প্রবাসী

র্তিক ১৩৮০

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৮০

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

অগ্রহায়ণ ১৩৮০

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

ভ্রম সংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর "স্মরণীয় সম্পাদকীয় সৌজন্য" প্রবন্ধটিতে ২য় কলমে ১৮ লাইনে একটি মারাত্মক ভুল ছাপা হইয়াছে। এজন্য আমরা লজ্জিত। লাইনটিতে আছে—"১৩০৬ সালে একটা গল্প পাঠিয়ে পয়সা চেয়েছিলাম" কিন্তু 'পয়সা'র পরিবর্তে 'জায়গা' চেয়েছিলাম হইবে। পড়িবার সময় এই ত্রুটিটি সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

বর্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু 'প্রবাসী' বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

—ম্যানেজার, 'প্রবাসী'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

১৩৮০

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৮০

সূচীপত্র

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

বর্ত্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু 'প্রবাসী' বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

—ম্যানেজার, 'প্রবাসী'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

১৩৮০

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৮০

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

১৩৮০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত-

চৈত্র

১৩৮০

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

নব বধু　　　　শিল্পী—সুধীররঞ্জন খাস্তগীর

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৮০ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

একচেটিয়া ব্যবসার শোষণ শক্তি

ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আসিলে ক্রেতা বিক্রেতাকে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে কোনঠাসা করিয়া যথেচ্ছা অল্পমূল্যে বিক্রয় কিম্বা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে না। প্রতিযোগিতা না থাকিলে যদি ক্রেতা একমাত্র ক্রয়কারীরূপে উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে বিক্রেতা বাধ্য হইয়া ঐ একমাত্র ক্রেতার কথাতেই তিনি যে মূল্য বলিবেন তাহাতেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। বিক্রেতার যদি একাধিপত্য থাকে তাহা হইলে বিক্রেতাও ক্রেতাকে অধিক মূল্য দিতে বাধ্য করিতে পারেন। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকাই সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক এবং প্রতিযোগিতার অভাব একচেটিয়া কেনাবেচার প্রবর্তন করিয়া সাধারণকে শোষন সহ্য করিতে বাধ্য করে। একচেটিয়া ভাবে কেনা বেচা আজকাল অর্থনীতি ক্ষেত্রে নানান প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে। শাসকগোষ্ঠী এই কথাই সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে জাতীয় ভাবে যাহা কিছুই করা হইবে তাহাই জনসাধারণের মঙ্গলকর। কিন্তু শাসকগণ যদি এক চেটিয়াভাবে চাউল অথবা গম খরিদ করেন তাহাতে চাষী উচিত মূল্য না পাইয়া শোষিত হইতে পারে। অথবা যদি সরকারী দোকান হইতেই শুধু চাউল গম বিক্রয় হয় তাহাও ক্রেতার পক্ষে সুবিধা-জনক না হইতে পারে। ত্রিপুরা সাপ্তাহিক ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে চাউল ক্রয় লইয়া কি ঘটিতেছে তাহার একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে সরকারী একাধিপত্য কেমন করিয়া জনসাধারণকে শোষিত হইতে বাধ্য করে। বিবৃতির উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইতেছে :—

ত্রিপুরা সরকার নাকি ন্যায্যমূল্যে ১ টাকা ৫ পয়সা কেজি দরে চাউল খরিদ করিয়া কৃষকদের বাঁচাইতে স্থানে স্থানে সরকারী ক্রয় কেন্দ্র খুলিয়াছেন। গত

সপ্তাহে সরকারী ক্রয় পদ্ধতি চাক্ষুষ করিবার জন্য পত্রিকার তরফ হইতে লোক গিয়াছিল খোয়াই মহকুমার কয়েকটি ধান চালের প্রসিদ্ধ বাজারে। বাজারের নাম মোহর ছরা এবং চেবরী। বড় রাস্তার পাশেই বাজার। ট্রাকে মাল পরিবহন চলে। উভয় স্থানেই সরকারী ক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। খোলা হইয়াছে বলা ঠিক নহে; কারণ সরকারী ক্রয় কেন্দ্র সাইন বোর্ড লাগানো ঘরগুলি হাটবারেও ছিল তালাবদ্ধ। ঐ বন্ধ দরজার সামনে বহুলোক ধান চাল লইয়া বসিয়াছিল বেলা দুপুর হইতে সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত। তালাবদ্ধ দরজা আর খুলিল না। বিক্রেতা (কৃষকরা) সরকারী দর পাইবার জন্য দূর দুরান্ত পল্লী অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। আর কত বসিয়া থাকিবে; চাল বেচিয়া তেল, নুন, চিটা, ভেরমা প্রভৃতি লইয়া ঘরে ফিরিতে এমনিতেই বেশ রাত হইবে। অতএব বেশি দেরি আর সয় না। চাল বিক্রি না করিয়াই বা বোঝা লইয়া বাড়ী যাইবে কি করিয়া। বাজারে তখনও অবশ্য বেসরকারী ক্রেতা ছিল। তাহাদের কথামত দরেই প্রতি কেজি ৭৫ বা ৮০ পয়সা (চাউলের মান অনুযায়ী) বিক্রি করিতে বাধ্য হইল। সেখানকার লোকেরা বলাবলি করে এই চালই পেছন দরজা দিয়া অথবা রাত্রে সরকারী ক্রয় কেন্দ্রে ঢুকে। দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে, যে সকল জায়গা হইতে মাথায় করিয়া অথবা ঘোড়ার পিঠে করিয়া মাল আনা নেওয়া করিতে হয়, ঐ সকল (বাজার হইতে যাহাদের দূরত্ব পনর বিশ মাইল) অঞ্চলে টাকায় দুই কেজি আড়াই কেজি চাল বিক্রয় হইতেছে। ঐ সকল অঞ্চলের কোথাও সরকারী ক্রয় কেন্দ্র নাই।

সাব্রুম বিলোনিয়া মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে টাকায় চারি কেজি ধান বিক্রয় হইতেছে—প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য ইহারও কারণ ঐ সকল অঞ্চলে সরকারী ক্রয় কেন্দ্র নাই। ক্রয় কেন্দ্র যাইবে কি, রাস্তাই যে নাই। অথচ দুই তিন বছর আগেও ঐ অঞ্চলে যানবাহন চলাচল করিবার রাস্তা ছিল। ঐ সকল অঞ্চলে সরকারী পর্য্যায়ে লেভিতে ধান চাউল কেনা হইত এবং ঐ অঞ্চলেই গুদামজাত করা হইত। ঐ ধান চাউল তিন মাস পর অন্নকষ্টের দিনে ন্যায্যমূল্যের দোকান মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিক্রি করা হইত।

মহাপণ্ডিত আল বিরুনির সহস্রতমজন্ম বার্ষিকী

৪তারিখ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ এ বিশ্ববাসী মধ্য এশিয়ার সুবিখ্যাত মহা বিদ্বান আবু রেহান আহম্মদ ইবন মহম্মদ আলবিরুনির সহস্রতম জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত করিবেন। আলবিরুনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। তাঁহার সমতুল্য সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সে যুগে বা তৎপরেও পৃথিবীতে অল্পই জন্মিয়াছে। আলবিরুনি মধ্যযুগের খোরেজম-কঠয়াৎ এর রাজধানীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে উহা উজবেকিস্থানের বিরুনি নামক একটি ক্ষুদ্র সহর। বিরুনি প্রথমে পাঠে মনোনিবেশ করেন ও পরে কিয়াৎ-এ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। কিয়াৎ হইতে বিরুনি ইরানের রে ও গুরগানে কর্ম্ম সূত্রে গমন করেন। তাহারও পর তিনি তুর্কীস্থান ও আফঘানিস্থানের গজনিতে বাস করিয়াছিলেন। গজনিতেই আলবিরুনির ১১ই ডিসেম্বর ১০৪৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।

আলবিরুনির বিদ্যানুশীলন ক্ষেত্র দীর্ঘ প্রসারিত ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল বহুমুখী। তিনি প্রায় ১৫০টি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ, ইতিহাস, রসায়ন, ভূগোল, জরিপকার্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র বর্ণনা, ভারতবর্ষ লব্ধ বিদ্যাবিচার, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন। আলবিরুনির সহিত সমসাময়িক মধ্য এশিয়াবাসী ইবনসিনা (অভিসেনা) নানা বিষয়ে যে সকল পত্র বিনিময় করেন তাহার মধ্যে বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধানতঃ তাঁহাদের পত্রালাপের বিষয় ছিল। আলবিরুনি অন্য নানান গণিতজ্ঞ পণ্ডিতজনের সহিতও পত্র বিনিময় করিতেন। অঙ্কশাস্ত্র লইয়াই আলোচনা অধিক হইত। এই মহাপণ্ডিতের সহস্রতম জন্মবার্ষিকী পৃথিবীর সকল শিক্ষিত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। সোভিয়েটদেশে বিশেষ করিয়া।

রুশিয়ার পৌর ব্যবস্থা বিচার

শ্রী কে, এন, সাহানি দিল্লীর মেয়র। তিনি মস্কো গমন করিয়াছিলেন ও সেখানের পৌর ব্যবস্থাদি দেখিয়া বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। রুশিয়ার দুইটি বড় বড় সহর মস্কো ও লেনিনগ্রাড দেখিয়া তিনি সংবাদ পত্রের লোকেদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা খুবই প্রশংসাসুচক। এই শহর দুইটি খুবই পরিষ্কার এবং তাহাদের যানবাহন ব্যবস্থাও অতি উত্তম। ইহা ব্যতীত বলিতে হয় যে এই দুই সহরেরই বাসস্থান নিম্মানকার্য্য প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ। তিনি বলেন যে, মস্কো ও লেনিনগ্রাড দেখিয়া তাঁহার নিজের খুবই উপকার হইয়াছে অর্থাৎ নানা বিষয়ে চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির উপর ঐ শহরগুলির দেখা শোনার ভার তাহারা সকলেই বিশেষ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও নিজ নিজ কার্য্য যথাযথভাবে করাইয়া লইতে উৎসুক ও ব্যাগ্র। যাহা যাহা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে সেই সকল কার্য্যই নিশ্চয় হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মস্কোতে বাৎসরিক ১২০০০০ টি ফ্ল্যাট নির্ম্মিত হইতেছে ও তাহাতে পাঁচলক্ষ মানুষ বাস করিতে পারে। পাঁচ বৎসরে ৬৫০০০০ ফ্ল্যাট নির্ম্মান সম্পূর্ণ হইবে এবং তৎপরে বাসস্থানের অভাব আর থাকিবে না। আর একটা কথা আছে যার মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইল বাড়ী ভাড়ার কথা। সাধারণ রোজগেরে মানুষের উপার্জ্জনের টাকার শতকরা ৩ হইতে ৫ টাকার মধ্যেই বাড়ীভাড়া হইয়া যায়। বাড়ীগুলিও বাসযোগ্যতার দিক দিয়া পুরাপুরি সুনির্ম্মিত। মস্কোর যানবাহন ব্যবস্থা খুবই উত্তম। ৫০০০ টি বাস, ২০০০ ট্রলি বাস, ১৫০০ ট্রামগাড়ী, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ পথে চালিত রেলওয়ে এবং ১৫০০০ মোটর গাড়ী। এই সকল যানবাহন দৈনিক এক কোটি ত্রিশলক্ষ যাত্রীকে পারাপার করিয়া থাকে। মস্কোর সুড়ঙ্গ রেল পথে যাতায়াত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প খরচে হয়। নিউইয়র্কের তুলনায় এক সপ্তমাংশ মাত্র খরচ লাগে। গাড়ীগুলি সুন্দর আরামদায়ক। শ্রী সাহনির মতে রুশিয়ান জাতির উন্নতির মূলে আছে তাহাদের শ্রমক্ষমতা আতিথেয়তা, অপরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ও স্বদেশপ্রেম। এই সকল গুণই একটা জাতিকে উন্নতি করিতে সক্ষম করে।

জনসাধারণ না রাষ্ট্রীয় দলের সবল হস্ত

দুই তারিখ সেপ্টেম্বর বেলেঘাটার এক কংগ্রেসনেতা সাইকেল থেকে পতিত হইয়া আঘাত পান ও তাঁহাকে তাঁহার দলের লোক অথবা আত্মীয়বন্ধুগণ নীলরতন সরকার হাসপাতালে লইয়া যান। সেখানে যে ডাক্তার 'ইমারজেন্সি' অঙ্গে আগত রোগীদের পরীক্ষা চিকিৎসাদি করিতেছিলেন তিনি ঐ আহত কংগ্রেস নেতাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর জীবিত নাই। ডাক্তার ইহা দেখিয়া রোগীকে নানা-ভাবে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হইল না। রোগীর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকে বলিতে থাকেন যে রোগী তখনও জীবিতই আছেন ও তাঁহাদের কথায় ডাক্তার রোগীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করেন ও দেখেন যে রোগী মৃত। তিনি অতঃপর দেহটিকে মর্গে পাঠাইবার জন্য একটা সার্টিফিকেট লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় রোগীর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডাক্তারকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে আহত করেন। ডাক্তারের নাক-মুখ কাটিয়া যায় ও পরে তাঁহাকে এক্সরে করাও আবশ্যক হয়। ঐ সকল আক্রমণ-কারীগণ হাসপাতালের জিনিসপত্রও ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নষ্ট করে ও ডাক্তার ব্যতীত অন্য লোকেদের উপরও আক্রমণ করিতে যায়। বৈদ্যুতিক আলো, তার ইত্যাদি এবং টেলিফোনের যন্ত্র নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পুলিশের লোকে হাসপাতালে আসিয়া সকলকে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য করে এবং ঐস্থলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনে। ঘটনাটির বিষয়ে রটনা করা হয় যে জনসাধারণ ঐ আক্রমণ প্রভৃতি করেন ও তাঁহার কারণ তাঁহারা ডাক্তারের কার্যে অসন্তোষ অনুভব করেন। এই প্রকার রটনা কোনও ভাবেই

বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না; কারণ কোন আহত ব্যক্তির সহিত সাধারণের যাঁহারা হাসপাতালে গমণ করেন তাঁহারা প্রায় কখনই আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এরূপ মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না যাহাতে তাঁহারা চিকিৎসকের উপর আক্রমণ করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে যাঁহারা অন্যায়ভাবে ডাক্তারের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিলেন তাঁহারা নিঃসন্দেহ মৃতব্যক্তির অন্তরঙ্গ ব্যক্তিই ছিলেন। তাঁহাদের জনসাধারণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টার মধ্যে শুধু দোষীদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র লক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তাহারা রাষ্ট্রীয় দলের গুণ্ডাব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। এই গুণ্ডাজাতীয় ব্যক্তিগণ অল্পবুদ্ধি ও সহজে উত্তেজিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নেতাকে হঠাৎ মৃত ঘোষণা করিলে তাঁহারা উত্তেজিত হইতেই পারেন। সে যাহাই হউক এখন যাহাতে এইরূপ বেয়াইনি আক্রমণ হাসপাতালের ডাক্তারদিগের উপর না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়দলগুলির উচিত হইবে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে দলের সকল ব্যক্তিকে লেখা যে এই জাতীয় কার্য্য কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না। এবং দলের সকল ব্যক্তিই এইরূপ ব্যবহারের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছেন। যাহারা এই কার্য করিয়াছেন তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা আর একটা প্রয়োজনের কথা। দলের লোক হইলেই তাহাকে অন্যায় করিলেও শাস্তির হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এই রীতির কোনও সমর্থন করা শেষ অবধি দলের সুনাম রক্ষার দিক হইতে উত্তম পন্থা নহে। যে রাষ্ট্রীয়দলের ব্যক্তিগণ এই কার্যে লিপ্ত ছিলেন সে দলের নেতাদিগের কর্তব্য হইবে আহত ডাক্তার মহাশয়কে উপযুক্তরূপে ক্ষতি পূরণ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য সুসাধিত করা। ইহা না করিয়া ঘটনাটিকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া সাধারণকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা দলের পক্ষে অখ্যাতির কথা।

সাধারণ-তন্ত্র কি অচল হইতেছে ?

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণতন্ত্র অনুগত রাষ্ট্র। এই সাধারণতন্ত্র এখন যে রাষ্ট্রীয়দলের সংখ্যাগরিষ্টতাজাত শক্তিতে শাষিত হইতেছে সে দলটি হইল শাসক-কংগ্রেস দল। বিগত ১৯৭১ খৃঃ অব্দে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস আর (রুলিং বা শাসক) ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ও কেন্দ্রে বিশেষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়া জয়লাভ করেন। এই দলের নেতা হইলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের মূলে আছে নানান কথা, যাহার মধ্যে উল্লেখনীয় কথা হইল (১) তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর একমাত্র সন্তান ও তিনি পিতার সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়াই এই দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন। (২) সচরাচর রাষ্ট্রনেতাদিগের বিরুদ্ধে যে সকল অপ-প্রচার করা হইয়া থাকে শ্রীমতী গান্ধীর সম্বন্ধে সেইরূপ অপপ্রচার বিশেষ কেহ করিবার চেষ্টা এখন অবধি করে নাই। (৩) শ্রীমতী গান্ধী নিজমত অনুসরণে সবিশেষ সাহস দেখাইয়া থাকেন। তিনি যে-ভাবে কংগ্রেসের পুরাতন পন্থী নেতাদিগকে সরাইয়া দিয়া কংগ্রেস আর দলের প্রবর্ত্তন করেন তাহা তাঁহার সাহসের একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পরে তিনি বাংলাদেশে পাকিস্থানী উৎপীড়কদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া যেভাবে অল্পদিনের মধ্যেই জয়লাভ করেন ও বাংলাদেশকে পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তিনি স্বয়ং দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নিজ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে জ্ঞাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাঁহার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় ও সবল হয়। ভারতবর্ষের মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ভক্তি পোষণ করে তাহার মূলে বিশেষ করিয়া আছে এই যুদ্ধজয়ের কাহিনী।

বর্ত্তমানে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে যাঁহারা নিন্দাবাদ করিতেছেন তাঁহাদের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র হইল ইন্দিরার শাসনকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিশেষ

প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সরবরাহে ঘাটি। পর পর যদি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হয় এবং ফলে যদি চাষবাস যথাযথ ভাবে না হইতে পারে তাহা হইলে তাহার জন্য কোনও রাষ্ট্রনেতাকে দায়ী করিবার চেষ্টাকে সুতর্ক বলা চলেনা। উপরন্ত পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ হওয়ায় ভারত বর্ষের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হইয়াছিল এবং আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রও ঐ কারণে তাঁহাদিগের ভারত বিরুদ্ধতা আরও প্রকটভাবে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। এই বিরুদ্ধতার ফলে ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থ সংগ্রহ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যবস্তু আমদানীও ঠিকভাবে হইতে পারে না। ভারতের বর্ত্তমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যবস্তুর অভাব যে সকল কারণে ঘটিয়াছে তাঁহার মধ্যে এই আমেরিকার বিরুদ্ধতা একটা অতি বড় কারণ। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী না থাকিয়া যদি কংগ্রেসের পুরাতন নেতাগণ থাকিতেন অথবা যদি বামপন্থী কোন দল বা দল গোষ্ঠী ভারত শাসন করিতেন তাহা হইলে অবস্থা উন্নততর হইত এইরূপ কল্পনার কোনও বাস্তব অবস্থা নির্বিষ্ট ভিত্তি থাকিতে পারে না বলিয়াই চিন্তাশীল ভারতবাসীদিগের মধ্যে বহু লোক মনে করেন। পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে এবং বাংলাদেশ-বাসী পলাতক ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হওয়াতে ভারতবর্ষের যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাহাও তৎপরবর্ত্তী অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে প্রকটরূপ ধারণ করিয়া দেখা দেয়। শ্রীমতী গান্ধী না থাকিয়া অন্য কোন নেতা থাকিলে অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল হইত এইরূপ চিন্তা করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। (৪) এখন যে অবস্থা তাহাতে কংগ্রেস দলের মধ্যে নানা প্রকার বিভেদের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু তাহা স্থানীয় প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ভূত। শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত সে সকল বিভেদ ও কলহের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বামপন্থীদল যে সকল আছে বা আরও গঠিত হইবে বলিয়া মনে হয় তাহাদিগের সম্মিলিত শক্তি কোন বৃহত্তর দল গঠনে সহায়তা করিবে বলিয়াও মনে হয় না। তাহাদিগকে আমেরিকা গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া কংগ্রেসকে হাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু তাহারা যে সেই অবস্থায় রুশিয়ার সাহায্য লাভ করিবে তাহা মনে হয় না। রুশিয়া যদি কংগ্রেসের (আর) দিকে থাকে তাহা হইলে বাম পন্থিদিগের শক্তি কোন ভাবেই শাসন ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। কংগ্রেস (আর) সি পি আই কিছুটা মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে কিন্তু সে মিলন যদি না থাকে তাহা হইলেই যে কংগ্রেস (আর) এর শাসন-শক্তি চলিয়া যাইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেস (আর) সি, পি, আই এর পরিবর্ত্তে অন্য কোনও দলকে সঙ্গে টানিতে পারে এবং সেই সম্মিলিত দল গোষ্ঠী ভারতের সাধারণতন্ত্রকে যথাযথভাবে চালাইয়া রাখিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে।

সুতরাং বর্ত্তমানে যে কংগ্রেস (আর) এর বিষয়ে নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছে, যে কংগ্রেস (আর) ফ্যাশিষ্টনীতি অনুসরণ করিতেছেন ইত্যাদি; তাহার মূলে কোন প্রমাণ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন না। সাধারণতন্ত্র যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিতেছে। অর্থাৎ কোন কার্য্যই গায়ের জোরে কেহ কোথাও করিতেছে না। ভোটের জোরেই এমন অবধি সকল কার্য্য চলিতেছে এবং লোকসভা রাজ্যসভাতে কংগ্রেসের ভোটের জোর অটুট রহিয়াছে। গায়ের জোর দিয়া কোন মতলব হাসিল যদি কেহ কোথাও করিতেছে ত তাহা ব্যক্তিগত ভাবেই হইতেছে এবং তাঁহার সহিত রাষ্ট্রীয়দলের নীতির কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ এখন অবধি দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ফ্যাশিজ্‌ম প্রবর্ত্তন চেষ্টার অপবাদ শুধু অপপ্রচার বলিয়াই ধরিতে হইবে। ভোট যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে ভোটাধিক্য যাহার তাহারই শাসন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। একাধিকার ও "জোর যার মুলুক তার" নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে ভাবিবার কোনও নিশ্চিত কারণ—যতক্ষণ দেখা না যাইবে ততক্ষণ এই জাতীয় অপ-প্রচার বিস্তার করিতে না দেওয়াই সাধারণতন্ত্রবাদী জনসাধারণের কর্তব্য।

ফ্যাশিষ্ট কে ?

ফ্যাশিষ্ট বলিতে আমরা সেইরূপ রাষ্ট্রীয় দল সংগঠনই বুঝি যেরূপ-দল গঠনের উদ্দেশ্য দেশবাসীকে একাধিপত্য মানিয়া একনায়কের সকল হুকুম পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে বাধ্য করা। ফ্যাশিষ্টের প্রধান ও প্রবলতম অস্ত্র হইল সামরিক শক্তি ও ক্ষুদ্র গণ্ডির সবল দক্ষিণ হস্ত গ্রস্ত অস্ত্রের শানিত আদেশ পালন করাইবার ক্ষমতা। যদি কোন রাষ্ট্রীয় দল সামরিক শক্তিকে নিজ করায়ত্ব না করে এবং যদি সেই দলের শক্তিমাণগণ জনগণকে অস্ত্র ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করে তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রীয় পন্থা অনুসরণকে ফ্যাশিজমের পথ চলা বলা চলিতে পারে না। ফ্যাশিজম এর অপরাপর লক্ষণ হইল সামরিক শক্তি ব্যবহারে শুধু দেশবাসীকে এক নায়কের হুকুমের দাস করিয়া রাখা নহে, সেই সামরিক শক্তি দ্বারা অপর দেশের উপরেও প্রভূত্ব স্থাপন চেষ্টা করা ও নিজ দেশেও শাসনের উদ্দেশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় দলের সামরিক শক্তি দিয়া সেই দলের একাধিপত্য কায়েম রাখা। জনমঙ্গল বা অপর কোন সদুদ্দেশ্য সাধন নহে। ইটালিতে মুসোলিনি যখন ফ্যাশিজম আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শ্রমজীবিদিগের সোসিয়ালিষ্ট দলগুলি। কত স্থানে কত সহস্র শ্রমজীবিকে যে মুসোলিনির কালো-কামিজধারী সৈন্যগণ হত্যা করিয়াছিল তাঁহার হিসাব আজ যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব হইবে না। হিটলারের স্টর্মট্রুপারগণ হত্যা করিত ইহুদিদিগকে এবং তদুপরি হিটলার সারা ইয়োরোপ জয় করিয়া নিজের মতলবে সকল দেশকে চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই সকল আত্মমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য মুসোলিনি ও হিটলার অন্য সকল সুনীতির কথা সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া যথেচ্ছাচারের চুড়ান্ত করিয়াছিলেন ও তাহার ফলে তাঁহাদের অখ্যাতির কথা যুগে যুগে বিশ্বমানব সমাজে মানবতার সকল আদর্শের বিরুদ্ধবাদ বলিয়াই প্রচারিত হইবে। এই ফ্যাশিজমের সহিত তুলনীয় কোনও অন্যায় বা অধর্ম্মের অবতারণা আমরা ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোথাও দেখিতে পাইনা। সুতরাং এই দেশে যাঁহারা ফ্যাশিজম ফ্যাশিজম বলিয়া অকারণে জনগণের মনে উত্তেজনা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা ফ্যাশিজম কাহাকে বলে সেকথাও সঠিকভাবে জানেন না। ভারতবর্ষে ফ্যাশিজম এখন অবধি কোথাও হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

কাছাড় পৃথক করার দাবী

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "যুগশক্তি"তে প্রকাশ যে "গত ২রা সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ মদনমোহন মাধবচরণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাক্তন এম, পি শ্রীদ্বারিকানাথ তেয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কাছাড় পৃথকীকরণের দাবীর স্বপক্ষে জনমত তৈরী করার জন্য অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকে সভাপতি ও আইনজীবি শ্রীমুকুন্দমুরারী সেনকে সাধারণ সম্পাদক করে করিমগঞ্জ শহর প্রস্তুতি কমিটী গঠন করা হয়।

"উল্লেখ্য যে কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ গত ১২ই আগষ্ট শিলচরে অনুষ্ঠিত জনসম্মেলনে পন্থা বিবৃত্তি বাতিল করেণ। এবং কাছাড় পৃথকীকরণের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

"করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণদান করেন শ্রীগোলাম ওসমানী, শ্রীপ্রমোদ চৌধুরী, মৌলানা আবদুল নুরা, আবদুল কায়ুম চৌধুরী, শ্রীকেতকী দত্ত, শ্রীনন্দকিশোর সিংহ ও সভাপতি মহাশয়। শ্রীওসমানী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে আগামী নভেম্বর মাসে এই দাবী নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোমার কর্ম্ম পন্থা গ্রহণ করা হবে।"

কাছাড়কে আসাম হইতে পৃথক করিয়া লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করাই উদ্দেশ্য। ইহার কারণ আসামে আসামী ব্যতীত অপর জাতীয় লোকেদের ভাষা প্রভৃতি লইয়া নাজেহাল করার রীতি। লেখাপড়ায়, কোর্টে, কর্ম্মক্ষেত্রে আসামের বাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতির বাসিন্দাদিগের জীবন অতিবাহিত করা অত্যন্তই কঠিন। সর্ব্বক্ষেত্রে অসমীয়া ভাষা লইয়া যত গোলযোগ। ইহা ব্যতীত যে আসমীয়া নহে তাহার পক্ষে আসামে বসবাস করা একটা মহা সমস্যার বিষয়। সংখ্যা

অধিবাসীজাতিসকল যদি নিজেদের নিজত্ব ভুলিয়া গিয়া আসামী হইয়া যাইতে পারেন তবেই তাঁহাদের আসামে থাকা চলে। অন্য উপায় হইল আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানান জাতির সুবিধার জন্য নুতন নুতন প্রদেশ গঠন করা। কাছাড়ে বাঙ্গালীদিগের জন্য সেই চেষ্টাই চলিতেছে।

পশ্চিমবাংলাতে খাদ্য সমস্যা

পশ্চিম বঙ্গে যাঁহারা শাসকের পদে অধিষ্ঠিত তাঁহারা খাদ্য সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাতে মনে হয় যে তাঁহাদের খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বণ্টনের যে বিলি-ব্যবস্থা তাহা ঠিক থাকলেই পশ্চিম বঙ্গের জন সাধারণের আর কোন অভাব থাকিবে না। তাঁহারা মাথা পিছু এক কিলো চাউল ও এক কিলো গম একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির এক সপ্তাহের খোরাক বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন ও তাহাও দিতে তাঁরা সকল সময় সক্ষম থাকেন না। দুই হাজার গ্রাম চাউল ও গম অর্থাৎ দৈনিক হিসাবে ৩০০ শত গ্রামেরও কম ভাতরুটি এক ব্যক্তির একদিনের খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট নহে এ কথা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। দুই বেলায় একপোয়া ভাত রুটি হইল আধ পেটা খাদ্যেরও কম। সুতরাং যখন এই বণ্টনরীতি পূর্ণ চালু থাকে তখনও তাহা হইতে কাহারও পেট ভরে না। কালো বাজারে চাউল আটা ক্রয় সকলকেই প্রায় নিয়মিতভাবেই করিতে হয়। এই কারণে জনসাধারণ কালো বাজারের দর কি তাহা দিয়াই দেশের খাদ্যমূল্যের অবস্থা বিচার করিয়া থাকেন। কিছু কাল পূর্ব্বেও কালো বাজারে চাউল দুই টাকা আড়াই টাকা কিলো হিসাবে পাওয়া যাইত। ইহাতে জনসাধারণ খুসী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ঐ দর বাড়িয়া সাড়ে চার পাঁচ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে গরীব লোকের পুরা পেট খাওয়া জোটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া যে কেহ পেট ভরাইবার ব্যবস্থা করিবে তাহাও হওয়া কঠিন। কারণ মৎস মাংস ইত্যাদি একান্তই দুর্মূল্য এবং তরি-তরকারিও অত্যন্তই মহার্ঘ। এইরূপ অবস্থায় মানুষের না খাইয়া মরিবার সম্ভাবনা প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে ও সকলেই আশায় রহিয়াছেন যে সেই অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে ভারতের শাসকগণ কোন ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের প্রাণ রক্ষা করিবেন। শুনা যাইতেছে যে বাহিরের রাষ্ট্রগুলি খাদ্য সরবরাহ করিয়া ভারতের সাহায্যে অবতীর্ণ হইবেন। যথা রুশিয়া কুড়ি লক্ষ টন চাউল ও গম পাঠাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার কথা কিছু শুনা যাইতেছে না; তবে টাকা দিলে খাদ্য পাওয়া যাইবে—নিঃসন্দেহে। সন্মুখে দেড় দুই মাস মহা কষ্টের সময় হইবে। ঐ সময় গত হইলে পরে অবস্থা উন্নততর হইবে।

পারমিট কোটা লাইসেন্সের কথা

আমাদের নূতন জাতীয় জীবন যখন ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয় তাহার কিছুকাল পরেও আমাদের স্বাধীন শাসন পদ্ধতির মধ্যে নানান প্রকার লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ নানা প্রকার বস্তু পাইতে কিম্বা সরবরাহ করিতে হইলে ও বিভিন্ন কার্য্য বা কারবার পরিচালনা করিতে হইলে সরকারী অনুমতী পাওয়ার রীতি অনুবর্ত্তিত হইল। বহুকাল পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে চাউল, সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতি ক্রয় করিতে হইলে তাহার জন্য ক্রয়ানুমতি পত্র যোগাড় হইত। কোন কারবার করিতে হইলে তাহার জন্য লাইসেন্স সংগ্রহ করা আবশ্যক হইত। সেই সময় চাউল যাহারা সরবরাহ করিত তাহারা সরকারী কর্মচারীদিগের জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতে চাউলে মণকরা একসের দেড়সের কাঁকড় মিশাইয়া দিত। সিমেন্টেও গঙ্গা মৃত্তিকা মিশান হইত এবং অন্যান্য বস্তুতেও ভেজাল দেওয়ার চল ছিল। কোন পারমিট পাইতে হইলে যথাস্থানে তৈলমর্দন না করিলে কিছুই পাওয়া যাইত না। এবং এই সকল ব্যবস্থা যাহারা করিয়া দিত তাহারা নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া তৎপরেই কাজ করিয়া দিত। সিমেন্ট ক্রয় করা অথবা ইস্পাত সংগ্রহ করা বহুকাল হইতেই কঠিন কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল

লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি লইয়া নানা ব্যক্তির দুর্ণাম হইতেছে তাহারা কে কি করিয়াছে অথবা করে নাই সে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সহজ কার্য্য নহে; কারণ এই সকল কার্যকলাপ বহুকাল হইতেই অন্যায় ও দুর্নীতির সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। যে জাতীয় দুষ্কার্য্য বহুকালাবধি ভারতবর্ষের মানুষ করিয়া আসিয়াছে সেই দুষ্কার্য্য যদি জড় হইতে উচ্ছেদ করিয়া ভারতীয় মানবের পক্ষে করা অসম্ভব করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহার জন্য বহু বর্ষকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ সে প্রচেষ্টা হইবে একটা বিরাট নৈতিক বিপ্লব প্রচেষ্টা। অতি বাল্যকাল হইতে যদি সর্ব্বত্র সকলে চেষ্টা করেন যে অন্যায় কেহ করিবেন না, অথবা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবেন না, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় মানুষের মধ্যে সেই সৎ চরিত্রভাব গঠিত হইবে যাহাতে ভারতীয় মানুষ আর প্রবঞ্চনা উৎকোচ দান ও গ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। এই নৈতিক বিপ্লব যদি হয় তাহা হইলে তাহা হইতে বহু বৎসর সময় লাগিবে এবং তাহার পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ভারতবর্ষে বহু মহান চরিত্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও সুনীতি প্রতিষ্ঠার বহু চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সুনীতি প্রতিষ্ঠা কখন কখন হইয়াছে আবার বহুক্ষেত্রে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অন্যায় ও দুর্নীতি ন্যায় ও সুনীতির সহিত একই সঙ্গে একই স্থানে অঙ্কুরিত হইয়াছে ও হইতেছে। একটি থাকিলে অপরটি থাকিবে না এরূপ ব্যবস্থা কেহ করিতে পারে নাই কখনও। আজও তাহা কেহ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক চেষ্টা করিতে কোনও দোষ নাই।

নেতা পার্শ্বচর ও অনুচর

নেতা হইলেন তিনি যিনি পথ প্রদর্শন করেন, আদেশ নির্দেশ, দিবার অধিকারী ও যাঁহার কথায় পার্শ্বচর ও অনুচরগণ চলিতে বাধ্য বলিয়াই সকলে জানে। পার্শ্বচর হইলেন তাঁহারা যাঁহারা নেতার কাছাকাছি আসেপাশে ডাইনে বামে ঘনিষ্ঠ সহায়ক বলিয়া উপস্থিত থাকেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা কম ও ইঁহারা হাতে গোনা বাছাই করা মানুষ। বস্তুতঃ এই পার্শ্বচরগণই নেতাদিগের অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন, ও বহু মতলবও তাঁহাদিগের মস্তক হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি যে রূপ তাঁহার সেনাবাহিনীর নানান অংশের নানান সহায়ক সৈন্যাধক্ষদিগের সাহায্যেই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও যাঁহারা মহা রথী তাঁহারাও তেমনি নিজেদের অনুগত পার্শ্বচরদিগের সাহায্যে বহু কার্য্য সাধন ব্যবস্থা করিয়া লইয়া থাকেন। এই সকল পার্শ্বচরগণ যুদ্ধক্ষেত্রের ব্রিগেডিয়ার, কর্ণেল, ক্যাপ্টেন প্রভৃতির সহিত তুলনীয় এবং ইঁহারা না থাকিলে রাষ্ট্রক্ষেত্রের কোনও অভিযান কদাপি সফল হইতে পারে না। পার্শ্বচরদিগের মধ্য হইতেই আবার নেতাদিগের উদ্ভব হয় এবং সেই নেতাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে সফলকাম হইতে পারেন যিনি সহজে,উপযুক্ত সংখ্যায়, সক্ষম কর্ম্মী পার্শ্বচর সংগ্রহ করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় কলহ বিবাদ, তর্ক বিতর্ক, প্রচার ও দলের লোক সংগ্রহ প্রভৃতি সকল কার্য্যই নেতাদিগের পার্শ্বচরগণই করিয়া থাকেন এবং সকল সহকারীদিগের ক্ষমতার উপরেই নেতাদিগের দলের শক্তি ও প্রসার নির্ভর করে। এখন দেখিতে হইবে সাধারণ-ভাবে নেতাদিগের দলের আদর্শবাদ বিস্তার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে সুসাধিত হয়। এই কার্য্য যাহারা অধিক সখ্যায় দলবদ্ধ ভাবে করেন, তাঁহারা হইলেন নেতা ও নেতাদিগের পার্শ্বচরদিগের অনুগামী সাধারণ অনুচর। ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত তুলনীয় এবং ইঁহাদের কার্য্য হইল আদেশ-নির্দেশ মানিয়া কাজ করিয়া চলা। কোনও দলেরই সাধারণ অনুচরদিগের উপর কোনও আদর্শ, উদ্দেশ্য বা মতলব নির্ণয়ের কার্য্য নির্ভর করে না। তাহাদের কার্য্য হইল কোন তর্ক বা আলোচনা না করিয়া এবং কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সময়ের অপব্যয়ও না ঘটাইয়া সকল আদেশ নির্দেশ যথা সম্ভব পূর্ণরূপে ও যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সুসম্পন্ন করিয়া ফেলা ক্ষতি হয় না। কাহারও কাহারও মতে চিন্তা-শক্তি অধিক না থাকাই উত্তম। কিন্তু নেতাদিগের আদর্শ ও আদেশ যদি একেবারেই বোধগম্য না হয় অনুচরদিগের পক্ষে তাহা হইলে নেতাদিগকে অনুসরণ করাও কঠিন হয়। এই কারণে কিছু কিছু বোধ শক্তিও বুদ্ধি থাকিলে অনুচরগণ আরও উত্তম রূপে নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যন্ত্রের ন্যায় শুধু প্রতিক্রিয়াশীল হইলেই অনুচরগণকে দিয়া রাষ্ট্রীয় দলের কার্য্য সুসাধিত না হইতেও পারে। তাঁহারা অন্তত কতকটা বুঝিয়া শুঝিয়া চলিতে পারিলেই রাষ্ট্রীয় দলের গঠন ও অগ্রগমন আরও উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে যে ভাঙ্গণ ধরার সম্ভাবনা সৃষ্ট হয় তাহা মানিয়া লইতেই হইবে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্মরণীয় সম্পাদকীয় সৌজন্য

জ্যোতির্ময়ী দেবী

প্রথমেই মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের উক্তি "উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও বাড়িতে থাকে" (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(আর সঙ্গে সঙ্গে মনে আসছে নিজের বয়সের কথা। শেষ কথাটা বলে নিতে পারা যায় যেন।) যদিও সর্বত্র কৃতজ্ঞতা বাড়ে কি না জানা যায় না। কেননা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রসিদ্ধ একটা উক্তি আছে "আমি তো ওর কোনো উপকার করিনি" কেউ নিন্দা করলে বলেন।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করেও যেন মানুষের পার নেই। একসময় ছিল যখন লেখক-লেখিকাও নিজের লেখায় কথকও বটে—আর দেশশুদ্ধ জনসাধারণও বটে, সবাই তাঁর সেই রচনার শ্রোতা ছিলেন। এখন তা নেই। লেখক নিজের লেখার পাঠক বা কথক নন। তাঁর শুধু লেখাই কাজ। পাঠক বা শ্রোতার দল একটা আলাদা অচেনা জগতের মানুষ। এবং মাঝে আছেন লেখক-পাঠকে পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের যান্ত্রিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সম্প্রদায়। একালে যাঁরা না হলে লেখার প্রচার ও সংগ্রহ বা সঞ্চয় হয় না।

এককথায় একালে এটা যেন একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। লেখক যখন নতুন কলমী, নিজের লেখার সম্বন্ধে প্রত্যয়, বিশ্বাস অন্যের মতামতের অপেক্ষা রাখে, তখন তাঁদের এমন কারুদের চাই যাঁরা তাঁর লেখার দোষগুণ দেখতে পান। রসিক পাঠক, সম্পাদক ও প্রকাশক সম্প্রদায় হলেন সেই সজ্জন। এমনকি এই সহানুভূতি প্রসঙ্গে নবনী-তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথেরও উক্তি পাই ৺প্রিয়নাথ সেনের সম্বন্ধে লেখা—"......সেইসময়ের লেখায় তাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমার কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল......। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না। এবং পরে কাব্যের ফসলে কতটা ফলন হইত বলা শক্ত।" এবং সেই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমাদৃত বচনমালা পাওয়াও স্মরণীয়" (জীবনস্মৃতি)।

এখন মনে পড়ছে 'বঙ্গদর্শনে' তরুণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা নিয়ে প্রবেশের কথা। 'বঙ্গদর্শনে'র আগেও পত্র-পত্রিকা কিছু ছিল—'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ কৌমুদী', 'প্রভাকর', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। কিন্তু সেগুলি 'বঙ্গদর্শনে'র মত ছিল না। এখানেও রবীন্দ্রনাথই স্মরণীয়—'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব যেন বঙ্গসাহিত্যে 'রাজার আবির্ভাব'।

শোনা যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের নৈহাটীর বাড়ীতে একদিন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সঙ্গে আলাপ-গল্প করতে করতে বলেন, এখানকার একটি ছেলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। ছেলেটি লেখে-টেখে।

বঙ্কিমবাবু বললেন, 'এখানকার ছেলে। লেখে। আমি চিনি না।'

'সে আপনাকে তার লেখা দেখাতে চায় কিছু।'

এবারে সম্পাদক বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। (হরপ্রসাদের উক্তি)

'তা কাদের বাড়ীর ছেলে? কি নাম?'

'নন্দকুমার শাস্ত্রীর ভাই। নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।'

এবারে বঙ্কিমবাবু। 'নন্দর ভাই! নন্দ আমার সহ-পাঠী। তবে তো তার লেখা আমার দেখতে হবে। আসতে বোলো।'

যুবক হরপ্রসাদ কিন্তু লেখা পাঠালেন, স্বহস্তে নয়। সামনে এসে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হয়েছিল। হয়ত সমীহ বা ভয়ও। লেখার নাম 'ভারতমহিলা', 'বাল্মীকির জয়'।

কদিন যায়। কাছাকাছি তিনি ঘোরাঘুরি করেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুদের বাড়ী যায় না। সামনে তো নয়ই।

বঙ্কিমবাবুর বন্ধুদের মধ্যে সহসা একদিন কে যেন বললেন, "ওহে, তুমি যেও ওবাড়ী। বঙ্কিমবাবু তোমাকে ডেকেছেন।"

বঙ্কিমবাবু ডেকেছেন! নতুন লেখকের তাই দুরুদুরু বুকে তিনি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। কি বলবেন বঙ্কিমচন্দ্র—লেখা ভাল বা মন্দ হয়েছে!

বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে তাঁর পাঠানো দুটি লেখা, 'ভারতের নারী' ও 'বাল্মীকির জয়'। মুখে আলবোলার নল।

বঙ্কিমবাবুর আর সম্পাদকীয় গুরু-গাম্ভীর্য্য নেই।

একেবারেই বললেন, "ওহে, আগে যেটি দিয়েছিলে সেটী রূপা। আর এটী একেবারে খাঁটি সোনা।"

নতুন লেখকের কাছে এমন কথা বিখ্যাত বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের মুখে শোনা যে কত বড় পুরস্কার এবং সাহিত্যিক প্রেরণা—যেন তাঁর ভবিষ্যৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরূপে আবির্ভাবের সূচনা হয়ে গেল। ('নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে।)

এই হল সম্পাদকের সহায়তার আনুকূল্যে নতুন লেখকদের নিজেকে খুঁজে পাওয়া—চিনতে পারা। কারুর মহৎ লেখক হতে পারার পথের দিশাও বলা যায়। যেমন "পথের পাঁচালী" প্রকাশ বিচিত্রা সম্পাদকের আনুকূল্যে।

বলা বাহুল্য তখনকার বঙ্গদর্শনে শাস্ত্রীমহাশয়ের লেখা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল তো বটেই এবং পরেও বহু লেখা বেরিয়েছিল। এবং তাঁর ভাষায় মুগ্ধ প্রশংসাও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি পেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের কঠোর সমালোচকের কাছে এই প্রতিষ্ঠা পাওয়া সেকালের একটি নতুন লেখকের কাছে কম পাওয়া নয়। কিন্তু তিরস্কার ও পুরস্কারের মাঝে যে তিনি সাহিত্যিক সংঘ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন, তাই হল সম্পাদকের হাতে লেখক সৃষ্টির কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে প্রথম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই বঙ্গদর্শনের আয়ু মাত্র চার বছর। তারপরও জন্ম অবসান তার আবারও বার বার হয়েছে। বেশীদিন করে নয় কিন্তু, তবু যেন বঙ্গদর্শনই ও পথ প্রদর্শক। ঠাকুরবাড়ীতে তখন 'ভারতী'র ও আবির্ভাব হয়েছে এবং 'সাধনা'ও। কিন্তু তারা অনেকটা পারিবারিক বা ঠাকুরবাড়ীর প্রভাবান্বিত পত্রিকা। বাইরের লেখক বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রবেশ তাতে সীমাবদ্ধ।

এবারে বলি 'প্রবাসী'র কথা।

এই প্রবাসীর জন্ম ১৩০৮ সালে। তার মধ্যেও 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দুটি পত্রিকার জন্ম ও তিরোধান ঘটেছে। 'দাসী' এবং 'প্রদীপ'। 'প্রদীপ' আমরা দেখেছি আমাদের প্রবাসের বাড়ীতে। আকার এবং রচনায় সমৃদ্ধ ছিল।

কিন্তু প্রবাসী বেরুল প্রবাসের এলাহাবাদ থেকে। যেখানে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন। এই প্রবাসী জন্মমুহূর্তেই সমস্ত বাঙালীর মন হরণ করে নিল বললে অত্যুক্তি হবে না। আমার বয়স তখন আট। পড়তে শিখেছি মাত্র বলা যায়।

বঙ্গ দর্শনের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাহিনী কেমন তা তখন জানা থাকবার কথা নয়। নামও না। পরে রবীন্দ্রনাথ থেকে নানা লোকের, কবি নবীন সেন, শ্রীশ মজুমদার, কৃষ্ণকমল, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয় সরকার, প্রমুখ নানা স্মৃতিতে সে কথা আমাদের পাওয়া।

তার প্রায় তিন বছর পরে বাংলা সাহিত্য ও পত্রিকা জগৎ আরো পরিণত হয়েছে। 'ভারতী' 'সাধনা' 'জন্মভূমি' 'প্রচার' আদি নানা পত্রিকা জন্মেছে। কিন্তু প্রবাসীর আবির্ভাব আরেক ধরণের রূপ, সাধনা, ভঙ্গী চেষ্টা নিয়ে। যা ঐ অন্য পত্রিকাগুলিতে স্পষ্ট ছিল না। তারা শুধু সাহিত্যপত্র বলা যায়।

প্রবাসী এলো সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্পকলা, স্ত্রীশিক্ষারও এবং দেশের মানুষের সুখদুঃখ রুচি আদর্শের যেন প্রতীক ও প্রদীপ হাতে নিয়ে।

ধরতে গেলে সে যুগে এটা আদর্শ সুপ্রকাশ। রুচি, বিষয়, নির্ব্বাচনে অতুলনীয়। এবং সবচেয়ে বিশেষত্ব, তাতে নারী লেখিকা সমাজের জন্য একটা আসন বা কোণও দেখা গেল। যা আগের যুগের "বঙ্গদর্শন" বা অন্য পত্রিকায় ছিল কি না আমার জানা নেই। ('ভারতী'তে ছিলেন অবশ্য) স্বর্ণকুমারী প্রমুখ, যা প্রায় পারিবারিক)।

আমাদের বক্তব্যই আজ তাই। এবং 'প্রবাসী' বা 'প্রবাসী' সম্পাদকের কাছে নারী সমাজের এই অপরিশোধ্য ঋণ যে কতখানি সেটা বলা।

সবাই মানেন, স্ত্রীশিক্ষার জগতে খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে এদেশের নারীসমাজ কতখানি ঋণী। যে কারণেই হোক ছোটছোট স্কুল পাঠশালায় ধর্মপ্রচার বা শিক্ষার প্রচার যাই হোক, সেটা বেথুন সাহেবের আগে থেকেই এ চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন বিদ্যাসাগর মদনমোহন ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ কেশব সেনেরও এই নিরালোক লোকে দৃষ্টি পড়েছিল। তাঁরা সমাজের ও শিক্ষার এবং স্ত্রীশিক্ষার অনেক অভাব দেখতে পেয়েছিলেন।

ক্রমে তখন ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিয়েছেন কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা, সরলা ইন্দিরা দেবী প্রমুখ উচ্চশিক্ষিতা। হিন্দু সমাজের কেউ নয়। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় দেখতে পেয়েছিলেন তাও। যদিও লেখিকা জগতে তখন কবিতা নিয়ে এসেছেন মানকুমারী, প্রসন্নময়ী, গিরীন্দ্রমোহিনীরা কিন্তু কেউই উচ্চশিক্ষিতা নন। সবাই ঘরোয়া লেখাপড়া জানা। এবং বিয়োগ শোক দুঃখের পথে সেই কাব্য জগতে আগমন। সবাই হিন্দু অন্তঃপুরিকা।

অনুরূপা, নিরুপমা দেবীরাও দেখা দিয়েছেন উপন্যাস নিয়ে স্বর্ণকুমারীর 'ভারতী'র পাতায়। এঁরাও অন্তঃপুরবাসিনী ঘরোয়া-শিক্ষিতা হিন্দুকন্যা। তখন প্রবাসী সম্পাদকের কন্যারা স্কুল কলেজে পড়ছেন। কলমও ধরেছেন বেনামে (সংযুক্তাদেবী)।

হেনকালে একদা সহসা দেখা গেল নিরুপমা দেবীর 'দিদি'কে প্রবাসীর পাতায়। আর দুএক বছর পরেই শৈলবালা ঘোষের 'সেখ আন্দু'কে। দুটিই হিন্দু ঘরের সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়ে।

শৈলবালার আত্মকথাতে পাচ্ছি—তিনি লেখাটি স্বামীর হাত দিয়ে প্রবাসীতে পাঠান। নেওয়া হয়। কিছু দাক্ষিণাও পান।

সেকালের সেই ১৩১৯।২০ সালের 'প্রবাসী'তে লেখকদের ঠাঁই পাওয়া যে কত গৌরবের ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ছিল, সে কথা 'কল্লোলযুগে'র লেখকদের স্মৃতিতে পাই। শ্রীপ্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, শৈলজানন্দ, প্রবোধ, মনোজ বসু প্রমুখ অনেকেরই লেখাতে সে কথা রয়েছে। যেন সাহিত্যের প্রাঙ্গনে 'ছাড়পত্র'র। যে প্রবাসী লেখক গোষ্ঠী হলেন রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর বিধুশেখর শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিদ্বৎজন ও মহারথী রথীরা। গল্প কবিতায় প্রভাতকুমার, চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রিয়ম্বদা দেবীরা। ক্রমে কলেজ শিক্ষিতা সীতা শান্তা দেবীরা।

তারই মাঝে প্রায় অশিক্ষিতই হিন্দু অন্তঃপুরচারিণীর দিক থেকে একদিনও প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি বা চোখ সরে যায় নি। যিনি সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। তাই একটা চিঠিতে পড়ি কর্মচারীদের বলা ছিল, মেয়েদের যে কোনো লেখাই হোক তাঁকে না জানিয়ে যেন ফেরৎ দেওয়া না হয়...। নিজে নিরুপমা দেবীর লেখা সংশোধনও করে দিয়েছেন। মেয়েরা লেখার জন্য উৎসাহ ও সুযোগ পান। এবং সেই সব বিরাট মহৎ পুরাতন বিখ্যাতদের মাঝে তাঁরা ঠাঁই পেয়েছেন।

এবং আমিও সহসা ১৩৩৬ সালে একটা গল্প পাঠিয়ে পয়সা চেয়েছিলাম—প্রবাসীর গৌরবান্বিত পাতায়। তারপরও লেখা পাঠিয়েছি। প্রাপ্তি স্বীকার, মনোনীত হওয়া না হওয়ার চিঠি। এবং কখনো কখনো দাক্ষিণাও এসেছে। এই হল প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগ এবং তার সৌজন্য। যে প্রবেশ পথটি, দুয়ারটি প্রবাসী সম্পাদক খোলা না রাখলে আমাদের অন্তঃপুরের

অনেক লেখিকাই লেখিকা হতে পারতেন না। যেটা সেকালের সাহিত্য জগতে লেখক সকলেরই সিংহদ্বার। খিড়কী দুয়ার চারিণীদেরও প্রবেশ অধিকার দিয়েছিল প্রবাসী।

প্রবাসীর পর 'উত্তরা' পত্রিকার কথাও স্মরণীয়। এখানেও বহু বিখ্যাত বিদগ্ধ সুধীজন ও নতুন লেখকদের সঙ্গে অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠাঁই পেয়েছি। সম্পাদক ছিলেন সুরেশ চক্রবর্তী। সম্প্রতি বিগত 'ভারত বর্ষ' পত্রিকায়ও জলধর সেনের সময়ে মেয়েদের লেখার প্রবেশদ্বার খোলাই ছিল অনুরূপা নিরুপমা প্রভাবতী উপন্যাসে স্মরণীয়া। আমি প্রবন্ধ গল্প কবিতায় জায়গা পেয়েছি। জলধর সেন দীর্ঘকালই সম্পাদক ছিলেন। এমনি সহৃদয় মানুষ যে সর্ব সাধারণ লেখকের জলধর দাদা ছিলেন।

প্রবাসের আরো পত্রিকা 'অলকা'তেও (সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য অধ্যাপক) লেখা চেয়েছেন। দিয়েছিলাম।

মাঝে দীর্ঘকাল থেমে গেছে কলম। আবার ধরেছি একসময়ে 'গল্প ভারতী'র আহ্বানে। নরেন্দ্র দেব নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ডাকে। তার স্বত্বাধিকারী সত্যেন্দ্র বসু মহাশয়েরও ডাক এসেছে।

'বিচিত্রা'র (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে মুখ্যতঃ যোগাযোগ কিছু ছিল না। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই যোগাযোগ করে দেন। এবং লেখা প্রকাশিত হয়।

"যুগান্তর সাময়িকী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর সহৃদয়তা ও সৌজন্য অনেকবার পেয়েছি। লেখা পাঠিয়েছি। বেরিয়েছে। ভুলে গিয়েছি কিন্তু ফিরে আসেনি। দেখি বেরিয়েছে। নীরব সৌজন্যে যুগান্তর সাময়িকীর পরিমল গোস্বামী 'প্রবাসীর' তিন সম্পাদকের সঙ্গে তুলনীয়। এঁর 'পত্রস্মৃতি'তেও এই চেনা-অচেনা, প্রবাসী-অপ্রবাসী, খ্যাত-অখ্যাত নানা শ্রেণীর লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের কৌতুকময় খুঁটিনাটির সন্ধানও পাওয়া যাবে। এইসব সম্পাদকীয় সৌজন্য ও অচেনা বা অপরিচয়ের নামহীনা সঙ্কুচিতাদের সামনে। ছোটবড় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে তাদের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে রাখেনি।

আরো সেকালের পত্রিকার সম্পাদকদের কথায় মনে পড়ছে 'মাসিক বসুমতী' সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়ের সহৃদয় সৌজন্য। তিনি আমায় 'আরাবল্লীর আড়ালে'র কয়েকটি গল্প প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদনায়। চিনতাম না। সহসা নিজেই একদিন এসে পড়েন বাড়ীতে। অতি সজ্জন। 'শনিবারের চিঠি'তেও পাঠিয়েছি। সজনীবাবু গ্রহণ করছেন। 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। সম্পাদক বারীন্দ্র ঘোষ। প্রবোধ সান্যালও। জয়পুর থেকে যথেচ্ছ ভাবে লিখেছি তাঁরা নিয়েছেন।

'স্বদেশ' পত্রিকাও বিজলীর নির্বাণের পর বেরোয়। লেখা নিয়েছেন। সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

ছোটবড় খ্যাত অখ্যাত কাগজ তখন 'হিন্দু মিশন' 'নবশক্তি' এঁরাও কখনো কখনো চেয়েছেন লেখা।

"জয়শ্রী" লীলা নাগ (রায়) পত্রিকাতেও কিছুদিন লেখা দিয়েছি। যতদিন রাজরোষে পড়ে উঠে না গিয়েছিল।

আমাদের কালে বাইরে বেরুনো বা সাহিত্যিক সমাজে গতিবিধির খুব সুযোগ ছিল না। সম্পাদকেরা চেনা নন। লেখক গোষ্ঠীও অচেনা। প্রকাশকদেরও দেখিনি কখনো বললেই হয়।

বাড়ীতেও লেখক বা পাঠক পরিচিতি বা লেখাপড়া দেখানোর সুযোগ সেকালের মেয়েদের ছিল না। জেন অষ্টেনের জীবনকথায় একবার পড়ি, ঘরে বসে লিখতেন, কেউ এলে হিসাবের খাতা বা বই চাপা দিতেন। যেন সংসারের হিসাব দেখছেন।

আমাদের কালের নিরুপমা প্রভাবতী সরসীবালা দেবীদের যে কিছু অন্য ধরণ ছিল তা মনে হয় না। কোনো ভাই, কোনো কাকা বা অন্য কেউ গুরুজন কদাচ কখনো সহৃদয়ভাবে সাহায্য করেছেন। যদিও বেশীর ভাগই লেখিকাদের লেখা সঙ্গোপনে কোণে বসে লেখা।

অনেকটা ধ্যান করবে "কোণে বনে মনে"। ভগবানের স্মরণ উপদেশের বাণীর মত। সকলেই লিখছেন বলে ভীত সঙ্কুচিত।

আমাদের এই 'নাবালক' গোপন জগৎ ছাড় হতে অনেক সময় লেগেছে।

এই পথের প্রথম ঋণ কাকাদের বন্ধু ওমর খৈয়ামের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের কাছে। কয়েকটা কবিতা ও প্রবন্ধতো ভারতবর্ষ পত্রিকায়।

নিজে থেকে লেখা পাঠিয়ে কিন্তু প্রথম প্রত্যয় বিশ্বাস সাহস পাই প্রবাসীর পাতায় জায়গা পেয়ে। আগে কেউ পড়েনি সে লেখা। জানাই ছিল না লেখাটা 'লেখা' হয়েছে কি না। প্রবাসী নেওয়াতে আশ্চর্যও হয়েছিলাম, ভরসাও পেয়েছিলাম।

এর শেষ কথা ও কৌতুকের কথা হল এই যে, যে-সব লেখা অন্যত্র গিয়ে উপেক্ষিত হয়ে পত্রপাঠ ফিরে এসেছিল তা কিন্তু প্রবাসী সম্পাদকেরা ফেরৎ দেননি। কেদারননাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও ফিরে আসেনি। মেয়েদের লেখার উপর যে অনুকূল ও সহৃদয় উৎসাহদায়ক মনোভাব শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছিল, প্রবাসীর পরের দু'জন সম্পাদকও সেই উদারতার আদর্শ থেকে সরে আসেন নি।

এই প্রতিষ্ঠিত প্রবাসীতে জায়গা পাওয়ার পর 'উদ্বোধন' 'বিশ্ববাণী' পত্রিকাতেও লেখা পাঠাবার ভরসা পেয়েছিলাম। এবং এই সন্ন্যাসী সম্পাদকদের সহৃদয় সৌজন্য স্মরণ করছি।

কোনো লেখকের লেখা স্বীকৃত হবে কি না, কালের পাতায় বেঁচে থাকবে কি না কেউ জানে না, বিশেষ করে মেয়েদের লেখা কিন্তু প্রবাসীর কাছে হিন্দু ঘরের লেখিকাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এটুকু না মেনে যেন আমাদের শেষ কথা বলা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ এবং হিন্দী সাহিত্য

যদুপতি ঘোষ

সর্ব্বপ্রথমে ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে রচিত রাধাকৃষ্ণ দাসের "সাধনা" নামক গদ্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষাগত এবং ভাবগত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে হিন্দী সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব পতিত হয়। তবে কাব্য-সাহিত্যেই তাঁহার প্রভাব সমধিক।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দী কবিগণ হিন্দী কাব্যসাহিত্যকে যে নবরূপ দান করিয়াছিলেন তাহা ছায়াবাদ নামে খ্যাত।

হিন্দী কাব্যসাহিত্যে ১৫।২০ বৎসর যাবৎ ছায়াবাদের প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল। ছায়াবাদী কবিগণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের অনেকেই বেশভূষায় এবং প্রসাধনে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। সুমিত্রানন্দন পন্ত এবং কবি নিরালা রবীন্দ্রনাথের মত কেশবিন্যাস করিতে আরম্ভ করেন। কবি জয়শঙ্কর প্রসাদ তাঁহার মত শ্মশ্রু রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আলাপ-আলোচনাতেও রাবীন্দ্রিক শব্দাবলীর প্রচুর ব্যবহার হইত।

পণ্ডিতগণ বলেন যে হিন্দী কাব্যসাহিত্যে গদ্য কাব্যের উদ্ভব প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেরই ফল। চতুর সেন শাস্ত্রী, বিয়োগী হরিপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের গদ্যকাব্য তৎকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম হইতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিয়া কবি জয়শঙ্কর প্রসাদ 'চিত্রাধার' এবং 'কাননকুসুম' নামক কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উড়িষ্যার মধ্য দিয়া আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার অনুসরণে মৈথিলী শরণ গুপ্ত 'ঝঙ্কার' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিয়াশরণ গুপ্তের "আর্দ্রা" নামক কবিতাপুস্তকেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। ছায়াবাদী কবি নিরালা এবং পন্ত তাঁহাদের প্রাথমিক সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ-কে ভাবে ও ভাষায় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরালা "রবীন্দ্রকবিতা" কানন নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বিহারের কবি মোহনলাল মহতো (বিয়োগী) নিজেকে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার "একতারা" ও "নির্মাল্য" রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ অনুসরণে রচিত। প্রসিদ্ধ মহিলা কবি মহাদেবী প্রসাদ বর্ম্মার রচনাতেও অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দী কথা-সাহিত্যে প্রেমচন্দ্রের প্রভাব অধিক হইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নেহাৎ কম নহে। রাধিকা-রমণ প্রসাদ সিংহ এবং প্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করিয়াই উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' হিন্দী কথাসাহিত্যিক-দিগকে বেশীই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ঘরে বাইরের ভাবধারার অনুসরণে জৈনেন্দ্র নাথ তাঁহার কয়েকটি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ডাঃ দেবরাজের ঘর আউর বাহর নামক পুস্তকের নামই রবীন্দ্রঅনুস্মৃতির পরিচায়ক। গোরা এবং চোখের বালি হিন্দীতে অনূদিত হইবার পর হিন্দী কথা সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতীকধর্ম্মী নাটকগুলি প্রধানতঃ তাঁহারই অনুসরণে রচিত। পন্তের 'জ্যোৎস্না' এবং প্রসাদের 'কামনা' রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে রচিত।

আলোচনা সাহিত্যেও হিন্দী লেখকগণ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য হইতে অনুপ্রেরণা লইয়া আচার্য্য মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী 'হিন্দী সাহিত্য কী উপেক্ষিতায়েঁ' রচনা করিয়াছিলেন। মৈথিলী শরণের "সাকেত" এবং বলকৃষ্ণ শর্মার "উর্মিলা" রবীন্দ্র-অনুস্মৃতির নিদর্শন।

হিন্দী জগতের বিদ্বান্‌গণ স্বীকার করেন যে হিন্দী সাহিত্যের নব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, জীবন-দর্শন এবং জীবনসাধনার দান অসামান্য।

একটি ছাতা ও একটুখানি বিবেক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাসে ওঠার পর থেকেই মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মুখপাতে নিজের ওপরেই; বাসটা ছাড়তে যখন খেয়াল হোল, বর্ষাকাল, অথচ ছাতাটা ভুলে এসেছি। এরপর যা হোল তা এমন কিছু নূতন নয়। তবে মনের অপ্রসন্নতার জন্যই বরদাস্ত করা আরও শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। এক্সপ্রেস্ বাস, ব্যবস্থা অনুযায়ী এখান থেকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক শ'খানেক মাইলের মধ্যে মাত্র চারটি বিরতি, কিন্তু একচতুর্থাংশ না যেতে তিনটি হয়ে গেল। লোক উঠছে; এসব যাত্রীর সঙ্গে নাকি ড্রাইভার-কন্ডাক্টারের অন্যরকম হিসাব; তাদেরও জানা, এদেরও জানা। ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে বিশেষ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, সময়ের এই অপব্যয়। একটা কাজের জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছান দরকার ব'লে নানা অসুবিধার মধ্যে ভোরের এই বাসটা ধরেছি; ছাতার ভুলটাও তার মধ্যে এসে পড়ে। হাত ঘড়ি উল্‌টে দেখলাম, এর মধ্যেই মিনিট কুড়ি খুইয়েছি। এখনও সমস্ত পথ বাকি। তৃতীয়বারের পর আপত্তি করতে চতুর্থবারের বেলা ড্রাইভার নেমে সামনের চাকাটায় কি ঠোকাঠুকি করল, যার জন্য আরও কিছু বেশিই সময় গেল। আবার উঠে বসতে বসতে আমার দিকে একবার আড়ে চেয়ে ছিল। সেটা ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়, এর চেয়ে বড় অস্ত্র আছে তার হাতে। চুপ করে বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। সকালটা পরিষ্কার ছিল। পূব দিকে একটা মেঘ জমে উঠছে। ছাতায় মনটা দিয়ে বাসের কথা ভোলবার চেষ্টা করছি, ওদিক থেকে একটা বাস আসছিল, তার ড্রাইভার গতিবেগ একটু কমিয়ে গলা বাড়িয়ে খবর দিয়ে গেল—"সামনে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং হ্যায়।"

অবৈধ ফালতু যাত্রীদের নামানো, তারপর একটা চৌমাথায় ছোট ষ্টপে পৌঁছে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং—আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক গেল।

এরপর, অতিরিক্ত ভিড়ের চাপেই সামনের একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি খানিকটা একপেশে হয়ে গিয়ে প্রায় এক্সিডেন্ট করে ফেলেছিল, কোনরকমে সামলে গেল। তবে যাত্রীদের নামিয়ে চাকা খুলে অন্য চাকা পরাতে, তাদের আবার উঠে নিজের নিজের জায়গা নিতে এবার সময় গেল আরও বেশি।

নিয়মিত তিনটে ষ্টপ পেরিয়ে যখন চতুর্থ, অর্থাৎ মাঝখানের শেষ ষ্টপে এসে পৌঁছুলাম, তখন প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক বিলম্ব হয়ে গেছে। এটা তিনটে "রুটের" জংশন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বড় প্রাঙ্গণের মধ্যে। তার ভেতর অফিস, চা আর খাবারের দোকান, হাত-পা ধোওয়ার ব্যবস্থা, সব রয়েছে। এরপরেই আমার বাসের শেষ ডিপো, যেখানে যাচ্ছি। তবে কাছে নয়, প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মাথায়।

মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি হোল। ঝাপটায় কিছু কিছু ভিজতে হোল; এতে ছাতার কথাটা জেগে জেগে উঠে মনটাকে বেশ একটু ঐদিকেই টেনে রাখতে লাগল একরকম করে।

এখানে এসে মন-মেজাজ একটু গুছিয়ে নেওয়ার কথা মনে হোল। ঠিক ছিল, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই দিনের আহারটা সারব। তার সময় থাকবে। এখন, এ বাসের যেমন গতিগতি দেখছি, ঘণ্টা-দুই তো গেলই, বাকি পথটায় আরও কত টেনে নেয় বলা যায় না। এখানে বিরতিটাও একটু বেশি হবে। হোটেল নেই, তবে খাবারের দোকানটা, চায়ের ষ্টলটা ভদ্রগোছের ব'লেই মনে হয়। বোধহয় বাস কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানেই। ষ্টেট বাস।

গুছিয়ে নেব কি, এখানেই মেজাজ গেল আরও বিগড়ে।

বেশ একটু ভিড় নামল। বেশ তাড়াহুড়াও, গাড়িটা লেট যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়ে এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে টেবিলে বসলাম। ষ্টলের চা যেমন হয়। চুমুক দিতে দিতে মনে হোল, কখন পৌঁছাব, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে। অন্তত একটু ভালো করে খাবারটা খেয়ে নিই। মনে পড়ল বিশেষ ক'রে, সামনে একটা কড়ায় টাটকা বড়বড় সিঙাড়া ভাজতে দেখে। লাল হয়ে উঠেছে। চারটের অর্ডার দিয়ে দিলাম। গামলায় বড়বড় রসগোল্লা ভাসছে, তারও তিনটে। সিঙাড়ায় কামড় দিতেই বুঝলাম টাটকা নয়। বাসি সিঙাড়া আবার ক'রে ভাজছে, ভেতরের আলুগুলো টকে গেছে। বুঝলাম, অমন মন ভোলানো লালচে ভাব দু'বার ক'রে ভাজার জন্যই।

মাথায় আগুন ধ'রে গেছে। ডান দিকে একটু তাকাতে দোকানদার মালিক একটা টেবিলে বাক্স রেখে খদ্দেরদের সঙ্গে লেনদেন করছিল। সিঙাড়াগুলা চেপে রাখতে একবার আড়চোখে চেয়ে নিল। আমি তখন ঠিক ক'রেই ফেলেছি, তবু মনে হোল রসগোল্লাটাও পরখ ক'রে দেখে নিই। ভালো থাকে, এ বিভুঁইয়ে আর গোলমালের মধ্যে যাব না। বাসে হর্ণ দিয়েছে। বৃষ্টি নামবারও লক্ষণ।

রসগোল্লা বোধহয় দু'দিনের পচা। শোনা ছিল, এরা বাজারের দোকান থেকে খারাপ মাল নিয়ে এসে ভিড় আর তাড়াহুড়ার সুযোগে চালিয়ে দেয় অনেক সময়।

আর একটা হর্ণ। টেবিলের সামনে লোকও মাত্র একজন দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু জিদ ধ'রে গেছে তখন। হর্ণ, যাত্রীরাও তাড়াহুড়া করে প্রায় সবাই উঠে গেছে, আমি একটু চেপে বসেই বললাম—"পচা খাবার আপনি যাত্রীদের খাওয়াচ্ছেন। নিশ্চয় কর্পোরেশনের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করা দোকান, কমপ্লেন্ট বুক (Complaint book) আছে, বের করুন, আমি লিখে রাখব। রসগোল্লা তো একেবারে পচা।"

"পোচা বলছেন আপনি!"—চোখ কপালে তুলল লোকটা। গোলগোল ভাঁটার মতো চোখ, নিখুঁৎ অভিনয়ের জন্যই যেন তৈরী। হাঁক দিল—"আরে ভজুয়া!"

খদ্দের নেই, এদিকে আমি ঐভাবে চেপে ব'সে আছি, ছোঁড়াটা কখন সটকে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছে; দোকানের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল।

"তুমকো না হাম্ ভোজ্‌কা রসগুল্লা পোখরা মে ডাল্ দেনে বোলাথা? যাও, আভি সব ফেঁকো!"

ক্রোধের অভিনয়ও নিখুঁৎ। তারপর আবার আমার দিকে চেয়েও—

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বয়স হবে। বেশ বড় একটি, ভুঁড়ি, চোখের কথা বলেছিই; যেমন বিস্ময়ে, তেমনি ক্রোধে, অমনি আবার ক্রোধ ঠাণ্ডা করে দিতেও। অপরাধীর সলজ্জ এবং সনম্র হাসির ভাব ফুটিয়ে বেশ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, বাংলাতেই বলল—"একঠো ভোজের ফরমাইস্ ছিল বাবু। বর্ষার লিয়ে বরিয়াতির লোক সোবাই এলোনা তাদের। তাই জন্তে সো মাল লিলে না জাহান্নামিরা। এ-হারামজাদাকে পুকুরে ফেলে দিতে বললুম—আমারও ভোজ খেয়ে ভবিয়ৎ খারাপ ছিল, দেরিতে এসেছি..."

ঘন ঘন দু'টো হর্ণ দিল; এদের সঙ্গে যোগাযোগ তো থাকেই। ঠিক এই সময় ঝিরঝির করে বৃষ্টিও নামল।

মন ঠিক না ভিজলেও, সত্য-মিথ্যা যাই হোক একটা যুক্তি তো, ওদিকে নিজেকেও দেখতে হয়, কন্‌ডাক্‌টার হাঁকছে, চাকাও একটু ঘুরেছে বাসের, দু'দিক বজায় রেখে, তারই মধ্যে খানিকটা রোয়াবস্ত দেখিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বললাম—"ওসব ঢের শোনা আছে। আপনি কম্‌প্লেন্ট বুক বের করলেন না। ইংরিজী হিন্দী কাগজ আছে, গিয়েই আপনাদের কাণ্ড সব..."

"হুজুর, আপনাকোর ছাতা?"

"আনিনি।"—ব'লেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ব, 'হাঁ-হাঁ' ক'রে উঠল—"তাকি হোয়?...আরে ভজুয়া, জলদি ছাতাঠো নিকাল দে বাবুকে।"

ভজুরী নিয়ে আসতে বললাম—"পৌঁছে দিয়ে আয় বাসে।"

"আরে, না, না, লিয়ে যান বাবু। নেমে জরুরৎ হবে।"

"আর, তোমার ?"—প্রশ্ন করলাম।

"ছোড়িয়ে দিন আমার কথা। সোজায় ফিরবেন, দিয়ে যাবেন। না ফিরেন তো ছতি না আছে।"

তাগাদা, হর্ণ, চাকাও আবার ঘুরেছে। একটু ধমকই দিল ওদের লোকটা—"আরে ঠহরিয়ে সাহেব। দেখতে নেহি কৌন হ্যায় ?"

—দেখছ না মানুষটা কে হচ্ছে ?

বেশ জোরে বৃষ্টি নামল। কিন্তু জলের ঝাপটায় ভিজে, কিছু ওর শেষের এই সাড়ম্বর পরিচয়ে ভিজে, ওখানকার আক্রোশের অনেকখানিই ওখানে নামিয়ে উঠে এসে নিজের সীটে বসলাম।

আমার এ কাহিনী আসলে কিন্তু বাস-যাত্রার দুর্ভোগ দুর্গতি নিয়ে নয়। ও তো একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা, কমবেশি করে; বাসে একবার উঠলে হোল কিছুক্ষণের জন্য। আমি বলতে বসেছি ছাতাটার কথা, ওর শুভাগমন হোল কি ক'রে সেইটুকু বলতেই বাসের অবতারণা। আজ চার মাস রয়েছে আমার কাছে। না, আত্মসাৎ করিনি। বরং বলা যায় ওই আমার আত্মসাৎ করেছে। এর মধ্যে ক'বার ফিরিয়ে দেওয়ার কাছাকাছি এসেছি, কিন্তু পারিনি। কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে, ভালোর দিকেও, আবার মন্দর দিকেও। ছাতা হারাবার জিনিস বলেই জানতাম। একটা ছাতা উলটে একটা মানুষকে যে ছিনেজোঁকের মতো কামড়ে থাকতে পারে এরকম অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনও আর হয়নি। পরের ছাতা, মাঝে মাঝে উৎকট বিবেকদংশন, হাতছাড়া কিন্তু কোন মতেই করতে পারছি না; ক'তে চাইছে না বললেই বোধ হয় অবস্থাটার সঠিক বিবরণ হয়।

নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ব্যাপারটা আলোচনা করতে গিয়ে যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে উদয় হোল তা এই যে, লোকটা আমায় ঘুষ খাওয়াল। ঐ যে বললাম, কম্‌প্লেন্ট বুক না দিক, আমি দৈনিক কাগজগুলোয় লেখালেখি করব ব্যাপারটা নিয়ে, সেই জন্যই। যদি আমায় বৃষ্টি থেকে বাঁচাবারই ইচ্ছা ছিল তো, যেমন বললাম, ছোঁড়াটাকে সঙ্গে দিয়ে বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই তো যথেষ্ট হোত, এর পর নামবার সময় কি অবস্থায় নামব তা নিয়ে ওর এত মাথাব্যথা কেন যে, অপরিচিত মানুষ, কবে আবার ফিরব না ফিরব, হঠাৎ এমন দাতব্য করে বসল। একটা বাজে বাঁশের বাঁটের ছাতা হলেও কথা ছিল, দিব্য প্ল্যাসটিকের মুঠি দেওয়া প্রায় নূতন একটা ছাতা।

বৃষ্টি জোরে নেমেছে, বন্ধ জানলাগুলা ঝাপসা হয়ে গিয়ে মনটা বেশি রকম অন্তর্মুখী হ'য়ে উঠায় ঐ একটি চিন্তাই তার সমস্তটুকু জুড়ে রয়েছে। একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছিলাম; পচা-বাসি জিনিস খাইয়ে, পথের মাঝে কত লোকের বিপদ ঘটাচ্ছে—কত শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন—যতটুকু পারলাম, প্রতিশোধ করা যেত, লিখে রেখে কর্ত্তাদের নোটিসে এনে; লোকটা উলট্‌ ঢাল দিয়ে বন্ধ করল। গাড়ির বিলম্বের সুযোগ নিয়ে দু'টো বানানো মিষ্ট কথা ব'লে। নিশ্চয় বাঁধা বুলি—কাদের ফরমাস ছিল, পুরো বরযাত্রী এলো না—ছোঁড়াটাকে পুকুরে ফেলে দিতে বলেছিল বাসি মাল। ভুলে গেলাম সংকল্প। অথচ, অথচ তিনটে রুটের জংশনে, অনেক বাস যায় এখান থেকে। বিলম্ব হয়েছে, না হয় আর একটু হোতই।

এরপর; খবরের কাগজেও যাতে না লিখি তার জন্য ছাতাটা সুযোগ বুঝে দিল গছিয়ে। হাতে ক'রে নিলাম। ঘুষ।

অবশ্য, ছাতা কিন্তু আত্মসাৎ করছি না আমি, ফিরিয়েই দেব, প্রথম সুযোগেই। তবু যেন কোথায় কি ক'রে একটু বাধছে। বিবেক, কি দুর্বলতা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ছাতাটা জানলার গায়ে লুকিয়ে রেখেছি। যতই

ওদিকে না চেয়ে মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি, ততই নজর ওর ওপর গিয়ে প'ড়ে, ওকে কেন্দ্র ক'রে চিন্তাটা জটিল হ'য়ে উঠছে।

সমস্ত জটিলতা ছিন্ন করে, সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে যা' হক একটা সংকল্পে উপস্থিত হওয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে, নয়তো এই চুলচেরা বিবেক নিয়ে থাকতে গেলে এ-অশান্তি কাটবে না। আর, যতই বিলম্ব করব ততই এই চুলচেরা বিচারের হাতে গিয়ে পড়তে হবে। আমি ঠিক ক'রে ফেললাম। সবচেয়ে আগে এই কাজ, টাটকা-টাটকি। খবরের কাগজের আফিসটা বাস ডিপোর থেকে বেশ দূর নয়। এত দেরী হয়েছে, না হয় আরও একটু হবে।

নেমে আমি একটা ট্যাক্সি ক'রে সোজা চ'লে গেলাম। সম্পাদকের সঙ্গে ভালোরকম জানাশোনা আছে।

যেতেই একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন—"হঠাৎ এই অসময়ে—এরকম আলুথালু বেশে?"

"আরে মশাই, দুর্ভোগের কথা।"

"দু'মিনিট। পাশের ঘরে এ্যাসিস্টেন্টকে একটা কথা ব'লে আসছি—প্রেসে মেটার যাচ্ছে।"

তখনই ফিরে এসে বললেন—"বলুন, কি করতে পারি।"

এর মধ্যেই কিন্তু আমার সংকল্প শিথিল হয়ে গেছে, বিবেকের একটি প্রশ্নে—"লোকটার ছাতা ফিরিয়ে দেওয়ার আগে কি তার বিরুদ্ধে লেখা ঠিক হবে?"

অতি-সূক্ষ্ম একটু দ্বিধা। বললাম—"আলুথালু বেশের আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? বাস থেকে এই নামলাম, দু'ঘণ্টার ওপর লেট। এদিকে একটু কাজ ছিল, ভাবলাম ব'লে যাই আপনাকে। একটা বেশ কড়া করে..."

"লিখছি তো মাঝে ম'ঝে। টাইমের ঠিক নেই, তার ওপর চিঠি আসছে—হোটেল-ক্যান্টিনগুলোতে এন্তার পচা-বাসি চালাচ্ছে..."

ছাতাটা একটা খুলে টাঙিয়ে রেখেছি, নজর গিয়ে পড়ল, যেন টেনে নিলে নজর: বললাম—"অতটা অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি, বোধহয় লোক বুঝে টাটকা-বাসির ব্যবস্থা। হোক, একটু দেখবেন। ভাবলাম, এদিক দিয়ে যখন যাচ্ছি, একটু বলেই যাই। আবার আসব পরে। নমস্কার।"

বিস্মিত হয়ে পড়েছি নিজের আচরণে। যা করতে গেলাম তা তো হোলই না, উলটে লোকটার স্বপক্ষেই খানিকটা ব'লে এলাম। যেন মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল কথাগুলো। আর, আশ্চর্য, যেই না ছাতাটার ওপর নজর পড়া। ঘুষ আর কাকে বলে? তাহ'লে, এত সে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছি, সেটা কি মনকে শুধু চোখ ঠারা? আসলে আরও অন্তরের সঙ্গে ওটাকে গ্রহণ করা?

বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি না পাওয়ায় একটা রিকশা করতে হোল। বাড়িতে আসতে অনেকখানি পথ। বৃষ্টিটা মাঝে বেশ ধরে গিয়েছিল, কিছুটা আসতে প্রবল বেগে আবার নামল। ছাতাটা খুব কাজ দিল। খুলে সামনেটা আড়াল ক'রে না ধরলে ভিজে নেয়ে যেতে হোত। একটু কৃতজ্ঞতা এসেই পড়ে—মনে হোল, চিঠিটা লিখে এলে অন্যায়ই হোত।

আরও কিছু উপকারই ক'রে কৃতজ্ঞতার গন্ধটা ভারি করল ছাতাটা। কিন্তু যত কৃতজ্ঞতা ততই এদিকে দ্বন্দ্ব—একটা ঘুষকেই তো ক্রমে যেন বেশি করে আমল দেওয়া হচ্ছে না? স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে না?

দিতেই হবে ফিরিয়ে।

একটা কাজ এসে পড়ে বাড়ি ফিরতে দিন পাঁচেক দেরি হয়ে গেল। উপকার দিচ্ছে, তবু মনে হচ্ছে এ-ছাতার সঙ্গে আরও পাঁচটা দিন কাটাতে হলে পাগল হয়ে যাব।

ভাবলাম ঐ বাসের ড্রাইভার বা কন্‌ডাকটারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই ছাতাটা দোকানীকে। বাসটা তিনটের সময় এদিক থেকে ছাড়ে। বাজারে কিছু কাজও ছিল ঐ পথেই।

কন্‌ডাক্‌টারকে বললাম; লোকটা আমায় সেদিন ছাতা নিয়ে আসতে দেখেছিল। খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজী হোল। এত বেশি আগ্রহের সঙ্গে সে মনটা খুঁৎখুঁৎই করতে লাগল। তবু ঠিক করেই ফেললাম, দেব। বললাম, তাহলে আমি এক্ষুণি একটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে এটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।"

তিন কোয়ার্টারটাইম দেরি রয়েছে বাসের তখন। বাজার কাছেই।

কিনলাম একটা ছাতা। তারপর আরও কিছু জিনিস, কয়েকটা দোকান ঘুরে, তাড়াতাড়িই করতে হোল। গোটা চারেক ছোট বড় প্যাকেট হোল, আর কাগজের খোলে পাক দিয়ে রাখা নূতন ছাতাটা। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়ে উঠে পড়লাম।

এরপর যা হোল তাকে এমন অস্বাভাবিক কিছু বলা যায় না। একটা ছাতারই হিসাব রাখতে পারিনি কখনও, কত যে হারিয়েছি। যখন বাস ডিপোয় পৌছুলাম—ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে—নেমে দেখি ট্যাক্সির পিঠের কাছে রাখা প্যাকেটগুলার মধ্যে নূতন ছাতাটা নেই। কয়েকটা দোকান ঘুরেছি তাড়াহুড়ার মধ্যে, ভিড়ও ছিল, কোন দোকানে সে ছেড়ে গেছে মনেও পড়বার কথা নয়।

একটু সান্ত্বনা রইল, গেছে তো নিজেরটাই গেছে। ওরটা তো যায়নি।

তার পাশে একটা ক্ষোভও, গেলে অন্তত অব্যাহতি পাওয়া যেত।

পাঁচ দিন পরে যখন যাত্রা করলাম, বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করছি, এ-ছাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ টেনেবুনে আরও হোল ঘন্টা দু'য়েক। তারপর ফিরে গিয়েই কাগজে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া।

বৃষ্টি ক'দিন থেকেই বন্ধ; পৌছে সোজা ছাতা নিয়ে নেমে পড়লামও। তারপর দোকানের দিকে পা বাড়াব, নিজের ভেতর থেকেই একটা প্রশ্ন—"ছাতাটা ফেরাতে যাচ্ছ কেন?"

এত অপ্রত্যাশিত আর নূতন ধরণের সে, শুধু থমকেই গেলাম না, দোকানের আড়াল হয়ে বাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর নিজের সঙ্গেই নিজের যেন তর্ক লেগে যায়—

বললাম—"ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি ওর ছাতা বলে।"

—"ওর ছাতা, কে বললে একথা? একটা মানুষ নিজের ছাতা এত দামী, আজকালকার বাজারে বোধহয় পনেরো ষোল টাকার কম হয় না—দাতব্য ক'রে দেবে? ছাতা হারিয়ে ফেলারই জিনিস, কেউ ফেলে গেছে, তোমায় দিয়ে মুখ বন্ধ করলে।"

—"বেশ তো, সে লোকটার হাতে গিয়ে আবার পৌছাবে।"

—"জোর ক'রে বলতে পারল পৌছাবেই? পচা মাল বিক্রী ক'রে পয়সা করছে যে মানুষ সে অত সাধু হয়ে উঠবে?"

ডিপো থেকে বেরুবার পর এই প্রথম বিরতি, অল্পক্ষণই; বাস ছাড়ার হর্ণ দিল। একসঙ্গে দুবার; অল্প বিরতি জানি। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। ছাতা দেওয়া হোল না।

কিন্তু আত্মবিতর্কটাও তো সম্পূর্ণ হয়নি। লোকটা যার ছাতা সে এসে চাইলে যদি নাই ফিরিয়ে দেয়, বলে, দোকানে ভিড় থাকেই, কে নিয়ে গেছে কি ক'রে বলবে—তাহলে সে ওর বিবেক, ও জানে, আমি নিজে কেন পরিষ্কার থাকব না?

আরও অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো লোকটা সত্যই ওরকম নয়। আমি মনের বিরক্তিতে, রাগের বশে গোড়া থেকেই একটা ধারণা গড়ে নিয়েছি, নয়তো ও যা বলল—ভোজের ফরমাস, বরযাত্রী কম আসা—সত্যও তো হ'তে পারে তা? হয়তো ছোঁড়াটারই দোষ। দিতে বলেছিল পুকুরে ফেলে, দেয়নি। কিংবা নিজেই লাভ করবার জন্যে মালিক ভাঁড়িয়ে কিছু ফেলে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল টাটকার সঙ্গে, আমার ভাগ্যে পচাই পড়েছিল। কামড় দিয়েছিলাম তো একটাতেই; আর দুটো যে ছিল পচা একথাই বা কি ক'রে বলতে পারি?

বাসেই আরম্ভ হয়েছিল যুক্তিগুলা, তারপর সময়ের দূরত্বে যেমন হয়ে থাকে, এগুলাই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, ওর সদ্ব্যবহারের কথাই বড় হয়ে উঠে একটা অন্য ধরণের অশান্তিতে ভরে উঠতে লাগল মনটা।

সে দ্বন্দ্বও কেটে গেছে। মাস দুয়েকের পর আবার ঐ পথে আসি। ছাতা নিয়েই। দিয়ে দেব। বিশেষ দরকার না থাকলেও চায়ের সঙ্গে গোটা-চারেক রসগোল্লাও অর্ডার দিতে হবে। কেমন যেন লোকটার স্বপক্ষেই প্রমাণ সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করছে। ছাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে—সেবারে খুব উপকার করেছিলেন। আরও দুটো কথা বাড়িয়ে।

একটা লোকের সম্বন্ধে অন্যায় চিন্তা করাটাও তার প্রতি অবিচারই।

দোকানে গিয়ে দেখি বাক্সর সামনে সে নয়, অন্য লোক। বেচছেও অন্য একটা ছেলে।

এদিক-ওদিক একটু খোঁজ নিতে জানা গেল, বাসি-পচা বেচবার অনুযোগে লোকটাকে চুক্তি বাতিল ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শালা-ভগ্নীপতি দু'জনকেই। ঐ সম্বন্ধই ছিল দু'জনের মধ্যে।

যাক, চুকে গেল ব্যাপারটা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একটু অনুশোচনা, আমার এই দুর্বৃত্তদমনে কোন হাত রইল না।

তাও যাক। উপস্থিত সমস্যা, আমি এ ছাতার থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাই?

ছাতা হারাবার ব্যাপারে আমি একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এত ছাতা হারিয়েছি জীবনে, নিজের আর অপরের নিয়ে যে, একত্র করলে একটা দোকান খোলা যেত। কিন্তু এই একটা ছাতা সম্বন্ধে মনটা এত সতর্ক এত সজাগ যে, হাজার চেষ্টা করেও কোন মতে কাছছাড়া করতে পারছি না।

চোখের বাইরে সরিয়ে রাখবার জন্য কয়েকটা ছাতা একের পর এক ক'রে কিনলাম, হারিয়ে গিয়ে আবার এই ছাতাকেই টেনে বের করাচ্ছে!

একটা আতঙ্কেরই সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এও যেন স্বর্গোদ্যানে আদম ইভের অরিজিন্যাল সিনের (Original Sin) মতো হয়ে দাঁড়াল; একবার দুর্বল মুহূর্তে পা পিছলে আর কোনমতেই সামলানো যাচ্ছে না।

কাব্যনাট্য ও টি, এস, এলিয়ট

অশোক সেন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বৃটিশ থিয়েটারে আবার কাব্যনাট্যের পুনরাবির্ভাব হতে শুরু হল। দেখা গেল মঞ্চে কবিতা শুনতে দর্শক আর আগের মত বিরক্ত হচ্ছে না। ১৯৩০ সালে একজন নাট্য-সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন :

—'The Briti sh public has a healthy distrust of poetry'.

১৯৪৪ সালে এ ধরণের কথা বললে নাট্যামোদীরা তাঁকে পাগল বলতে দ্বিধা করত না।

১৯৪০ সাল অবধি বৃটিশ রঙ্গমঞ্চে উইলিয়াম আর্চারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আর্চারের মতানুসারে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারেরা ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয় —কারণ আর্চার বলতেন, "এলিজাবীথান নাট্যকারদের সৃষ্ট চরিত্রেরা কখনও স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলেন না—তাঁদের সংলাপের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অনেক পার্থক্য।" কিন্তু আর্চারের মতবাদের গোড়াতেই ছিল গলদ। কোন নাটকেরই (গদ্যে বা পদ্যে) সংলাপ কখনও বাস্তবজীবনের সংলাপ অনুসারে রচিত হয় না। এ সম্পর্কে টি, এস, এলিয়ট বলেছেন :

"For I mean to draw a triple distinction between prose and verse. and our ordinary speech which is mostly below the level of either verse and prose. So if you look at it in this way, it will appear that prose, on the stage, is as artificial as verse ; or, alternatively, that verse can be as natural as prose."

আর্চার বোঝাতে চেয়েছিলেন যেহেতু এলিজাবীথান নাটকের বেশীর ভাগ অংশটাই কাব্যে রচিত এবং যেহেতু বাস্তব জীবনে মানুষ কবিতায় কথা বলে না, সেহেতুই একথা বলা যায় যে, এলিজাবীথান নাটকের সংলাপ অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব। একথা তাঁর মনে আসেনি যে, গদ্যে হলেও যে ভাষায় আমরা বাস্তব জীবনে কথা বলি তা ঠিক গদ্য নাটকের ভাষা নয়। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে এলিয়টের কথাই ঠিক—নাটকের গদ্য সংলাপও নাটকের পদ্য সংলাপের মতই অস্বাভাবিক, বা নাটকের গদ্য সংলাপকে যদি স্বাভাবিক বলতে হয়, তবে নাটকের পদ্য সংলাপকে স্বাভাবিক বলব না কেন? আসলে নাটকের উভয় রকম সংলাপেই একটা রিদম্ বা ছন্দ-সৌন্দর্য থাকে, যা কখনই ব্যবহারিক জীবনের সংলাপে দেখা যায় না।

এরপর প্রশ্ন ওঠে : কি রীতি অনুসারে নাটকে গদ্য বা পদ্যের ব্যবহার হবে। এ বিষয়েও টি. এস. এলিয়টের মতবাদই সব দিক থেকে গ্রহণীয়।

এলিয়ট বলেছেন :

"If poetry is merely a decoration, an added embellishment, if it merely gives people of literary tastes the pleasure of listening to poetry at the same time that they are witnessing a play then is superfluous. It must justify itself dramatically, and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form. From this it follows that no play should be written in verse for which prose is dramatically adequate. And from this it follows again that the audience, its attention held by the dramatic action, its emotions stirred by the situation between the characters, should be too intent upon the play to be wholly conscious of the medium. Whether we use prose or verse on the stage, they are both but means to an end,"

এর মর্মার্থ হল : শুধুমাত্র অলঙ্করণের জন্য, শুধু শোভাবর্ধনের জন্য, শুধু শ্রুতিমধুর করবার জন্য (যার ফলে দর্শক নাটক দেখতে দেখতে কাব্যের ব্যঞ্জনা এবং অনুরণনে মুগ্ধ হন) যদি নাটকে কাব্যের ব্যবহার হয়,

সে ক্ষেত্রে কাব্যকে নাটকের পক্ষে বাহুল্য হিসাবেই ধরা হবে। নাটকে কাব্যের ভাষা ব্যবহারে নাট্যিক যৌক্তিকতা থাকা চাই। সুন্দর কাব্যকে নাট্যিক আকার দিলেই নাটক হয় না। এর থেকে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়, যে-নাটককে যথাযথ ভাবে গদ্যে লেখা যায় সে-নাটক কিছুতেই কাব্যে রচিত হওয়া উচিত নয়। আরও একটা কথা,—নাটক দেখবার সময় দর্শকদের মন নিবিষ্ট থাকে ড্রামাটিক এ্যাকশনের উপর, তাদের ভাবাবেগ আলোড়িত হয় বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক অবস্থা এবং সম্পর্কের সৃষ্টির উপর। সুতরাং দর্শকেরা নাটক সম্পর্কেই এতটা মনঃসংযোগ করে যে, নাটকটি গদ্যে রচিত না পদ্যে রচিত, সে বিষয়ে ততটা খেয়াল করে না। মঞ্চে মুখ্যস্থান হচ্ছে নাটকের-সংলাপ (গদ্যে বা পদ্যে) হচ্ছে ঐ নাটকের নাট্যরস সৃষ্টির মাধ্যম মাত্র।

'নাইনটিন টোয়েনটিজ', 'নাইনটিন থারটিজ'-এ রঙ্গজগতে আর্চারের ছিল অসীম প্রতিপত্তি। বৃটিশ থিয়েটারের যে রূপ ঐ সময় আমরা দেখতে পাই, তার উপর বিশেষ ছাপ ছিল উইলিয়ম আর্চারের চিন্তাধারার। বক্তৃতায়, কথাবার্তায় এবং লেখায় নিছক বাস্তববাদের উপরই তিনি বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একমাত্র রিয়ালিজ্‌মের মাপকাঠিতেই নাটকের মূল্য যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবধারার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত রোনাল্ড ম্যাকেঞ্জির মিউজিক্যাল চেয়ার্স'কে বহু বছরের মধ্যে প্রকাশিত সবচেয়ে সেরা নাটক বলে অভিহিত করেছেন।

একটানা প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাস্তবতার প্রাধান্য চলেছিল বৃটিশ রঙ্গমঞ্চে। তারপরেই শুরু হল এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কাব্যনাট্য ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরম্ভ করল। প্রধানত দু'টি কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধের সময় থেকেই শেক্সপীয়রের নাটকের প্রতি জনচিত্তের আকর্ষণ ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল। জাতীয় গৌরব, জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় বীর্যবত্তার যে সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস শেক্সপীয়রে পাওয়া যায়, যুদ্ধের সময় জাতীয় জীবনে তার যে একটা বিশেষ প্রভাব সবাই অনুভব করবে, এ কথা তো বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া বিগত কুড়ি বছরে বাস্তবতা যেন নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। দর্শকচিত্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল নূতনত্বের আস্বাদের জন্য। এরই ফলে টি. এস. এলিয়ট ও কৃষ্টফার ফ্রাই উৎসাহ পেলেন যুগপোযোগী কাব্যনাট্য রচনা করবার।

ইংলণ্ডের আধুনিক কাব্যনাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে সবার আগে মার্টিন ব্রাউনের কথা মনে আসে। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের একথা অবিদিত নয় যে, প্রযোজক মার্টি'ন ব্রাউনই এলিয়টের কাব্যনাট্যকে মঞ্চস্থ করে ও-দেশে ভার্স ড্রামার নবযুগের সূচনা করেন। পেঙ্গুইনের 'ফোর মডার্ণ ভার্স প্লেজ' সঙ্কলনটির সম্পাদনার গুরুদায়িত্বও তাঁরই উপর দেওয়া হয়। এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত ও বহু তথ্য পূর্ণ ভূমিকাটিও তাঁরই লেখা। নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মার্টি'ন ব্রাউন প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলেছেন :

'Drama is a composite art. It is literature and it is theatre, designed both for reading and acting."

অর্থাৎ নাটক বিভিন্ন উপাদানে গঠিত—ইহা একই সঙ্গে সাহিত্য এবং থিয়েটার। নাটক একদিকে পঠন-পাঠন এবং অন্যদিকে অভিনীত হবার জন্য রচিত।

বর্তমান শতাব্দীতে নাট্যসৃষ্টিতে ইওরোপ যে কতটা এগিয়ে এসেছে, সে কথা বলতে গিয়ে মার্টি'ন ব্রাউন লিখেছেন :

"এ কথা সত্য যে, এই শতাব্দীতে শেক্সপীয়রের মত নাট্যকার জন্মাননি, কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাই শেক্সপীয়রের আমলের কথা বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীতে নাট্যের যা উৎকর্ষ সাধন হয়েছে, এমনটা আর এর আগের কোন শতাব্দীতে হয়নি। আজকের দিনে সব ভাল লেখকরাই চান নাটক লিখতে। আজকের দর্শক নাটক শুনতে চান, সঙ্গে সঙ্গে নাটকের

গুণাগুণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিচার করেন। তা ছাড়া আজকালকার পাঠকরা নাটক পড়েও উপভোগ করছেন।

"এই সব কারণে আরএকদিক থেকে একটা বিশেষ ফল পাওয়া যাচ্ছে—সেটি হল আধুনিক কাব্যনাট্যের রচনা। সত্যিই এ এক নতুন সৃষ্টি। এখনও অবশ্য আধুনিক নাট্যকাব্য শৈশব কালের গণ্ডীর ভেতরেই আবদ্ধ এবং বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। এ জাতীয় নাট্যের প্রথম আবির্ভাব থারটিজে। তখন পর্যন্ত ভার্স সম্বন্ধে থিয়েটার দর্শকেরা ছিল সন্দিহান। এই সব নাটকের এই সময় প্রডাকশন হত ছোট ছোট নাট্যমঞ্চে এবং এমন সব রঙ্গালয়ে—যেগুলো ছিল সাধারণ থিয়েটার পাড়ার বাইরে। আর বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময়েই ভার্স ড্রামার প্রডাকসন হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়েই কয়েকটি কমার্সিয়াল থিয়েটারে আধুনিক কাব্যনাট্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। কিন্তু এখনও এ শ্রেণীর নাটক সাধারণের সমাদর লাভ করেনি। তা সত্ত্বেও আধুনিক নাট্যবিদ্দের মানসে ভার্স ড্রামা যে একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, সে কথা অনস্বীকার্য।"

সমালোচক আর্নেষ্ট শর্ট তাঁর 'ষাট বছরের থিয়েটারের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন: ১৯২৪ থেকে ১৯৩৯ সালের ভেতর কয়েকটি সম্ভাবনাপূর্ণ লণ্ডন প্রডাকশনের প্রারম্ভিক মঞ্চরূপায়ণ হয়েছিল শহরতলীর ছোট ছোট থিয়েটারে। নটিং হিল্ গেটের মার্কারী থিয়েটার এই শ্রেণীর একটি রঙ্গালয়। মার্কারীর দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছিল বিখ্যাত স্কলার, নাট্যকার এবং সমালোচক এ্যাশ্লে ডিউকের ১০,০০০ পাউণ্ডের সাহায্যে। এ টাকাটা মিষ্টার ডিউকস্ অর্জন করেছিলেন অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাঁর মনোমুগ্ধকর রোমান্স 'দি ম্যান উইথ এ লোড অভ মিস্‌চিফ্' এর প্রডাকশন থেকে। এ সব কথা এ্যাশ্লে ডিউকস্ লিখেছেন 'দি সীন্ ইজ্ চেইঞ্জড্' নামে তাঁর আত্মজীবনীতে। এই বইটিতেই সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে কি ভাবে নবপর্যায়ে ইংলণ্ডে কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল।

প্রথম দিকটায় মার্কারী থিয়েটারে মিসেস এ্যাশ্লে ডিউকস্‌কে কেন্দ্র করে শুধু ব্যালেরই মঞ্চরূপায়ণ হত—কারণ, মিসেস ডিউকস্ নিজে ছিলেন ব্যালেরিণা।

এরপর ডবলিউ. বি. য়েট্স্ এবং টি. এস. এলিয়ট মিষ্টার ডিউকস্‌কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক করলেন যে, মার্কারী থিয়েটারকে পোয়েটস্ থিয়েটার হিসাবে চালাতে হবে। এই নব পরিকল্পনার প্রথম যে কাব্যনাট্যটি দিয়ে উদ্বোধন হল, সেটি হচ্ছে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল'।

এ নাটকের প্রথম প্রডাকশন হয়েছিল ক্যান্টারবেরীর চ্যাপটার হাউসে। এখানকার পটভূমিকা দিল সব দিক দিয়ে নাটকটির উপযোগী। সদাশয় সমালোচকেরা নাটক দেখেই তার যথার্থ মূল্য এবং মৌলিকতার দিকটা অনুধাবন করে সেইভাবেই সমালোচনা লিখেছিলেন।

মার্কারী থিয়েটারে বসবার আসন ছিল দেড়শোটি। এলিয়টের নাটকটি এখানে ন'মাস ধরে চলেছিল এবং সর্বসমেত কুড়ি হাজার দর্শক নাটক দেখেন। যুদ্ধোত্তর কালে ভার্স ড্রামা হিসাবে 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেলে'র সাফল্য একটা সত্যিকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই কাব্যনাট্যের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু তরুণ লেখক বিংশ শতাব্দীতে রঙ্গমঞ্চে ছন্দোপূর্ণ সংলাপের উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় লেগে গেলেন।

বহুদিন অবধি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আধুনিক কাব্যনাট্য সম্বন্ধে আমার একটা বড় রকমের ভুল ধারণা ছিল। আমার মনে হ'ত এ সব নাটক, পড়ে আনন্দ পাবার জন্যই লেখা। মঞ্চরূপায়ণে এ জাতীয় নাটক অসার্থক হবে বলেই আমার মনে হত।

আমার এই ভুল সংশোধন হল ১৯৫৩ সালে লণ্ডনের ফিনিক্স থিয়েটারে এলিয়টের 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' নাটকটি দেখতে গিয়ে। ফিনিক্সে তখন পল স্কোফিল্ড-পিটার ব্রুক সিজন চলছিল। এঁদের তিনটি বিখ্যাত প্রডাকশন আমি দেখেছিলাম—'হ্যামলেট' 'দি পাওয়ার এ্যাণ্ড দি গ্লোরি, এবং 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন'।

এখানে শেষোক্ত নাটকটিরই আলোচনা করব। অনেক ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী এ নাটকে নেমেছিলেন,—যথা, পল্ স্কোফিল্ড, স্যার সেসিল ক্যাসন, ডেম সিবিল থর্ণডাইক. জেন্ ফ্রাংকোন ডেভিস প্রভৃতি। অভিনয় দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এ নাটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এর কোরাসের অভিনয়। অভিনেতারা কখনও পৃথক ভাবে এক-একটি লাইন কবিতার সুরে আবৃত্তি করছিলেন, আবার কখনও ঐক্যতানে এবং সমস্বরে কোরাস রিসাইট করছিলেন। এর ফলে একন একটা অদ্ভুত ও অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছিল—যা ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো যায় না।

নাটকটি দেখে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জাগল। ইচ্ছা হল কোন নাট্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবার। সে সময়ে আমি প্রায় রোজই বৃটিশ ড্রামা লীগ্ লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে যেতাম। লীগ্-এর প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ফ্রান্সেস ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। তাঁকে আমার মনের কথা জানাতে তিনি বললেন যে, ই. মার্টিন ব্রাউন এই লীগ-এর স্থায়ী ডিরেক্টর। তা ছাড়া মার্টিন ব্রাউনই প্রথম ১৯৩৯ সালে 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' প্রডিয়ুস করেন ওয়েষ্টমিনিষ্টার থিয়েটারে এবং এর পরেও তাঁরই পরিচালনায় ১৯৪৬ সালে এই নাটকটিই রিভাইভ্ড্ হয় মার্কারী থিয়েটারে।

পরদিন বিকাল চারটার সময় লীগের লাইব্রেরীতে যাতে মিষ্টার ব্রাউনের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়ে গেলেন মিস ম্যাকেঞ্জি।

পরের দিন মিঃ ব্রাউন যথা সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন ছিল :

আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কাব্যনাট্যে কোরাসের ব্যবহার তখনই সমর্থন করা যায়, যখন পরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারণ করে বা রহস্যঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন'-এ একটি কোরাস আছে যেটি হঠাৎ আনা হয়েছে সাধারণ কথাবার্তার মাঝে। মার্টিন ব্রাউন বললেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি এবং কোন্ বিশেষ কোরাসটির কথা বলছি। তিনি তখুনি বই খুলে সেই বিশেষ কোরাসটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এইটির কথা বলছেন তো?' দেখলাম তিনি ঠিক কোরাসটিই বের করেছেন। এটি হচ্ছে ঐ নাটকের প্রথম ভাগের প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে অর্থাৎ যার আরম্ভ :

Why should we stand here like guilty conspirators, waiting for some revelation..." ইত্যাদি।

এর আগে চরিত্রদের ভেতর যে কথাবার্তা হচ্ছে তা অতি সাধারণ স্তরের—হঠাৎ এখানে কোরাসের ব্যবহার কি ভাবে সমর্থন করা যায়? মার্টিন ব্রাউন এ বিষয়ে আমার সঙ্গে ঠিক একমত হলেন না। অর্থাৎ আধুনিক নাট্যে রহস্যঘন পরিবেশেই কোরাস ব্যবহার সমর্থনযোগ্য—এ কথা তিনি মানতে চাইলেন না। অথচ আমার যুক্তিও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না যে, এখানে নাটকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়েছে। মঞ্চাভিনয় দেখবার সময় এ জায়গাটায় এসে দর্শকের পক্ষে 'Willing suspension of disblief' maintain করা শক্ত হয়ে ওঠে। মনের ওপর এসে এমন একটা ধাক্কা লাগে যে, ইলিউশন নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—স্কোফিল্ড-ব্রুক প্রডাকশনে অভিনয়ের সময় কোরাসগুলি যখন ভাগ করে এক-এক লাইন এক-একজন চরিত্রকে দিয়ে বলানো হচ্ছিল, তখন সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের অনেক সময় সঙ্গতি থাকছিল না। অর্থাৎ কোরাসের যে অংশ যাকে দিয়ে বলানো হচ্ছিল তা সময় সময় ঠিক চরিত্রানুগ হচ্ছিল না। মিষ্টার ব্রাউন বললেন, এ ব্যাপারটা দেখে তিনিও খুব আশ্চর্য বোধ করেছেন। তিনি নিজে যখনই এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন—এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন, যাতে ঐ জাতীয় অসঙ্গতি না দেখা যায়।

এরপর আমার শেষ প্রশ্ন করলাম—লর্ড মনচেন্সী কি সত্যিই স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন, না এটা তাঁর

কটা অবসেশনের মত? ছাত্রী নিজেও এক জায়গায় বলেছেন—

"That cloudless night in the
mid-Atlantic

When I pushed her over."

অবশ্য তাঁর এ উক্তিকে নিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।—এর চমৎকার উত্তর দিয়েছেন অনারেবল্ চার্লস্ পাইপার—

"He has probably let this
notion grow in his mind,
Living among strangers,
With no one to talk to."

আমার প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ব্রাউন বললেন, এক সময় এলিয়টকেও এই কথাই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—কিন্তু তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বোধহয় তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই থাক্।

সেদিন এইখানেই আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে দেখলাম পেঙ্গুইন বুক্‌সে 'ফোর মডার্ণ ভার্স প্লেইজ' প্রকাশিত হয়েছে মার্টিন ব্রাউনের সম্পাদনায়। ভূমিকায় মিষ্টার ব্রাউন এই প্রসঙ্গে লিখছেন:

No murder is actually committed and we find ourselves constantly recalling the sermon on the mount with its reminder that sin is born in the heart.

এর কিছুদিন বাদেই মার্টিন ব্রাউন আমেরিকা চলে যান— সুতরাং আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

বেশ কয়েক বছর বাদে এই সেদিন মার্টিন ব্রাউনকে আমাদের ১৯৫৬ সালের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি চিঠি লিখেছিলাম। তার জবাবে তিনি লেখেন—

July 4, 1971

Dear Mr. Asoke Sen,

I have recently received your letter of 29 April because I was for some weeks out of England. It was very good of you to write, and I remember your call at the British Drama League and our discussion of The Family Reunion in 1956. The following year I left the League and went to work in America for 9 years, paying it a return visit in the summer of 1968, which is doubtless the reason why you then failed to find me. I have now pretty well retired from the theatre: I did a production of the "Murder" Canterbury Cathedral Nave (first time ever) last autumn for the 800th anniversary of Becket's martyrdom, which I expect will be my last, and it was a wonderful completion of a 3 -year-old circle.

I go to the theatre a good deal, but did not see the latest Coriolanus. I did see the Berliner Ensemble one term, and agree with you that Shakespeare is better! I did his play myself for the Old Vic in 1943, with Sir John Clements as Coriolanus and Sir Alec Guinness as Menenius.

Your Callcasian Chalk Circle, will be opening next week, I hope to great success. I hope also that the tragic events of the last few months have not impeded your work too much.

Every good wish,
Yours sincerely,
E. Martin Browne

বিগত জুন মাসে আবার লণ্ডনে মার্টিন ব্রাউনের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সে বিষয়ে পরে লিখব।

আইনষ্টাইন ও আণবিক বোমা

সন্তোষকুমার দে

যেদিন (১৯০৫ সাল) আইনষ্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বের (থিওরি অব রিলেটিভিটি মূল সূত্র Z—me2 অর্থাৎ **Energy in matter is equal in ergs to its mass in grams multiplied by the square of the velocity of light in centemeters per second** জগতে প্রকাশ করলেন; সেদিন কি এই শান্তশিষ্ট বিজ্ঞানী একবারও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, এই সূত্রের মধ্যেই বীজাকারে সুপ্ত রয়েছে বিশ্বধ্বংসের মারণমন্ত্র। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীরা কি সেদিন ধারণা করতে পেরেছিলেন, এই সূত্রকেই জপমালায় পর্যবসিত করে সমগ্র সভ্য জগৎ একদিন জটার বাঁধন খুলে নটরাজের প্রলয় নাচন শুরু করে দেবে? নিশ্চয়ই নয়। এই আপেক্ষিক তত্ব প্রকাশিত হওয়ার অনেকদিন পরে ১৯২১ সালে প্রাগে এক তরুণ জার্মান বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছে এসে তাঁকে আপেক্ষিক তত্ব খুব সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। আইনষ্টাইন তখন কতগুলো খুব সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তাঁকে আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল সূত্রটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন একটা চলমান ট্রেনকে দণ্ডায়মান ট্রেনের চেয়ে বড় বলে মনে হবে; ট্রেন থেকে একটা বল ছুঁড়লে আর দণ্ডায়মান ট্রেন থেকে আর একটা বল ছুঁড়লে দুটো বলের গতি হবে আপেক্ষিক। শুনে বিজ্ঞানী তাঁকে আবার বললেন, অঙ্কের আকারে যে সূত্রটি দিয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থটি আমায় ব্যাখ্যা করে বলুন। আইনষ্টাইন তখন বললেন, এর অর্থ হল যদি একটা পরমাণুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় এবং পরে ঐ দুটি ভাগ আবার জোড়া-লাগানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে, অবিভক্ত পরমাণুটির যে ওজন ছিল ভাগ হবার পরে আর সে ওজন নেই, ওজন তার অতি সামান্য পরিমাণে কমে গিয়েছে। ওজন কম হবার কারণ হল, বিভাজনের সময় পরমাণুটির কিছু অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে তখন বিজ্ঞানী তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন বিভাজন জনিত ঐ শক্তির পরিমাণ কত? আইনষ্টাইন বললেন, সেশক্তি হবে অসীম—স্কয়ার অব টাইম। শুনে বিজ্ঞানী আবার বললেন, একটিমাত্র পরমাণু থেকে যদি এই অপরিসীম শক্তি পাওয়া যায়, তাহলে সেই শক্তিকে সংহত করে তো ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রে পরিণত করা যায়। শান্তিবাদী আইনষ্টাইন তখন বললেন, ওসব কথা থাক, আলোচনার আরও অনেক বিষয় আছে, পদার্থ বিজ্ঞানের অন্য কোন প্রশ্ন থাকে তো বল, তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এই ঘটনা থেকেই মনে হয় আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণা-লব্ধ সূত্রটিকে কোন দিনই ধ্বংসের কাজে লাগাতে চাননি। এরকম বলার কারণ তখন পর্যন্ত তিনি এই সূত্রের তত্ত্বগত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকটারই কথা ভেবেছিলেন, তার ব্যবহারিক দিকটার কথা একবারও ভাবেন নি। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে যখন জার্মাণীতে প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন (১৯১০ সালে) অনেক পদার্থ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সূত্র—Z=me2 এর ব্যবহারিক দিক নিয়ে গোপনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করলেন। আইনষ্টাইন সম্ভবত সেখবর রাখতেন না। ১৯৩৪ সালের একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক কলডন বলেন, এই আলোচনা সভায় একজন বিজ্ঞানী ঐ সূত্রের ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। সভায় আইনষ্টাইন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সূত্রের ব্যবহারিক দিকটা যে কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়, সেটা তিনি একেবারেই বিশ্বাস

করতে চাননি তাই আলোচনা সব শুনে অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, "তাই নাকি? (Ist-das wirklich so)

এর আরও কিছুদিন পরে আর একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভা বসে। সেখানেও কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর সমীকরণ অনুসারে পরমাণুকে বিভক্ত করলে সত্যি কি অশ্রুতপূর্ব শক্তি আহরণ করা যাবে? উত্তরে আইনষ্টাইন বলেছিলেন, তত্ত্বের দিক দিয়ে সত্যি হলেও ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সেটা সম্ভব নয়, কারণ পরমাণুকে ভাগ করা সম্ভব নয়। "Splitting the atom by bombardment is like is shooting at birds in the dark in a region where there are few birds." পরমাণু বিভাজন সম্বন্ধে এতই অবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এই সভায় যে সব প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে এক বাক্যে সমর্থন জানালেন। জানালেন না শুধু একজন। তিনি হলেন বিজ্ঞানী Les szilard। তিনি এ বিষয়ে আংশিকভাবে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ফলাফল গোপনীয় বিষয় হিসেবে ব্রিটিশ এডমিরালটির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

আইনষ্টাইন ছিলেন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী। একবার খৃষ্টান সেঞ্চুরীর সম্পাদককে লিখেছিলেন,—My pacifism is an instinctive feeling, a feeling that possesses me because the murder of men is disgusting. My attitude is not derived from intelcletual theory but is based on my deepest antipathy to every kind of cruelty and hatred ......I am an absolute pacifist". এরপর Die Friedensbeweguug নামে এক পুস্তিকার মুখবন্ধে লেখেন,—"A Human being who considers spiritual values as supreme must be a pacifist." শুধু তাই নয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "যদি আবার যুদ্ধ বাধে তাহলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিজেতো কোন সাহায্যই করব না, উপরন্তু আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলকেই এই রকম কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে প্ররোচনা দেব।" তাঁর এ ঘোষণায় জার্মানী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাঁকে জার্মান স্বার্থের বিরোধী প্রচ্ছন্ন শত্রু বলে ভাবতে লাগলো।

আগেই বলা হয়েছে আইনষ্টান ছিলেন জন্ম শান্তিবাদী; কাজেই পরমাণু বিভাজন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আপেক্ষিক তত্ত্বকে যাতে সকলের বোধগম্য করা যায় তাই নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্রমাগত আলোচনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আবার নতুন করে জার্মানীতে ইহুদি বিদ্বেষ আরম্ভ হল। যা কিছু ইহুদিদের তা সবই মন্দ; কাজেই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বও মন্দ, ভ্রমাত্মক ও অসৎবুদ্ধি প্রণোদিত। তাই জার্মানরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের (স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি) বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে লাগল। এই আন্দোলনে ছিলেন সাধারণ লোক আর ছাত্র সম্প্রদায়; দুচার জন বিজ্ঞানীও যে না ছিলেন তা নয়। এঁদের এই আন্দোলনকে আইনষ্টাইন ঠাট্টা করে "এনটি রিলেটিভিটি কোম্পানী" নাম দিয়েছিলেন। এঁদের এইরকম এক প্রতিবাদ সভায় আইনষ্টাইন একবার অনাহুতভাবে যোগদান করেছিলেন তাঁদের ব্যক্তব্য শুনবার জন্যে। সভায় একজন সাধারণ বিজ্ঞানী আপেক্ষিক তত্বকে ভুল বলে প্রমাণ করবার জন্যে বাগাড়ম্বর আরম্ভ করলেন। বক্তৃতায় কোন যুক্তি ছিল না; ছিল শুধু ভাবাবেগ ও ইহুদিবিদ্বেষ। বক্তৃতা শেষ হলে কৌতুকপ্রিয় আইনষ্টাইন সাবাস, সাবাস বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়েই চললো এবং দেখতে দেখতে তা হিংসার পথে প্রবাহিত হতে লাগলো। ১৯২২ সালে জুনমাসে জার্মানীর বিদেশী মন্ত্রী ওয়ালটার র‍্যাথিনিউকে ইহুদি বলে হত্যা করা হল। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সীড্‌মানকেও হত্যা করবার চেষ্টা হল। প্রচার করা হতে লাগলো ইহুদি বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আর র‍্যাথিনিউ দুজনেই সমান অপরাধী। একজন অপসৃত হয়েছে আর একজনকেও শেষ করে দেওয়া দরকার এবং সেজন্যে

গোপনে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। শুনতে পেয়ে আইনষ্টাইন পাকা চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, এই মাথাটার দাম যে এত হতে পারে আগে তা জানা ছিল না। ঠিক এই সময় (১৯২২ সালে) আইনষ্টাইন পদার্থবিদ্যায় (আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্যে) নোবেল পুরস্কার পেলেন।

এল ১৯৩২ সাল। হিটলারের হাতে এখন ক্ষমতা। জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলিতে এখন থেকে "ইনটার ন্যাশনাল ট্রিপল" শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে বার হতে লাগলো। এইসব প্রবন্ধে আইনষ্টাইন, টমাস মান, হাইনরিস, আর্ণল্ড সোয়াইগ প্রভৃতি ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের দেশের প্রচ্ছন্ন শত্রু বলে বর্ণনা করা হতে লাগলো, বলা হতে লাগলো এঁরা জার্মানীকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিতে চান না। হিটলারের বিশুদ্ধিকরণ নীতি (Purge) আরম্ভ হল ১৯৩৩ সালে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত অধ্যাপক একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন। বার বছর আগে সে ইহুদি বিতাড়ণ কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৯৩৩ সালে সে কাজ আরও জোরদার হল। বার্লিন শহর, যা ছিল এতদিন স্থানীয় ও জাতীয় সংস্কার মুক্ত উদার মনোভাবাপন্ন সেখানে একদিন দেখা গেল স্বস্তিকা চিহ্নধারী পাঁচ হাজার যুবক আইনস্টাইন,ফ্রয়েড, টমাস মান, ষ্টিফেন সোয়াইগ, এমন কি আমেরিকান ইহুদি হেলেন কেলার ও অপটন সিংক্লেয়ারের লেখা দু-হাজারখানা বই বার্লিন অপেরা হাউসের সামনে এনে আগুন লাগিয়ে বহ্নুৎসব পালন করল। আর শহরের চল্লিশ হাজার অধিবাসী হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। মনে হল বার্লিনে আবার সেই ভুলে যাওয়া মধ্য যুগ বুঝি ফিরে এসেছে,--যখন কোরান ছাড়া সব বইপুঁথি মিথ্যে এই অজুহাতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ভাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রীয়ার গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল।

ইহুদি নির্যাতন এখানেই থামলো না। ব্যাঙ্কে আইনষ্টাইনের যে ৩০ হাজার মার্ক জমাছিল, তা বাজেয়াপ্ত করা হল এই অজুহাতে যে, এই টাকা দিয়ে আইনষ্টাইন জার্মানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়া শহরে হেবরল্যাণ্ড ষ্ট্রিটে তাঁর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। বার্লিনের উপকণ্ঠে Caputh এ তাঁর যে সুরম্য আবাসগৃহ ছিল তাও সরকারের বাজেয়াপ্ত হল। আইনষ্টাইন এখন গৃহহীন কপর্দকশূন্য ভিখারী। এত উৎপীড়নেও তিনি জার্মানী ছেড়ে গেলেন না। এল ১৯৩৪ সাল। এবার সিলার্ড টেলার ভিজেল্স, পাল'স, ক্রিয়, অটোষ্টার্ণ, হান্স বেটে ম্যাক্স বর্ণ, ভিক্টর বাইসকফ্ বিতাড়িত হলেন—সেই সঙ্গে বিতাড়িত হলেন তিন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, জ্ঞানতপস্বী আইনষ্টাইন। এই বিতাড়িতদের মধ্যে ৬ জন হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। এ ছাড়াও ১৬৪ জন নামী জার্মান ইহুদি অধ্যাপকও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে অপসৃত হলেন।

এবার অনেক ভাবনাচিন্তার পর ভবঘুরে জীবন চিরদিনের জন্যে শেষ করে দিয়ে অবশেষে আইনষ্টাইন আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। জন্ম তাঁর জার্মানীতে, ধর্মে ইহুদি কিন্তু নাগরিক অধিকার ছিল সুইজারল্যাণ্ডের। জার্মানীকে তিনি কোন দিনই মনে প্রাণে ভালবাসতে পারেন নি তার জঙ্গি মনোভাবের জন্যে; আর হিটলারের Deutschland uber alles (সবার উপর জার্মান সত্য) নীতির জন্যে; কিন্তু ভালবাসতেন জার্মানীর বিদগ্ধ জনদের। সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের আর অনুসন্ধিৎসু জার্মান ছাত্রদের। প্রিন্সটনে সুখে ও শান্তিতে ছিলেন। তবু মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেত যখন মনে পড়ত লাইডেনের নয়নমনোহর দৃশ্যাবলী কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটের আর ETH এর (Eidemossische Technische Hcchschule কথা। এখানে প্রিন্সটনে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন।

এতদিনে জার্মানীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে। হিটলার তখন সর্বেসর্বা। ১৯৩৮

সালের শেষের দিকে জগতের সব চেয়ে চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফল হল। আইনষ্টাইনের ভূতপূর্ব সহকর্মী, কাইজার উইলহেলম ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক ওটো হান ইউরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) দুভাগে ভাগ করতে সক্ষম হলেন। পদার্থবিদ্যা এবার আর নিরীহ বিজ্ঞান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারলো না। আরম্ভ হয়ে গেল এই দিন থেকেই পরমাণু যুগের সূচনা। এই পরমাণু বিভাজনের কথা অবশ্য তখনও বহির্বিশ্বের কেউ জানতে পারে নি।

১৯৩৯ সালে আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীরা পরমাণু বিভাজনের কথা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলেন। এছাড়া হিটলারকে রুখবার আর অন্য কোন পথ নেই। এই পরমাণু বিভাজন কাজে ঋষিপ্রতিম স্থিতধী আইনষ্টাইন প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে বেশ খানিকটা জড়িয়ে পড়লেন তবে তিনি কতটা জড়িত ছিলেন সে কথা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। একজন বিজ্ঞানী কিন্তু বলেছেন আইনষ্টাইন পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। Fritz Haber;—A scientist belonged to the world during times of peace but to his country during times of war" বলে তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন। আইনষ্টাইন অবশ্য নিজে বলেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেলটের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে সাক্ষর করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। এ বিষয়ে বেশ মতভেদ আছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনষ্টাইন কতটা সাহায্য করেছিলেন বা আদৌ সাহায্য করেন নি সাধারণের অজানা। এবিষয়ে একমাত্র ম্যানহাটান প্রোজেক্টের সামরিক কর্তৃপক্ষই যথার্থ আলোকপাত করতে পারেন। জোলিও কুরি, টমসন, ম্যাক্স প্ল্যাংক, নীলস বোর প্রভৃতি সমস্ত প্রথমশ্রেণীর পদার্থবিদরা এবিষয় নতুন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা জানতে পারলেন, ইউরেনিয়ম—২৩৫ থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরকপদার্থ পাওয়া যেতে পারে—যা বিস্ফোরক হিসেবে সবরকম মামুলি বিস্ফোরক থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী শক্তিশালী। এই সময় সবচেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম পাওয়া যেত বেলজিয়ম অধিকৃত কঙ্গোতে। যাতে এই ইউরেনিয়াম জার্মনীর হাতে না পড়ে সেই জন্যে আইনষ্টাইন আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে বেলজিয়ম সরকারকে লিখতে বলেন এবং তিনি নিজেও বেলজিয়মের রাণীকে (যাঁর সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং যাঁকে তিনি অনেকবার বেহালা বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন) বিপদের আশঙ্কা বর্ণনা করে এক পত্র লেখেন।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আইনষ্টাইন কিন্তু পারমানবিক-অস্ত্রের সম্ভাবনা ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারেন নি। ইউরেনিয়াম পরমাণুর প্রচণ্ড শক্তিকে সংহত করে তা থেকে বোমা তৈরি করা সম্ভব, সেটা ১৯৪৩ সালেও তিনি ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন নি। বুঝেছিলেন পেরেছিলেন নীলস বোর। তাই তিনি এই সময় বলেছিলেন,—"আমার জীবদ্দশায় ইউরেনিয়ম থেকে আনবিক শক্তি আহরণ করে কাজে লাগানো সম্ভব সেটা প্রকৃতপক্ষে আগে থেকে আমি ঠিকমত বুঝতে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল এটা তত্ত্বগত হিসেবে সম্ভব।"

এই সময়ে (১৯৩৯ সালে) নীলস্ বোর ইউরেনিয়াম ২৩৫ পরমাণু সহজেই বিভাজন সম্ভব বলে উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন; তবু এর পরীক্ষা আমেরিকায় এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হল। জার্মানীতে পরমাণু বিভাজন কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সে কথা এতদিনে (১৯৪০ সালে) জানাজানি হয়ে গেল। ফলে বিজ্ঞানী Szilard পাছে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রে জার্মানীর পিছনে পড়ে যায় সেই ভয়ে একখানা দীর্ঘ পত্র মুসাবিদে করে আইনষ্টাইনকে পাঠিয়ে দিলেন এই অনুরোধ করে যে, তিনি সে পত্রখানি সই করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পাঠিয়ে দেন। জোলিও কুরি, ফার্মি ও জিলার্ড গবেষণাগারে আণবিক বোমা তৈরী করার সম্ভাবনা

দেখতে পেয়েছেন বলে রুজভেল্টকে জানান তাই মার্চ ১৯৪৪ সালে। আইনষ্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সিলাডের্'র মুসাবিদা করা যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তাতে এক জায়গায় আছে,—

"The new phenomenon would also lead to the construction of bombs and it is conceivable —though much less certain—that extremely powerful bombs of a new type may that be constructed. A single bomb of this type, carried by boat or exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air."

এই রকম একখানা চিঠি নয়, পর পর আরও দুখানা চিঠি মুসাবিদে করে আইনষ্টানকে পাঠানো হয় স্বাক্ষর করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পাঠাবার জন্যে। তৃতীয় পত্র পাবার পর রুজভেল্ট "ব্রিগস্ কমিটি" নামে এক কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটি "ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির" অধীনে ১৯৪২ সালে কয়েক কোটি ডলার ব্যয়ে "ম্যানহাটান প্রোজেক্ট" গঠন করলেন। এই ম্যানহাটান প্রোজেক্টই পারমাণবিক বোমা তৈরি কাজে সাফল্য লাভ করেন।

জার্মানীতে সবপ্রথম পরমাণু বিভাজনের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়েছিল, বটে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথম দুবছর ব্লিৎস ক্রীগ (Blitz Krieg নীতি অবলম্বন করে সামরিক দিক দিয়ে জার্মানী এত দ্রুত সাফল্য লাভ করেছিল যে তার পারমাণবিক অস্ত্রের কোন প্রয়োজনই হয় নি। তাছাড়া হিটলার নিজে পারমাণবিক অস্ত্রে বিশ্বাসী ও উৎসাহী না হওয়ায় এবং দেশ থেকে সমস্ত বিখ্যাত ইহুদি বিজ্ঞানী বিতাড়িত হওয়ায়, জার্মানীর পক্ষে এ বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। হিটলার মনে করেছিলেন, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে লাগবে তার চেয়ে অনেক কম খরচে ট্যাংক, বিমান, কামান প্রভৃতি মামুলি অস্ত্র তৈরি করে সম্মিলিত শক্তিকে ঘায়েল করা যাবে। এই ভুলের ফলে ইতিহাসের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হল।

এদিকে ম্যানহাটান প্রোজেক্ট উঠে পড়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি কাজে লেগে গেল। এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন বিভক্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু হতে উদ্ভূত শক্তি সংগ্রহ করে বোমা তৈরি করলে, তা টন টন ওজনের না হয়ে কয়েক পাউণ্ড ওজন হলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অক্লান্ত চেষ্টার পর ম্যানহাটান প্রোজেক্ট আনবিক বোমা তৈরি করে ফেললেন। আর ১৯৪৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গেরীয় অধ্যাপক এডওয়ার্ড টেলার হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করলেন।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর আনবিক বোমা ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসিকায় ওপর নিক্ষিপ্ত হল। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই শহরের প্রত্যেকটিতে ১০০,০০০ করে নিরপরাধ নরনারী শিশু শেষ নিশ্বাস ফেলে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল —তার তেজস্ক্রিয় ভস্মের বিষ কণিকায় অগুন্তি অভাগা হল বিকলাঙ্গ বিকৃত মস্তিস্ক ও লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত। নারীরা হল বন্ধ্যা বা বিকলাঙ্গ সন্তানের জননী। এই সময় আইনষ্টাইন ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, এ বোমার গোপন তত্ব আর বেশি দিন গোপন থাকবে না। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, এই গোপন তত্ব বিশ্ব-শাসন সংস্থাকে (World government) দেওয়া হোক—

"The secret of the bomb should be committed to a World government, and the United States should immediately announce its readiness to do so. Such a World Government should be established by the United States, the Soviet Union and Great Britain the only three powers which possess great military strength."

আইনষ্টাইন ছিলেন মানবদরদী, চির শান্তিবাদী। প্রিন্সটনে যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে তাঁর পড়বার ঘর ছিল মাটি থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত বইভর্তি আলমারিতে ঠাসা। ঘরে সাজসজ্জা বলে কিছুই ছিল না। শুধু

ছল বিজ্ঞানী ফ্যারাডে আর ম্যাক্সওয়েলের দুখানা ছবি আর ছিল আমাদের সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর ছবি। গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন "the only statesman who represented that higher conception of human relations in political sphere to which we must aspire with all our power."

১৯৫২ সালে একজন বিজ্ঞানী আনবিক বোমা তৈরি সম্বন্ধে তাঁর অবদান বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলে বলেছিলেন," ব্যবহারিক বিজ্ঞান নিয়ে কোনদিন কাজ করি নি; সামরিক উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ত দূরের কথা। সত্যি সত্যি জীবনভোর আমি শান্তি বাদী; আর গান্ধীকেই আমি এ যুগের একমাত্র সত্যিকারের রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে করি।"

বিশ্বের উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত সংখ্যালঘু ইহুদিদের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ১১ই জুন তারিখে নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁর এক উপদেশ বাণী বেরিয়েছিল, —"সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলে কি করা উচিত? এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কিছু বলতে হলে বলতে পারি, গান্ধীর যুগান্তকারী অসহযোগ আন্দোলনই একমাত্র পথ।"

অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে কি করা উচিত; সে বিষয়ে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, —"গান্ধী প্রবর্ত্তিত পথ যে বহু সম্ভাবনাময়, সে কথা সাধারণকে বলবার সুযোগ আমি কখনই হারাই নি। এই পথই বুদ্ধিমান ও নীতিমান সম্পন্ন স্বাধীনচেতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শক্তি যুগিয়ে থাকে।"

শান্তিবাদী গান্ধীজী ও তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে আইনষ্টাইন সত্যিই খুব শ্রদ্ধা করতেন; তাই এই সব কথা বলতে পেরেছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য মানবদরদী, মানবতার পূজারী, চিরশান্তিপ্রিয়, স্থিতধী আইনষ্টাইন এইরকম বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে সাহায্য করলেন কেন? সমস্ত ইহুদিজাতের ওপর যুগ যুগ ধরে অন্যায় ও অত্যাচারে কি তিনি মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, না মানুষের সহ্যের যে সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয়েছিল? না তাঁর নির্জ্জন মনে যে দানব প্রকৃতি লুকিয়ে ছিল এখন সময় ও সুযোগ পেয়ে সে প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল? না এত দিনে বুঝতে পারলেন শান্তিবাদী হতে হলে শক্তিমান হতে হবে? যুদ্ধের সময় এক বন্ধুকে বলেছিলেন, তিনি আর শান্তিবাদী নন, শান্তি বাদের সীমা আছে, শান্তিবাদী হতে হলে সমস্ত পৃথিবী মানবজাতির শত্রু যারা তাদের হাতে গিয়ে পড়বে। আঘাত দিয়ে প্রত্যাঘাত রুখতে হবে। "Organized power can be opposed by organized power. Much as I regret this, there is no other way." এই কথা বলার বার বছর পরে আবার বলেছিলেন,—"While I am a convinced pacifist there are circumstances in which I believe the use of force is appropriate namely in the face of an enemy unconditionally bent upon destroying me and my people."

শান্তিবাদী মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন, অহিংস অসহযোগ দুর্বলের কার্য্য নয়। মনে প্রাণে অহিংস হতে হলে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। নিজের বলই হল বল। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন "বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজ বলে প্রবল সেই স্থানটি আমরা যদি আবিষ্কার ও ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।" তাই বুঝি ইজরাইলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শান্তিবাদী হলেও আইনষ্টাইন বলপ্রয়োগ সমর্থন করে ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল তখন শান্তিবাদী গান্ধীজী এ সুযোগ গ্রহণ করে ইংলণ্ডকে নাস্তানাবুদ না করে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে আইনষ্টাইনের তফাৎ। আইন-ষ্টাইন কিন্তু ইসরায়েলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কোনরকম সুযোগ সুবিধে অবহেলা না করেই বলপ্রয়োগ নীতি সরাসরি সমর্থন করেছিলেন। স্বধর্মীদের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন,—

"প্যালেষ্টেনিয়ানদের ভাগ্যের ওপরই পরিণামে পৃথিবীর অবশিষ্ট সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ভর করছে। যারা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে না তাদের কেউ সম্মান করে না। আমরা দুঃখিত যে, যে-উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছি তা আমাদের নিজেদের কাছেও অপ্রীতিকর ও মূঢ়তার পরিচায়ক; কিন্তু এ-উপায় থেকে মানবজাতি আজ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সকলের আগে সর্বতোভাবে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হবে।" দেখা যাচ্ছে অবস্থার দাস হয়ে স্বভাবশান্তিবাদী শান্তিবাদীতে রূপান্তরিত হলেন।

এই বছরই Wroclawতে যে বিশ্ববুদ্ধিজীবীদের সভা (ওয়ার্লড কংগ্রেস অব ইনটেলেকচুয়ালস্) বসেছিল তাতে কিন্তু যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিল—"By painful experience we have learned that rational thinking does suffice to solve the problems of social life—we scientists, whose tragic destiny it has been to helpmake the methods of annihilation ever more gruesome and more effective, must consider it our solemn and transcendent duty to do all in our power in preventing these weapons from being used for the brutal purpose for which they are invented."

আইনষ্টাইন চরিত্রে এই আপাত বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করে একজন সমালোচক বলেছেন,—"Einstein was, even more obviously than most human beings, a one-off model. His genius was linked with attributes not only of the saint but also of the rogue elephant......But his weakness in a predatory world was that of the man who speaks the truth by an inner compulsion; thus his ability to disregard his wartime activity suggests a psychological failing rather than dishonesty" এ মন্তব্য খুব সমীচীন বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত আণবিক বোমা তৈরি বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে আইনষ্টাইন দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত হলে অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল বলে ১৯৪৯ সালে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়কে দুঃখ করে লিখেছিলেন,—"আমাদের স্বপ্ন সফল হওয়ার শেষ পর্যায় একটা বিষয় আমার মনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। সেটা হল প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের আপন অধিকার রক্ষা করতে হয়েছিল; কিন্তু উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাপাবার এইটাই ছিল একমাত্র উপায়।"

১৯৫৪ সালে লাইমস পলিংকে লিখেছিলেন," জীবনে আমি একটা মস্ত বড় ভুল করেছি, সে ভুলটা হল পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে যে চিঠিটা খসড়া করে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, তাতে আমি সাক্ষর করেছিলাম। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে এইটুকু বলতে পারি যে, পাছে জার্মানী আগে থেকে এই বোমা তৈরি করে ফেলে সেই ভয়েতেই চিঠিতে সই করেছিলাম।"

এই বছরই বিজ্ঞানীদের অসহায় অবস্থা দেখে আমেরিকার এক পত্রিকায় আইনষ্টাইন লিখেছিলেন—" আবার যদি যৌবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় এবং কি ভাবে জীবিকা অর্জন করব, সেটা যদি ভাবতে হয় তা হলে জোর করে বলতে পারি বিজ্ঞানী, পণ্ডিত বা শিক্ষক হবার চেষ্টা আর করব না, তার চেয়ে বরং কলমিস্ত্রী বা ফেরিয়ালা হব; কারণ তাদের যে স্বাধীনতা আছে বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানীদের সে স্বাধীনতা নেই।" বড় করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী অসহায়ের আর্তনাদ।

তাঁর লেখা একখানা চিঠি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন,—"

"I want to suggest that the practices of those ignoramuses who use their public positions of power to tyranize over professional intellectuals must not be accepted by intellectuals without a struggle. Spinoza followed

(এর পর ৫১ পৃষ্ঠায়)

মানসকন্যা

(গল্প)

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

একটু আগে হামিদা এখানে এসেছিল। তোমার খবর দিতে। এই তো চলে গেল।

হামিদাকে মনে আছে তো? আমার ছোট বোন। সেই যে গো, সাত বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটা? এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর ডাগর ডাগর দুটি চোখ। তোমার কাছে ছুটে ছুটে যেত দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার। হাতে থাকত একখানা শ্লেট। বলত, অঙ্ক শিখিয়ে দাও, ছবি এঁকে দাও। নয়তো এটা-সেটা। বায়নার কি অন্ত ছিল তার!

সে আজ কত দিনের কথা বল তো? বাইশটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। অথচ মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তুমি ডিউটি সেরে বাড়ী ফিরছ। সেই উঁচু মাটির ঢিবিটা পার হয়ে মাঠে নামলে। আগাছায় ভরা ফাঁকা মাঠ। এখানে-ওখানে পাথর ছড়ানো। তুমি হনহন করে হেঁটে আসছ। কাঠফাটা রোদে কপালটা তোমার ঘেমে উঠেছে, কান দুটো লাল।

তোমাকে দেখতে পেলেই ঘরের দরজা খুলে হামিদা ছুটে যেত। বলতাম, ছিঃ, এখন যেয়ো না। অফিস থেকে ফিরলে বিরক্ত করতে নেই। কিন্তু ও কি কথা শুনত আমার? কার সাধ্যি ওকে ঠেকায়।

মুখে যতই বলি, আমিও কিন্তু চাইতাম হামিদা তোমার কাছে ছুটে যাক। যেদিন দুপুরে ও ঘুমিয়ে পড়ত, সেদিন তোমাকে দেখতে পেলেই আমি ওকে ডেকে তুলতাম, শীগগির ওঠ্। ওই তো আসছে তোর ভাই সাহেব।

হামিদা তোমাকে 'ভাই সাহেব' বলে ডাকত। সেই থেকে তুমি আমাদের বাড়ীশুদ্ধু লোকের কাছে 'ভাই সাহেব' হয়ে দাঁড়িয়েছিলে।

অফিস থেকে ফিরে খাটিয়ার ওপর একখানা চাদর পেতে তুমি শুয়ে পড়তে। হামিদা গিয়ে তোমাকে বিরক্ত করত। খুব ভাল লাগত আমার। হামিদা ফিরে এলে বকুনির সুরে ওকে বলতাম, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? লেখাপড়া নেই?

হামিদা বলত, ভাই-সাহেবের কাছে গল্প শুনছিলাম। ভূতের গল্প। আমার সঙ্গে তুমিও একদিন যাবে দিদি? ভাই-সাহেব খুব ভাল গল্প বলতে পারে।

যাঃ দুষ্টু মেয়ে। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করত। কি জানি, তোমার কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু বলে এসেছে কি না মেয়েটা।

ঘরের জানলাটা খুলে চুপচাপ বসে থাকতাম। জানলা খুললেই সব দেখা যেত। মাঠের কোল ঘেঁসে রেল লাইন চলে গেছে। একটু দূরে আমাদের কোয়ার্টারের সামনেই স্টেশন, বড় বড় অক্ষরে লেখা 'বিশ্বনাথগঞ্জ'। ছোট স্টেশন। যাত্রীর সংখ্যাও কম। স্টেশনমাস্টারের ঘরের সামনে ছোট একটা টিনের

ছাউনি। অতো বড় প্ল্যাটফর্মের বাকি সমস্তটাই খোলা। কেমন যেন খাপছাড়া আর ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাত স্টেশনটাকে। খুব মোটা মানুষের মাথায় যদি একটা লেডিজ্ ছাতা থাকে, তাহলে যেমন বেমানান দেখায়, তেমনি বেমানান আর অদ্ভুত দেখাত প্ল্যাটফর্মের মাথার ওপর ছোট্ট ওই টিনের ছাউনিটা।

বাবা ছিলেন স্টেশনমাস্টার। তুমি বাবার এসিষ্ট্যান্ট হয়ে এলে। যেদিন প্রথমে দেখলাম তোমাকে সেদিন ভারি আশ্চর্য হয়েছিলাম। এতটুকু ছেলে চাকরি করবে! কতই বা তোমার বয়েস হবে তখন? বড় জোর আঠারো? মনে আছে, একটা বেডিং আর একটা সুটকেস্ নিয়ে একেবারে আমাদের কোয়াটারের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলে। বাবা তখন ডিউটিতে ছিলেন না। তাই বোধ হয় কোয়া-টারেই দেখা করতে এসেছিলে ওঁর সঙ্গে।

—নতুন এপয়েন্টমেন্ট বুঝি? বাবা জিজ্ঞেস করলেন, বললে, হ্যাঁ।

তোমার মুখটা তখন কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। বিয়ের লগ্নে নতুন একটা অচেনা জীবনের অনুভূতিতে মেয়েরা যেমন ভয় পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ঠিক তেমনি। চাকরি পাবার নতুন মুহূর্তটিও বোধ হয় ছেলেদের কাছে তেমনি একটি লগ্ন।

—আপনার বাড়ী কোথায়?

—আগে ছিল ঢাকায়। পার্টিশনের পরে কলকাতায় চলে এসেছি। তুমি বললে, বর্তমানে কলকাতাতেই আমাদের বাড়ী।

বাবা বললেন, আসুন না ভেতরে? এক কাপ চা খাবেন।

তুমি ভেতরে এলে, কিন্তু চা খাওনি। আমি বুঝেছিলাম তুমি কেন খেলে না। একে হিন্দু, তায় আবার ব্রাহ্মণ। এতো অল্প বয়েসে জাতের সংস্কার ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বাবার অনুরোধ সত্ত্বেও তুমি উঠে দাঁড়ালে। বাবা কিন্তু রাগ করেন নি তোমার ওপর। মাকে বলেছিলেন, ছেলে-মানুষ তো? এখনো বুঝতে শেখেনি।

বাবাকে আমরা বরাবরই দেখেছি ধর্মের ব্যাপারে খুব উদার। বলতেন, ধর্মের বিভিন্নতা হচ্ছে মানুষের বাইরের জিনিস। আসলে, সে যে মানুষ, এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

আমাদের ঠিক পাশের কোয়ার্টারটাই বাবা তোমার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন আগে থাকতে। সুটকেস্ আর বেডিং নিয়ে তুমি তোমার কোয়ার্টারে চলে গেলে।

সারাদিনটা তোমার একলাটি কি করে কাটত! আমি হলে কিন্তু পারতাম না। মেয়েরা কোনো কালেই চুপচাপ থাকতে পারে না। তারা চায় আত্মীয়-স্বজন, ঘর-সংসার। বুড়ো বয়েসে চায় নাতি-নাতনী। সংসার ছেড়ে এক মিনিট বেঁচে থাকাই যেন তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের কেউ না থাকলে অন্ততঃ ঝি-চাকর চাই। তুমি কিন্তু বেশ কাটিয়ে দিতে। ডিউটি সেরে এসে কোনো দিন কাঠের আগুন জ্বেলে রান্না করতে। রান্না করতে করতে কোনো দিন বা গলা ছেড়ে গান ধরতে। গানের কলি আমি বুঝতাম না। বাংলা গান। কিন্তু গান শুনতে শুনতে মনে হত, একা থাকতে কত ভাল লাগে তোমার! আবার কখনো দেখতাম লণ্ঠনের আলোয় বসে কি লিখছ। ভাবতাম, গল্প লেখার অভ্যাস আছে বোধ হয়। নয়তো ডায়েরী, কিন্তু কাকে নিয়ে লিখবে তুমি? লেখার মত কে বা ছিল তোমার? মাঝে মাঝে ভারি রাগ হত তোমার ওপর। ভাবতাম, কেউ না থাক, একটা বিয়ে-থা করলে তো পারে? অমনি একলা থাকতে পারে মানুষ? ভাবতে ভাবতে ভারি লজ্জা করত আমার। ভাগ্যিস্ মানুষের মনের কথা কেউ শুনতে পায় না! পোড়া মনকে নিয়ে কি কম জ্বালা!

যেদিন শেষরাত্রে তোমার ডিউটি থাকত, সেদিন জানতেও পারতাম না তুমি কখন অফিসে চলে যেতে।

তখন আমি লেপের মধ্যে। শীতকালে বেলা ন'টার আগে আমার ঘুম ভাঙত না। বরঞ্চ হামিদা আমার চেয়ে আগে উঠত। কিন্তু আমি ওকে উঠতে দিতাম না। জোর করে শুইয়ে রাখতাম। ও উঠলেই আমাকে উঠতে হবে, এই ভয়ে। বলতাম, এক্ষুণি হবে না, শুয়ে থাক্। কি এমন তাড়া পড়েছে শুনি?

এই নিয়ে বাবা কত উপদেশ দিতেন। সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠলে শরীর ভাল থাকে, মন সতেজ হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে, আরও কত কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাবাকে কি ভয় করতাম আমরা? তারপর মা যখন বকতে বকতে ঘরে ঢুকত, তখন আর বিছানা না ছেড়ে উপায় থাকত না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বলতাম, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, মা। বড্ড মাথা ধরেছে।

—বেশ হয়েছে। মা বলতেন, বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমুলে মাথা ধরবে না?

আমি মনে মনে হাসতাম। তাকের ওপর টাইম-পিস্‌টা টিক্‌টিক্ করে বাজছে। ইচ্ছে হত, ওটাকে ভেঙে ফেলে দিই। ওটাই তো যত নষ্টের গোড়া। চেয়ে দেখতাম ন'টা বেজেছে। খুব কম হলেও পৌনে ন'টা। স্টেশনের ছাউনি ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে সকাল বেলার রোদ হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভেতর বিছানায় উঠে এসেছে। আমার কোলের কাছে এতক্ষণ শুয়ে ছিল, দেখতেই পাইনি।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুতে যেতাম। তারপর চা-জলখাবার খেয়ে যখন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম তখন হয়তো চোখে পড়ল, তুমি স্নান করছ কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে। বালতি করে জল তুলে তুলে হুড়হুড় করে মাথায় ঢালছ। পৈতাটা কাঁধ থেকে ঝুলছে, ঠিক একটা শাদা রেখার মতো। মাথার চুলগুলো নাকে, মুখে, চোখে ছড়িয়ে পড়েছে। কী চমৎকার দেখাত তোমাকে! দেখতে দেখতে চোখ ফেরাতে পারতাম না। নিজের মনেই কতবার ফিক্-ফিক্ করে হেসে ফেলেছি।

হামিদা আমার হাসি শুনে ছুটে আসত। জানলাটা একটু উঁচুতে ছিল বলে ও জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পেত না। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলত, কি দেখছ, দিদি? আমিও দেখব।

কিছু নয়, যাঃ!—ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে আসতাম।

তুমি কি দেখতে পেতে আমায়? নিশ্চয়ই পেতে। নইলে সেদিন অমন দুষ্টুমি বুদ্ধি এল কি করে তোমার মাথায়? স্নান করে কোয়ার্টারে ফিরছিলে। হঠাৎ বালতি থেকে এক খামচা জল-নিয়ে আমার দিকে ছিটিয়ে দিলে! ছিঃ ছিঃ, কেউ যদি দেখতে পেত সেদিন! কি হত! লজ্জায় আমি মরে যাই।

কি জানি কেন, তারপর দুদিন আমি ঘুমোতে পারিনি। সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট করতাম। কিছুই ভাল লাগত না। যেন সব অসহ্য মনে হত। না পারতাম খেতে, না পারতাম শুতে, না পারতাম একটু পড়াশুনা করতে। বই খুলে বসলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা মুখ। আঠারো বছর বয়েসের একটা চেনা মুখ। ভাবতাম, একবার আসতে তো পারে আমাদের কোয়ার্টারে? অফিসের কজে বাবার কাছেও কি একবার আসতে পারে না?

অথচ জানলার কাছেও আর দাঁড়াতে পারতাম না সাহস করে। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করত। কেউ যদি দেখে ফেলে! মনে হতো, ওখানে দাঁড়ালেই ধরা পড়ে যাব। মা বলবেন, এত নির্লজ্জ তুই, পোড়ার-মুখী? লজ্জা-শরমের মাথা কি খেয়ে বসেছিস্? এর চেয়ে যে মরণ ভাল!

আর পাড়ার লোক? দেখতে পেলেই তারা আমার দিকে চেয়ে থাকবে। বলাবলি করবে, স্টেশন-মাস্টারের মেয়ে একটা কীর্তি করছে বটে।

আর আত্মীয়-স্বজনদের কানে যখন কথাটা গিয়ে পৌঁছবে, তারা বলবে, রাসিদা একটা হিন্দুর ছেলেকে ধরলে?

ছিঃ ছিঃ, কি করে মুখ দেখাব আমি লোকের কাছে! তারা তো বুঝতে চাইবে না, আমি নারী। আমার মধ্যে রয়েছে একটি নারী-মন, সে-মন কেবল ধরতে চায়। আশা-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে গড়া একটি সংসার পাতবে বলে খুঁজে বেড়ায় একটি আশ্রয়। ভালবাসতে চায় একটি মানুষকে যার মুখ থেকে সে শুনতে পাবে, সে হচ্ছে জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, তার চোখের তারায় তারায় রয়েছে অতল রহস্য, ঠোঁটের মৃদু স্পর্শে ফুটে ওঠে এক-একটি গীতি-কাব্য!

কিন্তু কাকে বোঝাব সে-কথা। একটি মুখরোচক আলোচনার বিষয় পেলে আর কি কেউ ছাড়ে?

তবু বাধা মানত না এই মন। সংসারে সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে লোকনিন্দা। কিন্তু তা-ও অনেক সময় পারে না মানুষের মনকে দাবিয়ে রাখতে। এমনই দুর্বার-এর আকর্ষণ আর আবেগ। তাই যেদিন তোমার চিঠি পেলাম হামিদার হাতে সেই দিনই স্থির করলাম, হাজার বিঘ্ন এলেও তোমার কথা মত তোমার সঙ্গে দেখা করব।

একটা সুযোগও মিলে গেল। যেদিন তুমি দেখা করতে বলেছিলে সেদিন মাকে নিয়ে বাবার এলাহাবাদে যাবার কথা ছিল। তুমি বোধ হয় আগেই খবরটা পেয়েছিলে। তাই হিসেব করে দিন স্থির করেছ।

ঠিক রাত বারোটার সময় তোমার কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, চারদিক নিশুতি। এ-অভিজ্ঞতা জীবনে এই আমার প্রথম। এত রাত্রে এই অবস্থায় কখনো বাইরে বেরোই-নি। এমন কি, বেশী রাত্রে একা ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরুতেও মা বারণ করতেন। তাই মনে হচ্ছিল যেন একটা নতুন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। সব অচেনা, অজানা।

হিন্দুদের বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার অভিসারের কথা লেখা আছে। সে-পোড়ারমুখীও নাকি রাত দুপুরে অভিসারে বেরুত। সে-অবস্থায় তার মনের খবর আমি জানি না। কিন্তু আমার? সেকথা ভাষায় বোঝাতে পারব না। পা দুটো তখন থর্‌থর্ করে কাঁপছে। পক্ষাঘাত হলে যেমন হয়। মনে হচ্ছিল, তখনই বুঝি আমি পড়ে যাব। একটা দুনিয়া-জোড়া আতঙ্ক আমার বুকের ওপর চেপে বসেছিল।

দরজাটা ভেজানো ছিল। একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি, ও মা, তুমি ঘুমোচ্ছ।

মাথার কাছে লণ্ঠনটা জ্বলছিল। বিছানায় দু-একখানা বইখাতা ছড়ানো। কলমের মুখটা খোলা। বুঝলাম, লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছ।

লণ্ঠনটা থেকে বড় বেশী ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পলতেটা বেড়ে গিয়েছিল বোধ-হয়। আলোটা একটু কমিয়ে দেব বলে লণ্ঠনটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তোমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলে, আচমকা ঘুম ভেঙে গেল যেমন হয়। যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছ। ঠিক এমনি ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে।

—তুমি এখানে? দুচোখে তোমার অদ্ভুত বিস্ময়। কপালটা কুঁচকে গেছে।

—তুমি আমাকে ডেকেছিলে। অনেক কষ্টে কথা বললাম। বুকের ভেতরটা আমার তখন ভীষণ তোলপাড় করছে।

—আমি ডেকেছি? কই না তো?

আমি যে বেঁচে আছি, এই সংজ্ঞাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছি তখন। মরা মানুষের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘরের বাইরে দুপ্ দুপ্ শব্দ হল। যেন একটা মোটা মানুষের মৃদু চলার শব্দ। কে যেন হেঁটে গেল ঘরের পাশ দিয়ে।

তুমি চমকে উঠলে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের দরজা-দুটো বন্ধ করে দিলে ভেতর থেকে। তারপর আমার দিকে ফিরে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত বললে, কেন এসেছ এখানে?

আমি তখন কান্না সামলাতে পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য, তোমার মনে কি এতটুকুও দয়ামায়া নেই! এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরে বললে, শীগগির

চলে যাও। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না তোমার। বলে একরকম জোর করেই আমাকে টেনে বার করে আনলে ঘর থেকে। তোমার মুখের দিকে তখন চাইতে পারিনি। তাহলে বোধ-হয় আঁৎকে উঠতাম।

আমাদের কোয়ার্টার পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে তুমি ফিরে গেলে। সারারাত বিছানায় পড়ে কাঁদলাম। চোখের জলে বালিশটা সেদিন ভিজে উঠেছিল। কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না নিজেকে। বুকের ভেতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা।

পাশেই হামিদা শুয়ে ছিল। কি সুন্দর ঘুমোচ্ছে! এতটুকু দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা নেই। মান-অপমান নেই। ওর প্রাণটা কত মুক্ত। বন্ধন নেই, পরাধীনতা নেই। এই জন্যেই বোধ হয় শিশুর জীবন এত সুন্দর।

কাছে টেনে এনে হামিদাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলাম। ঘুমের ঘোরে হামিদা একবার কেঁদে উঠল, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই ও ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হামিদা ঘুমোচ্ছে। ওর ছোট ছোট নিঃশ্বাস আমার বুকে এসে লাগছে। কে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমার বুকে। কি আরাম, কি স্বস্তি! মনে মনে বললাম, আশীর্বাদ করি, এমনি নিশ্চিন্তে যেন সমস্ত জীবনটা তুই কাটাতে পারিস্ হামিদা। আমার মতো দুর্গতি তোকে যেন কখনো সইতে না হয়।

কিন্তু কি করে জানব সে আমার দুর্গতি নয়?

দুর্গতির হাত থেকে সেই ছিল আমার গতি। তুমি যে আমার সমস্ত দুর্গতির, সমস্ত দুঃখের ওপরে খড়্গহস্তে বসেছিলে, সেদিন রাত্রে তা আমি কোনো রকমেই বুঝতে পারিনি। তোমার ওপর কত রাগ করেছিলাম। শুধু রাগে নয়, অভিমানে, দুঃখে আর ঘৃণায় স্থির করেছিলাম যে, আর কখনো তোমার মুখ দেখব না। হামিদাকেও আর যেতে দেব না তোমার কাছে। ছি ছি, সেদিন কি করে তোমাকে এত ভুল বুঝেছি, ছোট করেছি! ভাবলে আজও লজ্জায় মরে যাই।

সমস্ত ব্যাপারটা যেদিন আমার কাছে ধরা পড়ল সেদিন আমি শিউরে উঠেছিলাম। এত বীভৎস হতে পারে মানুষ! বুঝলাম, সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল শ্রীবাস্তববাবুর কারসাজি। তোমার নাম করে যে-চিঠিটা তিনি দিয়েছিলেন হামিদার হাতে আমাকে দেবার জন্যে, সেটা আসলে জাল চিঠি। তোমার চিঠি নয়।

ঠিক তোমার পেছনের কোয়ার্টারেই থাকতেন শ্রীবাস্তববাবু। তোমার মত তিনিও ছিলেন একজন এ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন-মাস্টার। দুজনে ছিলে সহকর্মী? কিন্তু দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ কত তফাৎ। যেন স্বর্গ মর্তের ব্যবধান।

শ্রীবাস্তববাবুর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে অশরীরী-আত্মা বললেই ভাল হত। দেহ ছিল না বললেই চলে। সজনে ডাঁটার মত রোগা পিত্পিতে চেহারা। আধমরা রোগীর মত সব সময় ধুঁকতেন। বছরে একবার করে তাঁকে হাসপাতালে যেতেই হত মা-ষষ্ঠীর কৃপায়। কিন্তু শ্রীবাস্তববাবুর ভ্রূক্ষেপ ছিল না সেদিকে। আশ্চর্য মানুষের মন। তার তৃষ্ণা কিছুতেই মেটে না। তাই আমিও তাঁর নজরে পড়েছিলাম।

এমন ঘটনা শ্রীবাস্তববাবুর জীবনে নতুন নয়। তাঁর কলঙ্কের অন্ত ছিল না। শুনেছি, বিয়ের পরেও তিনি প্রায় ছ-সাতটি মেয়ের সর্বনাশ করেছেন এইভাবে, বিয়ের আগের কথা জানি না। তাই সে-প্রসঙ্গ ছেড়েই দিলাম।

সে-রাত্রে আমাকে নিয়েও একটু মজা লুঠতে চেয়েছিলেন শ্রীবাস্তববাবু। আর একটি মেয়ের সর্বনাশের কল্পনা তাঁর চোখের তারায় তারায় নাচছিল। তারপর এক টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবেন, এই ছিল তাঁর মনের অভিপ্রায়। তাই সেদিন তোমার ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, উনি

শ্রীবাস্তববাবু এবং ওই পায়ের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বীভৎস একটা ষড়যন্ত্র। তুমি খানিকটা আন্দাজ করেছিলে, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তুমিও জানতে না। সেদিন শ্রীবাস্তববাবু একা ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে আরো দুজন ছিল। তারা পোর্টার। তারাও ছিল শ্রীবাস্তব-বাবুর অংশীদার।

সমস্ত ঘটনার খানিকটা শুনেছিলাম তোমার কাছে, আর বাকীটা শ্রীবাস্তববাবুর স্ত্রীর মুখে। উনিও জানতে পেরেছিলেন ষড়যন্ত্রের কথা। বলতেন, মরণ হলে আমার হাড় জুড়োয়। তার আগে আরও কত জ্বালা সইতে হবে জানিনে।

সত্যি, দুঃখ হয় ভদ্রমহিলার জন্যে। আজও তিনি বেঁচে আছেন কি না জানি না। থাকলে বুঝব সে তাঁর কপালের দোষ।

শ্রীবাস্তববাবুর কথাও মনে পড়ে। এত বড় কাপুরুষ আমি আর কখনো দেখিনি। অবশ্য তাঁর মতো লোকের অভাব সংসারে নেই। বরঞ্চ বলতে পারি, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই শ্রীবাস্তববাবুর মতো কাপুরুষতা দিয়ে গড়া। নারীত্বের প্রতি তাদের কোনো ইমান-ইজ্জত নেই, শুধু ভোগ লালসার ইন্ধনই তাদের কাছে নারীত্বের একমাত্র সংজ্ঞা। স্নেহ নয়, প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, একটা বীভৎস অন্ধকারকেই তারা সব সময় আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই শুধু অন্ধকার চোখে নিয়েই তারা নারীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলে, সে-চোখ নিষ্ঠুর কামনার নেশায় উন্মাদ।

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য যে, এই বীভৎস উন্মাদনা-কেই তারা সব চেয়ে বড় পৌরুষ বলে মনে করে। অবশ্য এক দিক থেকে বিচার করলে, এটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ মানুষ যত বেশী কাপুরুষ হয়, তত বেশী ক্ষমতা-হীন এবং বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। আর এই অক্ষমতার দরুণই সে তার ভুলচুক, অন্যায়-অপরাধ-গুলোকে বুঝতে পারে না এবং তাদের সঙ্গে লড়তেও পারে না। তাই তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকেই শেষ পর্যন্ত পৌরুষ বলে মেনে নিতে সে বাধ্য হয়।

কিন্তু দুর্গতির হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমাকেই যে সাজা পেতে হবে তা কখনো ভাবিনি। সেদিনের সন্ধ্যেবেলাটা মনে পড়লে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। হামিদা তোমায় টেনে নিয়ে এসেছিল আমাদের কোয়ার্টারে। চেয়ে দেখি, রক্তে তোমার কামিজের বাঁ দিকটা ভিজে গেছে। কপাল থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে তখনো।

কি করব কিছুই ভেবে না পেয়ে তাড়াতাড়ি মাকে ডাকলাম। বাবা চা খাচ্ছিলেন। আয়োডিন আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ছুটে এলেন।

মনে আছে, বাবার কাছে একটি কথাও তুমি প্রকাশ করনি, পাছে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়; অথচ অফিস থেকে ফেরার পথে তুমি স্পষ্টই দেখেছিলে, পাথরটা এসে তোমার কপালে লাগল সেই আম গাছটার ঝোপ থেকে। শুধু তাই নয়, শ্রীবাস্তববাবুকেও তো ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছিলে? এখন ভাবি, এত উদারতা তুমি কোথায় পেলে, যার জোরে আমার মত একটা সামান্য মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সেদিন সমস্ত দুঃখ তোমার নিজের মাথায় তুলে নিতে পেরেছিলে? আর ভাবি, কোন্ পুণ্যবলে তোমাকে আমি পেয়ে-ছিলাম। আমার কি সৌভাগ্যের সীমা আছে? সে-সৌভাগ্যের কথা ভাবলে বুকটা আমার দশ হাত ফুলে ওঠে।

অসুস্থ হয়ে দশ দিন বাড়ী ছিলে। ডিউটিতে যেতে পারনি। কপালের ঘা-টা আস্তে আস্তে সারছিল। হামিদা রোজ ছুটে ছুটে যেত তোমার কাছে। গিয়ে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, পাখার বাতাস করত। ইচ্ছে হত, আমিও ছুটে যাই। নিজের চোখে একবার দেখে আসি, কেমন আছ। কিন্তু তেমন কপাল নিয়ে কি আমি জন্মেছি?

হামিদাকে বলতাম, কী বোকা মেয়ে রে তুই! তোর ভাই-সাহেবের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারলি না?

—কি শিখব দিদি, বলে দাও না তুমি? হামিদা আনন্দে আমার গলা জড়িয়ে ধরত।

বললাম, তোর ভাই-সাহেবকে বলবি 'বাংলা শিখিয়ে দাও'।

হামিদার খুশি আর ধরে না। বলল, আজই বলব ভাই-সাহেবকে। তুমিও শিখবে, দিদি?

—যাঃ, আমি কেন শিখতে যাব রে? আমার বুকের ভেতরটা একবার তোলপাড় করে উঠল। হামিদাকে নিয়ে আর পারি না। না পারি মেয়েটাকে কিছু বোঝাতে, না পারি বলতে।

হামিদার শ্লেটে তুমি বাংলার বর্ণপরিচয় লিখে দিতে। আমি সেগুলোকে যেন গিলে খেতাম। মনে হত, এত মধু মাখানো আছে বাংলায়? ক্রমে বর্ণ পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম আট-দশ দিনের মধ্যেই। হামিদা কি শিখছে না-শিখছে তা আমি দেখতাম না। আমি তখন আমাকে নিয়েই ব্যস্ত।

তারপর একটু সুস্থ হয়ে তুমি একদিন আমাদের কোয়ার্টারে এলে। সেদিনও বাবা-মা কেউ বাড়ী ছিলেন না। এলাহাবাদে গিয়েছিলেন পিসীমার কাছে। বাড়ীতে ছিলাম শুধু আমি, হামিদা আর বুড়ী ঝিটা। হামিদা তোমায় ডেকে এনেছিল। আমি কিছুই জানতাম না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলাম। চেয়ে দেখি, ওমা, তুমি যে একেবারে ঘরের মুখেই দাঁড়িয়ে আছ। ছুটে পালিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। তোমাকে বসতে বলব, তাও ভুলে গেছি। এমনই পোড়া মন।

কি ভাগ্যি হামিদা তোমায় বসিয়েছিল। তাড়াতাড়ি খানকয়েক পুরি আর চা তৈরি করে আনলাম। টেবিলের ওপর খাবারগুলো রাখতেই তুমি বললে, একি, এসব কেন?

বুকের ভেতরটা আমার দুরুদুরু করতে লাগল। কি জানি, হয়তো খাবে না। দেওয়াই আমার সার হবে।

তুমি বললে, এত ঝামেলা কেন?

ঝামেলা? শুনে ভীষণ হাসি পেল। মনে মনে বললাম, এসব গুরুদক্ষিণা।

দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন একলব্যের কাছে। একলব্য হাতের একটা আঙুল কেটে দক্ষিণা দিয়েছিল। সেদিন আমার কাছেও তুমি চাইলে না কেন? আমি কি কিছু দিতে পারতাম না? নিজের মুখে একবার বললেই তো পারতে 'তোমার সর্বস্ব দাও'।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই তুমি বললে, বাঃ, চমৎকার চা করেছ। এতো ভাল চা কখনো খাইনি।

কী যে লজ্জা করছিল আমার। আয়নার গায়ে আমার ছায়া পড়েছিল। মনে হচ্ছিল আয়নাটা যদি এক্ষুণি চুরমার হয়ে ভেঙে যায়।

সেই প্রথম তুমি আমাদের বাড়ীতে খেলে। শুধু আমাদের বাড়ীতে নয় আমার কাছে। এত সুখ আমি জীবনে কোনো দিন পাই-নি।

আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখোমুখি না হলেও সামনে তো? এক-একবার চুরি করে দেখছিলাম তোমাকে। তুমিও দেখছিলে। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, দুজনেই চুপচাপ। মাঝে মাঝে তুমি হামিদার সঙ্গে কথা বলছিলে, ঠাট্টা করছিলে। তোমার কপালের ঘা-টা আমি দেখছিলাম। ভালভাবে সারতে তখনো বেশ দেরী। মাগো, সেদিন কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেছে।

তুমি উঠে দাঁড়ালে। যাবার আগে আমার দিকে হঠাৎ ফিরে বললে, আমাকে ক্ষমা করো, রাসিদা।

ওমা, ও কি কথা। ক্ষমা চাইছ কেন? কি করেছ তুমি? ছিঃ ছিঃ। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধ হয় তুমি বললে, সেদিন রাত্রে তোমার সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছি। সেজন্যে আমি দুঃখিত।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না তোমার সামনে। ছুটে পালিয়ে গেলাম। তুমি আমাকে এমন করে অপমান করবে, তা জানতাম না। তাহলে কি

তোমার সামনে যেতাম। আনন্দের পরে সেদিন আমাকে এত দুঃখ দিলে কেন?

হামিদা তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিল তা হামিদাই জানে। তোমার কাছে একদিন যেতে না পেলে ও যেন হাঁপিয়ে উঠত। একবার বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে পিসীমার বাড়ী গিয়েছিলেন এলাহাবাদে। সেখানে হামিদাকে নিয়ে কী বিপদ! ভাইসাহেবের কাছে যাবে বলে সারাদিন কেঁদে কেঁদেই সারা হল মেয়েটা। মা আমাকে বললেন, তুই ওকে একটু ভোলানোর চেষ্টা কর তো, মা। কিন্তু আমি কি পারি ওকে ভোলাতে? আমারই প্রাণ যায়! শেষে ফিরে এসে তবে বাঁচলাম। পরদিনই বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে বিশ্বনাথগঞ্জে ফিরে এলেন। এক সপ্তাহ আর থাকা হল না এলাহাবাদে।

যেন হামিদার কাছ থেকেই বাবা শিখলেন তোমার কাছে যেতে। অফিস থেকে প্রায়ই তোমার কোয়ার্টারে যেতেন। রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত গল্প করে বাড়ী ফিরতেন।

বাবা বলতেন, খুব ভাল ছেলে। চমৎকার স্বভাব। মা বলতেন, ও তো এক রত্তি ছেলে, ও চাকরি করতে পারে?

ছেলেটির শেখবার ইচ্ছে আছে। খুব উদ্যমী।

মা বলত, আহা, বাপ নেই, তাই চাকরি করতে এসেছে। ওর কি এখন চাকরি করার বয়েস?

বাড়ীতে তোমার বিধবা মা, আর ছোট দুটি ভাই-বোন। সকলের কথা মনে পড়লে আমারও ভারি মন কেমন করত। মা ভাই বোন সবাইকে কলকাতায় রেখে কত দূরে তুমি পড়ে আছ। সংসারের টাল সামলাতে কত কষ্টই না করতে হয় মানুষকে। আবার মনে হত, তুমি এখানে না এলে তোমার সঙ্গে হয়তো কোনো দিনই আমার পরিচয় হত না। কোথায় থাকতে তুমি, আর কোথায় আমি। বাংলা শেখাই বা আমার হতো কার কাছে?

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দুখানা তখন শেষ করেছি। কিন্তু বাংলা শেখার প্রথম অধ্যায় শেষ না হতেই তাতে ছেদ পড়ল। চুণারে বদলির অর্ডার এল বাবার।

আমরা চলে যাব, একথা ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। ওই ধূ-ধূ করা মাঠ ছোট্ট ছাউনি ঢাকা স্টেশন, এমন কি ওই কুয়োটা পর্যন্ত কি নিবিড়ভাবে আমার মধ্যে মায়া বিস্তার করেছে, সেই প্রথম আমি তা উপলব্ধি করলাম। তারপর তুমি? কোথায় আবার দেখা পাব তোমার?

যাবার দিন বিকেল থেকেই কুলিরা আমাদের মোট বইতে শুরু করল। হামিদা ছুটে গিয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে এল। ওকে বলা হয়নি যে, আমরা একেবারে চলে যাচ্ছি। তুমি ওর হাতে এক বাক্স বিস্কুট দিলে, টফি দিলে। আরো কত কি?

খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যখন স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম, তার অনেক আগেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ী আসতে তখনো বেশ দেরী। স্টেশন থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার ঘরে টিমটিম করে লণ্ঠনটা জ্বলছে। ঠিক তার পাশেই আমাদের বাড়ীটা একেবারে অন্ধকার। যেন একটা ভূতের বাড়ী। লণ্ঠনের সামনে বসে তখন কি করছিলে তুমি? ডায়েরী লিখছিলে বোধ হয়? মনে হচ্ছিল, তোমার ডায়েরীতে আমার নামটাও যদি থাকে!

একটা অজুহাত দেখিয়ে মাকে বললাম, আমি এক-বার বাড়ী থেকে আসছি, মা। যাব আর আসব।

মা বললে, দেরী করো না কিন্তু। গাড়ী এসে যাবে। আমাদের কোয়ার্টারের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে তোমার কোয়ার্টারের পিছনের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল আমার জ্বর এসেছে।

তুমিও কি ভাবছিলে আমার কথা? দরজায় মৃদু আওয়াজ করতেই তুমি এসে দরজা খুলে দিলে। যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলে। বললে, এস।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দেখতে পেলাম, তোমার মুখখানি কী ভীষণ শুকিয়ে গেছে। চুলগুলো আঁচড়ানো নেই, ঝামরে পড়েছে মুখের ওপর।

গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা হিন্দুদের একটা রীতি। কি জানি কেন, সেদিন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আমি হিন্দু নারী ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারিনি। তাই পায়ে হাত দিয়ে তোমায় প্রণাম করতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই তুমি আমায় ধরে ফেললে। তোমার চাদর দিয়ে আমার চোখ মুছে দিয়ে বললে, ছিঃ, কাঁদতে নেই!

তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। যেন একটা দুস্তর বাধা আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একখানা রুমাল এনেছিলাম। কদিন আগে তৈরি করেছি। রুমালটা তোমার হাতে দিয়ে বললাম, দুজনের নাম লেখা আছে, রেখে দিয়ো।

তোমার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে তুমি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলে। বললে, হারিয়ে ফেলো না।

আমরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন করে আগে কখনো দাঁড়াইনি। কিন্তু দুজনেই চুপচাপ। যে-কথা বলতে চেয়েছি, বলতে এসেছি, তা বলা হয়নি। কোনো দিনই বলতে পারিনি। তুমিও পারনি, আমিও নয়।

অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলে তাকালাম, দেখি তুমি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছ। যেন আমার বুকের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে দেখছ। ওই চোখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। তবু বলতে হলো, যাই?

তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে। যেন পাথরের একটা মূর্তি। বুঝি-বা শুনতেই পাওনি আমার কথা।

স্টেশনে এসে যখন হাজির হলাম, তখন গাড়ী আসতে আর বেশী দেরী নেই। সিগনাল ডাউন হয়ে গেছে।

চুণারে আমরা দু'বছর ছিলাম। সেখান থেকে বাবা বদলি হয়ে গেলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদ থেকে কানপুর। তারপর বেরিলি, মোরাদাবাদ আর বেনারসে সাত বছর কাটিয়ে আমরা এলাম লক্ষ্ণৌতে। বাবা তখন স্টেশন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। লক্ষ্ণৌতেই বাবা মারা গেলেন। তার ছ'মাস পরে মাকেও হারালাম।

আমরা দুটি বোন। কোনো অভিভাবক নেই। অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগল নিজেদের। তোমাকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তুমি তখন কোথায়, তা কি জানি? কোন্ স্টেশনে আছ, সেটুকু জানতে পারলেও তো হত। যেমন করে হোক খুঁজে বের করতাম। কিন্তু তখন সেও তো হবার নয়। চুণারে থাকতেই শুনেছিলাম, তুমি আর বিশ্বনাথগঞ্জে নেই। ওখান থেকে বদলি হয়ে গেছ। দু-একজন জানাশুনা লোককে তোমার খোঁজ করতে বলেছিলাম। তারা কোনো সঠিক খবর দিতে পারল না। কেউ বললে, তুমি বারাবাঁকিতে আছ, কেউ বললে প্রতাপগড়ে, আবার কেউ বা বললে তুমি বেনারসে। সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম। কোথাও পেলাম না তোমায়।

মাঝে মাঝে মনে হত, যদি কখনো খুঁজে পাই তাহলে? তুমি কি চিনতে পারবে আমাকে? তুমি নাই-বা পারলে? আমি তো পারব। নিজের পরিচয় দিয়ে বলব, আমি তোমার বাঁসিদা।

তুমি হয়তো বলবে, ও, তুমি বাঁসিদা? কেমন আছ? বলবো, ভাল আছি। তুমি?

—আমিও ভাল আছি। অনেকদিন পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে। আচ্ছা চলি। আজ একটু কাজ আছে।

তুমি হয়তো চলে যাবে। আমি রাস্তার মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। হয়তো দেখতে পাব, তোমার পেছনে একটি মেয়ে লঘু পায়ে হেঁটে চলেছে। তার মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর। বউটি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কে গা মেয়েটা?

তুমি বলবে, ও কেউ নয়। আমাদের একজন স্টেশন-মাস্টারের মেয়ে।

ষাট। বালাই আর কি। এ সব কি ভাবছি আমি আবোল-তাবোল। তুমি কি তেমন মানুষ যে আমাকে ভুলে যাবে? মনে হতো, যেখানেই থাকো, তুমি আমায় নিশ্চয়ই মনে রাখবে। তুমি যে আমারই।

সব চেয়ে মুশকিলে পড়লাম হামিদাকে নিয়ে। ওকে নিয়ে আমি কোথায় ঘুরব? তখন আমি লক্ষ্ণৌতে একটা মেয়েদের স্কুলে মাস্টারি করি। গ্রীষ্মের ছুটি পড়লেই আমি বেরিয়ে পড়তাম তোমার খোঁজে। কিন্তু বাড়ীতে হামিদাকে একলা রেখে যেতে আমার ভয় করত। তাই হামিদাও সঙ্গে থাকত আমার।

ছোট-বড় কত স্টেশন ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার খোঁজে। কিন্তু কোথাও পাইনি তোমায়। আবার ফিরে এসেছি লক্ষ্ণৌতে।

হামিদা বলত, ভাই-সাহেবকে বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না দিদি। খোঁজাই তোমার সার হবে।

বলতাম, নিশ্চয়ই পাব, তুই দেখিস্।

হামিদা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। কি দেখত ও আমার মুখে?

হামিদার জন্যে পাত্র খুঁজছিলাম। সন্ধান পেতেই ওর বিয়ে দিয়ে দিলাম। ওর স্বামী কলকাতায় চাকরি করে। তাই হামিদা এখন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

যা-ই বল, হামিদা কিন্তু আমার মত পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে না। এখনও আমার সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলে। ও হিন্দীতে বা উর্দুতে কথা বলতে চায়। আমি বলতে দিই না। আমার বাংলা শুনে ও হাসে, বলে, তুমি যে খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে হয়ে গেলে দিদি। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব কি করে? আমার বাংলার দৌড় যে কত দূর সে তো তুমি জানো?

আমি বলি, তা হোক। তবু আমার সঙ্গে তোকে বাংলাতেই কথা বলতে হবে।

হামিদাকে দেখলে তুমি এখন চিনতেই পারবে না বোধ হয়। কত বড় হয়েছে মেয়েটা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর নেই। চুলগুলো এখন পিঠ বেয়ে কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ফ্রক্ ছেড়ে ও এখন সালোয়ার-কামিজ পরে। শুধু আমার কাছে যখন তখন বাঙ্গালী মেয়েদের মত শাড়ী পরে আসে। না হলে আমি খুব বকুনি দিই। হামিদার এখন সংসার হয়েছে, ছেলেপিলে হয়েছে। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। সংসার নিয়েই ও সব সময় ব্যস্ত। এক কথায় হামিদা এখন পাকা গিন্নী।

হামিদার মেয়েটিকে ঠিক হামিদার মত দেখতে হয়েছে। ঠিক যেন একটা কড়ির পুতুল। কি সুন্দর আধো-আধো কথা বলে। হামিদা ওর নাম রেখেছে রাবেয়া, আমি রেখেছি জ্যোৎস্না।

ছেলেমেয়েদের আমি বাংলা শেখাতে বলেছি।

হামিদা বলে, কার সঙ্গে ওরা বাংলা বলবে দিদি? বাড়ীতে কেউ তো বাংলা জানে না?

আমি বলি, তা হোক, তবু বাংলা শেখাস্। ওরা মায়ের ভাষা শিখবে, আর মাসীর ভাষাটা শিখবে না?

হামিদা আমার কথা রেখেছে। বাড়ীতে মাস্টার রেখে ছেলেদের বাংলা শেখায়। মেয়েটির এখনো পড়াশুনার বয়েস হয়নি। এই তো সবে দু'বছরের হলো।

তোমাকে খোঁজা আমার কিন্তু শেষ হয়নি। প্রতি বছরেই গরমের ছুটিতে বেরিয়ে পড়ি। হামিদাকে আর সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয় না, এই সুবিধে। নিজে যেখানে খুশি যেতে পারি। অবশ্য আমিও মেয়ে। মনে মনে ভয় করে বৈকি! দুনিয়ায় কত রকমের লোক আছে। কিন্তু ভয় করে বাড়ীতে বসে থাকলেও তো চলবে না? ওতে কি কাজ উদ্ধার হবে?

ঘুরে ঘুরে যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক সেই সময় কলকাতা থেকে হামিদার চিঠি পেলাম। তোমার খোঁজ পেয়েছে হামিদা।. বুকের ভেতর রক্তবিন্দুগুলো যেন লাফিয়ে উঠল আনন্দে। হামিদা লিখেছে, ওর স্বামী খুঁজে

বার করেছে তোমাকে। কোথায় থাকো সে-ঠিকানাও নিয়ে এসেছে।

তোমার মা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। ভাই-বোনের বিয়ে দিয়েছ। তারা এখন সংসারী। আর তুমি? হামিদা লিখেছে, ভাই-সাহেব ঠিক তোমার মতো সন্ন্যাসী সেজে বসে আছে, দিদি। নিজের হাতে ভাতেভাত ফুটিয়ে খায়।

সেই দিনই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলাম। লক্ষ্ণৌ-এর মায়া এতদিনে বুঝি কাটল!

হামিদা আমার জন্যে আগে থাকতেই একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছিল। ঠিক কলকাতায় নয়, একটু গাঁয়ের দিকে। এই আমি ভালবাসি। ঝোপ-জঙ্গল, পুকুর-বাগান, ফাঁকা মাঠ, এর মধ্যেই যেন তোমাকে আমি সব চেয়ে বেশী করে খুঁজে পাই। এই পরিবেশের মধ্যে এলেই খুব বেশী করে বুঝতে পারি, আমি বাংলার মেয়ে, বাংলার মাটি আমার মাটি, বাংলার আকাশে বাতাসে আমার মন-প্রাণ মিশে আছে।

দুদিনের মধ্যেই ঘরখানা গুছিয়ে ফেললাম। তুমি আসবে। না গুছালে চলে! তারপর হামিদাকে নিয়ে তোমার খোঁজে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী খুঁজে বের করতে খুব বেশী কষ্ট হল না। হামিদা সঙ্গে ছিল, তাই। ও এদিকের রাস্তা বেশ চেনে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম, তুমি বাড়ী নেই, অফিসের কাজে কোথায় বাইরে গেছ। এক সপ্তাহের আগে ফিরবে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

হামিদা বলল, চল দিদি, পরে একদিন আসব।

আমরা ফিরে এলাম। আসার সময় হামিদা একটা কাগজে আমার বাড়ীর ঠিকানা লিখে জানলা দিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে ফেলে দিল।

আজ রবিবার। দিনটার নামের সঙ্গেই যেন একটা ছুটির আমেজ মিশে আছে। চিরকালের অভ্যাস মতো বিছানা ছেড়ে উঠতেও তাই আজ দেরী হল। মুখ ধুয়ে, স্নান সেরে সবে ঘরে ঢুকেছি, শুনতে পেলাম বাইরের দরজায় কে ধাক্কা মারছে। কে এল? হামিদা নাকি? কিন্তু সে তো এত জোরে দরজা ধাক্কায় না? তবে কে?

দরজা খুলতেই একজন ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করলেন। তাঁর হাতে ছোট এক টুকরো কাগজ। তাতে আমারই বাড়ীর ঠিকানা লেখা রয়েছে।

ভদ্রলোকের ঠোঁট কাঁপছিল। তোমার নাম করে বললেন, মিস্টার চক্রবর্তীকে আপনি চেনেন?

ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না আমি। শুধু বললাম, উনি আমার স্বামী!

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তাঁর কাছ থেকেই আমি আসছি। একটা দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ! কেন, কি হয়েছে? তিনি এখন কোথায়?

—মিস্টার চক্রবর্তী এখন হাসপাতালে। ভদ্রলোক বললেন, একটু আগে মোটর এক্সিডেন্টে তিনি সাংঘাতিক-ভাবে জখম হয়েছেন। এই কাগজখানা তাঁর পকেটে পাওয়া গেছে।

কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। মাথাটা আমার ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার ঠিকানাটা তোমার পকেটে পাওয়া গেছে। তুমি কি আমার কাছেই আসছিলে?

হামিদাকে ডাকতে লোক পাঠালাম। খবর পেয়েই সে ছুটে এল। বললাম, তুই একবার তাকে দেখে আয় দিদি আমার। দেরী করিসনি ফিরতে। যাবি আর আসবি।

হামিদা বললে, তুমিও চলনা দিদি, নিজের চোখে একবার দেখে আসতে?

—আমি যেতে পারব না। আমার মাথার ভেতরটা কি রকম করছে। তুই যা হামিদা।

হামিদা চলে গেল।

একটু আগে ও আবার এসেছিল। তোমার খবর দিতে। সমস্ত সময়টা আমার ছটফট করে কেটেছে,

হামিদা ঘরে ঢুকতেই বিছানা ছেড়ে আমি উঠে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছে রে? কি রকম দেখে এলি?

হামিদা কথা বললে না। আমার মাথাটা ওর বুকের ভেতর চেপে ধরল। ওর হু'চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

বুঝলাম, তুমি নেই। চিরদিনের মত আমাকে ছেড়ে তুমি চলে গেছ। তোমাকে ভেবে জানলার ধারে আমার বসে থাকবার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেলে। জীবনে আর কিছু ভাববার নেই, বলবার নেই, করবার নেই। যার জন্যে এত ব্যস্ততা, সে নিজেই আমার হাত থেকে সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় গেলে, তা তো বলে গেলে না? কোন্ মাঠ পেরিয়ে তুমি বুঝি হেঁটে চলেছ! সে-মাঠের কি শেষ আছে? যত দূর দেখা যায়, শুধু ধু-ধু করা মাঠ, আর মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। মাঠের আল্ বেয়ে তুমি হেঁটে চলেছ। আহা, মুখখানি তোমার রোদ্দুরে ঝামলে গেছে! কোথায়, কোন্ অজানা দেশে তুমি চলে যাচ্ছ, তা কি কেউ জানে? সে-দেশ এখান থেকে দেখা যায় না; কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি সব দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি, তোমার এখনও অনেক পথ বাকী। সারাদিন হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় তুমি গিয়ে পৌঁছবে সে-দেশে, যেখানে প্রাণ নেই, শব্দ নেই, স্বর নেই, যেখানে ওই অনন্ত নীল আকাশটা একটা অপূর্ব গম্ভীর্যে সমাধিস্থ হয়ে আছে।

হামিদাকে বললাম, তুই বাড়ী যা হামিদা, বাচ্চারা কাঁদবে।

যেতে ওর পা সরছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, কাল সকালে একবার আসিস্ বোন। আসবি তো?

হামিদা মাথা নাড়ল, আসব।

ও চলে যেতে আমি চুপ করে অনেক ক্ষণ বসে রইলাম বিছানায়। ঘরের সুমুখে দুটো চড়ুই লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল। কেমন অসহ্য লাগল। পাখী দুটোকে তাড়িয়ে দিলাম। চোখের সামনে নীল আকাশটা যেন হঠাৎ রং হারিয়ে শাদা হয়ে গেছে। কিছুতেই ওদিকে তাকাতে পারছি না।

তোমার দেওয়া আংটিটা বাক্স থেকে বের করে আজ আবার আঙুলে পরলাম। পাছে ক্ষয়ে যায়, এই ভয়ে আংটিটা সব সময় পরতাম না। বাক্সে তোলা থাকত। শুধু তোমার জন্মদিনে বের করতাম। আর আজ? আজ সেই জন্মদিনটাকেই আমার চোখের সামনে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দিয়ে চলে গেলে। তাই বুঝি আংটিটা শেষবারের মতো আজ বাক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে।

বসে বসে তোমার কাছে লিখছি। কিন্তু কেন লিখছি? কে পড়বে এই লেখা? তা কি আমিই জানি? মনে হচ্ছে, তোমাকে আমার সামনে বসিয়ে রেখে আমি গল্প বলে যাচ্ছি। আর তুমি বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছ, আর আমার গল্প শুনছ। কি করে বোঝাব নিজেকে, তুমি নেই! তুমি আর কোনোদিন আমার গল্প শুনবে না।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, হামিদা ছুটে ছুটে আসছে আমার কোলের কাছে। সাত বছরের ছোট্ট একটা কচি মেয়ে। তার রেশমের মত নরম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক-মাথা চুল। হাতে একটা শ্লেট। তুমি নেই, তাই বুঝি ও আসছে আমার কাছে! গল্প শুনতে আর ছবি আঁকতে? কিন্তু আমি কি কিছু জানি যে ওকে গল্প শোনাব আর ছবি এঁকে দেব?

কেন পারব না? খুব পারি ওকে গল্প শোনাতে আর ছবি এঁকে দিতে। আমাদের দুজনের ছবি ওর চোখের সামনে আমি তুলে ধরব, আমাদের গল্প ওকে শোনাব নতুন করে। হামিদা শুনবে। শুনতে শুনতে ওর মনে পড়ে যাবে অনেক দিন আগের সেই ভুলে যাওয়া দিনগুলো। মনে পড়ে যাবে, ও ছুটে ছুটে যেত তোমার কাছে, আবার ফিরে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারপর তোমার গল্প বলতে

বলতে আমার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে ও কখন ঘুমিয়ে পড়ত। আর আজ? ইচ্ছে হয়, তোমারই গল্প বলতে বলতে আমি ওর কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোই।

কাল সকালে হামিদা আসবে। এসে যখন দেখবে, আমি নেই, তখন কি করবে হামিদা? আমাকে জড়িয়ে ধরে 'দিদি' বলে ককিয়ে কেঁদে উঠবে? না, না, ওকে আমি কাঁদতে দেব না। আমি লিখে রেখে যাব, ও যেন না কাঁদে।

আমার মাথার কাছে এই কাগজগুলো দেখতে পাবে হামিদা। দেখবে আমারই হাতের লেখা। ও কি না পড়বে? সমস্ত কাগজগুলো একখানা একখানা করে পড়বে? পড়তে পড়তে ওর মনে পড়ে যাবে, একটা ফাঁকা মাঠ, মাঠের মাঝখানে একটা ছোট রেলওয়ে স্টেশন, আর সেই সঙ্গে মনে পড়বে দুটি মুখ। তুমি হয়তো চা খাচ্ছ, আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মনে পড়ে যাবে, পাথর লেগে একজনের কপাল কেটে গেছে, এবং আরেকজন নিজের বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরছে। আমরা আবার বেঁচে উঠব।

তোমাকে পাইনি, এ-দুঃখ বুকে নিয়ে যাব কেন? তুমি কি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছ? না, আমি যাচ্ছি? আমরা বেঁচে থাকব। অন্তত: হামিদা যতদিন আছে। দুটি হাসি-উজ্জ্বল মুখ থেকে-থেকে হামিদার মনে পড়ে যাবে, আর হামিদা ফিরে ফিরে যাবে সেই পুরনো দিনগুলোয়। হামিদা তখন কারো গৃহিণী নয়, স্ত্রী নয়, মা নয়। হামিদা একটি ছোট্ট শিশু। সাত বছরের একটা কাঁচ মেয়ের জীবনে অভিন্ন আত্মা হয়ে আমরা বেঁচে থাকব, তা-ও কি কম!

দিগ্-দর্শন

সিদ্ধেশ্বর মাইতি

যশেশ্বরবাবু আজ পঞ্চাশ বৎসর এই একই পথে যাতায়াত করেছেন। পথ বলতে এ-গাঁয়ের এ-কোণ থেকে ও-গাঁয়ের ও-কোণ। মাঠের বুক চিরে বহু পদ-লাঞ্ছন রেখাটি এ-গাঁয়ের এ-কোণের বটগাছ থেকে শুরু করে ও-গাঁয়ের ও-কোণের ঝাউগাছ অবধি প্রসারিত। ইদানীং কিন্তু ঝাউগাছের নিশানা বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষের হাতে গেছে একটি, প্রকৃতির হাতে অন্যটি। কিন্তু তাদের জায়গায় নতুন দুটি নিশানার সৃষ্টি হয়েছে।

এ-গাঁয়ের ঠিক ঐ কোণে সুচরিতা গার্লস্ স্কুলের সাদা দোতলা ভবনটি গাঁয়ের নতুন সম্পদের গর্বের বস্তু-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর ও-গাঁয়ে বহুমুখী বিদ্যাভবনটি ঠিক যেন একটি শ্বেত ঈগল পাখীর মত দুদিকে ডানা ছড়িয়ে এ-অঞ্চলের গৌরবের সংযোজন-রূপে আত্মঘোষণা করে চলেছে। পথের নিশানা এখন এ-দুটিই।

এছাড়া তাঁর পঞ্চাশ বছরের পাড়ি-দেওয়া এই পথে পরিবর্তনের আর কোন্ স্বাক্ষর এসে পড়েছে? যশেশ্বর-বাবু ভাবতে থাকেন।

নীল আকাশটা গম্বুজের মত তেমান দাঁড়িয়ে আছে, উজ্জ্বল সূর্য তেমনি আলো দিয়ে যাচ্ছে, বাতাস তেমান কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল, কখনও মৃদু, কখনও প্রবল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ঘুঘু-ডাকা দুপুর, কোকিল-কূজিত বসন্ত, ভেক-নিনাদিত বর্ষা তাঁকে অভ্যর্থনা করে যায়। চারিদিকে শ্যামল-সবুজের মেলায় কখনও কখনও পুষ্পরাগ-সজ্জার আয়োজন দুইচক্ষুকে নন্দিত করে, কিন্তু সেও সেই একই নিয়মের বশে।

তাহলে এই পঞ্চাশ বৎসরে কোন্ পরিবর্তন এসেছে এই পৃথিবীতে? না, ভগবানের সাজানো খেলাঘর মানুষ-পুতুলের এই পৃথিবীর চেহারাটা ঠিক তেমান আছে।

শুধু বয়স হচ্ছে তাঁর, চশমার কাঁচটাকে তাঁর বারে বারে পাল্টাতে হচ্ছে, শরীরের কোথায় যেন ঘুণ ধরেছে, সবকিছুর স্বাদ কেমন যেন একটু একটু করে ফিকে হচ্ছে —তিনিই পরিবর্তিত হচ্ছেন।

চলিষ্ণু দুনিয়া তাঁকে পিছনে ফেলে হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কিন্তু সুখ-শান্তি-সম্পদ্ এগুলি কি আসছে মানুষের সৌভাগ্যের উজান বেয়ে?

ঠিক বলতে পারবেন না যশেশ্বরবাবু। এর খতিয়ান তৈরী করার কাজও তাঁর নয়, তিনি দেখেছেন জীবন-জলতরঙ্গে পরিবর্তনের মাঝে কোথায় যেন একটি অপরি-বর্তনের ডুবন্ত পাহাড় লুকিয়ে আছে তাঁর মনে। পঞ্চাশ বৎসরে কত মানুষের আনাগোনা দেখেছেন তাঁর এই চলার পথে। দেখেছেন আদুর গায়ে গামছা হাতে মানুষ, চটের থলে হাতে ধুতি-জামা-লুঙ্গিপরা মানুষ, এখন দেখছেন চৌকস চটপটে মানুষ, যারা লুঙ্গি ছেড়ে পায়-জামা- বুশশার্টে চর্মদেহটিকে ঢেকে, রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা হাতে প্ল্যাস্টিকের চটকদার নানা আকার ও ডিজাইনের ব্যাগ এক বিশেষ কায়দায় ধরে পথ চলে যাচ্ছে।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন তাঁর সেই চির-পরিচিত পথ ধরে আসছিলেন যশেশ্বরবাবু। হঠাৎ এমনি একজন তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। চিনি চিনি করেও চিনতে পারলেন না তাকে। ডাকবেন? জিজ্ঞেস করবেন?

কোথায় যেন বাধল তাঁর। চিনেও যদি না চেনার ভান করে চলে যায়, বয়স ও অভিজ্ঞতার পাওনা সম্মান-টুকু না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়, ত এমন মানুষকে কি সেধে ডাকা যায়?

ডাকা আর হয় না। যশেশ্বরবাবুর বন্ধু ও সতীর্থ শরৎবাবু আসছিলেন ও-গাঁয়ের ও-কোণ থেকে। বয়স হয়েছে তাঁরও, দুনিয়ার হালচাল, পরিবর্তনের আবহাওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে সরস সমন্তব্য আলোচনাও হয় যশেশ্বর-বাবুর।

যশেশ্বরবাবু একটু থেমে সোজা হয়ে শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভাই শরৎ, ঐ ছেলেটা কে বল ত? চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, অথচ ঠিক পরিচয় নিতে ভরসা পেলাম না। আজকাল আবার চোখটা খারাপ হয়েছে, অনেক অচেনাকে চেনা মনে করে আলাপ করতে গিয়ে ঠকেছি।

শরৎবাবুর বয়স হলেও চশমা নেন নাই, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে দূরের চলমান নরদেহটির দিকে প্রসারিত করে দিলেন, তারপর দন্তহীন মাড়ি বিস্তার করে হাসলেন, তারপর তাঁর হাসির ওজনে যুৎসই মন্তব্য করলেন, সত্যি ভাই তোমার চোখটা একেবারে গেছে। আরে, ওকে চিনতে পারলে না? ও হচ্ছে বিনোদিনীর ছেলে, বিনোদিনীর শিব-রাত্রির সলতে। ওর বাবা মারা গেলে ওর মা-ই ত রেখে গেল ওকে তোমাদের বাড়ীতে। তুমি ওর লেখা-পড়ার ভার নিলে। ভাল লেখাপড়া হল না, শেষে তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এখন কলকাতায় কোন্ বেকারীতে ঢুকেছে।

যশেশ্বরবাবুর মুখবিবর বিস্ময়ে বড় হয়ে ওঠে, তিনি কথার পিঠে কথা জুড়ে দিয়ে বলেন, তাহলে ও ত মানুষ হয়ে গেছে। নিশ্চয় ভাল কামায় ছেলেটা।

শরৎবাবু বলেন, তুমিও যেমন! খুব ভাল আর কোথা? এ-ই মাসে একশ' থেকে দেড়শ'। ওতে আর আজকাল কার ভাল চলতে পারে?

যশেশ্বরবাবু আরও বিস্মিত হন, এত অল্পেতে এই ব্যাপার? পোশাক-পরিচ্ছদের এই বাবুয়ানির ঘটা? তা কেমন করে সম্ভব।

শরৎবাবু হাসলেন—না যশেশ্বর, তোমার বয়সের সঙ্গে অপর জিনিসটা আর বাড়ছে না। আয়ে ওর কি আর উপরি আয় নেই? আর যদি না থাকে, ও কি আর ধুতি মালকোঁচা দিয়ে, গায়ে হাফশার্ট চড়িয়ে, চটের থলের বোঝা ঝোলাতে ঝোলাতে যাবে আসবে? পঁচিশ বছর আগে যা ছিল, পঁচিশ বছর পরেও কি তাই থাকবে? এটা হল আত্মোন্নতির যুগ। সবাই যা করবে, ও তাই করবে। ওর বয়সটা ওইটাই করতে চাইবে।

এবার যশেশ্বরবাবু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, সত্যি কেমন ভুলো মেরে যাচ্ছি দিনদিন। সব কেমন উল্টে পাল্টে যাচ্ছে দিনগুলো।

শরৎবাবুর কথায় আর একটি দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ল যশেশ্বরবাবুর। সেই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বাড়ীর দিকে পথের বাকীটুকু পার হয়ে আসতে লাগলেন। সেদিন সত্যই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে-ছিলেন। যা গল্পে-নাটকে ঘটে, সিনেমার সেলুলয়েডে যা ফুটে উঠতে দেখেছেন, তাঁর চোখের সামনে তাই ঘটে গেল।

সেদিনও তাঁর চিরচেনা এই পথটি দিয়ে পা ফেলে ফেলে যাচ্ছিলেন তিনি, চিন্তামন্থর গতি, কিছু অন্য-মনস্কও ছিলেন বুঝি, হঠাৎ রাস্তার মোড় ঘুরেই তাঁর সামনে উদয় হলেন দুটি তরুণ-তরুণী—শ্রীমান্-শ্রীমতী। ছেলেটি চুঙ্গপ্যাণ্ট, বুশ-সার্ট, চোখে গগল্‌স পরা সিনেমার হিরোর মত চেহারা নিয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠেছিলেন, বড়দা বলতে পারেন, সরপুরা গার্লস হাই স্কুল যাওয়ার পথ কি এটা? উনি অবশ্য ওদের পথের গাইড হয়ে ওদের যথাস্থানে এনেছিলেন, কিন্তু ওদের সব পরিচয় না নিয়েও ছাড়েন নি।

ছেলেটির মত মেয়েটিরও সাজ-সজ্জার চটক ছিল ঠিক সিনেমার হিরোইনের মত। মাথায় চুড়োকরা চুল বাঁধা, রুজ-পাউডার বুলানো বরাননে যথারীতি নীল গগল্‌সের তলায় লিপষ্টিক রঞ্জিত রক্তাধর দুটি। আর তারই ফাঁকে কচি দাড়িম্বদানার মত দু-সারি দাঁতের মিষ্টি হাসি। একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন উনি, পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোত্থেকে আসছেন আপনারা? সরপুরা গার্লস হাই স্কুলের খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

ছেলেটি বলেছিল, ওখানকার গার্লস স্কুলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসছি। আজ জয়েন করার কথা।

—আর আপনি?

মেয়েটি ফিক্ করে হেসে উঠল। মেয়েটির তরফে ছেলেটির কাছ থেকে জবাবটি এল, ঐ একই ব্যাপার ওর।

ছেলেটি যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, হাতের ঘড়ির কাঁটাটা দ্রুত টিক্‌টিক্ করে চলেছে, ওদের মনকেও ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল নতুন অজানা কাজের ঠিকানায়। ছেলেটি বললে, তাহলে বড়দা, এই রাস্তা ধরে যাব ত?

যশেশ্বরবাবু বলেছিলেন, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজ যে-কোন সময়ে জয়েন করলেই হল। আচ্ছা আপনার নাম তাহলে দিগন্তবিজয় বিশী। আর আপনার নাম ত সুচনা শীল?

ওদের আকাশ থেকে পড়ার অবস্থাটা দেখে মজাই পাচ্ছিলেন যশেশ্বরবাবু। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা চরম ট্রাম্প্‌ হেনে বলেছিলেন, আমি সেই স্কুলের সেক্রেটারী কি না? আর ঐ নতুন নামগুলো দেখে তার মালিকদের সশরীরে দেখবার লোভটা হল বড়। তাই আর সব ক্যাণ্ডিডেটদের বাতিল করে, আপনাদের নিয়োগপত্র-গুলো পাঠিয়ে দিলাম।

মাপ চাওয়ার ভঙ্গীতে ওরা হাত জোড় করে ওঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল, ওঁর প্রাণখোলা আলাপে খুশিতে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। যশেশ্বরবাবু ওদের ডেকে এনে নিজের বাড়ীতে তুলেছিলেন, খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলেন, এই বিশ মিনিট আগে পর্যন্ত ওরা পরস্পরের অপরিচিত ছিল। হাওড়া স্টেশনের ট্রেনের একই কামরায় দুজনে উঠেছিল, তারপর একই ট্যাক্সীতে করে নদী পর্যন্ত এসেছিল, একই খেয়ায় পার হয়ে একই বাসে তালতলার মোড় পর্যন্ত কেউ কারোর হাঁড়ির খবর না নিয়ে নেমেছে। সরপুরা গার্লস্‌স্কুলের নাম একে অপরের মুখে শুনার পরেই পরস্পর পরিচিত হয়ে গাঁয়ে অচেনা মেঠো পথের রেখা ধরে চলা শুরু করেছিল।

এই সম্পূর্ণ নাটকীয় সূচনার উপসংহার কিন্তু বিয়োগান্তক কিংবা মিলনান্তক কোনটাই হল না। প্রতি-মুহূর্তে কিন্তু যশেশ্বরবাবু আশা করেছিলেন, পদার্থবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ ছাপমারা একটি তরুণ, কলাবিভাগের স্নাতকোত্তমা একটি তরুণীর সঙ্গে না জানি কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসে। আকাশে বাতাসে এত রঙ আর সুর ছড়ান, তা কি আর তাদের প্রাণে কোন ছবি বা গানের মায়াজাল বুনবে না?

হেড মিস্ট্রেস সুচনা শীলের পিছনে দিগন্তবিজয় বিশী এসে যখন দাঁড়াত, তখন মনে হ'ত দ্বীপবাসিনী সম্রাজ্ঞীর পিছনে তাঁর প্রেমপ্রার্থী কোন ডিউক এসে দাঁড়িয়েছেন, ছায়াছবির নায়িকার পিছনে যেন কোন সুদর্শন নায়ক নাম-ভূমিকায় নেমেছেন, হোক মিথ্যে তবুও অভিনয়ে বিশ্বাসের সত্য মিশে একটা আনন্দের সুখাবেশ বয়ে আনে না কি দর্শক-শ্রোতাদের মনে?

কিন্তু ওদের জীবনে সে-সব কিছুই ঘটল না। বাস্তবিক এমন নিছক নিরামিষ জীবনও দেখেননি এর আগে কোন তরুণ-তরুণীর। পরে ভেবে দেখেছেন, এ যুগের জীবনে শুধু ধূসর রঙের ছায়া, শুকনো মাটির উপর বয়ে যাওয়া পশ্চিম-উত্তরের ঝলসান উষ্ণ হাওয়া, সেখানে বাগিচার মুকুল শুকিয়ে যায়, বসন্তদূতের কণ্ঠে পিপাসায় সরসতাটুকু শুষে নেয়, আকাশমাটির বিশাল ক্যান্‌ভ্যাসে শুধু জ্বালার রঙ ধরা।

দিগন্তকে তিনি চুপি চুপি জিগেস করছিলেন, দিগন্ত, তুমি শহর ছেড়ে এখানে এলে কেন? তোমার এই কোয়ালিফিকেশন, স্কুলমাষ্টারির কাজ তোমার দুহাত ভরে কিছু আর ত তুলে দেবে না? অন্য কিছু আছে নাকি ব্যাপার ট্যাপার?

দিগন্ত তার প্রশস্ত ললাটে জোড়া-ভুরু দুখানার খিলান তৈরী করে বিস্ময়ে বলেছিল, ব্যাপার ট্যাপার?

—আরে না না, কোন রাজনীতিঘটিত ব্যাপারের কথা নয়, সে-সবের ক্লিন রেকর্ড আছে আমার কাছে। আমি বলছি হৃদয়ঘটিত। এই ধর, কোন মেয়েকে

ভালবেসে ফেলেছ, অথচ তার মনের থৈ খুঁজে পাচ্ছ না, রাগ করে চলে এলে তার মনে শূন্যতাবোধ, এই একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগাচ্ছে।—

যশেশ্বরবাবুর কথা শুনে দিগন্ত খুব একচোট হেসে নিল, তারপর মুখখানা করুণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, এ স্বপ্নবিলাস আপনাদের যুগে ঘটত হয়ত, কিন্তু আজকের দিনে যেখানে নিছক পেটের ধাঁধায় হেন কর্ম নাই যা করতে গররাজি হচ্ছে ছেলেরা, সেখানে তারা ভালবাসবে কখন, বিয়ে করবে কখন, একগাদা ছেলেমেয়ের জনক হয়ে পৃথিবীর ভার বাড়াবে কখন? নেহাৎ এ চাকুরীটা পেয়ে গেলাম, নাহলে কোন নরকের দরজায় পৌঁছে যেতুম কে জানে?

হেডমিস্ট্রেস সুচনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একদিন ঐরকম একটা প্রশ্ন ছুঁড়েদিলেন তিনি।

সত্যি ভাই, তোমরা আসতে স্কুলের তোল পাল্টাচ্ছে। ছাত্রীসংখ্যা বেশ বেড়েছে, রেজাল্টও ভাল হচ্ছে, বিল্ডিংটার সামনে বুগেনভিলিয়ার ঝাড় বসিয়ে এর জেল্লা ফিরিয়ে এনেছ, কিন্তু নিজের দিকটা চিরকালই এমনি ফাঁকা রয়ে যাবে নাকি?

সুচনা উজ্জল দুটো চোখ মেলে রেখে আরও পরিষ্কার ভাবে জানতে চেয়েছিল। যশেশ্বরবাবু তখন বলেছিলেন, আমার স্কুলের উন্নতি হয় হোক, কিন্তু তার জন্য কেউ চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে, এমন কড়া আইন ত আমি পাস করিনি? বলি, এই বেলাবেলি একটা বরটর জুটিয়ে নাও।

খিল্‌খিল্ করে জলতরঙ্গের আওয়াজ তুলে সুচনা ঠাট্টা করে বলেছিল, আপনি যদি জুটিয়ে দেন ত রাজী আছি। নিজেদের শক্তিতে ত ফেল্ মেরে বসে আছি।

ঠাট্টার সুরে ও যাই বলুক, জীবনের এই জরুরী দিকটা ওরা পাশ কাটিয়ে যেতে পছন্দ করছে, এটা বুঝে নিয়েছিলেন।

কিন্তু কেন?—এখন মাইনে-পত্র ওরা যা পায়, তাতে সংসার-জীবন অনায়াসে গড়ে তোলা যায়। বিমলা, ঝর্ণা, সুনীতা, গীতা, এরা ত স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে বেশ আছে। কিংবা যে দু-একজন পুরণো মেল্ টিচার তাঁর স্কুলে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীর মেলায় ত বেশ জাঁক করে বসে আছেন। অভাব-অভিযোগ নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে নিয়ে ত বিধাতাপুরুষের কাছে মামলা দায়ের করে নিজের উপর শোধ তুলতে চায় নি এরা কেউ?

তবে? পরে প্রশ্নের শলাকাটি ওদের অন্তরের গভীরে চালিয়ে যে মহামূল্যবান্ তত্ত্বটি আহরণ করেছিলেন যশেশ্বরবাবু তা হ'ল, শ্রীমতী সুচনা দেবীর একটি স্বপ্ন আছে, সে স্বপ্নটি যতদিন না সার্থক হচ্ছে, ততদিন তিনি কুমারীত্বকে রক্ষা করে চলবেন। শ্রীমান্ দিগন্তের একটা এ্যাম্বিশন্ আছে, সেটি চরিতার্থ না হলে, কৌমার্যের ব্রতকে কিছুতেই ভঙ্গ করবেন না।

স্বপ্ন আর এ্যাম্বিশন্ আর কি? মহানগরীর উপকণ্ঠে বা শহর-তলীতে একটা সাজান সুন্দর বাড়ী, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা-পয়সা, আর, তেমন যদি বরাত হয়, ত এখানে ওখানে টুর দেওয়ার জন্য একটা কার। কিন্তু এ-যে বড়-মানুষী, ছেলে ঠেঙিয়ে কোনদিনই ও বস্তুর নাগাল ত পাবে না ওরা? পাবে না জেনেও, শ্রীমতী সুচনা দেবী সাজ-সজ্জা আসবাব উপকরণে বড়মানুষীর তপস্যায় নিজেকে ক্ষয় করে চলেছেন, আর শ্রীমান্ দিগন্তও নিজেকে একই ভাবে ক্ষয় করতে গিয়ে শেষকালে যে কাণ্ড করে বসল, সেটিকে ক্ষয় না বলে বলা যায় অবক্ষয়।

এক ছুটিতে বাড়ী গিয়ে ইস্তফাপত্রের সঙ্গে একটি রঙীন প্রজাপতি মার্কা নিমন্ত্রণ-চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তাঁর গেঁয়ো কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যশেশ্বরবাবু আলো, সানাই, উলুধ্বনি, শাঁখ, পানীয়, আতর, আসবাব, শহুরে হুল্লোড়ের মাঝে কি দেখলেন রে বাবা?

শুভ্ররজতনিভ হিমাদ্রির কোলে মৌসুমীমেঘের কালোঘটা? না, অত কাব্য করে বললে আবার মনটা

নরম হয়ে যাবে, শিবের গায়ে সেঁটে-যাওয়া কালো-পেত্নী? হ্যাঁ, ঠিক তাই দেখে এসেছিলেন তিনি। আদর আপ্যায়ন?—গাঁয়ের মানুষ বলে হয়ত সেটুকু বেশী-মাত্রায় জুটেছিল, কিন্তু সেই একরাত্রি থেকে শরীরের অজুহাতে কেটে পড়েছিলেন। শুনে এসেছিলেন, বিপুল ব্যবসায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এক শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে লাভ করে দিগন্তের সব এ্যাম্বিশনই চরিতার্থ হয়েছিল।

কিন্তু সুচনা দেবীর স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে কোন কালোমাণিক লক্ষপতি যক্ষের আবির্ভাব আর হল না। সুতরাং তার নির্জন কোয়ার্টার্সে, জানালার পাশে, পুষ্প-ভারনত মাধবীলতার দোল-খাওয়া দেখে তাঁর জীবনের এক-একটা বসন্ত দীর্ঘশ্বাসে চলে যায়।

বিনোদিনীর ছেলে বসন্ত, হ্যাঁ, নামটা যশেশ্বরবাবুর এতক্ষণে মনে পড়ে, ঠিক ওই একই স্বপ্ন দেখছে হয়ত। পাওয়ার শক্তিকে যদি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়ে যায় ত সেখানে গোঁজামিল দিয়ে পেতে চাওয়া হয় নিজেকে ঠকান, সাধুভাষায় আত্মপ্রবঞ্চনা। বসন্ত যতই নিজেকে সাজ-পোশাকে ঢাকুক, টেরোলিন, ট্রাউজার্স, টেরী আর রিস্ট-ওয়াচে নিজের অঙ্গশোভা বাড়াক,—ও কিছুতেই আর বিনোদিনীর ছেলে ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না।

বিনোদিনী তাঁরই বাড়ীর উত্তর পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় ঘর বেঁধেছিল। অকাল-বিধবা আর তার চার বছরের ছেলে বসন্তকে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সদাশিব যশেশ্বরবাবু ওদের বাঁচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলে-টিরও পড়াশুনার ভার নিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পড়াশুনা ওর বেশী এগোয় নি। ক্লাস সেভেনের বিদ্যা শেষ না হতে ও একবস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে পালায়। হতভাগ্য ভাগ্যান্বেষীর সে এক নির্মম পলায়ন। নির্মম এই জন্যই যে মায়ের কথা একবারও ভাবে নি। কেঁদে কেঁদে ওর মার চোখে অন্ধকার নামল। দৃষ্টিহীনার লাঠি ঠুক্‌ঠুক্‌ করে কী আশ্বাসে আসা, আর বুকভাঙ্গা হতাশ্বাসে ফিরে যাওয়া,—সে ছবি এখনও মনে পড়ে। শেষে একরাত্রে ঘাটে পা পিছলে জলে ডুবে সব আশা-নিরাশার ওপারে চলে যায় হতভাগিনী। বসন্ত কি মায়ের খোঁজ নিয়েছিল একটিবারও? যদি নিত, মায়ের এই অপঘাত মৃত্যুর অপবাদ ছায়ার মত ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত না।—আত্মোন্নতির এই সর্বনাশা আত্মা-হুতি বসন্তকে টেরিলিন, টেরিশার্ট, ট্রাউজারের অরণ্যে আরণ্যক করে তুলত না।

আর একা বসন্তকেই বা বিচারের কাঠগড়ায় এনে হাজির করবেন কেন, এই যুগটাই যেন প্রকাণ্ড হাঁ মেলে সবাইকে গ্রাস করতে চাইছে। বসন্ত, দিগন্ত, সুচনা কারুর যেন ওর হাতে নিষ্কৃতি নেই। জাতির ভাগ্যকে নিয়ে যারা অসম্ভব জুয়াখেলায় মেতে উঠেছেন, তাঁদের পঁচিশ বছরের শ্রম-যজ্ঞে কুবেরের ভাণ্ডার খালি করেও আপামর সাধারণের ভাঙা কপাল আজও জোড়া লাগাতে পারেন নি। সেখানেও যেন বিরাট মুখব্যাদান বিস্তৃত করে আছে এই চটকদার প্রগতির যুগটা। তাই টেরিকট, টেরিলিন, ট্রান্জিস্টারের সৌখিনতাটুকু মনের মধ্যে ঠেসে দিয়ে, সবাইকে অসম্ভবের স্বপ্নের নেশায় মাতাল করে রেখেছে সে। তাই, আজ আর পথচলার খাট পায়ের সঙ্গে লম্বা পায়ের তাল ঠুকে চলাটা কিছুতেই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে না। ভাবতে ভাবতে পথের বাকীটুকু পেরিয়ে এলেন যশেশ্বরবাবু।

চিরচেনা পথের উপর তাঁর অভ্যস্ত পরিক্রমা আজ অনেক কিছুই শিখাল তাঁকে। বলতে গেলে এই তাঁর নতুন দিগ্‌-দর্শন।

(৩২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ)

this rule when he turned down a professorship at Heidelburg and (unlike Hegel) decided to earn his freedom. The only defense a minority has is passive resistance."

পত্র দুখানি পড়লে মনে হয় আইনষ্টাইন স্বেচ্ছায় পরমাণু বোমা তৈরি করার কাজে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নি। যেদেশে তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেলেন, সেখানকার ভালমন্দের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়েছিল; কাজেই ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁকে এবিষয়ে সাহায্য করতে হয়েছিল। তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈরি হলে সেটা জার্মানীর ওপর পড়বে, জাপানে নয় এটাই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। জাপানে এই বোমা ফেলার কোন পূর্বাভাষ তাঁকে দেওয়া হয় নি। অনেক পরে যখন জানতে পারলেন, বোমা জাপানে ফেলা হয়েছে তখন বেশ মনোবেদনা পেয়েছিলেন; এ কথাও একজন বলেছেন।

বোমা তৈরিতে সাহায্য করার জন্যে আইনষ্টাইনের দুঃখ বা লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। তিনি সাহায্য না করলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না; কারণ এই সময় প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই আমেরিকায় এসে ভীড় জমিয়ে ছিলেন। তাঁরা এ বোমা বানাতে পারতেন। তবে হয়ত কিছু দেরি হত। ১৯৪৬ সালে সেটা হয়ত তৈরি হত না, হত কিছু পরে এবং সে বোমা জাপানে না পড়ে পড়ত উত্তর কোরিয়ায়। জাপানে যে বোমা পড়েছিল আজকের দিনের পারমাণবিক বোমার তুলনায় সেটা ছিল নিতান্ত খেলা ঘরের বোমা। আনবিক বোমা আজ আর গুপ্ত তথ্য নয়। পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি এ বোমার এখনই অধিকারী। পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ইটালি ও ইজরাইল প্রভৃতি সব রাষ্ট্রই এ বোমা তৈরি করতে পারে এবং হয়ত অচিরে করবে। কাজেই আজ সারা বিশ্ব কম্প্র বক্ষে নম্র নেত্রপাতে মরণের সেই বিভীষিকাময় দিনের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে। আজ সত্যিই—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,

ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।"

আপাত বিরোধী মনোভাব দেখা গেলেও আইনষ্টাইন ছিলেন সত্যকারের মানবদরদী সাধক ও প্রেমিক। তাঁর উদ্দেশ্যে বলা যায়,—

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস।"

আজ বিশ্ববাসীর হৃদয় ভরা থাক তোমার স্মৃতিসুধায়। তোমারে—জানাই প্রণাম। শেষ জীবনে যদি দুঃখ পেয়ে থাকো, তাহলে আমাদের কবির কাছেই তোমায় সান্ত্বনা মিলবে,—"মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত; তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে; মহত্তেরই গৌরব দুঃখ।" আজ প্রণাম জানাই আনবিক বিজ্ঞানসংঘের এই প্রাণপুরুষকে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী'

শৈলেনকুমার দত্ত

ইংরেজি সাহিত্যে ব্রাউনিং কবিদম্পতি যেমন খ্যাতি লাভ করেছিলেন, বংলা দেশে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী কবি-দম্পতিরও সেরূপ খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করা উচিত ছিল। অথচ যেকোন কারণেই হোক তাঁরা তা পারেননি। অক্ষয়চন্দ্র উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি না করলেও, উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ভাবে-ভঙ্গিতে মনে-মননে রূপে-রসে গন্ধে-বর্ণে কবিত্বে ভরপুর ছিলেন। ব্যক্তি-জীবনে তিনি ঢক্কা-নিনাদ পছন্দ করতেন না; কিছুটা মজলিশী এবং অলস প্রকৃতির ছিলেন—তাঁর কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথে এগুলোই হয়তো দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাই আজ অক্ষয়চন্দ্র বিস্মৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাতায় তিনি অমর হয়ে আছেন। এটাও হয়তো মহাকালের একটা নির্মম রসিকতা!

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাব্য বিচারে তাঁর কবি-প্রকৃতির কিছু উদাহরণ দিলে হয়তো তাঁকে স্পষ্ট করে চেনা যাবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন 'আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল।' এই অসামান্য উদারতা নিয়েই তিনি ঢিলে-ঢালা ক্ষুদ্রাকৃতি অবয়বটি নিয়েও ঠাকুরবাড়ির রথী মহারথীদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাননি। তিনি ঠাকুর-বাড়িতে অভিনয় করতেন, পার্ট ভুলে গেলে স্বচ্ছন্দে নিজেই জোগান দিতেন। গান-বাজনার চর্চাও ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেহালা বাজালে একাত্ম হয়ে তিনি তবলা সঙ্গত করছেন—কারও কারও স্মৃতিকথায় এ চিত্রও আছে। যেখানে বসতেন অবিরাম ধূমোদ্গারিণ করতেন, পোড়া দেশলাই-এর কাঠি এবং ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরোয় সে জায়গাটা ভরে যেত; কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি এই মানুষটির অন্তরে ছিল সূক্ষ্মরসের অফুরন্ত ঝর্ণাধারা! এই প্রকৃতির মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের কবি-প্রকৃতিরও স্বাভাবিক ভিত্তিমূলটি প্রোথিত।

অক্ষয়চন্দ্র সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে লিখেছেন—'তিনি সত্যই সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন—যশের কাঙাল ছিলেন না।' কিন্তু তিনি যশের কাঙাল না হলেও যশ নিজেই কাঙাল হয়েছিল তাঁর জন্যে। তিনি উদাসিনী কাব্য লিখেই যশ পেয়ে ছিলেন—হয়তো সাধারণ পাঠকের কাছ পর্যন্ত সে-যশ পৌছায় নি, কিন্তু সেকালের অন্যান্য সব স্রষ্টাই 'উদাসিনী'র কাব্য-মাধুর্যে মোহিত হয়েছিলেন। "জীবনস্মৃতি"র পাতায় সে-যশ চিরকালের অক্ষয় যশ হয়ে আছে—"উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১) যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।"

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০—১৮৯৮) মাত্র তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন—উদাসিনী (১৮৭৪), সাগরসঙ্গমে (১৮৮১) এবং ভারত-গাথা (১৮৯৫)। একজন কবির কাব্যকৃতির পূর্ণ মূল্যায়ণে এ রচনাই যথেষ্ট, সেদিক থেকে আক্ষেপের কোন কারণ নেই। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র নিজে যত বড় কবি ছিলেন, তাঁর কাব্য তাঁকে ততবড় কবি দেখাতে পারেনি, এটাই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হতে পারে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক-এর (১ম-খণ্ড) একস্থানে লিখেছেন—"ইঁহারই কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি মুরের Irish Melodies ও বালক কবি চ্যাটার্টনের সম্বন্ধে তথ্য অবগত হন। ইঁহারই রচিত 'উদাসিনী' কাব্য সে যুগের গাথা কাব্যের রোমান্টিসিজম্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঐ কাব্য হইতে সবিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রথম কাব্য বনফুল হইতেই জানা যায়।"

'উদাসিনী' দশটি সর্গে বিধৃত একটি মিলনাত্মক প্রণয়-গাথা। স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি, নাটকীয় আবেগ এবং সাবলীল কাব্যসুষমায় কাব্যগ্রন্থখানি

বিশেষ ভাবে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই গাথার নায়ক-নায়িকা হল সুরেন্দ্র ও সরলা।

প্রথম সর্গে বনপথে এক পান্থ বামাকণ্ঠের কান্না শুনতে পেয়ে বনদেবীকে আকুল ভাবে জিজ্ঞেস করছে—

এ কি গো বিষম কাণ্ড বনের ভিতরে।
ওই যে বিবশা বামা, হের গো নয়নে,
চিতানল জ্বেলে, দেখি। রোদিছে সঘনে
কে রে বরাঙ্গনা?

কাব্য-পাঠক এই দৃশ্য থেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই পান্থই কৌতূহল নিবৃত্ত করে জানায় যে ঐ বামাই হল সরলা।

সরলা বনদেবীকে তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে সে এক 'সহায়সম্পদহীন জনকে'র দুহিতা। সে মাতৃহীনা। চতুর্দশ বছর বয়সে সে একদিন ভিক্ষা করে ফেরার সময় প্রবল বানের কবলে পড়ে। সে তখনি জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে এক যুবক তাকে বিপমুক্ত করেছে—

ক্রমশঃ চেতনা পেয়ে, চকিতে দেখিনু চেয়ে,
তরুণ পুরুষ-অঙ্কে রয়েছি শয়ান।

এই তরুণ পুরুষই হল সুরেন্দ্র। সচকিতা সরলা অপ্রস্তুত হয়ে ওঠার আগে সুরেন্দ্র আকুল ভাবে তার মনোভাব জানায়—

এ কি লজ্জা হরিণাক্ষি! শশাঙ্কে করিয়া সাক্ষী,
স্কন্ধে মম মাথা তব রাখ লো ললনে।

সেই নির্জন বনে তাদের প্রথম দর্শনেই প্রেম জাগে। অতঃপর ভিখারী পিতার ভিখারী নন্দিনী সরলা সুরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফেরে। কিন্তু সেখানেও নাটকীয়তা আছে। প্রেম তো সুলভ নয়, বিরহের অঙ্গারে তাকে যাচাই করতে হয়। তাই অনিবার্য কারণেই সরলার পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর সুরেন্দ্রর অন্তর্ধান হয়।

সুরেন্দ্রও আসি বলে কোথায় যে গেল চলে
কিছু তার নাহিক সন্ধান।

(৩য় সর্গ)

একাকী সরলা আর কি করে! তখন তার মনে পড়ে যায় মৃত্যুর আগে প্রদত্ত পিতৃ-আদেশ। একটি চিঠি নিয়ে তাকে দেখা করতে হবে মহাতেজা রাজা সুপ্রকাশের সঙ্গে। সেখানে চিঠি নিয়ে গেলে যথেষ্ট সমাদর পায় সরলা। নিরাপদ আশ্রয়ও মেলে সেই সঙ্গে। কিন্তু সুরেন্দ্র-বিরহে সে কাতর। তাই সুরেন্দ্র প্রাণা সরলা 'একদা যামিনী যোগে' বনে পালায়। তার এই সময়ে একাকিনী ঘোরবার বিবরণটি কবি অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন—

হয়ে উন্মাদিনী প্রায়, উদাসে অবশ কায়,
কেলিবনে ভ্রমি একাকিনী।
পরিমল মাখি গায়, মৃদু-মন্দ বহে বায়,
নাচাইয়া ক্রীড়া কল্লোলিনী॥
আঁচল লাগিয়ে গায়, বারবার ঝরে যায়,
গোলাপের শিশির আসার।
কামিনীর পাপড়িগুলি, নিঃশব্দে পড়িছে খুলি:
উড়ে যায় অলি চারি ধার॥

এই রাজপুরীতে থাকাকালীন তার রাজপুত্র-বধূ হবারও অনেক প্রস্তাব আসে। কিন্তু সুরেন্দ্র-সর্বস্ব সরলা সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুরেন্দ্রকে না পেলে সে 'সিন্ধুতীরে রহিবে শয়ান।' প্রনয়ের অপমান সে কোন ভাবেই সহ্য করবে না। তার মানসিক চিত্রটি কবির তুলিতে অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে—

তবুও থাকিতে প্রাণ, প্রণয়ের অপমান,
কখন হবে না সুলক্ষণে।
যার প্রেমে অনুরাগী, সর্বত্যাগী যার লাগি,
বাঁচিব মরিব তারি সনে॥
মনসিজ জিনি ঠাম, অলকা ঐশ্বর্য ধাম,
প্রণয়ের কি ধার তা ধারে।
স্বাধীন প্রণয়ী মন, যার প্রেমে নিমগন,
পারে কি তাহারে ছলিবারে॥

ইতিমধ্যে কুমারের সঙ্গে আবার বিয়ের আয়োজন হয়, কিন্তু সে অনড়, অটল। এদিকে এ সংবাদ পেয়ে সুরেন্দ্র অশোক বৃক্ষের গায় একটি লিপি খোদিত করে। অভিমান করে—সে জানায় তার সিদ্ধান্ত।

প্রমাদ ঘটেছে মম সরলা প্রণয়ে।

তাই দুঃখভরে সে বিদায় প্রার্থনা করে সরলার কাছে—

যাই তবে প্রেয়সি রে। জন্মের মতন
ঘুরিব অদৃষ্টচক্রে সমস্ত ভুবন।
সোহাগের পতি লয়ে, থাক তুমি সুখী হয়ে।
অভাগারে একেবারে হও বিস্মরণ॥

সরলা এ লিপি পাঠ করে অধীর হয়ে ওঠে। সেও তাই স্থির করে –

একান্তই যাব আজ সুরেন্দ্র সন্ধানে।
ধবল অচল হতে সিংহল অবধি
উল্লঙ্ঘি অরণ্য বন গিরি নদ নদী
ভ্রমিব যোগিনী বেশে ছাড়িব না আশ,
হোক যদি ইথে হয় শরীর বিনাশ।

উন্মাদিনী সরলা বনে প্রবেশ করে। বনের ভয়ঙ্করতাও কবি দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন—

কোথাও গরজে গর্বে শার্দ্দূল সকল,
কোথাও বা রোষমত্ত মহিষের দল
কোথাও গণ্ডারকুল বিলোড়িছে সর,
কোথাও ফুঁসিছে কোপে ক্রুর অজাগর।

কিন্তু 'কোমল শিরীষ ফুল কমনীয় কায়' হলেও সরলা নির্ভয়। সুরেন্দ্র সন্ধানে যাচ্ছে সে, কিসের ভয়। 'সমুদ্রে শয়ান আমি শিশিরে কি ভয়?'

একাকিনী সরলার সঙ্গিনী হন বনদেবী স্বয়ং। তিনি সরলাকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে সুরেন্দ্র সন্ধানে বেরোন। তারপর ভূধরশিখরে গিয়ে সুরেন্দ্রর সাক্ষাৎ মেলে। সেখানেই সরলার সঙ্গে মিলন এবং বিবাহ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাবার চিঠি মারফৎ সরলা যে অনাথা দুঃখিনী নয় তাও জানা যায়।

মিলনের সেই দৃশ্যটি বড় মনোরম—

হের হে পথিকবর। যেখানে ভুধর-পর,
ভ্রমিছে সুরেন্দ্র সনে সরলা যুবতী।
অধরে মধুর হাসি, চমকে চপলা রাশি,
উথলিছে হৃদে হৃদে প্রণয় উৎসব,
পূর্বের দুঃখের কথা, দারুণ বিরহব্যথা,
মিলন মহান্ সুখে ভুলেছে সে সব॥

বিরহ মিলনের এই সাধারণ কাহিনীটি কবির বর্ণনা-গুণে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনায় গীতি-কবিতার বাঙ্ময়তা এবং বিষাদের সুরমূর্ছনা অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে এক-একটি অংশ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তৃতীয় সর্গের একটি অংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়—

যে ভেলা নির্ভর ক'রে, দুস্তর ভব সাগরে,
জননী গো দিয়েছি সাঁতার—।
সহসা ভাসায়ে জলে, অতল জলধি-তলে,
মগ্ন হল অদৃষ্টে আমার॥
চারিদিক শূন্যাকার, ধূ ধূ করে পারাপার,
হতাশে হতাশ প্রাণ মন।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, কল্পনা শক্রতা করি,
বিভীষিকা করে প্রদর্শন॥

কিংবা নবম সর্গের একটি ছত্র বর্ণনা-ভঙ্গিতে অনবদ্য—

হৃদের রুধির সম, স্বর্ণ কৌটা ছিল মম,
সরলার শান্ত-মূর্তি ভিতরে তাহার।
সম্পত্তি আছিল আর বৃক্ষের বল্কল,
সম্পত্তি, সরলাময় জীবন-সম্বল।

অক্ষয়-চন্দ্রের এই ঘন পিনদ্ধ বর্ণনা যে-কোন কবির ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে। তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি লাইন প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হবারও যোগ্য—

'যৌবনে জলন্ত জ্বালা দগ্ধ দিবারাতি।"
"বার্দ্ধক্যে বিবেক বুদ্ধি সকলি বিলয়।"
"সমুদ্রে শয়ান আমি শিশিরে কি ভয়।"

ইত্যাদি।

এ হেন কাব্য 'উদাসিনী' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে গর্ব করারও বিষয় আছে—যোগ্য কবির যোগ্য সম্মান বর্ষিত হয়েছে বিশ্বকবির হাত থেকে। আত্মনিমগ্ন উদাস কবির 'উদাসিনী'র প্রতি বাংলা কাব্যপাঠকের এই আপাত-ঔদাসীন্যই হয়তো যোগ্যতর সম্মান-দক্ষিণা।

অনাহূত

সুবোধ বসু

এরোড্রোম থেকে হোটেলে পৌঁছুবার পনেরো মিনিটের মধ্যেই অবনীশ সেন পুরানো বন্ধু হৃষীকেশ চাটুয্যের ফোন পেলেন। 'আজ সকালে মাত্র খবর পেয়েছি' তুমি অফিসিয়াল ট্যুরে দেশে আসছ,' তারের ওপার থেকে চাটুয্যের সুপরিচিত কণ্ঠ ধ্বনিত হলো। 'দপ্তরের একাধিক ডিপার্টমেন্টে টেলিফোন করে' তোমার সাময়িক আস্তানার খবর সংগ্রহ করেছি; এখানেও আমার থার্ড অ্যাটেম্প্‌ট্‌! আজ খুকীর বিয়ে। হ্যাঁ, রুবী! সাড়ে তিন বছরে আরও বড় হয়েছে বৈকি। তোমার আসা চাই। তখন কথা হবে সব। তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তাড়াতাড়ি এসো......'

ন্যুয়র্ক থেকে কলকাতা, পাড়িটা কম নয়। কিন্তু দেশে ফেরার আনন্দ আরও বেশি। বেশ তাড়াতাড়িই তৈরী হয়ে নিলেন অবনীশ। ভারতসরকারের দফতর থেকে ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌এ স্থানান্তর তিন বছরেরও আগের ঘটনা; এর মধ্যে আর দেশে ফেরেন নি। পনেরো দিনের ডেপুটেশনে এসে প্রথমেই বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে ডাক পেয়ে ভালো লাগল। সরকারী ব্যবস্থায় ব্যবহারের জন্য গাড়ী মোতায়েনই ছিল। জরুরী ক'টা কাজ সেরে বন্ধুর বাড়ীতে হাজির হবেন, স্থির করলেন।

গড়িয়াহাট রোডের ওপর হৃষীকেশ চাটুয্যের বাড়ী। প্রায় পোয়া মাইল রাস্তার দুধারের ফুটপাথের গা ঘেঁষে মোটর দাঁড়িয়ে গেছে। সামনের লন আর গাড়ীবারান্দায় লোক গিসগিস করছে। রঙিন বিচিত্র আলোর ফুলে সেজে রয়েছে গাছগুলি, সানাই বাজছে উদাস সুরে।

এই তো বাংলাদেশ, এই তো ভারতবর্ষ! মিলনের এমন উৎসব আর কোথায়?—গাড়ী থেকে নামতে নামতে ভাবতে লাগলেন অবনীশ সেন। বিয়েতে আড়ম্বর না হলে তা মনে গভীর সম্ভ্রম ও নিষ্ঠা জাগাবে কি করে? ফটকের কাছে অভ্যর্থনারত কিশোরীদের কাছ থেকে ফুলের তোড়া গ্রহণ করে সুখে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'এই যে সেনসাহেব। মার্কিন মুলুক থেকে কবে ফেরা হলো?'

'আরে, চৌধুরী!' পাশে তাকিয়ে বললেন অবনীশ। 'মাত্র ঘণ্টা দু'য়েক আগে মাত্র পৌঁছেছি। পক্ষকালের মেয়াদে। তারপর আপনাদের খবর সব ভালো? কাগজে দেখেছিলাম, হাইকোর্টের জজিয়তী প্রত্যাখ্যান করছেন। খুব আর্থিক ক্ষতি হয়, তাই না?' হাল্কা বন্ধুত্বের সুর।

'কিছু তারতম্য করে না,' চৌধুরীসাহেব হৃদ্যতার সঙ্গে কিন্তু গম্ভীর আওয়াজে জবাব দিলেন। 'ইনকমট্যাক্স ইস্‌ এ মাইটি লেভেলার!'

'হৃষীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'এখনও হয়নি।'

'আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। কর্মকর্তার দেখা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।' বলে সহাস্য মুখে গাড়ী-বারান্দার দিকে এগোলেন অবনীশ। যেতে যেতে আরও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, ভদ্রতা বিনিময় হলো। হৃষীকেশ নজরে পড়ল না। অবনীশ গাড়ী-বারান্দার সিঁড়ি অতিক্রম করে সামনের ঘরে ঢুকে পড়লেন। এ বাড়ীর সঙ্গে হৃদ্যতা তাঁর বহুকালের; কর্তাকে ডেকে দেবার জন্য কাউকে বলার দরকার নেই।

উপরে ওঠবার সিঁড়ির পাশে আরেকটি পুরাতন চেনা

মুখ নজরে পড়ল। রেলিং-এর একপাশে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গৃহস্বামীর কন্যা রুবীর গোয়ানিজ পিয়ানো-শিক্ষক ফনসেকা। ডাকসাইটে গুণী বাদক এই ফনসেকা; তাঁর কাছে পিয়ানো শিখবার জন্ম অভিজাত মহলের মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি; শিক্ষক হিসেবে তাঁকে পেতে হলে অনেক সাধ্যসাধনা ও অপেক্ষা করতে হয়। হৃষীকেশের একমাত্র মেয়ে রুবী যে পিয়ানো বাজনায় এতটা নাম করেছে, অবনীশ তার কারণ জানেন।

'হ্যালো ফনসেকা, গুড ইভনিং। হাউ ডু ইউ ডু?' এই পরিচিত ফনসেকার উদ্দেশে হেঁকে বললেন অবনীশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে।

ফনসেকা সবিস্ময়ে উপরে তাকাল। পরিচয় স্বীকৃতির স্মিতহাস্যের রেখা তার মুখে ভেসে উঠল। মুখে কিছু না বলে 'নড' করে' ভিড় ও হট্টগোলের উপযোগী জবাব দিল সে।

একটুও বদলায়নি, মনে মনে বললেন অবনীশ। সেই চকচকে টাক, লম্বা জুলপি, গলায় কালো 'বো' বাঁধা, কালো রঙের ডিনার জ্যাকেট, পায়ে ছুঁচলো-মুখ কালো জুতো।

'আরে অবনীশ! এসো এসো। এতক্ষণ তোমার জন্ম নীচে অপেক্ষা করছিলাম।' কাজের বাড়ীর নির্দেশপ্রার্থী কর্মীদের ভিড়ের মধ্য থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে হৃষীকেশ বিদেশাগত প্রিয় বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'খুকীর বিয়ের দিন তুমিও যে হাজির হতে পেরেছ, এটা আমার পরম আনন্দের ব্যাপার।...চলো, ওকে দেখবে চল। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।...মন্টু, তোর মামীমাকে খবর দে তো, সেন-সাহেব এসেছেন, অবনীশ সেন...'

রুবী, রুবীর মা এবং আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। বিয়েবাড়ীর ব্যস্ততার মধ্যে একটু অতিরিক্ত হৈ-চৈ করলেন হৃষীকেশ বন্ধুকে নিয়ে। অবনীশকেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে সামলাতে হলো। 'আই অ্যাম কোয়াইট এট হোম হিয়ার। তুমি যাও কাজকর্ম দেখ।'

'দাঁড়াও, নিচে গিয়ে চেনা লোকদের মধ্যে তোমাকে বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'কিছু দরকার নেই', অবনীশ বললেন। 'মাত্র তিন বছরের প্রবাসবাসের ফলে অন্তত তোমার নিমন্ত্রিত-দের মধ্যে আমার পরিচিত লোক খুঁজে নিতে কোনও কষ্ট হবে না। ইতিমধ্যেই দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে—যায় রুবীর পিয়ানো-শিক্ষক ফনসেকার সঙ্গে...'

'ফনসেকা!' যেন ধাক্কা খেলেন হৃষীকেশ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন 'কোথায় দেখলে?'

'সিঁড়িতে ওঠবার মুখেই দেখা। উইশ করলাম, হেসে নড্ করল।' অবনীশ বন্ধুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বললেন। 'কেন, কিছু গোলমাল করছে নাকি? আমি তো ভাবলাম প্রিয় ছাত্রীর বিয়েতে বাজাতে এসেছে...'

'চলো তো, দেখে আসি নিচটা', হৃষীকেশ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, এবং দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

বড় বাড়ীর বিয়ের ভিড়ে লোক খুঁজে বের করা সহজ নয়। সিঁড়ির কাছে এতক্ষণ কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। গাড়ীবারান্দা পেরিয়ে লন্ পর্যন্ত ছুটে গেলেন হৃষীকেশ; বিস্মিতভাবে অবনীশও সঙ্গে চললেন। কিন্তু ফনসেকার সঙ্গে দেখা হলো না। 'হয়তো ওপর-তলায় উঠে গেছে', অবনীশ বললেন। কিছু না বলেই বেশ একটু উত্তেজিতভাবেই হৃষীকেশ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন।

'বাড়ীর কর্তারই খোঁজ করছিলাম, সিঁড়ির কাছ থেকে পাকা ইভনিং স্যুটপরা চৌধুরীসাহেব নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। 'খুব ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি...'

একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হৃষীকেশ।

'তোমাদের ফনসেকার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিতে পার?' চৌধুরী বললেন। 'মেয়ে বায়না ধরেছে রুবীদির পিয়ানো মাষ্টারকে রেখে দিতে হবে, নইলে

চলবেই না।...একটু আগেই ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম...'

'কোথায়?' ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন হৃষীকেশ। 'কোথায় দেখেছিলে?'

'সিঁড়ির ধারেই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কাছাকাছি কোথাও হবে...কি হলো? আরে আরে ধর, পড়ে গেল...' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন চৌধুরী। অবনীশ ঠিক পেছনেই ছিলেন। দুই সবল বাহুতে হৃষীকেশকে ধরে ফেললেন।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। একাধিক যুবক ধরাধরি করে হৃষীকেশের সংজ্ঞাহীন দেহ পাশের লাইব্রেরী ঘরের সোফার উপর শুইয়ে দিল। ডাক্তারের কাছে ফোন গেল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কোনও ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যায় কি না খুঁজতে গেল ক'জন। রুবীর মা ও রুবী উদ্বেগবিকৃত মুখে উপর থেকে ছুটে এলো।

ইতিমধ্যে অবনীশ রোগীসম্পর্কিত পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছেন। ডাক্তার হাতের কাছেই পাওয়া গেল। বিপদ্‌ কিছু গুরুতর নয়; সাময়িক কারণে সংজ্ঞাহীনতা। অবিলম্বে সংজ্ঞাও ফিরে এলো। না নড়েচড়ে এখানেই কিছুকালের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম করার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার লন্‌-এ ফিরে গেলেন। রুবীর মাকে আশ্বস্ত করে উপরে পাঠালেন অবনীশ, বললেন, কিছু ভয় নেই, আমি হৃষীকেশের কাছে রইলাম। আপনি যান, বিয়েতে যেন কোনও রকম বিঘ্ন না হয় দেখুন গিয়ে। বিয়ের ব্যবস্থা করার স্ট্রেইন চাট্টিখানি নয়, উত্তেজনা আর ক্লান্তি থেকে এ রকম হতেই পারে।'

ডাক্তার চুপে চুপে বলে গেছেন, কোনও আকস্মিক শক্‌-এ এমন হয়ে থাকবে। অসম্ভব নয়। ফনসেকার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই হৃষীকেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে কি ফনসেকাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি? সে জোর করেই উপস্থিত হয়েছে? কোনও গুরুতর অপরাধ করায় এ-বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়নি তো ফনসেকা।

'কে? অবনীশ?'

'হ্যাঁ, আমিই। তুমি শুয়ে থাক। বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ঐ ফনসেকা। ফনসোকে ঠিক কোথায় দেখেছিলে তুমি?'

'ব্যাপার কি বলো তো?' কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন অবনীশ। 'লোকটা কি কোনও বদমাসি করে পালিয়েছে?...

'ফনসেকা তিন মাস আগে মারা গেছে।' হৃষীকেশ কম্পিত কণ্ঠে বললেন।

শিব এবং দক্ষের দ্বন্দ্বে সতীর দেহত্যাগ এবং হিমালয়ের কন্যা উমারূপে মহাদেবের সহিত পুনর্মিলন

সুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

প্রাচীন আমলে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, সানুচর মুনিগণ এবং যাবতীয় অগ্নিগণ মিলিত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সে যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত অন্যান্য সকলে স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষ লোকগুরু (এখানে লোকশব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—নরলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক প্রভৃতি) ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন—"অজ্ঞং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ-তদাজ্ঞয়া" (শ্রীমদ্ভাগবত—৪।২।১-৭)। আসন গ্রহণ করিয়া দক্ষ বলিতে লাগিলেন—শিব আমার মৃগনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তাই শিব আমার শিষ্য, ইহার আচরণ আপনারা দেখিলেন তো? শিব বিবস্ত্র এবং বিকীর্ণকেশযুক্ত, সে ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগণের সঙ্গে কখনও হাস্য করে, কখনও রোদন করে, সর্বদা শশ্মানে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করে, অমঙ্গল চিতাভস্ম দ্বারা সে দেহ আবৃত করে, ইহার গলায় প্রেতের মালা, মৃত নরের অস্থি ইহার গলার মালা, ইহার নাম শিব, বস্তুতঃ সে নিজে অশিব, সে মাদক সেবনে মত্ত, তাঁহার স্বভাবও সেরূপ—"প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ" ইত্যাদি (ঐ—৪।২।১৪-১৫)।

আমি কেবল ব্রহ্মার আজ্ঞাপালনের জন্য এই অধমের সহিত আমার সতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ দিয়াছি—"দত্তা বত ময়া সাধ্বীচোদিতে পরমেষ্ঠিনঃ" (ঐ—৪।২।১৬)। এই দেবাধমকে দেবতাগণের যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করা হইল—"সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ" (ঐ—৪।২।১৮) শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিবের এই বিদ্বেষ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাই দক্ষের চিত্তে অত্যন্ত গর্বের উদয় হইল। তিনি বৃহস্পতি যজ্ঞনামে এক উৎকৃষ্ট বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শিব এবং সতী ভিন্ন এ যজ্ঞে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল।

শ্রী সতী মহাদেবকে কহিলেন—নাথ! আপনার শ্বশুর যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবতাগণ তথায় গমন করিতেছেন, চলুন আমরা সকলে তথায় গমন করি—"প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং নির্য্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল" ইত্যাদি (ঐ—৪।৩।৮)। আমার ভগিনীরা স্ব স্ব পতির সহিত নিশ্চয়ই তথায় গমন করিবে। তথায় গেলে মাতা, ভগিনীগণ প্রভৃতিকে তথায় দেখিতে পাইব, মহর্ষিগণ পিতৃযজ্ঞে যে ধ্বজা উত্থিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইব—"দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা" (ঐ ৪।৩।১০)। আমি স্ত্রীলোক, ঔৎসুক্যই আমার স্বভাব। হে শিতিকণ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনিয়া দুহিতার তাহা দর্শন করার আগ্রহ প্রচলিত সত্য। বন্ধু, স্বামী, শ্বশুর, পিতৃভবনে বিনা আমন্ত্রণে গমন করা আগৌরবের বিষয় নহে—"অনাহূতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং ভর্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্" (ঐ—৪।৩।১৩)।

অতএব হে অমর্ত্ত্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি জ্ঞানী হইয়াও আমাকে অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনার কৃপাভিক্ষা চাহিতেছি—"মানুগৃহাণ যাচিত" (ঐ -৪।৩।১৪)। তখন দেবদেব মহাদেব

কহিলেন হে শোভনে! যদি দেহাদিতে অহংকার বুদ্ধি না জন্মে, ক্রোধ দ্বারা দোষদৃষ্টি না জন্মে, তাহা হইলে অনাহুতভাবে আত্মীয় গৃহে গমন করা যায়। তোমার এই উক্তি যুক্তিসংগত। শম্ভু হাস্যমাখা মুখে কহিলেন—প্রজাপতি দক্ষ বিশ্বস্রষ্টাগণের সম্মুখে আমার প্রতি মর্মভেদী কুবাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য এই ছয়টী সাধুদের গুণ। এসবে অভিমানবুদ্ধি জন্মিলে অসাধুদের বিবেক জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাহারা অভিমান-দৃপ্ত হইয়া উঠে। এই রূপ অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের গৃহে পদার্পণ করা উচিত নহে। দক্ষের মর্যাদা অতি উৎকৃষ্ট, তুমি তাহার অতিশয় আদরের কন্যা, কিন্তু আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ বশতঃ তোমার পিতার নিকট হইতে তুমি সম্মান এবং আদর লাভ করিতে পারিবে না, কারণ তিনি এই সম্বন্ধের জন্য পরিতাপ ভোগ করিতেছেন—"কঃ পরিতপ্যতে যতঃ" (ঐ—৪।৩।১৫-২০)।

হে সুমধ্যমে! মানুষ পরস্পরের মধ্যে যে বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বান্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা সম্পাদন করেন। দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি নহে—"ন দেহমানিনে" (ঐ—৪।৩।২১-২২)। হে বরাঙ্গনে! দক্ষ তোমার দেহের জন্মদাতা পিতা হইলেও আমার শত্রু, অতএব তাঁহার এবং তাঁহার অনুগামীদের মুখাবলোকন উচিত নহে। আমার বাক্য লঙ্ঘন হইবে না—'স সম্ভোমরণায় কল্পতে'—ঐ—৪।৩।২৩-২৫)।

মহাদেব এইসব কথা বলিয়া "গমনে অনুমতি করি আর নিবারণই করি, পত্নীরতু অঙ্গনাশ অবশ্যম্ভাবী" চিন্তা করিতেছিলেন,—পত্ন্যঙ্গ নাশং হ্যভয়ত্র চিন্তয়ন্" (ঐ—৪।৪।১। সতী শোকে ক্রোধে অত্যন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি বিমূঢ় হইল, তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় পিতৃযজ্ঞে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সতী একাকিনী অতিবেগে যাত্রা করিলেন, ত্রিলোচনের হাজার হাজার যক্ষপার্ষদ এবং অনুচর বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া সতীর পাছে পাছে ধাবিত হইলেন—"সপার্ষদযক্ষামণিমন্মদাদয়ঃ পুরোবৃষেন্দ্রাস্ত রসাগতব্যথাঃ" (ঐ—৪।৪।৪)। সতী পিতা দক্ষের যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিলেন। দক্ষ সতীকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী এবং ভগিনীগণ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন না—জননীঞ্চ সাদরাঃ প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্ব জুমুর্দা" (ঐ - ৪।৪।৭)।

সতী দেখিলেন এই যজ্ঞে রুদ্রের অংশ নাই, দেবদেবমহাদেবকে তাঁহার পিতা অবমাননা করিয়াছেন, নিজেও যজ্ঞে অনাহুতা। মহেশ্বরী সতী যজ্ঞসভায়ই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে যেন চতুর্দশভুবন দগ্ধ হইতে লাগিল—"চু কোপ লোকানি-বধক্ষ্য ভীরুষা" (ঐ ৪।৪।৯)। শ্রীসতী কহিলেন—পিতঃ! ইহলোকে মহাদেবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, তিনি দেহধারী জীবগণের আত্মস্বরূপ, তিনি সকল জগতের কারণ স্বরূপ, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ সেই শিবের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। শিব নাম উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ মানুষের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে, আপনি নিজে অমঙ্গল স্বরূপ হইয়া সেই মঙ্গল রূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন—"ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ" (ঐ—৪।৪।১৪), "ভবান দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে (ঐ—৪।৪।১৫)। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, তবে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইতে অক্ষম হইলে, অথবা নিজের প্রাণত্যাগ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া প্রভুভক্তের সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত। আর যদি শক্তি থাকে তবে সেই অজ্ঞানীর অকল্যাণবাদিনী জিহ্বা ছেদন করাই প্রভুভক্তের ধর্ম—ছিন্দ্যাংপ্রসহ্যরুষতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বামসূন্, পিততো বিসৃজেৎস ধর্মঃ" (ঐ—৪।৪।১৬-১৭)। অতএব পিতঃ! শিববিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত আমার এই অপবিত্র কলেবর আমি আর ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞান বশতঃ কেহ কোনও নিন্দিত বস্তু ভক্ষন করিয়া ফেলে তবে

যমন যাহা তাহার বিশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিত গণের মত। আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিত, মহাজ্ঞানীর অপ্রিয় কর্তা হইতে যে জন্ম হয়, সেজন্যে ধিক—"ধিগ্ যোমহতামহদ্ভকৃৎ" (ঐ—৪।৪।২২)।

পিতঃ ভগবান বৃষধ্বজ পরিহাসচ্ছলে যখন আমাকে "দাক্ষায়ণি" সম্বোধন করেন, তখন আমি আপনার সহিত আমার সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া এমন দুঃখিত-চিত্তা হইয়া পড়ি যে রহস্যের সময় হইলেও আমি হাস্য করিতে পারি না, অতএব আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহকে মৃতদেহের ন্যায় আমি পরিত্যাগ করিব—"ব্যপেতনর্ম্মস্মিতমাশু তদ্ব্যহং ব্যৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্" (ঐ—৪।৪।২৩)। সতী যজ্ঞ স্থলে দক্ষের প্রতি এভাবের বহু নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক উত্তরমুখী হইয়া মাটিতে বসিলেন, তৎপর জলস্পর্শ পুরঃসর আচমনপূর্বক পীতাম্বরে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মুদ্রিত নেত্রে যোগপথের পথিক হইলেন—"নিমীল্য দৃগ্ যোগপথং সমাবিশৎ" (ঐ—৪।৪।২৪)। সতী অপান বায়ুকে নিরোধ করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন করিলেন, পরে উদান বায়ুকে ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, পাছে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ঐ বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। ভগবান্ রুদ্র সতীর যে দেহকে বার বার ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, সেই সতী পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই দেহত্যাগ করিবার বাসনায় সর্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন—"জিহাসতীদক্ষরুষা মনস্বিনী দধারগাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্" (ঐ—৪।৪।২৬)।

অনন্তর শ্রীসতী স্বীয় পতি মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে অন্তর্দর্শনরহিতা হইলেন, তাঁহার পাপশূন্য দেহে সমাধিসমুৎপন্ন অনল সদ্যঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল —সদ্যঃ প্রজ্বালসমাধিজাগ্নিনা" (ঐ—৪।৪।২৭)। সবত্র হাহাকার রব উত্থিত হইল। সতীর পার্ষদগণ স্ব স্ব যুদ্ধাস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষবধার্থ উদ্যত হইলেন—"দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নদায়ুধাঃ (ঐ—৪।৪। ৩১)।

দেবর্ষি নারদের মুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া "শান্তং শিবং সুন্দরং" এবার "ভীষণভয়ংভয়ানাং" হইয়া সতী-দেহ স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে-সময় বিষ্ণু-চক্রে সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিই পীঠস্থান। সতীদেহের একাংশ আসামের কামাখ্যাতে পতিত হইয়াছিল, তাই কামাখ্যা ভারতবিখ্যাত হিন্দু মহাপীঠ। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইল। দক্ষের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল—"যজমানপশোঃ কস্য কায়াং তেনং হরচ্ছিরঃ" (ঐ ৪।৫।২৪)। ভগবান্ কমলযোনি এবং বিশ্বাত্মা নারায়ণ পূর্ব হইতেই ইহা জানিতেন তাই তাঁহারা দক্ষ-যজ্ঞে যোগদান করেন নাই। ব্রহ্মা দেবতাদের বার্তা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—মহাদেব যজ্ঞভাগভোগী, তাঁহাকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করা অপরাধ হইয়াছে, তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও—"ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্" (ঐ—৪।৬।৫)। ব্রহ্মা মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দিলেন এবং যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিলেন—"যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্যযজ্ঞহন্" (ঐ—৪।৬।৫৩)। দক্ষমুণ্ড ছাগমুণ্ড হইয়াছিল, তিনি মহাদেব রুদ্রকে দর্শন করিলেন, দক্ষের কলুষিত আত্মা নির্মল হইল, তিনি মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন—"স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ" (ঐ—৪।৭।১৫)। সকলে যজ্ঞেশ্বর মহাদেবের শরণ লইলেন—"কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ" (ঐ—৪।৭।৪৭)। সতী শম্ভুকেই আবার ভজনা করিয়াছিলেন —"অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্" (ঐ—৪।৭।৫৯)।

তৎপর হিমালয়ের ঝি উমারূপে শ্রীসতী জন্মিয়াছিলেন এবং মহাদেবের সহিত বিবাহে শিবশক্তির পুনর্মিলন হইয়াছিল। শিব অজেয় অমর, তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি অবিনশ্বর, কিন্তু শ্রীসতীর বার বার জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, তিনি জন্মে জন্মে শিবের পত্নী হন। তাঁহার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যতবার সতী দেহত্যাগ করেন, শিব সতীর দেহের এক-একটি হাড়

নিজের গলায় পরিধান করেন। এই মহাজ্ঞান অবগত হইবার জন্য সতী শিবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"কণ্ঠে কেনে তোমার হাড়ের ধর মালা।
ঝলমল করে যেন জলদ উঝলা॥—"(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষ ১২ পৃঃ)

"মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেন পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্মঝুলি-ঝালা॥"
(বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের "গোর্খ বিজয়"—৬ পৃঃ)

"বিস্মিত হৈয়া দেবী বলেন শিবেরে।
হাড়মালা কেন প্রভু কণ্ঠের উপরে॥"
(বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত—হাড়মালা)

দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিয়াছিলেন—

"সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার।
একবার মর তুমি একখানি হাড়॥
তোমার সন্তাপ হয় নিশানী আমার।
এই কহিলাম প্রিয় শুন তত্ত্বসার॥"
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়—১২ পৃঃ)

"পঞ্চভূতের ফান্দে,
ব্রহ্মা পড়ি কান্দে।"

বাঙ্গালী নরনারী পঞ্চভূতেশ্বর মহাদেবকে জামাতা-রূপে বরণ করিয়া এবং বিশ্বজননী মহামায়া দুর্গাকে কন্যা-রূপে নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনের শোক-শান্তির সাথী করিয়া লইয়াছেন। উমা বাপের বাড়ী 'নাইওর' আসিবার সময় শিব জিজ্ঞাসা করেন—

"তুমি যে যাইবা গৌরী তোমার বাপের বাড়ী।
আমার জন্য কি আনিবা বল সত্য করি॥"(১)

তদুত্তরে (চিন্ময়ী মা যিনি মৃন্ময়ী প্রতিমার কায়ায় নামিয়া আসেন বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসবে) জগজ্জননী মা মহামায়া দুর্গা বলেন—

"আমার যে পিতামাতা বড় দুঃখীজন।
আলুনী কচু টেকইর মুড়ি দেবতার ভোজন॥"(২)

বাঙ্গালী নরনারীরা যখন "শুনেছি নারদ মুখে—উমা আছে বড় দুঃখে" তখন প্রকাশ্যে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন—

"এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়।
মায়ে ঝিয়ে করব দ্বন্দ্ব,
জামাই বলে মানব না।"—গিরীশ ঘোষ

ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিতেন—

"এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।২২।৫)

আজও আমাদের বাংলাদেশের কুমারীরা—

"শিবের মাথায় দিয়া মৌ,
আমি যেন হই রাজার বৌ।
শিবের মাথায় দিয়া পানী,
আমি যেন হই রাজার রাণী॥"(৩)

ইত্যাদি গান আবৃত্তি করিয়া মনোমত পতিলাভ করার জন্য শিবের ব্রত পূজাদি করিয়া থাকেন।

চিন্ময়ী মা! বাঙ্গালী নরনারী এভাবেই তোমাকে নিজের আপনজন করিয়া লইয়াছে, এভাবেই তুমি "বাঙ্গালী হৃদয় অমিয় ছানিয়া" মৃন্ময়ী প্রতিমার কায়ায় নামিয়া এস বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসবে।

এই দুর্গাই কৃষ্ণশক্তি মায়া। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মম মায়া দুরত্যয়া" (গীতা—৭।১৩-১৪)। সাংখ্যের প্রকৃতিই বেদান্তের মায়া। শাস্ত্রান্তরে এই মায়াই দুর্গা-দুর্গতিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, সর্বভূতের শক্তি-স্বরূপিণী" ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা নারায়ণী, ঈশানী, অম্বিকা, প্রভৃতি (শ্রীমদ্ভাগবত—১০।২।১১, শ্রীকৃষ্ণবাক্য)। তিনিই—

"মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদে সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুত্থিতে॥"

সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ, তাই শক্তিরও নানা

মূর্ত্তি, নানা বিভাব, তাই দুর্গা ভোগে ভবানী, অসুরদের সহিত সংগ্রামে কখনও অষ্টভুজা, কখনও দশভুজা, আবার কখনও শতভুজা, সহস্রভুজা। জগৎ রক্ষায় এই দুর্গাই জগদ্ধাত্রী, প্রলয়কালে ইনিই আবার করালী কালী।

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবতাগণের মধ্যে এমন প্রাণী বা বস্তু নাই, বা থাকিতে পারে না, যাহা প্রকৃতি-জাত এই মায়ামুক্ত—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বঃ দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥
(গীতা—১৮।৪০)

মা মায়া, তুমি তো—

"তারা পরমেশ্বরী
কখনও পুরুষ হও মা,
কখনও ষোড়শী নারী।"

মা, তুমি একা অদ্বিতীয়া ইহাই তো শ্রীচণ্ডীবাক্য—"দ্বিতীয়াং কে মমাপরা।" দেবতারা তো মায়েরই অংশ—"অহং রুদ্রেভিঃ বসুভিশ্চরামি।" দেবতাদের সমস্ত শক্তির সমবায়েই তো তাঁহার মহিষমর্দিনী মূর্ত্তি—"নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহ-মূর্ত্ত্যা।" তিনিই বলিয়াছেন—"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজতে জগৎ।" তিনিই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণা। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে দেবকীগর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলরামকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন—"দেবক্যা জঠরে-গর্ভং শেষাখ্যং ধামমামকম্। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা-উদরে সন্নিবেশয়" (শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০।২।৮)। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দুর্গাই নন্দপত্নী যশোদাগর্ভে মায়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—"নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি" (ঐ—১০।২।৯)। স্বার্থান্ধ কংস এই মায়াকেই দেবকীর ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করতঃ বধ করার চেষ্টা করে—"তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্" ইত্যাদি (ঐ—১০।৪।৮)।

সেই মায়াই কংস হস্ত হইতে স্খলিতা হইয়া অষ্টভুজা-দেবী মূর্ত্তিতে আকাশমার্গে গমনকালে কংসকে বলিয়াছিলেন—"তোমাকে বধিবে যে, নন্দালয়ে বাড়ে সে", তাঁহার অষ্টহস্তে যথাক্রমে ছিল—"ধনুঃ শূলেষু চর্ম্মাসি-শঙ্খচক্রগদাধরা" (শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০।৪।৮-১০)। ইনি বিচিত্র বসনভূষণ এবং মাল্যাদিতে ভূষিতা ছিলেন—

"অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা
দিব্য-স্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা।"—(ঐ)

(১), (২), (৩) এগুলি গ্রাম্য ধামালি সঙ্গীত হইতে সংগৃহীত। সম্মিলনীর নদীয়া অধিবেশনের সভাপতি ৺রাজমোহনবাবুর ভাষণে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য।

যে ফুল ঝরে

নন্দলাল পাল

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখেই মুছিমং চলে গেল। আজ স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে ওদের ম্যাচ খেলা। মুছিমং স্কুলের ছাত্রদের বিপক্ষ দলের গোল-রক্ষক। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরেই সে মাঠে যাওয়ার জন্য উস্‌খুস্ করছিল।

হাসপাতাল থেকে এসে বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। দশ দিনের পুরনো কাগজ—আজকের ডাকেই এসেছে।

একটি সিপাই এসে স্যালুট করে আমাকে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়লাম। সুবেদার টেক-বাহাদুর লিখেছেন। আজই রাত্রে তাঁর বড় মেয়ে পার্বতীর বিয়ে। আমার নিমন্ত্রণ।

পার্বতীর বিয়ে। টেক-বাহাদুরের বড় মেয়ে পার্বতীকে দেখেছি। একেবারে ছেলেমানুষ। বয়স বড় জোর বছর বারো। তার বিয়ে!

সেদিন পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে টেকবাহাদুরের বাসায় গেলাম। আমার বাংলা থেকে প্রায় দু'ফার্লং দূরে বিরাট এলাকা জুড়ে মিলিটারী ক্যাম্প। ছোট ছোট গাছের খুঁটিকে মাটিতে পুঁতে দু'দিকে বাঁশের চাপ বেঁধে চক্রাকারে গোটা জায়গাটাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওই বেড়ার পরেই পরিখা। পরিখা থেকে আট দশ গজ দূরে আবার একই রকম কাঠের খুঁটির বেড়া। তারপর আবার পরিখা। এই পরিখার পর লম্বা লম্বা ব্যারাকে সিপাইরা থাকে। ব্যারাকের ঘরগুলো কাঁচা। খড়ের ছাউনি। মেঝে এবং দেয়াল কাঠের। প্রথম খুঁটির বেড়ার পর ক্যাম্পের চার কোণায় চারটি বিবর। বিবরগুলো বালির বস্তা দিয়ে সুরক্ষিত। বিবরে বসে মেশিনগান নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে—সিপাইরা।

মিলিটারী ক্যাম্পের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। প্রহরারত সিপাইরা আমাকে দেখে গেট খুলে দিল। আমি সটান সুবেদার টেকবাহাদুরের বাসায় উপস্থিত হলাম। ক্যাম্পের এক কিনারে দু'খানা ঘর নিয়ে থাকেন টেকবাহাদুর।

টেকবাহাদুরের বাসাটা আলোতে ঝলমল করছে। গোটা-কয়েক পেট্রোমাক্স জ্বালানো হয়েছে। তাছাড়া বাইরে জ্বলছে অসংখ্য মশাল। ক্যাম্পের মিলিটারীরা ছাড়াও ওখানকার সমস্ত সরকারী কর্মচারীই নিমন্ত্রিত।

বিবাহ-বাসরে পুরুতের কাজ করছে ওখানকার এক-সিপাই। বরবেশে পার্বতীর পাশে বসে রয়েছে সিপাই নীলবাহাদুর।

নীল-বাহাদুর মিলিটারী ক্যাম্পের কম্পাউণ্ডার। কম্পাউণ্ডার বলতে ঠিক যা বুঝায়, সে তা নয়। আসলে নীলবাহাদুর সাধারণ সিপাই। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিল। কিন্তু নিজের অধ্যবসায়ের জোরে সে এখন ভালভাবেই সকলের নামধাম ইংরেজীতে লিখতে পারে। টাইপ করা চিঠি নকল করতে পারে। সাধারণ সিপাইরা এসব পারে না। নীলবাহাদুর আগে আসাম রাইফেলস্-এর ডাক্তার বড়ুয়ার সঙ্গে ছিল। তখন সে গোটা কয় মিকশ্চার ও টাবলেটের নাম মুখস্থ করেছিল। এখন সে প্রয়োজন বোধে সিপাইদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে ওই সব মিকশ্চার ও ট্যাবলেট দিতে পারে।

একটা খাতায় অসুস্থ সিপাইদের নাম লিখে নীল-বাহাদুর হাসপাতালে রোজ আমার কাছে নিয়ে যায়। আমি পরীক্ষা করে রোগের গুরুত্ব অনুসারে তাদের নামের পাশে 'এ' 'বী' বা 'সী' লিখে দিই। 'এ' মানে ঔষধ খেয়ে কাজ করতে সমর্থ, 'বী' মানে হাল্‌কা

কাজ করা উচিত, আর 'সী' মানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। নীলবাহাদুর ক্যাম্পে এসে সুবেদারকে এসব বুঝিয়ে দিত। হাসপাতালে যাতায়াত করতে করতে এবং অন্যান্য সিপাইদের চেয়ে সহজে সুবাদারের সান্নিধ্যে আসতে আসতে নীলবাহাদুর নিজেকে অন্যান্য সিপাই-দের চেয়ে স্বতন্ত্র ভাবত। এ ছাড়া প্রতিমাসে বাড়ীতে টাকা পাঠানোর সময় সে সিপাইদের মনিঅর্ডার ফরম লিখে দিত বলে তাদের কাছে তার একটা আলাদা খাতির ছিল। এই ভাবে মিলিটারী ক্যাম্পে নীল-বাহাদুর নিজেকে কম্পাউণ্ডার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

নীলবাহাদুর জাতিতে গুর্খা। শরীরের বাঁধুনি শক্ত। পেশীবহুল দেহ। তার বয়স কত জানি না। তবে বছর পঁয়ত্রিশের কম নয়, এটা সত্য।

নীলবাহাদুরের পরনে আঁটা পাজামা। গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় পাগড়ি। ওদের প্রথামত মাথা ন্যাড়া।

আমাকে দেখে নীলবাহাদুর সলজ্জ হাসি হাসল। তার পাশে বধূবেশে পার্বতী। পার্বতীর কৈশোর এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। কয়েকদিন আগেও তাকে ফ্রক পরে লুকোচুরি খেলতে দেখেছি। আজ এক মস্ত বড় শাড়ী পরে সে বসে আছে। তার চোখে মুখে লজ্জার কোন বালাই নেই। কিশোরী-সুলভ ঔৎসুক্য নিয়ে সে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। বিয়েটা যেন তার একটা মজার খেলা।

গুর্খা সিপাইরা গান করছে। একটা গানে 'দার্জিলিং' শব্দ বার বার উচ্চারিত হতে শুনে আমি সুবেদারকে গানটির অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর দিলেন তাঁর স্ত্রী।

সুবেদার কালিম্পং-এর লোক। গুর্খা। তাঁর স্ত্রীও গুর্খা মেয়ে, কিন্তু তাঁর জন্ম আসামের শিলচরে। ভদ্রমহিলা বেশ ভাল বাংলা এবং অসমিয়া বলতে পারেন। তিনি বললেন, গানটির বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়—,ওগো দার্জিলিং পাহাড়ের মেয়ে, আজ তোমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। দার্জিলিংএর পাহাড়ী নদীর মতই তুমি উজ্জ্বল। তুমি বালিকা ছিলে কিন্তু আজ তুমি ঘরণী হতে চলেছ। আজ তুমি দার্জিলিং-এ নও বটে, কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ের মতই উঁচু নাগা পাহাড়ে আছ। তুষারমৌলী কাঞ্চনজঙ্ঘার মত শরামেত্তী পর্বত তোমার পাশেই রয়েছে।'

রীতিমত কাব্যমণ্ডিত গান। সুবেদারের স্ত্রী বললেন, গানটি এখানেরই এক সিপাই বিজয়কুমার ছেত্রী লিখেছে।

সিপাই বিজয়কুমারকে আমি চিনি। প্রায়ই অসুখের ভাণ করে। মাসে অন্ততঃ তিনচার বার সে সিক্ (sick) রিপোর্ট করে আমার কাছে যায়। কোন সময় ঠিকই অসুস্থ থাকে, তবে বেশীর ভাগ সময়ই অসুখের ভাণ করে। এজন্য বহুবার তা'কে আমি তিরস্কারও করেছি। কিন্তু সেই বিজয়কুমার কবি—সে গান লিখতে পারে জেনে বিস্মিত হলাম।

বিয়েবাড়ীর জলযোগের পর আমি বিদায় নেওয়ার সময় সুবেদার টেকবাহাদুরকে বললাম, "কাল দুপুরে একবার বিজয়কুমারকে আমার কাছে পাঠাবেন।"

পরদিন দুপুরে হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। উত্তর আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। মুখ তুলে তাকালাম। উত্তর দিগন্তের পাশে ছোট চড়ুই পাখির মত একখানা প্লেন দেখা দিল। তারপর ক্রমশঃ বড় হতে হতে তা একখানা পরিপূর্ণ প্লেনের আকার নিল। প্লেনটা এসেই চারদিকে চক্কর দিতে লাগল এবং নামতে নামতে প্রায় গাছের মাথা পর্যন্ত নেমে এল। এক-একবার মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি উঁচু পাইন গাছটার মাথায় ধাক্কা খাবে প্লেনটা। আতঙ্ক ও উত্তে-জনায় বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল; কিন্তু পাইলট আশ্চর্য কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। একটা জায়গায় চুণের গুঁড়ো দিয়ে খুব বড় বড় করে কতকগুলো অক্ষর লেখা। তার চারপাশে বড় জোর দু'কার্লং ব্যাসার্দ্ধের একটা বৃত্ত করে প্লেনটা ঘুরতে লাগল এবং প্যারাশুট দিয়ে চাল

ডালের বস্তা, কেরোসিনের টিন ইত্যাদি ফেলতে লাগল। আকাশের গায়ে প্যারাশুটের ঝাঁক একঝাঁক মুক্তপক্ষ বলাকার মত নেমে এল। প্রায় কুড়ি মিনিট প্যারাশুটের বুদ্বুদ উড়িয়ে প্লেনটা আবার উত্তর দিকে চলে গেল। আমি তন্ময় হয়ে প্লেনটার গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওই একটা সময় যখন মনেপ্রাণে তীব্র উত্তেজনা অনুভব করা যায়। প্লেনের শব্দ শুনলেই সব বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রায় নির্বাসিত এই জীবনে ওই সময়টুকু এনে দেয় বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা। পুংরোতে মালপত্র গাড়ী করে পৌছানোর উপযুক্ত রাস্তাঘাট নেই। তাই ওখানকার মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্র প্লেন থেকে air-drop করা হয়। প্লেনটা চলে যাওয়ার পর মনে প্রাণে একটা অবসন্নতা বোধ করলাম। আবার কবে air dropping হবে ঠিক নেই। এর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করতে থাকি।

প্লেনটা চলে যাওয়ার পর সরকারী কুলিরা ছুটে গেল। সাপ্লাই ক্লার্ক ও সার্কেল অফিসারও উপস্থিত হলেন। আজ সিভিল কর্মচারীদের জন্য air dropping —তাই সিপাইরা গেল না। নইলে ওরাও যায়। সাপ্লাই ক্লার্ক ফর্দ মত জিনিষ মিলিয়ে নিলেন। ওই ফর্দটা প্লেন থেকে একটা বোঝার সঙ্গে ফেলা হয়েছে। তাই নিয়ম। আমার বারান্দা থেকে সব কিছু স্পষ্ট দেখছিলাম।

নাগাপাহাড়ে বসন্ত জেগেছে। শীতের তীব্রতা কমতে শুরু হয়েছে। শরামতী পাহাড়ে বরফ গলছে। শাদা বরফের তলা থেকে তার মাথাটা বেরিয়ে পড়েছে। বাতাসে একটা মন-কেমন-করা আমেজ। পুংরো টিলার কয়েকটা শিমুলগাছে লালের সমারোহ। ডালগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে।

নীল আকাশের এখানে ওখানে দু'এক খণ্ড সাদা মেঘ পাইন আর ধুপগাছগুলো বাতাসে শিস্ দেয়। যতদূর চোখ যায়, কেবল পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সূর্যের আলো ঝিকমিক করে। চারদিকে কেমন একটা নীরব ভাব। এই নীরবতার এমন একটা মাদকতা আছে যা মনকে উদাস করে তুলে। তা অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না।

দূরে—বহুদূরে একটা টিলা থেকে ধুম উঠছে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—সুতরাং ওখানে আগুন লেগেছে। নাগারা জুম প্রথায় চাষ করে। শীতের শেষদিকে এবং বসন্তকালে ওরা টিলার গাছপালা কেটে—শুক্‌নো গাছপালায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেলে বর্ষার শুরুতে টিলার গায়ে বীজ লাগায়। বৃষ্টির জলে বীজ থেকে গাছ বের হয়।

হঠাৎ বুটে বুট ঠোকার শব্দে চম্‌কে উঠলাম। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি সিপাই বিজয়কুমার আমার পাশে দাঁড়িয়ে। এ-সময়ে বিজয়কুমারকে পেয়ে খুশী হলাম। তাকে বসতে বললাম। বিজয়কুমার সঙ্কুচিত হয়ে বসল।

বিজয়কুমারের চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমি তাকে কেন ডেকেছি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বিশেষতঃ সুবেদারের মারফতে কেন তাকে আসতে বলেছি, ঐটাই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে।

আমি কিছু বলবার আগেই বিজয়কুমার বলল, "স্যার, সুবেদার সাহেব বললেন, আপনি আমাকে আসতে বলেছেন।"

আমি বললাম, "বিজয়কুমার, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হবে। সুতরাং তুমি বলে সম্বোধন করলে রাগ করবে না ত?"

আমার কথার ধরণে বিজয়কুমার আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আমি এত ঘনিষ্ঠভাবে এবং আপনজনের মত কেন কথা বলছি, বিজয়কুমার ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আমি বললাম, "বিজয়কুমার, তুমি নাকি গান লিখতে পার। কাল রাত্রে তোমার লেখা গান শুনলাম। আমার খুবই ভাল লেগেছে।"

বিজয়কুমার সসঙ্কোচে বলল, "স্যার, আমি এমন কি গান লিখতে পারি? তবে আমার লেখা গান আপনার ভাল লেগেছে, তাতেই আমার আনন্দ।"

আমি বললাম, "বিজয়কুমার, তুমি গুণী লোক। আমার কাছে আর সঙ্কোচ করো না। তোমার লেখা গান শোনাও আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাংলা অর্থও আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

বিজয়কুমার দার্জিলিং-এর লোক। বেশ ভাল বাংলা জানে। তার লেখা অনেকগুলো গান শোনাল। চমৎকার গলা। যদিও বাংলাতে তর্জমা না করা পর্য্যন্ত আমি গানের অর্থ বুঝতে পারছিলাম না, তবু বিজয়কুমারের গান যে অতিশয় ছন্দোময় ও কাব্যমণ্ডিত তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছিল না।

প্রায় একঘণ্টা পর বিজয়কুমার বলল, "স্যার, আজ এখানেই থাক। আমি সময় পেলেই এসে আপনাকে গান শোনাব।"

আমি বললাম, "অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিজয়-কুমার একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব—এ সৈনিক-জীবন তোমার কাছে কেমন লাগে?"

বিজয়কুমার ম্লান হেসে বলল, "স্যার, আমি গুর্খা, সৈনিক-জীবন গুর্খাদের কাছে একটা পেশা-বিশেষ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এ-জীবন আমার কাছে একটুও ভাল লাগে না। যতক্ষণ হাতিয়ার হাতে থাকে না, ততক্ষণ আমি অন্য মানুষ। হাতিয়ারে হাত দিলেই কেমন যেন একটা নিষ্ঠুরতা আমার ওপর ভর করে—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। যখন আমি একাকী থাকি, নানা প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করে আসে। সৈনিকের জীবন মানেই ত হানাহানির জীবন। পৃথিবীতে যদি হিংসা, ঘৃণা, লিপ্সা ইত্যাদি না থাকত, তবে হয়ত আদিমকাল থেকে এ সৈন্য পোষার প্রয়োজন হ'ত না। অনন্তকাল ধরে হানাহানি করে পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়েছে, সব রক্ত ধরে রাখলে হয়ত একটা সমুদ্রই হয়ে যেত।"

একটুখানি চুপ করে থেকে বিজয়কুমার আবার বলল, "এক-একবার ইচ্ছা হয় সৈনিকের এ-ধরাচুড়া ছেড়ে কোথাও কোন মঠে-মন্দিরে চলে যাই। কিন্তু যাই কী করে। দার্জিলিং-এর এক গ্রামে বুড়ো অথব মা আর একটি ছোট বোন প্রতিমাসে মানি-অর্ডারের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে। মহামায়ার এ বাঁধন ছিন্ন করি কী করে।"

বিজয়কুমারের চিন্তার গভীরতায় মুগ্ধ হলাম। কিন্তু আলোচনা উভয়ের অজান্তে বিজয়কুমারের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাই আলোচনার গতি পরিবর্তনের জন্য আমি বললাম, "বিজয়কুমার, তোমার বেশীরভাগ গানেই দার্জিলিং-এর বর্ণনা। তোমার গান এবং কবিতা কি শুধু প্রকৃতি-কেন্দ্রিক না অন্যান্য বিষয়েও তুমি লেখ?"

বিজয়কুমার বলল, "স্যার, দার্জিলিং আমার জন্ম-ভূমি। এর গাছ-ফুল-নদী-পর্বত-পাখি—সব কিছুর সঙ্গে আমি কেমন যেন রক্তের সম্পর্ক অনুভব করি। দার্জিলিং সম্বন্ধে যা-কিছু আমি ভাবতে চাই বা বলতে চাই, সবই যেন আমার কাছে গানের আকারে ধরা দেয়। আমার অন্য কবিতাও আছে। একদিন এসে আপনাকে শোনাব।"

বিজয়কুমার মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসে রইলাম। নিজের অজান্তেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা লাইন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—

"সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নেই বাহিরের দেশ-কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

॥ ২ ॥

হাসপাতালে বসে বসে রোগী দেখছিলাম। রোগী-দের সঙ্গে তাদের অসুখ সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছিল দোভাষীর মাধ্যমে। দোভাষী এখানে হাসপাতালের অ্যাটেনডেন্টরা। ওরা কাজ চালাবার মত ভাঙা ভাঙা অসমিয়া জানে। আমিও ইতিমধ্যে গোটা-কয়েক অসমিয়া শব্দ শিখে আর তার মাঝে বাংলা শব্দ জুড়ে দোভাষীদের সঙ্গে কথা বলি। যেটুকু ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তা আকারে-ইঙ্গিতে পুষিয়ে নিই। আমি বললাম, "কি দুঃখ আছে? (তোমার কষ্ট কি?)"

দোভাষীর কাজ করছিল কিচিংকাম। সে তাদের

ইমচুংগর ভাষায় তা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রোগীকে জিজ্ঞেস করল। রোগীটি আবার কিচিংকামকে তাদের ভাষায় বলল এবং কিচিংকাম রোগীর হয়ে আমাকে বলল, "মন বিথাইছে (বুকে ব্যথা আছে)।"

বুকে ব্যথা। সুতরাং আমি কিচিংকামের মারফতে রোগীকে জিজ্ঞেস করলাম, "জ্বর হয় কি না, কাশি আছে কি না, ব্যথাটা শ্বাস টানতে লাগে কি না, ইত্যাদি" এবং কিচিংকাম আবার প্রত্যেকটা কথার উত্তর রোগীকে জিজ্ঞেস করে আমাকে বলল।

বাহ্যিক পরীক্ষা শেষ করে সবে রোগীর বুকে ষ্টেথোস্কোপ বসিয়েছি, হঠাৎ দুম্ দুম্ করে শব্দ হল হাসপাতালের চালের টিনগুলো যেন ঝন্ ঝন্ করে উঠল।

যেখান থেকে শব্দটা আসছে, তা খুব দূরে মনে হল না। বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে কোথাও সংঘর্ষ বেধেছে —তবে কোথায় এবং কতদূরে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘড়িতে বারোটা বেজে দশ মিনিট। হাসপাতাল বন্ধ করে বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। পথে একটি সিপাই একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা খুলে পড়লাম। লিখেছেন ক্যাপ্টেন্ বলবীর সিং।

আগেই সন্দেহ করেছিলাম। চিঠি পড়ে গোটা ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'ল। বলবীর সিং লিখেছেন, "ডাক্তার সাহেব, আনাতুংরি বস্তির কাছে কিপিরিগামী পেট্রল পার্টি আক্রান্ত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নি। মেডিক্যাল্ হেল্পের দরকার হবে।"

চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি সোজা মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে চলতে শুরু করলাম। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সমস্ত ক্যাম্পে একটা থমথমে ভাব। বলবীর সিং ক্যাম্পের ভেতরে ডাকবাংলোয় থাকতেন। আমি সেদিকেই অগ্রসর হলাম। আমাকে দেখে বলবীর সিং বললেন, "আইয়ে ডাক্তার সাহেব, আইয়ে।" তিনি কিছুটা উত্তেজিত, বারান্দায় পায়চারি করছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খবর কতটুকু পেয়েছেন ক্যাপ্টেন্ সাহেব?"

বলবীর সিং একটা চেয়ারে বসে বললেন, "খবর এ-পর্য্যন্ত যতটা পেয়েছি, তা রীতিমত উদ্বেগজনক। ফাইটিং এখনও চলছে, শব্দ শুনে তা ত বুঝতেই পারছেন। রিইন্‌ফোর্স´মেন্ট পাঠিয়েছি। ওরা এখনও বোধ হয় পৌঁছায় নি। এদিকে ইন্‌ফরমার একটুখানি আগে খবর এনেছে বিদ্রোহীদের আজকের প্রোগ্রাম্ নাকি পেট্রল পার্টি´কে একদল এ্যাটাক্ করবে এবং অন্য-দল অ্যাটাক্ করবে এই ক্যাম্প, তাই নিজে রি-ইন্‌ফোর্স´ পার্টি´র সঙ্গে না গিয়ে ক্যাম্প আগলে বসে আছি।"

পরিখার মধ্যে সিপাইদের মাথা দেখা যাচ্ছে। আসন্ন একটা আক্রমণের আশঙ্কায় তারা প্রস্তুত।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে বলবীর সিং ওয়্যারলেস্-এর দিকে চললেন। গিয়েই একটা মেসেজ পেলেন সেখানে। ওটা পড়ে বলবীর সিং-এর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাগজ-খানা ভাঁজ করে বলবীর সিং বললেন, "ডক্টর, খবর খারাপ। হতাহত অনেক হয়েছে। রি-ইন্‌ফোর্স´মেন্ট চেয়েছে অর্থাৎ আমাদের রি-ইন্‌ফোর্স´মেন্ট এখনও পৌঁছায় নি।"

আমি বললাম, "ক্যাপ্টেন্ সাহেব, যেখানে এত লোক হতাহত হয়েছে, সেখানে মেডিক্যাল্ হেল্প খুবই জরুরী। আপনি ব্যবস্থা করুন, আমিও স্পটে যাব।"

বলবীর সিং বললেন, "আপনার কি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

"খাওয়া-দাওয়া পরে হবে। অনেকগুলো লোক হত এবং আহত হয়েছে, দেরী হলে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়বে। আপনি বরং আমার জন্য ছোট একটা এস-কর্ট´ (escort) পার্টির ব্যবস্থা করুন।" কিছুটা উত্তেজিত হয়েই আমি বললাম।

তাই হল। বারোজন সিপাই এবং একজন হাবিল-দারের ছোট একটা দল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হল। সঙ্গে ঔষধপত্র নিয়ে চারজন কুলি। মিলিটারী ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আমরা পুংরো টিলার গা বেয়ে সোজা নীচের দিকে নামতে লাগলাম। আমরা যত এগুচ্ছি,

গুলির শব্দ ততই স্পষ্ট হচ্ছে। সামনে লড়াই হচ্ছে। বেশ কিছু লোক ইতিমধ্যে হতাহত হয়েছে। আমি যাচ্ছি সে যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে মর্টার ও মেশিনগান গর্জাচ্ছে। মনে প্রাণে তীব্র একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম।

হঠাৎ গুলির শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। সিপাইরাও চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। শব্দ আর হচ্ছে না। তখন সিপাইরা খুব জোরে চলতে শুরু করল। বলল, "বিদ্রোহীরা বোধ হয় পালিয়েছে।"

গুলির শব্দ বন্ধ হয়েছে। বিদ্রোহীরা পালিয়েছে। সিপাইরা জোরে চলছে। আমিও জোরে চলছি। এখনই মেডিক্যাল হেল্প-এর দরকার সবচেয়ে বেশী।

রাস্তাটা নীচের দিকে ঢালু হয়ে নামতে নামতে বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে। এ জায়গাটা ধূপগাছে ভরা। মোড় ঘুরে রাস্তাটা আবার নীচের দিকে নেমেছে এবং তারপর আনাতুংরি বস্তির ভেতর দিয়ে সোজা ঝুমকি নদীর দিকে নেমে গেছে।

আনাতুংরি বস্তি থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' ফার্লং দূরে এম্‌বুশ (ambush) করা হয়েছে। এম্‌বুশের উপযুক্ত জায়গাই বটে। ওই জায়গার রাস্তাটা প্রায় খাড়াভাবে নীচের দিকে নেমেছে। বাঁ দিকে দুর্গম পথ— কোন মানুষের পক্ষে পালানো অসম্ভব। ডানদিকে নিবিড় জঙ্গল। এই জঙ্গলে গা-ঢাকা বিদ্রোহীরা ওৎ পেতে বসে ছিল। সামনে এবং পেছনে হালকা মেশিনগান বসিয়েছিল এবং পেট্রল পার্টি দুই মেশিনগানের আওতায় প্রবেশ করতেই গুলি শুরু করেছে। যদি কোন সিপাই ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকে 'পজিসন' নেওয়ার চেষ্টা করেছে অমনি জঙ্গলের ভেতর থেকে রাইফেল দিয়ে গুলি করা হয়েছে। সুতরাং পেট্রল পার্টি 'পজিশন' নেওয়ার আগেই তাদের মধ্যে অনেক হতাহত হয়েছে। রিইন্‌ফোর্স পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা পালিয়েছে।

বীভৎস দৃশ্য। যারা মরেছে তাদের ত সব যন্ত্রণার অবসান হয়েছে, কিন্তু যারা আহত হয়েছে তাদের করুণ আর্ত্তনাদে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত। মালপত্র হাতিয়ার ইতস্ততঃ ছড়ান। সব মিলিয়ে একটা বিপর্যস্ত অবস্থা।

* * *

আবার চড়াই-র দিকে রওয়ানা হলাম। আনাতুংরি বস্তির প্রায় সমস্ত সমর্থ পুরুষ মানুষকে কাজে লাগান হয়েছে। জীবিত সিপাইরা এবং আনাতুংরি বস্তির লোকেরা হতাহতদের বয়ে আনছে। চার জন করে লোকের কাঁধে একটি করে বাঁশের মাচা।

চড়াইর দিকে চলেছি। উৎরাই-র দিকে যেতে সময় লাগে কম। অনেকটা সর সর করে নেমে যাওয়া যেন ঢালু হয়ে গড়িয়ে পড়া। কিন্তু চড়াই—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকে নিজের শরীরের ওজনটাকে টেনে তোলা। পরিশ্রম অনেক বেশী। পা টিপে টিপে লাঠি ভর করে সাবধানে এগিয়ে যাওয়া। সুতরাং যাওয়ার সময় যতটা সময় লেগেছিল, তারচেয়ে অনেক সময় লাগছে। পুংরো টিলাকে যেন অনেক বেশী উঁচু মনে হচ্ছে।

বাতাস সোঁ সোঁ করছে। পাইন ও ধূপ গাছের ফাঁক দিয়ে যখন বাতাস বয় তখন এমনি শব্দ হয়। কিন্তু আজ বাতাসের শব্দ যেন করুণ আর্ত্তনাদের মত শোনাচ্ছে! অসংখ্য নারীকণ্ঠ যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। জঙ্গলের ভেতরে দু'টো পাখি ককিয়ে উঠল।

আকাশে চাপ চাপ মেঘ জমেছে। নাগাপাহাড়ের আকাশে এমনি মেঘ হামেশা জমে। কিন্তু আজকের মেঘ যেন পেছনে ফেলে আসা জমাট বাঁধা বিবর্ণ রক্তের মত। একটু পরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। ক্রমশঃ পায়ে হাঁটা রাস্তাটা পিছল হয়ে এল।

চলছি ত চলছিই। পা-দুটো আমার অসাড় হয়ে আসছে—কাঁপছে। শরীর অবসন্ন। সকালে চা-রুটি খেয়েছিলাম। দুপুরে খাওয়া হয়নি। উত্তেজনার মাথায় না খেয়েই চলে এসেছিলাম। ঘড়িতে বেলা আড়াইটা। মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানুষের একটা শোভাযাত্রাকে সঙ্গে নিয়ে

ক্লান্ত অবসন্ন পা-দুটোকে টেনে টেনে চলছি। আজ কপালে কখন খাওয়া জুটবে কে জানে।

আস্তে আস্তে ঝড় হাওয়া বইতে শুরু হল। পাইন ও ধুপ গাছের শোঁ শোঁ শব্দ বিকটভাবে শাঁ শাঁ করে উঠল। যেন শত শত দৈত্য গভীর অরণ্যভূমিকে আলোড়িত করে ধেয়ে আসছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝে মাঝে বজ্রের শব্দও হচ্ছে।

দাঁতে দাঁত চেপে চলছি। সঙ্গে মৃতের শোভাযাত্রা। চারদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব। দুর্যোগের ঘনঘটায় সমগ্র পরিবেশটা যেন অশুভ হয়ে উঠল।

পুংরোর রাস্তা যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। পুংরো পাহাড় কিছুতেই যেন আজ তার শীর্ষে উঠতে দেবে না, আর আমরাও ওই শীর্ষে উঠতে কৃতসঙ্কল্প, যেখানে মিলিটারী ক্যাম্প।

নাগারা স্থানীয় লোক। এরূপ ঝড়জলে পাহাড়ী রাস্তায় তারা চলতে অভ্যস্ত। সিপাইরাও কম যায় না। নিয়মিত পরিশ্রম ও অভ্যাসে তাদের শরীরও অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাকী রইলাম আমি—যে এ পরিবেশে নতুন।

আমার অনভ্যস্ত ক্লান্ত পা-দু'টো ক্রমশঃ পিছিয়ে যেতে লাগল। নাগা কুলি ও সিপাইরা হতাহতদের কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ঝড়ো হাওয়া বাড়ছে, সঙ্গে বৃষ্টিও। গায়ের কাপড়-চোপড় ভিজে একাকার। হাত-পা শরীরে আছে কি না বুঝতে পারছি না। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে চিমটি কাটলাম। এ যেন বরফের গায়ে চিমটি কাটা। ব্যথার অনুভূতি নেই।

কতক্ষণ এভাবে চলেছি জানি না। আচমকা বলবীর সিং-এর গলা কানে এল। বলবীর সিং কিছু লোক নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ার জন্য এতক্ষণ খেয়াল ছিল না কতটা রাস্তা এসেছি। এবার খেয়াল হল। আমরা প্রায় এসে গিয়েছি। পুংরো আর দূরে নয়। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে মিলিটারী ক্যাম্পটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

এখান থেকে বলবীর সিং-ও আমাদের সঙ্গী হলেন।

ক্যাম্পে ঢুকে বলবীর সিং আমাকে ডাকবাংলোর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন এবং ফিসফিস করে বললেন, "আপনার খাওয়া হয়নি। টেবিলের ওপর আপনার খাবার ঢাকা আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে আসুন। অনেক কাজ বাকী।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা প্রায় পাঁচটা। এতক্ষণ ঝড়জলের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন অনুভূতি ছিল না। বলবীর সিং-এর কথায় এত দুর্যোগের মধ্যেও পেটটা চন চন করে উঠল।

গোগ্রাসে ভাত গিলে যখন এলাম, তখন হত ও আহতদের মিছিলটা এসে নেমেছে। মৃতদের একদিকে রাখা হয়েছে। ওভারসীয়ার শ্রীবাস্তব উত্তরপ্রদেশের লোক। একদম নতুন। সেও আহত হয়েছে।

জর্জ ও আমি মিলে যখন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করলাম, রাত তখন ন'টা। এদের মধ্যে তের জনের আঘাত গুরুতর এবং সতের জনের আঘাত কিছু কম।

এবার এলাম মৃতদের পাশে। পর পর ন'টা দেহ বাঁশের মাচার ওপর রয়েছে। প্রথম দেহটিকে ভাল করে দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে বিজয়কুমার। সে আমার সিক্‌লিস্টে ছিল এবং মাত্র গতকাল কাজে যোগদান করেছে। বিজয়কুমার মৃত এ যে বিশ্বাসই হয় না। বুকে গুলি লেগেছে। মুখটা সম্পূর্ণ অবিকৃত। বিজয়কুমারের মুখে মিষ্টি হাসি এখনও যেন লেগে রয়েছে।

পার্বতীর কান্নায় টেকা যাচ্ছে না। নীলবাহাদুরও মাথায় গুলি লেগে মারা গিয়েছে।

পার্বতী ছেলেমানুষ। বিয়ের পর ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে, যদিও ফ্রকেই তাকে ভাল মানায়। কিন্তু স্বল্প কয়েকদিনের বিবাহিত জীবনেই পার্বতী স্বামীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে নারীজাতির যে শাশ্বত সচেতনতা তা এর মধ্যেই পার্বতীর মধ্যে পুরোপুরি দেখা দিয়েছে। সুবেদার এবং তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা

করছেন: কিন্তু কিছুতেই সে প্রবোধ মানছে না। পার্বতীর কিশোর সিঁথিতে সিঁদুরের ফোঁটা বড় বেশী জ্বল জ্বল করছে।

* * *

মৃতদের সম্বন্ধে আমার কাজ শেষ। এবার তাদের সঙ্গে যে যে জিনিষপত্র এবং টাকা পয়সা পাওয়া গেল, তার একটা হিসাব লিখলেন বলবীর সিং এবং সার্কেল অফিসার যোসেফ।

বিজয়কুমারের দেহ তল্লাসী করে বলবীর সিং আমাকে ডাকলেন। বিজয়কুমারের হাতঘড়ি, টাকা পয়সা ইত্যাদি ছাড়া আরো দু'টি জিনিষ পাওয়া গেল। তার পিঠের ব্যাগে একখানা ডায়েরী বই, একখানা কবিতার বইর পাণ্ডুলিপি এবং বুকপকেটে একখানা ছোট ফোটো। বুঝা গেল এ জিনিষগুলো বিজয়কুমার সবসময় তার সঙ্গে রাখত। ফোটোখানা এক তন্বী পাহাড়ী যুবতীর। ফটোটা রেখে ডায়েরীটা খুললাম। হিন্দীতে লেখা আত্মকাহিনী। কিন্তু খানিকটা পড়েই বুঝলাম এ শুধু আত্মকাহিনী নয়—এ যে রীতিমত উপন্যাস। কোন এক দয়িতার উদ্দেশে বিজয়কুমার ডায়েরীর পাতায় লিখেছে "...কিন্তু প্রেমের পরিণাম কি চোখের জল? দুঃখের আগুনে পুড়ে প্রেমের কি কোন রূপান্তর হয়—নইলে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হতে পারল না কেন?"

ডায়েরীর আর একজায়গায় বিজয়কুমার লিখেছে—"...আমার জীবননাট্যের যেখানে তুমি প্রবেশ করেছিলে, সে ত দৃশ্য নয়—দৃশ্যান্তর।"

মৃত বিজয়কুমারের দিকে আবার তাকালাম। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনটা ভরে গেল। বিজয়কুমার সামান্য সৈনিক নয়। সে কবি, দার্শনিক, গায়ক এবং প্রেমিক। নিজের গুণ সম্পর্কে বিজয়কুমার কোনদিন সোচ্চার হয়নি। 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে—'

আমার বাংলোর বাঁদিক্ ঘেঁসে যে বিরাট টিলাটি আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে টিলাটি অজস্র বুনোফুল এবং লতাগুল্মে ঢাকা, যে টিলাটির গা বেয়ে একটি পাহাড়ী ঝর্ণা অবিশ্রাম ঝর ঝর করে ঝরছে এবং যার মাথার ওপর অজস্র ধুপ গাছ ছত্র ধরে আছে, তারই এককোণে ঝর্ণার পাশে বিজয়কুমার সহ ন'জন সিপাইকে সমাহিত করা হল। দেখতে দেখতে কবি, গায়ক এবং প্রেমিক বিজয়কুমারের দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেল।

* * *

বিজয় কুমার বলেছিল সুযোগ পেলেই এসে আমাকে গান শোনাবে। সে সুযোগ আর হয়নি। কোনও জ্যোৎস্নারাতে বারান্দায় বসে ওই টিলার দিকে তাকালে অকারণে ধুপগাছগুলো যেন ফিস্ ফিস্ করে উঠত। মনে হত কোন সুদূর থেকে যেন বিজয়কুমারের গলা সেই ফিসফিসানির সঙ্গে ভেসে আসত এবং বিজয়কুমারের ডায়েরীর লেখা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠত—"দুঃখের আগুনে পুড়ে কি প্রেমের কোন রূপান্তর হয়, নইলে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হতে পারল না কেন?" সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠত আর-একটা ছবি। নাগা-হিলস্-এর রাজধানী কোহিমায় অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোহিমার রণাঙ্গনে নিহত মিত্রপক্ষের সৈন্যদের সমাধিভূমি। এক অখ্যাতনামা মৃত সৈনিকের বুক পকেটে তারই রচিত দুটো কবিতার লাইন নাকি পাওয়া গিয়েছিল যা তার সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে—

> "When yon go home
> Tell them of us and say,
> For their tomorrow
> We give our today.

কত সম্ভাবনাময় বিজয়কুমার এমনি চোখের আড়ালে ঝরে পড়ে।

বৈশালীর নটী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সেকালের লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালী। ধনে জনে সুখে সম্পদে সমৃদ্ধ কায়ী নানা শ্রেণীর বসবাস ও বাণিজ্যে বৈশালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বহু বিখ্যাত এ রাজ্যের বৈভব গৌরব।

নগরের শ্রেষ্ঠা নটী আম্রপালী। অপরূপ যৌবন-সমৃদ্ধ তনু-সৌষ্ঠব, চিত্তরঞ্জিনী লাবণ্যের সৌন্দর্য-প্রতিমা, বিবিধ ললিতকলা-বিলাসিণী।

রাজধানীর উপান্তে তার সুরম্য উদ্যান-বাটিকা। ধনশালী ভোগবিলাসীদের পরম আকাঙ্ক্ষার স্থল।

সেদিন নব বর্ষা সমাগমের এক স্নিগ্ধ দ্বিপ্রহর। ঘন বর্ষণ শেষে অবারিত হয়েছে আকাশের নীলিমা। গ্রীষ্মের প্রখর সন্তাপ থেকে বৈশালীবাসীরা তখন মুক্তি পেয়েছে।

আপনার সুসজ্জিত শয়নকক্ষে দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিল আম্রপালী। নিদাঘের দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অবসান-প্রায়। সুবাসিত শয্যায় নটী আঁখি মেলে চাইলে পরম আলস্যে। গবাক্ষ পথে দৃষ্টি তার প্রসারিত হল। স্তিমিত সূর্যকিরণ বিচিত্র আলোছায়ার মায়া রচনা করে চলেছে আন্দোলিত লতা-পত্রে।

আম্রপালী অলস নয়নে সে দৃশ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করলে। পুনরায় তার আঁখিপল্লব নিমীলিত হল বিলম্বিত তন্দ্রায়। সুকোমল পার্শ্ব-উপাধানে শিথিল আলিঙ্গন করলে।

অলিন্দে পিঞ্জরের শুক ডাক দিলে—জাগ জাগ সখি, জাগ জাগ।

নটীর সস্নেহ তিরস্কারে মৌন হল শুক পাখি।

আম্রপালী নিদ্রার আশা এবার ত্যাগ করলে। পালঙ্কের এক প্রান্তে অর্ধশায়িতা হল আর একটি উপাধানে। গজদন্তের ক্ষুদ্র দর্পণটি নিয়ে দৃষ্টিপাত করলে। সুখ দিবানিদ্রার শেষে ঢল ঢল মুখকান্তি। আঁখিনিম্নে ছায়ার আভাস চক্ষুদুটিকে যেন আরো আয়ত, আরো মোহময় করেছে। তৃপ্ত হাসির স্ফুরিত রেখায় উল্লসিত হল অধর-প্রান্ত। আপন রূপে আপনি মুগ্ধা আম্রপালী।

বিগত নিশি যাপনের স্মৃতি অন্তরে উদয় হল। কাল এক ভিন্নদেশী শ্রেষ্ঠী অতিথি ছিলেন তার উদ্যান-ভবনে। সুদূর মদ্রদেশ-নিবাসী তিনি। কর্ম্মসূত্রে বৈশালীতে নগর-শ্রেষ্ঠীর আবাসে কিছুদিন যাবৎ তিনি অবস্থান করছিলেন। বাণিজ্যিক কাজের শেষে এবার তাঁর বিদায়ের পালা। সেই শ্রেষ্ঠীর নিকটেই মদ্রদেশীয় ব্যক্তিটি বৈশালীর শ্রেষ্ঠা নটীর সন্ধান করেছিলেন। এই রাজধানীতে নৃত্যকলায় শ্রেষ্ঠা সুন্দরী কে? যত স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিতে হয় তার জন্যে তিনি প্রস্তুত। এক রাত্রির জন্যে নগর-শ্রেষ্ঠীই তাঁকে আম্রপালীর নাম করেছিলেন। তাঁর সম্মতিতে আম্রপালীও নগর-শ্রেষ্ঠীর অনুরোধ রক্ষা করে।

মদ্রবাসীর কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করল আম্রপালী। নৃত্যকলা উপভোগ তাঁর ছলমাত্র। শ্রেষ্ঠা নটীর আবরণে শ্রেষ্ঠা রূপবতীই তাঁর লক্ষ্য ছিল। আম্র-পালীরও আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই। এই তার জীবনের

বৃত্তি। সমাজ-অনুমোদিত জীবিকা। এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা একটি রজনীতে উপার্জন হল। উপাধানতল থেকে রেশমী থালক টি একবার ধারণ করল নটী। স্বর্ণমুদ্রাগুলি ক্রীড়াচ্ছলে বন্ধনীমুক্ত করে দেখল। মধুর রিনিঝিনি শব্দতরঙ্গ।

কিন্তু সে-ধ্বনি সাড়া জাগাল না আম্রপালীর অন্তরে। বরং সে আর এক ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মন তার ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল কি এক অব্যক্ত বিষাদে। স্বর্ণমুদ্রার স্পর্শ কোন তৃপ্তি আজ দিতে পারল না। বরং এক অদ্ভুত অতৃপ্তির অনুভব জাগল মনের সঙ্গোপনে। অননুভূত এক রিক্ততার বিষণ্ণতা। গত রাত্রের শ্রেষ্ঠীর তুল্য বৈশালীর কত বিত্তবান্, কত প্রতিপত্তিশালী কিংবা বৈশালীতে আগত কত সম্রান্ত ব্যক্তিই তার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বহুমূল্য উপহারে-আভরণে কৃতার্থ করেছেন তাকে। মণি-মুক্তা-কাঞ্চন-রত্ন কত লাভ হয়েছে। দাতারা উপভোগ করেছেন তার নৃত্য-সঙ্গীত বিলাসকলা, রূপ-লাবণ্য যৌবন-হিল্লোলিত তনুলতা দর্শনে আদান-প্রদানের এই তৌলদণ্ডে কোথায় হৃদয়ের স্থান? সেই হৃদয়ের বুভুক্ষায় আজ আকুল হল অমিত-ঐশ্বর্য্যশালিনী নটীর অন্তর। এত সম্ভোগের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও রিক্ততা, এত অতিথি অভ্যাগতদের নিয়েও নিঃসঙ্গতার দুঃখ। মনে হল, তার উদ্যানের সামান্য মালিনীও তার চেয়ে অনেক সুখী। কারণ তারও আছে হৃদয়ের আপনজন। কিন্তু আম্রপালী সঙ্গহীন।

লিচ্ছবি রাজ্যে বহিরাগত সম্মানভাজন বিলাসীর আগমন ঘটলে নটীই তাঁর বিনোদনের ভারপ্রাপ্তা হয়। এমনি সব রজনীর পরেই তার মনে বেশী করে জাগে একাকিত্ববোধ। আজও তেমনি।

অন্যমনস্ক হয়ে আম্রপালী স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখছিল। এমনি আরও কত কনকের রাশিতে পূর্ণ আছে তার সঞ্চয়ের পেটিকা। কিন্তু আপন অন্তরেই এ কি অপূর্ণতা? করপুটের স্বর্ণমুদ্রা থেকে কক্ষের চতুর্দিকে নানা ঐশ্বর্যসম্ভারের দিকে আম্রপালী দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কারুকর্ম-শোভন রৌপ্যদণ্ডের পালঙ্ক। মসৃণ কোমল মূল্যবান্ শয্যাদি। রৌপ্যমণ্ডিত স্বর্ণশীর্ষ দীর্ঘ দীপাধার। আপন অঙ্গে অঙ্গে মণি-রত্নময় কত সুচারু আভরণ। গজদন্ত নির্মিত সুদৃশ্য মুকুর। মাণিক্য-খচিত বহুমূল্য তাম্বুলাধার, আরও কত মনোহর বিলাসদ্রব্য ইতস্ততঃ সজ্জিত রয়েছে। দুয়ার পথে দেখা যায় সুপ্রশস্ত বহির্কক্ষ। মান্যগণ্য অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্যে সেটি নির্দিষ্ট। তার মসৃণ মর্ম্মরতল নৃত্য-ছন্দিত চরণাঘাতে মুখর হয়ে ওঠে কত ত্রিযামা নিশীথে। বিচিত্রিত বর্ণলেপনে অলঙ্কৃত দেওয়াল, অতিথিদের আরামের মনোরম আসন, দীপবর্তিকা, পাত্রাদি নানা প্রয়োজন ও সজ্জা-সামগ্রীতে সুবিন্যস্ত বিশাল প্রকোষ্ঠ—আম্রপালীর রঙ্গশালা! কিন্তু কে জানে এই সব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীর গহন মর্ম্মের সন্ধান?

আবেগ বিধুর একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে নটী পালঙ্ক থেকে নেমে এল। স্তিমিত হয়ে এসেছে অপরাহ্নের আলো আম্রপালীর প্রাক্‌সন্ধ্যা প্রসাধনের এই ক্ষণ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ নটী, দৈনন্দিন অভ্যাস বশেই, প্রসাধিতা হল এবং কি অপরূপ কান্তিময়ী হয়ে উঠল। ঈষৎ কুসুম-শোভন কবরী রচনা, আয়ত আঁখিপটে কজ্জল রেখা, সূক্ষ্ম চূর্ণের মুখ-প্রলেপ ও ওষ্ঠরঞ্জিনী। কণ্ঠের শতনরী হার উন্মোচন করে নটী একটি মুক্তামালা ধারণ করলো, কর্ণে রত্নকুণ্ডল। বাহুবল্লরীতে চুনী পান্না খচিত একটি মাত্র কঙ্কন। বরাঙ্গে রক্তগোলাপ বর্ণের চিকন বহির্বাস। মসৃণ আবরণের মধ্যে দেহশোভার আভাস।

মুনিচিত্তহারিণী রূপ নিয়ে আম্রপালী অলিন্দে এসে দণ্ডায়মান হল। পশ্চিম গগনে অস্তরাগের রক্তিমাভা। তারই কনকবর্ণের ছটায় ঝলমল করে নটী অঙ্গ। আকাশের রঞ্জিত মেঘমালায় মৃগনয়নীর ঘন কৃষ্ণ চক্ষুতারকা ইতস্তত সঞ্চরণ করছিল। ক্রমে তার মুগ্ধ দৃষ্টি হয়ে এল নিম্নমুখী। আপনার সু-প্রসন্ন উদ্যান অঙ্গনে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। বৃক্ষরাজির শাখার পল্লবে, পুষ্প স্তবকে, ক্ষুদ্র দীর্ঘিকায়, লতাগুল্মের তোরণ দ্বারে।

সম্মুখে জনবিরল পরিচ্ছন্ন পথ। তার দক্ষিণে নিভৃত শান্তির নীড় এক প্রশস্ত আম্রকুঞ্জ। তার তরুশ্রেণীর শাখা কাণ্ডের বিস্তারে সমগ্র কুঞ্জতল স্নিগ্ধ ছায়াময়। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্যামল পত্রসম্ভারে সূর্যাস্তকালের কিরণজাল বিচিত্র বর্ণ মায়া সৃজন করেছে।

সহসা তারই এক প্রান্তে আকৃষ্ট হল নটীর নয়ন। সচকিত হয়ে দেখলে—আম্রতরুতলে পদচারণরত এক দেবকান্ত পুরুষ। তাঁর বর অঙ্গের দিব্যদ্যুতিতে আম্রকুঞ্জ যেন বিভাময় হয়ে উঠেছে।

বিস্ময়ে বিক্ষুব্ধ হল আম্রপালী। কে এই অলোকসামান্য বরতনুধারী? পূর্বে ত তাঁর কখনো দর্শন মেলেনি এখানে? কোথা হতে তাঁর আগমন? কি পরিচয়?

অপলক চক্ষুতে নটী দেখতে লাগল সেই অপূর্ব দর্শনকে। তারপর তাঁর পরিচিতি লাভের জন্যে কৌতূহল দুর্বার হল।

কক্ষান্তরে এসে একবার দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখে নিলে আম্রপালী। আপন রূপমাধুরী আপনিই একবার পরীক্ষা করলে যেন। আর কিছু সজ্জা আভরণের প্রয়োজন আছে কিনা। মুকুরে একবার কটাক্ষও হানলে। ত্রুটি কিছু নেই। রক্তপদে শুধু নূপুর যুক্ত করে নিলে। অবিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হল সর্ব অঙ্গে হিল্লোল তুলে।—কক্ষ থেকে অলিন্দে। সেখান থেকে উদ্যানে। তোরণ পার হয়ে পথে। অবশেষে আম্রকুঞ্জে।

কম্প্রবক্ষে নূপুরশিঞ্জিত চরণে আম্রপালী সেই বৃক্ষতলের সন্নিকটে উপস্থিত হল।

আপন ভাবনায় আপনি নিমগ্ন ছিলেন অপরূপ বিভাময় পুরুষ। নটীর অলঙ্কার নিক্কণে যেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। বিস্মিত হয়ে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন এদিকে। দেখলেন—এক অনিন্দ্য রূপলাবণ্যময়ী যুবতী। মুগ্ধা, সম্মোহিতা। আবেশে নিবিড় তার আয়ত চক্ষুপল্লব।

তাঁর অপলক দৃষ্টি দেখে আম্রপালীর অন্তরে পুলকের উচ্ছ্বাস জাগল। মনে হল, এই পরম রূপবান্ পুরুষের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি। কিন্তু পরক্ষণেই এমন সঙ্কুচিতাবোধ করলে তাঁর মুখভাব লক্ষ্য করে যে নিজেও তার কারণ অনুধাবন করতে পারল না। তাঁর মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব শান্ত সৌম্যতা, সকল পুরুষের মধ্যে তা যেন এক আশ্চর্য অনন্য। নটীর অভ্যস্ত কপট লজ্জা এখন অন্তরের সত্যরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠল। এমন বিমূঢ়বোধ করলে যা কোনদিন হয়নি তার জীবনে। কোন্ বাক্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত করবে, তাও স্থির করতে পারলে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এই দৃষ্টির সামনে নটী জীবনে এই প্রথম বিভ্রান্ত হল আম্রপালী। শির আপনি আনত হয়ে এল।

বহু পুরুষের আচরণে অভিজ্ঞা, আত্ম-সচেতন বহুবল্লভা। কত রূপবান্ শ্রেষ্ঠী, কত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যে চক্ষুতে তার দিকে চেয়েছে, এঁর দৃষ্টিতে তিলমাত্র সে ভাবের স্পর্শ নেই। এই একান্ত ব্যতিক্রমের সঙ্গে কেমন করে কথোপকথনের সূচনা করবে সে?

কিন্তু অচিরেই নটী এই বিমূঢ়তা মনোবলে জয় করলে। ফিরে পেলে আত্ম-সংবিৎ। লাজ-নম্র নয়নে পুনরায় সেই দিব্যকান্তি দর্শন করতে লাগল। যেন কোন অকলুষ দেবতার প্রতিমূর্তি। পরিধানে গৈরিক বসন মাত্র। সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কিন্তু সর্ব অঙ্গে তপঃলাবণ্যের ঐশ্বর্য। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ।

তবু এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করলে রঙ্গনটী। কামজয়ী ব্রহ্মচারীকে আয়ত্ত করবার কামনা জাগ্রত হল। তাঁর পলাশলোচনে উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ করুণার আলো সাহসিকা করে আম্রপালীকে।

ধীরপদে সে নিকটতর হল। নতি জানিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে প্রগল্ভা বললে, 'মহাভাগ, আপনার পরিচয় বহিরঙ্গেই সুপ্রকাশ। সংসারে, ভোগে আপনার বিরাগ জন্মেছে। বৈরাগীর জীবন গ্রহণ করেছেন আপনি।'

তাপসের চক্ষুতে যুগপৎ কৌতুক ও কৌতূহলের আভাস দেখা গেল। নিরুত্তরেই তিনি শুনতে লাগলেন অপরিচিতা নিলাজিনীর ভাষণ।

আশ্বাস বিবেচনা করে মুখরা নটী বাক্জাল বিস্তার করলে, 'ক্ষমা করবেন, জানি না সুখ ও আনন্দের আস্বাদ

আপনি কতখানি লাভ করেছেন। অথবা আদৌ পেয়েছেন কি-না। যদি পর্যাপ্ত সুখ-সম্ভোগ আপনার না ঘটে থাকে, তাহলে নিজেকে আমি নিবেদন করতে পারি আপনার সেবায়। আপনার ইচ্ছামাত্রে আমার সর্বাঙ্গ ধন্য হবে। আমার ওই সম্মুখস্থ ভবনে আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই। এখানে আছে অপরিমিত আনন্দ—প্রেমসুখ। মুক্তির সন্ধান অন্যত্র কোথায়? কেউ জানে না। এই অবারিত প্রেম, আনন্দ ও সুখের মধ্যে কি মুক্তি নেই?'

অক্রোধ যতি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে এবার উত্তর দিলেন, 'বরাননে, যে আনন্দের, সুখের কথা তুমি জানাতে চাও, তা নিতান্ত ক্ষণিকের। অতিশয় অচিরস্থায়ী। কালবেগে তা দ্রুতগতি বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে সুখের অভিলাষী, তার ক্ষয় লয় নেই। অজয়-মরণহীন। সেই অনন্ত আনন্দের আস্বাদ কি লাভ করব তোমার আলয়ে?'

ভাষণ-পটীয়সী বারবিলাসিনী তথাপি অপ্রতিভ হল না। ঈষৎ রক্তিমাভ মুখে চাতুর্য প্রকাশ করে বললে, 'দেবকান্ত, সেই সুখ ও আনন্দ যদি ক্ষণজীবী হয়, তারও কি সমাধান নেই? সুখের মুহূর্তগুলি ত পরস্পর যুক্ত করে নেওয়া যায়। এমনি অসংখ্য আনন্দক্ষণের মিলন-মালায় মহা-সুখের সার্থকতা লাভ করতে পারেন।' অপরূপ ব্রীড়া ভঙ্গিমায় পুনরায় আত্ম-নিবেদন করলে, 'ওই গৃহে পদার্পণ করে অধীনাকে কৃতার্থ করুন।'

দুর্বিনীতার প্রতি কোন ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ করলেন না সন্ন্যাসী। বরং ক্ষমা-সুন্দর হাস্যমুখে বললেন, 'তোমার অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ করি। কিন্তু জেনো. তোমার প্রস্তাবিত সুখভোগে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ওই প্রকার সুখ আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছি চিরদিনের জন্যে। আত্ম-সংবৃতা হও, গৃহে ফিরে যাও। আমি উদাসীন।'

কণ্ঠে বিষামৃত উদ্বেল করে আকুল হয়ে আম্রপালী বলে উঠল, 'আপনি মায়া-মমতাহীন। নির্দয়। কিন্তু তথাপি আমার আকিঞ্চন, আপনি আজ আমার অতিথি হোন। আমি একান্ত নিঃসঙ্গ। আর আপনার তুল্য পুরুষের সাক্ষাৎ কখনো পাইনি—যদিও...যদিও আপনি তপস্বী!''

'আমি অন্য পুরুষ হতে ভিন্ন নই,' স্মিত হেসে বৈরাগী বললেন, 'শুধু সাহস করে গৃহত্যাগ করে এসেছি গৃহহীন রাজ্যে। আত্মজন, দয়িতদের কাছে চিরবিদায় নিতে অবশ্য সাহসের প্রয়োজন। কিন্তু বৃহৎ সুখের জন্যে আয়োজনও করণীয়। এ-জগতে কিছু লাভ করতে হলে কিছু ত্যাগ অপরিহার্য।'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে নায়িকার আঁখি-কমল বিস্ফারিত হয়, 'অতি অদ্ভুত আপনার আচরণ! সুখ বর্জন করেছেন সুখেরই সন্ধানে? এ কি অযৌক্তিক ভাষণ! এ কি স্ব-বিরোধী মনোভাব।'

পরম ধৈর্যে তাপস সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে দিলেন—"আমার বাক্যে কোন স্বত-বিরোধিতা নেই। যে সুখের মায়া ত্যাগ করে এসেছি তা তিক্ত এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যে সুখ আমি আকাঙ্ক্ষা করি তা মধুর এবং চিরন্তন।"

'তবে কি আপনার শুভাগমন কোনদিনই হবে না এ-দুঃখিনীর গৃহে?' ব্যাকুল আর্তনাদের তুল্য ধ্বনিত হয় আম্রপালীর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ, 'সব সুখের মধ্যেও আমার অন্তরে দুঃখের অন্ত নেই। প্রভু, রিক্ততার বিভীষিকার মধ্যে আমি একাকিনী দিবস-যামিনী যাপন করি। আপনি বরাভয় দান করুন হতভাগিনীর গৃহে।'

অচঞ্চল গম্ভীর কণ্ঠে সন্ন্যাসী আশ্বাস দিলেন, 'যদি সে পরম ক্ষণ আসে তোমার জীবনে, যদি সে অনুভব তোমার মনে যথার্থ জাগে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হব। কিন্তু এখন আমার সময় নেই, আমি যাত্রা করেছি আমার প্রাণের মুক্তির সন্ধানে। আমি চলেছি আমারই অন্তরের পীড়া দূর করতে। মহাপ্রশ্নের উত্তরের আশায় উদ্বেল আমার চিত্ত। অহর্নিশি যে সংশয় আমায় অবরোধ করে রেখেছে, তা হতে আমি উত্তীর্ণ হতে চাই। নিরন্তর যে সন্দেহের ভারে আমি আক্রান্ত হয়ে আছি তার নিরশন না হলে আমার মুক্তি

নেই। আমার চিত্ত-সমস্যার কথা তোমায় বোঝাতে আমি অক্ষম, বরাঙ্গনে।'

বিফলতার বেদনায় অধোবদন হল নটী। তপস্বীকে প্রলুব্ধ করবার আকিঞ্চন তার ব্যর্থ হয়েছে। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। সমস্ত বাক্-চাতুর্য এখন তার অন্তর্ধান করেছে। আনত নয়নে নির্বাক্ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে যখন ফুল্লকমল মুখ উত্তোলন করল, দুই চক্ষুপক্ষ্মে অশ্রুর মুক্তাবিন্দু।

তার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে এবার শুধু উচ্চারিত হল এক প্রার্থনা, 'আপনার সর্ব প্রশ্নের উত্তর যখন লাভ করবেন, মুক্ত হবেন সমস্ত সংশয় থেকে, তখন কি অনুগ্রহ করে দর্শন দেবেন, দেখাবেন আমাকে পথের দিশা? এই দীনা-হীনার কথা কি আপনার স্মরণে থাকবে, প্রভু?'

'আশা করি বিস্মৃত হব না। আমি আসব। জানাব তোমাকে।'

'সেই সৌভাগ্যের আশায় আমি অপেক্ষা করে থাকব, দেব: যতদিন না আপনার পদার্পণ ঘটে। আর একটি নিবেদনের জন্যে আকুল হয়েছে আমার সমগ্র অন্তর কিছুক্ষণ পূর্বেও এ চিন্তা আমার পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এই ক্ষণে আমি স্থির করেছি—প্রথম যৌবন থেকে এতকাল যে প্রকার জীবন আমি যাপন করে এসেছি, তা সর্বথা পরিত্যাগ করব আপনার প্রতীক্ষায়।'

প্রশান্ত স্বরে পরিব্রাজক বললেন, 'কিন্তু কতকাল পরে এ অঞ্চলে উপস্থিত হতে পারব, তার কোন স্থিরতা নেই। অতি কঠিন সমস্যা-জালে আমি জর্জরিত। তার সমাধানে কঠোর তপশ্চর্যায় উদ্‌যাপন করব যতদিন প্রয়োজন। সর্ব সংশয় মুক্ত হবার পর আমি আসব। তার পূর্বে নয়। সেই অনির্দিষ্ট কাল তোমার জীবনের ধারা পরিত্যাগ করবার কথা বলছ? কি তোমার সে জীবনযাত্রা তা আমার অজ্ঞাত। অনুমান করতে পারি মাত্র।'

আম্রপালী নতমুখে আত্মপরিচয় দেয়, 'আমি... আমি বৈশালীর গণবধূ...'

করুণায় পূর্ণ হল সন্ন্যাসীর দৃষ্টি। নটী প্রত্যাশা করেছিল ঘৃণা অথবা ধিক্কারের ভাব। এই সহানুভূতির প্রকাশে যুগপৎ কৃতজ্ঞতায় ও অনুশোচনায় তার অন্তর আকুলিত হল।

বিচিত্র সদয় কণ্ঠে যতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি এক প্রকার জীবনযাত্রা?'

'তাই বলা যায়,' অর্ধস্ফুট স্বরে নারী উত্তর দেয়।

তেমনি কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন—'এই পথ কি তুমি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করেছ?'

'না, প্রভু, না। এ জীবনযাত্রা আমি আপন ইচ্ছায় নির্বাচন করিনি। বরং অতি বিপরীত। এই পথ আমি সর্বান্তঃকরণে বর্জন করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বৈশালী রাজ্যের এ এক বহুকালাগত প্রথা। রাজ্যের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা আমার সম্পূর্ণ অমতে এই জীবনপ্রণালী আমার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। অবশ্য তাঁদের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের এক প্রাচীন সামাজিক প্রথা অনুসারী।'

'অদ্ভুত প্রথা।'

'বৈশালীর গণ-মান্য এই প্রথার পরিচয় দিতে হলে আমার বিগত জীবনের কথাও বিবৃত করতে হয়। কারণ এই প্রথার সঙ্গে আমার দুঃখময় জীবন বিজড়িত হয়ে আছে।'

আম্রপালী তার আত্মকাহিনী, বিশেষ সেই অধ্যায়ের বিবরণ দিতে লাগল,—'আমি জন্ম হতেই দুর্ভাগিনী, প্রভু। যিনি আমার পিতা বলে পরিচিত ছিলেন, আমি তাঁর সন্তান নই। তিনি আমায় পালন করেছেন পিতৃবৎ। আমার প্রকৃত পিতামাতা কে তা জানি না। বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে শুনেছি, আমায় শৈশবে নিরাশ্রয় অবস্থায় একটি আম্রকাননে পাওয়া যায়। তার নিকটেই এক সম্পদ্‌শালী দম্পতির আবাস ছিল। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। সে কারণে মনোকষ্টে জীবন যাপন করতেন। আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তাঁরা নিয়ে গেলেন তাঁদের গৃহে। আমার লাভ করে তাঁরা আনন্দিত হলেন। তাঁদের শূন্য আলয় যেন পূর্ণ হল।

তাঁরা আমায় লালন-পালন করতে লাগলেন পরম স্নেহে, যত্নে। যেহেতু আমার জন্মপরিচয় অজ্ঞাত, সেজন্যে বৈশালীর প্রথা অনুসারে রাজ্যের গণ-নেতারা আমার নামকরণের অধিকারী। আম্র-উদ্যানে পাওয়া যায় বলে তাঁরা আমার নাম দেন—আম্রপালী। পালক পিতামাতার গৃহে সুখে আদরে শশিকলার ন্যায় আমার শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।

'সকলের মুখে শুনেছি, যৌবন সমাগমে আমি হই বৈশালীর সর্বাপেক্ষা রূপবতী কন্যা। নানাজনে বলেছে, আমার তুল্য আকর্ষণী শক্তি সমগ্র গণ-রাজ্যে অন্য কোন বনিতার ছিল না। কিন্তু হায়, সর্বশ্রেষ্ঠা সুদর্শনা হওয়াই আমার চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হল। আমার বিবাহের কথা আরম্ভ হওয়া থেকেই তার সূচনা। ক্রমে আমার বিবাহ উপলক্ষ্য করে—বিবাহ না হতেই —রাজ্যে নানা অশান্তি দেখা দিলে। অনর্থ ঘটতে লাগল দিনের পর দিন। কারণ বৈশালীর অনেকেই আমায় বধূরূপে লাভ করতে লালায়িত হলেন। দেখা গেল, রাজ্যের প্রত্যেক বিবাহার্থী কামনা করছেন আমাকে। পাণিপ্রার্থীরা আমায় রূপে এমন উন্মত্ত হলেন যে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ হতে লাগল। অবশেষে বৈশালীর নানা স্থানে বেধে গেল রীতিমত যুদ্ধ। বহু লোক হতাহত হল। উৎসন্ন গেল কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। ক্রমে অবস্থা এমন শোচনীয় দাঁড়াল যে, রাজ্যের বিবেচক ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন—এক রমণীর জন্যে সমগ্র বৈশালী ধ্বংস হয়ে যাবে।

'তখন রাজ্যের নেতৃস্থানীয়রা চিন্তা করতে লাগলেন এই বিপদ্ থেকে উদ্ধারের পথ। আমার পালক পিতাও রাজ্যের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। একথা সকলেরই সুবিদিত যে, বৈশালীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সেজন্যে পিতার পরামর্শে রাজ্যের নেতারা গণ-সভা আহ্বান করলেন। আমার বিবাহ ব্যাপারে সেখানেই নির্ধারিত হবে ইতিকর্তব্য।

'সেই গণ-সভায় নেতৃবর্গ প্রথমে স্থির করলেন—গুণে কর্মে স্বাস্থ্যে বৈশালীর যে যুবক সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবেন, তিনিই আমায় লাভ করবেন পরিণয় সূত্রে। সকলেই সেই বিবাহ স্বীকার করে নেবেন, সুতরাং আমাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আর কোন অশান্তির আশঙ্কা থাকবে না।

কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকর করতেও অপারগ হলেন গণনেতারা। কারণ শ্রেষ্ঠ পাত্র কে—এবিষয়ে সকলে একমত হতে পারলেন না।

'তখন পুনরায় আহ্বান করা হল গণ-সভার অধিবেশন। কিন্তু নেতৃবর্গের অনেকেই তখনো আমায় দেখেন নি। সে জন্যে সেই সভায় সিদ্ধান্ত করা হল—আমাকে দেখবার পর তাঁরা নির্বাচন করবেন শ্রেষ্ঠ বর।

'তাঁরা আমায় এই উপলক্ষে দেখতে এলেন। কিন্তু কি কুগ্রহ আমার। আমাকে তাঁরা দেখবার ফলে আবার এক নতুন ও জটিল সমস্যার উদয় হল। আমার রূপে নেতারা শুধু মুগ্ধ হলেন না, লুব্ধ হয়ে উঠলেন নিজেরাই। কিন্তু এবার আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলহ বা বিবাদ করলেন না। বরং একমত হলেন আর-এক গণ-সভার অধিবেশনে। সেখানে এই সমস্যার সমাধানে কামাতুর নেতারা আমার সম্পর্কে এক-বাক্যে ঘোষণা করলেন—"গণভোগ্যা।"

'সেই সভায় একমাত্র আমার পালক পিতা এই বিচারের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তাঁর মতামত অগ্রাহ্য হল অন্য সকলের সিদ্ধান্তে।

'বৈশালী রাজ্যের আর একটি প্রথা এই যে, গণ-সভায় গৃহীত প্রস্তাবের ও গণ-সভায় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধ-বাদী হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অতএব প্রতিবাদী আমার পিতা অপরাধী ঘোষিত হলেন, তাঁর শাস্তি ভোগ হবে—বৈশালী থেকে নির্বাসন। আমার সম্পর্কে গণ-সভার সিদ্ধান্ত যদি তিনি কার্যকর না করেন তাহলে পিতাকে এ রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

'আমার প্রতি তিনি এত মমতাপূর্ণ ও কর্তব্যপরায়ণ

ছিলেন যে, এই নিষ্ঠুর দণ্ডও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হলেন।

'আমাকে কেন্দ্র করে এতদিন এত কাণ্ড ঘটলেও আমি কোন মতামত এ যাবৎ প্রকাশ করিনি। কিন্তু আমার স্নেহময় লালনকর্তার এই অসম্মান ও নিদারুণ ক্ষতি আমায় অস্থির করে তুললে। আমার মর্মযাতনার সীমা রইল না। আমি স্থির করলেম—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে এই নির্মম নির্বাসন দণ্ড থেকে তাঁকে মুক্ত করাই আমার কর্তব্য। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্মান অমর্যাদা ইত্যাদি এখানে অবান্তর।

'অবশেষে তাঁকে মুক্তি দিতেই বৈশালীর প্রথা অনুসারে আমায় গণভোগ্যা হতে হল। আজও পর্যন্ত রাজ্যে আমার এই পরিচয়। প্রভু গণনেতাদের শুধু ভোগের পাত্রী গণিকা আমি। আমার দুঃখ বিষাদের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে কারো কোন সম্বন্ধ নেই।'

আম্রপালীর আত্মকাহিনী শোনবার পরেও সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তেমনি করুণাপূর্ণই রইল।

'অদ্ভুত।' কিছুক্ষণ মৌনের পর তিনি পুনরায় বললেন, 'অতি অদ্ভুত বৈশালী রাজ্যের এই প্রথা।'

দিনশেষের আলো তখন বিগতপ্রায়। সন্ধ্যার ছায়া কুঞ্জতলে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

তপস্বী ধীরপদে অগ্রসর হলেন একটি আম্রশাখার দিকে। দীর্ঘদেহী শালপ্রাংশু ভুজ। উত্তোলিত হস্তে শাখাটিকে আনত করলেন। তার ফল ভার থেকে বৃন্তচ্যুত করে নিলেন একটি আম্র।

তারপর আম্রপালীর নিকটে এলেন। ফলটি হাতে নিয়ে সস্নেহে বললেন, 'আম্রপালি, আমার উপহার স্বরূপ এটি রক্ষা করো। অবশ্যই ঐ উপহার মুল্যবান্ কিছু নয়। বরং অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আজ এই মাত্র উপায়ন নাও। আশা করি একদিন অধিকতর সারবান্ কিছু তোমায় দেব।'

সাশ্রুনয়নে করপল্লব প্রসারিত করলে গণভোগ্যা। পরম শ্রদ্ধায় যুক্তপাণিতে আম্রটি ধারণ করলে। গভীর স্বরে বললে, 'এ জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার এই ফল মহামূল্য জ্ঞানে আমি রেখে দেব। আপনার শুভ প্রত্যাগমনের আশ্বাসে আমি আজ হতে অপেক্ষা করে থাকব।'

করপুটের আম্র শুভ্র ললাটে স্পর্শ করলে ভক্তি-ভরে।

তাপস বিদায় নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন, আম্রকুঞ্জ থেকে পথের প্রান্তে। অপসৃয়মান তাঁর সুদীর্ঘ অবয়বের দিকে আম্রপালী চেয়ে রইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে সমস্ত দৃশ্যের সঙ্গে লুপ্ত করে দিলে তাঁর ছায়াও।

শূন্য ভবনে ফিরে এল গণভোগ্যা। বহির্কক্ষে বৃহৎ দীপাধার। তার প্রজ্বলিত দণ্ডের সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু তবু যেন কক্ষের চতুর্দিকে অন্ধকারের ম্লানিমা। কি এক ক্রন্দ্যমান আবেগে অন্তঃস্থল অব্যক্ত বেদনায় মথিত হতে লাগল। কেন এই মর্মযাতনা, কিসের এ আকুলতা—আম্রপালী তার কোন কারণ ধারণা করতে পারলে না।

নিশিশেষে নব প্রভাতের উদয় হল। পুনরায় রাত্রি, দিন। কালচক্র আবর্তিত হতে লাগল মহালীলা ভরে।

গণভোগ্যার জীবন-ছন্দ কিন্তু সেই নৃত্যগীত ভোগ-বিলাসের স্রোতে আগের তুল্য লীলায়িত হল না। অলক্ষিত যাত্রা আরম্ভ হল উজ্জীবনের পথে। পূর্ব-রীতির জীবনচর্যার প্রান্তচ্ছেদ একে একে ঘটে যেতে লাগল। প্রাকৃত জগৎ মহা আবর্তন স্পন্দিত হতে লাগল। দিবসে নিশীথে বিচিত্র পরিবর্তনের ধারা। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বর্ষ গেল। অবিরাম রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্য পটক্ষেপ।

অঙ্কুর হতে ফল। পরিণতির প্রান্তে ক্ষয়। পুষ্পিত যৌবন শেষে খিন্ন-জীর্ণ-জরা। সৃষ্টি অন্তে লয়। কুসুমের বৃন্ত থেকেই পরিণামের সূচনা। জীবনের সমান্তরালে নিত্য ধাবমান্ মৃত্যুর নিশ্চিত পদধ্বনি।

ক্রান্তিকারী মহাকাল। কত সংখ্যাতীত ক্ষণ-বুদ্বুদ্ অতিক্রান্ত হয়ে চলে। আম্রপালীর অন্তর্জীবনেও ঘটে যায় কি যুগান্তকারী পরিবর্তন।

একদিন সন্ন্যাসীদত্ত সেই ফলটি দেখতে ইচ্ছা করে

তার। কিন্তু দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় বিস্ময়ে, বেদনায়। বহুমূল্য জ্ঞানে কি সযত্নে সেটি রক্ষা করতে সে চেয়েছিল কি দুর্মূল্য আধার তার। অতি সুদৃশ্য কারুকর্মখচিত গজদন্তের আবরণী। তার অভ্যন্তরে সুবর্ণমণ্ডিত আস্তরণ। তারই মধ্যে রক্ষিত ছিল আম্রপালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার।

কিন্তু এত ব্যয়ে এত যত্নেও কালের করাল গ্রাস থেকে এ-সামগ্রীকে সে রক্ষা করতে পারেনি ত। ফলটির গতি দেখে বিষাদে স্তব্ধ হয়ে রইল আম্রপালী। সেই সরল সুপুষ্ট আম্র এখন নিতান্ত বিশুষ্ক, অসার! কোথায় গেল তার কাঞ্চনবর্ণ উজ্জ্বল আবরণ? কুঞ্চিত বিশীর্ণ এই কুরূপের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে বিগত দিনের রূপ-রস-গন্ধ। আর তারা ফিরবে না।...

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই হস্তীদন্তের আবরণী উন্মোচন করে আম্রপালী। সেই বিবর্ণ বিকৃত বস্তুটিকে সখেদে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করে। কালের ব্যবধানে একি সকরুণ পরিণাম। আর সেই পরম কারুণিক তাপস-মূর্তির উদয় হয় তার মনে। ভাবে, আর কতকাল পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন? কবে পাবে তাঁর বহুবাঞ্ছিত দর্শন? যদি সে শুভদিন আসে, জিজ্ঞাসা করবে তপস্বীকে—আপনার উপহারের এ কি ব্যর্থ পরিণতি? এ উপহারের তাহলে সার্থকতা কোথায়? এখন কি দৃষ্টান্ত নিয়ে আমি অবশিষ্ট জীবন ধারণ করব, প্রভু?

সেই দেবকল্প পুরুষের সঙ্গে কবে সাক্ষাৎ হবে? তাঁকে প্রণিপাত করে জীবনপথের পাথেয় ভিক্ষা করে নেবে হতভাগিনী। পুনরায় আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। বলবে, যে পুণ্য আলোকের পথ পাপীয়সীর জীবনে উন্মোচন করে দিয়েছ, নাথ, তার থেকে সে বিচ্যুত হয়নি। প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছে ক্ষুদ্র সাধ্যের সর্বশক্তিতে। জীবন যাত্রার সেই পূর্ব ধারা তার আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সর্ব প্রলোভনের আহ্বান সে উপেক্ষা করে চলেছে অন্তরের প্রেরণায়। কত শ্রেষ্ঠী, কত ধনী-মানীর সঙ্গ, কত বহুমূল্য উপহার নির্বিকারচিত্তে প্রত্যাখ্যান করছে—আপনারই শুভাশীষে ধন্যা হয়ে।...

এমনিভাবেই সেই করুণাময়ের আশাপথ চেয়ে আম্রপালী প্রতীক্ষায় থাকে। সাক্ষাৎ লাভ না করলেও এতদিনে সে জেনেছে তাঁর নাম পরিচয়। নানা মুখে, পরম্পরায় শুনেছে তাঁর মহাজীবনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত। তাঁর চরম ত্যাগের, পরম প্রজ্ঞার কিছু বিবরণ পেয়েছে। তিনিই গৌতম। তিনিই সিদ্ধার্থ। তিনিই বুদ্ধ। তিনি তথাগত।

গণভোগ্যা কিন্তু কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করেনি তার এতবড় সৌভাগ্যের কথা—তিনিই আপন হস্তে একদিন তাকে উপহার দিয়েছিলেন, পুনরায় পদার্পণের আশ্বাস দিয়েছেন।

তারপর আরও দিন বয়ে যায় কালের যাত্রাপথে। অবশেষে আম্রপালীর ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হয়। সুদীর্ঘ ঐকান্তিক প্রতীক্ষার সমাপ্তিক্ষণ দেখা যায় একদিন।

সেদিন নগরীর দিকে দিকে বার্তা রটান হয়ে গেল—বৈশালীতে ভগবান্ বুদ্ধের অচিরেই শুভাগমন ঘটবে। কয়েকদিন তিনি অবস্থান করবেন এ রাজ্যে।

উৎকর্ণ আম্রপালী এ বার্তা শুনে ধন্যা হল।

তথাগতের আবির্ভাব সমাসন্ন। সেই উপলক্ষে উৎসবের সাজে সজ্জিত হল বৈশালী। চারিদিকে যেন বিপুল আনন্দের প্রবাহ। সমস্ত সরণি, সব গৃহ অভিনব বেশ ধারণ করলে। পথের সংযোগ ও অন্যান্য স্থলে রচিত হল সুশোভন তোরণশ্রেণী। অট্টালিকার সারি সুপরিচ্ছন্ন দেখা গেল। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট। তোরণে প্রাসাদে অলিন্দে অলিন্দে বর্ণাঢ্য পতাকার সমারোহ। ধ্বজা-লাঞ্ছন ভবন-শীর্ষ। মঙ্গল বাদন ধ্বনিতে পরিপূরিত হয়ে উঠল আকাশ বাতাস।

অবশেষে সশিষ্য তথাগত উপনীত হলেন।

কিন্তু কোথায় হবে তাঁদের অবস্থান? বৈশালীর কোন ভাগ্যবানের বাসভবন তিনি পদার্পণে ধন্য করবেন? কোথায় ঘটবে বুদ্ধ সন্দর্শন? ব্যাকুল আম্রপালী নানাজনকে প্রশ্ন করে।

সংবাদ পায় যথাসময়ে।

কোন সুসজ্জিত প্রাসাদ কিংবা সুশোভিত অঞ্চলে তথাগত উপস্থিত হননি। কোন প্রকার আড়ম্বরের মধ্যে স্থিতি করলেন না তিনি। নগরীর এক-প্রান্তে, নিভৃত একটি উদ্যানে ভগবান্ বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করলেন।

তাঁর অবস্থানে তীর্থে পরিণত সেই একদা নির্জন কুঞ্জভূমি। শুধু বৈশালী নয়, পার্শ্ববর্তী নানা অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর সমীপে উপস্থিত হতে লাগল। কেউ শুধু পুণ্য দর্শনের জন্যে। কেউ নানা প্রশ্নে উপদেশ নির্দেশের আশায়। কেউ শোকে সন্তাপে সান্ত্বনার প্রত্যাশায়। কেউ বা নানা সমস্যার সমাধান কল্পে। অনেকেই ধর্ম দর্শনের আলোচনা শ্রবণের উদ্দেশ্যে।

বুদ্ধের নিকট অবারিত দ্বার। ধনী-নির্ধন, কৃতী সাধারণ, অভিজাত পতিত, কারও প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁর সন্নিধানে, তাঁর অমৃত বাণীর আস্বাদনে সকলের অধিকার। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবের প্রতি তাঁর প্রেম মৈত্রী করুণা সমমর্মিতা।

কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁর বোধিলাভ হয়েছে। সেই তপস্যালব্ধ জ্ঞান ও ধর্মের তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন জিজ্ঞাসুদের কাছে। ইহজগৎ দুঃখময়। কিন্তু সেই দুঃখ হতে পরিত্রাণের উপায় কি? সৎ আচারের কথা। শীলের বিধি।

অভিনব ও অমৃতবৎ তাঁর বক্তব্য, ভাষণ ও ব্যাখ্যানের ধারা। তাঁর অপূর্ব বাণীতে অনেকেই এক অনাস্বাদিত শান্তি লাভ করে। শোকার্তজন পায় মর্মের সান্ত্বনা। কত আকুল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার সমাধান হয়। কত বিক্ষুব্ধ চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে শুধু তাঁর অভয় সন্দর্শনে। কত জনমানসে অলক্ষ্যে এক সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সূচনা ঘটে যায়।

তথাগতের আবির্ভাবে নব জাগরণের সাড়া জাগে বৈশালীতে। সকলেরই মুখে বুদ্ধের কথা।

শুনে শুনে আম্রপালী সাক্ষাতের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু মনে হয় তার, এ অভাগিনীকে আর কি স্মরণ আছে তাঁর? যদি না-ও থাকে, এ মহান সুযোগ কি সে হেলায় হারাবে? উপস্থিত হবে না তাঁর সমীপে! এই পতিতার আবাসে তিনি স্বয়ং উপনীত হবেন এতবড় আকাঙ্ক্ষায় সে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে? সুদীর্ঘ তাঁর তপস্যার কালে, পরিব্রাজক ও প্রচারক জীবনের বহু ব্যস্ততার মধ্যে অবশ্যই তিনি বিস্মৃত হয়েছেন এই দীনাকে।

আম্রপালী আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না। তীর্থ অভিলাষিণী হয়ে যাত্রা করলে বুদ্ধ-স্থানের উদ্দেশে।

উদ্যানের সম্মুখস্থ হয়ে দেখলে, বহু জনসমাগম সেখানে। তোরণদ্বারেও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-বেশী উপস্থিত রয়েছেন।

কিন্তু আম্রপালী অগ্রসর হতেই বাধা পড়ল প্রবেশ-পথে। বৈশালীর কয়েকজন গণ-নেতা তোরণে তার গতিরোধ করলেন। তাঁরা এখানে বুদ্ধের সেবক ও পরিচর্যার ভারপ্রাপ্ত। আম্রপালী তাঁদের সকলেরই সুপরিচিতা।

রূঢ়স্বরে তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা যেতে চাও?'

'উদ্যানের মধ্যে। ভগবান বুদ্ধ দর্শনে।'

'গণভোগ্যা! তথাগতের অমৃত পরশে পবিত্র হয়েছে এই কুঞ্জভূমি। তোমা হেন রমণীর কোন স্থান এখানে হবে না। তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। দেহ-পসারিণী বুদ্ধের পুণ্য সাক্ষাতের অধিকারিণী নয়।'

অপমান-হতা আম্রপালী সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এবার লক্ষ্য করে দেখলে। বৈশালীর শ্রেষ্ঠী, প্রভাব-শালী এই গণ-নেতারা তার নিতান্ত পরিচিত। গণ-ভোগ্যার বিগত জীবনে তাঁরাই কত মধুনিশি যাপন করেছেন তার সান্নিধ্যে। সেকালে তাঁরাই ছিলেন তার আসঙ্গের কাঙাল, লুব্ধ ভোগী। তাঁরাই আজ হয়েছেন বুদ্ধ-সেবক।

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে আম্রপালী বলে উঠল, 'মহাশয়েরা পূত চরিত্রের গুণেই বুদ্ধ সেবার অধিকার লাভ করেছেন!'

স্পর্ধিত উক্তি শুনে ক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন তাঁরা।

বিসম্বাদ শুনে উদ্যানের মধ্যে থেকে এক বুদ্ধ-শিষ্য উপস্থিত হলেন।

তোরণ-বর্তীরা আম্রপালীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাঁকে বললেন, 'এই বারাঙ্গনা তথাগতের নিকটস্থ হতে চায়। আমরা বাধা দিয়েছি বলে কলহ করছে নির্লজ্জা।'

বুদ্ধশিষ্য তার দিকে ফিরে বললেন, 'তিনি এখন ধর্মোপদেশ দানে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।'

অপমানে, নৈরাশ্যে আম্রপালীর অন্তর বিকল হয়ে গেল। অসহ হল মর্মদাহ। সুদীর্ঘকালের অপেক্ষা শেষে এই গ্লানি বহন করে ফিরে যেতে হবে?

অকস্মাৎ তার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি উদ্যানের এক বৃক্ষতলে আকৃষ্ট হল। তথাগত। দিব্য জ্যোতিষ্মান্ হয়ে বরাভয় রূপে উপবেশন করে রয়েছেন। অভ্যাগতদের সঙ্গে আলোচনারত।

পুনরায় বুদ্ধশিষ্য সবিনয়ে ফিরে যেতে বললেন আম্রপালীকে। অমনি বৈশালীর সেই গণ-নেতারা উচ্চকণ্ঠে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলেন, 'ভ্রষ্টা, গণিকা, এ পবিত্র স্থান কলুষিত করতে তোমায় কিছুতেই দেব না আমরা।'

এই কোলাহলের শব্দে তথাগতের দৃষ্টি তোরণদ্বারের দিকে নিবদ্ধ হল। দৃষ্টিপাত করলেন আম্রপালীর প্রতি। ক্ষণপরেই তাঁর মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আম্রপালীকে স্মরণ হয়েছে তাঁর।

আসন ত্যাগ করে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। ধীর পদে তোরণদ্বারে এসে তাকে সম্ভাষণ করলেন, 'কল্যাণি, আমি এসেছি।'

কৃতজ্ঞতা, সার্থকতায়, পুলকের উচ্ছ্বাসে বাকাহারা হল আম্রপালী। নীরব ভাষা শুধু অশ্রুরূপে উৎসারিত হতে লাগল। নতজানু হয়ে আভূমি প্রণিপাত করলে কৃতার্থ চিত্তে।

তার আবেগমথিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আমার সেই কলঙ্কিত পূর্ব জীবনকে আমি সর্বাংশে পরিত্যাগ করে এসেছি, প্রভু। আপনার আশীর্বাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি এতকাল।'

সৌম্যদর্শনের মুখে পরম ক্ষমা ও আশ্বাস অনুভব করলে আম্রপালী। তাঁর কোন বাণী আর তায় শোনবার প্রয়োজন হল না। অভূতপূর্ব আনন্দের প্লাবনে অন্তঃস্থল পরিপূর্ণ হয়ে গেল তার।

নতজানু হয়েই সে সসঙ্কোচে নিবেদন করলে, 'প্রভু, অভাগিনীর গৃহে একবার পদার্পণ করে তার জীবন ধন্য করুন। আপনাকে নিমন্ত্রণের অনুমতি দিন কৃপা করে। আপনার পদধূলিতে অধীনার গৃহ পুণ্য হোক।'

'আগামী কাল আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব।'

কৃতাঞ্জলি হয়ে তখন আম্রপালী জীবনের এক শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা নিবেদন করলে, 'দেব, অনুগ্রহ করে আমার গৃহে আহার করবেন সেদিন।'

'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' নির্দ্বিধায় তথাগত জানালেন।

বৈশালীর সেই গণ-নেতারা স্তম্ভিত হলেন বিস্ময়ে। আম্রপালীকে যাঁরা বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, এখন আর তাঁদের বাক্‌স্ফূর্তি হল না। অনেকেই গ্লানি বোধ করতে লাগলেন মনে মনে। বুদ্ধদেব ভোজন করবেন গণ-ভোগ্যার গৃহে? কি দুর্দৈব।

পরদিন তথাগত আম্রপালীর ভবনে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন শিষ্য। পরম ভক্তিভরে সেবিকা তাঁদের প্রণতি জানালে। তারপর ভোজ্য-সামগ্রী নিবেদন করলে সশ্রদ্ধচিত্তে। বুদ্ধ সশিষ্য আহার সমাধা করলেন।

বিদায়ের প্রাক্‌কালে তাঁর কাছে আম্রপালী নিয়ে এল সেই গজদন্তের আধারটি। উন্মোচন করে দেখালে —তাঁর উপহার দেওয়া সেই আম্র। বললে, 'প্রভু, আপনার দান বহুমূল্য জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু রোধ করতে পারিনি তার ক্ষয়। সেদিনের সেই সরস, স্বর্ণকান্তি ফলটির আজ এই জর্জর বিকৃত

রূপ। একটি সুন্দর সামগ্রীর কি করুণ পরিণাম। কেন এমন হয়, দেব ?'

স্মিতমুখে বুদ্ধ আম্রটি হাতে নিলেন। সেদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইহজগতের এই নিয়ম, এই ধারা। তেমনি আমাদের জীবনও। যৌবন-ধন্য দেহ একদিন জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ব্যাধিতে। বহিরঙ্গ রূপ কালগ্রাসে পড়ে।'

শুষ্ক, শীর্ণ ফলটিকে তিনি ভগ্ন করলেন। তারপর আম্রপালীকে তা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এর অভ্যন্তরে বীজটির দিকে দেখ—অজর, অকৃত্রিম, কোন মালিন্যের স্পর্শ নেই। আমাদের অন্তঃকরণও তেমনি হওয়া উচিত। আম্রপালি, তুমিও এই ফলের সঙ্গে তুলনীয়া। তোমারও অন্তর যেন এমনি অমলিন, এমনি সৎ।'

'প্রভু, আমার একটি শেষ প্রার্থনা আছে। যদি অনুগ্রহ করে পূর্ণ করেন, হতভাগিনীর জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না...'

"বল, কি তোমার অভিলাষ ?"

'আপনার সঙ্ঘের সেবায় আমার আম্রকাননটি নিবেদন করতে চাই। আপনি করুণা করে সম্মতি দিন।'

'তোমার অনুরোধ রক্ষিত হবে।' বুদ্ধ তাকে আশীর্বাদ করে সশিষ্য বিদায় নিলেন।

তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে রইল আম্রপালী। তিনি গৃহ ত্যাগ করে যাওয়ার পরও তাকে প্রণতা অবস্থায় দেখা গেল। উত্থানের কোন প্রয়োজন কিংবা উৎসাহ সে বোধ করলে না অন্তরে। এক বিচিত্র, অপূর্ব অনুভব তার মনের সঙ্গোপনে জেগে উঠল। কিসের অব্যক্ত প্রভাবে আচ্ছন্ন হল সে। এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তিতে আপ্লুত অন্তঃস্থল। কোন গ্লানিবোধ, কোন মর্মযন্ত্রণা আর তাকে ক্লিষ্ট করতে পারবে না—এমন আত্মপ্রত্যয় তার মনে দেখা দিল। সমস্ত ক্ষোভ, সর্ব সংশয় নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল অনাবিল প্রশান্তিতে। এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে নিস্তরঙ্গ সন্তোষের ভাব তার চৈতন্যলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

গণভোগ্যার জন্মান্তর ঘটল ইহজীবনেই।

কান্ত-কথা

শান্তিলতা রায়

এর মধ্যে রাজশাহীতে খুব বড় রকমের সাহিত্য-সভা হ'ল। দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়, দিঘাপাতিয়ার মেজ কুমার শরৎকুমার রায়—ছোট কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায়, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, অক্ষয়কুমার মৈত্র, লালগোলার মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক এসেছিলেন, কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। জলধর সেনও এসেছিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত সাহিত্যসভা হয়েছিল। রাজসাহীর পাবলিক লাইব্রেরির হলে কনফারেন্স হয়েছিল। অভ্যর্থনা সঙ্গীত বাবা লিখেছিলেন 'স্বস্তি, স্বগত সুধী অভ্যাগত জ্ঞানপর-ব্রত পুণ্যাবলোকন। গেয়েছিলেন বোধহয় কটা সাহেব ও অন্যান্য আরও কয়েক জন। আর অধিবেশন-সমাপ্তির গানও বাবাই লিখেছিলেন 'সুখের হাট কি ভেঙে নিলে? মোদের মর্মে মর্মে রইল গাঁথা, এই ভাঙাবীণায় কি সুর দিলে', এটা বোধহয় বাবাই গেয়েছিলেন। আর তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীতটি এই সময়েই রচনা . তব চরণানিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা'। এঁদের সাহিত্য-সভার শেষে আমার ও আমার ছোট দাদার গান গাইবার ডাক পড়ল। আমরা একটা করে গান গাই, সেটা শেষহয় আবার সবাই বলেন আর একটা গান আবার একটা গেয়ে শেষ করি, আবার ফরমাস আসে আর একটা গান শুনব। এই রকম পরপর অনেক গান গাইলাম, তার পরে ও ফরমাস এলো আরও একটা শুনব, তখন আমাদের গানের থলি উজাড় হয়ে গেছে। আর নতুন গান জানি না। তখন আবার ফরমাস এলো, যেগুলি গেয়েছ তাই আবার ফিরে গাও। তাও গাইতে হল। সব শেষে বাবা গাইলেন নুতন লেখা গান, শ্যাম ধরণী সরসা। এই গান শুনে সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তার পরে দিঘাপাতিয়ার রাজা আমাদের তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর গলার ফুলের মালাটি আমাদের হাতে জড়িয়ে দিলেন। তখন আমি ঘুমে আচ্ছন্ন। আর ছোট দাদা খালি বলছেন, 'এই ঘুমুসুনে, বাড়ী যাবিনে'? কখন বাড়ী এসেছি কিছুই জানিনে। পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। উঠেই পড়তে বসেছি। পড়ায় অবহেলা করলে মা বাবা দুজনেই অসন্তুষ্ট হতেন। তাছাড়া পড়ায় অবহেলা করবো না। এ জিনিষটা আমাদেরও বিশেষ ছিল।

কোন কোন দিন সান্ধ্যবেলা পদ্মায় নৌকা করে বেড়াতে গিয়েছি বাবার সঙ্গে। বাবার বন্ধুবান্ধবেরা, যেমন অভয়কুমার মুন্সী (ইনি এখনকার বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক নীহারকুমার মুন্সীর জেঠামশায়), কুঞ্জমোহন মৈত্র, যাদবগোবিন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ সেন, আরও অনেকে আসতেন নৌকায়। কটা সাহেব তো ছিলেনই। আর ছিল বাবার হারমোনিয়াম আর আমি তো সর্ব্বকালের সঙ্গী। দিগন্তবিস্তৃত গৈরিক-বসনা পদ্মা ছলাৎ ছলাৎ জলের আওয়াজ তুলে নেচে চলেছে। যতদূর চোখ যায় পদ্মা,—উপরে নির্মল নীল আকাশ তারায় তারায় খচিত,—তারার ঝিকিমিকি মিষ্টি আলো পদ্মার ঢেউয়ের উপর চুমকি ছড়াচ্ছে, পদ্মা তারার আলো বুকে নিয়ে নেচে গেয়ে রূপ ছড়িয়ে চলেছে। পাড়ে ভিড়ানো ছোট-বড় নৌকা সারি সারি দুলছে। নৌকার মাঝিরা ভিতরেই রান্না খাওয়াদাওয়া সারছে। তাদের একটু একটু কথা কানে আসছে আর থালা বাসন ধোবার টুং টাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমাদের নৌকার ছাদে বসে কটা সাহেব গান গাইছেন, কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত

শীতল রাগে, মোহতিমির নাশে, প্রেম-মলয়া বয়'।— নৌকা ধীরে ধীরে বেয়ে চলেছে। আবার গাইলেন, 'সন্ধ্যার উদার মুক্ত মহা ব্যোমতলে, সুগম্ভীর নীরবতা মাঝে, ফুল্ল শশী কোটিকোটি দীপ্ত গ্রহদলে, আলোকের অর্ঘ্যালয়ে সাজে'। সঙ্গীতের কথা সুর আর পদ্মার কল্লোলধ্বনি এক হয়ে যেন বলছে: 'তোমারই কৃপার দান দিবে তব পায়ে চন্দ্র তারা সবারই বাসনা কিন্তু সে চরণ কোথা? গেলে কোন্ পথে স্নিগ্ধ হবে দীন উপাসনা?'

কটা সাহেবের গানের পরে বাবা গাইলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো'। কত কথা, কত গান, কত হাসি কল্লোলিত হ'ত পদ্মার বুকের ওপরে। বোলপুরের পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের শ্বশুর বাড়ী ছিল ঠিক বড়কুঠির ঘাটের ওপরে। ক্ষিতিমোহন সেনের শ্বশুর ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন সেন। তাঁর বাড়ীর পাশেই বড়কুঠির ঘাটের ওপরে একটি শিবমন্দির ছিল। সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পদ্মার কলোচ্ছ্বাস আর রজনীকান্তের গানের সুধাধারা দিগন্তে মহাদেবতা-চরণে যেন লীন হয়ে যাচ্ছে। রাত্তির বাড়ছে, আবার বাড়ীর মুখে নৌকা ঘুরল। বড়কুঠির ঘাটে নেমে সকলেই হেঁটে বাড়ী চলে যেতেন। আমাদের বাড়ীও ঘাটের কাছেই,— আমরা হেঁটে আসতাম। রাস্তার দুধারে শিরীষ কৃষ্ণচূড়া বকুল গাছের পাশ দিয়ে। রাত হয়েছে। রাস্তায় লোক জন বিশেষ চলছে না। মাঝপথে দেখা যেত, আমাদের চাকর বরণ লণ্ঠন নিয়ে আসছে, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। বাড়ীতে ঠাকুমা জেগে বসে আছেন, মা শুয়ে আছেন জেগেই। আর দাদাদের ঘরে আলো জ্বলছে, তাঁরা পড়াশুনা করছেন।

সকাল বেলায়ই গুনগুন করে গাইছেন বাবা, 'কুলু কুলু কুলু নদী বয়ে যায় রে ভাই, তীরে বসে ভাবছ বুঝি কি বলে ছাই'। এই দুটো লাইনই বার বার করে গাইছেন। বিকেলে গানটা সম্পূর্ণ হয়ে টেবিলে বিরাজ করছে। আগেই বলেছি, গানের কলির সব সুরই প্রায় একই রকম, তবু বৈচিত্র্যহীন মনে হ'ত না। গায়কের ভাষা, ভাব, ভক্তি—সমস্ত সুর ছাপিয়ে যে তন্ময়তা এনে দিত, তাতে গায়ক ও শ্রোতা প্রসন্নচিত্তে উপভোগ করে যেতেন, ভক্তিরসের মধুধারায় সিঞ্চিত হতেন।

আবার হাসির গানে হাসির লহরী ভেসে যেত। মনের আবিলতা ধুয়ে মুছে যেত। মা বলতেন মাঝে মাঝে, কি যে দেশী ভাষায় গান লেখ। এত বাঙাল ভাষায় গান শুনলে লোকে বলবে কি?' বাবা বলতেন, 'বাঙাল ভাষায় লিখি, ওটা আপনি আসে। জোর করে লিখিও না জোর করেও গাইনে'। একদিন সন্ধ্যা বেলায় বাবা, মা বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন, বাইরের আর কেউ ছিলেন না, এমন সময় 'বল হরি হরিবোল' দিয়ে বাহকেরা একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল পদ্মার ধার দিয়ে শ্মশানঘাটে যাবে বলে। তারা ধীরে ধীরে চলে গেল, মা সেদিকে চেয়েই আছেন। তার একটু পরেই ব্যাণ্ড বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে ধুমধাম করে একদল বরযাত্রী সহ 'ল্যাণ্ডো' গাড়ীতে টোপর মাথায় দিয়ে বর চলেছে বিয়ে করতে। বাজনার আওয়াজে আমরা পড়া ফেলে ছুটে এসেছি বাজনা দেখতে। বর চলে গেল। মা পরে বললেন বাবাকে, 'দ্যাখ এই রকম একটা গান লেখ যে পথ দিয়ে মরা ছেলে নিয়ে যাচ্ছে—সেই পথ দিয়েই ছেলের বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছে। ভগবানের রাজ্যে সবই বৈচিত্র্যের ধারা'। সেই কথাতেই বাবা ঐ গানটি লিখেছিলেন, 'যে পথে মরা ছেলে যাচ্ছে নিয়ে শ্মশান-ঘাটে—দিয়ে হরিবোল, সেই পথে আসচে নিয়ে বিয়ে দিয়ে ছেলে আর বৌ বাজিয়ে রে ঢোল।' সুর দিয়ে মার কাছে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন।

বাবা যখন কলকাতায় হষ্টেলে থেকে সিটি কলেজে বি এ পড়তেন তখন আমাদের একজন পিসতুতো ভাই নলিনী রায়ও হোষ্টেলে থেকে বি এ পড়তেন, কোন্ কলেজে ঠিক মনে নাই।

নলিনীদাদার সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। নলিনী-দাদার বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এঁরা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। ইনি আমার বাবার জেঠতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন। নলিনীদাদার সঙ্গে বাবা প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতেনআবার নিজের লেখা গানও গাইতেন। নিজের লেখা গান যেমন, 'আর কত দূরে আছে প্রভু প্রেম পারাবার', 'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে',—ছাত্র অবস্থাতেই এ সব গান রচিত হয়েছিল।

ব্রহ্মোপাসনায়ও যোগ দিতেন। সেখানেই রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে আলাপ হয়। ব্রহ্মোপাসনার পরে রবীন্দ্রনাথেরও গান হ'ত। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বাবার ব্রাহ্মসমাজেই আলাপ হয়। সেই আলাপই পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার বন্ধুত্বের বন্ধন শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে একটা কথা এখানেই বলে রাখি।—

বাবার মৃত্যুর প্রায় পনর-যোল বছর পরের কথা। আমি তখন বিবাহিত। আমার ভাসুর সীলেটে (অধুনা পাকিস্থান) ডাক্তার সিভিল সার্জন। আমি ও তাঁদের সঙ্গে সীলেটে গিয়েছিলাম। তখন কার্ত্তিক মাস। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। একদিন শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে সীলেটে আসছেন ওখানকার জমীদার ব্রজেন্দ্রনাথ দাসের আমন্ত্রণে। সমস্ত সীলেটবাসী চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের বাংলোর সামনে দিয়ে সুরমা নদী বয়ে চলেছে। খুব চওড়া নয়। কিন্তু রেল ষ্টেশন সুরমার ওপারে, নদী পার হয়ে তবে সীলেটে আসতে হয়। যেদিন রবীন্দ্রনাথের সীলেটে পৌঁছাবার কথা সেদিন সমস্ত সুরমা নদীর ধার দিয়ে কি লোকসমাগম। সবাই চেয়ে আছে, কখন রবীন্দ্রনাথের লঞ্চ দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ পৌঁছুলেন কিন্তু আমাদের দেখা হল না। নদীর ধারে আমরা যাব, সকলের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবই, তাও রাত্তিরে নয়, দিনের বেলায়,—এ হতেই পারে না। আমার ও আমার বড় জায়ের যাওয়া হল না। দুজনেই দুঃখিত মনে রইলাম। তার পরদিন আমার বড় জার নামে মহিলা-সমিতি থেকে একখানা চিঠি এলো, শ্রীহট্ট মহিলা-সমিতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে মানপত্র দেওয়া হবে, আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। মহিলা-সমিতির সদস্যা ছিলেন আমার বড় জা প্রিয়বালা দেবী। আমিও আমার জায়ের সঙ্গে যাব। তার পর দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আমরা তো গাড়ী করে গেলাম। মনটা ভারি খুশী। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, প্রতিমা দেবীও এসেছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে সবাই রবীন্দ্রনাথের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছেন। ধূপ দীপ দিয়ে বরণ করছেন। আশীর্ব্বাদ পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের হাতে ধান-দূর্ব্বা দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে মাথা নত করে আছেন। তার পরে প্রণাম করে সরে যাচ্ছেন। তার পরে কয়েকটি মেয়ে গান গাইলেন 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে, মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে'। সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজালেন মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা নলিনীবালা চৌধুরী। এরপর রবীন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ কিছু বললেন। তারপরে সম্পাদিকা নলিনীবালা চৌধুরী বললেন, গুরুদেব, আপনি এসেছেন সময় করে। আমরা কৃতার্থ। এ রকম ভাবে আপনাকে আমরা এত কাছে পাব এ আশা আমাদের আর নাই। আপনার মুখে একটা গান শুনবার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আজ একটা গান আপনি দয়া করে আমাদের শুনিয়ে যান।' রবীন্দ্রনাথ শুনে একটু চুপ করে থেকে প্রতিমা দেবীকে আস্তে করে কিছু বললেন। তার পরে সকলের দিকে, চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা'—শোনো, গাইলেন 'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গলকরে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে, তব পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে সবাই গান শুনলেন। যখন গান থামল তখন সম্বিত ফিরে পেলাম। আমার মনে তখন রজনীকান্তের রূপ ভেসে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে রজনীকান্তের গান আমার মনের মধ্যে

অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলাম কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি। রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী চলে গেলেন। কোনো পুণ্য ক্ষণে আমি ঐ মহিলা-সভায় গিয়েছিলাম।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে থেকেই স্বদেশ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা বাবার মনকে আন্দোলিত করত। আমাদের বাড়ীতে বিলিতি জিনিষ আসত না। তখনকার দিনে এদেশে বিলিতি কোম্পানী রেলী ব্রাদার্সের কাপড়ের চাহিদাই বেশী ছিল। সে-সব ভালো ভালো বিলিতি ধুতি শাড়ি বাবা কখনও বাড়ীতে আসতে দিতেন না। আমাদের দেশ পাবনা জেলায় ভাঙাবাড়ী গ্রামের কাছে সাহাজাদপুরের (সাজাদপুর) জোলারা যে মোটা সুতোর ধুতি শাড়ি বুনত, বাবা সেই সব কাপড় কিনতে হুকুম দিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন তখনও দানা বাঁধেনি। কিন্তু আলোড়ন শুরু হয়েছে। কোনো নেতা জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়ান নি। এর মধ্যে শোনা গেল সিরাজ-গঞ্জে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হচ্ছে। বাবার ও অন্যান্য অনেকের আমন্ত্রণ এলো। স্বদেশী বিষয়ের আলোচ-নাই প্রধান স্থান পাবে জানা গেল। আমরা তখন দেশে ছিলাম। বাবা একাই আগে এসেছিলেন। আমরা পরে সিরাজগঞ্জ গেলাম। সিরাজগঞ্জ টাউনে মস্ত বড় একটা দীঘির পারে সিরাজগঞ্জ টাউন হাই স্কুলের হলে কন্‌ফারেন্সের আয়োজন হয়েছে। নানা দেশ গ্রাম থেকে লোকজন আসছে—তখন কোনো টিকিটের ব্যবস্থাও ছিল না, মাইকের ব্যবস্থাও ছিল না। কে আগে মিটিংএ ঢুকবে এর জন্য হুড়োহুড়িও ছিল না। ধীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে মিটিং হল। এবং স্বদেশী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বললেন। তবে খুব যে গরম গরম বক্তৃতা হল তাও নয়। মিটিংএর শেষে বাবার গান হ'ল, 'নমো নমো নমো জননীবঙ্গ'। আরও দুএক জন গাইলেন। সব শেষে আমি ও ছোট দাদা গাইলাম 'আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট, তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো'। আর গাইলাম 'তোরা আয় রে ছুটে আয়। ঘুমের মা আজ জেগে উঠে ছেলে দেখতে চায়।' আরও কে কি গান গেয়েছিলেন ঠিক মনে নাই। এই কন্‌ফারেন্সে কে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। কোন কোন বিষয় যেন এখন ভুল হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়ীতে বিলিতি সাদা লবণ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু আমাদের বাড়ী কেন, অনেক বাড়ীতেই বিলিতি লবণ ব্যবহার হ'ত না। হয় সৈন্ধব লবণ না হয় করকচ লবণ, কালো দানা দানা অপরিষ্কার, সেই লবণ ব্যবহার হ'ত। চিনিও কাশীর চিনি, এক রকম প্রায় ধুলোর মতন দেখতে, তাই ব্যবহার হ'ত। বিলিতি জুতোও প্রায় অনেকেই বর্জ্জন করেছিলেন। অন্ততঃ আমাদের বাড়ী আসতো না। চীনে বাড়ীর জুতো কেনা হ'ত, বছরে একবার শুধু পূজোর সময়ে। তা ছাড়া তালতলার চটিও ব্যবহার হ'ত। বিলাসিতা আমাদের বাড়ীর ধারেপাশেও আসত না। বাবার এই রকম স্বদেশ প্রেমের দৃঢ়তা সবাই মেনে নিয়েছিলেন।

বাবার কথা মনে করতে করতে বাবার চরিত্রের আরেকটা দিক্ মনে পড়ে যায়। ভগবৎসাধনায় লিপ্ত থাকলেও বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে নিজেকে ঢেলে দিতেন। বাবা সকলের সঙ্গে বেশ মজা করতেন একথা আজও বার বার মনে পড়ে যায়।

যখন মা-জেঠিমারা দুপুর বেলায় ঘুমোতেন তখন যদি বাবা তাড়াতাড়ি কোর্ট থেকে বাড়ী ফিরতেন তাহলে তাঁর দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠত। তখন তিনি জেঠিমার খোলা চুল খাটের পায়ার সঙ্গে বেশ করে বেঁধে দিতেন কিংবা কারোর চুলের সঙ্গে জেঠিমার হাত বেঁধে দিতেন। তারাও এমনি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন যে, দোয়াত-কলম নিয়ে বাবা সুযোগ বুঝে কারও গোঁফ এঁকে রাখতেন। কারও কপালে বেশ বড় করে একটি চোখ এঁকে দিয়ে ঘরের কোণেতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হঠাৎ এঁদের ঘুম ভেঙে গেলে বাবা হাততালি দিয়ে পালাতেন। তাছাড়াও বাবা মাঝে মাঝে মার সেমিজের মধ্যে পিঠের দিকে পুকুর থেকে

সংগ্রহ করে জোঁক এনে ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতেন। মা তো পিঠের মধ্যে ঠাণ্ডা কি নড়ে চড়ে বুঝে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। বাবা হাসি চাপতে না পেরে এসে বলতেন "রাঙা বৌ, অমন করছে কেন দেখি, পিঠে কি হল।" হাত দিয়ে জোঁক বার করতেই মা তো তাড়াতাড়ি দৌড় দিতেন। মধ্যে মধ্যে এইভাবে মজা করতেন।

নানাবিধ সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে মার পড়াশুনা বাবা বন্ধ করতেন না। বাবার জেঠতুত বোন, আমার রাঙা পিসিমা অম্বুজাসুন্দরীও খুব লেখা-পড়া করতেন। তিনিও একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা-গ্রন্থ ছিল, মা ও তিনি একসঙ্গে পড়তেন। বাবা বা পিসেমশাই তাঁদেরকে, নিয়ম করে না হোক, মাঝে মাঝে পড়াতেন। খাতা পেন্সিল বই প্রাইজ দিতেন। পড়াশুনায় ফার্স্ট বা সেকেণ্ড হলে আমাদেরকেও প্রাইজ দিতেন। প্রাইজ কোন খেলার জিনিষ নয়, মাঝারি সাইজের বাঁধানো খাতা আর নানা রংএর চার-পাঁচটা করে পেন্সিল আর রবার। ছবি আঁকা শিখতে হত তাই রবার লাগত। যার যা দেখে ভাল লাগত তাই আঁকতে হ'ত।

আমার ছোট আরও দুটি বোন ও একটি ভাই। বোনেরা এতই ছোট যে তাদের শুধু হাতেখড়ি হয়েছিল। বর্ণপরিচয় আর ফার্স্ট বুকের এ, বি, সি, এইটুকুই পড়া শুরু করেছিল কিন্তু তারাও পেত খাতা-পেন্সিল-বই ও শ্লেট। হিজিবিজি ছবি আমাদের সঙ্গে ওরাও আঁকত। তাই দেখেই বাবা খুসী হয়ে তাদের খুব প্রশংসা করতেন। বারে বারে বলতেন, আরো সুন্দর করে আঁক। তাদেরও বলতেন, 'এস ত দেখি, আমার সঙ্গে দৌড়ে কতদূর যেতে পার।' হয়ত ছোট বোনটিকে ঘাড়ে করে সারা বাড়ী ঘুরে এলেন। এইভাবেই সবাইকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

কিন্তু অন্তরের গভীরে তিনি ছিলেন ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পিত। তাঁর ভগবৎসাধনার বিকাশ তাঁর লেখনীতে, সঙ্গীতে এবং সুরে। সংসারের আনন্দ-অমৃত পরিপূর্ণ প্রাণে গ্রহণ করলেন—আর অন্তর থেকে উৎসারিত হল—"আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি।"

রূপে, রসে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সুধা-স্বাদ গ্রহণ করেছেন আর চলেছে অন্তরের গভীরে প্রেম-ভক্তির সাধনা। তাঁর দয়ালের ভয়াল রূপ শান্ত, নির্মল, মঙ্গল রূপ, সুন্দর রূপ, উজ্জ্বল রূপে কবির মন বিমোহিত, তিনি সমস্ত আস্বাদ গ্রহণ করে নিজেকে তাঁর চরণে বিলিয়ে দিয়েছেন। একবার গাইলেন—"তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।"

আবার গাইলেন—"যদি তুই প্রেম কুড়াবি, প্রাণ জুড়াবি' অভয়পদে থাক পড়ে।"

তাঁর এই ভগবৎপ্রেম ভগবানে আত্মসমর্পণ কত অল্প বয়সের লেখা, গানেও লক্ষ্য করেছি। এ সম্বন্ধে সামান্য একটা কথা মায়ের থেকে শুনেছিলাম। একদিন আমার এক দাদা মাকে বললেন—"মা বলত, বাবা কি এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে এত অল্প বয়সে ভগবানের পায়ে এমন করে আত্মসমর্পণ করেছেন। যেন তিনি কত পাপ করেছিলেন, কত দুঃখ পেয়েছিলেন যে গাইলেন—আর কি ভরসা আছে তোমারি বিনে, তুমি না রাখিলে সখা, কে রাখিবে দীনহীনে।" তুমি কি কিছু জানো?" মা বললেন "ভাখ, এইসব মহাপুরুষকে বুঝতে পারা কি সহজ কথা? তোমার বাবা ও তোমাদের পিসতুত ভাই নলিনী যখন কলকাতায় হস্টেলে থেকে বি. এ. পড়তেন তখন তাঁরা সঙ্গীতচর্চ্চা করতেন। কলেজে ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চ্চা করতেন। তখন তোমার ঠাকুরদাদা বেঁচে আছেন। রিটায়ার করে দেশের বাড়ীতেই থাকতেন ও মৈথিলী ভাষায় হরপার্ব্বতী-বিষয়ক অনেক গান লিখেছিলেন। বই আকারে ছাপিয়েওছিলেন। তখন নলিনী একবার তোমার বাবাকে বললেন,—দেখ, রাঙামামা, দাদুর লেখা এই বইখানা যদি একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে মতামতটা জানতে পারতাম তবে খুব ভাল হ'ত। চল না একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটা নিয়ে যাই।' বইটার

নাম ছিল 'পদচিন্তা মণিমালা' বাবা তোমার প্রথমে রাজি হন না। তবু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাবার ইচ্ছা, যদি তাঁর দেখা পাই মনে করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, তারপর বইটি নিয়ে তাঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের বাড়ী গিয়েছিলেন এবং দেখাও পেয়েছিলেন। যখন বইটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁকে একটা মতামত দিতে বললেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বইটি নিয়ে বলেছিলেন—'আপনারা আর দু-চার দিন পরে আসবেন। আমি দেখে রাখব।' শেষে কয়েকদিন পরে তোমার বাবা ও নলিনী আবার গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। দু-চার কথার পর রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আপনার পিতা আমারও গুরুজন। বইটি পড়ে ভালই লেগেছে। দেখুন, রাধা ঘুমায়, শ্যামও ঘুমায়, কিন্তু তাঁদের হাস ত ঘুমায় না! এইটুকুই আমার বলবার কথা।" রাধাকৃষ্ণর উচ্ছ্বসিত প্রেমভক্তি নিদ্রায় আত্মসমাহিত —কিন্তু প্রেমের আনন্দ-মহিমা হাসিতে উদ্ভাসিত। আমি বুঝি রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা। তোমার পিতার সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। তাঁর দয়ালকে পাবার জন্য আকুলতা তাঁকে নিজেকে সমর্পণ—তাঁর চরণে প্রার্থনা, নানারূপে তাঁকে দেখা, সমস্ত অন্তর দিয়ে এই উপলব্ধি তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন করে দিত। তাই তখন তিনি ধ্যানমগ্নযোগী। আবার তিনিই সংসারের যা-কিছু সম্পদ্ গ্রহণ করে দু-হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি, জানতে পেরেছি?" এই ভাবেই মা যতটা বুঝেছেন এ কথাগুলি বলেছেন।

এত কম বয়স থেকেই ভগবৎচৈতন্য মহাপুরুষের জীবনেই দেখতে পাওয়া যায়। বাবা বলেছেন—"তুমি কি মহান্ প্রভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র, আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু তুমি যে সুধা সমুদ্র।"

নিজের দীনতা-হীনতা "সমর্পণ করে বলেছেন— তাকে তুমি মোরে ভালবাস ডাকিলে হৃদয়ে এস, তাই এত অযোগ্যের লাজ।" অযোগ্যতার দুঃখই তাঁর আত্মানু-

আমার দাদাদের সঙ্গে বাবার অন্তরঙ্গতা গভীর ছিল। বন্ধুর মতন পরস্পরের প্রীতি ব্যবহার দেখেছি। দাদাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত কিছুতেই হতে দিতেন না আমাদের কারুর অসুখ হলে মা ও বাবা দুজনে মিলে সমানভাবে শুশ্রূষা করেছেন! রাত জেগে পাখার বাতাস দিতেন। কোথায় তখন আড্ডা বা মজলিশ। তবু তখনও বাবার সঙ্গীত-রচনার বিরাম ছিল না। সঙ্গীত রচনাই ছিল তাঁর শান্তি ও সান্ত্বনা- আমাদের জীবনের সুখের তরণী এইভাবেই চলেছিল।

বেশ কিছুদিন পর একবার কোন পুজোয় নিবেদিত পান ঠাকুমা বাবাকে খেতে দিয়েছিলেন। পান খেয়ে পানের চুনে বাবার গলার মধ্যে একটু ঝাঁজ লেগে পুড়ে যায়। তাই নিয়েই গান, বাজনা, সভা-সমিতি সবই করে যেতে লাগলেন। চুনে পুড়ে যাওয়া জায়গাটা যেন সারতেই চায় না। বরঞ্চ একটু একটু বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও হতে লাগল। ডাক্তার ঔষধ দিলেন। তখনকার দিনে এত ভাল চিকিৎসা তো ছিল না? ডাক্তাররা গলাটাকে একটু বিশ্রাম দিতে বললেন, এত গান বা বক্তৃতা যেন না করেন। কিন্তু বাবা সে কথা গ্রাহ্যও করলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবেন।

এর মধ্যে থেকেও রংপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্সে যাবার জন্য বাবার ডাক পড়ল।

বাবা আমার বড়দাদাকে নিয়ে চলে যান। সেখানে অর্থাৎ রংপুরে তখন অতুল গুপ্ত ছিলেন উকীল। তাঁর বাড়ীতেই বাবা উঠেছিলেন। অতুল গুপ্তর সুযোগ্য পুত্র প্রতুল গুপ্ত বোলপুরে বিশ্বভারতীর এখন ভাইস চ্যান্সেলার। তিন-চার-দিন সেখানে অনবরত গান গাইতে হয়েছে। কনফারেন্স ছাড়াও অনেক বাড়ীতে অনেকবার নিমন্ত্রিত হয়ে গান গাইতে হয়েছিল।

তারপর রাজসাহী ফিরে এলেন, বেশ অসুস্থ হয়ে। গলায় ব্যথাও একটু ফুলো ফুলো ভাব। রাজসাহীতে ডাক্তার দেখানো হ'ল। তখন ডাক্তার কেদারেশ্বর

দেখলেন, তারপর কামানচন্দ্র চক্রবর্তী বড় কবিরাজ তিনিও দেখলেন। এইভাবে নানা চিকিৎসা চলতে লাগল।

এর মধ্যে আমার ছোটভাইএর অন্নপ্রাশন খুব ধুমধাম করেই হল। সব কিছু সত্ত্বেও কিন্তু লেখনীর বিরাম নাই। ছোট একটা আলগা কাগজে একটি গান লেখা হয়ে আছে বিছনার উপর,—"ঐ রবি ডুবুডুবু গেল যে দিন ফুরায়ে" এবং এর উল্টো পৃষ্ঠায় লেখা—"ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ গর্জ্জনে মরণ বিষাণ।"

বাবার কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। তখন ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে।

কলকাতায় বাবাকে নিয়ে যাওয়া একরকম স্থির। আমাদের তখন খুব আনন্দ লাগছে যে আমরা ষ্টীমারে চড়ে কলকাতায় যাব। কিন্তু আমরা দেখছি যে মায়ের মুখ যেন কেমন বিষণ্ণ, কেন যে বিষণ্ণ তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। সঙ্গে ঠাকুমাও যেন কেমন নীরব হয়ে রয়েছেন। অথচ বাবা ত চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, খাওয়া-দাওয়াও করছেন তাঁর জন্য বা এত চিন্তায় কি আছে? যাই হোক, আমরা কলকাতার দিকে রওনা দিলাম। ঠাকুমা আর আমাদের সঙ্গে গেলেন না। বড়দাদার কলেজ কামাই হবে, তাই ছোটদাদা ও বড়দাদা রইলেন। কিন্তু মেজদাদা আমাদের সঙ্গে গেলেন।

আমরা স্ফূর্ত্তি করে ষ্টীমারে গিয়ে উঠলাম। অনেক লোক ষ্টীমারঘাটে এসেছিলেন। সকলে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের ষ্টীমার হুইসেল দিয়ে আস্তে আস্তে ডাঙ্গা থেকে সরে যেতে লাগল। মাল্লাদের সাঙ্কেতিক কথায় নোঙর তুলে হুইলের কাছি ছাড়ান ষ্টীমার ধীরে ধীরে চলল। আনন্দ হচ্ছে বটে কিন্তু মা-বাবার দিকে চাইতেই যেন বিষাদপূর্ণ চেহারা দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য মনটা ভাল লাগছে না। ভোরবেলা ষ্টীমার লাগল—লালগোলা স্টেশনে। সেখানে নেমে আবার রেলগাড়ীতে চড়ে কলকাতায় এলাম। স্টেশন থেকে বৌবাজারে আমাদের পিসতুতো ভাই নলিনী দাদার ছোটভাই জ্যোতি রায়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেই বাড়ীর দোতলায় মেডিক্যাল মেস। অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা সেই বাড়ীটায় থাকত। ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের মামাত ভাই ডাঃ জে এম দাসগুপ্ত। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁকে আমরা যতীনদাদা বলতাম। তিনি বাবাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তাররা রোগ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বাবার গলায় ক্যানসার হয়েছে এবং অনেকটা ছড়িয়ে গেছে। গলার ব্যথা ক্রমেই বেড়ে চলল। সে আনন্দময় মূর্ত্তি ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে আসতে লাগল। মাও যেন কি রকম হয়ে গেলেন। এর মধ্যে কে একজন খবর দিল বেনারসে একসাধু বালাজী মহারাজ আছেন, তিনি হিমালয় পাহাড়ে পাওয়া কোন গাছের শিকড়ের রস খাইয়ে ও প্রলেপ দিয়ে এইসব দুরারোগ্য রোগ ভাল করেন। ডাক্তারী চিকিৎসায় তখনও এমন কোন ঔষধ বেরোয়ই নাই যে বিশেষভাবে চিকিৎসা করা চলে। অনেক পরামর্শের পর যতীনদাদা ও অন্যান্য ডাক্তাররা বললেন, 'দেখুন, কাশী গিয়ে বালাজী মহারাজের চিকিৎসায় ভাল হয়ে আসতে পারেন, সেই চেষ্টাই আগে করা উচিত।'

এরপরে আমরা ও আমার মেজদাদা, আরও কে-কে মনে নাই—বাবাকে নিয়ে কাশী গেলাম। সেখানে চিকিৎসা শুরু হল। বালাজী মহারাজকে আমরা দেখি নাই। ঔষধ খাওয়ান, গলায় প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা সবই আমার মেজদাদা নিজহাতে করতেন। চিকিৎসার আর একটা ব্যবস্থা ছিল দু'বেলা নৌকায় করে গঙ্গার মধ্য দিয়ে বেড়ান। বাবা একলা কখন যেতেন না। আমরা সবাই বাবার সঙ্গে নৌকায় গিয়েছি, বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করেছি। সে কি গলি!—গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে দুধারের দেওয়াল হাত দিয়ে ধরা যায়। এই রকম গলি তার আবার দুধারে দোকান। কোন দোকানে গালার চুড়ি তৈরী হচ্ছে। যেমন নমুনা বলবে তেমনি তৈরী করে দেয়। কত

খাবারের দোকান, কত খেলনার দোকান, সে সব জায়গায় ভিড় ত আছেই। আমাদের বোনদের লক্ষ্য কাঁচের চুড়ি আর গালার চুড়ির দোকানের ওপর। গালার চুড়ির দোকানের সামনে এলেই আমরা দাঁড়িয়ে পড়তাম। তার উপর ষাঁড়ের উপদ্রব। বিশ্বনাথের মন্দিরে বিশ্বনাথ দর্শন করে অন্নপূর্ণা মন্দিরে চলে যেতাম। অন্নপূর্ণার কি অপূর্ব মূর্তি। ওখানে দাঁড়িয়েই থাকতে ইচ্ছে হত। মনটা যেন কি রকম হয়ে যেত।

দু-এক মাসের মধ্যে বাবা বেশ সেরে উঠলেন। সামান্য একটু কষ্ট ছিল। বালাজী মহারাজের চিকিৎসাও চলছিল, নৌকায় বেড়ানও চলছিল। আর কান্তকবি বেনারসে এসেছেন চিকিৎসার জন্য, খবরটা সমস্ত শহরে রটে গিয়েছিল। তখন স্বদেশীর যুগ। আমরা থাকতাম কাকিনার রাজার বাড়ীতে। কাকিনা রংপুর জেলায় ছোট একটি এষ্টেট। সেখানে সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনাগোনা শুরু হোল।

বাবা যদিও গান বেশী করতেন না, তবু একটু-আধটু গাইতেন। গঙ্গার ধারে বসে নতুন লেখা গান, তার সুর গুন-গুন করে নিজেই দিতেন। আমরা নৌকায় বেড়িয়ে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে নামতাম। ওখান থেকে বড় রাস্তা ধরে খানিকটা হেঁটে এলেই বিমল মিত্র বলে এক ভদ্রলোকের দোকান। সেখানে বাবা ঢুকে যেতেন আমার মেজদাদাকে নিয়ে। সেখানে জ্ঞানী-গুণীজন আসতেন। খুব গানবাজনা ও মজলিশ চলত। আমরা মা ছোটভাই-বোনদের নিয়ে বাড়ী চলে আসতাম।

বাবা উত্তরোত্তর ভাল হতে লাগলেন। এর মধ্যে ঠাকুমা, বড়দাদা ও ছোটদাদা এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। আবার যেন খুশীর হাওয়া লাগল বাড়ীতে।

ভোর বেলায় বাবা ও মা বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন পায়ে হেঁটে। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে যে রাস্তা গেছে শহরে, সেইটাই কাশীর একমাত্র খুব চওড়া ও বড় রাস্তা। আর যে সব রাস্তা ছিল তার মধ্যে গলিই বেশী ছিল। বাবা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতেন। মা তো ছোট্ট মানুষ, বাবার সঙ্গে হেঁটে পেরে উঠতেন না। মা পিছিয়ে পড়তেন। বাবা ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছেন পিছনে না চেয়ে। এতে মা বড় বিপদে পড়তেন। একদিন এত পিছিয়ে পড়েছেন যে মা একটু ভয় পেলেন। জোরে ডাকতেও পারেন না। পাশের এক দোকানীকে বললেন—"ছাখ, ঐ যে চওড়া পাড়ের শাল গায়ে বাবুটি যাচ্ছেন ওঁকে একটু ডেকে দাও তো।" সে দৌড়ে গিয়ে বলল, "বাবু ও বাবু, আপনাকে ঐ মাঠাকরুণ ডাকছেন। বাবা ফিরে এলেন, বললেন "কেন তুমি আমাকে ডাকলে না কেন?' মা বলেন,—"ডাকতে তো, পারতাম কিন্তু কি বলেই বা ডাকব?" বাবা বললেন, "ওঃ, তাই তো, এত সম্বোধন আছে তার কোন একটা বলেও জোরে ডাকা যায় না, না?"

ভোর বেলা বেড়িয়ে এসে সকালের খাবার-টাবার খেয়ে আমরা সবাই মিলে আবার গঙ্গার ধারে গিয়ে নৌকায় চড়েছি। নৌকায় তখন মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে কেদার ঘাট, হরিশচন্দ্র রাজার ঘাট, এবং একেবারে রামনগর পর্যন্ত এক-একদিন এক-এক জায়গায় ঘুরেছি। কত লোকে স্নান করছে, জলে নেমে আহ্নিক করছে। বড় বড় ছাতার নীচে বসে জপ করছে। কোন সাধু জলের ধারে একটি ছায়লা মত করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। সকলের মুখেই জয় বিশ্বনাথ, জয় মা অন্নপূর্ণা ধ্বনি। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। লোকের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। বিশ্বনাথ নামের ধ্বনিতে গঙ্গার জল, আকাশ-বাতাস মুখরিত। মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি। এমন পবিত্র স্থান দুর্লভ। আর আমাদের নৌকা চলেছে দাঁড় বেয়ে। মা, ঠাকুমা হাত জোড় করে—চোখ বুজে বসে। বাবা নিঃশব্দে বসে যেন বলছেন, তুমি সুন্দর তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।

বেলা হলে বাড়ী এসে স্নান, খাওয়া-দাওয়া হলে একটু বিশ্রাম, বিকালে আবার নৌকায় যাওয়া।

এর মধ্যে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটি বোধহয় তখন

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। সেখানে বাবাকেও নিয়ে যেত। বাবা একদিন আমাকে ও আমার মেজদাদাকে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ী থেকে অনেক দূর। একা গাড়ী চড়ে গিয়েছি। একা গাড়ীর সামনের দিকে বসা যায় না, পিছন দিকে মুখ করে বসতে হয়। যাই হোক হিন্দু কলেজের মধ্যে বড় একটা হলঘরে আমরা গেলাম। সেখানে কত লোক বসে আছে। আমাকে আর মেজদাদাকে গান গাইতে হল। পিয়ানোর মত মস্ত বড় একটা অর্গ্যান। মেজদাদা বাজালেন, তিনি আর আমি গান গাইলাম অর্গানের সামনে পিছনে কত লোক এসেছিল। ভিড় করে, বাবার লেখা "কোন দেশের উত্তরের সীমায় ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি," এই গানটি আগে গাইতে হল'। পর-পর খুব ফরমাস আসতে লাগল গাইবার জন্য। পরে আমার মেজদাদা একলা গাইলেন, "শ্যামল শস্য ভরা," বাবা শেষে আমাদের সঙ্গে অর্গ্যান বাজিয়েছিলেন। বোধহয় গান করেন নি।

হিন্দু ইউনিভার্সিটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে প্রবাসী বাঙালীর ছাত্রের সংখ্যা বেশী ছিল এবং মৈথিলী ছাত্রের সংখ্যা কম।

বাবা আমাদের নিয়ে বাড়ীতে এসেই মাকে বললেন, "স্থাখ আমার ছেলেমেয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে গান গেয়ে এলো। গান শুনে তো সবাই খুব খুশী হয়েছেন। জান, আমার মেজদাদা তো বলে সে মোটেই ভালো গাইতে পারে না। সে তো ভালই গাইল। আমারও খুব ভাল লেগেছে।"

বড়দাদা, ছোটদি দা রাজসাহী চলে গেছেন, তাঁদের পরীক্ষা এসে গেছে। মেজদাদা রইলেন। রোজ সকালে বাবা-মা বেড়াতে যেতেন, ফিরবার সময় আমাদের জন্য কত রকমের খাবার কিনে আনতেন। শাড়ি কিনে আনতেন। আর চলন্ত নৌকায় গঙ্গায় বেড়ানো আর সভা-সমিতি। এইভাবেই আমাদের দিন চলছিল

এর মধ্যে একদিন শুনলাম আমার বড়দাদার বিয়ে। রাজসাহীতেই আমার বাবার বন্ধু যাদব গোবিন্দ সেনের মেয়ের সঙ্গে। শুনেই তো আমাদের আহলাদের সীমা নাই। কত রকম কেনাকাটা চলতে লাগল। বেনারসীর ব্যবসায়ীরা আমাদের বাড়ীতে কত বেনারসী পাশী শাড়ি এনে ফেলল। মা ঠাকুমা পছন্দ করে বেনারসী শাড়ি কিনলেন, আর ও কি-কি শাড়ি কিনলেন। মায়ের জন্য বাবা নিজে পছন্দ করে একখানা বেনারসী কিনলেন। এইসব জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে এর মধ্যে আমি আর বাবা দুর্গাবাড়ী হেঁটে বেড়াতে গেলাম। সঙ্গে আর কে ছিল আমার মনে নাই। বড্ড বেশী হাটা হয়ে গিয়েছিল। তখন দুর্গাবাড়ীতে খুব ঝোপ-জঙ্গল ছিল আর ছিল বানর। গাছে গাছে শুধু বানর। মন্দিরের চূড়ায় বানর। রাস্তা ফাঁকা, বসতি খুব কম। শিব-দুর্গা দর্শন করে আমরা হেঁটেই ফিরলাম। বাড়ী এসেই বাবার শরীর খুব খারাপ হয়। তার কয়েকদিন পর থেকে আবার গলা ব্যথা হল। ঔষধ প্রলেপ চলতে লাগল। আমাদের মন এত খারাপ হয়ে গেল যে কারো সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগত না। কত লোক দেখতে আসত, যেন বিয়েবাড়ী এত ভিড়; নৌকাতেও বেড়ানো হত কিন্তু সবাই যেন নিরুৎসাহ।

একদিন আমরা নৌকায় যাব বলে বেরিয়েছি; কিছুদূর এসে হঠাৎ দেখা গেল যে আমাদের মধ্যে আমাদের ছোট বোনটি নাই। খোঁজ—খোঁজ, কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা সবাই মিলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াদৌড়ি করে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে এল। মার আঁচলে ভরা খাবার। সব রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলেন। সে এক মজার দৃশ্য। তারপরে সবাই গঙ্গার ঘাটে গেলাম তখন হঠাৎ দেখা গেল দশাশ্বমেধ ঘাটের বড় চওড়া সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে উঠছে আমার ছোট্ট বোনটি আর গান গাইছে, "বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোরে শকতি"। আমাদের ঠাকুর ভগুনাথ দৌড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে মার কোলে দিল। সেদিন আর নৌকায় আমাদের বেড়ান হল না। আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।...

তৃপ্তি কি করে এদিকে দলছাড়া হয়ে এল তা কিছুই বলতে পারল না। আমাদের ভাগ্য যে তাকে ফিরে পেয়েছিলাম। নাহলে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, চেনা-জানা নাই, সামনে গঙ্গা, দেরী হলে কি হ'ত বলা যায় না।

এদিকে বাবার ব্যথা কমে না। বাল্লাজী মহারাজ বলেছিলেন কিনা ঠিক মনে নেই। তবে কলকাতায় ফিরে আসাই ঠিক হল।

এর মধ্যে একদিন নৌকায় যাবার জন্য মা, আমরা তিন বোন, ছোট ভাই ও মেজদাদা, সবাই মিলে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়েছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি মাথায় ছাতা দিয়ে বসে বাবা লিখছেন। পরে দেখলাম, আমার বড়দাদার বিয়ের জন্য একটি গান লিখেছেন—'মধু মঙ্গল গোধূলি পরিণয় উৎসব দরশনে আকুল প্রাণ'।

কখনও কখনও নৌকায় বসে বাবা নিজেই গুনগুন করে গেয়ে সুর দিয়ে আমাদের শিখিয়ে দিতেন। নতুন গান শিখতাম, ভারী আনন্দ হত। যেন মনে হত আমরা আবার সুস্থ বাবাকে ফিরে পেলাম। কিন্তু না, বাবা আর সুস্থ হলেন না।

আমাদের কলকাতায় যাবার দিন ঠিক হল। কত লোক আমাদের বাড়ী আসতে লাগলেন। একদিন রাত্রে আমাদের সবাইকে নিয়ে বাবা রেলস্টেশনে এলেন। কাশীতে অমূল্যবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন দাদাদের বয়সী। তিনিও বাবাকে দেখাশুনা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে এলেন। রেলগাড়ীতে উঠলাম। হুইসল্ দিয়ে গাড়ী ছাড়ল। গঙ্গার ব্রিজের ওপর গাড়ী, আমরা তিন বোন পরিপূর্ণ চোখের জল নিয়ে কাশীর দিকে চেয়ে আছি। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতকালের রাত। পিছনে পড়ে রইল অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি গঙ্গা। কত মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা, স্বর্ণ-মুকুট-শোভিত বিশ্বনাথের মন্দির আর আনন্দ-উজ্জ্বল দিনগুলি।

গাড়ী ধীরে ধীরে ব্রিজ পার হল। এখনও যেন দেখতে পাই—মা বাবার পাশে বসে আছেন। আমরা সকলে ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অন্য প্রদর্শনী ছিল আঞ্চলিক শিল্পজাত দ্রব্যের। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদিসহ নানারকম শিল্পে এই অঞ্চলে অগ্রগতির সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব এই প্রদর্শনী থেকে। কুটীরশিল্প মণ্ডপটিও অনবদ্য। চন্দন কাঠ ও শিল্পের জন্য মহীশূরের জগৎজোড়া খ্যাতি। চন্দন কাঠ দিয়ে এরা বহু বিচিত্র জিনিস যেমন তৈরি করেন, তেমনি এর তেল দিয়ে সুবাসিত হয় সাবান ও আরও বহুতর বস্তু। প্রসাধন রূপে চন্দন পাউডারের বহুল ব্যবহারের কথাও শুনেছি। সারা ভারতে তো বটেই, বিদেশেও এর বাজার বেশ বড়। বিত্তবান্ সৌখীন ও রুচিশীল মানুষের ঘরে চন্দন কাঠের আসবাব তো থাকেই, বহুক্ষেত্রে দরজা জানালাও হয় ঐ কাঠ দিয়ে। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের সমাধিসৌধে চন্দন কাঠের উপর হাতির দাঁতের কাজ করা দরজা দেখেছি। হাতির দাঁতের কাজ মহীশূরের আর এক প্রসিদ্ধ শিল্প। মহীশূরের জঙ্গলেও প্রচুর হাতি। সেগুলি ধরে এরা ফলাও কারবার করেন। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে হাতির প্রাধান্য স্বীকৃত, উৎসবে অপরিহার্য।

প্রদর্শনী প্রাঙ্গণের একটা বিরাট চত্বর জুড়ে গড়ে উঠেছে আনন্দমেলা। নানারকমের নাগরদোলা, কোন-কোনটি তার বিদ্যুৎচালিত, দশ পয়সার ম্যাজিক, চার আনার সার্কাসের সঙ্গে জুয়ো খেলার বা ভাগ্য পরীক্ষার নানা চাতুর্যপূর্ণ আয়োজন রয়েছে। একটা টেবিলে কতকগুলি সাবান সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে কাঠের একটি রিং ছুঁড়ে একখানা সাবান ঘিরে ফেলতে পারলে সাবানটি আপনার হয়ে যাবে। এই ছোঁড়বার অধিকার অর্জনের জন্য মূল্য ধার্য হয়েছে দশ পয়সা। ব্যর্থ হলে দশ পয়সা গচ্চা গেল। না-পানেওয়ালার দল দারুণ ভারি, তবু খদ্দেরের অভাব নেই।

আর এক পাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ। বেশ খোলামেলা বিরাট জায়গা। মঞ্চ থেকে জনৈক গায়ক সুললিত কণ্ঠে সুন্দর গান করছিলেন। কিন্তু শ্রোতা জন-কুড়ি মাত্র। তবে মাইক মারফত গানটিকে সারা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এতে গায়কের প্রতি অসম্মান দেখানই হয়। এমনটি হলে বাংলাদেশে কোন গায়ক গান করতে স্বীকৃত হতেন বলে আমার মনে হয় না। শ্রোতাহীন মঞ্চ দূরের কথা অমনোযোগী বা বেরসিক শ্রোতাদের গান পরিবেশন করতে অস্বীকার করার ঘটনা আমার জানা আছে। মহীশূরের মানুষের নাচগান অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ যে রয়েছে তার প্রমাণ পেলাম চন্দ্রগুপ্ত রোডের থিয়েটারে। এটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। দিনে চারবার করে প্রদর্শনী হয়। প্রথমটির শুরু সকাল সাড়ে দশটায়। দিনভোর আয়োজন অন্য কোথায়ও দেখিনি।

বাজির শব্দে মধ্যে মধ্যে শহর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। রাস্তা চলাই বিপজ্জনক। কখন যে ধাবমান বাজির শিকার হতে হবে তার ঠিক নেই অতএব আর ঘোরাঘুরি করা সমীচীন মনে হয় নি। প্রদর্শনী থেকে সরাসরি আমরা লজে ফিরে এলাম। হোটেলে এসে দেখি এলাহি ব্যাপার। নিচের তলার হল ঘরটি লোকে লোকারণ্য। এরা সব দূরদূরান্তের যাত্রী বাসে করে এসেছেন। রাতটা এখানে ঘুমোবেন। সকালেই বেরিয়ে পড়বেন. নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে। প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের সুযোগ সহ এক রাত ঘুমোবার জন্য জনপ্রতি মাশুল এক টাকা করে। অর্থাৎ হলটির থেকে দৈনিক আয় হয়

প্রায় একশত টাকা। আমরা তিনদিন ছিলাম; প্রতিদিনই এটি ভর্তি দেখেছি। দিনের বেলায় একদম ফাঁকা থাকে।

শহরাঞ্চল দেখানোর বাস ছাড়বে সকাল আটটায়। আমাদের হোটেলের সামনে মহারাজার পুরাতন প্রাসাদ —এখন আর্ট গ্যালারি নামে পরিচিত. তারই প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু হবে। দর্শনীয় স্থানের তালিকায় প্রথম নাম হলো এই আর্ট গ্যালারিটির। সঙ্গে একটি ছোট যাদুঘর আছে। আমি দেখতে উৎসাহ বোধ করি নি। তালিকাভুক্ত আরও কয়েকটি স্থানের উপর বাসে বসেই চোখ বুলাতে হয়। আর্ট গ্যালারি প্রাঙ্গণ থেকে ছেড়ে বাসটি চিড়িয়াখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দেড় ঘণ্টা এখানে থাকবে। ততক্ষণ আমাদের চিড়িয়াখানা দেখতে হবে। সময় নষ্ট করে এবং পয়সা ব্যয় করে মফস্বলের একটা চিড়িয়াখানা দেখতে বাধ্য হওয়ার জন্য মনটা অপ্রসন্ন হলো তবু পঞ্চাশ পয়সা সেলামী দিয়ে ঢুকে পড়লাম পশুশালার প্রাঙ্গণে। সব চিড়িয়াখানার মত এখানেও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পশু পাখি বানর সাপ প্রভৃতি বহু বিচিত্র জন্তু প্রাণী বন্দী করে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে একেবারে মন্দ লাগে না। গণ্ডারের সংখ্যাধিক্যই এ চিড়িয়াখানার এ বিশেষত্ব। এত অধিক সংখ্যক ও নানা আকৃতির গণ্ডার অন্যত্র দেখা যায় না। বহু বানর হনুমান, একদম শাদাও একটি আছে, সমুদ্র-সিংহ এ সব ইতিপূর্বে দেখি নি। বেশ বড় বড় জিরাফ আছে অনেকগুলি। জিরাফগুলির কোনটিকে একতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত মুখটা বাড়িয়ে দিতে দেখা গেল। গলাটা অত লম্বা হলে কি হবে, ওরা মুখটা মাটি পর্যন্ত নামাতে পায় না।

চিড়িয়াখানার সামনেই কয়েকটি দোকানপাট আছে। নানাবিধ সৌখীন স্মারক-দ্রব্য। কয়েকজন কিছু কেনাকাটা করলেন। চন্দন কাঠের গুঁড়োটুকু পর্যন্ত বেশ দামে বিক্রী হয়। সুধীরদা কয়েক প্যাকেট কিনলেন। সুদৃশ্য পলিথিনের প্যাকেটে ভরা কাঠের গুঁড়ো। দাম একটু চড়াই মনে হলো। বাইরের লোকের কাছ থেকে বেশি দাম নিতে এদের কোন কুণ্ঠা নেই।

চিড়িয়াখানা ছেড়ে বাস নিয়ে থামাল একেবারে চামুণ্ডি পাহাড়ের মাথায়। বাসে করে পাহাড়ের মাথায় চড়বার স্ফূর্তিই আলাদা। কোয়াম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার সময় পাহাড় ডিঙিয়েছিলাম। এ পথ ততটা পেঁচালো বা রোমান্টিক নয় বটে, কিন্তু স্বাদ প্রায় একই রকম। উঠবার পথে কোন এক বাঁক থেকে কনডাক্টর আমাদের অদূরে তিন হাজার সাড়ে-তিন হাজার ফুট নিচেয় মহীশূর শহরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ওখান থেকে পুরো শহরটি দৃষ্টি গোচর হয়।

পাহাড়ের শীর্ষদেশটি সমতল এবং বেশ বিস্তৃত। খেয়ালই হয় না আমরা এতটা উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় চড়েছি। চারিদিকে গাছপালাও আছে বেশ। বাস থেকে নামতেই প্রথম দর্শন মিলল মহিষাসুরের। গোঁফ ওয়ালা খর্বাকৃতি মানুষ মূর্তি। ডান হাতে তার উত্তোলিত খড়্গ, বাম হাতে একটি সাপ। মূর্তিটি অসুরের বলেই বোধ হয় অসুন্দর ও ভয়ঙ্কর। সামান্য দূরে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির।

বইপত্রে পড়েছিলাম এটা মা দুর্গার মন্দির। দেবী সিংহবাহিনী অষ্টভুজা। অনেকগুলি বাস একসঙ্গে এসে পড়ায় যথেষ্ট ভিড় হয়েছে মন্দিরে। ভাল করে দেখবার অবকাশ হলো না। দুবার ঢুকেও ঠিক মত দেখতে পারি নি। সংগ্রামরতা দেবী ও অসুর মাত্র দেখে বাঙালী মন তৃপ্ত হয় না, তার চোখ আরও কিছু খোঁজে।—নানা অলংকার, বেশবাস ও মালা চন্দনে আবৃত দেবীকে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখেই ফিরে আসতে হলো। জানি এই মূর্তির মধ্যে বাঙালীর মা দুর্গা খোঁজা অর্থহীন। তবু দ্বিতীয়বার ঢুকেছিলাম এই ভেবে যে, নাই বা রইলো পুরো প্রতিমা, এই দূর দেশে যেটুকু আছে তারই বা তুলনা কোথায়?

সারা ভারতবর্ষেই যে মা দুর্গা নানাভাবে ও নামে

অচিন্ত্য হন সে কথা আমরা ভুলে যাই। বাংলার শারোদ্‌ৎসবের সঙ্গে মহীশূরের দশেরার প্রকার ও প্রকরণগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

অসুর নিধনের জন্য দুর্গার আবির্ভাব। এক এক দেবতার তেজ থেকে দেবীর এক একটি অঙ্গ হয়েছে। দেবতারা সকলেই একটি করে অস্ত্র তুলে দিলেন দেবীর হাতে। সমুদ্র দিলেন বস্ত্র ও অলঙ্কার, হিমালয়ের কাছ থেকে পেলেন বাহন—সিংহ। দেবীর তেজ সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হলো। তাঁর হুঙ্কারে ও গর্জনে বিশ্ব কেঁপে উঠল। দেবীর নিঃশ্বাস থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য জন্মায়।

দুর্গোৎসবের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙালীর নিবিড় পরিচয় রয়েছে। মহীশূরের দশেরা উৎসব একটু আলোচনা করলেই উভয়ের মধ্যেকার নিবিড় যোগসূত্রটি সহজে উপলব্ধি করা যায়।

মহীশূরে নবরাত্রির নবম দিবসে সরস্বতী পূজা হয়। আমাদের মত বই দোয়াত কলমের পূজোর সঙ্গে শিল্পীর বাদ্যযন্ত্র, মিস্ত্রির অস্ত্রপাতি, কৃষকের হল ও পূজিত হয়। আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর উৎসবটি এদেশে বোধ হয় মহিলাদের আমন্ত্রণ করে পান ও কুমকুম উপহার দেওয়ার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের দেশে বিজয়া সম্মেলনে গানবাজনা হয়। ওখানকার এই উৎসবেও গান একটা প্রধান অঙ্গ। কিছু কিছু লৌকিক আচারে ভিন্নতা দেখা যায়।

দশম দিনে সমারোহের সঙ্গে বিগ্রহটিকে এনে গ্রামের বারোয়ারি তলায় সুসজ্জিত কলাগাছের তলায় রাখা হয়। কলাগাছটি হলো অসুরশক্তির প্রতীক। পুরোহিত গাছটিকে তীরবিদ্ধ করেন। অতঃপর গ্রাম-প্রধান এসে তরবারির আঘাতে গাছটি দ্বিখণ্ডিত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা সমস্বরে ধ্বনি দেন, পাপের বিনাশে পুণ্যের জয় হলো। আমাদের পূজার বলিদানের মধ্যেও তো একই বিষয় লক্ষ্য করি। পাঁঠা বা মোষ বলি ছাড়াও, কুমড়া বলি, আখ ও অন্যবিধ ফল বলিদানের প্রথা বাংলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দশেরা অর্থই হলো অশুভ ও অপরাধের বিনাশ এবং শুভের জয়। আমাদের দেশে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ জন্মদিনে কিশোরকিশোরীরা পুতুল সাজিয়ে যেমন জন্মাষ্টমী করে, এদেশে দশেরার দিনে প্রায় সেই রকম কাণ্ড-কারখানা করে ছেলেমেয়েরা। দশেরা মহীশূরের জাতীয় উৎসব। জীবনের প্রায় সব উৎসব প্যাক করে এই দশদিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে উঠবার একাধিক পথ আছে। মন্দিরের দোরগোড়া থেকেই মনে হলো হাঁটা পথ দু'দিকে গেছে। পথের উপর অনেক দোকানপাট। অনেক যাত্রী এসেছেন, বেশ জমজমাট। এখানে আবার টেলকোর চাটার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। প্রচুর ছবি তুলছেন তিনি। বহুজনেই নানা দিকে ক্যামেরা ঘোরাচ্ছেন। আজকের এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চান সকলেই। কিন্তু তা কি সম্ভব? মনের ক্যামেরায় যা রইল তার চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন আমরা বোধ করি নি। তবু ছবি দেখাও ভাল লাগে। তিনি আমাদেরও একখানা ছবি তুললেন।

আমরা ভিন্ন পথে নেমেছি। এই পথের প্রান্তে বৃহত্তম নন্দী অর্থাৎ শিবঠাকুরের ষাঁড় রয়েছে। একখানা পাথর কেটে কুটে উপবিষ্ট একটি বিশাল বৃষ রচনা করা হয়েছে। এর বিশালত্বই শুধু নয়, শিল্পকার্য এবং পরিবেশও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খোলা আকাশের তলায় রয়েছে মূর্তিটি। পূজা হয়তো হয়, কিন্তু অযত্নরক্ষিত। আমাদের সহযাত্রীদের অনেকে পূজা দিলেন প্রদক্ষিণও করলেন। একটি জীবন্ত ষাঁড় সামনে এসে দাঁড় করিয়ে পয়সা আদায়ের ফন্দি এঁটেছেন পূজারীরা। ষাঁড়টি নিরীহ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুজনে ভক্তি সহকারে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে দু-চারটি পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন। উৎসাহী কেউ কেউ ষাঁড়টিকেও কিছু খেতে দিলেন। খাবার আনতে ভুলে গেছেন এমন একজন জঙ্গল থেকে কিছু লতাপাতা এনে ষাঁড়টির মুখে ধরলেন।

ভাস্কর্যের দিক থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মূর্তিটির প্রশংসা করেছেন। এদিকে প্রায় সব শিবমন্দিরেই বৃষমূর্তি দৃষ্ট হয়। এর চেয়ে শোভনতর একটি বৃষ দেখেছিলাম তাঞ্জোরে। সেটা শ্বেত পাথরে তৈরি, কমনীয় রচনা। আকারে ছোট হলেও মনে হয় সেটিই সুন্দরতর।

পাহাড়ের পথে একটি রাজপ্রাসাদ আছে। দূর থেকে এক ঝলক দেখিয়ে দিলেন কনডাকটর। শহরের নানা পথ ঘুরে যাত্রাস্থল আর্টগ্যালারির সামনে দিয়ে এসে আমাদের এ বেলায় মত যাত্রা-বিরতি ঘটল। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক সেখানেই আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো। আবার বিকেল দুটোয় আমরা বেরোব। ঘণ্টা দু'য়েকের কিছু কম সময় হাতে ছিল, তার মধ্যে খেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া গেল। বিকেলের ভ্রমণসূচিতে ছিল টিপু সুলতানের প্রাসাদ, দুর্গ, সমাধি, কাবেরী সঙ্গম, শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির, কৃষ্ণরাজসাগর এবং বৃন্দাবন গার্ডেন।

মহীশূরকে বলা হয় উদ্যাননগরী। সার্থক এ নাম। পথে পথে সবুজ গাছ আর বহুবর্ণ ফুলের প্রাচুর্য একান্ত অমনোযোগী লোকেরও চোখে পড়ে। তাই বলে ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলেরও অভাব নেই। সেখানে খোলার ঘর, রাস্তায় গরু ছাগল, জঞ্জালের বিশেষ কমতি আছে বলে মনে হয় নি। তবে কলকাতার মত জঞ্জালের পাহাড় জমে নেই কোথায়ও।

বিকেলের যাত্রায় প্রথমে এলাম শ্রীরঙ্গপত্তনে। মাইসুর থেকে দূরত্ব দশ কিলোমিটারের মতো হবে। পত্তন শব্দের অর্থ রাজধানী। প্রাচীন কথা কেউ বিশেষ মনে রাখে নি। টিপু সুলতানের জন্য বর্তমান কালে স্থানটির গৌরব বেড়েছে। টিপুকে মহীশূরের মানুষ জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। গোড়ায় তিনি ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলালেও শেষে ইংরেজের সঙ্গে লড়ে শহীদ হয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদটি প্রায় অক্ষতই রয়েছে। বাড়িটির নাম "দরিয়া দৌলত।" এর শুরু থেকে শেষ অবাধ নানা চিত্রে শোভিত। ইতিহাসের বিষয় বস্তু নিয়ে ছবিগুলি আঁকা। অতএব সমসময়ের ইতিহাস জানা না থাকলে এগুলির মর্ম অনুভব করা যায় না। আমাদের সঙ্গে জনৈক স্বয়ংনিযুক্ত ভঙ্গিসর্বস্ব গাইড এসেছিলেন। তবু তার কথায় স্থূল ঘটনাগুলির সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ঘটেছিল।

একখানা ছবিতে সমকালীন প্রধান রাজন্যবর্গকে চিত্রিত করা হয়েছে। তার মধ্যে চিতোরের মহারাণীর ছবিটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী ব্রীড়াবনতা রমণী সব যুগেই রাজ্যশাসনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন—ছবিখানির মধ্যে সে কথাটাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এই যুগের আর এক অধিনায়িকা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথা। কংগ্রেসের ভাঙা-গড়ার পর্ব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত ও গর্বিত।

শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর দ্বারা সুরক্ষিত। 'দরিয়া দৌলত' দ্বিতল বাড়ি। বিস্তৃত প্রাসাদটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এখন ভারত সরকার। Monuments and Archeological Sites and Remains Act অনুসারে এগুলি সরকারী সংরক্ষিত সম্পত্তি। তাই কিছু কিছু ঝাড়পোচ ও সাজানো গোছানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

দরিয়া দৌলতের দোতালায় টিপু ও তাঁর পুত্রদের ছবি আছে। টিপুর দুটি কচি ছেলেকে ইংরেজ জামিন স্বরূপ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই ঐতিহাসিক ছবিখানি দেখে চোখ আর্দ্র হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশি হতেই পারে না। নানা সময়ের অনেকগুলি মুদ্রারও একটি সংগ্রহ এখানে রয়েছে। নানা আকারের স্বর্ণ মুদ্রাও আছে। তাতে আরবী অক্ষর ও বিবিধ প্রতীক চিহ্ন। ব্রোঞ্জ ও রুপার মুদ্রাও আছে অনেকগুলি।

দুর্গটি ভাঙাচোরা। একটা অর্ধভগ্ন তোরণ দিয়েই

বোধ করি আমরা দুর্গপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলাম। তার বর্তমান আকার প্রকার থেকেই অতীতে এ যে কি বিরাট ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দুর্গপ্রাকারের মধ্যেই মাতা-পিতার কবরের পাশে টিপুর কবরটি রয়েছে। মাতা-পিতার জন্য টিপু নিজে এই সমাধিমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এর স্থাপত্য রীতিটি চমৎকার। বারান্দার কালো উজ্জ্বল পাথরের স্তম্ভগুলি নাকি পারস্য থেকে আনা হয়েছিল। দরজাগুলি সব চন্দন কাঠের। হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম নক্‌শা বসানো রয়েছে, এখনও সেগুলি উজ্জ্বল এবং অক্ষত। ইংরেজরা চূড়ান্ত শয়তানি করলেও একটি মাত্র মানুষের মত কাজ করেছিল যে, যুদ্ধে নিহত টিপুর মৃতদেহটি তার মা ও বাবার কবরের পাশে কবর দিতে দিয়েছিল। সমাধি-সৌধের দক্ষিণে রয়েছে একটি বড় মসজিদ। সেটিও দেখবার মত।

এখানে আমার স্থাপত্য সম্পর্কে রাসেলের একটি অপ্রচলিত কথা মনে পড়েছিল। তাঁর ধারণা প্রাচীন কাল থেকেই স্থাপত্য শিল্পের দু'টি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। এক—আশ্রয় দান, এবং দুই—রাজনৈতিক। দ্বিতীয় কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—জাঁকজমক পূর্ণ বাড়ি-ঘর জনচিত্তে প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসাবে রচনা করা হয়েছে। রাজার প্রাসাদ বা দেবতার মন্দির ভগবান্ এবং তাঁর পৃথিবীর প্রতিনিধির (রাজা) প্রতি বিস্ময় জাগাবার জন্য পরিকল্পিত। রাসেল সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর কথার প্রতিবাদ করি না। কিন্তু মন্দির দেখে তো বটেই, এই প্রাসাদ ও সমাধি দেখেও রাসেল সাহেবের কথা যে শেষ কথা নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলেও মনে মনে বুঝেছি।

অদূরে বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির। ত্রিচিনাপল্লীর বিষ্ণু মন্দিরের নামও রঙ্গনাথস্বামী মন্দির। একই নামের দুটো মন্দির আর আমরা দেখিনি। এত মন্দির দেখলাম, সবত্র পূজা-অর্চনার বেশ সুচারু ব্যবস্থা আছে। এখানে কয়েকজন স্থানীয় পুরোহিত নিজেরাই 'উপার্জনের' উপায় হিসাবে পূজার আয়োজন করে থাকেন। এটি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোন পূজার ব্যবস্থা নেই। শুনলাম সরকার নেবার আগে এখানে দীর্ঘকাল পূজা-পাঠের ব্যবস্থা ছিল না, লোকও তেমন আসতেন না। এটিও বিষ্ণুমন্দির। বাইরে থেকে মন্দিরের শিল্পকর্ম তেমন নয়নতৃপ্তিকর মনে হয়নি।

এই মন্দিরের পথে একটি অদ্ভুত কয়েদখানা আছে। লোকে বলে 'ডানজ্যন'। মাটির তলায় অন্ধকার কারাগৃহকে ডান্‌জ্যন বলে। আমরা তার ভেতরে নেমেছিলাম। কতকটা অবরুদ্ধ গুহার মত, সামনে এক ফালি উন্মুক্ত স্থান। তার পরেই উচু পাঁচিল। ঐ এক ফালি আকাশ ছাড়া আলো বাতাস প্রবেশের দ্বিতীয় কোন সুবন্দোবস্ত দেখা গেল না। বাইরের দিকে একখানি তাম্রফলক স্থাপিত হয়েছে। এর থেকে জানা যায়, টিপু এখানে ইংরেজ বন্দীদের দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিলেন।

বাস এবার আমাদের নিয়ে চলল কাবেরী-সঙ্গমে। কাবেরী নদীর দুটি শাখা এইখানে পুনর্মিলিত হয়ে পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়েছে। অপ্রশস্ত দু'টি জলধারা। তার মধ্যে বিস্তর উর্দ্ধ-শীর্ষ শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার দেশের মানুষ একে নদী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন। এ নদীতে নৌকা চলে না, চলবার উপায় নেই। স্রোত যেমন তীব্র তেমনি পাথরেও ভর্তি। সঙ্গম যাই হোক, জায়গাটি মনোরম। একেবারে শান্ত শ্যামশ্রীমণ্ডিত গ্রামীণ পরিবেশ।

আমাদের এ বেলার স্বয়ংনিযুক্ত গাইড এখানে তাঁর আসল বক্তব্যটি উপস্থিত করলেন। একে তাঁর কথাবার্তা বলার ধরণ-ধারণ কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট, তারপর ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে সুরুচির সীমা রক্ষা করে নি। কাল ভদ্রলোকের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন ছিলেন না। বিদ্যাবুদ্ধিতে খাটো মানুষও তার স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকলে, প্রিয় ও গ্রহণীয় হয়ে থাকেন। চালবাজ মানুষ অচল। এঁরা জানেন না ভঙ্গিসর্বস্ব

কৃত্রিমতা ষ্টাইল হতে পারে না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যখন সর্বজনগ্রাহ্য ও গ্রহণীয় হয় তখনই মাত্র তা ষ্টাইলের মর্যাদা পায়। এ মর্যাদালাভ নকলনবিশী করে হয় না। প্রগল্ভতা কুরুচির নামান্তর। যাই হোক এ লোকটি যখন চলে যাবার সময় তার শ্রমের মূল্য চাইলেন তখন যাত্রীরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু দিলেন। ভদ্রলোকের ছেলেকে তো আর দু-চার আনা ভিক্ষা দেওয়া যায় না? কম করে তাই একটা টাকা দিতে হলো। মোট জনা-পঞ্চাশেক যাত্রীর কাছ থেকে অন্যূন চল্লিশটা টাকা নিশ্চয়ই উঠেছিল। ঘণ্টা আড়াইয়ের পরিশ্রমে চল্লিশ টাকা আয়। মহীশূরের মানুষ, কেবল মহীশূর কেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি জনপদ ভ্রমণকারীদের নিকট থেকে কতভাবে যে পয়সা লোটে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

মহীশূর থেকে এ বেলার ভ্রমণে আমরা মন্দির, মসজিদ গীর্জার সঙ্গে প্রাচীন কীর্তি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সবই দেখেছি। গীর্জার কথাটা বলা হয়নি। সেন্ট জোসেফ চার্চ। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে নির্মিত। গীর্জার বাইরে মা মেরী ও যীশুর পৃথক পৃথক মন্দির আছে। কেরলের পথে যীশুর মন্দির দেখেছি। মন্দির-ময় দক্ষিণে যীশুকেও গ্রহণীয় করে তুলবার জন্য মন্দির স্থাপন করতে হয়েছে বলে মনে হয়। গীর্জাটি প্রাচীন না হলেও দর্শনীয়। গীর্জার অভ্যন্তরে আমরা ঢুকে-ছিলাম। সেখানকার পরিচ্ছন্ন শান্ত নীরবতা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। গীর্জাটির ভিত্তিশীলা ন্যাস করেছেন মহীশূরের মহারাজা কৃষ্ণ রাজেন্দ্র। ভারতীয় হিন্দুর পক্ষেই এই ঔদার্য সম্ভব। পৃথিবীতে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছেন এমন নজীর বড় বেশি নেই। অনেকে বলতে পারেন, তখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল। চাপে পড়ে অথবা তাদের খুশী করার জন্য সেদিনকার করদমিত্র রাজ্যের এই মহারাজা গীর্জার জমি ও অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত মেনে নিতে তর্ক নাই করলাম। কিন্তু এই রকম একজন রাজাকে দিয়ে ভিত্তিশিলা স্থাপন করানোর পেছনে ত কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ভারত সংস্কৃতির সার সত্যটি এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব গীর্জাটিক ভ্রমণসূচিতে স্থান দেবার মধ্যে বাণিজ্যিক বুদ্ধি যদি থেকেও থাকে, আমি খুশী হয়েছিলাম।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে মহীশূরের ইঞ্জিনিয়ার রাজপুরুষ বিশ্বেশ্বরাইয়াজি সারা ভারতের প্রথম জলাধার তৈরী করেন। মহারাজার নামে এটির নাম হয়েছে কৃষ্ণরাজ সাগর। ভারতে এখন এমন অনেক সাগর হয়েছে। তাই এটাকে আর অনেকে আজকাল দর্শনীয় বলে মেনে নেবেন না। তবু এই জলাধার দেখতে গিয়েছিলাম। ড্যামের কফি দোকানে বৈকালিক জলযোগ সেরে নিলাম। দুই-এক-মিনিট ঘুরে দেখলেই দেখা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর আমরা যাব আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থল বৃন্দাবন গার্ডেন বা কুঞ্জ। সরোবর, ফোয়ারা ও ফুল পাতায় সাজান বাগান। সন্ধ্যার পর ঘণ্টাখানেক প্রচুর বিজলি আলো জেলে, সার্চ লাইট দিয়ে রঙীন আলো ফেলে ফোয়ারাগুলিকে মোহিনী করে তোলার ব্যবস্থা আছে। সরোবরে জলবিহারের আয়োজনও রয়েছে। পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে দু চক্র স্পীড বোটে ঘুরে আসতে পারেন। এরও খদ্দের আছে বেশ। এসব দেখে ভাল লাগার বয়স পেরিয়ে এসেছি বলেই বোধহয় তেমন আস্বাদ পাইনি।

যানবাহনের অসুবিধার জন্য মহীশূর থেকে শ্রাবণ-বেলগোলা, হাসান হালেবিদ ও বেলুর যাওয়া সম্ভব হল না। রেলে হাসান গিয়ে বেড়ান যায়, তাতে একদিন সময় বেশি লাগে। একমাত্র সিজন টাইম অর্থাৎ মার্চ মাস ভিন্ন অন্য কোন সময়ে দৈনিক যাত্রীবাস ওদিকে যায় না, কিন্তু খবর পেলাম বাঙ্গালোর থেকে যাওয়া এখন অনেক সুবিধা। তাই তৃতীয় দিনেই মহীশূরের বাস তুলে বাঙ্গালোর যাওয়া ঠিক হল। তাড়াতাড়ি পুরান ব্যবস্থা বদলে ফেলার ফলে বেশ অসুবিধার পড়তে হয়। পরিচিত দু-একজন লোকের সঙ্গে দেখাৎ সাক্ষাৎ করা বাতিল করে দিতে বাধ্য হলাম।

এই রকম ভ্রমণে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন জায়গায় এক-দুই দিনের বেশি থাকছি না। আবার কবে কোথায় পৌঁছাব তারও ঠিক নেই। তাই সাধারণত পরিচিত বন্ধুদের ঠিকানায় বাড়ি থেকে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। মহীশূরের গান্ধী শান্তিকেন্দ্রে চিঠি আসার কথা। সকাল দশটার আগে তাদের দেখা মিলবে না। আবার চিঠি না নিয়ে যেতেও মন চাইছে না। তাই সকালটা বসে বসে কাটিয়ে বারোটার বাস ধরে আমরা বাঙ্গালোর রওয়ানা হলাম।

আমরা এক্সপ্রেস বাসের সওয়ারি। মহীশূর থেকে ছাড়বে আর বাঙ্গালোর গিয়ে থামবে। মাঝখানে কোথায়ও দাঁড়াবে না। ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা। আসন সংরক্ষণ টিকিট চার আনা। দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। কোয়েম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার আনন্দ-স্মৃতি তখনও অম্লান। তাই বাসের ছোট আসন, মালপত্রের চাপ ইত্যাদি অসুবিধা আমাদের গায়ে লাগেনি। পরে বুঝেছিলাম দীর্ঘপথে এগুলি শেষ পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এ রাস্তাও সুন্দর, তবে মহীশূর বাঙ্গালোর পথের মত সৌন্দর্য এর নেই, সেই পরিচিত দৃশ্য। আকাশের পট-ভূমিকায় পাহাড়, ধানক্ষেত, কৃষকের কুটীর। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে বাঙ্গালোর আসতে। পথে একটি জনবিরল প্রান্তরে এক আমগাছ তলায় মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়েছিল বাসটি। জনৈক ডাব বিক্রেতা এখানে ডাব নিয়ে হাজির ছিলেন। বাঁধা দর পঞ্চাশ পয়সা, বাসের যাত্রীরা সব একসঙ্গে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের এ অভিজ্ঞতা আছে। তাই বোধহয় খদ্দের সামলাবার জন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে করেই এসেছেন। তারা খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে আর তিনি ঝুপঝাপ ডাব কেটেই চলেছেন। কথাবার্তা দুই-তিনটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেউ কারও ভাষা জানি না। মধ্যে মধ্যে কন্‌ডাক্টর কাছেপিঠে থাকলে কিছু বুঝিয়ে দেন।

পূর্বেই হয়ত বলেছি, বাঙালী যেরকম ডাব খেতে ভালবাসে এ দেশে তা মেলে না। কুমড়ো নারকেল। জলের চেয়ে শাঁসের পরিমাণ বেশি। নরম শাঁস এখানে মালাই নামে পরিচিত। এক রামেশ্বর ছাড়া আমাদের রুচিকর ডাব আর কোথায়ও দেখিনি।

বাঙ্গালোরের বাসঘাঁটি একটা পুকুরের মত জায়গায়। চারিদিকে উঁচু উঁচু রাস্তার মধ্যবর্তী ভূভাগ পুকুরের আকার ধারণ করেছে। রেল স্টেশন নিকটে, আধুনিক শহর কেন্দ্রস্থলে এই বাসঘাঁটি থেকে দূরপাল্লার সব বাস ছাড়ে, সর্বত্রই বাসে যাওয়া যায়। এমনকি সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে।

বাঙালোর মহীশূরের রাজধানী, আধুনিক শহর, কিন্তু প্রাচীনতার স্পর্শ বর্জিত নয়। রামায়ণ মহাভারতের অতি প্রাচীনকাল বা মধ্যযুগের ইতিহাসেও মুসলমান রাজত্বের নানা অধ্যায়ে বাঙ্গালোরের উল্লেখ আছে। মহীশূর রাজ্যের নাম বদলে কর্ণাটক করা হচ্ছে সেই পুরাতন স্মৃতির সূত্র ধরেই। হাল আমলের একটা দিক বাঙ্গালোর বিখ্যাত উদ্যান লালবাগের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা নিয়ে নিরস বা সরস যে আলোচনাই করা হোক না কেন সে হবে মনোজগতের ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসলে ঠকতে হবে, অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে হয়। কিন্তু হায়দার আলি ও টিপু-সুলতানের হাতে গড়া বিশাল বাগান—লালবাগ, বোটানিকাল বাগান খোলাচোখে দেখা যায়,—এখনও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অশীতিপর বৃদ্ধ হায়দার যুবক টিপুর সঙ্গে মিলিত হয়ে শঠ ও প্রবঞ্চক ইংরেজের শয়তানির চিরতরে শেষ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরেজের শৌর্যের কাছে তাঁরা পরাজিত হননি। হেরেছিলেন নিমকহারামির কাছে, স্বদেশবাসীর ষড়যন্ত্রের কাছে। তাই ত এ পরাজয় গ্লানির হয়নি, শতাব্দীকাল পরেও গৌরবের জয়টিকা হয়ে রয়েছে।

আধুনিক ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালোর একটি বহুশ্রুত নাম। সাহিত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ রাজ্য সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী। আর শিল্প-

প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখানা, টেলিফোন ফ্যাক্টরি, সরকারী মেসিনটুল্‌স্‌ ফ্যাক্টরি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়ান্স ইত্যাকার নামগুলি স্বাধীন ভারতবাসীর গৌরব ও গর্ব্বের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। কাছেপিঠে ত অফুরন্ত দেখবার জায়গা। তার সঙ্গে ইদানীং যুক্ত হয়েছে—হোয়াইট ফিল্ডে সাই বাবার আশ্রম। বাঙালীর নিকট বিশেষ আকর্ষণের আর একটি স্থান আছে রবীন্দ্র কলা ক্ষেত্র।

বাঙ্গালোরে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রীনিবাসে উঠেছিলাম। নাম শুনেই এটি পছন্দ করি, বেশ বড়সড় আধুনিক আবাস। বিন্নিপেটের ছাত্র মোহন গিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সেবা করতে। বারাসতের নিকট আমডাঙ্গায় সে এই কাজে আমায় সহকর্মী ছিল প্রায় ছ'মাস। এখানে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ হল। খাওয়া-থাকা ও অন্য সব কিছুর দারুণ অসুবিধার মধ্যে যাঁরা হাজার মাইলের দূরের দুর্গত মানুষের সেবা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তারা কেউ সাধারণ মানুষ নন। মোহন ভাই তেমনি একজন অসাধারণ মানুষ। সে আমার অনুজপ্রতিম হয়ে উঠেছিল। খবর পেয়ে হোটেলে এসে দেখা করেছিল। দুঃখ রয়ে গেল তার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। মোহনদা ও সুধীরদা গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সৌজন্যে ও আন্তরিকতায় তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন।

মোহন নববারাকপুর সমবায় পল্লীতে আমার বাসভবনে গিয়েছিল। সমবায় প্রথায় গড়ে-ওঠা উদ্বাস্তদের বাসভূমি নববারাকপুর দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। সমবায়ের প্রতি আমার স্বাভাবিক অনুরাগ তাই তার জানা ছিল। সুতরাং সে বাঙ্গালোরের ওমেনস্‌ ইনডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি দেখার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছিল।

সমিতিটি সোমেশ্বরপুরে। বারো বছর মাত্র হল এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শহরের নিম্নআয়ী পরিবারের মেয়েদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে এটি সফল হয়েছে বলা চলে। বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্ত এবং অনগ্রসর সমাজের নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমিতি টেলিফোনের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করেন। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইনডাস্ট্রিজের সঙ্গে চুক্তি বলে এঁরা টেলিফোন কোম্পানীর নিকট থেকে কাঁচা মাল পান। কোম্পানীর নির্দেশ মত সমিতি নিজস্ব কর্ম্মশালায় সেগুলিকে গড়া-পেটা করে ফেরত দেন।

সমিতির বর্তমান সদস্যসংখ্যা একশর কিছু বেশি। সমবায় বিভাগে একজন পদস্থ অফিসার এর ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত হয়েছে। ম্যানেজারের বেতন সরকার দেন বটে, কিন্তু সমবায় সমিতির নির্দেশেই তাঁকে কাজ করতে হয়। সমিতির নিজস্ব মূলধন অর্থাৎ শেয়ার মাত্র হাজার তের টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করেছেন। শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে এই সমিতি পেয়েছেন ১২,৪১,৫০ টাকা। মহীশূর সরকার ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি ছাড়াও বিবিধ উপায়ে নানা সাহায্য করে থাকেন। বিদেশের মানব সেবা সংস্থা থেকেও এঁরা বেশ কিছু সাহায্য পেয়েছেন।

নারী কর্মী বলে কোলের বাচ্চা নিয়ে অনেককেই কাজ করতে আসতে হয়। ছোট হলেও কারখানা ত বটে, তাই বাচ্চা সামলে কাজ করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। এ সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছেন পশ্চিম জারমানি ক্যাথলিক সংগঠন ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এই সমবায় সমিতির ক্রেশটিও খুব সুন্দর। এটি সমিতি পরিচালনা করেন। সদস্যদের এজন্য মাসে মাত্র দুই টাকা চাঁদা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে দু হাজার টাকা পাওয়া যায়। কর্ম্মশালা সমিতি ভবন, ক্রেশ ইত্যাদি যে জমির উপর গড়ে উঠেছে সেটি নিয়েছেন বাঙ্গালোর নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট। কোন সেলামি লাগেনি। বার্ষিক খাজনা মাত্র বার টাকা।

এমন সুবিধা পশ্চিম বঙ্গের কোন সমিতি আশা করতে পারেন? এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি কর্মীকে

৬ মাসের ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং-এর সময় প্রত্যেককে মাসিক ৬০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। শেষ হলেই চাকরি মেলে। নিম্নতম নিশ্চিত বেতন ৭৫ টাকা। তারপর যে যেমন কাজ করতে পারবেন তেমনি ইনসেনটিভ বোনাস। সাধারণতঃ কর্মীপ্রতি এই খাতে মাসিক উপার্জন পনের টাকা থেকে একশত টাকা পর্যন্ত হয়। এই উপার্জন সামান্য মনে করার কোন কারণ নেই। বাঙ্গালোরে জীবনযাত্রার ব্যয় কলকাতার অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়া আছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং কর্মচারী রাজ্যবীমার সুবিধা।

সমিতি থেকে দুপুরে কর্মী ও তাদের সন্তানবর্গকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। সদস্যবর্গের সন্তান-সন্ততির জন্য ইন্দিরা-নগরে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন সমিতি।

সমিতি কর্মীদের পুনর্বাসনেও উদ্যোগী হয়েছেন। যে-সব মৃত বা বিকলাঙ্গ সৈনিকের স্ত্রী এই সমিতির সদস্য, প্রথমে তাদের পুনর্বাসনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮টি পরিবারের বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন এই সমিতি।

একটি মধুর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এই সমিতিতে। নববর্ষের দিন প্রতিটি কর্মীকে ব্লাউজের কাপড় সহ একজোড়া শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। অর্থমূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, এই রকম কাজের দ্বারা কর্মী ও পরিচালকদের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কর্মীদের নিকট প্রতিষ্ঠানটি কেবল মাত্র উপার্জনের হাতিয়ার।

সোসাইটি অচিরেই আরও বড় হবে। পঞ্চাশ জন নতুন কর্মী নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে শুনে এলাম। মহীশূর সরকার রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিল থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতি কিনে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সমবায় ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আহার্য্যের ব্যাপারটা এদের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বুঝা যায় আমরা কেন পিছিয়ে আছি। যেখানে দশ টাকা দরকার, সেখানে এঁরা দু টাকা দিয়ে দুধ ও তামাক দুটোই খেতে চান। পশ্চিম বাংলার সরকারী সাহায্যের চেয়ে চোখ রাঙানিটাই বোধ হয় বেশি। সরকারী মনোবৃত্তি না বদলালে এবং সাহায্যের পরিমাণ না বাড়ালে, কেবল অর্থের মাত্র নয়, অর্থের সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যের নিশ্চিত বিক্রয়-ব্যবস্থা কিছুই সফল হবে না। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে এই রকম একটি সমবায় একবার গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাকে কেন্দ্র করে একটা সমিতি গড়ে উঠেছে—সেখানে সরকারের কোন সাহায্যই নেই বলেই শুনেছি।

বাঙ্গালোর শহরে ফুলের মেলা। পথে প্রান্তরে সর্বত্র অজস্র ফুল। লালবাগের গোলাপবাগানের নাকি তুলনা নেই ভূভারতে। কি জানি এ কথা কতটা সত্য। আমি তো যা দেখি তাই অতুলনীয় মনে হয়। ষাট রকমের পুষ্পিত গোলাপ গাছ আছে এই বাগানে। হাজার রকম চেনা-অচেনা আরও সব গাছগাছালির মেলা বসেছে। শহরে খানিকটা এলোমেলা ঘোরা-ফেরা করে কাটিয়ে দেওয়া গেল। জনৈক বাঙালী যুবক বাঙ্গালোর থেকে ঘুরে এসে বলেছিলেন, এই শহরের একটি পথে চোদ্দটি সিনেমা আছে। দেখা গেল চোদ্দটি নয়, আঠারটি। দু-চার দশ-পা এগোলেই একটা সিনেমা পড়ে।

ক্রমশ:

বিত্ত যশ......?

জ্যোতির্ময়ী দেবী

নিশির ডাক

গ্রামদেশে সবাই জানে, রাত্রে যদি কেউ দরজা ঠেলে ডাকে, তাকে এক ডাকে সাড়া দিতে নেই। তিনবার ডাকার পর যদি আবার ডাকে তবেই সাড়া দেবে। দরজা খুলবে। অথবা বন্ধ দরজার পিছন থেকেই বারকতক 'কে' 'কে' জিজ্ঞাসা করে তার গলার শব্দটা আওয়াজটা শুনে নেয় যেন, লোকে।

আর যদি সে তিনবার ডেকে আর না ডাকে—তাহলে?

গ্রাম-বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চোখ কুঁচকে চুপি চুপি আতঙ্ক-অভিভূত স্বরে বলেন, নিশি ডেকে ছিল রে। নিশি।

যদি একবার বা দুবারের ডাকে সেই ডাকা লোকটি দরজা খুলত, বেরিয়ে পড়ত ঘর থেকে...। তাহলে?

'তাহলে আর দেখতে হত না।'

তারপর চোখ বড় করে, ফিস্ ফিস্ করে বললেন আবার, 'আর দেখতে হত না।'

শিশু-বালক শ্রোতারা প্রশ্ন করে, 'কেন দাদা' অথবা 'কেন ঠাকুমা। কি হত তাহলে?'

তাঁরা মৃদুকণ্ঠে বলতেন, 'সে ত মানুষ নয়, নিশি যে।'

'মানুষ নয়? মানুষ নাহলে নিশি? সে কি দাদা-ভাই?'

কোন দাদাভাই বা ঠাকুমা বলেন, 'সাধারণ ভাবে সে মানুষ নয়। সে আবছায়া—একটা ছায়ার মত......।'

কেউ বলেন স্পষ্টই, সে অপদেবতা। ভূতের মত বা প্রেতিনীর মত একটা সাকার নিরাকারে মেশানো ব্যাপার। অর্থাৎ ছোঁয়া যায় না। কিন্তু চেহারা আছে একটা, ভয়ানক আকারের। এবং তার হাতে থাকে একটি নতুন পাড়া কাঁচ ডাব। মুখটা কাটা ডাবটার। যে তার এক বা দুডাকে সাড়া দিয়ে ফেলে, নয়ত ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে, তার প্রাণটা ঐ 'নিশি' বা সে ঐ ডাবটার মধ্যে তখনই পুরে নেয়। তারপর তার হাত ধরে জলা জঙ্গলে বনে শ্মশান মশানে চলে যায়—সেখানে গিয়ে তার গলা টিপে মেরে পচা পুকুরের পাঁকে পুঁতে রেখে দেয়। প্রাণটা অবিশ্যি বার করে ঐ ডাবের মধ্যে রেখে দেয়। যখন ইচ্ছে হয় তাকেও আর একটি 'নিশি' বানিয়ে খেলার সঙ্গী করে নেবার জন্য।

এই হল 'নিশির' ডাক। আর 'নিশির' কাহিনী—সেকেলে ঠাকুরমারা এবারে গল্প বলেন।

ওঁদের পাড়ার চেনাজানা একটি ঘরে একদিন 'নিশি' ডাকল। একটি মেয়ের নাম ধরে ডাকল, 'কালী, ওরে কালী'—দুবার।

সেদিন ঘরে ঠাকুমা পিসিমার সঙ্গে কালী ঘুমিয়ে ছিল। সে যেমন 'এ্যাঁ' বলে উত্তর দিতে গেছে, পিসিমা মুখটা চেপে ধরে বলেছেন, 'চুপ চুপ'।

অন্ধকার ঘর, বাইরে অমাবস্যার রাত্রি। তৃতীয় প্রহর রাত, সেইটেই 'নিশি'দের ডাকার সময়। অন্ধকার রাত ঝমঝম করছে যেন। নিঃসাড়—নিশুতি। কালো চাদর ঢাকা রাতটা যেন থমথমে হয়ে বসে আছে একটা ডাইনী-বুড়ীর মত।

কালীর ঠাকুমা বললেন, 'কথা কয়ো না কেউ। শাপ লেগে যাবে। ওদের কানে কথা গেলে তার আর রক্ষে নেই। আজ নয় কাল এসে টেনে নিয়ে যাবে।'

কালী, তার ভাই পাঁচু, ছোট বোন ক্ষেন্তি সব অসাড় হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কালীর ঠাকুমার পিসিমার বুদ্ধির জোরে সেদিন তারা বেঁচে গেল।

আবার একবার একটা বাড়ীতে নিশি ডেকেছিল।

শ্রোতারা নীরব। মুখ-বুক শুকিয়ে কাছ ঘেঁষে বসে বৃদ্ধার। যেন নিশি পাশেই কোথায় রয়েছে। এখনই ডাকবে—গোপাল, পাঁচী, টুনী, মনি, বিধু, শ্যাম, সুধা, কারুকে নাম ধরে। আর তার সাড়া পেলেই তার প্রাণটা বার করে 'মুখুটি' খোলা ডাবটার ভিতরে টেনে নিয়ে পুরে মুখটা বন্ধ করে নিয়ে চলে যাবে। আর তার দেহটা তার সঙ্গে আপনি চলে যেতে থাকবে কলের পুতুলের মত।

আতঙ্কিত শিশুরা বলে, 'রোজ ডাকে নিশি? আজ ডাকবে? কেন ডাকে? এখনই ডাকবে?'

বৃদ্ধা হাসলেন—বললেন, 'নিশি' তো সন্ধ্যে রাতে আসে না। সন্ধ্যেবেলা ডাকে না। সে আসে দুপুর রাতে। অমাবস্যার রাতে। নয়ত কেষ্ট (কৃষ্ণ) পক্ষের 'খর' তিথি 'খর' বারে। এই শনি মঙ্গলবার যে অন্ধকার তিথিতে চাঁদ সন্ধ্যে বেলায় উঠে অস্তে চলে যায়। রোজও আসে না সে।

কে জানে, কে ভাবে, অত তিথি-নক্ষত্র-বারের হিসেব করে। গ্রামের পথঘাটগুলো তখন অন্ধকারের লেপে মুড়ি দিয়ে বসে আছে বাইরের উঠানে-জঙ্গলে-বনে-বাদড়ে। বাতাসের শন-শন শব্দ হচ্ছে নারকেল খেজুর তালগাছের পাতায় পাতায়। আম-কাঁঠালের বাগানে পেঁচা ডাকছে। আর কি যেন ভয়ে পাখিরা ঝটপট করে উঠছে। তাদের ডানার শব্দ ওঠে, শোনে।

'তাহলে রাত এখন কত? এখন নিশির আসবার সময় হয়নি?'

'না, তোমরা খাওয়া দাওয়া কর। এখনও তো সাড়ে আটটার রেলগাড়িটার বাঁশির শব্দ শোনা যায় নি।'

বলতে বলতে দূরের ষ্টেশন থেকে একটা রেলের তীব্র বাঁশির শব্দ আর প্রায় নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ভেদ করে ভস্ ভস্ ঘস্ ঘস্ করে রেলগাড়িটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেল।

এইবার সব ডেলি প্যাসেঞ্জার সব বাড়ীর কাকা বাবা মামা দাদা ভাইদের আসার সময় হয়েছে।

শিশুরা আশ্বস্ত। তাঁরা পুরুষ মানুষ, সাহসী। হাতে লাঠি, গায়ে জোর আছে। মোটা ভারী গলায় ধমক দিতে পারেন। আর একসঙ্গে অনেকজন তাঁরা আসেন। তাঁদের 'নিশি'রাও ভয় করে।

* * *

কিন্তু যে গল্পটা, নিশির ডাকার যে কাহিনীটা কেউ কেউ তারা পরে শুনেছিল, তখন কেউ বলে নি, সেটা হল ঐ পাটুলী (নবদ্বীপ) গাঁয়ের কাছে একটা জায়গা। রাখাল সরকারদের বাড়ীর গল্প।

পৌষ মাস। সাগর মেলা এসে পড়েছে। বাড়ীর আর পাড়ার গিন্নী-বান্নীরা এবং শক্তসমর্থ পুরুষরাও 'সেথো' সাথী হয়ে কেউ কেউ তাঁদের নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় যাচ্ছেন।

সে আজ প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের কথা। জাহাজে-নৌকায় করে দল বেঁধে যাচ্ছেন তাঁরা।

যেখানে সাগর আর গঙ্গা মিলেছেন সেই সঙ্গমে দেবার জন্য সোনা-রূপা পঞ্চরত্ন মণিমুক্তা তামার প্রায় অদৃশ্য কুঁচি মুদির দোকানে কেনা হয়েছে। কাগজে মুড়ে সযত্নে রাখছেন সবাই। কেউ কেউ নিয়েছেন পঞ্চফল। অর্থাৎ পাঁচটা ফল—হরীতকী, সুপারি, আমলকী, বহেড়া, ঝুনো নারিকেল বা কচি ডাব। নৈবেদ্য-ভোজ্য গঙ্গা ও সাগরের। একফালি রেশমখণ্ড মা গঙ্গার বস্ত্র হিসেবেও কেউ নেবেন। এবং ওখানে দানপুণ্য করার জন্য—পিতৃগণের তীর্থকৃত্যের জন্য কেউ কেউ অন্ন-জল-বস্ত্রের থালা-গেলাস বস্ত্রও নিয়েছেন।

ক'দিনের জন্য সারাটা গ্রাম প্রায় বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী এবং মাঝারি বয়সের নরনারীশূন্য। সে বছরে আবার অমাবস্যা ও সংক্রান্তি একদিনে পড়েছে।

অন্ধকার গ্রাম। ঘরে ঘরে বাড়ীতে বাড়ীতে টিম্-টিমে তেলের প্রদীপের ও কেরোসিনের কুপীর আলো। বাড়ীর হারিকেন ক'টাও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেছেন সাগর-দ্বীপে, পথঘাটে ঝোপঝাড়ের জায়গায় আলোর জন্য।

সরকারবাড়ীর বৃদ্ধা ঠাকুমা পিসিমা জেঠিমারাও গেছেন। বাড়ীতে শুধু ছোটবড় ছেলেমেয়ে নিয়ে

তাঁদের কম বয়সের বউরা মেয়েরা আর দু'তিনজন ছোটবড় পুরুষ ও বড় বড় ছেলেরা আছে।

আগের রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে কনকনে শীত পড়েছে। গ্রামে তাই সন্ধ্যে হতেই ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ হয়েছে। কেমন যেন একটু ভয়ও হচ্ছে সকলেরই। সরকারদের একতলা বাড়ীরও দরজা বন্ধ হয়েছে সন্ধ্যে থেকেই।

ঠাকুমার ঘরেই নিরুপমা আর অনুপমা দু'বোন রাত্রে শুত।

নিরুপমার বয়স প্রায় ১৯।২০। ১২ বছরে বিয়ে হয়ে ১৬ বছরে বিধবা হয়। সেই অবধি বাড়ীতেই আছে। শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয়নি তখনও ছোট বলে। অনুপমা ১১।১২ বছরের অবিবাহিতা মেয়ে। সেদিন বাইরে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি থেকে থেকে পড়ছে। থামছেও কখনো। কখনো ফিস্‌ফিস্ করে কথা কওয়ার মত শব্দ করে পড়ছে।

মায়েরা নিজেদের ঘরে ঘরে শিশুদের নিয়ে শুতে গেলেন। ওদের ঘরে আজ আর বড়রা কেউ নেই।

কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোদের ভয় করবে? খিল দিয়ে শুবি তো।'

নিরুপমা বললে, 'না ভয় করবে না।'

কিন্তু দু'জনেরই মুখ শুকনো যেন ভয়ে।

রাত আটটা-ন'টা থেকেই গ্রামের শীতের রাত গভীর হতে থাকে। তাতে সেদিন আবার শীতে-বর্ষাতে যোগ হয়ে চাঁদে চুড়ো বসেছে যেন। গ্রামের উপমায় 'চাঁদে চুড়োর শোভা'।

তারপর নিশীথ বা নিশুতি রাত। কত রাত কে জানে।

এদের শঙ্কিত ঘুম কেবলই ভেঙে যাচ্ছে। কোথায় যেন পাখী ডাকছে, না—পেঁচা। কোথায় ঝপ ঝপ করে জলের শব্দ, না, কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে জানলার পাশে পথের ধারে। পাশের পুকুরে ঝপাৎ করে মাছ লাফাল একটা।

সহসা যেন ঠুক্‌ঠুক শব্দ হয় জানালায় না দরজায়। দরজার সামনে উঠানের ওপারে দরজা। খিল বন্ধ। প্রাঙ্গণের চারদিকে ঘরে বাপ-মা কাকা-কাকী পিসীরা থাকেন।

সাড়া

কত রাত কেউ জানে না।

হঠাৎ উঠানের দরজায় মৃদুভাবে ঠক্ করে একটা শব্দ হল।

পিতামহীহীন একলা অন্ধকার ঘরে ওদের ঘুম ছ্যাক ছ্যাক করে পাতলা হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল কেবলই। আগে থেকেই।

শব্দটা শুনতে পেল অনু। সে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'দিদি, একটা শব্দ হল কোথায়।'

নিরুরও পাতলা ঘুম ভেঙে গেছে।

এবারে আবার একটা শব্দ, যেন ঘরের দরজায়। কাছেই? না! কে ডাকল চুপি চুপি—'নিরু, ও নিরু।'

নিরুপমা উঠে বসল। মাথার চুল ঠিক করে জড়িয়ে নিতে লাগল।

অনু সভয়ে দিদিকে ধরে আছে। বললে, 'কে যেন তোমাকে ডাকছে। নিশি। উত্তর দিও না। এক্ষুণি নিয়ে চলে যাবে, দুবার ডেকেছে।'

নিরুপমা উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকে সরিয়ে দিল। হাতটা ছাড়িয়ে নিল। একটাও কথা বলল না। লেপ সরিয়ে চৌকি থেকে নেমে পড়ল।

ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতের জন্য জানালাও বন্ধ। 'কোলের মানুষ' দেখা যায় না, গ্রামের অন্ধকার এমনি।

অনু কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, 'দিদি, ও দিদি, সাড়া দিও না। নিশি ডেকেছে। আজ অমাবস্যার রাত বোধ হয়। ঠাকুমা বলেছিলেন অমাবস্যার যোগ গঙ্গাসাগরে আজ।'

নিরুপমা কোন জবাব দিল না। তাকে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলল।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। তৃতীয়বারে আবার একটা শব্দ উঠানের ও-প্রান্তে

বাইরে যাবার দরজায়। অনু ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ বুজেই শুনতে পেল—নিরুপমা সে-দরজায় খিলও খুলল।

অন্তর্ধান

কুয়াসাচ্ছন্ন ঝাপসা মুখে শীতের সকাল চোখ মেলল অনেক বেলায়।

অনু সারারাত্রি ভয়ে-আতঙ্কে জেগে চোখ বুজে শুয়ে থেকেছে। আর মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে তার রাত কেটেছে।

তারপর ভোরের বেলায় কি শেষরাত্রে সে ঘুমিয়েছিল বোধহয়। ভয়ে ঘরের দরজাটাও সে উঠে বন্ধ করে দিতে পারেনি। বাইরের প্রাঙ্গণের দরজাও খোলাই পড়ে ছিল।

সকালে পরিজনরা ঘরে ঘরে জেগে উঠে বেরিয়ে দেখেন প্রাঙ্গণের দরজা খোলা। ঝড়ের হাওয়ায় কখনও খুলছে কখনও বন্ধ হচ্ছে।

কে খুলল দরজা? কখন খুলল? সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ত কখনো হয়নি।

অনুর বাবা জিজ্ঞাসা করেন ভাইদের।

কেউ জানে না কে উঠেছে আগে। দরজা খুলেছে কেনই বা।

কে দেখলেন অনুদের ঘরের তাঁদের জননীর ঘরেরও দরজা খোলা। অনুর তখনও ঘুম ভাঙে নি।

অনুর মা মেয়েকে ঠেলে ডাকলেন, 'নিরু, ওরে নিরু, —অনু, ওঠ্, বেলা হয়েছে।' ভাবলেন লেপের তলায় নিরু আছে।

এবারে দেখলেন বিছানায় ত নিরু নেই। নিরুই কি তবে দরজা খুলেছে।

কিন্তু সে কোথায়? গেল কোথায় নিরু এই ভোরে? ঘাটে গেল?

অনু তখন চোখ খুলেছে। উঠে বসল, হ্যাঁ সকাল। ত্যার ভয় নেই।

অভিভূতভাবে বসে রইল। যেন স্বপ্ন দেখছিল কিসের।

মা বললেন, 'দরজা খুলে শুয়েছিলি? দিদি কই?'

'দিদি দরজা খুলে কোথায় গেল এই সকালে।'

ঘরে রাখাল সরকার, অনুর বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন। 'নিরু কোথায়, তাকে ডাক। সদর-দরজা কে খুলল জিজ্ঞেস করি।'

অনু শুকনো কাঠ মুখে চারদিকে চাইল কি যেন ভয়ে। বাইরে উঠান আলোয় আলোয় ভরে গেছে।

খুড়তুতো-পিসতুতো ভাইবোনরা পিসি-কাকা-খুড়িমারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাকিয়ে রইল সেদিকে। সেখানে দিদি ত নেই।

আবার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিদি কোথায় গেল বলে গেছে?'

অনুর মনে পড়ল রাত্রির কথা। দিদি নেই তাহলে? সত্যি সত্যি নেই? তাহলে স্বপ্ন নয়?

সভয়ে সে মাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা কথায় বললে, 'মা, কাল রাত্রে নিশি ডেকেছিল। দিদিকে ডেকেছিল।'

সহসা রাত্রির সেই ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দু'চোখে ভয় আর জল ভরে উঠেছে।

অবাক্ হয়ে পিতা বললেন, 'স্বপন দেখেছিস? নিশি কোথায়? নিশি ডেকেছিল বলছিস্? দিদি কোথায়?'

মা ঠেলা দিয়ে মেয়েকে সরিয়ে দিলেন।

'সকালে উঠে কি ন্যাকামী করছিস্ নিশি নিশি করে। দিদি কোথায় গেছে বলে গেছে? জেগে ছিলি?'

চোখ মুছে অনু বললে—'হ্যাঁ নিশিই, এসেছিল মা। আমি দিদিকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। দিদি তার ডাক শুনে বিছানা থেকে নেমে গেল আমার হাত ছাড়িয়ে।'

পিতা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন 'ছুঁড়ী স্বপন দেখেছিস্। সেই থেকে আবোল-তাবোল বকছে। কি দেখেছিস্ তুই? নিশিকে দেখেছিস্? দিদি কোথায় গেল?

'মা, স্বপন দেখিনি বাবা। দিদিকে সত্যিই নিশি ডেকে নিয়ে গেছে। আমি একবারটি চোখ খুলেছিলাম

দেখলাম, ঘরের দরজা খুলে দিদি বেরিয়ে গেল। আর উঠানের দরজার সামনে চাদর মুড়ি দিয়ে কি যেন দাঁড়িয়ে আছে।'

অনু আবার কেঁদে ফেলল।

মা ধমক দিলেন, 'চুপ কর্। কাঁদতে হবে না আর। কি দেখলি—শাদা চাদর গায়ে কে, মেয়ে না পুরুষ সেটা?'

অনু বললে, 'তা জানি না। ঠিক যেন ব্রহ্মদৈত্যের মত কি একটা।'

ছোটকাকা এসেছিলেন ঘরে। হেসে ফেলে বললেন —'ব্রহ্মদৈত্য কেমন দেখতে তুই জানিস বুঝি? সেটা পেত্নীও ত হতে পারে। শাঁকচুন্নীও শাদা কাপড় পরা ত হতে পারে।'

অনু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চাইল। কেন, সে ত ব্রহ্মদৈত্যের গলা শুনেছে। তাদের গলায় পৈতে থাকে। গায়ে চাদর, পায়ে খড়ম থাকে শুনেছে। লোকে দেখেছে।

এবার পিতা বললেন, 'কেষ্ট, দেখ ত নিরু খিড়কীর ঘাটে গেছে হয়ত। তাহলে জানা যাবে দরজা কে খুলেছে।'

মেজকাকা সুবল এসেছিলেন, তাঁকে বললেন, 'দেখ ত রান্নাঘরে বাসন-কোসন জিনিসপত্র ঠিক আছে ত? চোর এসেছিল কি না কে জানে।'

আর স্ত্রীকে বললেন, 'অনুদের ঘর—মার ঘর সারারাত খোলা ছিল। মার জিনিসপত্র, ঠাকুরদেবতা, লক্ষীর হাঁড়ি-কৌটো, সব ঠিক আছে ত?'

সকলেই এবারে জিনিসপত্র দেখতে যেতে সচকিত তৎপর হয়ে উঠলেন।

ছোটকাকা গেলেন নিরুর সন্ধানে ঘাটে—বাগানে।

অনুর মা শাশুড়ীর ঘর-দুয়ার দেখতে এলেন।

বললেন, 'কাপড় কেচে আসি। মার ঠাকুর-দেবতা ছোঁব কি করে এখন?'

খুড়িমারা ভাইবোনেরা সব এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে। কাল রাত্রে 'নিশি' এসেছিল শুনে।

আর 'নিশি'র গলার শব্দ শুনেছে অনু।

দেখতেও পেয়েছে কাকে, 'নিশি'কে, না ব্রহ্মদৈত্যকে অথবা কোন শঙ্খচূর্ণী প্রেতিনীকে।

হ্যাঁ অনু দুবার চোখ খুলেছিল। কিন্তু একবারই দেখেছিল একটা শাদা কি যেন।

'তার হাতে মুখ-খোলা ডাব ছিল?'

না, তা অনু জানে না। শুধু জানে দিদি সদর-দরজা খুলে চলে গেল। তারপর ও আর চোখ খোলেনি। ভাবছিল দিদি ফিরে এলে চোখ খুলবে আর জিজ্ঞাসা করবে ঐ শাদা চাদর মুড়ি দেওয়া ব্রহ্মদৈত্য না শাঁকচুন্নীর কথা। কিন্তু দিদি ত আর ফিরে আসে নি।

না। নিরুপমা আর ফিরে আসে নি।

ক্রমে বেলা হল, রোদ উঠল। জলে-শিশিরে ভেজা রৌদ্র।

রোদ পড়ল পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে জলা-জঙ্গলে মন্দিরে-দেবালয়ে শ্মশানে-বাঁওড়ে নদীর পারে।

গ্রামের সব লোকই ছিল—চাষা শিউলী (খেজুররস সংগ্রাহক) ক্ষেত-মজুর কিষাণ গোয়ালা বামুন কায়েত গৃহস্থ সবাই ছিল।—

শুধু নিরুপমাই কোথাও আর ছিল না।

* * *

সবাই জানল, হ্যাঁ, নিশিতে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় নিয়ে গেল?

জলায় জঙ্গলে ডোবায় পানা-পুকুরে নদীতে? দেহখানা কোথায় পড়ে আছে?

কিন্তু কোন চিহ্ন কোথাও নেই তার।

দুদিন পরে শুধু দেখা গেল, নদীর ধারে শ্মশানের কাছে একটা পচা পুকুরের পাশে একটা শিমুলগাছের তলায় কার একখানা কাদামাখা শাড়ী পড়ে আছে।

সেটা কি নিরুপমার? চেনা যায় না। অমন শাড়ী ত অনেকেই পরে।

আর শোনা গেল শম্ভু চক্রবর্তীর মার সে রাত্তে হাঁপানীর জন্য কে ওষুধ আনতে বেরিয়েছিল, পরদিন

সকালে বাড়ী ফিরেছিল। রাত্রে পথ চিনতে পারে নি। কিন্তু না, সে নিরুকে দেখেনি।

এবং শম্ভু চক্রবর্তী আরও বললে, সে আজই কলকাতায় যাবে মাকে নিয়ে, মেডিকেল কলেজে দেখাবার জন্য। এখানকার ডাক্তার তাই বলেছিল।

সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করে চিকিৎসা করাবে।

শম্ভু বাড়ীতে তালা-চাবি বন্ধ করে গ্রামের পরিজনকে দেখতে-শুনতে বলে বিকেলের ট্রেনে মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অন্তরীক্ষ গায়িকা

বিখ্যাত গায়িকা সুজাতা রায়ের সুন্দর বাড়ীখানার সামনে একখানা চমৎকার ঝকঝকে চেহারা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল।

কীর্তন-ভজন-লোকসঙ্গীত, আবার রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গে সঙ্গে রাগপ্রধান গানে সুজাতা রায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তবে বেশী খ্যাতিটা কীর্তন আর ভজনের গানে। মীরাবাই, তুলসীদাসও যেমন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসেও তেমনি মনোহর-মনোহারিণী গায়িকা। গাওয়ার জন্য আবার মাঝে মাঝে অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'অন্তরীক্ষ গায়িকা' হয়ে গাওয়ার জন্য আহ্বান আসে।

গাড়ীটা কোথায় গানের আসরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। রেডিও আপিস থেকে তখন ফিরেছে।

সেদিন কোন্‌খানে কীর্তন হবে কোন সঙ্গীতের আসরে।

গাড়ীটার সামনে দু'তিনটে ছোট ছোট ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ীর রঙ ফিকে বেগুনী, আরশির মত চকচকে তার গা। দাঁড়ালে মুখ দেখা যায়।

রাস্তার গ্যাসের না বিদ্যুতের আলো পড়েছে গাড়ীর গায়ে।

ড্রাইভারটা দূরে একটা পানের দোকানের ধারে ঝোলান দড়ির আগুন থেকে বিড়ি না সিগারেট ধরাচ্ছে।

আর গাড়ীটার এদিকে-ওদিকে ৫।৭জন বালক-শিশু জড় হয়ে গাড়ীটার ঝকঝকে গায়ে মুখ দেখছে—কারো মুখ গাড়ীর পেটে চ্যাপটা দেখাচ্ছে, কারো মুখ কোন্‌ দিকে সরু-লম্বা দেখতে হচ্ছে, কেউ জিভ ভেঙিয়ে দাঁত বের করে নানারকম মুখভঙ্গী করে করে মুখ দেখছে আর বন্ধুদের দেখাচ্ছে।

'ও ভাই, দেখ্, চেনাই যায় না, যেন আর কার মুখ।'

একটা ৫।৬ বছরের ছেলে গাড়ীটার গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'ভাই কি তেলা সুন্দর দেখ্।'

আর একটা ছেলেও এসে হতে দেয়।

হঠাৎ তাদের দাদা চকিত হয়ে ওঠে।

'হাত সরা, হাত সরা। ড্রাইভার দেখতে পেলে বকবে।'

আর একটা ছেলে বাড়ীর দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই রে! ওই নামছে ওরা। গাড়ীতে উঠবে এবার। সরে যা সবাই। ওই ওরা কারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে।'

নিমেষে ভিড় ছিটকে ছড়িয়ে গেল।

বারান্দায় ওপর থেকে দু'টি মেয়ে তাদের দেখছিল। আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা ইজি-চেয়ারে বসে ছিলেন।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার এসে দাঁড়াল, 'এই বাচ্চা লোগ্, ভাগো। গাড়ীমে হাত না লাগাও।' তার মস্ত দাড়ি-গোঁফ আর পাগড়ীর মাঝ দিয়ে উক্তি-ক'টি বেরিয়ে এল। তার হাতে লোহার চুড়ি (কড়া), মাথায় পাগড়ী, গায়ে সালোয়ার কামিজ। একটা বিশালকায় মানুষ।

সুজাতা রায় আর তার বন্ধু তপতী সেন খুট খুট করে নেমে এল নিচে। হিল-উঁচু জুতো পায়ে, মাথায় উঁচু খোঁপা একজনের, একজনের চুল ছাঁটা ঘাড় অবধি। মূল্যবান্‌ শাড়ীর আঁচলটা পিঠের একধারে পড়েছে। জামা বা ব্লাউজের ছাঁট সময়োচিত ফ্যাশনে।

দুটি ছোট ছোট ছেলে বাদে আর সবাই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েদুটি হাসতে হাসতে কত কথা কইতে কইতে নামছিল। তাদের পিছনে এসে পড়েছে।

আর সেই ড্রাইভার বলছে, 'এই বাচ্চা, গাড়ীমে ময়লা হাথ—গন্ধা হাঁথ না লাগাও। দূর রহো, মেমসাব লোক আগিয়া।'

ছেলেরা সচকিতে পেছনে চাইল। 'এই রে, এসে পড়েছে।'

তারপর অপ্রস্তুত মুখে দূরে সরে গেল। 'এই মানিক, চলে আয়', কারা ডাকল সুজাতাও তাদের দিকে চাইল।

মানিকও ওর দিকে চাইল। মানিকের বন্ধু তখন গলির দিকে চলে যাচ্ছে।

সুজাতা মানিকের দিকে চেয়ে হাসল। বললে, 'গাড়ীর আয়নায় মুখ দেখছ!' বন্ধু বললে, 'বেশ চকচকে না? কি নাম তোমার?' সুজাতাও হাসল। 'বেশ ছেলেটি, না?'

তপতী সেন বললে, 'আমার দিদির ছেলেটা ঠিক এই রকম দেখতে।'

এতক্ষণে মানিকের সাহস হয়েছে একটু। সে বললে, 'আমার নাম সমীর ঘোষ, ডাক নাম মানিক।'

সুজাতা, 'ওঃ, বেশ নাম ত। আবার দুটো নাম। বাঃ, দুটো নামে কি করবে? কোথায় থাক? সমীরই বেশ নাম। একটা নাম আমাকে দিয়ে দাও।'

ছেলেটা বললে, 'ঠাকুমা বলে মানিক। বাবা সমীর বলে ডাকে। আহা! নাম বুঝি দেওয়া যায়!' বলে হাসল।

মেয়েরা দু'জন হাসল। 'ও! কোথায় থাক? বেশ বুদ্ধি আছে ত! বলে নাম কি দেওয়া যায়!' বলতে বলতে তারা গাড়ীতে বসেছে। ছেলেটা পাশের একটা গলি দেখিয়ে বললে, 'ওইখানে থাকি।'

গাড়ীটা ঘ্যাঁচ্ করে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা গাড়ীতে বললে বন্ধুকে, 'ছেলেটা বেশ, না? তোর বোনপো কোথায় থাকে? একদিন নিয়ে আসিস না।'

'তারা বিদেশে থাকে, পাটনায়, মাঝে মাঝে আসে। আচ্ছা এবার এলে একদিন পারি ত আনব। এলেই যা হুজুগ পড়ে যায়, এখানে ওখানে দেখা করার—যাওয়া আসার। তোদের বাড়ীতে ত কাউকে দেখি না? তোর দিদি দাদারা কোথায় থাকেন?'

সুজাতা বললে, 'আমি একলাই। আর ভাইবোন নেই।'

তপতী,—'ও! এই চেনা-জানার পর তোর মাকে তো একদিনও দেখিনি।'

সুজাতা,—'মা এই ক'বছর হল মারা গেছেন। তোর সঙ্গে চেনার আগেই। তোর সঙ্গে আলাপ ত মোটে ৪।৫ মাস।'

'তাহলে বাড়ীতে কে আছেন? শুধু বাবা?'

'দাদা, মানে ঠাকুরদা আর আমি। আর একটা পুরোনো চাকর বাবার। মা যাওয়ার পরেই বাবা মারা গেছেন।'

গাড়ী গন্তব্যস্থলে এসে পৌছল।

কয়েকজন যুবক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

খুশী। ও হাসিমুখে এসে দাঁড়াল। 'এই যে, আপনি এসে পড়েছেন। আমাদের সভার আর দেরী নেই।'

ইনি!

'ইনি তপতী সেন। একজন সু-গায়িকা, আমার বন্ধু।'

তারা পুলকিত। 'বাঃ, খুব ভাল হয়েছে। আমাদের সভার সৌভাগ্য। আসুন। আসুন।'

ছেলেগুলো

তারপরও চকচকে গাড়ীটা ত রোজই সুজাতার দরজার সামনে দাঁড়ায় আর ছেলেগুলোও খেলার ফাঁকে ফাঁকে এসে গাড়ীর চকচকে গায়ে মুখ দেখে। গাড়ীর গায়ে হাত বুলোয় পরম আদরে, কৌতূহলে, আনন্দে ও লোভে, ড্রাইভার একটু চোখছাড়া জায়গায় দূরে থাকলেই।

আর সুজাতাও কোনদিন একলা, কোনদিন বা মেয়েরা কোনো কেউ থাকে।

এতদিনে মানিক অথবা সমীরদের একটু বেশী সাহস হয়েছে, সুজাতার স্নিগ্ধ হাসিতেও দু'একটা প্রশ্নে।

যদিও আর সব ছোটবড় ছেলেরাই পালিয়ে যায় ওদের থাকতে দেখলে।

সহসা একদিন সমীর বললে, 'গাড়ীটা তোমার খুব ভাল। চকচকে, না?' কি বলবে সুজাতাকে তা ওর জানা নেই।

সুজাতা হাসল, গাড়ীতে উঠে বললে, 'হ্যাঁ, নতুন কিনা।'

মানিক সাহসী হয়েছে। অতর্কিতেই বললে, 'আমি কক্ষণো মোটরে চাড়িনি।'

সুজাতা আবার হাসল। 'ও!' গাড়ী ছেড়ে দিল ড্রাইভার। আজ সঙ্গে কেউ নেই।

মনে হয় বেশ ছেলেটা, ভাবে, ওর কি কোন মাসী-পিসীও নেই? তাদের কোনো ছেলে-মেয়ে? কখনও ত কারুকে আসতে দেখে না বাড়ীতে। বাবা-মাও ত কখনো কোনো গল্প করেননি কারুর।

ছোট্টবেলা থেকে শুধু পড়ার স্কুলে পড়া, গানের স্কুলে গান শেখা, নাচের স্কুলে নাচ—তারপর খাওয়া, ঘুম, গল্পের বইয়ের স্তূপে ডুবে যাওয়া। নাচ, গান, পড়ার স্কুলের সঙ্গিনীদের আসা-যাওয়ার সমারোহ।

কোনো গল্প, কোনো কারুর কথা ওর জানা নেই।

মারও কি ভাইবোন ছিল না? বাবারও কেউ ভাইবোন নেই?

হ্যাঁ, ঠাকুমার গল্প শুনেছে সে বাবার কাছে। আর ঠাকুরদাকে দেখছে ছোট্ট বেলা থেকেই। তিনি তখন ওকে অনেক রূপকথা, অনেক গল্প বলতেন।

কিন্তু কেউ নেই কেন তাদের? দেশ শুনেছে জয়নগর-মজিলপুর না কোথায়। মামার বাড়ী? মার বাপ-মা ছিলেন না। ছোটতেই মারা গিয়েছিলেন। কোন এক সম্পর্কের মামা বুঝি আশ্রয় দেন, তারপর দাদা (ঠাকুরদা) বাবার জন্ম পছন্দ করে নেন। মা কাশীর মেয়ে।

বন্ধু

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামে। ওর বয়স কবে ত্রিশ পার হয়ে গেছে।

মা মারা গেছেন বছর ৫।৬ হবে। সেই অবধি বাবা বাতে, নানা ছোটখাটো অসুখে ভুগে প্রায় স্থবির হয়ে মারা গেছেন। পিতামহ একলাটি বাড়ীতে থাকেন। ওর পথ চেয়ে। বেশ বোঝা যায়। ওর আবার গানের রেওয়াজ করতে হয় বাড়ীতে। তারপর পিতামহের কাছে একটু বসে গল্প করে অন্তরীক্ষ গানের রাজ্যের। কার খাতির, বেশী কার কম, কার কত অহংকার, কে কত ভদ্র ও সজ্জন, অমায়িক। হেসে হেসে সে তাঁকে বলে।

তার গানের জগতের বন্ধুরা, তপতী মণিকা অমিতারা আসে মাঝে মাঝে। তপতীর বিয়ে হয়নি। অমিতার বিয়ে হয়েছে। কি জাত ওরা? কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে' কেন বিয়ে হয়নি? এমন ভালো গায়িকা। দেখতেও ত ভাল। এবং জাত?

জাত? সুজাতা রায় বলে ব্রাহ্মণ তারা, জয়নগরে আদি বাস ছিল, ক'পুরুষ আগে জানা নেই।

পিতামহ বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে পথ চেয়ে থাকেন যেন।

সুজাতা আসে, দু'একটা কথা বলে কাপড়-চোপড় বদলাতে চলে যায়।

গান গায়, বই পড়ে, তাঁর সঙ্গে গল্প করে, রেডিওতে খাদ্য অখাদ্য নানা অনুষ্ঠানও শোনে। কিন্তু 'তবু ভরিল না মন'। কেমন যেন ফাঁকা শূন্য ঠেকে জীবনটা।

যশ? তা একটু হয়েছে বইকি। বিত্ত? তাও কম নয়। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। উপকরণে ভরা জীবন। সচ্ছলের চেয়েও বেশী। কিন্তু? কিন্তু কোথায় কি ফাঁক আছে, কোথায় যেন কি আছে অভাব। কি যেন নেই ওর এই জগতে। যেন কি সব জিনিষ নেই, কি যেন ও পেল না, কি চায়, ওর জানা নেই যেন। সকলেরই কি এই রকম হয়? কাকে জিজ্ঞাসা করবে?

পরিজন

ফিরে এসে পিতামহের কাছে বসে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন সভা হল, কেমন জমেছিল, কত লোক ছিল, আর কে কে গান গাইল।'

সুজাতা বললে, 'মন্দ ভিড় হয়নি। গান গাইল

মণিকা দত্ত, উজ্জ্বলা সরকার, কাশীর সুন্দরলাল পাঁড়ে খুব ভাল রাগপ্রধান গান গাইল। আর সবাই কেউ লোকসঙ্গীত, কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত।—অনেক রকম।'

পিতামহ শিবতোষ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, তোমারটা—তোমার গানটা কেমন হল? কারা কি গাইলে? লোকে খুশী হল?'

সুজাতা হাসল, 'লোকের খুশি কি সভায় বোঝা যায়? তুমি বলতে, 'রামকৃষ্ণকথামৃত' বলেন 'লোক না পোক।' তা ততটা নয়, তবে একালের সবকিছুতেই বেশীটাই হুজুগ। ঠিক যে কার ভাল লাগছে বোঝাই যায় না। অবশ্য ভাল না লাগলে একটু বোঝা যায়। বড্ড কথা কয়। নয়ত হাসে মেয়েরা।'

পিতামহ বললেন, 'হ্যাঁ' ওই হুজুগ কথাটাই ঠিক। একালের সব জায়গাতেই কারুরই কোন কিছুতেই ওদের মন দেবার ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই। আমার মনে পড়ে অমৃতসরে 'সোনার মন্দিরে' অহোরাত্র গান-সেবাই হয় পালা করে। সে এমন গান যে ওঠা যায় না। একালে এদের না আছে সে আদর্শ, না আছে সে ভালবাসা। কি করে সহজে ও সস্তায় একটা নাম বা খ্যাতি হবে সবাই তার পেছনে ছুটছে। আর সেই সঙ্গে যদি কিছু টাকা করে নিতে পারে। সেকালে...?' সেকালে বলেই পিতামহ থেমে গেলেন।

সুজাতা চা খেতে খেতে কথা শুনছিল। একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'থেমে গেলে যে দাদা-ভাই? সেকালে কি বলছিলে?'

শিবতোষবাবু একটু চুপ করে বললেন, 'মনে হয় বটে সেকালে, কিন্তু কাল ত যুগে যুগে ভাল-মন্দ দুইয়ের স্রোত নিয়েই আসে। আমাদের কালে হয়ত অনেক কিছু আমরা পাইনি। ছিল না। এরা একালে তা পেয়েছে। আবার সেকালের অনেক ভাল জিনিষ ভেসে গেছে। যেমন যে-কোন গুরুজনকে সমীহ-সম্মান করার ভদ্রতা। তার জায়গায় এসেছে একালের মানুষের ব্যক্তিত্বের বাহাদুরি প্রকাশ। ভাসা ভাসা নানামুখী সংস্কৃতির ডাক।—কিন্তু—'

হেসে পৌত্রী বলে, 'আবার কিন্তু কিসের? থামলে যে!'

'এ কিন্তুটা হল,—যা আমারই হয়ত একলার কথা—যে একালে সাধারণ মনের কোন গভীরতা, কোন-কিছুতে আদর্শনিষ্ঠা আমি দেখতে পাই না। যা আমাদের দেশে উনিশ শতকে ছিল। এ শতকের প্রথম দিকেও ছিল। দেশ স্বাধীন হবার আগেও ছিল। এই ক বছরে আমরা এমন কিছু সঞ্চয় বা সংগ্রহ করতে পারিনি বা ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে বাঙালীর ছিল। যা নিয়ে আমাদের গর্ব্ব গৌরব। যাঁদের নিয়ে আমরা আজও ভাঙিয়ে খাচ্ছি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র। এই ছেলেরা কি পাচ্ছে, পাবে সে জিনিষ? সে যুগের মানুষদের আমিও সবাইকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র ছাড়া। কিন্তু—' পিতামহ চুপ করলেন।

সুজাতা কারুকেই দেখেনি। সুভাষচন্দ্রেরও নামটুকুই শোনা আছে। তারপর? তাঁদের পর? সে ভাবে, আর পিতামহর মুখের দিকে তাকায়।

সহসা পিতামহ বলেন, 'তোর গাড়ীর কাছে ঐ ছেলে দুটো কে রে? তোদের সঙ্গে কথা কচ্ছিল দেখলাম।'

সুজাতা বললে, 'পিছনে বস্তির কাদের ছেলে। চিনি না। তাদের নাম জানি না। কিন্তু বেশ ছেলেটা। খুব নির্ভয়। সেদিন বলছে, আমি কখন মোটরে উঠিনি। একদিন উঠতে দেবে? তা বীর সিং এমন ধমক দিল, বললে, গন্ধা কাপড়া, ভাগো। কাপড়টা নোংরা নয় কিন্তু। সাবান-কাচা ময়লা ময়লা। আমি বললাম, একদিন ফরসা কাপড় পরে এসো, গাড়ীতে উঠতে দেব, কেমন? ভারি খুশী। দৌড়ে গলিতে চলে গেল। বললে, 'মাকে আমি বলে আসি।'

দাদামশায় চুপ করে রইলেন। যেন কি ভাবতে লাগলেন।

সমীর

রাত্রে রান্নাঘরে রুটির টুকরো ছিঁড়তে ছিঁড়তে সমীরের দাদা মাকে বলে হাসতে হাসতে, 'জানো মা,

সমীর আজ কি রকম বোকার মত কাজ করেছে। ঐ সামনের গেটওয়ালা বাড়ীর গান গাওয়া দিদিমণিদের গাড়ীতে উঠতে চেয়েছে। আর ড্রাইভার ধমক দিয়েছে, ভাগো ময়লা কাপড়া হায় বলে। ওকে বারণ করে দিও। ওদের গাড়ীতে হাত দেয়। চকচকে গায়ে মুখ দেখে ঐ পিন্টু ঝুনু মণিদের সঙ্গে। একদিন দেবে খাবড়া পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা। মস্ত লোকটা, ঘুরে পড়ে যাবে সবাই।'

শরৎবাবু, মানিকের বাবাও খাচ্ছিলেন ওদের সঙ্গে। ভ্রূ কুঁচকে ছেলের দিকে চাইলেন, 'ছিঃ, তুমি বড়লোকের গাড়ীতে উঠতে চাও। না! আর যেয়ো না, চাইতে নেই ওরকম, অপমান করবে।

মানিক বললে, 'ও ত দিদিমণি, ও বড়লোক কেন হবে? কই, মস্তবড় ত নয়। আর ও ত আমাকে বলেছে ফরসা কাপড় পরে এলে গাড়ীতে উঠতে দেবে। আর একদিন মার কাছে বেড়াতে নিয়ে আসতেও বলেছে।'

উনুনের কাছে রুটি সেঁকতে ব্যস্ত মা, সত্য সত্য অবাক্ হয়ে চাইলেন 'আমার কাছে সে আসবে? এ বাড়ীতে? তুই পাগল। না না, ওসব বড়লোকদের সঙ্গে কথা কইতে যাসনি।'

মানিক আবার প্রতিবাদ করল, 'মা, ও ত দিদিমণি একজন। বড়লোক মোটেই নয়, বাবুর মত কাপড় পরে না, শাড়ীপরা তোমার মত মানুষ। শাড়ীটা খুব ভাল কিন্তু। তোমার মতন ময়লা লালপাড় কাপড় নয়।'

পাশের ঘর থেকে ঠাকুমা হাসলেন। পিতামাতাও হাসলেন।

পিতা শুধু বললেন, 'না না, তুমি পরের গাড়ীতে চড়তে চেয়ো না। আমরা গরীব, ওসব আমাদের ছেলেদের করতে নেই।'

অদৃশ্য

তিন চার দিন আর ছেলেগুলোকে সুজাতা দেখতে পায় না। কর্মব্যস্ত সুজাতার লক্ষ্য হয় না।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য হয়, তাই ত, ঐ দলবাঁধা ছেলেগুলো আর ঐ ছোট সমীর ছেলেটা আর আসে না যে? গাড়ীতে হাত বুলোয় না, চড়তে চায় না, কোথায়ও তো দেখছি না? ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, 'ছেলেগুলো এসেছিল? আর আসে না?'

ড্রাইভারের কিছু মাথাব্যথা নেই ওই বস্তি রাস্তার ছেলেদের জন্য। সে বড়লোকের বাড়ীর ড্রাইভার মোটা মাইনে পায়। সে বললে, 'না দিদিজী, ওরা আর আসে না। বিলকুল নোংরা কাপড় হাতপা, আমার গাড়ীতে হাত দিতে মানা করেছি।'

দিদিমণি খুব ব্যস্ত। তবু বললে, 'না, বকো না, মানা করো না, ছেলেগুলো খারাপ নয়। আমি যে একদিন ওই সমীরটাকে গাড়ীতে চড়াব বলেছি।

গানের আসরের সময় হয়ে গেছে। গাড়ী চলতে শুরু করল।

আহ্বান

অন্য ছেলেরা সেদিন আর গাড়ীর কাছে কেউ নেই। ড্রাইভারও পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে।

সমীর একটা ফরসা জামা আর প্যান্ট পরে গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে একলা।

সুজাতা নেমেছে, ওকে দেখে হাসল। বলল, এতদিন আসনি যে? ওঃ! আজ ফরসা জামা কাপড় পরেছ!'

সমীর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'আজ কি গাড়ীটায় একটু বসব?'

সুজাতা একটু হেসে তার হাত ধরে বসিয়ে দিল গাড়ীতে।

ড্রাইভারকে ডাকল। বললে, 'একটুখানি বড়রাস্তায় ঘুরিয়ে আনো আমাদের বীর সিং।'

পরিচয়

সমীরদের মা রান্না ভাত চড়িয়ে রুটি বেলে নিচ্ছিলেন।

'মা' বলে সহসা দরজার কাছে ছেলেরা এসে দাঁড়ায়। তিনি মুখ তুললেন না, বললেন, 'কি?'

'দেখ, কে এসেছেন আমাদের বাড়ী।'

'কে?' মা মুখ তুললেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

একটি খুব সুশ্রী সুবেশিনী অচেনা মেয়ে। দেখেছেন কি? হয়ত দেখেছেন। না দেখেননি তো। মেয়েটার মুখে মিষ্ট অপ্রস্তুত হাসি।

আর পাশে দাঁড়িয়ে তার দাদা মিহির আর পাশের বাড়ীর ছেলে অমল। তাদেরও হাসিভরা মুখ।

মা কোন মাননীয়া অভ্যাগতা মনে করে একটু বিব্রত হয়ে হাত থেকে বেলুন নামিয়ে রাখলেন, আর বললেন, 'আসুন, আসুন! ও-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, আমি হাত ধুয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটা কিন্তু বললে, 'আপনার কাজ ক্ষতি হবে। আমি অন্য সময় আসব, ওরা নিয়ে এল।'

মা উঠলেন। বললেন, 'না না, সে কি, একটু বসুন। কিন্তু আমি ত চিনতে পারছি না...।'

মনে ভাবছেন, কি দরকার, কেন এসেছে, মেয়েরা চেনে ওকে? আর উনি চেনেন না কি তাহলে?'

মেয়েটিও বিব্রত হয়েছে। শোবার ঘরের তক্তপোশের একধারে বসে বললে, 'আমি এই গলির পাশের রাস্তার বাড়ীর মেয়ে, আমার নাম সুজাতা রায়।'

সমীর বললে, 'মা, ওই যে রেডিওতে গান গায় সুজাতা রায় সেই। আজ আমরা ওঁর গাড়ী চড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছি এখুনি।'

মা অবাক্ বিব্রত। এবার ঘরের চারদিক্ তাকালেন। ময়লা জামা-কাপড়, অগোছাল জিনিসপত্র। মনে মনে খুব লজ্জিতও হচ্ছেন।

তবু হেসে বললেন, 'একটু মিষ্টি নিয়ে আয় দৌড়ে। আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন কি ভাগ্যি।' আঁচল থেকে চার আনা পয়সা বার করলেন।

সুজাতা লজ্জিত মুখে বললে, 'আমি এই মাত্র চা খেয়ে বেরিয়েছি, ওরাও জানে। খাবার আনাবেন না! আর একদিন আসব, খেয়ে যাব।'

মিহির ও সমীর বললে, 'মা, আমরাও ও বাড়ীতে এখনি কেক আর চা খেয়েছি, বড়দিনের কেক।'

রান্নাঘরে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। হয়ে গেল কি? জল আছে তো? ওদের জননী বিচলিত ভাবে একবার সুজাতার কাছে বসার কথা ভাবেন আবার রান্নাঘরের দিকে তাকান।

ছেলেরা কে একজন বললে, 'মা, ফ্যান পড়ে যাচ্ছে দেখ!'

সুজাতা বুঝল, উঠে পড়ল, 'আজকে যাই, আমার দাদাভাই সন্ধ্যের পরই খেয়ে নেন তো? একটু কাছে বসতে হয়।'

নিঃসঙ্গ?

নিঃসঙ্গ অথবা বৃদ্ধ ও বন্ধুহীন। মানুষের কাছে একটুখানি মানুষের কথা হাসি খুব দুর্লভ বস্তু।

আজ সুজাতা ছেলে ক'টাকে নিয়ে ওপরে এসে গল্প গুজব করে গেছে। সেই জিনিষটাই বৃদ্ধ পিতামহের মনে ঘোরাফেরা করছিল।

তিনি একা, কিন্তু সুজাতা যে কত একা ও নিঃসঙ্গ তাও তাঁর চোখ এড়ায় না। আজ বিশেষ করে কয়েকটা অজানা ঘরের বালকশিশুদের নিয়ে আনন্দ করে চা' বিস্কুট কেক নিয়ে খাওয়ানোতে সেটা তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ল।

তার বন্ধুরা: স্কুল কলেজের বন্ধু-বান্ধবী, অন্তরীক্ষ গানের মজলিসের সঙ্গিনী সতীর্থ আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু...

সে একেবারে একা বাড়ীতে। তার মা বা পিতামহী অনেকদিন আগেই বিগত হয়েছেন। তার কিশোর বয়সেই। যখন সে বার বার প্রশ্ন করত তার কোনো আর ভাইবোন কাকা পিসি কেউ নেই কেন...। দাদাভাইয়েরও কেউ নেই? ঠাকুমার ভাইবোন ছিল না? আর মারও ভাইবোন নেই? বৃদ্ধ চুপ করে ভাবেন।

কি ভাবেন? কি ভাববেন? মনের কোন্‌খানে কত কি জমা হয়ে আছে। কি যেন ভুল? অথবা ঠিক? অপরাধবোধ? অথবা অপরাধও নয়? কিন্তু কি একটা কাঁটা আছে ফুটে কোথাও। যে কাঁটাটা তাঁর ছিল, স্ত্রী নিরুর ছিল। তাঁর পুত্রবধূ পুত্রেরও মনে বিঁধে ছিল আমরণ ভাবনা। আজ তারা কেউ নেই। তিনি একলা আছেন কিন্তু কাঁটাটা আছে। সুজাতা জানে না সে

কাঁটার কথা। কিন্তু কাঁটার অস্তিত্বটা সে বুঝতে পারে যেন এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, আর নিজের নিঃসঙ্গ অদ্ভুত জীবন নিয়ে।

বৃদ্ধ ভাবেন, তাহলে? তাহলে কি এবারে ওকে সব গল্পটা বলবেন? তিন পুরুষের,—সুজাতা শুদ্ধ তিন পুরুষ তাঁরা। সে মেয়ে হলেও তিন ধারার তো একধারা সেই।

পুরাতনী

সুজাতা উঠে এল একটু যেন হাসিমুখে। আজ আর অন্তরীক্ষ গানের প্রোগ্রাম নেই। বাড়ীতেই গুন গুন করে কি একটা গান গায়, 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' না 'হিয়ার মাঝে'?

একটা গান গায়, কিন্তু সেই গানের অন্তরাতে এসে আর একটা গানের অন্তরা জুটে যায়। বেশ মজার মত সে আবার সেই গানটাই ধরে। আগের গান পথছাড়া হয়ে যায়। এবারে যেন গায় 'ধরব তারে, ভরব তারে... করব রমণীয়' মাঝখান থেকেই এসে গেছে গানটা। তারপর হঠাৎ ধরে 'সে রূপে বেড়িল কালরূপ জল কাল মনোরমা।—

দোষ কারো নয় গো মা।' (দাশু রায়।)

এবারে হঠাৎ হেসে ফেলে দাদার ঘরে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, 'কাল মনোরমা...বেশ সুন্দর কথাটা।'

পিতামহও হাসলেন তাকে দেখে। বললেন, 'ঐ গানটাই পুরো গা না। 'দোষ কারো না গো মা।'

সুজাতা বললে, 'সুরটাই মনে আছে। গানের সব কথাগুলো ত মনে নেই দাদাভাই।'

দাদাভাই বললেন, 'আমার মনে আছে। কিন্তু সুর তো নেই।' দুজনেই হাসলেন।

রাত্রের খাবার এল। মাটিতে আসন পেতে বসা হল।

সুজাতা বললে, 'জান দাদাভাই, আজকে ঐ ছেলেদের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ওর মার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু হল। বেশ লাগল। একজন বুড়ী ঠাকুমা আছেন। ঠিক আমার ঠাকুমার মত যেন...'

হাসে ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে, তিনিও হাসেন। বলেন, 'তোর তাঁকে মনে আছে?'

'তা থাকবে না? তখন আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি। তাঁর কাছেই আমার গান শেখা ঐ 'দোষ কারো নয় গো মা।' 'এমন মানবজীবন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।' খুব ভাল গলা ছিল কিন্তু, না? কম বয়সে? তখনো কি সুন্দর গাইতেন।'

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, গান ভাল গাইত। তা তোমা মার কথা মনে নেই? বৌমাও ভাল গান গাইতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত চমৎকার গাইতেন। ''আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে', 'তুমি একজন হৃদয়েরি ধন"। আমার সামনে গাইতেন না। তবে শুনতে পেতাম গুনগুন কদাচ' কখনো।'

'হ্যাঁ, মার গানও আমি শুনেছি। খুব মনে নেই কিন্তু খুব লুকিয়ে গাইতেন। না?'

পিতামহ বললেন, 'হ্যাঁ, সেকালের মেয়ে তো। লজ্জা করতেন। অবিশ্যি কথা কইতেন আমার সঙ্গে।'

খাওয়া শেষ হয়ে এল।

দাদা বললেন, 'তা কেমন দেখলি ওদের বাড়ী?'

সুজাতা—'বেশ। সমীরের বাবা তখনো অফিস থেকে আসেন নি। মা রান্না চড়িয়েছিলেন, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়াতেএকটু বিব্রতহলেন। মিষ্টি খাওয়ারকথা বললেন। আমি আর বসলাম না, দেখলাম অনেক কাজ, রুটি বেলে রাখছেন, তরকারি কোটা পাশে রয়েছে, ওরা ক'জন ভাইবোন, বুড়ো ঠাকুমা—বাবা, সকলের খাবার যোগাড় তো একা হাতেই করতে হয়? বেশ চেহারাটা। আমি আগে কিন্তু কখনো এরকম ধরণের বাড়ীতে যাই নি। যেন গ্রামের গল্পের বাড়ীর মত মনে হল। আমাদের গ্রামে আমাদের কে আছেন দাদাভাই?'

দাদা,—'আছেন জ্ঞাতিগোত্ররা অনেকে। আমি আজ পঞ্চাশ বছর গ্রামছাড়া, তোমার ঠাকুমার সঙ্গে বিয়েরও আগেই।'

হঠাৎ চুপ করলেন।

'কেন? বিয়ে করে আর যাওনি দেশে?'

'না, দেশে আর যাওয়া হয়নি। মা কলকাতাতেই অসুখে ভুগে মারা গেলেন…।'

খাওয়া হয়ে গেল।

'আর আজো তোর বিয়েও তো দিতে পারা গেল না। তোর ঠাকুমার খুব ইচ্ছে ছিল সকাল সকাল বিয়ে দেবার। ভাবতে ভাবতে মারা গেল।'

সুজাতা জানে। এবং এও জানে, সেই বিয়ের সম্বন্ধ এসে ভেঙে গিয়েছিল, কি যেন রহস্যময় ভাবে হঠাৎ।

অবশ্য ওকে সেকথা ওরা কেউ বলেননি। তখন মাও বেঁচে—বাবাও।

একদিন পাশের ঘরে ও পড়া সেরে শুয়েছিল। ঘুমোয়নি। সেদিন কানে এসেছিল পাশের ঘরে অনেক রাত্রে বাবা আর মার কথা। মা বলছেন বাবাকে, 'না, সব কথা ওদের বলেই বিয়ের সম্বন্ধ করো, নইলে পরে মেয়ের ক্ষতি হবে, রাগারাগি হতে পারে, যদি সব কথা শোনে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ… বিধবা…বিয়ে-না-হওয়া কিন্তু বিয়ের মত জীবন… তোমাদের বাড়ীর কথা।' অসংলগ্নভাবে সেই সব কথা। কি সে কথা? সুজাতা আজও জানে না, এবং সেই খুব ভাল ঘরের বিয়ের সম্বন্ধটা তার যখন ভেঙ্গে গেল তখন সে ১৫।১৬ বছরের মেয়ে। ছেলে খুব বিদ্বান্। দেখতে ভাল, বড় ঘর।

তারপর আবার একবার, তখন সে অন্তরীক্ষ গায়িকা হয়েছে কোথাও কোথাও সিনেমা থিয়েটারে। একটু নামও হয়েছে।

লোকেন বলে একটা ছেলে, সেও খুব ভাল গান গাইত। সেই সূত্রে আলাপ। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হয়েছিল। ভালবাসা? কে জানে সে কথা। খুব যাওয়া-আসা ছিল তার এবাড়ীতে। বিয়ের প্রস্তাবও সেই করেছিল।

হঠাৎ আর সে এল না। এমনকি কোন্ দেশে যে, না বলেতেই চলে গেল সে খবরও সে জানে না।

এও যেন সেই রহস্যময় ধরণ। প্রথমবারের ভেঙ্গে যাওয়া বিয়ের ঘটনাকে এবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর সেই একদিনের বাবা-মার কথা জড়িয়ে জুড়ে তার মনে হয়, কি যেন একটা অসামাজিক রহস্য জড়ানো এঁদের বাড়ীর জীবন ধরণে।

কিন্তু কেন যে তা বোঝা যায় না। অসবর্ণ বিয়ে, বিধবা বিয়ে তো সমাজে চলছে অনেকদিন। তখন কি চলেনি? কে ব্রাহ্মণ, কে কায়স্থ, এবং বিধবাই বা কে? ঠাকুমা? না মা? এদের বিধবাবিবাহ কার হয়নি। তাও সে জানে না।

সে মুখ ধুয়ে দাদাকে শুতে যেতে দেখে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

সব জানালা, খোলা আকাশ ভরা তারা দেখা যাচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে। বাগানের গাছের পাতা একটু হাওয়ায় নড়ছে দেখতে পাচ্ছে।

সঙ্গ ও সঙ্গী

কিন্তু ক্রমে সমীরদের বাড়ীর সঙ্গে যেন বেশ একটু ভাব আলাপ জমে গেল।

ছবির বই, লজেন্স, চকলেট সমীরদের এটা-সেটা কিনে দেয়। বেশী দিতে ভরসা হয় না। তবু তার জন্মতিথি শুনে প্যান্ট-শার্ট কিনে দিয়েছে। মিষ্টি খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন সমীরের মা।

সমীররা ওকে মাসী বলবে, না দিদি বলবে এখনো ঠিক করতে পারেনি।

সুজাতা হেসে বলে, 'ও দুটো ডাকই বেশ মিষ্টি। আমার মাসী হতে খুব ভাল লাগবে। আর দিদি? তাও মন্দ কি। কিন্তু অনেক বড় দিদি যে। ২৫ বছরের বড় দিদি হয় কি?' পায়েস খেতে খেতে বলে।

সমীরের ঠাকুমা মা সবাই হাসেন।

ঠাকুমা বলেন, 'সে যা হয় বলে ডাকুক না, তুমি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছ মা।'

একটা সহজ পারিবারিক মিষ্ট জীবন। খুব সাধারণ গৃহজীবন।

ওর মন ভুলিয়ে দেয়। কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায়। নাই বা হল বিয়ে কিন্তু বাড়ীতে দুজন বন্ধু

আত্মীয় থাকতে কি বাধা ছিল? কেউ নেই কারুর বাবা বা ঠাকুরদার।

কেউ কোথাও নেই এমন সংসারজীবন হিন্দু সেকেলে ঘরে কোথাও ত নেই। সেখানেও দেখেছে বন্ধুদের বাড়ী ঠাকুমা-দিদিমা-পিসী-মাসী নানা সম্পর্কের ভাই-বোন-ভাগিনা-ভাগিনেয়ী।

বাড়ী ফেরে। ঘুম আসে চোখ জড়িয়ে, শুয়ে শুয়ে ভাবে।

সহসা কি যেন একটা কখন ঘুমের ঘোরে ওর মনে পড়ে যায়। সেটা? সেটা কি হয় না? সেকালে ত অনেকে তা করত, একালেও করে।

ঘনিষ্ঠতার সাধ

বছর শেষ হয়ে যায় সমীরদের সেই গাড়ীচড়া আর চেনা-পরিচয়ের পর।

পিতামহ আরও বৃদ্ধ হয়েছেন এবং চিন্তাকুলও হয়েছেন, সেও নিঃসঙ্গ। আবার বন্ধু সঙ্গী গানের কর্মক্ষেত্রের। কয়েকজনের সঙ্গে ভাসা ভাসা চেনা-আলাপ হয়। কিন্তু কোন ঘনিষ্ঠতা হয় না, কেন যে কে জানে।

সেদিন সন্ধ্যার পর সমীরদের বাড়ীতে গেছে।

এখন রান্নাঘরের একদিকে একটি পিঁড়ি বা আসনে বসে সুজাতা গল্প করে। সমীরের মা কাজ করেন। আর সঙ্কোচ করেন না। কোনদিন কদাচ সুজাতা এক-খানা রুটি চেয়ে নিয়ে খায় ছেলেদের খাবার সময়।

সমীরের মার কাজ সারা হয়ে গেছে, এবারে বিছানা পাতবেন চৌকিতে, আর মাটিতেও একটা বিছানা।

ছেলেরা চারজন আর সমীরের বাবা চৌকির ওপরে শোবেন।

ছেলেরা সুমুখের দালানে পড়া-শোনা করছে। দু'বছরের ছেলেটি আগেই মার কাছে ঘুমিয়েছে।

সহসা সুজাতা বললে, 'ভাই, আপনার সমীরকে আমাকে দিয়ে দিন না?'

সমীরের মা সুরবালা দেবী হাসলেন। বললেন, 'নিয়ে নিন না। ও ত আপনারই হয়ে গেছে।'

সুজাতা একটু অপ্রস্তুতভাবে বললে, 'সে-রকম নেওয়া নয়। আমি বলছিলাম, একেবারে আমাকে দিয়ে দিন। আমি ওকে পড়াব। মানুষ করব। আমাদের কাছেই থাকবে, অবিশ্যি আপনার কাছেও আসবে যাবে।'

সমীরের মা একটু অবাক্ হয়ে গেলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। একটু ভেবে তিনিও অপ্রতিভভাবে বললেন, 'সে কি রকম করে হতে পারে। কেন, এ কি আপনার আপনার লোকের মত মনে হয় না? এও ত ভালবাসা আদরযত্ন সবই করছেন।'

সুজাতা আর কি বলবে ঠিক করতে পারছিল না। একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁ, তবু যেন মনে হয় যদি একে-বারে নিজের করে নিজেদের বাড়ীতে ওকে পেতাম।'

সমীরের মা চুপ করে রইলেন। সে কেমন হবে। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া না দত্তক নেওয়া। কি জাত ওরা? ওঁদের স্বজাতি কি? আর স্বজাতি বলেই বা উনি ছেলে দিতে যাবেন কেন...? কি রকম একটা ভয় ও বিতৃষ্ণা হয়। এ আবার কি কথা মেয়েটার।

সুজাতার ওপর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। ছেলে কেন দেবেন ওঁরা।

মেয়েটা কি বোকা না দুষ্টু?

আর কথা বলতে পারলেন না। মনে হচ্ছে ও চলে যাক। শাশুড়ী আর স্বামীকে বলবেন এ-কথা।

সুজাতাও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, বললে, 'এবারে ওদের আপনি শোওয়ান, আমি বাড়ী যাই।'

সুরবালা বললেন, 'হ্যাঁ রাত হয়েছে।' বলতে পারলেন না প্রতিদিনের মত হেসে, 'আবার সময়মত আসবেন।'

সেই ইতিহাসটা

সুজাতা বিমনা ও অপ্রতিভভাবে বাড়ী ফিরল।

তারপর বিক্ষিপ্ত মন ও নিজের কাজ নিয়ে দিনগুলো কেমন করে যেন তাকে চারদিক্ দিয়ে জড়িয়ে নিল জানতে পারল না। যেন জানতে চাইলও না। সমীরদের বাড়ীর খবর—সমীরদের কথাও ভাবতে পারছিল না। অথচ যেন ভাবছিল।

ওর কাজের চাপ ও মনের চাপের মধ্যে সহসা শিবতোষবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর কেমন যেন বিমনাও। যখন তখন নাতনীর ডাক পড়ে গল্প করতে, গান গাইতে। আর দুজনেরই মনে হয় যেন কি একটা কথা আছে, সেই আসল কথাটা শোনাও হচ্ছে না, আর বলাও হচ্ছে না।

ক্রমে ঠাকুরদা যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দেখতে পান, সমীররা আর আসে না এবং গাড়ীতে করে ওর সঙ্গে বেড়াতেও যায় না। সুজাতাও যেন বিমনা, যদি প্রকাশ করে না সেটা। আর ঠাকুরদা গান গাইতে বলেন, না একালের গান নয়, সেকেলে গান 'তারা কোন্ অপরাধে এ-দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্' এইসব ধরণের গান।

তারপর হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করেন 'হ্যাঁরে, তোর সেই ছেলের দল যে আর আসে না? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?'

'না। অসুখ করে নি নিশ্চয়। তবে ক'দিন ধরে আর আসে না। আমিও ব্যস্ত রয়েছি গানের কাজ নিয়ে। নতুন গান। আবার লক্ষ্ণৌতে একটি গানের সম্মিলনীতে যেতে হবে তপতীকে আর আমাকে।'

দাদাভাই: 'লক্ষ্ণৌ যাবি? কবে? ক'দিন হবে? আমার ত শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তুই চলে যাবি? আমি একা পড়ে যাব।'

'তাহলে কাটিয়ে দেব, যাব না। তুমি ভাল না থাকলে যাব না। তুমি এত কি ভাবনায় থাক আজকাল বল ত? সব সময়ে কি ভাব?'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'ভাবি অনেক কিছু কথা। তোকে একদিন সে-কথা বলব।'

সুজাতা কৌতূহলী চোখে চেয়ে বললে, 'কি এমন কথা যে এত ভেবে-চিন্তে বলবে। এতদিন ধরে ভাবছ, আর বলনিই বা কেন? খুব মজার কথা বুঝি?'

'না, খুব ভাববার কথা। এখনি বলব না।'

দাদাভাই হাসলেন—বললেন, 'আচ্ছা, তুই তোর কাজ সেরে আর কোথায় যাবি, ফিরে আয়।'

পুনশ্চ

সুজাতা নেমে গেল।

তারপর কি ভেবে গাড়ীতে উঠল না। সমীরদের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় মাসখানেক আগে সেই কথা বার্তার পর আর সঙ্কোচ করে যায়নি।

দেখল, বাড়ীতে বুড়ী ঠাকুমা একলা রয়েছেন। আর সকলে কোথায় গেছে যেন।

বেশ মিষ্ট কথা বুড়ীর। বললেন, 'এস মা, বস। ওরা ত কোথায় যেন গেছে। তুমিও কতদিন আসনি। সমীরটা বলছিল, মাসী আসেনি। কি বা খেতে দিই। কি বা কথা কই। বুড়ো মানুষের কথাই কি বা আছে।'

সুজাতা একটু হেসে বলে।

সহসা বুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বিয়ে দেননি কেন ঠাকুরদা। মা-বাবা না হয় নেই বুড়ো তো আছেন। অতবড় বাড়ী ঘর। এমন গাড়ী বাড়ী। তা তোমরা তো ব্রাহ্মণ—চক্রবর্তী না?

সুজাতা হাসল আবার। 'কি জানি কেন বিয়ে দেন নি। মা-বাবা তো অনেকদিন মারা গেছেন। তা তখন আমি বি. এ. পড়ি।'

ভাবে, বুড়ী কি শুনেছেন সমীরকে চাওয়ার কথা? হঠাৎ ওর বিয়ের প্রশ্ন কেন?

বুড়ী আবার বললেন, 'তোমাদের দেশ কোথায় মা?'

'শুনেছি, হুগলী জেলায় পাটুলী গাঁয়ে। আমি কখনো যাইনি, গল্প শুনেছি।'

সুজাতার মনে হতে লাগল এ যেন হঠাৎ কেমন কৌতূহল...। আর দু-চারটে কথার পর সে উঠল।

উন্মোচন

লক্ষ্ণৌ গানের সভার অধিবেশনে তার যাওয়ায় বাধা পড়ল কি? দাদামশাই-এর অসুখ নয় কিন্তু যেন কি একটা অবসাদে ভরে রয়েছেন।

সেদিন সন্ধ্যারাত্রি। খাওয়ার সময় হয়নি।

সুজাতা কাছে বসে কি একটা সেকেলে গানের সুর

গুনগুন করছে। যেসব গান শিবতোষবাবু ভালবাসেন। কিন্তু মনে আসছে কেবলই একেলে সেই গানটা—

"দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়..."

সহসা হাসি হাসে, দুঃখটা কি? আর 'তোমারে' সেই তিনিই বা কে? আর 'বঞ্চনা'টাই কি? কে করেছেই বা সেটা?

তবু মন মুষড়ে একটা অজানা অভাব দুঃখ আর সেই অজানা অচেনা যিনি সংশয়াতীত তাঁকে কোন এক ঈশ্বরকে ভাবতে ইচ্ছে করে। কেবলই মনে হয়, 'তোমারে যেন না করি সংশয়।'

বাইরে বারান্দায় আলো জ্বালা নেই। ঘরে মিট-মিটে একটা বাল্‌ব জ্বালা রয়েছে।

দাদামশাই ভণিতা না করেই বললেন, 'আজকে সেই গল্পটা শোন দিদিমণি, বলেই ফেলি। না বললে স্বস্তি-শান্তি পাব না।"

সুজাতা অবাক্ হয়ে এসে কাছে একটা চেয়ারে বসল। কি কথা? কার কথা?

আমার তখন বয়স বাইশ-তেইশ হবে।

১৯০২ সাল। আমি তখন ডাক্তারি পড়ি। ছুটিতে গাঁয়ে আসি। বাড়ীর লোকরা গ্রামেই থাকেন। আমাদের দেশটার নাম পাটুলী। নবদ্বীপ হুগলীর কাছাকাছি।

পৌষ মাস। গঙ্গাসাগর মেলা এসে পড়েছে। গাঁয়ের কিছু মানুষ সাগরে তীর্থ করতে যাবেন বলে তৈরী হচ্ছেন।

আমাদের বাড়ীর কেউ যাবার মত নেই। গাঁয়ের কিছু পুরুষও যাচ্ছেন মনের মতো 'সেথো'ও জুটে গেছে। বাড়ীতে আমার মার অসুখ, আমি আছি দূরে-কাছে, সকলে নিশ্চিন্ত। জ্ঞাতিগোত্ররা আছেন কাছের বাড়ীতে।

এদিকে গাঁয়ের অন্য বাড়ীতে উজাড় করে বুড়ো-বুড়ীরা যাচ্ছেন।

তোমার ঠাকুমা নিরুপমাদের বাড়ীরও অনেকে যাবেন।

নিরুপমার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরই বিধবা হল। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে যাওয়া-আসা ভাব ছিল, আমার বোনের সই।

সেদিন সংক্রান্তির রাত। খুব জলঝড় হয়েছে। আমি বিকেলবেলা ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। একবার দেখলাম নিরুরা দু'বোন ঠাকুমার ঘরে বিছানা পাতছে, মনে একটু ভয় ভয় ভাব।

তখন অনেক রাত· প্রায় ১২টা। আমি পড়ছিলাম। মা ভাল নেই। তার পরের দিন কলকাতায় নিয়ে যাবার ঠিক আছে।

হঠাৎ রাত্রে কি যেন দুষ্টুবুদ্ধিতে মনে হল, আজ নিরুদের বাড়ী নিশি ডাকি। দেখি কি করে। ওকে নিয়ে আসি। ডাকলাম নিরুর নাম ধরেই।

নিরুও ডাক শুনল, আমার গলায় ডাক।

ও ভাবলে আমার মার অসুখ বলে ডাকতে এসেছি ওদের বাড়ীতে। এমন আমাদের গাঁয়ের ঘরে ডাকা-ডাকি হত।

ও উঠে এল। আমার গায়ে একটা কালো চাদর, মুখটা ঢাকা। ও একটু ভয়ে ভয়ে বললে, 'শম্ভুদা, আমায় ডাকছ?'

আমাদের বাড়ী একেবারে খালি, শুধু আমার মা আর আমি। নিরুকে নিয়ে এলাম। মা আচ্ছন্নভাবে শুয়ে। আমি তাকে ভালবাসতাম, আর সেও বোধহয় চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে কিছু ভালবাসত। নিষিদ্ধ ভাল-বাসার মত।

বাড়ীতে এসে বললে, 'মাসীমার অসুখ; তাই ওরকম করে ডাকলে আমাকে? অনুটা তো ভয় পাবে একলা, আর মা-বাবা রাগ করবেন। বলে এলে হত। বলে আসবে?' আমি তখন বেপরোয়া। বললাম 'সে

ব্যবস্থা যা হয় করব। কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাকে নিয়ে, তুমি চল। সেখানে গিয়ে মা আর সরযূর সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করব। সেই যে সেদিন তোমাকে বলেছিলাম বিয়ে করার কথা।'

ও একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

তারপর কাঁদ-কাঁদভাবে বললে, 'কারুকে না জানিয়ে আমার আবার বিয়ে হবে! বিধবা বিয়ে? পালিয়ে গিয়ে? গাঁয়ের সবাই কি বলবে? আর মা-বাবাকে না জানিয়ে? না শম্ভুদা, আমি ফিরে যাই, বাড়ীর দরজা এখনও খোলাই আছে বোধহয়।'

আমি ওর হাতটা ধরে বললাম, 'সে সব আমি ঠিক করে নেব নিরু। মা সেরে উঠলেই। এরকম বিধবা বিয়ে তো হয়। মাকে তখন বলব, ভেব না।'

আমার ভালবাসা, আমার জোর, তাকে নিয়ে চলে আসা অভিভূত করে দিয়েছিল তাকে। সেও তো ভালবাসত। বিয়ের কথা ভাবেনি যদিও।

আমি তাকে এনে মার ঘরে বসিয়ে দিলাম।

মা একবার তাকালেন, বললেন, 'কে?'

অত রাত, কত রাত তা বোঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

আমি বললাম 'নিরু এসেছে মা। তোমার কাছে ক'দিন থাকবে। কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি বলে এসেছি, ওদের বাড়ী।'

... ...

দাদাভাই থামলেন। 'তারপর কদিনের মধ্যেই মা মারা গেলেন। বোন এসেছিল অসুখের খবরে। তাকে দেখে একটু অবাক্ হল। মাকে কিছু বলা যায়নি। বোনকে বললাম, আমি ওকে বিধবা বিয়ে করব বলে নিয়ে এসেছি। সেও হতবুদ্ধি হয়ে রইল। তারপর বললে, 'ওর বাবা-মা, গাঁয়ের লোকে কেউ জানে না। কথা হবে খুব।'

আমি বেপরোয়া, বললাম হয় হোক, ওকে তোর কাছে ক'দিন রাখব।'

তারও বাড়ীতে শাশুড়ী ভাসুর জা স্বামী। বললে, 'সেখানেও কথা হবে। তবে বন্ধু বলে, মার সেবার জন্য এসেছিল বলে রাখতে পারি। কিন্তু তুমি শীগ্‌গির মাঘ মাসেই, যা হয় করে ফেল। গাঁয়ে ওদের বাড়ীতে জানিয়ে, তোমার আমাদের বাড়ীর সবাইকে বলে এস দাদা।'

কিন্তু সে হল সরকারদের মেয়ে, কায়স্থ। আমরা ব্রাহ্মণ। বিধবাবিবাহ আইনে অসবর্ণ চলে কি না জানতাম না। আবার অসবর্ণ বিয়েতে কোন ধর্ম-জাতি চলবে না।

শেষ অবধি কালীঘাটে গেলাম। তাঁরা রাজী হলেন না। বিদ্যাসাগরী বিধবা বিয়ে এবং বিধবা অসবর্ণ বিয়ে দুটোর সমন্বয় আর হল না। সেই বছরই শেষ বছর, ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে গেলাম। আর্য্যসমাজী বিয়ে, মালা বদল, নানারকম জায়গায় কথা বলে একটা বিয়ের মত ব্যবস্থার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে কোন কারুকেই সঙ্গী বা সাক্ষী বন্ধু পেলাম না। আমার ভাল নাম ছিল শিবতোষ, সেটাই আজও আছে। একটা মন রাখা বিয়ে হল কিন্তু রেজিস্ট্রীওলা অনুষ্ঠানও নয়।

চলে গেলাম নেপালে চাকরি নিয়ে। কে কার খোঁজ রাখে বিদেশে। তোমার ঠাকুমা খুব মনমরা হয়ে রইলেন।

তোমার ঠাকুমার মতে বিয়ে হল না অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক বিয়ে। আর কোন ভাই তো ছিল না— বোনের সঙ্গেও খুব যোগাযোগ রইল না। নিরুর বাপের বাড়ীরা রটিয়ে দিয়েছিলেন নিরুকে নিশি ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে, একটা জলার ধারে কাপড়-চোপড় পাওয়া গেছে।

তার বয়স কম ছিল, আমায় কথায় বিশ্বাস করল ক্রমে। অনুষ্ঠান না করেও বিয়ে হয়। মালা বদল করে দিল কালীঘাটের কম বয়সী এক পূজারি কিছু বেশী টাকা নিয়ে। কিন্তু অনুষ্ঠান ব্যাপারটা তো সমাজকে জানানো—বিয়ে হয়েছে। তা আর হল না তো।

তারপর তোমার বাবার জন্ম হল,—বিশ্বতোষের।

... ...

তোমার বাবাকে মানুষ করলাম। সেও ডাক্তার হল। তোমার ঠাকুমার ইচ্ছে, ভাল ঘরের একটি মেয়ে এনে আচার-নিয়ম মত বিয়ে হয়। তাঁর লজ্জা, ক্ষোভ, অসামাজিক হয়ে থাকার লজ্জা যায়নি।...

সুজাতা নীরব।

দাদাভাই চুপ করলেন।

কিন্তু একবার ভুল করলে বা অন্যায় করলে তাকে ঢাকতে আবারও ভুল করতে হয়, অন্যায় করতে হয়।

এবারও তাই করলাম।

একটা খুব গরীব গেরস্থ ঘরের বাপ-মা মরা অনাথ মেয়েকে পেয়ে গেলাম নেপালেই। তারা অনাথ ভাগ্নীকে নামিয়ে দিল ঘাড় থেকে। আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে পেয়ে গেলাম। তোমার ঠাকুমার ইচ্ছামত অনুষ্ঠান মাফিক বিয়ে হল।

মেয়েটি অর্থাৎ তোমার মা বেশ ভাল মেয়ে ছিলেন। গুণবতী ও চেহারাও ভাল। শাশুড়ী বউতে বেশ মিলও হল। কিন্তু অনাচারের ছিদ্র আর কতদিন লুকানো থাকে? কেউ কোথাও নেই দেশঘর জাতগোত্র নেই—'স্বয়ম্ভূ' সংসার। তোমার মা জানতে পারলেন সব। কারণ তোমার বাবাকে, বিশ্বতোষ বা বিশুকে আমি সব কথা বলেছিলাম।

তাইতেই তোমার মাও জানলেন। শুধু তোমার বাবাকে মৃত্যুর সময়ে বললেন, মেয়ের বিয়ের সময় সব কথা খুলে জানিয়ে যেন বিয়ে দেওয়া হয়। হোক গে বিধবাবিবাহ, না হয়ে সংসার ধর্ম, কিংবা অসবর্ণ বিয়ে। সমাজ স্বীকার না করলেও সমাজকে জানিয়ে সোজা হয়ে তোমরা চলতে পার। বিয়ে দিও সেইভাবে।'

এবং তাতে তোমার বিয়ে বারবারই ভেস্তে যেতে লাগল। এই হল আমার সেই নিশি ডেকে নিরুপমাকে ভুলেই বা ইচ্ছে করেই আনা আর জীবনযাত্রার কাহিনী। আর তোমাকে বিত্ত যশ অর্থ সম্পদ সব দেওয়া গেল। শুধু দিতে পারলাম না সংসারজীবন ধারা।

দাদাভাই চুপ করলেন। সুজাতাও নীরব। একেলে সংস্কারমুক্ত আর সেকালের সংস্কারের সংঘাত নীরব দুটি মনের কি বক্তব্য বা ভাবনা তার ভাষা পাওয়া শক্ত।

সমীরজননী-প্রসঙ্গ

সমীরের মা সুরবালা স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে সুজাতার কথা বলে বললেন, 'আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। থ' হয়ে গেলাম। এই এক বছর না দেড় বছর চেনা-শোনা। জাত-কুল বংশ কিছু জানা নেই। বলে কিনা সমীরকে নিয়ে মানুষ করবে। মাথা খারাপ নাকি ছুঁড়ীর? ছেলে কি চাইলেই কেউ দিয়ে দেয়? বড়লোক আছিস—আছিস। আমারও ভাতের হাঁড়ীতে সমীরের চাল আছে। 'গাছে কি ফল ভারি হয়'? ভগবান দিয়েছেন সন্তান। ছেলে। মানুষ করে দেবে আমার ছেলেকে। আ মোলো যা।'

পিতা চুপ করে রইলেন।

ঠাকুমা বললেন, 'সেদিন আমার কাছে এসেছিল। তা' বয়সকালে বিয়ে করেনি কেন। অত টাকা বড়লোক যদি। নিজেরই একঘর ছেলেমেয়ে হত। ছেলে আবার কেউ দেয় নাকি যাকে তাকে? জাত জাত নয়, পাড়ার লোক বলে ওদের কুলে কি দোষ আছে।'

ছেলেরা এসে পড়েছে খেলা করে। তাদের কানে কি গেল কথাটা?

ওঁরা চুপ করলেন। শুধু পিতা বললেন, 'তা উনি তো কথাটা ভালভাবেই বলেছেন। তোমরা রাগ করছ কেন? দেবে না দিও না, আর যদি সত্যি মানুষ করে দেন—ভালবাসেন ছেলেটাকে তাহলে সমীরের ভালোই হবে। হিল্লে হয়ে যেতে পারে।'

সমীরজননী,—'আর যদি তখন ছুঁড়ী একটা বিয়ে করে বসে?'

পিতা,—'হ্যাঁ তাও তো হতে পারে। তা উনি ভদ্রলোকের মেয়ে, সমীরকে স্নেহ করেন। কোন নীচতা

নিশ্চয়ই করবেন না। তোমাদের কল্পনার দৌড়ও কম নয়। বিয়ে করে যদি।'

সমীরের পিতা উঠে বাইরে চলে গেলেন।

কিন্তু দুটি নারীর জিহ্বা তখনও রাগে মুখর। পুত্র হারানোর ভয়ে। শেষ অবধি—শেষ অবধি কি করা যাবে ভাবনায় অধীর হয়ে উঠলেন। সমীর ওকে ভালবাসে, যদি ভুলিয়ে নেয় ডাইনী? ঘরের মধ্যে উঠে এলেন। রাত্রি বাড়তে লাগল। খাওয়া হল। শুতে গেলেন দু'জনে পাশাপাশি ঘরে।

গানের মজলিস-ফেরত এক সন্ধ্যা

ডিসেম্বর। গানের আসরের আহ্বান অন্তরীক্ষ গায়িকা এড়াতে পারে না।

শেষ অবধি দুর্দিনের জন্য গেল।

ফিরে এসে দেখল, পিতামহ ভালই আছেন।

বললেন 'তোকে খুঁজতে কদিন আগে সমীররা এসেছিল।'

'সমীররা?'

'হ্যাঁ। তারপর ড্রাইভার বললে, ওরা বাড়ী বদল করছে। কোথায় চলে গেল কদিন হল।'

সুজাতা,—'বাড়ী বদল!' চুপ করে রইল একটু। শুধু ভাবল বাড়ী বদ্‌লে কোথায় গেলেন। কেনই বা? 'কোন ঠিকানা দেননি দাদাভাই?'

'না, তা তো কিছু বলল না। ছোট ছেলে, অত জানেই না কিছু। বাড়ী বদলের কথাও তো সে বলে নি। ড্রাইভার বললে।'

সুজাতা অবাক্ হয়ে কি যেন ভাবে।

কয়েকদিন পর। এবারে সুজাতার মনের কথা বলবার পালা এল। সেদিন ছিল শ্রাবণের সন্ধ্যা। যেদিন সে শিবতোষবাবুর কাহিনী শোনে।

আজ হল পৌষের কুয়াশাভরা ধোঁয়াটে আকাশ, ঝাপসা পৃথিবী।

সুজাতা বললে, 'জানো দাদাভাই, আমার সমীরটাকে খুব ভাল লেগেছিল জান তো। আমার জন্তেই ওরা বাড়ী ছেড়ে পালাল বোধহয়।'

'কেন? তোর জন্তে কেন?'

'হ্যাঁ, আমি ওর মার কাছে বলেছিলাম, সমীরকে আমায় দিন, মানুষ করি। উনি যেন কেমন বিরক্ত হলেন, ভয়ও পেলেন বোধহয়।'

'এতে ভয়ের কি আছে?' বৃদ্ধ বললেন।

তারপর বললেন, 'তা' অমন একটা বুদ্ধিমান্ ছেলে। লোকে কেন দেবে? দিতে কি চায়?'

বাজার দোকান পথ

চৌরঙ্গী ধর্মতলার মোড়ে গাড়ী দাঁড় করিয়ে সুজাতা কি সব জিনিষ কিনছিল, খেলনা লজঞ্জুস চকলেট জামা-কাপড় ছোটছেলের। গাড়ীর মধ্যে একটা বছর পাঁচের বালক বসে।

সে এ দোকান ও দোকান ঘুরে জিনিষ আনে, গাড়ীতে রাখে, ছেলেটা হাত দিয়ে দেখে, নাড়ে।

সুজাতা আবার কি নিয়ে এল। সহসা তার পিছন থেকে কে কথা বললে, 'কি এত জিনিষপত্র কিনছ সুজাতা?'

সুজাতা চমকে চাইল পিছনে। 'আপনি! আপনি কোথা থেকে? লোকেনবাবু তো?'

'হ্যাঁ আমি লোকেন রায়। তা তুমি কিসের বাজার করছ?'

'বিশেষ কিছু না। আজ একটু সময় ছিল তাই একটু বাজার করছি।'

'তা তো দেখছি। তা গাড়ীতে ও কে?'

'একটা ছেলে।'

লোকেন হাসল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি একটা ছেলে বটে, কিন্তু ছেলেটা কে?'

'ছেলেটা একজন কারুর নিশ্চয়ই। তা আপনি না বিলেতে মেম বিয়ে করেছিলেন, শুনেছিলাম কার কাছে? কবে এলেন? তিনি কোথায়?'

'তিনি কোথাও নেই। কারণ এই কালো আদমীকে কোনো মেম বিয়ে করেনি। তাছাড়া কাকে বিয়ে

করব ? যিনি বাংলা গান বুঝবেন না, জানেন না, গাইতেও পারবেন না।'

'তবে ?'

'তবে আর কি ? আমি আমার গানকে বিয়ে করেছি। ভালবেসেছি আপাততঃ।'

সুজাতা হাসল। 'ও, ইয়ারকি করছেন ? যাক, কোথায় যাচ্ছেন এখন ?'

'ঠিক কোথাও নয়। কোন্‌খানে যাব ঠিক করিনি।'

'তবে আসুন না, গাড়ীতে একটু গল্প করি।'

'তোমার দাদাভাইয়ের খবর কি ?, দেখা করব ভাবছিলাম।'

'বছরখানেক হল তিনি মারা গেছেন।'

'আহা, তবে তুমি একলা আছ নাকি ?' মাথায় কাপড় এখনকার মেয়েরা দেয় না। সিঁদুরও সবাই তেমন পরে না। লোকেনের কৌতূহলী চোখ ওর মুখের দিকে, চুলের দিকে চেয়ে ছিল। সুজাতা বুঝতে পারছিল, কিন্তু কিছু বলল না।

শুধু বললে, এই ছেলেটাকে বউবাজার একটা আশ্রম থেকে তখন দাদা বেচে থাকতেই এনেছিলাম। ও আর আমি আছি। ছেলেটা বেশ, না ?'

লোকেন,—'হ্যাঁ। কি নাম তোমার খোকা ?'

খোকা বললে, 'সমীর।'

'বাঃ। সমীর।'

গাড়ী একটু এগিয়ে আর এক জায়গায় একটু থামল খুব ঘিঞ্জি একটা গলির সামনে।

সহসা সামনে একটা হাফপ্যান্ট শার্টপরা ছেলে এসে দাঁড়াল। 'মাসী' বলে ডাকল।

সুজাতার হাতে একটা কি খেলনার বাক্স। আবার চমকে ফিরে তাকাল। 'সমীর ? কি রে সমীর, তুই। এখানে কি করে।' সমীর এতবড় হয়েছে।

'আমরা এখানেই কাছেই থাকি। কোথায় যাচ্ছ মাসী। গাড়ীতে ও কে মাসী ছেলেটা।'

'আয় না গাড়ীতে। ও একটা ছেলে। একটু বেড়িয়ে আসবি।'

কৌতূহলী সমীর গাড়ীর সামনে এল।

সুজাতা হাতের জিনিষপত্র রেখে আরও সব কি কি হাতে করে তুলতে আর নিতে লাগল।

একটা খেলার মোটর, একটা এরোপ্লেন, টফি, চকলেটের মোড়ক। ছবি দেওয়া বাক্স ভরা চকলেট নিল। আগন্তুক সমীরের হাতে দেবার জন্য তার দিকে তাকাল।

গাড়ীতে বসা ছেলেটা এতক্ষণ দেখছিল। তার হাতের কাছ থেকে এবার জিনিষ সরে যেতে দেখে সে হাত বাড়িয়ে এবারে সব জড়িয়ে আঁকড়ে ধরল। 'কাকে দিচ্ছ ? ওকে দিচ্ছ কেন ? কে ওটা ? ও কে ? আমি দেব না। দেব না ওকে কিচ্ছু।' সে রাগে কেঁদে ফেলল।

পথে দাঁড়ান সমীর অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। আর গাড়ীতে বসা সমীর আকুলভাবে জিনিষ আঁকড়ে কাঁদতে লাগল। 'দেব না আমি ওকে, একটাও দেব না। ওসব তো আমার জন্যে এনেছ তুমি। ওকে কেন দেব।'

সুজাতা হতবুদ্ধি অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'তোমাকে আবার আরও কিনে দেব। একটু ওকে দিই। ও যে তোমার দাদা হয়। ওর নামও সমীর যে।'

গাড়ীর সমীর জিনিষ ছাড়ল না, আঁকড়ে রইল। তবু সুজাতা কি একটা নিয়ে পথের সমীরকে দিতে গেল। ওর কান্নায় সেও অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এবারে তার চোখ জলে ভরে গেল। সে নিল না। বললে, 'না মাসী, ওর জিনিষ আমি নেব না।' এক নিমেষে দৌড়ে কোন একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

সুজাতা গাড়ী থেকে নামবার আগেই গলির মধ্যে ভিড়ের ভেতরে সে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাড়ীতে অন্য সমীর জিনিষ আঁকড়ে ফোঁপাচ্ছে।

(এরপর ১৩৩ পৃষ্ঠায়)

মন্থরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর লক্ষ্মীকুণ্ডের সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বে তাঁহার বর্তমান আবাসবাটীর দ্বিতলে জটাজুটমণ্ডিত ভদ্র ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, শ্মশ্রু আনাভিলম্বিত, ঊর্ধ্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, রুদ্রাক্ষত্রিপুণ্ড্রকাদি মণ্ডিত হইয়া তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। সম্মুখে আস্তৃত বালুকা-নির্মিত চতুষ্কোণ বেদীর উপর নির্বাণোন্মুখ যজ্ঞাগ্নি ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল। স্তিমিত দীপালোকে অদূরে দুইজন শিষ্য যুক্তকরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বারী সুবাহুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি কৃষ্ণবস্ত্রাবৃতা অবগুণ্ঠনবতী নারী কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাঁহার পদ-শব্দে কক্ষের নৈঃশব্দ্য ব্যাহত হইল, সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তাঁহার চক্ষুর ইঙ্গিতমাত্রে অন্য ভক্তদ্বয় সসম্ভ্রমে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন, সুবাহুও কক্ষ ত্যাগ করিল। সন্ন্যাসী মন্থরার ভয়ার্ত মুখের দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ সিক্ত বস্ত্রে আছ, এই কক্ষের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তোমার জন্য শুষ্ক বস্ত্র, কঞ্চুলিকা এবং অঙ্গমার্জনী রক্ষিত আছে, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আইস।" মন্থরা নিঃশব্দে দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেল। তাহার আগমন-সংবাদ যেন সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই জানিতেন; সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, অন্তর্বাস, মহার্ঘ কঞ্চুলিকা, গাত্রমার্জনী, কঙ্কতিকা—কিছুরই অভাব ছিল না। সিক্ত কেশ মুছিয়া আঁচড়াইয়া শুষ্ক শুভ্র বসন পরিয়া সে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিতেই তিনি বলিলেন, "সারাদিন উপবাস গিয়াছে, ঐ কোণে কিছু আহার্য আছে, খাইয়া লও।" মন্থরা বলিল "প্রভু, আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি। এখন আহারের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছি না আপনি দয়া করিয়া"—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "নিরাপদ আশ্রয় আমি তোমার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সেজন্যে রাত্রি প্রভাত হইলেই তোমাকে বহুদূরে যাইতে হইবে। তৎপূর্বে সাধ্যমতো শক্তিসঞ্চয় করিয়া লও। আহার করো, বিশ্রাম করো।" মন্থরা নির্দিষ্ট কোণে একটি লৌহময় আচ্ছাদনী উন্মুক্ত করিয়া দেখিল রৌপ্যপাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনের বিপুল সমারোহ। সে অল্প কিছু আহার ও পান করিয়া সন্ন্যাসীর নির্দেশক্রমে নিকটবর্তী একটি স্নানকক্ষে গিয়া আচমনাদি সারিয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি শীতার্ত, যজ্ঞাগ্নির নিকটে আসিয়া উপবেশন করো। এইবার তোমার কি বক্তব্য আছে বলো।"

মন্থরা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল, "কি আর বলিব। আমাকে রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি, মা, নিজের জালে নিজে জড়াইয়াছ। প্রথম সাক্ষাতের দিন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, যাহা করিয়াছ করিয়াছ, আর কাহারও ক্ষতি করিয়ো না। তুমি তো আমার কথা শুনিলে না। পট্টমহিষীর সর্বনাশ করিতে কেন

গিয়াছিলে! বালকের রজ্জুপাশ যদি বক্ষে না পড়িয়া রাজার কণ্ঠে বদ্ধ হইত, কীলকের তরবারি তোমায় ক্ষেপণীচালনার পূর্বেই যদি রাজার বক্ষে বিদ্ধ হইত, সুদতীর প্রদত্ত বিষ রাজা বিড়ালীর দ্বারা পরীক্ষা না করাইয়াই যদি অন্নের সহিত গ্রহণ করিতেন তবে তুমি নিজে কোথায় দাঁড়াইতে বলো তো? রেবন্তের মুখ বন্ধ করিবার জন্য, নগরপাল মহাবলকে আর্দ্রপটী বীজ সাহায্যে হত্যা করিবার জন্য যখন উদ্যোগ করিয়াছিলে তখন পরিণাম চিন্তা করো নাই? তুমি বোধ হয় জানো না, সুদতী এইরাত্রে এই সময়ে নগরপাল কর্তৃক কাশী-রাজের নিকট নীতা হইয়া স্বীকারোক্তি করিতেছে। সমস্ত সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, এখন তোমাকে রক্ষা করা সত্যই কঠিন।"

মন্থরা অনেকক্ষণ নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। পরে বলিল, "সুদতী শেষে এই কাজ করিল? সেই তো আমাকে কুপরামর্শ দিয়াছিল?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মন্থরা, তুমি অযোধ্যার রাজ-পুরীতে দাসদাসীদের মধ্যে অনেকদিন কুসীদ ব্যবসায় চালাইয়াছিলে, তুমি নিশ্চয় জানো অর্থ কুসীদযোগে দ্বিগুণ বা বহুগুণ হইয়া ফিরিয়া আসে। তোমার দাসীর মধ্যে তোমার পাপপ্রবৃত্তি যদি কিছু অধিক পরিমাণে জাগ্রত হইয়া থাকে তবে কাহাকে দোষ দিবে? কৈকেয়ী তো স্বভাবতঃ তেমন মন্দ ছিলেন না, তুমি তাঁহাকে বশীকরণ বিদ্যা শিখাইয়াছিলে, সপত্নী-দিগের সহিত দাসীর মতো ব্যবহার করিতে শিখাইয়া-ছিলে, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া রাজার মৃত্যুর এবং রামসীতার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিলে। তোমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে তুমি কৈকেয়ীর কল্যাণই চাহিয়াছিলে, সুদতীও নিজ জ্ঞানবিশ্বাস মতো তোমার কল্যাণই চাহিত। আজ তাহার নিজের জীবন বিপন্ন, তাহার একদিকে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও মৃত্যু, আর-এক দিকে সত্য প্রকাশ করিলে মুক্তির প্রলোভন। সে কি করিবে? আত্মরক্ষার জন্য দুর্বলচিত্তা নারীকে বাধ্য হইয়া তোমার ভূমিকা বর্জনা করিতে হইয়াছে। সামান্য রূপের লোভে তুমি অন্যকে অন্ধ করিয়াছ, মনে পড়ে?"

মন্থরা বলিল, "আমি কিন্তু এবার দুইটি বর চাহিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা লই নাই।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি পূর্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে এবার তাহারই প্রমাণ দিয়াছ। এক বরে নিজের নির্বাসন এবং অন্য বরে কুমারের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া রাজাকে মুগ্ধ করিয়াছ। যদি মুখ ফুটিয়া রাণীর নির্বাসন এবং কুমারের প্রাণদণ্ড চাহিতে তাহা হইলে পাইতে না, তাহা জানো। সুপর্ণ দশরথ নহেন। এক্ষেত্রে কুমার বন্দী হইয়াছেন, পট্টমহাদেবীর নির্বাসনও প্রায় ঘটাইয়াছিলে, গুপ্ত-চরেরাই সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল। তুমি অতি চতুরা, যষ্টি অক্ষত রাখিয়া সর্পকে নিহত করিবার জন্যই তুমি নিজের নির্ব্বাসন চাহিয়াছিলে, কোনও মহত্ত্ব বশতঃ নহে। মন্থরা, তুমি স্বভাবতঃ দুষ্টবুদ্ধি, সুদতীর পরামর্শে তুমি মন্দ হইয়াছ একথা আর যাহাকে বলিতে হয় বলিয়ো, আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিয়ো না। সুদতীকে তুমি সপ্তবার হট্টগৃহে বিক্রয় করিয়া ক্রয় করিয়া আনিতে পারো। শস্ত্রচিকিৎসায় তোমার বাহিরের কুব্জ অন্তর্হিত হইলে কি হইবে, মনের বক্রতা যায় নাই।"

মন্থরা নতমুখে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী বলিলেন. "এ যাত্রা রক্ষা পাইলে স্বভাব সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে? সরল পথে চলিতে, কাহারও ক্ষতি না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিবে?"

মন্থরা তখনও নীরব। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার মতো পাপীয়সীর জীবন রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তোমার পাপাচরণের সহায়তা করিবার জন্যই কি আমার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছ?"

মন্থরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "গুরুদেব, ক্ষমা করুন। যাহা করিয়াছি করিয়াছি, ভবিষ্যৎজীবনে

জ্ঞানতঃ কাহারও ক্ষতির চেষ্টা করিব না,—আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। বিশ্বনাথ সাক্ষী।"

বাতায়নপথে উষালোক কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, বাহিরে অচিরে সূর্যোদয় হইবে বোধ হইল। সন্ন্যাসী সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন, "উত্তম। মহারাজ সুপর্ণ আমার নিকট পরামর্শ লইবার জন্য এতক্ষণ বোধ হয় প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খলকেও বন্দী করিয়াছেন, তোমার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীর বক্তব্য শেষ না হইতেই বাহিরে ভেরী ও তূর্যনিনাদ শ্রুত হইল, রাজানুচরগণ রাজার আগমন ঘোষণা করিল। জনকোলাহলে, বহুজনের পদশব্দে, অশ্বের হ্রেষায় এবং হস্তীর বৃংহিতে নিভৃত আশ্রমের যেন ধ্যানভঙ্গ হইল। দ্বারী সুবাহু দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কাশীরাজ সুপর্ণ আপনার দর্শনাভিলাষী।"

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "সঙ্গে কেহ আছেন?" দ্বারী বলিল, "একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন পরিচারিকা শ্রেণীর স্ত্রীলোক প্রহরীবেষ্টিত হইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। বোধহয় তাহাদের বন্দী করিয়া আনিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কপিলানন্দকে বলো, তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া আসিবে। তৎপূর্বে একখানি আসন তুমি এইখানে পাতিয়া দিয়া যাও। আর এক কথা। অনুচরদিগকে এবং বন্দিগণকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলো, ভিতরে অধিক লোকের স্থান হইবে না মনে হয়।"

মন্থরা ভয়বিহ্বলা হইয়া বলিল, "আমি কোথায় যাইব? আপনি আমাকে ধরাইয়া দিবেন না তো?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। তুমি যে কক্ষে বস্ত্র পরিবর্তিত করিলে তাহার পশ্চাতে আর একটি বৃহৎ বহুছিদ্রযুক্ত মঞ্জুষা দেখিতে পাইবে। উহা শূন্যগর্ভ, উপস্থিত তুমি উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকো। রাজা চলিয়া গেলে আমি বিশ্বস্ত শিষ্যদের সাহায্যে তোমাকে কাশী রাজ্যের বাহিরে প্রেরণ করিব। আমার তপোবনে তুমি আশ্রয় পাইবে। সেখানে শেষ জীবন শান্তিতে কাটাইতে পারি।

মন্থরা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারী সুবাহু এবং সন্ন্যাসীশিষ্য কপিলানন্দের সঙ্গে কাশীরাজ সুপর্ণ প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া তিনি আসনে উপবেশন করিলে কপিলানন্দ ও সুবাহু বাহিরে গেল। সন্ন্যাসী রাজার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সম্প্রতি বড়ো আঘাত পাইয়াছেন। রত্নহার-ভ্রমে কালসর্পিণীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, সে আপনার মস্তকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।" কাশীরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কথার অর্থবোধ হইল না। রাজপুরীর মধ্যে আমার জীবননাশের জন্য চক্রান্ত চলিতেছে, সেজন্য অত্যন্ত অশান্তিতে আছি ইহা সত্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আপনার জীবননাশের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে কাহারও ছিল না। ছলনাময়ী কালিন্দী আপনাকে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছিল, পট্টমহিষীর প্রতি এবং রাজকুমার ঋতুপর্ণের প্রতি বিরূপ হইয়া আপনি যাহাতে একান্ত ভাবে তাহার অনুগত হন সেজন্য তাহার নিযুক্ত আততায়ীদিগের হস্ত হইতে এবং তাহারই প্রদত্ত বিষমিশ্রিত অন্নগ্রহণ হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকে হত্যা করা তাহার স্বার্থের প্রতিকূল হইত। আপনার বিরুদ্ধে প্রাসাদে কোনও চক্রান্ত হয় নাই, পট্টমহিষী এবং রাজকুমার সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

কাশীরাজ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, প্রভু।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্য কথাই বলিতেছি, মহারাজ। আপনি রূপমোহে অন্ধ হইয়া নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। সেই অজ্ঞাতকুলশীলা ডাকিনীর কথায় নিজের পুত্রকে কারাগারে পাঠাইয়াছেন, সতী সাধ্বী পত্নীকে অবিশ্বাস করিয়া নির্বাসনে পাঠাইবার চিন্তা করিতেছেন।"

কাশীরাজ বলিলেন, "কালিন্দী নিজের নির্বাসন

এবং কুমারের অভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিল।" সন্ন্যাসী বলিলেন "সত্য, কিন্তু সেই বরপ্রার্থনার কারণ কি বলিয়াছিল মনে পড়ে? আপনার মনের মধ্যে সে বিষসঞ্চার করিয়াছে। মহারাজ, পট্টমহিষীর সহিত আপনি বিংশবৎসর কাল সংসার করিতেছেন, ইতঃপূর্বে কখনও কি তিনি আপনার অন্নে বিষ দিয়াছিলেন অথবা আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আততায়ী পাঠাইয়াছিলেন?"

কাশীরাজ বলিলেন, "কালিন্দীও বলিয়াছিল একথা। তাহার মতে আমাকে হত্যা করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই এই চক্রান্ত। কথায় বলে, নারী যমকে স্বামী দিতে পারে, সপত্নীকে দিতে পারে না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যৌবনে যখন ভোগস্পৃহা প্রবল থাকে তখন স্ত্রীলোকের সপত্নীবিদ্বেষও প্রবল থাকে। পট্টমহিষীর যৌবনাবস্থাতেই একে একে আর দুই বার বিবাহ করিয়াছেন, সুপ্রিয়া দেবী এবং রাঘবী দেবীকে গৃহে আনিয়া তাঁহার প্রেমের অপমান করিয়াছেন। তখন তিনি তাহা সহ্য করিয়াছেন আর আজ করিতে পারিতেছেন না?"

সুপর্ণ বলিলেন, "আমার অপর দুই পত্নী বন্ধ্যা। নূতন বিবাহিতা রাজ্ঞীর সন্তানসম্ভাবনায় সম্ভবতঃ সিংহাসনের জন্য"—

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ইহাও আপনার ভ্রম। কালিন্দী সন্তানসম্ভাবিতা নহে, সে আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। যাহা হউক, সে ভবিষ্যতের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে চায়। মহারাজ, যে নারী বিড়াল দিয়া আপনার অন্ন পরীক্ষা করাইবার পরামর্শ দিয়াছিল, সেই যে এই চক্রান্তের মূলে রহিয়াছে তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? আপনি না বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব অনুভব করেন?" সুপর্ণের দৃষ্টির ঘোর কাটিতেছিল, চারিদিকের অন্ধকার যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল, তবু সন্দেহ যেন যাইতে চাহিতেছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই প্রেমময়ী সুন্দরী, সে এরূপ বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে পারে? এ যে আমার কল্পনার অতীত, প্রভু। অবশ্য পট্টমহাদেবীর গৃহে বিষমিশ্রিত অন্ন দেখিয়া আমারও সন্দেহ যে না হইয়াছিল তাহা নহে, তবু—"

"তবু সেই ব্যভিচারিণীর সুন্দর মুখ দেখিয়া আপনি তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন।" সুপর্ণ বলিলেন, "ক্রোধবশে কিছু বলিয়া থাকিলেও তাঁহার সতীত্বে আমি কোনও দিন সন্দেহ করি নাই। কিন্তু কালিন্দী ব্যভিচারিণী, এ আপনি কি বলিতেছেন প্রভু?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অনেক অপ্রিয় সত্য কথাই বলিতে হইতেছে মহারাজ, অপরাধ লইবেন না। কালিন্দী পূর্বে অন্যের বিবাহিতা পত্নী ছিল, রাজরাণী হইবার লোভে সে দরিদ্র পূর্বস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছিল, আবার আপনার চেয়ে সুপুরুষ এবং বিশালতর রাজ্যের অধিপতি যুবক কোনও নৃপতিকে পাইলে অন্তই সে আপনাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করিবে। করিবে কেন বলি, মহারাজ, করিয়াছে। সে কল্য রাত্রিতে নগরপাল কর্তৃক সত্য প্রকাশের ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

কাশীরাজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "এ কি বলিতেছেন প্রভু? আমার অজ্ঞাতে কালিন্দী কাশী ত্যাগ করিয়াছে? একথাও আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?" সুপর্ণ বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া জনৈক প্রহরীকে ডাকিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সেই ভালো, নগরপাল মহাবলকে প্রমাণসহ আসিতে বলিলেই আপনার সন্দেহভঞ্জন হইবে।" প্রহরী আসিলে কাশীরাজ তাহাকে অবিলম্বে মহাবলকে এবং উচ্ছ্বখকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তারপর নীরবে নতমুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "সে যখন রাজবাটীর বাহিরে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল তখনই কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, সে ধৃত হইবার ভয়ে পলায়নের আয়োজন করিতেছে?" কাশীরাজ বলিলেন, "না।"

প্রথমেই উচ্ছ্বখ একটি বেত্র-পেটিকা সহ আসিয়া

উপস্থিত হইল। কম্পিত কলেবরে একবার সন্ন্যাসীকে একবার রাজাকে প্রণাম করিয়া জোড়করে দণ্ডায়মান রহিল। রাজা প্রশ্ন করিলেন "অমাত্য, আপনার বন্ধুকন্যা কালিন্দী এক সপ্তাহের জন্য আপনার গৃহে বাস করিতে গিয়াছিল। সে এখন কোথায়?"

উচ্ছৃথ বলিল, "মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে। হৃত-ভাগিনী গতকল্য রাত্রে একবস্ত্রে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। আমার এবং আপনার উভয়েরই মুখ পুড়াইয়াছে। আমি আপনার বিশ্বাসের সম্মান রাখিতে পারি নাই, মহারাজ, আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন।" বলা বাহুল্য উচ্ছৃথ সন্ন্যাসীর নিকট পূর্বরাত্রেই কথোপকথনের পাঠ লইয়াছিল। সে বেত্রপেটিকা খুলিয়া একে একে মন্থরার সমস্ত বস্ত্র-অলঙ্কার বাহির করিয়া দিল, বলিল "কয়দিন হইতেই সে যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইতে-ছিল; কল্য সারাদিন জলগ্রহণ করে নাই। রাত্রে কখন যে গৃহত্যাগ করিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। বস্ত্রালঙ্কার ও অর্থ সমস্তই রাখিয়া গিয়াছে। আপনার প্রদত্ত বস্তু আপনি বুঝিয়া লউন।"

কাশীরাজ দেখিলেন। সেই পরিচিত কঙ্কণ কেয়ূর, পীত নীল নানাবর্ণের বিচিত্র ক্ষৌম বসন। সম্প্রতি প্রদত্ত নবলক্ষ মুদ্রাব্যয়ে রচিত পদ্মরাগ ও হীরকখচিত একটি কণ্ঠহার প্রভাত সূর্যকিরণে জ্যোতির্ময় ব্যঙ্গহাস্যে যেন তাঁহার মূর্খতাকে উপহাস করিতে লাগিল। সুপর্ণ চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমাকে আমি বড়ো বেশী বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া শুনিয়া আমার এ সর্বনাশ করিলে কেন? কালিন্দীর পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল জানিয়া—"

এ বিষয়টার সম্বন্ধে পূর্বে পাঠ লওয়া হয় নাই, উচ্ছৃথ ভীতিবিহ্বল নেত্রে একবার রাজার, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া সুপর্ণকে বলিলেন "মহারাজ, আমি কি বলিয়াছি অমাত্য জানিয়া শুনিয়া এ কাজ করিয়াছেন? আমরা ধ্যাননেত্রে যাহা দেখিতে পাই সাধারণ মানুষ কিরূপে তাহা জানিবে? কি হে যজ্ঞদত্ত, কালিন্দীর সহিত এক সময়ে উচ্ছৃথ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কিছু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল কি না? সেই যে তোমার আত্মীয়—"

উচ্ছৃথ করপুটে কহিল, "হইয়াছিল প্রভু। কিন্তু তাহাতে দোষের কিছু আছে বুঝিতে পারি নাই।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার বন্ধুকন্যা গান্ধর্বমতে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহা তোমার জানিবার কথা নহে। কাশীরাজ সুপর্ণকে যে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া গেল সে যে তোমার চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? মহারাজ, হৃতভাগ্যকে ক্ষমা করুন। এ সত্যই আপনার হিতার্থী।" রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন, "হায় বিশ্বনাথ!" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অমাত্য, আপনি যাইতে পারেন। আমার দ্বারা আপনার কোনও ক্ষতি হইবে না।" উচ্ছৃথ রাজাকে নমস্কার এবং সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। গৃহের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, "জয় গুরুদেব।" উচ্ছৃথ নিষ্ক্রান্ত হইবার পরক্ষণেই নগরপাল মহাবল কক্ষে প্রবেশ করিল। সে গত দুইতিন দিন বড়োই অশান্তিতে কাটাইতেছিল। অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া সে অতি অল্পকালের মধ্যে অভাব-নীয়রূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার চরগণ একে একে যে-সকল তথ্য তাহাকে আনিয়া দিতেছিল সেগুলি যেন তাহারা অনায়াসে সংগ্রহ করিতেছিল, কোনও অদৃশ্য-শক্তি যেন তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। অসি-সঙ্গমের পরপারে বিষবৈদ্য রেবন্তের সন্ধান যেমন আকস্মিক ভাবে পাওয়া গেল, তেমনি একটি সুন্দরী রমণী মূষিকের উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া কোন্‌দিন কোন্ সময়ে তাহার নিকট বিষ ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও তাহার বাধা হয় নাই। অপরদিকে সেই সুন্দরী রমণী-কে কেদারেশ্বরের পাষাণসোপান হইতে যে কৈবর্ত বরুণাসঙ্গমের কাছে আদিকেশবের মন্দিরনিম্নে পৌঁছিয়া দিয়াছিল সে স্পষ্টই তাহাকে রাজবাটীর দাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। প্রাসাদ-পুররক্ষীরা একবাক্যে বলিয়াছে নূতন রাজ্ঞী কালিন্দীর দাসী সুদতীর কাশী-রাজের বিশেষ অনুমতি অনুসারে যেরূপ অবাধভ্রমণের

অধিকার ছিল সেরূপ আর কাহারও ছিল না। পূর্বের অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাকালে মণিকর্ণিকার ঘাটে দুইজন ভীমকায় স্নানার্থী নাকি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেখানেও সন্ধ্যাকালে একজন সুন্দরী স্নানার্থিনীকে তাহাদের সহিত মৃদুস্বরে আলাপ করিতে দেখা গিয়াছিল, রাজার নৌকা আক্রান্ত হইবার কিছু পূর্বেই সে অদৃশ্য হয়। স্থানীয় কয়েকজন নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, ঐ তিনজনকে তাহার পূর্বে কোনও দিন দেখে নাই, একজন ঐ নারীকে রাজপ্রাসাদের দাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এ সমস্ত প্রমাণই একটি সত্য নির্দেশ করিতেছিল, সুদতীর কর্ত্রী নূতন রাজ্ঞী কালিন্দী দেবীই সমস্ত চক্রান্তের মূলে অবস্থিতা। অথচ রাজার আদেশ, সুদতী বা কালিন্দী দেবীর সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করাও চলিবে না। এই দ্বিধার মধ্যে নগরপাল বিমূঢ় অবস্থায় রাজাদেশে রাজসাক্ষাতে করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ, অপরাধের প্রমাণ যথেষ্ট পাইতেছি কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। হয়তো আপনি বিশ্বাস করিবেন না, হয়তো আমাকেই দণ্ড দিবেন, কারণ সত্য বড়োই অপ্রিয়।"

কাশীরাজ অনেকটা আত্মস্থ হইয়াছিলেন, বলিলেন, "নূতন রাজ্ঞী কালিন্দী দেবীর বিরুদ্ধেই প্রমাণ পাইয়াছ আশা করি। যাহা আনিয়াছ নির্ভয়ে বলো। আমি আজ সমস্ত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

নগরপাল একে একে তাহার সমস্ত সংগৃহীত তথ্য নৃপতির কর্ণগোচর করিল। রাজা বলিলেন, "সুদতীর বা কালিন্দীর কোনো সন্ধান পাইলে?" নগরপাল বলিল, "না মহারাজ, তবে এখনও আশা ছাড়ি নাই।" রাজা বলিলেন, "আর সন্ধানে প্রয়োজন নাই। উহারা যেখানে ইচ্ছা যাক। তুমি তোমার চরদিগকে পুরস্কৃত করিয়ো। তাহাদিগকে বলিয়ো, কুমার ঋতুপর্ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাই, এবিষয়ে প্রজাগণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। অতঃপর সর্বদা সতর্ক থাকিবে, আমার প্রাণরক্ষা না হইলে তোমার প্রাণ যাইবে জানিয়া রাখিয়ো।"

কাশীরাজের চক্ষুর ইঙ্গিতে নগরপাল প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। সুপর্ণ নির্জীবের মতো নতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহা হইয়াগিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া লাভ নাই মহারাজ।"

সুপর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু কালিন্দীর কি হইল, কি হইবে,না জানিয়া মন যে শান্ত হইতেছে না প্রভু। সে আমার সহিত যতই ছলনা করিয়া থাকুক, আমার প্রণয়ে একাধিপত্য লাভের লোভেই করিয়াছে আপনিই বলিতেছেন, আমার প্রাণনাশের ইচ্ছা তাহার ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাহাকে এক কথায় মন হইতে সরাই কি করিয়া? যাহাকে লইয়া এতদিন সংসার করিয়াছি সে অনাথিনীর মতো পথে পথে ফিরিতেছে ভাবিলেই যে প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে থাকে। সে অসহায়া সুন্দরী যুবতী শূন্যহস্তে একবস্ত্রে পথে বাহির হইয়াছে, হয়তো এতক্ষণে কোনও দুর্বৃত্তের কবলে পড়িয়াছে"—

ভদ্র মনে মনে হাসিলেন। তাহার সুন্দর মুখখানির মায়া কাটাইতে পারিতেছ না আর কি। মুখে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার দয়ার শরীর, পাপীয়সীর প্রতি এ দয়া আপনারই উপযুক্ত বটে, কিন্তু আপনার চিন্তার কারণ নাই। সে অতঃপর যেখানে যাইতেছে সেখানে সে নিরাপদে মাতৃতুল্য সম্মানে থাকিবে, কোনো পুরুষ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না। আমি এবিষয়ে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, সে এখন তপস্বিনীর জীবন যাপন করিবে।"

কাশীরাজ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বলিলেন, "আমি আপনার কাছে চিরঋণী রহিলাম। আপনার সেবায় লাগিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

ভদ্র বলিলেন, "আমাকে রাজাধিরাজ কুশ তাঁহার বর্তমান রাজধানী কুশাবতীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত একটি নৌকা গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করিতেছে, অদ্য শেষ রাত্রেই আমাকে যাইতে হইবে। আপনি নগরপালকে জানাইয়া দিন,

সে যেন আমার যাত্রাবিঘ্ন না ঘটায়।" সুপর্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি প্রভু! আজ যাইবেন? আমি যে আশা করিতেছিলাম আপনার নিকট কিছুদিন সান্ত্বনা লাভ করিব।"

ভদ্র বলিলেন, "সান্ত্বনা আপনার গৃহেই অপেক্ষা করিতেছে, মহারাজ। আমাকে বিদায় দিন।" সুপর্ণ কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া বলিলেন, "আমার মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র আমার কোনও কিঙ্কর এখনই আপনাকে দিয়া যাইবে, উহা সঙ্গে থাকিলে কাশীরাজের প্রত্যন্ত-দেশস্থ রক্ষীরা আপনাকে বাধা দিবে না।"

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ভদ্র সদলে নৌকারোহণ করিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি মঞ্জুষা তাঁহার সঙ্গে ছিল, রাজাদেশে কেহ তাহা পরীক্ষা করিল না। বলা বাহুল্য, কাশীনগরে সেদিন তাঁহার আবাসবাটিকায় মহুয়াকে স্নানাহারাদির জন্য দুইবার মঞ্জুষার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় দিবসের অধিকাংশ সময় সেই মঞ্জুষা-মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, বহির্জগতের সম্বন্ধে তাহার মনে একটা আতঙ্ক আসিয়াছিল। নৌকাযাত্রার প্রারম্ভে সন্ন্যাসী এবং তাঁহার শিষ্যেরা যখন বিশ্বেশ্বরের সুউচ্চ মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করিয়া প্রণাম নিবেদন করিলেন তখনও সে বাহিরে আসিতে চাহিল না। কাশীর রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলের নিকট যখন সন্ন্যাসী নৌকাত্যাগপূর্বক স্থল-পথে যাত্রা করিলেন, মহুয়া তখনও মঞ্জুষা-মধ্যে বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী একটি উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া তাহার পৃষ্ঠের একদিকে মহুয়া-গর্ভ মঞ্জুষাটি এবং অপরদিকে অন্যান্য মঞ্জুষা তালাবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। কাশীরাজ-মহিষী মহুয়া এইরূপে স্বেচ্ছায় অপহৃতা হইয়া উষ্ট্রের গতিছন্দের তালে তালে দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া জাগিয়া, শুইয়া বসিয়া কুশাবতীর পথে যাত্রা করিল।

কংগ্রেস-স্মৃতি

(দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৩)

ইতিমধ্যে মাদ্রাজ কংগ্রেসের তোড়জোড় আরম্ভ হল।

অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী আগষ্ট মাসের মধ্যে ডাঃ এম্ এ আনসারীর নাম কংগ্রেসের সভাপতি-পদের জন্য সুপারিশ করল বটে কিন্তু তখনই আন-সারী সাহেব সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মতি দিলেন না। তিনি জানালেন যে সভাপতির পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করবেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিতে তিনি মনস্থ করেছেন এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করার পূর্বে তিনি তা দেশের সামনে উপস্থিত করবেন। তাঁর এই অভিপ্রায় তিনি মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে জানালেন এবং এসম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন।

ডাঃ আনসারীর মত মোটামুটি এইরূপ :—যদিও তিনি অসহযোগের পূর্ণ সমর্থক এবং কাউনসিল প্রবেশের নীতিতে বিশ্বাস করেন না তথাপি তিনি মনে করেন যে যদি কংগ্রেসীরা কাউনসিলে প্রবেশ করেন তাহলে কংগ্রেসকে কাউনসিলের কর্ম্মসূচী পুরোপুরি মেনে নিতে হবে এবং তার প্রতিনিধিদের মন্ত্রিত্ব এবং অন্যান্য পদ গ্রহণের অনুমতি দিতে হবে। অর্থাৎ কানপুর ও গোহাটী কংগ্রেসে গৃহীত নীতি বর্জন করে তৎপরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। ডাঃ আনসারী সভাপতির পদ গ্রহণ করলে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এই নীতির সমর্থন করবেন এবং কংগ্রেসে এই নীতি গ্রহণ জন্য জোর দিবেন। এই কারণে তিনি মনে করেন যে, যাঁরা তাঁকে নির্বাচন করলেন তাঁরা যেন তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাকেন।

এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা শওকত আলী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সোয়েব কুরেশী এবং এম্ এ জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি বোম্বাই গেলেন। ডাঃ আনসারীর মত শুনে জিন্না সাহেব ত মহাখুশী। তিনি আনসারী সাহেবকে পূর্ণ সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ডাঃ আনসারীর মতের সমালোচনা করে বললেন, এটা তাঁর নিকট বেদনা-দায়ক বিস্ময়ের মত ঠেকছে। প্রত্যুত্তরে ডাঃ আনসারী জানালেন যে, তিনি তাঁর মতে অনড়।

লালা লাজপত রায়ও ডাঃ আনসারীর মতের সমালোচনা করলেন।

শ্রীমতী সরোজনী নাইডু এবং মৌলানা শওকত আলী কোন মতামত প্রকাশ করলেন না।

এই রকম সময়ে বঙ্গীয় বিধানসভায় স্বরাজ্য দল গভর্ণমেন্টকে পর্যুদস্ত করতে আরম্ভ করল। ২৫শে সেপ্টেম্বর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থামূলক প্রস্তাব পাস করার ফলে মন্ত্রীদ্বয় আবুল করিম গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে "গজ-চক্রবর্তী মন্ত্রিত্বের পতন ঘটল।

(৪)

পুনরায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিল। কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আবার দাঙ্গা বেধে গেল। বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ একদল মুসলমান অভয়

আশ্রমে চড়াও হয়ে আশ্রমের কর্মীদের আক্রমণ করে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে জখম করল। সংবাদ পেয়ে পুলিশবাহিনী আশ্রমে হাজির হল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তারা আততায়ীদের কিছু না বলে আত্মরক্ষাকারী আশ্রমের কর্মীদের গ্রেপ্তার করল।

ভারতের অন্যান্য স্থানেও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে লাগল।

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এম্ এ জিন্নার সভাপতিত্বে সিমলায় একটি ঐক্য সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

মূল কমিটীর অধিবেশন হল ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে। ১৮ই তারিখে একটি নব কমিটী গঠিত হল। তার সদস্য হলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডাঃ মুঞ্জে, জয়রামদাস দৌলতরাম, দিল্লীর রায় কেদার নাথ, কানপুরের প্রিন্সিপাল দেওয়ান চাঁদ, সর্দার শার্দুল সিং, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ এম্ এ আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলী এবং ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু।

১৮ই তারিখেই নব কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হল। গোহত্যা এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো সম্বন্ধে আলোচনা হল কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান গেল না।

উপরোক্ত কারণে ঐক্য সম্মিলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখা হল। সভাপতি জিন্না সাহেব ঘোষণা করলেন যে, যদি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারী, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপত রায়, ডাঃ মুঞ্জে, রায় কেদারনাথ, জয়রামদাস দৌলতরাম এবং সর্দার উজ্জ্বল সিং ঐকমত্য হয়ে রেকুইজিশন দেন, সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করবেন।

সভা মুলতুবি হওয়ার পূর্বে মূল কমিটী ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে।

ঐ সম্মিলনের পরেও হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ কমল না বরং বেড়েই চলল। ১১ই অক্টোবর একজন হিন্দু ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

ঐ তারিখেই সিন্ধু প্রদেশে স্থানীয় জাতীয় ইসলাম আঞ্জুমান একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রচার করল যে জনৈক রামপাল পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুৎসা করে একটি পুস্তিকা রচনা করেছে এবং এর জন্য আঞ্জুমান মুসলমানদের উত্তেজিত করতে লাগল। ফলে সিন্ধুতেও দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হ'ল।

(৫)

বি. জি. হর্ণিম্যান সহ ৩০ জন সদস্যের রেকিউজিশন অনুসারে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধানসভায় দ্বৈত-শাসন পরিচালনার বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্বন্ধে মাদ্রাজ কাউন-সিলের কয়েকজন স্বরাজী সদস্যের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি বিশেষ অধিবেশন কলিকাতার এলবার্ট হলে ১৯শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের সভাপতি মশায় এই সভার সভাপতিত্ব করেন। সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—ডাঃ আনসারী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, টি প্রকাশম, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শাওকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ভি. ভি. যোগিয়া, কুমার গঙ্গানন্দ সিং, বি. জি. হর্ণিম্যান, লালা গিরধারীলাল, গোপবন্ধু দাস, নিম্বকর প্রভৃতি।

রেকিউজিশন স্বাক্ষর-কারীদের পক্ষে প্রস্তাব উপস্থিত করতে দাঁড়ালেন নিম্বকর মশায়। রাজকুমার চক্রবর্তী বিষয়টি মুলতুবি রাখার জন্য অনুরোধ জানালেন কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হল না।

নিম্বকর নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন:—

মাদ্রাজ কাউনসিলে কংগ্রেস পার্টির আচরণ সম্বন্ধে

স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যা কিছু বলা হয়েছে সে সকল বিবেচনা করে ওয়ার্কিং কমিটী স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যে, পার্টি কংগ্রেসের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য স্বরাজ অর্জন অথবা গৌহাটী কংগ্রেসের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কিছু করে নি, কারণ কমিটীর বিচারে সেই সময় ঐ প্রদেশে দ্বৈত শাসন অবসানের কোন সম্ভাবনা ছিল না, বরং তারা একটি পার্টীর সহযোগিতায় আমলাতন্ত্রের বল বৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছে—যে পার্টীর প্রধান উদ্দেশ্য আমলাতন্ত্রের নিকট অনুগ্রহ স্বরূপ চাকুরি পাওয়ার জন্য সম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়তা দমন করা। যতটা তারা এ কাজে সাফল্য লাভ করেছে তার জন্য মাদ্রাজ কাউন্সিল পার্টি কংগ্রেস ও দেশের ধন্যবাদের যোগ্য। ওয়ার্কিং কমিটী এই সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করছে যে কোনমতেই কাউন্সিল পার্টি গৌহাটী প্রস্তাবের (গ) ও (চ) ধারা অনুসারে মন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এবং সর্বদা দ্বৈত শাসন ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করবে। প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হল।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় প্রস্তাব করলেন যে নিম্বকর মশায়ের প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হোক।

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সেনগুপ্ত মহাশয়কে সমর্থন করলেন।

সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, তার পর নিম্বকরের প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ডাঃ এম্ এ আনসারী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যে-সকল হত্যাকাণ্ড সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে তা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করছে এবং দেশে অহিংস আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

মৌলানা মহম্মদ আলী এবং অন্যান্য সদস্য দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করলেন :—

প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির অন্যাকে যুক্তিতর্ক করে অথবা বুঝিয়ে শুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করা বা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা অন্য অসৎ উপায় (যথা আর্থিক লোভ দেখিয়ে) দ্বারা তা চেষ্টা করা চলবে না, পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কাকেও ধর্মান্তরিত করা চলবে না। যদি ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে তার পিতামাতা হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায় তাহলে তাকে তার নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের কারও নিকট পৌছে দিতে হবে। ধর্মান্তরিত করণ বা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যক্তি, স্থান, কাল ও প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা চলবে না অথবা ধর্মান্তর বা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণের সপক্ষে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ বা আনন্দোৎসব করা চলবে না।

ধর্মান্তরিতকরণ অথবা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে যখনই কোন অভিযোগ পাওয়া যাবে যে, এই কাজ গোপনে বল প্রয়োগ দ্বারা বা অন্যায় উপায়ে করা হয়েছে এবং যখন ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করণের সংবাদ পাওয়া যাবে তখনই সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত অথবা সাধারণ নিয়ম অনুসারে সালিশ দ্বারা বিবেচিত হবে।

মৌলানা শওকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

জয়রামদাস দৌলতরাম একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বললেন যে, কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এই রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আলোচনা করা সঙ্গত নয়।

টি. প্রকাশম্ প্রস্তাবটি মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করলেন। জয়রামদাস দৌলতরাম তা সমর্থন করলেন।

তুলসীচরণ গোস্বামী প্রকাশমের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেওয়া কর্তব্য।

রাজকুমার চক্রবর্তী তুলসীবাবুকে সমর্থন করলেন।

মুলতুবি প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হল।

তারপর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর সেদিনের মত অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

পরের দিনের অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গোহত্যা এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে প্রস্তাব প্রতিপক্ষদের বিভিন্ন মতের দাবির সুষ্ঠু সমাধান মনে করেও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী প্রস্তাবের নির্দেশানুসারে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালানোর অধিকার কংগ্রেস সদস্যগণকে দিচ্ছে এবং এইরূপ প্রচার চালনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীকেও নির্দেশ দিচ্ছে।

এবং আরও প্রস্তাব করছে যে, মাদ্রাজে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ও কংগ্রেস অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হবে।

যেহেতু ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়ের উপর তাদের ধর্মমত আরোপ—বা আরোপ করার চেষ্টা—থেকে বিরত থাকবে অতএব সাধারণ শৃঙ্খলা ও নীতি বজায় রেখে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার ধর্মমত প্রচার ও অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া হচ্ছে।

যে কোন সময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার অধিকার হিন্দুদের থাকবে, কিন্তু মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা থামান বা কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ চলবে না, অথবা মসজিদের সম্মুখে গান ও বাজনা এমনভাবে চলবে না যাতে মসজিদের উপাসকের প্রতি ঔদ্ধত্য বা অসম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং বিশেষ করে তাঁদের বিরক্তি উৎপাদন করা হয়।

খাদ্যের প্রয়োজন পশুবধ নিয়ন্ত্রণের মিউনিসিপাল আইনের সাপেক্ষে রাজপথ এবং মন্দির বা উপাসনালয়ের সান্নিধ্য ছাড়া হিন্দুদের চোখের আড়ালে যে কোন শহর বা গ্রামের যে কোন স্থানে মুসলমানদের গোহত্যা করার অধিকার থাকবে। হত্যার জন্য গরুকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে কোন উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করা চলবে না।

গোহত্যা ব্যাপারে হিন্দুদের দৃঢ়মূল ভাবপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানান হচ্ছে, যেন তাঁরা গোহত্যা এমন ভাবে সম্পাদন করেন যাতে সংশ্লিষ্ট হিন্দুদের শহর বা গ্রামে কোন প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

এই প্রস্তাবের যে কোন শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ যখনই পাওয়া যাবে তা ওয়ার্কিং কমিটী দ্বারা নিয়োজিত অথবা সাধারণ নিয়মানুসারে গঠিত সালিশগণ অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

প্রস্তাব উপস্থিত করে সেনগুপ্ত মশায় তার সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘবক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মৌলানা আক্রাম খাঁ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং রাজকুমার চক্রবর্তী দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তার পর কমিটীর অধিবেশন শেষ হল।

(৬)

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি ষ্ট্যাটুটারী কমিশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বড়লাট সাহেবের আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী, বিঠলভাই প্যাটেল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, দেওয়ান বাহাদুর টি. রঙ্গচারিয়া, স্যর আবদার রহিম, মহম্মদ ইয়াকুব, মহম্মদ আলী জিন্না প্রভৃতি আলোচনা সভায় যোগ দিলেন।

আলোচনার ফলে জানা গেল, এই কমিশন কেবল মাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য দ্বারা গঠিত হবে। কোন ভারতীয় সদস্য এতে স্থান পাবে না। তবে কমিশনের কাজের সুবিধার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় এবং শেষ পর্যায়ে কিছু ভারতীয় সদস্য নেওয়া হবে মাত্র।

অবশেষে রয়েল কমিশন গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। জানা গেল লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে কেবলমাত্র পার্লামেন্টের ইংরেজ সদস্য দ্বারা কমিশন গঠিত হয়েছে।

কোনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করার ফলে দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল।

স্যার হরি সিং গৌর আক্ষেপ করে বললেন যে, পার্লামেন্টের একমাত্র ভারতীয় সদস্য লর্ড সিংহকে পর্যন্ত কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্যের স্থান না থাকায় দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল।

শ্রীমতী বেশান্ত মহোদয়া কমিশনকে একটি ফাঁদ বলে আখ্যা দিয়ে দেশের লোককে সতর্ক করে দিলেন।

প্রাদেশিক স্তরেও ছোট ছোট সাহেবরা কমিশন সমর্থনের জন্য স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। বাংলার ছোট লাটসাহেব রয়েল কমিশন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে আমন্ত্রণ জানালেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হল না।

ভারতের সকল রাজনৈতিক দল একবাক্যে কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী বেশান্ত, জিন্না সাহেব এবং অন্যান্য প্রধান নেতারা সকলেই কমিশন বয়কট করার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

লালা লাজপত রায় ভারতের নেতাদের একটি সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শ দিলেন। ক্রমশঃ

(১২০ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ)

লোকেন অবাক্ হয়ে বসে। সুজাতা নেমে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে সুজাতা পথের এদিকে-ওদিকে খুঁজে আস্তে আস্তে ফিরে এল।

গাড়ী চালাতে বললে ড্রাইভারকে।

লোকেন এতক্ষণ অবাক্ হয়ে বসে। এবারে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপারটা বুঝলাম না, ওটা কে? সমীর নাম ওরও?'

সুজাতা গাড়ীর সমীরকে চুপ করাতে চেষ্টা করছে। কিছু চকোলেট বার করল একটা মোড়ক থেকে। বললে, 'ছিঃ, কেঁদো না। এই যে এটা খাও। ও তো তোমার দাদা হয়। ওকে লজঞ্জুস দিতে হয়। ও' ও তোমাকে দিত।'

গাড়ীর সমীর চোখ রগড়ে চকোলেটের খোসা খুলতে লাগল।

এবার সুজাতা লোকেনকে বললে, 'আপনিও দুটো একটা খান।'

'আমাকেও ভোলাচ্ছ?' সহাস্যে লোকেন বললে।

—'তা মেয়েরা তো সবাইকেই ভোলায়।,

তবে কিরকম ভোলানো সেটা ভাববার।'

সুজাতা সহজভাবেই কথাটা বলেছিল। এবারে বলল, 'সব কথার অত মানে খুঁজবেন না। খান।'

'কিন্তু ওই সমীরটা কে বললে না তো?

'চলুন না বাড়ী গিয়ে একটু চা-টা খাবেন। তখন গল্প করা যাবে।'

এও আর এক সন্ধ্যা।

অগ্রাণের শেষ হৈমন্তী সন্ধ্যা এটা। কলকাতার আকাশ অস্বচ্ছ, ঝাপসা আকাশ। কোন বস্তি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পথের আলো মিটমিটে ম্লান মুখে চেয়ে আছে। সুজাতা নেমে এসে সমীরকে তার খেলনা শুদ্ধ তার মাসীর কাছে সমর্পণ করে বললে, 'ওকে কাপড় ছাড়িয়ে খাইয়ে শুইয়ে দাও। একটু খেলে তো খেলুক। আমিও কাপড়-চোপড় ছাড়ি।'

লোকেন রায় বারান্দায় দাদাভাইয়ের বসবার জায়গায় বসলেন।

সুজাতা এল—বললে, 'আপনি খেয়েই যান না।'

লোকেন,—'আচ্ছা। বাড়ীটাতে সেই ১১ বছর আগে এসেছিলাম। তখন তোমার বাবা দাদা দুজনই বেঁচে। আজ খুব ফাঁকা লাগছে।'

সুজাতা,—হ্যাঁ। বাবা দুতিন বছর পরেই মারা গেলেন। দাদা এতদিন ছিলেন।'

সেবারে আমি লক্ষ্ণৌতে তোমাদের গানের জলসায় ছিলাম। গান শুনলাম। নাম শুনলাম। কিন্তু যোগাযোগ করার আগেই তুমি কলকাতায় রওনা হয়েছ খবর পেলাম।' আমি দিল্লী ফিরে গেলাম।'

'আপনি এখন কোথায়?'

'দিল্লীতে একটা গানের স্কুলে আছি।'

'ওঃ, বড় জায়গায়।'

'তা ওই সমীরটা কে বললে না?'

'ওটি আমাদের এই বাড়ীর পিছনের গলিতে একটা বাড়ীতে থাকত। ছোট্ট ছিল, হঠাৎ দেখি গাড়ীর পাশে জড় হয়েছে ক'জন, সমীরও। গাড়ীতে হাত বুলোচ্ছে। মুখ দেখছে গাড়ীর গায়ে। বলে, 'আমাদের একটু উঠতে দেবে...?' সেই থেকে পরিচয়। ছেলেটিকে খুব ভাল লাগত। একদিন ওর মার কাছে গিয়ে ওকে মানুষ করতে চাইলাম...। তারপর ওরা ছেলে হাতছাড়া হবার ভয়েই বোধহয় বাড়ী ছেড়ে পালাল। আর তারপর দেখিনি প্রায় ৪-৫ বছর। তারপর দাদা আর আমি এই সমীরকে, অর্থাৎ আমিই নামটা রাখলাম,—নিয়ে এলাম এক আশ্রম থেকে।'

'বেশ ত গল্প।'

'হ্যাঁ, গল্পই প্রায়। বাড়ীতে সবসময় ঘরগুলো যেন হাঁ হাঁ করছে ফাঁকা। একটা দুরন্ত ছেলের উৎপাতে সেটা দাদার আর আমার অনেকটা সময় ভরে দিত। দেয়।'

জীবনের আহ্বান

একজনের সামান্য যোগাড় আহার্য থেকে দুজনের খাওয়ার ব্যবস্থা হল।

রাত্রি প্রায় ৯টা বাজল। ছেলেটা ঘুমিয়েছে সুজাতা দেখে এল।

লোকেন বললে, 'আমার কিন্তু বেশ লাগছে তোমার কুড়িয়ে আনা পাতান ঘরকন্না। অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করলে না কেন?'

সুজাতা বলল না 'সে ত তুমি জান।' বলল, 'বিয়ে ত করা হল না। দেওয়াও হয়নি ত। সুতরাং—'

লোকেন নীরব। সেও ত জানে বিয়ে না হওয়ার কারণ ও কাহিনী। নিজেদের বাড়ীর বিমুখ হওয়ার কথা।

বললে, 'আচ্ছা, যে কদিন এখানে থাকি আবার আসব। আসব কি? কখন রেওয়াজ কর? গানের? তখন এলে খুব ভাল লাগবে। তোমার মত কীর্তন ভজন আর রবীন্দ্রনাথ ত আর কারুর গলায় শুনলাম না।'

আকস্মিক এই প্রশংসাতে সুজাতা অবাক্ হয়ে গেল। একটু হাসল। বললে, 'অনেক রাত্রেই করি। নইলে ভোরে পাঁচটা থেকে খানিকটা গাই।'

লোকেন,—'তখন ত লোকের বাড়ী আসার সময় নয়।'

'নাঃ।'

দুজনে নীরব। 'এবারে ওঠা যাক', লোকেন বলে।

সুজাতা উঠল, কিন্তু লোকেন উঠল না। সুজাতা আশ্চর্যভাবে আবার বসল।

সেই পুরাতন কথা

লোকেন,—'খুব বিদেশে ঘুরে এলাম। বেশ কিছু দেখলাম, শুনলাম, কিন্তু মন ভরল না। খুব তোমার কথা মনে হত।'

'আমার কথা।'

'হ্যাঁ, আজ মনে হচ্ছে গানকে ভালবাসলাম কিন্তু যদি গায়িকাকেও পাই। তোমার গান ভুলিনি।'

'কিন্তু আমার ত সব পরিচয় আপনারা জানেন, জানতেন।'

'জানি।' কিন্তু একটা ভুল করেছিলাম, সেটা যদি শুধরে নিই। গান গায়িকা দুজনকে পাই যদি।'

সুজাতা হাসল। 'আমার বয়স কত জানেন? এক-চল্লিশ পার হলাম।'

'তাতে কি?'

'তার মানে যে মেয়েদের চল্লিশের পর আর জীবনকে দেবার কিছু থাকে না। গান হয়তো থাকবে। কিন্তু গায়িকার জীবনস্রোতে ফুরিয়ে যাবার পথে। আমি ফুরিয়ে গেছি।'

'তবু যদি আমি চাই?'

সে আবার হাসল,—'না। ঠিক হয় না সেটা। জীবনকে কিছু দিতে হয়। কিছু নিতে গেলে দিতেও হবে কিছু। কি দেব আপনাকে? দশ বছর আগে হলে কিছু পেতেন। সংসারধর্ম জীবনধর্ম দুই-ই থাকত হয়ত। গান ও—। আর একদিন আসবেন, আমার পিতামহের ভুলের ইতিহাস শোনাব। 'আমি আর কোনও ভুল বা মোহ করব না। সেটাও ভাববার।'

লোকেন,—কিন্তু…আচ্ছা। আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব কিন্তু কলকাতায়।'

'নিশ্চয় আসবেন।'

লোকেন থামে। ওদেশে কিন্তু এমন বেশী বয়সেও বিয়ে করে লোকে।

সুজাতা নীরব। লোকেন পথে নামল। গাড়ীতে উঠল।

অবসাদ ও আনন্দসন্ধ্যা

রাত্রি বাড়ল। আকাশ ভরা তারা বুকে নিয়ে। শীত নেই। সুজাতা বসে থাকে কতক্ষণ। তারপর উঠে যায়। অবসাদ অস্বস্তিভরা মনে ঘুম ছেঁড়াকাটা মেঘের মত ভাবনা আসা-যাওয়া করে। কেটে যায়।

ভোরের আগেই গান নিয়ে বসল তানপুরা নিয়ে।

কি গাইবে? কার গান? সুরদাস? মীরা? পদাবলী? রবীন্দ্রনাথ।

মনে আসে একলা সুর নয় —কথা ও সুর মিশিয়ে।

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে —'

জানি নাই ত তুমি এলে—

'হ্যাঁ, ঝড় বয়েছে জীবন ভোর।

কিন্তু এ কে এতদিন পরে এল প্রেমের মোহময় মধুর কোমল ডাক নিয়ে।

আর সেই 'মোহ' তার মনকে চুরমার করে দিতে চাইছে। কিন্তু না, ও নেওয়া যাবে না। জীবনের ত্যাগের কঠিন সংকল্প মূর্তি ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"জানি নাই"...যাকে জানা নেই সেই তিনিই হয়ত এই রিক্ততার মাঝে মহাপ্রসাদ নিয়ে আসবেন কোনো সময়।

লোকেন বিয়ে করুক। লোকেনের সামনে সংসার-জীবন আসতে পারবে। যা তার কাছে নেই। জীবন অনেক বড় সবারির কাছেই। সে অজানা জীবন। ভোরের শিশির পড়ার টুপটুপ করে শব্দ কানে আসছে। স্থলপদ্ম গাছটা ফুলে ভরে উঠেছে। গাঁদাগাছগুলো বাগান আলো করে আছে।

তবু সমস্ত মন অন্তর তার ভরে ওঠে এক প্রসন্নতায়। লোকেন মাঝে মাঝে আসবে বলেছে। সে ফিরিয়ে দেবার পরও।

মানুষের বুঝি মানুষকে চাওয়ার আদি অন্ত নেই। কেন যে কি হয় কেউ জানে না। আবার মনে হয় যেন মোহ না হয় ওর আহ্বানে। আসা-যাওয়ার পথ মুক্ত খোলা থাকে। এটা জীবনের আকাশে এক অপূর্ব তৃতীয় সন্ধ্যা। শেষ সন্ধ্যা কি।
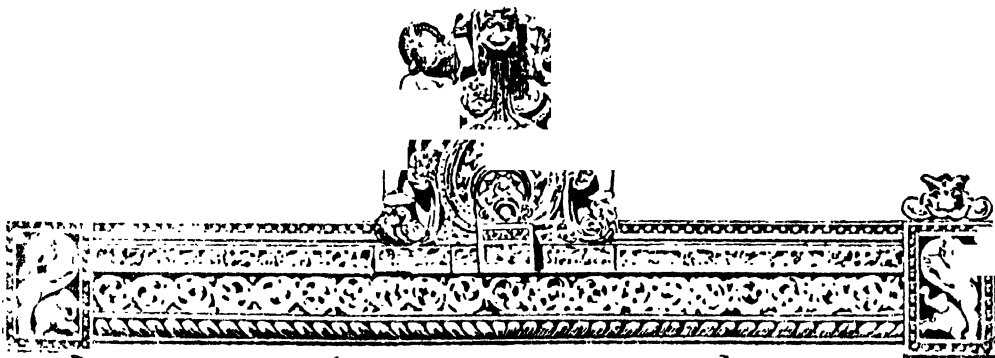
ভারতীয় কৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাক্ ইতিহাসের রূপরেখা

বিভিন্ন 'জাতি'র বা 'জনে'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য নামাবলীতেও

সুধীন্দ্রকুমার কাব্যসাংখ্যতীর্থ

ইউরোপ ও এশিয়ার যে সব রাজ্য 'জাতি' বা 'জনের নাম এই সম্পর্কে করা হয়েছে সেই সব নামের ইতিকথা মূল ও রূপান্তর অনেকেরি কাছে আজ রূপকথার মত মনে হলেও তার বাস্তবতা ও অবিস্মৃত ধারা অনস্বীকার্য ভূতত্ত্ব ও ভৌগোলিক তথ্যাদির মৃত সঞ্জীবনী সুধা যেন অনেককেই দিয়েছে নব জীবন দান। জগতের অন্যতম সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে বর্ণিত নানা বিশিষ্ট নাম ও ঘটনা তার উপর করেছে নতুন আলোক পাত। ভারতের প্রাচীন ও বিভিন্ন কালের ইতিহাস এ সবের গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। তার সম্যক বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন।

তবে তার সামান্য উপক্রমণিকা রূপে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সংপর্কে কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। যেমন আজর্বাইজান শব্দটি স্পষ্টই মূলে 'আর্যব জন' হোতে গড়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্বেরি নিয়মে অতি সামান্যই পরিবর্তিত হয়ে। আর্যবাই বা আর্যবই-আর্যবন্দেরি 'জান' অর্থাৎ জনপদ। আর্যব জনের বাসভূমিরূপে। এই রাজ্যেরই প্রতিবেশী সুপ্রাচীন আর্মেনিয়া। আর্যব জনদের রাজ্যেরি মত অতি প্রাচীনকালে আর্মেনিয়া রাজ্য অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল তুর্কিস্থানের পূর্বাঞ্চল হোতে এশিয়ামাইনরে। 'আর্মেনিয়া' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে এরমন নদীর নাম হোতে। তারি তীরভূমির বাসিন্দাদেরি রাজ্যরূপে। 'অর' শব্দেরো সুপ্রাচীন অর্থ লাঙল এই সব ভূভাগেরি অতি প্রাচীন শাসক ক্ষাত্তিদেরি ভাষায়। খুবই সম্ভব এই অঞ্চলে এই ঐতিহাসিক নদীতীরেই প্রথম কৃষিভূমি লাঙল দিয়ে দিয়ে হয়েছে কর্ষিত। তারি অবিস্মৃত ছাপ রেখে গেছে এই নদীটিরই নামে শুধু নয় 'আর্য' বা অর্য শব্দেরো মধ্যে। অর হতে জাত তাই অর্য বা আর্য। কিংবা অরজীবী অর্থাৎ কৃষিজীবী। আর্যরা নিজ 'জন'কে কৃষিজীবরূ বলে গৌরব দিত। ঋগ্বেদে বহু সূক্তে কৃষ্টির গুণগান। পঞ্চজনের কৃষ্টিরো। বহুঋকে অর, অর্য, আর্য ও অরমন প্রভৃতির উল্লেখ। ঋগ্বেদেরই এক প্রধান প্রাচীন দেব অর্যমা অর্যমন্। এই অঞ্চলেরি সুপ্রাচীন দেব। অর্যমন শব্দ থেকে 'ইরেন' ('Erenn' 'Airem') 'ঐরেম'। বর্তমান তুরকি প্রাচীন ক্ষাত্তিভূমি এশিয়া মাইনর জুড়ে।

আর্য অবেস্তার 'ঐর্য'। জার্মান ভাষায় প্রাচীন 'অরিয়োস' ('Arios') বা 'অর-ঈয়শ' 'অর-ঈশ হওয়া সম্ভব। সুমেরুর খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরো পূর্বেকার দেবী 'EA' বা 'I A' ইয়া। পরে ইরা ইনাতে রূপান্তরিতা। ইরেক বা ইরাক রাজ্যের। সুমেরুর অতি প্রাচীন নগররাজ্য ঈশিবের ঈশি বা ঈশা। এশিয়ামাইনর তুর্কির (সিরিয়ার) খৃষ্টপূর্ব তিন সহস্রকের ক্ষাত্তিদের নামের প্রথমেই যুক্ত হোত 'অরইভ' বা 'অরিভ' ('Ariva')। অর্য-আর্য শব্দেরি প্রকার ভেদ। 'মিতান্নি' ও 'হুররি'দেরো। শিরিয়া পালেস্তাইনে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে মিতান্নীর কালে ক্ষাত্তি –মিতান্নি ও 'হরি মিতান্নি' বলেও প্রসিদ্ধ। নিশ্চিতই ক্ষাত্তিদেরি ঋগ্‌বেদ কালীন ন্যম ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয়। ইরাণে ষষ্ঠ শতকের (খৃঃ পূঃ) 'পর্শিপোলিস্' বা পার্শিপুরের এক প্রসিদ্ধ শিলালিপির 'ক্ষরথিথ'। 'ক্ষরথিতানাং' অর্থাৎ ক্ষয়থিথ ক্ষত্রিয়দের। ঋকবেদে

প্রাচীনতম নাম মান্ধাতার 'ক্ষৈত্রপতি' উপাধিতে। ক্ষৈত্র শব্দটি এশিয়ামাইনরের ('Land of Khet') ক্ষেত্র রাজ্যেরি নামটির হুবহু প্রতিধ্বনি। মিতান্নি শব্দ মিত্রানিক শব্দ হতে খুবই সম্ভব রূপ নিয়েছে। ক্ষাত্ত মিতান্নিদের দেবতা মিত্র ও তার বাহিনী অবীক শব্দ যুক্ত হয়ে। মিত্রবাহিনী রূপে। ভারতে ঋগ্‌বেদ কালের নাম মৈত্রেয় 'মিত্রজুন'। মিত্রজ্ঞানী মিত্র পূজক রূপে। মিত্র সূর্য্যের এক নাম। 'Hurri' বা 'Harri' ভারতে হয়েছে 'হরী'। ঋগ্‌বেদেরি এক প্রাচীন কালে দিক্‌বিজয়ী মানুষ ইন্দ্রের এক উপাধি ছিল 'হরী'। সৌন্দর্যের খ্যাতিতে 'হুরি' বলেও বিখ্যাত হয়। খ্রী. পূ দেড় হাজার বছর হোতে ক্ষাতি হরি কন্যারা মিশরের রাজরাণী ও খ্যাতনামা সম্রাজ্ঞীও হয়েছে। শব্দগঠনে হরি অরজীবী আর্য শব্দেরি এক রূপান্তর। হ বর্ণটির মূলবর্ণ সম্ভবত খ। খ মানে আকাশ। আকাশ হোতে বর্ষণেরি দ্বারা অর অর্থাৎ লাঙলের কর্ষণে খেত বা ক্ষেতে কৃষি কাজ সম্ভব হোত।

গান্ধার—আফগানিস্তানের হিরাত সহরে 'হরিরুদ' তীরে 'হরহুর'দের বাসভূমি ছিল। 'হারয়ু'-হরয়ু হোতে সরযু। হরিরুদ হোতে সরযু উপত্যকায় ক্ষাত্রিয় মৈত্রেয় 'ইস্‌পাকু' ইক্ষাকুদের পদচিহ্ন আঁকা। কাশ্‌প কাশ্‌শিপ কাশ্যপদেরও। হরি-অব নদীও—হার ও অপ হোতে। ঋগ্বেদে 'হরিয়ুপীয়ায়াং' হরিয়ুপীয়াতে ও 'যব্যাবত্যাং' যব্যাবতীতে বা যব্যাবতীতীরে বা এই দুটি নামের নগরী ও উপত্যকায় অতি প্রাচীনকালের বৃহৎ যুদ্ধগুলির অতি বাস্তব বর্ণনা আছে। যব্যাবতী নিশ্চিতই 'ঝোব' বা 'জোব' উপত্যকা। খৃ-পূ তিন সহস্রকের প্রারম্ভের কাছাকাছি 'জোব' কৃষ্টির। বেলুচিস্তানের গান্ধারেরো সম্ভবতঃ। হরিয়ুপা যেন হরপ্পারই প্রতিধ্বনি। এ-সব আলোচনার জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ দরকার।

সুমেরু বাবিলন ইরান আইর্যানা ভারতের কাশ্‌শ কাশ্‌শিপ কৌশিক কুশ কাশ্যপদেরই নামাঙ্কিত কাস্পিয়ান বা কাশ্যপসাগর। সুমেরুর এক প্রাচীনতম নগর ও নগররাজ্য কিশ হতে আসিরিয়া ইরানের দ্বিতীয় সর্গন, অসুর সম্রাটেরি নতুন নগরী ইরানীয় রাজধানী কিশপাল শৈলে কিশেনিন। কিশেনিন বর্তমান খোরশাবাদ হতে কাশ্মীর কোশল কাশী এশিয়া মাইনরের 'কুশর' হতে কুশস্থলী। ককেশাশ কাশগড় খাসগড় হতে সিমলার খাস পাহাড় হয়ে সুদূর উত্তরপূর্বে খাসিয়া পাহাড়। কাশ্যপ কৌশিক কুশদেরই নয় বাবিলন ভূপতি 'ইস্‌সাকু' 'পতেশী' গাদি গাথীন ('GUDI' 'GUTEAN') ঋগ্বেদের গাথীন্ বিশ্বামিত্র কৌশিক গাধিদেরও প্রাক্-ঐতিহাসিক—ঐতিহাসিক পথরেখা। কর কুরু কর-কাশ্‌শিদেরও বহু মিশ্রণ ঘটেছে পথে পথে এইসব গোষ্ঠীদের। তথাকথিত 'আর্য' ও 'অনার্যে'র। চিত্রলের 'খোস' বা 'খস' হতে খাসিয়াদের মত পার্বত্য 'জাতি'দেরও মধ্যে আর্যানার্যেরই সংমিশ্রিত ধারা বহমান। বাবিলন রাজ্য ও সাম্রাজ্যের শাসক ছিল কাশ্‌শ বংশ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি হতে প্রায় ছয়শত বছর। তাদের ভূপতিদের উপাধি ছিল কর। কর হতে কুরু। হিমালয়ের দুইপারে উত্তর কুরু হতে দক্ষিণ কুরু। সাইবিরিয়ার এশিয়ারই উত্তরমেরু সাগরে কর উপসাগর। ইরানের কুরুগন খৃঃ পূঃ ২৪০০ বছরেরও আগেকার বলে প্রমাণিত। করপাথার হতে কারাকুরুম—কুরুক্ষেত্র। সুদূর দাক্ষিণাত্যে করমণ্ডল। উত্তর কুরুতেই করদারিয়া-শিরদারিয়া সঙ্গম। কৃষ্ণ কাশ্যপ ভূমধ্যসাগর। অরল সাগর অতি পুরাণী ক্ষাত্তভূমি, 'হয়স্তান', 'নৈরী', 'উরতু', 'আর্যবো', 'অরমনীয়া', 'কাপ্পাদেশীয়া' আনাতোলিয়া বা অস্তলীয়া প্রভৃতি রাজ্য ও সাম্রাজ্য ও বহুবর্ণ মানুষের বাসভূমি কাশ্যপ সাগরের এবং কৃষ্ণ ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এইসব ভূভাগে খনিত পুরাতত্ত্বের ঐশ্বর্য্য খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহস্রকের বহু লিপি, লেখবস্তু ও তথ্যাদি সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত রাজ্যগুলিকেও শুধু প্রাক্‌ঐতিহাসিক নয় সত্যকার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দিয়েছে বা দেবে। নতুন ও পুরাতন সব তথ্যেরই জাতিধর্মবর্ণগর্বহীন সত্যকার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্যক বিশ্লেষণ ও আলোচনা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই দৃষ্টিরও খুবই

অভাব বহু পণ্ডিতদেরও মধ্যে। যদিও তাদের খ্যাতির ও প্রচারের জোরে বহু ভুল কথা ও কাহিনী সত্য বলে চলে যাচ্ছে। সহজেই তা উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়।

এইসব ভূভাগের প্রাক্ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক ধারার কিছু পরিচয় দিতে চাই। বিশেষতঃ ঋগ্বেদে বর্ণিত বহু বিশিষ্ট ঘটনা নামাবলী ও কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় এ-সবের যথেষ্ট গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। প্রথমে তুর্কি তুর্কিমেনিয়া তুর্কিস্তান ধরা যাক। প্রসঙ্গতঃ এর সঙ্গে আর্মেনিয়া আজরবাইজান আর্যব প্রভৃতি রাজ্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু উল্লেখ ও আলোচনা আসবে।

লক্ষ্যণীয় যে তুর্ক, উজবেক, কাজাখ, তাজিক, কিরঘিজদের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী গণরাষ্ট্রগুলির দক্ষিণে পূর্ব হতে পশ্চিমে কাশ্মীর, বেলুচিস্তান—উত্তর পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান, ইরান ও আর্মেনিয়া। আর্মেনিয়ার দাক্ষিণ-পশ্চিমে ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস নদী ধৌত সুমের বাবিলন আসিরিয়ার সুবিশ্রুত পুরাণী সভ্যতাভূমি। কাশ্শপ ককেশাসের পশ্চিমে ককেশাশ-জরজীয়া স্পষ্টই জরজরা হতে জাত। তারই পাশে কাম্পিয়ান সাগরেরই পশ্চিমতীরে পর পর তিনটি অনুরূপ সোভিয়েত গণরাজ্য ককেশাশ জরজীয়া, আর্যব-জনের আযবাইজান ও আরমেনিয়া বা অরমেনিয়া। বর্তমানের 'মেনিয়' শব্দটি মীনিয় হওয়াই সম্ভব মিশর ভারতের মীন মৎস্য মীনেশ (MENES) হতে,কৃত্তেরো। এশিয়া মাইনরের 'মাইনর' (MINOR) মীনর হতে। এমনকি 'এশিয়া' শব্দটিও সম্ভবতঃ ঈশিয়া আদিতে। অনেকে ত বটেই বড় বড় পণ্ডিতেরা এই কথায় চমকে গেলেও তা সত্য হতে পারে ভৌগোলিক ও প্রাগৈতাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। এই সূত্রে স্মরণীয় কাজাখ কশ্শাক কাশ্যকভূমির ও তার উত্তর-পূবস্থ সর্ববৃহৎ সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের (আর. এস. এফ. আর.) ঈশিন নদীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নাম ত তারই সহিত অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট সুমের সভ্যতার এক প্রাচীনতম পুর-নগরী প্রখ্যাত ঈশিন্। 'ঈস্তর' 'ঈশিশ' 'আইশিস' 'ঈকরী ঈশ্বরী ঈশানীরই নাম হয়ত। কিন্তু সে-সব অন্য প্রশ্ন। মীন মৎস্য কৃত্ত ত্রয় স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য।

অত্রিপুত্র অবস্যু আত্রেয় ঋগ্বেদে পঞ্চম মণ্ডলের ৩১ সূক্তে ৮ম ঋকে ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বলছেন: তুমি যদুতুর্বশ প্রভৃতিকে সুদুর্গম অরময় নদী পার করে এনেছ। এই ঋকেরি শেষার্ধে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রবন্ধু কুৎসকে এবং কবি উশনাকে সম্বোধন করে তাদের সাহায্যে ও সঙ্গে তুগ্রকেও এই নদী পার করার কথা অবস্যু বলেছেন। দেশে-বিদেশে বহু যুদ্ধে ইন্দ্রের অন্যতম প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও সহায়ক বিরূপ অঙ্গিরস। অত্রিও। অঙ্গিরসকে তাঁর কদাকারের জন্য বিরূপ বলা হত। তাঁর পুত্র বহুসূক্তের রচয়িতা কুৎস আঙ্গিরস। প্রাচীনতম ভূপতি-দের অন্যতম মান্ধাতার পুত্র রাজা পুরুকুৎস। উভয়েই ইন্দ্রবন্ধু বিভিন্নকালে। তুগ্রের উল্লেখ ঋগ্বেদের বিভিন্ন ঋকে। তুগ্র হতে তুর্গ—তুরগ—'তুরগশ'—তুর্ক তুর্কি শব্দগুলির স্বাভাবিক রূপান্তরের ধারাটি লক্ষ্যণীয়। তুরগ শব্দটিরও উৎপত্তি অশ্বের সুবিখ্যাত জন্ম ও বিকাশভূমি তুরদের তুর্কি তুর্কমেনিয়া তুরকি-স্থান হতে। সুপ্রাচীন 'হয়স্তান' বা হয়স্থান রাজ্যও ছিল এই ভূভাগে। নামটিও তার বিখ্যাত হয় 'হয়' অর্থাৎ অশ্বেরই স্থান বা দেশ বলে। এই বিস্তৃত ভূভাগই প্রধানতঃ পূর্বেকার তুর্কি এশিয়া মাইনর। কাশ্পিয় কাশ্যপীয় সাগর ও ককেশাশ পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমস্থ কৃষ্ণ ভূমধ্য সাগর দুটির মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল। প্রাচীন খাত্তি ক্ষাত্তি ক্ষত্রদেরও রাজ্য ও সাম্রাজ্যভূমি। পরে তাদেরই জনগোষ্ঠী শাখা-প্রশাখা মেসোপোটামিয়া বা মেষপত্তন এবং মিশর ও ট্রয় বা ত্রয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইরানে। ভারতেও। এশিয়া মাইনরেই প্রধানতঃ তাদের রাজ্যের আরম্ভ ও বিকাশ। বর্তমান তুর্কি ও সোভিয়েত আর-মেনিয়া আযবাইজান জর্জিয়া ককেশাশ। প্রাচীন সুমের বাবিলন আসিরিয়ার এবং বর্তমান সিরিয়া ইরাক ইরানের উত্তরদিকের ভূভাগ। প্রাচীন হয়স্থান রাজ্য ছিল অরমেনিয়ার অররত পর্বতশৃঙ্গের দাক্ষিণ-পশ্চিমে

বান হ্রদের চারপাশের এলাকা ও ইরানের উত্তর-পশ্চিম কোণে উর্মিয়া হ্রদেরও অঞ্চল পর্য্যন্ত। এখানে এক প্রাচীন রাজ্য 'উরঅরতু' বা 'উরতু'র উদয় হয়েছিল পরে। তুর্বশ তুররস তুর্বীতি তুর্বান তুরান এই ধারাটি লক্ষ্যণীয়।

সেসব অন্য কাহিনী। তবে কান টানলে যেমন মাথার আসা প্রায় অপরিহার্য্য তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থপূর্ণ এই শব্দগুলির টানে বিভিন্ন শব্দই নয় তাদেরই টানে প্রাকৃইতিহাসের কথাও কাহিনীর সাথে বহু তথ্যবস্তু ঘটনাবহুল ইতিহাসেরও। আজ এইসব এলাকায় খনিত পুরাতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যের ও নামাবলীর সঙ্গে স্থানে স্থানে মিল ঘটেছে ঋগ্বেদে বর্ণিত বহু নাম তথ্যবস্তু ঘটনার সঙ্গে। প্রতিটি নাম ও ঘটনা তারি সম্পর্কিত তথ্যাদি পৃথকভাবে আলোচ্য। অবশ্য যদি তার বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের রূপরেখা নির্ণয়ে তার বিশেষ তাৎপর্য্য থাকে। বহু নামও ঘটনাগুলির আছে।

এই অরময় বা অরমন্ নদীর কথা বলেছেন ঋগ্বেদেরই আর এক প্রাচীন ঋষি, গৃৎসমদ। পরে আঙ্গিরস শৌনিহোত্র নামে প্রসিদ্ধ, ভার্গব শৌনিক নামেও। নামগুলিরও যথেষ্ট তাৎপর্য্য আছে। ইনি ২।১৫।৫ ঋকে ইন্দ্রকে 'ধুনি'দের 'অরম্মাৎ' অরমণ নদী হতে পার করার কথা বলেছেন। পরে দভীতির সাহায্যের জন্য চুম্বুরি ধুনিদেরই বধেরও কাহিনী। অরমণ নদী পারের সঙ্গে গভীর অর্থপূর্ণ 'ঈ মহীং' ও 'রায়ন্' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই ঋকে আছে 'রয়ি'র 'অভিমুখে' ছিলেন ইন্দ্র। মিশরের প্রাচীন সূর্যদেব 'RI'। স্পষ্টই যেন 'রয়ি' সংস্কৃতে রূপান্তরে। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে ও অসংখ্য ঋকে এই রয়ির ও রয়িগণের অধিপতির বর্ণনা আছে। পৃথকভাবেই মিশর-ভারত সম্বন্ধ আলোচ্য।

যদু তুর্বশদের নাম অভিন্নভাবে জড়িত হয়ে আছে বহু ঋকে যদুতুর্বশ নামে, যদুদেরই সাথে। বৃচীবন-বৃষ্ণি ও ইন্দ্রমিত্র বিষ্ণু যাদবজনদেরই। তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে পরে প্রাচীন কোন ঋগ্বেদকালে।

ইন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহায়ক সুপ্রাচীন বৃহস্পতির পুত্র নামে পরিচিত খ্যাতনামা ভরদ্বাজ। 'বিধাতৃন্' ভরদ্বাজ। বৃহস্পতিভ্রাতা উচথ্যের স্ত্রী মমতা। তার এক পুত্র মামতেয় দীর্ঘতমা নামে প্রসিদ্ধ মাতৃনামে (ঋঃ বেঃ ৪।৪।১৩)। বৃহস্পতির ঔরসে জাত পরিত্যক্ত পুত্র এই ভরদ্বাজ বৈশালীরাজ মরুত্ত দ্বারা পালিত। যে ভরতের নামে ভারতবর্ষ বিখ্যাত সেই ভরত তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ ও পালন করেন। অথচ ভরতের তিন স্ত্রীর গর্ভজাত নয় পুত্র-কন্যা ছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র মেনকার দৌহিত্র শকুন্তলা-পুত্র ভরত তাদের জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতেন বলে পুরাণ-কাহিনী আছে। আশ্চর্য্য এই যে ঋগ্বেদে দুষ্মন্তও নেই শকুন্তলাও নেই, কিন্তু তাঁর পূর্বকালের ও পরবর্তীকালের অনেক ভূপতিও ঋষি আছেন। সন্দেহবশে যাকে পোষ্যপুত্র নিলেন তার জন্মরহস্য ভরতের ভাগ্যে কম পরিহাস নয়। তাঁর পুত্রগণ পুরোহিতের জীবিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু খুবই সম্ভব অশ্বমেধা ভারতই তাঁর পরে ভূপতি হন। কেন না ৫।২৭ সূক্তের রচয়িতা তিন নৃপতি—ত্রৈবৃষ্ণ ত্র্যরুণ, পুরুকুৎস পুত্র ত্রসদস্যু এবং অশ্বমেধা ভারত। দেবশ্রবা ভারত ও দেববাত ভারত ৩।২৩ সূক্তের যুগ্ম রচয়িতা। দৃশদ্বতী ও সরস্বতী তীরে তাঁরা ভারতদের অগ্নিকে ইলার সাথে করেছেন ধাবাহন। ভরদ্বাজের পুত্রগণ সকলেই ভারদ্বাজ। ঋগ্বেদের একাধিক সূক্তের রচয়িতা প্রত্যেকেই। সুহোত্র ভারদ্বাজ, শুনহোত্র, নর, গর্গ, পায়ু ও ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ। বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ ৬।২৭ সূক্তে যদুতুর্বশ বৃচীবানদের বিরুদ্ধে হরিয়পীয়া ও যব্যাবতীতে পার্থিব সম্রাট অভ্যাবর্তি চয়মানের সঙ্গে যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেইসব যুদ্ধে ভারতের দৈববাত সৃঞ্জয় সহায় ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ দেববাত ভারতের পুত্র। পার্থিব সম্রাট পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন রাজ্য পার্থিয়ার। কাশ্পিয় সাগরের পূর্বতীরে দক্ষিণদিকে বর্তমান সোভিয়েত তুর্কমেনিয়ার অন্তর্গত এই পার্থিয়া। তার পশ্চিমতীরে আমর্বাইজান আরমেনিয়া ককেশাশ। ককেশাশ পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিমে কাশ্পিয় সাগরকে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আরল হ্রদের দক্ষিণে পর পর পূর্বদিকে 'তুর্কমেনিয়'

উজবেকিস্তান কাজাখিস্তান আরলেরি পূর্ব-পশ্চিমে ও দক্ষিণে। অতি পুরাকালে কাশপীয় সাগরের সঙ্গে আরল সাগর যুক্ত ছিল। আজ তার মধ্যস্থ প্রাচীন উর্বতউস্ত বা উররতু অস্ত ভূমি। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক উররতু রাজ্যের নামে। পার্থিয়া নাম করলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে পার্থ্যের কথা। অর্জুনের এক নাম পার্থ্য—জননী কুন্তীর পৃথা নাম হতে। পার্থিয়ারই রাজকন্যা। দশরথরাণী কৈকেয়ী ইরানের কৈকেয়-রাজকন্যা। পাণ্ডুর অপর স্ত্রী মাদ্রী মদ্ররাজকন্যা। উত্তর কুরু দক্ষিণ কুরুর মত হিমালয়ের দুইপারে ছিল উত্তর ও দক্ষিণ মদ্র। উত্তর মদ্র মিডিয়া বা মিদিয়া। আদিতে মণ্ডীয় মদীয়। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে মিডিয়া ছিল আসিরিয়ার এবং আরমেনিয়া ও জগরস বা মার্গরস পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্বে, ইরানের উত্তরে ও উত্তরাংশে।

বর্তমান তুরস্ক ও আরমেনিয়ার প্রায় সীমান্তবর্তী 'ARAS' অরস বা আরস নদীটিই নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদে বর্ণিত অরময় বা অরমন নদী। তারি নাম হোতে হয়েছে অরুমনীয়া বা আরুমেনিয়া। মূলত একই অর অর্থাৎ লাংগল হোতে। আগেই তা বলেছি। অর শব্দের পরবর্তী অর্থ যাগ যজ্ঞ। কৃষি কর্মের সাহায্যে নদীতীরেই পুরাকাল হোতে যাগযজ্ঞাদি বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোত। একই মূল অর্থ হোতে 'অররত' বা 'অরোরত' পর্বতেরো নাম হয়েছে আরমেনিয়া ভূভাগেই। অররত পরে অররথ এবং সুমেরু বাবিলনের 'জাগ্‌গরথ' বা 'যাগ্‌গিরথ' সপ্তস্তরের। সাততলা স্বর্গীয় রথ পরম্পরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি। ইরাণ ভারত পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। আদিতে ভূ ভূব ও স্ব এই ত্রিভূবনের ধারণা সাততলা যাগ্‌গরথের প্রসাদে সপ্তস্বর্গের কল্পনায় রূপান্তরিত। ত্রি ত্রয় বা ত্রয়ী শব্দ ও সপ্ত শব্দ উভয়েরি আমাদের দেশে ও অন্যান্য প্রাচীন ভূভাগে বিশেষ ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। আরারত পর্বত যগে্‌গরস পর্বত আরাবল্লী পর্বতেরো। আরাকান বা অরকর্ণেরো। অরল বা আরল সাগরেরো। থেস্‌সালি বা তিষ্‌শালির অরগীশ্‌শ বা অরগীশ পর্যন্ত। অয়বেল অর ও বা আরব সবই একসূত্রে গাঁথা। নিঃসন্দেহে অরপ অব অর্থাৎ অপ শব্দ হোতে আরব শব্দের উৎপত্তি।

এই সূত্রে আর একটি নদীর নাম ঋগ্বেদে বর্ণিত ঘটনাগুলির এবং এই সব এলাকার নামগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ও খনিত তথ্যবস্তু প্রভৃতির ভিত্তিতে বিবেচ্য।

ঋগ্বেদের আদিম কালের এই নদীটির নাম 'রসা'। দশম মণ্ডলের হলেও ১০৮ সূক্তের জলন্ত ভাষায় বর্ণিত ঘটনা স্পষ্টই অতি প্রাচীন। সূক্তটির যুক্ত রচয়িতা ১১টি ঋকের। পণয়ঃ অসুরাঃ। সমরা দেবমী। ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ১১; সরমা দেবশুনী ঋষিকা পনয়ো—দেবতা। অর্থাৎ অসুর পনিরা ও 'দেবশুনী' সরমা যুগ্ম ঋষি ও ঋষিকা। উভয়েই উভয়কে দেবতা বলে প্রথামত সম্বোধন করে ঘটনাগুলি বলেছেন একই সূক্তে। প্রাচীন কাল হোতে বিভিন্ন পশুপক্ষীর নামে বহুনাম দেখা যায়। তারা সকলেই নর নারী। পশুও নয় দেবদেবীও নয়। ঋগ্বেদে দেবতা ও মানুষ বহু ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন ভাবে মিলে গেছে। তার প্রধান কারণ দেবতার নামে মানুষেরো নাম দেবার প্রথা। পিতৃ-পুরুষরা বিশেষত মরণের পরে সকলেই দেবতা। জীবিত কালেও।

সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী

সন্তোষকুমার অধিকারী

গান্ধী এবং সুভাষ—জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্টতম এই দুই নেতার কেউই স্বাধীনতার আলোককে উপভোগ করবার জন্যে বেঁচে থাকেন নি। একজন স্বাধীনতার প্রথম উষাকে রক্তাক্ত করে বিদায় নিলেন। যাঁরা এই দেশকে বিভক্ত ক'রে হানাহানি ও রক্তপাতের সূচনাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন সেই অনুচরদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই যেন গান্ধী বলিদান দিলেন নিজেকে। আর একজন অশান্ত বিপ্লবী ভারতের বাইরে এক অপরিচিত পরিবেশে চিরদিনের জন্যই নিরুদ্দেশ হলেন স্বাধীনতার ব্রাহ্মমুহূর্তে। গান্ধী স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও কংগ্রেসই ছিল তাঁর সকল কর্মের কেন্দ্র। আর একজন সুভাষ, কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, যদিও কোন সময়েই তিনি নিজেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধপক্ষ বলে ভাবতে চাননি।

গান্ধী ছিলেন বিবেকবাদী। তাঁর যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, ভারতের নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর কাম্য। তাই অহিংসা তাঁর শুধু অস্ত্র নয়, একমাত্র ধর্ম।

সুভাষ ছিলেন দুরন্ত জাতীয়তাবাদী। তাঁর সংগ্রাম বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসককে তাই তিনি শত্রু বলে জেনেছিলেন। অহিংসা তাঁর কাছে একটি বিশেষ অস্ত্র মাত্র। তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে যোদ্ধা যেমন অস্ত্রবদল করে, তিনিও তাই করেছিলেন। অহিংসাকে সরিয়ে রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে তিনি মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধান্বিত হননি।

গান্ধী ছিলেন ধর্মপরায়ণ দার্শনিক। সুভাষ বাস্তববাদী রাজনীতিক।

সাংবাদিক লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস্ তাঁর 'দি লাস্ট্ ইয়ারস অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকার চমৎকার ছবি এঁকেছেন। গান্ধী সম্পর্কে তাঁর অভিমত- "He was a religious reformer.........a man who could exercise almost hypnotic influence upon the most diverse of characters, and his main effect on them was to drain away any revolutionary fervour they might have had."

কংগ্রেসের কণ্ঠদেশে 'Ancient Mariner' কবিতার 'এ্যালবেট্রস' পাখির মতই তিনি ঝুলে থেকে তাকে বৈপ্লবিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন—এই হ'ল এডওয়ার্ড্‌সের অভিমত। "His response was to develop a system that might be called 'conscience in action' and, because it was successful, Cangress never became a truly revolutionary movement..........।"

গান্ধীর পরই তিনিই উল্লেখ করেছেন প্যাটেল ও নেহরুর। Gandhi chose his lieutenants with great care......তাঁদের একজন হলেন বল্লভভাই প্যাটেল।—Patel was not a thinker but a worker, অর্থাৎ প্যাটেল-এর কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল না, তিনি ছিলেন শুধু কর্মী। The other leader was Jawaharlal Nehru, a Harrow educated aristocrat with Fabian—Socialist ideas, যিনি ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত, বিশিষ্ট, অভিজাত, এবং ইংল্যাণ্ডের সোশ্যালিষ্ট দলের মতই সতর্ক সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন।

এরপরে গান্ধীর পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় তিনি লিখেছেন সুভাষচন্দ্রের নাম—Only one outstanding personality took a different and violent path, and, in a sense, India owes more to him than to any other man—even though he seemed to be a failure।

গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার বিবরণ সুভাষচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন তাঁর দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্ গ্রন্থে। "সেদিন অপরাহ্নের ঘটনার প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি স্মরণ করতে পারি। বম্বেতে গান্ধীজির বাসভবন মণিভবনে পৌঁছলাম। কার্পেট দিয়ে মোড়া একটি ঘরের ভেতরে আমাকে নিয়ে গেল। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সঙ্গী পরিবৃত হয়ে গান্ধীজি ঘরের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন।"

বলা বাহুল্য এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে। সুভাষ আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ করেছেন, কারণ দেশের সেবা এবং বিদেশী রাজার সেবা একই সঙ্গে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কল্পনা। লণ্ডন থেকে ফিরে তিনি বম্বেতে প্রথম নামলেন এবং গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—"আমি তাঁর পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝে নিতে চেয়েছিলাম; একটি একটি করে ধাপ এগিয়ে কি ভাবে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা তিনি ছিনিয়ে নিতে চান—সেই কৌশলের বিন্যাসকে। সেই উদ্দেশ্যে আমি একটির পর একটি প্রশ্ন করে চললাম এবং মহাত্মা তাঁর স্বভাবধৈর্যের সঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। আমি তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বুঝে নিতে চাচ্ছিলাম—

"প্রথম: কিভাবে কংগ্রেসের বিভিন্নমুখী কর্মধারা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে, অর্থাৎ ট্যাক্স না দেওয়ার সংগ্রামে পৌঁছোবে?

"দ্বিতীয়: ট্যাক্স না দেওয়ার আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ কিভাবে এই সরকারকে আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে? এবং

"তৃতীয়: এবং কিভাবে মহাত্মা একবৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?

(নাগপুর কংগ্রেসে এইরকম প্রতিশ্রুতিই মহাত্মা দিয়েছিলেন।)

"প্রথম প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দুটি প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিলেন, তাতে আমি একটুও আশ্বস্ত হতে পারিনি।"

সুভাষচন্দ্র জাতীয় সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক গান্ধীর সংগ্রাম-নীতির ব্যাখ্যাকে ধোঁয়াটে মনে করে হতাশ হয়েছেন। "Depressed and disappointed as I was, what was I to do?"

সুভাষচন্দ্র এবার ছুটেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। আর এখানেই তাঁর সংশয়ের নিরসন ঘটেছে। তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন দেশবন্ধুর। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—"During the course of our conversation I began to feel that here was a man who knew what he was about—who could give all that he had and who could demand from others all they could give............I felt that I had found a leader...... ।"

গান্ধীর নেতৃত্বে নয়, গান্ধীর নীতিতে সুভাষচন্দ্রের সংশয় ছিল। তাই কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়ে গান্ধীজিকে নেতা হিসেবে তিনি বরণ করেছেন, তবু সত্যকার সংগ্রামীর মত প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করেছেন গান্ধীজিকে বাস্তব রাজনীতির পথে টেনে আনতে। কিন্তু শুরুতে যা ছিল সংশয়, পরবর্তী কালে তাই দাঁড়িয়েছে মতান্তর, এমন কি রাজনৈতিক বিরোধে।

গান্ধীর দ্বিধান্বিত সংগ্রামনীতি শুধু সুভাষকে নয়, সেদিন বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সকলকেই, এমন কি দেশবন্ধু দাসকেও বিচলিত করেছিল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সারাভারতের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ একটি সামান্য ঘটনাকে (চৌরী চৌরী) কেন্দ্র করে গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। কারণ তাঁর বিবেকে আঘাত লাগল।

মাইকেল এড্ওয়ার্ড্স-এর বিশ্লেষক চোখে—"The British felt that they had little to fear from Gandhi himself...............so the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect—jailing him occasionally to keep up appearances—while they took much more positive action against terrorists...whom they really feared."

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ওপর সুভাষচন্দ্র অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন। তার পরিচয় গান্ধী সম্পর্কে এই সময়ে তাঁর যে মনোভাব ছিল তার থেকেই সুস্পষ্ট। গান্ধী-বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষ ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। একসময়ে তিনি লিখেছিলেন—"কংগ্রেসকে গান্ধীজি যে শুধু নিয়ম-কানুনের বাঁধনের মধ্যে আনলেন, তাই নয়; কংগ্রেসকে তিনি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কংগ্রেসকে তিনি সংগ্রামমুখী করলেন।.........দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধীজি অনেক গুরুতর ভুলের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—হিমালয়ের মত বিপুল ভুল—'Himalayan blunders'। আজও যে তিনি মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে বসে আছেন, তার কারণ এ নয় যে, তাঁর বিচারে ভুল ছিল না কিন্তু তাঁর সাফল্যও এত বেশী ছিল যে দেশবাসী তাঁর সমস্ত ভুল ক্ষমা করতে পেরেছে।"

কিন্তু হিমালয়ের মত বিপুল পরিমাণ ভুলই করলেন গান্ধীজি! আন্দোলন যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে তখন হঠাৎ তিনি জানালেন আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—"To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point, was nothing short of a natoinal calamity।" জনতার উৎসাহ ও উত্তেজনা যখন চরমমুহূর্তে পৌঁছেছে, তখন পশ্চাদপসরণের নির্দেশ-কে জাতীয় দুর্দৈব ছাড়া আর কোন ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায় না।

১৯২২-এর পর ১৯২৮ সালে দেশ আবার সংগ্রামমুখী হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালেই সুভাষচন্দ্রের রাজ-নৈতিক মতবাদ একটি সুস্পষ্ট আকার নিল। এবং গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর মতের বৈষম্যও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। এই সময়ে সাইমন কমিশন বয়কট নিয়ে দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা; অথচ গান্ধী সবরমতী আশ্রমে সুতোকাটায় ব্যস্ত। সুভাষ ছুটে গেলেন গান্ধীর কাছে। চেষ্টা করলেন তাঁকে টেনে আনতে। কিন্তু গান্ধীজির উত্তরে সুভাষ নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। গান্ধী বললেন—"আমি ত কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না"।

ডিসেম্বরে কলকাতা অধিবেশনে তরুণ সুভাষ গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে সোচ্চার করে তুললেন। কিন্তু গান্ধী মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবকেই গ্রহণ করালেন। সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর এই মতবিরোধ আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল লাহোর কংগ্রেসে। পূর্ণস্বাধীনতাকে অন্তিম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেও গান্ধী নির্দেশ দিলেন যে কর্মবিধির, তা হলো—

চরকায় সুতো কাটা
খাদির তৈরী বস্ত্র পরা এবং
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করা।

সুভাষের প্রস্তাব ছিল সমান্তরাল জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। সে প্রস্তাব উপেক্ষিত হল।

অর্থাৎ গান্ধী স্বাধীনতার সংগ্রামকে যখন চরকায় সুতো কাটা ও অস্পৃশ্যতার সমস্যায় কবর দিতে চাইছেন, তখন সুভাষ সক্রিয় পন্থা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত। সুভাষ তখন ভাবছেন, ভারতবর্ষে ঋষির অভাব কোনদিন হয়নি। কিন্তু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতার অভাব রয়েছে। দর্শনচিন্তার পথ থেকে স্বদেশচিন্তার পথে এবং নিষ্ক্রিয় নীতিচর্চার ছায়া থেকে প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পথে দেশকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মত সবল নেতৃত্বের প্রয়োজন।

১৯৩৩ সালে কারাগার থেকে অসুস্থ অবস্থায় সুভাষ-চন্দ্রকে ইউরোপ যেতে হ'ল চিকিৎসার জন্য। ১৯৩০ সাল থেকেই সুভাষকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরুইন চুক্তি, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, দেশব্যাপী সংগ্রাম এবং যথারীতি গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনাগুলি ঘটে। সুভাষ নিরুপায় বেদনায় ছটফট করছেন। অস্পৃশ্যতা দূরী-করণের জন্য গান্ধীজির হঠাৎ আবেগকে তিনি বর্ণনা করলেন এইভাবে—যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে

সেনাধ্যক্ষ তাঁর সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কুয়ো খুঁড়তে। সুভাষ বললেন,—এক সময়ে তিনিই দেশকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সংগ্রামের পথে কিন্তু এখন সংগ্রামের পথে তিনিই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে সুভাষ বললেন,—"আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই, যে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই এখন নতুন ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। কংগ্রেসকে নতুন ভাবধারায় সংগঠিত করবার জন্য নেতৃত্বের বদল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, তাঁর জীবনব্যাপী নীতিকে পরিত্যাগ করে গান্ধী নতুন কর্মপথ বেছে নিতে পারবেন, এমন আশা করা অসংগত।..........."

সুভাষ বললেন,—"গোলটেবিল বৈঠকে কেবল সময়ের অপচয় করা হয়েছে। শুধু আলোচনার মাধ্যমে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নজির ইতিহাসে নেই। মুক্তির জন্যে ভারতবাসীকে রক্তদানের ব্রত নিতে হবে। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।"

১৯৩৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্" গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র গান্ধীচরিত্রের যে আলেখ্য রচনা করেন, তার মধ্যেই তাঁর মনোভাবও স্পষ্ট। সুভাষচন্দ্র গান্ধীর প্রশস্তি গেয়ে বললেন—"ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মুখ্যতঃ তাঁরই সৃষ্টি। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রও তাঁর রচনা। আগে যা ছিল শুধুমাত্র একটি বক্তৃতাযন্ত্র, গান্ধী তাকে পরিবর্তিত করলেন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে।......তবু যদিও তিনি পুরোমাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রয়োজনমত বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না।

..তাই স্বরাজ আজও দুরস্বপ্নই রয়ে গেল।.........কিন্তু পবিত্র-চরিত্র গান্ধী তাঁর এত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বরাজ অর্জনে ব্যর্থ হলেন কেন?

"কারণ নেতার শক্তি ত তার জনপ্রিয়তায় নয়; সে শক্তি নির্ভর করে চরিত্রের দৃঢ়তায়।...তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ, তিনি তাঁর নিজের দেশের মনকে যতখানি বুঝেছেন তার প্রতিপক্ষের হৃদয়কে ততখানি বুঝতে পারেননি। তিনি ব্যর্থ কারণ, তিনি তাঁর হাতের সবগুলি তাসই প্রতিপক্ষের টেবিলে বিছিয়ে দেন। কিন্তু রাজনৈতিক যুদ্ধে কূটনীতিকে বাদ দিয়ে জয়লাভ করা অসম্ভব। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি সফল হননি, কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী স্বার্থচিন্তাকে আপাতদৃষ্টিতে একতার বন্ধনে টানতে চেয়েছেন। ফলে রাজনীতির সংগ্রাম আরও দুর্বল হয়েছে। সবশেষে, তাঁর ব্যর্থতার কারণ, গান্ধীজির মধ্যে দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটেছে। একদিকে তিনি দাসত্বে বদ্ধ জাতির নেতা, অন্যদিকে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে নীতিধর্মের প্রচারক হয়ে দাঁড়াতে চান। এই দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের জন্যই তিনি কখনও ইংরাজের চরম শত্রু—(চার্চিল) কখনও বা ইংরাজশাসকের শ্রেষ্ঠ পুলিশম্যান—(মিস এলেন উইলকিনসন।)

১৯৩৪ সালে হঠাৎ সুভাষচন্দ্র ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র নিজেকে নিয়োজিত করলেন কংগ্রেস ও দেশের মধ্যে আপষ-বিরোধী মনোভাবকে গড়ে তুলতে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পর্যটন করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষ নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, আর একটি মহাযুদ্ধের কাল এগিয়ে এসেছে। অসাধারণ দূরদর্শী সুভাষ এও বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধে ব্রিটিশ দুর্বল হয়ে পড়বে। ব্রিটিশকে আঘাত করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

গান্ধীজি সুভাষের এ' মনোভাবে খুশী হলেন না। তিনি ধরে আছেন যে, জাতীয় আন্দোলনের সময় এটা নয়। তিনি চাচ্ছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ায় আসতে। কাজেই সুভাষের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি তাঁকে বিপর্যস্ত করল।

আর একদিক থেকেও মতবিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। গান্ধী খাদিকেন্দ্রিক গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের

জন্ম তাঁর জীবন নিয়োগ করেছেন। অন্যদিকে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের প্রতি তাঁর নিদারুণ বিতৃষ্ণা। আর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে "দি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি"র সৃষ্টি করলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে শিল্পোন্নতির কাজকে ত্বরান্বিত করা। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন দ্রুত যন্ত্রশিল্পের প্রসার।

কাজেই ১৯৩৯ সালে গান্ধী পট্টভি সীতারামায়াকে তাঁর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আশীর্বাদ জানালেন। কিন্তু সুভাষ পট্টভিকে পরাজিত করে ত্রিপুরি কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজি অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন। স্বভাবধৈর্য্য তাঁর ভেঙ্গে গেল। গান্ধীজি জানালেন—"পট্টভির পরাজয় আমারই পরাজয়......... যাহা হউক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।........."

১৯৩৯ সালে মার্চ মাসে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব আনলেন যে, অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া হোক। চরম পত্রে ছ'মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে দাবি জানানো হবে। ব্রিটিশ এ দাবি মানবে না, কাজেই চরম আন্দোলনের জন্যও এখন থেকেই প্রস্তুত নিতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন গান্ধী, গান্ধীকে সমর্থন করলেন নেহরু। শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'ল। ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে, সুভাষচন্দ্র দেখলেন, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কেউই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। এমন কি সুভাষচন্দ্রের নামে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্নাম ছড়ানো হ'তে লাগল। ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারেও সেই অসহযোগ। সুভাষ গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েও সক্ষম হলেন না। অবশ্য তাঁর চিঠির উত্তর দিলেন গান্ধী—

"............তুমি যে মত ব্যক্ত করেছ তা আমার এবং অন্যান্যদের মতের এত বিপরীত যে, আমি দুইমতের ব্যবধান ঘোচানোর কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয়--কোন রকম মিশ্রণ না ঘটিয়ে এই ধরণের চিন্তাধারা দেশের সামনে তুলে ধরা উচিত। সততার সঙ্গে তা করা হ'লে কোন রকম তিক্ততা দানা বাঁধবেই বা কেন, আর তা গৃহযুদ্ধেই পর্য্যবসিত হবে কেন—আমি বুঝতে পারছি না।............

"তুমি বলেছ দেশ এখন যতটা অহিংস, এমন আর কোনদিন ছিল না। এ সম্পর্কে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বায়ুতে আমি শ্বাস গ্রহণ করি, তাতে আমি হিংসার গন্ধ পাচ্ছি। তবে হিংসা একটা সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসার একটি মন্দ দিক।............

"এই অবস্থায় আমি অহিংস গণসংগ্রামের পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি না।"

ওপরের চিঠিটি লেখেন গান্ধী এপ্রিল মাসের ২ তারিখে। গান্ধীর অনুগামী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ অসহযোগিতায় বাধ্য হয়ে সভাপতির পদ থেকে এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে সুভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন।

ভূশণ্ডির প্রায়োপবেশন

সন্তোষকুমার ঘোষ

অনন্যোপায় হয়ে ভূশণ্ডি শেষটায় হিমালয়ে এসে হাজির হয়। তপস্যা-টপস্যায় আর যে দেবতাদের টনক নড়ানো যায় না—তা ও ভালরকমই জানে। তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভের মতলবেশ শণ্ডি তাই চরমপন্থাই অবলম্বন করেছে।—না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরবে বলে প্রচণ্ড গোঁ ধরে বসে আছে। উদ্দেশ্য—খোদ সৃষ্টিকর্তার টনক নড়ানো।

কলিযুগ পড়ার পর থেকেই সিকিপেটা করে খেয়ে কোনরকমে দিন কাটাছিল বেচারী। গোঁ ধরা অবধি একেবারে নিরম্বু উপোস চলছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—কেটেই চলেছে। সৃষ্টিকর্তা চুলোয় যাক—কোন একটা দেবদূতটুতের টিকিরও পাত্তা নেই। এদিকে ক্ষীণ হতে হতে ওর নাড়ীও ক্রমশ নিস্পন্দ হয়ে আসছে।

নিতান্ত বেকুব এক যমদূত অক্কা পেয়েছে ভেবে ভুল করে ওর ঠ্যাং ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বসল। ভূশণ্ডি খ্যাঁক্ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। খিঁচিয়ে বললে—তুই কোন্ আক্কেলে আমার গায়ে হাত দিস রে হতভাগা! আমি অমর—সে খেয়াল আছে? যা, তোদের বড়কর্তাকে পাঠিয়ে দিগে যা।

বেকুব এই যমদূতটাই গিয়ে চিত্রগুপ্তকে খবরটা দেয়। বৃদ্ধ চিত্রগুপ্তের এখন পদে পদে বিস্মরণ হয়। পদে পদে সংশয় জাগে। রেজিষ্টার বই খুলে দেখেন—অশ্বত্থামা, কৃপ, বলি, ব্যাস, বিভীষণ, হনুমান—এইসব চিরজীবীদের সঙ্গে ভূশণ্ডিরও নাম রয়েছে বটে। উনি 'ভালো জ্বালা' বলে উঠে পড়ে বড়কর্তা অর্থাৎ যমরাজের ঘরে গিয়ে খবরটা দিলেন। ব্যাপারটা শোনামাত্রই বড়কর্তার মেজাজ গেল চড়ে। বেশ কড়া গলায় বললেন—দিন দিন আপনার ভীমরতি হচ্ছে নিবন্ধকমশাই। অমর যারা—তাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের দপ্তর আবার কবে মাথা ঘামিয়েছে? এ সম্পর্কে যা-কিছু করণীয়—ব্রহ্মলোকের। খবরটা সরাসরি সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।

অতঃপর যমপুরী থেকে খবরটা ব্রহ্মলোকে চালান গেল। খবরটা পেয়েই পিতামহ ব্রহ্মাও প্রথমটায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'খেলে কচু'—বলে খিঁচিয়ে উঠে দপ্তরের মুখ্যনির্বাহককে ডেকে পাঠালেন। মুখ্যনির্বাহকমশাই সামনে আসতেই বললেন—অমর ভূশণ্ডিটা হঠাৎ মরতে বসেছে। এ তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার দেখছি হে! তা যম হতভাগা মরতে খবরটা এ-চুলোয় পাঠালে কেন? এতো বিষ্টুর দপ্তরের ব্যাপার। যত সব—বলে বিড়বিড় করে উনি খানিকটা স্বগত বকলেন। খানিক পরে বললেন—এই মুহূর্তেই বৈকুণ্ঠে খবরটা পাঠিয়ে দাও। সেই সঙ্গে এই অঘটনের জন্যে বিষ্টুর কাছে কৈফিয়ত তলব করো।

ভগবান বিষ্ণু খবরটা পেয়েই চমকে উঠলেন। ত্রিকালদর্শী কাক-ভূশণ্ডিটার আক্কেল বলিহারি! বেটা অমর—অথচ মরতে বসেছে। তাজ্জব ব্যাপার! উনি সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করলেন। দেবর্ষি আসতেই খবরটা শুনিয়ে বললেন—তড়িৎঘড়ি একটা ব্যবস্থা করতে হবে দেবর্ষি। পিতামহ প্রজাপতি রেগেমেগে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি তাড়াতাড়ি হিমালয়ে যান। ভূশণ্ডির ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্ত করে আসুন। ব্রহ্মলোকে যা-হ'ক একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে তো? না হলে—বুড়ো খ্যাপাই হয়ে ঘন ঘন কৈফিয়ত চাইতে থাকবে। জ্বালিয়ে খাবে।

অতঃপর দেবর্ষি ঢেঁকিতে চড়ে হিমালয়ে এসে

হাজির হলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন—নিতান্ত বেঁটেখাটো একটি চুড়োর মাথায় ভুশণ্ডি চোখ বুজিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বরফে বরফে চারদিক ঢাকা। বিনা খড়মে কোনখানে পদার্পণ করবার উপায় নেই। তাছাড়া হাড়ভাঙা ঠাণ্ডায় দাঁতকপাটি লেগে যাবার যোগাড়। দেবর্ষি কোন রকমে ভুশণ্ডির কাছাকাছি গিয়ে ঢেঁকি থেকে অবতরণ করলেন। পায়ের খড়মের শব্দ পেয়েই ভুশণ্ডি চোখবোজা অবস্থাতেই বললে—কোন্ হতভাগা এলি রে আবার?

দেবর্ষি অল্প রুক্ষস্বরে বললেন—চোখ চেয়ে আগে দেখ ভুশণ্ডি। অন্য কেউ নয়—আমি দেবর্ষি নারদ। বৈকুণ্ঠ থেকে আসছি। খোদ ভগবান্ বিষ্ণু পাঠিয়েছেন।

ভুশণ্ডি চমকে চোখ মেলে দেখে—দেবর্ষিই তো বটে! তদ্দণ্ডেই ঠোঁটে জিব কেটে বললে—দণ্ডবৎ হই প্রভু। অপরাধ নেবেন না কোনরকম। আপনি এসেছেন যে—তা ঠিক মালুম হয় নি।

দেবর্ষি বললেন—আমড়াগাছি রাখো ভুশণ্ডি। তাড়াতাড়িতে পাতলা নামাবলীখানা কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে এখানে এসে পড়েছি। ঠাণ্ডায় আমার বুক গুরগুর করছে। বুকে-পিঠে সর্দি বসলে এবয়েসে আর দেখতে হবে না। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাই আমি। যা জিজ্ঞেস করি—চটপট তার উত্তর দাও।

ভুশণ্ডি দু'পায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে—যথা আজ্ঞা প্রভু। কিন্তু আগে একছিটে চরণামৃত দিন। খেয়ে খানিকটা চাঙ্গা হই। নির্জলা উপোস করলেও চরণামৃতে দোষ নেই শুনেছি।

চরণামৃত—অর্থাৎ পা-ধোয়া জল। কিন্তু এখানে জল কোথায়! সবই তো জমে বরফ হয়ে আছে। উনি কোন রকমে বরফের উপর পায়ের বুড়োআঙুলটা একবার ঠেকালেন। ভুশণ্ডি জিব দিয়ে সেখানটা চাটা মাত্রই বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। দেবর্ষি তখন ভুরু কুঁচকে বললেন—তুমি হঠাৎ মরতে বসেছ কেন হে?—ব্যাপার কি?

ভুশণ্ডি সঙ্গে সঙ্গে বললে—এ অধমকে অমর করে রাখা হয়েছে, কিন্তু আহারের কোন রকম ব্যবস্থা নেই। বেঁচে থাকব—অথচ খিদেয় নাড়ী চুঁই-চুঁই করতে থাকবে,—সৃষ্টিকর্তার এ কেমন ব্যবস্থা—বলুন? তাই না-খেয়ে মরব বলে ঠিক করেছি।

দেবর্ষি বিস্ময়ের সুরে বললেন—সে কি! ফলপাকুড় পোকামাকড় আর পশুপাখীতে তো দুনিয়া ঠাসা। আমিষ নিরামিষ দু'রকম খাদ্যেরই তো ঢালাও ব্যবস্থা করা আছে। তোমার আবার আহারের ভাবনা কি হে?

ভুশণ্ডি সবিনয়ে বললে—কোন্ যুগের কথা বলছেন প্রভু? কতকাল পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি সে খেয়াল আছে? গাছপালা থাকলে তো ফলপাকুড় থাকবে? সে সব কেটেকুটে কবে সাফ করে ফেলেছে। তাছাড়া—রক্তমাংসখেগো ধাত আমার। নিরামিষ খাদ্য কোনকালেই মুখে রোচে না—জানেন তো? পোকামাকড়রাও সব সাবাড় হয়ে আসছে। বিছুমিছু থাকলেও—নিতান্ত নিকৃষ্ট জীব ওরা। খাদ্য হিসেবে একেবারে অচল। পশুপাখীদের অবস্থাও তথৈবচ। বিলকুল সাবাড় হয়ে এসেছে। চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও তাদের নমুনা খুঁজে পাবেন না।

দেবর্ষি বিস্ময়ের সুরে বললেন—সৃষ্টির সবকিছুই তো অঢেল আর অফুরন্ত হে! তা এতসব কি করে সাবাড় হল হে?

ভুশণ্ডি বললে—সৃষ্টিকর্তাকে এখন শুধু মানুষ গড়ার বাতিকে পেয়েছে নিশ্চয়ই প্রভু। দুনিয়া জুড়ে গিজগিজ করছে শুধু মানুষ আর মানুষ। তারাই এই অপকর্ম করেছে প্রভু। কেটে কেটে, মেরে মেরে আর খেয়ে খেয়ে—সব সাফ।

দেবর্ষি বললেন—তুমি তো আগে দৈত্য-দানব, রাক্ষস-বানর—এসবের রক্তমাংসও হামড়ে পড়ে খেতে হে?

ভুশণ্ডি বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। মিথ্যে বলব না। সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধল। এলাহি কাণ্ড।

পেট পুরে দৈত্যদের রক্তমাংস খেয়েছি। ত্রেতায় রাম-রাবণের যুদ্ধ হল। সেও ভুরিভোজের ব্যাপার। রাক্ষসদের রক্তমাংস খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল। হাজার হোক—খাঁটি জিনিসের গুণই আলাদা। সুখসেব্য না হ'ক—সহজপাচ্য ছিল প্রভু। কোন রকম হজমের গোলমাল হয়নি। তারপর দ্বাপরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধল। সেই প্রথম মানুষের মাংস চাখলুম। খাসা স্বাদ। খাঁটি মানুষের রক্তমাংস—আহা, যেন অমৃত। তবে সেবার ভুল করে শকুনিমামা আর দুঃশাসনের রক্তমাংস গিলে কিন্তু কাল করে বসে-ছিলুম প্রভু। সে-কী বিদকুটে স্বাদ রে বাবা। হরদম বমি করে করে হয়রান। শেষটায় পেট ছেড়ে দিলে। বেশ দিনকতক অতিসারে ভুগতে হয়েছিল।

দেবর্ষি বললেন—ভুরিভোজন না হলে তোমার বেশ তৃপ্তি হয় না—দেখছি। তা এ যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ কি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ভুশণ্ডি?

ভুশণ্ডি বললে—বন্ধ হবে কি প্রভু। হাজারগুণ বেড়েছে। তাছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি—এ তো হরদম লেগেই আছে। পথে ঘাটে এখন গণ্ডাগণ্ডা বেওয়ারিশ মড়া মেলে। হলে কি হবে। এখনকার মানুষের রক্তমাংস একেবারে অখাদ্য। ঠোঁট ঠেকাতে না ঠেকাতেই গা পাক দিয়ে ওয়াক উঠতে থাকে। কাজেই কি খাই বলুন?

দেবর্ষি বললেন—ভ্যালা ফ্যাসাদ। কিন্তু মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব হে? অতি-উৎকৃষ্ট উপাদানে তৈরি হয় শুনেছি। তাও যেকালে মুখে রুচছে না তোমার—নিশ্চয়ই অগ্নিমান্দ্যে ভুগছ তুমি। অবিলম্বে অশ্বিনী-কুমারদের কাছে যাও ভুশণ্ডি। ভাল করে চিকিৎসা করাও।

ভুশণ্ডি সঙ্গে সঙ্গে বললে—অগ্নিমান্দ্য আমার শত্তুরদের হোক। তা নয় প্রভু। সত্যি কথা বলতে কি—সৃষ্টির বাজে বেয়াড়া গলদ ঢুকেছে। কলিযুগ পড়ে অবধি—যতসব বাজে আর ভেজাল মাল দিয়ে মানুষ গড়া হচ্ছে প্রভু। এখনকার মানুষের রক্তমাংস অখাদ্য। আপনি সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে আমার হয়ে একটু দরবার করলে কৃতার্থ হব প্রভু।

দেবর্ষি বললেন—আমি সৃষ্টিকর্তার দপ্তরের লোক নই ভুশণ্ডি। তোমার অভিযোগটা কি—স্পষ্ট করে বল। আমি বৈকুণ্ঠেশ্বরকে জানিয়ে দেব—তিনি যা হয় করবেন।

ভুশণ্ডি বিনীতভাবে বললেন—আজ্ঞে মানুষের রক্ত-মাংসই এখন আমার একমাত্র খাদ্য। সেই খাদ্যে ভেজাল ঢুকেছে প্রভু।

দেবর্ষি বললেন—খাদ্যে ভেজাল বলছ।—অর্থাৎ মানুষে ভেজাল। আচ্ছা বেশ, এছাড়া তোমার আর কোনরকম অভিযোগ থাকে তো—তাড়াতাড়ি বল।

ভুশণ্ডি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বললে—আজ্ঞে না প্রভু। আর কোন অভিযোগ নেই।

দেবর্ষি বললেন—ঠাণ্ডায় আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। দাঁতকপাটি লাগল বলে। আমি তবে আসি ভুশণ্ডি।

ভুশণ্ডি সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে দেবর্ষির পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—তাড়াতাড়ি এর একটা বিহিত হবে তো প্রভু? না,অনন্ত-কাল ধরে শুকিয়ে শুকিয়ে দড়ি হতে হবে আমাকে।

তাড়াতাড়ি ঢেঁকিতে উঠে পড়ে দেবর্ষি আশ্বাস দিয়ে বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক ভুশণ্ডি। বৈকুণ্ঠে পৌঁছেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের কাছে তোমার অভিযোগ আর আরজি পেশ করব। কথা দিচ্ছি।

চকিতের মধ্যে দেবর্ষি হিমালয় ছেড়ে রওনা হলেন। কিন্তু ওঁর চিরকেলে স্বভাব যাবে কোথায়। সোজা বৈকুণ্ঠে না গিয়ে সারা ত্রিভুবনে ঘুরে ঘুরে খবরটাকে বেশ ফলাও করে চাউর করতে লাগলেন উনি। বৈকুণ্ঠে ফিরলেন—প্রায় একযুগ পরে।

দেবর্ষির মুখ থেকে ভুশণ্ডির ব্যাপারটা সব শুনে বৈকুণ্ঠেশ্বর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। যাক, অভাবনীয় ব্যাপারটার জন্যে তাঁর দপ্তর তা হলে আদৌ দায়ী নয়। ভুশণ্ডির একমাত্র অভিযোগ—খাদ্যে ভেজাল। অর্থাৎ

মানুষে ভেজাল। সুতরাং দোষ-ত্রুটি গলতি—যা কিছু সবই ওই সৃষ্টিকর্তার দপ্তরের। এখন ঠ্যালা বুঝুক বুড়ো।

অনতিবিলম্বে বৈকুণ্ঠ থেকে ব্রহ্মলোকে তদন্তের রিপোর্ট এসে পৌঁছল। সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের আটদিক্ থেকেও 'ছি-ছি' ধ্বনি এসে পিতামহের আটটা কানেই নাগাড়ে ধাক্কা দিতে শুরু করে দিলে।

খোদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেই ঘোরতর অভিযোগ। অভিযোগ শুনেই পিতামহের মেজাজে আগুন ধরে গেল। নারদ ছাড়া বাকি সব উপ-প্রজাপতিদেরই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করলেন উনি। খাস দপ্তরের পদস্থ দেবতারাও হাঁক শুনে ছুটে এলেন। সকলে ওঁর খাস কামরায় এসে সমবেত হতেই পিতামহ বললেন—আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। এখন নাকি সেরেফ ভেজাল-মাল দিয়ে মানুষ গড়া হচ্ছে। ব্যাপারটা কি সত্যি?

উপ-প্রজাপতিরা—অর্থাৎ সৃষ্টির কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্তামশাইরা মাথা নেড়ে নেড়ে সমস্বরে বললেন—কখনই না। আমরা আপনার নির্দেশ মাফিক নিখুঁতভাবে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

চতুরানন রেগেমেগে চিৎকার করে উঠলেন। চার-মুখ দিয়ে সমস্বরে বললেন—নিখুঁতভাবে চলছেইযদি—তা হলে অমর ভূশণ্ডিটা না খেয়ে মরতে বসেছে কেন? বিষ্টুর কাছ থেকে এ ধরণের অভিযোগ এল কেন? ত্রিভুবনের সবাই 'ছি-ছি' করে আমাকে দুষছে কেন?

উপ-প্রজাপতিরা নির্বাক হয়ে রইলেন। উনি মুখ্যনির্বাহকমশাইকে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন—অবিলম্বে একটা তদন্ত কমিশন বসাও। আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চাই। ত্রিভুবনময় আমার বদনাম রটেছে বিষ্টুর দপ্তর থেকেই খবরটা বেরিয়ে চারদিকে চাউর হয়েছে নিশ্চয়ই। যাই হ'ক—দোষ প্রমাণিত হলে আমি সৃষ্টিকর্তার পদ ছাড়তে রাজী আছি।

পিতামহের নির্দেশে তদ্দণ্ডেই কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাও হল তাঁদের। দেবলোক থেকে দুজন হোমরাচোমরা-গোছের রসায়নবিৎ আর পদার্থবিদ্যাবিৎ এলেন। গোলোক থেকে দুজন মনোবিদ্যাবিৎ আর জীববিদ্যাবিৎ এলেন। ব্রহ্মলোকের দুজন ব্রহ্মাণ্ডবিশ্রুত শারীরবৃত্তবিৎ আর নৃতত্ত্ববিৎ এলেন। আর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবার জন্যে শিবলোক থেকে একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ প্রমথ এসে হাজির হলেন। বেশ ঘটা করেই কমিশনের কাজ শুরু হল।

বর্তমানে কি কি উপাদানে মানুষ তৈরি হচ্ছে—কমিশন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেহ ছাড়া মানুষের মন, বিবেক ইত্যাদি বানাবার জন্যে বরাবরই ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোমের সঙ্গে আরও কয়েক রকমের মাল মিশেল দেওয়া হয়। সব রকম কাঁচা মালই যথারীতি পরীক্ষা করে করে দেখা হতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ দারুণ রকমের গলদও বেরিয়ে পড়ল। ভূশণ্ডির অভিযোগ নিতান্ত বাজে নয়। খাঁটি উপাদান দিয়ে এখন আর একটিও মানুষ গড়া হচ্ছে না। দৈত্য-দানব, যক্ষ-রক্ষ, ভূত-প্রেত, জন্তু-জানোয়ার, পোকামাকড় ইত্যাদি বানাবার যত সব নিকৃষ্ট কাঁচামাল দিয়ে এখন পাইকারী হারে মানুষ বানানো হচ্ছে। সর্বনেশে ব্যাপার হচ্ছে—ব্রহ্মলোকের বাইরে থেকে শয়তান বানাবার যত সব জঘন্য কাঁচামাল এখন টন টন আমদানি করা হচ্ছে। এই মালই এখন ভূরি পরিমাণে মানুষের মধ্যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে।

কমিশনের রিপোর্ট পেয়েই পিতামহ ব্রহ্মা আগুন হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপ-প্রজাপতিদের আবার স্মরণ করলেন উনি। ওঁর খাসদপ্তরের উচ্চপদস্থদেরও হাঁক দিলেন। সবাই আসতেই চার মুণ্ড নেড়ে নেড়ে পিতামহ সকলকে কমিশনের বক্তব্য শোনালেন। তারপর ঘূর্ণিতলোচনে বললেন—যা-তা মাল দিয়ে গাদা গাদা মানুষ বানানো হচ্ছে। এ অপকর্মের জন্যে দায়ী কে বা কারা? আমি অবিলম্বে তা জানতে চাই। অভি-যোগপত্র দিয়ে এখনই আমি তাদের বরখাস্ত করব।

সকলের পরামর্শে আবার কমিশন বসান হল। এবার একজনমাত্র দিক্‌পাল দেবতাকে নিয়ে কমিশন বসল।

তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। পিতামহের নির্দেশ। মহাতৎপরতার সঙ্গে খোঁজাখুঁজির পর্ব শুরু হয়ে গেল। কাগজপত্র ঘাঁটকে পাঁটকে, পুঁথিপত্র নাড়ানাড়ি করে, হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া আর হুঁয়াকা মাটি হিঁয়া করে সারা মহাফেজখানাকে চষে ফেলা হল। শেষ কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ সাপ বেরিয়ে পড়ল। দেখা গেল—অন্য কেউ নয়—দায়ী পিতামহ প্রজাপতি স্বয়ং। কলিযুগের গোড়াতেই উপপ্রজাপতিরা একবাক্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন—মানুষ গড়বার মত খাঁটি কাঁচামাল আর আদৌ মিলছে না। মজুদ মালও ফতুর। এদিকে দুনিয়া জুড়ে চারদিকে পালপাল মানুষ সরবরাহ করতে হচ্ছে। চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অতএব—উপায় কি? পিতামহই ঢালাও হুকুম দিয়েছিলেন তখন।—খাঁটি মালের অভাব। সুতরাং দৈত্য-দানব, যক্ষ-রক্ষ, ভূতপ্রেত, জন্তুজানোয়ার, পোকামাকড়——ইত্যাদি বানাবার কাঁচা মাল দিয়েই মানুষ বানাও। দরকার হলে ব্রহ্মলোকের বাইরে থেকে শয়তান বানাবার সস্তার মালও আমদানি করা যেতে পারে। লিখিত হুকুমনামার তলায় পিতামহের হাতের দেবঅক্ষরের দস্তখতও জ্বলজ্বল্ করছে।

ব্যাপারটা শোনামাত্রই পিতামহের চার-চারটে মুখই কেলে হাঁড়ির মত হয়ে উঠল। কমিশনের কর্তা মুচকে হাসলেন। উচ্চপদস্থরা মুখ টিপে টিপে হেসে নিলেন। উপ-প্রজাপতিরাও ঘাড় বেঁকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে চতুরানন ক্ষেপে রেগে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। চার মুখ দিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে বললেন—আমি এই মুহূর্তেই সৃষ্টিকর্তার পদ ছেড়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মলোক ছেড়েও জন্মের মত চলে যাচ্ছি আমি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গোল্লায় যাক।—বলতে বলতে পিতামহ হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠলেন। চারমাথা ফুঁড়ে লকলক করে অগণ্য অগ্নিশিখা ফুঁসে উঠল। শরীরের চারদিক থেকের প্রচণ্ড গর্জনে অগ্ন্যুদ্-

গান শুরু হল। দেখতে দেখতে ব্যোম মহাব্যোম আগুনের শিখায় শিখায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অগ্নিময় হয়ে ছারেখারে যাবার উপক্রম হল। স্থাবর-জঙ্গম আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে কাঁপতে লাগল। ত্রিভুবনের চারিদিক্ থেকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। কল্লান্ত উপস্থিত ভেবে—উপ-প্রজাপতিরাও চোখ বুজিয়ে তারকব্রহ্ম নাম জপতে লাগলেন।

ব্যাপার কি—জানবার জন্যে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন প্রভৃতি চাঁইচাঁই দেবতারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণু ছুটে এলেন। শিবলোকে মহেশ্বরেরও নেশা ছুটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনিও এসে হাজির হলেন।

উপ-প্রজাপতিদের মুখ থেকে সব ব্যাপার শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু আর কালক্ষেপ করা চলে না। সৃষ্টি যায় যায়। তাড়াতাড়ি সবাই নতজানু আর বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সমবেত কণ্ঠে পিতামহ প্রজাপতির বন্দনা শুরু করে দিলেন।—

হে আদিপ্রজাপতি—কৃত অপকর্মের জন্ম আপনি আদৌ দায়ী নহেন।

হে লোকপিতামহ—আপনি যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহা হয় অহিফেনের প্রভাবে—নতুবা তন্দ্রার ঘোরে।

হে চতুরানন—আপনি কদাচ অনাসৃষ্টি অথবা অঘটনের কারণ হইতে পারেন না।

হে কমলাসন—আপনি চিরনির্মল এবং অপাপবিদ্ধ।

হে স্বয়ম্ভু—আপনি অভিমান ত্যাগ করুন।

হে হিরণ্যগর্ভ—আপনি ক্রোধ সংহরণ করুন।

হে পদ্মযোনি—আপনি প্রকৃতিস্থ হউন।

বন্দনামন্ত্র শুনতে শুনতে পিতামহের প্রজ্বলন্ত দেহের প্রচণ্ড উত্তাপ ক্রমশ শীতল হতে শুরু করল। পুঞ্জীভূত অভিমান ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে ক্রোধবহ্নিও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হল। উনি আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন।

বিষ্ণুই প্রস্তাব করলেন—ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া হক পিতামহ।

মহেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটিকে সমর্থন করলেন। দিক্‌পাল দেবতরাও মাথা নেড়ে নেড়ে সম্মতি জানালেন।

অতঃপর ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া অবস্থাতেই পড়ে রইল। এদিকে হিমালয়ে ভুশণ্ডি এখনো প্রায়োপবেশনে রয়েছে। নাভিশ্বাস উঠছে। খাবিও খাচ্ছে। কিন্তু অমর বলে বেচারী কিছুতেই মরতেও পারছে না।

সঞ্চয়ন

লেনিনগ্রাডের হারমিটেজ শিল্পকলা সংগ্রহশালা

লেনিনগ্রাডের এই শিল্পকলা সংগ্রহশালায় পঁচিশ লক্ষ শিল্পকলা কার্য্যের নিদর্শন রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে আছে ১৫,০০০ ক্যানভাসে অঙ্কিত চিত্র। ১২,০০০ ভাস্কর্য্যকলার রূপায়ণ এবং ৬০,০০০ রেখাঙ্কন ও অপরাপর চিত্রকার্য্য। এই পঁচিশ লক্ষটি সংগ্রহ-কৃত কলা কার্য্যের নিদর্শন ৩০০ শতটি বিরাট কক্ষে রক্ষিত আছে। যে বিরাট প্রাসাদে এই সকল কক্ষ আছে পূর্ব্বকালে তাহার নাম ছিল উইনটার প্যালেস বা শীতকালের রাজভবন। এই প্রাসাদের চতুর্থ তলায় পাঁচটি কক্ষে বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্পকলার সংগ্রহ সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ইহা ১৯৫০ খৃঃ অব্দে আরম্ভ করা হয়। ৭০০ শতটি কলাকার্যের নিদর্শন এই ভারতীয় অঙ্গে এখন প্রদর্শিত হইতেছে। আরও ২০০০টি প্রদর্শনযোগ্য কলা কার্যের নিদর্শন হারমিটেজের সংগ্রহশালার অন্যত্র রক্ষিত আছে। সেগুলি ক্রমে ক্রমে সাধারণকে দেখাইবার জন্য বাহির করা হইতেছে। ভারতীয় প্রদর্শনীতে যে সকল শিল্পকলা কার্য্যের নানান বস্তু আছে সেগুলির মধ্যে অনেক কিছুই ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কার্য্য। সোভিয়েট দেশীয় ব্যক্তিগণ ভারতীয় শিল্পকলা বিশেষ পছন্দ করেন। তাহা গালিচা,শাল,খোদাই কাজ, তরোয়াল বা চিত্রকার্যা যাহাই হউক না কেন। হারমিটেজ সংগ্রহশালার ভারতীয় অঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইলেন শ্রীমতী তাতিয়ানা গ্রেক। তিনি ইতিহাস চর্চ্চার জন্য খ্যাতনামা এবং ভারতের কৃষ্টি সম্বন্ধে বহু অনুশীলন কার্য্য করিয়াছেন।

রুশিয়ায় বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশীয় অভিজাতদিগের অনেকেরই বহু শিল্পকার্য্য সংগ্রহ ছিল। এই সংগ্রহশালাতে সেই সকল বস্তু অনেক এখন প্রদর্শিত হইতেছে। ভারতীয় শাখায় যে সকল মূল্যবান্ চিত্রাদি আছে তাহার অনেকগুলি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ও শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

সয়াবীন

মার্কিন বার্ত্তাতে প্রকাশ :—

এ যুগের খাদ্য তালিকায় সয়াবীন একটি বিরাট নাম। একদিন ছিল যখন সয়াবীনের কদর কেউ বোঝেনি। এখন কিন্তু প্রোটিনে ভরপুর এই সবজিটির মর্ম সকলেই বুঝেছেন আমাদের মত যেসব দেশে খাদ্যাভাব প্রকট, সেসব দেশের খাদ্য তালিকায় সয়াবীন আশীর্বাদস্বরূপ। সস্তায় শরীরে প্রোটিন যোগাতে সয়াবীনের তুলনা নেই।

বহুমুখী গুণের অধিকারী এই সয়াবীন। রান্নায় ও স্যালাড তৈরিতে সয়াবীনের তেল অদ্বিতীয়। সয়াবীনের খাবার মাছ, মুরগী ও গবাদি পশুর পুষ্টিকর আহার। সয়াবীনের দুধ থেকে ছানা, দই, সন্দেশ, কী না তৈরি হচ্ছে। ভাল রুটি তৈরিতে সয়াবীন কাজে লাগছে। আরও কত নতুন নতুন খাবার তৈরি হচ্ছে এ দিয়ে।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। সয়াবীনের আরও অনেক বিস্ময়কর গুণ আছে। শ্রমশিল্পে এর ব্যবহারের কথা চিন্তা করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। সয়াবীনের তেল পরিশোধিত করে তা রং, বার্নিশ, প্লাষ্টিক, সাবান, দাড়ি কামাবার ক্রীম, ছাপার কালি, নানা প্রকার ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি কত কিছু তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইদানীং সয়াবীন উৎপাদনের ওপর অনেক দেশেই জোর দেওয়া হচ্ছে। শতাব্দী কাল ধরে সয়াবীন চাষের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন সয়াবীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতমপ্রধান কৃষিফসল।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে সয়াবীন চাষের জমির পরিমাণ চারভাগের তিন ভাগ বেড়েছে। এর উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ, আর রপ্তানি বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে এখন ১৩০ কোটি বুশেল বা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন সয়াবীন উৎপন্ন হচ্ছে।

সয়াবীন ও সয়াবীনজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বছরে ২০০ কোটি ডলার মূল্যের সয়াবীন ও সয়াবীনজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছে।

পৃথিবীতে সয়াবীনের মোট উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ এখন উৎপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এই উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি তারা রপ্তানি করছে বিদেশে।

১৯৭২ সালে ৫ কোটি বুশেল, অর্থাৎ, ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টন কাঁচা সয়াবীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ ১৯৭১ সাল অপেক্ষা ২০ শতাংশ বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়ন গত বছর আগষ্ট মাসে ১০ লক্ষ টন সয়াবীন আমেরিকা থেকে কিনেছে।

গবাদি পশু ও মুরগীর খাদ্য হিসেবে সয়াবীনের খাদ্যের চাহিদা প্রচুর। সয়াবীনের তেলের চেয়ে সয়াবীন খাদ্যের রপ্তানির পরিমাণও অনেক বেশি।

কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি সয়াবীনের তেল ও সয়াবীনজাত খাদ্যের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। এসব দেশ এক বছরে ৫৪ কোটি ডলারেরও বেশি দামের ৪৫ লক্ষ টন সয়াবীন এবং ২ লক্ষ ৬ হাজার ডলার মূল্যের ৮০০ টন সয়াবীনের তেল কিনেছে।

এর পরই জাপানের স্থান। ১৯৫৬ সালে জাপান প্রায় ৬ লক্ষ টন সয়াবীন কিনেছিল আমেরিকা থেকে। গত কয়েক বছরে ভারত, বাংলা দেশ, টিউনিসিয়া ও পাকিস্তান যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবীনের তেল কিনেছে আমেরিকার কাছ থেকে। মরক্কো, ইরাণ ও চীন প্রজাতন্ত্রও কিনেছে। তবে এদের পরিমাণ অনেক কম।

সয়াবীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্রেজিল এখন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্রেজিলের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। সয়াবীন রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ব্রেজিলের স্থান এখন দ্বিতীয়।

সয়াবীন উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্থানও নগণ্য নয়। এরা বছরে ৬২ লক্ষ টন সয়াবীন উৎপাদন করে, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন করে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার টন।

ছোটখাটো উৎপাদকের মধ্যে রয়েছে কানাডা, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, রুমানিয়া, তাইওয়ান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ।

১৯৭২ সালে সমগ্র বিশ্বে সয়াবীনের উৎপাদন ৪১

লক্ষ টন বেড়েছে। বর্ধিত উৎপাদনের অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে আমেরিকা ও ব্রেজিলের অধিক উৎপাদনের দরুন।

সয়াবীন যেভাবে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় অন্যান্য বহু দেশেও এর উৎপাদন ক্রমেই বাড়বে। গ্রীষ্মপ্রধান ও আধা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব।

তবে সয়াবীনের প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে। যুক্তরাষ্ট্রেই এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হল তুলাবীজ তেল, ভূট্টার তেল, পীনাট তেল, স্যাফ্লাওয়ার তেল।

এছাড়া রয়েছে রাশিয়া, ইউরোপ ও আর্জেন্টিনার সূর্যমুখী বীজের তেল, কানাডা ও ইউরোপের রেপসীড তেল, পেরু ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মাছের তেল, এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার বাদাম তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি।

সারাবিশ্বে এই সব জাতীয় তেল আমেরিকার সয়াবীনের তেলের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করছে।

তৈলবীজজাত তেলের চাহিদা সারা পৃথিবীতে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে কয়েকটি দেশ, যেমন অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে।

অষ্ট্রেলিয়া তার সূর্যমুখী বীজের উৎপাদন খুবই বাড়িয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদন যেখানে ছিল ১৮,৮০২ টন, সেখানে ১৯৭০-৭১ সালে উৎপাদন ৮২ হাজার টন ছাড়িয়ে গেছে।

ফিলিপাইনের নারিকেল তেলের উৎপাদন ও রপ্তানিও অনেক বেড়েছে। পেরুর মৎস্যশিল্পেরও বেশ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, যাতে বিদেশে রপ্তানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তেল ও খাদ্যবস্তু উৎপাদন করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সয়াবীন বেশ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে কৃষিবিজ্ঞানীরাও নিশ্চেষ্ট বসে নেই। তাঁরা চেষ্টা করছেন ভূট্টা ও সরগামের মত শঙ্কর সয়াবীন উৎপাদন করতে। তা হলে এর উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রোটিনের গুণগত মান দুই-ই বাড়বে।

সাময়িকী

পাটচাষীদের আর্থিক সর্ব্বনাশ

বাংলায় পাটচাষীদিগের অবস্থা, পাটের দাম চাষের খরচের তুলনায় অত্যল্প করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে, খুবই খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যুগবাণী" সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্য এই বিষয়ে অনুধাবন-যোগ্য। আমরা উহা হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া-দিতেছি:

কেন্দ্রীয় সরকার পাটের দর (সাপোর্ট প্রাইস) প্রতি কুইন্টাল ১৫.৫৮ টাকা বেঁধে দিয়েছেন। এই হিসেবে প্রতি একমণ পাটের দাম পড়ে প্রায় ৬২'৫০ টাকা। কলকাতায় এই দরে পাট পেতে হলে আনার খরচ বাদ দিতে হবে। ব্যবসায়ী বা দালালেরা কিছু লাভ করবেই। সেই লাভের অঙ্কটা কম নয়। প্রকৃতপক্ষে সরকার-নির্দিষ্ট দরে পাট কেনা-বেচা করতে হলে—প্রকৃত চাষীদের পাটের দাম ৪৫ টাকার বেশী পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে চাষীরা ৩০/৩৫ টাকায় পাট বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে পাটচাষীদের উৎপাদন খরচও পোষাচ্ছে না। পাটচাষীদের এই ক্ষতি সারা পশ্চিম বংলারই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার দেখা দিয়েছে।

এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে পাটচাষীদের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দল, কৃষক প্রতিষ্ঠান, এম এল এ, এম-পি সকলেই বিশেষ তৎপর হয়েছেন। এই ভয়াবহ দুর্দশার প্রতিকারের জন্য দিল্লী পর্যন্ত দরবার চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন প্রতিকারের পথ দেখা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন—পাটের সমর্থন মূল্য তিনি বাড়াতে পারবেন না।

পশ্চিম বাংলার সদস্যরা পাটের দাম ১৭০ টাকা কুইন্টাল ধার্য করার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকালী মুখার্জী এম-পি ইংরেজ আমলে ফ্লাউড কমিশন পাটের দাম নির্দ্ধারণে যে নীতির সুপারিশ করেছিলেন, তার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ ছিল তিন মণ ধানের দামের সমান এক মণ পাটের দাম হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকার আজ ২৬ বছর পরও এই নীতি কার্যকর করতে অনিচ্ছুক।

সরকারী দলের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের দাবীও সরকার অগ্রাহ্য করছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীবাবু বলেছেন কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন পাটের সর্বনিম্ন দাম প্রতি কুইন্টাল ১২৫ টাকায় ধার্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা উৎপাদন খরচ খতিয়ে দেখেন নি বলে, সরকার এই মূল্য বাড়িয়ে ১৫৭'৫৮ টাকা ধার্য করেছেন। গমের দাম, তুলার দাম খতিয়ে দেখবার সময় কৃষি পণ্যমূল্য কমিশনের ভুল হয় না, কিন্তু পাটের দাম ধার্য করার সময় কমিশনের কর্তাদের মাথা গোলমাল হয়ে যায়। এর কারণ কী? গোলমালটাও সামান্য নয়—কুইন্টালে ৩২'৫৮ টাকা।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন: বাণিজ্যমন্ত্রকও সেই একই রোগে আক্রান্ত হন নি তো? বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী বাবুও কি আমলাদের দেওয়া হিসেবটাই শিরোধার্য করে নিয়েছেন? কেননা দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সম্পাদক নুরুল ইসলাম, তিনি কৃষক কংগ্রেসেরও প্রধান—বলছেন এক মণ পাট উৎপাদন করতে চাষীর খরচ হয় ৫৮ টাকা। পাট চাষ করে যদি চাষীকে তাঁর পরিবার প্রতিপালন করতে হয়, তবে নুরুল ইসলামের মতে প্রতি মণ পাটের দাম হওয়া উচিত কমপক্ষে ৭৫ টাকা। অর্থাৎ উৎপাদন খরচের উপর মাত্র ১৭ টাকা

মণে বেশী দেবার প্রস্তাব কৃষক কংগ্রেস করছে। এই হিসবে এক কুইন্টাল পাটের দাম দাঁড়ায় ১৮৭'৫০ টাকা। অর্থাৎ দেবীবাবুর ধার্য দর থেকে ৫০ টাকা বেশী। কৃষকদের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, চাষবাসের খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের হিসেবটা ন্যায্য হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে চাষীকে আমরা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে দেখতে চাই কি না এটাও বিবেচ্য। নতুবা পাটকল শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের মনস্থির করতে কোন কুণ্ঠা দেখা যায় না, একলাফে ৩০/৩৫ টাকা বাড়াতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু চাষীদের বাঁচবার প্রশ্ন উঠলেই নানা অজুহাত সৃষ্টি করেন কেন?

বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় বলছেন কাঁচা পাটের দাম বাড়ালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে এবং তাতে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা যাবে না। কিন্তু জনদরদী মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—পাটকল শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হলে কি পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়ে না? তাতে কি প্রতিযোগিতার সুবিধে হয়? শ্রমিকদের বেলায় এক দৃষ্টিভঙ্গি—আর কৃষকদের বেলায় অন্য দৃষ্টিভঙ্গি কেন? কৃষকদের কি জীবনধারণের মান উন্নত করার অধিকার নেই? কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষকেরাই কি আবহমান কাল শোষিত হতে থাকবে?

পাট চাষীরা যে শোষিত হচ্ছে একথা নাকি তিনি মেনে নিয়েছেন। তার প্রতিকারের জন্য জুট কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে বলে বলেছেন। কিন্তু এই জুট কর্পোরেশন তো ঐ ১৫৭'৫৮ টাকা দরেই কলকাতায় পাট পৌঁছতে থাকবেন। তা হলে চাষীদের থেকে কতদরে পাট কিনবেন জুট কর্পোরেশন? আনা খরচ বাদ দিয়ে জুট কর্পোরেশন চাষীদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই ৫০ টাকার বেশী প্রতি মণ পাটের দাম দিতে পারবেন না। দেবীবাবু যে আশ্বাস বাণীই দিন না কেন, চাষীদের উৎপাদন খরচও তাতে মেটানো যাবে না।

বোম্বাইয়ের তুলাচাষীদের ভারত সরকার সাবসিডি দিচ্ছেন— অথচ পাটচাষীদের বেলায় সে ব্যবস্থা করতে তারা নারাজ। কিন্তু পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করেই সরকার ২০০-২৫০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা প্রতি বছর অর্জন করছেন। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী বাবদ যে শুল্ক

আদায় হয় তার পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা। কেউ কেউ অনুমান করেন এই টাকা থেকেই তুলা বস্ত্রশিল্পকে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। কারণ ঐ শিল্পে যে সাবসিডি দেওয়া হয় তার পরিমাণও প্রায় ২১'৩৮ কোটি টাকা। স্বার্থান্বেষীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করা দরকার।

সারা ভারতের স্বার্থে পশ্চিম বাংলা দেশ বিভাগের ফলে পাট চাষের জমি ২'৭ লক্ষ একর থেকে ১৮ লক্ষ একরে পরিণত করেছে। ধানের জমিকে পাটের জমিতে পরিণত করার ফলে পশ্চিম বাংলায় খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। কাজেই আজ যদি পাট চাষের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হয় তবে পাট চাষ করা বন্ধ করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র মহাশয় এরূপ অভিমত ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন কোন প্রতিকার করার আশ্বাস দিতে পারছেন না—তখন এ পথেই পশ্চিম বাংলাকে অগ্রসর হতে হবে। তাতে পাট চাষীরাও বাঁচবে এবং খাদ্য সংকটেরও অনেকটা সুরাহা হবে। খাদ্যের জন্যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দরজায় দরজায় ধর্ণা দিতে হবে না।

ত্রিপুরার খবর

"ত্রিপুরা" পত্রিকা হইতে নিচের খবরগুলি আহরণ করা হইয়াছে :

ম্যালেরিয়া দমন

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যাবার যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তা সত্য হলেও কিন্তু সমস্ত জ্বরের রোগীই যে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগছে তা ঠিক নয়।

সরকারী ঔষধের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না, তা সত্য নয়। গত কয়েক মাসের মধ্যে (জানুয়ারী হতে আগষ্ট ১৯৭৩ ইং) কুইনাইন ইন্‌জেকশন এবং কুইনাইন মিকচার ছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রোগীদের মধ্যে ৩'৬০ লাখ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ট্যাবল্যাট বিতরণ করা হয়েছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীহিসেবে গৃহীত ভারত সরকার যে সকল নীতি নির্দ্ধারণ করেন এখানে তা অনুসরণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২১শে মার্চ থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমানার দশ মাইল এলাকার ভেতরের প্রথম বারের ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়বার ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ ২০শে আগষ্ট থেকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যের অবশিষ্ট এলাকায় ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

ম্যালেরিয়া ছাড়াও মশার উৎপাত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মশার এ উৎপাত বন্ধ করার জন্য আগরতলায় মশার সংখ্যা যাতে না বাড়তে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

উচ্চফলন ধান

কুমারঘাট উন্নয়ন সংস্থার কৃষি কর্মিগণের উদ্যোগে এবার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল আউশ ধানের চাষ করা হয়। স্থানীয় অভিজ্ঞ মহল মনে করেন গড়ে একর প্রতি ৫০-৫২ মণ ধান ফলন হবে। এই এলাকার ১০ জনেরও বেশী কৃষককে উচ্চ ফলনশীল আউশ ধান চাষের জন্য প্রায় ১৫,০০০ টাকার মত ঋণ দেওয়া হয়।

এই এলাকায় আগামী আমন মরশুমের জন্য বিশ হাজার তিন শত কেজি উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান বিক্রি করা হয়। এলাকার প্রগতিশীল কৃষকগণ কৃষি অধিকর্তাকে পরবর্তী সময়ে এলাকায় কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

দেশ-বিদেশের কথা

চিলিতে দক্ষিণপন্থী বিপ্লব

অনেকের ধারণা যে বিপ্লব করাটা বিশেষ করিয়া বামপন্থীদিগেরই অধিকারগত এবং দক্ষিণপন্থীগণ রক্ষণশীল বলিয়া বিপ্লবের পথে চলিতে অনিচ্ছুক। এইরূপ ধারণার মূলে আছে ফরাসী বিপ্লব কিংবা রুশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস। ফরাসীগণ নিজ দেশের রাজার রাজশক্তি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বিপ্লব করিয়া এবং রুশিয়ানদিগের ইতিহাসেও ঐ একইভাবে রাজাকে অপসৃত করিয়া জনগণের শাসনরীতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই যাহারা বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন সাধারণ প্রগতিকামী উন্নতিশীল ব্যক্তি। অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় তাঁহারা বামপন্থী বলিয়াই আখ্যাত হইতেন। ইতিহাস কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের অন্য কথাও বলে। দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল ব্যক্তিগণও কখন কখন বামপন্থী শাসনশক্তিধারীদিগকে বহিস্কৃত করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। ওলিভার ক্রমওয়েল যখন ইংলণ্ডেশ্বর চার্লসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহাকে প্রগতিশীল বামপন্থী বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করা চলিতে পারিত। আবার ইংলণ্ডে যখন রাজা সিংহাসনে পুনরারোহণ করিলেন তখন তাহা ছিল দক্ষিণপন্থী বিপ্লব। এইভাবে বাম ও দক্ষিণ উভয় পথেই বিপ্লব আসিতে পারে ও কখন রক্ষণশীলদিগকে প্রগতিশীলগণ বিতাড়িত করে এবং কখনও বা প্রগতিপ্রার্থীগণই রক্ষণশীলদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। বিগত বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যে সকল ঘটনাকে আমরা ফ্যাসিস্ট বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি, সেগুলি ছিল দক্ষিণপন্থী, পুরাতন শ্রেণীবিভাগ রক্ষণকারী, সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে দমনকারী, সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রনীতি অনুগত ব্যবস্থা। সেগুলিও ছিল নিদারুণ বিপ্লবের সহিত জড়িত ও তাহাতেও বহু লোকের প্রাণ গিয়াছিল। সুতরাং দক্ষিণপন্থী অনুগমনকারী রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ যেরূপ বামপন্থীগণের বিপ্লব চেষ্টার বিরোধ ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের নিরাপত্তার আয়োজন সুগঠিত রাখেন, বামপন্থীগণও রাজশক্তিতে আসীন থাকিলে সেইভাবেই দক্ষিণপন্থীগণ যাহাতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগকে শাসনশক্তি হারাইতে বাধ্য করিতে না পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা রাখেন (অথবা তাঁহাদের সেইরূপ ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য)।

চিলিতে যে রাষ্ট্রপতি ডাঃ আলেন্দ সম্প্রতি তাঁহার বামপন্থী রাজশক্তি দক্ষিণপন্থীদিগের বিপ্লবের ধাক্কায় হারাইলেন এবং স্বয়ং প্রাণ হারাইলেন, তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে ডাঃ আলেন্দ নিজের ও নিজদলের ব্যক্তিদিগের আত্ম ও স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন না। থাকিলে তিনি কখনও অত সহজে দক্ষিণপন্থীদিগের নিকট পরাজিত হইতেন না। তিনি জানিতেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার মার্কসিস্ট মতামতের সমর্থক নহেন এবং সম্ভব হইলেই তাঁহার বিরুদ্ধ দল তাঁহাকে অপসৃত করিবার জন্য আমেরিকার সাহায্যলাভে সক্ষম হইবে। তাহা জানিয়াও তিনি নিজ দলের সামরিক বিলিব্যবস্থা পূর্ণগঠিত রাখেন নাই। ও দক্ষিণপন্থী বিপ্লবকারীদের আক্রমণ আরম্ভ হইতেই তাঁহার রক্ষকগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। এমনও হইতে পারে যে তাঁহার রক্ষকগণও বিপ্লবীদিগের সহিত হাত মিলাইয়া তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতেছি যে বাম দক্ষিণ যেরূপ শাসনশক্তিই কোন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত থাকুন না কেন, শাসনশক্তিধারীদিগের কর্তব্য নিজেদের

সামরিক শক্তি নিজেদের দলগতভাবে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা। কারণ সামরিক ব্যবস্থা যদি বিরোধী দলের করায়ত্ত হইয়া যায় তাহা হইলে শাসন ক্ষমতা অটুট রাখা কঠিন হয়। চিলির ঘটনাতে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রেই শাসকদিগের বিরুদ্ধদলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অন্য আকার গ্রহণ করিতে পারে। কোথাও কোথাও বিপ্লব চেষ্টাও হইতে পারে। অবশ্য সেই সকল কথা নির্ভর করে বৃহৎ শক্তিগুলি কিভাবে কি সাহায্য কাহাকে দিবেন তাহার উপরে। চিলিতে কোনো বৃহৎ শক্তি যে ডাঃ আলেন্দের বিরুদ্ধদলকে সাহায্য করিয়াছিল একথা ক্রমশঃ সর্বজনস্বীকৃত হইতেছে। তাহা যদি না হইয়া থাকে এবং যদি ডাঃ আলেন্দের বিরোধী পক্ষ কাহারও সাহায্য না লইয়াই তাঁহাকে অপসৃত করিয়া থাকে তাহা হইলে ডাঃ আলেন্দের শক্তিহীনতা আরও অধিক করিয়া প্রমাণ হয়! এই ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ফ্যাশিজমের পুনর্জাগরণ দেখিতে পান। ফ্যাশিজ্‌ম যদি শক্তিমান্‌ রূপ ধারণ করে তাহা হইলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অথবা সামাজিক মঙ্গলের আদর্শ কোনও কিছুই নিজ রাষ্ট্রীয় মূল্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না। সকল বিষয়ের একমাত্র মান হইবে সামরিক শক্তি। এই "জোর যার মুলুক তার" নীতির প্রতিষ্ঠা ও তৎসঙ্গে সমাজবাদ অথবা অপর সকল মানবীয় আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া দেওয়া যখন কার্য্যতঃ করা সম্পূর্ণ হইবে তখন কোনও শুভবুদ্ধির কোন প্রয়োজন বা মূল্য থাকিবে না। সুতরাং পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই এখন হইতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এই জাতীয় মানব-কল্যাণ বিরুদ্ধ মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত হইতে না পারে। বামপন্থী বাড়াবাড়িও দমন করা এই কারণে আবশ্যক। কারণ বামের মধ্যেও যথেচ্ছাচারিতা থাকে ও অনেক সময় সেই একাধিকারের নেশা বামপন্থী আদর্শবাদীদিগকে স্বেচ্ছাচারের মত্ততায় নিমগ্ন করিয়া জনপ্রিয়তা হারাইবার পথে লইয়া যায়। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি জনমঙ্গলকর নহে এবং এই কথা স্মরণ করিয়া চলিলেই সকলের পক্ষে ভাল হয়।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

২য় সংখ্যা

জাতীয়তা বোধের কথা

পূর্বকালে ভারতের মানবের রাষ্ট্রীয়তার মধ্যে কোন জাতীয়তা বোধ ছিল না। এবং আধুনিক কালে বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্গত হইবার পরেই ভারতীয় জাতি বলিয়া একটা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ একটা কথার অনেকে নানা ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে উত্থাপনা করিয়া থাকেন। কথাটা বলিবার মধ্যে একটা ইঙ্গিত নিহিত থাকে, তাহা হইল এই যে, জাতীয়তা বোধ অন্য অন্য নানা দেশে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, শুধ এই দেশেই তাহা কোন কারণে বৃটিশ আগমনের পূর্বে গঠিত হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ বিশ্বের নানাদেশে পূর্বকালে কোথাওই আধুনিককালে জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝা যায় সেই-রূপ জাতীয়তা গড়িয়া উঠে নাই। নানা দেশ ও জাতি এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া শাসিত হইত হয়ত, কিন্তু সেই সকল দেশ ও জাতি নিজ নিজ ভাষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সভ্যতাও কৃষ্টি ইত্যাদি পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই এক সাম্রাজ্য বা রাজ্যের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। বৃটিশ শাসনে এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া থাকিলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, ভাষা-ভিত্তিক সম্প্রদায় প্রভৃতি মিলিত হইয়া এক জাতি হইয়া যায় নাই। তাহাদের নিজ নিজ পার্থক্য তাহারা বজায় রাখিয়াই চলিত এবং বৃটিশ শাসকগণ সেই সকল পার্থক্য প্রকট ভাবেই জাগ্রত রাখিয়াই ভারত শাসন ব্যবস্থা করিতেন। উপরন্তু হিন্দু মুসলমান, সামরিক অসামরিক, উন্নত অনুন্নত ইত্যাদি নানা প্রকার নতুন নতুন আখ্যার সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ শাসকগণ ভারতের মানুষকে এক জাতি হইয়া গড়িয়া উঠিতে না দিবারই চেষ্টা করিতেন। বৃটিশ রাজত্ব প্রতি-ষ্ঠিত হইবার পরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ইত্যাদি যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা শাসকদিগের কোনও বিশেষ রাষ্ট্রীয় পন্থা অনুসরণের ফলে গড়িয়া উঠে নাই। তাহার মূলে ছিল ভারতীয় জন-সাধারণের রাষ্ট্রীয় চিন্তা-ধারার ক্রমোন্মেষ। জাতীয়তা বোধ পৃথিবীর কোথাওই আধুনিক "নেশনহুড" অর্থে পূর্বকালে গ্রাহ্য হইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা "ডিউকডম" একত্র করিয়া এক রাজার রাজত্ব বা "কিংডম" গঠন করার অ দশ পরে গঠিত হয়। এক রাজা ও এক রাজত্ব হইলে পরে এক জাতি হইবার কথা উঠে। ইহা হইয়াছিল মধ্যযুগ বা "মিডল এজেস" অতিক্রান্ত হইবার পরে। অর্থাৎ পুরাকালে অথবা মধ্য-

যুগে এই জাতীয়তা বোধ কোন দেশেই জাগ্রত হয় নাই। ইহা হইয়াছিল ইয়োরোপে দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এবং ভারতবর্ষে তাহার কিছু পরে। ইহাকে মানব সভ্যতা বিকাশেরই অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ও ভারতে ইহা যে গাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বৃটিশের যে কোনও বিশেষ কেরামতি ছিল ইহা কল্পনা করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

এই যে জাতীয়তা বোধ ইহা সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া গড়িয়া উঠা কোন নবজাগ্রত মনোভাব প্রসূত নহে। ইহার মূলে আছে বহু পুরাতনকাল হইতে সংরক্ষিত সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্মগত সম্বন্ধের ও ঐক্যের দীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ছিল বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর্শের উপর রচিত এবং ঋষিদিগের সাধনা ও ধ্যান পুষ্ট। সম্রাট বা রাজা অদল বদল হইলেও সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারা পরিবর্ত্তিত হইত না। এই কারণে উচ্চ-স্তরের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রচারিত আদর্শ, শিক্ষা ও দর্শন-বিজ্ঞানের সারমর্ম্ম রাষ্ট্রক্ষেত্রের শক্তিমান্-দিগের বিশ্বাস বা মানসিক গতির দ্বারা কোন ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইত না। বিজাতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তে রাষ্ট্রীয় শক্তি কখন কখন চলিয়া যাইলেও আবহমান যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা একইভাবে ভারতীয় মানব-মনকে প্রভাবিত করিতে থাকিত। অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তার ধারা কোনও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতেই নিজের স্বরূপ গভীর-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দিয়া মূলতঃ বিপরীত পথে চলিত না। জাতি, ধর্ম্ম, দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতি বহু বিষয়েরই বিচার ভারতে শত শত বৎসর একই ধারা অবলম্বন করিয়া চালিত হইত এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থার অদল বদল বহুবার ঘটিয়া থাকিলেও তাহাতে মত ও বিশ্বাসের ধারা নূতন পথে চলে নাই। মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে মুসলমান ধর্মের কোন কোন আদর্শকে ভারতীয় ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ ভারতীয় চিন্তা বিশ্বাস ও নীতি বোধের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সকল আদর্শ যে ভারতীয় আদর্শবাদের প্রতিকূল ছিল এইরূপ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই; তবে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতীয় আদর্শবাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল একথাও বহুজনস্বীকৃত। মুসলমান নৃপতিগণ এই দেশে অবস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজেদের মধ্য এশিয়ার জন্মস্থানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বাস-দেশ হিসাবে এই দেশকে গ্রহণ করিয়া লইয়া ভারতীয় হইয়া যান; কিন্তু তাঁহাদের সভ্যতা ও অন্তর্ভুক্ত বহু তুর্ক, তাতার, আরবী অথবা ইরাণী ভাষাগত ও কলা-কৌশলজাত উপকরণ আমাদিগের দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া তদন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। যাহাকে সকলে ইন্দো-ইরাণী সভ্যতা ও কৃষ্টি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে তাহা মুসলমানদিগকে এদেশের মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সাহায্য করিয়াছিল; যদিও মুসলমানগণও ভারতের নানা স্থানের বৈশিষ্ট্য মানিয়া লইয়া স্থানীয় ভাষা, রীতিনীতি প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া সমগ্র ভারতের এক মুসলমান জাতি গঠন করিতে কখনও সক্ষম হয়েন নাই। ভারতে যেরূপ বিভিন্ন হিন্দু জাতি ছিল ও এখনও আছে, সেইরূপ বহু পৃথক পৃথক মুসলমান গোষ্ঠী এবং জাতিও এদেশে নানা স্থানে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়া থাকে। ভারতের জাতীয়তার আদর্শ ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতির ঐক্যের উপর নির্ভর করে না। তাহার মূলে মানব মনের গভীরে যে সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্মগত সাম্য ও ঘনিষ্ঠতা চিরবর্ত্তমান আছে তাহাই সকল ভারতীয়কে এক মহাজাতির অঙ্গ বলিয়া বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হইতে সক্ষম করে। বেদ বেদান্ত, পুরাণ, উপাখ্যান, সংস্কৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ প্রভৃতির মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সারমর্ম্ম রক্ষিত আছে। সকল শাস্ত্র ও কলার মূল সত্যও উহারই মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতের নানা ভাষা ভাষী, বহু বংশ উদ্ভূত, বিচিত্র সামাজিক রীতি-নীতি পালন-কারী সম্প্রদায় সকল কিন্তু ঐ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, উপাখ্যান ও সংস্কৃত ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জ্ঞান, বিদ্যা, মতবাদাদি গঠন করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রগমন করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও অনুশীলন

[illegible] সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ছাড়িয়া দিয়া কোনও অজানা [illegible]তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিতে এখনও চাহিতেছে না। ইন্দো-ইরাণী কৃষ্টিও যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাকেও নিজের ও ভারতীয় করিয়া লইয়া ভারতবাসী ঐ অপরূপ সমন্বয় লব্ধ রস-ধারাকে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির পূর্ণতর অভিব্যক্তির কার্যে নিযুক্ত করিতেছে। ভারতের বহু বংশজাত, বহু ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন রীতিনীতির অনুসরণকারী মানবগোষ্ঠীসকল বর্তমান অর্থে জাতীয়তাবোধের উপলব্ধির পূর্ব হইতেই মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে একটা বহু সুদূর হইতে বহমান ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্যের উপস্থিতিজাত মানসিক ঐশ্বর্য্য আস্বাদন করিয়া লাভবান্ হইয়া আসিতেছিলেন। সেই ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুরণের পথ সহজ ও সরল করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য চিন্তার ধারা ও বিজ্ঞান চর্চা ভারতকে মধ্য যুগ হইতে বর্তমান যুগে আনিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু [illegible]নবলব্ধ আধুনিকতা ভারতীয় মহাজাতির এক-[illegible]তার উপলব্ধি বা ক্রমবিকাশের কার্য্যে বিশেষ করিয়া কোনও সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ রাজপুরুষদিগের ভারতের একতা সৃজনে কোন আগ্রহ ছিল না। পারস্পরিক অমিল বা বিরুদ্ধতা সৃষ্টিতেই তাঁহারা অধিকতর ভাবে উৎসাহী ছিলেন। বৃটিশ রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার চেষ্টাই বরঞ্চ ভারতকে একত্বের প্রেরণা দান করিয়াছিল।

জাতিকে আধুনিক ভাবে গড়িয়া তোলা, তাহার সকল কুসংস্কার দূর করিয়া তাহাকে শিক্ষায় জ্ঞানে বিশ্বের অপরাপর জাতি সকলের সমকক্ষ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা, জাতির সকল মানুষকে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও উন্নতিকামনাশীল করিয়া অগ্রগমনে নিযুক্ত করা প্রভৃতি সকল নূতন আদর্শই এক প্রদেশ হইতে অপর সকল প্রদেশে সঞ্চারিত হইত ও তাহার ফলে একটা এক জাতীয়তার ভাব সর্বত্র সঞ্জাত হইত। রাজা রামমোহন রায় যখন বাংলা দেশে প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও জ্ঞানের পূর্ণতর প্রচার ও প্রাচীন সামাজিক কুরীতি সকলে দূর করিবার চেষ্টা করেন ও তাহার পরে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবগণ ভারতের উন্নতির চেষ্টা করেন, তখন তাঁহাদের বাণী ভারতের সর্বত্রই ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করে এবং তাঁহাদের প্রচারিত আদর্শ সর্ব্ব-ভারতীয় রূপ ধারণ করে। সাহিত্য, কাব্য, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ইত্যাদি সকল রস অভি-ব্যক্তির আসরেও ভারতের সকল গোষ্ঠীর মানবের সমবেত ভাবে আগমন একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দেবী-প্রসাদ, উদয়শঙ্কর প্রভৃতির প্রেরণার উৎসে নানা ভাষা-ভাষী বংশোদ্ভূত ভারতীয়গণ অবগাহনার্থে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। শান্তিনিকেতনে সকল প্রদেশের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদিগের সমাগম হইত এবং এই জাতীয় একত্র শিক্ষা ও অনুশীলন ভারতীয় মানবকে এক জাতিরূপে গঠন করিয়া তুলিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিত।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন প্রবল রূপ ধারণ করে তখন কি সশস্ত্র বিপ্লব, কি অহিংস আন্দোলন, উভয় পথের পথিকের মধ্যে সকল জাতির মানবের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বহু লক্ষ ভারতীয় কারাবরণ করেন। ইঁহা-মধ্যে সকল শ্রেণী, সকল জাতি, সকল ভাষাভাষী ও সকল ধর্মাবলম্বী মানুষই ছিলেন। রাষ্ট্রীয় দলগুলির শাখা প্রশাখা সর্বত্র স্থাপিত হওয়াতে একটা বৃহত্তর জাতীয়তা গঠনের সাহায্য হইতে আরম্ভ হয়। নেতাগণ যাহা যে ভাষাতেই বলুন না কেন সেই সকল কথা ভারতের সর্বত্র সকল ভাষায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে ও তাহাতেও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে। ভারতীয় মানব এক উপমহাদেশের অধিবাসী এবং সভ্যতা ও কৃষ্টিগত ভাবে এক মহাজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশে গঠিত এক জাতির অন্তর্গত, ইহাই বিশ্বের

দরবারে ভারতীয়দিগের বর্তমান পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন বিভিন্ন পুষ্প একত্রে সাজাইয়া রাখিলে তাহার যে পুষ্পগুচ্ছরূপে সঞ্জাত সৌন্দর্য তাহা পুষ্পগুলির বৈচিত্র্য হইতেই জন্মলাভ করে। সকল ফুলগুলিকে পিষিয়া এক পুষ্পপিণ্ড প্রস্তুত করিলে সেই পিণ্ডের কোন সৌন্দর্যই থাকে না। বৈচিত্র ও পার্থক্য থাকিলেও বহু মানব অথবা বস্তুর একটা জাতিগত একত্ব থাকিতে পারে এবং ভারতের নানা ভাষাভাষী, নানা বংশোদ্ভূত মানবদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটা ঐক্য বিশেষ করিয়া আছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক, ব্যবহারে পার্থক্য ও বিভিন্নতা থাকিলেও অন্তরের গভীরে একটা জাতিগত ঐক্য নানান ব্যক্তি বা বস্তুকে একত্র বাঁধিয়া লোকসমাজে প্রদর্শন করিতে পারে ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। প্রস্তর নানা বর্ণ ও কাঠিন্যের হইলেও সকল প্রকার প্রস্তরের একটা জাতিগত ঐক্য থাকে। বৃক্ষও নানা প্রকার হইতে পারে কিন্তু সকল বৃক্ষই বৃক্ষ। পার্থক্য থাকিলেও জাতিগত ঐক্য সকল পার্থক্যকে গৌণ বলিয়া অপ্রাধান্য বিচারে হিসাবের বাহিরে রাখিয়া চলে।

ভারতের মানুষ বহু ভাষাভাষী। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোন ভাষা আর্যাজাতীদিগের দ্বারা কথিত প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত এবং কোনটি বা দ্রাবিড় অথবা ভারতের আদিবাসী কোল-ভিল-সাওতাল-ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির ভাষাজাত। কিন্তু সকল ভাষাতেই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির সংক্রমণ হইয়াছে ও তাহার ফলে সকল ভাষাই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া একটা ভারতীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতের বাহিরের দ্রাবিড় ভাষা ও আদিম অতি প্রাচীন মানবদিগের ভাষা ভারতীয় দ্রাবিড় ও আদিবাসীদিগের ভাষার সহিত সর্বরূপে এক প্রকার নহে। বহু সহস্র বৎসর ভারতের পারিপার্শ্বিকে পুষ্ট হওয়ার ফলে ঐ সকল ভাষারই রূপান্তর ঘটিয়া একটা ভারতীয়তা প্রাপ্তি হইয়াছে। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, পূজা পার্বণ ইত্যাদি নানান বিষয়েও এই ভারতীয়তা রূপায়িত হইয়াছে। এই ভারতীয়তা কোথাও অধিক দেখা যায়, কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণরূপে এই উপমহাদেশের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জিত ভাবে ভাষা কিম্বা জনগণের বিশ্বাস বা ব্যবহারের ধরণ-ধারণ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায় না। প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির ছাপ সকল ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু লাগিয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতের সকল মানুষের সকল মনোভাবের অভিব্যক্তিই অল্পাধিক পরিবর্তিত আকার গ্রহণ করিয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইতেছে যে, ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রে আধুনিক যুগে যখন জাতীয়তা পূর্ণ গঠিত আকার ধারণ করিল তখন সেই জাতীয়তার বুনিয়াদ নূতন ভাবে কাহাকেও গঠন ও স্থাপন করিতে হয় নাই। তাহা অতি পূর্বকাল হইতেই ভারতীয় মানবের মনে ও চরিত্রে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন জ্ঞান বিদ্যা, সভ্যতা ও কৃষ্টি বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতের সকল জাতির মানুষকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছিল। ইহার ফলে নানান শাস্ত্রবাক্য, পুরাণের কথা, উপাখ্যান ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা ভারতের মানুষের নিকট প্রচলিত হয় ও ভারতের সকল মানুষই বহু বিষয় সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া একটা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী আহরণ করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এখন যাহাকে আমরা জাতীয়তা বলি সেই জাতীয়তার স্বরূপ মধ্যযুগে অথবা তৎপূর্বে কোনও বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। এই "নেশনহুড" বা জাতীয়তা দুই তিন শত বৎসরের পূর্বে বর্তমান অর্থে বা কোনও কার্য্যকর ভাবে জন-সাধারণের বোধগম্য ছিল না। ইয়োরোপ আমেরিকাতে "ন্যাশনাল অ্যানথেম" (জাতীয় সঙ্গীত), "ন্যাশনাল ডেট" (জাতীয় ঋণ), "ন্যাশনাল গার্ড" (জাতীয় রক্ষা বাহিনী), "ন্যাশনাল ইনকাম" (জাতীয় আয়) প্রভৃতি কথার কোন ব্যবহার দুই-তিন শতবৎসরের পূর্বে ছিল না। আমেরিকায় প্রথম "ন্যাশনাল পার্ক" বা জাতীয় জীবজন্তুদিগের মুক্ত

[illegible] স্থাপিত হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে [illegible]কটা নামমাত্র ছিল; ইহার জাতীয় স্বরূপ সম্ভ[illegible]কোন প্রদেশের বাহিরের কোন কিছু অবলম্বন করিয়া গঠিত হয় নাই। "ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক" অথবা "ন্যাশনাল থিয়েটার" প্রভৃতি নামেরও ন্যাশনালত্ব অতিসীমিতই ছিল ও তাহার সহিত সমগ্র জাতির কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করা উচিত হয় না।

বহুভাষা থাকিলেও এক জাতি হইতে পারে। যথা সুইৎজারল্যাণ্ড দেশে সকল মানুষই সুইস জাতীয়, যদ্যপি সুইসদিগের মাতৃভাষা সুইস-জার্ম্মান, সুইস-ফ্রেঞ্চ, সুইস-ইতালীয়ান কিম্বা সুইস-রোমান্স হইতে পারে। বেলজিয়ামের মানুষ ফরাসী অথবা ফ্লেমিশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ক্যানাডায় ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা কথিত হইয়া থাকে। চেকোস্লোভাকিয়াতে জার্ম্মান ও চেক, হাঙ্গেরীতে জার্ম্মান ও ম্যাগিয়ার এবং রুশ দেশে অনেক ভাষা ও রাষ্ট্রের চলন আছে দেখা যায়। ধর্ম, [illegible] ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের বৈচিত্র নানা [illegible]শের জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়। মুসলমান ও খৃষ্টান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট, কম্যুনিষ্ট ও ধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি, সামাজিক শ্রেণীআনুগত্য ও শ্রেণীহীন সমাজবাদ প্রভৃতি নানা প্রকার পার্থক্যও এক জাতির মানুষের মধ্যে দেখা গিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত খাদ্য, বস্ত্র, সংস্কার ও রীতিনীতি অনুসরণ বিষয়েও এক জাতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে পারে ও আছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের মানুষের মধ্যে এই বিভিন্নতা প্রকটভাবে থাকিলেও সকল ভারতীয়ের মধ্যে একটা সভ্যতা ও কৃষ্টিগত একতা থাকায় ভারতের জাতীয়তা গড়িয়া উঠা সহজ হইয়াছে। বিদেশীর অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের দীর্ঘকালস্থায়ী সংগ্রাম সেই জাতীয়তা গঠনে আরও অধিক করিয়া সাহায্য করিয়াছে। মানবীয় ও জাতীয় আদর্শ উপলব্ধির চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া ক্রিয়াশীল থাকায় এক পথে চলিবার আগ্রহ জাগ্রত হয় ও এই মনের একাভিমুখী গতি জাতির একতাকে জোরাল করিয়া তুলিয়া জাতীয়তা বোধকে জীবন দান করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির গঠনের ফলে এক জাতীয়তা বোধ আরও প্রাণবান্ ও সজীব হইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ নানাভাষা বলিলেও ভারতের নানা প্রদেশের ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়দিগের একজাতিত্ব বজায় রাখিতে কোন অসুবিধা হইত না, এখন তেমনিই নানা কথিত ভাষা ব্যবহার করিলেও সকল প্রদেশের মানুষের এক ভারতীয় জাতিত্ব থাকায় কোনও বাধার সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় ভাষা বলিয়া কোনও বিশেষ ভাষা না থাকিলে ভারতীয়তা থাকিতে পারে না এরূপ কথা কেহ কেহ কখন কখন বলিলেও শতবর্ষকালের অধিক সময় ধরিয়া ভারতের এক জাতীয়তা পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইয়া আছে ও তাহাতে ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদিগের পরস্পরকে বিদেশী মনে করিবার কোন কারণ উদ্ভূত হইতেছে না। সুইৎজারল্যাণ্ডের মানুষ যেমন জার্ম্মান, ফরাসী অথবা ইতালীয়ান যাহাই বলুক না কেন তাহার সুইস জাতীয়তা তাহাতে আহত হয় না; ভারতেও তেমনি মরাঠী, হিন্দী অথবা বাংলা ভাষায় বাক্যালাপ করিয়াও সকলের ভারতীয় স্বরূপ রক্ষা করিতে বাধা প্রাপ্তি ঘটে না। কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় ভাষার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা না-করিয়া বিদেশী ভাষা ইংরেজীকেই সেই স্থলে স্থাপন করিয়া রাখিয়া জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য সহজেই হইয়া যাইতেছে ও নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবার সম্মান কোন ভাষা বিশেষের ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে ইহা লইয়া কোন কলহের সম্ভাবনাও হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে আমাদিগের জাতীয় আদর্শ হইল এইদেশের সকল গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিয়া এক স্তরে স্থাপন করা। শিক্ষা, চিকিৎসা, কার্য্য ও ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা সকলের জন্য একপ্রকার করার ব্যবস্থাও সেই আদর্শের অনুগত বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা ব্যতীত নরনারীর সম্বন্ধ, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ ইত্যাদি

সকল বিষয়েই এক পন্থা ও এক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার রীতি প্রবর্তন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করা হইবে। ইহাতে ভারতীয় মহাজাতির একতা ও জাতীয়তা বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হইবে।

মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাধি

আজকাল সকলের মুখেই এক কথা। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান, যানবাহন, পুস্তকাদি ও অপর যাহাকিছু মানুষের অবশ্যপ্রয়োজনীয়, সকল কিছুরই নিদারুণ অভাব ও দুষ্প্রাপ্য অবস্থা। এই না পাওয়ার প্রধান ও অতি সহজবোধ্য কারণ হইল মূল্যবৃদ্ধি ও উচ্চমূল্য দিবার ক্ষমতার অভাব। যদি সকলের নিকট অর্থ এত থাকিত যে যত অধিক মূল্যই হউক না কেন তাহা দিয়া যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিবার ক্ষমতার অভাব হইত না তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধিই প্রধান অভিযোগ হইত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পাওয়ার যে ক্লেশ তাহা কাহাকেও ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু মানুষের আর্থিক আয় যতই বাড়ুক না কেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দিয়া আয় বৃদ্ধি কখনও জয়লাভ করিতেছে না। ইহা ব্যতীত আর একটা কথাও আছে। তাহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থাৎ যাহারা দ্রব্য ক্রয় করিবে তাহারা সংখ্যায় ক্রমশঃ অধিক হইতেছে বলিয়া ক্রেতার সংখ্যার তুলনায় দ্রব্যের সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িতেছে না। অর্থাৎ চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু বিক্রয় বস্তুর পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না। ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই ঘটিতেছে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা পূর্ব্বে বহু বস্তু ক্রয় করিত না তাহাদের মধ্য হইতেই ক্রমশঃ ঐ সকল বস্তু ক্রয় করিবার ক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা আরম্ভ হইতেছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় ক্রেতা-বৃদ্ধি অধিকতর সংখ্যায় হইতেছে। জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, জনসাধারণের রোজগার বৃদ্ধিও কিছু কিছু হইতেছে। ফলে নানা বস্তুর ক্রয়েচ্ছা মানুষের মধ্যে অধিকতর ভাবে জাগ্রত হইতেছে। সরকারী খরচ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। দ্রব্যমূল্য হিসাবে ও নানানিযুক্ত চাকুরে ও ঠিকাদার-দিগকে যাহা দেওয়া হয় সেই সকল অর্থ ক্রমে ক্রমে বাজারে আসিয়া পাড়া টাকার সরবরাহ বাড়াইয়া তুলিয়া ক্রয় বিক্রয় সকল ক্ষেত্রেই তেজী করিয়া তুলিতেছে। ইহার উপরে আছে মালপত্র ক্রয়বিক্রয়, চালান করা, সরকারী ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বিধান, লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদির চাপ ও নানান প্রকার রীতি ও পদ্ধতিগত নিয়মরক্ষার কথা। এই সকল ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ যাহাদিগের করায়ত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি নানান সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া জনসাধারণের সুখসুবিধাতে আরও বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বহু আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার দুর্নীতিঅনুসরণকারীদিগের খোরাক জোগাইবার খরচ মিটাইতে কালোবাজারে উচ্চমূল্যদাতাদিগের হস্তে যাইয়া থাকে এবং ইহা জাতীয় অর্থনীতিকে সহজ সরল ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া গুপ্তপাপের পঙ্কিল পারিপার্শ্বিকে নিমজ্জিত করিয়া দরিদ্রকে আরও অধিক দারিদ্রে ডুবাইয়া দিয়া তাহাদের কষ্টবৃদ্ধি করে ও অন্যায়লব্ধ অর্থে পুষ্ট দুর্নীতি অনুসরণ-কারী ধনিকদিগকে আরও ধনবান্ করিয়া সমাজে পাপের পথকেই কর্মে সক্ষমতার পথ বলিয়া প্রদর্শন করিয়া জাতির ধর্মবোধকে বিনাশ করিয়া থাকে। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই উচ্চপদস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম স্তরের কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতাগণ সবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় দেশবাসীর মানবীয় অধিকার প্রাপ্তি প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং দুর্নীতি বর্জ্জিত ভাবে কোনও কিছুই করিয়া লইবার কথা দেশবাসী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তি চাকুরী না পাইয়া গুণহীন উমেদারগণ মোটাটাকা ঘুষ দিয়া কর্ম্মে মোতায়েন হইতে সক্ষম হইতেছে। ঠিকাদারগণ নিকৃষ্টভাবে কাজ করিয়া এবং নিরেস মাল সরবরাহ করিয়া উৎকোচ দিয়া নিজেদের পাওনার অধিক টাকা পাইতেছে। সমাজে সততার কোনও মূল্য থাকিতেছে না; জুয়াচুরীই ব্যবসাবুদ্ধির উৎকৃষ্টতম পরিচয় বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছে। সৎ-

পথের পথিক যে সে চাকুরেই হউক অথবা ঠিকাদার ব্যবসাদার প্রভৃতি যাহাই হউক—তাহার পক্ষে সক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা অতি দুরূহ কার্য্য বলিয়াই সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে গুণ না থাকিলেও ধোকা দিয়া মিথ্যার আশ্রয়ে কার্য্য সিদ্ধি সম্ভব হয় সেই সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মশক্তি-হীন প্রতারকগণ সক্ষমভাবে নিজেদের প্রাপ্যের অধিক ধন-সম্পদ সমাজের নিকট হইতে আহরণ করিয়া লইতেছে। শুধু যেখানে প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মকৌশল নিঃসন্দেহে না থাকিলে কোনমতেই চলে না, সেই সকল ক্ষেত্রেই গুণবান্‌দিগের যথার্থ সম্মান কোন মতে তাঁহাদিগের পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। সমাজ তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে অধিক পরিমাণে অর্থ দিতেও বাধ্য হইতেছে। অবশ্য ইহা শুধু সেখানেই সম্ভব হইতেছে যেখানে মিথ্যা অভিনয়, সুপারিশ, প্রতারণা প্রভৃতি চলিতে পারে না এবং পূর্ণমাত্রায় গুণ, জ্ঞান, কৌশল ও প্রতিভা না থাকিলে যোগ্যতা ও কর্মপটুতার অভাব সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

দুর্নীতি, মিথ্যা ও অক্ষমতাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সকলের পরিচালনার কার্য্যে উচ্চ স্থানে বসাইয়া জনসাধারণকে সুনীতি, সত্য, সর্ব্বব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সর্ব্বাধিক মঙ্গল প্রভৃতি মানব প্রগতির সার কথা অস্বীকার করিয়া চলিতে শিখাইলে তাহার ফল অতি বিষময় হয়। যে জাতি ও সমাজ ঐভাবে নিজেদের সময় অতিবাহিত করে সেই জাতি ও সমাজের ক্রমবর্দ্ধনশীল অবনতি কেহ রোধ করিতে পারে না ও শেষ অবধি সেই জাতি ও সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উঠিয়া পরে দুর্নীতি, মিথ্যা ও অক্ষমতা আশ্রয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া অবনতি ও পতনের গভীরে চলিয়া যায়। আরও অনেক সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির ঐ কারণেই পতন হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গতি-গোষ্ঠী, দল বা পরিবারও অন্যায়ের পথে চলিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হারাইয়া থাকে ইহা সর্ব্বদাই সর্ব্বদেশে দেখা যায়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য জাতিগত অথবা ক্ষুদ্রতর সমষ্টিগত ভাবে সুনীতি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা যাহাতে অপ্রতিহত থাকে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করা। ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে সকলে যদি জন-মঙ্গলের পথ অনুসরণ করে তাহা হইলে জাতির উন্নতি কিছুতেই অচল হইতে পারে না।

দোকানপাট অফিস কারখানা স্কুল-কলেজ যানবাহন বন্ধ

বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় আমদানী মাল আসা কঠিন হওয়ায় বৃটেনের জনসাধারণের খাদ্যাভাব হয়। তখন সেই অভাব দূর করিবার জন্য বৃটেনের জনসাধারণ খাদ্য বস্তু উৎপাদন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন ও "বিজয়ের জন্য মাটি খোঁড়া আবশ্যক" (Dig for victory) জাতীয় কথা বিজয় চেষ্টার অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কোনও অভাব দূর করিতে হইলে জাতীয় কর্ম্মশক্তি সাক্ষাৎভাবে সেই অভাব দূর করিবার জন্য নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ জন-সাধারণ যদি আত্মনির্ভরশীল না হইয়া শুধু অপরকে বলিয়া-কহিয়া অভিযোগ করিয়া অভাব অথবা দুরবস্থা অপনয়ন চেষ্টা করেন তাহা হইলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা অধিক হয়। নিজেরা ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করিলে ফল সর্ব্বদাই লাভজনক হয়। যে বস্তুর অভাব তাহা উৎপাদন করিলেই অভাব দূর না হইলেও হ্রাস হয় নিশ্চয়ই। সকলে চেষ্টা করিলে বেকার অবস্থা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির অল্পবিস্তর উন্নতি হইতে পারে। যাহারা বেকার তাহারা যে সকল সময়েই কোনও সরকারী দফতরে অথবা কারখানায় চাকুরী পাইবে এরূপ ধরিয়া লইবার কোন কারণ দেখা যায় না। অনেক মানুষকেই নিজ চেষ্টায় কোনও কিছু করিয়া লইয়া রোজগার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। কেহ দোকান খুলে; কেহ মৎস্য, হাঁস মুরগী, ছাগ, মেষ পালন করে; কেহ বা চাষ-বাস করে অথবা কোন বিশেষ কৌশলের কার্য্য করে,

যথা মিস্ত্রির কাজ, বয়ন কার্য্য, বস্ত্রাদি সীবন কার্য্য ইত্যাদি। স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় চাকুরী অপেক্ষা অধিক আয় করিয়া থাকে। কুমার, লোহার, সেকরা, কাঁসারী, ঝালাইওয়ালা, ছাউনীকর্ম্মী, চাটাই-মাদুর-দাঁড় প্রভৃতি প্রস্তুতকারক—কাহারও অবস্থা খুব খারাপ হইবার কথা নয়। যাহারা গাড়ী চালায়, শহরে গিয়া ভৃত্য অথবা মজুরের কাজ করে তাহারাও অভাবে দিন কাটায় না। এখন সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে ও সেই কারণে বিজলি মিস্ত্রির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। রাস্তা ও গৃহ নির্ম্মাণ বাড়িতেছে। তাহাতেও অনেক ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেছে। রেল-রাস্তা, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে ও সেই সকল কার্য্যেও লোক নিয়োগ আবশ্যক। ইহার উপরে রহিয়াছে কয়েক কোটি বালক-বালিকার শিক্ষার কথা, হাসপাতাল খাড়া করার প্রয়োজন এবং আধুনিক জীবন-যাত্রার আনুষঙ্গিক নানান আয়োজন ব্যবস্থা। সকল কিছুতেই মানুষের পরিশ্রমের আবশ্যক এবং এই সকল ব্যবস্থা হইলে কোটি কোটি মানুষের কর্ম্মশক্তি ব্যবহৃত হইবে। ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে তাহাদের বহু নূতন নূতন বস্তু ব্যবহারের কথা উঠিবে। সেই সকল বস্তুর মধ্যে অনেক কিছুই বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় উৎপাদিত হইবে না, গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের কারবারেই সে উৎপাদন কার্য্য সাধন করা হইবে। খাতাপত্র পুস্তকাদি বাঁধান, তৈল নিষ্কাশন, ঘৃত ঔষধাদি প্রস্তুত কার্য্য, আসবাব তৈজসপত্র নির্ম্মাণ, রুটি বিস্কুট প্রভৃতির সরবরাহ ইত্যাদি বহু কিছুই এই জাতীয় কার্য্যের মধ্যে পড়িবে। গ্রামে গ্রামে যদি রাস্তা, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নানা প্রকার লাভজনক কার্য্য করিয়া আয় করিবার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে গ্রাম হইতে দলে দলে বেকার জনমানুষের শহরে যাইবার আর প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু তাহা করিতে হইলে গ্রামের উন্নতি সাধন প্রথমে করিতে হইবে। তাহা না হইলে গ্রামবাসীর শহরে গমন বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ যদি গ্রামে থাকে তাহা হইলে তাহার খাদ্য, বাসস্থান, পরিবারের আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত জীবনযাত্রা প্রভৃতি নানা দিকে একটা সহায়তা প্রাপ্তি সহজ হয়। ফলের গাছ, পুকুরের মাছ, হাঁস মুরগী পালন, দুধের জন্য গরু মহিষ রাখা সকল কিছুই সহজ হয়। শহরের চাল বজায় রাখা ও অধিক ব্যয় করিয়া যাতায়াত, দ্রব্যাদি ক্রয় ও অবসর যাপন ইত্যাদি ব্যয়সাধ্য জীবন নির্ব্বাহ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয় না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, দৈনন্দিন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতিও অল্প ব্যয়ে হইতে পারে। গ্রাম হইতে শহর ও শহর হইতে গ্রামে গমনাগমন করিয়া সময় ও পয়সা নষ্ট করিতে হয় না। শহরে বহু মানুষ ক্রমাগত আসিয়া জুটিলে তাহাতে সকল বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি আরও অধিক করিয়া হইতে থাকে। ইহার কারণ শহরে মানুষের খরচ করিবার অভ্যাস ও গ্রামে লোকাভাব হইয়া নানা বস্তু উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হওয়া ও সেই কারণে সরবরাহের ঘাটতির জন্য মূল্য বৃদ্ধি। সংঘে সভ্যতায় বহুমানবের একত্র বাস করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে হস্ত নিয়োগ করা আধুনিক অর্থনীতিতে, প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই জাতীয় কর্ম্ম বাড়াইয়া চালিয়া ক্রমশঃ গ্রামগুলিকে জন-হীন করিয়া শুধু সহর ও কারখানা চালিত রাখিয়া জাতির অর্থনীতিকে পঙ্গু ও অচল করিয়া তোলাও জাতীয় জীবন নির্ব্বাহের কোন আদর্শ নহে। যাঁহারা আন্দোলন করিয়া ও অভাব-বোধ প্রকট ও সবলভাবে ব্যক্ত করিয়া অর্থনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে-সকল অবস্থা হইতে ব্যাধির জন্ম হয় সেই সকল অবস্থা সংশোধিত না করিতে পারিলে শুধু অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া কোনও চিকিৎসা কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার রীতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ক্ষতি অধিক না হয়। একদিন যদি সকল কার্য্য বন্ধ রাখা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের জাতিগত ভাবে কত টাকা লোকসান তাহা হিসাব করা

(পরবর্ত্তী অংশ ২৪৬ পৃষ্ঠায়)

ঋষিবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বনারসীদাস চতুর্বেদী

(অনুবাদক—রামবহাল তেওয়ারী)

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। গান্ধীজী আমার জন্য সন্ধ্যায় পনের মিনিট সময় বরাদ্দ করেছিলেন। আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম। গান্ধীজী বললেন, "আমাকে জীবনলাল অ্যাণ্ড ম-নিয়ম ওয়ালার বাড়ি যেতে হবে। তুমি কি পথ জানো? সঙ্গে চলো, কথাবার্তাও হবে।" সঠিক রাস্তা জানতাম না, তবু সঙ্গে গেলাম। আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম, তাই যেতে আধঘণ্টার মতো সময় লেগে গেল। অনেক কথা হল। প্রসঙ্গক্রমে রামানন্দ-বাবুর কথাও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী বললেন, 'রামানন্দবাবু একজন ঋষিব্যক্তি।'

বাপুজী এই বাক্যটিতে রামানন্দবাবুর চরিত্রের সমগ্র রূপটিই যেন চিত্রিত করে দিয়েছিলেন। বড়বাবুর সুদীর্ঘ ও সৌম্য মূর্তির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দীর্ঘ তপস্যা ও নিরন্তর সাধনার প্রতীক ওই মূর্তিটি জাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করত। ফ্রান্সের মহাশিল্পী রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে প্রথমবার দেখেই লিখেছিলেন—

"How sympathetic he is by nature! The moment one sees him, one must love him. He radiates so much of affection and goodness; and so simple and modest he is! His patriarchal figure makes me think of a Tolstoy more sweet and compassionate."

অর্থাৎ, "তাঁর (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের) প্রকৃতি কত সংবেদনশীল! যে মুহূর্তে কেউ তাঁকে দর্শন করবে সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁকে ভালো না বেসে পারবে না। প্রেম ও সৌজন্য যেন সর্বদাই বিকীর্ণ করছেন! তিনি কত সরল ও বিনয়ী! তাঁর সৌম্য আকৃতি আরও মধুর আরও স্নেহপ্রবণ টলস্টয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

এমন মহামানবের পায়ের কাছে দশ বছর বসবার সৌভাগ্য আমি কখন এবং কেমন করে পেল —সে কাহিনী হয়তো অন্যের কাছে উপভোগ্য হবে ১৯২৭ সালের কথা। তখন আমি 'অভ্যুদয়' কাজ করি, শ্রীকৃষ্ণারাম মেহতার কৃপায় থাকবার জ একটি ঘর পেয়েছিলাম 'লিডার ভবনে'। একদিন সন্ধ্যে বেলায় বেড়াতে বেড়াতে আমি শ্রীরামরথ সি সায়গলের 'চাঁদ' কার্যালয়ে গিয়ে হাজির হলা সেখানে শ্রীসায়গলজী জানালেন 'মডার্ণ রিভিউ' অ থেকে একটি হিন্দী মাসিক পত্র বের করা হবে। তাঁ জিজ্ঞাসা করলাম এই খবর তিনি কোথায় পেলে উত্তরে তিনি রামদাসজী গৌড়ের কথা বললেন। শ্রীগৌ রামানন্দবাবুর অধীনে এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশা পূর্বে কাজ করতেন।

আমি সোজা পণ্ডিত সুন্দরলালজীর নিবাসে গেলাম। ১৯১৭ সাল থেকেই আমি তাঁর স পরিচিত। তিনি ছিলেন আমার গুরুতুল্য। পূর্বোক্ত সেই পত্রিকার সম্পাদকের পদের জন্য আবেদন কর তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন। তি সুপারিস করে দেবেন। সে কাজটি আমি পাবই এ আশা ছিল না, তবু পণ্ডিতজীর হুকুম আমি তা করলাম। পৃথকভাবে একটি পত্রে সুন্দরলালজী লিখেছিলেন তা জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধেয় রামানন্দব তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁ পরিচয় বহুদিনের পুরনো। পণ্ডিতজীর হৃদ রামানন্দবাবুর জন্য শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

সে সময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর কাছে আমি যে প্রার্থনা পূর্ণ পত্রখানি লিখেছিলাম, দৈবক্রমে আমার পুর

কাগজপত্রের মধ্যে তার একটি প্রতিলিপি থেকে গেছে। সে পত্রটি ১১।৫।২৭ তারিখে ফিরোজাবাদ থেকে ইংরেজিতে লেখা। তার সারাংশ এই—

"যদিও আপনার 'মডার্ণ রিভিউ'কে আমি সর্বোত্তম মাসিকপত্র বলে মনে করি তথাপি 'বিশাল ভারত' তার অনুবাদে পর্যবসিত হোক তা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস আপনিও তা চান না। আমাদের হিন্দী পত্রিকাটির পৃথক স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। কয়েক বছর তাকে 'মডার্ণ রিভিউ'র উপকরণের উপরই নির্ভর করতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবু তার ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হওয়াই ভালো, যাতে সে 'মডার্ণ রিভিউ' থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেও তাকে কিছু দিতে পারে। আপনার অবগতির জন্য আরও নিবেদন করি যে, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি। শান্তিনিকেতনে (যেখানে আপনার সুসন্তান মুলু থাকতেন) আমি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এবং তার রক্ষায় আমি সতত আগ্রহী। আপনার হিন্দী পত্রিকা সম্পাদনের সুযোগ যদি আমায় দেন, তবে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, আপনার অধীনে কাজ করতে গিয়ে আমাকে আমার আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে না। মা তার সন্তানকে যেমন স্নেহ করে, শ্রীএণ্ডরুজও তেমনি আমাকে স্নেহ করেন। আমি কাজ করার সুযোগ গেলে তিনিও খুব খুশী হবেন। তিনি অতি উত্তম সুপারিস করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমি ধর্মসঙ্কটে ফেলতে চাই না।

"আপনি সম্পাদকের পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এবং নিজের পছন্দ মতো লোকও বেছে নিতে পারেন।"

৪৬ বছর আগের নিজের চিঠি পড়ে আজ লজ্জায় মরে যাই। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৩৪-৩৫ বছর সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা-হীনতার জন্যই এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বড়বাবু অত্যন্ত শান্ত ও সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক ছিলেন, আমার বালসুলভ ধৃষ্টতা তিনি ক্ষমা করে দিয়ে থাকবেন।

আমার আরও অনুমান, তাঁর স্বর্গত পুত্র মুলুর (প্রসাদ) নামের উল্লেখে তাঁর মন নরম হয়ে থাকবে। রামানন্দবাবু অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, প্রসাদের পবিত্র স্মৃতি তিনি কোনদিনও ভুলতে পারেননি। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি প্রসাদ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা ছাপিয়েছিলেন। তার একটি কপি ১৯২০ সালে আমি দীনবন্ধু এণ্ডরুজের কাছথেকে পেয়েছিলাম।

আমার কলকাতা-যাওয়া যখন প্রায় নিশ্চিত, সেই সময় আমি আরও একটি বোকামি করে বসলাম। আত্মীয়স্বজনদের কাছে শুনেছিলাম—কলকাতার জলবায়ু ভালো নয়; এই ভয়ে পড়ে আমি রামানন্দবাবুর কাছে অস্বীকৃতি জানিয়ে চিঠি লিখে দিলাম। শুধু তাই নয়, বন্ধুবর জয়চাদজী বিদ্যালঙ্কারের জন্য জোরালো সুপারিস করে আরও একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। যার ফলে রামানন্দবাবু সুন্দরলালজীর কাছে চিঠি লিখলেন। আমি সুন্দরলালজীর আগ্রহভরা পত্র পেলাম। সে সময় আমি পঞ্চাশ টাকা বেতনে বন্ধুবর হরিশঙ্কর শর্মার অধীনে 'আর্যমিত্র'র সহায়ক সম্পাদক ছিলাম আর বিশাল ভারতের ১৭৫ টাকা বেতনের কাজ অস্বীকার করে বসলাম। ভাই হরিশঙ্কর শর্মাও বিশাল ভারতের চাকরিটি নেওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের ০১ অক্টোবর কলকাতায় গিয়ে বিশাল ভারতের কাজে যোগ দিই। ১৯৩৭ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করি। এই ভাবে সেখানে অতিবাহিত দশটি বছরকে আমার সাংবাদিকতার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ পর্ব বলে মনে করি।

স্বর্গত রামানন্দবাবুর (যাঁকে আমরা সকলে 'বড়বাবু' বলেই ডাকতাম) জীবন নিয়ে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন, আমি কেবল আমার অভিজ্ঞতার কথাই লিখব।

রামানন্দবাবু স্বয়ং ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়।

এবং দশ বছর ধরে আমাকেও পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। এমন কি তিনি হিন্দুমহাসভার অধ্যক্ষ হওয়ায় আমি তাঁরই পত্রিকায় তাঁরই বিরুদ্ধে লিখি, তিনি অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে তা সহ্য করেন।

সুরাটে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে ফিরে এসে তিনি বিশাল ভারতের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন, "পণ্ডিতজী, আমার ভাষণ সম্পর্কে হিন্দী পত্র-পত্রিকায় কিছু আলোচনা হয়ে থাকলে আমাকে বলুন।" আমি বললাম, "আপনার কাগজ বিশাল ভারতে কী বেরিয়েছে দয়া করে পড়ে নিন।"—এবং বিশাল-ভারতের ওই সংখ্যাটি তাঁর হাতে এগিয়ে দিলাম। তাতে লেখা হয়েছিল, "জাতীয়চেতনাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিন্দুমহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করা উচিত নয়।" আমার এই অভিমতটি পড়ে নিয়ে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আপনার কাগজে এর উত্তর ছাপতে পারবেন?" আমি বললাম, 'অবশ্যই ছাপব।" তা শুনে বড়বাবু বললেন, "আমি হিন্দী বলতে তো পারি কিন্তু প্রবন্ধ লিখতে পারি না। আপনি কি আমার ইংরেজী লেখা অনুবাদসহ ছেপে দেবেন?" আমি তাতে রাজি হয়ে গেলাম। বড়বাবু ইংরেজীতে যুক্তিপূর্ণ এবং বেশ কড়া উত্তর লিখে পাঠালেন। অনুবাদসহ সেটি ছাপা হল। তাঁর সেই পত্রটি ১৯২৯ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে লিখিত। আজ ৪৪ বছর পরও সেটি পড়ে স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য লজ্জা বোধ করি। বর্তমানে সেরূপ আলোচনা, তাও আবার তাঁর মতো মহৎ সাংবাদিকের বিষয়ে, করার কল্পনাও করতে পারি না। আমার এই অভিমতটি পূজনীয় দ্বিবেদীজী এবং পণ্ডিত পদ্মসিংহজীর মনোমত হয়নি। শ্রদ্ধেয় দ্বিবেদীজী তো এমন কথাও বলেছিলেন, "আমরা তো রামানন্দবাবুকে গুরুতুল্য জ্ঞান করি। আমাদের মন্তব্য লেখার হাতে খড়ি তাঁরই কাছে। তাঁর সমালোচনা করা আপনার উচিত হয়নি।"

কিন্তু আমার সেই মন্তব্যের একটি ভালো ফলও দেখা দিল। বড়বাবু যে কতবড় স্বাধীনতার পূজারী তা ওই মন্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করল। প্রেস কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদানকালে জনৈক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ওই ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। স্বর্গত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনারসীদাস কাপাড়িয়া এবং পণ্ডিত সুন্দরলালজী রামানন্দবাবুর মহাপ্রয়াণের পর এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তাঁদের রচনায়। হিন্দুমহাসভার সম্পাদক শ্রীপদ্মরাজ জৈন যখন বড়বাবুর কাছে অভিযোগ করলেন যে স্বয়ং তাঁরই পত্রিকা 'বিশাল-ভারতে-এ হিন্দুমহাসভার বিরুদ্ধে কটূক্তি করা হয়েছে কেন? তখন বড়বাবু স্পষ্টভাবে কেবল এইটুকু বলেছিলেন, "পণ্ডিতজীকে আমি আমার মতোই স্বাধীন মনে করি, তাঁর স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারি না।"

আমার দশ বছরের ওই জীবনের এমন একটি ঘটনাও মনে পড়ে না, যাতে বড়বাবু আমার উপর কিছুমাত্রও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছেন। যখন ইচ্ছা অফিসে যেতাম, যখন ইচ্ছা ফিরে আসতাম, যা ইচ্ছা তাই লিখতাম এবং যাকে ইচ্ছা নিজের দপ্তরে নিয়োগ করতে পারতাম। কেবল একটি বিষয়ে আমার স্বাধীনতা ছিল না—কোনো অধীনস্থ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার। এ ব্যাপারে বড়বাবু খুবই সজাগ থাকতেন। সবচেয়ে ছোট চাপরাশিরও 'চাকরি যাওয়া' তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

অবশ্য একবার বড়বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নাটকে কাজ করে এমন নর্তকীদের চিত্র বিশাল-ভারতে ছাপা হয়েছিল। তা দেখে তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না, কিন্তু যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে কিছু বেশি, সুতরাং এই পরামর্শ দিতে পারি যে, নর্তকীদের চিত্র 'বিশাল-ভারতে' ছাপবেন না, তারা প্রায়ই চরিত্রহীন হয়।"

অশিষ্টের মতো আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম। বললাম, 'একজন সম্পাদক কার-কার চরিত্রের বাছবিচার করতে পারে? বোধ-হয় বহু নেতা এবং নেত্রীদেরও চরিত্র ভালো নয়।" তাতে বড়বাবু শুধু বললেন,

...রা এবং নেত্রীরা মঞ্চে উঠে নিজের হাব-ভাবে সাধারণকে পথভ্রষ্ট করেন না, কিন্তু নর্তকীরা তা ...ই থাকেন।"

এ ব্যাপারেও বড়বাবু আমাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন, ...ু ভেবেচিন্তে তাঁর নির্দেশই মেনে নিলাম। কিছু পরে শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সুপ্রসিদ্ধ ...তত্ত্ববিদ্) আমাদের কার্যালয়ে এসেছিলেন। তাঁর ...ে ঘটনাটির উল্লেখ করায়, তিনি হেসে বললেন—

"আমিও নিজের একটি ঘটনা বলি। একবার আমি ...ে গিয়েছিলাম কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও ছাত্র, আমিও। আমার কাছে একজন ...ক্ট্রেসের' ছবি ছিল। ভুলের ফলে সেটি বড়বাবুর ...েই পড়ে থাকল। পরের দিন সেখানে পৌঁছে ...চারটুকরো করে ছবিটি যেখানকার সেখানেই আছে। আমি কেদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম ...ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'স্বয়ং বড়বাবু ...াকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। বড়বাবু প্রাচীন ...ের মানুষ, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা আপনার উচিত ...'

...নে রাখা প্রয়োজন যে, বড়বাবু জীবনে একটিও ...বা সিনেমা দেখেন নি, তবে শান্তিনিকেতনে ...দের নাটক তিনি অবশ্যই দেখেছিলেন।

...বিশাল ভারত' ত্যাগ করার পরও ১৯৩৯ সালে যখন ...তাতে 'অরাজকতাবাদ' ও 'অরাজকতাবাদী'দের ...ে আমার প্রবন্ধ ও মতামত প্রকাশ করি, তখনও ...ু আমাকে নিরস্ত করেন নি। শুধু বলেছিলেন ...ক্ষ রাখা দরকার—এই জাতীয় রচনা যেন প্রচলিত ...নের বিরোধী না হয়।

...ড়বাবু কোনোদিন চাননি যে, 'বিশাল-ভারতে' ...-দেশ অথবা বাঙালীদের জন্য কোনোপ্রকার ...কার্য হয়। একটি চিঠি লিখে তিনি এবিষয়ে ...কে সাবধানও করে দিয়েছিলেন।

...খানে একটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রা... ...হবে না। উত্তর প্রদেশের একটি হিন্দী পত্রিকার ১৯৩৫ সালের ৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'হিন্দী শোষক এজেন্সিয়াঁ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে দোষারোপ করা হয়েছিল যে, 'বিশাল-ভারত' হিন্দীভাষীদের পেটের অন্ন কেড়ে নিয়ে বাঙালীদের পেট ভরছে; সুতরাং তাকে 'বয়কট' করা উচিত। প্রবন্ধটি আদ্যন্ত এইরূপ মিথ্যা অভিযোগে পূর্ণ ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক রামানন্দবাবুর কাছেও ওই সংখ্যাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি পড়ে বড়বাবু খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। আমাকে ঘরে ডেকে এনে বলেছিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনি তো জানেন যে, বিশাল-ভারতের জন্য আমরা প্রতি বছর ২ হাজার-হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করে চলেছি। তা সত্ত্বেও হিন্দীওয়ালারা যদি আমাদের 'শোষক' মনে করে তবে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন।"

বড়বাবুর কথা শুনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং বুঝে নিলাম যে, আট বছরের পত্রিকা 'বিশাল-ভারত'-এর আয়ুষ্কাল শেষ হতে চলেছে। তা সত্ত্বেও ...হস করে সুদৃঢ় সবিনয়ে নিবেদন করলাম, "বড়বাবু, এটি আমার ইজ্জতের প্রশ্ন। এখনই যদি 'বিশাল-ভারত' বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। সেইজন্য আরও এক বছরের সময় আপনি আমাকে দিন। যদি এই সময়ে তার কোনও উন্নতি না ঘটে, তবে আপনি বন্ধ করে দেবেন।"

বড়বাবু দয়াপরবশ হয়ে আমার কথা মেনে নিলেন তারপর তিনি সেই সম্পাদকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁর নাম বলে দিলাম। সে ভদ্রলোক ছিলেন বড়বাবুর একজন প্রাক্তন শিষ্যের পুত্র, তা জেনে বড়বাবুর কষ্ট আরও বেড়ে গেল। সেবারের মতো 'বিশাল-ভারত' রক্ষা পেয়ে গেল এবং তারপর ব... বছর ধরে তা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। একবার রামানন্দবাবু 'মডার্ণ রিভিউ'তে লিখেও ছিলেন—

"Our losses in the Vishal Bharat have run into five figures—"

অর্থাৎ "বিশাল-ভারতের জন্য আমাদের হাজার হাজার টাকার লোকসান হয়েছে।"

বড়বাবু ছিলেন মিতভাষী এবং সঙ্কোচগ্রস্ত স্বভাবের। কথা বলতেন খুবই কম। যখন তিনি সত্তর বছরে পা দিলেন, তখন তাঁকে সার্বজনিক সংবর্ধনা জানাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন-নি। উদ্যোগীদের আগ্রহাতিশয্যে—'প্রবাসী'-প্রেসের কর্মচারীরা দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে নিয়ে একটি ছোট্ট ঘরোয়া সভা করতে পারেন, এই শর্তে তিনি রাজি হলেন। এই ঘরোয়া সভাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়, প্রবাসী প্রেসের বন্ধুরা আমাকেই সভামুখ্যের স্থানে বসিয়েছিলেন; সে সম্মানের যোগ্য আমি ছিলাম না, তবু আমার পক্ষে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য পরম গৌরবের ছিল। এই সংবর্ধনা [illegible] কয়েকদিন পরে অবাধ্যের মতো বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—"এত বয়সেও আপনি এতটা পরিশ্রম করেন কি করে?"

তিনি বললেন, "আমি আর কি পরিশ্রম করি, পরিশ্রম করেন ডঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড (আমেরিকান লেখক) [illegible] বছর বয়সেও [illegible] লেখা পাঠিয়ে চলেছেন। তবে হ্যাঁ, এক সময় আমিও পরিশ্রম করতাম: সকালে চার-পাঁচ ঘণ্টা, দুপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর তিন-চার ঘণ্টা এবং রাত্রেও দু ঘণ্টা। এখন আর তা পারি না।"

যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল, বড়বাবু অফিসে এসে তাঁর লেখা ও মতামতের শেষ প্রুফটি নিজে দেখে যেতেন। শেষের দিকে হৃদয়ের দুর্বলতার জন্য সিঁড়ি ভাঙতে পারতেন না, তাই নিচের তলাতেই বসে প্রুফ দেখতেন। একদিন তিনি প্রুফ দেখছেন, সেই সময় তাঁকে না জানিয়েই আমি তাঁর একটি ছবি তুলে নিলাম। ডেভেলপ করার জন্য ফিল্মটি পাঠালাম 'কোডাক' ওয়ালাদের কাছে। তাঁরা লিখে পাঠালেন চিত্রটি বড় করিয়ে নিলে ভালো হবে। দৈবেক্রমে বড়বাবুর সেই চিত্রটিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হল।

সেই চিত্রটির একটি বৃহদাকার ডঃ কালিদাস নাগের ঘরে টাঙানো ছিল। সেটি দেখে একজন অতিথি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই চিত্রটি কি কোনো জার্মান ফোটোগ্রাফরের তোলা?" তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, একজন জার্মান পণ্ডিতের, যিনি টিকমগড়ে থাকেন।" শ্রীকেদারবাবুও বলেছিলেন, "বড়বাবুর ভবামূর্তি চিত্রের খুবই উপযোগী ছিল কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র আপনারটাই।"

দশবছরে আমি কি শিখেছি আর কি না শিখেছি? এখানে আমি অকপটভাবে স্বীকার করব—যে দশ বছরের দীর্ঘ পথে আমি অনেক কিছু শিখে নিতে পারতাম, কিন্তু পারিনি। তাঁর প্রথম অসামান্য গুণ, যা আমার চোখে ধরা পড়েছিল, তা হল—তাঁর সুসমঞ্জস জীবন। দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য যেমন উত্তম রূপে পালন করেছেন, তেমনি, [illegible], সন্তান-সন্ততির প্রতিও [illegible] [illegible] তাঁদের [illegible] ক্ষেত্রের পূর্ণ বিকাশের [illegible] শ্রীকেদারবাবু [illegible] জন্য তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন [illegible] তাঁর [illegible] লিখেছেন, তাঁর কন্যা শ্রীমতী [illegible] মহাপুরুষের [illegible] একটি [illegible] এমার্সনের এই উক্তি—

"Thy love afar is spite at nome."

অর্থাৎ "প্রেম তোমার পরের জন্য, ঘরের জন্য দ্বেষ" তাঁর সম্পর্কে খাটে; কিন্তু রামানন্দবাবু এবিষয়ে পুরোপুরি নির্দোষ ছিলেন। তাঁর চরিত্রের দ্বিতীয় গুণ ছিল এই যে তিনি অপরের উপকার গ্রহণ করতেন খুবই কম, কিন্তু অপরের উপকার করতেন অত্যন্ত বেশি। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচিন্তামণি ঘোষ এবং মেজর বামনদাস বসু—মাত্র এই দুজনের কাছ থেকে। সেই সাহায্যের প্রকৃতি ছিল এই রূপ—তিনি শ্রীচিন্তামণি ঘোষকে 'প্রবাসী'-মুদ্রণের বিল মেটাতেন বছরের শেষে এবং মেজর বসু তাঁর গ্রন্থ মুদ্রণের খরচ অগ্রিম দিয়ে দিতেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি অনন্যভক্ত ছিলেন,

তাঁর সেবার কোনো সুযোগই তিনি হারান নি। কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' অথবা 'বিশ্বভারতী'র কাছ থেকে কোনো উপকার বা সাহায্য গ্রহণ করেননি। গুরুদেবের গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের অধিকার তিনি 'রয়াল্টি' দিয়েই নিয়েছিলেন। একবার আমার কয়েকটি ব্লকের প্রয়োজন হয়, যা 'বিশ্বভারতী' থেকে সহজেই পাওয়া যেত। আমি বিশ্বভারতীর থেকে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তা শুনে বড়বাবু বললেন, 'না চাওয়াই ভালো।'

তাঁর চরিত্রের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গুণ হল—নিজের জন্য যথাসম্ভব কম খরচ করা ও অতি সাদা-সিধা জীবন যাপন করা। ছোট ছোট কাগজের টুকরোও তিনি কাজে লাগাতেন। নিজের সময়ের প্রতিটি ক্ষণ এবং শক্তির প্রতিটি কণাকে তিনি রক্ষা করে চলতেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি কোনো সাধারণ সভায় যেতেন না। কিন্তু 'লীগ অব নেশন্‌স'-এর আমন্ত্রণে ইউরোপ যাওয়ার সময় তাঁকে সে নিয়ম ভাঙতে হল, লোকে বলত, "আপনি যদি ইউরোপ যেতে পারেন, তো আমাদের সভায় আসেন না কেন?"—এর কোনো সমুচিত উত্তর তাঁর কাছে ছিল না।

'লীগ অব নেশন্‌স্'এর আমন্ত্রণে ইউরোপে গেলেও তাঁদের কাছ থেকে পাথেয় রূপে একটি পয়সাও তিনি গ্রহণ করেন নি। এই ভাবে কয়েক হাজার টাকার লোকসান তিনি অকাতরে স্বীকার করলেন। তিনি বলতেন, "যদি পয়সা গ্রহণ করি তবে আমার অবচেতন মনে তার প্রভাব পড়তে পারে, ফলে হয়তো সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশে অক্ষম হয়ে পড়ব।"

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি 'লীগ অব নেশন্‌সের' কঠোর সমালোচনা করলেন। তাতে 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট'-এ মন্তব্য করা হয়—"এটা 'লীগ অব নেশন্‌সে'র আতিথ্যের দুরুপযোগ।"

"An abuse of the hospitality of League of Nations."

বড়বাবু এর সমুচিত উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, "আমি কি 'সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেট'-এর সম্পাদককে জানাতে পারি যে, এক কাপ চায়ের জন্যও আমি লীগ অব্ নেশন্‌স-এর কাছে ঋণী নই?"

সম্পাদকীয় অধিকারের ক্ষেত্রেও বড়বাবু অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হোক বা লালা হরদয়ালেরই হোক। তিনি বলতেন, যদি কোনো লেখক শাসিয়ে তাঁর লেখা ঠিক যেমনটি আছে তেমনি ছাপাতে চান, তবে তাঁকে এই একটি উত্তরই দেওয়া যেতে পারে—"লেখা ছাপা হবে না।"

একটি মজার গল্প। শোনা যায় কাশীতে গঙ্গাস্নানের সময় বড়বাবু একবার ডুবতে লাগলেন। সে সময় একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁকে রক্ষা করেন। বড়বাবু সেই যুবককে নিজের কলকাতার ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে বললেন, "কলকাতায় এলে, আমার দ্বারা সম্ভব এমন কাজের কথা আমাকে বোলো।" সেই যুবক যখন কলকাতায় এলেন, তখন একটি স্বরচিত কবিতা নিয়ে 'প্রবাসী প্রেসে' হাজির হলেন। কবিতাটি বড়বাবুকে দিলেন। কবিতাটি ছিল মামুলি। বড়বাবু বললেন, "তোমার এ কবিতা ছাপা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি চাও তো আমায় ভাগীরথীতে ডুবিয়ে দিতে পার।"

লালা হরদয়াল তাঁর একটি প্রবন্ধ একই সঙ্গে 'মডার্ন রিভিউ' এবং লাহোরের একটি উর্দু পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। সেটি সম্পাদনান্তে বড়বাবু ছাপলেন। ওদিকে উর্দু পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মামলা করে দিলেন। সাক্ষ্য দেবার জন্য বড়বাবুকে লাহোর যেতে হয়েছিল। গুরুদেব, মিস্টার ব্রেলস্‌ফোর্ডের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Rebel India'র একটি সমালোচনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। আইনের দৃষ্টিতে তার কোনো-কোনো অংশ আপত্তিকর মনে হওয়ায় বড়বাবু সুস্পষ্ট করে লিখে পাঠালেন, "এখানে আমি অক্ষম। এই ধরণের অস্বীকৃতির ফলে আমার চোখে ঘুম আসে না। কিন্তু প্রচলিত আইনের ফাঁদে আমি পড়তে চাই না।"

বড়বাবু অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা লিখতে চাইতেন না। শহীদ এবং

বিপ্লবীদের বিষয় নিয়ে তিনি যত লিখেছিলেন সম্ভবতঃ অন্য কোনো পত্রিকায় তত লেখা হয়নি। 'মডার্ণ রিভিউ'র পুরনো ফাইলের প্রবন্ধ এবং মতামতগুলিই তার প্রমাণ। শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন যে, যখন জেলে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে বড়বাবু মডার্ণ রিভিউতে একটি জোরাল 'নোট' লিখেছিলেন। আন্দামানে ইন্দুভূষণ নামক একজন বাঙালী যুবক গলায় দড়ি দিলে, তার বিবরণও ১৯১০ সালের মডার্ণ রিভিউর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। না জানি কতবার 'মডার্ণ রিভিউ' অফিসে খানাতল্লাশ হয়েছিল। ডঃ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'India in Bondage' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ায় বড়বাবুকে প্রচুর অর্থক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি সব গ্রন্থই পুলিশকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শোনা যায় পুলিশের লোকেরা এক-একটি গ্রন্থ ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি করে অর্থোপার্জন করেছিল।

একজন সহায়-সম্বলহীন যুবক তাঁর পত্রিকা 'মডার্ণ রিভিউ'কে কি করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন—সে বিবরণ যেমন দীর্ঘ তেমনি আনন্দদায়ক। সাণ্ডারল্যাণ্ড একবার লিখেছিলেন, "মডার্ণ রিভিউর সমকক্ষ কোনো পত্রিকা আমেরিকায় এবং য়ুরোপেও আছে কি না সন্দেহ।"

'মডার্ণ রিভিউর' মাত্র তিন-চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরই বিলেতে একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন, "এমন গভীর ও বিবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকা আমাদের দেশে নেই বললেই হয়।"

বড়বাবু ছিলেন নিষ্কামকর্মী। তিনি 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' উপদেশের অনুসারী ছিলেন। একবার সি. ওয়াই. চিন্তামণিজী তাঁর বিষয়ে আলোচনায় 'noblest, ablest, and the best' প্রভৃতি গুণবাচক শব্দ প্রয়োগ করেন। বড়বাবু আমাকে ডেকে বললেন, "আপনি তো চিন্তামণিকে জানেন? তাঁকে লিখুন যে, এমন অভিজ্ঞ সম্পাদক এরকম অসঙ্গতিপূর্ণ ভাষা লেখে কেন?" আমি বড়বাবুর কথা শুনে তো নিলাম, কিন্তু চিন্তামণিজীর কাছে লিখব এমন সাহস হল না। মনে রাখার বিষয় হল, 'লিডার' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ কালে চিন্তামণিজী রামানন্দবাবুর সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করতেন এবং বড়বাবু তাঁকে পথনির্দেশ দিতেন।

'মডার্ণ রিভিউ' প্রকাশের পূর্বে বড়বাবু তিন বছরের মতো সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তাঁর পত্র-পত্রিকার সাফল্যের কৃতিত্ব বহুলাংশে তাঁর সহধর্মিণীর (সর্বশ্রী কেদারবাবু অশোকবাবু, শান্তাদেবী, ও সীতা-দেবীর পূজনীয়া মাতৃদেবীর) প্রাপ্য। তিনি পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি সহায়তা করতেন। কিন্তু প্রসাদের মৃত্যুতে তাঁর হৃদয়ে যে গভীর ধাক্কা লাগে তাতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।

একথা খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, 'সরস্বতী' পত্রিকা প্রকাশের পরামর্শ বড়বাবুই শ্রীচিন্তামণি ঘোষকে দিয়েছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ'র প্রাচীন ফাইলগুলি আজ ভারত সম্পর্কে বিশ্বকোষের কাজ করে থাকে। পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারগুলিতে সেগুলি পাওয়া যায়।

বড়বাবুর চরিত্রে এইরকম অনেক গুণ ছিল যা ভারতীয় সাংবাদিকদের অনুকরণীয়। তিনি খুবই সংযম ও নিয়ম মেনে চলতেন। তাঁরে অধীনস্থ লোকদের কাছ থেকেও তিনি নিয়মানুগ কাজ প্রত্যাশা করতেন। যখন তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে আচার্য ছিলেন, সে সময় দীনবন্ধু এণ্ডুরুজের পক্ষেও নিয়মশৃঙ্খলা অমান্য করার উপায় ছিল না। তাঁর জীবনের সফলতার চাবিকাঠি ছিল 'আত্মনিয়ন্ত্রণ।'

শক্তিসঞ্চয়, সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর স্বাভাবিক গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাবু বিনয়ী হয়েও অত্যন্ত আত্মসচেতন ছিলেন।

এহেন মহাপুরুষের পায়ের কাছে বসবার সৌভাগ্য আমি দশ বছর ধরে লাভ করেছিলাম।—এ আমার পূর্ব-জন্মের পুণ্যকর্মেরই ফল বলে আমি মনে করি।

শান্তি বৌদি

মুকুল সেনগুপ্ত

ভোরের কুয়াশাবৃত আকাশ।

রেলওয়ে কলোনীর একখানি বারান্দায় ঘুম ঘুম তন্দ্রালু চোখে চেয়েছিলেন শান্তিবৌদি। সামনের বাগানে গুলঞ্চলতায় ফুল ধরেছে অনেক। আর, তার পাশেই ওই বুনোগাছটা, যে গাছটা ফুল ধরিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, ফল দেয়নি একটিবারও, সেই বন্ধ্যা গাছটা শীতের কুয়াশায় কেমন গামুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছে। বন্ধ্যা গাছ, স্বামীর মন্তব্যটা মনে পড়ল! শান্তিবৌদির চোখে জল। ঠোঁটটা একটু হেলিয়ে হাসলেন বুঝি।

বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর। জীবনে সাতটি বসন্ত এসেছে গেছে। ফুল ধরেছে ওর দেহবল্লরীতে; কিন্তু হায়, ফল ধরেনি একটিবারও। বন্ধ্যা বউ, লোকে তাই বলবে, হয়ত বলতে আরম্ভ করেছে। না হলে আরিন্দম দিনে দিনে অমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়বে [illegible] আজ আর কোনদিকে [illegible] শান্তিবৌদি। কিন্তু [illegible] আক্ষেপ করেন, হয়ত [illegible] তো [illegible] তো [illegible] বিয়ের [illegible]

আ[illegible] কুয়াশা [illegible] আর কাটবে না। কত বেলা হ'ল, আরিন্দম ঘুমিয়েই আছে। আজ ওর মর্নিং ডিউটি। মাথার ধারে টাইম-পীস্‌টা বেজে বেজে থেমে গেছে। ঘুমে অচেতন আরিন্দম। বেচারা! আফশোষ করলেন শান্তিবৌদি। আহা, বেচারা! মনে মনে বললেন, আরিন্দম, তুমি বিয়ে করেছ, পাওনি ঘরকরণা, যা তুমি চেয়েছিলে। সমস্ত দেহ মন দিয়ে চেয়েছিলে। অক্ষমতা, আমারই অক্ষমতা। চেষ্টার তো কোন ত্রুটি ছিল না। কত ডাক্তার ওষুধ হ'ল। কত খরচ করলে অক্ষম স্ত্রীর পেছনে। ডাক্তাররা সবাই একমত—হবে না।

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে ডাকলেন শান্তিবৌদি,

'ওঠো। শুনছ?'

'উঁ।'

'উঠে পড়। এলার্ম হয়েছে।'

শেডের ডিউটি। কাছেই শেড। রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। ধোঁয়া আর কালি। স্টিম এঞ্জীনের একঘেয়ে আওয়াজ। ঘট ঘট ঘটাং ঘটাং। কালিঝুল নিয়ে কারবার। ধোপাবাড়ির ইস্ত্রিকরা প্যান্ট-শার্ট পরে যায়, ফেরে যখন, তখন জামাকাপড়ের ইজ্জত একেবারে গেছে। একহাতে আলকাতরার পলেস্তারা তুলতে সাবান ক্ষয়ে একশেষ। মর্নিং ডিউটিতে খাওয়ার ছুটি পৌনে-একঘণ্টা। তারই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে খেতে যায় গোগ্রাসে। পান সেজে অপেক্ষা করেন শান্তিবৌদি। খাঁচিয়ে উঠেই সেটা ছোঁ মেরে মুখ গুঁজেই ছুট দেয় আরিন্দম। চুনটুকু মুখে দেবার অবসর থাকে না। চাকরি প্রাণের উপর দিয়ে উঠেছে।

হুয়ারোগ্য রোগে গতপ্রাণ শাশুড়ির অবয়বহীন স্মৃতির আতঙ্ক বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। সময়ের তালে তা' যদি কেটেছে, এসে জুটল অন্য অজুহাত। বুক পুড়ে যায় শান্তির। বুঝে পায় না, এই প্রতিকারহীন সমস্যার সমাধান ও করবে কি দিয়ে। ডাক্তাররা বলেছেন, অক্ষমতা শান্তিরই! অনেক কেঁদেছে শান্তি। এক-ঘর কথা অস্বস্তিকর গুমোট চাপ-ধরা বদ্ধ বাতাসের চেপেছে ওর বুকে। বিয়ের পর সাতটি বছরই ওর কেবল প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। সে কেউ বুঝল না বুঝবেও না কেউ। উল্টে খোঁচা আর অপমান! বউ

অপয়া, সে অলক্ষ্মী, সে অশুচি—অরিন্দমের সবচেয়ে সংসারে অশান্তি ডেকেছে সে-ই।

'কই, ওঠো। আবার শুয়ে পড়লে যে!'

'ও', হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলে অরিন্দম, বললে, 'ভাল লাগেনা রোজ রোজ।'

'তাই কারও লাগে না কি? যেও না আজ। ছুটি নাও।'

'ছুটি!' একটু বুঝি বিতৃষ্ণ হাসি হাসল অরিন্দম, 'ছুটি নিয়ে করবটা কি?'

উত্তরে কিছু বলতে পারে না শান্তি। সত্যিই তো, কোন্ আকর্ষণে ওকে ছুটি নিয়ে বসে থাকতে বলছে! খাঁ-খাঁ মরুভূমির মত ঘরগুলো; সারাদিন শেডের ধোঁয়ায় ঢাকা মরা রোদ্দুর পোহায়, আর ধুঁকতে থাকে তার প্রতিটি ইট-কাঠ দরজাজানলা; শান্তিবৌদির মনে হয়, অরিন্দমের কাছে সেও এই বাড়িটারই মত—নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

হাতমুখ ধুয়ে আসে অরিন্দম। শেডের জামাপ্যান্ট চাপিয়ে দেয় গায়ে। তাড়া দেয়, 'চা হ'ল?' বলেই আবার বলে, 'দেরী হ'লে থাক্, ওখানে গিয়ে খেয়ে নেব।'

হিটারের ব্যবস্থা করেছে অরিন্দম, তবু চা ঠিক সময় মত পায় না। ওর দেরী লেগেই আছে। 'এই হ'ল, হচ্ছে, আর এক মিনিট'রোজই শুনতে হয় একবার করে। অরিন্দম বেরিয়ে গেলে একটুক্ষণ ঘুরঘুর করেন শান্তি-বৌদি। কাজ আছে, চেষ্টা করলেই একটা না একটা কাজ তৈরি করা যায়, সে চেষ্টাই নেই, মনই যায় না কাজে। পরিণামহীন কাজে কে কবে আনন্দ পেয়েছে। সেলাইয়ে দক্ষতা ছিল শান্তিবৌদির, এককালে গানও গাইতেন, অচর্চায় অচর্চায় সব ধুয়েমুছে যাচ্ছে। যায় যাক, ছোট ছেলেমেয়েরা যদি কেউ আসে, ওদের নিয়ে দিন কাটে। অরিন্দম পছন্দ করে না, নাই করুক, মন মানে না শান্তিবৌদির। ছেলেরা তাঁকে ভালোওবাসে, রোজ আসে, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়াতে বসান শান্তিবৌদি।

পাশের ফ্ল্যাটের অ্যাংলো বাচ্চাটা প্রায়ই উঁকিঝুঁকি দেয়, মিটিমিটি হাসে। শান্তিবৌদিও হাসেন, ইশারায় ডাকেন। জন্ এক-পা এগোয়, এক-পা পেছিয়ে যায়। মজাটা দু'পক্ষেরই জমে উঠেছে। ওরা তো খুব চটপটে হয়, তবু শান্তিবৌদিকে কেন যে লজ্জা পায়, বুঝতে পারেন না। বাচ্চাটা আজও উঁকি মারলে শান্তিবৌদি হাত তুলে ডাকলেন, জন্, কাম্ অন্। এই জন্,—আর না, দুষ্টুটা। আর না। বিস্কুট দেব।'

'জন্, কামঅন্।' ফের ডাকলেন শান্তিবৌদি।

'নো।'

'কেন, নো কেন। আয় না একবার।'

'নো, নো। মাম্মি কলিং মি।'

সত্যিই তো, ওর মাম্মি ওকে ডাকছিল। শান্তির মনে হয়, অ্যাংলো পরিবারটি বেশ। ঝগাট ঝামেলা নেই, দিব্যি আছে। শান্তিবৌদি পছন্দ করেন, অরিন্দম পছন্দ করে না। বলে, 'কি দরকার মাখামাখিতে? ওরা বিদেশী, মিলবে কেন?''

একদিন, দু'দিন একই কথা বলায় শান্তিবৌদি সেদিন বললেন, আচ্ছা 'মাখামাখি তোমাকে কে বলল? ছেলেটাকে ভাল লাগে, তাই একটু আধটু ডেকে থাকি।'

'কি দরকার? ডেকো না।'

'আচ্ছা বেশ। ডাকব না।'

রেলের ড্রাইভার জনের বাবা। মাইনে যাই পাক গোমড়ামুখো নয় একেবারেই। হাসতে পারে, হাসাতে জানে। পুরু বলিষ্ঠ লোক, দোষ অবশ্য আছে। পান দোষ। ড্রিঙ্ক করে। ড্রাঙ্কার্ড। মদ যখন খায়, তখন তার চেহারাই বদলে যায়। বউকে ধরে মারে, ছেলেও বাদ যায় না। আর, মুখে আবোল-তাবোল প্রলাপ তো লেগেই আছে। এই আবোল-তাবোল প্রলাপ বেশ চীৎকার করে বকতে থাকে, রান্নাঘর থেকে শুনতে পায় শান্তি। ড্রিঙ্ক না করলে সে মানুষ অন্য মানুষ। ছেলে বৌকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়। দেখে হাসিই পায়, যায় যখন মিসেস্কে একেবারে বগলদাবা করে। রুজ লিপস্টিক্ মাখলে বৌটিকে দেখায়ও চমৎকার।

দেহের বাঁধুনি এখনো অটুট। অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের মত বাজে-আলস্যে মুটিয়ে যায় নি একটুও।

এরকম একটা সাইকলজি গড়ে উঠেছে শান্তি-বৌদির মনে। আসলে নিজের বঞ্চনায় অপরের সুখ-সম্পদ কেবল ঈর্ষার নয়, অপরিমিত ব্যথারই সূচনা করেছে। মন যেন অনন্যমনা হয়ে উঠছে দিকে দিকে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, কিন্তু বুঝতে পারবেন না,— রোজই একবার ক'রে ওই বন্ধ্যাগাছটার পরিচর্য্যায় কেন যেতে হয় একটি বৌকে। রেলওয়ে কোয়ার্টারের এক ক্ষণিকের অতিথি কেন সজল নয়নে কিসের তৃষ্ণায় চেয়ে থেকেছে গুলঞ্চলতার ওই রক্তকরবী ফুলগুলির দিকে।

আজকের দিনটাতে একটা এন্‌গেজমেন্ট এনেছে অরিন্দম, অনেকদিন পরে শান্তিবৌদির ঠোঁটে রাঙা হাসি। ওদের বর্তমান ঘরকন্নায় এটা অভিনব। ডিউটি থেকে ফিরে এসে অরিন্দম তাড়া দেয়, 'সেজেগুজে নাও যা নেবার—একটু তাড়াতাড়ি।' সকালে বলে গেছে একবার, বন্ধুর ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে মানিকতলায় ওবেলায় নেমন্তন্ন। এ-বেলায় উনুন ধরানোর পাট নেই, শান্তিবৌদিও গা ঢেলে দিয়ে বসে আছেন।

'কি, উঠবে না ?'

শান্তিবৌদি আলস্যজড়িত মন্থরস্বরে বললেন, 'সত্যি কি চাও, যেতেই হবে ?'

'তবে কি মিথ্যে ? তোমায় দেখছি আজকাল ভূতে পেয়েছে। দিনরাত ধন্দ ধরে বসে আছ—কি ব্যাপার ? হয়েছে কি ?'

হেসে উঠলেন শান্তিবৌদি এবার। বললেন, 'সে একটা বিদঘুটে রোগ। বুঝবে কি ? আচ্ছা দেখ, আজকের আকাশটা বেশ লাগছে, না ? আর ওই গুলঞ্চফুলগুলো—কি চমৎকার। সারাদিন বসে থাকি আর দেখি।'

'আচ্ছা মুশকিল, তুমি কি সত্যিই কবি হয়ে উঠলে। চলো, ওঠো। আঃ শান্তি। একটু freely, একটু ঝাড়া হাত পায়ে, ওরকম, করে নয়। দেখ আমাকে। একটা বেলা কুলিমজুর খাটিয়েও কিভাবে চলছি, আমার অনেক দোষের মধ্যেও এই গুণটি অন্ততঃ দেখ।'

'তোমরা যে পুরুষ মানুষ। তোমরা যে পার।'

ফিরে দাঁড়ায় অরিন্দম। শক্তহাতে চাবুক কশাতে ইচ্ছে করে ওর। হাত নিশপিশ করে। তবু সংযত হয়। আর যাই হ'ক, সে জনের বাবা নয়। স্ত্রীকে আঘাত করতে আত্মমর্য্যাদায় বাধে। তাছাড়া, অরিন্দমও আজকাল বড় অসহায় হয়ে পড়েছে। হাজার দোষ দেখলেও কাউকে আঘাত করতে সে পারে না। ভয় করে।

মানিকতলায় বন্ধু স্ত্রী-সমেত অরিন্দমকে দেখে ভারি আশ্চর্য হল। অনেকদিন স্ত্রীকে নিয়ে বেরোয় না অরিন্দম। অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে সুরজিৎ তা জানত। বলেওছে অনেকবার। কিন্তু, তাতে কোনো ফল হয়নি। আজ শান্তিবৌদিও উপস্থিত। অরিন্দমের পাশে, এক রিক্‌শায়।

'আসুন বৌদি, আসুন। এসো অরিন্দমবাবু।' সুরজিৎ এগিয়ে এল যুক্তকরে। 'বৌদি, আপনি যে আসতে পেরেছেন, এতে সবচেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম,—অন্ততঃ আমি।' তারপর অনেক খাতির-যত্ন। কাউকে চেনেন না শান্তিবৌদি, সকলকেই নমস্কার ঠোকেন। কথায় কথায় রাত হল অনেক। এবার না ফিরলে নয়। ফের আর একদফা নমস্কার প্রতিনমস্কার চলল। শান্তিবৌদি হাসিমুখে বললেন, 'চলি এবার।'

ওইটুকু হাসিমুখ করতে অনেক কষ্ট, অনেক চেষ্টা, অনেকটা পরিশ্রম। হাসি কি আর আসে। ও আনতে হয় জোর করে।

সুধা, সুরজিতের স্ত্রী বললেন, 'আবার আসবেন। না কেন ? ঝাড়া হাত-পা এখনও, চলে আসতে কষ্ট কি। ভগবানের দয়া।—হ'ত আমাদের মত ছেলেমেয়ে-দের সংসার, বুঝতেন মজা। এক-পা বাইরে বেরুবার জো নেই। এটা কাঁদে, ওটা ফেলে। একে সামলাই তো ও বেসামাল। আপিসের বাবুদের আচড়টা লাগে

না, ওঁরা বোঝেন না। সকালে যখন কাঁধা কাপড়ের টান ঘাড়ে পড়ে, তখন ভাই জীবনের সব রস শুকিয়ে যায়। এক-আধদিন পারা যায়। রোজ রোজ আর কাহাতক, বল?'

'তা সত্যি!' সহাস্যমুখে বললেন শান্তিবৌদি।

বাইরে নেমে, পথ চলতে চলতে অরিন্দমের পাশে নিজের অস্তিত্ব যেন নেই মনে হল শান্তিবৌদির। কিছুতেই বোঝা যাবে না কি, কেন অমন হয়? কিসের অভাব? কি তার নেই? এই যে সংসারের ছবি একটু আগে চোখে পড়ল, সে অমন সাজানো হয় কিসে? কিসের জোরে সবাই সবাইয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে?

আবছায়া কালির কুয়াশায় ঢাকা রেলওয়ে কলোনির ঘরগুলো আজ আবার এমন করে রিক্ত মনে হয় কেন? ওই তো ওদের সুধা, শান্তিরই বয়সী হবে, কিন্তু দেখ, কত অন্যরকমের সে। মনে হয় না, সংসারে সে কিছু পেয়েছে? কোনো আকাশ ছোঁওয়া সুখ? কোনো অপার্থিব দান? যা শান্তি পায়নি। দেহমনের সমস্ত শক্তি একত্র করেও পায়নি।

'শোন!' ডাকল শান্তি।

অরিন্দম একটু এগিয়ে আসে, ফিরে বলল, 'কি? কিছু বলবে? কি হল, মাথা ধরেছে নাকি?'

'না।'

'তবে।'

'না শোন, আমায় একবারটি দুর্গাপুরে যেতে দাও।'

'হঠাৎ সেখানে?'

'তা বলতে পার হঠাৎই। এই সেদিন ঘুরে এলাম, তবু মনে হচ্ছে কেউ যেন ভাল নেই। চিঠিপত্র ত এর মধ্যে আসেনি। কি জানি, যদি কিছু হয়ে থাকে। বাবার শরীর তো জানোই, মাও ভুগছেন। এর আগের চিঠি তোমাকে দেখিয়েছিলাম—'

অরিন্দম এত কথায় উত্তর দিল না, শুধু বলল, 'বেশ তো, যেও।'

'বেশ তো, যেও।' ভদ্রতায় কে বলবে ত্রুটি আছে! তবু কথাটা শান্তিবৌদির বুকে চাবুক মারল। ওজর আপত্তি নেই, কেন—কি, বলা নেই; একবাক্যে স্বীকার 'বেশ তো, যেও'। অরিন্দমের ব্যবহার এটাই কি প্রমাণ করে না যে, স্ত্রীর প্রতি অধিকারের দাবি সে খাটাতে চায় না? শান্তি যেন স্ত্রী নয়, স্ত্রীর ভূমিকায় কোন অভিনেত্রী। তবু হাসিমুখে সহজ সুরে সে বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় হল, কিন্তু তুমি ত একলা পড়ে যাবে।'

'তাতে কি?'

'না, আমি বলছিলাম, বেকার লোকদের না-হয় একরকম, কিন্তু চাকরে লোকের একা ঘর-বার সামলানো রীতিমত কষ্টের। ডিউটি দিয়ে এসে উনুনে হাঁড়ি বসানো, ঘরের আর আর পাঁচটা খুঁটিনাটি দেখা— নিশ্চয়ই দুর্ভোগের। স্বীকার কর?'

'হুঁ, তা করি। কিন্তু আমার অভ্যাস আছে, শান্তি। সেজন্য তুমি একটুও মন খারাপ করো না। ও ঠিক চলে যাবে।'

'কি করে চলবে, তাও জানি। বাড়িতে ভাত বন্ধ, হোটেলে হোটেলে বিহার, তাই তো? অনেকে তাও করছে, তাদের শরীরের গতিক ভাল। তুমি যে পেট-রোগার প্রথম।'

'অদ্বিতীয়, তাও বলতে পার। তবু মনে মনে শক্ত আছি। তুমি ঘুরে এসগে, দুর্গাপুর। আমার জন্য মিথ্যে ভেব না। কবে যেতে চাও—কাল? পরশু? তবে কবে?'

'যবে তোমার সুবিধে হবে।'

'যাত্রী তুমি—সুবিধা-অসুবিধা তোমার।'

'একা কি যেতে পারি? যদি তুমি সাথে না থাক।'

ট্রেনের টিকিট কাটা বা পৌঁছে দেওয়া, এর জন্য আর কি আছে। P. T. O. ভাড়িয়ে রাখবখন। ট্রেনের টাইমটেবিল তো রয়েইছে, তার জন্য ভেব না। রেলের লোক, রেলের ব্যাপারে ভাবে না।'

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন এইরকম চলল কিছুক্ষণ। তারপর যে যার মত চুপচাপ। এক শয্যা। তবু শান্তি-বৌদির মনে হয়, অরিন্দম যেন শতযোজন দূরে।

ঘরে অতিষ্ঠ লাগছে বলেই এর থেকে বাইরে যেতে চাইছেন শান্তিবৌদি। একটু আলোর, একটু মুক্তির আশায়। এখানে, এই ধোঁয়ার এই কালিতে মন যে ছোট হয়ে উঠল। হায়, তবু যদি ঘর হাসিতে আলোতে ভরা থাকত। এটা কাউকে বোঝাতে পারে না শান্তি বৌদি; বাইরের লোকে ত বুঝবেই না, যখন ঘরের এত কাছের লোক অরিন্দম বুঝে উঠল না। এইটাই সবচেয়ে বেঁধে তাঁকে।

সুখী কি অরিন্দমই হতে পেরেছে?—পারে নি। ওর বিবাহিত জীবন যেন শান্তিবৌদিই অসুখী করে রেখেছেন। সে-ই অপরাধিনী অথচ, আজ এত দেরীতে সেটা বুঝতে হল, বিয়ের আগে কোন কথা কিন্তু ওঠেনি। অরিন্দম নিজে আলাপ করে পছন্দ করেছিল। বিয়ের আগে মাস পাঁচ ছয় সময়ও পেয়েছিল বাচাই করে নিতে। তখন কেন বললে না সে, অনেক অভাব তোমার! বরং বলেছিল, 'শান্তি, এই আমার সুখ, তুমি আমার ছোট ঘরে ছোট্ট নীড় বাঁধবে। সেখানে থাকবে দুটি পাখি, তারা জাগবে বিনিদ্ররজনী শুধু সুখ আর সুখের স্বপ্নে।'

ভালোবাসার মানুষ এমন কাব্যিকও হয়। তাহলে অরিন্দমের মত ওয়ার্কশপে হাতুড়ি পেটা বাস্তব লোক-টাও কি রকম অস্বাভাবিক ভাবালুতায় নিজেকে ফেলেছিল হারিয়ে। কাব্য সকলেরই কিছু কিছু আসে, তার মাত্রা থাকে; অরিন্দম যেন কাব্যের বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। শান্তিবৌদির রূপ একরকম মন্দ নয়, সেও অরিন্দমের চোখের আলোয় রাতারাতি যেন স্বর্গশোভা প্রাপ্ত হয়েছিল। আজ অনেক ভাবনার মধ্যেও হাসি পায় শান্তি বৌদির।

বিয়ের পর সাতটি বছর কেটে গেছে। সাতটি নিষ্ফলা বছর। হিসাব-নিকাশ করবার সাধ হয় এক-আধবার। কি পেলেন, আর কি-ই বা ফিরিয়ে দিলেন তাঁদের এই সম্মিলিত জীবনে। নিজের দিকে চেয়ে মনে হয়, কি মনে হয় ঠিক বুঝতে পারেন না শান্তিবৌদি। সুখ-দুঃখের বিচার-শক্তি কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। অনুভূতির দোলা আজ আর দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে না।

সারা সকাল কিছু কাজ আর কিছু আলস্যে কাটিয়ে বাইরের ছোট বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শান্তিবৌদি। কলোনির একফালি রাস্তাটায় লোক-চলাচল এই সময়-টায় বাড়ে। কেউ ছুটেছে শেডের ডিউটিতে, কেউ ফিরছে ওঠা-বাজারের সস্তাদরের জিনিস কিনে, কেউ বা অন্য কাজের তাড়ায়। রেলওয়ে কোয়ার্টার হলেও এ সময় ঝিমিয়ে থাকে না। সংসারযাত্রার সুখচিত্র কোনো কোনো ঘরে দৃষ্ট হয়। জায়ে জায়ে হাসিতামাশা, বৌদি-ভাজে গা টেপাটেপি, মায়ে-ঝিয়ে উপভোগ্য কথা কাটাকাটি—সবই চলেছে আপন আপন ছন্দে। কোথাও স্কুল-কলেজের ভাত দেবার তাগিদ, কোথাও বা বেলা গড়ানো অলসতা।

নীল আকাশের নীচে বর্ণালী চিত্রসভার। তুলসী-লতার ফুলগুলো থোকার মত ফুটেছে। রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ছে ফুলগুলি ঘিরে, উড়ে উড়ে বসছে শুকনো গাছের ডালে। শিশিরে ভেজা সকালের শ্যামল দূর্বাদল রৌদ্রের কাছে মুখ লুকিয়েছে। টবের নীচে কতকগুলো বিবর্ণ হলুদ বুড়োটে ঘাসের মুখ দেখা যাচ্ছে। টবের উপর বিলিতি গাছক'টি ফুলের রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে, মনে আর সুর নেই, কাছের প্রকৃতিও তাই দূরের বলে মনে হয়। তবু একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে, পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চা ছেলেটার চালচলন দেখে। ও-ও মুখ ফিরিয়ে দুষ্টুমিভরা হাসি ফিরিয়ে দিল। হাতছানি দিলেন শান্তিবৌদি। ও-ও হাসিমুখে ঘাড় দোলাতে লাগল। এত কাছে আছে, তবু পাশে আসতে ভয়। শান্তি কি এতই ভয়াবহ? আচ্ছা ছেলে যা হোক।

'এই আয় না। এই খোকাটা। আয় বিস্কিট দেব। আয় বলছি।'

'নোঃ।'

'বাবা, ছেলের রাগ ভাখ। ঘাড় বাঁকিয়ে, নোঃ। নোঃ। কে বকবে যে এলে? আমাকে সবাই চেনে,

সবাই ভালোবাসে, কেউ কিছু বলবে না। আয় না একবার। লক্ষ্মীটি!'

'নো, মামি উইল স্কোল্ড্ মি। শি ইজ্ ভেরি-ভেরি এঙ্গরি, মাই পাপা অল্‌সো। বাট্ নট্ লাইক মামি।'

শান্তিবৌদি মুখ টিপে-টিপে হাসছিলেন।

'আহা, মামির আর খেয়েদেয়ে কাজ কি, অমনি মারতে উঠলেন। কেবল মামির দোহাই। আমিও তোমার আরেক মামি হই, এ মামির কথা বুঝি শুনতে নেই না? আয় না একবার!'

'নো, নো। মামি উইল কল্ মি নাউ।'

'বাঃ, এদিকে ছেলে বোঝে বেশ! এই তুই আমাদের বাংলা কথা বুঝ্তে পারিস? কতটা পারিস? এতটা?'

'নোঃ!' ছেলে মাথা ঝাঁকিয়ে দিল।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন শান্তিবৌদি। ছেলের বুদ্ধি এবার ধরা পড়েছে। কেবল জানে, 'নো' আর 'নো'। তা সাজ আজ বেশ পরিপাটি, বোধ হয় বেড়ু করতে যাওয়া হবে। ছোট্ট মাথায় লালরঙের ছোট্ট হ্যাট্, একরত্তি শার্ট-প্যান্ট, হাতে আবার একটা ছড়ি! যেন মর্নিং ওয়াক্ করতে যাচ্ছেন ক্ষুদে ছড়িদার সাহেব! গট্‌গট্ করে নতুন কেনা জুতো জোড়া আবার পরখ করা হচ্ছে। দৃপ্ত ভঙ্গিমা। ডোণ্ট-কেয়ারি ভাব।

'হ্যাঁ বাবু, যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বলই না? না এও বলতে মামির মানা?' বলতে বলতে কয় পা এগিয়ে আসতেই 'নো, নো, মামি কলিং মি' বলে ছেলে পালাল।

এইটুকু আলাপই যথেষ্ট। এইটুকুতেই মন ভরে থাকবে অনেকক্ষণ। ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষি করাতেই আজ আনন্দ পান শান্তিবৌদি। বড়মানুষের সঙ্গ কেমন যেন দীর্ঘ, মন্থর, ক্লান্তিকর উপদেশবহ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, এতেও যদি মনের তারুণ্য প্রকাশ না পেয়ে থাকে, তবে সে দোষ কি তাঁর, না তাঁর বয়োদশা অপরাধিনী? তবে কেন ওবাড়ির কলেজী মেয়ে মঞ্জুলা যখন তখন-বলবে, 'তুমি বড্ডই-বুড়িয়ে গেছ, বৌদি', তবে কেন অরিন্দমের নিঃশব্দ দৃষ্টি বলবে—'আমি পাইনি শান্তি, তোমায় পেয়ে সুখ পাই নি, স্বস্তি পাই নি, তাই ফুরিয়ে গেছি আমি, শেষ হয়ে গেছি? তবে কেন তাঁরও অবচেতন মন দিনে দিনে সেই একই কথা একই সুরে বলবে?

না, ভেবে আর লাভ কি! অথচ বসে থাকলেই ভাবনা আসবে। সংসার বলতেই সংসার; এখানে কাজকর্ম নেই বললেই চলে, কাজে মনও যায় না; তবু এটা ওটা করবার থাকলে ভাবনা অনেক ভুলে থাকা যায়। লোকে বলে, তাঁর মধ্যে নাকি অশেষ গুণপনা ছিল। মিষ্টি মুখ, মিষ্টি ব্যবহার, হাতে সূঁচের নিখুঁত কাজ, চিত্রাঙ্কন বিদ্যা, আর কণ্ঠে গান। গানের প্রশংসা কে না করেছে! বালিশের খোলে একবার কি একটা এঁকে সূঁচ চালিয়েছিলেন, তারই কত তারিফ চিনুবৌদির শ্বশুরবাড়ির ওদের। ফিরে এসে চিনু-বৌদি কত আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেই শান্তি ছিল এক; আর এই শান্তি আর। যেন আগের ছায়া, যেন আগের ভগ্নাবশেষ!

সময় সময় তাই মনে হয়, আগেকার সেই চর্চাগুলো আবার ফিরিয়ে আনলে কেমন হয়! কত তো সময় এখানে, কত কাজেই না লাগানো যায়। শুধু শুধু ভাবনা আর মন খারাপ করার লাভ কি? বড় ট্রাঙ্কটা খুলতে ইচ্ছে হল আজ অনেক দিনের পর। ট্রাঙ্কে আছে পুরনো দিনের কিছু সঞ্চয়—কিছু আঁকা, আর কিছু সেলাইয়ের কাজ। হারমোনিয়মটা চৌকির নীচে পড়ে পড়ে ধুলো খাচ্ছে। কতদিন কেউ ওর রিডগুলো টেপে নি। অরিন্দমকে গান শোনাতে ইচ্ছে গেছে অনেকবার, অনেক অবসরে। কিন্তু ওর কাছে প্রতিবারই কেমন বাধো-বাধো লেগেছে। দূর্, কি গান করব, ও কি মনে করবে। বিয়ের পরে দু'একটা শুনিয়েছিলেন, সেও জোরে নয়, গুনগুনিয়ে। অরিন্দম চোখের সামনে কোনো এঞ্জিনীয়ারিং জার্নাল খুলে বসেছিল। তাই শান্তিবৌদি ধরেই নিয়েছেন, ও একটুও গান-পাগলা নয়। তাই বলে যে হৃদয়হীন, তাও নয়; হৃদয় ওর আছে,

কিন্তু ওর সব কিছুকে যান্ত্রিকতা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে প্রতিদিন। চাকরি যে মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, এটা শান্তিবৌদি বড় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেন! একদিনও অফিস কামাই করবে না, একটা ছুটিও নষ্ট করবে না। এঞ্জিনের বাঁশী বাজলেই কান পেতে শুনবে। ডিউটির নামে তো পাগল। রাত্রে শুতে গিয়েও স্বস্তি নেই, 'ঘড়িতে এলার্ম হয়েছে তো, কাল কিন্তু মর্ণিং ডিউটি; দেখো, লেট্ করিয়ে দিও না।' বোসবাবু শেডের এসিস্ট্যান্ট, তাঁকে খাতির করে আনা চাই, দু'জনে মত্ত হয়ে ওঠে চাকরির গল্পে। কে গাড়ি খারাপ করলে, কার নামে কটা চার্জশীট গেছে, কে চাকরির তাঁবিরে হাতেপায়ে ধরেছে, বড়সাহেব কার শিফ্ট্ পছন্দ করেন, কে কাজে ফাঁকি দেয়, কার কাজ ভাল, কেবল এইসব।

কিন্তু তাই বলে অরিন্দম আন্সোন্যাল, এ কথা ওর শত্রুতেও বলতে পারে না। সামাজিকতায় ও বরং অনেকের চেয়ে আগে-আগে চলে। তাই ওকে বোঝা ভার। গত সাত বছরেও ওকে বোঝা শান্তিবৌদির পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। যাকৃগে, বলে ট্রাঙ্কটা খুলতে বসে গেলেন শান্তিবৌদি, এমন সময় মঞ্জুলা এল। ও রোজই একবার করে আসে, ঢুঁ মেরে যায়। কলেজী জীবনে সবে ছাড়পত্র-পাওয়া মেয়ে। পাকামিতে পনের আনার ওপর ষোলআনা উৎসাহ। আর শান্তি তো সুবাদে বৌদিদি. ঠাট্টার সুবাদ। শান্তি পেরে ওঠে না এদের সঙ্গে, বাব্বা, কি পাকামিই না করতে জানে। বিয়ের পর সাত বছর কেটে গেছে; ছেলেমেয়ে হয় নি তাই, হলে পাকা ভারিকি গিন্নী হত আজ শান্তি, তবু আজও কি কি বৌদি, কালকের বাসরশয্যে কেমন কাটল' বলে লজ্জা দিতে আছে? কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না শান্তি। মুখে যদিও বা উত্তর যোগায়, সবটা বলতে পারেন না। মঞ্জুলারা যে রকম ঠোঁট-আলগা মেয়ে, ফিরে আবার লজ্জা দেবে। না পেরে শান্তিবৌদি বলে দেন. 'বলব কি, অবিলম্বে তোমাদের বিয়ে দেওয়া উচিত। তবে যদি অঙ্গজ্বলা, বুকপোড়া থামে। সত্যি কথা, তাই হওয়া উচিত।'

মঞ্জুলা শান্তিবৌদির ফেলা-ঘোমটা টেনে তুলে দেয়. ফের, লজ্জা পায় না একটুও। বলে, 'বেশ তো, দাও-না একটা জুটিয়ে। বল-না বাবাকে।'

শান্তিবৌদিও হেসে হেসে রসিকতা করেন, 'অতদূর না গেলেও চলবে ভাই, দেবার লোক হাতের কাছেই আছে। ঘটকালির ভাতাটুকু পাইয়ে দিও, ব্যস্ তা হলেই খুশী।'

'সে নিশ্চয়ই পাবে।'

'আচ্ছা, তা না হয় হ'ল। এখন কনের কি হবে? তাকে যে যেতে হবে দিল্লী বম্বে,—আর যে এপাড়া সে-পাড়া করা চলবে না? বাপের আদর, মায়ের চুমু আর যে কপাল পাবে না!'

'নাই পেল।'

'আর মজা করে রোজ মর্ণিং কলেজ। কোথায় যাবে। তখন রাতভোরে ওঠ, উনুনে আঁচ দাও। স্বামীর ন'টায় অফিস, দেবরদের দশটায় স্কুল কলেজ, আর যদি ভাসুরঝি থাকেন তবে সকাল সাতটায় আগেই চা জলখাবার—'

'ভাসুরঝিটার অত তাড়াহুড়ো থাকবে কিসের?'

'বারে, তার গানের ক্লাস থাকবে না বুঝি?'

'উঁহু, ওটি বরদাস্ত হবে না। উনি যাবেন গানে তার জন্য কনেকে উঠতে হবে সাত সকালে। বাঃ বেশ মজা তো।'

'সেই যে নিয়ম ভাই। ঘরে ঘরে এই একই নিয়ম। তুমি তো দেখ নি, আমরা যে দেখেছি; কম করে সাত বছর তো হল শান্তিবৌদির বিয়ে, কম দেখা শান্তিবৌদি দেখে নি।'

'ইস্, তাই যেন।'

'ঠোঁট ওল্টালে হবে কি, যা বললুম সে যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি না হয় তো—'

'না হয় তো—কি?'

'কি আবার। আমার মাথার দিব্যি।'

'কার মাথার। তোমার। না অরিন্দমদার।'

'উঃ, ফের আরম্ভ করলে মেয়েটা। আমি আর পারি না বাজে বকতে।'

'পারতে তোমাকে হবেই।' মঞ্জুলা এবার একটু খানিকটা হয়ে বলে, 'বল-না বৌদি, তোমাদের সেই সাতটি বছরের সাতটি বসন্তের কথা। বলবে বলেছিলে সেদিন, আজ বল।'

স্যুটকেসটার ডালা খুলতে দেখে মঞ্জুলা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওর মধ্যে যদি সেই সাতটি বছরের সাতটি বসন্ত রূপকথার কৌটায় ভোমরার প্রাণের আদরে পোরা থাকে।

'দেখি, দেখি—ইস্, কতো কি! ওগুলো, কার জিনিস, বৌদি? হাতে করা বুঝি। ইস্, কি সুন্দর জিনিসগুলি। কেন দেখছ বৌদি, কি হবে এসবে?'

'দেখছি না ভাই, তুলতে হবে। দুর্গাপুরে চলে যাচ্ছি যে।'

'ওমা, সে কি? কবে?'

'এই খুব শিগ্‌গিরই।'

'হঠাৎ।'

'প্রশ্নটা একেবারে মিলে গেল।' একটু হেসে শান্তিবৌদি বললেন, 'তোমার দাদাও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। হঠাৎ। এর উত্তর কি আছে বল! বাবার কাছে অনেকদিন যাই নি, এ ওজর দেখালে চলবে না; কেননা এই সেদিনই ঘুরে এলাম। তাই তোমার দাদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম—এমনি।'

মঞ্জুলা বলল, 'এমনি আবার কি। কি করেছ? ঝগড়াঝাঁটি? বল বল, ঝগড়াঝাঁটি করেছ, স্বামীর সঙ্গে?'

'দূর্, ওসব আমরা কবেই ভুলে গেছি। ইচ্ছে তো করে, দজ্জাল বউদের মত কাঁধে কোমরে কাপড় বেঁধে ঝগড়া করি কিন্তু তা করবার উপায় কই? ভুলবোঝা-বুঝির মধ্যে যে ঝগড়া হয়, সে সব আমাদের কবেই মিটে গেছে। দু'জনের মন দু'জনেই বুঝে গেছি। এ অবস্থায় আর যাই হোক, কোন্দল করা যায় না, ভাই।'

'তবে এখন হঠাৎ তল্পিতল্পা গুটোবার কি দরকার পড়ল?'

শান্তিবৌদি হেসে বললেন, 'তোমার বড়বৌদিকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো, কেন বাড়ির বউরা হঠাৎ তল্পিতল্পা গোটায়।'

'আহা, বড়বৌদিদের ব্যাপার তো অন্য।'

'অন্য আবার কি। সেই একই।'

'বড়বৌদির ব্যাপার শুনবে? বছর বছর তার ছেলে হ'য়ে গেছে, তাই বছর না ঘুরতেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে দৌড়েছেন তিনি। সে একটা যুক্তি ছিল। তোমারও কি তাই? ওমা, দেখি দেখি, মুখ দেখি, ওমা, কি সর্বনাশ করেছ!'

শান্তি-বৌদি সস্নেহে হাত ছাড়িয়ে দিলেন মঞ্জুলার, ও যা সন্দেহ করছে তা সত্যি নয়। যদি হ'ত তা হ'লে আর আফশোষ ছিল কি। মুখ দেখতে চায় মঞ্জুলা, বেশ তো দেখুক না। লজ্জা পাবার কোনো চিহ্ন যে মুখে নেই, সে মুখ তুলে দেখাতে বাধা কি। মঞ্জুলা কি বুঝল, লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল ও-ই। যেন খুব বুঝতে পেরেছে, শান্তিবৌদি হঠাৎ কেন দৌড় দিচ্ছেন।

'তোমাকে বুঝেছি গো বৌ, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।' মঞ্জুলা কৌতুকরঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শান্তিবৌদিও পাল্টা জবাব করেন হেসে হেসে, 'আরও বোঝ। মুখ আমি সরাচ্ছি নে, কি বুঝবার আছে বুঝে নাও।'

'আমার কাছে কেন, অরিন্দমদার মুখে বুঝে নিও।'

'আহা, তিনি কিছু বলেন নাকি। দেখতে পাও না, কত কাজে তাঁর, কত ব্যস্ততা।'—শান্তিবৌদি কিশোরীর মুখের কৌতুক-লাবণ্য ঠোঁটে এনে বললেন।

'সব বাছার মুখেই এক রা। সব বউ-ই একথা বলে থাকে। আসলে, যে কথা চলে কানাকান ক'রে, লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়।'

'আহা, করলে কি ভাই! ওর মধ্যে আবার গীতাতত্ত্ব আছে যে।' হাসতে ফেটে পড়লেন শান্তি-বৌদি, 'আর যাই কর, সন্নেষী চাটয়ো না'—

'ভয় কার নাকি কারও ত্রিশূলের খোঁচা? বিন্দু-মাত্রও না।'

'বটে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু না, আমাকে আর খোঁচাবে না।

কোথায় শুনতে এলাম তোমার কথা, তা নয়, খালি এটা আর ওটা। কেন পালাচ্ছ হঠাৎ বাপের বাড়ি? বল, বলতেই হবে আমাকে।'

'ওই যে বললে কি-একটা বুঝে ফেলেছ।'

মঞ্জুলার মুখ-চোখ ফের রাঙা হ'য়ে উঠল, বললে, "তা বাপু অতশত'র আমি বুঝব কি? মুখ ফুটে তবু যদি একবার বলতে—'

শান্তিবৌদি একটু হেসে বললেন, "না ভাই ঠাকুরঝি, সে সব কিছু না। যদিও বা হ'ত, তবে তোমাকেই জানাতুম সবার আগে। তুমি ত দেখছই ভাই, ভগবান্ সে আশীর্বাদে কতখানি বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন।'

'ভগবানের আশীর্বাদ! তুমি ভগবান্ মান?'

'মানি বৈকি, ভাই। কিন্তু ও কথা থাক। দুঃখ ভাবলে দুঃখ বাড়ে বৈ তো নয়!'

'তা বাড়ে। তবু মানুষ সুখদুঃখের কথা অপরকে ব'লে বুকের ভার কমায়। তুমি তাও করবে না। যুগলঠোঁট যেন সেলাই করা।"

'আচ্ছা পাগল। তা করি না কে বলল?'

'সে তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।'

'কেন, জ্যোৎস্না পাও না, নাকি।'

'কোথায়! সারা মুখ তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তাও যদি এক-আধদিন থাকত তো বুঝতাম। বারো মাস চব্বিশঘণ্টা হাঁড়িমুখে থাকবে, এ কি রকম? লোকে যদি বলে, 'ম্যানিয়া' আছে, সে কি লোকের দোষ? না যারটা দেখে, তার?'

'তুলনা করলে কি পারি? তোমাদের বয়েস আর আমার বয়েস?' শান্তিবৌদি চেষ্টা ক'রে হাসছিলেন।

মঞ্জুলা বললে, 'তুলনার কথা হচ্ছে না। সেটা লোকে এমনি বলে। আর তুলনা করলেও বা কি? তোমার বয়েস এমন কি বেশী? মেজবৌদি, উষাদি এদের চেয়ে কি তুমি বড়? এবার ওদের দেখ, ওরা কেমন হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে।'

'সংসারে কেবল শান্তিবৌদিই কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে, এই তো শ্রীমতীর বক্তব্য? আচ্ছা বেশ—'

'সংসারের কথা উঠছে না, বৌদি। আমি কেবল এ-বাড়ি ও-বাড়ির তুলনা দিচ্ছি।'

শান্তিবৌদি বললেন, 'আবার দেখ মঞ্জুলা, তোমার দেওয়া এই ভাবনাটুকু যদি মনের মধ্যে রাখি, সারাক্ষণ ভাবতে থাকি, তবে সারাক্ষণ যে কেবল ঈর্ষার আগুনেই দগ্ধ হব! কেন বলছি? বলছি এই জন্য যে, মানুষের মনকে একটুকু বিশ্বাস নেই। তোমার মেজবৌদি বা উষাদি, এঁদের আমি আজও যে কত আপনার চোখে দেখি, শেষ কি এঁদেরও ঈর্ষা ক'রে যেতে হবে? এমনিতেই তো বোঝার ভারি, তার ওপর এ অপরাধের বোঝা, এ আমি বইব কেমন ক'রে?'

বুকের পরে দু'বাহু অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে এতক্ষণ শুনছিল মঞ্জুলা, আর দাঁড়াল না। 'লেকচার শুরু হয়েছে, পালাই বাবা,' বলে পালিয়ে গেল। ওর স্বচ্ছন্দ লীলা-চপল ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল, কি সহজ আনন্দ এদের! বেলা বেড়ে গেল, থাক, আজ আর ট্রাঙ্ক খুলে কাজ নেই। এক্ষুণি অরিন্দম খেতে আসবে। এ সময়টা শান্তিবৌদির মুখস্থ হয়ে গেছে। ঘড়ি যাই বলুক, সময়ের নড়চড় হবে না; হরিবাবুর টিফিন ক্যারিয়ার চলেছে, সেই পুরনো স্টিলের চল্টা-ওঠা নরবড়ে টিফিনের বাক্সগুলি—তা হোক, ঘড়ির কাঁটাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে ওর যাতায়াত নিত্যনৈমিত্তিক। চোখ ফিরিয়ে ওয়াল ক্লক দেখলেন শান্তিবৌদি, কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা পাঁচ। হরিবাবুর উড়িয়া চাপরাশিটার একেবারে অবাক্ কাণ্ড। বোধ হয় ঘড়ি দেখতে শিখেছে কি শেখে নি, কিন্তু কি অদ্ভুত সময়জ্ঞান! সে কি ওর আপন খেয়াল, না হরিবাবুর গিন্নীর পিছনঠেলার গুণ, জানবার কৌতূহলে সেদিন ওকে ডেকে আলাপ করেছিলেন শান্তিবৌদি। উড়িয়ার ভাষা যদিও বা কিছু বোঝা যায়, লোকটার পান চিবুনো মুখের কোনো কথাই ঠিক বোধগম্য হল না। মঞ্জুলা চলে গেলে, জানালার দিকে চোখ ফেরাতেই হরিবাবুর তেল-চটা টিফিন ক্যারিয়ার সহ পরিচিত বহনকারীটিকে দেখা গেল। এখন এগারোটা পাঁচ, অরিন্দমের খেতে আসবারও

সময় হল। আজ ডিউটিতে যাবার সময় একটু গায়ে পড়া আদর দেখিয়ে গেছে অরিন্দম। অভিনব কিছুই নয়, অনেকেই করে থাকে। কিন্তু তবু, আজকের কাণ্ডটায় হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলেন শান্তিবৌদি। অভ্যাসে যে অনেকদিন থেকেই ছুট্ পড়েছে।...

আজ সকালে গুলঞ্চলতার ফুলগুলোকে কেমন অন্যরকম লেগেছিল। ভাল লেগেছিল সকালের সুনীল আকাশ, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো কার্পাস-সাদা মেঘ, ভাল লেগেছিল ভোরের প্রথমতম আলো।...আর মন? সেও ভালোলাগার আনন্দে গুঞ্জরণ করে ফিরেছিল ভুলে যাওয়া গানের স্মৃতি। তারপর কখন যেন সম্বিৎ ফিরেছিল। সুখস্বপ্নের দূত গেল ফিরে, সম্মুখ ঘিরে দাঁড়াল শুধু অনিশ্চয়, শুধু অনিশ্চয়তা। যা সত্য, বাস্তব, প্রত্যক্ষে যা ধরা দিয়েছে, তাই তো ফিরে ফিরে আসবে।

ভোরের কুয়াশাবৃত আকাশ। শীতের সকালে রেলওয়ে কলোনিটা রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোয়। যেমন ঘুমিয়েছে শান্তিবৌদির জীবন-যৌবন উপবন। তাই, সুখ যদি বা আসে, স্থায়ী হয় না। অরিন্দমের আদরটুকু যে সকালে এসেছিল, সেই সকালেই মিলিয়ে গেল।

বেলা একটা। ঘর বার করছেন শান্তিবৌদি, অরিন্দম এখনো আসছে না। কোনোদিন তো এত বেলা হয় না? এমন সময় শেডের একটি লোক এসে ডাকল। তার হাতে চিঠি; অরিন্দম লিখেছে, 'এঞ্জিন ডিরেল্ড্ হয়েছে, ফিরতে দেরী হবে।' এই দুটি কথার শেষে লিখেছে, তার জন্য শান্তি যেন বসে না থাকে, শরীরকে মিছিমিছি কষ্ট যেন না দেয়।

না হেসে থাকতে পারলেন না শান্তিবৌদি। অরিন্দম আজ যেন কি শুরু করেছে। আজ যেন ও প্রথম আবিষ্কার করল, শান্তি ওর জন্য অপেক্ষা করে। খোলা কাগজের টুকরোটা হাতে করে কতক্ষণ কেটে গেল। নিজের এ আচরণও নিজের কাছে আশ্চর্যজনক।

'কোথায়? দুর্গাপুর পাঠাবার কোন ব্যবস্থাই তো করলে না। কেবল আজ না কাল, কাল না পরশু, এই শুনছি। অথচ, এমন করে বললে যেন তাড়াহুড়ি একটা কিছু করবেই।'

অরিন্দম হাই তুলে বললে, 'বেশ তো, সে হবে'খন।'

'আবার কবে হবে! আজ তো তোমার ডিউটি নেই; ওঠো না, দেখ না চেষ্টা করে। না, সত্যি আর বাহানা ভাল লাগছে না। যদি পার, আজই ব্যবস্থা কর।'

অরিন্দম পাশ ফিরে শুয়ে শান্তির গাল টিপে দেয়, বলে, 'বুক যেন তোলপাড় করছে। এ লক্ষণ কিসের জান? অভিসারে যাবার।'

'ঠাট্টা কেন কর।'

'না করলুম। কিন্তু, হৃদয়ের ওই ওঠাপড়া, ওটা কি অমনি থাকতে দেবে? তার চেয়ে—'

'আঃ, কি ছেলেমানুষি কর। ছাড়ো।'

বুকের ওপর তপ্ত প্রশ্বাস, কঠিন শৃঙ্খলের দৃঢ় বন্ধন আর এক অজানা রহস্যের আস্বাদন...এতেও যেন বীতস্পৃহ শান্তিবৌদি। যে মাঠে ফসল জন্মায় না, বৃষ্টিধারাকে সে কেবল স্পর্শই করে, পরিতৃপ্ত করে না। সুখ তখনই সুখকর, যখন সে স্বপ্নবাহী। যাই হোক, দুর্গাপুর যাবার ঠিক হল। দু'একদিনের পরেই তিনি রওনা দিলেন। অরিন্দমের এখানকার ব্যবস্থার জন্য দুজনের কারুর মাথাব্যথা দেখা গেল না। হোটেলে খেয়ে, চাকরি করে ঘরে শোয়া, এরজন্য অরিন্দমের ভাবনা নেই। ভাবনা শান্তিবৌদিরই ছিল, কিন্তু তিনিও শেষ অবধি নীরব রইলেন।

নীরবতার মধ্যেই পাঁচ মাস কেটে গেল।......

পাঁচ মাস পরে ফিরে শান্তিবৌদি দেখলেন, এখানে একাধিক পরিবর্তন। ঘরদোরের অবস্থা একটুও অগোছালো ছিল না, বরং একটু বেশীই সাজানো-গোছানো। বিছানার চাদর, বালিশের কভার ধপধপে পরিষ্কার। জানালা দরজার পর্দাগুলি একটুও নোংরা নয়। টেবিল একটা নতুন এসেছে, সেই টেবিলের উপর একটা ফুলদানি, আর একথোকা রজনীগন্ধা। লক্ষ্মীপুজা ক'দিন আগে গেছে। মেঝেতে আলপনা আঁকা। একটু কেন, বেশ অবাক্ হয়েই শান্তিবৌদি বললেন,

'এ কি! ঘরে ঘরে আলপনা!'

বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছিল অরিন্দম, খোলা গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, করা গেল লক্ষ্মীবন্দনা।'

'আলপনা তুমিই দিলে নাকি?'

'না, ওসব আমার আসে না জানোই। ওসব মঞ্জুলা দিয়েছে।'

'কে।' অজান্তে একটি বিস্ময়কর ধ্বনি বেরিয়ে গিয়েছিল।

'মঞ্জু, মঞ্জুলা।'

আপনার মনে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন শান্তি-বৌদি। মঞ্জুলা অপরিচিত নয়। এখানে সে অনেকবার এসেছে গেছে; ঢের ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে ওর অরিন্দমদার সাথে। বাধা কোনোদিনই দেন নি শান্তিবৌদি, বরং এতে যেন তাঁর প্রশ্রয়ই ছিল। সারাদিন খাটাখাটুনির পর মানুষটির আনন্দ-বিধান করা উচিত। ওটুকু চাই নিশ্চয়ই। যা শান্তিবৌদি দিতে পারেন নি, তার কিছুটাও যদি মঞ্জুলার দিক্ থেকে আসে শান্তিবৌদিরই উপস্থিতিতে, সে আর বেশি কি! মৌখিক আলাপ বৈ তো নয়। অরিন্দম দিনে দিনে ধন্দের চাপে অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে, মঞ্জুলা যদি পারে তাকে সমাজের মধ্যে ফেরাতে; এটা চেয়েছিলেন শান্তিবৌদি। ভালোবাসার গোপন সম্পর্ক যে ওদের মধ্যে আসতেও পারে, এ যেন কিছুতেই মনে হয় নি। মঞ্জুলা একটু ঠোঁট-আলগা, তা হলেও সে পরিষ্কার মনের মেয়ে। আর ও যে এসেছে কেবল শান্তিবৌদিরই আকর্ষণে, অরিন্দম আর বাড়ি থাকে কতক্ষণ? এই পাঁচ মাস শান্তিবৌদি অনুপস্থিত, এই অবকাশে মঞ্জুলা একেবারে কাছে এসে ধরা দিয়েছে। না হলে এ ঘরে আজ আলপনা সে দেয়! শুধু তাই নয়, ওর হাতের স্পর্শ যা কিছুতে পড়েছে, নিছক কর্তব্যপালনের রুক্ষতার চেয়ে তাতে মনের টানটাই বেশি। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের মন বুঝতে অসুবিধা কেন হবে! মন আলোড়িত হল, তবু স্বভাবত শান্ত স্থৈর্যে ঘরে প্রবেশ করলেন শান্তিবৌদি। মেঝের আলপনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুছে দিলেন, কেমন একটা আক্রোশ পড়ল মঞ্জুলার ওপর।

অরিন্দম মৃদু আপত্তি করেছিল—'থাক্ না। ভালই তো দেখাচ্ছে।'

'না, থাকবে না। মুছতে হবে।'

'খুব যেন রেগে আছ?'

'মোটেও না। রাগতে যাব কেন?'

'মঞ্জুলার ওপর রাগ করে—'

'তা বলছ কেন?'—দীর্ঘায়ত দৃষ্টিতে চাইলেন শান্তি-বৌদি। সে দৃষ্টির সামনে লোহার মানুষ অরিন্দমও কুঁকড়ে গেল। সহসা উত্তর করতে পারল না। কত অভিযোগ, কত যে অনুযোগ শান্তিবৌদির মনে ভিড় করল এ ক'দিনে, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলা গেল না। মঞ্জুলায় ব্যবহারে অসঙ্গতি এসেছে, এটা চাক্ষুষ ধরতে পেরেও বলা চলল না কিছু। নির্বাক্ দর্শকের নীরব আসনে বসেই রইলেন ধরের ধরণী, শান্তিবৌদি।

মঞ্জুলা আসে, বৌদির সংসার গুছিয়ে দিয়ে যায়। কোনোদিন বা রান্নায় সাহায্য করতে আসে। ছুটির দিনে একবেলার রান্না ওই করে দিয়ে যায়। শান্তিবৌদি আপত্তি করেন, কিন্তু ও শোনে না।

'ওঠ না বৌদি, মাংসটা রেঁধে দিয়ে যাই।'

কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্নাঘরে ঢোকে মঞ্জুলা। ওকে আসতে দেন শান্তিবৌদি। সংসারধর্মে কলেজী মেয়ের চঞ্চল মন যে বিচিত্র একাগ্রতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে, দূর থেকে এইটিই লক্ষ্য করেন শান্তিবৌদি। অবাক্ হতে হয়। অন্তত: মঞ্জুলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবাক্ হবার মত। রান্নার ষোড়শোপচারের পরিপাটি দেখতে দেখতে রসিকতা করেন শান্তিবৌদি 'বাবা, এ যা করছ, এ যে দীক্ষাগুরুর সেবাতেও লোকে করে না। আর কি যত্ন! তাই দেখছি আর অবাক্ মানছি। সত্যি ভাই, অনেক বদলে গেছ তুমি।'

উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে মঞ্জুলা ফিরে বলল, 'নতুন কি?

ঋতুর যেমন বদল আছে, মানুষও তো তেমনি বদলাবে, বৌদি। কিন্তু, কি বদল দেখলে তা যদি না বল, তবে অবাক্ মানবার পালা আমার। কই, বল—বলে ফেল—'

শান্তিবৌদি বললেন, 'সে আলোচনা পরে হবে। এখন তোমার হাঁড়ি সামলাও।'

'এই ছাখ, ঘি সব শুকিয়ে গেছে। আরো যে লাগবে, দাও না এনে, প্লিজ।'

ঘিয়ের শিশি এনে ওর হাতের কাছে দেওয়া না-দেওয়ার ছল করলেন শান্তিবৌদি, মঞ্জুলা খপ্ করে কেড়ে নিল শিশিটা। মুখটি খুলতে পারে না; কাপড়ে জড়ায়, আগুনে ধরে—নাঃ, এ যা বিশ্রীভাবে আটকানো, দৈত্যদানবের শক্তির বাইরে। এবার রাগ করে উনুনের গলগলে আঁচে ঠেসে ধরতে যেতেই শান্তি বৌদি হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হয়েছে গিন্নী, হয়েছে। এইটুকু শিশি, অত আঁচ সয় কখনো? দাও, আমাকে দাও দেখি। এই রকম না করে এইরকম করলে কত সহজে খোলা যায়।—দরজার পাল্লার ভাঁজে মুখটি রেখে একটু চাপ দিতেই শিশির মুখ খুলল; মঞ্জুলার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কায়দাটা শিখে রাখ, বুঝলে নতুন গিন্নী?'

'গিন্নী গিন্নী কেন করছ তখন থেকে? এমন বিশ্রী শোনাচ্ছে। সত্যিই কি গিন্নী হয়ে গেলাম নাকি?'

'না হও আজ—হবে তো একদিন। সেদিন বৌদির এই দেখানো কায়দাটা দেখিয়ে দেওর-ভাজদের অবাক্ করে দেওয়া চাই কিন্তু। আচ্ছা মঞ্জুলা, একটা কথার জবাব যদি চাই দেবে?'

'নিশ্চয়ই। বল।'

'তোমার পরীক্ষা সামনে। এ সময়টা পড়াশুনো ফেলে বাড়ি-বাড়ির কাজ করে দিতে যাও কেন? পরীক্ষার ক্ষতি হয় তো?'

মঞ্জুলা বিরক্ত হল, তবু বিরক্তি চেপে সহজ সুরে বলল, 'পরীক্ষার এখনো ঢের দেরী। আর এটা পড়াশুনোর বেলাই নয়। ঘটিরা সেদিকে চালাক আছে বৌদি। নিজের লাভলোকসান তারা ভারি বোঝে। আর বাড়ি-বাড়ির কাজে সাহায্য করতে যাওয়া, তা গেলুম কখন? অত পরোপকারবৃত্তি আমার নেই, হ্যাঁ। এক আসি এখানে; সে কেউ বললেও আসব, না বললেও আসব। দোষারোপ দিতে পার, দাও, যত খুশি দাও।'

নিরুত্তর রইলেন শান্তিবৌদি, কথা গেল থেমে। কিন্তু, আলোচনা আরো চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল; যে আঘাত মঞ্জুলার প্রাপ্য, তা আসা উচিত শান্তিরই দিক্ থেকে। আপন অধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপ কে কবে সহ্য করেছে? তাও কি শান্তিকে সয়ে যেতে হবে? কেন পারা যায় না শক্ত হতে? সমীচীন কটু কথা কেন মুখে আসে না? এ দুর্বল সভ্যতাবোধ আর যাবে কবে?

দুপুরবেলা মঞ্জুলার মেজবৌদি আসছেন ক'দিন থেকে। কথাবার্তায় আঁচ করা যায়, তাঁর কি একটা প্রস্তাব আছে। এবং সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনা বৃত্তাকারে ঘোরাফেরা করে। মনে করে দেখে, তার এই সন্দেহ কি অমূলক? আবার নিজের পাগলামি ভাবনায় নিজেকেই লজ্জা দেয়, দূর্, তাও কি হয়! অরিন্দমের সঙ্গে মঞ্জুলার গাঁটছড়া বাঁধার প্রস্তাব, তাও কি কখনো আনতে পারে ওরা? যতক্ষণ শান্তি আছে, ততক্ষণ সে প্রস্তাব অসম্ভব। স্বেচ্ছায় শান্তি যদি সরে যেতে চায়, তবে যা হোক একটা হতে পারে। আগে ডিভোর্স চাই। অরিন্দম অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদের এই বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। শান্তিও আর তেমন করে আনন্দদান করতে পারে না। এই অবস্থায় মঞ্জুলাকে ও ডাকতে পারে। কিন্তু বিয়ে কি করে সম্ভব যদি না শান্তি সরে যেতে চায়? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে প্রত্যহের প্রত্যেক মুহূর্ত!

মঞ্জুলার মেজবৌদি কিছুক্ষণ বকে বকে চুপ করে গেছেন শান্তির সাড়া না পেয়ে। অন্যমনে শান্তি এইসব ভাবছিল এতক্ষণ।

'তাহলে উঠি এখন।' মোটাসোটা মানুষ মঞ্জুলার

মেজবৌদি, উঠতে বসতে সময় লাগে। মুখে লাবণ্য আছে, আর সে মুখ পানের রক্তিমাভায় রক্তিম। পান-সুপারির কৌটো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। পানভর্তি মুখে রসিয়ে রসিয়ে কথা বলবার অভ্যাস। গৃহসুখে সুখী যে, দেখলেই মনে হয়।

'আর একটু বসুন না কেন? বেলা এখনও অনেক বাকি। আর একটু গল্প-সল্প করে চা-টা খেয়ে তারপর যাবেন।'

'না ভাই, এদিকে বসব আর ওদিকে হুলুস্থুল পড়ে যাবে। আপিস ভাঙার সময়টা আমাদের আবার উদ্বেগে কাটে কি না।'

'কেন, মারামারি হয় নাকি?'—হেসে বললে শান্তি-বৌদি।

'ওমা, তা হবে কেন! ওদের একমুখে যেমন আদর সোহাগ, অন্যমুখে তেমনি ঝাল! কি আর করব, সমঝে চলতে হয়।' তারপর আরও একটু রসিয়ে বলেন, 'নীচে যখন পড়েছি ভাই, তখন চিরকাল নীচেই থাকতে হবে। চিৎ কখনো পাট্ হয়ে বল?'

'না হবে কেন? করলেই যে হয়!'

'দূর্, তুমি কিছু বোঝ না।' খিলখিল হাসিতে পরিবেশ উচ্চকিত করে রওনা দেন মেজবৌদি। এই মঞ্জুসার বৌদিরা। প্রাণোচ্ছলা, তরঙ্গায়িত জলধারার মত। বড়, সেজ, মেজ—তিন জনেই একরকম। মেজ-জনের বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে; বয়সের ভার দেহে নিশ্চয় পড়েছে, কিন্তু মন? প্রাণবন্ত। তাও বেশি কিছু পেয়ে নয়, সংসারের খুঁটিনাটি কাজেকর্মে কি অপরিমিত পরিতৃপ্তি! এরা কাব্যিক নয়, প্রকৃতির শোভা এরা দেখে না। দেখবার ফুরসুৎ-ই নেই। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে হেঁসেল ঠেলা, ছেলেমেয়েদের পরিচর্য্যা, বাবুদের দেখাশোনা;—খেয়ে অবসর হতে সেই বিকাল। তারপর, অবিলম্বে চায়ের পাট। ঘনায় সন্ধ্যা। আরেক বউ তখন হেঁসেল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ছুটল তার সাহায্যে আর দুই বউ। ওইটুকু হেঁসেলে তিন জনের তখন মাথা ঠোকাঠুকি। ওদিকে ছোটছেলেটা কাঁদছে, দুধ দিতে ছুটল সেজ। তিন জায়ের ছেলেমেয়েতে বাড়ি তোলপাড়। এটা কাঁদছে, ওটা ফেলছে, ওটা বায়না ধরেছে! মেজবৌদি মুখে পান গুঁজে সকাল-সন্ধ্যা পড়ুয়াদের নিয়ে বসেন। নামে মাত্র বসা। পড়তে ব'সে এর ঢেকুর ওঠে, ওর হেঁচকি পায়; এটাকে জল খাওয়ান, ওড়ার ব্রহ্মতালু থাবড়ে দেন। এমন সময় ওদিকের ডাক আসে। সেজ ডাকে, 'মেজদি, এবার এস; জল ফুটে গেছে।' ছুটল তখন মেজ, পানের ডিবে বগলদাবা ক'রে। শাশুড়ীহীন সংসার। বউরাই মিলেমিশে চালাচ্ছে। কাজের ভিড়ে ওরা এমন করে মিশিয়ে গেছে, অন্যতর ভাবনার সময়ই পায় না। আর তাই আত্মসৃষ্ট দুঃখে দুঃখীও নয়?

ঈর্ষা করতে নেই, পরশ্রীকাতরতা পাপ। শান্তি তা করেও না। আজও যাই ওর কপালে ঘটুক না কেন, আজও ওর মন অপরের সৌভাগ্যে দ্বিধাবিমুক্ত। ঘরের আলো নিবিয়ে আপনমনে ও পাড়াপড়শীর ঘরের ভাবনায় সময় কাটায়। রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের আলো জানালা দিয়ে ঘরও খানিকটা আলোকিত করে। এ ঘরে শান্তি একা, পাশের দুটি ঘরও অন্ধকারে ভুতের নির্জনতায় পড়ে থাকে। দুজনের রান্না. কখন সমাপ্ত। আর কাজ নেই।...সুদীর্ঘ অবসর বেদনার বোঝা ঘাটে চাপিয়ে কোথায় কোন অলক্ষ্যে বসে মজা দেখে।...

যে কান্নায় অশ্রু নেই, সে কান্না মর্মান্তিক? অশ্রু ডেকেও পান না শান্তিবৌদি। অথচ, বুকের আগুন কি সহজে নেভে! কে আছে; কাকে ব'লে, কার কোলে মাথা রেখে অবরুদ্ধ অশ্রুগুলি মুক্ত হবে!

কড়া নড়ছে সিঁড়ির দরজায়। আলো জাললেন কোণার ঘরের, দরজার ওপারে বোসবাবু। শেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান্। অমসৃণ মুখে বসন্তর দাগ-গুলো ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে, চোখদুটি ফোলাফোলা। কণ্ঠস্বর জড়িত। কি-একটা বিশ্রী গন্ধ মুখে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'ইয়ে, অরি বাড়ি নেই নাকি।'

'তিনি তো ফেরেন নি।'

'ফেরেই নি, ঐ যাঃ! পানের দোকানে যে

দেখা। হ'ল এইমাত্র, বললে, আপনি যান, আমি আসছি, ফেরেই নি, এঁ্যা ?"

"না।"

'তাই সেইরকমই আন্দাজ করেছিলাম। দূর থেকে ঘরের বাতি নেবানো দেখে ভাবলুম, কেউ বুঝি নেই। তা হ'লে, তোমার কি অসুখ-বিসুখ কিছু—'

'নাতো।' মুখে হাসি এনে পরিবেশ লঘু করতে চাইলেন শান্তিবৌদি। বোসবাবুর 'তুমি' সম্বোধন কানে লাগছে, কিন্তু কি ভাবে প্রতিবাদ করা যায়। অফিসের বড়বাবুতুল্য ব্যক্তি, অরিন্দমের বন্ধুস্থানীয়ও বটে। বোসবাবু যেন কৈফিয়ৎ চাইলেন, 'তবে এই সন্ধ্যারাতে বাতিগুলো নেবানো যে! শুনিই না, কি হয়েছে ?'

'মাথাটা ধরেছিল তাই'—

শুনে অবধি বোসবাবু অস্থির হয়ে পড়লেন, 'মাথা ধরা! সে কি! না না, এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। ডাক্তার কেন দেখানো হয় না ? ট্যাবলেট নেই ঘরে ?' নেই শুনে বললেন, 'থাকা উচিত। অরিটা কিছু দেখে না? আচ্ছা না থাকে, এনে দিচ্ছি।' ছুটলেন দোকানে। ট্যাবলেটের একটা পাতা এনে বোসবাবু বললেন, 'এক্ষুনি একটা বড়ি খেয়ে নাও। একমুহূর্ত দেরি নয়—এক্ষুনি।'

ওষুধের পাতা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল শান্তিবৌদি। এই অপরাধ! এই নিয়ে পরে কথা উঠেছিল। কথা তুলেছিল অরিন্দম। শান্তিবৌদি বড় অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন অরিন্দমের জেরায়। সন্দেহের সুরে অরিন্দম বলেছে, 'লক্ষ্য থাকে না আমার, এ অপবাদ প্রায়ই শুনি। এটা কিন্তু আমার লক্ষ্যের বাইরে যায় নি, বোসবাবু তাঁর অপার পরোপকারবৃত্তির আংশিক পরিমাণ চালিয়েছিলেন সেদিন শ্রীমতী শান্তির ওপর। ঠিক সেইদিন যেদিন আমি বাড়ি ছিলুম না। আমারই দুর্ভাগ্য—'

'দুর্ভাগ্য কেন ?'

'দেখতে পেলুম না. তাই।'

'ইচ্ছে যায় নাকি এইসব দেখে বেড়াতে ? আমি তো জানি, এসব ব্যাপারে দৃষ্টিক্ষেপ করা তুমি দরকারই মনে কর না। যা কোনদিন কর নি, আজ তাই নতুন করে করবে, এত বদল হয় কি করে তোমার ?'

'প্রকৃতিতে ঋতুরও বদল আছে, শান্তি।'

'বাঃ, চমৎকার! মেয়েলি যুক্তি বেশ শোনালে।'

'শোনো,' ফিরে দাঁড়াল শান্তি, 'যা বললে তা ফিরিয়ে নাও। লোকের পরোপকারবৃত্তিই বলো আর যাই বলো, সে আমার চেয়ে বেড়াবার অভ্যাস নয়। কোনোকালেই ছিল না তো আজ। সেদিন তোমার বড় সাহেবের উপকার পেয়েছিলুম, সে তুমি আগেই কি করে শুনেছ; না শুনে থাকলেও আমি একসময় বলতাম। কাজেই, ঢাকাচোরা করে কথা যদি বল তবে সে যেমন আমার তেমনি তোমারও অপমান।'

অরিন্দম টেবিলের উপর কাগজপত্র খুঁজতে ব্যস্ত। শান্তির কথায় মনোযোগ নেই, এই ভাবটা স্পষ্ট করবারই প্রয়াস ওর। তবু, কথা কি কানে যায় না, কান যদি থাকে খোলা ? বিশেষতঃ, প্রসঙ্গটা ওদের দ্বৈত জীবনে যেমন আকস্মিক তেমনি আকাঙ্ক্ষিত। প্রাত্যহিকর জীবন-চর্যায় আঘাত-প্রতিঘাতেরও যে একটা মনোরম দাক্ষিণ্য আছে, এ অস্বীকার করবার নয়। সামান্য একটু ওষুধ কিনে দেওয়া নিয়ে যে কথাপ্রসঙ্গ হঠাৎ উঠে পড়েছিল, অতঃপর তার রেশ যে চলতে থাকবে, স্থির বুঝেছিলেন শান্তিবৌদি। চক্ষুলজ্জা একবার যখন কেটে গেছে, তখন তো ভালোই। ছুতো খোঁজা ? সংসারে ছুতোর আবার অভাব!

আপনিই এল। আঘাতের পর আঘাত, অপমানের পর অপমান বিষাক্ত সূঁচের খোঁচায় বিঁধল, বিঁধল শান্তিবৌদিকেই। নীরব অভিমানের কতকগুলো দিন শুধু কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা উপহার দিল। সময়ের সাথে ধৈর্য্যও ভাঙে লোকের। অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন শান্তি-বৌদি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর চরম অভিজ্ঞতা যে স্ত্রী স্বামীর কাছে পায়, স্নেহ ভালোবাসায় গড়া এই মানবসংসারের ওপর বিশ্বাসহীনা সে কেন না হবে! আপনার ছোট্ট নীড়টুকুর পরিপ্রেক্ষিতেই যে সে চিনেছে

বৃহত্তর সংসার। সেখানেই যখন ভাঙচুর, তখন সার্বিক প্রেম টিকবে কিসের জোরে! অসাধারণ স্ত্রী নন শান্তি বৌদি, ভালোবাসার বিরাটত্ব তাঁর কাছে আশা করা বৃথা।

আদর করবার মধ্যে পাশের ফ্ল্যাটের সাহেবের ছেলেটা! অরিন্দম এর মধ্যেও সন্দেহ করল। আগে সে এমনি বারণ করেছে, 'কি দরকার ওদের সঙ্গে মাখামাখি করে, ওকে আর ডেকো না,' এ একরকম; ঘাড় নেড়ে বসেছিলেন শান্তিবৌদি, ''আচ্ছা বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে আর ডাকব না'। না ডেকে পারেন নি অবশ্য, অরিন্দমের আড়ালে বাচ্চাটাকে আদর করতে হয়েছে। তবু, কিছু মনে হয়নি। কিন্তু, দু'দিন আগে যে রকম ভাষায় কথা বললে অরিন্দম, তাতে মরামানুষকেও ঘা দেয়,—প্রতিবাদ কেন উঠবে না শান্তিবৌদির দিক থেকে?

'কি! এতখানি তুমি বলতে পারলে! এতটুকু মুখে বাধল না! ছি ছি! এ যে কোনোদিন আমার মনেও আসেনি গো! ঐটুকু একরত্তি ছেলে; ওকে ভালোবাসি, হ্যাঁ, ভালোবাসি, ভালোবাসবও। তাই বলে তুমি—

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে। ন্যাকা কান্না না কাঁদলেও চলবে।' বেরিয়ে যাচ্ছিল অরিন্দম।

পথ রোধ করে দাঁড়ালেন শান্তিবৌদি, বললেন, 'এত অবিশ্বাস জমেছে তোমার মনে! ভাবতে পারলে তুমি, শান্তি এই মাতাল লোকটার সঙ্গে—আমি যে মুখে আনতে পারছি না,—এ তুমি বললে কি করে? কি? কি দেখেছ তুমি আমার মধ্যে? কি অন্যায় আমি করেছি? আজ এই সাতবচ্ছরে কি অন্যায়, কি বেয়াদপি তুমি পেয়েছ শান্তির মধ্যে? বল, বল, —বলে যাও।'

অভদ্রোচিত মুখভঙ্গিমায় উত্তর করল অরিন্দম, ঐ দরজার কাছ থেকেই বলল, 'সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ শান্তি? বাড়িতে এই লোকটা থাকে কতক্ষণ? বাড়ির সাথে তার সম্পর্কই বা কতটুকু? তাই বরং, নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখ'—

বাধা দিয়ে বলে উঠল শান্তি, 'তা আমি করেছি। হাজারবার, লক্ষবার করেছি। তুমি জান, কি করে দিন কাটে আমার? জান তুমি?'

'তা আমার জানবার কোন দরকার নেই, শান্তি।'

'তাই ত—এতটা দূরে নিজেকে নিয়ে গেছ বলেই আজ আর কিছু বুঝতে চাও না। ভালোবাসা চাইনে কারও কাছে, অরিন্দম; চাইনে - কিছু আমার কারুর কাছে চাইবার নেই। শুধু এইটুকু, মিথ্যে সন্দেহের আগুনে পুড়িও না আর। তোমার পায়ে পড়ে মিনতি করছি'—

অরিন্দম প্রত্যুত্তর না করে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

গৃহদাহের সূত্রপাত আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান!...

তবু স্থির অকম্পিত মনে অপেক্ষায় থাকতে হবে শান্তিকে—যা ঘটবার তাই ঘটবে; ভবিষ্যৎ তাই হবে। দুঃখ আর কি, শুধু এই নিষ্ফল দিনগুলোকে বোঝার মত ভার মনে হয়। মঞ্জুলা আসে। ওর পাল্টানো চালচলনের বহু প্রতিবাদ আছে, তবু মন স্থিরই রেখেছেন শান্তিবৌদি; ঠিক করেছেন এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না। অরিন্দমের প্রশ্রয়ই আছে যেখানে, সেখানে আজ তাঁর কিছু বলাও উচিত নয়। এ যেন নিজের আগুনে নিজেকে পোড়ানো। কাউকে বলতে বাধে, অথচ না বললেও বুকের ব্যথা ঠেলে উঠতে চায়। দুর্গাপুরে লিখতে গিয়েও আজ মনের বাধা আসে। জন্ খেলা করে মাঠে, ফিরে ফিরে চায়, ডাকতে বাধা পান শান্তিবৌদি। ছেলেটাও আর কাছ ঘেঁসে না, ও-ও যেন বুঝতে পেরেছে, শান্তিবৌদির মনের বাধা।

'জন্, কাম অন্—এই জন্!' সেদিন ডাকলেন। বারান্দায় বসে বিষণ্ণ বিকেল কাটছিল, না ডেকে পারলেন না। জন্ পালিয়ে গেল। কিন্তু, একটু পরে বারান্দার ওপাশ থেকে উঁকি মারল। ছেলের মুখ তো রীতিমত শুকিয়েছে।

শান্তিবৌদি হেসে বললেন, 'কি গো, তোমারও মানে লাগে নাকি? কি করেছি যে একবারও খোঁজ নিতে নেই, মাসিটা মরল না বাঁচল? তোমার আবার হ'ল কি—ও বাবু?'

'হোয়াই ?'

'হোয়াই কি ? হয়েছ ত ডুমুরের ফুল।'

'নো-নো, ডোণ্ট কল মি ফুল। আই অ্যাম নট এ ফুল।'

'আবার গালাগাল। কান মলে দেব। এই শোন্, শুনে যা—এই দ্যাখো পালিয়ে গেল।'

আবার একলা। মঞ্জুলাদের চারতলার ফ্ল্যাটের দিকে চেয়ে দেখল, আজ আসেনি মঞ্জুলা। ছুটির দিন আজ; ওবেলা আসেনি, এবেলা আসতেও পারে। ওই আসছে মঞ্জুলা। উজ্জ্বল সাজ, উচ্ছল পথ-চলা। কেন না হবে, শান্তির মত সবারই কেঁদে কেঁদে দিন কাটতে যাবে কোন্ দুঃখে ? কাছে এসেই আক্রমণ করে মঞ্জুলা, 'নিঃসঙ্গ বৈরাগিণী, যেন কতযুগের প্রেমোপবাসিনী। এ দশা কেন ?'

হাসলেন শান্তিবৌদি। টবের তলায় যে ঘাসগুলি হলুদ হয়ে গেছে ওই দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন, মুখে কিছু বলবার দরকার হল না। মঞ্জুলা কি বুঝল, একটুখানি হেসে নিল।

সাদরে আহ্বান করলেন শান্তিবৌদি, 'এস।'

হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে এসে দেখলেম, মঞ্জুলা অন্যমনে কি ভাবছে। টবগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে হল, আচমকা ধাক্কায় সৌখিন ভাববিলাসের সৌধ ভেঙে দিতে। মঞ্জুলার মত মেয়ে 'সিরিয়াস' হয়েছে, এটা মনকেও কেমন ধাক্কা দেয়।

'মঞ্জুলা! এই, এই মঞ্জুলা!'

কানের পাশে এত ডাকাডাকি, তবু এর সাড়া নেই। গায়ে ধাক্কা লাগালে বলে, 'কি ? ডাকছ আমায় ?'

'এখন ? ডেকে ডেকে গলা ব্যথা হয়ে গেল। ধন্যি মেয়ে যা হোক। অনন্যচিত্তের ভাবনায় একেবারে নির্বিকার নির্বিকল্প হয়ে যেতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল ?'

'মোটেও না। একটুও ভাবছিলাম না।'

'নির্ঘাত ভাবছিলে। ভাবছিলে কি ? বল না; ছাড়ছি না; বলতেই হবে কি ভাবছিলে।'

'কিছুই না।'

'কিছুই না—এ হতেই পারে না।'

'তবে ভাবছিলাম, তুমি এমন সুন্দর হলে কি করে ?'

হেসে উঠলেন শান্তিবৌদি।

'ঘরগুলো এত নোংরা ক'রে রেখেছে কেন ? ওটা কি কয়লা রাখবার জায়গা, না ঘুঁটে রাখবার চুবড়ি ? বাসনগুলো অমনি পড়ে,—দরজা-জানালার পর্দাগুলো যেন কতজন্ম ধোওয়া হয় নি। ইস্, কি অব্যবস্থা!'

'তা কি করব, বল। অচর্চায় সব কিছুতে যখন মরচে পড়ে যায়, তখন হাতপাগুলোর আর কি দোষ বল। কাজ করতে হাত ওঠে না, পা এক পাও নড়তে চায় না।'

'বাঃ, তা বল্লে চলবে কেন ? এটা কোন যুক্তিই নয়।' মঞ্জুলা ফিরে বলল, 'তুমি জান কি না জানি না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অরিন্দমদা কত পছন্দ করেন। দিনান্তে ঘরে ফিরে মানুষটাকে যদি নোংরাই দেখতে হবে, তবে তাঁর বিরক্তি আসবে না কেন, তুমিই বল।'

পরিষ্কার আঘাত করল মঞ্জুলা। রুক্ষ-রূঢ় উত্তর দেবার ছিল শান্তিবৌদির, তবু অকপট সারল্যে মুখের হাসিতে ঢাকতে হ'ল সবকিছু। মঞ্জুলার প্রশ্নের উত্তরে হেসেই বলতে হ'ল 'তুমি যে লোকটার কথা বলছ ভাই, তিনি একরকম ধরেই নিয়েছেন, ঘরের মানুষটি একেবারেই অথর্ব।'

মঞ্জুলা বলল, 'তবে বিয়ে করা কেন ?'

'কিছু না, কিছু না—কোনো কাজেই আসল না।' শান্তিবৌদি হেসেই বললেন কথাটা। মঞ্জুলা চুপ ক'রে আছে, বোধ করি নিজের প্রশ্নে নিজেই লজ্জা পেয়েছে।

শান্তিবৌদি বল্লেন, 'আবার এটাও কেমন অনুশোচনার দেখ, কোন কিছু নিয়ে ও কিছু বলবে না। সে যেন অর্জুনের ধনুক ভাঙা পণ;—বলব না তো বলবই না, করব না তো করবই না। তাঁর 'না'কে 'হাঁ' করানো যায় না। লোকে তো কাজেরই কৈফিয়ৎ চায়,—'কেন হয় নি' 'কেন হ'ল না'—ও তাও চাইবে না। একেবারে নির্বিকার মানুষ।'

'মোটেও তা নয়। ও রকম স্বভাবের লোক হ'লে আর অফিস চালাতে পারত না।'

'চালাচ্ছে কি আর, ও আপনিই চলে যাচ্ছে।'

'তা বৈ কি। চালাচ্ছে না, মাস গেলে মাইনে ওরা মুখ দেখে দিচ্ছে কি না। নাও সরো দেখি—'কাঁধে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজে লেগে যায় মঞ্জুলা। একটুও অপ্রস্তুত নন শান্তিবৌদি। কেননা, এইটিই আজ স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে। শান্তিবৌদির সংসার মঞ্জুলা গুছিয়ে দিয়ে যাবে, এটাই কেমন করে স্বভাবত হ'য়ে গেছে। ফুলদানিতে ফুল নেই। বইপত্রগুলো অগোছালো। দোয়াতদানি উল্টে পড়ে আছে, কলমের নিব ভাঙা। আরও কত বেহিসেব। যেন লক্ষ্মীহীন সংসার। মঞ্জুলা এটা টানে, ওটা টানে; আর কৈফিয়ৎ চায়। শান্তিবৌদি চৌকির পরে গুছিয়ে বসে কেবলই হাসতে থাকেন।

'হেসো না ন্যাকার মতন।' ঝাঁঝিয়ে ওঠে মঞ্জুলা।

'একটা গান শুনবে?' আগুনে ঘি দেন শান্তিবৌদি।

'না, না, না।' রুক্ষ কটাক্ষে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় মঞ্জুলা।

'শুধুশুধু চটছ তো। কার ক্ষতি? মাথা যে গরম ক'রে রাখছ, পরে ভুগতে হবে নিজেকেই। মেজবৌদি বলছিলেন, ওর আবার মাথার গোলমাল। তোমার কথা। তাই, আমরা তাকে সহজে চটাই না।'

'মেজবৌদি ওই রকমই চালিয়াত। ওদের বাড়িটাই চালিয়াত চন্দর।'

'তা কি ক'রে বোঝা গেল?'

'খুব বোঝা যায়। কিন্তু, মোটাবৌদির কথা থাক্। নিজের কথা বল।'

'নিজের কথা কিছু নেই।'

মঞ্জুলা একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'সত্যি বুঝতে কষ্ট হয়, কিছু আছে কি নেই। তবু বলছি, এখানে একজন লিখিয়ে থাকলে গল্প লিখত তোমাকে নিয়ে।

'প্লট হারিয়ে ফেলত।' বাধা দিয়ে বললেন শান্তিবৌদি, 'এই একরাশ এলোমেলো কথা গাঁথবে কে।'

'লিখতে জানলে আমি নিজে লিখতুম। এ রকম একটা চরিত্র কিছুতে ছাড়তাম না। শান্তিবৌদির স্টোরি জনে জনে শুনিয়ে বেড়াতুম।'

'করতুম পারতুম অনেক শুনলুম, এবার আমি থামলুম। বাবা, তোমার সঙ্গে বকা আমার সাধ্যেরও অতীত। নাও, যা করছিলে তাই কর। ছবির মত সাজিয়ে গুছিয়ে দাও ঘরগুলি, বাতায়নে ব'সে আমাকে দেখতে দাও।'

'ওটা কি হ'ল।'

'কাব্য।' শান্তিবৌদি হেসে উঠলেন, 'মনে কর কি, ফুরিয়ে গেছি? একটুও না। এখনও অনেক আছে, অনেক দিতে পারি।'

শান্তির কাব্য-প্রয়াস কানেই তুলল না মঞ্জুলা। ছুটোছুটি করে কাজ গুছিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘরে ফিরে অরিন্দমকে বেশ খুশী মনে হল। মঞ্জুলার হাতের স্পর্শ সবখানে, কি করে যেন বুঝেছিল অরিন্দম। শান্তিবৌদি শেড়ে কালি-আলকাতরার খাটা লোকটাকে নতুন করে বুঝতে চাইলেন।

হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে অরিন্দম।

শান্তিবৌদি দূর থেকেই বলেন, "কি হল? শরীর খারাপ নাকি? তবে, শোবার কি হল? ওঠ, ভাত দিয়েছি।'

'বাঃ, আজ ত আমার খেয়ে আসবার কথা।'

'বা রে, তা আমি জানব কি ক'রে?'

'কেন, যাবার আগেই তো বলে গেলাম, পার্টি আছে।'

'কই, আমার তা কানে যায়নি।'

অরিন্দম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শুধু এটা বলে না, কোন্ কথাটাই বা কানে যায়। সারাদিন এমন ভাব যেন, অশেষ দুঃখ, অশেষ কষ্টের মধ্যে কে ফেলে দিয়ে গেছে। যেন খুব অত্যাচারিত হতে যাচ্ছ—'

শান্তিবৌদি একটু হেসে বললেন, 'কথাগুলো যে গল্পের মত শোনাচ্ছে।'

'না-না, ঠাট্টা নয় শান্তি। আমি সিরিয়াসলি বলছি।—শোন, তোমার যখন মনে হচ্ছে এখানে তুমি

সুখী নও, অন্যত্র কোথাও সুখ হয়, then why not think of ইয়ে—'

'আঃ, কি বকছ পাগলের মত।' অরিন্দমকে থামিয়ে দিতে বলে উঠলেন শান্তিবৌদি। অরিন্দমের অমুক্ত বক্তব্য স্পষ্ট। এতদিন বলেনি, আজ ও স্পষ্ট বলে দিতে চায়ঃ

Why not think of mutuad separation !

মন ত প্রস্তুত। হ্যাঁ, প্রস্তুত। বাজ পড়বার মত চমকে উঠবে না দু'জনের কেউ। অস্বস্তি কেবল কথাটাকে ঘিরে। সাতটি বছরের স্মৃতি যে কথায় ছিন্ন হবে, অস্বস্তি তার উপস্থাপনায়; এই ভেবে বুক কাঁপছিল শান্তিবৌদির। তাই থামিয়ে দিতে চাইলেন অরিন্দমকে। আর আবার ভয়ের কি। আর কোন দ্বিধা, কোন সন্দেহ. কোন সংশয় পিছু টানছে না। সমস্ত আজ মুক্ত।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে চাইলেন শান্তিবৌদি। সে দৃষ্টিতে সেই একটিই প্রশ্ন,—কবে, সে কবে! কত শীঘ্র। মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত করে দাও এ নিষ্করুণ বাঁধন হতে। মোহ কেটেছে, শান্তি নেই, সুখ অন্তর্হিত,—কি হবে আর এই শাঁখায়, এই সিঁদুরে। মুছে দাও সিঁথির সিঁদুর, ভেঙ্গে দাও হাতের শাঁখা; মুক্ত করে দাও।

থেমে গিয়েছিল অরিন্দম সেদিন। শান্তি বুঝল অরিন্দমের মনের দ্বিধা যায়নি এখনো। সময় লাগবে একটা কিছু করতে। অগত্যা, সে ভিড়ল দেবালয়ের শঙ্খঘণ্টার ডাকে। ভক্তির পথ প্রশস্ত নয়; প্রাণের সাড়া সে পায় না; তবু পুজোর আসনে জোর করে বসায় নিজেকে। রাতভোরে ঘুম ভেঙ্গে অরিন্দম শোনে, শান্তির মন্ত্রপাঠ। সন্ধ্যায় ফিরে দেখে ঘরের কোণায় জ্বলছে মাটির প্রদীপ, শান্তি দেবচর্চ্চায় নিমগ্না। দিনে দিনে ভক্তিমার্গের আচার-বিচার বেড়েই যেতে থাকে। এক মাসের মধ্যে স্ত্রীর আধাসন্নেস্বীনীর ভাব লক্ষ্য করে সেদিন প্রথম জেরা করল অরিন্দম, 'এসবের মানে কি?'

শান্তি এড়িয়ে যেতে চায়। অরিন্দম ও-ঘরে গিয়ে দু'হাতে শান্তিকে ফেরাল, 'কি, জবাব দিচ্ছ না যে।'

'নতুন করে আর কি দেবার আছে, বল। ঘর-সংসার তোমার যেমনটি চলছিল, তেমনটিই চল্‌ছে।'

'ন্যাকামি করো না। ওটা আমার ধাতে সয় না। শোন,—এই যে ঘরবাড়ি দেখছ, এটা মঠ-মিশন গড়বার জন্য এত দরখাস্ত এত তদ্বির করে করিনি; আর পাঁচ জনের মত ঘর-সংসার করবার জন্যই এটা করেছিলাম।'

'জানি।' শান্তি বলল, 'আর কিছু বলবে?'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অরিন্দম; ও ঘরে যেতে যেতে শুনিয়ে যায়, 'আর কত বলতে হবে! যথেষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। যা বলা হয়েছে পাঁচ বছরের শিশুও এতকালে বুঝে ফেলত। জেগে যে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙ্গান যায় না। অকৃতজ্ঞ।'

শান্তির মাথায় হঠাৎ কি হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ফিরল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'মঞ্জুলা আসুক। আমাকে যেতে দাও।'

অরিন্দম ফিরে দেখল, শান্তির সন্ন্যাসরুক্ষ অনমনীয় অভিব্যক্তি। এমন স্পষ্ট উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না অরিন্দম। ও বরাবর দেখেছে, শান্তি ভীরু লতার মত। আজ দেখল অন্য রূপ। ওর বলিষ্ঠ পৌরুষচিত্ত সহসা কেমন গুটিয়ে গেল। শান্তির অকম্পিত কণ্ঠের ওই স্পষ্ট উচ্চারণ বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ধ্বনিতে বেজেছে, অরিন্দম তার উত্তর খুঁজে পেল না। শুধু বলল, 'নির্লজ্জ কোথাকার।'

'বেশ। পারো বিদেয় কর নির্লজ্জ স্ত্রীকে। স্বামীর কর্তব্য কর।'

'এই যে। চমৎকার কথা বলতে শিখেছ।'

'না পারব কেন। শেখালে পাখীও যখন শেখে।'

'সব পাখীত কথা কয় না। তোতা ময়না টিয়া—এ কটিই কয়, জানতাম। যাক, ছেলেমানুষী তর্কে আমার লাভ নেই। কাজ আছে, বেরুচ্ছি:—হ্যাঁ, মঞ্জুলাদের বাড়িতেই। যাসন্দেহ করছ, ঠিক তাই। কিন্তু শোন—"

"বল।" শান্ত চোখ তুলল শান্তি।

"পদেপদে সন্দেহ-সংঘাত, কলহ কোলাহল, এ ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে না। এ ভালো নয়। আজ একটা জাতি নষ্ট হ'তে বসেছে এই ভাবে। একটা পরিবার না হবে কেন। সম্পর্কের বাঁধন যেমন পরিবারেই বেশি, তেমনি ভাঙনও এখানে কথায় কথায়, বিশেষতঃ, conjugal life-এ এটা যেন অবশ্যম্ভাবী—"

"হ্যাঁ, বিষবৃক্ষে আছে।"

"কিসের বিষবৃক্ষ। ও বঙ্কিমবাবুর। তুমি তা হ'লে পড়েছ। কিন্তু শোন, গল্পের উপমা দিয়ে জিনিসটাকে ঢাকবার চেষ্টা ক'রো না। কেননা, ওসব আমি আবার বুঝি কম।"

"বোঝাবুঝির কি আছে? আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা তো পরিষ্কার। সেজন্য কি? মন প্রস্তুত আছে। যদি সাহস থাকে তোমার, বাধা আমার দিক থেকেও আসবে না।"

"সত্যি?"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি।"

অরিন্দম চলে গেলে একলা ঘরে অনেকক্ষণ কাঁদল শান্তি। চোখের জল আজ আপনিই এল।

বাকি মাত্র ক'টা মাস। শান্তিবৌদির শেষের ক'টি বসন্ত।

তারপর, শান্তিবৌদির কাহিনী দ্রুত শেষ হয়ে গেছে।

বিদায়ের বাঁশী জীবনে তো অনেকদিন আগেই বেজেছিল, শেষটা ছিল বাকি, তাও সম্পূর্ণ হ'ল।

তবে অশান্তির মধ্যে চলে যেতে চান নি শান্তি-বৌদি। শেষ পর্য্যন্ত তাও হ'ল। কেননা, অরিন্দমের ব্যবহার দিনে দিনে বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছিল। মুখে যা বল্‌বার তার একটাও বাকি রাখেনি, এক হাত তুলতেই যা বাকি। সেদিন কি একটা কথায় ছুটে আসে অরিন্দম, শান্তিবৌদি ওর মুখের চেহারায় চমকে ওঠেন। মাঝখানে জনু এসে পড়ায় থেমে গিয়েছিল অরিন্দম। একেবারে থামল না। আক্রোশটা মেটাল বাচ্চা ছেলেটার ওপর। শান্তিবৌদির হাত থেকে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিল। বাধা দিতে গিয়েছিলেন শান্তিবৌদি, অরিন্দম ফিরে বল্‌ল, "আবার।"

"কি করলে তুমি? ওর গায়ে হাত তুললে? ও তোমার খায় না পরে? তার চেয়ে আমাকে মারলে না কেন?"

অরিন্দম বল্‌ল তেমনি আক্রোশে, "ও আসবে কেন?"

শান্তিবৌদি বল্‌লেন, "আসবে।"

"নির্লজ্জ, বারণ করলেও শুনবে না।"

"না, তোমার ও-বারণ আমি শুনব না; তাতে আমাকে নির্লজ্জই বল আর যাই বল। পাঁচ বছরের শিশুর মধ্যে তুমি অন্যথা দেখতে পার, আমি পারি নে। মন ছোট করেছ, আর কত করবে?"

"শান্তি।"

"না, না, না। ও নামে আর ডেকো না। শান্তি নেই, সে মরে গেছে তোমার কাছে।"

"বাঃ, চমৎকার নাটক! চমৎকার অভিনয়!"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" উত্তেজনায় কাঁপছিল শান্তি।

অরিন্দম একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "এভাবে কত-দিন চল্‌তে পারে, বা চলা উচিত, প্রশ্নটা একবার কোনো ভদ্রপাড়ায় ক'রে দেখো।"

শান্তিবৌদি বললেন, "কিন্তু, আমি যে বিশ্বাস হারিয়েছি, অরিন্দম। ভদ্র বলতে এতকাল যা বুঝেছি, আজ দেখছি তাতে আগাগোড়াই ভুল। না হ'লে, তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি আপনিই দিতে।"

"তার মানে আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর?"

"কোন্ উত্তরে সন্তুষ্ট হও?"

"জানি-নে। আমি শুধু তোমার মনের কথা শুনতে চাইছি। বল, বল আমাকে, শান্তি।"

শান্তিবৌদি একটু হাসলেন, "নতুন ক'রে আর কি বোঝাতে যাব? সাত বছরের প্রতিদিনের কাজে যা শান্তি করেছে তাই শান্তির পরিচয়।"

"রীতিমত কাব্যের মত শোনাল।"

"শোনাতে পারে। জীবনের সকল কিছুতে যখন শান্তি কাব্যই করছে। কিন্তু সে যাক্। আসল কথা, সমস্যা। দেখ, সমস্যা সংসারমাত্রেই আছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। আমাদের ব্যাপারে সেটা যাই হয়ে থাক, মীমাংসা এখনই ক'রে নিতে হবে। আর দেরী নয়।—অনেক দুঃখ, অনেক অশান্তি এসেছে, নইলে সে আরো যে আসবে! তার চেয়ে, এখনই ঠিক ক'রে নাও। কেননা, আমি সত্যি ক্লান্ত হয়ে গেছি, অরিন্দম, আর কোনো কিছুতে আমার ইন্টারেস্ট নেই। বিশ্বাস কর, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।" একটু থেমে শান্তি বৌদি আবার বললেন, "কিন্তু তাই ব'লে একজনের দুর্ভাগ্যে আরেকজনের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠবে, এ আমি চাই নে। জানি অরিন্দম, আমাদের চারপাশে সমাজ আছে; সামাজিকতা আছে; সমাজের অনুশাসন আছে; ভদ্রঘরের বউ ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে গোটা পরিবারের ওপর তারা কলঙ্ক দেবে। সে কলঙ্কের কালি মর্মান্তিক। তাই এমন কর, যাতে সবদিক থেকে দেখতে শুনতে ভালো হয়, কেউ কিছু বলতে না পারে, সুযোগ না পায়—"

"বাঃ, এ অভিনয়ও চমৎকার!"

'না।" আবেগকম্পিত কণ্ঠে শান্তিবৌদি বলে উঠলেন, "অভিনয় নয়। আমি অভিনেত্রী নয়। আমি তোমাদের গেরস্তঘরের বউ, শান্তি। আমি মুক্তমনে বলছি, অরিন্দম। কেননা, এ-ভাবে একসাথে থাকার কোন অর্থ হয় না।"

"তাতে যদি তোমার ব্যথার উপশম হয়, দুঃখ ঘোচে, তাই হবে।"

"কবে?" শান্তিবৌদি প্রশ্ন করলেন।

"তোমার কথামত, তোমার সুবিধামত।"

"আচ্ছা।"

বারবারান্দায় যখন এসে বসেছিলেন শান্তিবৌদি, তখনও ভোর হয় নি। শীতের কুয়াশা কাটেনি। সূর্য উঠল অনেক পরে। শেষরাতের হিম পড়ে মাঠের ঘাসগুলোকে ভিজিয়ে দিয়েছে। একটা আলোয়ান গায়ে দিতেও ভুলে গিয়েছিলেন শান্তিবৌদি। অরিন্দমের কথায় চমক লাগল। প্রশ্ন করছে অরিন্দম, "ঠাণ্ডায় ব'সে কেন? একটা আলোয়ান নিলেই হয়।"

উত্তর দেবার ছিল, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও। তবু চুপ করেই বসে রইলেন তিনি। মন আজ ভারশূন্য। চলে যেতে পারলে আজই যাওয়া যায়। আজ দিনটি যাবার মতই। একটু পরে শেডের জামাকাপড়ে বেরিয়ে আসে অরিন্দম, চায়ের জন্য আর ডাকে নি। ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে মনে পড়ল শান্তিবৌদির, ডেকে বললেন, "চা খেলে না?"

"না। ওখানে গিয়ে খেয়ে নেব।"

আঁচলের চাবি খুলে হাত বাড়িয়ে দেন শান্তিবৌদি, অরিন্দম হেসে বলল, "আচ্ছা-আচ্ছা, সে হবে।"

"হবে আবার কি! কি ছেলেমানুষি কর। রেখে দাও এটা। পরে মনে থাকবে না।"

ততক্ষণে চলে গিয়েছে অরিন্দম। একলা বাড়িতে সারাদিন শূন্যমনে কাটল।......বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে শীতের সকাল উপভোগ করা গেল। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল জন্-এর কথা। সেই যে অরিন্দম বার ক'রে দিয়েছিল, তারপর দু'দিন তার দেখা নেই। মনটা পড়ে আছে ওকে একটু আদর দিতে। এমন সময় চোখে পড়ল, মাঠের উপর জন্ দাঁড়িয়ে; ভুরু কুঁচকানো, রুক্ষ চুল, এলোমেলো চেহারা ছেলের—হাতে ব্যাড্‌মিন্টনের র‍্যাকেট। চোখের ইশারায় ডাকলেন শান্তিবৌদি। জন্ মাথা নাড়তে লাগল। শান্তিবৌদি এবার একটা বিস্কুট দেখিয়ে বারবার ডাকতে ও কাছে এল এক পা এক পা ক'রে। দু'পা দূরে আছে, দৌড়ে ধরে ফেললেন ওকে। চুমু খেলেন। বারবার। র‍্যাকেট দিয়ে মুখ আড়াল করে জন্, শান্তিবৌদি ওটা কেড়ে রাখেন। ফিরে ও আচল খামচায়। জোর ক'রে ওর চিবুক ধরে মুখ সোজা ক'রে ধরে শান্তিবৌদি বলেন, "আর রাগ কার ওপর হবে! আমি তো চললাম। Yes John, I am leaving you all."

জন্ চোখ ছোট ছোট ক'রে বলল, "why?"

"ঝগড়া করেছি যে স্বামীর সঙ্গে। সে খুব angry, get out ক'রে দিয়েছে।"

বাংলা ইংরেজী মেশানো কথা জন্ বেশ বুঝতে পারে।

ও প্রশ্ন করে, "when will you come back again?"

শান্তিবৌদি মাথা নেড়ে বলেন, "never!"

"Oh, my God!"

"ছি জন্, ভগবানকেই তুমি বলো, শান্তিকে তিনি সৌভাগ্য দিন। এত দুঃখের পরে আর সে স'বে কত! অনেক কান্না সে কেঁদে গেল এ কটি বছর, কেউ তা' মনে রাখবে না। ওরা বলবে, শান্তি অপয়া, শান্তি অলক্ষ্মী; অরিন্দমের জীবনে মন্দ গ্রহের মত সে এসেছিল; সংসারকে সে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। তুমি, জন্, তুমি যেন থেকো শান্তির দিকে। কোলের ছেলের মত ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, আর কোনো পাপ তো আসে নি মনে।"

জন্ শান্তির আঁচলে মুখ লুকিয়েছিল। শান্তি ওর চিবুক তুলে ধ'রে মুখ দেখলেন, ছেলে মুখ সরিয়ে নেয় বারবার। শান্তি ছাড়বে না, ও-ও জোর করবে। ছোট্ট দু'হাতের প্রবল আপত্তির চোট লাগল হাতের শাঁখায়, শাঁখা গেল ভেঙ্গে। জন্ পালিয়ে গেল। ভাঙা টুকরোগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে হাসলেন শান্তিবৌদি। কি হবে আর অনুশোচনায়! শাঁখা-সিঁদুর যা কিছু প্রত্যক্ষে, মনে মনে সে কবেই মিথ্যে হয়ে গেছে।

নতুন জীবনের বাঁশী যেন কোথাও বাজে। সে কি শান্তির নতুন জীবনের সুর? বাঁশী বাজুক, সে তো আর চায় না। তার চেয়ে অন্য কিছু। যা রুদ্র, যা রুক্ষ, কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি যা ঠেলে দেবে।

ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অপিস থেকে সার্টিফিকেট আনতে একটুও ভুল বা একটুও দেরি করে নি অরিন্দম। সকালে সেটা সে দেখাল শান্তিকে। শান্তি দেখল, ফর্ম ফিল্আপ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। সই করতে বাকি। সই শান্তিরও হয় নি, অরিন্দমও করে নি। ফর্মটা ফের চেয়ে নিল শান্তি। কলম তুলতে যাবে, অরিন্দম ব'লে উঠল এমন সময়, "শোন, এত তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে হবে, এমন নয়। সময় আছে, ভেবে দেখ—"

"বাধা দিও না, অরিন্দম। অনেক ভেবেছি আমি। মনে দ্বিধা রেখো না, না ভেবে আমরা কেউই এটা করছি না। তাছাড়া—"একটু থেমে বলল, "না, তাছাড়া আর কিছু নেই।"

অরিন্দম ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করল, "বাবা-মা জানেন? তাঁদের চিঠিতে কিছু জানিয়েছ কি?"

শান্তি মাথা নাড়ল। একরকম মরিয়া হয়ে ফর্মগুলোয় সই ক'রে দিল। অরিন্দমের হাতে ফিরিয়েও দিল তেমনি মরিয়া হয়ে। কাজের জায়গা থেকে ফিরে এসে অরিন্দম দেখে, শান্তি যাবার জন্য তৈরি। হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ মাত্র। অপেক্ষায় আছে অরিন্দমের। চোখে চোখ পড়বামাত্র চোখ নামিয়ে নিল শান্তি। অশ্রু লুকোতে নয়, এমনি। বুঝতে পারল অরিন্দম, একটুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরে চলে গেল। দরজার পাশে দাঁড়ায় শান্তি। মাথার ঘোমটা সে খসিয়েছে, সিঁদুর মুছেছে সিঁথির, দু'টি হাত শাঁখাশূন্য। চেয়ে চেয়ে দেখল অরিন্দম। কিছু বলবার নেই, তাই কিছু বলল না।

শান্তিও নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ঘরের কোথায় কি আছে, না আছে, সব দেখানো হয়ে গেছে। অরিন্দম অবশ্য দেখতে চায় নি, শান্তিই জোর ক'রে দেখিয়েছে। চাবিগোছা আজ সকালে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে। আর বিশেষ কি!

অনেকক্ষণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করল অরিন্দম, প্রশ্ন করল, "কোথায় উঠবে এখন?"

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে মিনতির সুরে ওকে থামিয়ে দিল।

অরিন্দম আর একটু অপেক্ষা ক'রে বলল, "তোমার আর কি-কি জিনিস আছে? না না, থাকবে কি। ওসব নিয়ে যাও।"

"সবই নিয়েছি। ঐ একটা ট্রাঙ্ক শুধু—"

"নিয়ে যাও। ফেলে কেন যাবে?"

"ফেলে যাচ্ছি কে বলল! এসে একদিন ঝগড়া ক'রে নিয়ে যাব। তর্ক আমি আর রেখে যেতে চাই না। কিন্তু দেখ, এসব কথা তুললে তর্ক আর ফুরোবে না। তর্ক আমি রেখে যেতে চাই না। আমার মিনতি, এসব কথা তুলে আর আমার দেরি করিয়ে দিও না। চললুম।"

"বেশ। এস।"

'এস' বলায় এত ভদ্রতাও ছিল! তবু, আর-একটু ভদ্রতা ক'রে এ কথা প্রকাশ করল না অরিন্দম, তুমি কি একলাই যাচ্ছ? সঙ্গী কে তোমার? যদি কেউ না থাকে, স্টেশনে তুলে দিয়ে আসব কি?...

যাক, না বলেছে তাই ভাল। এখন সৌজন্য প্রকাশও নাটকের মত শোনাবে। তার দরকার নেই।

যাবার পথে পা বাড়িয়ে দেন শান্তিবৌদি।

সন্ধ্যাবেলায় রেলওয়ে কলোনী কুয়াশায় থম্‌থম্‌ করছে। পথের আলো অস্পষ্ট। বাইরের সিঁড়ির শেষ ধাপে পা বাড়িয়েও থেমে দাঁড়িয়েছেন শান্তিবৌদি। ওদিকের সদর-দরজায় কড়া নড়ছে।

পরিচিত স্বরে। থেমে থেমে, বারে বারে।

মঞ্জুলা হয়ত।

কান্ত কথা

শান্তিলতা রায়

পরদিন আমরা হাওড়া এলাম, বাবা খুবই অসুস্থ। আমরা গিয়ে উঠলাম ৫৭নং সার্পেনটাইন লেনে আমার মাসতুতো ভাই সুরেশচন্দ্র গুপ্তর বাড়ীতে। আমাদের মামাতো ভাই ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত (এঁর কথা আগেই বলেছি) এলেন, বাবাকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গেলেন সেখানে, সব ডাক্তাররাই পরীক্ষা করলেন এবং যন্ত্রণা কমাবার জন্য ওযুধপত্রও দিলেন। মর্ফিয়া ইনজেকশন দিলেন। বাড়ী ফিরে এসে দু-তিন দিন গেল। কিছুই কমল না, বরং নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল। সে সময় মেডিক্যাল হাসপাতালে সব-চেয়ে বড় সার্জন ছিলেন ডাক্তার বার্ড সাহেব, এবং ডাক্তার হাসান সুরাওয়ার্দ্দি। সমস্ত ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বার্ড সাহেবকে কল্ দিয়ে তাঁকে দেখানো হল। বার্ড সাহেব বললেন, ট্র্যাকিওটমি ছাড়া আর গত্যান্তর নাই। দেরী হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে। যন্ত্রণায় বাবা শয্যাশায়ী। মায়ের চোখে জল। আমরা অপারেশনের কিছুই বুঝি না, শুধু বাবার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যন্ত্রণার রাত ভোর হল। বাবাকে ডাক্তার যতীন দাশগুপ্ত (যতীন দাদা) গাড়ী করে সকাল বেলায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

বাবাকে নিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে বোধহয় বেলা দুটা আড়াইটা হবে, আমরা গেলাম দাদাদের সঙ্গে বাবাকে দেখতে। গিয়েই দেখি, মা বাবার খাটের কাছেই বসে আছেন—নীরবে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। অনেক লোক ঘিরে আছে বাবাকে, বাবার নিঃশ্বাসের কষ্ট আর নাই। ঘুমুচ্ছেন। কতরাত যন্ত্রণায় ঘুম হয় নাই। আজ আরাম পেয়ে ঘুমুচ্ছেন। গলায় ব্যাণ্ডেজ করা। বার্ড সাহেব অপারেশন করে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজসাহীর আদরের কান্ত, উত্তর বঙ্গের বুলবুল, আমাদের আনন্দমুখর শান্তিনিকেতন চিরতরে নীরব হয়ে গেল। কণ্ঠহারা রজনীকান্ত গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, শান্তি পেয়েছেন।

বাবা মেডিক্যাল কলেজে কয়েকদিন থেকে যখন একটু সুস্থ হলেন, নিজের সম্বিৎ ফিরে পেলেন—কণ্ঠহারা বাক্যহারা রজনীকান্ত নিজের দিকে ফিরে চাইলেন। নাই, কিছু নাই, কোথা থেকে দানব এসে অমৃতনিস্যন্দী কণ্ঠ টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়ে গেল। ঈশ্বর তাঁর নিষ্ঠুর হাত দিয়ে আনন্দের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। অপারেশনের পর শুধু একটি কথাই বললেন মাকে ডেকে, আমাকে যতীন বাঁচিয়ে দিল। এই বলেই তাঁর কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। অমোঘ বিধান তার দুর্লঙ্ঘ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করল। রজনীকান্ত উঠে বসলেন। আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন তাঁর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে! আমাদের চোখের জলের সঙ্গে তাঁর চোখের জলের ধারা মিশে যাচ্ছে। মুখে বলছি, ও বাবা তুমি বেঁচে ওঠ, ও বাবা তুমি বেঁচে ওঠ, কেউ পিঠে হাত বুলাচ্ছি। কেউ পায়ে হাত বুলাচ্ছি।—অনেকদিন পর আমরা বাবাকে কাছে পেলাম, কাশীর থেকে এসে বাবাকে আর

এত কাছে পাইনি। কি হারালাম আর কি পেলাম সে বোধ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা কোথায় ?

বাবা একটু একটু করে ভালোর দিকে যাচ্ছেন। ডাক্তার আর বেশীর ভাগই নার্স সেযুগে ছিলেন ইউ-রোপীয়ান বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাঁরা সব সময়ই বাবার পাশে উপস্থিত থাকতেন, আর বাবার খাটের কাছে বা ঘরের বাইরে, যেখান থেকে বাবাকে দেখা যেত সেখানে কত জায়গা থেকে এসে কত লোক বাবাকে দেখে যেতেন, বাবা হাত তুলে তাঁদের দৃষ্টির জবাব দিতেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হেমেন্দ্রনাথ বক্সী, বিজিতেন্দ্রনাথ বসু এঁরাও সর্ব্বদা বাবাকে দেখাশুনা করতেন। ডাঃ হাসান সুরাওয়ার্দি (যিনি পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন) তিনিও রোজই দুবেলা বাবাকে দেখে যেতেন। তিনি আমাদের ছোট ছোট ভাইবোনদেরও খুব স্নেহ করতেন। আমরাও ডাক্তারদের, নার্সদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলাম ; সকলের কাছেই স্নেহ পেয়েছি।

কয়েকদিন পরে বাবাকে নিয়ে আসা হল মেডিক্যাল কলেজের সংলগ্ন ইডেন হস্‌পিটাল রোডে কটেজ ওয়ার্ডে। একতলা বাড়ী, লাল রংএর কটেজটি, সেই বাড়ীটিতে প্রথমে বাবা এলেন পরে আমরাও গেলাম, মা দাদারা, আমরা তিন বোন, আমাদের ছোট্ট দু-বছরের ভাই, ঠাকুর চাকর। বাড়ীটার সামনে বারান্দা তার পরেই একটা বড় ঘর, সেই ঘরটায় বাবা থাকতেন। আমরা ভেতরের ঘরে থাকতাম। এখন বাবা একটু ভালো। ব্যথা ছিল তবে অত বেশী না। ডাঃ হেমেন্দ্র বক্সী বাবার ছোট ভাই রূপে বাবার বান্ধব হয়ে মা-বাবার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বিজিতেন্দ্র বসু ও মেডিক্যাল কলেজের আরও কয়েকজন ছাত্র পালা করে দিনরাত বাবার কাছে থাকতেন, সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি কেউ হতে দেননি।

বাবা উঠে বসলেন। কোন্ ইন্দ্রলোক থেকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এল, কোথা থেকে রাবণের চর এসে কণ্ঠস্বর চুরি করে নিয়ে গেল উপলব্ধি করে তাঁর দয়াল হরির চরণে আত্মনিবেদন করে খাতা কলম সম্বল করে উঠে বসলেন। মাও ডানা-ভাঙ্গা পাখীর মতন লুটিয়ে পড়লেন, তাঁরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল আপনা আপনি ; নির্জীব প্রাণে চলে ফিরে বেড়ান, সে হাসিটুকুও নাই, সে সিন্দুরের শোভা নাই, সেই ঘন ঘন পান খাওয়াও নাই। বিষাদ-প্রতিমা, বাবার কাছে বেশী আসতেও পারতেন না। বাইরের লোক সব সময়েই বাবাকে দেখতে আসত, ডাক্তার আসত, বার্ড সাহেব আসত কত লোক আসত যেত। মা বেশী সময় ভেতরেই থাকতেন, কম সময়ই বাবাকে পেতেন। আমার বড়দাদা মেজোদাদা, ডাঃ যতীন দাদা, আমাদের পিসতুতো ভাই নলিনীদাদা, তাঁর মেজোভাই ব্যারিস্টার জে এন রায় (জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়) এঁরা আমাদের পিসতুতো ভাই—এঁরা বাবাকে মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, প্রায়ই বাবার কাছে এসে বসতেন। যখন যেটুকু দরকার সব করতেন, বাবাকে আরাম দেবার জন্য, একটু সেবা করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। যতীনদাদার সঙ্গে আমার মায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল, দুজনের প্রতি দুজনের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ছিল। আগেই বলেছি নলিনীদাদার সঙ্গে বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, বাবাও এঁদের দেখলে খুব খুশী হতেন। বাবার কথা বলবার তো আর ক্ষমতা ছিল না, খাতা ও পেনসিল নিয়েই কথা বলবার জন্য তৈরী হলেন। শরীর একটু বোধহয় স্বচ্ছন্দবোধ করছিলেন। কলমের প্রথম কথাই তাঁর হল,'হেমেন্দ্র, ভাই ভেবেছিলাম এই বুঝি আমার শেষ। দয়ালকে বললাম আর মারিসনে, এবারে তোর কোলে তুলে নে দয়াল, আর সহ্য হয় না, নিঃশ্বাস নিতে পারি না। দয়াল নিল না। কত করলি আমার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আর যে ক'টা দিন আছি হেমেন্দ্র ভাই, আমাকে ছেড়ে তোরা যাসনে। দেখতে পাচ্ছিস হরি আমাকে কি করে রেখে গেল। যিনি আসতেন তাঁকে দেখতে, তাঁকেই বাবা লিখে অভ্যর্থনা জানাতেন। লেখনীর ক্লান্তি নাই।

ডাক্তার সুরাওয়ার্দ্দি রোজ আসতেন। একদিন বাবা খেতে বসেছেন এর মধ্যে সুরাওয়ার্দ্দি এলেন। বাবা হাতের ঈঙ্গিত করে বসতে বললেন, তখন সুরাওয়ার্দ্দি বললেন, "না এখন আমি যাই। অপনার খাবার সময় আমি যদি থাকি তাহলে তো বলবেন ঐ নেড়ে বেটা আমার খাবার সময় এসেছিল?" এই বলে চলে গেলেন। বাবা পরে লিখলেন, 'হায় রে এখনো আমার জাত বিচার! ভেদ-বুদ্ধি আমার যাবেনা? এঁরা আমার জীবনদাতা এরা আমার নমস্ত। যাবার পথে কত ভালবাসাই কুড়িয়ে যাচ্ছি।

সারাদিন লোকসমাগমে বাবার ঘর পরিপূর্ণ থাকত। একদিন বাবাকে দেখতে এলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদেই বাবার সঙ্গে আলাপ ও বিশেব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ঋষির মতন চেহারা, যেন কোন দেবতা এলেন। বাবার কাছে বসলেন, বাবা লিখলেন, দেবতা এসেছেন দীনের কাছে, একটু পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে যান। আশীর্বাদ করে যান যেন হরি আমাকে তাড়াতাড়ি তাঁর চরণে স্থান দেন। আপনার বাড়ী গিয়ে একদিন গান গেয়ে এসে-ছিলাম, সে কণ্ঠ, সে কথা দয়াল আমার হরণ করে নিয়েছেন। গান গাইবার বা কথা বলবার ক্ষমতা আমার আর নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের দ্বারো-দ্ঘাটন,—সেই সুধী-বৃন্দের আগমন, রবীন্দ্রনাথের কথা, সব আমার মনে আছে। আমার ঐ স্মরণটুকুই আমার সম্বল। ভাগ্যে এই লেখনী ছিল তাই আপনাদের সঙ্গে একটু আধটু কথা কইছি। কত পুণ্য করে এসেছিলাম তাই যাবার পথে মহাপুরুষের দর্শন হল।'

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "আপনার বাণীর আরাধনা আপনার সঙ্গীত, আপনার স্বদেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। আপনার সেই প্রাণোচ্ছল রূপটিই আমার চোখের সামনে সুপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু আমি কি দেখলাম। এই কি সেই রজনীকান্ত? বিধাতার লীলার মাধুর্য্য যেমন অপরিসীম, জীর্ণ দীর্ণের প্রকাশও কত বেদনাপূর্ণ। ভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি, দয়াময় আপনাকে নিরাময় করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে আরও কিছুদিন জীবিত থাকুন, আমাদের সঙ্গীতে সাহিত্যে মাধুর্য্যময় করুন।" রামেন্দ্রসুন্দর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। অনেকক্ষণ বাবার কাছে বসে ছিলেন। বাবাও অনেক কথা লিখে জানালেন। সেই বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা, সারদাচরণ মিত্রের কথা নানান কথা বার্ত্তায় বাবাও যেন খুব খুশী মনে হল।

বাবা মাকে লিখে বললেন, 'দেখ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এসেছিলেন, কত ভালো লাগল। সেই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে আলাপ হয়েছিল, সেই কথা মনে করে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। সেই সঙ্গীত পরিবেশনকারী দীন কান্তকে দেখতে এসেছিলেন। আমি তো আর সেই রজনী সেন নাই তবু কত স্নেহ, কত ভালবাসা জানিয়ে গেলেন। এঁদের কথায় এঁদের আগ্রহে আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দয়াল যে রকম মারছে, আর আমি বেশী দিন নাই।'

রাত্রির কষ্ট যেন বাড়তে লাগল। কিন্তু সেই হাসি, ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণের উজ্জ্বলতাও বাড়তে লাগল। রোগক্লিষ্ট দেহ যেন তপঃক্লিষ্ট তনু হয়ে উঠতে লাগল। রোগীরঘর দেবমন্দির হয়ে উঠতে লাগল। সকলেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বাবাকে দেখতে আসে, যে যতটুকু পারে একটু সেবা করে যায়। একদিন বললেন, 'তোমরা আস আমাকে ভালবাস, দীনহীন হয়েছি, আমাকে এখন আর তোমরা বড় করে তুলো না। আমি বড় কাঙাল হয়েছি। তারই প্রেম পাব বলে আমাকে রিক্ত করে নিঃস্ব করে নিচ্ছে। আমাকে দেখে যাও, আমাকে আশীর্বাদ কর। যাবার সময় আমার অকারণ মানে বাড়িও না। আমি বড় লজ্জিত হই।'

শরীরের কষ্ট যখন একটু কম থাকে তখন সাংসারিক কথাবার্ত্তা বলেন। এই সময়ে রাজসাহীর যাদব-গোবিন্দ সেন বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর তৃতীয়

কন্যার সঙ্গে আমার বড়দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। ভেবেছিলেন তাঁদের এই বন্ধুত্ব চিরদিনের আত্মীয়তায় বাঁধা থাকবে। কিন্তু বাবা এই রকম অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিয়ের কথাটা বন্ধ ছিল। কিন্তু তা হল না। যাদব-গোবিন্দ সেন নিজে এসে এই বিয়ের জন্য চাপ দিলেন। হয়তো ভয় হয়েছিল, বাবা যদি আর না বাঁচেন তবে দুজনের মধ্যে যে কথা দেওয়া আছে তা হয়তো অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এদিকে কটেজ হয়েছে দেশবাসীর তীর্থক্ষেত্র। কত বন্ধু কত ছাত্র কত লোক আসছেন তার ঠিক নাই।

বাবাও একটু একটু করে লিখে যাচ্ছেন। রাত্রে ঘুম হত না, রাত্রেই বসে বসে লিখতেন। তাতে অন্যমনস্কও থাকতেন আর অন্তরের দুঃখ ব্যথা আনন্দ সঙ্গীতে কবিতায় অবিরল ধারায় লেখনীতে এসে পড়ত। আমার মাসতুতো ভাই সুরেশচন্দ্র গুপ্ত তাঁর নিজের বড় অর্গানটা আমার বাবাকে দিয়েছিলেন। আর রাজসাহী থেকে সেই সুগায়ক দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (যিনি খুব ভালো গাইতেন) কলকাতায় এসেছিলেন। তিনিও প্রায় সব সময়ই বাবার কাছে থাকতেন। বাবা যে সব গান লিখে যেতেন সেগুলির সুর একবার অর্গান বাজিয়ে নিজেই তৈরী করে নিতেন আর দেবেনবাবু সেগুলি নিজের গলায় তুলে নিতেন। একটু এদিক ওদিক হলে বাবা আবার বাজিয়ে সুর ঠিক করে গাইয়ে নিতেন। বারে বারে সুর ঠিক করে দিয়ে গানটি নিজের পছন্দ মতো হলো কি না শুনে তবে ছেড়ে দিতেন। এখানেও দেখেছি, নিজের শারীরিক কষ্ট, মানসিক ব্যথা, সম্মুখে মৃত্যুর দুরন্ত পদধ্বনি, পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সত্ত্বেও রজনীকান্ত অন্তরের ব্যথা, দুরন্ত অভিমান শ্রীহরির চরণে সমস্ত সমর্পণ করে সঙ্গীতের সুরের ধারায় অবিরল অবগাহন করে যাচ্ছেন। যেন অমৃতবারি সিঞ্চনে সিঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রীহরির নাম দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন সুরে সঙ্গীতের ধারায়। লিখলেন—ও সে বসল কি না বসল তোমার শিওরে, তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে সেই খবরটা নিও রে।—সকালে উঠে তাতে অর্গান বাজিয়ে সুর দিয়ে দাদাদের, অথবা যদি দেবেনবাবু থাকতেন তাঁকে ডেকে তাদের শিখিয়ে গাইয়ে তবে ঠিক করে দিতেন। রাত্রেই কষ্ট বেশী হ'ত। ঘুম হ'ত না, তখন বসে বসে লিখতেন। 'অমৃত' অষ্টপদী কবিতার বইটি ঐ রকম রাত্রেই বসে বসে লিখেছেন। অমৃতে প্রথমেই লিখলেন--নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা, রুগ্ন ক্ষীণ অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা। গভীর রাত্রে চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখছেন আর লিখে যাচ্ছেন। মৃত্যুকে দেখছেন কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে মৃত্যুর শঙ্কা কোন বিহবলতা, কোথাও মৃত্যুর প্রতি বিরূপতা নাই। অন্তর উজাড় করে অমৃতের স্রোতে 'অমৃত' গঠন করে দেশের শিশুদের হাতে তুলে দিলেন। এক মাসের মধ্যে বইটি রচিত হয়েছিল।

এর মধ্যে একদিন বাবাকে দেখতে এলেন কবি রসময় লাহা। তাঁর রচিত 'ছাইভস্ম' নামে একটা কবিতার বই বাবাকে উপহার দিলেন। বইটি পেয়ে বাবা খুশী হয়ে লিখলেন, রসময় 'ছাইভস্ম' দিয়ে 'অমৃত' নিয়ে যান। তখন 'অমৃত' বইটি কেবল ছাপা হয়ে এসেছে। বাবা একখানা 'অমৃত' রসময় লাহাকে দিলেন।

রোজই সকালে ডাঃ বার্ড সাহেব বাবাকে দেখতে আসতেন। একদিন সকালে বাবা প্রাতরাশে বসেছেন, সঙ্গে নিয়ে বসেছেন আমার দুবছর বয়সী ছোট ভাইকে। ঠাকুমা মা বাবার পাশে বসে আছেন। এর মধ্যে ডাঃ বার্ড সাহেব এলেন, বাবা তো খাবার ফেলে উঠে পড়লেন, লিখলেন, 'এটি আমার ছোট ছেলে, ও তো আর কয়েকদিন পরে আমাকে দেখতে পাবে না—আর আমিও পাব না। তাই পিতাপুত্র এক সঙ্গে খাচ্ছি। আর ইনি আমার মা। আর এই যে নতমুখী এঁকে তো বুঝতেই পারছেন। এ মিলন তো আমাদের আর হবে না। আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যান।'

বার্ড সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছে বাবার সঙ্গে দুএকটা কথা বলে চলে গেলেন। যেদিন বাবার গলায় ডীপ এক্স্‌রে নেবার দিন থাকত

সেদিন সকাল বেলা আমাদের বোনেদের ও ছোট ভাই-টিকে নিয়ে হেঁটে মেডিক্যাল কলেজে যেতেন। ছোট ভাইটি বাবার লাঠিখানা নেবার ভারি চেষ্টা করত। লাঠিখানা নিয়ে বাবার হাত ধরে চলত। আমরা হাসপাতালের বাইরের মাঠে বসে থাকতাম। বাবাকে ভেতরে নিয়ে যেত। এক্‌স্‌রে করে যখন বাবা ফিরে আসতেন তখন অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসতেন। আবার আমরা তাঁর হাত ধরে আস্তে আস্তে বাড়ীতে নিয়ে আসতাম। সন্ধ্যাবেলায় বাবার ঘরে মজলিশ, কত লোক এল, কত গান গল্প হাসি, কত কথাবার্ত্তা হল, তার মধ্যে বসে খাতার এক কোণেতে লিখলেন—

দুর্ব্বল এ ক্ষীণ দেহ কাঁদে নাথ এ বেদনাতুর—
দেখা দিয়ে পূজা নিয়ে চাও না বিরহবিধুর

হাসপাতালে ব্যথায় বিবর্ণ, অন্তরে বাহিরে সংসারের শত কোলাহলে, তাঁর পরমেশের প্রতি আত্মনিবেদন, আকুল প্রার্থনা এক লক্ষ্যে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। যখন খুবই কষ্ট হত তখন লিখতেন বাবা, 'শচীন জ্ঞান তোরা আয় রে। কই রে হেমেন্দ্র কই, আয় রে বড় ব্যথা। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে। আর কতই মারবে বল। মারলে বড্ড ব্যথা পাই। তা-তো সে বোঝেনা। আয় যাদু বাছা বলে, কোলে তুলে নেবেই। তোরা তো কতই ব্যবস্থা করছিস, সে কিন্তু তার কাজ করে যাচ্ছে। ব্যথা না দিলে তো আমার চৈতন্য হবে না। তোরা কি করবি বল্।' রাত্রেই বসে বসে লিখলেন—

'মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে,
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া উর্দ্ধে ধরিবে কে ?

বাসনা কামনা নিয়ে তো তাঁর কাছে যাওয়া যাবে না ? রাজসাহীতে বড় সুখের আনন্দবাজার বসিয়েছিলাম। সেই সুখের অনুভূতি ক্রমেই ছাড়িয়ে দিচ্ছে। মারুক কত মারবে। আমি তার চরণ দুখানির আশায় চেয়ে আছি। একদিন তো তার অভয় চরণ পাবই। দেখিস সেদিন শীগীগরই আসবে।'

ঐ গানটির সুর পরদিন নিজেই দিলেন। গলায় তুলে নিলেন বোধহয় আমার বড় দাদা। সেই সুযোগে আমরাও শিখে নিয়েছি।

একদিন সকাল বেলা এলেন বাবাকে দেখতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁর সঙ্গে বাবার খুব হৃদ্যতা ছিল। বাবাকে দেখে যেন কেঁদে উঠবার মত হয়ে গেলেন। বাবা খুব শীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ আলাপ হল। বাবা বললেন, 'কাল রাত্রে একটা কবিতা লিখেছি। আপনি তো আমার গান কবিতা খুব ভালোবাসতেন। আপনার বাড়ী গেয়েছি, ব্রাহ্মসমাজে গেয়েছি' আমার লেখা গান আপনি খুব খুশী হয়ে শুনতেন। তাই তো সাহস করে আপনার হাতে এটিকে তুলে দিচ্ছি। আমি জানি আমি কত দীন, আপনাদের স্নেহ ভালবাসার উপযুক্ত নই। তবু রুগ্নের দান বলে এটি গ্রহণ করুন, আমি ধন্য হই।' কবিতাটি এই—

'কত বন্ধু কত মিত্র হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত—
পাঠায়ে দিতেছে হরি মোর কুটীরে নিয়ত।
মোর দশা হেরি তারা, ফেলিয়াছে অশ্রুধারা,
(তারা)যত মোরে বড় করে আমি তত হই নত।'

'শেষদান'

১৬ই আষাঢ়, হাসপাতাল, রাত্রি, ১৩১৭ সাল।

এইটি পড়লেন সবটাই সুরেন দাশগুপ্ত। সুধীন ঠাকুর সবটা শুনবার পরে কবিতাটি গ্রহণ করলেন। বিষণ্ণ অন্তরে বাবার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন। তার পর থেকে প্রায়ই তিনি আসতেন। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা চলত। সুধীন ঠাকুর একটা ছোট গল্পের বই লিখেছিলেন—একদিন কটেজে এলেন বইটি নিয়ে বাবার নাম লিখে তাঁর হাতে দিলেন। বইটির নাম এখন আর মনে নাই। কিন্তু ছোট ছোট গল্প ছিল বইটিতে। তার মধ্যে একটি গল্পের কোন একটা লাইনের মধ্যে একটি লাইন আমাদের এখনও খুব মনে আছে, 'কালির মত কালো অন্ধকার'—

এই কথাটি দরকার মতন আমরা প্রায়ই বলি,'কালির মত কালো অন্ধকার'। এবং এখনও নিজেরা নিজেরা এই কথাটা ব্যবহার করে থাকি। বইটি পেয়ে বাবা কত খুশী। লিখলেন, 'আপনাদের যার যা ভাল জিনিস আছে আমার জন্য নিয়ে আসছেন, আমি এ ভালবাসার দান মাথা পেতে নিলাম। এজন্মে তো হ'ল না, এ ভালবাসার ঋণ আর শোধ হল না। দয়াল তো আমাকে তাঁর কাছে যাবার পথ দেখাচ্ছেন। আর সময় পাব না। আর ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে গান গেয়ে আসতে পারবনা। মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষা, এই দীনহীন রজনীকান্তকে দেখে যাবেন। আমার যাত্রাপথ আপনাদের আশীর্বাদে সুগম হোক।' সুধীন ঠাকুর কি বললেন ঠিক মনে নাই। বাবার এই লেখাগুলি মাঝে মাঝে দাদারা কেউ অনুপস্থিত থাকলে আমাকেই পড়ে শোনাতে হত। তাই কথাগুলি ভুলিনি। সুধীন ঠাকুর এর পরে প্রায়ই আসতেন। তাঁর চেহারায় ভারি শ্রদ্ধাপূর্ণ সৌন্দর্য্য ছিল।

বাবা দুদিন পর পরই ডীপ এক্সরে নিতেন। আর বার্ড সাহিব প্রত্যেকদিনই আসতেন, গলার ড্রেস করবার সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। হেমেন্দ্র বক্সীই বেশীর ভাগ তুলো গজ পালটে দিতেন। দরকার মত দাদারাও করতেন। মাঝে মাঝে বিরাজতেন বসুও এসব কাজ করতেন। আর রাত জেগে বসে বাবা যখন লিখতেন তখন একটা অস্বস্তিতে কেউই ঘুমুতে পারতেন না। মা রাত্রিবেলাতেই বেশী সময় বাবার কাছে থাকতেন। বাবা মার সঙ্গে লিখে লিখে কথা বলতেন, মাও আস্তে আস্তে বাবার সঙ্গে কথা বলতেন। বাবা একদিন লিখলেন, 'দেখ' কত সেবা কত দয়া কত চিকিৎসা আমি পাচ্ছি। তবু মনে হচ্ছে আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।—তুমি আমার কাছে কাছেই থেকো। আর একবার বাঁচতে ইচ্ছে হয়। এই সেবাযত্ন ভালবাসায় আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়। তোমার এই কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না। এই কি সেই হাস্যময়ী হিরন্ময়ী? হা জগদীশ্বর, আর কটা দিন রাখ প্রভু, তোমার নাম করে যাই। না—তা হবে না জানি। ঐ রবি ডুবুডুবু গেল রে দিন ফুরায়ে, আমার রবিতো ডুবুডুবু হয়ে এল; আর ক'দিন১ বা হরি আমাকে তোমার কাছে রাখবে? এই আনন্দমেলা ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি তো সবই বুঝতে পারছ আমাকে কি ধরে রাখতে পারবে?' মার চোখের জল বাবার হাতে টপ টপ করে পড়ত। আমরাও কোনও সময় বাবার মাথার চুল আঁচড়িয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। বাবাও আমাদের সঙ্গে কত কথা লিখে বলতেন। 'আমি তো আর তোদের মাঝে বেশী দিন নাই রে। যে ক'টা দিন আছি কাছে কাছেই থাকিস তোদের যেন সব সময় দেখতে পাই। এই রকম অনেক কথা সকলের সঙ্গে বলতেন। কিন্তু যেন সমাধিস্থ মন যেন মনের ভেতর টেনে নিয়ে রেখেছেন। সেখানে অমৃতের আস্বাদন পুরোপুরি গ্রহণ করছেন, তারই কিছু কিছু লেখনীর মুখে রচনার মত নেমে আসছে! কখনো স্বদেশপ্রেমের সুললিত সঙ্গীত যেমন,

> সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজ্জল তারা—
> সেই হিমাদ্রি সেই গঙ্গা সেই সিন্ধুধারা।
> পরপদ-লেহনপটু স্বজনবন্ধু যারা—
> দুঃখ দৈন্য আনিল গেহে এমনি লক্ষ্মীছাড়া।

এই গানটি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আবার লিখলেন—

> কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
> ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি
> কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
> রয়েছে সমুদ্র ঘিরি?
> কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
> থোকা থোকা সোনার ধান
> সে আমাদের সোনার ভারত
> আমাদেরই হিন্দুস্থান।

এই গানটি সত্যেন দত্তর 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' গানটির সুরে গাওয়া। রাত্রেই লিখলেন—

আজি বিশ্বশরণ রাখ

পায় হে

ঐ ভৈরবে গরজে প্রভঞ্জন বায় হে।' শেষ দান।

রাজসাহী থেকেও সমস্ত বন্ধু, বাবার আত্মীয়স্বজন, আমাদের বাড়ীতে যে সব ছাত্ররা থেকে পড়াশুনা করতেন তাঁরা, সবাই চিঠি লিখে বাবার খবর নিতেন। আবার কেউ সুবিধা পেলেই রাজসাহী থেকে এসে দেখে যেতেন। অক্ষয় মৈত্র মহাশয় প্রায়ই চিঠি লিখতেন। একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, রজনীবাবু, আপনি আপনার আনন্দনিকেতনে যে সঙ্গীতের আসর রচনা করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের কোমল কণ্ঠের সঙ্গে আপনার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুললিত কণ্ঠ মিলিয়ে যে কোকিল, কুঞ্জ রচনা করে গিয়েছেন, আপনার বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যখন যাই তখন সেই সঙ্গীতের রেশ যেন কানে এসে মনটা উতলা করে দেয়। আপনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন, আমরা উন্মুখ হয়ে আছি।

কিছু কাল দীর্ঘ কাল চিরকাল রহ—

দেবতা দিবেন বর নাহিক সন্দেহ।

আপনি আমাদের মধ্যে আনন্দময় পরম পুরুষ রূপে বিরাজ করুন। আমরা সমস্ত দেশবাসী ধন্য হই। পরম দয়াল আপনাকে নিরাময় করে দিন আমরা নিয়ত এই প্রার্থনাই তাঁর চরণে জানাচ্ছি।' বাবাও এ চিঠির উত্তর এমন সরস কবিতায় লিখে দিয়েছিলেন ভারি সুন্দর হয়েছিল।সেটি দেখাবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বিদায়লিপি—

একসটেম্পোর পত্র পেয়ে

হয়েছি অবাক্

হাজার হলেও দাদা

মরা হাতি লাখ।

তোমার মঙ্গল ইচ্ছা

হ'ল না সফল,—

জীবন ফুরায়ে গেল

ভেঙে যায় কল।

আর তো হ'লনা দেখা—

কর আশীর্ব্বাদ—

এড়িতে সমস্ত দুঃখ

বেদনা বিষাদ।

বড় যে বাসিতে ভালো,

শিখাইতে কত,

ছাপালো কবিতা তাই—

সে 'নব্য ভারত'।

বিদায় বিদায় ভাই

চিরদিন তরে,

মুমূর্ষু'র হিতাকাঙ্ক্ষা

রেখো মনে করে।

একান্ত নির্ভর আমি

করেছি দয়ালে,

মারে সেই রাখে সেই

যা থাকে কপালে।

প্রীতি দিও তথাকার

প্রিয় বন্ধুগণে,

ভক্তি দিও তথাকার

নমস্য সুজনে।

হাসপাতাল।

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে এই কবিতাটি লিখেছিলেন।

এই দুঃসময়ে টাকা-পয়সার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আবার বড়দাদার বিয়ের জন্যও খরচ-পত্রের দরকার। বাবা তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই-দুখানা গুরুদাস চ্যাটার্জির বইএর দেকোনে বিক্রি করে দেবেন বলে ঠিক করলেন। এবং গুরুদাস চ্যাটার্জি শোনা মাত্র বাবার কাছে এসে দাঁড়ালেন বই-দুখানা কিনে নেবার জন্য। গুরুদাস চ্যাটার্জি জানতেন বাণী, কল্যাণী বই এর মূল্য। বাবা মাকে জিজ্ঞাসা না করেই বই-দুখানা বিক্রি করে দিলেন এই শর্ত্তে, গানের কথা পাল্টাবে না, বাবার নাম পাল্টাবে না ও গানের সুর পাল্টাবে না। তারা তাতেই রাজী হল ও কালবিলম্ব না করে কিনে নিল। যেন ছিনিয়ে নিল।

মা যখন শুনলেন তখন মা বাবার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, "তোমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই-দু-খানা বিক্রি করে দিলে? আর কি এমন বই হবে?" বাবা কতক্ষণ চুপ করে থাকলেন, বললেন, আমাকে যদি দয়াল আর কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখে তবে শত সহস্র বাণী কল্যাণী লিখে তোমার পায়ে অঞ্জলি দেব, তুমি আর কেঁদ, না। বিক্রি না করলেই হত। তোমার চোখের জল আমার সহ্য হচ্ছে না। বাবাও খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন বাণী কল্যাণী হাতছাড়া হয়ে গেছে। গুরুদাস চ্যাটার্জি বাবার ও আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন লুফে নিয়ে গেল মাত্র দুইশত টাকায়।

কিন্তু বাবার শরীর ক্রমশ: দুর্বল হয়ে আসতে লাগল। এদিকে বাবা বড়দাদার বিয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠতে লাগলেন। বাবার এই রকম অসুস্থতা, বড়দাদার আই এ পরীক্ষা, আমরা বহুদিন রাজসাহীর বাড়ী ছাড়া, নানানটা চিন্তা করে আমার মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে এই সময়টাতে বড়দাদার বিয়ে দেন। কিন্তু বাবা বললেন, "আমার আর সময় হবে না। আমি যাদবগোবিন্দ সেনকে কথা দিয়েছি তার মেয়েটি আমি পুত্রবধূ রূপে আনব। আমার অবর্ত্তমানে যদি বিয়ে দিতে দেরী হয় তবে আমার একটা কথার খেলাপ নিয়েই যেতে হবে। তুমি অনুমতি দাও, অমত কোরো না। আমি দেখে যাই" বিয়ের দিন ঠিক হল। মস্ত বড় বাড়ী। তার একটি ঘরে বাবার থাকবার ব্যবস্থা হল। বাবার দুঃখদিনের সহচর হেমেন্দ্র বক্সীরও বাবার সঙ্গেই থাকবার ব্যবস্থা হল। ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে করে বাবা এই বিয়েবাড়ীতে এলেন। দেশ থেকে আমার ঠাকুমা সহ আমাদের আত্মীয়স্বজন প্রায় অনেকেই এলেন।

বাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে বড়দাদা ও আরও কে কে বড়দাদার সঙ্গে বিয়ের জন্য রাজসাহী চলে গেলেন। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল তিনি বড়দাদাকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু ডাক্তাররা কেউই বাবাকে রাজসাহী যাবার অনুমতি দিলেন না। বোধহয় আমার মেজদাদাও বড়দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন। যাদবগোবিন্দ সেন রাজসাহীতেই থাকতেন। বিয়ে হ'ল অনাড়ম্বরে, নতুন বধূ সহ বড়দাদা এলেন, সঙ্গে রাজসাহীর অনেকেই এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে অনেক লোকের দেখা হ'ল। নববধূ এসে দাঁড়ালেন। চেলীপরা সুশ্রী ছোট্ট মেয়েটির হাত ধরে বাবা নিজের ঘরে নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। লাভচান্দ মোতিচান্দের দোকান থেকে বাবা-মার পছন্দ করা একটি নেকলেস গলায় পরিয়ে দিলেন বাবা। বাবা নববধূর মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। আমরা আনন্দ করব কি, আমাদের সকলেরই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কোথায় দুধে আলতায় পা ধোয়ানো, কোথায় বরণ করা, কোথায় হুলুরব সবাই সব ভুলে গেছেন। বাক্যহারা রজনীকান্ত চোখের জলে বধূ বরণ করলেন। মা তাঁর পুত্র পুত্রবধূকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবা লিখলেন, 'কই তোমরা কই বর বধূকে বরণ করে নাও আজ আমাদের আনন্দের দিন। দুঃখ বিষাদের দিন নয়।' বাবার লেখা সেই গানটি সেটি কাশীতে গঙ্গার ঘাটে বসে লিখেছিলেন—

মধু মঙ্গল গোধূলিপরিণয় উৎসব দরশনে আকুল প্রাণ,'অভয়া' এই গানটি তার পরদিন হয়েছিল—কিন্তু কে গেয়েছিলেন তা এখন আর মনে নাই। তবে আমি বা আমার ছোট দাদা গানটা গাইনি। আমরা তো নতুন বৌদি পেয়ে মহা খুশী। সব সময়ই তাঁর পাশে পাশে থাকছি। বাড়ী ভরা কত লোকজন। যেন সুখের হাট। তবু কেন যেন মনের ভিতরটায় কি যেন ঠেলে উঠতে থাকে। কোথায় রাজসাহীর আনন্দের হাট, কোথায় রজনীকান্তের সঙ্গীতের প্রস্রবণে ভেসে যাওয়া। কোথায় মায়ের ফুল্ল মূর্ত্তি, কোথায় শিউলি কামিনী করবী ফুলে সুরভিত আঙিনা, কোথায় সন্ধ্যামালতীর রঙিন রূপ, কোথায় নববধূর আগমনের আলিম্পনের অপরূপ সৌন্দর্য্য, কোথায় ঠাকুর চাকরের কলরব। মনের মধ্যে

চেয়ে দেখি যেন সব ছবির মতন চোখের সামনে ভেসে চলেছে, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি। সে ছবির সঙ্গে আমাদের যেন আর যোগাযোগ নাই। বাবা নববধূকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'মা' তুমি আনন্দময়ী হয়ে আমার ঘরে থাকো। তোমার কোমল হাতের স্পর্শে আমার এই মৃতকল্প শরীর জুড়িয়ে যাক। বড় কষ্ট পাচ্ছি মা। আমার একটু আরামের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করিস। লক্ষ্মীরূপিণী মা, তোর প্রার্থনা সেই দয়াল শুনবে।'

রাত্রে আবার যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে লেখাও যেন দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল। বাবার কষ্ট যত বাড়ে ততই সঙ্গীতের সুর বর্ণনা ভাবাবেগে মন্দাকিনীগতিতে স্বর্গীয় সুষমায় আবর্তিত করেই চলেছে—লিখছেন,

চল ফিরে চল তারে পাওয়া যাবেনা
কত দূরে কিসের মত
আলো আঁধার ছুটছে কত,
রইল ছায়া গেল কায়া ফিরে আসবে না। 'শেষ দান'।

এই গানটার আর সুর দিয়ে যেতে পারেন নাই। তখন শারীরিক কষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে বিয়েবাড়ীর ভিড় ক্রমশঃ কমে যেতে লাগল। দেশের সবাই দেশে চলে গেলেন। ঠাকুমা শুধু রইলেন। বাবা লিখলেন, 'মা' তুমি যেও না। আমার কাছেই থাকো। তুমি থাকলে আমার কষ্ট কমে যায়। তুমি আমায় মাথার কাছেই বসে থেকো। ঠাকুমা রয়ে গেলেন। বেশী সময়ই বাবার কাছে বসে থাকতেন। আর রজন রজন বলে আস্তে আস্তে ডাকতেন। বিয়েবাড়ীতে আমরা বোধহয় মাস খানেক ছিলাম। সেখানে প্রত্যেক দিন ডাক্তাররা আসতে পারতেন না। হেমেন্দ্র বক্সী, বিজিতেন বসু, অমূল্যবাবু যিনি বাবার সঙ্গে কাশী থেকে এসেছিলেন, এঁরা সব সময়ই বাবার কাছে থাকতেন। আর আমাদের মাসতুতো ভাই সুরেশ গুপ্ত এবং আরও অনেকেই প্রায় সময়ই বাবার কাছে থাকতেন। যখন যা করবার দরকার এঁরা সব সময় করতেন। কিন্তু লেখার বিরাম নাই। বাবার লেখার সময় যেন বেড়ে গিয়েছিল। একদিন লিখলেন, 'তোমরা সবাই বল রাত্তিরটা না জেগে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন! আরে যন্ত্রণা কমবার জন্য মর্ফিয়া তো দিচ্ছ; সে নেশায় তো আর ঘুম আসে না, যন্ত্রণাও কমে না। সেই হরির নামেই আমার কষ্ট কমে। তাই তার নাম নিয়ে বসে থাকি, তাই তার নাম লিখে যাই। তার নামই আমার শীতল প্রলেপ, সেই আমাকে নামের নেশায় বুঁদ করে রেখেছে তাই আর ঘুম আসে না রে।' সেই রাত্রে লিখলেন—

তীব্র বেদনা যবে ঢেলে দিলে মোর গলে
কত যে দিয়েছি গালি নির্মম নিদয় বলে:
তখন বুঝিনি আমি দয়াল হৃদয় স্বামী
পাঠায়েছ শুভাশিস্ দারুণ বেদনা ছলে।
অভ্রান্ত বিচারপতি দিবে না যে অব্যাহতি
বুঝিয়া বুঝাই মনে আর যেন নাহি টলে।

হাসপাতাল—'শেষ দান'

এই ভাবেই নিজের মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে সমস্ত দুঃখকষ্ট নিজে গ্রহণ করে তাঁর বিচারপতির পায়ে সমস্ত সমর্পণ করলেন। অন্তরের প্রেমসাধনা ভালবাসা যা কিছু দিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। তার পরেই লিখলেন—

তার পরে ভেবে দেখি এ যে তাঁরি প্রেম এ কি
শাস্তি কোথা, শুধু দয়া, শুধু প্রেম প্রতি পলে।'

ভগবৎপ্রেমের মধুর ধারার আপনাতে আপনি স্নাত হচ্ছেন। দেহের কষ্ট ভগবৎচেতনাকে আবৃত করতে পারছে না।

রুগ্ন দেহ ঘিরে যে বেদনা যে যন্ত্রণা অহরহ সূচীবিদ্ধ করছে, সেই যন্ত্রণাকাতর দেহ থেকেই অবিরাম চন্দন-শীতল ঈশ্বর-প্রেম উৎসারিত হচ্ছে। দীর্ণ জীর্ণ যন্ত্রণাপূর্ণ দেহ ভগবৎচরণে তিলে তিলে লীন হয়ে যাচ্ছে; ভক্তিধারায় উদ্ভাসিত হচ্ছে, যেন দেহ তাঁর নয়, দুঃখ তাঁর নয়, কিছুই কষ্ট নয়। দেহকে প্রেমজ্যোতিঃ ঘিরে রেখেছে এখানে দুঃখ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না।

বাবা লিখলেন, 'দেখ কি রকম করে মারছে। মেরে মেরে আমাকে চূর্ণ করে দিল। তবু কি ছাড়ে! তে বলি আর মারিসনে কিন্তু সে ছাড়ে না। আরে তারা কি বুঝিস,—সোনা গলিয়ে খাদ নষ্ট করে দিচ্ছে। খাঁটি না হলে তো তার কাছে যাওয়া যায় না? আমাকে তাই আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তাই এত কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু না রে, ভেবে দেখিস এটা তার দয়া।' হেমেন্দ্র বকসী বললেন, 'কেন, ভালবেসে কি কাছে টেনে নিতে পারে না? খালি শাসনই করতে পারে? কেমন দয়াল?' বাবা বললেন, হ্যাঁ রে, পারে যে সব তাকে দিয়েছে; সেই প্রেম পেয়েছে। আমি যে বড় পাপী। তাকে কিছুই দিতে পারিনি। শুধু নিয়েছি, তাই এখন ধরে মারছে। আরে, আগুনে সোনা না গলালে খাদ উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ে খাঁটি করে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী করে নিচ্ছে। হেমেন্দ্র ভাই রে, দুঃখ করিসনে। আমাকে তৈরী করে নিতে দে।' আবার লিখলেন, দেখো সুরেস দেখতে পাচ্ছে তার কত দয়া? কত ভালবাসা? কোথাকার কে এক রজনীকান্ত তাকে এনে বসালেন কোথায়? সমস্ত দেশবাসীর মনের মাঝখানে। কত প্রেম কত ভালবাসা কত দয়া তাদের মনের মধ্যে দিয়ে আমাকে হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে। এ তো তারই অনুকম্পা, তারই কৃপা, তাকে তোমরা বুঝতে চাও না কেন? শুধু আমার মর্মাক্লিষ্ট যন্ত্রণাকে মর্ফিয়ার মোহে অনুভূতিহীন করে রাখতে চাও? লিখলেন—

'আর ধরিসনে, মানা করিসনে,
আর কাঁদিসনে, আমায় বাঁধিসনে,
আমার গেল বেলা নিয়ে ধুলোখেলা,
আমি আর কত কাল করব হেলা
আমায় ছেড়ে দে—'

অভয়া।

কোনদিন যন্ত্রণা বাড়ে, কোনদিন একটু কম থাকে, এই মধ্যে দিয়ে দিন চলছে। আমাদের বৌবাজারের বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল। নববধূ চলে গেলেন পিত্রালয়ে রাজসাহীতে। বড়দাদার আই এ পরীক্ষা, বড়দাদাও রাজসাহী চলে গেলেন। আমরা আবার ফিরে এলাম মেডিক্যাল হাসপাতালের কটেজে। এই সময়ে কত বন্ধু, কত কলেজের ছাত্র বাবাকে দেখতে আসতেন। তাঁদের দেখে মনে হত যেন কোন তীর্থক্ষেত্রে দেবদর্শনের প্রার্থী হয়ে এসেছেন। কেউ কেউ একটু সেবা করবার জন্য উন্মুখ। তখন থেকেই সুধীরকুমার বসু ও তাঁর ভাই সুস্থিরকুমার বসু বাবার রোগশয্যার পাশে এসে বসলেন।

পরবর্তী জীবনে এঁদের বড় ভাই সন্তোষকুমার বসু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। কত লেখা, কত গল্প এঁদের সঙ্গে হত।

বাবা এই সময়ে আরও গান লিখলেন। আনন্দময়ী লিখলেন ভগবতী দেবীর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে, আগমনী ও বিজয়ায় মাতৃরূপের বন্দনা। আনন্দময়ী লিখবার আগে বাবা বলেছিলেন, তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক গান লেখেন এবং তা পুস্তকাকারে 'পদচিন্তামণিমালা' নামে প্রকাশ করেন। ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান শুনে তাঁর বড় ভাই গোবিন্দনাথ সেন বললেন ভাইকে, গুরু রাধাকৃষ্ণের গান লিখেছ সুর দিয়েছ... আবার গেয়েও শুনিয়েছ। ভাই রে মর্ম্মস্পর্শী গান হয়েছে। কিন্তু এতে আমার মায়ের নাম কই? তাই শুনে গুরুপ্রসাদ শিব-মহামায়া বিষয়ক ব্রজবুলি ভাষায় অনেক গান রচনা করে তাঁর বড় ভাই-এর হাতে দেন। এতেও নিজে সুর দিয়েছিলেন। এ বইয়ের নামও 'পদচিন্তামণিমালা' দিয়েছিলেন। বোধহয় তাতেই অন্তরে প্রেরণা পেয়ে আনন্দময়ী লিখলেন দেবী দুর্গার নামে। এই সব নতুন নতুন গান কবিতার আলোচনা সুধীর বসু সন্তোষ বসুর সঙ্গে অনেক ভাবে করতেন। তাঁদের সাহচর্য্য বাবার আনন্দদায়ক সাহিত্যচর্চ্চার সহায়ক হয়েছিল। কত লেখা কত গল্প এদের সঙ্গে হ'ত। বাবা এই সময়ে আরও কত গান

কবিতা লিখলেন। 'আনন্দময়ী'র গানের সুর নিজেই দিলেন। দেবেন চক্রবর্তী ও দাদাদের দিয়ে। তাঁদের গলায় ঠিক সুরটি আসছে না—হয়তো বারে বারে বাজিয়ে, হয়তো একটু আধটু কথা বা সুর বদল করে, কথা ও সুর ঠিক করে গাইয়ে নিয়ে তবে ছেড়ে দিতেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্বাদ এনে সুর দিয়ে বইয়ে দিচ্ছেন। যত শরীরে কষ্ট তত সঙ্গীতের সুধারসে আকণ্ঠ নিমজ্জন। হয়তো কেউ হাতটা ধরে হাতের পাতায় দেখছে বড্ডই যেন রক্তশূন্যতা দেখা যাচ্ছে। বাবা লিখতেন, ওখানে নয়, ওখানে নয়। অন্তরদ্বার খুলে দেখ কে উজ্জ্বল হয়ে বসে আছে।' লিখলেন, ঐ

আলো করে বসে কে আছে রে তোর ভাঙা ঘরে।
দেখ দেখি মন নয়ন মুদে ভালো করে।

এই সময়ে বাবাকে দেখতে এলেন কলকাতার এক প্রকাশ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার লাহিড়ী। পুরো নামটা এর ব্যবহার হ'ত না, এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড সন্স নামই তাঁর পরিচয়। তাঁর সঙ্গে বাবার খুব হৃদ্যতা ছিল। ইনিই বাবার সমস্ত বই ছাপাবার ভার নেন।

বাবাও তাঁর হাতে অভয়া অমৃত ও আনন্দময়ী বই, গুলি ছাপাবার দায়িত্ব দিয়ে দেন। অমৃতের কথা আগেই বলেছি। আনন্দময়ীর গানগুলি সমস্ত সঙ্কলিত করে এস কে লাহিড়ী নিয়ে যান ও ছাপতে আরম্ভ করে দেন। আর অভয়ার গান তখনও সমস্ত সঙ্কলন করা হয় নাই। পুরোনো গান ও নতুন লেখা গান একত্র করে 'অভয়া' নাম দিয়ে বই বার করা হবে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাবার জীবিত অবস্থায় অভয়া বার করা সম্ভব হয় নাই। বাবার মৃত্যুর দুদিন পরে অভয়া বাঁধাই হয়ে কটেজে এল। এবং বাবার শেষ নিঃশ্বাস যেখানে পড়েছিল সেখানেই বইগুলি সাজিয়ে রাখা হল। বাবা বলেছিলেন, অভয়া আমি দেখে যাব, তা হল না। আর দেখা হবে না। দয়াল আমাকে তার আগেই ডাকছে।, এস্ কে লাহিড়ীর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তিনি

রোজ বিকেলে আসতেন, বাবার বিছানায় বসে আমাদের ডাকতেন। বাবা যখন দাদাদের বা দেবেন চক্রবর্তী বা সুধীর বসুকে কোনো নতুন গান শেখাতেন তখন কাছা-কাছি থেকে সে গানগুলি আমরাও তো শিখে নিতাম। সেই নতুন শেখা গানগুলি তাঁর কোলের কাছে বসে তাকে শোনাতে হ'ত। প্রায় রোজই নতুন গান পুরোনো গান তাঁর কাছে আমাদের গাইতে হ'ত। বিশাল মোটা চেহারা তাঁর—তাঁর পাশে আমরা ডুবে যেতাম। ভারি স্নেহময় পুরুষ ছিলেন। আমাকে সব সময়ই মা বলে ডাকতেন।

হাউলার কি ও কেন

পরিমল গোস্বামী

ইংরেজদের দেশে 'হাউলার' বা পরীক্ষার ছাত্রদের আবোল-তাবোল উত্তর লেখা অনেকদিন ধরে সংগৃহীত হয়ে আসছে। যে সব ভুল উত্তর কৌতুককর হয় তা নানাদিক থেকে বিচার করলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বড়ই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এমন কি যারা এমন আবোল-তাবোল উত্তর লেখে, তারাও পরে নিজেদেরই লেখা উত্তর পড়ে প্রাণ খুলে হাসে। ইংরেজদের দেশে কৌতুক বইতে শুধু পরীক্ষার খাতা থেকে নয়, জীবনের সকল বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। কাগজে বা বইতে ছাপার ভুলে যে সব কৌতুক সৃষ্টি হয় তারও একটা বিরাট সংগ্রহ সভ্যদেশ-সমূহে নিয়মিত করা হয়ে থাকে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি কবর-খানায় প্রবেশের পরেও নিষ্কৃতি নেই। সেখানেও যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে কৌতুক আবিষ্কার করবার মতো রসিক ব্যক্তি ওসব দেশে আছেন।

এই সব হাউলার বিষয়ে আমার কিছু নিজস্ব মত প্রকাশ করছি। আমি ১৯৫৬ সনে, অর্থাৎ এখন থেকে ১৬ বছর আগে হাউলার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। তাতে এবিষয়ে আমার মত প্রকাশ করেছিলাম এই ভাবে—

"স্কুলের ছেলেরা যে-সব বিষয় অল্প জানে বা আদৌ জানে না, কিংবা মনে করে জানে, পরীক্ষার সময় সে-সব বিষয়ে তাদের উত্তরগুলিতে এমন এক জাতীয় মৌলিকতা থাকে যা সর্বসাধারণের উপভোগ্য, এবং আমার মতে এই উত্তরগুলি জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হওয়া উচিত।"

আরো লিখেছিলাম, "কার মুখ থেকে বা কলম থেকে কোন্ ভুল উত্তরটি প্রকাশিত হবে তা তারা নিজেরাই জানে না, ওতে উত্তরদাতাদের কোনো হাত নেই, সবই inspired, সবই দৈব। তাই যার মুখ থেকে বা কলম থেকে এই উত্তর বেরোয় সে এর স্বত্বাধিকারী নয়। ...হাউলার-উচ্চারণকারী হাউলারের স্রষ্টা নয়, আর সবার সঙ্গে সমান ভাবে তাকে সে ভোগ করতে পারে মাত্র।

"আমার মতে হাউলার অপৌরুষেয় এবং অলৌকিক। হয়তো বা মনঃসমীক্ষার সাহায্যে হাউলারের উৎপত্তির ব্যাখ্যা কিছু দেওয়া যেতে পারে।"

আমার এই রচনার শেষে লিখেছিলাম, "এই সব মুক্তা যাদের কলম থেকে বেরোয়, তারা সবাই নির্বোধ নয়, সাময়িক ভাবে তারা বিভ্রান্ত। কোনো প্রেতশক্তি বা দৈবশক্তি তাদের উপর ভর করে লেখার সময়। ভরমুক্ত হলে তারা নিজেরাই অবাক হয় এ-সব দেখে। তখন নিজেরাই হাসে।...(১৯৫৬)

একটা কথা এইখানে বলে রাখা দরকার যে, আমি যত হাউলার অন্যত্র বা প্রবাসী মাসিকে প্রকাশ করেছি, তার সবই প্রায় আমার নিজের দেখা উত্তরপত্র থেকে। আমি যখন পরীক্ষক ছিলাম, তখন মনে মনে হিসাব করে দেখেছি, এ রকম আবোল-তাবোল যারা লেখে, তারা প্রতি একশতের মধ্যে পাঁচজন মাত্র। এই পাঁচ-জনের মধ্যে একজন কিছুই পড়েনি। আর চারজন নার্ভাস হয়ে জানা জিনিস ওলটপালট করেছে লেখার সময়। অভিজ্ঞ পরীক্ষক মাত্রেই এটা বুঝতে পারেন।

আমি গত ১৩৭৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে যখন প্রবাসীতে ছাত্রদের আবোল-তাবোল পর্যায় লিখতে আরম্ভ করি তখনো হাউলারের উৎপত্তি বিষয়ে আমার মতের কোনো বদল ঘটেনি। আমি এই ভাবে আমার লেখা আরম্ভ করেছিলাম—

"পরীক্ষা দিতে গিয়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা

অনেক সময় অজ্ঞতা বশত অথবা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যে সব অদ্ভুত উত্তর খাতায় লিখে আসে তা নানা দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া পাঠের ক্ষীণ স্মৃতি থেকে দুঃসাহসিকভাবে কল্পনার সাহায্যে একটা কিছু যা গড়ে তোলে তাতে চতুর বুদ্ধির যে পরিচয় মেলে তাতে প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবার অনেক সময় পরীক্ষা কর্মকে অতি পবিত্র একটি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণের নিয়ন্তা জ্ঞানে পরীক্ষার হলে যাবার আগে গুরুজনদের পায়ে এবং আশেপাশে কোনো দেবতা থাকলে সেই দেবতাদের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসে। এই জাতীয় পরীক্ষার্থী খুব সহজে স্নায়ু-পীড়িত হয়ে সম্পূর্ণ জানা জিনিস ভুলে যায় এবং লিখতে গিয়ে সব ওলট-পালট করে ফেলে। পরীক্ষাকে একটি অতি সাধারণ ঘটনারূপে এরা দেখে না, এবং এদের অভিভাবকরাই এদের মনে পরীক্ষাকে একটা অতি ভয়ানক ব্যাপার ভাবতে শিখিয়ে দেন। গুরুজন বা দেবতাদের আশীর্বাদ ভিক্ষার মধ্যে একটা ভীরুতা লুকিয়ে থাকে। আর তার ফলে কোনো ছাত্র প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে ছাপা অক্ষর একটিও চোখে দেখতে পায় না, সব শাদা দেখতে থাকে, এবং কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে মাটিতে পড়ে যায়। আমি নিজে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। এ-রকম পরীক্ষার্থী নির্বোধ না হয়েও এবং পাস করার উপযুক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেও পরীক্ষায় বসে কিছু লিখতে পারে না। সেজন্য পরীক্ষা যে একটি অতি সাধারণ ঘটনা এ ধারণা স্কুল থেকে এবং বাড়ি থেকে তাদের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া উচিত।"

ইংরেজী হাউলারের বইতে কেবল হাউলার সংকলিত হয়, মন্তব্য সব সময় থাকে না, কারণ দরকার হয় না। আমার লেখায় আমি সেই দরকার বোধ করেছি নানা কারণে। সে হচ্ছে এই যে, আমি হাউলারের উপভোগ্য দিকটার প্রতি যেমন মনোযোগ দিয়েছি, ঐ সঙ্গে এর মূল কয়েকটি কারণও অনুসন্ধান করেছি। অধিকাংশ বিভ্রান্তির মূলে ব্যবসাদারী মনোভাব নিয়ে অর্ধশিক্ষিতদের লেখা বই পড়া। তারও প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়েছি প্রবাসীতে। এবং বলেছি, কার দোষ বেশি, এবারে সবাই তা চিন্তা করুন। অতএব প্রবাসীতে শুধু ছাত্রদের আবোল-তাবোলই প্রকাশিত হয়নি।

আমি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনা বহুকাল আগে থেকেই করে আসছি। আমি সে কাহিনী কিছু শোনাচ্ছি। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে, যখন আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদক ছিলাম, সেই সময় ১৯৩৫ সনে আমি (১৯৩৬এর আসন্ন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য) আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে কিছু কিছু পড়িয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলাম। কিন্তু জনৈক এল-এম-এস ডাক্তার লিখিত 'ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন' পড়াতে গিয়ে দেখি লেখক বহুস্থলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি শনিবারের চিঠির ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সংখ্যায় যে প্রসঙ্গ কথাটি লিখেছিলাম তার মধ্যে কয়েকটি প্যারাগ্রাফে এই বইএর ভুলগুলির উল্লেখ করেছিলাম এই ভাবে (অংশমাত্র তুলে দিচ্ছি)—

"Ozone OZ—অক্সিজেনবহুল একটি বাষ্প।" আমার মন্তব্য, "Ozone, যাহার সবটুকুই অক্সিজেন এবং যাহা বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহাকে 'অক্সিজেনবহুল' বলা সৎসাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ স্বর্ণকে আমরা স্বর্ণবহুল ধাতু বা হীরককে হীরকবহুল পাথর বলিতে যে সাহস পাই না, উক্ত লেখক সে সাহস পাইয়াছেন।"

এরপর লেখক বলছেন—

"নাইট্রোজেন (N)। এটি মৌলিক পদার্থ নহে। (element) Argon...ইত্যাদি বাষ্পের মিশ্রণে যৌগিক পদার্থ।"

আমার মন্তব্য—"নাইট্রোজেন গ্যাসকে যে হতভাগ্যগণ এতকাল element বা মৌলিক পদার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কাণ্ডজ্ঞান নাই, ইহা প্রমাণিত হইল।..."

এরপর তিনি লিখেছেন—

"অ্যামোনিয়া (NH_3)। ইহা একটি নাইট্রোজেনবহুল উগ্রগন্ধ বাষ্প।"

আমার মন্তব্য—"যে গ্যাসের একটি অণুগঠনে এক পরমাণু নাইট্রোজেন ও তিন পরমাণু হাইড্রোজেন দরকার, সেই গ্যাসকে নাইট্রোজেনবহুল বাষ্প বলাতেও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।"

সামান্য একটু নমুনা দেওয়া সম্ভব হল। এ বই-এর একটি ইংরেজী সংস্করণও ছিল, তাতেও ঐ একই কথা। এর পর সামান্য একটু এপিলোগ আছে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ে এই বই পাঠ্য ছিল। শনিবারের চিঠিতে আমার এই মন্তব্য ছাপা হওয়ার পর সেই স্কুলের এক শিক্ষিকাকে এক কপি শনিবারের চিঠি দিয়ে বলেছিলাম, হেডমিসট্রেসকে এটি দেখাও। দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, শনিবারের চিঠি ও রকম বলেই থাকে।

প্রমাণ হল, যাঁরা ভুল বই লেখেন এবং যারা পড়ান তাঁরা সমস্তরের জ্ঞানসম্পন্ন। যাই হোক, ঐ স্কুলে এ বই বাতিল না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছিল আমার এই সমালোচনার পরে। এবং পরে দেখেছিলাম বইয়ের ভুল সংশোধন করে নতুন সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। এখন আর এ ধরণের প্রতিকার হয় না।

এই একই জাতের পাঠ্যপুস্তকের ভুল নিয়ে আমি নিয়মিত প্রায় পনেরো বছর ধরে যুগান্তর সাময়িকীতে ইতস্ততঃ কীচারে লিখে আসছি। ছাত্রদের আবোল-তাবোল নিয়ে আমি ইতস্ততঃতে আলোচনা করিনি। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা একজনও যদি ভুল শিক্ষার বলি হয়ে থাকে, এবং পরীক্ষাঘরে তার প্রমাণ দিয়ে থাকে, তবে সব সময়েই তার উৎসসন্ধান করেছি পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে।

পূর্বে হাউলার লিখেছি দুবার, বার্ষিক এবং মাসিক বসুমতীতে। তার প্রথমটি পড়ে সৈয়দ মুজতবা আলী আমাকে লিখেছিলেন—আপনার হাউলার অনবদ্য, আমার একটি উপহার নিন—

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পদ নাক কান তাঁর।

প্রবীণ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারক, রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রধান সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে অনেকগুলি হাউলার তাঁর সংগ্রহ থেকে পাঠালেন, সেগুলি প্রবাসীতে আমার হাউলার পর্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে প্রকাশ করেছি। ঐ উদ্ধৃতিটও ছিল তাতে। এঁরা দুজনেই ইংরেজী হাউলার বইগুলির সন্ধান রাখতেন এবং হাউলার প্রকাশ যে ছাত্রদের 'মূর্খতা প্রকাশ' করে পৈশাচিক আনন্দলাভ করা নয়, তাও জানতেন। যাঁরা সাহিত্যে বা অন্যত্র বিশুদ্ধ হিউমার একেবারে সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা হাউলার দেখলে ক্ষিপ্তবৎ আচরণ করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। কৌতুকবিরোধীর সংখ্যা আমাদের মধ্যে সামান্য হলেও আছে। তাঁদের প্রতি করুণা প্রকাশ ছাড়া আর কি করা যায়? কন্‌জেনিটাল ডিফেক্টের প্রতিকার সামান্যই আছে। আমি এমন এক সমালোচকের কথা কিছু পরেই উল্লেখ করব। তিনি প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত আবোল-তাবোল দেখে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য চেপে গিয়ে আবোল-তাবোল বকেছেন।

ইংরেজী হাউলারের বইগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমি অক্সফোর্ডের Cecil Hunt সংকলিত The Best Howlers নামক নবম সংস্করণের বইএর ভূমিকা থেকে দুচার লাইন তুলে তার প্রমাণ দেখাচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

Since its original publication, I have written many books, but *Howlers* remains one of the major satisfactions. It has brought—and continues to bring—grateful letters from all over the world. It is rewarding to an author to know that he has given laughter and encouragement to so many in isolation, in hospital and rigours of active service conditions. The book has brought me many friends."

আমি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি দুটি কারণে।

প্রথমত প্রবাসীর মতো অভিজাত এবং সুবিখ্যাত মাসিক পত্র আমার লেখা 'পরীক্ষাঘরের আবোল-তাবোল' স্থান দিয়েছে, অতএব সে কাগজ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত থাকলে প্রবাসী যে অন্যায় করেনি তা প্রবাসীর পাঠক-দের কাছে বলা দরকার, যদিও প্রবাসীর পাঠকসংখ্যা সবাই শিক্ষিত এটি ধরে নেওয়া যায় এবং তার ডিফেন্সে দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওটা আমার তৃপ্তির জন্যই বলছি। দ্বিতীয় কারণ হাস্যরস-বিরোধী এই সমালোচক সর্বত্রই তাঁর রচনা প্রকাশের একটা অধিকার পেয়েছেন, হয়তো তাঁর অতি গোঁড়ামির জন্যই।

এইবার তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করছি।—তিনি একখানা মাসিকপত্রে লিখছেন—"ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার খাতায় মাঝেমাঝে খুব সাংঘাতিক রকমের ভুলভ্রান্তি করে। বিশেষত 'জেনারেল নলেজ' বা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নো-ত্তরের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ভুলের বহর খুব বেশী দেখা যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কখনও কখনও এই সব উদ্ভট ও হাস্যকর উত্তর একত্রিত করে ছাপিয়ে পাঠকের আমোদ জোগাবার চেষ্টা করা হয়। ভাবখানা এই যে, দেখ দেখ, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কত অজ্ঞ আর কত মূঢ়মতি—বহির্বিশ্বের এমনকি নিজের দেশের খবরও এরা কত কম জানে। ছাত্রছাত্রীদের এই ধরণের জ্ঞানের স্বল্পতা নিয়ে কৌতুক করা তো আমাদের সাহিত্যের কোন একজন বর্ষীয়ান সুরসিক লেখকের বলতে গেলে ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি একটি বাংলা দৈনিকের সাপ্তাহিকের ফীচারে এবং একটি পুরাতন মাসিক পত্রিকায় 'পরীক্ষা ঘরের আবোল-তাবোল' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় এই নিয়ে যে কত বাক্য ব্যয় করছেন তার আর ঠিকঠিকানা নেই। পরীক্ষার উত্তরপত্রে কৃত ছাত্রছাত্রীদের এই সব মারাত্মক ভুলভ্রান্তি (যেগুলিকে হাউলার আখ্যা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খরচায় মস্করা করা হচ্ছে) তিনি শুধু নিজে চোখে চোখে উপভোগ করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, পাঠকদেরও তাঁর আমোদের ভাগ দেবার জন্য ওই সব রচনায় ছাত্রছাত্রীদের ভুলের পসরা সাজিয়ে বসেছেন।"

কিন্তু এই লেখক শুনেছি গান্ধীভক্ত ও অনেস্ট। কিন্তু গান্ধী ভক্তি ও অনেস্টি এ দুটি গুণ তাঁর এই সমালোচনা লেখায় কিছু অসুবিধা অবশ্যই সৃষ্টি করেছে। প্রথম অসুবিধা—তাঁকে অহিংসা ভুলতে হয়েছে। দ্বিতীয় অসুবিধা, তাঁকে মিথ্যা কথা লিখতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন ছাত্রছাত্রীদের এই সব ভুল সপ্তাহিক কাগজের ফীচারে আমি ধারাবাহিক লিখছি। সাপ্তাহিক ফীচারে আমি বহুকাল শুধু পাঠ্যপুস্তক লেখকদের হাউলার নিয়ে আলোচনা করে আসছি, ছাত্রদের নয়। এবং সে আলোচনাও তাঁদের সমালোচনার আকারে করি, স্ফূর্তির জন্য নয়। তবে কেন তিনি অম্লানবদনে এমন মিথ্যা কথাটা লিখলেন? এ মনস্তত্ত্ব খুব যে দুর্বোধ্য তা মনে করি না। তার কারণ লেখকের sense of humourএর ভাণ্ডার শূন্য।

সমালোচক বলেছেন, আমি প্রবাসীতে ও সাপ্তাহিক ফীচারে (যা মিথ্যা) এই সব প্রকাশ করে Sadistic delight উপভোগ করে থাকি। তাতে প্রমাণ হয় তিনি হিউমারকে আক্রমণ করে নিশ্চয় heavenly delight অনুভব করে থাকেন। তবে লেখক যে Sadism কথাটির আংশিক অর্থও জানেন, সম্ভবত এটা পাঁচজনকে দেখাবার জন্য ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গান্ধী ভক্তের উপযুক্ত ভাষা বলে মনে হচ্ছে কি ওটা? তিনি Cecil Huntএর ঐ বইখানার বিরুদ্ধে ইংরেজী ভাষায় (যদি তিনি ইংরেজী ভাষায় লিখতে জানেন) বিলেতের কোনো কাগজে একটি লেখা পাঠিয়ে দেখুন না। তবে বাংলায় তিনি যে-অসভ্য ভাষা (যেমন 'মস্করা') ব্যবহার করেছেন, অত অসভ্য ভাষা ইংরেজী রচনা লিখতে খুঁজে পাবেন কি?

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য জগতের সন্ধান যে তিনি রাখেন না, তাঁর এই হিউমার-বিরোধী সমালো-চনায় (এবং আরো স্পষ্ট করে বললে—এই হাউলার-বিরোধী সমালোচনাতেই) তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং তাঁর হিউমার বোধের অভাবই শুধু আছে তা মনে করা ভুল হবে। কারণ এই ভদ্রলোকই এককালে

রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে লিখেছিলেন—'ও গান বাথরুমে গাওয়ার গান।'—রবীন্দ্র সংগীতে তিনি অবশ্য হিউমার আবিষ্কার করেননি।

এই ভদ্রলোক এতদিন আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রমণ চালিয়ে এখন হাস্যরসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, অতএব বাংলা-ভাষী মাত্রেই সাবধান।

কৌতুকরস বোধের অভাব একটি জন্মগত অক্ষমতা—ওটা অপরাধ নয়। ইংরেজদের দেশেও এমন দুএকজনের দেখা মিলবে, কিন্তু তাঁরা তা নিয়ে দম্ভ প্রকাশও করেন না, প্রবন্ধও লেখেন না। এ শুধু এদেশেই সম্ভব।

"Monkeys cannot sing, but the remarkable fact is that they do not try to."

অ্যামেরিকা থেকে প্রকাশিত Science Digest নামক বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় মাসিকপত্রে (জুন ১৯৭১) বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি হাউলার প্রকাশিত হয়েছে। এই হাউলারগুলি সংকলন করেছেন সেখানকার ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন এক শিক্ষক। তিনি এই রচনার আরম্ভে ছোট্ট একটি ভূমিকা লিখেছেন বেশ মজার। লেখকের নাম Hatold Dunn। আমি সেই ভূমিকাটি তুলে দিচ্ছি—

TAKE ONE CLASS of elementary school youngsters, mix them thoroughly with several pounds of unfamiliar scientific facts, then shake them up with an examination and you have the perfect formula for instant confusion. Fifteen years of teaching has convinced me of this. Here are some of the chemical reactions I received on a recent quiz.

(এই ভূমিকাটি ল্যাবরেটরির নির্দেশের মতো ভাষায় লেখা। তবে glass-এর বদলে class ব্যবহার করা হয়েছে সেটি লক্ষণীয়)।

এরপর তিনি মন্তব্যসহ অনেক হাউলার উদ্ধৃত করেছেন, ছেলেদের এবং মেয়েদের। আমি বাছাই করে দুএকটি মাত্র দিচ্ছি—

"In the deepest parts of the oceans there are many mountains but nobody has yet been able to climb to the bottom of the mountains."

"Some day we may discover how to make magnets that can point in every direction."

লেখক একস্থানে মন্তব্য করছেন—ছোটদের কল্পনার পথে বাস্তব সত্য কখনো বাধা সৃষ্টি করে না। "The difference between air and water is that air can be made wetter, but water cannot." আরো বলেছেন—Only a child could come up with a theory like this : "There are 26 vitamins in all, but some of the letters are yet to be discovered. Finding them all meaning living for ever."

এই মার্কিন শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের এই সব হাউলার প্রকাশ করে কি Sadistic delight উপভোগ করেছেন? ইনি কি ভুলগুলি নিয়ে 'মস্করা' করেছেন? এঁর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে অ্যামেরিকার কাগজে পাঠিয়ে দেখুন না, সমালোচক মশায়।

একটি অতি বিখ্যাত ইংরেজ ছাত্রের হাউলার আমি একটি ইংরেজী নভেলের (A Cuckoo in the Nest) নামপৃষ্ঠায় কাহিনীর প্রবেশদ্বারের চাবি রূপে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। সেটি এই—A cuckoo is a bird which lays other birds' eggs in its own nest. চমৎকার উপভোগ্য একটি হাউলার—লেখক Ben Travers 'মস্করা' করার জন্য হাউলারটির এতটা মূল্য দেননি।

আমার সমালোচকের ইংরেজী সাহিত্য সমাজে যদি প্রবেশাধিকার থাকত, তা হলে তিনি হিউমার-বিরোধী কিছু না লিখে চুপ করে থাকতেন। অনেকে চুপ করে থাকলেই লোক সমাজে শোভা পেয়ে থাকেন—একটি সংস্কৃত বচন এই রকমই আছে।

আমার এই রচনাটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য এই কথাটা প্রচার যে, হাউলার বিশ্বরসিকসমাজে, সভ্যসমাজে, শিক্ষকসমাজে, ছাত্রসমাজে এবং সাধারণ শিক্ষিতসমাজে বহুদিন থেকে আদৃত, কারণ এর একটা দিকে কৌতুক, এবং অনেক সময় উদ্দাম কৌতুক, যা

শিক্ষিত (আমি বিশেষ করে 'শিক্ষিত' কথাটার উপর জোর দিচ্ছি) সমাজে উপভোগ্য হিসাবে স্বীকৃত, ছাত্র-সমাজে শিক্ষণীয় রূপেও গৃহীত, কারণ এ জিনিস পড়ে তারা উপভোগ তো করেই উপরন্তু ভুলগুলি থেকে নির্ভুল কি, তা শিখতে পারে, শিক্ষকসমাজ ছাত্রদের এ রকম আবোল-তাবোল লেখার হেতু কি তা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, যদিও ছাত্রদের নার্ভাসনেস অনেকখানি দূর করতে পারলেও সম্পূর্ণ পারেন না। করতে পারেন পরীক্ষা-ভীতির বিরুদ্ধে সহানুভূতিপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক উপদেশ দিয়ে। অতএব হাউলার সর্বসমাজে আদৃত ছিল, আছে এবং থাকবে।

এই কথাটা ঐ সর্বপ্রগতিবিরোধী সংকীর্ণমনা সমালোচকের নির্বুদ্ধিতাজাত প্রচারের বিরুদ্ধে বলা দরকার ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য, দেশে রামগরুড়ের ছানার সংখ্যাবৃদ্ধি, কিন্তু তা হতে দিলে সমাজের ক্ষতি হবে।

অতএব এই অবসরে আরো কিছু বিদেশী হাউলার উপভোগ করা যাক—

1. The tiger is a very veracious animal.
2. William Pitt considered that he was a very suitable undertaker for the war with France.
3. Geometry teaches us to bisex angels.
4. Mata Hari means suicide in Japanese.

হারাকিরির সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্য থাকাই এই ভুলটির হেতু, ভেবেছে জাপানী ভাষায় ওতে হারাকিরি নামক পবিত্র আত্মহত্যা বোঝায়।

প্রবাসীতে আমার হাউলার পর্যায়ের লেখাগুলির প্রথম অধ্যায়েই বিদেশী অনেকগুলি মজার হাউলার উদ্ধৃত করেছি। তার মধ্যকার একটির কথা আবার মনে করিয়ে দিই। ওটিও সায়েন্স ডাইজেষ্ট থেকে নেওয়া—

"আজকাল অধিকাংশ বইতেই দেখা যায় সূর্য নাকি একটি তারকা। কিন্তু সে যাই হোক, দিনের বেলায় কিন্তু সে পুনরায় সূর্যের রূপ ধরার বিদ্যাটা এখনো ভোলেনি।"

ছাপার ভুলেও যে সব কৌতুক জমে ওঠে তার কথা ভবিষ্যতে বলা যাবে কোনো সময়। ইংরেজী ভাষায় হাজার হাজার সংগৃহীত হয়ে থাকে, এবং সাময়িক পত্র থেকেই প্রায় সব কাগজের নাম ও তারিখও দেওয়া থাকে। আমার সদ্যপ্রকাশিত 'যখন সম্পাদক ছিলাম' বইতে এদেশের কাগজ থেকে অনেক মজার ছাপার ভুল উদ্ধৃত করেছি। আমার সৌভাগ্য যে তা এখনো আমার সমালোচকের চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতে পড়লে আবার এক প্রবন্ধ দেখতে পাব, এবং তাতে লেখা থাকবে—সুকুমারমতি কম্পোজিটরদের ছাপার ভুল নিয়ে মস্করা করা হয়েছে।

আগেই বলে রাখি, এ ভুলও কারো অজ্ঞতায় হয় না, অজ্ঞাত কারণে হয়। যোগেশচন্দ্র বাগলের মৃত্যু-সংবাদ যখন ইংরেজীতে ছাপা হল, তখন দেখলাম মিস্টার বাগল, পরে মিস্টার বেঙ্গল হয়েছেন। এ কি অজ্ঞতার ভুল? এবং তা উপভোগ করলে এবং অন্যের সঙ্গে উপভোগ করলে তাকে কি Sadistic delight উপভোগ করা বলা চলবে?

দেশে এখনো রামগরুড়ের ছানার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণাধীন আছে, তাই ভরসা, তেমন কথা কেউ বলবেন না।

কংগ্রেস-স্মৃতি

(দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৭)

এই রকম পরিস্থিতিতে মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন আরম্ভ হল।

নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ এম্.এ. আনসারী ৯ই ডিসেম্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে অন্যান্য কথার পর তিনি জানালেন যে, রয়েল কমিশন ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখে উপস্থিত করেছে।

কমিশন বয়কট সম্বন্ধে আশাপ্রদ ঐক্যমত হওয়াতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তাঁরা যদি তার সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁদের লক্ষ্য স্বরাজ অর্জনের জন্য জনমত গঠন করতে পারেন তা হলে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে এমন একটা শক্তি অর্জন করা যাবে যা হবে অপ্রতিরোধ্য।

যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন— স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, স্যর নরোত্তম-মোরারজী, বিপিনচন্দ্র পাল, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, মহম্মদাবাদের মহারাজা, রাজা রামপাল সিং, স্যর মহম্মদ ইকবল, স্যর মহম্মদ সফী, এম্. এ. জিন্না, যমনাদাস মেহেতা, স্যর ইব্রাহিম রাহিমতুল্লা, স্যর জুলফিকর আলী খাঁ, স্যর হরি সিং গৌর, স্যর আলী ইমাম্, স্যর আবদুর রহিম, ফজলুল হক, এ. কে. গজনাবি, জগৎ নারায়ণ, নবাব মহম্মদ ইসমাইল, আর. বি. সীতারাম, ডঃ জিয়াউদ্দিন, স্যার মোরাপন্থ যোশী, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, রাজা নরেন্দ্রনাথ, ভাই পরমানন্দ, ডঃ গোকুলচাঁদ নারাং, সি. এফ. এণ্ডরুজ।

এঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে ডিসেম্বর।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর দলবল সহ ২২শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে পৌঁছলেন।

২২শে তারিখে মাদ্রাজ মেলে বাংলার ও বিহারের প্রতিনিধিদের একটি দল মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলেন। এই দলে বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, ডঃ যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সস্ত্রীক সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সস্ত্রীক অমরকৃষ্ণ ঘোষ, লালমোহন ঘোষ এবং সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী।

বাংলা দেশের আরও বহু প্রতিনিধি ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥টার সময় একটি স্পেশাল ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে মাদ্রাজ রওনা হন, এই প্রতিনিধিদের দলের সঙ্গে ছিলেন অধিকাংশ মফঃস্বলের প্রতিনিধি। নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, রাজসাহীর সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,

উকিল ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, তিনকড়ি মজুমদার, হিলির প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চৌধুরী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, বংশবাটীর (বাঁশবেড়ের) মুনীন্দ্রদেব রায় মশায় প্রভৃতির সঙ্গে আমিও ঐ ট্রেনে মাদ্রাজ রওনা হলাম।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নো-চেঞ্জারগণ পৃথক ভাবে রওনা হয়েছিলেন।

আমাদের স্পেশাল ট্রেন ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ৯টা নাগাদ মাদ্রাজ পৌছুলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের অভ্যর্থনা করে বাংলার প্রতিনিধিদের কংগ্রেস নগরে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমরা মাদ্রাজের সেন্ট্রাল স্টেশনে অবতরণ করি। সেখান থেকে নবনির্মিত কংগ্রেস নগর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত কংগ্রেস নগর পর্য্যন্ত একটি লাইন সম্প্রসারণ করে প্রতিনিধি এবং দর্শকদের সুবিধার জন্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষ একটি অস্থায়ী রেল স্টেশন স্থাপিত করেছিলেন।

কংগ্রেস নগর একটি জলাশয়ের ধারে মনোরম স্থানে নির্মিত হয়েছিল। এর পরিধি ছিল তিন মাইল।

কংগ্রেস নগরে প্রতিনিধিদের বাসস্থানের নির্মাণে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল। মাদ্রাজের অনিশ্চিত বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি তাঁবু এবং খাদির বাসস্থানের পরিবর্তে বাঁশ এবং নারকেল গাছের সাহায্যে বহু কুটীর নির্মাণ করেছিলেন। খুব সম্ভব গত বৎসরের গৌহাটী কংগ্রেসের অভিজ্ঞতার জন্য এই সতর্কতা। এই নগর দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন কালের নগরের মত করে নির্মিত হয়েছিল—গৃহগুলিতে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের ব্যবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নগরের মধ্যস্থলে মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল তিলক মণ্ডপ। বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য মণ্ডপের নিকটে মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। প্যাভিলিয়নের থেকে ৪টি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটি মিউনিসিপালিটির রাস্তায় গিয়ে মিশেছে এবং চতুর্থ রাস্তাটি অস্থায়ী রেল স্টেশনে গিয়ে মিশেছে।

প্রায় ৫০০ কুটীর নির্মিত হয়েছিল। মাদ্রাজ করপোরেশনের উদ্‌যোগে রাস্তাঘাটের আলো ও শৌচাগার প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল তা ছাড়া রোগীদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। আয়ুর্বেদী ও হোমিও-প্যাথী চিকিৎসারও ব্যবস্থাও ছিল। পোস্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস যথাযথ ভাবে খোলা হয়েছিল। আহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল।

নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারী বম্বে মেলে ২০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে দলবল সহ মাদ্রাজে পৌছন।

সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে অত্যন্ত ভিড় হবে মনে করে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বম্বে মেলকে বেসিন ব্রিজ স্টেশনে থামিয়ে সভাপতি মশায়ের কামরা ট্রেন থেকে বিচ্যুত করে মাদ্রাজের সেন্ট্রাল স্টেশনে আনয়ন করেন।

সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্টেশনের বহির্ভাগে বিশাল জনতা উপস্থিত হয়েছিল। সেই জনসমুদ্রকে সংযত রাখা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। জনসাধারণকে ভিতরে প্রবেশের বাধা দেওয়ার জন্য স্টেশনের বাইরে একটি বেষ্টনী রচনা করে তার গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ভিড়ের চাপ এত প্রবল হয়েছিল যে গণ্যমান্য নেতাদেরও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করতে হিমসিম খেতে হয়েছিল এবং তাঁরা অতি কষ্টে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। ডাঃ অ্যানি বেশান্ত মহোদয়াকেও অতি কষ্টে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবিকাগণ ভিতরে প্রবেশের সময় জনতার চাপে পড়ে যান। প্রাতঃকাল ৭টা থেকে ৭॥টা পর্য্যন্ত জনতার চাপে পরস্পরের ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। গাড়ী পৌছুনোর ১০ মিনিট পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এসে গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়ায় রেলিং টপকিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

যখন ৭॥টার সময় ট্রেন দেখা দিল—তখন সমবেত জনতার "আল্লা-হো-আকবর" এবং "ডাঃ আনসারী কি জয়" ধ্বনিতে সমস্ত স্থান মুখরিত হয়ে উঠল।

কামরা থেকে শ্রীমতী নাইডুর সহিত ডাঃ আনসারী প্ল্যাটফরমে অবতরণ করতেই স্বেচ্ছাসেবকগক কর্তৃক অভ্যর্থিত হলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার মশায় ডাঃ আনসারীকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীমতী নাইডুকেও পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হল। যাঁরা প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডাঃ অ্যানি বেশান্ত, মৌলানা শওকত আলী, ইয়াকুব হোসেন, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ডাঃ রামা রাও, স্বামী বেঙ্কটা রামন চেট্টি এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

সভাপতি মশায়ের ফোটোগ্রাফ নেওয়ার পর তাঁকে নিয়ে সকলে স্টেশনের বাইরে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। সেই সময় সভাপতি মশায়ের মস্তকের উপর গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ হচ্ছিল এবং জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করা হচ্ছিল। বাইরের বিশাল জনতা তখন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করল।

প্ল্যাটফরমের বাইরে যাওয়ার জন্য গেটের দরজা খোলা সহজসাধ্য হল না। অতি কষ্টে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গেট খুলে শ্রীমতী নাইডু এবং সভাপতি মশায়কে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে আসামাত্র চার দিকে জনতা সভাপতি মশায়কে চেপে ধরল এবং তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সভাপতি মশায়কে চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য চারজন তাঁকে ঘিরে চললেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সম্মুখে পথ দেখিয়ে চললেন, সভাপতি মশায়ের দেহরক্ষী তাঁর পশ্চাতে চললেন এবং দুই পার্শ্বে থাকলেন বেঙ্কটরামন এবং একজন বলিষ্ঠ মুসলমান কর্মী। চাপবদ্ধ উন্মত্ত জনতা উচ্চধ্বনি করতে করতে অগ্রে ও পশ্চাতে হেলতে দুলতে লাগল এবং সকলেই সভাপতি মশায়ের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ভিড়ের চাপে অনেকের চশমা ভেঙ্গে গেল এবং বহু লোকের জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল কিন্তু তাতে কারও উৎসাহ নির্বাপিত হল না। ডাঃ আনসারী বিনা প্রতিবাদে হাস্যবদনে নিজেকে জনতার হাতে ছেড়ে দিলেন।

স্টেশনের পোর্টিকোতে পৌঁছে মোটরগাড়ীতে ওঠবার সময় পুনরায় সভাপতি মশায় মুশকিলে পড়লেন। শ্রীমতী নাইডু গাড়ীতে ওঠার পর সভাপতি মশায় উঠলেন কিন্তু গাড়ীর হুড না সরানো পর্য্যন্ত এবং সকলে যাতে দেখতে পায় এমন ভাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উঁচুতে আসন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত জনতা গাড়ী চালাতে দিল না।

সভাপতি মশায়ের প্রতি জনতা আরও নির্দয় হল। জনতার নির্দেশে তাঁকে পুনঃপুনঃ দাঁড়াতে হল এবং কেউ অভিভাষণ দিতে বলল। ডাঃ আনসারী দুই-তিনবার দাঁড়ালেন এবং জনতার অভ্যর্থনা হাত জোড় করে নমস্কার দ্বারা স্বীকার করলেন। সভাপতির গাড়ীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ চেট্টীও ছিলেন।

প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায়কে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়ে দুই মাইল দূরবর্তী কংগ্রেস নগরে নিয়ে যাওয়া হল। শোভাযাত্রার সঙ্গে দেশী ও ইংরাজী ব্যাণ্ডপার্টি ছিল।

যে সকল পথ দিয়ে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল সেখানকার নাগরিকগণ জয়ধ্বনি দ্বারা সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানাল।

কংগ্রেস প্যাণ্ডেল, তিলক মণ্ডপের নিকট গিয়ে শোভাযাত্রা কিছুক্ষণের জন্য থামানো হল। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যর্থনাসূচক সঙ্গীত দ্বারা সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানাল।

তার পর শোভাযাত্রা সভাপতি মশায়ের জন্য নির্দিষ্ট মার্বেল হলের নিকট এসে থামল। রঙ্গস্বামী

অয়েঙ্গার, রামা রাও এবং হামিদ খাঁ প্রভৃতি স্থানীয় নেতাগণ সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা করে দোতালায় নিয়ে গেলেন।

(৮)

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হল। নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারী সহ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাস্থলে উপস্থিত হতেই সদস্যগণ তাঁদের হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করলো।

সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সি. বিজয় রাঘবাচারিয়া, মৌলানা শওকত আলী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ডাঃ সত্যপাল, স্বামী বেঙ্কটরামন চেট্টী, ডাঃ মুঞ্জে, বরদারাজন নাইডু, তুলসীচরণ গোস্বামী, সি. রাজাগোপালাচারী, এবং বল্লভভাই প্যাটেল।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির আসন ত্যাগ করে নব নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারীকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করে বললেন যে মহাত্মা গান্ধীর পূর্বাভাষ মত এই বৎসর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা থেকে শুরু তাঁর পক্ষে সময় খুব খারাপ হয়েছিল। বর্তমানে সাইমন কমিশনের কল্যাণে সর্ব দলের ঐক্য আশাপ্রদ। ডাঃ আনসারী জাতির কাজে তাঁর মধুর স্বভাব এবং সেবার অর্ঘ্য আনয়ন করলেন। তিনি আশা করেন যে বর্ষশেষে ডাঃ আনসারী স্বাধীন ভারতের মুকুটহীন শাসনকর্তা হবেন।

ডাঃ আনসারী হর্ষধ্বনির মধ্যে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যবসা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যেন মিলিত হন। তারপর ডাঃ আনসারী বিদায়ী সভাপতি যে অসাধারণ নৈপুণ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করেছেন তজ্জন্য তাঁর প্রশংসা করলেন।

সদস্যদের বসবার জন্য চাটাইয়ের উপর চাদর বিছান হয়েছিল। চাদরটি পরীক্ষা করে মৌলানা মহম্মদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি খদ্দরে নির্মিত? শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার পরীক্ষা করে উত্তর দিলেন যে, এটা খদ্দরের চাদর। মহম্মদ আলী তা স্বীকার করলেন না এবং চাদর গুটিয়ে চাটাইয়ের উপর বসলেন।

নবনির্বাচিত সভাপতির আসন গ্রহণের পর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী বিষয় নির্বাচনী কমিটীতে পরিবর্তিত হল।

বিষয় নির্বাচনী কমিটীতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সাইমন কমিশন বর্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে,সাইমন কমিশন গঠন ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পরিপন্থী অতএব ভারতের পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পন্থা হচ্ছে প্রত্যেক প্রদেশে প্রতিপদে উক্ত কমিশন বয়কট করা; সেই হেতু কংগ্রেস কমিশনের বিভিন্ন শহরে পরিদর্শনের সময় কংগ্রেস জনসাধারণকে গণবিক্ষোভ সংঘটন করতে আহ্বান করছে।

ভারতের বিভিন্ন বিধান সভার বেসরকারী সদস্যদের এবং রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নেতাদের কমিশনের নিকট সাক্ষ্য না দিতে এবং কোন প্রকার প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কমিশনের সহিত সহযোগিতা না করতে এবং বিশেষ করে বিধানসভাগুলির বেসরকারী সদস্যদের সিলেক্ট কমিটীর জন্য ভোট না দিতে বা কমিটীতে কোন কাজ না করতে এবং কমিশনের কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে কংগ্রেস অনুরোধ করছে এবং যতদিন সাইমন কমিশন ভারতে অবস্থান করবে ততদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্বের পতন ঘটানো বা কমিশন সংক্রান্ত গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য ছাড়া বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত না হতে কংগ্রেস সদস্যদের নির্দেশ দচ্ছে।

বয়কট সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অন্যান্য দলের সহযোগিতা প্রার্থনা করার ক্ষমতা ওয়া।কং কমিটীকে কংগ্রেস দিচ্ছে।

জমসেদ এন আর মেহেতা প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সর্বান্তকরণে প্রস্তাব সমর্থন করে সুচিন্তিত ভাষণ দিলেন।

টি. প্রকাশম্ একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা কেবল মাত্র বিধানসভার আসন শূন্য বলে ঘোষণার বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আসনগুলি খালি রেখে বিধান-সভার সদস্যগণকে গঠন-মূলক কার্য্য এবং সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

প্রকাশম্ মশায় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে বলেন যে, এমন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন কংগ্রেস সংবিধান থেকে সর্বপ্রকার বাধা দূরীভূত করা প্রয়োজন যাতে সকল দল কংগ্রেসে একতাবদ্ধ হয়ে একযোগে বয়কট আন্দোলন চালাতে পারে। যদি কংগ্রেসকে প্রাণবন্ত করে নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখার আগ্রহ থাকে তা হলে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যেন কংগ্রেসের প্রস্তাব বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা না করে প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাব (স্পিরিট) অনুসারে কাজ করেন।

স্যার. যে, সিদ্ধ আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা স্পষ্ট করে বলতে চান যাতে বিধানসভার বেসরকারী সদস্যগণ অথবা রাজনৈতিক নেতাগণ সাইমন কমিশনকে কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে না পারেন।

বুলুসু শাম্বমূর্ত্তি প্রস্তাবটি আরও জোরদার করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের উক্ত সভাগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেসকে নির্দেশ দিতে বললেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস সদস্যদের বিধানসভাগুলি থেকে একদম বেরিয়ে আসতে বললেন, যাতে গঠনমূলক কার্য্যসূচী বিনা বাধায় কার্য্যকর হতে পারে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে চক্রবর্তী মশায় বললেন যে, গত ৫ বৎসর গঠনমূলক কার্য্যক্রম প্রকৃত পক্ষে অবহেলিত হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে, মহাত্মাজীর রক্তের চাপ এই কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া শ্যামসুন্দর বাবুকে সমর্থন করলেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মূল প্রস্তাব সমর্থন করে সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

আনে এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও এই আলো-চনায় যোগ দিয়েছিলেন।

ভোটে সমুদয় সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, তারপর বিপুল ভোটাধিক্যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

শ্যামসুন্দর বাবু নোটিস দিলেন যে, কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

তারপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লিগ গঠনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর একটি প্রস্তাব দ্বারা চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সে দেশ থেকে ভারতের সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনের দাবি জানালেন এবং বললেন যে, ভারত থেকে সৈন্য প্রেরণ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাজনক।

ডাঃ মুঞ্জে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শাম্বমূর্তি একটি সংশোধনী প্রস্তাবদ্বারা "হীনতাজনক" শব্দটি বাদ দিতে বললেন।

আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সকলগুলিই অগ্রাহ্য হল।

মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আরও একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তাতে ভারতবর্ষে এবং পূর্ব সমুদ্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে তা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

মৌলানা মহম্মদ আলী এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

ডাঃ মুঞ্জে একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা ভারতীয়

যুবকদের যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বললেন। এই প্রস্তাব বৈধতার প্রশ্নে খারিজ হল। তারপর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আরও একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাবে পাসপোর্টের বিরক্তিকর ব্যবস্থার নিন্দা করে তার পরিবর্তন দাবি করা হয়েছে।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন হবে স্থির হল।

২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টায় পুনরায় বিষয় সভার অধিবেশন হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রস্তাব করলেন যে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, ভারতের জনগণের লক্ষ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা।

প্রস্তাব উত্থাপন করে নেহেরু মশায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এস. সত্যামূর্তি প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তনের কোন কল্পনা নেই।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় এবং ডাঃ অ্যানি বেশান্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বঙ্গীয় অন্তরীণদের সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

প্রস্তাব সমর্থিত হয়ে গৃহীত হল।

অন্যান্য প্রস্তাব দ্বারা ভারত থেকে বর্মাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাকে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনাকে ধিক্কার দেওয়া হল।

ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের একটি প্রস্তাবও আলোচনান্তে গৃহীত হল।

(৯)

২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার সমাবেশে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জাতীয় পতাকা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্যে উত্তোলন করলেন। সমবেত নেতাগণ জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতিতে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন।

ঐ দিন বেলা দুটোর সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল কিন্তু দ্বিপ্রহর থেকেই প্রতিনিধি ও দর্শকগণ দলে দলে কংগ্রেস প্যাণ্ডেল "তিলক মণ্ডপে" প্রবেশ করতে আরম্ভ করল এবং আধ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত প্যাণ্ডেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

এবারকার প্যাণ্ডেলটি বৃহৎ আকারের ছিল এবং তার অভ্যন্তর অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরের স্তম্ভগুলি ত্রিবর্ণ খদ্দরদ্বারা মণ্ডিত করা হয়েছিল। চতুর্দিকে রঙ্গীন ফেস্টুন দ্বারা প্যাণ্ডেলের শোভা বর্দ্ধন করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ স্তম্ভের গাত্রে নেতাদের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল।

প্রধান পথ দিয়ে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতেই দেখা গেল পথের দুধারে আমরা কি শিশু যে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে "আমরা পতাকা অবনমিত করব না," "ভারতবর্ষ আশা করে যে তার প্রত্যেক সন্তান কর্তব্য পালন করবে," "আমরা এক সঙ্গে উঠব অথবা তলিয়ে যাব" প্রভৃতি মটো টাঙ্গানো রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলের প্রধান দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করে পুষ্পমাল্যে শোভিত করলেন।

তারপর সভাপতি মশায় গেটের সামনে উত্তোলিত জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করলেন।

প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে "সাইমন কমিশন বয়কট

কর।" "হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ভারতের সন্তান" মটো টাঙ্গানো ছিল।

প্যাণ্ডেলের প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে সভাপতি মশায়কে শোভাযাত্রা সহকারে ডায়াসে নিয়ে যাওয়া হল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে এক দল স্বেচ্ছাসেবিকা এবং তাঁদের পশ্চাতে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল। প্রবেশ পথ থেকে ডায়াস পর্য্যন্ত অন্যান্য স্বেচ্ছা সেবকগণ তাদের বেটন তোরণ প্রস্তুত করেছিল। সভাপতি মশায়ের শোভাযাত্রা সেই তোরণের ভিতর দিয়ে ডায়াসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সভাপতি মশায়ের পুরোভাগে জোড়ায় জোড়ায় নেতৃবর্গ, যথা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলী,মৌলানা শওকত আলী এবং যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ছিলেন। শোভাযাত্রা ডায়াসে উপস্থিত হওয়ার পর সুসজ্জিত ডায়াসের একটি সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের নীচে সভাপতি মশায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। বিশিষ্ট নেতাগণ এবং সভাপতি মশায় কর্তৃক আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভাপতি মশায়ের নিকট আসন গ্রহণ করলেন। সভাপতি মশায়ের উভয় পার্শ্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ আসন গ্রহণ করলেন। ডায়াসের উপর ভারতমাতার মূর্তি অঙ্কিত ছিল, তাতে চরকা ও ও বন্দেমাতরম্ উৎকীর্ণ ছিল।

ডায়াসের ৫০ গজ নীচে একটি বর্তুলাকার মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল এবং তার নীচে মহাত্মা গান্ধীর একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল।

মাদ্রাজের জাষ্টিস পার্টির নেতারা ডায়াসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—পানাগলের রাজা, দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দ রাঘবিয়া, থানিকচলম চেট্টী, স্যর কে. ভি. রেড্ডি, রামস্বামী মুদালেয়ার (পরবর্তী কালে স্যর উপাধিতে ভূষিত) এবং মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী রাঘবেন্দ্র রাও।

ডায়াসের উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ অ্যানি বেশান্ত, মেজর গ্রেহাম পোল, ভি, স্প্র্যাট, পারসেল হার্ডি জোনস, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, সি ভি এস নরসিংহ রাজু, ডাঃ বরদাচলম্ নাইডু, আর কে সম্মুখম্ চেট্টী, ডাঃ ইউ রমারাও, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এস্ সত্যমূর্তি, আর. বেঙ্কটম্ নাইডু, ইয়াকুব হোসেন, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে, ডাঃ সত্যপাল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডাঃ মুঞ্জে, বল্লভভাই প্যাটেল, তুলসীচরণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, মাননীয় সুব্বারায়ান, অরুণস্বামী মুদালেয়ার, জি এ নটেশন্, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি পরবর্তীকালে লীগ গভর্ণমেণ্টের সময় বাংলার অন্যতম মন্ত্রী হয়েছিলেন)। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মিণ্টো প্রফেসর) প্রভৃতি।

সভাপতি মশায়ের আসন গ্রহণ করার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায়কে পুষ্পমাল্যে শোভিত করে তাঁর বক্ষে সভাপতির ব্যাজ পরিয়ে দিলেন।

তারপর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমে একদল বালকবালিকা তামিল নাড়ুর বিখ্যাত কবি ভারতীর একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইল। তারপর রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হল।

জাতীয় সঙ্গীতের পর একদল স্বেচ্ছাসেবিকা অভ্যর্থনা সূচক একটি সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন।

সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রতিনিধি ও দর্শকদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

ভারতের সংবিধান গঠন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে তিনি বললেন যে, তাঁর মতে কেন্দ্রীভূত শাসনের ভিত্তিতে সংবিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক।

অভিভাষণ সমাপনান্তে তিনি সভাপতি মশায়কে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণ পাঠের জন্য বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করলেন। সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণে মামুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অন্যান্য কথার পর বললেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভব হলে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নচেৎ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বয়ংশাসিত স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিজেদের সংগঠন দ্বারাই অন্যের বিনা সাহায্যে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।

তারপর তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন যে কংগ্রেস ৩৫ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার নীতি পালন করেছে। দেড় বৎসর অসহযোগিতার পথ অবলম্বন করেছে এবং চার বৎসর কাউনসিল প্রবেশ করে বাধাদানের নীতি এবং সং-বিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সহযোগিতার দ্বারা কোন ফল হয়নি। কাউনসিলে প্রবেশ করে ভিতর থেকে বাধাদানের নীতিও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। অসহযোগ অবশ্য সর্বতোভাবে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি, এর কারণ ঐ নীতির অন্তর্নিহিত ত্রুটি নয়। এর কারণ কংগ্রেসকর্মীদের নিজেদের দুর্বলতা। অসহযোগ কংগ্রেসের পরাজয় ঘটায় নি। কংগ্রেসই অসহযোগের পরাজয় ঘটিয়েছে।

তারপর তিনি হিন্দুমুসলমান সমস্যার উল্লেখ করে উভয় সম্প্রদায়কে সহনশীলতার জন্য আবেদন জানালেন এবং বোম্বাই ও কলিকাতায় সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত ঐক্য সম্মিলনকে সমর্থন করে বললেন যে, এখন কংগ্রেসের কাজ হচ্ছে ঐক্য সম্মিলনের প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করে জনপ্রিয় করার জন্য জোরের সহিত আন্দোলন চালানো।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিলেন যে, কংগ্রেসকে আরও ব্যাপকভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য কংগ্রেসের ভোটাধিকার জনপ্রিয় করে সকল সম্প্রদায়কে দলে দলে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন যে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক অথবা আত্মসম্মানী ভারতীয় কখনই স্বীকার করতে পারে না যে, ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রায় দেওয়ার দাবি গ্রেট ব্রিটেনের আছে। যেমন ভাবে মিশরের ভ্রাতারা মিলার কমিশনের প্রতি ব্যবহার করেছিল সেই ভাবে সাইমন কমিশনের প্রতি ব্যবহার করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর নেই।

বাংলার অন্তরীণদের সম্বন্ধে তিনি বললেন যে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ব্যাপার হচ্ছে যে, সাত শত যুবককে কেবলমাত্র দেশকে ভালবাসার অপরাধে জীবনের তারুণ্যের সময় তাদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এই ব্যাপার হচ্ছে গভর্ণমেন্টের পক্ষে নৈতিক দেউলিয়া হওয়ার স্বীকারোক্তি, যে অন্তরীনদের তাদের নিজের আদালতে উপস্থিত করে তাদের নিজেদের তৈয়ারী আইন অনুসারে তাদের নিজেদের জজ দ্বারা বিচার করার সাহস নেই।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ডাকাতি আখ্যা দিয়ে বললেন, কংগো থেকে ক্যান্টন পর্য্যন্ত রক্তাক্ষরে ঐ ডাকাতির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

সভাপতির ভাষণ শেষ হওয়ার পর সভাপতি মশায় শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি উন্মোচন করলেন। তারপর প্রতিকৃতিকে শোভাযাত্রা সহ মহাজন সভায় নিয়ে যাওয়া হল।

তারপর সাধারণ সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এম্. এ. জিন্না, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ, স্যর সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, এ. পি. পাত্র, জর্জ ল্যানসবারী, দেওয়ান বাহাদুর, গোবিন্দ রাঘব আইয়ার এবং জি. এ. নটেশনের নিকট হতে প্রাপ্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা সূচক বার্তা সভার সম্মুখে পাঠ করলেন।

সভাপতি মশায় তারপর পৃথ্বিশচন্দ্র রায়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব পাস করলেন।

তারপর সভাপতি মশায় স্বয়ং চারটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রথম প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লীগ গঠনে অভ্যর্থনা জানানো হল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে চীনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ ও ভারতীয় সৈন্য অপসারণের দাবি (যাদের নিয়োগ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাজনক) করা হল।

তৃতীয় প্রস্তাবে গভর্ণমেন্টের পাসপোর্ট নীতিকে, বিশেষ করে সাকলাতওয়ালাকে ভিসা দানে অস্বীকারকে ধিক্কার দেওয়া হল।

চতুর্থ প্রস্তাবে কাকোরী বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হল।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গভর্ণমেন্ট ব্যাপকভাবে ভারতে এবং পূর্ব সমুদ্রে এবং বিশেষ করে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সমর-প্রস্তুতির কাজ চালাচ্ছে তা এই কংগ্রেস উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে এবং অভিমত প্রকাশ করছে যে, এর উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় কণ্ঠরোধ করা এবং একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে অগ্রগতি দেওয়া এবং এই কারণে এর প্রতিরোধ করা প্রয়োজন অতএব এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, এরূপ যুদ্ধ হলে ভারত তাতে কোন অংশ গ্রহণ করবে না।

নিম্বকর প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে কংগ্রেসকে ব্রিটেনের সমর সচিবের সাম্প্রতিক ভ্রমণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, গ্রেট ব্রিটেন রাশিয়া, আফগানিস্তান এবং চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসুক এবং যে হেতু কোন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে না সুতরাং পরাধীন ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর-পর সেদিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হল।

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের জন্য ধার্য্য হল।

ক্রমশঃ

মানব যন্ত্রযান এমিল জ্যাটোপেক

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

"Often in the stilly night
Ere slumber chain has bound me ;
Fond memory brings the light
Of other days around me."

বাস্তবিকই সেদিন গভীর রাত্রে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে মানসলোকে ভেসে উঠল ফেলে আসা দিনের কোন এক মধুর ছবি। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, সেদিন অতীতের কোন এক ধূসর সায়াহ্নে এই বাংলা দেশেরই কোন এক ক্রীড়া-সংস্থায় জ্যাটোপেক দম্পতির সম্মানীয় অতিথিরূপে আগমন। চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শান্তির প্রতীক শ্বেত-পারাবতধারী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্ এমিল জ্যাটোপেক ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ডানা জ্যাটোপেককে আমাদের মাঝে উপবেশনরত অবস্থায়। ঠিক যেমনটি তাঁরা এসে বসেছিলেন ১৯৫৬ সালের কোন এক গোধূলি বেলায়।

ঐ-গভীর রাত্রিতেও হৃদয়ের মধ্যে রণিত হতে থাকল তাঁরই প্রদত্ত বাণীর ঝঙ্কার—"If you want to be a good runner then you should run, run and run," অর্থাৎ ভাল দৌড়বীর হতে গেলে তোমাকে শয়নে স্বপনে এবং জাগরণে দৌড়তে হবে। অর্থাৎ দৌড়ই করতে হবে তোমার ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কালে অনুভব করেছিলাম তাঁর সেই সহজ, সরল, মধুর, নিরহঙ্কার ব্যবহার।

১৯৫২ সালের ওলিম্পিক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কি অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই দৌড়বীরের মধ্যে।

১০,০০০ মিটার দৌড়ের শেষ পর্য্যায়ে ষ্টেডিয়ামের চক্রপথে তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে সমবেত দর্শকদের সকলেই সেদিন ভেবেছিলেন জ্যাটোপেক হয়ত তখনই মাঠের মধ্যে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়বেন। কিন্তু এটা যে তাঁদের কত বড় ভুল সেটি তাঁরা পরে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, ঐ রকম শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও দৌড়ের শেষ সীমানায় না যাওয়া পর্য্যন্ত জ্যাটোপেক তাঁর শ্রান্ত-ক্লান্ত মৃতকল্প শরীরটিকে, অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে, কেমন ধীরে ধীরে সবার আগে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন সর্বপ্রথম ফিতা স্পর্শ করার জন্য।

ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতাতেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবারে কিন্তু দর্শকেরা আর কোন ভুল করেন নি সেদিন। তাঁরা সেদিন জানতেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়া ঐ মৃতকল্প চেক যে কোন উপায়েই ম্যারাথন রেসের শেষ সীমানায় সর্বপ্রথম এসে উপস্থিত হবেন। ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল ঠিক একই ভাবে। এবারও জ্যাটোপেক ওলিম্পিক ম্যারাথন রেসে প্রথম হয়ে বিশ্ববাসীকে পুনরায় চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন।

এই প্রতিযোগিতার শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "ঐ রকম অসহনীয় অবস্থায় একজন মানুষের পক্ষে কি উপায়ে এই রকম দৌড়ান সম্ভব।"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন সেদিন "I run until It hurts, that is when I begin my training programme."

তাঁর দৌড় অভ্যাস পদ্ধতিটি ছিল তৎকালীন সব রকম প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম। দূর পাল্লার দৌড়ে প্রথম দিকে মন্থর গতিতে ছুটে দৌড়ের শেষ পর্য্যায়ে বেগে ধাবমান হওয়ার প্রচলিত রীতি তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তিনি অনুশীলন করতেন স্বীয় উদ্ভাবিত নিজস্ব পদ্ধতিতে। তাঁর পদ্ধতিটি ছিল এই রকম :—

যত দূর পাল্লার দৌড়ই হোক না কেন, দৌড়ের প্রথম

পর্য্যায়ে তীব্র বেগে দৌড়িয়ে অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। এই রকম দৌড়ানর পর দৌড়ের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গতি কিছু মন্থর করে দিয়ে ক্লান্তিবিদীর্ণ শরীরটিকে কেবলমাত্র মানসিক শক্তির বলে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অতঃপর দৌড়ের গতিবেগ শেষ পর্য্যায়ে আপনার যথাশক্তি নিয়োগ করে পুনরায় তীব্রবেগে দৌড়িয়ে দৌড়টিকে শেষ করতে হবে।

কোন এক প্রখ্যাত ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার বলেছিলেন—

"আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোন এক অতিরিক্ত শক্তি পুঞ্জীভূত থাকে। প্রবল দৌড়ে আমার ক্লান্ত দেহ ও মন যখন সহ্যশক্তির সীমা হারিয়ে ফেলে তখনই আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে এই পুঞ্জীভূত শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আর তখনই আমি আমার সাধ্যাতিরিক্ত ভাল দৌড় দৌড়তে সমর্থ হই।

ক্রীড়া জগতের বাঁধাধরা সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রমে এমিল জ্যাটোপেক ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ৫,০০০ মিটার ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে রেকর্ড সময় করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। তাঁর এই অবিস্মরণীয় দৌড়ের স্মরণে বিশ্ববাসী হেলসিঙ্কি ওলিম্পিককে অনেক সময় জ্যাটোপেকের ওলিম্পিক বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই অমানুষিক জীবনীশক্তির পরিচয় পেয়ে জগৎবাসী তাঁকে মানব যন্ত্রযান বা Human Locomotive নামে আখ্যাত করেন।

জ্যাটোপেকের কীর্ত্তিকথার এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। এরপরও দূরপাল্লার দৌড়ে তিনি বহু বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। এক সময় ১০,০০০ মিটার থেকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত মোট আটটি বিভাগের সব কয়টিতেই তিনি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন।

এক অতি সাধারণ কৃষক পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এমিল জ্যাটোপেক স্বীয় পুরুষকার বলে কৃতিত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁরই সম্মানে সম্মানিত দেশবাসীগণ তাঁকে তাঁদের ক্রীড়া-অধিকর্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি জ্যাটোপেক দম্পতিকে এক বিরক্তিকর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁদের এই লাঞ্ছনা আর নিপীড়ন দেখে বিশ্ব-বাসী আজ সত্যসত্যই মর্মাহত। এত ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও জ্যাটোপেক দম্পতি কিন্তু পূর্বের ন্যায়ই অবিচল আছেন।

জীবনযুদ্ধে এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও জ্যাটোপেক হয়ত ভাবছেন—

"I run until it hurts, that is when I begin my training programme."

মন্থরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ১১ ॥

বিন্ধ্য পর্বতমালার পাদদেশে কোশলেশ্বর রজাধিরাজ কুশের সৌধকিরীটিনী নব-রাজধানী কুশাবতী নগরীর প্রবেশপথমুখে গগনচুম্বী স্বর্ণশীর্ষ শ্রীরামমন্দিরের শিখরামলক তখনও সন্ধ্যাসূর্যের শেষরশ্মিপাতে পদ্মরাগমণিখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল, পশ্চিমাকাশ তখনও অপরূপ অনুরাগের কুঙ্কুমাভায় রঞ্জিত। মন্দিরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী জনপূর্ণ, তাহার দুই পার্শ্বে গন্ধপুষ্পবিক্রেতা ও বিক্রেত্রীরা পুষ্পভার সাজাইয়া বসিয়াছে এবং মৃদুস্বরে পূজার্থীদের সহিত পুষ্পমাল্য ধূপদীপাদির মূল্য লইয়া তর্ক করিতেছে। দুইপার্শ্বে কিয়দ্দূর অন্তর মনুষ্যদেহপরিমাণ প্রদীপধারিণী পিত্তলময়ী নারীমূর্তিসমূহের করধৃত দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে যুবক-যুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা সোপান বাহিয়া উঠিতেছে, নামিতেছে, প্রণাম করিতেছে, পুষ্পঅর্ঘ্য ক্রয় করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরমধ্যে সীতা ও রামের যুগল সুবর্ণমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুভ্রশ্মশ্রু পুরোহিত তখনও ষোড়শোপচারে পূজারতি করিতেছিলেন, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, পটহ প্রভৃতি নানাজাতীয় বাদ্য বাজিতেছিল, সুরভিত ধূপধূম্রের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। সেই কর্মচঞ্চল জনতার মধ্যে রাজপথসন্নিহিত মন্দিরতোরণের অদূরে সর্বনিম্ন সোপানের এক প্রান্তে একটিপ্রায়ান্ধকার স্থানে রাজাধিরাজ কুশ তাঁহার ছত্রধারিণীর সহিত নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন, দুইজন স্বর্ণদণ্ডধারী রাজপুরুষ নিকটে থাকিয়া লক্ষ রাখিতেছিল, কোন দ্রুত ধাবমান্ পূজার্থীর সহিত তাঁহার দেহসংঘর্ষ না ঘটে। অল্পক্ষণ পূর্বে তাঁহার পারাবত-দূত পত্র লইয়া আসিয়াছে, অমাত্য ভদ্র মন্থরাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিতেছেন। নগরদ্বারে অমাত্যকে পথ দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুচর নিযুক্ত করিয়া কুশ তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রাসাদ হইতে অগ্রসর হইয়া শ্রীরামমন্দিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজকার্যের অবসরে একবার এই মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিতেন, আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন। আজ অত্যন্ত চিন্তাকুলিতচিত্তে তিনি ঊর্ধ্বে মন্দিরের দিকে চাহিয়া তখন বোধহয় স্বর্গগত জনক-জননীর আশীর্বাদ ভিক্ষাই করিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ, দেহে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

মহারাজ কুশ সত্যই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। সপ্তাহকাল পূর্বে অযোধ্যার নগরদেবী মধ্যরাত্রে তাঁহার শয়নকক্ষে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। পরদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুশ তাঁহার সচিব এবং সভাসদ্দিগের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, লোকমত সংগ্রহ করিবার জন্য নগরবৃদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সকলের মতের ঐক্য হইতেছে না। যাঁহারা এক সময়ে আত্মীয়বিয়োগবেদনায় ব্যাকুল হইয়া বিতৃষ্ণাভরে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই ফিরিবার জন্য উৎসুক, অপর পক্ষে যুবক স্থপতি, তক্ষক, ভাস্কর প্রভৃতি যাঁহারা শতে শতে সহস্রে সহস্রে মিলিয়া নূতন নগরী কুশাবতী গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাঁহাদের মতে ফিরিয়া যাওয়া অনুচিত। দেবীদর্শন সম্বন্ধেও বিবিধ মত দেখা যাইতে-

ছিল। মহর্ষি জাবালি প্রমুখ অবিশ্বাসী কয়েকজন বলিলেন, "স্বপ্নমাত্রই অবচেতন মনের অপূর্ণ বাসনার প্রতিফলন মাত্র। মহারাজ কুশ যাহা দেখিয়াছেন স্বপ্ন তাহা ভিন্ন কিছু নহে, সুতরাং উহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই" 'অপর পক্ষে ইক্ষাকু বংশের কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের তপোবনে কুশ দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার মতে, 'দেবীর মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কুশ অচিরে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেই তাঁহার এবং দেশবাসীর কল্যাণ হইবে।" গুরুদেবের আদেশই শেষ পর্যন্ত কুশ শিরোধার্য করিয়াছেন। সেইদিন প্রাতঃকালেই কুশবতী নগরে রাজপুরুষগণ রাজাদেশ ঘোষণা করিয়াছেন, 'মহারাজ এক সপ্তাহের মধ্যে অযোধ্যায় যাত্রা করিবেন; যে-সমস্ত নাগরিক স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুগমন করিবেন রাজকোষ হইতে তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় পরিত্যক্ত গৃহ সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে, রাজগৃহ হইতে তাঁহাদের সপরিবারে গমনের জন্য অশ্বরথশকটাদির ব্যবস্থা হইবে। বণিক্‌গণ বিনাভাটকে আপন গৃহ পাইবেন, বিনা শুল্কে পাঁচবৎসর বাণিজ্য করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যশূদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাহাতে অযোধ্যায় পুনর্বাসনের সুযোগ পান সেজন্য রাজা স্বয়ং দায়িত্ব লইয়াছেন। দ্বিপ্রহরে কয়েক শত কুঠারজীবী যাত্রাপথের এবং পরিত্যক্ত অযোধ্যা-নগরীর বনজঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য এবং কয়েক শত মার্গনির্মাণদক্ষ শিল্পী ও স্থপতি হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, খর, শকটাদি সহ অযোধ্যার পথ ও গৃহসমূহ মনুষ্যবাসোপ-যোগী করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মন্দির-সোপানে দাঁড়াইয়া কুশাবতীর স্থপয়িতা শতসহস্র স্থপতির নিয়োগ-কর্তা এবং ভাগ্যনিয়ন্তা তরুণ নৃপতি সন্ধ্যান্ধকারে সুদূর-বিস্তৃত নগরীর আলোকমালার দিকে চাহিয়া আসন্ন-বিচ্ছেদবেদনায় মাঝে মাঝে বিহ্বল হইয়া পড়িতে-ছিলেন, আবার মন্দিরের দিকে চাহিয়া অন্তরে বল সঞ্চয় করিতেছিলেন: নিজের মনকে বলিতেছিলেন, 'পিতা পিতৃসত্য পালনের জন্য এক মুহূর্তে সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে পারিয়াছিলেন আর আমি একটা সামান্য নগরীর মায়া ত্যাগ করিয়া কুলদেবতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না?'

রাজাধিরাজ কুশ এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে একবার মন্দিরের দিকে একবার পথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে একটি সুসজ্জিত উষ্ট্র সমভি-ব্যাহারে একদল যাত্রী অশ্বপৃষ্ঠে এবং পদব্রজে মন্দির-তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমাত্য ভদ্র তাঁহার পরিচরবর্গের অগ্রে আসিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই কুশ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ভদ্রও তাঁহার আলিঙ্গনপাশমুক্ত হইয়া তাঁহা-কে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। পরস্পরের কুশল-প্রশ্নবিনিময়ের পর কুশ চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই, মন্থরাকে দেখিতেছি না?" ভদ্র হাসিয়া বলি-লেন, "মহারাজ, বহুমূল্য রত্ন কি প্রকাশ্যে আনা যায়? মন্থরা ঐ মঞ্জুষার মধ্যে আছে, এখনই দেখিতে পাইবেন। এখন আমাকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিন আমার পরিচয় তাহার না জানাই মঙ্গল।" ভদ্র মৃদুস্বরে উষ্ট্রপৃষ্ঠবিলম্বিত মঞ্জুষা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নামাইতে নির্দেশ দিয়া সোপানশ্রেণী বাহিয়া দ্রুতপদে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কুশ নিজমনে হাসিলেন, দুর্মুখেরও তাহা হইলে চক্ষুলজ্জা আছে!

কিঙ্করগণ মঞ্জুষা নামাইয়া উহার ঊর্ধ্বদেশ উদ্‌ঘাটন করিতেই মন্থরা আবির্ভূতা হইল। সে মঞ্জুষাগর্ভ হইতে অন্যের বিনা সাহায্যেই বাহির হইয়া আসিল, তারপর চতুর্দিকে চাহিয়া বিস্ময়সূচক একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল, "এ আমাকে কোথায় আনিলেন, প্রভু?" তার-পর সন্ন্যাসীকে নিকটে দূরে কোথাও দেখিতে না পাইয়া আবার কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কই, তিনি কোথায়? তোমরা কে? এ আমি কোথায় আসিলাম?" বলা বাহুল্য সন্ন্যাসীর শিষ্যবেশী অনুচরেরা সকলেই ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়াছিল, মন্থরা সেজন্য কাহাকেও চিনিতে

পারিতেছিল না, এমন সময় কুশ কিন্নরগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্থরার তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না,তাঁহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি? ইহার পূর্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? ওগো, তোমরা আমাকে হত্যা করো। আমি নদীগর্ভে ডুবিয়া মরিলাম না কেন, বিষ খাইলাম না কেন? এ দগ্ধ মুখ আমি রামের পুত্রকে দেখাইবার জন্য কেন জীবিতা রহিলাম!"

কুশও বিকৃতাবয়বা কুব্জার পরিবর্তে এই অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন, তাহাকে মন্থরা বলিয়া বিশ্বাস করিতেই তাঁহার সঙ্কোচ-বোধ হইতেছিল। কিন্তু রমণী যখন দুই হস্তে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া বারংবার আর্তস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার শরণ লইয়াছিলাম, এই কি তাহার প্রতিফল? আপনি আমাকে ব্যাঘ্রের বিবরে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? আপনি আমাকে আপনার তপোবনে স্থান দিবেন বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই কি আপনার তপোবন? হায়, সংসারে কি একজন মানুষকেও বিশ্বাস করিবার উপায় নাই? সর্বত্রই ছলনা, সর্বত্রই নিরীহ নির্বোধের প্রাণনাশের জন্য ব্যাধগণ মায়া-জাল পাতিয়া বসিয়া আছে!" তখন কুশের মনের দ্বিধা ঘুচিল বাক্‌স্ফূর্তি হইল; আরও একটু অগ্রসর হইয়া তিনি কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "মন্থরা, তুমি শান্ত হও। আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না। তুমি আমাদের রাজান্তঃপুরে সসম্মানে স্থান পাইবে, যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন আমরা তোমার ভরণপোষণ এবং সেবা করিব। আমারই নির্দেশ অনুসারে অমাত্য ভদ্র তোমাকে বারাণসী হইতে লইয়া আসিয়াছেন, আমি আমার নবরাজধানী কুশাবতীতে তোমাকে স্বাগত জানাইতেছি।"

মন্থরা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল; নবীন নৃপতির প্রসন্ন মুখের অভয়বাণী তাহার মর্মস্পর্শ করিল। সে নতজানু হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পদতলে বসিয়া কাঁদিল। তারপর বলিল, "তুমি কি জানো, আমি তোমার মাতৃদেবীর স্বর্ণমূর্তি চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম? তুমি কি জানো, আমি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে রাজপ্রাসাদের বহু অমূল্য চিত্র ও ভাস্কর্য নষ্ট করিয়াছি?" কুশ হাস্যমুখে কহিলেন, "জানি।" মন্থরা প্রশ্ন করিল, "তোমার প্রদত্ত শাস্তি আমার সহ্য হইত, কিন্তু ক্ষমা কিরূপে সহ্য করিব, মহারাজ?" কুশ বলিলেন, "ক্ষমার প্রশ্ন উঠে না। সংসারের মানুষ তোমাকে ভুল বুঝিয়াছিল, তোমার দ্বারা তাই কেবল সংসারের অকল্যাণই হইয়াছে। তোমার প্রতি ঈশ্বর অবিচার করিয়াছেন, মানুষ অবিচার করিয়াছে, তুমিও তৎপরিবর্তে অন্যের ক্ষতি করিয়াছ। আজ আমরা ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা করিতে চাই, তুমি আমার সহায় হইবে না?"

মন্থরা কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে বসিয়া থাকিয়া সহসা কুশের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিল। অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "মহারাজ, আপনি,—তুমি সত্যই সীতাদেবীর পুত্র। এই ধরিত্রীর মতো সহনশীলতা তোমাতেই সম্ভব। এ ক্ষণে আমি কি করিব বলিয়া দাও।"

কুশ বলিলেন, "রাজান্তঃপুরিকা যাঁহারা মন্দিরে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংবাদ দিতেছি, তুমি তাঁহাদের সহিত আজ অন্তঃপুরে যাও। দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত আছ, এখানে জনকোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলে বিশ্রামের আশা নাই। কল্য তোমার ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করা যাইবে।"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, যখন এত দয়া করিয়াছ তখন আর একটু দয়া করো, আমাকে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়ো না। সেখানে আমার পরিচিতা বহু নারী এখনও আছে, তুমি ক্ষমা করিলেও তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে না, নিরন্তর দিবারাত্র ঘৃণা এবং বাক্যানলে দগ্ধ করিবে।"

কুশ বলিলেন "তবে কোথায় থাকিতে চাও বলো? আমি উপস্থিত মন্দিরে প্রণাম করিয়া প্রাসাদে ফিরিব,

আজ রাত্রে অন্ততঃ সেখানে ফিরিলে ভালো করিতে, শান্তিবিনোদনের সুযোগ পাইতে।"

মন্থরা বলিল, "এ কাহার মন্দির মহারাজ? এখানে আমার স্থান হয় না?"

কুশ বলিলেন, "এ শ্রীরামমন্দির এখানে আমার পিতৃদেবও মাতৃদেবীর সুবর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দেখিতে চাও তো আমার সঙ্গে আসিতে পারো। পুরোহিত ঠাকুর তোমাকে মন্দিরসন্নিহিত পরিচারিকাদের গৃহে স্থান দিতে পারেন কি না তাহাও সেইসঙ্গে জানিয়া আসিতে পারিবে।"

মহারাজ কুশ মন্দিরসোপান আরোহণে অগ্রগামী হইলেন, মন্থরা, ছত্রধারিণী এবং রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কুশ দেখিলেন, তখনও আরতি শেষ হয় নাই; ধূপধূম্রে প্রায়ান্ধকার কক্ষের এক প্রান্তে দ্বারের অদূরে অমাত্য ভদ্র রামসীতার যুগল প্রতিমার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কুশ তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ হইলে কি হইবে, নিপুণ শিল্পী। পাথর মূর্তি যেন জীবন্ত বোধ হইতেছে।"

কুশ হাসিলেন। বলিলেন, "সত্য! আমি মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই যে পিতা জীবিত নাই। মন্দিরের যে প্রান্তেই দাঁড়াই পিতার স্নেহদৃষ্টি যেন আমাকে অনুসরণ করে, মাতার অভয়পাণি যেন আমাকে সাহায্য এবং সান্ত্বনা দান করে।"

মন্থরা কুশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে আরতি দেখিতেছিল, আরতি শেষে সকলের সহিত সেও ধূলায় লুটাইয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা অমাত্যের চক্ষুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনিই অমাত্য ভদ্র? আপনি সন্ন্যাসীবেশে আমাকে প্রতারণা করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন? বিশ্বাসপরায়ণা অসহায়া নারীকে ছলনা করিতে আপনার লজ্জা বোধ হয় নাই?"

ভদ্র বলিলেন, "ভদ্রে, আমি কুখ্যাত দুর্মুখ, আমাকে বেশী ঘাঁটাইও না। যখন বুদ্ধিহীনা কৈকেয়ীকে দিয়া নিরপরাধ রামকে অভিষেকমুহূর্তে বনবাসে পাঠাইয়াছিলে, তাহার ফলে বৃদ্ধ দশরথের প্রাণবিয়োগ ঘটাইয়া অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতাকে কাঁদাইয়াছিলে সেদিন তোমার লজ্জা বোধ হয় নাই? বৃদ্ধবয়সে সীতাদেবীর দয়ায় রাণীর ঐশ্বর্যে বাস করিয়া রামতিরোধান দিবসে রাজ্যের চরম দুর্দিনে যখন সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে তখন তোমার লজ্জা বোধ হয় নাই? যখন পিতামহী পরিচয়ে মূর্খ উচ্ছিখকে লইয়া প্রণয়লীলায় নামিয়াছিলে, মূর্খ কাশীরাজকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছিলে, তখন তোমার লজ্জা করে নাই? যখন অনাথা অসহায়া উৎপলার নাসিকাচ্ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিয়া চন্দনার যৌবন হরণ করিয়া নিজের রূপ-গরিমা বৃদ্ধি করিয়াছিলে তখন তোমার লজ্জা করে নাই, মন্থরা? যখন কাশীরাজমহিষী মহাদেবীকে বিনা দোষে পতিঘাতিনী বলিয়া প্রমাণ করিতে, তাঁহার পুত্রকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলে তখন তোমার লজ্জা বোধ কোথায় ছিল, মন্থরা?"

মন্থরা অধোবদনা হইল। পূজাশেষে পুরোহিতের করধৃত প্রজ্বলিত আরতিপ্রদীপের উত্তাপ নিজ নিজ করতলে সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে সন্তানসন্ততির এবং আপন আপন ইহ-পরকালের ইষ্টলাভের আগ্রহে যে সমস্ত পুণ্যার্থিনী এতক্ষণ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন তাঁহারা উভয়ের বাদানুবাদে আকৃষ্ট হইয়া পুণ্যলোভ ত্যাগ করিয়াই মন্থরা, ভদ্র ও কুশকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেরই চক্ষে কৌতূহল, মুখে অব্যক্ত জিজ্ঞাসাচিহ্ন, "কে এই অপূর্ব সুন্দরী রমণী? মহারাজ কুশ জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার পার্শ্বে এ কেন? এই ব্যক্তিই বা কে? এ উহাকে মন্থরা বলিয়া সম্বোধন করে কেন? ইহাদের কিসের কলহ?" নারীদের সঙ্গে পুরুষ এবং শিশুরাও চতুর্দিকে কৌতূহলবশবর্তী হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া কুশ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন, করজোড়ে সমবেত জনতাকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া একটু পথ দিন আমরা বাহিরে যাইতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী দীর্ঘ পথভ্রমণে ক্লান্ত আছেন।" কে কাহার কথা শুনে, মহারাজের ভাষণ শুনিবার জন্য তখন পর্যন্ত যাহারা দূরে ছিল তাহারাও অগ্রসর হইয়া আসিল। তখন নিরুপায় হইয়া স্বর্ণদণ্ডধারী রাজভৃত্যগণ ব্যূহরচনা পূর্বক বিভিন্ন দিকে জনতাকে ঠেলিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ কিয়দ্দূরে অপসৃত হইলে কুশ বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে ভদ্রকে বলিলেন, "মন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এসব কথা কেন? আপনি আজ শুধু নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই, আমাকে পর্যন্ত অপদস্থ করিয়াছেন। একজন সামান্য নারীর কটুবচনে এতটা বিচলিত হইবার আপনার কোনও কারণ ছিল না। আমার অমাত্য রূপে আমার নির্দেশে আপনি মন্থরাকে লইয়া আসিয়াছেন, কেবল এই কথাটা তাহাকে জানাইলেই যথেষ্ট হইত। যাক, আপনি বয়োবৃদ্ধ, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভন হয় না, অথচ না বলিয়াও পারিলাম না। আপনি শ্রান্ত, এখন গৃহে গমন করুন। কল্য প্রাতে রাজপ্রাসাদের গুপ্ত মন্ত্রণাগারে আসিবেন, সেইখানে আপনার কার্যবিবরণী আনুপূর্বিক শ্রবণ করিব। শুধু তৎপূর্বে একটা কথা আপনাকে জানাইয়া দিই। এই নারী ভালো হউক, মন্দ হউক, এক্ষণে আমার আশ্রিতা। আমি ইহাকে ক্ষমা করিয়াছি, অভয় দিয়াছি। ইহাকে অপমান করার অর্থ আমাকে অপমান করা,—সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রভু-শক্তিকে অপমান করা—একথা স্মরণ রাখিবেন। আপনি যদি একান্তই ইহাকে ক্ষমা করিতে না পারেন তবে অন্ততঃ আমার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসমাজে ইহার সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করিবেন, নারীর সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন। সত্য বলিতে নিষেধ করি না, কিন্তু সত্য বচনও প্রিয়ভাবে বলা যায়। দুর্মুখ হওয়ায় কোনও গৌরব নাই মনে রাখিবেন। যান।"

অমাত্য ভদ্র প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া কুশের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তৎপরে নতমস্তকে তাঁহার তিরস্কারবাণী শুনিতেছিলেন। কুশ নীরব হইলে তিনি নীরবেই অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। স্বর্ণদণ্ডধারী জনৈক রাজভৃত্য অগ্রগামী হইয়া ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে মন্দির বহির্দেশে সোপানশ্রেণীর সম্মুখে পৌঁছিয়া দিয়া গেল। কিন্তু কৌতূহলী জনতা তখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না। পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিল, "অমাত্য ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে যেন?" অপর একজন বলিল, "তাই তো দেখিতেছি। বহুদিন হইল দেশত্যাগী, শুনিয়াছিলাম সন্ন্যাসী হইয়াছে সেরূপ তো লক্ষণ দেখিতেছি না।" আর একজন বলিল, "রামাতিরোধান দিবসে প্রাসাদ হইতে যথেষ্ট ধনরত্ন সরাইয়াছিল শুনিয়াছি, ওদিকে উহার পরিত্যক্তা গৃহিনীর তো সংসার চলে না। অত টাকা লইয়া লোকটা করিল কি?" একটি পুণ্যবতী মহিলা বলিলেন, "কি করিল বুঝিতে পারিতেছ না? কন্যার বয়সী ঐরূপ সুন্দরীদের দয়া পাইতে হইলে অর্থ লাগে।" আর একজন বলিলেন, "তা বটে। ঐ অবিদ্যাটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি নিশ্চয় মহারাজকে উপঢৌকন দিয়া ক্ষমালাভ করিবার জন্য। কোথাকার মেয়ে কে জানে?" পূর্বোক্তা পুণ্য-বতী কহিলেন, "কাজ নাই ওসব পাপ কথায়। তবে মহারাজ আমাদের শিশু নহেন, তাঁহাকে ভুলানো সহজ হইবে না। কেমন ধাতানিটা দিলেন দেখিলে না? আমাদের অমাত্য নির্ঘৃণ, উহার ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িবেন, দেখ না। রাজার সম্পত্তি চুরি করিয়া যাইবে কোথায়?" একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করিলেন, "কুশ মাতৃ-নির্বাসন বিস্মৃত হন নাই। সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পাপিষ্ঠকে কি অপমানটাই না করিলেন! তারপর কুকুরের মতো দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বেশ হইয়াছে।" আর একজন বৃদ্ধ ভক্ত বলিলেন, "রাজা আমাদের বয়সে নবীন হইলে কি হইবে, বিবেচক ব্যক্তি। দুর্মুখটাকে তাড়াইলেন বটে, কিন্তু সুন্দরীটিকে হাতছাড়া করেন নাই। আহা, হতভাগা ভদ্রের দুই কূলই গেল।" চারিদিকে হাসির রোল উঠিল, নানা মুখরোচক আলো-চনা করিতে করিতে সকলেই অগ্রসর হইল।

অমাত্যের বুকের মধ্যে তখন বহ্নিগিরি অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে, তিনি নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তই শুনিলেন। তাঁহাকে নানারূপে আঘাত করিয়াও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না তখন তাঁহার রসজ্ঞতায় সন্দিগ্ধ হইয়া প্রথমোক্ত নরনারীর দল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ভদ্র তখন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণবেদিকার স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ক্ষমাসুন্দর নির্নিমেষ নয়নে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছেন আর বেদিতলে নতজানু হইয়া বসিয়া কুশ এবং মহুয়া বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট হইতে প্রসাদী নির্মাল্য গ্রহণ করিতেছেন। ভদ্র অস্ফুট কণ্ঠে স্বর্ণপ্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, প্রভু! কর্তব্যবোধে তোমাকে কঠিন দুঃখ দিয়াছি, তাই কি পুত্রের হস্তে আমার জন্য আজ এই কঠিন শাস্তি পাঠাইলে?"

জনৈক স্থূলকায় ধনী ব্যক্তি রাত্র্যন্ধতা বশতঃ ভদ্র পার্শ্বমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন বুঝিতে পারেন নাই, সবেগে আসিয়া তাঁহার বক্ষোলগ্ন হইলেন এবং পরক্ষণেই ভূপাতিত হইলেন। ভদ্র তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেই তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কে কে তুমি? চক্ষে দেখিতে পাও না? অন্ধকারে নগরবৃষের মতো পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?" তাহার সমভিব্যাহারী আর এক ব্যক্তি পিছন ফিরিয়া অবিলম্বে ভদ্রের ঐ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার কারণ নির্ধারণ করিয়া ফেলিল, তাঁহারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে দেখিল মহুয়াকে। বলিল, "কি হে, সুন্দরী নারী কখনও দেখ নাই বুঝি? কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি দিয়া কোনও লাভ হইবে না, বৎস, ও রাজভোগ্য হবি, তোমার মতো সারমেয়ের পাকস্থলীতে সহ্য হইবে না।" ইহারা অমাত্যকে চিনিত না, অমাত্যের অন্তরে ইহাদের বিষদিগ্ধ ব্যাকবাণ বিদ্ধ হইয়া কি গভীর যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছিল তাহা ধারণা করিবার শক্তি ইহাদের ছিল না। মন্দিরদ্বারের বাহিরে আসিয়া পর্যন্ত ভদ্র যেন চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সোপানাবতরণ করিবেন কি, প্রতিপদেই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনা ঘটিতেছিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তিনি এক-একটি সোপানে নামিয়াই কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতেছিলেন। একটি বৃদ্ধা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, "রাজপুরুষেরা এই মন্তপগুলাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় না কেন?" দ্বিতীয়া বৃদ্ধা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে বলিলেন, "মস্তপ নয় গো মস্তপ নয়, এ সমস্তই ভান। এক দণ্ড পূর্বে এই মানুষটাকে দ্রুতপদে উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। নিশ্চয় কোনও কুঅভিসন্ধি লইয়া কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শিকারী বিড়ালের গুম্ফ দেখিয়া চিনিতে পারো না।" প্রথমা বৃদ্ধা বলিলেন, "আকৃতি দেখিয়া তো ভদ্র ইতর বোঝা যায় না। চল, না হয় তোরণের প্রহরীকে সাবধান করিয়া দিয়া যাই। অনেক সালঙ্কারা ধনিকন্যা এবং রাজান্তঃপুরিকা আসিয়াছে, কাহারও উপর কখন উপদ্রব করিবে কে জানে? এগুলা মানুষ, না পশু?"

অমাত্য ভদ্র এ মন্তব্যও শুনিলেন, মনে মনে বলিলেন, "ধরনী তুমি দ্বিধা হও, আমার এ লজ্জা নিবারণ করো। আর যে সহ্য হয় না।" তিনি আর একটি সোপান অতিক্রম করিতে গিয়া স্খলিত হইলেন, সেই মুহূর্তে একটি সবল কোমল শঙ্খবলয়শোভিত নারীবাহু তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার বাম কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল, তাঁহার পতনোন্মুখ দেহের ভার নিজ দেহে লইয়া একটি অর্ধাবগুণ্ঠিতা সুরূপা প্রৌঢ়া রমণী তাঁহাকে আসন্ন পতন হইতে রক্ষা করিলেন। সুতপা স্বামীর কানে বলিলেন, "আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি? আমার স্কন্ধে ভর দিয়া চল।"

কুশাবতী রাজপ্রাসাদে সভাগৃহ এবং অন্তঃপুরের মধ্য পথে সু-উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানভ্যন্তরে রক্তপ্রস্তর নির্মিত একটি সুরম্য গৃহ রাজাধিরাজ কুশের গুপ্তমন্ত্রণাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। সেদিন প্রভাতে সেখানে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল। নবীন নৃপতি তাঁহার অষ্টসচিব সহ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের শুভাশুভ

বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। বিভিন্ন প্রান্তপাল, মহাসামন্ত, দণ্ডনায়ক, কোট্টপাল, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, তরিক প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিযুক্ত রাজ-পুরুষদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সংবাদ দূত প্রৈষণিক সভায় নিবেদন করিলেন, জ্যেষ্ঠকায়স্থ এবং মহামুদ্রাধি-কৃতের সহায়তায় সম্রাটের মুদ্রাঙ্কিত আদেশ পত্র সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত হইল। অতঃপর অন্য সকলকে বিদায় দিয়া মহারাজ কুশ সচিববর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যতদূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে অত্র কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। প্রজাগণ এবং সৈন্যগণ সুখী এবং সন্তুষ্ট, রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত।"

স্পষ্টবাদী বলিয়া সচিবগণের মধ্যে তক্ষকের দুর্নাম ছিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আজ যেখানে শান্তি বিরাজিত কল্য সেখানে অশান্তি জাগ্রত হইতে বাধা নাই। সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে কুশাবতী অযোধ্যা অপেক্ষা শ্রেয়স্তর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অযোধ্যা অনেক উত্তরে, জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত শাসনে রাখিতে হইলে বিন্ধ্যসন্নিহিত মধ্যদেশই কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে প্রশস্ত। মহারাজ এখনও অযোধ্যা-যাত্রার আদেশ প্রত্যাহার করিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে না।"

অমাত্য সুনন্দ শ্রীরামচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন, তিনি সম্প্রতি নৃপতির মুখ্যসচিব। তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বলিয়া মহারাজ কুশের তিনি সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কুশ তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, মানবেন্দ্র মনু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি-বৃন্দ, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি আপনার পূর্বপিতামহগণ সকলেই অযোধ্যা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। বিরলবসতি দাক্ষিণাত্যে এবং বন্ধুভাবা-পন্ন লঙ্কারাজ্যে আমাদের অচির ভবিষ্যতে বিপদের কারণ নাই, অপর পক্ষে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে গিরিপথ দিয়া যে কোনো মুহূর্তে দুর্ধর্ষ শত্রুদল জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করিতে পারে, সীমান্তবাসী যবন গন্ধর্ব কিন্নর এবং হিমাচলপাদবাসী কিরাতদিগকেও বিশ্বাস নাই, সদা সতর্ক না থাকিলে উত্তরাপথের যে কোনো রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিতে পারে। শাসিত রাজ্যের বিস্তৃতির দৈর্ঘ্য বিচার না করিয়া জনসংখ্যা, কোষ, অস্ত্রবল, সৈন্যবল, শিক্ষায় অগ্রসরতা ইত্যাদিই বিচার করিতে হয়। সেদিক দিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনই আমার মতে উপস্থিত কর্তব্য।"

তক্ষক বলিলেন, "বহু সহস্র বৎসরের স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে অযোধ্যার নাগরিকেরা অলস বিলাসী এবং অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিল, রাজধানী পরিবর্তনের ফলে তাহাদের মধ্যে যেটুকু জাগৃতির চিহ্ন দেখা গিয়াছে পুরাতন আবাসে ফিরিয়া গেলে অবিলম্বে তাহা অন্তর্হিত হইবে, তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় সহসা কোনো প্রবল শত্রুর কবলে পড়িবে।"

সুনন্দ বলিলেন, "বহু সহস্র বৎসরের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির, শৌর্যের এবং অভিজ্ঞতার ধাত্রী অযোধ্যা, অতীত মহত্ত্বের উত্তরাধিকার হেলায় ত্যাগ না করিয়া তাহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে অযোধ্যা চিরদিন 'অ-যোধ্যা'ই থাকিবে।"

উভয়েই ক্রমে উত্তপ্ত হইতেছেন দেখিয়া কুশ তাঁহা-দিগকে বাধা দিলেন, বলিলেন, "অযোধ্যা-প্রসঙ্গ এখন আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই, ইক্ষ্বাকু বংশের কুল-গুরু বশিষ্ঠদেব ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, তিনি যে আদেশ দিয়াছেন তাহাই আমরা শিরোধার্য করিয়াছি। আমার অনুরোধে তিনি শীঘ্রই এখানে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। উপস্থিত আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করি আসুন। আপনারা জানেন অমাত্য ভদ্র গতকল্য সন্ধ্যায় কুখ্যাতা পলাতকা দাসী মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কি কৌশলে কুরূপা মন্থরা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়া কাশীরাজ সুপর্ণকে বিবাহ করিয়াছিল, কি কৌশলে সন্ন্যাসীর বেশধারী অমাত্য ভদ্র তাহাকে কাশী হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন তাহা আপনারা ইতঃপূর্বে অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্যা হইয়াছে, মন্থরাকে কোথায় স্থান দেওয়া যায়। সে রাজপ্রাসাদে থাকিতে

সম্মতা নহে, আমাদের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মতা নহে। তাহাকে লইয়া কি করা যায়?"

অমাত্য ভদ্র সচিববর্গের মধ্যে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে পূর্বরাত্রে যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, অদ্য প্রভাতে কুশের অকপট ক্ষমা প্রার্থনায় তাহা বিদূরিত হইয়াছে। কুশ অন্যান্য সচিবগণের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অর্থসচিব পদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত নিয়োগপত্র দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি কি এখন বিদায় লইতে পারি? জ্যেষ্ঠকায়স্থ এবং কোষাধ্যক্ষ বোধ হয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কুশ বলিলেন, "আলোচ্য বিষয় যখন মন্থরার ভবিষ্যৎ, তখন আপনার আর কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আমি আপনারও পরামর্শপ্রার্থী।"

অমাত্য সুনন্দ রসিক ব্যক্তি, মন্ত্রণাসভার অবান্তর দলবল বিদায় লওয়ার পর হইতে তিনি একটু সহজ ভাবে দুই-একটা রসিকতা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, বলিলেন, "সেই সন্ন্যাসিবেশ, সেই নারীহরণ। বন্ধুবর ভদ্র কুটিলতায় রাবণকেও পরাজিত করিয়াছেন। স্বভাবকুটিলা মন্থরা ইহাঁর মঞ্জুষায় স্বেচ্ছায় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। মা জানকীর মতো আর্তনাদ করে নাই।"

রাজার বিদূষক মহোদর মন্ত্রণাসভার বহির্দেশে একটি বানরশিশুকে লইয়া এতক্ষণ নৃত্যশিক্ষা দিতেছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "আহা, 'সদা পশ্যন্তি সূরয়'। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্বদা সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করিবে। বুঝা যাইতেছে, মন্থরা শাস্ত্রজ্ঞা।"

কুশ হাসিয়া বলিলেন, "যাক, তোমাকে আর বিদ্যা ফলাইতে হইবে না। এখন পরিহাসের সময় নয়।" মহোদর বলিল, "কি বিপদ্! আমি শাস্ত্রকথা বলিলে তোমরা যদি পরিহাস মনে করো" তবে যাই কোথায়?" সুনন্দ বলিলেন, "তোমার শাস্ত্রজ্ঞান তো গভীর। মন্থরাকে লইয়া কি করা যায় সে বিষয়ে তোমার শাস্ত্র কিছু বলে?"

মহোদর বলিল, "কি আর বলিবে? শাস্ত্র মারা গিয়াছে।" সুনন্দ বলিলেন, "আহা, বড়োই সাধু ব্যক্তি ছিল। কখন মরিল?" মহোদর বলিল, "আরে মুর্খ, জানো না, জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি। জ্ঞান হইলেই শাস্ত্র প্রাণত্যাগ করে। আমার তিন বৎসর বয়সে জ্ঞান হয়।" সুনন্দ বলিলেন, "তবে যে এখনই শাস্ত্র আওড়াইতেছিলে? শিখিলে কিরূপে?" মহোদর বলিল, "কি করি, ব্রাহ্মণসন্তান, পিতৃপিতামহ চিরদিন নির্বোধদের প্রতারণা করিয়া খাইয়াছেন, আমি দুইচারিটা বচন না আওড়াইলে লোকে মানিবে কেন? তাই মৃতকে জীবন্ত বলিয়া চালাই।"

সুনন্দ বলিলেন, "তা বেশ করো। এখন তোমার মৃত শাস্ত্রকে না-হয় বাদ দাও জীবন্তজ্ঞান কিছু পরামর্শ দেয়?" মহোদর বলিল, "বলে, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। মন্থরা পূর্বে যাহাই থাকুক এখন সে স্ত্রীরত্ন। রাজার কোনও কর্মচারী রাজাদেশে কোনো সম্পত্তি আহরণ করিলে তাহা রাজারই প্রাপ্য হয়। আমাদের রাজার অন্তঃপুরে এ রত্ন মানাইবে ভালো। দেবীর দোলায় আগমন, ফলং নিত্য ব্রাহ্মণভোজনং ষোড়শোপচারেণ সংপূজনঞ্চ। অধিকন্তু শাস্ত্র বলেন 'মিষ্টান্নং ইতরেজনাঃ'।"

কুশ বলিলেন, "বলিয়াছ ভালো। দাসী আমার পিতামহী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা তাহা মনে আছে?" মহোদর বলিল, "বয়স্য, শাস্ত্র বলিয়াছেন—কো হতিভারঃ সমর্থানাং? তুমি রাজ্যের ভার বহনে সমর্থ, একটা পিতামহীর বয়সী নারীর ভার বহন করিতে ভয় পাইতেছ? তাছাড়া 'যা গতা সা গতা', তখন সে পিতামহী পরিচয়ে উচ্ছ্বেখের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এখন তো তাহার সে রূপ নাই। সে এখন পূর্ণ যুবতী, ভালোই মানাইবে।"

কুশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি দূর হও, নচেৎ প্রহৃত হইবে, ব্রাহ্মণ বলিয়া নিস্তার পাইবে না।"

মহোদর ভীতির ভান করিয়া বানর-শিশুকে কক্ষে লইয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, "তালমলং সাহসেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণং চ স্ত্রীয়োগাশ্চ পুষ্পেনাপি ন তাড়য়েৎ'। তা তোমরা যখন শাস্ত্র মানিবে না তখন আমিই 'স্থান ত্যাগেন দুর্জন' করি।" সে মন্ত্রণাগৃহ ত্যাগ করিয়া অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া আবার তাহার বানরকে নৃত্যকলা শিক্ষা দিতে লাগিল।

তখন অন্যতম সচিব উত্তম বলিলেন "মহারাজ, মন্থরাকে কাশীরাজের নিকট প্রত্যর্পণ করিলে কিরূপ হয়? অমাত্য ভদ্রের কথায় মনে হইল, তিনি উহার প্রেমে উন্মত্ত। মন্থরা-লাভ করিলে তিনি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিরদিন আপনার অনুগত থাকিবেন।"

কুশ ভদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না মহারাজ, সে আর হয় না। মন্থরা কাশী-রাজ্যে এবং রাজান্তঃপুরে শনিস্বরূপা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আমি আর একদিন বিলম্ব করিলে সে কাশীরাজকে দহে মজাইত। পাপীয়সীর প্রতি দয়া করিতে গিয়া নিরপরাধা রাজমহিষীদিগের এবং নির্দোষ প্রজাপুঞ্জের ক্ষতি করিলে আপনি ধর্মের নিকট অপরাধী হইবেন।" সুনন্দ বলিলেন, "বন্ধুবর ভদ্র নারীহরণ করিয়া সম্প্রতি বড়োই ধর্মপ্রবণ হইয়াছেন। মহারাজ, আমি বলি কি, মন্থরাকে লঙ্কায় প্রেরণ করা হউক। লঙ্কাধিপতি বিভীষণ অজেয় অমর, ওদিকে তাঁহার সরমা মন্দোদরী প্রভৃতি মহিষীগণ ক্রমেই বৃদ্ধা হইতেছেন বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে মন্থরা দান করিলে লঙ্কারাজ্যের সহিত আমাদের সখ্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেখানে মন্থরা কোনোরূপ ক্ষতি করিতে সাহস করিবে না, গোলমাল করিবামাত্র রাজা বা রাজভৃত্যগণ তাহাকে উদরসাৎ করিবেন।"

এ-পরামর্শও কুশের মনঃপূত হইল না, কহিলেন, "বিভীষণ আমার পিতৃবন্ধু, তাঁহার নিকট এ-প্রস্তাব আমি করিতে পারিব না। তিনিও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, এরূপ উপহার লইতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।"

অমাত্য নির্ঘৃণ বলিলেন, "মহারাজ, কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিতে ও পরিত্যক্ত নগরীকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অমাত্য ভদ্রের অনুপস্থিতিতে রাজকোষের তত্ত্বাবধান আমি করিতেছিলাম, সুতরাং এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে, আপনার বর্তমান অর্থবল এজন্য যথেষ্ট নহে। প্রজাগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইলে আপনার অবিলম্বে আয়-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। করবৃদ্ধি করা আপনার মত নহে জানি, সে-ক্ষেত্রে মহারাজ রামচন্দ্র কর্তৃক বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে প্রাপ্ত কিছু দুর্লভ মণিরত্ন বিক্রয় করা আশু প্রয়োজন হইবে। সেই সঙ্গে অনায়াস-লব্ধ এই দুর্লভ নারীরত্নটিকেও কোনও সামন্ত নৃপতি বা ধনকুবের শ্রেষ্ঠীর নিকট সর্বোচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে আমাদের অর্থ-চিন্তার কিছু লাঘব হইত। বিকল্পে তাহাকে বিভিন্নদেশীয় ধনিজনের নিকট সাময়িকভাবে গচ্ছিত রাখিয়াও অর্থ-সংগ্রহ করা চলিতে পারে।"

কুশ বলিলেন, "মন্থরাকে প্রতারণা করিয়া ফিরাইয়া আনায় যে পাপ না হইয়াছে, তাহাকে বিক্রয় করিলে বা পণ্যাস্ত্রীরূপে ব্যবহার করিলে তাহার শতগুণ পাপ হইবে। যে আমাকে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় লইয়াছে, আমি তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিব না।"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, মন্থরা নিজমুখে তাহার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা জানাইলে ভালো হয় না?"

কুশ বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। তাহার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্বে তাহার বক্তব্য কিছু আছে কি না আমাদের অবগত হওয়া কর্তব্য। দৌবারিক!"

দৌবারিক দ্বারদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিল। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে রমণীকে আনিবার জন্য শিবিকাপ্রেরণ করিয়াছিলাম তিনি আসিয়াছেন কি?"

দৌবারিক নিবেদন করিল, "তিনি উদ্যান-বহির্দেশে কিছুক্ষণ হইল অপেক্ষা করিতেছেন।"

কুশ বলিলেন "তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" তারপর সচিবগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত লোকের সম্মুখে সে অন্তরের কথা বলিতে লজ্জা পাইবে না?" রাজার ইচ্ছা অবগত হইয়া সচিবগণ সকলেই কক্ষ ত্যাগ করিতেছিলেন। কুশ বলিলেন, "আর্য সুনন্দ, আপনি থাকুন। আর্য ভদ্র, আপনারও থাকা প্রয়োজন।" অন্যান্য সচিবগণ অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইবার পর অনতিবিলম্বে দৌবারিকসহ মন্থরা ধীরপদে নতমস্তকে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং পুষ্পবীথিকামধ্যস্থ প্রস্তরমণ্ডিত পথ অতিক্রম করিয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিল। সে একবার সকলের দিকে চাহিল, তারপর নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন মহারাজ?"

কুশ বলিলেন, "ভদ্রে, আমি শীঘ্রই কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিব, তোমাকে তাহা জানাইয়াছি। তুমি যদি সেখানে যাইতে না চাও তবে আমি তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া যাইব না। কিন্তু উদ্যানে এই পরিত্যক্ত নগরে তোমার নবলব্ধ রূপযৌবন লইয়া বাস করাও নিরাপদ্ হইবে না। তুমি কি কাশী-রাজের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে?" মন্থরা চিন্তামাত্র না করিয়া বলিল, "না।"

কুশ প্রশ্ন করিলেন, "অন্য কোনো রাজা বা রাজপুত্র বা ধনকুবের শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিতে চাও? তুমি ইচ্ছা করো তো আমি আজই এই নগরীতে সমাগত কমপক্ষে উনবিংশজন মুকুটধারী নৃপতিকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাঁহারা যে কেহ তোমাকে লাভ করিলে কৃতার্থ হইবেন। তুমি স্বেচ্ছায় যাহাকে নির্বাচন করিবে তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। বলো, লজ্জা করিয়ো না।"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, আমি বিবাহিতা, আমার বিবাহের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।" ভদ্র বলিতে গিয়াছিলেন "দুইবার বিবাহ হইয়াছে, আর একবারে ক্ষতি হইত না," কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া রসনা সংযত করিলেন। কুশ বলিলেন, "তবে তোমার জন্য কি করিতে পারি, বলো?"

মন্থরা অল্পক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর যুক্তকরে বলিল, "বৎস, মহারাজ, যদি ক্ষমা করিয়া থাকো তবে আজ আমাকে একটি ভিক্ষা দাও।"

স্বভাবদুর্মুখ ভদ্র আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "সাবধান মহারাজ। কেশহীন ব্যক্তি দ্বিতীয়-বার বিল্ববৃক্ষতলে গমন করে না। অযোধ্যার রাজ-পরিবারে মন্থরার ক্রীড়াপুত্তলিকা কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার ফল অবিদিত নহে। এবার সে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইয়াছে, এক বরেই আপনাকে পথে বসাইবার ক্ষমতা সে রাখে। কি মন্থরা, একটি বর চাহিবে, না দুইটি? মহারাজের বনবাস এবং পাপিষ্ঠ ভদ্রের শূলদণ্ড? কি, বলো?"

কুশ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বলো মন্থরা, তোমার কি প্রার্থনা। আমার সাধ্যাতীত না হইলে অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিব।"

মন্থরা বলিল, "শুনিলাম তুমি শ্রীরামমন্দির হইতে বিগ্রহদ্বয় অযোধ্যায় অপসারিত করিবে?"

কুশ বলিলেন, "যথার্থ শুনিয়াছ। স্বর্ণ-প্রতিমাদ্বয়কে পুরোবর্তী করিয়াই আমি কুশাবতী ত্যাগ করিব।"

মন্থরা বলিল, "অযোধ্যার আকাশ-বাতাস রাম-সীতার কীর্তিকাহিনীতে পরিপূর্ণ, সেখানে এই মূর্তিদ্বয় লইয়া গিয়া তৈলসিক্ত মস্তকে তৈলদান করিয়া কি লাভ হইবে, মহারাজ? এখানে রাখিয়া যাইলে চলে না?"

কুশ বলিলেন, "ঐ মূর্তি দুইটি আমার প্রাণস্বরূপ, মন্থরা।" মন্থরা বুঝিল, আবার কিয়ৎকাল নীরব রহিয়া বলিল, "তবে শূণ্য মন্দিরের জন্য দুইটি প্রস্তর-প্রতিমা রচনার আদেশ দাও।" কুশ বলিলেন, "দিয়াছি। বিশাখদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত এবং মথুরা হইতে আগত ভাস্কর ধনঞ্জয় দুইটি মূর্তিই প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। বর্তমানে যে বৃদ্ধ পুরোহিত পূজা করিতেছেন তাঁহাকেই পূজার ভার দিয়া যাইব।"

মন্থরা বলিল, "আমাকে সেই মন্দিরের পরিচর্যার

ভার দাও। আমি নিজহস্তে প্রতিদিন মন্দিরকুট্টিম মার্জনা করিব, পুষ্প-অর্ঘ্য রচনা করিব, বিগ্রহদ্বয়কে মাল্যচন্দনভূষিত করিব। পাপিষ্ঠা বলিয়া ঘৃণা করিয়ো না, এই কাজটুকুর অধিকার আমাকে দিয়া যাও।"

কুশ বলিলেন, "তোমাকে মন্দির-পরিচর্যার ভার দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই কিন্তু আমার সৈন্য-দল চলিয়া গেলে তোমাকে রক্ষা করিবে কে? পরিত্যক্ত নগরীতে পার্বত্য-দস্যুরা হয়তো তৃণখণ্ডটি অবশিষ্ট রাখিবে না। তাহারা বৃদ্ধ পুরোহিত এবং পাষাণ-বিগ্রহকে অব্যাহতি দিলেও তোমাকে অব্যাহতি দিবে মনে হয় না।"

মন্থরা বলিল, "তাহার ব্যবস্থাও তুমি করিতে পারো। আমার বহু অপরাধ সঞ্চিত আছে, তোমার দণ্ডপাশিককে এখনই নির্দেশ দিলে তাহার ভৃত্যেরা আমার মুখের এবং ঊর্ধ্বাঙ্গের মাংস স্থানে স্থানে দগ্ধসন্দংশিকা দ্বারা উৎখাত করিবে বা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদারণ করিয়া ক্ষতসৃষ্টি করিবে। তখন আমি এমন বিকৃত দর্শনা হইয়া যাইব যে তস্করেও আমাকে স্পর্শ করিবে না।"

কুশ বলিলেন, "সে হয় না, ভদ্রে, ও কথা আমি চিন্তাও করিতে পারি না।"

মন্থরা বলিল, "তবে আমি নিজেই না-হয় উত্তপ্ত তৈলে মুখমণ্ডল এবং শরীরের দৃশ্যমান অংশ দগ্ধ করি, তাহা হইলেও আমার এ অভিশপ্ত রূপ থাকিবে না, লোকে দেখিলে ভীত হইবে।"

কুশ বলিলেন, "ও সকল চিন্তা পরিত্যাগ করো।"

মন্থরা বলিল, "আর এক উপায় আছে, তাহা কঠিন-তর কিন্তু তোমার পক্ষে তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। আমি যে রমণীর চক্ষু ও নাসিকা হরণ করিয়া মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছি, যাহার যৌবন হরণ করিয়া যৌবন-বতী হইয়াছি তাহাদিগকে তুমি আনাইয়া দাও। তুমি রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান্, তুমি আদেশ দিলে অবন্তী-রাজ প্রতিষ্ঠানরাজ, সকলেই অবিলম্বে সেই হতভাগিনী-দিগকে সন্ধান করিয়া প্রেরণ করিবেন, শল্যচিকিৎসক এবং বৈদ্যাচার্যও তোমার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি যাহার যাহা কিছু লইয়াছি তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব। আমার স্রষ্টা আমাকে কুরূপা করিয়া দাসীগর্ভজা করিয়া জন্ম দিয়াছিলেন, আমি নিজের চেষ্টায় সুরূপা হইয়াছিলাম, কিন্তু স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারিলাম না, সেজন্য আমার বিদ্রোহ নিষ্ফল হইয়াছে, চিত্তেও শান্তি নাই। এখন পরাজয় স্বীকার করিয়া কুরূপা দাসীরূপেই আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে চাই। তুমি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ দাও, মহারাজ।" ক্রমশঃ

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

মালয়দেশে বারটা বছর ধীরে-ধীরে কেটে গেল। ছেলেমেয়েরা ছোট থেকে বড় হয়ে অনেকেই হাওড়ার বাড়ীতে ফিরে এল। ওখানে থেকে অবশ্য তারা উচ্চ-শিক্ষা নিতে পারত, কিন্তু আমাদের সে ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমাদের বন্ধু প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে ভিন্ন-ভিন্ন জাতে বিবাহ করতে আরম্ভ করল। কেউ ইউরেশিয়ান, কেউ চীনা, কেউ তামিল, কেউ সিলোনিজ, কেউ মালয়ন, কেউ ইংরেজকেও বিবাহ করে বসল। এখন অনেক পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন জাতের পুত্রবধূ, জামাতা বা বৌদিরা এসে পড়েছে। তাদের বেশ কয়েকটা সন্তান-সন্ততিও হয়েছে। সেখানে আমার পাঁচটি মেয়ে ও একটি ছেলে ছিল। তারাও এসব নিজেদের চোখে দেখছে। কখন বলতে কখন একটা অঘটন ঘটে যাবে সেই আশঙ্কাটাও আমাদের মনে বাসা বেঁধেছিল। তাই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পরই তাদের প্রত্যেককে আমরা হাওড়ার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় পড়াতাম। আমার বাবা-মা-ই তাদের তত্ত্বাবধান করতেন।

এইসব ছেলেমেয়ে মানুষ করতে-করতে আমাদের আর অন্য কোন দেশ দেখা হয়নি। তবে বাড়ীতে মধ্যে-মধ্যে আমাদের আসতে হ'ত। সেই সময় আমাদের ব্যাঙ্কক দেখা হ'ত। কারণ প্রায় প্লেনগুলি ব্যাঙ্ককে আমাদের নামিয়ে দিয়ে জাপানে চলে যেত। আমাদের ওখানে ২৪ ঘণ্টা থেকে তবে কলকাতার প্লেন ধরতে হ'ত। থাকা ও খাওয়ার খরচটা প্লেন কোম্পানীই সব সময়েই দিত। সেই সময়ের মধ্যে আমরা ব্যাঙ্কক সহরটা ও তার আশেপাশের জায়গাগুলি ভালভাবেই ঘুরে দেখতাম।

১৯৬২ সালে আমরা সকলেই প্লেনে করে বাড়ী ফিরে বড় ছেলে ও বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে মালয়ে আবার ফিরে গেলাম। কিছুদিন পরে মেজ মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই আমার কাছে চলে এল। তখন সেখানে তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে নিয়ে আমার সংসার। উপায়ও বেশ হচ্ছে। সব টাকাটাই বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। আমার স্ত্রী আমাকে অনেক করে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, আমাদের এখন কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসা উচিত। এই অনুরোধটা প্রায় মাস ছ'য়েক ধরে চলল। আমি কোথাও যেতে নারাজ। কেননা উপায় ফেলে বেড়ানোটা আমার খুব পছন্দ হ'ত না। ওঁকে বুঝিয়ে বলি, "বাড়ী ফিরে গিয়ে আমরা একবার বিশ্ব-পরিক্রমা করব।" ভদ্রমহিলা শোনেন না, বলেন "বিদেশী মুদ্রা ভারত গভর্ণমেন্ট দেবে না। কি করে বেড়াতে যাবে তুমি?" সত্যই বিদেশী-মুদ্রার কথা আমার মোটেই খেয়াল ছিল না। তাই ওখান থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লিখলাম যে, আমার পাঠানো ডলার থেকে আমায় কিছু দেওয়া হোক। আমি বিদেশে বেড়াতে যাবো। তাঁরা উত্তর দিলেন যে ভারতে একবার বিদেশী মুদ্রা এলে সেটা আর বাইরে খরচ করা যায় না। আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম। বাড়ীতে কিছুদিন টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলাম। জমার খাতায় তখন কিছুটা পড়তে আরম্ভ ক'রল।

বেশ কয়েক মাস পরে ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে এক চীনা বন্ধু আমায় বললেন যে, সাইম ডারবী কোম্পানী (Sime Darby Co.) ১১ দিনের জাপান-ভ্রমণ করাচ্ছে, আমরা যেতে রাজী আছি

কিনা। প্রত্যেকের থাওয়া-থাকা আর বেড়ানোর বাবদ সাড়ে তিনহাজার মালয়ান ডলার পড়বে। আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। মেজ মেয়ে আর ছোট ছেলে আমাদের জাপান দেখবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করল। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে সাইম ডারবির কোয়ালালামপুরের অফিসে ফোন করতে হ'ল। এইসব ফোন 'টোল কল' বলে' ধরা হয়। নিজেরাই তাদের ফোন করা যায়, কারও সাহায্যের দরকার হয় না। তারা জানালে যে, তারা প্রথমে থাইলাণ্ডের ব্যাঙ্কক সহর, তারপর হংকং, তারপর থাইওয়াদ (ফরমোসা) ও শেষ কালে জাপানের কয়েকটী বিখ্যাত জায়গা ঘুরিয়ে আমায় হংকং-এ চার'দিন ঘোরাবে। তারপর থাইলাণ্ডের রাজধানী হয়ে কোয়ালামপুরে ফিরবে। সমস্ত ভ্রমণটাই হবে ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ার ওয়েজের মাধ্যমে।

আমার ডিসপেনসারীটী বন্ধ করে দিয়ে তার পর-দিনই আমাদের কোয়ালালামপুরে যেতে হ'ল। টাকা দিয়ে দুটী সিট বুক করে আমরা ভারতীয় হাইকমি-শনারের অফিসে গেলাম। ফরমোসাকে ভারত কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি, সে-জন্যে ভারতের পাশপোর্ট ওখানে অচল। তারা বোধ হয় আমাদের ওখানে ঘুরতে দেবে না। যাই হোক ওখানকার প্রথম সেক্রেটারী দশ টাকার ষ্ট্যাম্প্ মেরে একটা কাগজ আমাদের দিলেন। তাতে লেখা ছিল যে, আমরা যদি ফরমোসাতে যাই তাতে ভারতের কোন আপত্তি নেই। সাইম ডারবি অফিস থেকে জানাল যে, আমরা ফরমোসায় বেড়াতে পারব। ওখানে আমাদের টুরের দলটি তিনদিন ধরে থাওয়া-দাওয়া করবে আর ওদের নাচগান দেখবে।

আমরা ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের দু' তারিখে প্লেনে চড়ে বসলাম। এর মধ্যে আমাদের পাশপোর্টে মালয় গভর্ণমেন্ট থেকে রি-এনট্রির ছাপ মেরে নিতে হয়েছিল। আমরা একবছর বাইরে থাকতে পারব। কিন্তু এর মধ্যে মালয়ে না ফিরে এলে জীবনে আমরা আর মালয়দেশে ঢুকে ব্যবসা করতে বা থাকতে পারব না। ছেলেমেয়েরা আমাকে কোয়ালালামপুর বিমান বন্দরে এসে বিদায় জানাল। আমার এক চৈনিক বন্ধু মিঃ ইয়াপ চান্ নাম্ (Yap Chan Nam) আমার গাড়ী করে আমাদের পৌছে দিয়ে গেল। ও ছিল আমার মালয় দেশের একটি অকৃত্রিম বন্ধু। আজও আমায় সে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। আমিও প্রত্যুত্তর দিয়ে চিঠি দিই।

আমরা কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যাঙ্কক আন্তর্জ্জাতিক বিমান বন্দরে নেমে পড়লাম। পাশপোর্ট দেখান ও অন্যান্য কাজ সেরে আমরা বাইরে যেতেই টুর অফিসের একজন এজেন্ট আমাদের একটা বাসে করে সহরে নিয়ে এলেন। আমাদের দলটির মধ্যে সকলেই চীনদেশীয় লোক ছিলেন, শুধু আমরা দুজন ভারতীয়। আমার বন্ধুটি—যিনি আমাকে জাপানে যাবার জন্যে বলেছিলেন, কোন কারণ বশতঃ যেতে পারেননি। মিঃ চেং চলেছেন তাঁর দুই বৌ আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ছেলেটির বয়স বাইশ বছর আর মেয়েটির বয়স প্রায় আঠার বছর হবে। তাঁর প্রথম পক্ষের বৌ-পঁয়তাল্লিশের ওপর আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌটি হবেন একজন অষ্টাদশী যুবতী। তিনি তাঁর ছোট বৌ-এর সঙ্গ মোটেই ছাড়ছেন না। ছোট বৌ একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন তাঁর প্রৌঢ় স্বামীর ব্যবহারে। কিন্তু স্বামীটি লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে বাসে এসে তাঁর যুবতী বৌটির পাশে গিয়ে বসে তাঁকে জড়িয়ে বসলেন। বড় বৌ ও ছেলেমেয়েরা বাবার এই প্রেমিকসুলভ অবস্থা দেখে আড়চোখে মাঝে মাঝে চেয়ে লজ্জায় মনমরা হয়ে যাচ্ছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্যেরাও নিজেরা নিজেদের গা টেপাটেপি করছেন। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে পড়ে গিয়ে না পারি কারও সঙ্গে কথা কইতে আর না পারি তাঁদের দেখে হাসতে। আমরা নিজেদের মধ্যে অন্য কথা পাড়ি আর ব্যাঙ্ককের রাজপথের দুধারের সরু-সরু খালের দৃশ্য দেখতে-দেখতে চলি। ব্যাঙ্ককের দেখার মধ্যে আমাদের আর নতুন কিছু নেই কারণ এই পথ দিয়ে বার আষ্টেকের বেশী আমরা যাতায়াত করেছি। অন্যদের হাসিঠাট্টা

আমাদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি তাঁদের এই হাসি-ঠাট্টা আর রঙ্গরসযুক্ত কথাবার্তা সবই সেই মিঃ চেং আর তাঁর যুবতী স্ত্রীটিকে নিয়ে। আমরা কিন্তু মনে মনে মিঃ চেং-এর তারিফ করে চলেছি। এই বাজারে দুটো বৌ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে জাপান ভ্রমণে বেরিয়েছেন বলে। বলিহারী বুকের পাটা। ভাবছি একজন বৌকে নিয়েই তার তদ্বির করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে চলেছে আর দুটো বউ নিয়ে তিনি চলেছেন। ভদ্রলোক যে খুব সাহসী তা আমরা টের পেয়েছিলাম। আর বুঝতে পেয়েছিলাম যে অত লোকলজ্জার ভয় তাঁর নেই। তিনি তাঁর বিয়ে করা বউকে নিয়ে যাচ্ছেন, এতে লোকের বলবার কি আর আছে?

আমরা ব্যাঙ্ককের একটা বড় হোটেলে গিয়ে পৌছলাম। মিঃ চেং তাঁর যুবতী স্ত্রীটিকে নিয়ে একটা ঘরে সরাসরি ঢুকলেন। আর অন্যরাও যে-যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বেচারী প্রৌঢ়া পত্নীটি তাঁর মেয়েকে নিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকলেন। যুবতী স্ত্রীটি যদিও লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছিলেন তথাপি তাঁর স্বামীর প্রেমে তিনি বেশ গর্ব্বিতা হয়েছেন বলে মনে হ'ল। আমরা এখানে একরাত্রি থেকে পরদিন একটি বড় জেট প্লেনে করে হংকং অভিমুখে যাত্রা করলাম। এতবড় বিমানে আমরা এই প্রথম উঠলাম। কোয়ালা-লামপুর বিমানবন্দর থেকে ব্যাঙ্ককের দূরত্ব ছিল ১২৪০ কিলোমিটার বা ৭৭০ মাইল। কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকে হংকংএর দূরত্ব হচ্ছে ১৮৭৫ কিলোমিটার বা ১৪৭০ মাইল। তাই হংকং যেতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল।

আমাদের বিমানটি থাইলাণ্ডের ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। এদিককার প্রায় সমস্ত জমিটাই সমতল। এদিকে কোন পাহাড় দেখতে পেলাম না। মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি সরু নদী পার হয়ে আমরা ইন্দোচীন সীমান্তে এসে পৌছলাম। বিমানের ঘোষক তা আমাদের জানিয়ে দিলেন।

ইন্দোচীনের সীমান্ত পার হতেই বেশ কিছু সময় আমাদের বিমানটিকে কতকগুলি পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হ'ল। বিমানটি নীচে দিয়ে চলেছে। খোলাচোখে বেশ দেখতে লাগলাম। লাল মাটীর রাঙা পথগুলো সেই পাহাড়ের ধারে-ধারে এঁকেবেঁকে চলেছে। পাহাড়ের নীচে সমতল জমিতে কতকগুলি সরু-সরু নদীর ওপর নৌকা ভাসতে দেখলাম। এদিকটায় কোন গ্রাম বা সহর আমাদের চোখে পড়ল না। আমাদের সঙ্গে বিমান কোম্পানীর দেওয়া পথের নক্সাও রয়েছে। নক্সাটী দেখে-দেখে আমাদের গন্তব্য পথটির হদিস পেয়ে যাচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট্ট গ্রামের ওপর দিয়ে আমাদের বিমানটি নীল সমুদ্রের ওপর আকাশে ভাসতে লাগল। নক্সা দেখে বুঝতে পারলাম আমরা দক্ষিণ-ইন্দোচীনের ওপর দিয়ে এসে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের আকাশের ওপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে চলেছি। মন আনন্দে নেচে উঠল। আমরা আমাদের ছোটবেলাকার স্বপ্নের জাপান দেখতে চলেছি। আমার স্ত্রী চীনদেশের অনেক গল্প অনেক ভ্রমণকাহিনী বইতে পড়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন "আমরা সত্যিই চীন সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। কি চমৎকার না? ভাগ্যিস তোমাকে জোর করে নিয়ে এলাম, তা না হলে ত আর চীন সমুদ্রের দৃশ্য দেখা তোমার ভাগ্যে ঘটে উঠত না। শুধু পয়সাই জমিয়ে চলেছ, কিছুটা খরচ করে একটু আনন্দ করা উচিত বলেই আমি মনে করি।"

"চীন সমুদ্রে ত স্নান করনি? আমি কিন্তু স্নান করেছি।"

"ওঃ তুমি একবার যুদ্ধের সময় শ্যামদেশের Songkhla (Sengora)তে এসেছিলে। প্রবাসীতে তোমার লেখা "সেংগোরায়" পথে পড়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে।" বলে তিনি চীনসমুদ্রের দৃশ্য ওপর থেকে দেখতে লাগলেন।

"ওপর থেকে তুমি চীন সমুদ্রকে এত শান্ত দেখছ, জাহাজে করে গেলে এর রুদ্র মূর্ত্তিটী একবার দেখতে পেতে। জাহাজে উঠলেই আমাদের sea sickness-এর কবলে পড়তে হয় তাই বিমানপথে আসা। তা না হলে

জাহাজে করে এলে তোমার কিন্তু খুব ভাল লাগত।" আমি তাঁকে বললাম। "এবার বিমানে যাচ্ছি। পরের বারে আমরা জাহাজে করে আসব। কি বল ?" আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। "তা আসা যাবে এ আর কি ?" বলে ম্যাপটা দেখতে আরম্ভ করি। "তুমি আবার এদিকে আসবে বলে আমি আশা করতে পারি ? আমার ত মনে হয় না যে, আমরা আবার বেড়াতে বেরুব।"

"মনে কচ্ছি পৃথিবী ভ্রমণে একবার বের হব।" বলে চুপ করে থাকি। তিনি আমার কথা শুনে হাসতে থাকেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল যে তিনি আমায় মোটেই বিশ্বাস করতে চান না। আমাদের বাঁদিকের সীটে মিঃ চেং আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ বসে বসে কি খাচ্ছেন দেখতে পেলাম। মিস্টার নিজের হাত দিয়ে বৌকে জড়িয়ে ধরে একটা তার মুখে গুঁজে দিলেন। ওঁদের দিকে তখন অনেকের লক্ষ্য পড়েছে। সকলেই হাসতে সুরু করেছে। ওঁরা বাইরের লোকের হাসি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না। পেছনের আসনে বড় বৌ আর বড় মেয়ে রয়েছেন। তাঁদের মুখগুলো লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভদ্রমহিলা আর সহ্য করতে না পেরে চীনাভাষায় কি একটা বলতে মিঃ চেং পেছন দিকে বড়-বৌকে কি একটা কথা বলে ছোট বৌয়ের গা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। মনে হয় বড়বৌ কর্তাকে বেশ বকে দিয়েছেন।

আমাদের বিমানে চা কফি কেক সরবরাহ করছে দেখলাম। সকলেই এখন আহারে ব্যস্ত। আমাদেরও কফি কেক আর স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল। আমরাও খেতে খেতে নিচের দিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। ধারের আসনটা আমার স্ত্রী প্রথম থেকে অধিকার করে বসে রয়েছেন। একবারও তিনি আমায় বসবার জন্যে অনুরোধ করছেন না। আমি আমার ঘাড়টা বকের মত উঁচু করে বাইরের জগৎ দেখছি। দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখা গেল। আমরা হাইনান দ্বীপটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি তা ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলাম। এ জায়গা থেকে হংকং আর বেশীদূরে নয়। সূর্য্যের তেজ এখন খুব প্রখর, আমার স্ত্রী এখনও সেই রৌদ্রের মাঝে প্রকৃতির বিরাটত্ব দেখতে দেখতে চলেছেন। আমি একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে বসে পড়ছি। মাঝে মাঝে মিঃ আর মিসেসের হাসিঠাট্টা আমাদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান বন্দরে এসে নেমে পড়লাম। হংকংএ আসতে হলে এই বিমান বন্দরেই নামতে হয়। এটার নাম কাই টাক বিমানবন্দর। এই বিমান বন্দরটার বিমান ওঠানামার পথটা (রানওয়ে) সমুদ্রের ওপরই গঠিত হয়েছে। এখানে বিমান অবতরণ করতে একটু ভুল হলেই যাত্রীশুদ্ধ বিমানটা একেবারে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। আমাদের এখানে আসবার দুদিন পরে এই রকম একটা দুর্ঘটনায় অনেক যাত্রী মারা যান। এই বিমানবন্দরটা মূল চীনাভূখণ্ডের একটা অংশে স্থাপিত হয়েছে। এই জায়গাটার নাম কাউলুন। রাত্রির কাইটাক বিমানবন্দরটা দেখতে এত সুন্দর হয়ে ওঠে তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। আমরা একদিন এই সুন্দর দৃশ্য দেখে এসেছিলাম। রাত্রে সারা সহর আর বিমানবন্দরটা আলোর মালায় যখন সজ্জিত হয় তখন তাকে আর যেন চেনা যায় না।

এখানে আমাদের থাকবার জন্যে টুরিষ্ট অফিসের লোকেরা সান-ইয়া হোটেলটা বন্দোবস্ত করেছিল। ঐ অফিস থেকে একজন ভদ্রলোক বিমানবন্দর থেকে আমাদের ঐ হোটেলে নিয়ে তুললেন। এখানে দু'রাত্রি থাকার পর আমাদের ফরমোসাতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তিনরাত্রি থেকে ফরমোসার দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখবো আর তারপর ওখানকার আদিবাসীদের নাচগান দেখে আমরা জাপানের ওসাকাতে চলে যাব। তাই ওয়ানে (ফরমোসা) থাকবার আর খাবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। হংকং এই সময়ে খুব গরম। বাইরে পা দিতে পারা যায় না। রৌদ্রের তেজ এত প্রখর যে গা যেন পুড়িয়ে দিয়ে যায়। সমস্ত হোটেলটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, তাই হোটেলের মধ্যে ঢুকলেই দেহ-মন শান্তিতে ভরে যায়। আমাদের ঘরটা চারতলাতে। তাই সবসময়ে লিফটেই ওঠানামা করতে হ'ত। অল্পবয়স্ক যুবতী

মেয়েরা রাতদিন লিফট্ চালায়। প্রত্যেকের আট ঘণ্টার ওপর ডিউটী দেওয়া আছে। হোটেলটীতে এত যাত্রীর ভীড় যে লিফটের মেয়েরা এক মিনিটও বিশ্রাম নিতে পারে না। অনবরত তাদের ওঠানামা করতে হয়। সবসময় তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিফট চালাতে হয় দেখলাম। দুপুর বেলায় খাওয়ার পর আমরা এদিক ওদিক একটু ঘুরতাম আর না হয় ফেরী জাহাজের একটী টিকিট কাটিয়ে হংকং দ্বীপটীতে চলে যেতাম। সেখানে গিয়ে পার্বত্য রেলে করে পাহাড়ের মাথায় উঠে কাউলুন সহর বসে বসে দেখতাম। এই দুটোদিন আমরা নিজের ইচ্ছায় ঘোরাফেরা করব। টুরিষ্ট কোম্পানী এর জন্যে আমাদের কোন খরচ দেবে না। তবে জাপান দেখে ফেরবার পথে আমাদের এখানে চারদিন রেখে এখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থান তারাই দেখাবে ও যাবতীয় খরচ তারাই বহন করবে বলে দিয়েছে। দুপুর বেলায় খুব বেশী ভীড় নেই, তাই আমরা নিজেরাই একটা ম্যাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আবার ম্যাপ দেখে দেখে হোটেলে ফিরে আসতাম। লিফটের একটী যুবতী মেয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েগিয়েছিল। ওর কাছ থেকেই শুনতে পেলাম যে তার বাবা মা তাদের নিয়ে চীনদেশ থেকে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছেন। সে এখানকার স্কুলে কিছুদিন লেখা-পড়া করেছিল তার জন্যেই সে এখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। সহরের এককোণে পাহাড়ের মাথায় একটা টিনের ঝুপড়ি তৈরী করে সেখানে তারা সকলে বাস করে। অনেক অনুনয় বিনয় করতে এই হোটেলের মালিক এখানে ওকে চাকরী দিয়েছে। ছোট ভাই গুলো এ-ওর বাড়ীতে কাজ করে কিছু পায়, তাতেই তাদের সংসার চলে যায়। এখানে সব লোকেই কম বেতন পায়, সেই জন্যে কাজের পর তাদের আবার অন্য কাজ করতে হয়। সেও বাড়ী গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অন্য একটা কাজ করতে যায়।

আমরা নিজে-নিজেই হংকং আর কাউলুনের অনেক অংশ দেখে নিলাম। মুভিফিল্ম দিয়ে অনেক ফটো তুললাম। স্টিল ক্যামেরাটী এখানে এসেই বিগড়ে গেল। তাকে হংকং এর দশ ডলার দিয়ে সারানো হ'ল, তবে তাকে নিয়ে অনেক কাজ করতে পেরেছিলাম। অনেকগুলি মুভিফিল্ম এখান থেকে কিনে নিলাম। মালয়ে শুনেছিলাম যে এখানে ফিল্মের দাম খুব কম কিন্তু দেখা গেল সব জায়গাতেই ফিল্মের দাম একই। গিন্নীর মুখ ভার। শুধু ফিল্ম কিনে কিনেই ফরেণ কারেন্সী নষ্ট করে ফেলছি। তাঁর জন্যে আমি কোন জিনিষই কিনছি না। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তাঁর মুখভাবের পরিবর্তন হয়ে গেছে। পূর্বাকাশে ঘন কৃষ্ণ বর্ণের মেঘের মত তাঁর মুখের পরিবর্তন দেখতে পেলাম। এখনি বোধহয় বৃষ্টি আসতে পারে। বৃষ্টি থামাবার জন্যে কি চাই তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটী ভাল দামী সুটকেশ চাই তাঁর। কিনে দেওয়া হ'ল। আমি বুঝিয়েছিলাম যে, আসবার পথে কিনে নিয়ে একেবারে বাড়ী ফিরব। তিনি আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। ফিল্ম কিনে কিনে টাকাগুলো অযথা নষ্ট করে ফেলছি। ফটো একটীও ভাল হবে না এটাই তাঁর অভিযোগ। যাই হোক তাঁর কথা আমি শুনিনি বলেই তিনি আমাদের জাপান-ভ্রমণ সিনেমা সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেকে আজ জাহির করতে পারছেন। ছবিটী দেখতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগে। সত্যই ছবিটী ভাল হয়েছে আর আমাদের জাপানে ভ্রমণের স্মৃতিটা এর মাধ্যমে আমরা মাঝে মাঝে পাই দেখতে।

মিস্টার আর যুবতী মিসেস্টী দুজনে বাইরে থেকে ঘুরে এলেন। অন্য স্বামীটী তাঁর ছেলেমেয়ের সঙ্গেই ঘুরতে বেরিয়েছেন। অন্যেরা যে যার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। এখানে অনেকের আত্মীয় স্বজন খাস চীন থেকে পালিয়ে এসে বাসা বেঁধে রয়েছে। মালয় দেশে আর কাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমরা ১৯৫১ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। ১৯৫৩ সালের শেষাশেষি আইন করে সে দেশে ঢোকা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

দুদিন হোটেলে বেশ ভাল ভাবে খেয়ে থেকে কেটে গেল। দুদিন পরে কাইটাক বিমানবন্দরে বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমাদের টুরিষ্ট বন্ধুরা সকলেই ফরমোসাতে চলে গেলেন কিন্তু আমাদের দুজনের যাওয়া আটকে গেল। কারণ ফরমোসাতে ভারতীয়দের ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে বিমান-বন্দরের অফিসার আমাদের জানিয়ে দিলেন। আমাদের হোটেলে ফিরে যেতে হল। সাইম ডারবি কোম্পানির লেখক একটা পত্র আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে যদি আমাদের ফরমোসাতে না যেতে দেয় তাহলে যেন ওসাকাতে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্লেনটার আসন সবই সংরক্ষিত ছিল। প্রথম শ্রেণীরও সব ভর্তি। তাই আমাদের সান-ইয়া হোটেলেই আবার ফিরে যেতে হ'ল। আমার স্ত্রী আমাকেই দোষারোপ করলেন "কি ভাগ্যই তুমি করেছিলে যার জন্যে প্রতি পদেই আমরা বাধা পাই। সকলে কেমন আনন্দ করে চলে গেল আর আমরা এখানে বন্ধু বান্ধব-হীন হয়ে পড়ে রইলাম।" দুদিন পরে ওসাকাগামী বিমানে আমাদের চাপিয়ে দেওয়া হবে। হোটেলে গিয়ে শুনলাম যে, আমাদের দুদিনের হোটেলের সব খরচ দিতে হবে। আমরা তখনই তেত্রিশটা মালয় ডলার খরচ করে সাইম ডারবি কোম্পানিকে কোয়ালালামপুরে টেলিগ্রাম পাঠালাম। প্রত্যুত্তরে নির্দেশ পেলাম যে আমাদের সমস্ত খরচ ক্যাথে প্যাসিফিক কোম্পানী দিতে বাধ্য। আমি সেখান থেকে ওদের কাউলুন (Kowloon) অফিসে ধর্ণা দিলাম। স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তাঁরা জানালেন সেখানকার অফিসের কিছু হাত নেই। হংকং এর প্রধান অফিসটা এবিষয়ের কিছু করণীয় থাকলে তা করবেন। তিনি হংকংএ ফোন করে তাঁদের টেলিগ্রামের বিষয়টা জানাতে আমাদের সেখানে যেতে বলা হলো।

হংকংএ পানীয় জল অপ্রচুর চীন দেশ থেকে আনানো হয়। তাই যেখানে সেখানে জল পাওয়া যায় না। বাইরে কোকাকোলা ওঅন্যান্য পানীয় রয়েছে, চারগুণ তার দাম। একটা কোকাকোলা কিনে দুজনে ভাগ করে খেলাম। ডলার কমে আসছে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। মালয় থেকে ডলার আনানো যায় না। মালয় সরকারের অনুমতি থাকা দরকার। দুঘণ্টা পরে ওদের অফিসের নীচে স্ত্রীকে বসিয়ে ওদের বড় কর্তার কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আমাকে বোঝালেন যে, এখন ওসাকাগামী প্লেন নেই, দুদিন পরে থাকে। আসছে কাল তাদের প্লেন টোকিও যাচ্ছে। তাতে আমাদের আসন তিনি দিতে পারবেন না। খরচ বেশী পড়ে যাচ্ছে। আমি টেলি-গ্রামটা দেখালাম। তিনি পড়ে বললেন যে তা হয় না। আমরা কিছুই দিতে পারব না। তখন আমি বললাম যে আমাদের হাতে বেশী ডলার নেই। যদি তিনি রাজী না হন তাহলে আমাদের যেন মালয় ফিরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। আমরা মালয়ে ফিরে যেতে চাই। এই কথা বলা মাত্র ভদ্রলোক আমাদের পরদিনই টোকিও যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে দেন। টোকিও থেকে ওসাকারও বিমানের আসন টেলি মেসেজ করে বন্দোবস্ত করে দিলেন। আর হোটেলের খরচার জন্যে একটা স্লিপ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "আপনি এবার যেতে পারেন", খুব তেষ্টা পেয়েছিল। "একটু জল পেলে খুব ভাল হয়।" বলতেই যেন ঘরে বোমা ফাটল। ভদ্রলোক মুখের ওপরই বলে দিলেন—এখানে জল পাওয়া যায় না। আপনি আপনার টিকিট নিয়ে হোটেলে যান। পরের দিন আমাদের বাস এসে বিমান বন্দরে সকাল ১০টায় আপনাদের নিয়ে যাবে। আপনারা যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন।" এরকম অসদ্ব্যবহার আমি কোন জায়গাতেই পাইনি। দোষ হয়েছে দুজনেরই ক্যাথে প্যাসিফিক আর সাইম ডারবি কোম্পানীর মাঝখান থেকে আমরাই খাদে পড়েছিলাম। পরে বাড়ী ফিরে এসে তাদের আমি বেশ কয়েকটা কড়া কথা চিঠিতে লিখে ছেড়েছিলাম ও টেলিগ্রামের ৩৩টা ডলারের বিলও পাঠিয়ে ছিলাম। তাঁরা আমার সমস্ত টাকার একটা চেক দিয়ে আমার কাছে মাপ চেয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলের ম্যানেজারের মুখে কোনদিন বোধহয় হাসি ফোটেনি। আমাদের দেখে মুখটা গোমড়া করে এক কোণে বসে রইলেন। তাঁর সহকারীটাই মালয়ে আমাদের টেলিগ্রাম করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সবকিছু জিজ্ঞেসা করলেন। তারপর হোটেলের সব খরচের দায়িত্ব যে ক্যাথে প্যাসিফিক নিয়েছে তার চিঠিটা ম্যানেজারের সামনে ধরতেই তাঁর মুখে হাসি ফুটতে দেখা গেল। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হেসে কথা কইলেন। আমি এ সুযোগ ছাড়লাম না। ওঁকে বললাম যে মালয়ের ডাক্তারেরা কেউ ভিখারী নন। তাঁরা দস্তুরমত রোজগার করে থাকেন। এখানে বেশী ডলার আনবার কোন অনুমতি ছিল না বলেই আমরা বিপদে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি জানতেন যে, মালয়ের ডাক্তারদের যথেষ্ট পয়সা আছে।

পরদিন ব্রেকফাষ্টের পর বেহারাদের বকশিস্ দিয়ে আমরা দশটার কিছু পূর্ব্বেই সব গোছগাছ করে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ঠিক দশটার সময় ক্যাথে প্যাসিফিকের বাস এসে আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে গেল। আমরা টোকিওগামী প্লেনে ওঠবার জন্যে লাউঞ্জে বসে রইলাম। জাপানে যে সব ভদ্রলোক চলেছেন তাঁরা সকলেই এখানকার সরকার চালিত একটা দোকান থেকে হুইস্কি সিগারেট ও তামাকের টিন কিনে নিচ্ছেন দেখলাম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে কিনে নিতে পরামর্শ দিলেন। জাপানের হোটেলে এই সব জিনিষের মূল্য দুগুনের বেশী। সেখানে যে কেউ ঐ দামে কিনে নেবে। তাই সেই দোকানটাতে এত ভীড়। এটী একটী custom free shop, প্রত্যেক বিমান বন্দরেই থাকে। বিমানবন্দর ছাড়বার পূর্ব্বেই শুধু কেনা যায়। তার পূর্ব্বে নয়। পরে আমি যখন বিমানে করে অন্যান্য দেশ বিদেশে ঘুরেছি তখন আমরা ঐসব দোকান থেকে শুধু চকোলেট কিনে নিয়ে প্লেনে উঠতাম। কারণ মদ ও সিগারেট কিনে নিয়ে অন্যদেশে বিক্রি করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

হংকং থেকে বা অন্যদেশ থেকে জাপানে প্রত্যেক টুরিষ্ট৬০টা সিগার বা ২০০ শত সিগারেট, ছয় বোতল হুইস্কি বা অন্যান্য সোমরস, একটী ক্যামেরা একসেট গলফ ক্লাবস্ (golf clubs) কিংবা দু-ডজন গলফ বল সঙ্গে নিতে পারে। কাষ্টমস্ এর জন্যে কোন চার্জ্জ করে না। ভারতে ২০০টা সিগারেট বা ৫০টা সিগার ও আধ বোতল হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি শুধু আনা যায়। ক্যামেরা আনলেই ট্যাক্সের আওতায় পড়তে হবে।

আমাদের ডাক আসতেই আমরা প্লেনে গিয়ে উঠে বসলাম। অন্যেরা যে যার বড় বড় কাগজের হাতব্যাগের মধ্যে তাঁদের মদের বোতল সিগারেট হাতে ঝুলিয়ে প্লেনে উঠে এলেন। তারা সকলেই টোকিওতে নেমে যাবেন তারপর যে যার হোটেলে বা বাড়ীতে চলে যাবেন। আমরা টোকিওতে নেমে পরের প্লেনেই আমাদের ওসাকাতে যেতে হবে। তারপর ওদের লোক যদি থাকে তাহলে ভয় নেই আর তা না হলে আমাদেরই হোটেলে খুঁজতে হবে। আমাদের কাছে ওদের কোম্পানীর দেওয়া Itinery একটা রয়েছে। তাতে লেখা আছে ওসাকাতে পৌছে আগামী কাল থেকে ওসাকা হোটেলে আমাদের থাকতে হবে। যাই হোক ভগবানের নাম নিয়ে আমরা চলেছি। ওদের হোটেলে একটা টেলিগ্রাম করতে ক্যাথে প্যাসিফিকের বড়কর্ত্তাকে বলে এসেছিলাম। জানি না হয়ত করে থাকবেন। এত অভদ্র মানুষ পৃথিবীতে থাকতে পারে? চীনা ভদ্রলোকটী ভারতকে ভাল চোখে দেখেন না বুঝতে পারলাম। কারণ গত বছর চিনি হিন্দি ভাই ভাই এর যুদ্ধ হয়ে গেল।

প্লেনটী ক্যাথে প্যাসিফিকের। কিছুক্ষণ পরেই কাইটাক বিমান বন্দরটী ত্যাগ করে শূন্যে ভাসতে ভাসতে উড়তে লাগল। নীচে সাগরের নীল জলের ওপর বড় বড় জাহাজ, চীনা জাঙ্ক ও ছোট ছোট অসংখ্য নৌকা ভাসছে দেখতে পেলাম। আমাদের বিমানটী ফরমোসাতে থেমে তবে টোকিও যাবে। কারণ এখানে অনেক যাত্রী নামা ওঠা করবেন। ফরমোসা হংকং থেকে ৮৫০

কিলোমিটার বা ৫৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের বিমানটী পূর্ব্বদক্ষিণে বেশ কিছুটা গিয়ে উত্তর দিকে উড়তে উড়তে চলল। দূরে চীন সমুদ্র দেশের তীরের সরলরেখা আমাদের চোখে পড়ল। অনেক জেলে ডিঙ্গি এদিক ওদিক যাতায়াত করচে দেখতে পেলাম। এর মধ্যে আমাদের লাঞ্চ দিয়ে গেল। আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা তাইপে বিমান বন্দরে (ফরমোসা) এসে পৌছালাম। বিমান বন্দরটা খুব'বড় নয়, মাঝারি গোছের। এদিকে কোন ফোটো তোলা যাবে না বলে সব জায়গায় লিখে রাখা হয়েছে। তবুও গোপনে আমি কয়েকটা ফোটো তুলে-ছিলাম। সেখানে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হ'ল। এখানেএক গ্লাস করে অরেঞ্জ-ক্রাস সকলকে পান করতে দিয়েছিল। পাশেই সুভেনিরের দোকান। ওদেশের চর্ম্মশিল্পের অনেক জিনিষ বিক্রয় হচ্ছে দেখ-লাম। আমার স্ত্রী দোকানে গিয়েই প্রায় তিন ডলারের সুভেনির কিনে ফেললেন। সেগুলি আমার দেখার আগেই তাঁর ব্যাগের মধ্যে তিনি পাচার করেফেললেন। আধঘণ্টা পরেই আমাদের প্লেনটা আবার ছাড়ল। নীচে গ্রাম, ধানের জমি, সরুসরু মেঠো রাস্তা সবদিকে ছড়িয়ে আছে। একটু দূরেই একটা বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে রয়েছে। তার নীচে দিয়ে সরু একটা নদী বয়ে চলেছে। আকাশে ঘন মেঘ দলে দলে ভাসছে। আমাদের প্লেনটা কোন ফাকে মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নীচে আর কোন কিছুই দেখা গেল না। শুধু মেঘ আর মেঘ। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে নীচে চেয়ে দেখলাম মেঘের জায়গা দখল করে রয়েছে চীন সমুদ্রের নীল জলরাশি। বুঝতে পারলাম যে আমরা তাই ওয়ান বা ফরমোসা অনেকক্ষণ ছেড়ে চলে এসেছি। আমরা এখন টোকিও অভিমুখে চলেছি। টোকিও ফরমোসা থেকে ৮৯০ কিলোমিটার বা ৫৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এবার আমাদের ঘড়িটা জাপানের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। এমনি করে আমাদের ঘড়িটা একবার শ্যাম দেশে আর একবার হংকংএ মিলিয়েছি। মালয় দেশের সময় এদেশের সময় থেকে অনেক তফাৎ। প্লেনে আমাদের চা কেক স্যানডউইচ দিয়ে গেল। আমরা দুজনে আরাম করে পেট ভরে খেয়ে নিলাম। বেলা এখন সাড়ে তিনটে, সাড়ে পাঁচটার সময় প্লেন টোকিওর বিমান-বন্দরে নামবে। সূর্য্যের তেজ এখন বেশ প্রখর। বাঁদিকের আসনগুলোর জানালাগুলোতে পর্দা ফেলে সূর্য্যের আলোটার আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম যে জাপানের কাগোসীমার একটু জমি দেখা গেছে। এত-ক্ষণ শুধু সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে-উড়ে আমাদের আর ভাল লাগছিল না।

দ্বীপ দেখা গেছে শুনতে পেয়ে সকলেই জানালার পর্দা-গুলো সরিয়ে ফেললেন। ষ্টুয়ার্ট এসে হাত তুলে দূরের এক টুকরো জমি দেখিয়ে বললেন যে ঐ জমিটাই কাগো-সীমার একটী অংশ। সকলেরই বেশউৎসাহ দেখা দিল। আমরা জাপানের মধ্যে এসে গেছি। এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই টোকিওর হানেডা বিমান-বন্দরে আমাদের বিমানটী অবতরণ করবে। আমরা আবার কিছুক্ষণ শুধু সাগরের ওপর দিয়েই উড়ে চললাম আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার স্টুয়ার্টটী এসে আমাদেব জানালেন যে দূরের যে পাহাড়টী মাথা উঁচু করে রয়েছে সেটীই হচ্ছে ফুজিয়ামা পর্ব্বত। দূর থেকে ফুজিকে দেখলাম। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে সেটী রয়েছে। ফুজিয়ামাকে জাপানিরা দেবতার পর্য্যায়ে ফেলেছে। ফুজির কয়েকটী ফটো নিলাম। মুভিতেও প্রায় পাঁচফিট ফটো তুললাম। এরপরই আমরা জাপানের ভূমির ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে ঠিক ৫-৩০ মিনিটে হানেডা বিমানবন্দরে নেমে পড়লাম।

বিমান বন্দরে নেমে পাশপোর্টের ওপর ওখানকার অফিসারের ছাপ নিয়ে কাষ্টমসের কাছে আসতে হ'ল। আমরা সেখানেই সার দিয়েদাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও পর্য্যন্ত আমাদের ব্যাগেজগুলো প্লেন থেকে এসে

পৌঁছেনি। সামনে একটা বড় প্ল্যাটফরম ঘুরেই চলেছে। আমাদের ব্যাগেজগুলো একটা ধারের গর্ত্তদিয়ে এসে তার ওপর ঘুরতে লাগল। ব্যাগেজগুলো আমরা তাড়াতাড়ি ধরে নিয়ে সেখান থেকে নামিয়ে সমতল জায়গায় রেখে দিলাম। ওদের কাষ্টমস্ অফিসার আমাদের বাক্সগুলো তন্নতন্ন করে দেখে ছেড়েদিলেন। আমাদের পাশপোর্টে একটা করে Taxfree slip এর এক টুকরো কাগজ তাঁরা এঁটে দিলেন। তারপর আমাদের উপদেশ দিয়ে দিলেন যে যে-কোন বড় দোকানে ২৫ ডলারের (আমেরিকান) সওদা করলে তারা কোন রকম তার ওপর ট্যাক্স আদায় করবে না। এখানকার সমস্ত দোকানে দামী ক্যামেরা, মুক্তো ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ওপর কোন ট্যাক্স লাগবে না যদি আমরা ঐ slipটা তাদের দেখাই। কিন্তু সস্তাদামে কিনে ওখানকার বাজারে বেচতে পারা যাবে না। দোকানদারেরা slip এর ওপর আমরা কি কি কিনেছি তা লিখে দিয়ে স্টাম্প মেরে দেবে। জাপান ত্যাগ করবার সময় এসব কেনা জিনিষ তাদের কাষ্টমস্ অফিসারকে দেখিয়ে তবে তারা আমাদের রেহাই দেবে।

আমরা ওখান থেকে সুটকেশ দুটো নিয়ে ওসাকার প্লেন কোথা ধরবো তা জিজ্ঞাসা করলাম। এখান থেকে ওদের Domestic এয়ারপোর্ট একটু দূরেই। সেখানে অফিসে গিয়ে আমাদের টিকিট দেখাতে অফিসের লোকটী আমাদের কিছু অনেক জাপানী ভাষায় উপদেশ দিয়ে আমাদের টিকিটের ওপর ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে একটা নম্বর দিয়ে দিলেন। এইখানে এত লোকের ভীড় যে রেলস্টেশনকেও হার মানায়। লোকে লাইন দিয়ে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোহার গেটগুলো পরপর সব বন্ধ রয়েছে। একটু দূরে সার সার প্লেন দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে রয়েছে। মনে হয় যেন এটা একটা প্লেনের কারখানা। এত প্লেন আমরা কোথাও দেখিনি। গেটের সামনে অনেকগুলি পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারাই সমস্ত জনসাধারণকে সাহায্য করছে। একটার পর একটা নম্বর দরজার ওপর দেখা দিচ্ছে। আমরা বার কয়েক চেষ্টা করলাম এগিয়ে যেতে কিন্তু পুলিশ সব সময়ে আমাদের নম্বর দেখে বাধা দেয়। বুঝতে পারি যে এখনও আমাদের প্লেনটী প্রস্তুত হয়নি।

ক্রমশঃ

(১৬৮ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ)

সহজ নহে। তবে ভারতবর্ষের মোট জাতীয় আয় যদি বার্ষিক ২০০০০ কোটি ধরা হয় আর সেই আয় যদি ৩০০ শত দিনের কার্য্য প্রসুত হয় বলিয়া হিসাব করা হয় তাহা হইলে একদিনের কার্য্যফল মূল্য ৬৬।৬৭ কোটি টাকা হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের একদিনের আয় হিসাব করিলে হয়ত ·৪।৫ কোটি টাকা হইতে পারে।

অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে যদি এক কোটি টাকাও ব্যয় হয় তাহা হইলে সেই জ্ঞাপন পদ্ধতি অতিরিক্ত ব্যয়-বহুল বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কাজকর্ম বন্ধ করিয়া সমগ্র প্রদেশের এক চতুর্থাংশ কর্মীও যদি বসিয়া থাকেন তাহা হইলে একদিনে পশ্চিম বঙ্গে এক কোটি টাকা প্রমাণ লোকসান হইতে পারে। ইহারও যদি এক চতুর্থাংশ লোকসান বলিয়া ধরা হয়, তাহাও একটা বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করিবার উপায় হিসাবে অমিতব্যয়ের চূড়ান্ত। অন্য উপায় অবলম্বন করার কথা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা ব্যতীত এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, আজ অবধি বহুবার কাজকর্ম বন্ধ করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার প্রসার, দুর্নীতিপরায়ণতার বিস্তার প্রভৃতি কোন কিছুরই অবসান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

চাউল পাওয়া—না পাওয়ার সমস্যা

সরকার জন-সাধারণের (অর্থাৎ সেই জন-সাধারণ যাহারা চাউল উৎপাদন করেন) নিকট হইতে নিজেদের (অর্থাৎ সরকারী) ধার্য্য মূল্যে ৫ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করিতে চাহেন। জনসাধারণ যাহাতে সরকারকে চাউল বিক্রয় না করিয়া উচ্চতর মূল্যে জন-সাধারণের মধ্যে চাউল-ক্রেতাদিগকে চাউল বিক্রয় না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সরকার পুলিস মোতায়েন করিয়া চাউল লইয়া যাতায়াত ও চাউল কেনা-বেচা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ চাউল আছে কিন্তু সরকার উচ্চমূল্য দিতে চাহিতেছেন না বলিয়া সেই চাউলের উৎপাদকগণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বিরুদ্ধ-ভাবে সাক্ষাৎ ভাবে ক্রেতাদিগের নিকট চাউল বিক্রয় চেষ্টা করিতেছে। ইহার কারণ মূল্য কম বেশীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার কম মূল্য দিয়া রেশন দোকান হইতে কম মূল্যে সেই চাউল রেশন হিসাবে বিক্রয় করিতেছেন। ইহাতে যাঁহারা রেশন পান তাঁহাদের কিছু লাভ হইতেছে। কিন্তু যাঁহাদের রেশন কার্ড নাই ও যাঁহারা ঐ কার্ড হইতে পাওনা চাউলের অধিক চাউল খাইয়া থাকেন তাঁহারা অনেক অধিক মূল্য দিয়া কালো বাজারের চাউল ক্রয় করিতেছেন। এবং কালো বাজার চলিতেছে পুলিস পাহারা থাকা সত্ত্বেও এবং সামাজিক কর্ম্মশক্তির বহু অপব্যয় করিয়া। অর্থাৎ কালো বাজার চালিত রাখিতে যে সকল লোক গোপনে চাউল পারাপার করিবার জন্য অনেক মেহনত করিয়া থাকে তাহাদিগের সকল পরিশ্রমের ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হওয়ার একটা মূল্য ধরিয়া লইতে হইবে। এবং সেই কারণে কালো বাজারের দর অধিক হইয়া থাকে। যতটা জানা যায় কালো বাজারের ক্রেতা ও রেশন কার্ডধারী ক্রেতাগণ অনেক সময় একই লোক। রেশন যাহা দেওয়া হয় তাহাতে পেট ভরে না বলিয়া বহু রেশন কার্ডধারী ক্রেতাই যাহা অতিরিক্ত প্রয়োজন সেই চাউল কালো বাজারে ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি সরকারী মূল্য ও রেশন দোকানের মূল্য বাড়ান হয় তাহা হইলে জনসাধারণের তরফ হইতে একটা মহা আপত্তি উঠিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। উপরন্তু এই রূপ করিলে গোপনে চাউল পারাপার করিবার সামাজিক প্রচেষ্টার পারিশ্রমিক, পুলিস পাহারা অতিরিক্ত খরচ প্রভৃতির প্রয়োজন হ্রাস হইবার ফলে সাধারণ ভাবে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি কালোবাজারের দরের তুলনায় অল্পই করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থাতে কিছু লোক কিছু চাউল অল্পমূল্যে পাইলেও বহু লোক অনেক চাউল কালো বাজারে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়। সরকারী

খবর সংগ্রাহকগণ বলিতে পারেন যে মোট কত চাউল কালো বাজারে বিক্রয় হয় এবং কতটাই বা রেশন দোকান হইতে বিক্রয় হয়। মূল্য কিছুটা বাড়াইলে কি অবস্থা হইবে তাহা যথাযথ-ভাবে বুঝিয়া লইয়া বিষয়টা বিচার করা যাইতে পারে।

এখন অবধি যাহা মাঝে মাঝে শুনা যায় তাহাতে মনে হয় যে সরকারী ক্রয়মূল্য অল্পকিছু বাড়ান হইবে, কিন্তু বিক্রয়মূল্য বাড়ান হইবে তাহার দ্বিগুণ। ইহা হইলে মনে হয় না যে চাউল ক্রয় যতটা বাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক তাহা হইবে, অর্থাৎ কৃষকদিগের সহিত কালো বাজারের মিতালি চলিতেই থাকিবে। কালো বাজার থাকিয়া যাইলে পুলিস পাহারা প্রভৃতি যেমন আছে তেমনি থাকিবে। তাহার খরচও জনসাধারণের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে। সুতরাং মনে হয় যে, সরকারী মূল্য এরূপভাবে বাড়াইতে হইবে যাহাতে কৃষকগণ নিজ ইচ্ছাতেই সরকারের নিকট চাউল বিক্রয় করিতে অগ্রসর হবেন। বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। এই কথাগুলি সহজ কথা। ইহা বুঝিতে সরকারী বিশেষজ্ঞদিগের কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নহে।

চীনের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

একটা সময় ছিল যখন চীন দেশের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য শুধু কম্যুনিজ্‌মের প্রসারের উপর নিবদ্ধ ছিল। সে কম্যুনিজ্‌ম আবার যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা ধরিয়া লইলে চলিত না। তাহা চীন দেশীয় অর্থাৎ মাওবাদ অনুগত কম্যুনিজ্‌ম হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে মাওবাদ রুশীয় কম্যুনিজ্‌মের সহিত কোনও সংঘাতে জড়িত হয় নাই বলিয়া মনে করা হয়। পরে কোনও সময় রুশের মতবাদ ও মাওৎসে তুঙ্গের মতবাদ পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, এবং যে কথাটা আরও বড় কথা, রুশের সহিত চীনের রাজ্যসীমানা লইয়া একটা কলহের আরম্ভ হয়। কলহটা পূর্ব্বের পুরাতন কলহই ছিল কিন্তু সেইটাই আবার পুনর্জাগ্রত হইয়া দেখা দেয়। চীনাগণ রুশ দেশকে চীনের শত্রু প্রচার করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় মতবাদের আদর্শগত পার্থক্য দেখাইবার আবশ্যকতা থাকিলে সুবিধা হয় বলিয়া মাওবাদের সহিত রুশ দেশের কম্যুনিজ্‌মের আদর্শগত প্রভেদগুলি জোরাল ভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করে। রুশ দেশের মতবাদ মার্কসবাদের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গঠিত ও সেই কারণে অশাস্ত্রীয়তা দোষদুষ্ট ইত্যাদি সমালোচনা চীনাদিগের রুশদেশ বিরুদ্ধতার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল। অর্থাৎ সীমানা লইয়া কলহটা আদর্শবাদের বৈপরীত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া আরও উৎকট রূপ ধারণ করিল। এই ভাবে ঝগড়াটা চলিতেছিল এবং দুই চারটি সামরিক সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছিল কখন কখন; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ কখনও লাগে নাই। ইহার কারণ ছিল রুশের সামরিক শক্তির আধিক্য। চীন সাহস করিয়া রুশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে নাই যেহেতু রুশের পারমাণবিক অস্ত্র আছে অত্যধিক এবং চীনের কোনও সমর্থক রাষ্ট্রও ছিল না যাহার সাহায্যে চীন রুশদেশকে যুদ্ধ করিয়া দাবাইয়া রাখিতে পারে। এই ভাবেই চলিতেছিল।

হঠাৎ নিকসন আমেরিকার তরফ হইতে চীনের সহিত গায়ে পড়িয়া বন্ধুত্ব স্থাপন চেষ্টা করিলেন। চীন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল ও সেই বন্ধুত্ব যাহাতে আরও জোরাল হয় সেই চেষ্টাতে আত্মনিয়োগ করিল। কম্যুনিজ্‌ম ও মাওবাদ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কারণে দেরাজে বন্ধ রহিল। আমেরিকা রুশের শত্রু এবং তাহার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার রুশের তুলনায় পূর্ণতর। আমেরিকা যদি চীনের সমর্থক হয় তাহা হইলে চীন রুশ দেশকে আর পরোয়া করিবে না, বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই প্রকার। ইহার গতি কোন্ মুখে যাইবে তাহাই সকলে চিন্তা করিতেছেন।

"ভালো মন্দ সব ভেদ করি—

দেখিনি সম্পূর্ণ মানুষেরে।"

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"মা'র কাছে কী করেছি দোষ। ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস-দাসী সৈন্য-প্রজা ল'য়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন'এ ত্রিপুরার মহারানী গুণবতীর মুখে এই কথা বলেছেন।

মহারানী, মহাধনী, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, অনেকেরই এইরূপ একটি শিশুর জন্যে জীবনের সব সুখ-শান্তি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা কবির এই শান্তিনিকেতনে বসেই চোখের সামনে দেখেছি কবির পরিবারেই এইরূপ 'তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ লালসিয়া' কয়েকজন স্নেহময়ী নারী ছিলেন। তাঁদের সকলেই আশ্রমের শিশুদের সন্তানের ন্যায় গ্রহণ করেছেন। মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-নির্ঝরে অভিষিক্ত হয়ে, মাতৃবিরহে কাতর শিশুগুলি পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

আমরা দেখেছি—কারো কারো অফুরন্ত মাতৃস্নেহ সেখানেও শেষ না হয়ে পশু-পাখী, কুকুর-বেড়াল, হরিণ-ময়ুর প্রভৃতি অসহায় প্রাণীদের ওপর অঝোর ধারে বর্ষিত হয়েছে।

এইরূপ এক স্নেহ-পরিষিক্ত হরিণ-শিশুর অন্তর্ধানে 'পলাতকা'র কবিতা এবং 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থ, আমাদের চোখের সামনেই লেখা হলো, ছাপা হলো এবং সেই কবিতা আমরা কবি ও কবির নাতি দিনেন্দ্রনাথের ক্লাসে বসে পড়লাম।

প্রায় ষাট বছর পরে বৃদ্ধ বয়সে তা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

শান্তিনিকেতনে আজও এইরূপ বহু নারী সব পেয়েও একটি সন্তানের অভাবে যেন অশান্ত এক রিক্ত জীবন যাপন করছেন।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যা সত্য, সমস্ত দেশ সম্বন্ধে, সমস্ত মানবজাতি সম্বন্ধেও তা সত্য! অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কেউ কেউ সন্তানই চান না। তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়।

পাখী, কাঠবেড়াল, বেড়াল, কুকুর পোষা ত সর্বত্র দেখছি।

এঁরা যে সকলেই নিঃসন্তান তাও নয়। সন্তানবতী বহু নারী এবং বহু সন্তানের জনক পুরুষও জীবজন্তু পুষে থাকেন। তাদেরও সন্তানের মত স্নেহ করেন, তাদের মৃত্যু অনেকেরি কাছে সন্তানের মৃত্যুর মত নিদারুণ বেদনাদায়ক।

ছেলেবেলায় কুকুরবাচ্চা ভালবাসে না এমন শিশু দুর্লভ। পল্লীগ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হয়েও আমি কুকুরবাচ্চা কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকেছি এবং মা, বাবা, মাসী, পিসির তাড়া খেয়ে সজল চোখে তাদের বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসেছি, তারপর স্নান করে শুদ্ধ হয়েছি।

কেন জানি না, যৌবনে সেই আমিই কুকুরকে ভালবাসি নি—সুতরাং কুকুর পুষি নি। কুকুরকে যাঁরা

স্নেহভরে সন্তানের মত অতি যত্নে লালন-পালন করছেন—তাঁদের দিকে চেয়ে হেসেছি।

"মা! ওকে কুকুর বোলো না"—নিঃসন্তান পরম স্নেহাস্পদ ঘনিষ্ঠা এক আত্মীয়ার—তার মাকে বলা এই কথা শুনে পরিহাস করেছি।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস—সেই আমিই এক-দিন কুকুরকে নিজ সন্তানের মত স্নেহে করতে লাগলাম।

পুত্রের আনা দুটি পাহাড়ী কুকুরের বাচ্চাকে প্রথমে বিরক্তির সঙ্গে গ্রহণ করা, পরে পুত্র-কন্যাবৎ পালন করা এই আমারই অদৃষ্টে ঘটলো।

রাজর্ষি ভরতের মতই সামান্য গৃহস্থ এই আমি মূক প্রাণীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। অবশেষে তাদের অকালমৃত্যুতে নিদারুণ শোকে কাতর হলাম।

এই শোকে সান্ত্বনালাভ করতে দীর্ঘকাল গেল। এখনও বুকের মধ্যে তাদের সেই বিয়োগ ব্যথা নীরবে বহন করছি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ, শোকের ক্ষতে এক অপূর্ব প্রলেপের কাজ করে।

প্রত্যেকের হৃদয়ে কবির কবিতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়।

শোকের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে—এমনই একটি কবিতা পেলাম—যা পূর্বে দেখেও দেখিনি—অথবা হৃদয়ে আমার তা তখন কোনো সাড়া জাগায় নি।

কবিতাটি এই :

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।
বাক্যহিন প্রাণীলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে;
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য
পরিচয়।

—আরোগ্য, ৭ই পৌষ, ১৩৪৭।
সময়—সকাল,
স্থান—উদয়ন।

—কুকুর সম্বন্ধে এমন হৃদয়স্পর্শী উচ্চাঙ্গের কবিতা আমি আর কোথাও পড়ি নি।

ইউরোপ, আমেরিকায় যেখানে কুকুরের সমাদর আমাদের দেশের তুলনায় ঢের বেশী, সেখানেও কোন কবি এমন কবিতা লিখেছেন কি?

বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান সীমিত—সুতরাং বলতে পারি না। আর এখনকার এই দৃষ্টি নিয়ে কুকুর সম্বন্ধে কোন বিদেশী কবিতা পড়িও নি। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বারবার পড়েও আমার কাছে পুরানো হয়ে যায় নি।

কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ, কন্যা মীরা দেবী, নাতি দিনেন্দ্রনাথ কুকুর পুষতেন। কবি নিজে কুকুর পুষেন নি— ৯১৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আমি ত তাঁকে কুকুর পুষতে দেখি নি।

এই কবিতাটি যে-কুকুরকে দেখে লেখা,৩ সেটি একটি সাধারণ দিশি কুকুর। কবির শেষ বয়সে তাঁর কাছেই পড়ে থাকতো।

তারই সম্বন্ধে এমনই এক কবিতা তিনি লিখলেন—

যা তাঁর কাব্যে নিঃসন্দেহে একটি চিরস্থায়ী আসন পাবে।

এই গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের উপসংহারে আমি যে-কথা লিখতে যাচ্ছি—তা অনেকেরই কাছে হাস্যকর মনে হবে, মনে হবে এই প্রবন্ধে এ-কথাটি না লিখলেই ভাল হতো—তবু আমি লিখছি।

আমার বিশ্বাস দরদী হৃদয় এর মধ্যে একটি অমূল্য দরদী হৃদয়ের পরিচয় পাবেন। সেরূপ দরদী হৃদয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ক্বচিৎ পাওয়া যাবে—কিন্তু পাওয়া যাবে না একথা মনে করতে পারছি না।

ভাগবতে একটি শ্লোক আছে :

"মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক, সরীসৃপ (সর্পাদি), বিহঙ্গ ও মক্ষিকাদের নিজের সন্তানের মত দেখবে। নিজ সন্তান এবং এদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?"

এক অবিশ্বাস্য, অসামান্য দরদী হৃদয় হতে এই শ্লোকটি উৎসারিত হয়েছে। অনেকের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে—এখানে কুকুরের কথা কেন নেই! সে-সময় কি লোকে কুকুর পুষতো না!

কিন্তু আমার মনে হয়, সেকথা ঠিক নয়। এখানে যেমন কুকুরের কথা নেই, তেমনি গরুর কথাও ত নেই। অথচ গরু ত লোকে ঘরে ঘরে পুষতো।

আসল কথা হচ্ছে—যেসব প্রাণীকে আমরা মাংসের জন্যে হত্যা করি—যেমন মৃগ ও বিহঙ্গ যারা কুৎসিত কদর্য—যেমন উষ্ট্র, গর্দভ, যারা অপকারী—যেমন মর্কট ও মূষিক, যারা প্রাণঘাতী—যেমন সর্প, যারা ঘৃণ্য—কেঁচো প্রভৃতি সরীসৃপ, তাদের পর্যন্ত ভালোবাসতে বলা হয়েছে।

কী বিশাল হৃদয়! কী সার্বজনীন প্রেম! সত্যই কি এমন মহাকারুণিক মানুষ এই ধরণীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

যে-কথার উপক্রমণিকারূপে আমি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করলাম এবার সে-কথায় আসি।

ছাগ ও মেষকে আমরা আহারের জন্য প্রতিনিয়ত হত্যা করে থাকি। আহার ও বিক্রয়ের জন্য তাদের পালনও করি।

কিন্তু আমি দেখেছি একজন নিঃসন্তান মাংসাশী বাঙ্গালী একটি অজাপুত্রকে পুত্রবৎ পালন করছেন।

সেই হৃষ্টপুষ্ট ছাগটিকে দেখে আমাদের অধিকাংশেরই রসনায় রস সঞ্চার হবে। তিনি কিন্তু তাকে ভবিষ্যৎ মাংসাহারের জন্যে পালন করছেন না। বিক্রয়ের জন্যেও নয়। সে যে তাঁর **সন্তান**!

সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর ভ্রমণকালের নিত্যসঙ্গী এই ছাগটি। বাকি সমস্তদিন তাঁর অবসর যাপনের প্রিয় সাথী। রাত্রে সন্তানেরি মত সুন্দর বিছানায় তার সুখ-শয্যা।

এটি আমার কাছে এবং আমার মত অনেকেরই কাছে নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত, অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব সংবাদ!

কিন্তু মাংসজীবী হিংস্র নেকড়ে যদি তার আবশ্যক ভক্ষ্য মানব-সন্তানকে নিজ সন্তানের মত পালন করতে পারে, তাহলে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষ কি তার অনাবশ্যক ভক্ষ্য শান্ত, নিরীহ ছাগশিশুটিকে নিজ সন্তানের মত পালন করতে পারবে না ?

আর কেউ না পারুক—একজনকে তো আমি দেখলাম যে তিনি পেরেছেন।

একে কি ছেলেমানুষী, পাগলামি বা মায়া বা মোহ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি ?

"ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখি নি সম্পূর্ণ মানুষেরে"

মানুষকে আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখি না—দেখবার চেষ্টাও করি না। তার দোষ, ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, বদগুণ সদগুণ, মহত্ত্ব সব মিলিয়ে অখণ্ডভাবে মমতা দিয়ে তাকে দেখি কি ? বরং তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিই বড় হয়ে আমাদের চোখে পড়ে। ডাক্তারের শব-ব্যবচ্ছেদের মত করে পরীক্ষা করলে, চুলচেরা বিচার করলে—কোনো-দিন কোনো মানুষকেই আমরা শ্রদ্ধা করতে পারবো না।

"ভালো মন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভক্ত কুকুর'-এর সম্বন্ধে যা বলেছেন—সেইভাবে পৃথিবীতে ক'জন মানুষ মানুষকে দেখেছে ?

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। তাঁর সেই মনোভাবই তাঁর ঐ রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে ২।১ জন কবি বা ঋষি-কবি ঐভাবে সম্পূর্ণ মানুষকে দেখেছেন। কবি চণ্ডীদাস দেখেছেন। তারও আগে দেখেছেন মহাভারতের কবি, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

"ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ
মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর
নাই নাই কোনো কিছু নাই।"

শান্তিপুর, ৩০।১২০।

১। রচনাকাল—১৮৯০।
২। রচনাকাল—১৯১৮।
৩। রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি কুকুরের ছবি পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ সেটি এরই।

রবীন্দ্রানুসরণ ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী : তাঁর কবিতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সাহিত্য উপাসনার ঈশ্বর বলে মেনেছিলেন, মেনেছিলেন সবচেয়ে সার্থকতম এবং শ্রদ্ধেয় পিতৃপুরুষ বলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাম যতীন্দ্রমোহন বাগচীর। নদীয়াজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭৮ সালে ২৭শে নভেম্বর তিনি এই নারায়ণী ধরণীর কোলে চোখ মেলে তাকান। অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং খ্যাতিমান্ হয়ে উঠেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বাণীর সাধনা করে গেছেন।

ভারতী পত্রিকার সাহিত্য মজলিসে যতীন্দ্রমোহনই ছিলেন মধ্যমণি। রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্রপূজার অন্যতম পুরোহিত ছিলেন তিনি। ভারতী, প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ কলকাতাতে যে সাহিত্যের মালঞ্চটি গড়ে উঠেছিল এবং আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এক তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী, যাঁরা, বলতে গেলে সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী। রবীন্দ্রাদর্শ পরিত্যাগী সাহিত্যিক গ্রহের স্পর্শে মহান্ পিতৃপুরুষ রবীন্দ্রনাথের গ্রহণলগ্ন উপস্থিত হলে তাঁরাই তাঁকে রক্ষা করবার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এই রক্ষক দলের একেবারে পুরোভাগে। ৯১১ সালে কলকাতার টাউনহলে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে যে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাঁর প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন।

রবীন্দ্রনাথকেই সম্পূর্ণরূপে আচার্য মেনে সাহিত্য আরাধনায় নেমেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনির্দেশিত মত ও পথেই তিনি তাঁর দীর্ঘকালীন কাব্যচর্চা করেছেন। কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রথমেই রবীন্দ্রানুগত্য এবং অথবা রবীন্দ্রানুসরণ লক্ষ্য করবার মতন। কবিতাকে যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করেছিলেন গুরুদেবের প্রসাদী নির্মাল্যরূপে। তাই প্রার্থনার কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন—

> বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে
> একটা কিছু চেয়ে নেব সেবায় আরাধনে।
> আর সবারই পূজার শেষে
> বলেছিলে ঈষৎ হেসে
> কবি তুমি বলো, তোমার কিসের নিবেদন,
> বলেছিলাম, পাই যেন এই সঙ্গ সারাক্ষণ

যতীন্দ্রমোহনের সারা জীবনের কাব্য পর্যালোচনা করলে বুঝতে কষ্ট—হয় না যে তা' এই অগ্রজ রবীন্দ্রনাথেরই "সঙ্গ সারাক্ষণে" কম্পিত ও স্নিগ্ধ।

যতীন্দ্রমোহনের লেখা কাব্যগ্রন্থ নয়টি। লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), নাগকেশর (১৯১৭), বন্ধুর দান (১৯১৮), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬), পাঞ্চজন্য (১৯১১), অপরাজিতা ও জাগরণী।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে গুণটি তিনি পেয়েছিলেন আশীর্ব্বাদের মতন তা হল তাঁর বক্তব্য প্রকাশের আন্তরিকতা ও স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী তাপসের মতন অবিচলিতাবস্থা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতিতে যেমন বিশ্লেষণের অপেক্ষা বিমুগ্ধতাই বেশী, ভাবেরই প্রাধান্য, মস্তিষ্কজীবিতার চেয়ে মনোজয়েরই কুশল আকাঙ্ক্ষা যতীন্দ্রমোহনের মধ্যেও অনেকটা অনুরূপ গুণ বিদ্যমান।

বাঙলাদেশের দেশকাল পরিধি ইত্যাদি এবং মানুষ ও নিসর্গ যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মের সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি বহন করছে যতীন্দ্রমোহনের বেলাতেও তার

কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের শান্ত স্থিতধী, সৌম্য মূর্তিটিকে যতীন্দ্রমোহন বড় ভালবাসতেন। তাই কবিগুরুরই পরিচ্ছন্ন, নির্মল, অচল প্রশান্তির প্রতিবিম্ব পড়েছে যতীন্দ্রমোহনেরও কাব্যে। বাঙলাদেশ, শ্যাম-স্নিগ্ধ পল্লীপ্রকৃতি, নিঝুম নিবিড় নিসর্গ, পুরাণোক্ত কাহিনী সমুজ্জ্বল মহাভারত—উদাস করা, পাগল করা মহাভারত; সীমাহীন ধূলিধূসর কুরুক্ষেত্র তাঁকে বারবার প্রেরণা সঞ্চার করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতনই তিনি ভারতীয় ট্র্যাডিশন ও কালচারে আস্থাবান, নিবিড় ছিলেন।

তবু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও, পরিমিত মাত্রা-চেতনার দ্বারা যতীন্দ্রমোহন তাকে সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। অতিরিক্ততার ইঙ্গিত ছিল না তাঁর সুদীর্ঘকালীন কাব্যানুশীলনের কোথাও, কোন নির্জনে। ফলে অনুসরণ, প্রভাবের পরপারে তাঁর লেখাতে কিছু নিজস্বের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। অমিত না হোক, অনেকটাই পেয়েছি তাঁর মৌলত্বের নিদর্শন। আর এই নির্মল নিজস্বের প্রকাশেই, সুমহান্ মৌলত্বের মায়ায় নির্মম সময়রেখার মাঝখানেও কিছুটা প্রশান্তির ছায়াছত্র মেলে ধরেছেন তিনি।

'ভারতী' থেকে শুরু করে 'পূর্বাচল' পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী সাহিত্যসাধনায় কোথাও তিনি ভুল, অনুতাপ, সংশয় বা বেদনা কিংবা ভীতির কখনও সঞ্চার করেন নি। কবিতাকে তিনি বোধ হয় মাথু আর্নল্ডের মতন ক্রিটিসিজম্ অফ্ লাইফ্ বলে মানতে পারেন নি। ফলে তাঁর কাব্যে বেদনার পাণ্ডুর গভীর ফ্রাসট্রেশনের ছায়া সঞ্চারিত হয়নি। যন্ত্রণার ছবি তিনি আঁকেন নি। জীবন-জিজ্ঞাসার ঝড়-তুফান তাঁর কাব্যকে তোলপাড় করেনি। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি তেমন প্রচণ্ড না হয়ে হয়েছেন স্নিগ্ধ, প্রিয়ংবদ। মাঝে মাঝে কিছুটা বা অভিমানী। এক ভাবমুগ্ধ কবিমন তাঁর সুদীর্ঘকালীন কাব্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে দেবদূত অ্যাপোলোর মতন। প্রমিথিউসের সুতীব্র জ্বালা কোন মুহূর্তের তরেও তাঁকে জ্বালায় নি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্গ-প্রকৃতিতে কোন কৃপণতায় সন্ধান করতে চান নি, সর্বত্র যেমন তাঁর বাঙলাদেশের আশ্চর্য, অন্তহীন ঔদার্যের দিকটাই নজরে পড়েছে তেমনি যতীন্দ্রমোহনের কাব্যেও বাঙলাদেশের নৈসর্গের নিবিড় নিঝুম ঔদার্যের দিকটাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ক্লীবতার কথাকে তিনি স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গিয়েছেন হয়ত বা। হয়ত বা প্রাণের পরপারে প্রাণ বিনাশী কোন উপকরণকে সেব্য করতেও তিনি ছিলেন অনিচ্ছুক। গ্রাম বাংলার দুঃখ তাঁর প্রীতিপ্রসন্ন কবি-চিত্তের মাধুর্যকে এক নিমেষের জন্যও নিঃশেষ করতে পারে নি। বরং দুঃখও তাঁর লেখনীতে অসম্ভব রূপমূর্তি লাভ করেছে—রসমূর্তি লাভ করেছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতন যতীন্দ্রমোহনও বাঙলা দেশের নানা অনুল্লেখ্য অবহেলিত বিষয়কে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রকাশে তীব্রতার পক্ষপাতী হয়েছেন, যতীন্দ্রমোহন তাকে স্নিগ্ধ কবিমনের স্পর্শে সূক্ষ্ম ও কোমল করে অভিব্যক্ত করেছেন। ময়ানের কারুকর্মে তাঁর লেখা কবিতা আশ্চর্য সুরেলা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সম-কালীন অনেক কবির মতনই তিনি তাঁর কাব্যে সাধারণ গ্রামজীবন, ছোট সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না-পাওয়ার কথাকে পরিবেশন করেছেন। তবু তারা তাঁর স্নিগ্ধ কবিমনের ছোঁয়ায় পরিশুদ্ধ, নির্মল হয়েছে। যতীন্দ্রনাথের মতন গণশিল্পীর সুখ্যাতি তাঁর না থাকলেও, তাঁর কবিতাতেও হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ, ঘাটের মানুষ ও গোঠের মানুষের আনাগোনা আছে। তবে কোথাও প্রতিবাদের কণ্ঠে উদ্দাম, উদ্যত বা উদ্ধত হয়ে তারা কেউ আসে নি। ধীর ধীরাপদর মতন তাদের সর্বত্র ঘটেছে স্বচ্ছন্দ পদ-চারণ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে লালিত কবি এই সুকুমার ভদ্রতাটুকুকে সর্বদাই তাঁর কাব্যে বিদ্যমান রেখেছিলেন। তাঁর কাব্যে বাঙলাদেশের প্রকৃতি সমস্তামুক্ত। কোন কবিতাতেই তিনি কাকবৃত্তি অবলম্বন করে কারও কোন নিন্দাবাদ করেন নি। বরং কিছুটা বৈষ্ণবী রীতি তিনি রপ্ত করে নিয়েছিলেন আমাদেরই তৃপ্তির প্রয়োজনে। দাক্ষিণ্যে মুক্ত তাঁর দক্ষিণ পাণি তাঁর কাব্যে সতত একটি

সুধাভাণ্ড সংরক্ষিত রেখেছিল। জনপ্রিয় হবার মতন কিছু সম্ভাব্য সদ্গুণ তাঁর ছিল। তা হল প্রকাশের সারল্য ও কণ্ঠের মধুস্রাবিতা। দেশ-কাল-পরিবেশ প্রভৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ আন্তরিক ও গভীর ছিল। তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতিও ছিল সুতীব্র।

বাঙালী পরিবারের আটপৌরে জীবনকথা যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে অভ্রান্ত প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। আর এই জীবন পল্লীজীবন। পল্লীজীবনের নানা কথা—তার সুখ-দুঃখ, বিষাদ-বেদনা, হাসি-গান তাঁর কাব্যের পটভূমি জুড়ে আছে। আইবুড়ো কালো পল্লীবালার দুঃখকে বর্ণনা করে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

থমথম করে গভীর রাত্রি প্রদীপ-নেভানো ঘরে,
আঁধার পথের যুগল যাত্রী তুফাবীর বালুচরে।
একের যাত্রা শেষ হয়ে আসে, অন্যের যবে সুরু ;
কালের কপালে কোন্ পরিহাসে কাঁপে দুটি কালো
ভুরু!
একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ-
পার,
বাসতের চোখে কে-বা তারে চায়? নিরুপায়
চারিধার।

কাব্যটির মধ্যে বিষাদের অন্ত নেই। তবু কবির সহানুভূতির স্পর্শে কবিতাটি ধন্য। এইরূপ আটপৌরে জীবনকথার স্নিগ্ধ কবিতা হচ্ছে সত্যকাম, গঙ্গাস্নান, ঘুমহারা, কাজলাদিদি, মালোর মেয়ে, চাষার মেয়ে, জেলের ছেলে ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন মনোজয়ী শিল্পী। মনকে জয় করবার অসম্ভব ক্ষমতা ধারণ করতেন তিনি। তাঁর সহৃদয়তা বাংলাদেশের নিসর্গের মধ্যেই তাঁর বাসনার স্বর্গটিকে খুঁজে পেয়েছিল। কবি লিখেছেন—

শোভা বল, স্বাস্থ্য বল—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, ভায়ের হাসিমুখ ;—
তাই ত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
সেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি॥

যতীন্দ্রমোহনের সামগ্রিক কাব্যের মধ্যে, বিশেষতঃ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার মধ্যে ভোরের ভৈরবী আলাপই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। তারই করুণ সুরের সান্দ্র আয়োজনে সমগ্র কাব্যটি বিন্যস্ত।

এ-ছাড়া কিছু সার্থক প্রেমের কবিতাও তিনি লিখেছেন। এইসব কবিতায় বর্ণিত প্রেম মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ, লালসাশূন্য এবং আবেগদীপ্ত। অমৃতের, আলোর প্রত্যাশায় উন্মুখ। রীরংসাতপ্ত যৌনাচার কিংবা অতীন্দ্রিয়তা তাঁর প্রেমের কবিতার সুর নয়।

মোটকথা, যতীন্দ্রমোহন কোন এক বিশেষ ধারার কবি নন। তাঁর মধ্যে যখনই দেখা গেছে পল্লীপ্রিয়তা, দেখা গেছে সামান্যতার প্রতি আকর্ষণ, নিসর্গ-সান্নিধ্য, আটপৌরে জীবনাসক্তি, তখনই দেখা গেছে সাময়িক সমস্যা সম্পর্কেও চিন্তা। তিনি সাময়িক ঘটনার কথা উচ্চারণ করেছেন তাঁর 'নিরুপায়' কবিতাটিতে।

যতীন্দ্রমোহন কোন নবযুগের প্রবর্তক নন তাঁর কবিতাতে। তিনি কোন যুগকে তৈয়ার করেননি। যুগের সঙ্গে চলেছেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ নামক সংহতসত্তা নগাধিরাজের পাশে তাঁরই অংশবিশেষ এক সহৃদয় কবি হিসেবে তাঁর যোগ্য সমাদর নিশ্চয়ই তাঁরও পাওনা। তা তাঁকে অবশ্যই আমরা দেব। বাংলা কাব্যের সুপ্রসারিত আরণ্যক বিস্তৃতির মাঝখানে তমালতরু বিশেষ যতীন্দ্রমোহনের মৌল অস্তিত্বটুকু মেনে আমরা ধন্য হব। আমরা তৃপ্ত হব। গৌরবান্বিতও বটে।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জনতা ট্রাভেলসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমরা পরের দিন সকাল সাতটায় শ্রাবণবেলগোলা বেলুর ও হালেবিদ দেখবার জন্য যাত্রা করেছিলাম। চব্বিশ টাকা ভাড়া। পঞ্চাশজন যাত্রী নিয়ে একটি লাক্সারি বাস ঠিক সময়েই ছেড়েছিল কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মধ্যপথ থেকে আমাদের ফিরে আসতে হয়।

বেলা এগারটার কয়েক মিনিট পরে আমরা শ্রাবণবেলগোলা পৌঁছেছিলাম। পথে মিনিট কয়েক বাসটি দাঁড়িয়েছিল একটি গঞ্জমত জায়গায়, যাত্রীদের কফি পানের সুযোগ দেবার জন্য। কফি তো বটেই, যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য আমার অখাদ্য মনে হয়েছিল, পরিবেশটিও ছিল অপরিচ্ছন্ন। কফি খাওয়া বাতিল করে এদিক-ওদিক একটু ঘোরা-ফেরা করা গেল। বাঙ্গালোর থেকে শ্রাবণবেলগোলার দূরত্ব কয়েক কিলোমিটার, সেখান থেকে হালেবিদ ও বেলুর আরও কিছু কিলোমিটার দূরে।

শ্রাবণবেলগোলাকে বড়জোর একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা যেতে পারে। একটা মাঝারি ধরনের পাহাড়ের চূড়ায় জৈন তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বরের বিশাল পূর্ণাবয়ব মূর্তি। অনেক দূর থেকে এই মূর্তির উর্ধ্বাংশ, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি আছে। প্রবেশপথে কয়েকটি দোকান আর টিকিট-ঘর। আট আনা দক্ষিণা দিয়ে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে উপরে উঠতে হয়। সিঁড়িটি সুন্দর। যথেষ্ট প্রশস্ত এবং ধাপগুলি অনুচ্চ। উঠতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তেমন খাড়াইও কোথায়ও নেই। তবু আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পক্ষীতীর্থ বা বক টেম্পলের মত হাঁফ ধরে নি। সিঁড়ি-ভাঙ্গা যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে অপেক্ষাকৃত সমতল পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটেও যেতে পারেন। দু-চার জনকে এই ভাবে নামতে দেখলাম। উঠতে দেখিনি কাউকে।

সিঁড়িটা একটানা মূর্তির পাদদেশ অবধি যায় নি। প্রায় শীর্ষদেশে দু-তিনবার ছোট ছোট ঘরের মধ্যে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এমনি করে প্রলুব্ধ হতে হতে আমরা এক সময় মূর্তির পাদমূলে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিশালতাই শুধু মাত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, এর স্থাপনা-পদ্ধতি গঠন-সৌকর্য ও শিল্পকীর্তি মুগ্ধ করে এবং ভাবিয়ে তোলে। যারা এটি রচনা করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য ও দক্ষতার কোন বাস্তব ধারণা করা কি সম্ভব!

সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তি। দুই পায়ের মধ্যস্থল থেকে দুটি লতা মূর্তিটিকে বেষ্টন করে উঠেছে। ছাদে চড়লে পেছন দিক থেকে উর্ধ্বাংশ দেখার সুবিধা হয়। এখান থেকে দেখা যায় পরিপাটি করে বাঁধা কেশদাম। অনেকগুলি ছোট ছোট খোঁপা যেন জুড়ে আছে সমগ্র মাথাটিকে। দেখতে ভারি সুন্দর। পাদমূলের বেদি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে রচিত। দুটি সর্প মূর্তিও খোদিত রয়েছে। সাপও এখানে তার স্বাভাবিক হিংস্রতা ভুলে যায়, এই কথাই বোধ হয় শিল্পী বোঝাতে চাইছেন সাপের উপস্থিতির দ্বারা।

মূর্তির আসনে একটি মন্দির ভবনের শীর্ষে সবাহনা কিছু দেবীমূর্তি দৃষ্ট হয়। সিংহবাহিনী কুষ্মাণ্ডিনী দেবী, কুক্কুট ও সর্পসহ পদ্মাবতী, সহাতি ধরণীন্দ্র, হাঁস নিয়ে দেবী সরস্বতী এবং কমল হস্তে শ্রীলক্ষ্মী। জৈন তীর্থে এই সব বিগ্রহ অবশ্য পরবর্তীকালের সংযোজন। গোমতেশ্বরেরই রীতিমত পূজা হচ্ছে দেখলাম। তীর্থঙ্

(চরণামৃতকে দক্ষিণে তীর্থম্ বলে) দিয়ে পয়সা আদায় করার রীতি এখানেও প্রচলিত।

পাহাড়ের উপরে আরও কয়েকটি গৃহ আছে। একটি কুয়োর মত স্থান দেখিয়ে এক জন বল্লেন এখানে জল পাওয়া যেত। পাহাড়ের শীর্ষদেশের কুয়োতে জল একটু অবাক হবার মত কথাই বটে। ওপরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ বোলালে বেশ একটা শিহরণ জাগে মনে। নিচের বাড়ি-ঘর মাঠ-পুকুর সব এক নজরে এসে যায়, ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ঘরগুলি সব খেলাঘর, মানুষগুলি যেন পুতুল, আর গ্রাম হলো ছবি। নিকট থেকে যেটা একান্তই হিজিবিজি বা নোংরা বোধ হয় উপর থেকে সে সবও অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা নেমে এলাম। আপনার শ্রান্তি বিদূরণের জন্য ডাবওয়ালা হাজির। গ্রামটা ঘুরে দেখার সময় নেই। আমাদের রথ এখনই ছাড়বে। অনেকটা পথ যে বাকি! সাড়ে বারোটা নাগাদ বেলুরের পথে হাসান শহরে এসে আমাদের যাত্রা বিরতি ঘটল। একটি ছোট্ট সরাইখানা, নামটি কিন্তু তার বিরাট—হোটেল উডল্যাণ্ড। কোন কালে এটা হয়তো জঙ্গল ছিল। এখন তো পুরোপুরি শহর। আজ ঈদ। নতুন ও ঝলমলে পোশাকে মুসলিমদের দেখা গেল। সংখ্যায় তারা এখানে বেশ বেশিই বলে মনে হলো।

হোটেল উডল্যাণ্ডে আমাদের দুপুরের খাওয়া সারবার ব্যবস্থা হয়েছে, দামটা যে নিজেদের মেটাতে হবে এ কথা জানাতে বাস-কর্তৃপক্ষ ভুল করেন নি। সেই চিরাচরিত দাক্ষিণী খাবার। বাঙ্গালোর মহীশূরে একটু ইতরবিশেষ হয়েছিল কিন্তু এখানে চূড়ান্ত দাক্ষিণী। ভাত, সম্বর অর্থাৎ স-তরকারি বিস্বাদ ডাল, টক ডাল, রসম্ অর্থাৎ ঝালমিশ্রিত তেঁতুল গোলাজল, চাটনি অর্থাৎ লঙ্কা সহযোগে পাতিলেবু চটকে-আধা সেদ্ধ করা পাপর ও টক দৈ। পদে ঘাটতি নেই, আড়ম্বর অনুষ্ঠানও ঠিক আছে কিন্তু ঐ খাবার গলা দিয়ে নামল না। যাই হোক খাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই আমরা বাস-চালকের নির্দেশমত তাড়াতাড়ি করে বাসে ফিরে এলাম। ফিরতেই শুনলাম, বাসওয়ালা কৌতুক করে জানিয়ে দিয়েছেন, পাঁচটা পর্যন্ত এখানেই মনুমেন্ট দেখতে হবে, বাস খারাপ হয়েছে, সারতে সন্ধ্যে পাঁচটা হবে।

যাত্রীরা ক্ষেপে আগুন। কারো হাতেই প্রায় বাড়তি সময় নেই। বহু জনের জীবনে বেলুর হালেবিদের পথে দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ হয়তো জুটবেই না। দুঃখে ও ক্রোধে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু হৈ চৈ সার হলো। অনেক চেষ্টা করেও বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা গেল না। বাস-মালিক যদি আশ্বাস দিতেন পাঁচটা পর্যন্ত তাঁরা এখানে অপেক্ষা করবেন তা হলে অনেকে নিজেদের পয়সায় ট্যাকসী করে বেলুর হালেবিদ ঘুরে আসতে হয়তো সমর্থ হতেন। কিন্তু কয়েকজন উত্তেজিত যাত্রীর বাড়াবাড়িতে তাঁরা ভড়কে গেলেন। কিছুই ঠিক করে বলতে পারলেন না। রাস্তায় পায়চারি করেই সারাটা দিন কাটাতে হলো। মাত্র দশ পনের মাইলের ব্যবধানে থেকে ফিরে যেত হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বেলুর হালেবিদ না দেখে। অদৃষ্টে না থাকলে এমনি করেই সব আয়োজন ভেস্তে যায়।

কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে বাসটাকে চলার মত করতে ছ'টা বেজে গেল। বাসওয়ালা চান যে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমরা বেলুর হালেবিদ ঘুরে যাই। কিন্তু প্রায় সকলেই এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানালেন। বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে মহিলা ও শিশু আছেন তাঁরা একেবারে বেঁকে বসলেন। গেলে হয়তো ভালই হত, যাহোক একটু তো দেখে আসা যেত। তা হলো না। আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হলো। পথে আর একবার বাস গেল বিগড়ে, সেটা সারিয়ে নিয়ে বাঙ্গালোর পৌছতে পৌছতে ইংরেজী মতে তারিখটা বদলে গেছে।

বাঙ্গালোরে এসে ক্ষিপ্ত যাত্রীরা থানা পুলিশ করলেন, বাস নিয়েই হামলা চলল মালিকের বাড়ি। চালক এক সময় বাস ফেলে পালিয়ে গেল। সে এক

দারুন ধুন্দুমার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল প্রায় আড়াইটার সময়। কোম্পানি পরের দিন মোট ভাড়া থেকে ৫ টাকা করে ফেরত দিয়েছিলেন। পাঁচ টাকার জন্য এই হুজ্জত পোষায় না। রাতের খাওয়া ও বিশ্রাম দুটোই বাতিল হয়ে গেল।

সাঁইবাবার আশ্রম

ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েছি কি না-ঘুমিয়েছি সুধীরদা ডেকে তুললেন। ছ'টার মধ্যে আমাদের বেরোতে হবে। যাব হোয়াইট ফিল্ডে সাঁইবাবার আশ্রমে। স্নানাদি সেরে আমরা যখন বেরিয়েছি তখন ছটা পুরো বাজে নি। দিনের আলোও ভাল করে ফোটেনি। বাঙ্গালোর শহর একটু দেরিতে জাগে মনে হলো। ঐ সময় কোন চায়ের দোকান এ পাড়ায় খোলা পেলাম না। ফুটপাথে ও বারান্দায় যারা শুয়ে কাটায় তারা তখনও দিব্য ঘুমোচ্ছে। এ সময়ে বাঙ্গালোরে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা, তার উপর বইছিল বেশ জোরেই উত্তরে হাওয়া।

চা কফির পাট চুকিয়ে পৌনে সাতটায় মারুতির বাস ধরলাম। হিন্দুস্থান বিমাণ নির্মান কারখানার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই কারখানা। গাদা গাদা ভাঙ্গাচোরা ও ভাল প্লেন পড়ে আছে, তা রাস্তা থেকেই দেখা যায়। মারুতিতে এসে বাস বদল করতে হয়। এখানে অনেকটা সময় কেটে গেল ঠিক বাস পেতে। ভুল বাস ধরলে পথে আর একবার বদল করতে হয়।

ন'টার কাছাকাছি সময়ে আমরা হোয়াইট ফিল্ডে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু হায়, সাঁইবাবা নেই। সম্পৎ-বাবু বলে দিয়েছিলেন, সাঁইবাবা অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি। মন্দভাগ্য, তাঁর দেখা পেলাম না। দু-তিনদিন আগে তিনি তাঁর জন্মস্থান পুট্টিপার্তি চলে গিয়েছেন। জায়গাটা এখান থেকে ৮০ কিলোমিটার দূর। একদিনে ফিরে আসা যায় না, তবু অনেকে একবার মাত্র দর্শনের আশায় যাচ্ছেন দেখলাম। স্থানীয় সকলেই সাঁইবাবাকে ভগবান্ বলে অভিহিত করেন। অলৌকিক শক্তির সঙ্গে জনসেবার নানা কাজ,—স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ তাঁর ভক্ত। বহুজনের মুখে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনেছি। মুষ্টি উর্ধ্বে তুললেই তিনি প্রয়োজন মত প্রসাদ ইত্যাদি সেই মুঠির মধ্যে পান। কেবল পাওয়া নয়, ভক্তদেরও দেন।

আশ্রমে যাঁরা সমবেত হন তাঁদের মধ্য থেকে খুশি মত কয়েকজনকে বেছে নিয়ে আশীর্বাদ করেন, দীক্ষা দেন। ভক্তরা বলেন, যার বেশি প্রয়োজন তাকেই তিনি আগে ডাকেন। তিনি বলেন সত্যশ্রয়ী হও, ধার্মিক হও, শান্তি রক্ষা কর, ভালবাস তবেই সব পাবে। এর সব ক'টি অনুসরণ করা বর্তমান সময়ে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি যে-কোন একটি গুণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমার শোনা কথা। তবু বড় ভাল লেগেছে তাই বলি। তিনি নাকি বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মত দুষ্কৃতকারীদের নিধন করে এখন আর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ যুগে মানব-চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নেই। তাই অধার্মিক হত্যা অভিযান শুরু করলে কেউ আর বেঁচে থাকবে না। সেই জন্য তিনি এসেছেন ধর্মসম্মত উপায়ে মানুষের বুদ্ধিকে নির্মল করে দিতে। বুদ্ধি নির্মল হলে মানুষ যে ভাল হয়ে যায় তাতে আর সন্দেহ কী।

সাঁইবাবা ১৯২৬ সনে অন্ধ্রের একটি সামান্য গ্রাম পুট্টিপার্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক কাহিনী এখন লোকমুখে ফেরে। মাত্র বার বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি একখানি চাঞ্চল্য-কর নাটক রচনা করেন—বইখানির তেলেগু নামের অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'আমরা যা বলি তা কি করি?' তাঁর স্কুলে নাটকটি অভিনীত হয় এবং তিনি সে অভিনয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

স্কুলে পড়াশুনা তাঁর বেশী হয়নি। কিন্তু বেদ,

পুরাণ-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর অসামান্য দখল। তিনি তাঁর পূর্বজন্মের কথাও স্মরণ করতে পারেন। ১৯৪০ সনে তিনি গৃহত্যাগ করেন। আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি বিশ্বের নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর গুরুত্ব দেন না। থিয়োসফিস্টদের মতই বলেন—যার যা ধর্ম তিনি সেটাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন।

আজ সাঁইবাবার দেখা পেলাম না, কাল বেলুর হালেবিদ দেখা হল না। স্বভাবতঃই মনটা কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমাদের হাতে আরও একটা দিন সময় ছিল। মাদ্রাজ থেকে কলকাতাগামী মেলগাড়ী ধরতে হলে বাঙ্গালোর থেকে দিনের দিন গেলে চলে। কিন্তু আন্না ডি. এম্. কে. দলের রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিনটি আর আমাদের যাত্রার তারিখটি এক হওয়ায় আমরা একটু বিচলিত হয়েছিলাম। নানা কারণে প্রতিবাদ দিবসের পরিণতি নিয়ে সর্বত্র একটা চাপা উত্তেজনা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। এখানে বসে বুঝতে পারা যায় না মাদ্রাজে কী হচ্ছে। তারপর পরপর দু'টি নিষ্ফলা যাত্রার জন্য ঠিকই করে ফেলা হল আজই বৃন্দাবন এক্সপ্রেস গাড়ী ধরে মাদ্রাজ চলে যাব। সাঁইবাবার আশ্রম থেকে ফিরবার পথে সুধীরদাও মাদ্রাজের টিকিট কিনতে গেলেন, মোহনদা ও আমি এলাম সরাসরি হোটেলে সব গুছিয়ে নিতে।

প্রত্যাবর্তন

বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ ৩৫৬ কিলোমিটার পথ। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পাড়ি দেয় এই পথ। গাড়ি-খানি চমৎকার। যে ক'টি আসন তার চেয়ে একটি টিকিটও বেশী বিক্রী করা হয় না। সীটে বসেই চা, কফি, জলখাবার ও পানীয় পেতে পারেন। এজন্য অবশ্য টিকিট প্রতি একটাকা (তৃতীয় শ্রেণী) বাধ্যতামূলকভাবে টিকিট কাটার সময়ই আদায় করে নেওয়া হয়। ওটা কেবল সার্বিস চার্জ। জিনিসের দাম পৃথক। পথের দৃশ্যে বৈচিত্র্য বেশী নেই। মাদ্রাজের দিকে যত এগুনো যাবে, তালগাছের সংখ্যা ততই বাড়বে। পথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পাখীর মেলা। জায়গাটার নাম মনে নেই। সহস্র সহস্র পাখীর মেলা বসেছিল সেখানে।

মাদ্রাজ এসে জানা গেল মাদ্রাজ মেলে আমাদের আসন সংরক্ষিত হয়নি। খুব ঝগড়াঝাঁটি-হুজ্জত করে জনতার তিনখানা বসবার আসন পাওয়া গেল। গাড়ীতে উঠে যাহোক একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এই ভরসায় রইলাম। রাতের মত উঠলাম সেই পুরণো জানডান লজে। এখানকার তত্ত্বাবধায়ক ছেলেগুলি বড় ভাল। আসন সংরক্ষণের গোলমাল শুনে ওদের অন্ধকার পথের আড়কাঠি পাঠিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু হল না।

এবার ঘরে ফেরার পালা। গাড়ীতে চড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বাড়ীতে পৌছে গেল। গাড়ী যতই দেরি করে, উদ্বেগ ও ক্লান্তি ততই বাড়ে। পুরো ৪৮ ঘণ্টা গাড়ীতে কাটাতে হয়েছিল। অন্ধ্রে মুলকি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ছাত্রদলের দ্বারা আমাদের গাড়ী-খানা আক্রান্ত হয়েছিল। গাড়ীটিকে তারা মাঠে-ঘাটে যথেচ্ছ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কৌটো নাচিয়ে সংগ্রাম তহবিলে চাঁদা তুলেছে। ভীতু যাত্রীরা নীরবে অর্থ দিয়ে মুক্তি পাবার আশা করেন। ছাত্রদের ভাণ্ডার সহজেই পূর্ণ হয়। প্রত্যাশার অতিরিক্ত তারা পেয়ে তখনকার মত গাড়ীখানা ছেড়ে দেয়। খানিকটা যেতেই আবার গাড়ী থামে, ছাত্রদল ওঠে, চাঁদা সংগৃহীত হয় এবং পুনরায় গাড়ী চলে। পুলিশের চোখের সামনেই গাড়ীখানার আলো বিকল করে দিয়ে গেল কিছু অতি উৎসাহী ছেলে। ফিরতি যাত্রা আরও নানা কারণে খুবই রমণীয় হয়েছিল। গাড়ীতে বসেই ভাইজাগে একটা বাজার চোখে পড়ল যেখানে বস্তুতঃ কোন ঘর নেই, দোকানদারেরা সব বড় বড় গোল তালপাতার ছাতার তলায় বসে বেচাকেনা করছেন। সে যেন নানা আকারের একটা ছাতার মেলা। এ-অঞ্চলে তালগাছের যেমন প্রাচুর্য্য, তেমনি রকমারি কাজেও তালপাতার ব্যবহার হয়।

আর একটা মনোরম দৃশ্য দেখেছিলাম চিল্কাতে। রম্ভা ও কালকট স্টেশনে আমাদের গাড়ী থেমেছিল। বিকেলের পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় চিল্কা হ্রদের অপরূপ

সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। পাহাড় ও দ্বীপ ঘিরে দূর-বিস্তৃত শান্ত জলরাশি; বুকে অগণিত জেলেডিঙি। এমন জায়গায় ভেসে বেড়াতে বাসনা জাগবে না এমন পাষাণহৃদয় মানুষ কেউ আছে কি না সন্দেহ। ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত পাখীরা চকিত করে দিয়ে চলে যায়। কি পাখী তা বোঝাই যায় না। জনৈক সহযাত্রী বললেন— অধিকাংশই সারস জাতীয় পাখী।

মাছ ধরার ব্যাপক আয়োজন গাড়ীতে বসেই লক্ষ করা যায়। নানা বিচিত্র আকারের ঢাউশ বোচনোগুলি খানিকটা দূর দূর বৃত্তাকারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মাছেরা তার মধ্যে সহজে ঢুকবে কিন্তু শত চেষ্টা করেও বেরোতে পারবে না। কলকাতা থেকে চিল্কা পাঁচশ' পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতন। এই চিল্কা থেকে কলকাতা বাজারে রোজই প্রচুর মাছ যায়।

দক্ষিণ-ভারতবর্ষ সমুদ্র সেবিত, বেষ্টিতও বটে। সমুদ্রের উদার দাক্ষিণ্য এর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাণিজ্য লক্ষ্মীর সম্পর্ক ঘটেছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাদেশের সঙ্গে। খ্রীষ্টধর্মের শৈশবে ভারতবর্ষের এই অংশে সে আপনার স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের শতবর্ষের মধ্যেই সাধু টমাস এসেছিলেন মাদ্রাজে। ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে যিশুর ধর্ম্ম এতটা নিরুপদ্রবে বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়নি। খাস ইউরোপেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস ত হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনায় ভরপুর। অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ভাস্কোডা-গামা দক্ষিণের কালিকটে এসে কূল পেয়েছিলেন। হিমালয় অতিক্রম করে মুসলমান এসেছিল লুঠেরার বেশে, কিন্তু দক্ষিণের ভূমিখণ্ডে তাঁরা নেমেছিলেন বন্ধুরূপে বাণিজ্যের সহকারী হয়ে। দক্ষিণের এই ভারতবর্ষ শঙ্করাচার্য রামানুজদের ভারতবাসীকে উপহার দিয়েছেন। নবীন ভারতের পথনির্দেশক স্বামী বিবেকানন্দ। ওঁকে আমরা আজ যেমনভাবে জানি তার প্রস্তুতিপর্ব ঘটেছিল দক্ষিণভূমিতেই। দক্ষিণের ভারতবর্ষ তাই সত্যিকারের পুণ্যভূমি।

ভারতবর্ষের সুন্দরতম মন্দিরগুলির প্রায় সবক'টিই এই দাক্ষিণাত্যের মাটিতে। উত্তর-ভারতেও যে ছিল না তা জোর করে বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বংসী দুর্বৃত্তগণ ভেঙেচুরে ফেলার পর যা আছে তাই ত আমরা দেখছি। বিশ্বের আর কোন দেশের মন্দিরের সঙ্গে আমাদের মন্দিরগুলির তেমন মিল নেই। মিশরের পিরামিড প্রভৃতিতে বিস্ময়কর স্থাপত্য রয়েছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে ভারতের মন্দিরের তুলনা চলে না।

শুধুমাত্র ধর্মবোধ তৃপ্ত হলেই মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হল না। বাড়তি কিছু রচনার দ্বারা মানুষ স্বর্গের দেবতাকে ঘরের মানুষ করে তুলেছে। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সঙ্গে তার জাগতিক সঙ্গীসাথী পশুপাখী তৃণগুল্ম ফলফুল সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় ঘটনার ছবি ফুটিয়ে দূর ভবিষ্যতের অনাগত মানুষের নিকট শমযমের কথা পৌছে দেওয়া হয়েছে। মুখর হয়ে উঠেছে নিস্তব্ধ অতীত মন্দিরে মন্দিরে, শিলাখণ্ডের বুকে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার রসে রঞ্জিত করে রাগ-অনুরাগের দ্বারা ভগবানকে একান্তই আপনার জন করে নিয়েছে।

মন্দিরকে আমরা স্বর্গে প্রবেশের রাজপথের সিংহদ্বার বলে আলাদা করে রাখি নি। আমরা ভারতের হিন্দু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বা ভ্রাতাভগ্নী, এমনকি শিষ্য প্রশিষ্য বলে মনে করি না। আমরা বিশ্বাস করেছি মানুষ মাত্রেই ভগবানের অংশ। এর ফলে আমাদের সুকৃতি দুষ্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে ঈশ্বর একাত্ম হয়ে আছেন। এই ভাবনার অনুরূপ হল, আমাদের প্রতিটি গৃহই মন্দির। আমরা মন্দিরবাসী। রাজ-রাজড়ারা বড় বড় বিস্ময়কর শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার প্রাঙ্গণে বাস করতেন। আমরা যারা সামর্থ্যহীন তারা শোবার ঘরেই একখানা লক্ষ্মীর পট বা নারায়ণের ছবি রেখে নিত্য একটু ফুল-জল দেই। তাই মনে হয়, দক্ষিণের ভুবন-বিখ্যাত মন্দিরগুলির সঙ্গে আমার গৃহদেবতার আসনটির মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই, একই মানসিকতার ভিন্ন

প্রকাশ। এই ভিন্নতার আকর্ষণে তিন সপ্তাহ ধরে দক্ষিণের ভারতবর্ষের পথে পথে আমরা ঘুরেছি। দেখেছি অনেক, শুনেছিও বিস্তর। বুঝিনি তার অনেক কিছু। কিন্তু তৃপ্ত হয়েছি নিশ্চয়ই।

ভুবনেশ্বর মন্দির দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে সাক্ষীরূপে ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জনে নহে, যোগে নহে,—সজনে কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে; সমষ্টি রূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমতঃ ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে।" ঋষি কবির এই সত্যদর্শন দক্ষিণের সকল মন্দির সম্পর্কেই সত্য। লোকালয় যখন দেবালয়ে রূপান্তরিত হয় তখনই ত এই ধূলার ধরণী স্বর্গ হয়ে ওঠে।

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ আপন আপন ইচ্ছা অভিলাষ অনুসারে নিজ নিজ মনোমন্দিরে স্বর্গের রূপ কল্পনা করেছে। শোক-দুঃখ জরা-ব্যাধিশূন্য সদাপ্রফুল্ল ও শান্তিময় আনন্দলোক আমাদের স্বর্গ-কল্পনায় স্থান পেয়েছে। বাইবেলে নন্দনকাননের কথা আছে। সেখানে অফুরন্ত খাদ্য-পানীয় আরাম-বিরাম। কল্প-লোকের স্বর্গ নিয়ে সুখী হতে পারেননি বহুজনে। তাঁরা এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্ব-বন্দিত প্রেমিক কবি ওমর খৈয়ামের স্বর্গের কল্পনা খুবই বাস্তব। তাঁর ধারণায় বিজনে কুঞ্জতলে পাশে বসে প্রিয়া গান গাইবেন আর সঙ্গে থাকবে এক টুকরো রুটি, একপাত্র পানীয় এবং একখানা কবিতার বই। সম্রাট সাজাহান লালকেল্লা বানিয়ে বললেন, এই ত স্বর্গ। লিখে দিলেন তার গায়ে—ধরিত্রীর বুকে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তবে তা এখানেই, এখানেই। এত করেও স্বর্গ মরীচিকাই হয়ে রয়েছে অধিকাংশ মানুষের কাছে। হয়ত অতন্তকাল ধরেই এমনি করে সে মানুষকে প্রলুব্ধ করবে। এই প্রলোভনের শিকার হয়েই আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে, হিমালয় থেকে সমুদ্রে, আবার সমুদ্র থেকে হিমগিরির কন্দরে ছুটে চলি, মন্দিরে মন্দিরে খুঁজে ফিরি। কেউ স্বর্গের সন্ধান পাই, কেউ বা পাই না। পাই বা না পাই, খোঁজার বিরাম নেই, যাতায়াতও তাই কোনদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে না। অনন্তকালের সেই যাত্রা-পথের কোন-না-কোন বিন্দুতে পথিক আমরা সবাই। অগণিত সেই যাত্রীদলের মধ্যে কচিৎ কখনো দুই-পাঁচ-দশজন 'সুগন্ধ মাটি' হবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

পারসিক কবির স্নানাগারের সুগন্ধ মাটি কবিকে জানিয়েছিল—মাটি মাটিই—তার নিজের কোন সুগন্ধ নেই; কিছুকাল গোলাপ বাগানে ছিল সেই সুবাদে গন্ধ-হীন অবহেলিত মাটি সুগন্ধ হয়ে উঠেছে, কবির চিত্ত আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। যুগ-যুগান্ত থেকে চলমান এই যাত্রীদলের যাত্রাপথে সকলেই সাধারণ মানুষ—কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁরা ঐ মাটির মত গন্ধ বহন করে আসেন—তাঁরা সকলেই বহুলাংশে নতুনতর মানুষ হয়ে যান।

ঋগ্বেদে বর্ণিত বহু ঘটনার ও কাহিনীর ঐতিহাসিক-প্রাক্ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ভূগর্ভ উত্থিত ঐতিহাসিক নানা সুপ্রাচীন সভ্যতা কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে

সুধীন্দ্রকুমার কাব্যসাংখ্যতীর্থ

এই প্রবন্ধে কিছু কিছু ঘটনার ও কাহিণীর এক রূপ-রেখা দেবার সামান্য একটু প্রয়াস। বিষয় বস্তুগুলি ঋগ্বেদ বর্ণিত ঘটনার ও কাহিণীর সহিত গভীর ও স্বতন্ত্র-ভাবেও আলোচ্য। ভারতে ও বর্ত্তমান পাকিস্তানে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনর সুমেরু বাবিলন মিশর ক্রীতের (crete) ও নিকট প্রাচ্যের নানা 'জন'গণের সৃষ্টি ভূগর্ভখনিত প্রাচীন সভ্যতা কৃষ্টিগুলির —লিপিলিখির বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিণীর ও শিল্পবস্তু প্রভৃতির প্রমাণিত তথ্যের সহিত মিলিয়ে। তারি এক উপক্রমণিকা মাত্র।

ঋগ্বেদে মাতৃপ্রধান যুগ পেরিয়ে—পিতৃপ্রধান যুগের এবং উভয়ের সন্ধিকালের কাহিণী ও ঘটনার বর্ণনা আছে। দেবদেবী ও মানবমানবী এবং জনগণের ধ্যান ধারণা যুদ্ধবিগ্রহ মিতালী—উত্থান পতন ও বিভিন্ন কৃষ্টির পরিচয়েরি সাথে।

এমনি এক মাতৃপিতৃ যুগের সন্ধিকালের দেবী বাক্‌-ও মানবী খ্যাতনামা বাগাম্ভৃণী। তারপর পিতৃপ্রধান যুগে—পিতা হয়েছেন দেবতা। পরমপিতা—দেবাদি-দেবেরই যেন রূপে। আসামে আজো পিতাকে দেওতা বা দেতা বলে। বাংলাদেশে গুরুজনদের বলা হয় 'ঠাকুর' 'ঠাকুরতা'। ঋগ্বেদকালীন একশ্রেণীর মানুষদের দেবগণ বলার উৎস এখানে। ভূপতিদের দেবতা এমন কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলা হয়। তাই ভারতকে বলা হয়েছে দেবপ্রিয় ভূমি বা দেবভূমি। অশোককে বহু লিপিতে বলা হয়েছে দেবপ্রিয়। তথাপি সকলেই অন্য সকলেরি মত মানুষ। দোষগুণে কমবেশী হলেও সকলেরি দোষগুণ আছে। অতি মহান্ মানুষেরো দোষ আছে ভুল ত্রুটি আছে। সব দেশই এইঅর্থে দেবপ্রিয় দেশ। কোন দেশ কোন নগরীই 'God's own land or 'city' ঈশ্বরের একমাত্র নিজস্ব ভূভাগ বা নগরী নয়। দেব দানব অসুর রাক্ষস পিশাচদের কথা বলার সময় এই অতি বাস্তব সত্য স্মরণ রাখা দরকার। বিশেষত জাতি বর্ণ রূপ দেশ নিয়ে অন্যায় ভেদাভেদ রক্তারক্তির কালে। এমন কি দেবমাতা অদিতিরই পঞ্চ পুত্র : সুর অসুর গন্ধর্ব রক্ষ নিষাদের কাহিনী। ঋগ্বেদেরি প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কেরি বাণী। তেমনিই এক প্রাচীন নারী সরমা কুকুরের নামে। সরমা হোতেই সারমেয় শব্দেরো উৎপত্তি হয়েছে। এই ধরণের নাম করণকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই 'টটেম' প্রথা বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'টটেম' শব্দটিও সম্ভবত 'তাতম' শব্দ হোতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই যোগসূত্র তাঁদের কেউ দেখিয়েছেন বলে জানি না। তবু এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সম্যক বিবেচনা করলে প্রতীত হবে যে পশুপক্ষী দেবতাদের নামে নাম হলেই তাদের থেকে সেই সেই নামের গোষ্টি জাতি উপজাতির জন্ম হয়েছে এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। নানা কারণে বিভিন্ন প্রতীক ভূপতি পুরোহিতরা এবং বিভিন্ন কালের ও দেশের মানুষেরা ব্যবহার করেছেন। 'টটেম' প্রথার ধারণাবশে নয়। মূলত জীবিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যাবে। মনে রাখা দরকার রাজা পুরোহিত যোদ্ধাগিরি অতি প্রাচীন জীবিকা। শিকার ও পশু পালনও। শাসনশোষণ বৃত্তিও। তার ধরনধারণ

পদ্ধতি। মানা ও মানানোর। স্বতন্ত্র ভাবেও তা আলোচ্য। এ সব সম্বন্ধে গ্রহনক্ষত্রাদির সম্পর্ক স্থাপনও অতি-প্রাচীন। সরমা-সারমেয় প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত আছে সুমেরু বাবিলন মিশর ভারতের অনেক সুপ্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা।

এই সরমা নিজমুখেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এক সূক্ত গানে 'ইন্দ্রদূতী' বলে। এই সূক্তটি ভারতে প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা ও এক দিক নির্ণয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ। তার জন্য পৃথক আলোচনা করতে হবে। কিন্তু এই সূক্তে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে পনিদের বিপুল নিধির অন্বেষণে বহু দূর দেশ হোতে রসানদী অতিক্রম ও ভ্রমণ করে শেষে নিজের চোখে পনিদের গুপ্ত পর্বত-গুহায় বিপুল গো অশ্ব ধনরত্নাদি দেখে স্বদেশে ফিরে যান এবং ইন্দ্র আঙ্গিরসকে এবং বৃহস্পতিকে এই অমূল্য সংবাদ দেন। 'অরস' আরমীনিয়ার পশ্চিমে।

এই সূক্তে (ঋ. বে. ১০।১০৮) সরমা যে 'রসা' নদী অতিক্রম কোরে বহু দূর দেশ হোতে আসার ও ফিরে যাওয়ার কাহিনী বলেছেন, সেই রসা যেন বর্তমান অরসের প্রস্রবণ। এই ভূভাগের কাছাকাছি এক প্রাচীন গিরিপথ 'জগরস' বা 'যগরস' (zagros) পর্বত। তারি মত হয়তো নদীটির নাম পরে হয়েছিল 'অররস'। পরবর্তী কালে সহজেই অররস অরসে হয়েছে রূপান্তর। একই ইন্দ্র—যদু তুর্বশ উগ্রদের অরময় বা অরমন নদী পার করিয়েই নয় পরে ভারতেও যদু তুর্বশদের সরযূ নদী পার করিয়েছেন। মিত্রবরুণ উর্বশীর পুত্র অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি ১।১৭৪।৯ ঋকে 'ধুনিমতী' ধ্বনি ইন্দ্রের দ্বারা যদু তুর্বশকে সমুদ্র পার করানোর কথা বলেছেন। এই সূক্তেই ২ ঋকে অগস্ত্য ইন্দ্রকে বলেছেন 'দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ'। মিথ্যাভাষী অর্থাৎ অবোধ্য ভাষাভাষী জন্ম। অন্যত্র পুরুদেবো মৃধ্রবাক বলা হয়েছে: 'পুরুম্‌ মিধ্রতে মৃধ্রবাচম্‌'। ইন্দ্রকে 'দনো বিশ' বিশেষণে বিশেষিত করাও তাৎপর্যপূর্ণ। যদু তুর্বশকে পার করার সম্পর্কে ইন্দ্রকে শচীপতিও বলা হয়েছে। দানবরাজ পুলোমারই কন্যা শচী পৌলমী। খ্যাতনামা ইন্দ্রাণী। দন দনু দানব সমার্থক। বৃত্তমাতা দানু ইন্দ্রের পালিকা মাতা অপ্সরী আপের ভগ্নী। ইন্দ্রজননী অদিতিরো। দানুই পরে হয়েছে দিতি। বিশেষত পুরাণ কাহিনীতে। ঋগ্বেদেও দিতি অদিতি একই ঋকে আছে। এই সম্পর্কে স্মরণীয় যে এই তুর্কি অন্তলীয়া—এশিয়ামাইনর ভূভাগেই আর্মেনিয়ার অসুর বণিকরা খৃঃ পূঃ ২৪০০ বছরেরো আগে পণ্যজীবী পণিদেরি ব্যবসা করতো। ঋগ্বেদে বর্ণিত বাস্তব ঘটনাদির এবং তুর্কি এশিয়ামাইনর ক্ষ্যাত্ত ভূমিতে প্রাপ্ত, লিখিত পণ্য বাণিজ্যাদির বিবরণের ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অসুর পণিরা সিন্ধুসভ্যতার সম্ভবত মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্যায়ে ঐ একই কালে পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতেও অনুরূপ বসতি স্থাপন করেছিল। এ বিষয়টিও পৃথকভাবে যথাস্থানে আলোচ্য।

ইন্দ্রমিত্র কুৎস আঙ্গিরস অশ্বিনীযুগ্মের স্তুতিবাদে তাঁদের সাহায্যে রথসহ রসা নদী অতিক্রম করার কথা বলেছেন বহু প্রাচীন প্রখ্যাত কাহিণীর প্রসঙ্গে। যাদের রক্ষা করার জন্য অশ্বিনীর স্তুতিবাদ তার মধ্যে বিখ্যাত পুরুকুৎসের সঙ্গে আছেন অজানা কোন পৃশ্নি বিশ্ব স্বয়ংকৃত মরুত্মাতা পৃশ্নিরই নামে নামী। কুৎস ঋষির সঙ্গে কে এক শ্রুতর্য নর্য আছেন বশমখ্য। আছেন সুদূরের 'ক্ষেত্রপতি' মন্ধাতা। পুরুকুৎস পিতা। আছেন ভরদ্বাজ। আছেন 'সুদাণু' বণিক উশিজ কক্ষী-বান এবং দীর্ঘশবা। আছেন শম্বর বধে 'কশোজব' অতিথিগ্ন দিবোদাস। আছেন পুরুকুৎস পুত্র এসদস্যু। আছেন বম্র। আছেন ব্যশ্ব। আছেন কুৎস আর্জুনেয় শতক্রতু। আছেন তুর্বীতি ও দর্ভীতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ক্ষাত্ত ক্ষত্রিয় কিংবা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত পুরোহিত। সংহিতাকরা। ঋকগায়ক স্তোতা। তার মধ্যে আছেন সুদূর দাক্ষিণাত্য হোতে দেশবিদেশে ভ্রাম্যমাণ খ্যাতনামা সুপ্রাচীন বণিক দীর্ঘ-শ্রবা ও তাঁর পুত্র প্রখ্যাত কক্ষীবান। এঁরা শুধু বণিক নন সংহিতাকার স্তোতা। ঋগ্বেদের বহু সূক্ত রচয়িতা। সূক্তগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তু প্রাচীন। কক্ষীবান

সগর্বে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন দাসী হলেও তাঁরই মা উশিজের নামে ঔশিজ বোলে। পুরাণ কাহিনী অনুসারে সুবিখ্যাত দানবীর ভূপতি বলির রানী সুদেষ্ণার দাসী ছিলেন উশিজ। তবু অঙ্গিরস পুত্র কুৎস দীর্ঘশ্রবা ও কক্ষীবানকে স্তোতা বলে সম্মান দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতা অঙ্গিরার প্রসঙ্গে অদ্ভুতভাবে বলেছেন অশ্বিনীর দ্বারা তাঁকে রক্ষা করার কথা। 'গোতার্ণের বিবরে' অগ্রগামী তাঁর জনককে। গোঅর্ণ গোকর্ণ বোলে মনে হয়। সমুদ্র গুহাই সম্ভব। এই সূক্তের অনেক স্পষ্টই যেন নাম বিদেশী। অনেক নাম অজানাও।

মান্ধাতা নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন ভূপতি। তাঁর নাম এখনো জনপ্রিয় প্রবচনে 'মান্ধাতার কাল' বলে মুখে মুখে কথিত। ঋগ্বেদে তাঁকে মন্ধাতাও বলা হয়েছে। তাঁর ক্ষেত্রপতি বিশেষণ—এসিয়ামাইনর-তুরকি-আরমেনিয়ার খেত বা ক্ষেত রাজ্যের ও সাম্রাজ্যের খাত্তি বা ক্ষাত্তি ভূপতিদেরই কাহিণী স্মরণ করায়। আর এক খ্যাতনামা নাভাক কাণ্ব ৮।৩৯ সূক্তে ৮ম ঋকে যজ্ঞে মন্ধাতাকে পুরোহিতের মত অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার কথা বলেছেন। 'দস্যুহত্যা'র জন্যে। এই ধনকে অগ্নিকে সিন্ধুতে সপ্তমানুষের আশ্রিত বলা হয়েছে। 'সপ্ত মানুষে'র সঙ্গে সিন্ধুর যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সিন্ধুসভ্যতার এক শীলে ক্ষুদ্র পরিচয় লিপিসহ বিভিন্নবেশী সপ্তমানুষের বিচিত্র চিত্র আছে। অতি বাস্তব।

ঋগ্বেদে ঋকপূর্ব ও ঋগ্বেদী ভারতের সপ্তবুধ্নের কাহিণী আছে। সপ্তবুধ্নের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং কাহিণী স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। এঁর মধ্যে ছিলেন এক খ্যাতনামা কবি বুধ্ন। ঋগ্বেদী মানুষদের চোখে ক্রমেই সপ্ত কথাটিই হয়ে ওঠে পবিত্র। পরম বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এক সিন্ধু হয় সপ্তসিন্ধু। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। সপ্তপিতা। সপ্তমাতা। সপ্তস্বসা। সপ্তঋষি। সপ্তবিপ্র। সপ্তহোত।

সপ্তবুধ্নের অন্যতম ক্ষেতিবুধ্ন ক্ষাত্তিদের ক্ষেত রাজ্যের কথাই মনে করায়। মহৎ দেবগণের মধ্যে অসুরদের বর্ণনা করেছেন বিশ্বামিত্র পুত্র প্রজাপতি বাচ্য বা বৈশ্বামিত্র ৩।৫৫ সূক্তে। অসুরদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনাকালে এই গুরুত্বপূর্ণ সূক্তটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অসুরদের কথা বলা হবে। অসুরদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাক্ইতিহাস, ইতিহাস ও ঋগ্বেদবিরুদ্ধ নিতান্তই অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য উপস্থিত এ-কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে ঋগ্বেদ মতে বহু দেব-দেবীর গৌরবসূচক উপাধিই ছিল অসুর। রুদ্রকেও বলা হয়েছে 'অসুরো মহো'। মহান্ অসুরই শুধু নয়, মহান্ অসুরকে যিনি জানেন তিনিই রুদ্র। রুদ্রগণ পরে এক রুদ্র হয়েছেন। ঋ' বে. ১০।১২৫।১, ৮।২০।১০, ৪।২।৫।

'সম্রাট' 'হোতা' ক্ষেতিবুধ্নের অগ্রে দ্বিমাতা বিচরণ করেন। মহৎ দেবগণের মধ্যে এক অসুর। তার আগের ঋকে মিত্র বরুণেরও ব্রহ্মের সঙ্গে দ্বিমাতার অগ্রে বিচরণকারী বন্ধনহীন এক বৎস। এই দ্বিমাতা অথর্ব-বেদের এক সুপ্রাচীন আখ্যানে দ্বিমূর্ধা অসুরগণমাতা। কুৎস আঙ্গিরস অশ্বিনীর স্তুতিতে ১।১১২।৪ ঋকে অদ্ভুত ভাবে বলেছেন: 'দ্বিমাতা তূর্য তরণি বিভূষণ করেন। তারি সঙ্গে কোন বিশেষ পরিচয় না দিয়ে বিচিত্র তনয়ের কথা বলেছেন। তূর্ব যেন তুরসু বা তুরদের সু বা অসু প্রাণিস্বরূপা মাতা। এইসঙ্গে গন্ধর্বদের মধ্যে পালিত গন্ধর্ব প্রধান প্রথম রাজা সোমের পত্নী ব্রহ্মজায়া প্রথমা মানবীর কথা বলতে গিয়ে ঋতের দ্বারা জাত অর্থাৎ প্রকৃতির সত্য নিয়মে প্রসূত উগ্রা 'আলো-দেবী'কেই সেই অনন্যা অসামান্যরূপে সনাক্ত করছেন নিজেই নিজেকে। ১০।১০৯ সূক্তের রচয়িতা অন্য কেউ নন স্বয়ং ব্রহ্মজায়া, ব্রাহ্ম উর্ধ্বনাভো বা নামটিও অদ্ভুত জুহু। ঋতব্রতের নায়ক মিত্র বরুণই তাঁকে হাতে ধরে বৃহস্পতির করে আবার সমর্পণ করলেন। অম্ভৃণ বা আপেরি কন্যা বাক্। বাগাম্ভৃণী। বাক্ ১০।১২৫ সূক্তে সপ্তম ঋকে নিজেই বলেছেন যে মম যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান অপ্সু র অন্তসমুদ্রে। সিন্ধুতে। অপ্সু গন্ধর্ব বিবস্বন ও অপ্যা অপ্সরী—যমযমী অশ্বিনী-যুগ্মের জনক-জননী। সবর্ণা অপ্যার পুত্র 'সাবর্ণি' 'অপ্সব'

'বৈবস্বত' মনুরো। গন্ধর্ব দেবাসুরাদি মানুষদেরি মাতৃ-মূলক সমাজের সুবিশ্রুত জননীদের ও মাতাপিতৃমূলক সমাজের মাতাপিতাদের কাহিণীর সঙ্গে জড়িত ঋগ্বেদপা-দিতে ও ব্রাহ্মণসাহিত্যে কদ্রু আপ অদিতি অপ্যা সরণ্য। বাক্ দানুদিতি অহিবুধ্ন সপ্তবুধ্ন ত্বষ্টা ইন্দ্র অগ্নি মিত্র বরুণ অর্যমার মরুৎ অশ্বিনী যমযমী মনুর অসামাজিক জন্মের ইতিকথা ও রূপকথার আবরণে শ্রুতিস্মৃতিধৃত ইতিবৃত্ত। এসবের ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য' যথাস্থানে বিবেচ্য।

এই উপক্রমণিকায় ক্ষাত্ত মিতান্নি ক্ষত্রিয় মৈত্রেয় তুরাণ তুর্ব্যান তুর্বিতি তুরদের প্রাচীন এশিয়ামাইনর তুর্কি তুর্কিস্থান তুর্কিমীনিয়া সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় তাদের অনেকেরই প্রাচীন সম্পর্কের স্পষ্ট বা গূঢ় ঈঙ্গিত বহু ঋকগানে। ১।৬১, ১০।৩৫-৩৬, ৫।.১।

নিঃসন্দেহে আপ আর্যানার্যের জাতিবর্ণকুলগোত্র-হারা হিন্দু ভারতেরি এক প্রাচীন জননী। শুধু অসবর্ণ ভারতের নয় বর্ণাশ্রমী ভারতেরো। তথাকথিত আর্য ও অনার্যেরো দেবতা। অসুরেরো। অবিচ্ছিন্নভাবে আদিকালে। বিভিন্ন বংশগোত্রকুলের ভেদাভেদী বিচ্ছেদ ঘটেছে ক্রমে পরবর্তী কালে কালে। জেতা বিজেতার প্রভুত্ব দাসত্বের শক্তি অর্থ প্রতিপত্তির জোরে। বাহুবল অস্ত্রবল বুদ্ধিবলের ভিত্তিতে। এই সম্বন্ধে সর্বাগ্রে লক্ষ্যণীয় অবিমিশ্র আর্য বা অর্য বর্ণ কিংবা অনার্য বর্ণ কোন কালেই ছিল না। আদি বৈদিক কালেও নয়। মানুষেরই ক্রমবিকাশের অকাট্য প্রমাণে। ঋগ্বেদেও তার প্রমাণ প্রায় সর্বত্র। মহাবিজেতা 'মহাঁ ইন্দ্র' 'দেবরাজ' স্বয়ং ইন্দ্রেরই কনীন জননী অদিতি চমূরি চষ গোষ্টিবরই কন্যা। চষসুত ধষ্টারই ঘরণী ৪।১৮। আপ অপ্যা একই গোষ্টির বিভিন্ন শাখার। যমযমীর উক্তিতেই প্রমাণ: অপ্সরী অপ্যা ও অপ্সু গন্ধর্ব (বিবস্বন একই) যমযমী যমজেরি নয় অশ্বিনী যুগ্মেরও জননী। সরণ্যু সবর্ণারূপে মনুরো। যমযমী মনুর বংশধরেরা বারংবার ঋকগানে আপকে তাদের গোষ্টির মাতা বলে স্তুতি করে গেছেন। জন্মমাত্র অদিতি দ্বারা গিরিগর্ভে বিবর্জিত শিশু ইন্দ্রকে মাতৃস্নেহে অগ্নি ত্রিতের সঙ্গে মানুষ করেন আপ। বিজেতা ইন্দ্রের গৌরবে সকলেই পরে হয়েছেন মহাদেবী। ১০।১০, ১৭,১৮, ৩০।৪।১৮।

ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৬ সুক্তে প্রজাপতি বাচ্য বা বিশ্বামিত্র চতুর্থ ঋকে এক অদ্ভুত কথা বলেছেন এই আপ সম্পর্কে। আপ নাকি অরমন্ত দেবী পৃথক ভ্রমণ করছেন কোথায়। অরমন্ত দেবীর নাম মাত্রেই অতি সহজেই অরমন নদী ও তারই তীরের আরমেনিয়ার কথা মনে পড়ে। আপের জীবনে যেন কোন অজানা কালে এই নদী ও ভূভাগের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল এই ঋকে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। যদিও এখনও গহীন গুহায় নিহিত সে তত্ত্ব। কিন্তু কাল অস্পষ্ট হলেও আপের উক্ত সম্বন্ধ অনেকটা স্পষ্ট। ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎগণ ও অশ্বিনীযুগ্মের সম্বন্ধ তাকে আরও বাস্তব করেছে। এই-সব ভূভাগে সুপ্রাচীন পুর, নগর, জনপদে ভূগর্ভ খনিত বস্তুগত লিখিত লিপিগুলি তাকে দিয়েছে অন্ততঃ আংশিক ঐতিহাসিক রূপ। বিশেষতঃ প্রাচীন প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক ভারতের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের। বেদপরবর্তী ভারতেরও সহিত। ইহা পরে আলোচ্য।

পূর্বোক্ত সুক্তে অরমন্ত দেবী আপ দ্বারা পৃথিবীতে সবিতার কাছ হতে অন্নাদি যজ্ঞের জন্য রত্ন প্রার্থনা করেন' বলা হয়েছে এই সুক্তেরই সপ্তম ঋকে। এখানে 'রোদসি' শব্দ ব্যবহৃত দ্যৌ ও পৃথিবীর মিলন বুঝাতে উভয়ের সংযোগস্থানে অর্থাৎ পর্বতে। রত্নের সঙ্গে 'উর্বী' বিশেষণ প্রয়োগ পার্থিব রত্নই বুঝায়। আজ পুরাতত্ত্বের প্রমাণিত সত্য যে এই ভূভাগের মানুষরা বিশেষতঃ ভারতের ক্ষত্রিয় মৈত্রেয় পুরু মনু মীন মৎস্য দ্রুহ্য যদু, তুর্বশাদির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ক্ষাত্ত মিতান্নি 'জনে'রা ও জলপতিরা তুর্কি আরমেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে বাস্তবিক খনিজ রত্নধনাদি খনন ও আহরণ করত। তাম্র অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকে। লৌহ দ্বিতীয় সহস্রকে। তাম্র-লৌহের মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জ যুগে বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে ব্রোঞ্জ গালানো হোত। আগে তামা পরে লোহা। তামারও আগে প্রস্তর যুগে

নির্মিত হোত এইসব অঞ্চলেও প্রস্তরযুগের নানা বস্তু ও অস্ত্রশস্ত্র। তাম্র প্রস্তর যুগেরই কাল অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪২০০ অব্দ হতে ২৬০০ অব্দ। অঞ্চল বিশেষে তারও পরে। ধনরত্নের মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য নানাবর্ণের মূল্যবান্ প্রস্তরাদিও প্রাচীনকাল হতে বিখ্যাত সম্পদ্। তাম্র-প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি সহজেই খণ্ড ও চূর্ণ করে ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জ সভ্যতার আধিপত্য বিস্তার করেছে। ক্ষাত্তি মিত্তান্নিরাও প্রধানতঃ লৌহ নির্মিত তীর বর্শা ফলক খড়্গাদিরই বলে আমিশর ট্রয় (ত্রয়) শিরিয়া ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। কখন কীভাবে তা স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্য।

সুতরাং এক আদিম জননী আপের রত্নধন অন্বেষণ এই অঞ্চলে অতীব সম্ভব। অপ্ন বিবস্বনের পরবর্তী বংশধরদের কালে সবিতা দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে আপের সঙ্গে। তবু এখনো এই সূক্তেও মিত্র বরুণের সঙ্গে সবিতা ও অসুরদের তিন বীর রাজা "রাজানা মিত্র বরুণা...ত্রয়ো রাজন্যাসুরস্তবীরা" ৩।৫৬।১-৮। তিন জনই অসুরদের বীর রূপে বিরাজ করেন। ত্রয় নগরীরো উপরে ক্ষাত্তিদের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় প্রায় খৃঃ পূঃ ১৯০০ হোতে দ্বাদশ শতক অবধি। এই সূক্তে ত্রি ও ত্রয়ের স্তুতি। ট্রয় খুবই সম্ভব: 'ত্রয়' শব্দ হোতে ইউরোপীয় উচ্চারণে ট্রয়ে রূপান্তরিত। 'ক্রুট' দ্বীপ তেমনিই কৃতি হোতে। 'ক্রীট' ক্রীত শব্দ হোতে রূপান্তর নয়। ভূমধ্য সাগরের এই সব দ্বীপে মিশরীয় ও ক্ষাত্তি মিতান্নিদের সভ্যতা ও প্রভাব অতি প্রাচীন। অমর অমরু অমুয়দেরো। পরে ময় মায়ী মায়িশদের ময় দানবদেরো। 'মাইশিনিয়া' খুবই সম্ভব মায়ীশীনিয়া মূলত। গ্রীক ভাষাতেও কৃট্ 'KRITI'।

সুমেরু বাবিলনের অতি সুপ্রাচীন ঈশীন্ বা ইশিন্ পুর-রাজ্যের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে বিস্তারিত হয়ে পড়ে তাঁর দেবী—ঈপীশ ইশীন্ আইশিষের এবং পরে ঈক্ষ্মরী, ঈশ্বরী ঈশ্বরীর নামে। পিতৃপ্রধান যুগে ঈশ ঈশান ঈশ্বরের নামে। ঋগ্বেদে ও বিশেষত অথর্ববেদের এক প্রাচীন সূক্তে ব্রাত্য পশুপতি ঈশানের সমস্ত প্রাধান্যের বর্ণনা তাঁর নামো বহু ভব, সর্ব, রুদ্র।

রুশিয়াতেও তার এক প্রমাণ আজো জাজ্বল্যমান। কাজাখিস্তান রুশিয়ার ঈশীন বা ইশিনই ২ নদী। শরত নদী ইরাবৎ (ইরা ঈশা) পুর ইরত বা ইরাতের ঈশ হোতে। ঈশিন ও ইরতীশ উত্তর বাহিনী হয়ে পূবে বেঁকে যুক্ত হয়েছে সুদীর্ঘ অব বা অপ নদী সংগমে। উত্তর মেরু সাগরের অন্তর্গত দীর্ঘ সরু অপ উপসাগরে ও পরে কর সাগরে পতিত। কর সাগরো সুবিখ্যাত কস্মে কর কুরুদের নামাংকিত। কর সাগর হোতে কুরঙ্গন কারাকুরুম কুরুক্ষেত্র। কর সাগর হতে করবঙ্গলা। কর পাথরে হতে করমণ্ডল।

ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি

সম্প্রতি ইসরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ও যে যুদ্ধ এখন স্থগিত আছে, সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার রেডিও এবং টেলিভিশনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা "নিউজ ফ্রম ইসরায়েল" পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"দ্বিপ্রহর দুইটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে ৬-১০-৭৩ তারিখে মিশর ও সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী বহু স্থলে সিনাই ও গোলান হাইটস অঞ্চলে ইসরায়েলের উপর হাওয়াই, সাঁজোয়া গাড়ীর ও তোপের আক্রমণ আরম্ভ করে। ইসরায়েলের রক্ষাবাহিনী প্রত্যাক্রমণ করিয়া ঐ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিতেছে এবং শত্রুদিগের বহু হতাহত ও অপর লোকসান হইয়াছে।

"মিশর ও সিরিয়ার শাসকগণ যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ পুনরারম্ভ করিবার মতলব বহুদিন হইতেই করিতেছেন এবং তাঁহারা মিথ্যা প্রচার করিতেছেন যে ইসরায়েল যুদ্ধ পুনরারম্ভের জন্য দায়ী। কিন্তু এই যুদ্ধ আরম্ভ কার্য্য তাঁহারাই করিয়াছেন ও ইহার সকল দায়িত্ব তাঁহাদিগেরই।

"শত্রুপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে ইয়ম কিপ্পুর (অনুতাপ দিবস) যে দিন সেই দিন যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ইসরায়েল হঠাৎ অজান্তে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। কেননা ইয়ম কিপ্পুর কালে আমাদের অধিকাংশ লোক সিনাগগে গিয়া প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করে ও ইসরায়েল ঐ দিন প্রত্যাক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে না। কিন্তু আমরা প্রস্তুত ছিলাম ও হঠাৎ আক্রান্ত হইলেও আমরা সামরিক পাল্টা জবাব দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

"কিছুদিন হইতেই আমরা জানিতাম যে মিশর ও সিরিয়া সৈন্য পাঠাইয়া স্থানে স্থানে আমাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সুয়েজ-খাল ও গোলান হাইটস অঞ্চলে সশস্ত্র সৈন্যদল ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িয়াই চলিতেছে। পূর্ব্বের খবরের সহিত এই সকল খবর ঠিক মিলিয়া যাইতেছিল ও আমাদের সেনাবাহিনী এই বিপদের সম্মুখীন হইতে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল।

"আমাদের কোনও সন্দেহ নাই যে আমরা বিজয়ী হইব। আমরা ইহাও জানি যে এই আক্রমণ একটা উন্মত্ত অবস্থা হইতে উদ্ভূত। আমরা চাহিয়াছিলাম যাহাতে যুদ্ধ আরম্ভ না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ও সেই জন্য আমরা অপরাপর রাষ্ট্র সকলকে জানাইয়াছিলাম তাঁহারা যেন মিশর ও সিরিয়ার পাগলামোর কোনও সমর্থন না করেন। আমরা প্রতিপত্তিশালী বন্ধুগণকে বলিয়া চেষ্টা করিয়াছিলাম যাহাতে তাঁহারা মিশর ও সিরিয়াকে বুঝাইয়া যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইতে পারেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধ লাগিয়াই গেল।"

১৩-১০-৭৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাদিগের সহিত একটি বৈঠকে বলেন :

"আমরা এই যুদ্ধ আরম্ভ করি নাই—কিন্তু আমরা যে ক্ষেত্রে আক্রান্ত হইয়াছি সে ক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া চলিব। ইসরায়েলকে তাহার প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করিয়াছে এবং এই আক্রমণে দূর দূর আরব দেশ, যথা ইরাক, এলজিরিয়া, টিউনিস প্রভৃতিও সাহায্য করিতেছে। ইহা ব্যতীত পৃথিবীর দুইটি সামরিক

শক্তিতে মহাপ্রবল জাতির একটি সিরিয়া, মিশর ও ইরাক'ক সকলপ্রকার সামরিক হাতিয়ার বিগত ছয় বৎসর কাল হইতে প্রভূত পরিমাণে দিয়া আসিতেছে। সেনাধ্যক্ষ ও সেনাগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এই মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র করিয়াছেন। ইউ এস এস আর আত্মরক্ষা শিক্ষা দিবার জন্য মিশর ও সিরিয়াতে যা'ন নাই।

"এই ছয় বৎসর ধরিয়াই আমরা আমাদিগের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে রক্তপাত করিয়া আমাদিগের নিজেদের সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আর একটা যুদ্ধ হইলে শুধু রক্তক্ষয়, প্রাণবিনাশ ও ধ্বংসলীলাই চলিবে—কোনও কিছুরই মীমাংসা হইবে না—একমাত্র আলাপ আলোচনা করিয়াই কলহের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব।

"আমরা একটি অতি ক্ষুদ্র জাতি। আমাদের ও আমাদের আক্রমণকারী জাতিগুলির সৈন্যসংখ্যার কোন তুলনা হয় না। আক্রমণকারীদিগের সেনাবাহিনী বিরাট ও আমরা তুলনায় কিছুই নহি। আমাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের মালমশলার সেইরূপ পূর্ণ ভাণ্ডার নাই যেরূপ তাহাদের আছে; কিন্তু দুইটি বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সে দুইটি হইল যুদ্ধ ও প্রাণনাশ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব।

"নানাপ্রকার অসুবিধা থাকিলেও আমরা আত্মবিশ্বাসী। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের যে অবস্থা ছিল আজ তাহা হইতে আমাদের অবস্থা উন্নততর হইয়াছে। আমরা ঘোর বিপদের সম্মুখীন ছিলাম। আমাদের শত্রুগণ নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লড়াই করিতেছে না, তাহাদের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার। তাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে। আমরা বিনষ্ট হইব না।

চিনির পরিবর্ত্ত

"মার্কিন বার্ত্তা"তে প্রকাশ :

যারা চিনি খেতে ভালবাসে অথচ চিনির অতিরিক্ত ক্যালরির জন্য মোটা হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করে না তাদের জন্য প্রয়োজন আফ্রিকার বেরী বা জাম জাতীয় এক প্রকার ফল। পশ্চিম আফ্রিকায় এই জাম প্রচুর জন্মায়। জামগুলির রং লাল আর খেতে খুব মিষ্টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই জাম থেকে তার মিষ্ট উপাদানটা পৃথক করার কাজে সফল হয়েছেন। এই পৃথক করা উপাদানটি দেখতে সাদা পাউডারের মত। চিনির থেকে এই গুঁড়ো তিন হাজার গুণ বেশী মিষ্টি। এই আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার খাদ্য শিল্পে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। চিনির পরিবর্ত হিসেবে আফ্রিকার এই জাম হচ্ছে আদর্শ। অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার দরুণ যাদের কটি দেশ বেড়ে যাচ্ছে তাদের পক্ষে এর মত উপকারী আর কোনও জিনিস নেই।

সয়াবিন থেকে মাংসের অনুরূপ খাদ্য

আমেরিকার খাদ্য বিজ্ঞানীরা সয়াবিন থেকে এক ধরনের প্রোটিন খাদ্য উৎপন্ন করেছেন। এগুলি দেখতে ঠিক মাংসের মত। আসল মাংস থেকে একে আলাদা করা সহজে সম্ভব নয়।

এই খাদ্যের গঠন, খাওয়ার পদ্ধতি, একে কাটবার ধরণ, চেহারা আর রং অবিকল মাংসের মত। এমনকি এর স্বাদ আর মাংসের স্বাদের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। সত্যই বিস্ময়কর এই খাদ্য। এর আরও বিশেষত্ব এই যে, এই খাদ্য বস্তুটি মাংসের মতই প্রোটিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানে সমৃদ্ধ। নিরামিষ খাদ্যের প্রোটিন উপাদানের ব্যাপারে এই খাদ্য এক বিপ্লব আনবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রোটিন খাদ্যের প্রক্রিয়ণের কথা এবার বলা যাক্। সয়াবিনের খোসাগুলি প্রথমেই ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে কয়টি রোলারের মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে গড়িয়ে যেতে দেওয়া হয়। এরপর সেগুলি ছোট ছোট পাত্‌লা আঁশের মত হয়ে বেরোয়। সেগুলিকে হেক্‌সেন নামক হাইড্রোকার্বনের দ্রবণে ডোবানো হলে সেগুলি থেকে তেল নির্গত হয়। তেল আর হেক্‌সেনের এই মিশ্রণে তাপ দিলে হেক্‌সেন

বেরিয়ে যায়। কারণ এর স্ফুটনাঙ্ক খুবই কম। তখন এই তেল দিয়ে রান্নাখান্না করা যায়।

তেল বার করে নেবার পর সয়াবিনের যে পাতলা আঁশগুলি পড়ে থাকে সেগুলিকে ময়দার মত গুঁড়ো করে ফেলা হয়। ৫০ শতাংশেরও বেশী প্রোটিন থাকে এই ময়দায়। আরও প্রক্রিয়ণের দ্বারা হজমের পক্ষে কঠিন কার্বোহাইড্রেটগুলিকে ধুয়ে বার করে দেওয়া হয়। তারপরে যে ময়দার মত গুঁড়ো পড়ে থাকে তাতে শতকরা ৯০ ভাগ প্রোটিন পাওয়া যায়। এই ময়দাগুলিকে ক্ষারের দ্রবণে মিশিয়ে নিয়ে চরকা জাতীয় একটি যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয়। কৃত্রিম রেশম, নাইলন প্রভৃতি যেভাবে বোনা হয় এই প্রক্রিয়ণও সেই ভাবেই চলে।

এই দ্রবণ এরপর হাজার হাজার ক্ষুদ ক্ষুদ্র ছিদ বিশিষ্ট একটি ছাচের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে। এই তরল পদার্থটি তখন তীব্র ধারায় নির্গত হয় এবং একটি এ্যাসিডের দ্রবণের সঙ্গে মিশে যায়। তখন এই তরল পদার্থ সঙ্গে সঙ্গে ফিকে সোনালী রংয়ের প্রোটিনের তন্তুবিশেষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই তন্তুই শেষ পর্যন্ত মাংসের আঁশালো ভাবটাকে বজায় রাখে।

এই পর্যায়ে প্রোটিনের আঁশগুলি থাকে স্বাদ ও রংবিহীন। এই আঁশের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গন্ধ, বর্ণ আর পুষ্টিকর উপাদান মিশিয়ে নানা রকমের খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা হয়। তারপর দরকার মত আকার অনুযায়ী কেটে, রান্না করা যায়।

প্রক্রিয়ণের সময় ডিমের শ্বেতাংশ, গমের ময়দা, চিনি, নুন, উদ্ভিজ্জ তেল, নানা রকমের ভিটামিন আর ধাতব পদার্থ এর সঙ্গে মেশানো হয়। এই মিশ্রিত দ্রব্য ছাঁচে ঢেলে এক ঘণ্টা ধরে প্রেসার কুকারে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর একে ঠাণ্ডায় রেখে কঠিন পদার্থে পরিণত করা হয়। এবারে 'মাংসশূন্য এই মাংস' দরকার মত কেটে টুকরো করা হয়।

আরবদিগের দাবীর ন্যায্যতা

অক্টোবর ৬ তারিখে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহার প্রথম গুলিটি কে ছুঁড়িয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া যুদ্ধের দায়িত্ব নির্ণয় চেষ্টার কোন মূল্য আছে বলিয়া অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ্ই মনে করেন না। কারণ যুদ্ধ যে হইতেছে তাহার মূলে আছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম কাহিনী। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহুদি জাতি কোথায় বাস করিত তাহা বিচার করিয়া ১৯২৪ হইতে ১৯৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানা ভাবে ব্যবস্থা করিয়া আরবজাতি-সকলের বাসস্থানে ইসরায়েল রাষ্ট্রের কেন্দ্র স্থাপন করাটা ন্যায্য কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন না। আরবদিগের যে ইসরায়েল-রাষ্ট্র-সৃজন-বিরুদ্ধতা তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই এই সকল বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস। ইহার পরে ছয় দিনের যুদ্ধে আরবদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ইসরায়েল যখন আরও অনেক আরব এলাকা দখল করিয়া লইল তখন ইসরায়েলের ইহুদি-দিগের পরের দেশ দখল করিয়া চড়াও হইয়া বসা আরও পূর্ণতর আকার গ্রহণ করিল। ইহুদিগণের মতলব ছিল নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা একদিকে সুয়েজ খাল ও অন্য আর একদিকে সিরিয়ার গোলান হাইটস অঞ্চল স্থিতিশীলভাবে প্রতিষ্ঠা করা। একথা ছয় দিনের যুদ্ধের পরে জোর গলায় না বলিলেও এখন ইহুদিগণ খোলাখুলিভাবেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এই বৎসর ছয় তারিখ অক্টোবর যখন কায়রো রেডিও প্রচার করিল যে, মিশরের সেনা-বাহিনী সুয়েজখাল পার হইয়া সিনাই অঞ্চল পুনরায় অধিকার করিতেছে ও তৎসঙ্গে মিশরের আকাশ বাহিনী ইসরায়েলের বিমান বহরের সহিতও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে তখন বিশ্ববাসীর মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করিলেন যে মিশরের এই আক্রমণ ন্যায়তঃ সমর্থন করিতেই হয়।

কে আগে গুলি চালাইয়াছে একথা তাহা হইলে বিচারের বিষয় নহে। সকলে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যে যেখানে ছিল সেখানে ফিরিয়া যাইলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হইবে ইত্যাদি কথারও কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মূল কথা হইল, অন্যায়ভাবে ইসরায়েল, রাষ্ট্র সৃজন করিয়া আরবদিগকে নিজবাসভূমে পরবাসী

করিয়া দেওয়া। ইহার জন্য দায়ী ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও পরে অন্য অন্য বহু শ্বেতাঙ্গজাতি যাহারা ইহুদিদিগের জন্য একটা নিজ দেশ হইলে অনেক ইহুদি-সেই দেশে গিয়া বাস করিতে সক্ষম হইবে এই পরিকল্পনাপ্রাপ্ত মতলবে ইসরায়েল গঠনের বিশেষ সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। এখন যদি সকলে মিলিত হইয়া ইহুদিদিগের বাসভূমি বিস্তার করিবার চেষ্টা করে এবং আরও অধিক সংখ্যক আরবকে ইহুদিদিগের প্রজা হিসাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে এই ইহুদি-আরব কলহের কোনও শেষ কোথাও দেখা যাইবে না। এশিয়ার একটা বিরাট অংশ যদি ইয়োরোপ-আমেরিকাবাসী ইহুদিদিগকে আমদানী করিয়া আনিয়া একটা নূতন উপনিবেশবাদ (colonialism) সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে এই কলহ কোনও না কোনও সময় একটা বিশ্ব মহাযুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা প্রচণ্ড সমস্যার কথা। লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিলে এমন একটা অবস্থা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয় যে অবস্থায় মানুষের খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি আর সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। বৃটেনের অর্থনীতিবিদ্‌ ম্যালথাস প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, জনসংখ্যা সর্ব্বদাই দুই হইতে চার, চার হইতে আট ও আট হইতে ষোল এইরূপ ভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ অষ্টগুণ হারে বাড়িয়া চলে কিন্তু খাদ্যবস্তুর পরিমাণ বাড়ে দুই আর দুইএ চার, চার আর দুইএ ছয় ও ছয় আর দুইএ আট এই রকমভাবে। সুতরাং এই গুণান্তর ও সমান্তর শ্রেণীর বৃদ্ধির পার্থক্য হেতু পৃথিবীতে শীঘ্রই জনসংখ্যা বাড়িয়া এইরূপ হইবে যখন খাদ্যাভাবে মানুষের আর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। ম্যালথাসের যুগের পরে তাঁহার হিসাব যে মোটামুটি ঠিকই ছিল তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভিতর প্রমান হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি, খাদ্য উৎপাদনরীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি হওয়াতে খাদ্যাভাব সেইরূপ মারাত্মকরূপ ধারণ করে নাই। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে নব-নব উপায় অবলম্বন ক্রমশঃ আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজ থাকিতেছে না। একথা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত খাদ্য উৎপাদন আর তাল রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইবে না। আগামী দুই-তিন দশকের মধ্যে যদি জন্মসংখ্যা এখনকার তুলনায় অর্দ্ধেকও হইয়া যায় তাহা হইলেও একশত বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা এখনকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। খাদ্য বাসস্থান প্রভৃতির সরবরাহ ইহার মধ্যে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। পানীয় জল ও দাহ্য তৈল লইয়া এখন হইতেই অর্থনীতিজ্ঞদিগের মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বৎসরে শতকরা ২ হারে হইয়া থাকে। ইহা যদি হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে পৃথিবীর জনসংখ্যা একশত বৎসরে প্রায় ৩০০০ হাজার কোটি হইয়া যাইবে। এখন পৃথিবীতে ৩৬০ কোটিজন মানুষের বাস এবং তাহাতেই সকলের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান ঠিকমত জুটিতেছে না। জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণ একটা অতি আবশ্যক সামাজিক ব্যবস্থার কথা। বৈজ্ঞানিকগণ এখন চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে অধিক শিশুই পুরুষজাতীয় হয়। তাহা হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি তেমন হইবে না। এই চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণ চেষ্টা চলিতেছে।

উপনিবেশ স্থাপণ ও শোষণ

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ সর্ব্বক্ষেত্রে এক কথা না হইতেও পারে। সাম্রাজ্য থাকিলেই যে শাসক-জাতীয় ব্যক্তিগণ সেই সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গিয়া বসবাস করিবে এমন কথা না উঠিতেও পারে। প্রভুত্ব থাকিলেও সাম্রাজ্যের অনেক স্থলেই প্রভুদিগের নিবাস গঠিত হইবে না এই রীতিও প্রচলিত থাকিতে পারে। ইহার কারণ এই যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য উপনিবেশ স্থাপন হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে।

উপনিবেশ স্থাপন না করিয়াও প্রভুত্ব করা সম্ভব এবং শোষণ করিয়া সাম্রাজ্যের মালিকদিগের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিও হইতে পারে।

উপনিবেশ স্থাপিত হইলেই যে সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। অনেক সময় এক দেশের মানুষ অন্য দেশে গিয়া বাস করে এবং কাজকর্ম্ম করিয়া দিন গুজরানও করে। কিন্তু তাহাদের নিবাসক্ষেত্রে কোনও প্রভুত্ব না থাকিতে পারে। যথা, আমেরিকায় বহু লক্ষ কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীদিগের নিবাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রভু ত ছিলেনই না বরঞ্চ ছিলেন আমেরিকার শ্বেতকায়দিগের দাস। অর্থাৎ কৃষ্ণকায়দিগের আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন হইয়াছিল প্রভুত্ব করিয়া শোষণ কার্য্য সাধনের জন্য নহে, তাহার কারণ ছিল দাসত্ব করিয়া শোষিত হওয়ার মধ্যে। সিংহলে তামিলদিগের উপনিবেশ জাফনা প্রদেশে তামিলগণ কোন সময় প্রভুত্ব করিবার জন্য গিয়া থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহাদের সে স্থলে কোনও প্রভুত্ব নাই। তাহারা এখন সিংহলেরই "অধিকারভোগী" নাগরিক। তাহারা কোনও সিংহলবাসীকে শোষণ করিবার কোনও সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করে কয়েক সহস্র রাজস্থানবাসী। ইহাদিগের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব না থাকিলেও ইহারা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে শোষণ করিতে সমর্থ। পশ্চিমবঙ্গে আরও আছে বহু লক্ষ হিন্দী-ভাষাভাষী বিহার উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মানুষ। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে এবং ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই শোষক বলিয়া পরিচিত নহে। ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আছে বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদী এ কথা বলা চলে না। এ দেশে অনেক আফগান ও অন্য জাতীয় সুদখোর শোষক জাতীয় ব্যবসায়ী জনসাধারণকে শোষণ করিয়া কালাতিপাত করে। ইহাদিগের কোনও রকম রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব নাই। কিন্তু ইহারা সকলের উপর সওয়ার হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিব্বতে চীনাদিগের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদ কি না তাহা আলোচ্য বিষয়। মিং সম্রাট্‌দিগের অধিকারের দাবীতেই চীনাগণ তিব্বৎকে চীনদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকে। সুতরাং তিব্বৎ চীনের সাম্রাজ্য বলিলে ভুল হয় না। কিন্তু চীন তিব্বৎকে শোষণ করিতেছে কি না তাহা সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারে কি?

সাময়িকী

সোভিয়েট-ভারত অর্থনীতি

এল আই ব্রেঝনেভের ভারত আগমন উপলক্ষে সোভিয়েট-ভারত অর্থ-নৈতিক সহায়তার কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বহু বৎসর ধরিয়াই এই অর্থ-নৈতিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে ও এখনও তাহা প্রাণবান্‌ভাবেই বৰ্দ্ধনশীল। এখন অবধি ভারতে প্রায় পঞ্চাশটি অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান সোভিয়েটের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে ও সেই সকল প্রতিষ্ঠান সচল ভাবে ভারতের অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ হইবে। এখন যে পরিস্থিতি তাহাতে দেখা যায় যে ভারতের ধাতব যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ কার্য্যের মধ্যে শতকরা ৮০টি সোভিয়েটের সাহায্য লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কার্য্যের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ক্ষেত্রে শতকরা ৬০টি, তৈল নিষ্কাশন ও শোধন কার্য্যে শতকরা ৫০টি ও ৩০টি এবং ইস্পাত উৎপাদনে শতকরা ৩০টি প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট সহায়তা লাভ করিয়াছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা এখন অবধি দুই কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করিয়াছে এবং এই ইস্পাতের উৎপাদনের ফলে ভারতের শত শত কোটি টাকা বিদেশী অর্থব্যয় করিতে হয় নাই। এই ইস্পাত কারখানার এখন বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত। ইহা বাড়াইয়া প্রথমতঃ ৪০ লক্ষ টন ও পরে ৭০ লক্ষ টন করা হইবে। আর একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা বোকারোতে সোভিয়েট সহায়তায় গঠিত হইতেছে। ইহাতে আরম্ভকালে ৪০ লক্ষ টন ও ক্রমশঃ পরে এক কোটি টন অবধি ইস্পাত উৎপাদন করা হইবে। রাঁচির ভারি যন্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাতে যন্ত্র নির্ম্মাণের যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়। সিমেন্ট, রাসায়নিক বস্তু, অ্যালুমিনিয়াম, কয়লা খনন প্রভৃতির যন্ত্র নির্ম্মাণ বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। হরিদ্বারে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি যাহা প্রস্তুত করা হইতেছে তাহা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের ঐ জাতীয় যন্ত্রের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সক্ষম হইবে।

এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্য ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সোভিয়েট সহায়তায় ভারতবর্ষ তৈল ও দাহ্য বাষ্প কোথায় আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থলে মোটা তেল পাইয়াওছেন। হৃষিকেশে অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধ কারখানা ও হায়দ্রাবাদে কৃত্রিম রাসায়নিক প্রস্তুত কেন্দ্র হইতেও ভারতের মানুষের চিকিৎসা সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষে বিগত ২০ বৎসরে প্রায় ১০০০ হাজার সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ নানান্ ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। এদেশে তাঁহারা বহু ভারতীয় কর্ম্মীকে শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং তদুপরি প্রায় ২৫০০ হাজার কর্ম্মীকে ভারতবর্ষ হইতে সোভিয়েট দেশে লইয়া গিয়া শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতেও বহু দ্রব্য সোভিয়েট দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানি যাহা হয় তাহাও প্রচুর। যথা, ৩১শে মার্চ ১৯৭০-এর হিসাবে দেখা যায় যে সোভিয়েট দেশে ১৭৬ কোটি টাকার দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়াছিল। আমদানি হইয়াছিল ঐ দেশ হইতে ১১০ কোটি টাকার বস্তু। যে সকল দেশে এবং দেশ হইতে অধিক অধিক রপ্তানি আমদানি হইয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আমেরিকা, জাপান ও বৃটেন। এই সকল দেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল ৪৬৯, ৬৭, ও ১০০ কোটি টাকার বস্তু ও ঐ সকল দেশে রপ্তানি হইয়াছিল ২০৭, ১১৯, ও ১৬৪ কোটি টাকার দ্রব্যসম্ভার। এই সকল হিসাব হইতে বুঝা যায় যে ভারতের অর্থনীতি সোভিয়েট দেশের

সহিত কত গভীর ভাবে জড়িত। সোভিয়েট দেশের একরাষ্ট্রীয় গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত দেশ হইল চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড। ঐ সকল দেশের সহিতও ভারতের ব্যবসায় হইয়াছিল আমদানিতে ২৩, ২৪, ১৭ ও ২২ কোটি টাকা প্রমাণ ও রপ্তানিতে হইয়াছিল ৩০, ২০, ৯ ও ১২ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুনিচয়।

শ্রীযুক্ত ব্রেঝনেভের ভারত আগমনের ফলে দুই দেশের অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় এবং কৃষ্টিগত সম্বন্ধও মনে হয় গভীরতর হইবে।

পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধি

যতটা বোধগম্য হয় তাহাতে মনে হয় যে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যই সরকারী নির্দ্দেশে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র পেট্রলের মূল্য প্রায় শতকরা ৭৫ টাকা বাড়ান হইয়াছে। অর্থাৎ ঠিক দ্বিগুণ না হইলেও পেট্রলের দাম টাকায় বার আনা বাড়িয়াছে বলা চলে। সরকারী বিশেষজ্ঞদিগের হিসাবে এই মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে শতাধিক ক্রোর টাকা। বিদেশের মোটা তেল ও পেট্রল সরবরাহকারীদিগের দ্বারা কিছু মূল্যবৃদ্ধিও হইয়াছিল কিন্তু সে বৃদ্ধির টাকা অল্পই ছিল। রাজস্ব বাড়ানর জন্য যাহা মূল্যে জোড়া হইয়াছে তাহার এক দশমাংশও নহে। সরকার বলিতে পারেন যে এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইবে যাহাদের পয়সা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের নিকট হইতে; সুতরাং ইহা ন্যায্য ও গরীবের উপর কোনও চাপের বোঝা চড়াইবে না। কিন্তু কথাটা ঠিক অত সহজ নহে। যাহারা গাড়ী চালায়, ট্যাক্সি চড়ে ও স্কুটার মোটর সাইকেল ব্যবহার করে তাহারা সকলেই দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া নিজ নিজ চলাফেরার ব্যবস্থা করিতে পূর্ণরূপে সক্ষম এমন কথা বলিলে তাহার সত্যতা নির্বিচারে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। অনেক মানুষই দূর হইতে স্কুটার, মোটর সাইকেল ও গাড়ী চড়িয়া কাজে যাইয়া থাকেন যাহাদের মাসিক ব্যয় যদি ২৫ হইতে ৭৫ টাকা অবধি না হইয়া হঠাৎ ৫০ হইতে ১৫০ টাকা হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি ও অভাব সহ্য করিতে হইবে। যাঁহারাই ট্যাক্স দিতে পারেন তাঁহাদেরই বার্ষিক ৩০০ শত হইতে ৯০০ শত টাকা অধিক ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ধরিয়া লওয়া রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতি অনুগত সুবিচার ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। অনেক স্বয়ং চালক ডাক্তার; বস্ত্র, পুস্তক, গহনা ইত্যাদি বিক্রেতা; ইন্সিওরেন্স বা অপর কোনও কিছুর দালাল আছেন যাহারা গাড়ী চালাইয়া ঘুরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। ইঁহাদের সকলের যে দ্বিগুণ খরচে গাড়ী চালাইলেও সেই খরচ দিতে কোনও কষ্ট হইবে না এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। এক এক জায়গায় যাইতে যদি পূর্ব্বে দুই টাকা খরচ হইত এবং এখন সে স্থলে চার টাকা লাগিয়া যায় তাহা হইলে ইঁহাদিগের উপর একটা অন্যায় ধরনের চাপ দেওয়া হইতেছে বলিতে হইবে। যে ডাক্তারের সারাদিনে চারজন রুগী জোটে এবং আট টাকা ব্যয় করিয়া বত্রিশ টাকা ফি অর্জ্জন হয়, তাঁহার যদি ১৫ টাকা ব্যয় হয় তাহা হইলে তাঁহার আয় হয় মাত্র সারাদিনে ১৬ টাকা। হাঁটিয়া ডাক্তারী করা সহজ নহে। যানবাহন ভাড়া করিয়া যাইলে তাহার খরচা পোষায় না এবং হাঁটিয়া যাইলে সময় অধিক লাগিয়া কাজ যতটা হওয়া প্রয়োজন তাহা হয় না। অল্প খরচে গাড়ী চালান এই জাতীয় কার্য্যের একটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সুতরাং এই ভাবে গাড়ী চালান দ্বিগুণ ব্যয়সাধ্য করিয়া দেওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। স্কুটারে বা মোটর সাইকেলে চড়িয়া অনেক কর্ম্মী প্রত্যহ প্রায় ২০ মাইল যাতায়াত করেন। এই সকল ব্যক্তির রোজগার হয়ত ৩০০।৪০০ টাকা মাসিক। ২০ মাইল যাতায়াতে ইঁহাদের পূর্ব্বে খরচ হইত দুই টাকা মাত্র। এখন হইবে চার টাকা। অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা খরচ বাড়িবে। যাহার ৪০০ টাকা, এমন কি ৫০০ টাকাও রোজগার তাঁহার পক্ষে এমনিতেই মাসিক ৫০ টাকা যাতায়াতের খরচ অত্যধিক ছিল। সেই খরচ দ্বিগুণ হইয়া যদি ১০০ টাকা হয় তাহা হইলে সেই খরচের

ধাক্কায় ঐ ব্যক্তির সংসার খরচের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির সংসারে গরীবী হটানর পরিবর্ত্তে গরীবীকে ডাকিয়া আনা হইবে। এই সকল কথা বলিয়া দেখান হইতেছে যে আজকাল পেট্রল ব্যবহার করেন বহু অতি অসচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত মানুষ। ইঁহাদের স্কন্ধে বাৎসরিক অতিরিক্ত ৫০০।৭০০ শত টাকার রাজস্বের বোঝা চাপান একটা অতিবড় অন্যায় কার্য্য এবং রাজস্ব আদায় বিষয়ে সাম্য-নীতি-বিরুদ্ধ। রাজস্ব আদায় বিষয়ে সেই ব্যবস্থাই সুনীতিঅনুগত যে ব্যবস্থাতে কোনও ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গণ্ডির অন্তর্গত অল্পসংখ্যক নরনারীর উপর, বিশেষ করিয়া যাহা অপর সকলে দেয় না সেইরূপ একটা রাজস্ব দিবার নিয়ম আরোপ করা হয় না। পেট্রলের মূল্য বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি চেষ্টা ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা নহে।

বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য বৃদ্ধি

শীঘ্রই বৈদ্যুতিক শক্তির নূতন হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদিগের নিকট হইতে অধিক করিয়া টাকা আদায় করা আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে যে মূল্য আছে তাহা আদায়কালে কোম্পানীর মিটার-গুলি অকেজো থাকার ফলে যথেচ্ছা টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বের তুলনায় এখন মাসিক ৬০।৭০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকিলেও টাকা দিতে হয় পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২৫ হইতে ৫০ টাকা অধিক করিয়া। ইহার কারণ হইল, মিটার ঠিক না থাকায় কোম্পানী যথেচ্ছা আন্দাজ করিয়া বিল প্রস্তুত করেন ও ব্যবহারকারী সকলে তাহাই দিতে বাধ্য হন। যাহারা গ্যাস ব্যবহার করেন তাঁহাদের অবস্থা একই প্রকার। গ্যাস বেশীরভাগ সময় থাকে না এবং সরকার বাহাদুর সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া রাখেন যেন কেহ গ্যাস ব্যবহার চেষ্টা না করেন। ইহাতে সকলে গ্যাস ব্যবহার অর্দ্ধেক পরিমাণও করিতেছেন না; কিন্তু বিল হয় পূর্ব্বেরই মত অথবা আরও অধিক। কারণ অজানা। অর্থাৎ বর্ত্তমানে সাধারণের অতি প্রয়োজনীয় যাহা কিছুই আছে, সকল বস্তু বা ব্যবস্থারই মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ হ্রাস হইয়া চলিতেছে। যথা টেলিফোন; টেলিফোন একবার করিতে তিনটি ভুল নম্বর পাওয়া যায় এবং বিল আসিলে দেখা যায় যে ১০০ শতবার টেলিফোন করিলে বিলে তাহা ৩০০ শত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ব্যতীত দূরের কোন শহরে "ট্রাঙ্ক" টেলিফোন করিবার চেষ্টা করিলে তাহা একটা তীর্থযাত্রার মতই ধৈর্য্যশক্তি পরীক্ষার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ "ট্রাঙ্ক" টেলি-ফোন পাওয়া না-পাওয়া লটারী জেতার মতই অজানার অনুসন্ধানের কথা। তাহা যদি "বিশেষ প্রয়োজনীয়" বলিয়া দ্বিগুণ হারে টাকা দিবার রীতি অনুযায়ী-ভাবে করা হয় তাহাতেও সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা। আট গুণ টাকা দিলে টেলিফোন "বৈদ্যুতিক গতিতে" (lightning) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সে বিদ্যুৎগতি অনেক সময়ই কচ্ছপের মতই দ্রুতগামী হইতে দেখা যায়। টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুত, যান-বাহন, কয়লা প্রভৃতি বহু বিষয়েই দেখা যাইতেছে সরকারী ব্যবস্থা জনসাধারণের সুখ-সুবিধা ও ন্যায্য দাবীদাওয়া সংরক্ষণ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া চলে না।

বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ একটি কোম্পানীর সহিত জড়িত আছে, কিন্তু সেই কোম্পানী নিজেদের ইচ্ছামত সরবরাহ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সরবরাহ যথাপ্রয়োজন তাহা হইতে পারে না। এখন যে বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য বৃদ্ধি করা হইতেছে তাহা সরবরাহের উন্নতি সাধনার্থে হইতেছে অথবা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জনসাধারণের কষ্ট-অর্জ্জিত অর্থে আরও অধিক করিয়া সরকারী ভাগ বসাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য করা হইতেছে তাহার উত্তর সহজে পাওয়া সম্ভব হইবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

কাছাড় পৃথক প্রদেশ হইবে কি ?

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছিল :—

গত ১২ই অক্টোবর কাটিগড়ায় স্থানীয় ছাত্র যুব সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় পৃথকীকরণের দাবী আলোচনা করাই ছিল সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। দীর্ঘ আলোচনার পর ঐদিন পরিষদ এই সিদ্ধান্ত নেন যে বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বেকারী, শিল্পোন্নয়ন ও ভাষাগত সমস্যাজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় পৃথকী-করণ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সেই উদ্দেশ্যে গ্রামেগঞ্জে জনমত গড়ে তোলার উপর সভা গুরুত্ব আরোপ করেন।

ছাপার কাগজ না থাকার জন্য রুশিয়া দায়ী

"লালতারা" পাক্ষিক পত্রিকার মতে ভারতে বর্তমানে যে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের দারুন অভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য রুশিয়া দায়ী। এই তথ্য তাঁহারা চীনাদিগের মারফত পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

চীন আজ ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে তুলে ধরে এবং বলে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থালিপ্সার দরুণই ভারতে নিউজপ্রিণ্টের ঘাটতি পড়েছে।

সিনহুয়া নিউজ এজেন্সী তার এক মন্তব্যে বলেছে যে রাশিয়া ভারতে তার নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহ কমিয়ে দেয় এবং দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সে নিউজপ্রিণ্টের দাম ওপরের দিকে ওঠাতে বাধ্য করে।

যখন সারা দুনিয়াতে নিউজপ্রিণ্টের ঘাটতি চলছে ও দাম বেড়ে চলেছে ঠিক সেইসময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সরবরাহ কমাল এবং দাম বাড়াল। মন্তব্যে বলা হয়েছে, সোভিয়েতের এই কাজ ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

এতে আরও বলা হয়েছে যে ভারত সোভিয়েত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া প্রতিবছর ভারতকে ৫০,০০০ টন নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়েছে। বর্তমান বছরে বিশ্বের বাজারে নিউজপ্রিণ্টের ঘাটতি থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে তার চুক্তি একতরফাভাবে উপেক্ষা করে বিশাল মুনাফা লোটার জন্য ভারতে দেয় সরবরাহের পরিমাণের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সরবরাহকৃত নিউজপ্রিণ্টের উপর প্রচুর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে যা বিশ্ব বাজার অপেক্ষাও অনেক বেশী।

চীনা নিউজ এজেন্সী বলেছে যে রাশিয়া কর্তৃক একতরফাভাবে নিউজপ্রিণ্ট চুক্তিভঙ্গের ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে এবং কিছু মাঝারি ও ছোট ছোট সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিউজ এজেন্সী ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ষ্টেটসম্যান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখায় যে কেমন করে রাশিয়া ৫০,০০০ টন নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহের চুক্তি থেকে পিছিয়ে যায় এবং কানাডা ও অন্যান্য দেশ থেকে আনীত নিউজপ্রিণ্টের বর্দ্ধিত দাম অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী দাম বাড়িয়ে দেয়।.........

(ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১০-৯-৭৪-এ প্রকাশিত বি. কে. তেওয়ারী প্রেরিত সংবাদ)

আসামে বাঙ্গালীদের অবস্থা

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে প্রকাশ :—

চুলিয়াজানের বাঙ্গালী সমাজ এবছর বিগত বছরের

তারা দাঙ্গার কথা স্মরণ করে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন না। একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম, পুরুষের আত্মসম্মান যেখানে ভূলুণ্ঠিত সেখানে এই আড়ম্বর অর্থহীন।

ইস্তাহারে বলা হয়, ১৯৭২ সনের জুলাই মাসের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দুলিয়াজান শিল্প সহরে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। ৭২ সনের অক্টোবরের গোড়ার দিকে কর্ম পরিষদ এবং অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন সভাসমিতি, ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি সংগঠিত হয়। এবং সহরে উত্তেজনা দেখা দেয়। ১১ই অক্টোবর থেকে ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত শহরে আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে। ঐসময় সাধারণ নাগরিক ও দোকানদাররা নিগৃহীতও হন। শহরের দেওয়াল এবং রাস্তায় তখন আপত্তিকর স্লোগান লেখা হয়।

মহাষ্টমীর দিন একদল জনতা কলকাতার দুইটি দৈনিক, 'যুগান্তর' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জ্বালিয়ে দেয়। এরপরই উত্তেজিত জনতাদ্বারা ৪টি পূজা প্যাণ্ডেল আক্রান্ত হয়। এবং বহু নরনারী নিগৃহীত হন। পূজার পুরোহিতকেও অপমানিত করা হয় এবং 'দেবী প্রতিমা' ভেঙ্গে ফেলা হয়।

বিগত বছরের ঐসমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার আর দুলিয়াজানে দুর্গাপূজার কোন আয়োজন করা হয়নি।

১৯৭০-এর দশকে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের রূপান্তর

মার্কিন কৃষি বিভাগের কৃষি অর্থনীতির ডিরেক্টর "মার্কিন বার্তাতে" লিখিয়াছেন :—

গত বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে গমের ফলনে খুব বেশি রকম ঘাটতি হওয়ায় তাকে অন্যান্য দেশ থেকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, প্রচুর পরিমাণে শস্য কিনতে হয়েছিল। দেরি করে বর্ষা আরম্ভ হওয়ার ফলে এবং বৃষ্টি কম হওয়ার দরুণ ভারতেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ধানের ফলন ভালো হয়নি। খরার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার গম উৎপাদনও হ্রাস পায়।

আমার ধারণা, এই পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি আর বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাব—এ সব কিছুরই মূল কারণ হল অস্বাভাবিক রকমের মন্দ আবহাওয়া। দূর ভবিষ্যতে আবহাওয়া কেমন থাকবে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি কোনও হদিশ দেওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের নেই। দেখা গেছে, কোনও বছরে এক এলাকায় আবহাওয়া সাধারণের চেয়ে ভালো হলে, অন্যান্য এলাকাতেও আবহাওয়া ভালো হবার সম্ভাবনা কম। শস্যের ফলনের পরিপ্রেক্ষিতে আবহাওয়া সম্বন্ধে এখনও অনেক অনুশীলন দরকার।

একটা নতুন ধারণা ইদানীং ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছে যে, বিশ্বের খাদ্যপরিস্থিতির মূলগত অবনতি ঘটেছে—সেই ধারণার অসারতা প্রমাণ করবার জন্যই এত কথা বলতে হল। নৈরাশ্যজনক ফলন আর খাদ্যের চড়া দাম নিয়ে ফলাও করে কাগজে কাগজে হেডলাইন লেখা হচ্ছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সম্প্রতি যে সব বাস্তব প্রচেষ্টা চলেছে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সে সম্বন্ধে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা নেই।

১৯৭২ সালে সারা বিশ্বের কৃষি উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৭২ সাল থেকেই বিশ্বের খাদ্যশস্যের ফলন পড়তে শুরু করেছিল ঠিকই, তবে ১৯৭২ সালের ফলনের পরিমাণ ছিল এতাবৎ কালের সর্বোচ্চ পরিমাণের ঠিক পরেই এবং এখনও তার সেই দ্বিতীয় স্থানটি বজায় রয়েছে। খাদ্যের উচ্চমূল্যের ফলে সরকার এবং কৃষিজীবীদের টনক নড়েছে, কাজেই বর্তমানে

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অভাব হবে না বলেই আশা করা যেতে পারে। অবশ্য সাফল্যের অনেকখানিই নির্ভর করবে আবহাওয়া এবং অন্যান্য ব্যাপারের ওপর।

ইউ এস ডি-এর (ইউনাইটেড ষ্টেটস ডেভেলপমেণ্ট অ্যাসোসিয়েসনের) ১৯৫৪ সালের তথ্যপঞ্জী থেকে জানা যায় যে সারা পৃথিবীর হিসাব ধরলে, এমন কি দরিদ্র দেশগুলির সাকুল্য হিসাব ধরলেও, মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন ক্রমশঃ বাড়তির দিকেই গেছে।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত, এক আফ্রিকা ছাড়া সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশে বৃদ্ধির হার ছিল বছরে দেড় শতাংশ, স্বল্পোন্নত দেশে অর্ধ শতাংশ উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য ততটা নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই স্বল্পোন্নত দেশে বৃদ্ধির হারটা কম।

দারিদ্র্য, বণ্টন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের দাসত্ব ইত্যাদির জন্য, খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও দেশের কিছু কিছু মানুষের খাদ্যে পুষ্টিকারিতার অভাব ঘটে। আমাদের হাতে যে তথ্য আছে সেটা গড়পড়তা হিসাব, অনেক বিশেষ বিশেষ সমস্যার কথা তাতে ধরা হয়নি। গড়পড়তা হিসাব সব সময়ে সুষ্ঠু হয় না। তা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে এই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সর্বত্রই মানুষের দৈনিক খাদ্যের উৎকর্ষ বেড়েছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই খাদ্য হিসাবে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় সামগ্রী ব্যবহার করে, যেমন দানাশস্য, চিনি, মূল বা কন্দজাতীয় সব্জি, কলা, ইত্যাদি। এদের মধ্যে চাল আর গমের ব্যবহারই সব চেয়ে বেশি, তবে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জায়গাতেই খাদ্যশস্য হিসাবে ভুট্টাই প্রধান।

খাদ্যশস্য থেকে প্রোটিনও পাওয়া যায়, খাদ্যোপযোগী পশু যে সব দেশে প্রচুর, সে সব দেশেও প্রোটিনের অনেকখানি চাহিদা খাদ্যশস্য থেকে মেটে, স্বল্পোন্নত দেশে প্রোটিনের জন্য খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এশিয়ার কম্যুনিস্ট দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব দেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল, তার অর্ধেকেরও কম ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যক্ষ খাদ্য হিসাবে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার হিসাব অনুসারে, ১৯৬৪-৬৬ সালে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা ৪৮ ভাগ, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় শতকরা ৩৮ ভাগ, আর বীজ, মাড়, সুরা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বাকি শতকরা ১৪ ভাগ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য হিসাবে শস্যের ব্যবহার বাড়বে, তবে খাদ্য হিসাবে তার গুরুত্ব কমবে। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে খাদ্য হিসাবে শস্যের ব্যবহারের মোট পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়লেও মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে।

গত দুই দশকের শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, সাফল্যের দিক থেকে উন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদনের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ। উন্নত দেশে চাষের জমির পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি কিছু না বাড়িয়েও ফলন বেড়েছে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি, আর স্বল্পোন্নত দেশে চাষের জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বাড়ানো সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ পেয়েছে মাত্র তিন-চতুর্থাংশ। এই সময়ের মধ্যে উন্নত দেশে হেক্টর প্রতি ফলনের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, স্বল্পোন্নত দেশে বেড়েছে তার অর্ধেক হারে। বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশে শস্যের ফলনের হার উন্নত দেশের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র।

প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগে অনন্যপূর্ব ক্রিয়াকর্মের দৌলতে বিশেষ বিশেষ স্বল্পোন্নত অঞ্চলে এমন কি বিশেষ বিশেষ স্বল্পোন্নত দেশে গম ও চালের উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমষ্টিগতভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলির ফলনের গড় পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ব্যাপকতর দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কোনও নজির চোখে পড়ে না।

শস্য সম্পর্কিত প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষে-
উদ্ভাবন হওয়া সত্ত্বেও, এই সব উন্নত

ভাবে কার্যকর হতে এখনও অনেক সময় লাগবে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এই সব নবোদ্ভাবিত পদ্ধতি, যাকে সবুজ বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই সব তথ্যের দোহাই দিয়ে তার গুরুত্ব কিন্তু মোটেই নাকচ করা চলে না। এই সব নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা, বা বরং বলা যাক, নিজের নিজের দেশের উপযোগী করে নিয়ে প্রয়োগ করার কাজ এখনও বাকি রয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে, পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার কোনও সমাধান পাওয়া যাবে না। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, খুব বেশি দিন এই ভাবে চলতে দিলে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে, আমাদের বর্তমানে সাধ্যায়ত্ত বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কৃষিগত কোনও সমাধানের মাধ্যমেই তার নাগাল পাওয়া যাবে না।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যসংস্থানের ওপরেই শুধু চাপ পড়ছে না, সেই সঙ্গে সামাজিক বিক্ষোভ, রাজনৈতিক গোলযোগ এবং পরিবেশগত অবনতিও ঘটে চলেছে।

উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে বেশি খাদ্য ব্যবহার করছে, বিশেষ করে এমন সব উন্নত মানের এবং ব্যয়সাপেক্ষ খাদ্য, যা উৎপাদন করতে অনেক বেশি কৃষিজাত উৎকর্ষ এবং উপাদানের প্রয়োজন হয়। পশুজাত খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুখাদ্য হিসাবে শস্যের চাহিদাও বেড়ে গেছে।

খাদ্যের চাহিদার সঙ্গে উপার্জনের সম্পর্ক কতখানি, অর্থনীতিবিদরা তা গভীর মনোযোগ দিয়ে খতিয়ে দেখেছেন। এবিষয়ে সবাই একমত যে, উপার্জনের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটলে খাদ্যের জন্য উপার্জিত অর্থের ব্যয়ের পরিমাণেও তারতম্য ঘটে, তবে কতটা ঘটে এবং কত তাড়াতাড়ি ঘটে, সেটা এখনও নির্দিষ্ট করা যায়নি। মাথাপিছু আয় এবং ব্যবহারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে সব অনুশীলন হয়েছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্যের পরিমাণ স্থির করা হয়েছে তার আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে। এতে খাঁটি হিসাব পাওয়া যায় না। সাধ্যে কুলালে দরিদ্র মানুষও তাঁর চিরাচরিত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু ব্যবহৃত খাদ্যের মান প্রধানতঃ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যে কারণে সেটা হল আহার্যের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার।

যাদের উপার্জন বেশি, তারা সাধারণতঃ মাংস, হাঁস, মুরগী, ফল, শাকসব্জি আর চিনি বেশি কেনে। এগুলো সবই পুষ্টিকারিতার দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়।

পশুজাত প্রোটিন পুষ্টির দিক থেকে উন্নততর খাদ্য, তাতে সন্দেহ নেই, তবে এখন এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, মাছ এবং শাকসব্জির প্রোটিনের সমন্বয়েও যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যেতে পারে। ডালজাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে পশুজাত খাদ্যের চেয়ে অনেক কম খরচে যথেষ্ট পুষ্টিকর গুণসম্পন্ন খাদ্যের সংস্থান করা চলে।

কৃষির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাত্রা বাড়ানো নেহাৎ প্রয়োজন, বিশেষ করে দরিদ্র দেশের পক্ষে। খাদ্যের চাহিদা যখন ক্রমবর্ধমান এবং চাষযোগ্য জমি যেখানে সীমিত, সেখানে ফলনের হার বৃদ্ধি করা নিতান্তই দরকার। উন্নত দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা যখন অর্থনৈতিক বিকাশের হারকে বিলম্বিত করতে বলেন, নিজেদের দেশের পক্ষে কথাটা সঙ্গতই হয় বটে, তবে সঙ্গতিহীন দেশের পক্ষে কথাটা ততখানি প্রযোজ্য নয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, অর্থনৈতিক বিকাশ বেশ খানিকটা এগিয়ে না গেলে, কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন হয় মন্থর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অনেকখানিই ঘটে আরও বেশি জমিতে সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতেই চাষ করে। অধিকাংশ উন্নতিশীল দেশে অব্যবহৃত জমি, পশুচারণ-ক্ষেত্র বা বনভূমিকে চাষের আওতায় এনে কৃষিভূমির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

দরিদ্র দেশগুলিতে, বিশেষ করে এশিয়া, মধ্য আমেরিকা, নিকটপ্রাচ্য এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার অনেক দেশে, কৃষিযোগ্য পতিত জমি আর সহজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একাধিক শস্যের চাষ, এবং সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রয়োগ এবং উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার আসলে জমির পরিমাণ বৃদ্ধির বিকল্প উপায়। সঙ্গতিসম্পন্ন দেশগুলিতে বেশি করে উন্নত বীজ, রাসায়নিক পদার্থ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শুধু যে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, কৃষির কাজ অনেকখানি ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে উঠেছে, কারণ এসব সামগ্রী আমদানি করতে হচ্ছে কৃষিজগতের বাইরে থেকে এবং তাতে অর্থ বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হচ্ছে।

পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিব্যবস্থায় বিকাশ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্র, বিশেষতঃ বৃহদাকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার সেই পর্যায়ের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে, অনেক দরিদ্র দেশে, পল্লী অঞ্চলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির দরুন, এখনও বেশ কিছু কাল কৃষিমজুরের দল ভারি হতেই থাকবে। কাজেই, সমস্যাটা দেখা দেবে ক্ষেতে-খামারে সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যাপারে ফলপ্রসূ কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি নিয়েই, কৃষিমজুরের বদলে যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিয়ে নয়।

জমি ভোগদখল সংক্রান্ত, বিপণনগত পরিস্থিতি, ঋণ পাবার সুযোগ-সুবিধা এবং কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক ব্যাপারে আরও পরিবর্তন এবং বিকাশের প্রয়োজন দেখা দেবে। আরও উন্নত ধরণের খাদ্যশস্য এবং ফসল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

১৯৭১ সালে খাদ্য ও কৃষিসংস্থার তরফ থেকে ১৯৭০-১৯৮০ সালের কৃষিজাত সামগ্রী সংক্রান্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি খতিয়ান দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৯ বা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য এতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই খতিয়ানে বলা হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে খাদ্যের ঘাটতি সাধারণভাবে বর্তমানের চেয়ে কিছুটা হ্রাস পাবে, তবে খাদ্যাভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা সম্ভবত বর্তমানের চেয়ে কমবে না। আরও বলা হয়েছে যে, আগেকার হিসাবের ভিত্তিতে যা মনে করা হয়েছিল, প্রোটিনজাত পুষ্টিকর খাদ্যের সম্ভাবনা তার চেয়ে উজ্জ্বল। যে সব দেশের মানুষের আয় বেশি, সেই সব দেশে এবং উন্নতিশীল দেশেও খাদ্যসামগ্রীতে বৈচিত্র্য দেখা দেবে, আর সেই সঙ্গে খাদ্যশস্য এবং মূলজাতীয় খাদ্যের বদলে ক্রমশই পশুজাত খাদ্য, ফল আর শাকসব্জির দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকবে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে যে, গম, চাল, অন্যান্য অপকৃষ্ট দানাশস্য এবং আরও কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে 'উদ্বৃত্ত' হতে পারে।

১৯৭১ সালে মার্কিন কৃষিদপ্তর থেকেও ১৯৮০ সাল অবধির কৃষিজাত সামগ্রীর সম্ভাব্য খতিয়ান প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে যে স্বল্পোন্নত দেশে খাদ্যের পুষ্টিকারিতা মাথাপিছু বৃদ্ধি পাবে। বলা হয়েছে যে, আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে সারা বিশ্বে

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে চাহিদার চেয়ে দ্রুত হারে এবং তার ফলে সম্ভবত গমের মজুতভাণ্ডার আবার গড়ে তোলা যাবে, দাম কমতে থাকবে এবং প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক দেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করতে হতে পারে।

এই খতিয়ানে বলা হয়েছে যে, উন্নত এলাকার দেশগুলিতেই প্রধানতঃ গম এবং অপকৃষ্ট মোটা দানার শস্য উৎপাদিত হবে এবং ব্যবহৃত হবে। শস্যের লেনদেন এখনকার মতোই পাঁচ-ছটি রপ্তানিকারক দেশ থেকে অন্য উন্নত বা উন্নতিশীল দেশের মধ্যেই ঘটতে থাকবে। চীন সম্ভবতঃ গম আমদানি করবে এবং চাল রপ্তানি করবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপের বাণিজ্যের ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে, তবে এতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপ ১৯৮০ সালের মধ্যেই শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। স্বভাবতঃই, প্রতিকূল আবহাওয়া, নীতিগত সিদ্ধান্ত, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপরেই নির্ভর করছে বেশ কিছুটা।

খতিয়ানে আভাস দেওয়া হয়েছে যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে গমের উৎপাদনের সঙ্গে গমের ব্যবহারও সমান তালে বৃদ্ধি পাবে। ১৯৮০ সালে গম এবং অপকৃষ্ট দানাশস্যের মাথাপিছু ব্যবহার বাড়লেও উন্নততর দেশের তুলনায় তা কম থাকবে। অনেক স্বল্পোন্নত দেশে খাদ্যোৎপাদন দ্রুত হারে বাড়লেও, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেই তা কাজে লেগে যাবে, অপর পক্ষে, প্রধান প্রধান রপ্তানিকারী দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাবে উৎপাদন যে হারে বাড়ছে, অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বা রপ্তান সে হারে বাড়ছে না।

যে সব অঞ্চলে বেশি চাল উৎপন্ন হয় এবং ব্যবহৃত হয়, সে সব অঞ্চলে ব্যবহারের তুলনায় চালের বাণিজ্যিক লেনদেন কম। বলা হয়েছে যে, লেনদেন কমই থাকবে। চালের উপযোগ যা বাড়বে, সেটা সম্ভবতঃ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির দৌলতেই ঘটবে।

এই শতাব্দীর ষাটের দশকে কয়েক বছর খাদ্যশস্যের ফলন কম হওয়ায় খাদ্যসংস্থান যখন খুবই হতাশাব্যঞ্জক, তখনও মার্কিন কৃষি বিভাগ বলে গেছেন যে, মাথাপিছু খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ঠিক বলেছিলেন তাঁরা। সত্তরের দশকে আবার সেই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটেছে, বিশেষজ্ঞরা আহার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আশা করা যাক, এবারেও তাঁদের কথা নির্ভুল প্রমাণিত হবে।

সংশোধন লিপি

প্রবাসী ঃ আশ্বিন, ১৩৮০। ৬২৫—৬২৯

পৃষ্ঠা	অংশ/ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২৫	(১ম অংশ) ৮	‘চারনোফাইট	‘চারনোকাইট’
৬২৪	(২য় অংশ শেষ প্যারা)	‘পাস’	পার্শ
	১ ছত্রে	নয়	
৬২৬	(১ম অংশ শেষ প্যারা) ২ ছত্রে	‘ঋগ্বেদ’	ঋকে
,,	ঐ ৫ ছত্রে	‘তৃক্কিদের’	‘তৃক্কি’দের
,,	ঐ ৭ ছত্রে	‘‘নাহৃষীয়া’’	‘‘নাহৃষীয়া’’
,,	(২য় অংশ ৯ ছত্রে	‘আষ্ট’ব’	‘আর্যব’
,,	,,	‘কুশব’	‘কুশর’
,,	,,	‘প্রল’	‘পল’
,,	ঐ ১০ ছত্রে	‘অস্বাব’	‘অশ্বাব’
,,	ঐ ১৭ ছত্রে	‘করভ্যাজজগ’	‘করভগজজল’ (KARABOGAZGOL বা করবোগাজজল)
,,	,, ১৯ ছত্রে	‘ভগত্রভে’	ভগত্রাভ
,,	,, ৩০ ছত্রে	‘কামীশকাশ্য’	‘কামীশ-কাশ্য’। (পূর্ণচ্ছেদ)
৬২৭	১ম ৪ ছত্রে	অমুর	(অমুর)
,,	,, ,,	৪/৬/২	৪/৬/২— (৪/৬/২ ও ৭/৬১/৫ পৃথক্)
,,	১ম ১০ ছত্রে	‘বৃষকপির’	‘বৃষাকপির’
,,	,, ১৩ ছত্রে	এই	এক
,,	,, ,,	‘পাশব্য’	‘পার্শব্য’
,,	,, ১৯ ছত্রে	৮/২৫/২৮	৮/২৪/২৮।
,,	,, ২৪ ছত্রে	‘চক্ষুদাবো’	‘চহ্নুদায়ো’ (‘মহী’র পরে space)
,,	,, ২৬ ছত্রে	‘রণঘুতাই’	‘রণঘুণ্ডাই’
,,	,, ,,	‘থব্যাবতী’	‘যব্যাবতী’
৬২৯	শেষাংশ ১৮ ছত্রে	‘হর’	‘হারি’ HURRY বা হরি)

প্রবাসী ঃ কাত্তিক, ১৩৮০। ১৩৬—১৪০

১৩৬	১ম	,,	৫	সজ্জীবনী	সঞ্জীবনী
,,	,,	,,	৯	ইতিহাস	ইতিহাসে
,,	,,	,,	২৩	এরমন	অরমন
,,	২য়	,,	২	‘আর্য’ বা অর্য	‘আর্য’ বা অর্য’
,,	,,	,,	৫	জীবর	জীবী
,,	,,	,,	১০	ক্বত্তিভূমি	ক্বাত্তিভূমি
,,	,,	,,	১৭	ঈশিরের	ঈশিনের
,,	,,	,,	২৩-২৪	ক্বত্তি	ক্বাত্তি
,,	,,	,,	২৫	পর্শি	পার্শ
,,	,,	,,	২৬	‘পর্শি’	‘পার্শ
১৩৭	১ম	,,	৫	অবীক	অনীক
,,	,,	,,	৭	‘মিতজুন’	‘মিতজু’
,,	,,	,,	১৯	ইরযু	হরযু
,,	,,	শেষপ্যারা	৩	কাশ্পিয়ান্	কাশ্‌পিয়ান
,,	২য় অংশ		৪	হতে	হতে ভারতের
,,	,,	,,	১১	গোষ্ঠীদের	গোষ্টিদের
,,	,,	,,	২৫	‘কাপ্পাদেশীয়া’	‘কাপ্পদেশীয়’
১৩৮	১ম	,,	১১	আমেনিয়া	আর্মেনিয়া
,,	,,	,,	২০	জরজরা	জরাজরা
,,	,,	,,	২২	জনুরূপ	অনুরূপ
,,	,,	,,	২১	কাস্পিয়ান	কাশ,পিয়ান
১৩৮	১ম	,,	২৫	হতে কুতেরো।	হতে। কুতেরো।
,,	,,	,,	৩০	প্রাগৈতাসিক	প্রাগৈতিহাসিক
,,	,,	,,	৩১	কাগুকভূমির	কাগুকভূমির
,,	২য়	,,	৭	শেষার্ধে	শেষার্ধের
১৩৯	১ম	,,	৪	তুররস	তুরবশ
,,	,,	,,	২২	চুর্ষরি	চুমুরি
,,	,,	,,	৩১	তুর্বশ	তুর্বশ
,,	,,	,,	৩২	যাদবজল	যাদবজন
,,	২য়	,,	১৭	ত্রৈবৃষ্ম	ত্রৈবৃষ্ম
,,	,,	,,	১৮	দেবগ্রবা	দেবশ্রবা
,,	,,	,,	২১	ধাবাহন	আবাহন
,,	,,	,,	২৭	সৃঞ্জয়	সৃঞ্জয়
১৪০	১ম	,,	১৩	যার্গরস	যাগরস
,,	,,	,,	শেষছত্র	যগি্‌গরথের	যগি্‌গরথের
,,	২য়	,,	৪ ছত্র	যগে্‌গরস	যগ্‌গরস
,,	,,	,,	৬ ,,	অয়বেল	অরবেল
,,	,,	,,	৫ ,,	অরকর্ণেরা।	অরকর্ণ।
,,	,,		১২	প্রভৃশির	প্রভৃতির
,,	,,		১৭	প্রময়া দেবমী।	সরমা দেবশুনী।
,,	,,		১৮	পনয়ো—	পণয়ো—
,,	,,		১৯	‘দেকশুনী’	‘দেবশুনী’

ঃঃ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৮০

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শাসন ব্যবস্থা লইয়া বিক্ষোভ

ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মানুষ সুশাসন বলিতে বুঝে, সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মূল সুখ সুবিধা যথাযথভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা এবং দেশের অবস্থা যাহাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ্ থাকে তাহার উপযুক্ত আয়োজন। ইহা ব্যতীত সুশাসন বলিতে মানুষ ইহাও বুঝিয়া থাকে যে, দেশের সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রভৃতির প্রকৃষ্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে শাসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ন্যায্য অধিকার কি তাহা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা না করিয়া সাধারণতঃ দেশবাসী কোন্ অধিকার ন্যায্য মনে করেন সেই কথাই বিচার করা সঙ্গত মনে হয়। সকল মানুষই চাহিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া রোজগার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা দেশ-শাসকগণ করিবেন। ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও রোজগারের কোন পথ থাকিবে না সেইরূপ অবস্থা সুশাসন থাকার লক্ষণ নহে। ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও নানা ভাবে শিক্ষা ও কৌশল আহরণ করিয়া রোজগারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা না থাকাও সুশাসনের পরিচায়ক নহে। সভ্য জগতে যে সকল বিধিব্যবস্থা সৃজন করিয়া সমাজ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান্, কর্ম্মক্ষম, নানাভাবে নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্ষম করিয়া তোলে, সুশাসন থাকিলে সেই সকল বিধিব্যবস্থা থাকিবে বলিয়া সকলে আশা করেন। মানুষ আরও চাহে যে, পরিশ্রম, শক্তি ও কৌশলের

সাহায্যে যাহা আহরণ করা যায় তাহা উৎপাদন ব্যক্তি অথবা তাহার উত্তরাধিকারীগণ বিনা বাধায় সম্ভোগ করিতে পারিবে। যদি তাহার কোন অংশ শাসকগণ রাজকর হিসাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার পরিবর্তে করদাতা কিছু-না-কিছু পাইতেছেন দেখিতে পাইবেন। শাসন কার্য্যের ও দেশ রক্ষার ন্যায্য খরচ ও শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়তার ইহার মধ্যে ধরা যাইবে। কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার আয়োজন শান্তি ও বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত প্রভৃতি উপযুক্তরূপে বর্তমান না থাকে, শুধু রাজস্ব আদায়েরই চাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণ সুশাসন নাই বলিয়াই আন্দোলন আরম্ভ করিবে। এই রাজস্ব আদায় অনেক সময়ই সাক্ষাৎ ভাবে দেখা যায় না। শাসকগণ নানাভাবে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন ও সকল সময় সে আদায় সহজে দাতা বুঝিতে পারে না। যথা, কখন কখন কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় প্রভৃতি শাসকগণ জাতীয় ব্যবসা করিয়া লয়েন ও তৎপরে সেই দ্রব্যগুলির মূল্য-বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীকে অতিরিক্ত উচ্চমূল্যে তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া রাজস্ব আদায় বাড়াইয়া লইয়া থাকেন। বৃটিশ আমলে লবণ-শুল্ক লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছিল, কারণ, অতি দরিদ্র যে তাহাকেও লবণ ক্রয় করিতে হয় এবং লবণের উপর রাজকর ধার্য্য করিলে তাহা সকলেই দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা গান্ধী লবণের উপর যাহাতে কোনও রাজস্ব ধার্য্য না হয় তাহার জন্ম বিপুল আন্দোলন চালনা করিয়াছিলেন। আজকাল বহু দ্রব্যের উপর রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়া থাকে। যে যাহাই ক্রয় করে তাহার উপর অধিক ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু রাজকর আবকারী শুল্ক বলিয়া সংযুক্ত থাকে। ইহার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও সাধারণ ভাবে দ্রব্যনির্বিশেষে রাজকর আদায়ের নিয়ম সকল প্রদেশেই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ যাহাই ক্রয় করিয়া জীবন নির্বাহ করুক না কেন, তাহাকে টাকায় চার আনা হইতে আট আনা রাজস্ব দিতে হইয়া থাকে। এই সকল কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে ও অল্প খরচে জীবন ধারণ করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং মানুষের আয় যদি বা নানা উপায়ে টাকায় দুই আনা চারি আনা বাড়িতেছে, শাসকদিগের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের ফলে সেই আয়বৃদ্ধির কোনই মূল্য থাকিতেছে না। শাসকদিগের একটা বড় অর্থ-নৈতিক ভ্রান্ত নীতি হইল, ক্রমাগত মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের বস্তুর পরিমাণের তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা অসংযতভাবে ন্যায্য সীমা ছাড়াইয়া যাইতে দেওয়া। ইহা হয় সরকারী অমিতব্যয়িতার ফলে এবং ইহাতে বাজারে সকল দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে থাকে। কারণ, অর্থের পরিমাণ অযথা বাড়িলে এবং বাজারের মালপত্র সেই অনুপাতে না বাড়িলে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি হইবেই হইবে। সরকারী ভুল পথে চলার আর একটা নিদর্শন হইল, সাধারণ মানুষকে স্বাধীন ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে না দিয়া ব্যবসার নানান্ ক্ষেত্রে সরকারী একচেটিয়া অধিকার জারি করা। ভারতবর্ষে বর্তমানে এই নীতি বীমা, ব্যাঙ্ক, কয়লা, তামা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে বাজার তোলপাড় হইয়া দ্রব্যমূল্য ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল অর্থনৈতিক গোলযোগ আরোই অধিক কষ্টের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে এই কারণে যে, ইহার সহিত সমাজে বেকার ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও শাসকগণ নানাভাবে বেকারত্ব হ্রাস করিয়া সমাজের মানুষদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন চেষ্টা করিয়া চলিতেছেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সে চেষ্টা সেরূপ সফলতা প্রদর্শনে সক্ষম হইতেছে না। ইহার মূলেও আছে ভুল পথে চলা; কিন্তু শাসন যেখানে রাজনৈতিক মত অবলম্বন করিয়া দিক্ নির্ণয় করে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাফল্য রাজনৈতিক মতানুকূল না হইলে রাষ্ট্রদলের পাণ্ডাদিগের পক্ষে অর্থনীতিক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্তি কোনও ভাবেই সহজ ও

নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। একটা কথা বিচার করিলেই বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কি ভাবে অনেকসময়েই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধরূপ ধারণ করে। ইহা প্রায় সকল সময়েই দেখা যায় যে, রাজনৈতিক আবেগ চালিত ব্যক্তিগণ কোনও সমস্যা উপস্থিত হইলেই কাজকারবার বন্ধ করিয়া পথেঘাটে হল্লা করিয়া সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিয়া থাকেন। আন্দোলন অথবা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে কখনও কোন হিতসাধন হয় না এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না; কিন্তু সমাজের সকল রোগের চিকিৎসা ঐ একই ঔষধ প্রয়োগে হইতে পারে এরূপ ধারণাও ভ্রান্তিদোষদুষ্ট। একথা সহজবোধ্য যে, যে ক্ষেত্রে ভোগ্যবস্তুর অভাব প্রকট ভাবে সমাজকে বিপর্য্যস্ত করে সে-ক্ষেত্রে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বিক্ষোভ জ্ঞাপন করার কোন বিশেষ সার্থকতা থাকিতে পারে না। যদি ঐ উপায়ে সমাজশাসকদিগের উপর চাপ দেওয়া যাইবে মনে করা হয় তাহা হইলেও প্রথমে দেখিতে হইবে চাপ পড়িলেও কেহ কিছু করিতে পারিবে কি না। কাহার উপর কি ভাবে চাপ দিলে মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ হইবে এবং বেকারদিগের কর্মসংস্থান হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে কারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-দফতর ও ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি বন্ধ করিলে সেই প্রকার চাপ সৃষ্টি হইতেছে কি না। মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য-বস্ত্রের অভাব দূর করিবার কথা শাসকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য কোন কোন প্রদেশে উৎকটভাবে আইন ভঙ্গ করা হইতেছে। ইহার ফলে শাসকদিগের শিরঃপীড়া ঘটিতেছে অবশ্যই এবং যাঁহারা গোলযোগ করিতেছেন তাঁহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার নানান্ চেষ্টাও চলিতেছে; কিন্তু ইহার ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি হ্রাস হইতেছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু ঐ জাতীয় আইন ভাঙ্গার জোড়্ বাঁধ নানান্ প্রদেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে তাহা হইলে শেষ অবধি বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি বজায় রাখিয়া শাসন কার্য্য চালিত রাখা ক্রমশঃ কঠিন হইতে আরও কঠিন হইবে। হয়ত এই সাধারণতন্ত্র সংবিধান-সঙ্গতভাবে চালাইয়া রাখাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া ভোগ্যবস্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং বেকারদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিয়া শাসকদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে, চলিতে হইবে। অন্য পন্থা নাই। অপর কোনও রাষ্ট্রীয় দল শাসনভার পাইলে তাহাদেরও ঐ একই মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্ম্মীদিগের নৈতিক দায়িত্ব

প্রায়ই শুনা যায় যে, ডাক্তার ও নার্স দিগের অভিযোগ ও আর্থিক দাবির যথাযথ নিষ্পত্তি করাইবার জন্য তাঁহারা চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি অচল করিয়া ব্যবস্থাপকদিগকে বাধ্য করিবেন যাহাতে তাঁহারা সকল বিষয়ের সু-মীমাংসা করেন। অভিযোগ ও দাবি সকল কর্ম্মীরই থাকে এবং তাহার মধ্যে সকল নালিশই যে পূর্ণরূপে অভিযোগকর্ত্তাদিগের কথা অনুযায়ীভাবে ন্যায্য তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ নালিশের বিচার হইলে দেখা যায় যে, কোন কোন কথা কর্ম্মীদিগের সপক্ষে মীমাংসিত হয়, আবার কোন-কোনটি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও যায়। সুতরাং নালিশ থাকিলেই তাহা বলপ্রয়োগ, অর্থাৎ হরতাল করিয়া সর্ব্বৈব কর্ম্মীদিগের তরফে নিষ্পত্তি করা ন্যায্য হইবে ইহা বলা যায় না। বিচার করা হইবে বলিলে এবং শীঘ্র শীঘ্র বিচার আরম্ভ হইলে ন্যায়ের দিক্টা সুরক্ষিত থাকে। আরেকটা কথা হইল, চিকিৎসা-কেন্দ্র অচল করিয়া দেওয়া সমাজের দিক্ দিয়া সু-নীতি-সঙ্গত কি না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যাঁহারা ডাক্তার আখ্যা লাভ করেন ও চিকিৎসাকেন্দ্র-গুলি চালিত রাখেন তাঁহারা ঐ আখ্যা লাভের পূর্ব্বে একটা শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা হইল গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস-এর শপথ। হিপোক্রেটিস খৃঃ পূঃ ৪০০—৩৫৭ সময়কার মহাজ্ঞানী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার পিতা বলা হইয়া থাকে। তিনি সকল চিকিৎসকের নিজ কার্য্যের সু-নীতি অনুগত কর্ত্তব্যের কথা স্বীকার করিয়া চলিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগকে অবহিত করিয়াছিলেন। হিপোক্রেটিসের শপথ অনুসারে কোনও চিকিৎসকই

রোগীর প্রতি নিজ কর্ত্তব্য কোন কারণেই অবহেলা করিয়া চলিতে পারেন না। রোগী যাহাতে যথাসম্ভব সু-চিকিৎসা প্রাপ্ত হয় সেই ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের শপথ অনুবর্ত্তী কর্তব্য। এই শপথ স্বার্থবর্জ্জিত এবং এই শপথ গ্রহণ করিবার পরে কোন অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা তুলিয়া চিকিৎসক রোগীকে চিকিৎসা না করিয়া রোগভোগ করিতে দিতে পারেন না। অর্থাৎ চিকিৎসকদিগের প্রথম, প্রধান ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইল রোগীর চিকিৎসা যথাসম্ভব উপযুক্তরূপে চালাইয়া চলা। কোন ভাবেই চিকিৎসক সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ২০০০ হাজার বৎসর এই পূর্ব্বোল্লিখিত হিপোক্রেটিসের শপথ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন ও এখনও তাহা সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অ্যালোপ্যাথী শাস্ত্র অনুগত চিকিৎসাবিদ্যা যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহারা সকলেই ডাক্তারী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে ঐ শপথ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্ম্মীসংঘ গঠন করিয়া তাঁহারা নিজেদের শপথের কথাটা ভুলিয়া চলিতে পারেন না। সুতরাং চিকিৎসকদিগের দাবি ও নালিশ যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বিচার-কক্ষে চলিয়া যায় ও কোনও ধর্ম্মঘটের কথা না উঠিতে পারে সমাজের ব্যবস্থাপকদিগের কর্ত্তব্য সেইরূপ ব্যবস্থা কঠিন হস্তে প্রয়োগ করিবার আয়োজন অটুট রাখা। নার্স-দিগের জন্যও ঐ এক রীতি অনুসরণ করা আবশ্যক এবং এইরূপ ব্যবস্থা হইলে এই দিক্ দিয়া সমাজের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের কোন অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

ইস্পাতের মূল্যে দ্বৈবিধ্য

বহুকাল পূর্বে একটা সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালিত ছিল যাহাতে সকল বিক্রেতা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন তাহা একটা সাধারণ তহবিলে জমা করিতেন ও তৎপরে সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ীভাবে ঐ তহবিল হইতে নিজ নিজ অংশ বলিয়া একটা মূল্য পাইতেন। উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত তাহা হইতে সরকার আমদানি মাল বিক্রয়ের লোকসান মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেন। আমদানি মালের অধিকাংশই সরকারী কার্য্যের জন্য আনা হইত। সুতরাং এই সাধারণ তহবিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা রাখা ও কিছু কিছু বাদ দিয়া বিক্রেতাকে তাহার একটা অংশ-মাত্র দেওয়ার রীতি একটা সাধারণের নিকট টাকা আদায়ের উপায় মাত্র ছিল। বর্তমানে শুনা যাইতেছে যে, ইস্পাতের মূল্য দুই প্রকার হইবে। বৃহৎ বৃহৎ খরিদ্দারদিগের জন্য কম মূল্যে ইস্পাত সরবরাহ হইবে এবং যাঁহারা অল্প পরিমাণে ইস্পাত ক্রয় করিবেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে মাল পাইবেন। অর্থাৎ এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে যাহাদের অধিক দিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা শস্তায় মাল পাইবেন ও যাঁহারা অধিক দিতে অক্ষম তাঁহারা বেশী দাম দিতে বাধ্য হইবেন। এই রীতিকে কখনও ন্যায্য অথবা অল্পবিত্ত ব্যক্তিদিগের সহায়ক বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এই নিয়ম চলিলে ইহা একটা নতুন শোষণ পদ্ধতি বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইবে। আশা করা যায় এইরূপ কোনও নিয়ম চালানর ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর করিবেন না। সরকার বলিতে আমরা আজ-কাল জনগণের প্রতিনিধি শাসকদিগকেই বুঝি। তাঁহারা যদি সাধারণের অমঙ্গলসূচক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিলিব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে শক্তির আসনে বসাইলেও তাঁহারা বস্তুতঃ নিজেদের সাধারণের প্রতিনিধি মনে করেন না। তাঁহারা এই কথাই ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কোনও রাষ্ট্রীয় দলের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি ও তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হইল ঐ রাষ্ট্রীয় দলের সুবিধা ও মত বুঝিয়া চলা। রাষ্ট্রীয় দলের অভিলাষ ও মতবাদ এবং জনমঙ্গল এই দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরুদ্ধতা জাগ্রত হইলে যদি জনমঙ্গলকেই বলিদান দেওয়া হয় তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিয়া সাধারণতন্ত্র পরিচালনা সাধারণের স্বার্থরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় নহে।

বৃটিশকে ডাঙ্গে কোনও চিঠি লিখিয়াছিলেন কি না

কিছুকাল। হইল একটি পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে কারাগারে বাস করিবার সময় বৃটিশ শাসকদিগকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যাহাতে মনে হয় যে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহিত মিলিত ভাবে চলিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন কি তাঁহাকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিলে তিনি বৃটিশের সহায়তা করিবেন এইরূপ কথাও সেই পত্রে ছিল। ডাঙ্গে সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ঐরূপ কোন পত্র কখনও লিখেন নাই। ডাঙ্গে সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। বৃটিশ শাসকগণ পূর্ব্বকালে যে কখনও কোন জাল দলিলপত্র ব্যবহার করিয়া শত্রুপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই এমন কথা বৃটিশের পরম বন্ধুগণও বলিতে পারেন না। বৃটিশের পক্ষে জাল পত্র তৈয়ার করিয়া নিজেদের দফতরে রাখা কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহারা এইরূপ কার্য্য পূর্ব্বেও করিয়াছেন ও এক্ষেত্রেও করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। কারণ, যদিও ডাঙ্গে সাহেবের বিরুদ্ধ পক্ষ নানাভাবে প্রমাণ চেষ্টা করিবেন যে পত্র যাহা আছে তাহা জাল নহে একথা তথাপি মানিতেই হইবে যে বৃটিশ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা যে জাল পত্র তৈয়ার হইয়াছে তাহা সহজে কেহ জাল বলিয়া ধরিতে পারিবে না।

আর একটা কথা হইল এই, যে বৃটিশ যাহাই বলুন না কেন এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা সেই কথার সমর্থন করিলেও মানিতেই হইবে যে, ডাঙ্গে সাহেব নির্ব্বোধ ও অসাবধান ব্যক্তি নহেন। তিনি যদিও কখনও বৃটিশের সহায়তা করিতে কোনও কারণে প্রস্তুত হইয়া থাকেনও তাহা হইলেও তিনি সেই কথা পত্রে লিখিয়া দফতরগত কখনও করিতেন না। এই জাতীয় কার্য্য যাহারা করেন তাঁহারা সকল সময়েই গোপন মতলব ও গোপন কথা সাধারণের অজ্ঞাত রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়া চলেন। মৌখিক কথা বলিয়াই এই সকল কথা আরম্ভ ও শেষ হয়। চিঠি লিখিয়া কেহ কিছু করে না। সুতরাং ডাঙ্গে সাহেবের দ্বারা লিখিত তথা কথিত পত্রাদি জাল, এই কথাই সাব্যস্ত হয়। আমরা ইহাই গ্রাহ্য মনে করি।

তৈলাস্ত্রের ক্ষমতা অসীম

মানব কল্পনা সুদূর অতীতকাল হইতেই নানা প্রকার সর্ব্বধ্বংসকারী অস্ত্রের আকারপ্রকার লইয়া কালক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ, নাগপাশ, ব্রহ্মাস্ত্র কিম্বা পাশুপত অস্ত্র প্রভৃতির কল্পনা মানবজাতির চির বর্ত্তমান যুদ্ধজয় ইচ্ছার পরিচয় দিয়া থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে বহু বিস্ফোরক ও বিভিন্ন উপায়ে সেই সকল বিস্ফোরক পূর্ণ আক্রমণ-অস্ত্র নিক্ষেপ ব্যবস্থা লইয়া যুদ্ধবিশারদগণ ব্যাপকভাবে নিজেদের কর্ম্মশক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও আবিষ্করণ প্রতিভা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অস্ত্র ব্যবহারে কোন আক্রমণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অস্ত্র সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। যাহা নাই তাহা কখনও আক্রমণের অস্ত্র হইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি আরব ইসরায়েল যুদ্ধে প্রমাণ হইয়াছে যে, যাহা নাই তাহাও প্রচণ্ড শক্তিধারী অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আরবদিগের দেশে প্রচুর তৈল আছে এবং বিশ্বের বহু দেশে আরব হইতে তৈল আমদানি করিয়া রেলগাড়ী, বিমান, জাহাজ, মোটরকার, কলকারখানা ইত্যাদি চালান হইয়া থাকে। অনেক দেশে রন্ধন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গৃহাদি গরম রাখা প্রভৃতি কার্য্যও আরব হইতে তৈল আনাইয়া সম্পন্ন করা হয়। এই অবস্থাতে বহু দেশই আরব হইতে তৈল না আসিলে বিশেষ বিপদে পড়িবেন বলিয়া বুঝা গিয়াছে। আরবগণও বিশ্ববাসীকে ইসরায়েল বিরুদ্ধতায় নিযুক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন যে যদি কোন দেশ বিশেষ ইসরায়েল বিরুদ্ধতা করিতে রাজী না হ'ন তাহা হইলে সেই দেশকে আরবগণ তৈল পাঠাইবেন না। অর্থাৎ তৈল না থাকার আঘাতে সেই দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ তৈল না থাকার আঘাত বায়ুবাণ, অগ্নিবাণ অথবা পার-

মাণবিক বিস্ফোরণ হইতে কোন ভাবেই কম জোর হইবে না। আরবগণ বিশ্বকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তৈল নাস্তির শক্তিমত্তা কিরূপ ভীষণ ও প্রচণ্ড।

আরবদিগের এই তৈলাস্ত্র ব্যবহারের ভয়ে ভীত হইয়া বহুদেশেই জনসাধারণ নানা ভাবে সেই আক্রমণের হস্ত হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী নিজ প্রাসাদে তৈল ব্যবহার হ্রাস করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং যাতায়াতের জন্য মোটর গাড়ী ব্যবহার না করিয়া রেলগাড়ীতেই যথাসম্ভব চলাফেরা করিতেছেন। প্রিন্স্ ফিলিপ নিজের বৃহৎ মোটরগাড়ী তুলিয়া রাখিয়া একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় যান ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। প্রিন্স্ অফ ওয়েলস চার্ল্স পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইংলণ্ডে সকল ব্যক্তিই এই তৈলাভাব অস্ত্র যাহাতে তাঁহাদিগের অর্থনীতিকে অচল করিয়া দিতে না পারে সেই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। এদেশে তৈল পাঠান হইবে না বলিয়া কেহ আমাদিগকে ভয় দেখায় নাই। তৈল আসিতে পারে কিন্তু আমাদের বিদেশী অর্থ নাই বলিয়া আমরা ক্রয় করিতে অক্ষম। ঐ অর্থ থাকিলে তৈলও থাকিবে। আমরা বিদেশী অর্থাভাবের ফলে তৈলাভাবজনিত কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইব। অবশ্য আমাদিগের দেশে ইয়োরোপ আমেরিকার মত ঠাণ্ডা আবহাওয়া না থাকায় তৈলাভাব তেমন প্রাণনাশক রূপ ধারণ করে না। তাহা হইলেও আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ ট্রেণ, বাস-লরি প্রভৃতি না চলিলে কিম্বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষুণ্ণ হইলে সকলেরই জীবনযাত্রার গতি ও ধারা অল্প বিস্তর ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। এই কারণে আমাদেরও কর্ত্তব্য হইবে সকল কার্য্যের এরূপ ব্যবস্থা করা যাহাতে তৈলের পরিবর্ত্তে কয়লা বা অপর কিছু ব্যবহার করিয়া জীবন-যাত্রা যথাযথভাবে চলিতে থাকে। কয়লার সাহায্যে বাষ্প-তেজ সৃষ্টি করিয়া রেলগাড়ী প্রভৃতি চালান সহজেই হইতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনও এই উপায়ে হয়। কয়লা হইতে গ্যাস এমন কি তৈলও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত আছে কাষ্ঠজাত সুরাসার, তাহাও পেট্রলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভারতবর্ষকে যদি আরব মুলুক হইতে তৈল ক্রয় করিয়া সকল কিছু পূর্ব্বের ন্যায় চালাইয়া চলিতে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে তৈলমূল্য যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বাৎসরিক ১০০০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী অর্থ ঐ কার্য্যেই লাগিয়া যাইবে। আমাদের যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন হইয়া থাকে তাহা হইতে যদি শুধু তৈলের জন্যেই ১০০০ হাজার কোটি টাকা প্রমাণ অর্থ খরচ হইয়া যায় তাহা হইলে অপরাপর অতি প্রয়োজনীয় আমদানিতে বাধা পড়িবে। এইরূপ হইলে অর্থনীতির সহজ সরল গতি ও ধারা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় রাখা সম্ভব হইবে না। বাধা প্রাপ্তির অর্থ হইবে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি। তাহাতে নানান দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে এবং সেইরূপ ঘটিলে ফল হইবে বেতনবৃদ্ধির দাবি। অর্থাৎ যে মূল্যবৃদ্ধির ফলে আজ সর্ব্বত্র অসন্তোষের বন্যা প্রবলভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে সে মূল্যবৃদ্ধি যদি আরও অদম্য রূপ ধারণ করে তাহা হইলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হইবে। অতএব এমনভাবে দেশের অর্থনীতিকে চালাইতে হইবে যাহাতে এই মূল্যবৃদ্ধি আরও জোরাল না হইয়া উঠে। প্রথমতঃ বিদেশী দ্রব্য আমদানি না করিয়া সেই সকল দ্রব্য এই দেশেই প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ যাহা দেশে প্রস্তুত হইতে পারে ও যাহা আমদানি করা বিদেশী-মালের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে সেই সকল দ্রব্য বাজারে চালান প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ আমদানি মাল, বিশেষ করিয়া তৈল, যাহাতে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেইরূপ সামাজিক প্রচেষ্টা সতেজ প্রচার ব্যবস্থা করিয়া সমাজের সকল ব্যক্তির কার্য্যে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। খনিজ তৈলের পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ তৈল কতদূর ব্যবহার করা সম্ভব তাহা লইয়া গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক আয়োজন করিলে সম্ভবত অনেক কার্য্যে খনিজ তৈল ব্যবহার আর আবশ্যক না হইতে পারে। কেরাসিনের পরিবর্ত্তে রেড়ির বা

কোন উদ্ভিজ্জ তৈল দিয়া বাতি জ্বালান চলিতে পারে। পূর্ব্বকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া নানান কার্য্য করা চলিত। এখনও যদি উদ্ভিদলব্ধ তৈল এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যাহাতে আলোক আরও তেজাল হয় তাহা হইলে খনিজ তেল আর না ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে। রেড়ির তেল দিয়া যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশগুলিকে তৈলাক্ত রাখা সহজেই হইতে পারে এবং একসময় ক্যাস্ট্রল নামক তৈলের এই জন্য প্রচুর ব্যবহার হইত। এখন হয় কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু হওয়া যে সম্ভব তাহা আমরা স্থিরনিশ্চয় ভাবে জানি। কলকব্জা, মোটর গাড়ী, এঞ্জিন প্রভৃতি চলিবার জন্য যে শক্তি আবশ্যক হয় তাহা মূলতঃ বিস্ফোরণ হইতে আসিয়া থাকে। এই বিস্ফোরণ তৈলের বাষ্প ও হাওয়া মিলাইয়া তাহা বৈদ্যুতিক ভাবে জ্বালাইয়া ফাটাইয়া করা হইয়া থাকে। তৈলের পরিবর্ত্তে অপর কোন বিস্ফোরক বস্তুর সাহায্যে শক্তি উৎপাদন নিশ্চয়ই সম্ভব এবং তাহা কার্য্যকর ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে যাহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে সে চেষ্টা এখন হইতেই করা আবশ্যক। অসীম শূন্যে গমন করিবার জন্য নানা প্রকার শক্তিউৎপাদক বস্তু ব্যবহার করা হইতেছে। তাহার মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদির নাম শুনা যায়। পারমাণবিক শক্তিও বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগান যায় এবং অপরাপর কার্য্যেও তাহার ব্যবহার সম্ভব। আমরা যন্ত্র-বৈজ্ঞানিক নহি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহাদিগের উচিত এই সকল দিকে দৃষ্টি দান করা। উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার যাহাতে বহু লোকে চেষ্টা করেন সেইরূপ মানসিক আবহাওয়ার সৃজন প্রয়োজন।

দেশের অবস্থা কি হইতে কি হইয়াছে

১৯৫১-৫২ খৃঃ অব্দে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬কোটি ১২ লক্ষ। ১৯৬১-৬২ খৃঃ অব্দে তাহা বাড়িয়া হয় ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ। ১৯৭১-৭২এ লোক সংখ্যা হয় ৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং এখন অনুমাণ করা হইতেছে যে ভারতের জন সংখ্যা ৬০ কোটির অধিক। যদি ১৯৪৯ খৃঃ অব্দের সকল দ্রব্যের মূল্য ১০০ ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে সকল দ্রব্যের মোটামুটি মূল্য ১৯৫১-৫২ খৃঃ অব্দে দাঁড়ায় ১০৫এ। ১৯৬১-৬২তে তাহা বাড়িয়া হয় ১২৬, ১৯৭১-৭২এ ২২৪ ও বর্ত্তমানে ২৮০। জাতীয় আয় ১৯৫২ ৫২তে ধরা হইয়াছিল ১০,৫১৫ কোটি। ১৯৬১-৬২র জাতীয় আয় ধরা হয় ১৩,৭৬০ কোটি এবং ১৯৭১-৭২ তাহা দাঁড়ায় ১৮,৮০০ কোটিতে। বর্ত্তমান জাতীয় আয় অনুমান করা হয় ২০,০০০ কোটি হইয়াছে। লোক সংখ্যা এবং জাতীয় আয় ১৯৫১ হইতে এখন অবধি দ্বিগুণ হয় নাই। মূল্যবৃদ্ধি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ২.৭ গুণ (অর্থাৎ আড়াইগুণের অধিক) বাড়িয়াছে।

অধর্ম্মের আশ্রয়ে জাতীয়তাবোধ সবল হইতে পারে না

আরব "কমাণ্ডো" বিপ্লবীদিগের কার্য্য কলাপ বিশ্ববাসীকে ক্রমশঃ আরব বিপ্লবীদিগের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে বাধ্য করিতেছে। ইহার কারণ, এই দলের যোদ্ধাগণ ন্যায়যুদ্ধের নীতি ও রীতি কিছুই মানেন না। অজানা, নির্দ্দোষ, আরব জাতীয়তার সহিত সকল সম্পর্কহীন জনসাধারণের উপর নির্ম্মম আক্রমণ করিয়া তাহাদের হত্যা করা; অথবা যাহাকে ইচ্ছা যখন তখন যত্রতত্র ধরিয়া লইয়া যাওয়া, আটক রাখা ও কখন কখন নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা; এই সকল মানব উৎপীড়ন সভ্যজগৎ কখনও বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে পারে না। আরব "কমাণ্ডো"দিগকে নিজেদের ধরণ ধারণ বদলাইতে হইবে, নয়ত তাঁহাদের বিশ্বের সকল মানুষের সহানুভূতি হারাইতে হইবে।

শ্রীব্রেঝনেভের ভারত পরিক্রমণ

পরিক্রমণ বলিলে যথার্থ বর্ণনা হয় না, কারণ, শ্রীব্রেঝনেভ যদিও ভারতে আসিয়াছিলেন তথাপি তিনি যে পাঁচ দিন এদেশে ছিলেন তাহার মধ্যে তিনি এদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। করিবার প্রয়োজনও সম্ভবত ছিল না,

কারণ: তাঁহার কথাবার্ত্তা করিবার প্রয়োজন ছিল শুধু রাজধানীতেই এবং তাঁহার এখানে আগমনের যে প্রভাব তাহাও তিনি কলিকাতা, মাদ্রাজ অথবা লক্ষ্ণৌ না যাইলে যথাযথ ভাবে কার্য্যকর হইতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। সুতরাং ব্রেঝনেভের উপস্থিতির কারণ বা উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন তাহা সফল হইয়াছে বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। বিরুদ্ধ সমালোচকগণ বলিবার চেষ্টা করিতেছেন যে ইন্দিরা সরকারের কমজোরি হইয়াছে ও সে অবস্থার প্রতিবিধান করিবার জন্যই ব্রেঝনেভের আগমন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দিরা সরকার কমজোর রাজনৈতিক ভাবে কিছু মাত্র হয় নাই; যদি হইয়া থাকে তাহার কারণ খাদ্যাভাব অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ব্রেঝনেভ যদি খাদ্য সরবরাহ করিয়া দিতে পারেন অথবা দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিবার কোন সক্রিয় পথ দেখাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেস (আর)এর জোর বাড়িতে পারে। শুধু শ্রীযুক্ত ব্রেঝনেভ কিম্বা রাষ্ট্রপতি নিকসন এদেশে ঘুরিয়া যাইলেই কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়া হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিয়াছে এবং তাহাতে গভর্ণমেণ্টের কিছু সুবিধাও হইয়াছে; কিন্তু আরও খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন আছে। তাহা কোথা হইতে আসিবে তাহা কে বলিতে পারে? তাহার পরে আছে তৈলের কথা। রুশিয়া যদি নগদ মূল্য না পাইলেও ধারে তৈল সরবরাহ করেন তাহা হইলে তাহা লাভের কথাই হইবে। কিছু তৈল হয়ত এই ভাবে আসিতেও পারে। তৈল ব্যতীত ভারতের অন্য যে সকল বিদেশজাত বস্তুর অভাব আছে তাহার মধ্যে সংবাদপত্র মুদ্রন করিবার কাগজ একটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বস্তু। ধারে কাগজ পাইলে তাহাও সুবিধার কারণ হইবে। দ্রব্যের অভাব ও অর্থনৈতিক গোলাযোগের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে কম্যুনিষ্ট দলের কথা। ব্রেঝনেভ তাঁহাদেরও কংগ্রেস সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন এবং তাহাও একটা মূল্যবান্ সম্ভাবনার কথা।

ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানে দাবির লড়াই

কর্মীদিগের দাবির তোড় সেই সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে যেগুলিতে সকল দিক দিয়াই কর্ম্মীরা বিশেষ সুখ সুবিধা উপভোগ করিয়া জীবন কাটাইয়া থাকেন। যে সকল কারবারের অবস্থা ভাল নহে, বেতনাদি তেমন উচ্চহারে দেওয়া সম্ভব হয় না, সেই সকল কারবারে কর্ম্মীদিগের দাবির ফিরিস্তিও বিশেষ দেখা যায় না। ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ এই দেশের সকল কর্ম্মসংস্থার সহিত তুলনায় অধিক বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাইয়া থাকেন। এই কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণের দাবি দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে "যার ছেলে যত পায় তার ছেলে তত চায়" প্রবাদবাক্যটি বিমানসংস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য। ভারত সরকারও বিষয়টার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদিগের অন্যায় আবদারে কান দিতেছেন না। এবং একথাও তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতেছেন যে, কার্য্যে মন্দগতি কিংবা কার্য্য বন্ধ ইত্যাদি করিয়া যদি কর্ম্মীগণ নিজেদের আন্দোলন সফল করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টেও এই জাতীয় চেষ্টা যাহাতে সফল না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজন হইলে বিমান চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু অন্যায় আবদার কোনও মতেই সহ্য করা যাইবে না। ভারত সরকারের এই ক্ষেত্রে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া মানিয়া না লওয়া খুবই সৎসাহসের পরিচায়ক। এই ভাবে যদি গভর্ণমেণ্ট সকল ক্ষেত্রেই ন্যায়ের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে আজ ভারতের অবস্থা আরও অনেক উন্নত হইতে পারিত। কিন্তু এখনও সময় শেষ হইয়া যায় নাই। এখনও সরকারী সকল কর্ম্মীকে নিজ নিজ কার্য্য যথাযথ ভাবে করিতে বাধ্য করিয়া সরকারের সুনাম রক্ষা করা সম্ভব। একটা যে ধারণা সকলের

এরপর ৩৭৮ পাতায়

রোমান্সের রংমহল

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কথাসাহিত্য তথা গল্প-ছোটগল্প-উপন্যাস-রমন্যাস-নভেলেট-বড় গল্প ইত্যাদির বিবর্তন নিয়ে যাঁরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা ক'রে থাকেন তাঁরা জানেন যে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আসার পর মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই উপন্যাসবর্গীয় সাহিত্যের দুটি বড় শাখা গ'ড়ে ওঠে: নভেল ও রোমান্স। প্রথমটিতে বাস্তবানুগামী জীবনচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য; দ্বিতীয়টিতে ঘটনাবর্ণনা, পরিবেশ রচনা, কল্পনাবিহার ও স্বপনী জীবনাদর্শের আধিপত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দুই শ্রেণীর রচনাকেই সাধারণ ভাবে উপন্যাস বলা হয়ে থাকে।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের রচনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের পর দেখা যায় যে, অনেক ঔপন্যাসিক নভেল ও রোমান্স, দু রকম আখ্যায়িকাই রচনা করেছেন; আবার, অনেকে যে কোন একটি ধারা আশ্রয় করেছেন। এমন অনেক উপন্যাস আছে যেখানে নভেল ও রোমান্সের ভেদরেখা খুব স্পষ্ট নয়। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এখন উপন্যাস সাহিত্যে নভেল ও রোমান্সের ধারাদুটি সুষ্টভাবে পৃথক্ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে নভেলের পরিমাণ উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকে। রোমান্সের ধারা, বিশেষত ঐতিহাসিক রোমান্সের ধারা ক্রমে ক্রমে লুপ্তির দিকে মিলিয়ে যায়। মনে হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে শুধু নভেল বা বাস্তববাদী বিশ্লেষণনিষ্ঠ উপন্যাসই বর্তমান থাকবে, রূপকথার মতোই রোমান্সও হয়ে দাঁড়াবে কেবল অতীতের এক কল্পলোক। এমন কি, সুদূর অতীতের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে দূরত্বের স্বপ্নরঙিন ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে রোমান্টিক চিন্তা ভাবনা কল্পনার মায়াজাল বিস্তারের পরিবর্তে অতীতেরও বস্তুনিষ্ঠ রূপ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন ঐতিহাসিক নভেলিস্টের দল।

ঠিক এই সময় ফরাসী রোমাঁসিয়ের—রোমান্সলেখক—স্বনামধন্য আলেক্সাঁদ্র্ দ্যুমা প্রবীণ (১৮০২-৭০) গতায়ু হবার পর যখন ঐতিহাসিক রোমান্সের ধারাটি অবলুপ্তির পথে, তখন রূপে রসে ছন্দে ভঙ্গিতে সুষমার প্লাবন বইয়ে দিয়ে রোমান্সের রংমহল রচনা করলেন এক ইতালীয় ঔপন্যাসিক। বাঙালী প্রকাশকদের উৎসাহহীনতা ও বাঙালী লেখকদের অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপারে স্বাভাবিক নিরুদ্যমের জন্যে ইনি কেবল বাংলা জানা পাঠকমহলে আদৌ পরিচিত নন। কিন্তু বিদেশে এঁর প্রতিটি বই অন্তত মিলিয়ন সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। এঁর সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালী পাঠকদের অবহিত করবার জন্যেই এই সন্দর্ভের অবতারণা।

আধুনিক আলেক্সাঁদ্র্ দ্যুমা প্রবীণ ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনর্জন্মদাতা রূপে প্রসিদ্ধ ইতালীয় কথা-সাহিত্যিক রাফায়েল সাবাতিনি ১৮৭৫ সালে মধ্য ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রায় অখ্যাত অবজ্ঞাত অকৃতী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। পর্তুগাল ও সুইজার্ল্যাণ্ডে তাঁর বিদ্যালয় জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর পিতা ইতালীয় হলেও তাঁর মা ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। মাত্র আঠারো বছর ব সেই সাবাতিনি পাঁচটি ভাষায় সমান দক্ষতার সঙ্গে অনর্গলভাবে কথা বলতে পারতেন: ইতালীয়, ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ। তা ছাড়া, লাতিন ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহুভাষায় সহজ অধিকার বিস্তৃতি লাভ করে। ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয় জীবন

শেষ ’করে তিনি ইংল্যাণ্ডেই জীবিকানির্বাহের জন্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইংল্যাণ্ডে নাগরিক অধিকার লাভের পর তিনি প্রথমে পুস্তক প্রকাশকের জীবিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকাশনার ব্যবসায়ে তাঁর কোন সাফল্য লাভ হয়নি। এর পর অতি কঠোর জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত থেকে তিনি বহু রকম পেশা গ্রহণ করেন যেগুলি প্রকৃতিতে একে অপরের থেকে নিতান্ত স্বতন্ত্র ধরনের। কিন্তু কোন পেশাতেই তাঁর চমৎকারা অন্নচিন্তার সুরাহা হয়নি। ১৯০২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস বা রোমান্স প্রকাশিত হয়। বইটি তাঁর প্রথম প্রয়াস হলেও তাঁর সব বইয়ের মতোই লাবণ্যে ভরা, রসে টলটল। প্রথম থেকেই ইতিহাস তাঁর অতি প্রিয় বিষয় ছিল। ইতিহাসের খুঁটিনাটিতে তাঁর মতো গভীর জ্ঞান কোন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক আগে বা পরে কখনও দেখা গেছে কি না নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। বিখ্যাত ফরাসী কূটনীতিবিদ্ মাজারিন বা মাজার‍্যা-র সমকালীন ঘটনাবলী অবলম্বনে সাবাতিনি তাঁর প্রথম কাহিনী লিখেছিলেন। The Lovers of Yvonne (ইভোনের প্রেমিকরা)। কিন্তু খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠার রহস্য বোঝা কঠিন। প্রকৃত গুণী তাঁর জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খ্যাতি পেলেন না অথচ এক নিম্ন স্তরের শিল্পী সমসাময়িককালে প্রচুর যশ ও অর্থ কুড়িয়ে নিয়ে গেল, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে এমন দৃষ্টান্ত শত শত। সাবাতিনি তাঁর প্রথম বইএ খ্যাতি বা অর্থ কিছুই পেলেন না। এই ভাবেই দীর্ঘ উনিশ বছর কেটে গেল। পরে তাঁর যে সব বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে সেই বইগুলি এই ১৯ বছর সময়ের মধ্যে যখন একে একে প্রকাশিত হল, তখন সেগুলি প্রায় কোন সমাদর পায়নি। আরো পনেরোখানি বই এই উনিশ বছরে তিনি লিখেছিলেন যাদের মধ্যে ছোট গল্পের দুটি সংগ্রহ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ তিন ভল্যুমের এক মহাগ্রন্থও ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ষোলটি উৎকৃষ্ট দেবভোগ্য উপাদের গ্রন্থ রচনার পর ওরাফায়েল সাবাতিনি একজন অনাদৃত লেখকরূপে লোক চক্ষুর প্রায় অন্তরালে রয়ে গেলেন। সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দুর্গেশ-নন্দিনী রোমান্স নিয়ে আবির্ভূত হন। একই বয়সে সাবাতিনি “দি লভার্স অব ইভোন” নিয়ে পাঠক সমাজে আত্ম-প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২১ সালে ৪৬ বছর বয়সেও প্রৌঢ় সাবাতিনি প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত লেখক ছিলেন।

তার পরই ঘটল সেই অঘটন সাহিত্যজগতে যা কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়। ১৯২১ সালে সাবাতিনির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Scaramouche (স্পেনীয় শব্দ, স্পেনীয় উচ্চারণে স্কারামোচে, কিন্তু ফরাসি উচ্চারণে স্কারামুশ; ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি-কায় লিখিত ব’লে ফরাসি উচ্চারণই বিধেয়) প্রকাশিত হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেখক খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে গেলেন এবং বিপুল অর্থ তাঁর করায়ত্ত হল। স্কারামুশ্ বইটি কেবল যে লেখককে স্থায়ী সাহিত্যকীর্তির অধিকারী করল তাই নয়, এই উপন্যাসটি থেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নবজন্মের সূত্রপাত হল। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই স্কারামুশের আবির্ভাব এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

স্কারামুশের দৌলতে সাবাতিনির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব উপন্যাসের দিকে পাঠক সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ফলে তাঁর আগের আর্থিক দিক্ থেকে বিফল বইগুলি নতুন সংস্করণে লক্ষে লক্ষে বিক্রি হতে লাগল। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে স্কারামুশ যুগান্তর এনে দেবার পর সাবাতিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী হলেন এবং তাঁর দেখাদেখি আরো অনেক নবীন প্রতিভা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে নতুন ক’রে উৎসাহ বোধ করলেন। তাঁদের মধ্যে ডেনিস হুইট্লির খ্যাতি ও আর্থিক সাফল্যের কথা সুবিদিত। দ্যুমা প্রবীণের মৃত্যুর একান্ন বছর পরে ঐতিহাসিক রোমান্সের ধারাটি লুপ্ত হয়ে যাবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলেন, তা একে-বারে দূর হয়ে গেল। ১৯২১-৭৩ সালে গত বাহান্ন বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শত শত ঐতিহাসিক উপন্যাস

লেখা হয়ে চলেছে। বাংলা ভাষাতেও পরলোকগত ঐতিহাসিক ও লিপিতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদাড়ো খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র শচীশচন্দ্র প্রভৃতির পর আমৃত্যু এই ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন শশাঙ্ক, ধর্মপাল, ধ্রুবা প্রভৃতির মতো অতি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লিখে। কিন্তু সাবাতিনির আধুনিক বঙ্গীয় সংস্করণ প্রকৃত অর্থে বলা যায় পরলোকগত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর গৌড়-মল্লার, কালের মন্দিরা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ ইত্যাদি উপন্যাস সাবাতিনির আন্তর্জাতিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

১৯২২ সালে সাবাতিনির আর একটি অসামান্য উপন্যাস ক্যাপ্টেন ব্লাড প্রকাশিত হল। চরিত্র-চিত্রণে ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে সাবাতিনি যে কত বড় শিল্পী, তা স্কারামুশ ও ক্যাপ্টেন ব্লাড উপন্যাসদুটির চলচ্চিত্ররূপের দ্বারা প্রতিপন্ন হল। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য, কাত্যায়ন, শাজাহান, ঔরংজেব চরিত্রগুলিকে রূপায়িত ক'রে নাট্যলোকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃত যশের অধিকারী হন তেমনি সাবাতিনির কল্পলোকের অধিবাসী নায়কদের জীবনলীলার চলচ্চিত্ররূপদান করতে গিয়ে এরল ফ্লিন ও স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বস্তুত ক্যাপ্টেন ব্লাডের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে সামান্য কয়েদী এরল ফ্লিন রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত অভিনেতায় পরিণত হন। স্কারামুশের নায়ক আঁদ্রে মোরো-র ভূমিকায় স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জারের সাফল্যের বৃত্তান্তও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

১৯৫০ সালে পরিণত বয়সে পূর্ণ সাফল্যের প্রশান্তির মধ্যে এই ঐন্দ্রজালিক রোমান্টিক শিল্পী পরলোক গমন করেন। ভিক্টর হিউগো বা ভিক্তর য়্যুগো, চার্লস ডিকেন্স ও বঙ্কিমচন্দ্রকে জগতের শ্রেষ্ঠ তিনজন ঔপন্যাসিক বলা যায়। শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত পোষণ করতেন। রাফায়েল সাবাতিনিকে ঠিক এই পর্যায়ে ফেলা উচিত হবে না। হুগোর ব্যাপ্তি, ডিকেন্সের গভীরতা ও বঙ্কিমের প্রজ্ঞা সাবাতিনির নেই। কিন্তু এই পর্যায়ের ঠিক নিম্ন স্তরে স্কট, দ্যুমা প্রবীণ ও সাবাতিনির স্থান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আখ্যানবস্তুর নিখুঁত উপস্থাপনে, চরিত্রের বলিষ্ঠ ও জীবন্ত রূপায়ণে, পরিবেশের রম্য রচনায় ও চমক সৃষ্টির মনোহারিত্বে ওয়াল্টার স্কটের মর্যাদা রোমান্সের খাস-মহলের রাজার মতো। তাঁর পর ফরাসি কথাসাহিত্যের জাদুকর দ্যুমা প্রবীণ রংবেরং-এর ফুলঝুরি-রংমশালের দীপ্তিতে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। রাফায়েল সাবাতিনি ভাষার সংযমে, রুচির পরিচ্ছন্নতায়, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণার নৈপুণ্যে আমাদের শান্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে এমন এক রোমান্সের জগতে নিয়ে যান যেখানে রোমান্সের রংমহলের সাতরঙা খিলান, দালান, চত্বর অলিন্দের বহু বিচিত্র কারুকার্য ও মোজাইক আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। সস্তা চমক্ সৃষ্টি করার জন্যে সাবাতিনির কোন গরজ নেই। কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি সৃষ্টির মুন্সিয়ানার গুণে চমক্ আপন হতে এসে হাজিরা দেয়। চমকের পর চমক্, বিদ্যুতের ঝলকের পর ঝলক, সে-উদ্ভাসন অক্ষিরমণীয়, অনিন্দ্যসুন্দর।

সাবাতিনির চেতনা ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল। সব রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি নিপুণ প্রশান্তি ও নিঃশব্দ কৌতুকের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ক্রোধের কোন বাহ্বাস্ফোট নেই, দীর্ঘ বক্তৃতার একঘেয়েমি নেই, অথচ ধর্মান্ধতার অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে তিনি প্রায় নীরবে তার মূলোচ্ছেদ করেছেন। নিজে রোমান ক্যাথলিক পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও তিনি রোমক ধর্মযাজকদের বৃথা আড়ম্বর, কুসংস্কার ও কৃচ্ছ্রসাধনের বাড়াবাড়িকে অম্লমধুর ব্যঙ্গের দ্বারা পর্যুদস্ত করেছেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত Hounds of God গ্রন্থে তিনি স্পেনীয় ইনকুইজিটরদের ঈশ্বরের ফেরুপাল ব'লে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হন নি। The Strolling Saint গ্রন্থে মাতার ধর্মোন্মাদের কবল থেকে একটি অসহায় তরুণের আত্মরক্ষার যে-বিচিত্র

কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন, তা থেকেও তাঁর জীবনরস রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্কারামুশের পর ক্যাপ্টেন ব্লাড সাবাতিনির খ্যাতি আরো বাড়িয়ে দেয়। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই এর পর অগণিত বিভিন্ন সংস্করণে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তাঁর কোন বই অনুবাদ করা হয় নি ব'লে এই অসামান্য প্রতিভাধর লেখক সম্পর্কে বাঙালি পাঠকসমাজ প্রায় অজ্ঞ র'য়ে গেছেন।

সাবাতিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা ক'রে যশস্বী হয়েছেন; তাঁর মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৪৪ খানি। সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তাঁদের বিপুলায়তন গ্রন্থে সাবাতিনির প্রত্যেক ঐতিহাসিক রোমান্সের বিষয়বস্তু উল্লেখ ক'রে সেগুলির গুরুত্ব ও উৎকর্ষ স্বীকার করেছেন। আনন্দের অমরাবতীতে প্রবেশের আগ্রহ নিয়ে যদি কেউ এই বইগুলি পড়েন, তা হ'লে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবেন, এ-আশ্বাস অনায়াসে দিতে পারা যায়।

ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে সাবাতিনির সমগ্র রচনাবলীর উৎকর্ষের পরিমাপ দেওয়া সম্ভবপর নয়। কৌতূহলী পাঠকের অন্বেষু মনকে সুযোগ দেবার জন্যে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কঠোর বিধিনিষেধ এমন কি পুস্তক পাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য থাকায় বর্তমান ভারতে বইগুলি সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তবু যদি কেউ সংগ্রহ করতে পারেন, তবে তা বীণাপাণির স্বর্ণপদ্মের এক-একটি পাপড়ি সংগ্রহ করার মতো সার্থক শ্রমের বিষয় হবে।

রাফায়েল সাবাতিনির উপন্যাসাবলী :—

(১) দি লভার্স অব ইভোন (২) দি ট্যভার্ন নাইট (৩) বার্দেলিস দি ম্যাগ্‌নিফিসেণ্ট (৪) দি ট্র্যাম্পলিং অফ্‌ দি লিলিজ (৫) দি লস্ট কিং (৬) দি শ্নেয়ার (৭) দি স্ট্রোলিং সেণ্ট (৮) দি শেম্‌ অফ্‌ মট্‌লি (৯) কলাম্বাস (১০) দি মিনিয়ন (১১) দি গেমস্টার (১২) স্কারামুশ (১৩) স্কারামুশ দি কিংমেকার (১৪) দি সি হক (১৫) ফরচুন'স্‌ ফুল (১৬) ক্যাপ্‌টেন ব্লাড: হিজ ওডিসি (১৭) দি ব্ল্যাক সোয়ান (১৮) দি হাউণ্ডস্‌ অফ্‌ গড (১৯) মাস্টার-এ্যাট-আর্মস্‌ (২০) লভ্‌-এ্যাট-আর্মস (২১ মিসট্রেস উইল্ডিং (২২) বেল্লারিয়ন (২৩) দি রোমাণ্টিক প্রিন্স (২৪) দি নাপ্‌শল্‌স্‌ অফ্‌ নিম্‌বাল (২৫) সেণ্ট মার্টিন'স সামার (২৬) দি লায়ন'স স্কিন (২৭) দি গেট্‌স্‌ অফ ডুম (২৮) দি স্টাকিং হর্স (২৯) দি ক্যারোলিনিয়ান (৩০) শিভালরি (৩১) দি সোর্ড অব্‌ ইসলাম (৩২) দি মার্ক'ইস অফ্‌ কারাবাস্‌ (৩৩) কিং ইন প্রুসিয়া (৩৪) ভিনিসিয়ান মাস্ক।

তাঁর ছোট গল্প সংগ্রহ :—

(৩৫) দি ব্যানার অফ্‌ দি বুল (৩৬) দি জাস্টিস অফ্‌ দি ডিউক (৩৭) টার্বুলেণ্ট টেলস্‌ (৩৮) দি ক্রনিকল্‌স্‌ অফ্‌ ক্যাপ্‌টেন ব্লাড (৩৯) দি ফরচুন্‌স্‌ অফ ক্যাপ্‌টেন ব্লাড।

তাঁর নাটক :—

(৪০) দি টাইর‍্যাণ্ট।

তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থসমূহ :—

(৪১) দি হিস্টরিক্যাল নাইট্‌স্‌' এণ্টারটেনমেণ্ট, ৩ খণ্ড (৪২) দি লাইফ্‌ অফ্‌ চেজার বর্জিয়া (৪৩) তর্কেমাদা এ্যাণ্ড দি স্প্যানিশ ইনকুইজিশন (৪৪) হিরোইক লাইভ্‌স্‌।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলন ও একটি সর্ব্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন

সমর দত্ত

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। স্বাধীন ভারতে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের এলাকায় যে দু'টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে সে দু'টি নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন (বর্ত্তমান ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন)। এই ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বেঙ্গল সার্কেলের প্রায় সাত হাজার শ্রমিক কর্মচারী দীর্ঘ ৪৬ দিন ধর্ম্মঘট করে। তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তিনটি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। এই সার্কেলগুলিকে বলা হ'ত (ক) বেঙ্গল সার্কেল (আসাম থেকে কাশ্মীর এলাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত)। (খ) বম্বে সার্কেল (সমগ্র পশ্চিম ভারতব্যাপী বিস্তৃত)। (গ) মাদ্রাজ সার্কেল (সমগ্র দক্ষিণ ভারত এলাকায় ব্যাপ্ত)। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এই তিনটি সার্কেলের কার্য্যাবলী পরিচালিত হ'ত তিনটি হেড অফিসের মাধ্যমে। এই তিনটি হেড অফিস নিয়ন্ত্রিত হ'ত একটি সেণ্ট্রাল অফিস কর্ত্তৃক। এই সেণ্ট্রাল অফিস অবস্থিত ছিল বম্বেতে এবং এখনও তাই আছে।

উল্লিখিত তিনটি সার্কেলেই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণের তিনটি ইউনিয়ন ছিল। তবে বেঙ্গল সার্কেলের ইউনিয়নটিই (অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং শক্তিশালী। ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হ'বার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রমিক কর্ম্মচারীগণ সাংগঠনিক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। তারা যে কেবলমাত্র বেঙ্গল সার্কেল-ইউনিয়নটিকে সুসংগঠিত এবং উত্তরোত্তর শক্তিশালী ক'রে তোলবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল তা নয়, যুগপৎ বম্বে এবং মাদ্রাজ সার্কেলের ইউনিয়ন দু'টিও যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংগঠিত হয় সে বিষয়ে তারা বম্বে এবং মাদ্রাজ সার্কেলের কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দানে অগ্রসর হয়। এর ফলে বম্বে ও মাদ্রাজ সার্কেলের ইউনিয়ন দু'টিও ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। শীঘ্রই এই দু'টি ইউনিয়নের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'বার পর অনতিবিলম্বে এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গতি উত্তরোত্তর বেগবান্ হ'বার অনুকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ, ভারত স্বাধীন হ'লেও এদেশ বিভক্ত হ'য়ে যায়। বলা বাহুল্য দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। স্বাধীন ভারতের সরকারী নীতি যে জনসাধারণের, বিশেষ ক'রে খেটে

খাওয়া মানুষের, স্বার্থোপযোগী নয় সেকথা শ্রমিক শ্রেণীর বুঝে নিতে দেরী হয়নি। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর TACTICS AND STRATEGY OF REVOLUTION গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ করেন—

"One year of the National Government has revealed to the people the true character of Nehru regime. Prices have soared 400 per cent, inflation is gnawing at the heart of the country's economy, black marketing is rampant, the capitalists are looting the country, the working class and the middle class are thrown into the whirlpool of economic misery and the peasantry is hard hit by the rise in prices of the essential commodities. At the same time the overhead expenses of the so called National Government have bloated up. The Governor General, the Governors, the Ambassadors, the Ministers and the Members of the Central and the Provincial Assemblies are gorging themselves with public money with a voluptuous vulgarity unheard of in any country. Differentiation between the rich class and the mass is being accentuated today more than ever before."

এই রকম পরিস্থিতিতে ভারতের শ্রমিকমহল সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ক্রমশঃ প্রতিবাদমুখর হ'য়ে ওঠে। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গাঙে নতুন জোয়ার দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে এবং বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব ব্যতিরেকে বিভিন্ন শিল্পে বহু নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিল্পের অস্তিমান ট্রেড ইউনিয়নগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর আলোকে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল অর্থ-নৈতিক দাবীদাওয়া আদায় ক'রে নেওয়া এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

এই সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণ তাদের বেঙ্গল, বম্বে এবং মাদ্রাজ সার্কেলে অবস্থিত তিনটি ইউনিয়নের সম্মেলনে একটি ফেডারেশন (Fedaration) গঠনে উদ্যোগী হয় সর্ব্বপ্রথম এই ফেডারেশন গঠনের ধারণা পোষণ করেন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের (বেঙ্গল সার্কেল) সভাপতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনকে যখন বহু বৃহত্তর সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হবে তখন তিনটি সার্কেল ইউনিয়নকে একসঙ্গে একই সময়ে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেবে। সার্কেল ইউনিয়নগুলির সমবেত শক্তির সাহায্যেই শ্রমিক কর্ম্মচারীগণের পক্ষে তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেন্‌শন্ ফাণ্ড, গ্যারাণ্টি ফাণ্ড,গ্রাচুয়িটি এবং বিশেষ ক'রে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক কর্ম্মে শ্রমিকগণের অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত দাবীগুলি আদায় ক'রে দেওয়া সম্ভব হবে। নতুবা নয়। যথাসময়ে সভাপতির এই প্রস্তাব ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সমিতিতে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে ফেডারেশন গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। সভাপতি নিজের এই বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবব্রত ঘোষ এবং আরও কয়েকজন সদস্য তাঁকে এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রস্তাবিত ফেডারেশনটির খসড়া-সংবিধান রচিত হ'লে ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন নেতা সেটি নিয়ে বম্বে এবং মাদ্রাজ সার্কেল ইউনিয়নের নেতৃগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা এই দু'টি সার্কেল ইউনিয়নের নেতৃগণকে প্রস্তাবিত ফেডারেশনটির উদ্দেশ্য কি এবং ব্যাঙ্ক-মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফেডারেশনটি কেন বিশেষ প্রয়োজনীয় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। মাদ্রাজ সার্কেল ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত ফেডারেশনটি গঠনে সম্মত হন এবং তাঁরা এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করেন। কিন্তু বম্বে সার্কেল ইউনিয়নের নেতৃগণ এই ফেডারেশন

গঠনে সম্মত হ'তে পারেননি। শুধু তাই নয়। বম্বে সার্কেল ইউনিয়নের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীআবিদ আলি এই ফেডারেশন গঠনে বিরোধিতা করেন। কিন্তু আবিদ আলি সাহেবের বিরোধিতা সত্বেও আলোচ্য ফেডারেশনটি গঠিত হয়। ফেডারেশনটির নাম হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ষ্টাফ ফেডারেশন। বর্ত্তমানে এর নাম অল ইণ্ডিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ষ্টাফ ফেডারেশন। যাই হোক বম্বে সার্কেল ইউনিয়ন এই নব গঠিত সংগঠনে যোগদানে বেশ কিছুকাল বিরত থাকে।

১৯৪৭ সালের ২০শে অক্টোবর মাদ্রাজে নতুন ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।' এই অধিবেশনে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি এবং শ্রীজ্যোতি ঘোষ প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ এবং এই ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক কর্ম্ম পরিচালনায় শ্রমিক কর্ম্মচারীগণের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধীয় দু'টি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দু'টি প্রস্তাবকে যুগান্তকারী প্রস্তাব বল্লেও অত্যুক্তি হ'বে না। ফেডারেশনের কার্য্যালয় ক'লকাতায় স্থাপিত হয়।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ফেডারেশন সংগঠিত হবার ফলে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। কর্ত্তৃপক্ষ ফেডারেশনটিকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হয়। কিন্তু নব গঠিত ফেডারেশনটি স্বীকৃতি লাভের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইতিপূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রমিক কর্ম্মচারীগণ তাদের মূল বেতন, মাগ্‌গি ভাতা, অন্যান্য ভাতা, কাজের ঘন্টা, ছুটী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে সামান্য লাভবান্ হয়। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনশন ফাণ্ড, গ্যারান্টি ফাণ্ড, গ্রাচুয়িটি সম্বন্ধে তারা এযাবৎ কিছুই পায়নি। আশ্চর্য্যের কথা তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর যে পেনশন পেত সেটা তারা এক রকম নিজেদের টাকাতেই পেত। কারণ চাকুরীতে থাকা কালীন প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে প্রতিমাসে তার মূল বেতন থেকে পেনশন ফাণ্ডে শতকরা পাঁচ টাকা দান করতে হ'ত। এই দানের মোট পরিমাণ বড় কম ছিল না। এই দানের টাকা থেকেই কর্ত্তৃপক্ষ তখন ব্যাঙ্কের স্বল্প বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণকে পেনশন দিত। ফেডারেশন থেকে দাবী করা হ'ল যে কর্ত্তৃপক্ষ যতশীঘ্র সম্ভব পেনশন ফাণ্ড বাবদ শতকরা পাঁচ টাকা দান প্রথা রহিত করুক। কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের টাকায় কর্ম্মচারীগণকে পেনশন দিক্। এতদ্ব্যতীত ফেডারেশন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক কর্ম্ম পরিচালনায় শ্রমিক কর্ম্মচারীগণের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধীয় দু'টি দাবীও পেশ করে।

বম্বে সার্কেল ইউনিয়ন যাতে ফেডারেশনে যোগ দেয় সেজন্য ঐ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে ফেডারেশন সম্পাদক বম্বে সার্কেল পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যে ফেডারেশনের কর্ম্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ ক'রে বম্বে সার্কেল ইউনিয়নের অনেক ইউনিট সন্তুষ্ট হয়। সেই ইউনিটগুলি ফেডারেশনের সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হয়। কিন্তু বম্বে হেড অফিস ইউনিট ফেডারেশনে যোগ দিতে তখনও অনিচ্ছুক থাকে।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে ক'লকাতায় ফেডারেশনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভারতের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি শাহ। ইতিপূর্বে অধ্যাপক শাহ্ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বম্বে সার্কেল ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বম্বে হেড অফিস সহ সমস্ত বম্বে সার্কেল ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ক'লকাতায় ষ্টাফ ফেডারেশনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা শুনে সকলেই খুশী ও উৎসাহিত হয়। কারণ কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কি সামাজিক আন্দোলন, কি সংস্কৃতিক আন্দোলন, এক কথায় সকল প্রকার প্রগতিমূলক আন্দোলনের উৎস স্থল এই

ক'লকাতা। ভারতীয় নব জাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায়ের মূল কর্মকেন্দ্র ছিল ক'লকাতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, যাঁরা নব জাগরণের আলোকে এদেশের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, শিক্ষানৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন তাঁদের সকলেরই কর্মস্থান ছিল ক'লকাতা। যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ জ্বলন্ত অক্ষরে এবং উদাত্ত কণ্ঠে লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত মানবের দুঃখ দুর্দশার চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রই যে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন ক'লকাতার নাগরিক। কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, কি অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণের আদি কর্মস্থল ছিল ক'লকাতা।

নির্দিষ্ট সময়ে ক'লকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট্ হলে ফেডারেশনের দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ এই সভা অলঙ্কৃত করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত ডেলিগেটগণ, সংগঠনের সাধারণ সভ্যগণ, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যগণ এবং জন-সাধারণ এই সভায় উপস্থিত ছিল। সভা উদ্বোধন করেন ডঃ জে কে ব্যানার্জ্জি। এই সভায় বক্তৃতা করেন ডাঃ বিনয় সিংহ, টি এস রামানুজম্, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন সেন. বিশ্বনাথ দুবে, নরেন মিত্র, ধীরেন ভৌমিক, লীলা রায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, অজিত সেন, রমেশ চক্রবর্তী এবং সৌম্যেন ঠাকুর। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কে টি শাহ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অতি সত্বর জাতীয়করণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষণে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে সুর অনুরণিত হয়েছিল সেটি ছিল দেশ গঠনের সুর। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথা বলেন যে ধর্মঘটই শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র অস্ত্র। এবং ধর্মঘটকে সফল করতে গেলে শ্রমিকগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন বোধে ধর্মঘট অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বহু অভীপ্সিত উন্নয়ন এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং এই স্বাধীন দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত ক'রে তুলতে হ'লে শ্রমিকগণকেও তাদের কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হ'বে। কেবল মাত্র নিজেদের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করলেই শ্রমিকগণের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হবে না। দেশের সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে তাদের অগ্রসর হতে হবে। ভারতবর্ষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। ব্যাঙ্ক শিল্পের জাতীয়করণের জন্যও শ্রমিক কর্মচারীগণকে সংগ্রাম করতে হ'বে, কারণ ভারতের ক্ষমতাসীন সরকার কায়েমীস্বার্থের ধারক ও বাহকগণেরই সমর্থক। এদেশের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প অথবা ব্যাঙ্ক শিল্প জাতীয়করণে এই সরকার আগ্রহী নয়।

দ্বিতীয় দিন ডেলিগেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ব্যাপারে ভারত সরকারের গড়িমসি নীতির সমালোচনা হয়। এই রকম সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সভা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"The Federation strongly upholds the cause taken by Prof. K. T. Shah and Messrs. B. Das, T. T. Krishnammachari and others in advocating the nationalisation of the Imperial Bank of India. The Federation is surprised how the peoples' Government could postpone nationalisation measures of the Bank simply because they affect the vested interest of a small section of people. The nationalisation of the Imperial Bank would bring in its train immense resources and funds at the disposal of the present needy Government for its post war reconstruction programme.

Secondly, the nationalisation will also

transfer into the hands of the Government vast means of controlling credit which will be a potent means of combating the spiral of inflation, a major cause of national headache.

Regarding the doubt expressed by the Finance Minister about commercial banks being suitable sphere for nationalisation, the Federation fails to understand how the Imperial Bank of India could be classed among other ordinary commercial banks when it enjoys special privilege under a special statute.

No patch work to the present Imperial Bank Act as contemplated by the present Finance Minister would ever serve the purpose of nationalisation. The postponement asked for has no scientific basis and would be tantamount to shutting the stable doors after the steed is stolen.

The vacillating attitude of the present Government is a deplorable commentary on the influence that interested parties have been able to exert even on high level and for which the last Finance Minister had to go. The objectives referred by the Finance Minister cannot be effectively obtained unless this institution which is wellknown for its anti-national bias and particularly to foreign business is immediately nationalised. The Federation urges the Government to respond to the peoples' wishes."

এরপর অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া, কর্ম্মচারীগণের চাকুরী সংক্রান্ত নানারূপ অসুবিধা দূরীকরণ এবং কর্ম্মচারীগণের চাকুরীর উন্নততর অবস্থার প্রবর্তন সম্বন্ধে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দ্বিতীয় দিনের সভাতেই ফেডারেশনের নতুন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। অধ্যাপক কে টি শাহ, ফেডারেশনের সভাপতি এবং আর ডি বিজুর সম্পাদক নিবাচিত হ,ন। ফেডারেশনের দফতর পুনায় স্থানান্তরিত হয়।

ষ্টাফ ফেডারেশনের উল্লিখিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'বার পর ফেডারেশনটি যাতে ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বীকৃত হয় সে সম্বন্ধে সংগঠনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ অত্যন্ত সচেষ্ট হয়। একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ ফেডারেশনটি-কে স্বীকার ক'রে নিতে অসম্মত হয়। তারা বলে যে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুসারে ষ্টাফ ফেডারেশন রেজিষ্টার্ড নয়। ফেডারেশনের সভাপতি উত্তর দেন যে ফেডারেশন রেজিষ্টার্ড না হ'লেও যে সার্কেল ইউনিয়ন-গুলির সম্মেলনে ফেডারেশনটি গঠিত সেগুলির সব কটিই ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্টার্ড। কিন্তু এই যুক্তি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নিরুত্তর থাকে। ফেডারেশন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয় এমন সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই জুন ভারত সরকার ঘোষণা করে যে দেশের ৫৫টি ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শিল্প ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে। এটি একটি তিনজন সদস্যাবিশিষ্ট ট্রাইবুনাল। এই ট্রাইবুনালের সভাপতি বম্বে হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীকে সি সেন। শ্রী কে সি সেনের নাম অনুসারে এই ট্রাইবুনাল সেন ট্রাইবুনাল নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রমিক কর্মচারীগণের দাবী দাওয়া নিষ্পত্তির দায়িত্বও এই ট্রাইবুনালের উপর অর্পিত হয়।

যথা সময়ে সেন ট্রাইবুনালের অধিবেশন বম্বের কাউন্সিল হলে আরম্ভ হয়। স্টাফ ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হয়ে এই প্রশ্ন রাখে যে যদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্টাফ ফেডারেশনকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হয় তাহলে তারা কেমন করে ট্রাইবুনালে অংশ গ্রহণ করবে? স্টাফ ফেডারেশনকে কেন স্বীকৃতি দেওয়া হবে না সেই সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করবার জন্য ট্রাইবুনাল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। বেশ বোঝা যায় যে ভারত সরকার এবং সেন ট্রাইবুনাল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

স্টাফ ফেডারেশনটিকে স্বীকৃতি দিতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিল না। এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আর গোলমাল না করে স্টাফ ফেডারেশনটিকে স্বীকার করে নেয়। সংগঠনের চতুর্দ্দিকে খুশীর হাওয়া বইতে থাকে।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনায় ফেডারেশনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যে নতুন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি রূপে শ্রী টি এস রামানুজম এবং সম্পাদকরূপে শ্রী পি এম চেল্লাভিরাম নির্ব্বাচিত হ'ন। ফেডারেশনের কার্য্যালয় মাদ্রাজে স্থানান্তরিত হয়।

ফেডারেশনের চতুর্থ অধিবেশনে অনুষ্ঠান কাল এবং এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক অজ্ঞাত। তবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র The Bank Worker'এর একটি সংখ্যা (মার্চ—এপ্রিল ১৯৫৬) থেকে জানা যায় যে এই অধিবেশনটি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্রবীণ শ্রমিক নেতা স্বর্গীয় মৃণাল কান্তি বসু ফেডারেশনের সভাপতি এবংব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলনের নেতা শ্রীমোহনলাল মজুমদার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। মাদ্রাজ থেকে ক'লকাতায় ফেডারেশন দফতর স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘ চার বৎসর ফেডারেশনের কাজকর্ম্ম ক'লকাতা থেকেই সম্পন্ন হয়। এর কারণ, নানা রকম অসুবিধার জন্য ফেডারেশনের পঞ্চম অধিবেশন সময় মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এই অধিবেশনটি ক'লকাতায় ১৯৫৬ সালের ১০ই ও ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের উপরোক্ত চার বৎসরের (১৯৫২ থেকে ১৯৫৬) ইতিহাস প্রচণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণ ঐ চার বৎসর অভূতপূর্ব ঐক্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের শ্রমিক নীতির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালনা করে। এই প্রসঙ্গে একথা অনস্বীকার্য্য যে অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণও এই সময় মালিক এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

যাই হোক ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর ভারত সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করে যে কেন্দ্রীয় সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার সঙ্কল্প করেছে। কিন্তু এই ঘোষণায় ফেডারেশন কাউন্সিল সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। কারণ যে পদ্ধতিতে সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করবার ব্যবস্থা করেছিল ফেডারেশন সেটিকে জনস্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেনি। এতদ্ব্যতীত অর্থমন্ত্রীর ঘোষণায় ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক কর্মে শ্রমিক কর্ম্মচারীগণের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। প্রকৃত জনস্বার্থ এবং শ্রমিক-স্বার্থের অনুকূলে যাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয় সে বিষয়ে স্টাফ ফেডারেশন ভারত সরকারের নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সম্পূর্ণ সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে ফেডারেশন তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীমোহনলাল মজুমদারের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"On the 29th December 1954, the Finance Minister declared in the Lok Sabha that the Government had accepted in principle to form a State Bank of India by taking over control of the Imperial Bank of India and by amalgamating several other state-controlled Banks as recommended by the Reserve Bank Committee, better known as 'Gorwalla Committee. It was given to understand that the idea of forming the State Bank was to expand banking in the rural sector and to facilitate remittances. At this stage the Federation did its best to see that the Imperial Bank is nation alised in its true sense. In a Memoradum submitted to the Finance Minister the Fedaration urged that the shareholders should be completely eliminated by payment of shares on the face value or market value, whichever is lower, and the employees should have proper direct participation

through their chosen representatives in the shaping of the policy governing the operation of the Bank as well as effective share in the day to day management and control of the Institution. We also stressed that these conditions were to be accepted iu view of the Government's policy of establishing a 'socialistic pattern' of society. The State Bank Bill passed by Parliament provided only 33% of the shares to be held by the Government and the Reserve Bank. In spite of strong opposition in Parliament, heavy compensation of Rs. 1760/—(approx.) on a paid-up share of Rs. 500/—was granted. Adequate representation of the private share-holders was provided, but no consideration was given to the matter of worker's control. The Federation will continue to raise the voice until these fundamental suggestions are accepted by the Government in the interests of the nation and not of a particular group or ciass."

এমনিভাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্ত্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক) কর্মচারীগণের যে সর্বভারতীয় সংগঠনটি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে স্বাধীন ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিল সেটি ইতিমধ্যে এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজনে সমর্থ হয়েছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং শক্তিসম্পন্ন এই সংগঠনটির যথাসময় প্রকৃত মূল্যায়ন হ'বে ব'লে আশা করি।

সম্পাদক

রঞ্জিত গোস্বামী

—শৈবাল—

—হ্যাঁ।

—কত?

—আটান্ন।

—অনিমেষ?

—উনষাট। তোর?

—একষট্টি। এই আষাঢ়ে।

—একষট্টি হয়ে গেল?

—সময় হল বিহঙ্গের ঘরে ফিরিবার।

অনিমেষের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে চাপতে চেয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলার সুখ অনেক। নিঃশব্দে একবুক বাতাস বেরিয়ে গেল। 'সময় হল বিহঙ্গের ঘরে ফিরিবার'। সত্যিই সময় হয়ে এল। আর কতদিন। পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার সাধারণ সময়সীমা পার হয়ে গেল প্রায়। এরপরেই হয়ত একদিন অন্ধকার থেকে আদেশ নেমে আসবে 'যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রিদল হয়েছে আদেশ / বন্দরের কাল হল শেষ।' কোথায় যাবে। কিসে যাত্রা করবে। চির রহস্যময় মৃত্যু। তারপর? তারপর বিস্মৃতি। জলে ডুবে যাওয়া মাটির ঢেলা। এই-ই জীবন। এই ত জীবন। শেষ হয়ে এল বলে।

বয়োজ্যেষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ শিকদার উকিল ছিল। এখন

আর প্র্যাক্‌টিস্ করে না। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। তার বাড়ীতেই প্রতিদিন তিনবন্ধুর আড্ডা বসে। এক-একদিন সভ্যসংখ্যা বেড়েও যায়। বীরেন্দ্র রসিকতা করে অনিমেষের দিকে তাকাল। বলল—তাহলে বার্দ্ধক্য প্রতিষেধক ঔষধে কিছুই হল না? অনন্ত যৌবন ঔষধি—

অনিমেষ চশমা খুলে শাদা রুমালে পরিষ্কার করছিল। ভারী লেন্সের চশমাটা চোখে রেখে বেশ একটু সময় নিয়ে বলল—আমায় বলে কি হবে বল? ও তো তোর বোনের কাজ। আমি কবে এসবে মাথা ঘামাই বল?

বীরেন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল—সেটা অবশ্য মিথ্যে কথা নয়। মিথ্যে কথা নয়।

তারপর শৈবালের দিকে ফিরে বলল কি জানিস এই বার্দ্ধক্য প্রতিষেধক?

—কি?

—কলপ—

বলে বৃদ্ধ বীরেন্দ্র আরেক দমক হেসে উঠল। হাসি থামলে পর বলল—আমি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম অনিমেষের মাথার চারদিকে চুল পেকে উঠেছে। একদিন হঠাৎ দেখি সব চুল বিলকুল কালো হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? ধরলাম অনিমেষকে। জেরার পর জেরা। শেষে কবুল করতে বাধ্য হল,—বউ-এর পরামর্শে করেছে। কি করবে বল, বেচারা সাহিত্যিক মানুষ, বউ-এর কথা না শুনলে পাছে গোলমাল শুরু করে।

অনিমেষ রাগে না। অসন্তুষ্টও হয় না। তার বরং একটু হাসিই পায়। ভাল লাগে এই রসিকতাটুকু। এও ত কতদিন হল। প্রায় কুড়ি বছর হতে নিল। এখন কাঁচা চুলই নেই। পাকা চুল যে কটা আছে তাও অক্লেশে গোনা যায়।

শৈবাল চুপ করে চুরুট টানছিল। মজার কথাটা উপভোগ করছিল। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল—কিন্তু বীরেনদা, একালে আর অমৃতও পাওয়া গেল না যে অমর হব, আর মৃত সঞ্জীবনীও পাওয়া গেল না যে মরে গেলে কেউ বাঁচিয়ে তুলবে।

—আর তা দিয়ে কি হবে। যাদের সময় শেষ হয়েছে তাদের যেতে হবে ভাই। সপ্তর্ষি মণ্ডলে এখনই একলক্ষ প্রাণ অপেক্ষায় আছে। এদিকে জায়গা খালি হবে ওরাও যাত্রা শুরু করবে।

অনিমেষ ভাবছিল অমৃত। হ্যাঁ যা খেলে অমর হওয়া যায়। চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাই ত সে চেয়েছিল। অমৃত কি নেই? ঠিকই আছে। কেউ কেউ সে প্রসাদ পেয়েছে। পেয়েছেন বাল্মীকি, মহর্ষি ব্যাসদেব, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, টলস্টয়। মাত্র কয়েকজন, হাতে গোনা যায়। আর হাজার হাজার লোক হ্যাংলার মত গিয়ে হাত বাড়িয়েছিল। ঠিক যেমন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে লঙ্গরখানার চারপাশে শালপাতে অজস্র মানুষের ভিড় দেখেছিল।

তার খুব মনে পড়ছে। তখন মানসী কতটুকু? মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। সবে বিয়ে হয়ে তাদের বাড়ী এসেছে। বারান্দা থেকে মানুষের এই হৈচৈ দেখে চিৎকার শুনে হেসে লুটোপুটি খেত। একবার বারান্দায় একবার ছাতে গিয়ে দাঁড়াত। তাকে দেখাত—ভাখো ভাখো।

কিন্তু মানসীকে সে কি বোঝাতে পেরেছে এক জায়গায় সেও এভাবে লাইন দিয়ে হাজার হাজার মানুষের মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলো তবু একহাতা দুহাতা পেয়েছে। কিন্তু তার দুদশা কে বুঝবে?

বীরেন্দ্রর কথাটা মনে পড়ল। 'সপ্তর্ষি মণ্ডলে এখনই একলক্ষ প্রাণ অপেক্ষায় আছে। এদিকে জায়গা খালি হবে, ওরাও যাত্রা শুরু করবে।' এই-ই কি সত্য?

অনিমেষের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। একটা অসহ্য অস্বস্তি সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তাকে যে এমন সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হবে তা সে আজ সকালেও ভাবতে পারে নি। সন্ধ্যেবেলা সম্পাদকীয় অফিসে যখন প্রথম আসে তখনও না। তারপর সন্ধ্যে

যেতে না যেতেই তার সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল এই সমস্যা। জীবন-দর্শনের মূল্যায়ন।

এই মুহূর্তে যদি শৈলেনবাবু থাকতেন, কত সুবিধা হত। কিন্তু কোথায় শৈলেনবাবু! আজ পঁচিশ বছরের বেশী হয়ে গেল। কিন্তু তার নিজেরও ত শৈলেনবাবুর বয়স হয়েছে। শৈলেন চট্টোপাধ্যায়। অনিমেষ তখনও চুপি চুপি হাঁটছে। অনেক বড় সাহিত্যিক হতে হবে। 'বিন্দু'র সম্পাদক শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

'জানো অনিমেষ, কতবড় ধৈর্য্য, সংযম ও শিল্পীমানস থাকলে তবে সম্পাদক হওয়া যায়? ক'টা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ বেছে নিয়ে ছাপতে দিলাম আর সম্পাদক হলাম—এ হয় না। এইটুকু, শুধু এই ক'টা রচনা নির্বাচন। নিষ্ঠাবান্ পূজারী যেমন সযত্নে একটা একটা করে ফুল পূজার বেদীতে নিক্ষেপ করে। এক-একটা রচনা জানবে বাগ্‌দেবীর চরণে তোমার শ্রেষ্ঠ পুষ্পার্ঘ। এই রচনা সহজ কাজ নয়। সমগ্র অনুভূতি, সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে রচনার অন্তিম প্রদেশে লুকিয়ে থাকা প্রাণকে।'

শৈলেনবাবু একবারে বেশী কথা বলতেন না। কিছুটা বলে নিজের কাজে মন দিতেন। যেন কথা শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু বলবেন না। নিজের কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। অনিমেষ চুপ করে দেখত। তারপর আবার মুখ তুলত।

'জান অনিমেষ, সম্পাদকেরই দায়িত্ব নতুন সাহিত্যিক-দের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার। কারণ একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, মাতৃভাষার পূজোর ভার আমরা এই নতুন ব্রাহ্মণদের হাতেই দিয়ে যাব। নান্যপন্থা অয়নায়। আমরা চিরকাল বাঁচব না।'

অনিমেষ আবার ঘেমে উঠেছে। চশমাটা ঘামের বাষ্পে ঝাপসা হয়ে উঠল। সেটা খুলে আবার রুমালে ঘষতে লাগল। চশমা খুলে সে কিছুই দেখতে পায় না। চিন্তা করতে থাকলে আত্মমগ্নতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। তাই প্রায় হয়েছিল। সে চশমাটা চোখে দিল। সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল। টেবিল, চেয়ার, বই-এর আলমারি, দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার, টেবিলের ওপর রাখা চায়ের খালি কাপ, টেবিল ল্যাম্প, স্থির সিলিং ফ্যান্। সে একবার বীরেন্দ্র ও শৈবালের মুখ নিরীক্ষণ করল। শৈবালের মুখে হাভানা চুরুট পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। চুরুটের গন্ধ সারা ঘরের বাতাসে।

অন্যদিন তারা দাবা নিয়ে বসত। অনিমেষ ভাল খেলতে পারে না। খেলেও না খুব একটা বেশী, তবে দেখতে খুব ভাল লাগে। দাবার ছকে হাতি-ঘোড়ার লড়াই। লড়াই চলে বীরেন্দ্র আর শৈবালে। বীরেন্দ্র এক একসময় ক্ষেপে ওঠে বাঘের মত। তখন শৈবাল পালাবার পথ পায় না। হেরে হেরে একশেষ। বীরেন্দ্র হো হো করে হেসে ওঠে।

আজ অনিমেষের ভাল লাগছে না। দাবার বোর্ড বার করতেই বলল—চলি বীরেন! আজ বাড়ীতে দরকার আছে।

বীরেন্দ্র দাবার ছক পেতে একমনে তার ওপর সারি সারি ঘুঁটি সাজিয়ে রাখছিল। ছকের দিকে চোখ রেখে বলল—যাবি যা। কিন্তু দরকার-টরকারের কথা বলিস না।

বীরেন্দ্রর বাড়ী থেকে রাস্তায় পা দিতেই একটা হাওয়ার ঢেউ তার বুকে আছড়ে পড়ল। সন্ধ্যেবেলা সম্পাদকীয় অফিস থেকে এখানে আসার পথেই হাওয়ার বেগ অনুভব করেছিল। কিন্তু তাতে যে শীতের আকাশে মেঘ ঠেলে নিয়ে আসবে তা সে ভাবতে পারে নি। তাহলে আজ আর এখানে আসতই না। আকাশের দিকে তাকাল। মাতালের চোখের মত আকাশটা মেঘে মেঘে লাল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটা বেশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এখনই হয়ত বৃষ্টি নামবে। এই বুড়ো বয়সে শরীরের ওপর আর দাপাদাপি সহ্য হয় না। অনিমেষ বেশ ভালভাবে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল যাতে ঠাণ্ডাটা শরীর স্পর্শ করতে না পারে। রাস্তার লাইটগুলো নিভে গেছে। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল।

যখন বাড়ী পৌঁছাল তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। অল্পের জন্য তাকে ভিজতে হয়নি। মানসী দরজা খুলেই বলে উঠল—ভিজে এলে?

—না। আর একটু দেরী হলেই ভিজে যেতাম।

মানসী ব্যস্ত হয়ে বলল—আজ এত তাড়াতাড়ি এলে। শরীর খারাপ করেনি তো?

—না, না, বেশ আছি। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। একবার আরম্ভ হলে কখন থামবে তার কোন ঠিক আছে?

আসল কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল না। অনিমেষ এমন কথা বলে না। কারণ এ একেবারে নিজের কথা। অনেক গভীরে সত্তার অন্ধকারে, যেখানে অমাবস্যার মত এক বিরাট রহস্যময় জগতের সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই অজানা আপন সত্তা থেকে উঠে আসা এক চিন্তার আঘাতে সে মর্মাহত। তার এত দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি অদ্ভুতভাবে একটা বিন্দুর চারদিকে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বিন্দুটাকে অতিক্রম করে যেতে পারছে না। সে ইচ্ছা করলেই পারত লেখাটা লেটার-বক্সে ফেলে দিতে। আরও সব অর্থহীন লেখার মত এটাও যেত হারিয়ে, কিন্তু পারে নি সে। গল্পটা সত্যিই প্রকাশের যোগ্য। সে সমস্ত সত্তা দিয়ে গল্পের মধ্যে একটা প্রাণকে স্পন্দিত হতে দেখেছে। তাকে সে ফেলবে কি করে। কিন্তু এর ওপরেও নিজের ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে। এখনও মন ঠিক করে উঠতে পারে নি।

সে মানসীর মুখের দিকে একবার তাকাল। দেখল একটু একটু চুল পাকছে। মানসী—মানসী। শৈশবের উজ্জ্বলতা থেকে আজকের বার্দ্ধক্যের মুখোমুখি। এই মহা পৃথিবীর কবিতা।

হয়ত সে মানসীর দিকে একটু বেশীক্ষণই তাকিয়ে রয়েছে। মানসী সেটা লক্ষ্য করছে খেয়াল হতেই চোখ সরিয়ে নিল। নিজের ঘরের দিকে গেল।

অনিমেষ এক-একদিন অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করে। পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পাওয়া লেখাগুলোকে পড়ে নির্বাচন করে। আর এ ব্যাপারে সে শৈলেনবাবুর উপদেশ মেনে চলে। সমগ্র চেতনাকে বাইরের জগৎ থেকে তুলে এনে ডুবিয়ে দেয় এক-একটা রচনার মধ্যে। তারপর চলে গল্পের কবিতার প্রাণকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। এ যেন প্রাচীন কবিরাজের নাড়ীর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা। মৃত না জীবিত। যেখানে প্রাণের স্পন্দন পেল সেখানেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আর ব্রাহ্মণ যেন তার গৃহদেবতার জন্য এক নতুন ফুল চয়ন করল। এইভাবেই সে পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর এই সাধনায় যাতে কোন ব্যাঘাত না হয় তাই মানসী রাতের বেলায় অন্য ঘরে শোয়।

মানসী শুতে যাবার আগে অনিমেষকে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বসতে দেখে বলল—আজ আবার লিখবে? এখন বয়স হয়েছে। নিয়ম মেনে না চললে শরীরে সহ্য হবে না।

—বয়স হয়েছে বলেই তো কাজ বেশী বেড়েছে মানসী—

—থাক, আর বলতে হবে না।

মানসী চলে গেল।

অনিমেষ ড্রয়ার খুলে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাওয়া লেখাগুলো থেকে ঐ লেখাটাই বার করল। লেখাটা হাতে নিতেই শরীরটা কেমন অস্থির করে উঠল। বুকের ভেতরকার ধক্ ধক্ আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালাটা খুলে দিল। একটা হাওয়ার স্পর্শ পেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু হাওয়ার তীব্রতা রয়েছে। পৃথিবী অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। গায়ে চাদরটা ছিল না। চাদরটা জড়িয়ে আবার চেয়ারে বসল। লেখাটা পড়ল আগাগোড়া। একবার—দু'বার—তিনবার।

সে দেখল একই রকম গল্প। একই বিষয়। একই ঘটনাক্রম। একই সমাপ্তি। নাম আলাদা। ভাষার একটু এদিক্-ওদিক্। সে ভাবল, ছেলেটা হয়ত তার নিজের লেখা গল্পটা টুকে এনে দিয়েছে। কিন্তু সেটাই

বা কি করে সম্ভব। গল্পটা সে আজ সন্ধ্যেবেলা ওখানে শেষ করেছে। তবে। ছেলেটাকে একবার মনে করতে চেষ্টা করল। আজই মাত্র এই ছেলেটা এসেছিল লেখা দিতে। মুখটা ঠিক মনে করতে পারছে না। বেশ কালো, বেঁটে, রোগা। একটু ভীরু।

অনিমেষ নিজে যে গল্পটা লিখেছে সেটাও খারাপ নয়। সে ভেবে দেখল, তার সারাজীবনে সে এমন গল্প খুব একটা বেশী লেখেনি। সেইজন্যেই সে তার গল্পটা প্রকাশের লোভ সামলাতে পারছে না। সে জানে এই গল্পটা বেরুলেই পাঠকদের কাছ থেকে সে অনেক চিঠি পাবে। আর এই চিঠিই তো আনন্দ।

এইখানে এসেই তার সমস্ত চিন্তাস্রোত বারবার থেমে যাচ্ছে। যা সহজভাবে আসছে তাই বাধা পেয়ে কেমন উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠছে। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা বিন্দুকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অতিক্রম করে যেতে পারছে না। কিসের একটা ছায়া তার সমগ্র অন্তরকে ছেয়ে ফেলেছে। শুধু একটু জায়গা। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন বৃদ্ধ—আর একজন তরুণ। বিচারক সে নিজে। আর মুশকিল হয়েছে এখানেই।

সে একবার চেষ্টা করল নিজের মধ্যে ডুবে যেতে। কি কর্তব্য তার? শৈলেন চট্টোপাধ্যায় কি করতেন? পাঠকদের সঙ্গে নতুন সাহিত্যিকদের পরিচয় করিয়ে দেবার কাজ সম্পাদকের। এই নতুন ব্রাহ্মণদের হাতে দিয়ে যেতে হবে বাগ্দেবীর পুজোর ভার। তাই কি? আমার প্রতিদ্বন্দ্বি তরুণ। আমি বৃদ্ধ। আমার মাথার চুল পাকা। দাঁত ক'টা পড়েছে। দেহ শীর্ণ। হয়ত কদিন ভেঙে পড়ব। 'সময় হল বিহঙ্গের ঘরে ফিরিবার।' বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র ঠিক কথাই বলেছে। পৃথিমণ্ডলে এখনই একলক্ষ প্রাণ অপেক্ষায় আছে। কদিকে জায়গা খালি হবে। ওরাও যাত্রা শুরু করবে।

অনিমেষ টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। সমগ্র ঘর এক মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল। রাস্তায় আজ লাইট নেই। অন্ধকার ঘরে-বাইরে সর্বত্র। অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে তার বেশ ভাল লাগল। গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাণ্ডা জলে গা ডোবানোর মত আত্মাটা যেন দৃশ্য বস্তুর আড়ালে গিয়ে এক অসীম শান্তির স্পর্শ অনুভব করল। কিন্তু এক মুহূর্ত। তারপরেই নিজের অন্তরে সঞ্চিত অসংখ্য ঘটনার ছায়াচিত্রে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

তাকেও ত একদিন এই ছেলেটার মত সম্পাদকের অফিসে অফিসে ঘুরতে হয়েছে। একটার পর একটা লেখা ফেরত এসেছে। আর সে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েছে। তারপর একদিন নতুন আশায় নিয়ে এল এক পত্রিকা 'বিন্দু'। যৌবনের অজস্র ঘটনা তার মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। হাসি, দুঃখ, হতাশা নিয়ে এক যুবক অনিমেষ সম্পাদক অনিমেষের দপ্তরে প্রবেশ করল। সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সেই হতাশা-ক্লান্ত রুক্ষ-চুলো যৌবনকে দেখল বিস্ফারিত চোখে।

অনিমেষ লাইট জ্বালল। বস্তুময় জগৎ যা কিনা কিছুক্ষণ অন্ধকারে চেয়ে থাকার দরুণ অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল তা এবার চোখের পলকে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনিমেষ লেখাটা হাতে তুলে নিল। পড়ল। বেশ ভাল লাগল। নিজের মন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে সে ধাক্কা খেল। মন যেন স্বেচ্ছায় নিজের দাবী ছেড়ে দিতে চাইছে না। সে মনে মনে বেশ ক'বার উচ্চারণ করল—সম্পাদক—সম্পাদক—সম্পাদক।

পত্রিকার অফিসের চাবিটা নিল। ঘরের লাইট নিভাল। খুব আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা আস্তে করে ভেজিয়ে দিল। যাতে মানসী টের না পায়।

রাস্তার বৃষ্টির জল শুকিয়ে গেছে। বাতাস এখনও তীব্র বেগে শহরের পথে পথে, বাড়ির গায়ে গায়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। একটা মস্ত নিমগাছ সোঁ-সোঁ আওয়াজে বার বার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। রাস্তায় একটাও আলো নেই। যেটুকু আলো তা মেঘ থেকে ছড়ানো। এসব দেখবার অবসর নেই। মনের সে অবস্থাও নয় অনিমেষের। সে অতি দ্রুত হেঁটে চলল। নিশুতি রাত। বৃষ্টির দিন বলে ভিখিরীরা পর্যন্ত খোলা ফুটপাথে গা ছোঁয়ায় নি।

অনিমেষ পত্রিকার অফিসের সামনে এল। দরজা বন্ধ। তালা খুলল। একরকম প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। সমস্ত জানালা বন্ধ। ঘরটা বেশ গরম। আসবাবপত্রের ভ্যাপসা গন্ধ। সে ঘেমে উঠল। চাদরটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখল। নিজের টেবিলের ড্রয়ার খুলল। একরকম ছন্দহীনভাবে হাতড়ে নিজের লেখাটা বের করল। একটা ছোট উপন্যাস। আজ সন্ধ্যেবেলা শেষ করেছে। কত রাত্রি, কত দিনের পরিশ্রমের ফল। যেন নিজের হৃৎপিণ্ডটা হাতে নিয়ে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। পড়তে ইচ্ছা করল। কিন্তু পড়ল না। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সে সংযত করল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবপর নয় জেনে লেখাটা হাতে নিয়ে চাদরটা কাঁধে ফেলে ঘরে তালা দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ঘরের লাইট নেভানো হয়নি খেয়াল রইল না।

কিছুদূর হেঁটে গিয়ে সে খাতাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসের মুখে ছেঁড়া কাগজগুলো উড়িয়ে দিল। বাতাসে বাতাসে তারা অনেক দূরে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। সেইদিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা হাসি তার মুখে ভেসে উঠল। এতক্ষণে নিজেকে হাল্কা মনে হল। মনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। শীতের স্পর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘাড়ে আগোছালোভাবে ঝুলিয়ে রাখা চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। চারিদিকের পৃথিবী সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠল। দেখল সমগ্র পৃথিবী ঘুমে অচৈতন্য। কেবল তার মনের সুখের মত সে-ই এই পৃথিবীতে জেগে আছে। তার মনটা একটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল। বাতাসের দোলায় দোলায় নেচে উঠল। যেন বহুদিন সমুদ্রের নীচে থাকার পর আজ, আজই সে প্রথম আলোর স্পর্শ পেল। ইচ্ছে হল এখনই বীরেন্দ্রর বাড়ি গিয়ে বীরেন্দ্রকে ডেকে তোলে এবং বলে। কি বলবে ভেবে পেল না। মনের এই স্বস্তিকে প্রকাশ করবার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। এই দিগন্তহারা নীল আকাশকে বুকের মধ্যে বন্দী করে ঘরের দিকে ফিরে চলল।
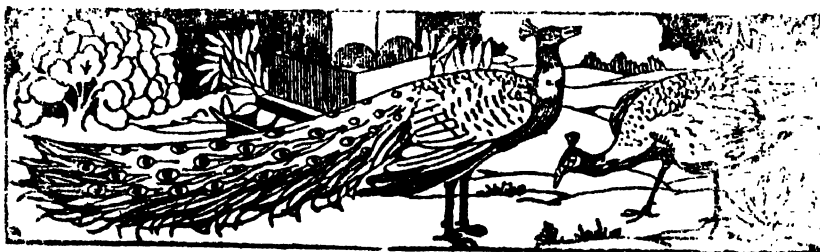
একটি নিঃসঙ্গ নির্জন জীবন—প্যাভো নুর্মি

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে প্যাভো নুর্মি (Pavo Nurmi) এক অবিস্মরণীয় নাম। সমস্ত জগতের নিকট তিনি অতুলনীয় প্যাভো বা অশরীরী ফিন্ নামে অভিহিত হতেন।

তৎকালীন ফিনল্যাণ্ডের, দৌড়বীর, ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ অথবা সাংবাদিকদের কেহই তাঁকে ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। তাঁদের নিকটও তিনি ছিলেন এক কল্প জগতের লোক, এক দুর্জ্ঞেয় মিশরীয় স্ফিংস (Sphinx) অথবা কোন এক মেঘে ঢাকা মেঘনাদ। ক্রীড়া-জগতের বিস্ময় প্যাভো নুর্মির রহস্যময় ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় তাঁর সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তিগুলি সত্য বলেই মনে হয়।

নুর্মি বিষয়ক সমস্ত জল্পনা কল্পনা থেকে কল্পনাকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বড় একটা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। নুর্মির অসাধ্য সাধনের ঘটনাগুলিকে চোখের সামনে তুলে ধরলে আমাদের মনে হবে তাঁর সম্বন্ধে কাল্পনিক কাহিনীগুলিও বুঝি বা অবাস্তব নয়। এমন কি সময় সময় তাঁর কার্য্য-কলাপে কল্পনারও মাত্রাধিক্য ঘটা কিছু অসম্ভব নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন পারদর্শী খেলোয়াড়ের জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হয়। প্যাভো নুর্মি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই একজন দৃঢ়-চেতা, লাজুক, সঙ্কল্পে অটুট যুবককেই নির্দেশ করে।

নেপোলিয়নের মতন নুর্মিও ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লাজুক এবং উচ্চাভিলাষী। সমকালীন সমস্ত ক্রীড়াবিদদের তুলনায় সত্য সত্যই তিনি একটু পৃথক ধরনের ছিলেন।

দৌড় প্রতিযোগিতায় যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করলে অনেক সময় তিনি দৌড়ে যে সময় করেছেন হয়ত তার চেয়ে অনেক কম সময়ে উক্ত দূরত্ব তাঁর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু অমানুষিক আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা অবিশ্বাস্য ভাবে সময় কম করার চেয়ে তিনি ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির পথটিই বেছে নিয়েছিলেন।

স্বীয় ক্ষমতা ও কর্মচাতুর্য্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য সাধারণতঃ ক্রীড়াবিদেরা তাঁদের আত্মনিয়োগ যথাসাধ্য সচেষ্ট ভাবে করে থাকেন। এ বিষয়ে নুর্মির মনোভাব ছিল কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের। বিশ্ব পর্য্যায়ের দৌড়বীরদের পরাজিত করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত ক্রমোন্নতির পথেই দৌড়ের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

কোন এক দরিদ্র নিয়মানুবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে নুর্মির বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন একজন কঠোর নিয়মানুগ দৃঢ়চেতা পরিশ্রমী পুরুষ। স্বাস্থ্যটি কিন্তু তাঁর খুব ভাল ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রক্তক্ষরণ জনিত দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় পরিবারের পাঁচটি শিশুর মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ নুর্মির বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর। চার ভাইয়ের মধ্যে বাকী তিন জনের বয়স ছিল অনধিক ছয় বৎসর।

সেই সময় তাঁর মা অতি অল্পই রোজগার করতেন। এই জন্য রান্নাঘরটির ভাড়া দিয়ে তিনি পাঁচ পুত্রের সঙ্গে একটি মাত্র ঘরের মধ্যেই বসবাস করতেন।

দেশের কোন এক দোকানে সংবাদবাহী ভৃত্য-রূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর প্রায় পনেরো বছর বয়সে তিনি কোন এক কারখানায় শিক্ষাধীন যন্ত্রীর কাজে নিযুক্ত হন।

নিদারুণ দারিদ্র, কঠোর পরিশ্রম এবং শৈশবকাল থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যই নুর্মি ভবিষ্যতে বোধহয় একজন দৃঢ়চেতা লাজুক আত্ম-কেন্দ্রিক যুবকে পরিণত হন। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিঃসঙ্গ একক জীবন কাটিয়ে তিনি তাঁর জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন এই পৃথিবীতে।

ভবিষ্যতে নিঃসঙ্গ নীরব সাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে পরিগ্রহণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে এও শোনা যায়, মাত্র ১২ বছর বয়সে কোন ক্রীড়া সংস্থায় স্বীয় উন্নত ক্রীড়ামানের স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও সেই সংস্থা পরিত্যাগ পূর্বক একাকী নীরবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি তাঁর দৌড় অনুশীলন করেছেন।

অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে পরিকল্পনামতন ধীর স্থির ভাবে লঘু অভ্যাসই পছন্দ করতেন তিনি। শারীরিক উন্নতির জন্য তিনি সমস্ত রকম মাদক দ্রব্য বর্জন করেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থানও তাঁর এক নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়।

সাধারণ জীবনে নুর্মি ছিলেন নির্বান্ধব। অবসর সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি তামাসায় না কাটিয়ে তিনি দৌড় পরিকল্পনা ও দৌড় অভ্যাস করতেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে দেশের টার্কু (Turku) ক্লাবের হয়ে তিনি সর্ব-প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন।

নুর্মির ভিতর প্রথম বয়সে ছিল কৈশোরের চাপল্য, বাচালতা এবং কিঞ্চিৎ গর্বিত মনোভাব। জীবনে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এবার তাঁর জীবনে পরিবর্তন দেখা গেল।

জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নুর্মি মনস্থ করেন এবার আর বাচালতা নয়। আপনাকে এবার আপনাতেই সন্নিবিষ্ট করতে হবে। আপনার মাঝেই আপনাকে মগ্ন রাখতে হবে। দৌড়ের মাঝেই সমস্ত মন নিয়োজিত করে দিতে হবে এবার। বাচাল কিশোরের আত্মকেন্দ্রিকতার এই নকল আবরণ পরবর্তীকালে আসল রূপেই রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল। বহু দেশের অপরিহার্য্য সাপ্তাহিক ও দৈনিকে নুর্মির রূপান্তরিত জীবন-ধারার এই তথ্যবহুল সংবাদ লেখা না থাকলে ভবিষ্যতের মানুষ হয়ত তাঁর জীবনের এই মহা পরিবর্তনের খবর কোনদিন জানতেও পারত না।

তিনি একক অনুশীলন করতেন। সৈনিক দলে যন্ত্রীরূপে কাজ করার কালে প্রতিদিন ভোর পাঁচটার সময় তুষারাবৃত রাস্তার উপর ১০ থেকে ৩ কিলোমিটার পথ পরিক্রমণ অভ্যাসের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত সময়ের ছুটির অনুমতি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি নিজেই নিজের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতেন আবার প্রতিটি প্রতিযোগিতার পূর্বে দৌড়ের উপায়টি সম্বন্ধেও কল্পনা করে রাখতেন পূর্বাহ্নেই। তিনি সদা সর্বদা নিজের এই কল্পনার মধ্যেই বিভোর হয়ে থাকতেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে যে-কোন দৌড়বীরের চেয়ে তিনি অধিকতর বেগে দৌড়তে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কোন কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। নিজস্ব ভঙ্গিমায় যথারীতি দৌড়লেই তিনি জয়ী হবেন। পরে কিন্তু তাঁর এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

১৯২০ সালের এ্যান্টোয়ার্প ওলিম্পিকের (Antwerp Olympic) পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে নিজস্ব রীতিতে দৌড়ানর ফলে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

এই প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষণই তিনি প্রায় পুরোভাগে ছিলেন। কিন্তু দৌড়ের শেষ চক্রে ফ্রান্সের গিলমোট তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান। এই কারণেই দশ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেন। দৌড়ের সারাক্ষণই প্রায় তিনি প্রথম জনকে অনুসরণে রত থাকেন। শেষ চক্রের ঘণ্টাধ্বনি শুনার পর তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেলে গিলমোটকেও তীব্র গতিতে তাঁকে অনুসরণ করতে দেখা গেল।

অতঃপর গিলমোটের থেকে প্রায় ৩০ মিটার দূরত্বের ব্যবধানে থাকাকালীন অবস্থায় ফিতা স্পর্শ করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন নুর্মি। দুদিন পরে আট হাজার মিটার ক্রস কান্ট্রী (cross country) দৌড়েও আবার ঐ একই পদ্ধতিতে দৌড়ে তিনি পুনরায় জয়মণ্ডিত হলেন।

এই ওলিম্পিকের পরবর্তী তিন বৎসর নুর্মি ছিলেন দৌড় জগতের যেন এক একচ্ছত্র অধিপতি। দূর পাল্লার দৌড়ের বহু রেকর্ডই তখন তাঁর আয়ত্বাধীন। এই সময় অপর এক ফিনল্যাণ্ড-বাসী যুবক Even Wide পৃথিবীর রেকর্ডের চেয়ে ২ সেকেণ্ড কম সময়ে ১৫০০ মিটার দৌড়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেন। এই শুনে অপ্রতিহত নুর্মি Wide এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে তার চেয়ে ১ সেকেণ্ড কম সময়ে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে পুনরায় একটি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন।

এরপর নুর্মি ওয়াইডের বিরুদ্ধে ১ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই সময় ১ মাইলের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৪ মিনিট ১২·৮ সেকেণ্ড। এই প্রতিযোগিতার পূর্বে নুর্মি বললেন—"আমি ৪ মিনিট ১০ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়ব। ওয়াইড যদি এর চেয়ে কম সময়ে ছুটতে পারেন তা'হলে তিনিই জয়লাভ করবেন।"

প্রতিযোগিতাতেও দেখা গেল নুর্মি তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী যথানির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি চক্র অতিক্রম করে (প্র-চ—৬০·১ সেঃ, দ্বি-চ—৬৩·১ সেঃ, তৃ-চ—৬৩·৫ সেঃ, চ-চ—৬৩·৭ সেকেণ্ডে) ১ মিনিট ১০·৪ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়িয়ে পুনরায় একটি রেকর্ড করেছেন। বিশ্ববাসী সেদিন সত্য-সত্যই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অঙ্ক কষার মতন নির্ভুল এই দৌড় দেখে। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে ২·৪ সেকেণ্ডে কম সময়ে মাইল দৌড়তে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর ক্রীড়ামান খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। এই প্রসঙ্গে একমাত্র ফিনল্যাণ্ড দেশীয় যার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি হলেন ভিলি রিটোলা (Villi Ritola)। তিনিও ছিলেন অনেকগুলি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী।

রিটোলাকে কিন্তু নুর্মির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা ভুল হবে। ক্রীড়া জগতে নুর্মিকে যদি সম্রাটের আসন দেওয়া হয় তা'হলে রিটোলা পাবেন সম্রাটের অধীনস্থ কোন এক সেনাধ্যক্ষের পদ। নুর্মি ছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে ক্রীড়া জগতের একজন একচ্ছত্র সম্রাট।

অহং-সর্বস্ব নুর্মি খ্যাতির বাসনায় উদগ্রীব হলেও তিনি ছিলেন খুবই প্রচারবিমুখ। এ্যান্টোয়ার্প ওলিম্পিকের বহু-বিজয়ী নুর্মির স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্দ্ধনা তাঁরই অনুরোধে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনেকের মতে তিনি ছিলেন একজন লাজুক প্রকৃতির মানুষ। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন বাহুল্য-বিবর্জিত একজন জাঁকজমক বিমুখ মানুষ। শারীরিক এবং মানসিক এই দুই বিষয়েই নুর্মি ছিলেন অমানুষিক শক্তির অধিকারী। লৌহ নির্মিত ছিল যেন তার তন্ত্রীসমূহ। অমানুষিক পরিশ্রমী নুর্মি দিনের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা বনের ভিতর তাঁর দৌড় অনুশীলন করতেন।

তিনি ছিলেন প্রখর স্নায়ুসচেতন মানুষ। স্বীয় ক্রীড়া মানের অবনতি প্রদর্শনকে তিনি খুবই ভয় করতেন। তিনি দৌড়পূর্ব বিশ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীকে তিনি সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টায় থাকতেন। কোন এক দৌড়বীরকে উদ্দেশ করে তিনি নাকি বলেছিলেন—"ও এত ঘুমুচ্ছে কেন? তবে তো এ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে পারবে না।" তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় ক্রীড়াপূর্ব বিশ্রামের পক্ষপাতী হলেও তিনি কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীকে সদা সচেতন রাখার চেষ্টা করতেন।

এই দুনিয়ায় নুর্মির ছিল বোধহয় নিঃসঙ্গ একক জীবন। এই একাকিত্বের মাঝেই বোধহয় তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। বন-পথের সৌন্দর্য্যেই ছিল তাঁর আনন্দ। অরণ্যরাজির বিহঙ্গকাকলীর মাঝেই তিনি

পেতেন আনন্দের শিহরণ। নির্জনতা হতেই ধীরে ধীরে তাঁর মন হয়ে উঠত আনন্দসচেতন।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। অনেক সময় মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে ঐ সকল কাহিনী হয়ত বা সত্য হলেও হতে পারে। শোনা যায় তিনি ট্রেন অথবা ট্রামকে ধরে সমান তালে ছুটে যেতে পারতেন। সম্ভবতঃ এই অভ্যাসের ফলেই তিনি সাতফুট দৈর্ঘ্যের দীর্ঘ পদক্ষেপের ব্যবধানে অনায়াস ভঙ্গীতে তীব্র বেগে ছুটে যেতে সমর্থ হতেন। এও শোনা যায় রাশিয়ান রণ-ক্ষেত্রে কোন এক Test Course-এ সৈনিকের পোশাক পরিচ্ছদ ও বোঝা নিয়ে পনেরো কিলোমিটার পথ তিনি ২৯ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ফিন-ল্যাণ্ডের কোন এক ডিভিশনাল (Divisional) চ্যাম্পি-য়নশিপের ২০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি নাকি দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর থেকে ১০ মিনিট পূর্বে তাঁর দৌড় শেষ করেন। জীবনের সকল কঠোর পরীক্ষা মনে হয় ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেও কঠোরতর। এই সকল পরীক্ষাই হয়ত ভবিষ্যতে তাঁকে নিজেকে সর্ব-শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য সঞ্জীবিত করেছিল।

১৯২৪ সালের প্যারিস ওলিম্পিকে ১৫০০ থেকে ১০,০০০ হাজার মিটার পর্য্যন্ত সকল বিভাগের দৌড়ে নুর্মির জয়লাভ সম্বন্ধে, সকলেই এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন। এতগুলি বিষয়ে নুর্মি প্রতিযোগিতা করছেন জানা সত্ত্বেও ইন্টার-ন্যাশনাল ফেডারেশনের ক্রীড়া তালিকায় দেখা গেল ১৫০০ এবং ৫০০০ হাজার মিটা-রের মতন দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় অনুষ্ঠান দুটিকে মাত্র পঞ্চান্ন মিনিটের ব্যবধানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থার সকলেই কিন্তু জানতেন ঐ দুইটি বিষয়েই নুর্মির জয়লাভের সম্ভাবনা প্রবল। বিশ্ব ওলিম্পিকের মতন ক্রীড়ার আসরে একই দেশের একই প্রতিনিধির বহু বিষয়ে জয়লাভ কি রকম যেন একটু দৃষ্টিকটু দেখায়। এই জন্যই নুর্মিকে একটু অসুবিধায় ফেলার জন্যই বোধ-হয় এই আয়োজনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফিন-ল্যাণ্ডও এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদ তখন গ্রাহ্য হয়নি।

এরপর ১৯২৪ সালের প্যারিস ওলিম্পিকে দেখা গেল নুর্মি বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে এক সেকেণ্ড কম সময়ে (৩ মিঃ ৫৩·৬ ও সেকেণ্ডে) ১৫০০ মিটার দৌড়েছেন।

অতঃপর এল সেই বহুবিতর্কিত ৫০০০ হাজার মিটার দৌড়ানর পালা। দৌড় আরম্ভও হলো যথানির্দিষ্ট সময়ে। ঐবারও দেখা গেল দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ব্যাঘ্র সদৃশ নুর্মি জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আবার প্রথম হয়েছেন মাত্র ১৪ মিনিট ৩১·২ সেকেণ্ড সময়ে। এই দৌড়ে অপর এক ফিনল্যাণ্ডবাসী যুবক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অবিসম্বাদিত রূপে দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

দ্বিতীয় জয়লাভের পর এবার এল নুর্মির জীবনের তৃতীয় স্বর্ণপদক প্রাপ্তির পালা। সেদিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম আর এই গরমের মধ্যেই আরম্ভ হলো ১০,০০০ হাজার মিটার ক্রস-কাণ্ট্রি (cross country) দৌড়। শোনা যায় মোট প্রতিনিধিদের প্রায় অর্ধেক ব্যক্তিই এই গরমের দরুন দৌড় শেষ করতে পারেন নি। এবারও নুর্মি তাঁর প্রচণ্ড জীবনীশক্তির দ্বারা পুনরায় জয়লাভ করে ওলিম্পিকে তৃতীয় স্বর্ণপদকের অধিকারী হলেন।

এরপর ওলিম্পিকের টীম রেস প্রতিযোগিতায় যোগ-দান করে অনায়াসেই তিনি চতুর্থ স্বর্ণপদকটিও স্বীয় করায়ত্ত করলেন।

অনেকেই মনে করেন দশ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি যদি প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দেশের অনুমতি পেতেন তা'লে হয়ত পঞ্চম স্বর্ণপদকের অধিকারী হওয়াটাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত না।

এ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। সেটি হলো এই যে ওলিম্পিকের প্রথম দিনে যখন তাঁর স্বদেশবাসী রিটোলা দশ হাজার মিটার দৌড়ে ৩০মিনিট ২৩·৩ সেকেণ্ড সময়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তখন ঠিক ঐ একই সময়ে নুর্মি তাঁর ওলিম্পিক প্রশিক্ষণ চক্রে

অনুশীলনের সময়ে ঐ একই দূরত্ব ২৯ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডে সমাপ্ত করেছেন।

যদি আমরা এটাকে কল্পকাহিনী বলেও ধরে নিই তা'হলেও এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে হয়ত বা এটা নুর্মির পক্ষে সম্ভব ছিল।

নুর্মি তিনটি ওলিম্পিকে (১৯২০,১৯২৪,১৯২৮) ছয়টি বিভাগে স্বর্ণপদক ও তিনটি বিভাগে রৌপ্যপদক জয়লাভ করে ওলিম্পিকের ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করে গেছেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই দারিদ্র নিপীড়িত জীবন দিয়েই যন্ত্রী নুর্মি তাঁর জীবনের জয়স্তম্ভ নির্মাণ করে গেছেন বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে। তাঁর কৃত সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড আজ ম্লান হয়ে গেলেও নুর্মি নামটি কিন্তু ওলিম্পিকের ইতিহাসে আজও অম্লান হয়ে আছে। তাই প্যাভো নুর্মি জগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম।

তাঁর এই অতুলনীয় কীর্ত্তিকথার স্মরণে কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁর দেশের এক বিখ্যাত শহরের কোনও এক জনবহুল স্থানে নুর্মির এক সুন্দর বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়েছেন।

মন্থরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এমন সময়ে বেত্রবতী দ্রুতপদে আসিয়া জানাইল, মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বারে সমাগত। মহারাজ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া আসিলেন,পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদানান্তর প্রণাম করিয়া সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃগচর্ম বিছাইয়া বসিতে দিয়া সপারিষদ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি স্মিত হাস্যে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে তিনি রাজার এবং রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশ করপুটে নিবেদন করিলেন, "অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া আপনাকে স্মরণ করিয়াছি। প্রথমতঃ কুশাবতী পরিত্যাগ সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ এই মন্থরা সমস্যা।"

মন্থরা এতক্ষণ বহুদূরে একটি স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহর্ষি তাহার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন দেখিয়া সে নতমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল. ভূলুণ্ঠিতা হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম পূর্বক নতজানু হইয়া যুক্তকরে ভূতলেই উপবিষ্টা রহিল।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি সত্যই অনুতপ্তা?"

মন্থরা বলিল, "আপনি অন্তর্যামী, আপনার কাছে কিছুই গোপন নাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "কাশীরাজের কাছে ফিরিয়া যাইবে?"

মন্থরা বলিল, "না প্রভু। আমি প্রেমের মর্যাদা রাখিতে পারি নাই। যে রূপজ মোহে তিনি তাঁহার পূর্ব পত্নীদিগের প্রেমবিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহার উপরও আর আমার লোভ নাই। তবে তিনি আমার দেহমনের বুভুক্ষা ঘুচাইয়াছিলেন; শ্রদ্ধা না করিতে পারি দূর হইতে চিরদিন তাঁহার মঙ্গল কামনা করিব।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "তোমার পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইলে তুমি কষ্ট পাইবে না?

মন্থরা সবিনয়ে বলিল, "কষ্ট পাইব না একথা বলিব না, তবে সহ্য করিব। আপনার আশীর্বাদে পারিব বলিয়া মনে হয়। আপনি দয়া করিয়া মহারাজকে অনুমতি দিলে তিনি আমাকে অঋণী হইবার সুযোগ দিবেন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "উত্তম। মহারাজের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, আমিই তোমাকে সে সুযোগ দিব। তুমি অন্যের ক্ষতি না করিয়া যেটুকু রূপ রৌপ্য এবং স্বর্ণের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়াছ তাহা তোমার থাকুক আর যাহা অন্যের নিকট হইতে নিষ্ঠুরতা দ্বারা আহরণ করিয়াছ তাহা এই মুহূর্তে পূর্ব আধারে ফিরিয়া যাউক, যাহাদের নিকট তুমি ঋণী আছ, তাহাদের ঋণ শোধ হউক। শল্যচিকিৎসার দুঃখ দুই পক্ষকেই আর দ্বিতীয় বার দিতে চাহি না, তোমার সুমতির পুরস্কারস্বরূপ আমার তপোবল আজ তোমার জন্য কিছু প্রয়োগ করিলাম। তোমার কল্যাণ হউক।"

সভায় সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, নিমেষ মধ্যে সেই পদ্মপলাশলোচনা সুনাসা নারীর অপূর্ব সুন্দর যুবতী দেহ এক স্থূলনাসা অনতিক্ষুদ্রনয়না ঈষল্লোলচর্মা কিন্তু ভ্রমরকৃষ্ণকেশা গৌরবর্ণা প্রৌঢ়ার শরীরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মন্থরা একবার নিজের বলিরেখাঙ্কিত কপোল ও ললাট অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিল, কুঞ্চিত গাত্রচর্ম কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করিল, তারপর প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত মুখে আবার ভূতলে লুটাইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিল।

মহর্ষি প্রশ্ন করিলেন, "সন্তুষ্টা হইয়াছ তো?"

মন্থরার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নাই, সে শুধু সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিল। মুহূর্তকাল পরে প্রশ্ন করিল, "উৎপলার, চন্দনার কি হইল?"

মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, "উৎপলা সহসা চক্ষু ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছে। সে কেবলই নির্নিমেষ নেত্রে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে আর পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। চন্দনা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছে। বৎস কুশ, তুমি অবিলম্বে উহাদিগকে আনাইয়া মন্থরার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়ো। উৎপলাকে অযোধ্যায় দেবসবার ভার দিয়ো, তাহার পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া যথাকালে তোমার পার্শ্বরক্ষী নিযুক্ত করিয়ো। চন্দনার বিবাহে কিছু যৌতুক দিয়ো, ধনীগৃহে মনোমত প্রার্থী পাইলে বিবাহ দিয়ো।"

কুশ করজোড়ে কহিলেন, "আমি এখনই তাহাদের আনাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছি। তাহারা আসিলে অবশ্যই মন্থরার সহিত সাক্ষাৎ করাইব। কিন্তু প্রভু, এই শূন্য নগরে মন্থরাকে রাখিয়া যাওয়া কি নিরাপদ হইবে?"

মহর্ষি কহিলেন, "কুশ, তোমার কুশাবতী কোনও দিন শূন্য হইবে না। শত প্রলোভনেও এ নগরী পরিত্যাগ করিবে না এরূপ নাগরিক এখানে আছে। পুররক্ষক এবং কিছু সৈন্য, শাসন এবং বিচারের জন্য কিছু ব্যবস্থা তোমাকে এখানে রাখিতেই হইবে, মন্থরা তাহাদের তত্ত্বাবধানেই থাকিবে। যতদিন জীবিতা থাকিবে ততদিনে সে রামায়ণ গান গাহিয়া এ অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের হৃদয়জয় করিবে। পরে তোমার সৈনাদিগের আর প্রয়োজন হইবে না। স্থানীয় নিষাদ, শবরাদির বংশধরেরাই যুগযুগ ধরিয়া কুশাবতী রক্ষা করিবে, নগরীর শূন্য মন্দির ও গৃহসমূহে প্রদীপ জ্বালাইবে, রামনামে আকাশ বাতাস প্লাবিত করিবে।"

মহারাজ কুশ বলিলেন, "আপনার অভয়বাক্যে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কুশাবতী নির্মাণ করিতে রাজকোষের বিস্তর অর্থব্যয় হইয়াছে, এখন ইহা

পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নগরবাসীকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে এবং সেখানে জীর্ণ নগরীর সংস্কার সাধন করিতে যে অর্থব্যয় হইবে সচিবগণের মতে আমার ভাণ্ডারে সে পরিমাণ অর্থ নাই ; সেজন্য কি কর্তব্য ?"

মহর্ষি কহিলেন, "অযোধ্যার নগরাধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা তোমাকে সেখানে আহ্বান করিয়াছেন, অর্থের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন।"

কুশ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনার একথার অর্থ বুঝিলাম না।"

বশিষ্ঠ কহিলেন, "বৎস, তুমি অভিষেক-সময়ে রাজর্ষি মনুর ব্যবহৃত যে মহামূল্য মুকুট ইক্ষাকুবংশের কুলপ্রথানুসারে ধারণ করিয়াছিলে তাহা এখন কোথায় ?"

কুশ কহিলেন "তাহা এখানে রাজ ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে, বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে ব্যবহার করি। অযোধ্যার রাজগৃহেও তাহা সদা ব্যবহৃত হইত না, এখনও হয় না। প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য অন্য মুকুট রাখিয়াছি।"

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, "অযোধ্যায় মহারাজ দশরথের রত্নভাণ্ডারের যে কক্ষে অভিষেক-সময়ে ব্যবহৃত অন্যান্য মণিরত্ন ও রাজবেশের সহিত সেই মুকুটটি রক্ষিত ছিল সে কথাটি মনে পড়ে কি ?"

কুশ কহিলেন, "পড়ে প্রভু। অযোধ্যা পরিত্যাগের পূর্বে আমি সে কক্ষ শূন্য করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছি। কক্ষটি প্রায়ান্ধকার, তন্মধ্যে অবস্থিত পাষাণনির্মিত কয়েকটি গুরুভার শ্রীহীন মঞ্জুষা কেবল আনয়ন করা প্রয়োজন বোধ করি নাই। সেগুলি বোধ হয় পৃথগ্ভাবে নির্মিত হয় নাই, গৃহসংলগ্ন করিয়াই রচিত হইয়াছিল।"

বশিষ্ঠ কহিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। তাহারই একটির তলদেশে গৃহকুট্টিম-সংলগ্ন একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারপথে ভূগর্ভস্থ একটি গুপ্তকক্ষে যাওয়া যায়। সেখানে অবতরণ করিলে তুমি মহারাজ ইক্ষাকুর সঞ্চিত গুপ্তধন পাইবে। মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু প্রভৃতি তোমার পূর্বপিতামহগণ সেই স্বর্ণভাণ্ডার যুগে যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আমার অনুমতি লইয়া তাহা হইতে কিছু কিছু ব্যয়ও করিয়াছেন। তোমার পিতা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে তাহার কিয়দংশ প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে পূর্তকার্যে এবং যজ্ঞাদির জন্য এক সময়ে ব্যয়িত হইয়াছিল, আবার বিভিন্ন সময়ে বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে আহৃত রাশি রাশি স্বর্ণ তিনি গোপনে সেখানে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন মতো সেখান হইতে কয়েক কোটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি এখন গ্রহণ করিতে পারিবে। কার্য শেষে আমাকে সংবাদ দিয়ো।"

কুশ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "পরিত্যক্ত বনাবৃত নগরীতে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, অথচ আমরা তাহা কেহই জানি না! যদি এতদিনে তাহা তস্করে অপহরণ করিয়া থাকে ?"

মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, "তস্করের চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নাই, সে কক্ষের সুড়ঙ্গপথ খুঁজিয়া বাহির করে। আমার অজ্ঞাতে সে কক্ষে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি এই কুঞ্চিকা গ্রহণ কর, ইহার সংলগ্ন তাম্রপত্রে ক্ষুদ্রাকারে ঐ কক্ষের মানচিত্র অঙ্কিত ও তাহাতে গুপ্তদ্বারের স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই কুঞ্চিকাসাহায্যে দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া সোপান-পথে নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে। যিনি যাইবেন তিনি একা যতটা ভার বহন করিতে পারেন তত পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রাই যেন এককালে গ্রহণ করেন, একাধিক ব্যক্তি যেন ঐ কক্ষের সন্ধান জানিতে না পারে। আমার ইচ্ছা, তুমি অমাত্য ভদ্রকে নগর সংস্কারের ভার দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করো। তিনি পুরাতন রাজ-প্রাসাদে সপরিবারে বাস করিলে এবং প্রত্যহ তিন চারিবার স্বর্ণমুদ্রা উত্তোলন করিলে কেহ গুপ্তকক্ষের কথা জানিতে পারিবে না, যত অর্থই ব্যয় হউক তিনি গৃহে বসিয়া পাইবেন। তুমি অযোধ্যার প্রজার কল্যাণের জন্য আজীবন ব্যয় করিলেও সে ভাণ্ডার শূন্য হইবে না।"

অমাত্য ভদ্র করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, মহারাজ কুশ আমাকে অর্থসচিব নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি রাজদণ্ড সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই, তবু সর্বদা শঙ্কিত আছি। একার্যে আমার সহায়ক কর্মী আছেন, সাক্ষী আছেন, অর্থের পরিমাণও মহারাজ জ্ঞাত আছেন। অপরদিকে আপনি যে অপরিমিত স্বর্ণরাশির কথা বলিতেছেন তাহার বর্ণনা শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প হইতেছে। শেষবয়সে কি বিনাদোষে দুর্নামভাগী হইব? তদ্ভিন্ন আমি দরিদ্র, কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের মধ্যে একা দিবারাত্র বাস করিয়া যদি আত্মসংবরণ করিতে না পারি? যদি প্রলোভনে পড়ি?"

মহর্ষি বলিলেন, "কোনো চিন্তা নাই, সুড়ঙ্গপথে যুগজীবী কালসর্প সোপানপ্রান্তে প্রহরায় নিযুক্ত আছে। মহারাজ রঘুর সময়ে একজন রাজপুরুষের মতিভ্রম হইয়াছিল, তিনি বহুবার রাজানির্দেশে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া একবার লোভবশে নিজ প্রয়োজনে ঐ কক্ষ হইতে রাজার অজ্ঞাতে অর্থ অপহরণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তুমি প্রলোভনে পড়িয়াছ বুঝিলেই সর্প তোমাকে দংশন করিবে। তুমি পাপ করিবার অবসর পাইবে না।"

ভদ্র হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চিন্ত হইলাম। মহারাজ অনুমতি দিলেই আমি এখন সপরিবারে যাত্রা করিতে পারি। বিধবা হইবার পূর্বে আমার পতিপ্রাণা পত্নীকে কিছুদিন নরলোকে পতিসেবা করিবার সুযোগ দিতে পারিব।"

মহর্ষি হাস্যস্ফুরিতাধরে বলিলেন, "তোমার পত্নীর বৈধব্যযোগ নাই, তোমার দারিদ্র্যও আর অধিকদিন থাকিবে না। মহারাজ কুশ যদি তোমাকে তোমার দায়িত্বের উপযুক্ত বেতন প্রদান না করেন, অযোধ্যার সংস্কারসাধনের জন্য কার্যশেষে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত না করেন তবে তিনি ধর্মে পতিত হইবেন। সম্প্রতি তুমি দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিয়াছ, সেজন্য রাজার কাছে কি পুরস্কার লাভ করিয়াছ?"

"কিঞ্চিৎ তিরস্কার" বলিয়া লজ্জিত কুশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, নিজ কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মণিখচিত স্বর্ণহার লইয়া অমাত্য ভদ্রের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। বশিষ্ঠ এবং সুনন্দ উভয়ে 'সাধু, সাধু' রবে তাঁহার কার্যে সমর্থন জানাইলেন। বশিষ্ঠ প্রণত ভদ্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "কল্যাণমস্তু।"

এতক্ষণে মন্থরা কথা কহিল। সে মহর্ষি বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি বলিলেন, আমি রামায়ণ গান গাহিয়া বিন্ধ্যের পার্বত্য অধিবাসীদিগকে বশ করিবে, কিন্তু রামায়ণ গান তো আমি কখনও করি নাই। কিরূপে করিব? কে আমাকে শিখাইবে? আমার পাপজিহ্বায় প্রাকৃত ভাষার আলাপ কোনও রূপে চলিতে পারে, দেবভাষা আমার মুখে সুষ্ঠুরূপে উচ্চারিত হইবে কি?"

বশিষ্ঠ কহিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কুশ এবং লব নামক দুইটি সুকণ্ঠ বালককে উহা তাললয়যোগে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাদের সম্মুখেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয় তোমাকে রামায়ণ গান করিতে শিখাইবেন। আর উচ্চারণের সম্বন্ধে কোনও বাধা ঘটিবে না, তোমার জিহ্বার কিছুমাত্র জড়তা লক্ষিত হইতেছে না।"

কুশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ আপনি কি আদেশ করিতেছেন, প্রভু? কতদিন পূর্বে পিতৃদেবের সভায় রামায়ণ গাহিয়াছিলাম এতদিন চর্চা নাই, আজ কি কিছু মনে আছে তদ্ভিন্ন সেই বিরাট্ কাব্যগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতেই মন্থরার কয়েক বৎসর লাগিবে, তাললয় সহযোগে সমস্ত অংশ গাহিতে শিখিবে কতদিনে?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "তা, দিবসত্রয় লাগিবে মনে হয়। মন্থরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এবং শ্রুতিধরা। আমার আশীর্বাদে শ্রবণমাত্র সে যথোচিত স্বরতালযোগে তোমার কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া রামায়ণ গান করিতে পারিবে। একবার শুনিলেই শ্লোকগুলি তাহার কণ্ঠস্থ হইবে। তোমাদের দ্বৈত সঙ্গীতে পৃথিবী মোহিত হইবে।"

কুশ তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বলিলেন, "কুশাবতী পরিত্যাগের জন্ম বহু আয়োজন অসম্পূর্ণ, এখন আমি রামায়ণ গাহিতে বসিব? আমি রাজা, গান গাহিলে প্রজারা ভাবিবে কি?"

মহর্ষি বলিলেন, "ইহাতে তোমার রাজমর্যাদার কিছু হানি হইতে পারে বটে কিন্তু প্রজাদের হৃদয়াসনে তোমার অধিকার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে—নিশ্চয় জানিও। আমি প্রধানতঃ তোমার কণ্ঠে রামায়ণ শুনিব বলিয়াই আজ তপোবন ছাড়িয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে নিরাশ করিয়ো না, বৎস! কুশাবতী পরিত্যাগের প্রাক্কালে এই উপত্যকাভূমিতে পুণ্য রামকথা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া যাও, মন্থরাকে নবজীবন দান করিয়া যাও।"

কুশ বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য। আর্য সুনন্দ, আপনি রাম-মন্দির-সম্মুখস্থ চত্বরে উৎসবের আয়োজন করুন। নগরে ঘোষণা করুন, অপরাহ্নে রামায়ণ গান হইবে। আর্য ভদ্র, আপনি মহর্ষির মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনা ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে যাইবেন। কল্য অপনাকে অযোধ্যাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

সেইদিন অপরাহ্ন কালে শ্রীরামমন্দিরের সম্মুখস্থ পথের অপরপার্শ্বে সুবিস্তৃত সমতলক্ষেত্রমধ্যে প্রস্তর-মণ্ডিত বিশাল চত্বরে একটি মহতী সভার অধিবেশন চলিতেছিল। কুশাবতী নগরীর নরনারী কেহ বোধ হয় সে সময়ে আর গৃহে ছিল না। চত্বর, পথ, প্রান্তর, মন্দির-সোপান, চতুর্দিকের বৃক্ষরাজি, সর্বত্রই সেদিন অগণিত-জনসমাবেশ, অদৃষ্টপূর্ব জনতা। পূবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নরমুণ্ডসমুদ্র। সুসজ্জিত চত্বরের কেন্দ্রস্থলে ঈষদুচ্চ অর্ধচন্দ্রাকৃতি মর্মর-শিলাবেদিকার এক প্রান্তে বহুমূল্য কৌষেয় আস্তরণের উপর তুলকপূর্ণ সুকোমল সুখাসনসমূহে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, চেদী, মৎস্য, বিদর্ভ প্রভৃতি জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের রাজগণ এবং অপরদিকে নৈগম, পৌরাণিক, শাব্দিক ও সঙ্গীতজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজগণ উপবিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যস্থলে বিচিত্র কম্বলাস্তৃত উচ্চতর অংশে ব্যাঘ্র-মৃগমেষাদির চর্ম বিছাইয়া বসিয়াছেন বশিষ্ঠ, জাবালি, মৌদ্গল্য, গার্গ্য প্রমুখ মহাতেজা মহর্ষিবৃন্দ। তাঁহাদের সম্মুখে অনতি-দূরে চত্বরকুট্টিমে কাশ্মীর দেশীয় একটি মনোরম আসনে বসিয়া শ্বেতবস্ত্রোত্তরীয়ধারী শ্বেতচন্দনচর্চিত এবং শ্বেত-মাল্য-শোভিত তরুণ নৃপতি কুশ কলস্বনা বীণাসংযোগে শ্রুতিমনোরম মূর্ছনাসহকারে কিন্নরকণ্ঠে পুণ্যরামায়ণ গান করিতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কৌষেয়বসনা এক সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ়া রমণী অনুরূপ বীণাসহযোগে তানলয়সম্পন্ন সেই অপরূপ কণ্ঠস্বর আপন মধুর কণ্ঠে অনুসরণ করিয়া ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে সুধারস পরিবেশন করিতেছিলেন। ঋষিগণ অনেকেই সমাধিস্থ, রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ সকলেই সম্মোহিত, জনতা অতীতের স্বপ্নে বিমোহিত এবং বাহ্যজ্ঞানহীন। লক্ষলক্ষ শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উৎকর্ণ হইয়া সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতেছে। কুশ প্রথমে একটি শ্লোক একাকী গান করেন, পরক্ষণে সেই শ্লোকটি মন্থরার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া একত্রে আর-একবার গান করেন। এই ভাবে সর্গের পর সর্গ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দশরথ-মহিষী কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা প্রসঙ্গে পৌঁছিলেন। রামাভিষে-কের সংবাদে আনন্দিতা কৈকেয়ীর মন্থরাকে রত্নহার-দানের উদ্যোগ, মন্থরার কুপরামর্শে তাঁহার দুর্মতির উদয়, কৈকেয়ীর অভিপ্রায় জানিয়া দশরথের আর্তনাদ এবং রামের শান্তচিত্তে পিতৃসত্য পালনের সংকল্প গ্রহণ সমস্তই বর্ণিত হইল। মন্থরার কণ্ঠ তখন ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তথাপি সে একবারও থামিল না। রাম সীতা লক্ষ্মণ সংসার কাঁদাইয়া বনে গেলেন, পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে হতভাগ্য বৃদ্ধ দশরথের মৃত্যু হইল, ভরত আসিয়া মাতাকে তিরস্কার করিলেন, শত্রুঘ্ন মন্থরাকে প্রহার করিলেন। অগণিত দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে যেন চিত্রের পর চিত্র উদ্ঘাটিত হইতেছে, রহিয়া রহিয়া শতকণ্ঠে ধিক্কার-ধ্বনি উঠিতেছে। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর

হইতেছে, আকাশে চন্দ্র অস্তোন্মুখ, প্রস্তর-বেদিকার বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত দীপবৃক্ষসমূহে দীপমালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নির্বানোন্মুখ। ভরতমিলন, রামের পঞ্চবটিবাস, অসহায়া জানকীকে হরণ করিয়া রাবণের লঙ্কায় প্রস্থান বর্ণিত হইয়া গেল। রাম বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন শ্রোতারা কাঁদিতেছে, ঋষি, রাজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী নির্ধন সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত। তরুণ গায়ক এবং প্রৌঢ়া গায়িকার কণ্ঠে সুধানির্ঝর এবং চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু-নির্ঝর যুগপৎ বহিয়া চলিতেছে কিন্তু গানের বিরতি নাই, আহারনিদ্রাবিস্মৃত শ্রোতৃবর্গেরও শ্রবণে ক্লান্তি নাই।

সহসা বাধা দিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই কুশ নীরব হইলেন, মহর্ষি মধুরস্বরে কুশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, একরাত্রে রামায়ণ শেষ করিতে পারিবে না এইবার বিরাম দাও।"

কুশ নতজানু হইয়া ভূমিন্যস্তমস্তকে মহামান্য মুনি-বৃন্দকে প্রণাম নিবেদন করিলেন, তারপর দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত সুধীগণের নিকট ও সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট করজোড়ে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দূরে নিকটে সভাভঙ্গসূচক তূর্যধ্বনি শ্রুত হইল, নিস্তরঙ্গ নীরব জনসমুদ্র যেন সহসা তরঙ্গোচ্ছ্বসিত হইয়া বিপুল গর্জনে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল, তারপর দিগ্বিদিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

মন্থরাও কুশের সঙ্গে সঙ্গেই বীণা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেও সভার উদ্দেশে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার জানাইল, তারপর একে একে মুনিগণের চরণ-বন্দনা করিল। মহর্ষি জাবালি হাস্যমুখে বলিলেন, "বৎসে, তুমি আমার মত আজ সপ্রমাণ করিয়াছ। পাপ এবং পুণ্যের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, অবিনশ্বর সত্য বলিয়া কিছু নাই, ধর্ম এবং অধর্ম কিছুই শাশ্বত নহে। আশীর্বাদে আমার বিশ্বাস নাই, সুতরাং করিলাম না। নিজ গুণেই তুমি জয়ী হইবে। বৃথা শরীরকে কষ্ট দিয়ো না। প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়ামচর্চা করিও, সঙ্গীতাভ্যাস ছাড়িয়ো না। জীবনে বহুজনকে আনন্দ দিতে পারিবে, নিজেও আনন্দ পাইবে। মরণের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং কে কি বলিল তাহাতে তোমার কিছু আসিবে যাইবে না।" মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ কেহই জাবালির বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না, তবে সকলেই মন্থরার সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। বশিষ্ঠের পদধূলি লইয়া মন্থরা অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "প্রভু, পারিব তো?"

বশিষ্ঠ স্নেহভরে তাহার মস্তকে উভয় হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "পারিবে বৎসে, পারিবে। তুমি আজ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, আর তোমার ভয় নাই। ভগবান্ রামচন্দ্র তোমার নিত্যসঙ্গী হইবেন, তোমার কল্যাণ করিবেন। অবশিষ্ট জীবন তুমি শান্তিতে অতিবাহিত করিবে এ আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। আশীর্বাদ করি, তুমি জনকল্যাণী হও, পাপী তাপীর আশ্রয় হও, আত্মজ্ঞা হও।"

মন্থরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বশিষ্ঠ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আজ মহর্ষি বাল্মীকি এখানে উপস্থিত নাই, তাঁহার রামচরিত্রকাব্যের এই পরম রমণীয় পরিবেশন তিনি দেখিলেন না, এই পরম আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন। বৎস, তিনি তোমার শূককীট রূপ দেখিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার স্পর্শের জ্বালা তিনি বর্তমান কালকে অনুভব করাইয়াছেন এবং অনাগত কালের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তোমার প্রজাপতিতে রূপান্তর তিনি দেখিলেন না, ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করিলেন না, আমার এই দুঃখ রহিল। তাঁহার রামায়ণে তোমার প্রতি অবিচার চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়া যাইবে, ইহা উচিত হয় না। আমি মহর্ষি-কে তোমার এই পরিবর্তনের কথা জানাইতে না পারিলে স্বস্তি পাইতেছি না। উত্তর কাণ্ডে আর একটা সর্গ যথা-স্থানে যোগ করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তুমি কি বলো?"

মন্থরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "প্রভু, আমি প্রকৃত-

পক্ষে পাপীয়সী, মহর্ষি রামায়ণে আমার পরশ্রীকাতরতার এবং ক্রূরতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, তিনি আমার যথার্থ রূপই জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছেন। আমার বর্তমান চিত্ত স্থৈর্যে আমার নিজেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, সুতরাং মহর্ষিরচিত পুণ্য কাহিনীর মধ্যে আমার কথা আর বাড়াইয়া লাভ নাই, আপনি তাঁহাকে আমার জন্য কোনও অনুরোধ করিবেন না। আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলিব না, আপনার আশীর্বাদ আমার অন্তরে চিরদিন বলসঞ্চার করিবে, কিন্তু পুণ্যবতী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি কোনও দিন পারিব না। এখন আমাকে একান্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুমতি দিন।" অতঃপর কিছুক্ষণ অবনত মুখে নীরবে অবস্থান করিয়া মন্থরা পুনর্বার অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, পৃথিবীতে রামকথা যতদিন প্রচারিত থাকিবে, ততদিন এই হতভাগিনীর নাম কেহ ভুলিবে না; অনাগত যুগের শতকোটি মানব-মানবীর ধিক্কার এবং অভিশাপ আমাকে মৃত্যুর পরপারে যুগযুগান্তর ধরিয়া অনুসরণ করিবে তাহাও জানি। কেবল আমার অন্তহীন পাপের সেই অকূল অন্ধকারের মধ্যে এই পথভ্রষ্টার অসহায় আত্মাকে পথ দেখাইবার জন্য দুইটি মহৎ হৃদয়ে করুণার দীপশিখা জ্বলিবে, একটি বৃদ্ধ এবং একটি তরুণ শুভকামী, অত্যাচারিত নর দেবতা, রামসীতার গুরু এবং সন্তান, আমাকে তাঁহাদের উদার অন্তরের ক্ষমায় স্নেহে এবং আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিবেন, এই সান্ত্বনায় আমি পরলোকেও, নরকেও শান্তিলাভ করিব।"

মহারাজ কুশ নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন, অদূরে দণ্ডায়মান অর্থসচিব ভদ্র অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন, কেবল মহর্ষি বশিষ্ঠ অবিচলিত চিত্তে মন্থরার মস্তকোপরি কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত বদনে বলিলেন, "তথাস্তু।"

॥ শেষ ॥

সবুজ বিপ্লব

সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল

অজন্মা প্রেতের কবল থেকে আমাদের সোনার ক্ষেতগুলোকে মুক্ত করার জন্য বেশ ক'বছর ধরেই নানা কর্ম-কাণ্ড চলছে। উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, সেচ ও কীটঘ্ন ওষুধের প্রয়োগ, আর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূমি-পরিচর্যা—এই কর্ম-কাণ্ডের অঙ্গ। উপযুক্ত সময়ে এই প্রকরণগুলির সুষম প্রয়োগকেই বলা হয়ে থাকে সবুজ-বিপ্লব।

এই বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে ধান এবং গম চাষের ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বর্তমান বছরের শেষাশেষি পশ্চিমবঙ্গের মোট চল্লিশ লক্ষ একর ধান-গমের জমি এই কর্মোদ্যোগের পরিধিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি অপ্রতুল হলেও বিপ্লবের প্রকৃতি দেখে কিন্তু এই ধারণাই জন্মায় যে ব্যাপকতার সাফল্যের বীজ নিশ্চিতভাবেই এর কেন্দ্রে নিহিত।

তবু প্রতিটি বিপ্লবের শুরুতে যেমন সংশয়ী মনের ভিড় দেখা যায়, কৃষি-বিপ্লবের শুভারম্ভও তেমনি সংশয়-কণ্টকিত। উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগ অনেককেই প্রশ্ন-ও সংশয়-সঙ্কুল করে তুলেছে। এই সংশয়-সন্দেহের দ্রুত নিরসন প্রয়োজন।

জয়া, পদ্মা, রত্না, আই-আর প্রভৃতি যে-সমস্ত উচ্চ-ফলনশীল বীজ বেরিয়েছে তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমশঃ নিম্নমুখী দেখে অনেক কৃষক সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন। আমাদের চাষীরা সচরাচর উৎপন্ন ফসলের একটি অংশকেই পরবর্তী চাষে বীজ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। উচ্চফলনশীল বীজের ক্ষেত্রেও অনেকে তাই-ই করেছেন আর আশানুরূপ ফসল না পেয়ে সন্দেহের শিকার হয়েছেন। এ-কথা মনে রাখা দরকার যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে এই তেজী বীজগুলিরও ফলন-ক্ষমতা কমতে থাকে। তাই প্রতি তিন বছর অন্তর চাষীকে নতুন শক্তিসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে, তবেই উৎপাদনের সুউচ্চ মাত্রা বজায় থাকবে। এই নতুন বীজ কেবল নির্দিষ্ট খামারেই পাওয়া যায়—যেখানে নিয়ত গবেষণা চলছে এবং বীজের বহুলীকরণ হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীজ পরিবর্তন তাই উন্নত কৃষি-ব্যবস্থায় একটি অত্যাবশ্যক এবং অবশ্য-পালনীয় বিধি।

কিন্তু তা ছাড়াও অন্য প্রশ্ন আছে। উন্নত জাতের ধানের বীজগুলি প্রায় সবই মোটাজাতের। বেশী ফলন পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিমাণই কি সব? উৎপাদন বাড়ানোর নামে যদি সর্বত্র মোটা ধানেরই চাষ চলতে থাকে, তাহলে আমাদের চিরন্তন আদরের চামরমণি, বাসমতী, গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, কামিনী, দাদখানি ইত্যাদি তো অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। এসব ধানের তো কোন উন্নত বীজ নেই। তাহলে ওজনই কি উৎপাদনের একমাত্র তৌল? অভাবের সশব্দ পদক্ষেপে কি ভুলে যাব আমরা ক্ষীণতনু বাস-কামিনীর সুগন্ধ নিঃশ্বাস?

সত্য বটে যে ক'টি উন্নত বীজ আমরা পেয়েছি তারা প্রধানতঃ মোটাজাতের। তবু এগুলির মধ্যে সবরমতী, আই-আর কুড়ি, জগন্নাথ, পঙ্কজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মিহিজাতের ধান। অতিমিহি ধান নিয়ে গবেষণা চলছে নিরন্তর এবং কিছু কিছু সুফলও ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আই-ই-টি ১৯৯১ একটি অতিমিহি ধানের পরীক্ষিত বীজ। আশা করা যায় এ-জাতীয় অন্যান্য বীজ অদূর ভবিষ্যতেই উদ্ভাবিত হবে এবং কৃষি-বিজ্ঞানের প্রসাদে অন্ন ও পরমান্ন দু'য়েরই সংস্থান ঘটবে।

তা না হয় হল। কিন্তু জমির উৎপাদিকা শক্তি

নিয়ে অন্য প্রশ্ন এসে পড়ে। দেখা গেছে, ক্রমাগত রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে অনেক জমি উৎপাদন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। তাই রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে চাষীর মনে সন্দেহ না থাকলেও জমির উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

সার প্রয়োগ একটি সূক্ষ্ম মণ্ডন-কলা। কোন্ জমিতে কোন্ ফসলের জন্য কোন্ সার কখন এবং কতটুকু প্রয়োজন তা ঠিক করতে দীর্ঘ পরীক্ষা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং নিবিড় অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সার জমির খাদ্য। জমির স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য পরিমিত এবং সুষম হওয়া চাই-ই, নইলে জমির স্বাস্থ্যহানি অপরিহার্য। রাসায়নিক সারের ক্রমাগতঃ প্রয়োগে জমিতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং তা উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ত্রুটি দূর করতে গেলে জমিকে প্রতি তিনবছর অন্তর 'চুন-দান' করতে হয়। তাহলেই জমির হাসি হাসি ভাব আবার ফিরে আসে, ফসলে আবার ঝলমল করে। দীর্ঘদিন যদি জমিতে চুণ না পড়ে তাহলে সেটা ভূমি-পরিচর্যায় একটা মারাত্মক ত্রুটি বলেই গণ্য হবে।

আবার রাসায়নিক সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব ও সবুজ সারও ব্যবহার করতে হবে। সাদা কথায়, একরকম সারে জমির অরুচি। জৈব অজৈব দু'য়ের সমন্বয়ই সারের ব্যাপারে সারকথা।

অন্য একটি উপদ্রব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেখা যাচ্ছে, বেশী বেশী সার প্রয়োগে উন্নত জাতের যে-সমস্ত ফসল তৈরী হচ্ছে তাতে রোগ আর কীট-পতঙ্গ যেন ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। তাই বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির সঙ্গে রোগ-পোকার সংখ্যাধিক্যের কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি না সে প্রশ্নও অনেককে আন্দোলিত করেছে।

এ-বিষয়ে নিশ্চিন্তভাবেই বলা যেতে পারে যে, উন্নত কৃষি-পদ্ধতির কোন প্রকরণই রোগ এবং পোকার আবির্ভাবের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়। তবে দেখা গেছে, উচ্চফলনক্ষম বীজ থেকে যে গাছগুলি জন্মায় তাদের রোগ এবং পোকায় আক্রান্ত হবার প্রবণতা অনেক বেশী। তার ফলে ঐ ধান বা গমের ক্ষেতে একবার রোগ শুরু হলে, কিংবা পোকার আক্রমণ ঘটলে, তা কাছাকাছি অন্যান্য ফসলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অবশ্য রোগ-পোকার এই আক্রমণ থেকে ফসলকে বাঁচাবার জন্য বিজ্ঞান চাষীর হাতে ইতিমধ্যেই অনেক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ফলিডলের নাম এখন কে না জানে? টল-মল এই ছন্দিত নামটির মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি। তাছাড়া থিওডেন, এন্ড্রিন্, ডায়াযিন্, হেক্সাথিন্ ইত্যাদি ন-কারান্ত নামগুলি শুধু কীট-পতঙ্গ কেন, মানুষের পক্ষেও কম নত্ববোধক নয়! তবুও দেখা যায়, পোকারাও ধীরে ধীরে তাদের প্রতিরোধ-শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। এক বছর আগে যে ওষুধে তারা মারা পড়ত, এখন আর সে ওষুধে মরছে না। নিক্ষিপ্ত ডি-ডি-টি-র গুঁড়ো অনেক পোকা-মাকড় ট্যালকম্ পাউডারের মত সর্বাঙ্গে মেখে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমরা বাধ্য হয়ে ওষুধের মারণ-শক্তি দিনের পর দিন বাড়িয়ে যাচ্ছি। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। একদিন এমনও হতে পারে যে, মশা মারতে সত্যি সত্যি কামান দাগতে হবে!

তাই সংশয়ী মনে অন্য একটি প্রশ্ন উঁকি মারে। উন্নত চাষের ব্যাপকতা যত বাড়বে, ফসল বাঁচাবার তাগিদে কীটঘ্ন ওষুধের প্রয়োগও ততই বাড়বে। তার ফলে দেশজুড়ে যে বিষ-বৃষ্টি শুরু হবে তাতে জল-বাতাস ইত্যাদি দূষিত হয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলবে কি না। অর্থাৎ ফসলের পক্ষে যা শত্রুঘ্ন, মানুষের পক্ষে তা বিভীষণ হয়ে উঠবে কি না।

বিষাক্ত ওষুধের অসতর্ক ব্যবহার নিশ্চয়ই বিপদ্ ডেকে আনতে পারে। তাই অন্যান্য দেশে কীটঘ্ন ওষুধের প্রয়োগ সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জন-স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আমাদের দেশেও হয়ত একদিন সে-সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে বর্তমানে কৃষি-বিপ্লবের যে স্তরে আমরা রয়েছি, তাতে ওষুধ-পত্রের ব্যবহার নেহাৎই যৎসামান্য। তাই এ-ব্যাপারে অযথা উদ্বেগ আপাততঃ বর্জনীয়।

জিজ্ঞাসার এখানেই শেষ নয়। বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির নববিধান আমাদের চাষীরা ঠিক ঠিক অনুসরণ করার সামর্থ্য রাখেন কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। কৃষি-পণ্ডিতদের অঢেল উপদেশ ত আছেই। কিন্তু তা সঠিক বোঝা এবং জমির প্রকৃতি বুঝে প্রয়োগ করা অনেক কৃষকের পক্ষেই হয়ত সম্ভব নয়। বিশেষতঃ নিরক্ষর এবং নিম্নবিত্ত চাষীদের পক্ষে উন্নতির বোঝা অনেক সময়েই দুর্বহ হয়ে পড়তে পারে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু এতখানি হতাশা-ব্যঞ্জক নয়। যেখানেই উন্নত প্রথায় চাষ শুরু হয়েছে, সেখানেই চাষীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ এবং তীব্র ঔৎসুক্য লক্ষ করা গেছে। এমনকি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় অনেকে নূতন নূতন প্রয়োগ-কৌশলও উদ্ভাবন করেছেন। তাই মনে হয়, সাহায্য এবং পরামর্শ পেলে আমাদের চাষীরা নূতনকে সাদরেই গ্রহণ করবেন। তবুও কৃষকের সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের সব সময় সচেতন থাকা প্রয়োজন। কারণ, সবুজ-বিপ্লবের চরম সাফল্য যন্ত্র-নির্ভর নয়, তা ব্যক্তি-নির্ভর। ব্যক্তিই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, আর বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষের মূল কথাই হল নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ। পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হলে প্রতিটি মাঠই হবে এক-একটি মুক্তাঙ্গন গবেষণাগার, কারণ প্রতিটি মাঠই পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তাই মাঠের যিনি মালিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিজ্ঞান-ভিত্তিক করতে হবে; অর্থাৎ গবেষকের মত তাঁকেও প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। এই দৃষ্টি এবং এই উপলব্ধি যত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের চাষীদের মধ্যে আনতে পারব, কৃষি-বিপ্লবের সবুজ নিশান তত দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে।

তৃতীয় প্রশ্ন

মনোজ গুপ্ত

তখনকার দিনে বাংলা কাগজে প্রকাশিত খবর নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হত গ্রামে আর শহরের অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে, শহরের উঁচু স্তরের লোকরা বাংলা কাগজ ছুঁতেন না। তবুও বাংলা কাগজের একটা খবর আস্তে আস্তে নিচে থেকে ওপর দিকে উঠতে লাগল। কেউ বললে খবরটা উত্তর কলকাতার এক বাজার বিশেষের, যদিও যে কাগজে খবরটা ছিল সেটা ও অঞ্চল থেকে বার হয় না। কেউ বললে অত অবিশ্বাসেরই বা কি আছে? লালমুখো সাহেবদের ম্যাজিক দেখে তো মুখে কথা সরে না; আমাদের দেশের ইন্দ্রজাল কি তার চেয়ে কম যায়? নেহাত যত সব অশিক্ষিত লোকদের হাতে গিয়ে পড়ছে তাই। হয়তো কোন শিক্ষিত লোক ওদের মধ্যে ঢুকে যেটুকু নেবার নিয়ে রীতিমত সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। যে খবরটা নিয়ে এই সব বাক্‌-বিতণ্ডা তা হচ্ছে এই :—

"আমাদের যুক্ত-প্রদেশস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা একটি তাজ্জব ঘটনা আমাদের জানাইয়াছেন; তাহা পাঠক-পাঠিকগণের গোচরীভূত করিতেছি।

"গত ১৫ই অক্টোবর কলিকাতাগামী মেইল ট্রেণ ইলাহাবাদ ইষ্টিশনে আসিয়া পৌঁছিলে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় একজন ইংরাজ বড় মিলিটারী অফিসার উঠেন, ট্রেণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত একজন বঙ্গবাসী সেই কামরায় উঠিতে চাহেন। যাহারা মিলিটারী অফিসারটিকে শুভ-যাত্রা জানাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা আপত্তি করেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকায় ইষ্টিশন মাস্টার তাঁহাকে একটি অন্য প্রথম শ্রেণীর কামরায় স্থান সংগ্রহ করিয়া দিতে রাজী হন কিন্তু ভদ্রলোক মিলিটারী সাহেবের সঙ্গে একই কামরায় যাইবার দৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন করেন। একটা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য যখন প্রায় সকলেই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল তখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি মিলিটারী অফিসারটির বাহু স্পর্শ করিয়া বলেন, "আমি আপনার সঙ্গে এক কামরায় গেলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?" আশ্চর্য্য ঘটনা, উদ্ধত মিলিটারী অফিসার মন্ত্রমুগ্ধের মত দরজা ছাড়িয়া ভদ্রলোককে উঠিতে দেন।

"গাড়ি ইলাহাবাদ ইষ্টিশন ছাড়িবার পরই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি শুইয়া পড়েন ও গভীর নিদ্রাভিভূত হন এবং সাহেব হুইস্কির বোতল লইয়া বসেন। মুঘলসরাই পৌঁছিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি দেখেন সাহেব তখনও হুইস্কি পান করিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বলেন, "আপনার স্ত্রীকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে জানি কিন্তু মদ খেয়ে কি সে কষ্টের লাঘব হবে?" সাহেব রক্তাক্ত চক্ষে তাঁহার দিকে চাহেন কিন্তু কিছু বলেন না। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বলেন, "এখনই, এই মুহূর্ত্তে আপনার স্ত্রীকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, না?" এবার সাহেব বলেন, "থাম।" এই সময় ট্রেন মুঘলসরাই ইষ্টিশনে প্রবেশ করে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি দরজা খুলিয়া কামরা হইতে নামিয়া সাহেবকে বলেন, "আপনার স্ত্রীকে দেখতে চান তো প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে চলে যান।" সাহেব এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করেন তাহার পর প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের দিকে ছুটিয়া যান। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রী ও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

"বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

বিশেষ সংবাদদাতা সন্ধান না পেলেও যাদের পাবার তারা পেয়েছিল বা নিয়েছিল। সে যুগে যে কোন

ইংরেজকে হতবুদ্ধি করে কেউই গায়েব হয়ে যেতে পারত না, এ ক্ষেত্রে তো একজন বড় মিলিটারী অফিসার জড়িত। তাঁর স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপারটা ইংরেজ মহলে চাপা থাকে নি আর কানের সঙ্গে মাথার মত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কথাও এসে যায়। সে যুগের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল অদ্ভুতকর্মা, সাহেবদের ব্যাপারে তো কথাই নেই। লোকটিকে আবিষ্কার করতে তাদের দেরি হল না আর সাহেব মহলে বাহবা পেতে তাঁর সময় লাগল না। দোকানদারী বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় হলেও অলৌকিকের প্রতি মোহ সেকালের ইংরেজের কম ছিল না। লোকটির খ্যাতি সাহেবদের মধ্যে এত দ্রুত এত ছড়িয়ে পড়ল যে ছোটলাটের একটা পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ হল,—উদ্দেশ্য অভিজাত অতিথিদের মধ্যে তাঁর ভেল্কির কিছুটা নমুনা দেওয়া।

সাহেবদের পার্টির নির্দিষ্ট সময় থাকে, এ পার্টিরও অবশ্যই ছিল তবে সবাই জানত যে-সময় পার্টি আরম্ভ হবার কথা তার আগেই উপস্থিত হতে হবে। সবাই এসেছিল, আসে নি কেবল এই লোকটি। অনেক ভারতীয়ের অনুপস্থিতি হয়তো পার্টি চলার সময় উপেক্ষিত হতে পারে কিন্তু এই লোকটির না আসা তাঁর প্রশংসাকারীদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল। তারা যা ভয় করছিল শেষপর্য্যন্ত তাই হল; স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সেই অদ্ভুত আবিষ্কারটি কোথায়?" ঠিক সেই সময় একজন এ ডি সি ছোটলাট সাহেবের কাছে এসে নিচু হয়ে কানে কানে কি বললে। তিনি তাঁর ঘড়ি দেখে একটু হেসে বললেন, "তোমাকে বোকা বানিয়েছে। ঠিক আছে নিয়ে এস।"

গায়ে হালকা গেরুয়া রংএর আলখাল্লা, মাথায় রাজপুতদের ধরণে পাগড়ি পরে যে লোকটি এসে উপস্থিত হল তাকে দেখে এলাহাবাদ-মোঘলসরাই-এর সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলে চেনবার উপায় ছিল না। ছোটলাট বাহাদুরের কাছে তাকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেবার পর বিরক্তি চেপে তিনি বললেন, "আপনার ঘড়িটা বোধহয় আপনার সঙ্গে দুশমনি করেছে।"

"কেন হুজুর? আমার কি দেরি হয়েছে?"

"আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে?"

"আমার সঙ্গে তো ঘড়ি নেই হুজুর। দয়া করে একবার দেখবেন আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?"

বেশ বিরক্ত হয়েই ছোটলাট বাহাদুর তাঁর ঘড়িটা দেখলেন এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারা পালটে গেল। ঘড়িটা কানের কাছে নিয়ে এসে শব্দ শুনলেন, ঘড়ি চলছে। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে?" ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে ছোটলাট বাহাদুরের মত ঘড়িটা কানে দিয়ে পরীক্ষা করলেন চলছে কি না তারপর বললেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঘড়িটা বোধহয় খারাপ হয়েছে। ক্ষমা করুন, আমি পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করছি।" সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, ঘড়ি দেখা, কানে দেওয়া ও পাশের লোককে জিজ্ঞেস করা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল অভ্যাগতরা সকলেই যে যার ঘড়ি দেখে একজন আর-একজনের মুখের দিকে চাইছেন। সকলের ঘড়িতেই কাঁটায় কাঁটায় সাতটা আর ঠিক ঐ সময় পার্টি শুরু হবার কথা ছিল। ছোটলাট বাহাদুর আলখাল্লাপরা লোকটিকে বললেন, "চমৎকার! সম্মোহন বিদ্যেটা আপনার বেশ আয়ত্তাধীন দেখছি।"

লোকটি বললে, "আপনার নিজেকে কি সম্মোহিত বলে মনে হচ্ছে?"

"বিদ্যেটা যাই হ'ক সরকারী কর্মচারীদের শেখাবেন না, তাহলে তারা বেলা চারটেয় এসেও দেখিয়ে দেবে ঠিক সময় এসেছে?" সঙ্গে সঙ্গে লাটপ্রাসাদের সমস্ত আলোগুলো নিভে গেল। ছোটলাট বাহাদুর আলখাল্লাপরা লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "আপনাকে অনুরোধ করছি আমার অতিথিদের অস্বস্তির কারণ ঘটাবেন না।" সমস্ত আলো আবার জ্বলে উঠল। এরপর সেই আলখাল্লাপরা লোকটি যে পার্টির মধ্যমণি হয়ে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য।

এ খবরটা শুধু বাংলা কাগজ নয় তখনকার দিনের সাহেবদের সেরা দুখানা দৈনিকেও বেরিয়েছিল, কাজেই বেশ কিছুদিন ধরে সব স্তরের লোকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। খবরটার সঙ্গে সব কাগজেই একটা লেজুড় জুড়ে দেওয়া হয়েছিল—লেজুড়টি এই রকম :—

এই অসাধারণ লোকটি সবিনয়ে নিবেদন করেছেন তিনি যোগী নয়, মহাপুরুষ নয়, সন্ন্যাসী নয়, ঐন্দ্রজালিক তো নয়ই; ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতের বিরাট অধ্যাত্ম-শক্তির কণা মাত্রের ভগ্নাংশের সন্ধান পাবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। এ শক্তির অপব্যয় করা গুরুর নিষেধ তাই তিনি তাঁর পরিচয় গোপন রাখবেন। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় ব্যবহারিক জীবনে তিনি একজন জ্যোতিষী।

এরপর কলকাতার অলিগলিতে যত জ্যোতিষী আছে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন লোকটির সন্ধান চলতে লাগল।

ইংরেজী কাগজের খবরটা রূপেনেরো চোখেও পড়েছে কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; এ নিয়ে মাথা-ঘামাবার ইচ্ছে বা অবকাশ কোনটাই তার ছিল না।

রূপেন সবে ডাক্তারি পাশ করেছে। রোজগার করবার প্রয়োজন যেমন প্রচণ্ড চেষ্টাও তেমনি আপ্রাণ, তবু বিশেষ কিছু হচ্ছে না। হবেই বা কি করে? শুধু সদ্য পাস করেছে বলে নয়। বাপ বা শ্বশুরের ভাল প্রাকটিশ থাকলে অনেকে ডাক্তারি পাস করার পরই পয়সার মুখ দেখতে পায়। রূপেনের সে রকম কোন পৃষ্ঠবল তো ছিলই না তার উপর দেখতে একেবারে ছেলেমানুষ। কাজেই ফি দিয়ে বড় একটা কেউ ডাকে না। অবশ্য তাকে খাটতে হয় প্রচুর, কারণ আত্মীয়-স্বজন, আত্মীয়স্বজনের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দাদাদের বন্ধু-বান্ধব বিনা দ্বিধায় এবং অনেক সময় বিনা কারণে ডেকে পাঠান, কারণ, জানেন ফি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা যে তাকে ডেকে কৃতার্থ করছেন অনেকে এটাও বেশ অমায়িকভাবে বুঝিয়ে দেন।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে এই রকম একটা বেগার খেটে রূপেন ফিরছিল, অবশ্য হেঁটে; এইটুকু পথের জন্যে ট্রাম ভাড়া খরচ করার কথা সে ভাবতেও পারে না। বাড়ি-পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি এল। বাধ্য হয়ে সে একটা গাড়ি বারাণ্ডার তলায় দাঁড়াল। যেতে আসতে বাড়িটা সে অনেকবার দেখেছে। চোখে পড়েছে একটা সাইনবোর্ড, এক জ্যোতিষীর। অন্য সব জ্যোতিষীর মত তিনিও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলতে পারেন; ঠিকুজি, কোষ্ঠী বিচার করেন, নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার করতে পারেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্নকারী তিনটি প্রশ্ন লিখে এনে নিজের পকেটে রাখবে; জ্যোতিষী প্রশ্ন না দেখে, এমন কি প্রশ্ন লেখা কাগজখানা স্পর্শ মাত্র না করে প্রশ্ন এবং তার জবাব বলে দেবেন।

রূপেন জ্যোতিষে অবিশ্বাস না করলেও জ্যোতিষী-কে বিশ্বাস করে না। এই বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় বহুবার দেখেছে সামনের দিক্‌কায় ঘরটায় অনেক লোক, তার মধ্যে শুধু অ-বাঙ্গালী নয়, সাহেবও মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে, সবাই তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছে, কিন্তু তার কোনদিন ভেতরে ঢোকবার ইচ্ছে হয় নি। আজ সে দেখলে ঘরটা প্রায় খালি। বাদলার জন্যে বোধহয় ভাগ্যদেবী কিছুটা রেহাই পেয়েছেন। সমস্ত পরিস্থিতিটা মিলিয়ে রূপেনের ওপর একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। সে ঘরটার ভেতরে ঢুকল। ডেস্কের সামনে বসে যে লোকটি এতক্ষণ রাস্তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়েছিল, রূপেনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে সামনের খোলা খাতায় গভীর মনোনিবেশ করলে। একটু অপেক্ষা করে রূপেন বললে, "জ্যোতিষী মশায়ের সঙ্গে এখন দেখা হবে?"

প্রায় ঘুম থেকে ওঠার মত লোকটি বললে, "প্রয়োজন?"

"তিনটি প্রশ্ন আছে।"

"লিখে এনেছেন?"

"না।"

"বেশ লিখে ফেলুন" বলে লোকটি কাগজ-কলম এগিয়ে দিলে। সেগুলো না নিয়ে রূপেন পকেট বই বার করে তা থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে কি লিখে পকেটে রাখলে।

লোকটি হাত পাতলে। রূপেন বললে, "শুনেছি প্রশ্ন আর উত্তর দুইই জ্যোতিষী মশাই বলে দেন।"

লোকটি হেসে বললে, "অবশ্যই দেন। আমি কাগজখানা চাইনি। জ্যোতিষী মশায়ের সঙ্গে দেখা করবার আগে টাকা দুটো এখানে জমা দিতে হয়।"

"প্রশ্ন আর উত্তর ঠিক ঠিক বলতে পারলে তবেই তো টাকা দেওয়ার কথা ওঠে।"

"ওঁর ভুল হয় না।"

"সেটা প্রমাণ হলেই টাকা দেবো।"

"এখানকার নিয়ম তা নয়।"

"তাই বুঝি? আচ্ছা, নমস্কার।"

চলে যাবার জন্যে রূপেন পা বাড়িয়েছিল কিন্তু তার যাওয়া হল না। পেছন থেকে কে বললে, "শুনুন।" রূপেন ফিরে দেখলে একটি মধ্যবয়সী লোক, সুন্দর চেহারা, সৌখীন বাঙ্গালী বাবুর পোশাক। লোকটি বললে, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন।" রূপেন তার সঙ্গে ভেতরের ঘরে গেল। ঘরটি চমৎকার করে সাজান। রূপেনকে বসতে বলে লোকটি নিজে বসল। কিছুক্ষণ রূপেনের দিকে চেয়ে থেকে লোকটি জিজ্ঞেস করল, "পড়েন?"

রূপেনের প্রথমে এ লোকটিকে জ্যোতিষী বলে মনে হয় নি। সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেল। কথার মধ্যে দিয়ে কিছু প্রকাশ হতে দেবে না ঠিক করে সে ছোট্ট জবাব দিলে, "না।"

"চাকরি করেন?"

"না।"

"বাড়িতে কে কে আছেন?"

"বড় সংসার।"

একটু হেসে জ্যোতিষী বললে, "আপনার মত লোক এখানে বেশী আসে না তাই একটু আলাপ করতে চাইছিলাম। কথার মধ্যে আপনার প্রশ্নের হদিস খুঁজছিলাম না।"

এইবার রূপেনের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকটির সম্বন্ধে সে যা ধারণা করে রেখেছিল, বাস্তবে তার সঙ্গে একটুও মিল নেই। লোকটার যদি সত্যিই কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকে আর তাঁর সাহায্যে ওর প্রশ্ন আর উত্তর বলে দেয়? তাহলে রূপেন বিপদে পড়বে কারণ, তার পকেটে পুরো দু'টো টাকা নেই। রূপেনের চেহারা দেখে তার মনের জোরের ধারণা করা যায় না। সে মন থেকে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললে।

জ্যোতিষী আবার কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে হাসিমুখে বললে, "আপনার ঐ চওড়া কপালটার ওপর বড় বড় অক্ষরে অনেক কিছু লেখা: বহু ঘাত প্রতিঘাত........."

রূপেনের কোন ভাবান্তর হল না। সে জিজ্ঞেস করলে, "এটা কি আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব বলে ধরে নেব?"

জ্যোতিষীর কপালে চকিতের জন্যে একটা রেখা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলে, "খুশী হলেন না?"

"না।"

"কারণ?"

"কারণ আমার প্রশ্নের এ জবাব হতে পারে না।"

"বেশ, আমি পারলাম না। এবার আপনার প্রশ্নটা বলতে আপত্তি আছে?"

"প্রথম প্রশ্ন আমার কত বয়সে আমার প্রথম দাঁত ওঠে।"

একটু চুপ করে থেকে জ্যোতিষী বললে, "প্রশ্নে মৌলিকতা আছে স্বীকার করতেই হবে কিন্তু প্রথম দাঁত ওঠার কথা তো আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়; জবাব দিলে তা ঠিক হল হল কি না বুঝতেন কি করে? যাক্‌গে, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?"

"আমার কত বছর বয়েসে আমার প্রথম দাঁত পড়বে।"

হো হো করে হেসে উঠে জ্যোতিষী বললে, "এ যে একেবারে দাঁত ভাঙ্গা প্রশ্ন। তা এর জবাব ঠিক হল কি না জানাবার জন্যে তো বহু দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

"আমার প্রশ্নগুলো জানতে পারলেই খুশী হতাম।"

"অর্থাৎ আপনি আমায় পরীক্ষা করতে এসেছিলেন?"

রূপেন জবাব দিলে না জ্যোতিষী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনার তৃতীয় প্রশ্নটা বলতে আপত্তি আছে?"

"অপত্তির কথা নয় তবে তার আর প্রয়োজন আছে কি?"

"আপনার দিক্ থেকে থাকবার কথা নয় কিন্তু আমার জানবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত কিন্তু প্রশ্ন থেকে প্রশ্নকর্ত্তার একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

রূপেনের ইচ্ছে ছিল না তৃতীয় প্রশ্নটা কি তা বলে কিন্তু তার মনে হল, দু-দুবার ঘা খেয়েও লোকটার দম্ভ কমে নি তাই তাকে চরম আঘাত দেবার লোভ সামলাতে পারলে না, বললে, "আমার তিনটি প্রশ্নই এই কাগজটায় লেখা আছে।" কাগজখানা জ্যোতিষীর হাতে দিতে সে সেটা পড়ে কিছুক্ষণ গুম খেয়ে বসে রইল। পরিস্থিতিটা খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। রূপেন ওঠবার চেষ্টা করতে জ্যোতিষী তাকে বসতে ইশারা করে একটা আলমারি খুলে একটা কাগজের বাণ্ডিল বার করে তা থেকে একখানা কাগজ তার হাতে দিলে। রূপেন দেখলে সেটা একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে জ্যোতিষী। সেটা দেখে সে জ্যোতিষীকে ফেরত দিতে গেল, জ্যোতিষী বললে, "উল্টে দেখুন।" রূপেন দেখলে হ্যাণ্ডনোটের পেছনে উশুলের হিসেব ও সই রয়েছে। এরপর জ্যোতিষী সমস্ত বাণ্ডিলটা রূপেনের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে, "ভাল করে দেখুন। এর প্রত্যেকটা হ্যাণ্ডনোট আমি কেটেছি, প্রত্যেকটায় পুরোপুরি উশুল দিয়েছি।"

"এ সব আমায় দেখিয়ে লাভ কি?"

"এ হ্যাণ্ডনোটগুলো কিসের জানেন? যে সব ক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যৎবাণী ফলে নি তার খেসারত দেবার কোন চুক্তি ছিল না, স্বেচ্ছায় দিয়েছি। সব টাকা একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয় না তাই হ্যাণ্ডনোট দিয়েছি।"

রূপেন হ্যাণ্ডনোটগুলো জ্যোতিষীর দিকে সরিয়ে দিলে সে কিন্তু সেগুলোতে হাত না দিয়ে আবার উঠে আলমারি থেকে একটা খাম বার করে রূপেনের হাতে দিয়ে বললে, "এটা বড় একটা কাউকে দেখাই না।"

"আমায়ই বা দেখাচ্ছেন কেন?"

"দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আপনাকে দেখান উচিত। তবে একটা অনুরোধ, যা দেখবেন তার কথা কাউকে বলবেন না। অনেকের মতে ওটার দাম অনেক।"

রূপেনের ঔৎসুক্য হল, সে খাম থেকে চিঠিটা বার করে পড়লে। চিঠিটা ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির। তিনি লিখেছেন, "ছোটলাট মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি যে.........তারিখের পার্টিতে আপনার উপস্থিতি তাঁকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে এবং আপনার অলৌকিক কার্য্যকলাপে তিনি অভিভূত হইয়াছেন।" এরকম একটা দলিল, যার প্রচারমূল্য প্রচুর, সেটা জ্যোতিষী কেন গোপন রাখতে চায় রূপেন তা বুঝতে পারলে না। এই জ্যোতিষীই যে খবরের কাগজে বর্ণিত সেই অসাধারণ লোক তা বুঝতে পেরে তার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। সে ভদ্রতাসূচক নমস্কার করে উঠে পড়ল।

তার সঙ্গে দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে জ্যোতিষী বললে, "অন্য কোন যুগে মানুষ সত্যদ্রষ্টা হতে পারত কি না জানি না; এযুগে কোন মানুষই সব সময় সব কিছু দেখতে পায় না, তবে এ যুগেও কোন কোন লোক সময় সময় অনেক কিছু দেখতে পায়। নিজেকে এই

[illegible]

ভুল হয় আর ভুল হলেই তার ফল ভোগ করতে হয়।"

এ অভিজ্ঞতার কথা রূপেন তার একমাত্র অন্তরঙ্গ অসীম ছাড়া কাউকে বলে নি তবে ছোটলাটের চিঠির কথা তাকেও জানায় নি। অসীম পুরোপুরি যুক্তি-বাদী। সমস্ত ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে সে বলেছিল, "ওটা একটা বুজরুক। তুই ঐ হ্যাণ্ডনোট-গুলোর কথা বিশ্বাস করেছিস, নাকি?"

রূপেন বলেছিল, "ওগুলো আমায় দেখাবার কারণ কি বুঝলাম না।"

"ও যে কতবড় সাধুপুরুষ তা তোকে বোঝাবার জন্যে দেখিয়েছে। ওর সবগুলো ভুয়ো হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।"

অসীমের কথাগুলো অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু রূপেন ঠিক মেনে নিতেও পারছিল না।

এরপর রূপেনের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে গেল। অনেক আশা নিয়ে তার অভিভাবকরা তাকে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন; তার পসার হল না। হবে কি করে? মোটা ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবি পরে প্র্যাকটিস শুরু করলে, রুগীর বাড়ির অবস্থা দেখে কি না নিয়ে সে টাকা ওষুধপত্র কেনবার জন্যে দিয়ে এলে ডাক্তারি করে পসার হয় না। শেষ পর্য্যন্ত একটা ছোট স্টেটে সামান্য মাইনের চাকরি নিয়ে রূপেন শহর ছেড়ে চলে গেল। সেখানে অবশ্য প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি ছিল, কিন্তু থাকলে কি হবে! যেখানে বেশীর ভাগ লোকের মরবার সময়ও ডাক্তার দেখাবার ক্ষমতা হয়-না সেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিশের অনুমতি থাকা বা না থাকায় কোন তারতম্য হওয়া সম্ভব নয়।

শহরে বড় হয়ে উঠলেও মনের দিক্ থেকে রূপেন কোনদিন শহুরে হতে পারে নি তাই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার খুব বেশী সময় লাগল না। সে যে এক সময় মেডিক্যাল কলেজের সেরা ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিল সে কথা বড় একটা মনেও পড়ে না। তবু মাঝে মাঝে মনের ধর্মে মন অশান্ত হয়ে উঠতে চায়, বিশেষ যখন তার অশিক্ষিত অন্নদাতা সেই অধিকারে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেন। এ কথা অসীম ছাড়া কেউ জানে না। সে-ই যোগাযোগ রেখেছে, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের খবরাখবর দেয়। অসীমের চিঠি থেকেই সে জানতে পারে কে কি করছে। এই রকম একটা চিঠিতে অসীম এক চটকদার, বারকতক ফেল-করা বন্ধুর বিরাট সাফল্যের কথা জানিয়ে লিখেছিল, "কলেজে ও কোথায় ছিল আর তুই কোথায় ছিলি! আর আজ ও কোথায় আর তুই কোথায়! তুই কি করে মানিয়ে নিস ভেবে পাই না।" জবাবে রূপেন লিখেছিল, "খুব একটা অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে খুদে জমিদার-নন্দনটিকে বরদাস্ত করা শক্ত হয়ে ওঠে. বিশেষ যখন অন্ন দেবার অধিকারে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর একটা জ্ঞানের নমুনা শুনবি? পেটের অসুখ অবহেলা করলে হয় টাইফয়েড আর ম্যালেরিয়া অবহেলা করলে হয় থাইসিস্।"

এই মাথা মোটা জমিদার-পুঙ্গবের অনেক খেয়ালের মধ্যে একটা ছিল রাজা-মহারাজাদের অনুকরণে গুণীদের বাড়িতে নিয়ে আসা। তবে গুণের বা গুণ প্রকাশের ক্ষমতার কিছু অবশিষ্ট আছে এমন কেউ এই গণ্ডগ্রামে আসত না; যারা আসত তারা অতীতের কঙ্কাল আর এই সব কঙ্কালে প্রাণের স্পন্দন বজায় রাখতে রূপেনের প্রাণান্ত হত। একবার কোথা থেকে এক খান সাহেবকে আমদানি করলেন। এক সময় তিনি নাকি কোন মহারাজার সভার তানসেন ছিলেন। রূপেন যখন তাঁর দর্শন পায় তখন তিনি জড় পদার্থ বিশেষ. কিন্তু তার অন্নদাতার চোখে বিরাট প্রতিভার প্রতিভূ, কাজেই তাঁর জন্যে রাজোচিত ব্যবস্থা আর তাঁকে খাড়া করে তোলবার দায় রূপেনের।

রাজারাজড়ার মত জমিদারটির একটি অতিথিশালাও ছিল তবে সারা দুনিয়ায় সবাই যাকে ত্যাগ করেছে এ রকম লোক ছাড়া কেউ সেখানে আসত না। এ কথা

জানত বলেই কালেভদ্রে যা দুএকজন আসত রূপেন প্রাণ দিয়ে তাদের শুধু চিকিৎসাই করত, সেবাও করত। তার জীবনের মরুভূমিতে এইটাই ছিল একমাত্র মরূদ্যান।

অতিথিশালায় লোক এসেছে, আর সে অসুস্থ শুনেই রূপেন সেখানে গেল। মাদুরের ওপর ছেঁড়া কম্বল ঢাকা যে লোকটি শুয়ে তার মুখের দিকে না তাকালে মনে হয় একটি ছোট ছেলে; মুখে বিশ্বের ক্লান্তি। রূপেন নাড়ি দেখলে, খুঁজে পাওয়া শক্ত। সে একটা ইনজেকশন দিয়ে সামনা-সামনি একটা খাটিয়ায় আশ্রয় নিলে। সমস্ত রাত প্রায় জেগেই কাটল- মাঝে মাঝে রূপেনের তন্দ্রা এসেছে আবার কেটে গিয়েছে। সে উঠে রুগীকে পরীক্ষা করেছে, দরকার মত ইনজেকশন্ দিয়েছে। ভোরের দিকে মনে হল রুগীর নিশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক। রূপেন ঘুমিয়ে পড়ল।

রূপেনের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ রোদ উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি রুগীর কাছে এল। রুগী জেগে আছে, অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে। রূপেন তাকে পরীক্ষা করে খুশী হল; বললে, "এখন বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। যা ব্যবস্থা করবার আমি করে দেব, কিছু ভাববেন না।"

রুগী তার শতচ্ছিন্ন জামার পকেটে কি খুঁজতে লাগল। রূপেন জিজ্ঞেস করল, "কি খুঁজছেন?" ততক্ষণে সে যা খুঁজছিল তা পেয়েছে। ময়লা, তেলচিটে একখানা খাম থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে কি বার করতে গেল। একটা টুকরো কাগজ পড়ে গেল। রূপেন সেটা তুলে তার হাতে দিতে গেল। সে ঘড়ঘড়ে গলায় বললে, "পড়ুন।" রূপেন ভাবলে কোন আবেদন-নিবেদন বা কোন বড়লোকের দেওয়া পরিচয়-পত্র লোকটি দেখাতে চায় যাতে কিছু ভাল ব্যবস্থা হয়। তাই সে বললে, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন, তারপর আপনার কাগজপত্র দেখা যাবে।" কাগজখানা সে বিছানার ওপর রাখলে।

"আবার ভাল হয়ে উঠব? এখনও কি ভোগ অবসান হয়নি?"

"আপনি বয়সে আমার চেয়ে বড়, আপনাকে বলা উচিত নয় তবু বলছি, মৃত্যু কামনা করা কি ঠিক?"

"প্রেতের কি মৃত্যু হয়?"

লোকটি কেন এ কথা বললে রূপেনের তা বোঝবার কথা নয়। তার মনে হল লোকটি জীবনে অনেক ঘা খেয়েছে, এটা তারই অভিব্যক্তি। তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবার জন্যে রূপেন তার ডান হাতটা লোকটির কপালের ওপর রাখলে। লোকটি রূপেনের হাতটা কিছুক্ষণ চেপে ধরে থেকে তারপর বললে, "আপনাকে অনুরোধ করছি কাগজটায় কি লেখা আছে আপনি দেখুন।"

লোকটিকে খুশী করবার জন্যে রূপেন কাগজখানা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুললে। কাগজখানায় লেখা ছিল :—

১। আমার কত বয়সে আমার প্রথম দাঁত ওঠে।

২। আমার কত বছর বয়সে আমার প্রথম দাঁত পড়বে।

৩। যারা লোক ঠকিয়ে খায় তাদের পরিণাম কি?

অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হয়ে রূপেন জিজ্ঞেস করলে, "এ কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?"

লোকটি বললে, "আপনি আমায় চিনতে পারবেন না জানতাম, চেনা সম্ভবও নয়। একদিন আপনার তিনটি প্রশ্নের একটিরও জবাব দিতে পারিনি। আপনার তৃতীয় প্রশ্নটির জবাব আজ পেলেন কি?"

শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে

বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

যা-কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম। কিন্তু এই পরিণামশীল নাম ও রূপের জগতের সবকিছুতেই তিনি ব্যাপ্ত হয়ে থাকলে বিশ্বকে ছাড়িয়েও তিনি আছেন। তাঁর এই বিশ্বাতীত Supracosmic Realityকে স্বীকার না করলে সমগ্র সত্যকে স্বীকার করা হয় না। সত্যকে তার সামগ্রিকরূপে গ্রহণ না করার জন্য আমরা ব্যক্তিসত্তার মহিমাকেও খর্ব করে দেখি বিশ্বের মহিমার অনুপাতে। কিন্তু এই বিশ্বনাট্যে আমাদের ব্যক্তি-সত্তার মূল্যের কি কোন পরিমাণ আছে? তার বিপুল গুরুত্বই কি এই বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা নয়? বিশ্বরচনার শুরুতে ত জড়েরই রাজত্ব। সমস্ত সত্যের, সমস্ত শক্তির, এই 'নিখিল-ভুবনে'র সমস্ত অস্তিত্বের উৎস এবং ভিত্তি ত সেই সচ্চিদানন্দ। তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন আমার মধ্য দিয়ে নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করবার জন্য। "আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই ত আমি এসেছি এই ভবে।" শুধু আমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই নয়, এই বিশ্বের মধ্যেও সেই পরম সত্তার প্রকাশ, তাঁরই আনন্দঘন অভিব্যক্তি যিনি বিশ্বকে ছাড়িয়ে আছেন, যিনি Transcendental Reality, বিশ্বাতীত সেই সচ্চিদানন্দ যেখানে নিয়ে নেমে এসে শুরু করলেন লীলাময়ের ভূমিকায় তাঁর লীলা, সেখানে লীলায়নের সেই আদিপর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি জড়ের একাধিপত্য। সেখানে জড়ের মধ্যে সচ্চিদানন্দের দিব্য চিচ্ছক্তি অনুস্যূত, কিন্তু অজ্ঞানের ঘন তমসায় সেই চৈতন্য আবৃত। কিন্তু জড়ের মধ্যে অনন্ত চিচ্ছক্তি প্রচ্ছন্ন থাকলেও সেই শক্তি অনস্বীকার্য্য সত্য এবং তার প্রকাশ অনিবার্য্য;—তাকে রুখবে কোন্ সমুদ্র-পর্ব্বত?

সুতরাং জড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল যে চৈতন্য দুর্জ্জয় বিশ্ব-নিয়মের বশেই সেই অব্যক্ত অসীম চৈতন্য ক্রমবিকাশের পথে প্রাণের মধ্যে একদা নিজেকে ব্যক্ত করল। চিচ্ছক্তির এই জয়যাত্রা কি প্রাণের স্তরে এসেই থেমে গেল? জড়ের মধ্যে নিহিত অসীম চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ত উদ্ভিদের প্রাণিক পর্য্যায়ে এসে থামতে পারে না। চিচ্ছক্তির দুর্জ্জয় অভিযান চলল ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বপানে, চেতনার শিখর থেকে নব নব চেতনার শিখরে। গাছপালার স্তর থেকে চৈতন্য নিজেকে ক্রমশঃ অপাবৃত করতে করতে একদা পৌঁছাল জানোয়ারের স্তরে। সেখান থেকে আধা-জানোয়ার, দেহসর্ব্বস্ব মানুষের সেই আরণ্যকের পর্য্যায়ে। মানুষ তখন half animal physical man। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে ভয়ার্ত্ত আদিম মানুষের সেই রাত্রিগুলি! অদূরে বাঘ ডাকছে। আগুনের ব্যবহার সে জানে না! কোথায় মানুষ ছিল, কোথায় সে আজ এসেছে! সচ্চিদানন্দের দুর্ব্বার চিচ্ছক্তি অবশেষে মননশীল মানুষের স্তরে এসে মনের মধ্যে নিজেকে আরও ব্যক্ত করল। আর জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন—চিচ্ছক্তির এই ক্রমবিকাশ ত অনিবার্য্যই ছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—This was inevitable because that which is involved must evolve.............. শক্তি যত প্রচ্ছন্নই থাক, অন্তর্নিহিত স্বভাবের বশে নিজেকে সে একদা লীলার মধ্যে অবারিত করবেই করবে।

সচ্চিদানন্দের চিচ্ছক্তির ক্রমবিকাশের একটি সুপরিকল্পিত স্তর-বিন্যাস রয়েছে। জড় পদার্থসমূহে অনুস্যূত (involved) সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য পর্ব্বে পর্ব্বে আপন সত্তাকে ক্রমবিকাশের পথে ব্যক্ত করতে করতে চলেছে। জড় (Matter) থেকে প্রাণ (Life), প্রাণ থেকে মন

Mind), মন থেকে অতিমানস (Super-mind)। মানুষ ত আমরা একদিনে হইনি। যুগ-যুগান্তের পরে কত রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এসে তবে আমরা দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েছি।

"কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি এই ধূলির 'পরে ধূলা-মাটির মানুষ।"
—রবীন্দ্রনাথ
(বলাকা)]

সুতরাং আমাদের ব্যক্তিসত্তা বিশ্বের "The most remarkable and significant fact"। শ্রীঅরবিন্দের এই যে আমাদের ব্যক্তিসত্তার উপরে এতটা গুরুত্ব আরোপ—এই গুরুত্ব কি রবীন্দ্রনাথও দেন নি আমাদের প্রত্যেকেরই অনুপম ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ মহিমাকে? আমার এই ব্যক্তিসত্তায় যিনি তাঁর বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন তাঁর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে অপরিমেয়। আমাকে বাদ দিয়ে, আমাকে ভুলে গিয়ে সেই অসীম বিশ্বাতীত যদি তাঁর বিশ্বলীলা নিয়ে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেন তবে তাঁর লীলার কোন সার্থকতা থাকত না। রবীন্দ্রনাথের সেই দুটো লাইনের কথা স্বতঃই এই প্রসঙ্গে মনে আসে :

"ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।"

ব্যক্তিসত্তার একটা অনবদ্য অপরূপ মহিমাকে কবি নানা কবিতায় কত বিচিত্র ভঙ্গীতেই না প্রকাশ করেছেন। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটা উদ্ধৃত করি :

"আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল।
নইলে তোমার সূর্য্য-তারা সকলই নিষ্ফল।"
অথবা
"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব-ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহো আপনার গান।"

এই সুরের অনুরণন কবির আরও অনেক কবিতায় শুনতে পাওয়া যাবে।

মার্কিণ কবি—গণতন্ত্রের কবি—ওয়াল্ট হুইটম্যান্-এর (Walt Whitman) অমর কাব্যগ্রন্থ Leaves of Grass-এর কবিতার পর কবিতাতেও এই ব্যক্তিসত্তারই জয়ধ্বনি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"It is a fact that the cosmic Being expresses itself through the individual being, but also it is a truth that the Transcendental Reality expresses itself through both the individual existence and the Cosmos; the soul is an eternal portion of the Supreme and not a fraction of Nature."

"একথা সত্য যে, বিশ্বসত্তা ব্যক্তিসত্তার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করেন নিজেকে, এও সত্য যে, দেশ-কালের অতীত যিনি জগৎকে অতিক্রম করে আছেন, তিনি ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্ব—উভয়েরই ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন; আত্মা সেই পরম সত্তারই অবিনাশী অংশ। তাকে প্রকৃতির একটা ভগ্নাংশ বলা ভুল।"

জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ক্রমবিকাশের পথে অন্তর্নিহিত সেই সচ্চিদানন্দের চিচ্ছক্তিকে, অসীম চৈতন্যকে ব্যক্ত করতে করতে চলেছে। "All is contained in the in sconscient or the subconscient, but in potentiality..." অসীম চৈতন্য তো প্রচ্ছন্ন রয়েছে নিশ্চেতনায় অথবা আমারই মধ্যে অবচেতনার কোন্ অতলস্পর্শী গুহায়। সেই গুহার নেপথ্য থেকে জড়ের আবরণে প্রচ্ছন্ন অনন্ত চৈতন্যকে মুক্ত করে ক্রমবিকাশের পথে তাকে বিকশিত করে তোলার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

"It is only by a change of outer self, a constant progression of the nature, a growth in the spirit that we can justify our existence."

"আমাদের বাহ্যসত্তার পরিবর্ত্তন, আমাদের স্বভাবের একটা নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি, আমাদের

অন্তর্নিহিত সত্তার বা আত্মার একটা উত্তরোত্তর বিকাশ—শুধু এর দ্বারাই আমরা আমাদের জীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে পারি।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"All the secret of the circumstances of re-birth centres around the one capital need of the soul, the need of growth, the need of experience ; that governs the line of its evolution and all the rest is accessory."

"জন্মান্তরের ব্যাপারের সমস্ত রহস্যের কেন্দ্র আত্মার একটিমাত্র প্রয়োজনকে ঘিরে এবং সেই চূড়ান্ত প্রয়োজন তার বিকাশের প্রয়োজন, তার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন; আত্মার ক্রমবিকাশের জন্য এই অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন। বাকী যা কিছু সবই এই আত্মপ্রকাশের পথকে সাহায্য করে মাত্র।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"It is for experience, for growth of the individual being that the soul enters into rebirth..."

"আত্মা যে জন্মান্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, সে ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উদ্দেশ্যে।"

আনন্দ বল, শোক বল, লজ্জা বল, বেদনা বল, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য-ভুল-ভ্রান্তি সবই এই অভিজ্ঞতারই অঙ্গ। তারা সবই আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করতে পারে। এমন কি আত্মা নিজের বিকাশের প্রয়োজনের তাগিদে স্বেচ্ছায় দুঃখ-ব্যথা-দারিদ্র্যের কঠিন পথকে বরণ করে নিতেও পারে।

এই যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য—মানুষের আত্ম-প্রকাশের পথকে এই অভিজ্ঞতাগুলি নিঃসন্দেহে প্রশস্ত করে। মারাত্মক মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তির খোঁচায় আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন নবতর চৈতন্যের আলোয় আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি, মানুষের অহংকার কত মিথ্যা, মহামায়া "ভ্রাময়ন্ সর্ব-ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" দৈবী মায়ার সাংঘাতিক প্রভাবের কাছে মানবিক অহমিকার মূল্য কতই না অকিঞ্চিৎকর। এই বোধোদয় আমাদের সকল অহঙ্কারকে চোখের জলে ডুবিয়ে দেয় এবং আমাদের অশ্রুসিক্ত কণ্ঠ থেকে স্বতঃই তখন উৎসারিত হয়: নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ। "আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্ম-দলে।" প্রভু, নিজের মানবিক সংকল্পের দৌড় যে কত দূর তা ত জেনেছি। এখন "দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।" জীবনের অভিযানের কাছাকাছি গিয়ে মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত করুণাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেই হয়। ভগবানের বাণীও তাই:

"ত্তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।"
(গীতা)

দুঃখ-ব্যথার, আনন্দ-শোকের, নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের লজ্জা-বেদনার, ভুল-ভ্রান্তির বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে যে ঐশ্বর্য্য দান করে সেই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত নূতন ব্যক্তিত্বকে আমরা জন্মান্তরে বহন করে নিয়ে যাই। আত্মাকে আমরা মনে করি একটা সীমিত ব্যক্তিসত্তা যা জন্মে জন্মে অপরিবর্তিত থেকে যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা পূর্বজন্মে যা ছিলাম পরজন্মেও যদি তাই থেকে যাই তবে ত জন্মান্তরের কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যই থাকত না। একই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পুনরাবৃত্তি চলত মহাকালের দৌড় যে পর্য্যন্ত না ফুরিয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ পুনঃ পুনঃ বলেছেন, 'জন্ স্মিথ' যদি অনন্ত কাল ধরে 'জন্ স্মিথ'ই থেকে যায় তবে ত—

"Our life and rebirth would be always the same recurring decimal ; it would be not an evolution but the meaningless continuity of an eternal repetition."

"আমাদের জীবন এবং জন্মান্তর হতো সর্বদা একই পৌনঃপুনিক দশমিক; জীবন ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যেত না; জন্মান্তর হতো অনন্ত কাল ধরে একটা চির-প্রবহমান পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।"

বর্তমান ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা আসক্তির বশেই এই

পুনরাবৃত্তি আমরা দাবী করি। জন্ স্মিথ চিরদিনই জন্ স্মিথই থেকে যেতে চায়। কিন্তু এ দাবী তৃপ্ত হলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হত, কোন সার্থকতায় পৌঁছাত না। আমাদের বহিঃসত্তার এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারাই শুধু আমাদের অস্তিত্বকে আমরা সার্থক করতে পারি।

আমাদের আর একটা বদ্ধমূল সংস্কারকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ মূল্য দেন নি। পূর্ব্বজন্মের অনুষ্ঠিত পাপ বা পুণ্যের ফলে আমরা পরজন্মে শাস্তি বা পুরস্কার স্বরূপ দুঃখ-সুখ ভোগ করি—এই সংস্কারকে। কর্ম্মবাদকে শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেন নি। Each being reaps what he sows ; কর্ম্মে মানুষের অধিকার আছে এবং প্রধানতঃ কর্ম্মই আমাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলে—এ ত প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য একটা নিয়ম। মানব-ইতিহাসের পাতা খুললেই চোখে পড়বে একটা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যখনই কোন গর্ব্বোদ্ধত শক্তি উৎপীড়িত জনসাধারণের সমস্ত প্রতিবাদ ও বাধাকে পদদলিত করে নিজের ক্ষমতাপ্রিয়তাকে চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে গণমানসে জমে উঠেছে একটা প্রবল অসন্তোষ এবং ঘৃণা। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরাত্মা ভিতরে ভিতরে হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ; অত্যাচারী যাদের পদদলিত করেছে তারা অবশেষে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে; বিধাতার রোষ নেমে এসেছে 'গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়'। প্রবলের উদ্ধত অন্যায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

এই কর্ম্মবাদের একটা দুর্ব্বার আবেদন আছে আমাদের বুদ্ধির কাছে। সত্যের এবং ন্যায়ের মানসিক আদর্শগুলির সঙ্গেও এই কর্ম্মবাদের বেশ একটা সঙ্গতি আছে। সুতরাং 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'—এই Law of Karmaকে অনুসরণ করে যখন সবকিছুই একটা অলঙ্ঘনীয় গাণিতিক পদ্ধতিতে ঘটে চলেছে তখন আবার এর মধ্যে এক অনন্তচৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তার অস্তিত্ব এবং ইচ্ছাকে আমদানি করবার প্রয়োজন কেন?

যে বীজ বুনবে তার ফসল তোমাকে পরজন্মে কুড়াতেই হবে, কর্ম্মবাদের এই তত্ত্বকে শ্রীঅরবিন্দ সামগ্রিক সত্য বলে স্বীকার করেন নি। আত্মা জন্মের দ্বারা নূতন দেহ গ্রহণ করে—অভিজ্ঞতা কুড়ানোর জন্য। আত্মার এই অভিজ্ঞতারাশিতে বিপুল প্রয়োজন আছে তাকে অজ্ঞানের তমসা থেকে চেতন্যের আলোয় বিকশিত করবার জন্য। কর্ম্মবাদের একটা যান্ত্রিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে নব দেহে আমাদের জন্মান্তর—এ তত্ত্ব শ্রীঅরবিন্দের মতে ঠিক নয়। নবজন্মের মৌলিক উদ্দেশ্য মানব-প্রকৃতির, ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ, অভি-জ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভিতর দিয়ে অজ্ঞানের তমসা থেকে চৈতন্যের মুক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে কর্ম্ম-বাদের মধ্যে একটা সত্য আছে—কিন্তু কর্ম্ম সত্যের একটা দিক্ মাত্র। আমরা কর্ম্মের দ্বারা আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তুলি—বিশ্ববিধানে এ তত্ত্ব একটা factor মাত্র। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হচ্ছে সেই পরম সত্তা, সেই প্রচ্ছন্ন অসীম চৈতন্য এবং ইচ্ছাশক্তি আমাদের মন, প্রাণ এবং দেহকে ব্যবহার করছে। আমাদের মানব-মনের তৈরী মাপকাঠি দিয়ে এই বিশ্বচৈতন্যের (Cosmic Intelli-gence) বৃহত্তর কার্য্যকলাপকে বিচার করতে গিয়েই আমরা ভুল করে বসি। শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্যে ঠাকুরেরই বাণীর প্রতিধ্বনি : "এক-সেরা ঘটিতে চার-সের দুধ ধরে না।"

গো......স্ত্রী অবধ্য

জ্যোতির্ময়ী দেবী

"চোর! চোর! চোর!"

গণেশ টকীর সামনের পথ। চারদিকের গলি ও পথ থেকে নিমেষে পথটা লোকারণ্য হয়ে গেল। প্রায় বিকেল। বড়বাজারী, ছোটবাজারী, কালোবাজারী, পথচারী, সিনেমাযাত্রী সব ব্যবসা ভুলে টিকিটের লাইন ছেড়ে, পথিক পথ ভুলে, চোর দেখতে—চোর ধরতে—চোর মারতে মারমুখো হয়ে এল।

এবং বাড়ীগুলির বারান্দায়, জানালায় মেয়ে, শিশু, কিছু পুরুষ দর্শকের ভীড়ও জমে গেল।

সবাই চোর দেখবেন। ধরতে পারলে পুরুষেরা নেমে আসবেন হয়ত, মেরে পাট বানিয়ে দেবার জন্য।

নীচে রাগে কম্পমান, কৌতূহলে উৎকণ্ঠিত, কৌতুকে হাস্যবিকশিত উৎসুক জনতা।

চোরকে দেখা যায় না। শুধু কথা ও মন্তব্য শোনা যায়। 'কি চুরি করেছে? কার টাকা? পকেটমার? কাপড়ের দোকানে না বাসনের দোকানে ধরা পড়েছে? কেমন দেখতে? কত বড়?'

জবাব—'না না। চাল গো—চাল।'

জবাব—'তেলও।'

জবাব—'কয়লাও ত দেখছি।'

জবাব—'আর একগাদা পয়সা।'

মন্তব্য—'মেরে মেরে ঠাণ্ডা করে দাও ডাণ্ডা মেরে।'

প্রশ্ন—'ছোঁড়া না বুড়ো?'

জবাব—'বুড়োও নয়, ছোঁড়াও নয়।'

—'তবে?'

—'বোঝা যাচ্ছে না ছেলে না মেয়ে।'

ওপরের বারান্দা থেকে দেখা গেল, একটা সিড়িঙ্গে রোগা কৃশ দেহ। পরিধানে হাফপ্যান্ট আর একটা ছেঁড়া ঢাউস ব্লাউজ। মাথায় একটা রুক্ষ চুলের—ফিতে নয়—নেকড়ার ফালি বাঁধা খোঁপা। কানে পেতলের মাকড়ি। কিন্তু সর্বাঙ্গ সরল-ঋজু-সোজা। তেলা-সমান। কিশোর ছেলের মত। হাতে একটা ঝোলা—কাঁধেও একটা। চোখ দুটো বড় বড়। ভীত সরল মুখ। ছেলে? না মেয়ে? সঙ্গে গোটা দুই ছেলে ৮।১০ বছরের। অর্দ্ধনগ্ন শীর্ণদেহ।

ছেলেদুটোর একজনের হাতে একটা তেলের বোতল আর কাঁধে ছাইবাহা কয়লার পুঁটলী।

এতক্ষণে ভিড়ের মধ্যে স্বদেশসেবী গান্ধীটুপী পরা গান্ধীপন্থী এবং রুশপন্থী, চীনপন্থীরা চোঙা-প্যান্ট, হাফ শার্ট পরা সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবীও জমেছেন। এবং ক্যামেরা হাতে কাগজের রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারও এসে গেছেন।

সমবেত প্রশ্ন—'কত চাল? আর তেল? আর পয়সা—টাকা? কয়লা কত মণ?'

উত্তর—(একটু হাসিসহ) 'দু'সের চাল। এক বোতল তেল। আর দু'টাকার পয়সা। আর কয়লা এক পুঁটলী।

—ও! ওইটুকু! ভিখিরী!'

—'টুকু নয়। একসের চোরও চোর। এক পয়সা চোরও চোরই।'

সাংবাদিক—'তবে? অত কম যে? কি লিখি?'

—'লিখে নিন, কুড়ি কুইন্টাল চাল, কুড়ি কুইন্টাল তেল। আর দু'শ টাকা।'

জনতা—'মেরে পাট করে দাও ক'টাকে।'

স্বদেশসেবী—'আগে ছবিটা তুলে নিন মশাই।'

তিনদলীয় দেশপ্রেমিক স্বদেশসেবী, স্বেচ্ছাসেবীরা সব ঠিকঠাক হয়ে ছেলেবেশী মেয়েটার আর ছেলেদুটোর পাশে দাঁড়ালেন।

জনতা—'এবার মেরে ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে দিন। সরকারী ঢালাহুকুম আছে গুলিমারার। ভয় নেই।'

'আহা! না হে না। স্ত্রীজাতি অবধ্য!'

'হ্যাঁ। "গো...স্ত্রী অবধ্য"। শাস্ত্রে আছে অবধ্য ওরা সব!'

মন্তব্য—'তা ভারতবর্ষে আর পুরুষ কোথা—। তাই ত নেহেরুজী ল্যাম্প-পোষ্টে কারুকে ঝুলোতে পারেন নি। সবাই গরু-ধার্মিক-স্ত্রীজাতি যে?'

কাকে মারা হবে! হয়ত 'স্বজাতি' বেরিয়ে আসবে!

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব

সন্তোষকুমার দে

দূরদূরান্তের গ্রহে মানুষ আছে; তারা কিন্তাবুদ্ধি ও সভ্যতায় পৃথিবীর মানুষের চেয়ে উন্নত, এরকম কল্পনা মানুষ অনাদি কাল থেকেই করে আসছে, আর এরকম কল্পনায় মানুষ পায় আনন্দ। তাই দেখা যায় সবদেশের পুরাণে উপকথায় এ নিয়ে কত মনোজ্ঞ গল্প, উপাখ্যান রচিত হয়েছে। চাঁদে মানুষ আছে, নদীনালা খাল আছে এ কল্পনাও মানুষ অনেক দিন থেকেই করে আসছিল; কিন্তু যেদিন এপলো—১১র তিনজন মহাকাশচারী চাঁদের দেশে অবতরণ করে অক্লান্ত বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, সে এক ভয়ঙ্কর মৃত জগৎ, সে জীবধাত্রী নয়, "জলহীন আতঙ্ক ফলহীন প্রান্তর" মরুক্ষেত্র সে, "নীলাম্বু রাশির অতন্দ্র, তরঙ্গ কলমন্দ্র মুখরা" সে দেশ নয়, "নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ, রোগমসীঢালা কালী তনু তার" উল্কা-বিধ্বস্ত, ব্রণকন্টকিত সে দেশ, সে দিন মানুষের কল্পনার ফানুস ফুটো হয়ে চুপসে গেল। কবির ভাষায় সে দেশকে সত্যি বলা চলে,—

"পথশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি রৌদ্রালোকে
জলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে
তপ্ত দেহ; উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দয়।"

মঙ্গলগ্রহে মানুষ এখনও সশরীরে পৌঁছতে পারেনি; কিন্তু এখন থেকেই কল্পনা করছে সেখানে মানুষ আছে; আর সে মানুষ আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান্ এবং সভ্যতায় অনেক অগ্রসর। এত হল সাধারণ মানুষের কথা। একদল প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী জোরের সঙ্গে বলছেন, মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বা থাকার সম্ভাবনা। আর এক দল বিজ্ঞানী সমান জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বলছেন, না সেখানে কোন প্রাণী নেই, প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে থাকা সম্ভব নয়।

অন্য সব গ্রহের চেয়ে মঙ্গলগ্রহের দিকে সাধারণ মানুষের এত আগ্রহ হবার কারণ মনে হয়, বহুকাল আগে (১৪৯৮ সালে) এইচ জি ওয়েলস্ 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' নামে একখানা কল্প-বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন। পরে ১৯৩৮ সালে বইখানি সিনেমার ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। দর্শকেরা মনে করেছিলেন সত্যই বুঝি মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে আর তারা পৃথিবী আক্রমণ করেছে। এই আলোড়নের ফলে জনসাধারণ এবং বিজ্ঞানীদের মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল জেগে উঠেছিল। তারপর অতি সম্প্রতি চাঁদে মানুষের অবতরণের পর বিজ্ঞানীদের প্রধান কাজ হল মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সত্যি সত্যি সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না জানা।

মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসা একেবারে হালফিল একথা অবশ্য বলা চলে না। অনেক আগে থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতেই মঙ্গলগ্রহ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে সে যুগে যন্ত্রপাতি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল না হওয়ায় এবং বিজ্ঞান বর্তমান যুগের মত উন্নত মানের না হওয়ায় গ্রহটি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হয়নি। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এই সময় থেকেই মঙ্গলগ্রহের বিশেষত্বগুলো মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে সকলের আগে নাম করা যেতে পারে একজন ওলন্দাজ পদার্থবিদের। তিনি হলেন ক্রিশ্চিয়ান হিগেন্স। তিনি দূরবীনের সাহায্যে গ্রহটির চিত্র এঁকে এর এক সরু প্রদেশ শাদা টুপির মত আকারে দেখান।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার উইলিয়ম হার্শেল এই শাদা আস্তরণ দেখে বলেন, এই আস্তরণ হল বরফ ও তুষারের এবং বলেন সেখানকার অধিবাসীরা পৃথিবীর মতো আবহাওয়া উপভোগ করেন। অবশ্য এটা তাঁর অনুমান ছাড়া কিছুই নয়, কারণ এসম্বন্ধে তিনি সর্বজন-গ্রাহ্য কোন যুক্তি দেখাতে পারেন নি। এরপর ১৮৭৭ সালে ইটালির মিলান মানমন্দিরের অধিকর্তা Giovanni Virginio Schiaparelli মঙ্গলগ্রহে কাটা খালের মতো দেখতে পান। এই চিহ্নগুলো ছিল জ্যামিতিক সরল রেখার মতো সোজা ও লম্বা। তাই দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি। সেইজন্যে যা মন্তব্য করেন তার ইংরেজী,—

Their singular aspect, and their being drawn, with absolute geometrical precision, as if they were the work of rule or compass, has led some to see in them the work of intelligent beings, inhabitants of the planet. I am very careful not to combat this supposition, which includes nothing impossible.

এইবার মঙ্গলগ্রহের সকলের জানা পরিচয়টা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। সবারই জানা আছে, মঙ্গল-গ্রহ পৃথিবীর কক্ষের বাইরে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে নটি গ্রহ আপন কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তার মধ্যে পৃথিবীর স্থান হল তৃতীয় আর মঙ্গলের স্থান হল চতুর্থ। পৃথিবীর কক্ষ মঙ্গলের কক্ষের মধ্যে থাকায়, মঙ্গল কখনও পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী হয় না। পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে উজ্জ্বল পীত-রক্তবর্ণ দেখায়। এর হরিদ্রাভ ও লোহিত আভা দেখে অনেকে মনে করেন এই গ্রহে জল আছে—সাগর ও জলাশয়াদি থাকলেও থাকতে পারে, আর থাকতে পারে উদ্ভিদপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর। এ অনুমান আজকাল অবশ্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যাই হোক, বাস্তব সত্য হল, মঙ্গল অন্যান্য গ্রহেরই মতো উপবৃত্তাকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; সেই জন্যে এদের পরস্পর দূরত্ব কখোনো সমান হয় না! সূর্য হতে এর দূরত্ব ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। বৃত্তাকারে আবর্তন করার ফলে প্রতি ১৫-১৭ বছর অন্তর অন্তর মঙ্গল পৃথিবীর কাছাকাছি (৩৫,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে) এসে পড়ে। পৃথিবীর কাছাকাছি শেষবার এসেছিল ১৯৭১ সালে, আবার কাছাকাছি হবে ১৯৮৬-৮সালে।

১৯০৫ সালে পার্সিভ্যাল পাওয়েল মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করে বলেন, এভারেষ্ট পর্বতশৃঙ্গের বায়ুমণ্ডলের মতো সেখানকার বায়ুমণ্ডল ঘন এবং জলাভাব অত্যন্ত বেশি। এই সময় উইলিয়াম পিকারিং নামে একজন বিজ্ঞানী পাওয়েলের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, মঙ্গল গ্রহে যে অংশটি কালো দেখায় সেটা হয়ত এক কালে সমুদ্র ছিল, কিন্তু এখন সে স্থান অরণ্যপূর্ণ। কালো জায়গাটাকে অরণ্যপূর্ণ বলে পিকারিং মনে করেছেন, সেটা সত্যি বলে মনে হয় না। কারণ বিষুব রেখার কাছে কালো জায়গাটা আশপাশের জায়গা থেকে অন্তত ১৫ ডিগ্রি বেশী গরম। বন থাকলে এত গরম হবে কেন? ঠাণ্ডা হওয়াই ত সম্ভব! এই জন্যেই মনে হয় এটা নিছক কল্পনা।

মঙ্গলে জল আছে কি না সে নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীর ভিন্ন ভিন্ন মত। অনেকে বলছেন জল মঙ্গলের পৃষ্ঠে না থাকলেও, মাটির তলায় থাকতে পারে। আলফ্রেড রাসেল মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে খুব বেশি সন্দিহান। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন মঙ্গলে জলীয় বাষ্প সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর এ মত ১৯৬৩ সালে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ঐ সময় মঙ্গলে অল্প পরিমাণে জলের অস্তিত্ব খুঁজে পান।

এই রকম মতানৈক্যের কারণ মনে হয়, বহুদূর থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছিল সেগুলো সুস্পষ্ট ছিল না। ১৯৬৪ সালে ২৮শে নভেম্বর মঙ্গলগ্রহ অভিযানে আমেরিকা এক অতি সাধারণ ধরণের যন্ত্রযান—মেরিণো ৪ পাঠান। যানটি সাড়ে সাত মাসে ৫২০ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১৪ই জুলাই, ১৯৬৫ সালে মঙ্গলগ্রহের ৯৮৪৪ কিঃ

মিঃ দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাবার সময় সেখান থেকে যে সব আলোকচিত্র পাঠিয়েছিল সেগুলো ছিল খুব স্পষ্ট, ভ্রমত্রুটিহীন। এই আলোকচিত্রগুলোতে কোন খালের চিহ্ন দেখা যায় নি—দেখা গেল মঙ্গলের ভূমি চন্দ্রভূমিরই মতো নতুন ও পুরণো আগ্নেয়গিরি ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। আলোকচিত্রগুলো বিজ্ঞানীরা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, গ্রহটি জীবধাত্রী আতিথ্যপরায়ণ নয়। এতদিন পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলের যে মঙ্গলময় মূর্তি কল্পনা করে আসছিল বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কবির ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় সেথা,—

"রয়েছে ধরা/ অনন্ত কুমারী ব্রত; হিমবস্ত্র পরা/ নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ,সর্ব আভরণহীন/ সেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে, ফিরে আনে দিন/শব্দশূন্য সংগীতবিহীন।"

মঙ্গলে জল আছে কি না এবং থাকলেও কি পরিমাণে আছে সেটাও এখন অনেকটা নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে। এটা জানবার জন্যে বিজ্ঞানীদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাই অনেকে বলেছেন এই আবিষ্কারটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়জয়কার। ক্যালিফোর্ণিয়ায় মাউন্ট উইলসনে একটা ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণ বসিয়ে তার কাঁচের ওপর মঙ্গলের সৌর-করের প্রতিফলন হিসেব করে সেখানকার আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প ও কার্বণডায়অক্সাইডের মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছিল। এঁদের এই হিসেবে জানা যায়, পৃথিবীর আবহাওয়ার চেয়ে সেখানকার বাতাস ১০০০ থেকে ২০০০ গুণ কম ঘন এবং কার্বণডায়অক্সাইডের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। আর সমতলভূমির অভিকর্ষ হল পৃথিবীর তুলনায় এক ভাগ মাত্র। পাহাড় পর্বতের মতো উচু জায়গায় বাতাস খুব ভারী। এ তথ্য-গুলো জানা যায় মাউন্ট উইলসনের টেলিস্কোপ থেকে সংগৃহীত আলোকচিত্র হতে এবং সেগুলো মেরিণো ৪, এবং ৬ এর প্রেরিত ফোটো অনুশীলন করে যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয় তার সঙ্গে প্রায় এক রকম মিলে যায়।

মেরিণো-৬এর পর মঙ্গলের দিকে যাত্রা করল মেরিণো ৭। সে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, অর্থাৎ ১৩০ দিনে অবিশ্রান্ত বেগে ছুটে ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কিলো-মিটার পথ অতিক্রম করে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ৫ই আগষ্ট, ১৯৬৯ সালে পৌছায়। পৌছিয়েই তার প্রথম কাজ হল ৯ কোটি ৬০ লক্ষ কিঃমিঃ দূর থেকে অতি আধুনিক সংবেদনশীল ক্যামেরা ও বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ ও আলোকচিত্রাদি পাঠানো। মঙ্গল গ্রহের দুই মেরুর বিশেষ বিশেষ স্থানের ২২টি আলোক-চিত্র আকাশ সংস্থা পেয়েছেন। সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের ধারণা হয়েছে মঙ্গলগ্রহ চন্দ্রের মতো উল্কা বিধ্বস্ত, ব্রণকণ্টকিত কৃষ্ণশৈল গুহামুখ পরিকীর্ণ এক বিশাল ভূখণ্ড। সেখানকার আবহাওয়ায় অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন, আরগন, জলীয় বাষ্প এবং অতি সামান্য অক্সিজেন আছে; কিন্তু কার্বণডায়অক্সাইডের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। অক্সিজেনের পরিমাণ এত কম যে সেখানে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। মেরিণো—৭ আরও খবর দিয়েছে যে, মঙ্গলের আবহমণ্ডল অত্যন্ত অনিবিড় (পাতলা) কিন্তু স্বচ্ছ—দূরদিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করা চলে। ভূগর্ভে জল থাকলেও থাকতে পারে; তবে নদী, হ্রদের মতো জলাধার হয়ত নেই। পৃথিবীর মতো দিনরাত সেখানে ২৪ ঘণ্টায়। সেখানকার অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে ৬ গুণেরও বেশি। এ ছাড়াও মঙ্গলগ্রহে আছে চারটি ঋতু এবং সেগুলো অতিপরিচিত পৃথিবীর ঋতুরই মতো; তবে তারা স্থায়িত্বে এখানকার ঋতুর প্রায় দ্বিগুণ। ৬৮৭ দিনে বছর সেখানে। Ozone সেখানে একেবারেই নেই বলে মনে হয়, যদি থাকেও পরিমাণে অত্যন্ত কম। যেখানে "ওজোন" এত কম সেখানে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। একথা বলেছেন মহাকাশ-বিজ্ঞানী হুবার্ট'স ষ্ট্রগহোলড। পৃথিবীতে ১২৩৮ মাইল ওপরে যে ওজোন এলাকা আছে সে উর্ধ্বাকাশের অতি বেগুনী রশ্মি বহু পরিমাণে শুষে নেয়; তাই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলে এ ওজোন এলাকা নেই। এই যখন পরিস্থিতি তখন সেখানে মানুষ কি করে বেঁচে

থাকবে? অক্সিজেনের অভাব, ওজোনের অভাব আর তার ওপর অতিবেগুনী রশ্মির প্রাবল্য, এরকম অবস্থায় কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়—যদি জীবন বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলো সমস্ত গ্রহেই এক রকম হয়।

এর উত্তরে কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, আমাদের এককোষী অনেক পূর্ব্বপুরুষ হয়ত আদিতে অতিবেগুনী রশ্মিতে অভিভূত হয়নি; তা ছাড়াও জীবনের আদি অবস্থায় অক্সিজেন ছাড়াও বেঁচে থাকা সম্ভব, যেমন বেঁচে থাকে কোন কোন রোগোৎপাদক জীবাণু। এটা না-হয় মেনে নেওয়া গেল; কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে সেখানকার প্রাণীরা বেঁচে থাকবে কি করে? মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর দিকেও ছুটে আসছে বটে কিন্তু পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে তারা দুই মেরুর দিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণীজগৎকে বাঁচাচ্ছে; তা ছাড়া ভূমণ্ডলে পৌঁছবার আগেই তার শক্তি অনেকটা প্রতিহত হয়ে যায়। পৃথিবীর মতো মঙ্গলের চৌম্বক বর্ম (ম্যাগনেটিক শিল্ড) নেই। আর সেটা যে নেই তা মেরিণো—৪,৫,৬, ৭-এ যেসব যন্ত্রপাতি ছিল, তা থেকে ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও এখনও কেউ কেউ মঙ্গলে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। মেরিণো—৯ মঙ্গলগ্রহে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পেয়েছে। এ থেকে আবার নতুন করে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল জেগে উঠেছে। যারা বুদ্ধিমান্ প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশাবাদী তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অন্তত ৬।৭ জন বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন মঙ্গলে বুদ্ধিমান্ জীব আছে। এর মধ্যে সবার আগে নাম করা চলে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেকের। ইনি হলেন সবচেয়ে বেশি আশাবাদী। ফ্রাঙ্ক ড্রেক বর্ত্তমানে ন্যাশনাল এসট্রনমি এণ্ড আইওনোস্ফিয়ার সেণ্টারের অধিকর্ত্তা। তিনি বলছেন, আরিসিবো শহরে যে হাজার ফুট ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে, সেটিকে যদি শুধুমাত্র মঙ্গলে এবং অন্যান্য দূর গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না সেই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে দেওয়া হয়, তা হলে আগামী দশ বছরের মধ্যে এ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত সংবাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মূল্যবান্ অতিকায় দূরবীণটি ত শুধু এই একটি মাত্র কাজের জন্যে ছেড়ে দেওয়া যায় না; আবার এই রকম একটি বৃহদাকার দূরবীণ নতুন করে তৈরি করতে হলে কম পক্ষে সাত কোটি ডলারের প্রয়োজন। সে টাকা বর্ত্তমানে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই আংশিক সময়ের জন্যে এটি ব্যবহার করায় তাঁকে এখনও ২০।২৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এরপর তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন, "প্রতি বৎসর আমাদের প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা যত বাড়ছে, সেই সঙ্গে দূরগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই পৃথিবীর বাইরে এক অজানা সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কথা বিজ্ঞানীরা ক্রমশই আর স্বপ্নজগতের কথা বলে ভাবছেন না, বরং মনে করছেন, মানবজাতির ইতিহাসের এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা আমাদের মত অনেকের জীবদ্দশায় একদিন অকস্মাৎ ঘটে যাবে।"

পদার্থবিদ্ ফিলিপ মরিসন এবং Giuseppe Coeoni দূরগ্রহে বুদ্ধিমান্ জীবের সন্ধান কি করে পাওয়া সম্ভব, তার এক পরিকল্পনা ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচারে" প্রকাশ করেছিলেন। বার্ণার্ড ওলিভ, কার্ল সেগন, মহাকাশ-বিজ্ঞানী জোসেফ স্যামুলোভিচ্ শোক্লেভস্কি, সিবাসটিয়ান ফন হেরনার এবং আরও দু-একজন বিজ্ঞানীর এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। বিজ্ঞানী অটো ষ্ট্রুভ ১৯৪০ সালে বলেছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর বাইরে দূর গ্রহে বুদ্ধিমান্ জীবের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু সেটা যেদিন আবিষ্কৃত হবে সেদিন হয়ত আমি বেঁচে থাকব না, আর মনের দিক্ দিয়েও তার জন্যে প্রস্তুত নই।"

মঙ্গলে বুদ্ধিমান্ জীব থাকতে পারে এ ধারণার আর একটা কারণ হল, ১৯৩৭ সালে মঙ্গলে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছিল, অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৫১ সালে এবং আবার ১৯৫৪ সালে। এই বিস্ফোরণের

সংবাদ জানতে পেরে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করে-ছিলেন, এইসব বিস্ফোরণ প্রাকৃতিক কারণে আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণ নয়; কারণ এই বিস্ফোরণের অগ্নি-শিখা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে পৃথিবীর দূরবীণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আলো অতদূর থেকে পৃথিবীতে পৌঁছন সম্ভব নয়। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন, সেখানকার বুদ্ধিমান্ জীবেরা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। এটা নিছক কল্পনা বলে মনে হয়। গত বছর সূর্যে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছিল বলে এক খবর বেরিয়েছিল। তাই বলে কি মনে করতে হবে সূর্যেও বুদ্ধিমান্ জীব আছে? তা ছাড়া দূরদূরান্তের গ্রহনক্ষত্র থেকে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে বেতার সংকেত এসে পৌঁছয়, যেমন এসেছিল ১৯৬৭ সালে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও টেলিস্কোপে এই সংকেত ধরা পড়ে। কোথা থেকে এ শব্দ আসছে প্রথমে বিজ্ঞানীরা ধরতে পারেন নি। পরে ঐ শব্দটা কোথা থেকে আসছে এবং কিসের শব্দ সেটা জানবার জন্যে পোর্টোরিকোর আরিসিবো শহরে বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি হলে জানা গেল, ঐ শব্দ কোন বুদ্ধিমান্ জীবের সংকেতধ্বনি নয়; কেননা ঠিক এই একই রকমের সংকেতধ্বনি একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে মহাকাশের বিভিন্ন স্থান থেকে একই সময়ে আসছিল। শক্তির এত মূঢ় অপচয় (সেকেণ্ডে ৪০ থেকে ১০০০ মেগা-সাইকেল) কোন বুদ্ধিমান্ মানুষ করতে পারে না। ঐ শব্দ আসছিল একটি স্পন্দমান তারকা (পালসেটিং ষ্টার) থেকে, যেটি আপন গুরুভারে (প্রতি ঘন সেনটিমিটারের ওজন ষাট কোটি টন) আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ছিল। সেদিনও কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন ঐ সংকেতধ্বনি ওখানকার মানুষেরা পাঠাচ্ছেন। কাজেই মঙ্গলে মানুষ আছে বলে মনে করবার মতো কোন সঙ্গত কারণ নেই।

এখন মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকবার যেসমস্ত কারণ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, সেগুলোর কথা ভাবা যাক কারণগুলো হল (১) প্রবল শৈত্য হিমাঙ্কের নিচে ৯৫°ডিগ্রি; গ্রহটি হল সূর্য থেকে পাঁচ কোটি মাইল দূরে। পৃথিবী থেকে সূর্য কিন্তু এত দূরে নয়। (২) তরল জলের একান্ত অভাব (৩) যথেষ্ট অক্সিজেনের অভাব (৪) মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ। এতগুলো কারণ সত্ত্বেও যাঁরা মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বে আস্থাবান্ তাঁরা বলেন, হয়ত সেখানে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ ঠিক পৃথিবীর নিয়ম ধরে চলে না; আর আদিতে হয়ত মঙ্গলে যথেষ্ট জল ছিল এবং তা বহু-কাল ধরেই ছিল। তারপর যখন ধীরে ধীরে জলের অভাব দেখা দিল, প্রাণীরা সেই জলহীন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল বরফ ও তুষারের সাহায্যে। বরফ ও তুষারগলা জল প্রাণধারণে তাদের কিছুটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেটা ত চিরদিন চলতে পারে না, তাই প্রাণ একদিন নিঃশেষ হল।

নাসার (NASA) রিচার্ড য়ুং, ষ্ট্রম্বলি আগ্নেয়গিরির আশপাশ থেকে কিছু অণুজৈব পদার্থ (মাইক্রো-অরগ্যানিজম্) সংগ্রহ করে দেখান সেগুলো জমে যাওয়া এবং গলে যাওয়া তাপাঙ্কের মধ্যেও অক্সিজেন ছাড়াই জীবিত আছে। সেটা যদি সম্ভব হয় তা হলে, মঙ্গলে তাড়াতাড়ি তাপাঙ্ক বেড়ে যায় এবং কমে যায় এবং অক্সিজেন কম আছে বলে অনুরূপ উদ্ভিদ্ থাকবে না কেন, বলে প্রশ্ন তুলেছেন। থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু থাকবেই যে সেকথা জোর করে বলা যায় না। মঙ্গলে উদ্ভিদ্ আছে কি না এবং থাকলেও কি ধরণের উদ্ভিদ্ থাকা সম্ভব সে নিয়ে এখনও তর্ক চলেছে।

এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, মঙ্গলের আবহাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং তরল জল সেখানে নেই বললেই চলে। এরকম অবস্থায় কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়; তবু ডাচ জ্যোতি-র্বিদ্ Gerard Kuiper বলছেন, তরল জল ও অক্সিজেনের স্বল্পতার মধ্যেও প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব; তবে সেসব প্রাণী হবে আকারে ছোট। মঙ্গলে যদি উদ্ভিদ্ বা কোন প্রাণী থাকে তাহলে তারা এত ছোট হবে যে, পোকামাকড়ও তাদের গায়ে পড়ে গেলে হোঁচট খাবে না।

তারপর বুদ্ধিমান্ জীব সে জগতে আছে কি না, সে তর্কের জবাবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বলছেন, মঙ্গলগ্রহ হল এক আতিথ্য-বিমুখ জগৎ। সেখানে ছোট ছোট গাছ-পালা এবং অতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থাকলেও থাকতে পারে; কেননা গাছ থাকলেই পোকামাকড় আসবে, তবে বুদ্ধিমান্ জীব সে জগতে থাকা সম্ভব নয়; কারণ বিবর্তনবাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। মঙ্গলের মতো আতিথ্যবিমুখ জগতে দীর্ঘ বিবর্তনের ধারা অব্যাহত গতিতে চলা সম্ভব নয়, কাজেই বুদ্ধিমান্ জীবের অস্তিত্বের কল্পনাটা বাতিল করে দেওয়া ভাল।

এসব যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও যে-সব বিজ্ঞানী অত্যন্ত আশাবাদী, তাঁরা শুধু মঙ্গলেই নয়, বৃহস্পতিতেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে আশা পোষণ করেন; কেননা সম্প্রতি বৃহস্পতি গ্রহে এমোনিয়া, হাইড্রোজেন ও মিথেন অণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হল জীবকোষের মূল উপাদান; তাই কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, এই গ্রহেও জীবনের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। এ আশা আমাদের দুরাশা বলেই মনে হয়। মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও পর্যন্ত শেষ কথা বলবার সময় আসে নি। সর্বশেষ খবর যা মেরিণো—৯ থেকে পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, মঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গেছে আর তার আলোড়িত আকাশের মেঘপুঞ্জের ভেতর নাকি "এমিনো" এসিডেরও সন্ধান মিলেছে। যদি এমিনো এসিডের অস্তিত্বের সন্ধান মিলে থাকে, তাহলে প্রাণের অস্তিত্বও নিশ্চয়ই মিলবে। প্রাণের মূল হল এমিনো এসিড। তবে সে প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে কীট-পতঙ্গদের মতো নিম্ন মানের প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও থাকতে পারে। প্রকৃতি হল নিয়মের রাজত্ব; সে রাজত্বে নিয়মবহির্ভূত কোন কাজ হয় না; তবে নিয়মগুলো বোধ হয় আমরা এখনও সব জানতে পারি নি। তাই বলতে হয় এখনও এ বিষয়ে শেষ কথা বলবার সময় আসে নি। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া যে সব মনুষ্যহীন মহাকাশযান পাঠাচ্ছে এবং তাতে যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আছে তাদের সাহায্যে আগামী পনের কুড়ি বছরে অনেক নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হবে—তখন এবিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে।

মঙ্গলগ্রহে মানুষ সশরীরে পৌঁছতে না পারলে সব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের সেখানে পৌঁছবার সবচেয়ে বড় বাধা হল, পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দুস্তর দূরত্ব। বর্তমানে রকেটের যে গতি, সেই গতিতে মঙ্গলে মহাকাশযানের পৌঁছতে কমপক্ষে দুবছর সময় লাগবে। তাহলে যেতে আসতে সময় লাগবে চার বছর; তার ওপর পর্যবেক্ষণের জন্যে ধরা যাক এক সপ্তাহ। এই চার বছরের ওপর মানুষের পক্ষে ভারশূন্য অবস্থায় সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না সেটাও ভাববার বিষয়। অবশ্য বিজ্ঞানীরা নিশ্চেষ্ট নন। রাশিয়া এবং আমেরিকা দুই মহাশক্তিধর জাতি এবিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কতদিন মানুষের পক্ষে ভারশূন্য অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব তা নিয়ে দুই দেশে পরীক্ষা চলছে। সোভিয়েট মহাকাশচারী সয়ুয-৯ মহাকাশযানে ৪২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৭ দিনের বেশি ভারশূন্য অবস্থায় মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তার আগে আমেরিকান নভশ্চর ফ্রাঙ্ক বোরম্যান এবং জেমস লভেল জেমনী-৭ আকাশযানে তের দিনের বেশি মহাশূন্যে কাটিয়েছেন। এবছরে, ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে তারিখে আমেরিকা স্কাইল্যাবে যে তিনজন মহাকাশচারীকে পাঠিয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই রাশিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এই প্রথম দলটি ফিরে এলে দ্বিতীয় দলটি মহাশূন্যে ৫৬ দিন কাটাবেন, তারপর যে তৃতীয় দলটি যাবে তারাও ৫৬ দিন কাটাবে; কিন্তু এই ৫৬ দিন চার বছরের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। শায়িত অথবা উপবিষ্ট অবস্থায় এক নাগাড়ে চার বছরের ওপর মহাশূন্যে কাটানো এখনও অকল্পনীয় বলে মনে হয়। সেই বিরামহীন গতির মধ্যে মানসিক অবসাদের ফলে মহাকাশচারীদের উন্মাদ হয়ে যাওয়া সম্ভব।

চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে মঙ্গলে রকেট পাঠাতে পারলে দূরত্ব খানিকটা কমবে বটে কিন্তু অসীম দূরত্বের তুলনায় সেটা কতটুকু বা সুবিধে। এই জন্যে দুই দেশের বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে একদিকে যেমন ভারশূন্য অবস্থায় সুস্থ থাকাটা দীর্ঘায়িত করবার চেষ্টা করছেন, অপর দিকে তেমনি রকেটের গতি বৃদ্ধি করবারও চেষ্টা করছেন। তাঁরা ভাবছেন আকাশযানের গতি বৃদ্ধি করে প্রায় আলোক-গতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় কি না। অবশ্য আকাশযানের গতি কখনই আলোকের গতির সমান করা সম্ভব নয়; কেন না আইনষ্টাইনের যুগান্তকারী সূত্র হল $E=mc^2$ i.e. energy equals mass multiplied by the square of the speed of light! রকেটের গতি আলোকের গতির সমান করতে গেলে, গতি আলোকে পরিণত হবে। তবে রকেটের গতিকে বর্তমানে সেকেণ্ডে ৮ মাইল বাড়িয়ে আলোকের গতির কাছাকাছি আনা যায় কিনা, সেটা বিজ্ঞানীরা ভাবছেন।

সম্প্রতি নাসা ঘোষণা করেছেন ১৯৮০-৯০ সালে মঙ্গলগ্রহে মানব অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রকেটের বর্তমান গতিতে মঙ্গল গ্রহে পৌছতে পুরো দু বছর সময় লাগবে। আকস্মিক কোন বিপদের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে স্থির হয়েছে, যে-মহাকাশযান করে তাঁরা পাড়ি দেবেন, তারই পাশাপাশি মানব-আরোহী-হীন আর একটা মহাকাশযান সমান গতিতে মঙ্গলের দিকে ছুটতে থাকবে। প্রথম মহাকাশযানটিতে কোনো বিপদ দেখা দিলে মহাকাশচারীরা দ্বিতীয়টিতে চড়ে বসবেন এবং তাঁদের কর্মসূচীর কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে মঙ্গলের দিকে গতি অব্যাহত রাখবেন। এতে অনেক অসুবিধের সুরাহা হবে। আর যেদিন তাঁরা মঙ্গলে অবতরণ করবেন, সেই অবতরণ দৃশ্য টেলিভিসন ক্যামেরায় দেখাবার ব্যবস্থা এখন থেকে করবার চেষ্টা হচ্ছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় অতদূর থেকে আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব নয়; তাই Laser Space Communication System-র সাহায্যে চিত্র পাঠানো হবে। এই 'লেসার' হল এক অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী-আলোক রশ্মি। সম্প্রতি আমেরিকায় এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। একশ' কোটি সূর্যের রশ্মির চেয়ে এর আলো উজ্জ্বল।

এখন পর্যন্ত যতটুকু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং যে সব তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাতে মনে হয়, আমাদের এই পৃথিবী ছাড়া কোন নিকট বা দূর গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব নেই—বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কথা ত ভাবাই যায় না। কারণ তাহলে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই সব গ্রহে পৌছবার জন্যে এবং তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, ঐসব গ্রহের মানুষরাও অনুরূপভাবে চেষ্টা করত; আর তার ফলে মাঝ পথে আমাদের মিলন ঘটত।

যাই হোক, এই শতকের শেষের দিকে মহাকাশচারীরা যখন মঙ্গলের ভূমিতে অবতরণ করবেন আর তারপরে জীবন-বিজ্ঞানীরা (বায়োলজিষ্ট) সেখানে গিয়ে মঙ্গলের ভূমি ভালভাবে পরীক্ষা করতে পারবেন তখনি সব তর্কের অবসান হবে—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। সেদিন জানতে পারব,যে জীবনবিজ্ঞান পৃথিবীতে খাটে সেই একই জীবনবিজ্ঞান তত্ত্ব অন্য গ্রহে খাটে কি না। পৃথিবীর মতো সেখানেও প্রোটিনে ২০টি এমিনো এসিডের অণু আছে কি না, পৃথিবীর মতো D N A (Deoxy Ribonucleric Acid) অণু সেখানে জীবনের বার্তা বহন করে কি না। সেদিন মিলবে মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর। এ বছর ২০শে জুলাই রাশিয়া মারস-৪ নামে একটা মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহ ও তার আশে-পাশে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে পাঠিয়েছে। ১৬ কোটি কিলোমিটার অতিক্রম করে মঙ্গলে পৌছতে ৬ মাস লাগবে। দেখা যাক মঙ্গলে পৌছে সে টেলিভিসন ক্যামেরা মারফত কি নতুন তথ্য পৃথিবীকে উপহার দেয়।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বলেছেন মঙ্গলে তরল জল ও অক্সিজেনের একান্ত অভাব। এ সত্ত্বেও এ বছর (১৯৭৩, আগষ্ট) নয়া দিল্লির সোভিয়েট দূতাবাসের এক সংবেদনে সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভিকুটা সিসকোভসাক

বলেছেনে, মানুষ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বেশ আরামেই বাস করতে পারবে; কারণ কারবনডায়োক্সাইড ও জল না কি সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই এই জল ও কারবনডায়োক্সাইড থেকেই তৈরী করে নিতে পারা যাবে। তবে অসুবিধা জ্বালানীর। এই জ্বালানী সংগ্রহ করতে হবে হয় সূর্য কিরণ থেকে, নয়ত পরমাণু চুল্লী বানিয়ে। সেটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আর কিছুরই অভাব থাকবে না; কারণ তখন এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেই কারবনডায়োক্সাইডকে কারবন অক্সাইড ও অক্সিজেনে বিভক্ত করা যাবে; আর জলকে বিভক্ত করা যাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে। মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেনের অভাব থাকলেও এইভাবে যে প্রচুর অক্সিজেন মিলবে তা দিয়ে মঙ্গলের পরিবেশকে মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী করে তোলা যাবে। হাইড্রোজেন ও কারবনডায়োক্সাইডকে প্যারাফিন ও হাইড্রোকারবনে রূপান্তরিত করে পাওয়া যাবে কৃত্রিম তেল। এই তেল থেকে মানুষের আলোর অভাব ঘুচবে।

এ ছাড়া হাইড্রোকারবনকে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার দ্বারা ৮০ লক্ষের বেশি রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। আর লক্ষ বা কোটি বছর বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী খাদ্যও পাওয়া যাবে কৃত্রিম প্রোটিনের আকারে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী সবই বলেছেন কিন্তু মহা-জাগতিক রশ্মি অতি-বেগুনী রশ্মির বিকিরণ থেকে মানুষকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি। মোট কথা যা যা বলেছেন, পড়লে মনে হবে যেন কল্প-বিজ্ঞান (সায়েন্স ফিক্‌শন) পড়ছি।

যাই হোক আর কয়েক মাস পরে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু তথ্য জানা যাবে। তার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু মন অধীর হয়ে বার বার মহাকাশকে বলতে থাকে :—

"খোলো খোলে হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা। খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা। খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে। আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথিবী-'পরে। শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা—। যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।"

গ্রন্থপঞ্জী :—(1)Drake, F. D.—The Radio Research for Intelligent Extra-territorial Life. (2) Salisburgh, F. B.—Martian Biology. (3) Sinton, W. M.—Spectroscopic Evidence for Vegetation on Mars. (4) Lederberg Jand C. Sagon—Micro-environment for Life on Mars.

সর্পকথা ও নাগজাতি

অবনীভূষণ ঘোষ

বর্তমানে নাগ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝে থাকি সরীসৃপ সাপ। সে হিসাবে নাগজাতির অর্থ সর্পকুল। কিন্তু একদিন - বিশেষ করে মহাভারতীয় যুগে আমরা দেখি. নাগজাতি ছিল মানব পরিবারেরই এক সম্প্রদায়, নাগেরা ছিল মানব জাতিরই এক অংশ। যে মানব সম্প্রদায় নাগজাতি বলে পরিচিত হয়েছিল, তারা ছিল প্রধানতঃ পর্বতবাসী। আর সেই অর্থেই বোধ হয় প্রথমে তাঁরা নাগ বলে আভিহিত হয়েছিল। পর্বতে বাস করে, এই অর্থে নাগ। নাগজাতি ছিল বড় দুর্ধর্ষ। এই দুর্ধর্ষতার পরিচায়ক রূপে তারা সর্প প্রতীক গ্রহণ করেছিল। এই উদ্যতফণা সর্প প্রতীক তারা শিরস্ত্রাণে অথবা স্কন্ধে বহন করত। নাগজাতি সর্প-পূজক ছিল না, সর্প তাদের টোটেমও ছিল না। সর্প ছিল তাদের কাছে বীরত্ব ও প্রভুত্বের পরিচায়ক। নাগজাতি সর্প প্রতীক বহন করত বলে ক্রমে অনুষঙ্গে নাগ শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে সাপও হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে নাগ ও সর্প একার্থক ছিল না। পরবর্তী কালে দুটি শব্দই সাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও দুয়ের অর্থ-ব্যবধান কোনওদিন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।

মহাভারতে উক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই বিশালকায় গ্রন্থ কিন্তু এমন কি কোন এক যুগে রচিত হয় নি। বিভিন্ন যুগে বহু পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটেছে। মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান ৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছিল। মহাভারতে বর্ণিত নাগজাতির পরিচয়ে আমরা দেখি, নাগ শব্দ কখনও মানুষ নাগজাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও বা সর্প অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত মহাভারতের উপাখ্যান-রচকেরা সরীসৃপ সর্পের গুণাগুণ মানুষ নাগজাতির উপর আরোপ করেছেন। ফলে নাগ-চরিত্র কখনও সর্প-চরিত্রে' সর্প-চরিত্র কখনও নাগ-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নাগ কখনও মানুষ থেকে সর্পরূপ গ্রহণ করেছে, কখনও সর্প থেকে মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছে।

ছ'টি আদি জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বর্তমান ভারতীয় জনসমষ্টি গঠিত। এই ছ'টি জাতিগোষ্ঠীর নাম, নিগ্রটো, প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েড, মঙ্গলয়েড, মেডিতেরেনীয়ান অ্যালপিনয়েড ও নর্ডিক। এই ছ'টি আদি জাতিগোষ্ঠী কথা বলত চারটি আদি ভাষায়—অস্ট্রিক, টিবেটো চাইনিজ, দ্রাবিড় ও আর্য। অস্ট্রিক ছিল প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েডদের ভাষা, টিবেটো-চাইনিজ মঙ্গলয়েডদের ভাষা, দ্রাবিড় মেডিতেরেনীয়ানদের ভাষা আর আর্য ছিল নর্ডিকদের ভাষা। নিগ্রটো ও অ্যালপিনয়েড তাদের নিজেদের ভাষা রক্ষা করতে পারে নি, হারিয়ে ফেলেছিল। অ্যালপিনয়েডরা নর্ডিকদের আর্য ভাষা গ্রহণ করেছিল—যদিও তাদের সংস্কৃতি ছিল স্বতন্ত্র। আমরা যে নাগজাতি নিয়ে আলোচনা করছি, তার উৎপত্তি হয়েছিল মনে হয় অ্যালপিনয়েড জাতিগোষ্ঠী থেকে। নাগজাতির বিবরণে আমরা দেখি, নাগজাতি আর নর্ডিক তথা আর্যজাতি দুজনের কেউই সামাজিক প্রতিপত্তিতে নিজেকে হীন মনে করত না, দুজনের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানও ছিল; কিন্তু দুজনের সংস্কৃতি ছিল স্বতন্ত্র, এমন কি পরস্পর-বিরোধী। নাগজাতি ও আর্যজাতির ভাষা এক হওয়ায় তাদের মধ্যে মেলামেশা ছিল। কিন্তু সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের হওয়ায় এই মেলামেশা অনেক সময়ই বিরোধে পরিণত হত।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে অ্যালপিনয়েড মানবের কঙ্কাল করোটি পাওয়া গেছে। পাটাতনে আসীন এক দেবতার মূর্ত্তিও পাওয়া গেছে যার দুপাশে রয়েছে নতজানু দুজন ভক্ত আর ভক্তদুজনের পিছনে রয়েছে একটি করে দুটি উর্ধ্ব-ফণা সাপ। এটি নাগজাতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। দেবতাটি শিবের আদিরূপ। অ্যালপিনয়েড জাতিগোষ্ঠীর মানসেই শিবের কল্পনা জন্ম নিয়েছিল বলে মনে হয়।

নর্ডিক আর্যদের আগেই অ্যালপিনয়েড নাগেরা ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। নাগেদের প্রধান বাসস্থান ছিল ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম অংশে। ভারতে প্রবেশ করে আর্যদের নাগদের সঙ্গে কোন বড়রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় নি বলে মনে হয়। ভারতে আগত নাগেদের সংখ্যাও তখন ছিল খুব অল্প।

মহাভারতে সর্পযজ্ঞের কথা আছে। অর্জুনের প্রপৌত্র ও পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এই যজ্ঞ করেছিলেন। মুনি উতঙ্কের মুখে তক্ষক নাগের দংশনে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুকথা শ্রবণ করে এবং তাঁরই দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তক্ষক সহ সর্পকুল নির্মূলের উদ্দেশ্যে জনমেজয় সর্পযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। বহু সর্প যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তক্ষক নাগের সখ্য ছিল। তিনি ভয়ে ইন্দ্রের আশ্রয় নেন। কিন্তু ইন্দ্রও তাঁকে রক্ষা করতে পারেন না। অবশেষে আস্তিক মুনি এগিয়ে আসেন। পিতা জরৎকারু মুনি, মাতা বাসুকি, ভগিনী জরৎকারু। আস্তিক মুনির প্রার্থনায় জনমেজয় যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হন। তক্ষক তথা আস্তিক মুনির মাতুল বংশ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

উপাখ্যানকার সর্পযজ্ঞের রূপ দিলেও আসলে এই যজ্ঞ নাগবংশীয় প্রধান তক্ষকের সঙ্গে আর্যবংশীয় তথা চন্দ্রবংশীয় প্রধান জনমেজয়ের সংঘর্ষ। তক্ষশিলা ছিল নাগরাজ তক্ষকের রাজধানী ; এই তক্ষশিলা বর্তমান পাকিস্তান পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডির কাছে অবস্থিত ছিল। আর ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল চন্দ্রবংশীয় রাজা জনমেজয়ের রাজধানী ; ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল দিল্লীর প্রান্তে। তক্ষকের রাজধানী তক্ষশিলায় এই সর্পযজ্ঞ অর্থাৎ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিষময় ফলে ভারতখণ্ডে কোন পরাক্রান্ত কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল না। চন্দ্রবংশীয় রাজা পরিক্ষিতের শক্তি খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। নাগরাজ তক্ষক তার সুযোগ নিয়ে পরিক্ষিৎকে দংশন করেন অর্থাৎ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করেন। তক্ষক নাগবংশীয় হলেও ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্যের ভিতর দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। আস্তিক মুনির মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বন্ধ হয়। আস্তিক মুনির মাতা নাগবংশীয় হলেও আস্তিক মুনির পিতা জরৎকারু ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজে আস্তিক মুনির বোধ হয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সেজন্যেই তাঁর পক্ষে জনমেজয় ও তক্ষকের সংঘর্ষ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। তক্ষক কর্তৃক পরিক্ষিৎ যখন নিহত হন, জনমেজয়ের বয়স তখন খুবই কম ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি রাজা হন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলে উতঙ্ক মুনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁকে প্ররোচিত করেন। জনমেজয়ও তক্ষশিলা আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়াসী হন।

তক্ষক পরিক্ষিৎকে দংশন করবেন, এই কথা জানাজানি হলে কাশ্যপ নামে এক সর্পচিকিৎসক ব্রাহ্মণ তাঁকে রক্ষা করার উদ্দেশে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হয়েছিলেন। তক্ষক ক্ষপণকের ছদ্মবেশে তাঁকে সেই কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এখানে তক্ষকের নরত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। পরিক্ষিৎকে প্রদত্ত ফলের মধ্যে তক্ষক তাম্রবর্ণ একটি কীটের আকারে লুক্কায়িত ছিলেন এখানে তাঁর সর্পত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। এই তাম্রবর্ণ ক্ষুদ্র কীট ক্ষুদ্রাকার পুঁয়ে সাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ্য, পুঁয়ে সাপ সম্পূর্ণ বিষহীন—যদিও সাধারণের ধারণা ভীষণ বিষধর।

খাণ্ডবদাহনের বিবরণেও আমরা তক্ষক নাগের দর্শন

পাই। খাণ্ডববন ছিল ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে যমুনা নদীর তীরে। এই খাণ্ডববনে তক্ষক নাগ স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করতেন। ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে নাগজাতির বাস পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় সমীচীন মনে করেন নি। তাই খাণ্ডব-দহনের ব্যবস্থা। তক্ষক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তক্ষকের স্ত্রী পুত্র অশ্বসেনকে নিয়ে সেই অরণ্যাঞ্চল ত্যাগ করতে উদ্যত হন। কিন্তু অর্জুনের শর তাঁর দেহ বিদ্ধ করে—এবং তিনি পরলোক গমন করেন। অশ্বসেন অবশ্য পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। খাণ্ডববন খাণ্ডবপ্রস্থে পরিণত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই অশ্বসেন কৌরবপক্ষে যোগ দেয়—এবং অর্জুনের হাতে নিহত হয়। উপাখ্যানকারের বর্ণনায় অবশ্য অগ্নিদেবের পরিতৃপ্তির উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন খাণ্ডববন দহন করেন। উপাখ্যানকারের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অশ্বসেন কর্ণের তূণমধ্যে সর্পবাণরূপে অবস্থান করেন। কর্ণ বাণরূপী সর্পকে অর্জুনের প্রতি ক্ষেপণ করলে অর্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে অর্জুনের রথ কিছু নিচু করে দেন। তাতে অর্জুনের কিরীট ছেদিত হয় মাত্র। তখন অশ্বসেন নাগ নিজ-মূর্তিতে অর্জুনের দিকে ধাবিত হয়—এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়। অর্জুনের শরাঘাতে তক্ষক-পত্নী নিহত হওয়ার কারণই বোধ হয় তক্ষক কর্তৃক পরিক্ষিৎকে হত্যার পিছনে রয়েছে।

সঞ্জয়-কৃত মহাভারতে আমরা একটি নতুন তথ্য পাই। তক্ষক ছিলেন রাজা পরিক্ষিতের শ্বশুর। জনমেজয় ছিলেন তক্ষক-কন্যার গর্ভজাত। পঞ্জাবের একটি লোক-কথায় প্রকারান্তরে এই কথারই সমর্থন পাই। লোক-কথাটিতে বলা হয়েছে, পরিক্ষিৎ নাগরাজ বাসুকির (তক্ষকের?) এক কন্যাকে হরণ করেন। এরূপ কিছু ঘটা আশ্চর্যের কিছু নয়। পূর্বেই বলেছি, নাগও আর্যদের মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদান ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগকন্যা উলূপীকে বিয়ে করেছিলেন। নাগেরা এক ধরনের তরল রসায়নের সঙ্গে পরিচিত ছিল। অশ্বমেধযজ্ঞ কালে যজ্ঞীয় অশ্ব ভারতের পূর্বখণ্ডে এলে চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বভ্রুবাহন সে অশ্ব ধরেন। যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। উলূপী তখন সেই মৃতসঞ্জীবনী রসায়ন এনে অর্জুনকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। ঐরাবত বংশীয় কৌরব্য নামে নাগ-রাজের কন্যা বলে অর্জুনের কাছে উলূপী নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুষঙ্গে নাগের অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে যেমন সাপও বুঝিয়েছে, তেমনি দীর্ঘাকার সাপের সঙ্গে হস্তিশুণ্ডের সাদৃশ্যে নাগের অর্থ আরও সম্প্রসারিত হয়ে হাতিও বুঝিয়েছে। উলূপী কৌরব্য নাগরাজের কন্যা হলেও তাঁর মাতুলবংশ এমন এক দলভুক্ত ছিলেন যাদের টোটেম ছিল ঐরাবত অর্থাৎ হাতি। তা না হলে উলূপী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মাত্র কৌরব্য নামে নাগরাজের কন্যা বলেই পরিচয় দিতেন—ঐরাবত বংশীয় বলে তা বিশেষিত করতেন না। ঐরাবত বলে একটি নাগও আছে। কিন্তু তা ঐরাবতের আদি অর্থ নয় বলে মনে হয়।

পঞ্চ পাণ্ডবের দেহেও নাগজাতির রক্ত প্রবেশ করে-ছিল মনে হয়। দুর্যোধন কর্তৃক নির্যাতিত ভীমসেন নাগলোকে গেলে বাসুকি নাগ বলেছেলেন, ভীমসেন আমাদের দৌহিত্রের দৌহিত্র। ভীমসেনের মাতা কুন্তীর পিতার মাতামহ ছিলেন আর্যক নাগ। সেই সূত্রেই বাসুকি ঐ কথা বলেছিলেন।

কলি কর্তৃক নির্যাতিত চন্দ্রবংশীয় নিষধপতি নল অরণ্যে বিচরণের সময় দেখলেন, একস্থানে দাবানল জ্বলছে আর কে যেন তাকে উদ্ধার করার জন্যে করুণ-স্বরে ডাকছে। এগিয়ে গিয়ে তিনি এক কুণ্ডলীকৃত স্থূল-কায় নাগ দেখতে পেলেন। তাকে বহন করে নল এক নিরাপদ্ স্থানে নিয়ে গেলেন। ঐ নাগের নাম ছিল কর্কোটক। প্রত্যুপকারে কর্কোটক নলকে দংশন করলেন। তাতে নলের সুন্দর রূপ বিবর্ণ হয়ে গেল। কর্কোটক নলকে বুঝিয়ে বললেন, লোকে আপনাকে রাজা বলে যাতে চট্ করে চিনতে না পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা করলাম। এই উপাখ্যানে কর্কোটক নাগকে বিশালকায় অজগর সাপ বলে কল্পনা করা হয়েছে।

আসলে কর্কোটক মানুষই ছিলেন। তিনি ঐ অরণ্যেই বাস করতেন। নলকে ছদ্মবেশ ধারণে তিনি সাহায্য করেছিলেন।

দেব ও অসুর পরস্পরের শত্রু। সাময়িকভাবে সখ্য স্থাপন করে তারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেছিল। মন্দর পর্বত হয়েছিল মন্থনদণ্ড, আর মন্থনরজ্জু হয়েছিলেন বাসুকি নাগ। এই মন্থনে বহু ধনরত্নাদি লাভ হয়। পর্বত মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি মন্থনরজ্জু হওয়ার মধ্যে দিয়ে পর্বতে শয়ান বিরাট্‌কায় অজগর সাপের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাসুকি নাগ অজগর সাপ। কিন্তু এই উপাখ্যানের প্রকৃত মর্মার্থ যা অনুমিত হয়, তা বলি।

হিমালয়ের পাদদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অনেক স্থানই জলমগ্ন থাকে। অতীতে তো থাকতই তাই প্রাচীনদের কাছে এই স্থান ছিল সমুদ্র। ক্ষীরোদ সমুদ্র পূর্ব সমুদ্র, মন্দর পূর্বদিকেরই পর্বত। এই অঞ্চলে প্রাধান্য লাভের উদ্দেশে দেব অর্থাৎ আর্যদের এবং অসুর অর্থাৎ দ্রাবিড়দের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ বাধে। ঐ সংঘর্ষ বহুদিন ধরে চলে।

সম্ভবত তখন এই অঞ্চলে বাসুকি বা অন্য কোন নাগ প্রধান তথা নাগজাতির প্রাধান্য ছিল। এর নাগ প্রাধান্য হ্রাসের উদ্দেশে দেব ও অসুর একরফায় আসার প্রয়াসী হয়। বাসুকি নাগ ছিলেন পরম ধার্মিক—সোজা কথায় আর্যঘেঁষা। শেষ পর্যন্ত দেবতারাই সুবিধা লাভ করে। অনন্তশয্যার কল্পনায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে বিষ্ণু অনন্ত তথা শেষ নাগের উপর শয়ন করে আছেন। এর মধ্যে দিয়ে নাগজাতি সম্পর্কে আর্যজাতির প্রভুত্ব ও সখ্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগকে দমন করেছিলেন। এই কালিয় নাগও মনে হয় মানুষ। কালিয় যমুনা হ্রদে তথা কালিদহে গৃহ নির্মাণ করে বাস করতেন। সম্ভবত এ ঘটনা ঘটে মথুরাতে।

শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা বলরাম শেষ নাগের অবতার বলে অভিহিত হয়েছেন। বলরাম যখন মারা যান, তখন তাঁর আত্মা সর্পরূপে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। বলরামের অনেক মূর্তির মাথায় প্রসারিত সর্পফণা দেখা যায়। বলরাম নাগবংশসম্ভূত ছিলেন বলে মনে হয়।

মহাভারতে রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের তথা নাগ-জাতির যে বিবরণ আমরা পাই, তা অনেক পরে রচিত। নাগজাতির ইতিহাসে তখন বিরাট্‌ ব্যাপার ঘটে গেছে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতকের মধ্যে দলে দলে যাযাবর অ্যালপিনয়েড শকজাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারতে ইতিমধ্যে বসবাসকারী নাগজাতির মত শকদের একটি দল শি-র স্থাণে অথবা স্কন্ধে উদ্যতফণা সর্প প্রতীক বহন করত। এরা তাদের পূর্বাগতদের সঙ্গে মিশে বিরাট্‌ নাগ জন-প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। এই দুই দল মূলে একই জাতিভুক্ত এবং একই ঐতিহ্যের ধারক ছিল। বস্তুত এই সময় থেকেই ভারত ইতিহাসে নাগজাতির উপস্থিতি লক্ষিত হয়। অনন্তনাগ, নাগপর্বত, নাগপাহাড়, নাগগিরি, নাগপুর, ছোটনাগপুর, নাগাপাহাড় ইত্যাদি ভৌগোলিক নাম নাগজাতির বিস্তৃতির কিছুটা পরিচয় আজও দেয়।

আরও পরবর্তী কালের পৌরাণিক ঐতিহ্যধারায় নাগ জাতি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল। হিমালয়ের সানুদেশের অধিবাসী যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ইত্যাদি খণ্ডজাতির মত নাগজাতিও ছিল দেবযোনি অর্থাৎ দেবতাও নয়, মানুষও নয়—মর্যাদায় দেবতার নিচে অথচ মানুষের উপর এদের স্থান ছিল।

নাগেরা সর্পপূজক ছিল না। তবে পূর্বপুরুষ পূজার ধারায় তাদের মধ্যে অষ্টনাগ-পূজার প্রচলন হয়েছিল। এই অষ্ট নাগপ্রধানের নাম: অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ। পরবর্তী কালে আরও অনেক নাগপ্রধান পূজিত হতে থাকেন। নাগপ্রধানদের উপর দেবত্ব আরোপ মহাভারতীয় যুগের পরের ঘটনা। নাগ শব্দ সর্পার্থেও ব্যবহৃত হওয়ায় কালক্রমে সরীসৃপ সর্পপূজার ধারার সঙ্গে অষ্টনাগ পূজার ধারা মিশে যায়—এবং আটজন মানুষ আটটি সাপে পরিণত হয়।

নাগেরা যে মানুষ ছিল, উত্তর ভারতে অনেক মন্দিরে শেষ নাগ, বাসুকি নাগ, তক্ষক ইত্যাদি নাগদেব-- তাদের ক্ষোদিত মূর্তিগুলিই তার প্রমাণ। মানুষেরই আদলে মূর্তিগুলি ক্ষোদিত। বৈশিষ্ট্য এই যে, মূর্তিগুলির মস্তকে রয়েছে প্রসারিত সর্পফণা—কারও মাথায় রয়েছে তিনটি ফণা, কারও বা মাথায় রয়েছে সাতটি ফণা।

বৌদ্ধ লোককথায় জানা যায়, ঝড়বৃষ্টিতে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের সাধনায় পাছে ব্যাঘাত ঘটে, সেজন্যে মুচলিন্দ নামে এক নাগ তাঁর ফণা তাঁর মাথার উপর মেলে ধরেছিলেন। অনুরূপক্ষেত্রে অনুরূপভাবে ধরনেন্দ্র নাগ ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাগিনী জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মাথার উপর ফণা প্রসারিত করে তাঁকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে লোককথা প্রচলিত আছে। আসলে মুচলিন্দ এবং ধরনেন্দ্র ও পদ্মাবতী মানুষ ছিলেন। একভাবে বা অন্যভাবে তাঁরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসারে সহায়ক হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী হওয়ায় নাগদের মধ্যে তাদের প্রসার সহজেই হয়েছিল। এমনও হতে পারে, মুচলিন্দ ও ধরনেন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না—লোককথাকারের কল্পনায় তাঁদের সৃষ্টি। কিন্তু তাঁরা মনুষ্যচরিত্র রূপেই কল্পিত হয়েছিলেন এবং তখনকার প্রচলিত নাগচরিত্রের সংস্কার অনুসারে তাঁদের উপর সর্প চরিত্র আরোপিত হয়েছিল।

বিহারের রাজগৃহে মনিয়ার মঠের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নানা মূর্তিও পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মী লিপিতে তাদের পরিচয় লেখা আছে। একটি মূর্তির তলায় মণি নাগ নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, মণি নাগ থেকেই মনিয়ার মঠের নাম। বলা বাহুল্য, মণি নাগ মানুষই ছিলেন—যদিও মনিয়ার নামে মারাত্মক বিষধর একটি সাপও আছে। বাংলাদেশে এ সাপকে বলা হয় কালাচ বা ডোমনা চিতি। বর্তমান রাজগৃহ মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ। মহাভারতে গিরিব্রজের বর্ণনায় মণি নাগের উল্লেখ আছে।

ছোট নাগপুরের রাজবংশ পুণ্ডরীক নাগের বংশ বলে কথিত। বাংলাদেশে নাগ পদবিধারীরা বাসুকি নাগের বংশধর বলে পরিচয় দেন।

বর্তমানে যে নাগা সাধু সম্প্রদায় আমরা দেখি, তাঁরা বোধ হয় নাগজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। এই সব সন্ন্যাসী তাদের মাথার লম্বিত জটা পাক দিয়ে উষ্ণীষের মত বদ্ধ করে রাখে। এই ধরনের জটা নাগজটা নামে অভিহিত।

নাগজাতির সংস্কৃতি বেশ উন্নত ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে চৈত্য দেখা যায়, নাগেরাই তার নির্মাণকর্তা বলে মনে হয়। নাগেরা সমুদ্রপথে যাতায়াতেও দক্ষ ছিল। নাগ রমণীদের সৌন্দর্যের জন্যে অনেক আর্য প্রধান তাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী হতেন। লোককথায় সর্পচরিত্র আরোপিত নাগেদের মণিমুক্তা ধনদৌলতের কথা বলা হয়েছে। নাগেরা বহুদিন পর্যন্ত যাযাবর ছিল। দূরদুরান্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় স্বভাবতই তারা নানা ধাতুদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারত।

কংগ্রেস-স্মৃতি

(দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ১০ ॥

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারিত হয়েছিল বেলা ২টার সময়। এদিনও নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পূর্বদিনের মতই সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহকারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

যথারীতি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

সাধারণ সম্পাদক অসুস্থ হাকিম আজমল খাঁ কর্তৃক প্রেরিত তাঁর বাণী পড়ে শোনালেন। এই বাণীতে তিনি সাইমন কমিশন বয়কট এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। এই তাঁর শেষ বাণী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তির পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর হাকিম সাহেব রামপুরে তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সমস্ত দেশ মর্মাহত হয়।

তারপর সাধারণ সম্পাদক মশায় মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী দেশমুখ, দেওয়ান বাহাদুর টি. রঙ্গচারিয়া এবং বি. মদনের কংগ্রেসের শুভেচ্ছা সূচক টেলিগ্রাম পড়ে শোনালেন।

আজকার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন নি।

আজকার প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রস্তাব উত্থাপন করে অন্যান্য কথার পর পণ্ডিতজী বললেন, যে লক্ষ্য আজ ঘোষণা করা হল তা কংগ্রেসের দূরবর্তী লক্ষ্য নয়—তা কংগ্রেসের বর্তমানের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আজ অথবা কাল, এক বৎসর অথবা দশ বৎসরে পৌছুনো যাবে কি না তা নির্ভর করছে কংগ্রেসের শক্তির উপর।

বালুসু সাম্বমূর্ত্তি প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর ভি. আই. শাস্ত্রী বক্তৃতামঞ্চে উঠে জানালেন যে তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনির মধ্যে তাঁর বক্তব্য হারিয়ে গেল। এক বর্ণও শোনা গেল না। তাঁকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন সভাপতি মশায় সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করে। তাতে ফল হল। তখন তিনি তাঁর মত বিবৃত করলেন।

এস্‌. সত্যমূর্ত্তি প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং উঠে পূঃ বক্তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দ্বারা তাঁর মত খণ্ডন করলেন।

অতঃপর মৌলানা শওকত আলী কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত বাংলার অন্তরীণ বন্দী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে বন্দীদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের হৃদয়হীন ব্যবহারের বর্ণনা দিলেন।

ডাঃ সত্যপাল এবং জি হরি সর্বোত্তম রাও কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর সভাপতি মশায় স্বয়ং নাগপুর সত্যাগ্রহের নেতা এভারির (যিনি ১৪দিন যাবৎ অনশন ব্রত পালন করছেন) প্রতি সমবেদনা সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধি মং মৌজে—ব্রহ্মদেশে উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে এবং ভারত ব্রহ্মদেশের আঁতাত সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

রেভারেণ্ড উত্তম ও টি. প্রকাশম্ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সাইমন কমিশন বয়কট বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

যেহেতু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী ষ্ট্যাটুটারী কমিশন নিযুক্ত করেছে অতএব এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে ভারতবর্ষের একমাত্র আত্মসম্মানজনক পন্থাই হবে প্রতিপদে এবং সর্ব্বপ্রকারে উক্ত কমিশন বয়কট করা। বিশেষ করে,

(ক) এই কংগ্রেস দেশের জন-সাধারণকে এবং দেশের সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিচ্ছে :—

(১) ভারতে কমিশনের আগমনের দিন গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করতে এবং যে-সকল শহরে কমিশন উপস্থিত হবে সেই সকল শহরে অনুরূপভাবে গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করতে।

(২) জনমত গঠনের জন্য জোরের সহিত আন্দোলন চালাতে, যাতে সকল প্রকার রাজনৈতিক মতের ভারতীয়দের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুষ্ঠুভাবে কমিশন বয়কট সাফল্যমণ্ডিত হয়।

(খ) এই কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন বিধানসভার বেসরকারী সদস্যদের এবং ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের ও সম্প্রদায়ের নেতাদের এবং অন্যান্য সকলকে কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান না করতে এবং তাদের সহিত কোন প্রকার প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সহযোগিতা না করতে, অথবা তাদের উপলক্ষ্যে আয়োজিত সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে আহবান করছে।

(গ) এই কংগ্রেস বিধানসভার আসন শূন্য বলে গণ্য করার বাণী প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং মন্ত্রিত্বের পতন ঘটানো বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কংগ্রেসদস্যদের বিধানসভায় যোগদান না করতে আহ্বান করছে।

(ঙ) এই কংগ্রেস বয়কট কার্য্যকর ও সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দলগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং যথাসম্ভব তাদের সহযোগিতা অর্জন করতে ওয়ার্কিং কমিটীকে ক্ষমতা প্রদান করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে অন্যান্য কথার পর আয়েঙ্গার মশায় বললেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করা কোন মতেই উচিত হয় নি। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে সাইমন কমিশন বয়কট ব্যাপারে জিন্না সাহেব, স্যর চিমনলাল শীতলবাদ, স্যর শিবস্বামী আইয়ার, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, এবং সি ওয়াই চিন্তামণি কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবেন।

ডঃ অ্যানি বেশান্ত প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে, কোন ভারতীয়ই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতের অধিকার সম্বন্ধে বিচারের ক্ষমতা ইংরাজের নেই।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ভারতীয়, তা তিনি হিন্দুই হোন মুসলমানই হোন, কমিশনের এই অপমান ছুঁড়ে ফেলে দিতে সঙ্কল্প করেছেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি কমিশনকে প্রতিপদে এবং সর্ব্বপ্রকারে বয়কট করবেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে মূল প্রস্তাবের (ঘ) ধারার পরিবর্তে

একটি নূতন ধারা দ্বারা বিধানসভার সদস্যদের তাঁদের আসন ইস্তফা দিতে এবং তৎপরিবর্তে খদ্দরের প্রচার ও বিলাতী বস্ত্র বর্জনের কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে।

কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

টি প্রকাশন আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা বিধানসভার সদস্যদের কাউন্সিলে পুনঃ প্রবেশ করে যে-সকল আইন ওয়ার্কিং কমিটীর মতে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী তা বাধাদানের অধিকার দিতে বলা হয়েছে।

বাল্লুস্থ শাম্ব্যমূর্তি এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য আর কে করন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে কাউন্সিলের কর্ম্মসূচী প্রতি ছয় মাস অন্তর বদলানো হচ্ছে। এটা বিধানসভার সদস্যদের প্রতি অপমান সূচক।

জর্জ যোসেফ আর-একটি সংশোধনা প্রস্তাব দ্বারা (খ) ধারায় পরে নিম্নলিখিত উপধারা সংযোগ করতে বললেন :—

এই কংগ্রেস সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদ মীমাংসা সম্ভব না হলে তার সমাধান মুলতুবি রেখে কমন দাবির উপর মন দিতে সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নেতাদের নিকট আবেদন করছে।

অভয়ঙ্কর সমুদয় সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মাদ্রাজের বশির আমেদ সঈদ এম-এল-সি, বললেন যে, বিধানসভার সদস্যরা গভর্ণমেন্টের খারাপ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিসের কাজ করছেন। কাউন্সিলে তাঁদের কার্য্যাবলী সি আর দাশের বিধানসভার অভ্যন্তরে অসহযোগ নীতির অনুকূল।

মাননীয় ভি রামদাস মূল প্রস্তাব থেকে (ঘ) ধারা বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

তারপর মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বিতর্কের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার পর প্রস্তাবগুলির উপর ভোট গ্রহণ করা হল।

ভোটে সকল সংসোধিনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। তারপর মূল প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

সেদিনের মত অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

পরবর্তী অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হল ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময়।

॥ ৩১ ॥

২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। রাত্রি ১১টা থেকে শেষ রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলল। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। সমস্ত রাত্রি ধরে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নি।

এই অধিবেশনে হিন্দুমুসলমান সমস্যা, যৌথ নির্ব্বাচন, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রচলন এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে প্রস্তাবের মুশাবিদা করে সভায় উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমানদের এক পক্ষের দাবি যদি যদৃচ্ছা বাদ্যসহকারে শোভা-যাত্রা পরিচালনার অধিকার এবং অপর পক্ষের-দাবি যেখানে ইচ্ছা উৎসর্গ ও খাদ্যের প্রয়োজনে গোহত্যা করার অধিকার, এই উভয় দাবি অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমানরা মুসলমানদের নিকট গোহত্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে যত দূর সম্ভব আঘাত না দিতে এবং হিন্দুরা হিন্দুদের নিকট মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে যতদূর সম্ভব আঘাত না দিতে আবেদন করছে এবং সেই হেতু কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে দাবি স্থাপনে শক্তি অথবা আইনের আশ্রয় না নিতে আহ্বান করছে।

এই প্রস্তাবের উপর বেশী তর্কবিতর্ক হল।

দীর্ঘ আলোচনার পর প্রস্তাব কংগ্রেসের জন্য সুপারিশ করা হল।

তারপর হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য ভোটাধিকার ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হল।

এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর বোম্বাই অধিবেশনের প্রস্তাব, যার ভিত্তিতে বর্তমান প্রস্তাব রচিত হয়েছে তা, ব্যাখ্যা করে শোনালেন। তারপর তিনি যৌথ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস বিবৃত করলেন এবং জানালেন, কেন কংগ্রেস উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে রাজি হয়েছে এবং কেন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠন করতে রাজি হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, কোন সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর মিশ্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে বলা হয়েছে ভবিষ্যতের যেকোন সংবিধান পরিকল্পনায় যেন নিম্নলিখিত নীতি পালিত হয় :—

(১) বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা মজুর এবং পুঁজিপতি, ছাড়া আসন সংরক্ষণ না রেখে যৌথ নির্বাচন।

(২) দেশব্যাপী সাবালকত্বের ভোটাধিকার।

তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ।

এই উক্তির পর জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য কি না।

মিশ্র মশায় উত্তর দিলেন যে হ্যাঁ, তাঁর সেই গৌরব আছে। তিনি মন্তব্য করলেন যে, যদি তাঁর বন্ধু মৌলানা মহম্মদ আলী খিলাফৎ কমিটীর সদস্য হতে লজ্জা বোধ না করেন তা হলে তিনিই বা কেন হিন্দু সভার সদস্য হতে লজ্জা বোধ করবেন।

ডাঃ মুঞ্জে, সরদার শার্দুল সিং, অন্নপূর্ণিয়া প্রভৃতি সদস্যগণ আলোচনায় যোগ দিলেন।

এম· এস. আনে মূল প্রস্তাবে একটি নূতন ধারা সংযোগ করতে বললেন যাতে সমস্ত সিডিউল্ড ভূখণ্ডগুলিতে যুগপৎ শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

তিনি বললেন, কংগ্রেস যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভীতির জন্য পথভ্রষ্ট না হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে,

১। কংগ্রেস আশা করে যে ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক অংশ জন-সাধারণের প্রতিনিধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের সুফল লাভ করবে। এই মত পোষণ করে কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে শাসন সংস্কারের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ভারতের যে শাসন পদ্ধতি এবং আইনের প্রচলন আছে সেই প্রকার শাসন পদ্ধতি ও আইনের অধীনে তাকে আনতে হবে কেবল মাত্র উক্ত প্রদেশের বিশেষ অবস্থা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

২। কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে সেই সকল প্রদেশের শাসন ব্যাপারে সংখ্যাগুরু করার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করার পরিকল্পনাকে ধিক্কার দিয়ে (কারণ এটি জনপ্রিয় প্রতিনিধি মূলক গভর্ণমেন্টের মূলনীতি এবং অকৃত্রিম জাতীয় ভাবপ্রবণতার পরিপন্থী) কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে যে কোন কার্য্যকরী পুনর্গঠনে প্রস্তুত আছে যদি তা আর্থিক বিবেচনার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্ভবপর হয়।

সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিত-জী তাঁর সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার সময় ব্রিটিশ ভারতের উল্লেখ করায় মৌলানা মহম্মদ আলী বাধা দিয়ে বললেন যে, "ভারতীয় ভারত" (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া)। পণ্ডিত-জী তাঁর সহিত একমত হয়ে বললেন যে 'নিশ্চয়ই'। তারপর তিনি বললেন যে, তিনি চান দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের রাজ্যে দায়িত্বশীল

গভর্ণমেন্ট প্রচলন করেন। এই সময় মহম্মদ আলী পুনরায় বাধা দিয়ে বললেন যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া' শব্দদ্বারা স্বাধীন ভারতের কথা বলেছিলেন।

মালবীয়জী বললেন 'হিয়ার, হিয়ার'। এজন্য তিনি মৌলানা সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানালেন যে, তিনি কি বোকা। এই উক্তিতে সভাগৃহ তুমুল হাস্য-রোল ও হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হল।

ডাঃ মুঞ্জে এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সরদার শাদু্‌ল সিং, অন্নপূর্ণিয়া প্রভৃতি সদস্যগণ এই আলোচনায় যোগ দেন।

এস. সত্যমূর্তি মূল প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে, তিনি আশা করেন যে, প্রস্তাবটিকে কোন সম্প্রদায়ের দাবির জন্য নয় তার নিজস্ব গুণ বিবেচনা করে সকলে গ্রহণ করবেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে মুঞ্জে ও মহম্মদ আলীকে একজন পরম হিন্দু ও পরম মুসলমান স্বরূপে নয়, পরম ভারতপ্রেমিক হিসাবে তৈরি করার জন্য কোন মূল্যই অধিক নয়।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুঞ্জে এবং জয়াকর উভয়েই প্রস্তাবটি বোম্বাইতে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস উৎকল প্রদেশ গঠনের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাবটি যথারীতি সমর্থিত হল।

আর. কে. সিদ্ধ পৃথক সিন্ধু প্রদেশ গঠনের দাবি করলেন। ডঃ চৈতরাম এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

তারপর কয়েকটি মামুলি প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হল।

শেষ রাত্রি ৪টার সময় (ইংরাজি মতে ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৪টার সময়) বিষয় নির্বাচনী কমিটীর অধিবেশন শেষ হল। ক্রমশঃ

কান্ত কথা

শান্তিলতা রায়

'আনন্দময়ী'ও ছাপাবার জন্য সঙ্কলিত হয়ে যন্ত্রস্থ হতে চলে গেল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বাবাকে দেখতে প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন। তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাগুলি নিয়ে বাবার সঙ্গে অনেক কথা হ'ত। বাবা লিখতেন, সত্যেন, তুমি ছন্দের বিচিত্র ধারা নিয়ে এসেছ; এ সৌন্দর্য্যের তো কোথাও তুলনা পাইনে। তুমি ছন্দের যাদুকর। তোমার লেখনী অক্ষয় হোক। সত্যেন দত্ত তাঁর কয়েকটি বই বাবাকে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমার মনে আছে 'বেণু ও বীণা' 'কুহু ও কেকা' 'ফুলের ফসল' এই তিনখানি আমাদের এত ভালো লাগত যে সব ভাইবোনেরা মিলে আমরা প্রায় সব কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বাবাকে কেউ বই দিলে সেগুলি প্রায় আমাদের হয়ে যেত। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, গায়ে পাঞ্জাবীর ওপরে একটি চাদর ভাঁজ করা থাকত। সত্যেন দত্তকে বাবা খুব ভালো-বাসতেন। তিনি এলেই বাবা তাঁকে দু'হাত দিয়ে ডেকে নিতেন।

বাবার শারীরিক কষ্ট যেন একটু একটু করে বেশী হয়ে উঠছিল। ডাক্তার বার্ড সাহেব, ডাঃ সুরাওয়ার্দ্দি, আরও একজন ইংরেজ ডাক্তার বোধহয় নামটা ওকেনেলি তিনিও প্রত্যেক দিন আসতেন। একদিন বাবা বললেন, আমার ছোট ছেলের মাত্র দু'বছর বয়স। ও

তো বড় হয়ে আমাকে আর দেখতে পাবে না, সুরেন, ওকে আমার কোলে দিয়ে একটা ফোটো তুলে রাখ। বড় হয়ে ও দেখবে ওরও বাবা ছিল। তাই করা হল। বাবা কোলে নিয়ে বসে আছেন আমাদের ছোট ভাই-টিকে। বড় হয়ে সেই ছবি নিয়ে সে প্রায়ই সামনে করে বসে থাকত। ও আমাদের বড় আদরের ভাই ছিল।

এর মধ্যে আমাদের পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা বেড়ে গেল। বাবার চিকিৎসা ও আমাদের এত বড় পরি-বারের খরচ সঙ্কুলান ও দাদাদের স্কুল, কলেজের ব্যয়, নানান্‌টা মিলিয়ে মা বাবা খুব দুর্ভাবনায় পড়লেন। দিঘাপতিয়ার কুমার, শরৎকুমার রায় বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন—তিনি সব সময়ই বাবার খোঁজ-খবর নিতেন; কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি জানতেন এই রোগের কি রাজসিক ব্যয়। তিনি রাজসাহীর সুধীজনের মর্ম্মব্যথা নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। রজনীকান্তের জন্য তাঁর নিজেরও একটা কর্ত্তব্য আছে ভেবে তিনিই এগিয়ে এসে-ছিলেন কিভাবে রজনী সেনের জন্য কিছু করা যায়। তাতে তাঁর বিবেকে এই চিন্তাই এল, তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন খুব বেশী। এবং শরৎকুমার অর্থ ই পাঠিয়ে দিলেন বন্ধুকে। এবং অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই পাঠালেন যদি এতে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ের সামান্য কিছুও সুবিধা হয়। বাবা তাঁর অর্থসাহায্য পেয়ে মনে যথেষ্ট বল পেলেন। 'অমৃত' বই-টি তাঁকেই বাবা উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর কাছে চিঠি লিখেছিলেন :

কুমার

আমি আইন ব্যবসায়ী। কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন দুর্লক্ষ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাহা লইয়াই জীবিত ছিল।

একান্ত অনুগত—শ্রীরজনীকান্ত সেন।

তাঁকে আরও লিখলেন—

'নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা।
রুগ্ন ক্ষীণ অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হতে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে করেছে তুমি ছাড়া, আর কে বা পারে।
কি দিব কাঙাল আমি রোগ শয্যাপরি
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র হার বহু যত্ন করি;
ধর দীন উপহার, এই মোর শেষ,
কুমার করুণানিধি দেখো র'ল দেশ।

বাবা এই কবিতাটি লিখে অমৃত বইখানি কুমার শরৎকুমার রায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। মা-কে বললেন, দেখ, এই ক্ষুদ্র জীবনটাকে বাঁচাবার জন্য শরৎকুমারও এগিয়ে এসেছেন। দয়াল হরি কাকে দিয়ে কি করায়, কেন করায়, কিছু কি বুঝবার কি উপায় আছে? কিছুই জানিনে, কিছুই বুঝিনে, শুধু বুঝি দয়াল হরির চরণে সব সমর্পণ কর। আমি শুধু এ ঋণ নিয়েই যাব, আমার আর কিছুই দিয়ে যাওয়া হল না। শ্রীহরির বাসনাই পূর্ণ হোক। যাবার পথে দুধার থেকে মমতা ভালবাসা কুড়িয়ে নিয়েই যাচ্ছি; এমন পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে হয়?

শরীর ক্রমেই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়ে আসতে লাগলো গলার কষ্টও বাড়তে লাগল। কিন্তু লেখার বিরাম নাই। সারা রাত নিষ্কম্প প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোক যেন রোগযন্ত্রণার কোলে বসে আছে। কোন অমোঘ শক্তির চালনায় লেখনী ও অন্তর এক হয়ে গেছে। 'আনন্দময়ী' বইখানির ভূমিকা লেখা শেষ হল। সুর দিলেন নিজে। সঙ্কলিত হয়ে এস কে লাহিড়ীর কাছে চলে গেল। নতুন কবিতা নতুন গানে আবার খাতা ভরে উঠতে লাগল। একদিন বললেন—সুরেন এই কবিতাগুলো আলাদা করে রেখো। যদি একত্র করে ছাপাতে পারো তবে তার নাম দিও 'বিশ্রাম'। বোধহয় এই বিশ্রামেই আমার চির বিশ্রাম।

ডাক্তাররা রোজই আসেন, দেখেন, বসে থাকেন, চলে

যান। ডীপ এক্সরেতে আর বিশেষ ফল হচ্ছে না। কটেজ থেকে মেডিক্যাল কলেজে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছেন। বাবার শারীরিক অবস্থা দেখে সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। রাজসাহীতে বাবার কিছু ঋণ ছিল, বাবার শারীরিক এই অবস্থা জেনে বাবাকে তারা ঋণ শোধের জন্য বিশেষ তাগিদ দিতে আরম্ভ করল। বাবা তখন নিরুপায়। এমন অবস্থা হ'ল—হয়ত পাওনাদাররা নালিশ করবে এই রকম ভয় দেখাতে সুরু করলো। পাওনাদারেরা এইটুকু বুঝেছিল যে, রজনী সেন আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তখন এ টাকা আদায় হওয়া খুব কঠিন হবে। মা-ঠাকুমা বাবা যেন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে আমাদের পিসীমা ও পিসামশাই বাবাকে দেখতে কটেজে এলেন। বাবা তো তাঁদের পেয়ে খুশী কি করে আনন্দ প্রকাশ করবেন শতবার লিখেও তৃপ্তি পাচ্ছেন না। মনের ওপর দেনার চাপ, শরীরের কষ্ট—তার মধ্যেই তাঁদের খবর নিচ্ছেন। তাঁরা ও বাবাকে ঘিরে বসে আছেন। এর মধ্যে একদিন খবর এল, কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাবাকে দেখতে আসছেন। শুনে বাবা বললেন, সেই রাজসাহী কনফারেন্সে মহারাজার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণে আছে। তাই এই মৃত্যুপথযাত্রী দীন কবিকে দেখতে আসছেন। আমি কি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবো? আমার আর কি আছে? আমার গান শুনতে ভালোবাসতেন, সে কণ্ঠ তো রুদ্ধ হয়ে গেছে। কথা দিয়েও অভ্যর্থনা জানাতে পারব না, তাও রুদ্ধ। তিনি আসুন, এই যন্ত্রণা-জর্জ্জর দেহ-টুকুই দেখে যান।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এলেন কটেজে। বসলেন বাবার পাশে। সাদা ধবধবে একটি গিলে করা চিলেহাতা পাঞ্জাবী, মাটিতে লুটিয়ে পড়া কোঁচানো ধুতি, পায়ে চটি। যেমন গায়ের রং তেমনি পরিচ্ছদের পবিত্রতা। আমরা সবাই তাঁর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বাবা লিখলেন—আপনার কত কাজ, তারই ভিতর সময় করে আমাকে দেখতে এসেছেন। দেখুন, এই কি সেই রাজসাহীর রজনী কান্ত? যার কথায়, যার হাস্যকৌতুকে, যার গানে যে ক'দিন আপনি রাজসাহী ছিলেন আনন্দিত হয়ে তাকে কাছে কাছেই রেখেছিলেন? না দেব, আমি মৃত্যুপথে চলেছি। দয়াল আমাকে নিয়ে চলেছে। আমি সে রজনীকান্ত নাই। আপনি দেখে যান মানুষের জীবনে কত পরিবর্ত্তন হয়। ভগবান্ আমাকে রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তার প্রেম ভালবাসা দিচ্ছে। না হলে আপনার মত মহাজনকে দীনের কুটিরে দীনকে দেখতে পাঠিয়েছে। আপনার কত দয়া, তাই আমাকে দেখতে এসেছেন। দেখুন কিছু প্রেম দিয়ে যান। আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁর চরণে লীন হয়ে যাই।

এর উত্তরে মহারাজা কি বলেছিলেন সে কথা কেউ-ই লিখে রাখেন নাই বা আমরা রাখিনি। তারপর কথায় কথায় চিকিৎসার কথা উঠল। এবং একটু একটু করে আর্থিক অনাটনের কথাও উঠল। মহারাজ খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সমস্ত বিষয় জেনে নিলেন। তারপরে বাবা আমাদের ডাকলেন, লিখলেন, আমার গাইবার শক্তি হরি হরণ করেছেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তাই আমার ছেলেমেয়ের মুখে একটা গান শুনে যান। বাবা হারমোনিয়াম বাজালেন আমি আর আমার ছোট দাদা গাইলাম—'শুনাও তোমার অমৃত বাণী অধমে ডাকি চরণে আনি'। মহারাজা আমাদের মাথায় নিঃশব্দে হাত রাখলেন, আমরা আবার প্রণাম করে চলে এলাম। বাবার দেনা আছে শুনে বাবার হাত ধরে বললেন, রজনীবাবু, আপনার দেনার দায় সমস্ত আমি গ্রহণ করলাম। আপনার চিকিৎসা ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের ভারও—আমি নিজ হাতে গ্রহণ করলাম। আপনি আমার কাছে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আপনার প্রতি আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। আপনি অসঙ্কোচে গ্রহণ করবেন কথা দিন, অনুমতি দিন। আমি যেন আমার এই পুণ্যব্রত সম্পন্ন করতে পারি। বাবা অভিভূত হয়ে পড়লেন—লিখলেন, দেব, আপনি আমার ক্ষত স্থানে কি শান্তি-প্রলেপ

বুলিয়ে দিলেন সেকথা মুখে বা লিখে বলবার নয়। আপনার সমস্ত দান আমি গ্রহণ করলাম। এবারে বোধ হয় আমি আর যে ক'টা দিন বাঁচি সে ক'টা দিন নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে হরিনাম রচনা করে যাব। আপনার পায়ের ধুলো একটু আমার মাথায় দিন। আপনার ঋণ শোধ এ জন্মে তো হবেই না, বার বার জন্ম নিলেও এ ঋণ শোধ দিতে পারব না। দীনকে ক্ষমা করে যান। আরও একটুক্ষণ বসুন, আরও দু'একটা কথা বলে যান।

তার একটু পরেই মহারাজা গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। বাবার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ঘরে যারা ছিলেন সকলেই নির্ব্বাক্। যেন কেউ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজপুরীর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পরে যখনই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে বা যখনই আমাদের বাড়ী এসেছেন—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে সব সময়ই আমরা মহারাজা বলে সম্বোধন করেছি সেই জন্য তাঁর সম্বন্ধে মহারাজা বলেই লিখেছি।

মণীন্দ্র নন্দী বহরমপুরেই বাস করতেন। বহরমপুরে আমাদের আত্মীয়স্বজনও অনেকেই ছিলেন। সেই আত্মীয়দের নিকট থেকেই তিনি জানতে পেরেছিলেন —যাদের কাছে বাবার ঋণ ছিল, বাবা যাঁদের কাছে ঋণী ছিলেন তাঁরা যখন জানতে পারলেন বাবার শারীরিক অবস্থা ভাল না তখন তাঁদের কি করা উচিত উপদেশ পাবার জন্য বহরমপুরে গিয়ে এই টুকু আইনানুগ ব্যবস্থা করে আসতে পারলেন বাবার মহালের যা খাজনা বাবার পাওনা থাকে—সেগুলি যাতে বাবার হাতে আসতে না পারে দেনার খাতে যায়, সেই ব্যবস্থা করে আসেন। কিন্তু বাবার লিখিত আদেশ ছাড়া এই ব্যবস্থা কার্য্যকর হয়না। তার ফলে বাবার পাওনা টাকাও বাবার হাতে এল না। পাওনাদারেরাই বা সে টাকা কি করে পাবেন। টাকা উভয় পক্ষের দিকেই বন্ধ হয়ে গেল। ফলে বাবার অর্থকৃচ্ছ্রতা বেড়ে গেল। এসব ব্যাপার মণীন্দ্র নন্দী সবই শুনলেন। তার ফলেই তিনি এসে বাবার ঋণভার গ্রহণ করলেন এবং রজনীকান্তের পরিবারের জন্য ও চিকিৎসার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করলেন।

অবশ্য বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমার মা মহারাজার কাছ থেকে মাসিক সাহায্য ও বাবার ঋণ শোধের জন্য পাওনা সমস্ত টাকাই মহারাজার অনুরোধে মহারাজার কাছেই শোধ দিয়ে দিয়েছিলেন। দেশবাসী সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে বাবা কপর্দকহীন দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভিতরের কথা কিছু জানতেন না। সেইজন্যই এই কথা কয়েকটি আমাকে বলতে হ'ল। আমাদের সরিকানি বিবাদের জন্যও খানিকটা অর্থকষ্ট এসে গিয়েছিল। পরে অবশ্য মা সমস্ত বিষয় আসয় ঠিক করে ফেলেছিলেন। আগে যেমন বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, এর পরে ঠিক সেই ভাবেই সব ব্যবস্থা এসে গিয়েছিল।

এর মধ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন বাবাকে দেখতে এলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কথাবার্ত্তা বললেন। তার কয়েক দিন পরেই শুনলাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাবার চিকিৎসার ব্যয় বাবদ একটি থিয়েটারের আয়োজন করেছেন। এবং সেই রাত্রির নাটকে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তার সমস্তটা অর্থই গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাবাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য বাবার হাতে না দিয়ে হেমেন্দ্র বক্সীর হাতেই দিয়ে গিয়েছিলেন। দেশবাসীর ভালবাসার দান, ঈশ্বরের কৃপা বলেই বাবা এই সাহায্য রজনীর দান গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল, কলেজের ছাত্ররাও বাবার 'অমৃত' বই স্কুলে স্কুলে বিক্রি করে কটেজে বাবার জন্য টাকা দিয়ে যেত। রাজসাহীতে বাবর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন উকিল মহেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা চৌধুরী ছিলেন দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের কন্যা ও কুমার শরৎকুমার রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইন্দুপ্রভা চৌধুরী বাবাকে দাদা বলে সম্বোধন করতেন এবং বড় ভাইএর মত শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও বাবার চিকিৎসার জন্য [illegible]

মা যেমন লজ্জিত ও অভিভূত হতেন আবার ভালবাসার দান বলে গ্রহণও করতেন। সমস্ত দেশের লোক বাবাকে বাঁচাবার জন্য অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। এর জন্য বাবার লজ্জার পরীসীমা ছিল না। শুধু লিখতেন, আমি দীন কবি—এত ভালবাসার যোগ্য কি আমি? মাকে লিখতেন, দেখ—আমাকে এরা কি ভালবাসে ,এদের দান আমি অগ্রাহ্য করি কি করে। সেটা কি অকৃতজ্ঞতা হবে না?

এর মধ্যে আমার বড় দাদা নববধূ সহ কলকাতায় এলেন। বাবা কত খুশী। রোজ দুপুর বেলা বউদিকে কাছে ডেকে নিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করতেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার সময় কণ্ব মুনি যে সব উপদেশ শকুন্তলাকে দিয়েছিলেন, বাবা সেই সব কথা বলে বউদিকে নানারকম উপদেশ দিতেন। বউদিও যতটা সম্ভব বাবার কাছে কাছেই থাকতেন। তখনকার দিনে মেয়েদের বাইরে বেরুনো, বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা বা মেলা-মেশার রীতি ছিলনা। কিন্তু আমার বাবার এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। ভদ্রলোকের সঙ্গে দরকার মত কথাবার্ত্তা বলা, সহজ ভাবে সবার সঙ্গে চলা, মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা, এ সব বাবা দরকার বলে মনে করতেন। সেইজন্য আমাদের বাড়ীর মেয়েরা সংসারের দায়িত্বও যেমন বহন করেছেন বাহিরের কাজও সঙ্গে সঙ্গে করেছেন। বউদিকে অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। বউদিও খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন ও বাবার কথা, ঠাকুমার কথা, মার কথা সব সময়ে মনে রাখতেন। সংসারের ছোটখাটো কাজও একটু আধটু করতেন। আর বাবাকে কি ভাবে যত্ন করলে তাঁর একটু আরাম হয় সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন। কত সময়ে বাবার কাছে আমি বা আর কেউ নাই অথচ বাবাকে দেখতে ডাঃ সুরাওয়ার্দি এলেন কি অন্য কেউ এলেন—বাবা যা লিখতেন সে সব বউদিই পড়ে শুনাতেন। ডাঃ সুরাওয়ার্দি রোজই যে কোন সময়ে বাবার কাছে আসতেন। বাবার অসুস্থতা বেশী হচ্ছিল আর লেখনী দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছিল। পরমেশের পায়ে আপনার বেদনা বিলিয়ে শান্তির পথে নিজেকে নিয়ে চলেছেন। এখানে তাঁর দুঃখ দৈন্য ব্যথা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না। শুধু হরিনাম গানের শান্তি প্রলেপ আপনি গ্রহণ করছেন।

আমার পিসীমা পিসামশাই এসেছিলেন বাবাকে দেখতে। সবাই একসঙ্গে ছিলাম ঐ ছোট্ট কটেজের মধ্যে। বাবা তাঁদের নিয়ে খানিকটা খুশীতেই ছিলেন। মা ও তাঁর ননদকে দুঃখ দিনের বান্ধবীরূপে পেয়ে আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কার্য্যকলাপ কে জানতে পারে? হঠাৎ একদিন আমার পিসামশায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রক্ত-আমাশার মত ভয়ানক ব্লিডিং হতে লাগল আর উপায়ান্তর না পেয়ে তাঁকে মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালে যাবার দু'দিন পরে পিসামশায় মারা গেলেন। ঠাকুমার অন্তরে শেল বিদ্ধ হল। বাবা চেয়ে রইলেন সকলের মুখের দিকে। তাঁর লেখনী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মা পিসীমার কাছে। বাবার একমাত্র বোন বাবার কাছে এসেছেন বাবাকে দেখতে আর সেই বোনেরই এই অবস্থা হল? পিসামশায়ের শেষ কৃত্য করে সবাই যখন কটেজের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, বাবা উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমার পিসতুত ভাইদের জড়িয়ে ধরলেন বাবা। তাদের ঘরে এনে বসালেন। লিখলেন, হায় রে হেমেন্দ্র, এটা কি হল? বিধাতার কি সুমহান্ কাজ সম্পন্ন হল? বিনা মেঘে বোধহয় এই ভাবেই বজ্রপাত হয়। এই শিশুগুলোর দিকে তো আর চাইতে পারছি না। কোথায় আমি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, আর দেখ কে তৈরী না হয়েই চলে গেল। আমি এখন কি করব. বলতে পারিস সুরেন? সুরেন দাশ বললেন, তাঁর অমোঘ বিধান আপনি প্রতি পলে মেনে নিয়ে চলেছেন; এ আত্মীয়বিয়োগ তো তাঁরই বিধান, আপনি তাঁর অমোঘ দণ্ড বলেই মেনে নিন।

যা নিয়মকানুন, অশৌচ পালন, সকলের জন্য ব্যবস্থা সব বাবা করালেন। পিসীমাকে কাছে টেনে নিয়ে লিখলেন, যা ছিল অদৃষ্টে সব পেয়ে গেলে। আর কেঁদ না। একটু চোখের জল আমার জন্য রেখে দিও। আমারও আর বেশী দিন নাই।

সেই দিনই রাত্রে পিসীমা তাঁর ছেলেদের নিয়ে দেশে চলে গেলেন। বাবা মা যেন আরও ভেঙে পড়লেন। ঠাকুমা যেন নির্ব্বাক্ হয়ে গেলেন। খালি বাবার কাছে এসে বললেন, বাবা রজন, তুমি আমার কাছে থাকো। আমাকে ছেড়ে যেও না। পিসীমাকে রওনা করে দিয়ে বাবা সমস্ত রাত ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। এ নিদারুণ শোক সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাঁর মা যখন বললেন, রজন তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না—তখন মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাঁর মাকে কি সান্ত্বনা দেবার আছে? বললেন, মা, সেই তাঁকে নির্ভর কর। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হতে দাও। তিনি দয়াময়, তিনি সবাইকেই পায়ে ঠাঁই দেবেন। আমিও যাব, তুমিও যাবে। রোহিণীও চলে গেল। সে-ই পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল। আর ওই যে অশ্রুমুখী নীরব তোমার বড় আদরের বউমা তিনিও যাবেন। তবে এ দুঃখ কেন পাচ্ছি মা? 'তবে কেন শোক যদি রে আনন্দ-ধাম পুণ্য পরলোক?' (অভয়া।) দেখ হেমেন্দ্র যাঁর দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। আগুনে দগ্ধ করে পাপের খাদ উড়িয়ে নিচ্ছেন—তা তো আমরা বুঝিনে, ভাবি কতই কষ্ট দিচ্ছেন। নিদারুণ কষ্টে রাত কেটে গেল। শরীর আর বইতে চাইছে না। এমনি রবিনাদ্র কত রাত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে চলেছে। আর তাঁর দয়াল হরিকে ডাকছেন। বলছেন, এটা ঠিক, যত শাস্তি তত প্রেম। সুরেন, সে যে তার কাছে নিয়ে যাবে বলে নির্ম্মল করে দিয়ে উজ্জ্বল না করলে কেমন করে সেখানে যাব। আবার বলছেন, কই, আমি তো কাঁদছি নে। আমার চোখের জল দেখে মা আমার চোখের মধ্য দিয়েই জল ফেলছেন।

বাবার অভয়া বা আনন্দময়ী ছাপা হয়ে আসেনি। বাবা বললেন বই দু'খানা আর দেখে যেতে পারব না। না দেখা হল, সবই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব'। মরি বেশ, বাঁচি বেশ। তার যা ইচ্ছা তাই হবে, আর ভাবব কেন। শরীর খারাপ তো চলছেই কোন কোনদিন ব্যথা একটু কমও থাকে।

এর মধ্যে একদিন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁর দুই কন্যা কুমুদিনী মিত্র ও বাসন্তী মিত্র এলেন বাবাকে দেখতে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। সুধীর বোস ও দেবেন চক্রবর্ত্তী কয়েকটা গান তাঁদের-শুনালেন। তাঁরা আবার ফরমাস দিয়ে দিয়ে অনেক গান শুনলেন। যেমন, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে গানটা, স্বদেশী গান শ্যামল শস্য ভরা, ও সাধুর চিত্তে তুমি আনন্দরূপে রাজ, এই সব পুরোনো গান, নতুন গান অনেক শুনলেন, সব শেষে আমাকেও গাইতে হল। বাবার সঙ্গে দেশের কথা হল (বাবা অবশ্য সবই লিখে বললেন), শরীরের কথা হল। বাবা বললেন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে আমি আপনাদের কত গান শুনিয়ে এসেছি। কৃষ্ণকুমার মিত্র বললেন, আপনার গান শুনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। 'কে রে হৃদয়ে জাগে' 'কেন বঞ্চিত হব চরণে।' আবার রবীন্দ্রসংগীতও আপনার মুখে অনেক শুনেছি। কি আপনার রচনা, কি আপনার গলা। খুব ভালো লাগত। আপনার অসুস্থতা জেনে আমার মেয়েরাও আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাবা খুশী হয়ে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বাবা কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বললেন—আপনি দেশকে জাগাবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন। সঞ্জীবনী যেন ঘরে ঘরে সকলের মনকে উদ্বুদ্ধ করে, ভগবানের চরণে আমি এই প্রার্থনাই করব। কুমুদিনী মিত্রকে ও বাসন্তী মিত্রকে বললেন, মা তোমরাই আমাদের ভরসা, তোমরা বড় হলেই দেশ জেগে উঠবে। তোমরা লক্ষ্মীরূপিণী হও। এই রকম নানা আলাপ আলোচনা করে গান শুনে তাঁরা চলে গেলেন। বাবা পরে

লিখলেন, নিজের মনেই বসে বসে লিখলেন, আমার যাবার পথে কত দেবদুর্লভ জনের সঙ্গে দেখা হল, আমি তো মহা ভাগ্যবান্। তবু যেন মনটা কেঁদে ওঠে। কত লোক এল কত সান্ত্বনা দিল। আবার বললেন, কত সান্ত্বনা দিবি আর বলিস্‌নে। যে গেল সে যে আমাকে দেখতে এসেছিল, দেখে শুনে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার এই একটি বোন। জামাই বড় আদরের ছিল। আর কি বলবার আছে বল—দেখ্ ইন্দু—

'যার যেটা এ সংসারে তীব্রতম আকর্ষণ
তাই আগে ছিন্ন করি ফিরাইয়া লহ মন।
মধুরে ডেকেছ তবু চেতনা হয় নি প্রভু
অবিশ্রান্ত কশাঘাত, না হলে কি জাগে চিত?
মোরে উৎকট ব্যাধি দিয়ে কি সঙ্কটে ফেলে দিয়ে
বুঝাইয়ে দিলে যবে সকল চিকিৎসাতীত। ('শেষ দান')

কত বন্ধু, কত ছাত্র, কত আত্মীয়, কত ডাক্তার—যেন বাড়ী সব সময় পরিপূর্ণ থাকতো। কাশীর সেই যে অমূল্যবাবু যিনি বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন সেই থেকে একদিনও বাবার কাছ ছাড়া হন নাই। তিনি এমনি-ই আমাদের সঙ্গে এক আত্মা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমরা দাদাদের মতই দেখতাম। তিনি যেমন বাবার শয্যাপার্শ্বে সব সময় থাকতেন তেমনি আমাদেরও স্নেহ করতেন। বাবা সারা রাত জাগতেন, লিখতেন, তিনিও সকলের সঙ্গে বাবার পাশে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন। বাবার কালিকলম খাতা এগিয়ে দিতেন, নিঃশ্বাসের কষ্ট হলে হেমেন্দ্র বক্সী ছাড়াই গলার ব্যাণ্ডেজ বদ্‌লিয়ে দিয়েছেন। মা ও মাঝে মাঝে গলার ব্যাণ্ডেজ পালটিয়ে দিতেন। দাদারা তখন কাছে থাকতেন। এ কাজটা খুব কঠিন ছিল। নিঃশ্বাসের নালীর ঠিক মুখে বাহিরের নলটা লাগাতে হত। তখন বাবার খুব কষ্ট হ'ত। বিজিতেন বসু বা হেমেন্দ্র বক্সী কাছে না থাকলে বাবা অতল জলে পড়ে যেতেন। বলতেন, আর কতদিন রে এই কষ্ট? একটু সান্ত্বনা দে ভাই, বল্ যে আর বেশী দিন এ কষ্ট নাই। স্বাথ, মনে হচ্ছে শান্তিময় বিধাতার পায়ের সাড়া যেন পাচ্ছি। তাই বলে কি কষ্ট একদিনও কম করে দেবে না? বড় যন্ত্রণা হরি, দয়াল দয়া কর, আমাকে তুলে নাও। লিখলেন তখনই বসে বসে—

'আজীবন সুখ-দুঃখ ভীষণ তরঙ্গ মাঝারে
এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে।
ক্ষণিক এ দুঃখ লহ প্রভু চাহিনা যে আর
চিরানন্দ করে দাও এ হৃদয় তন্ময় আমার।'

এদিকে তাঁর খাওয়ার কষ্ট বেড়েই যাচ্ছিল। বার্ড সাহেব আসেন, সুরাওয়ার্দি আসেন, রোজই দুটো চারটে কথা বলে যান। ওষুধও যে না-দেন তা নয়। কিন্তু বাবা আর ওষুধ নিতে চান না। লিখলেন, আমার ওষুধ শুধু প্রেমময় হরির পাদোদক, তাই আমাকে দাও—তাতেই আমি শান্তি পাই। ক্রমশঃ

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

হঠাৎ একটা নম্বর দেখা দিল। একজন পুলিশ ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে যেতে বল্লেন। এবার আমরা এগিয়ে গেলাম। পুলিশটি আর আমাদের বাধা দিল না। সঙ্গের লোকটী আমাদের প্লেনেই যাচ্ছেন, আমাদের দুজনকে নিয়ে তিনি প্লেনে উঠলেন। আমরা দুটী নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মোটর বাসের মত লাইন দিয়ে প্লেনগুলো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটার পর একটা পর পর উড়ে চলেছে। আমাদের প্লেনটী কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ডানা মেলে উড়তে আরম্ভ করল। দিনের আলো তখন বেশ প্রখর, আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র কোথায় দেখতে পেলাম না। আমাদের প্লেনটার সিটগুলো সব ভর্ত্তি হয়ে-গেছে। তবু প্লেনের কর্ম্মচারীনীরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের কেক্ বিস্কুট আর চা ও একটুক্‌রো লেবু দিয়ে গেল। চা তৈরী করতে যাই দুধ পেলাম না। পাশেই একজন আধা ইংরাজী জানা জাপানী ভদ্রলোক বল্লেন "নো মিল্ক, দিস্।" বলে পাশের লেবুর টুক্‌রোটা দেখিয়ে দিলেন। লেবু দিয়ে চা আমরা কোনদিন খেয়েছি কিনা আমার মনে পড়ল না। আদার চা আমরা বাড়ীতে প্রায়ই খাই কিন্তু সঙ্গে দুধ থাকে। স্ত্রী বল্লেন "দেখি না একবার চেষ্টা করে। ভাল না লাগলে খাবনা।" চিনি ও লেবু মিশিয়ে খেতে আমাদের মন্দ লাগল না। জাপানী কায়দায় চা এই আমরা প্রথম খেলাম।

একটু পরেই প্লেনের মধ্যে বেশ একটা মৃদু সোরগোল পড়ে গেল। আমরা দুজন দক্ষিণদিকের আসনে বসে-ছিলাম। আমার স্ত্রীটি তাঁর নির্দ্দিষ্ট ধারের আসনে সব সময়েই বসেন কি বাসে, কি ট্রামে, কি ট্রেনেতে অবশ্য যদি তিনি জায়গা পান। ওদিকে বাবা তাঁর ছোট ছেলেকে হাত দিয়ে কি একটা দেখাচ্ছেন, স্বামী দেখাচ্ছেন তাঁর স্ত্রীকে বন্ধু দেখাচ্ছেন তাঁর বন্ধুকে, আমরাও জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। প্লেনটীর একটু দূরে এক প্রকাণ্ড পাহাড় তার চূড়াটী নেই। মনে হ'ল ওর মাথায় একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত। গর্ত্তটী এক টুকরো বরফ ও মেঘে ঢাকা রয়েছে। সকলে প্রণাম করতে লাগল। আমি অবাক্ হয়ে পাশের আধা-ইংরাজী জানা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন "ওটী মাউণ্ট ফুজিয়ামা। জাপানের জনসাধারণ ওঁকে দেবতা জ্ঞান করেন তাই আমরাও তাকে প্রণাম করলাম। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে মুভি ক্যামেরাটা বের করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। প্লেনটী এখন একেবারে তার গা-ঘেঁসে যাচ্ছে বলতে পারা যায়। আমি মুভিক্যামেরা দিয়ে প্রায় পাঁচ ফুট ফটো তুললাম। আজও মাঝে মাঝে সেই দেবতা ফুজিয়ামাকে আমরা দেখতে পাই। ভদ্রলোক বললেন "এত পরিষ্কার মাউণ্ট ফুজিয়ামা প্রায়ই দেখা যায় না। সব সময় মেঘে ঢাকা থাকে। আপনাদের বরাত খুবই ভাল তাই দেবতা আপনাদের দর্শন দিলেন।" ফুজি-য়ামা পর্ব্বতটী জাপানের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। এর উচ্চতা ১২৩৮৯ ফুট। এটী মধ্য হনস্থর (Honshu) Fuji Hakone National Park এর মধ্যে অবস্থিত। [illegible]

মাইল। এর শৃঙ্গটী সব সময় বরফে ঢাকা থাকে। এর গা থেকে বড় ছোট বৃক্ষরাজী উঠে ওকে ঢেকে ফেলেছে। এর সৌন্দর্য্য ও উচ্চতার জন্যে জাপানীরা তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে একে একটা বিরাটত্ব দিয়েছেন। জাপানী ভাষায় ফুজির মানে হচ্ছে অগ্নিদেবতা। মাউন্ট ফুজিয়ামা এখন একটী বড় রকমের মৃত আগ্নেয় গিরি। অতীতে এই ফুজি জাপানের অনেক ধ্বংস করেছে। এর শেষ উদ্গিরণ হয়েছিল ১৭০৭ ও ১৭০৮ সালে। আর তার ফলে এর আশেপাশের গ্রামগুলি দশ ফুট গভীর লাভা ও ছাইয়ে ডুবে গিয়েছিল। কোন প্রাণী জীবিত ছিল না। তাই জাপানীরা একে পূজা করে থাকেন আর প্রার্থনা করেন যে আর যেন ফুজি তার রুদ্রমূর্ত্তি জনসাধারণকে না দেখান।" আমাদের ভারতবর্ষের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক সময় আমরা কাটালাম। আমার আশেপাশের যাত্রীরা যে যার পোটলাপুঁটলি গোছাতে আরম্ভ করতে দেখতে পেলাম। ওসাকা যে খুব নিকটে তা বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোক আমাদের জানালেন যে আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমরা বিমান বন্দরে অবতরণ করবো। নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম। আমরা একটা খুব জনবহুল সহরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে দিনের আলো মুছে ফেলতে আরম্ভ করেছে। নীচে বাড়ী ও রাস্তার অসংখ্য আলো আকাশের তারার মত টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে দেখলাম। রাত্রি আগত। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওসাকা বিমানবন্দরে এসে নেমে পড়লাম।

এখানে পাশপোর্ট ও হেল্থ সার্টিফিকেটের কোন ঝামেলা নেই। আমরা ওসাকা বিমান বন্দরের এক কোণে এসে আশ্রয় নিলাম। স্ত্রীকে মোটঘাটের কাছে বসিয়ে আমি পাশেই অনুসন্ধান অফিসে গিয়ে কেউ আমাদের খোঁজে এসেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। এঁরা প্রায় সকলেই ইংরাজীতে ভালভাবে কথা কইতে পারেন। কোন ভদ্রলোকই আসেনি তাঁরা আমায় জানালেন। আমার ইটিনারীটা খুলে দেখালাম যে আমাদের ওসাকা হোটেলে সিট সংরক্ষিত করা আছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা তখনই ওসাকা হোটেলে ফোন করে বলতে লাগলেন "মসি মসি, মসি মসি—" বেশ কতক্ষণ 'মসি মসি' বলে তিনি হোটেল থেকে উত্তর পেলেন। উত্তর পেয়ে আমার জানালেন "আপনাদের কোন টুরিষ্ট পার্টি ঐ হোটেলে কোন আসন সংরক্ষিত করেন নি। আর আজ কোন ঘর তাদের খালি নেই। আপনারা অন্য হোটেল দেখুন।" আমরা মহা ভাবনায় পড়লাম। আমার স্ত্রী এতক্ষণ এককোণে বসে সুটকেশগুলো আগলাচ্ছিলেন। তাঁর মুখখানা খুব মলিন দেখলাম। আর তাঁর পাশে ভীড় করে জাপানী পুরুষ মহিলারা তাঁকে হা করে দেখছেন। অনেকে শাড়ী-পরিহিতা সিঁথিতে সিন্দুর আঁকা নারী জীবনে দেখেন নি বলে আমার মনে হ'ল। আমি সেখানে যেতেই তাঁরা রাস্তা করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন "ইণ্ডো?" আমি মাথা নেড়ে তাঁদের জানালাম "হ্যাঁ"। ওরা চলে যেতে আমার স্ত্রী আমাকে রাগতঃভাবে বললেন "আমাকে ফেলে রেখে একলা তোমার যাওয়া উচিত হয়নি।"

"আমার এই কোণ থেকে অন্য কোণে যাওয়াটা তোমাকে একলা ফেলে রেখে গেছি বলে ত আমার মনে হয় না। এখান থেকে মাত্র চারগজ দূরে গিয়েছিলাম? চুপটী করে বসে থাক। আমাদের হোটেলের ঘর এখনও বুক করা হয়নি। আর ওসাকা হোটেলেও কোন দল আসছে না।" আমরা যে খুবই বিপদে পড়েছি তা বুঝে তিনি চুপ করে থাকেন। বিমান বন্দরের লোকেরাই ট্যাক্সি ডেকে দেন। আমরা সোজা Osaka হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আমি ওদের অফিসে Itineryটা দেখালাম। অফিসের লোকটী বল্লেন "আমরা ত আপনাদের প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছি। কেউ এখানে হোটেল বুক করেন নি। আর এ হোটেলের কোন ঘরও খালি নেই। আপনারা অন্য কোন হোটেল দেখুন।"

আমরা যে এখনে সম্পূর্ণ অচেনা তা তাঁকে জানালাম। তিনি তখন অন্য একটী হোটেল বন্দোবস্ত করে দিয়ে

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে বল্লেন।

আমরা ওখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটী পুরাণো হোটেলের দরজায় এসে ঘা দিলাম। খুব কমদামী হোটেলটী। সুযোগ বুঝে তারা আমায় কোপ মারলো। একরাত্রি থাকার খরচ ২০টী আমেরিকান ডলার চার্জ্জ করল। তাই দিয়েই আমরা সেখানে আশ্রয় নিলাম। স্ত্রীকে ঘরে বসিয়ে আমি দোকান থেকে জ্যাম ও রুটী কিনে নিয়ে এসে দুজনে তার সদ্ব্যবহার করলাম।

সকাল বেলায় উঠেই খাদ্যের সন্ধানে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম। শুধু 'Indo' কথাটাই জেনেছি। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একজন অল্পবয়সী জাপানী মেয়েকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে কোন ভারতীয় রেষ্টুয়ারেন্ট আছে?" মেয়েটী শিক্ষিতা বলেই আমি তাকে প্রশ্নটী করেছিলাম। কিন্তু সে ইংরাজী বোঝে না, অন্য একজন জাপানী পথচারীকে ডেকে আমার সঙ্গে কথা কইতে বল্লে। তিনিও ইংরাজী জানেন না। আমি হাত দিয়ে তখন আমার পেটটা প্রথমে দেখিয়ে মুখের হাঁ টা দেখালাম। তারপর বললাম "ইণ্ডো রেষ্টুয়ারেন্ট"। মেয়েটী আমার ঈশারা বুঝতে পেরে একচোট খুব হেসে নিল। তারপর একটী ছোট্ট রেষ্টুয়ারেন্টে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। ভেতরে গিয়ে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ও পাকিস্থানীকে টেবিলে খেতে দেখলাম। দোকানের মালিক একজন জাপানী স্ত্রীলোক। তিনি হিন্দীতে কথা বলতে পারেন, ইংরাজীও অল্পসল্প জানেন। তাঁর স্বামী একজন ভারতীয় ছিলেন। সেখানেই তিনি মারা গেছেন, দোকানটা তাঁরই ছিল। ভদ্রলোকটী মারা গেছেন, এখন মা ও মেয়ে দোকানটা চালাচ্ছেন। আমরা যেতেই তাঁর মেয়েটী হাসিমুখে বসতে বলে কি চাই জিজ্ঞাসা করল।

"চিকেনকারী আর রাইস চাই" বলতেই চিকেনকারী আর ভাত দিয়ে গেল। ভাতটা মোটা চালের আর একগ্রাস মুখে দিয়েই আর খেতে পারলাম না। তবু মুর্গীর মাংস আর ঝোলটা খেয়ে উঠে পড়লাম। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন খেলে?" "তবু ত জাপানী ভাতটার এক গ্রাসও পেটে পড়ল।" বলে চুপকরে রইলেন। আমরা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে আমেরিকান ডলার ভাঙ্গাতে ব্যাঙ্ক খুঁজতে আরম্ভ করলাম। মস্তবড় জাপানী ব্যাঙ্ক রয়েছে। তার মধ্যেই Bank of Indiaর নেমপ্লেট দেখে সেখানেই গেলাম। এখানে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার উত্তর প্রদেশের লোক। যেতেই ভাব হয়ে গেল। তারপর টোকিও ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও এখানে এসেছেন দেখলাম। তিনি বোম্বায়ের লোক, জাতিতে পার্শী। যুদ্ধের সময় অনেক পার্শী ডাক্তারের সঙ্গে আমি একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। একজন মারা গেছেন অন্যেরা বোম্বাইতে প্রাকৃটিস্ করছেন বলে জানালেন। ওখান থেকে টাকা ভাঙ্গিয়ে আমরা তাঁদের আমাদের হোটেলের গোলমালের কথা জানালাম। তাঁরা New sakaO হোটেলে ফোন করে জানতে পারলেন যে আমাদের পার্টিটী আজ বারটায় পর সেখানে পৌঁছাবে। তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক করা আছে। আমার নাম তাঁদের জানাতে তাঁরা বল্লেন যে আমার নামও তার মধ্যে আছে। তবে বারটার পর ঘরটী খালি হবে তারপর আমি যেন ওখানে যাই। এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আমাদের পার্টিকে কোথায় ধরা যাবে এই চিন্তাই শুধু করছিলাম। যাক্ বাঁচলাম। আমরা হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বারটার কিছু আগে একটা ট্যাক্সি ডেকে New Osaka Hotel-এ এসে পৌঁছলাম। ঘরটী ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গিয়েছিল। হোটেলের একজন পরিচারিকা আমাদের সেই ঘরে লিফ্‌টে করে নিয়ে গেল। চারতলার ওপর রাস্তার দিকে জানালা খোলা ঘরটী দেখে মনটা আমাদের খুব সন্তুষ্ট হল।

এই হোটেলটি সম্পূর্ণ নতুন। ২৩শে জুলাই ১৯৬৩ সালে হোটেলটীর দ্বারোদ্মুক্ত হয়েছে। আমাদের এখানে

ঘরটির মধ্যে সব নতুন নতুন আসবাবে পূর্ণ রয়েছে। নতুন একটা রঙীন টেলিভিসন সেটও ঘরের এক কোণে রয়েছে। ঘরের মধ্যেই বাথরুম রয়েছে। দু'জনের শোবার জন্যে একটী বড় বিছানা। নীচে লাল রংএর কার্পেট পাতা। ঘরের এককোণে সোফাসেট। বিছানার মাথার দিকে টেবিল ল্যাম্প তাতে সবুজ রংএর টুপি বসানো। আর তার পাশেই টেলিফোন আর চাকরকে ডাকবার জন্য কলিংবেল। এটী ছোট্ট একটা ইন্দ্রপুরী বললেও চলে। আমার স্ত্রী সোফায় বসে আরাম করতে লাগলেন। আমি এই প্রথম টেলিভিসন সেটের সুইচ অন করলাম। তারপর নিজের মনেই পর পর ডায়াল ঘুরিয়ে চলুম। জাপানের অন্য জায়গা থেকে অন্যান্য সংবাদ আসতে লাগল। অনেকে বেশ বক্তৃতাও দিতে সুরু করেছে। আমার স্ত্রী আমাকে একটু সাবধান করে দিলেন। আমি যেন যন্ত্রটার পরমায়ু কমিয়ে না দিই। ওঁকে টেলিভিসনের ছবি দেখতে দিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। এখানে কোন বাথটাব দেখলাম না। বাথটাবের বদলে একটা চৌবাচ্চা রয়েছে তার মধ্যে জল ছেড়ে সাঁতারকাটার মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। ছোট্ট বাথরুম হলে কি হয় এর একটা বেশ সৌন্দর্য্য রয়েছে দেখলাম। বেশ কয়েকটী কল ও একটী স্নানের জন্য ঝরণা (shower) রয়েছে। এখান থেকেও টেলিফোন করতে পারা যায়। বেশ কিছুক্ষণ স্নান করবার পর আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে পড়লাম। তারপর আমি জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। স্ত্রীর শাড়ী বদলানো হয়ে গেলে আমরা লাঞ্চ খেয়ে এলাম। ঘরে এসে কোবে (Kobe) যাবার স্থির করলাম। ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরাগুলো আর টাকাপয়সা পুরে একটা ট্যাক্সি ডেকে ওসাকা রেলষ্টেশনে আমরা প্রবেশ করলাম। ষ্টেশনটী খুবই বড়। অনেকগুলি লাইন এখানে রয়েছে। আমরা কোবের টিকিট কাটিয়ে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমরা ষ্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে কোবেগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। কি ভীষণ ভীড়। সব সময় আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত যদি না দুটী জাপানী ভদ্রলোক তাদের আসনদুটী আমাদের ছেড়ে দিতেন। আমার স্ত্রী বসে পড়লেন কিন্তু আমি কি করে ওঁদের দাঁড় করিয়ে নিজে বসি? তাঁদের একজনকে আমার স্ত্রীর পাশে বসতে অনুরোধ করি। কিন্তু আমাকে তাঁরা একরকম জোর করেই বসিয়ে দিলেন। ওঁদের কথা কিছুই বুঝিনা তবে আমার পেছনে একজন আধাইংরাজী জানা ভদ্রলোক আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কয়েকটী ষ্টেশনের পর আমরা কোবে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আমাদের এখানে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৩০ মিনিট। খরচ পড়েছিল ১৮০ ইয়েন। ওসাকার থেকে এটী ৪০ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। আমরা দ্বিতীয় শ্রেনীর টিকিট কেটে ছিলাম। এখানে দুটী শ্রেনী রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী। এখানে ট্যাক্সি করেও যেতে পারা যায় খরচ পড়ে দু'হাজার ইয়েন।

কোবে ষ্টেশনে নেমে আমরা টিকিট কালেক্টারের হাতে টিকিটটা দিয়ে গেটের বাইরে এলাম। এখানে অনেকগুলি ট্যাক্সি সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই এগিয়ে এ'ল, কিন্তু আমরা একটী গাইড চাইলাম। গাইড না থাকলে আমাদের অনেক অসুবিধা হবে তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের এই খরচাটা বাড়তি হ'ল। কারণ ইটিনারীতে কোবে যাওয়ার কথা লেখা ছিলনা। গাইড ও ট্যাক্সি পাওয়া গেল। আমাদের কোন কোন জায়গা দেখান হবে সেটা জিজ্ঞাসা করে নোট বইয়ে টুকে রাখলাম।

প্রথমে আমরা ট্যাক্সি করে কোবে উপসাগরের ধারে এলাম। এখানে একটী বন্দর আছে। জাপানের মধ্যে দুটী বড় বন্দরের মধ্যে এটী একটী বড় বন্দর বলে গণ্য হয়। যে সমস্ত টুরিষ্টরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া, ভারত আর ইউরোপ থেকে আসেন তাঁদের এই বন্দর দিয়েই জাপানে ঢুকতে হয়। একে এককথায় বলা যায় Gate-way to Japan। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অধিকাংশ লোক এসে এখানেই বসবাস করে থাকেন বলে গাইড

বল্লেন। উপসাগরে বেশ কয়েকটা জাহাজ রয়েছে। কোবের ডকে দুটো বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। গাইডটা প্রহরারত পুলিশটাকে অনুরোধ করাতে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হল। এত হাওয়া বইছে যে স্ত্রীর শাড়ীর আঁচলগুলো বেশ উড়তে থাকে। ওদের বলে ওখানকার ফটো নিলাম। ফটো নেওয়া এখানে বারণ ছিল। জাপান তার রপ্তানী ও আমদানীর তিরিশ পারসেন্ট জিনিষ-পত্তর এখান থেকেই আনা নেওয়া করে। ডকের মধ্যে থেকেই উত্তর দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যাবে উঁচু পাহাড়ের কয়েকটা শৃঙ্গ। গাইড বলছেন যে এ পাহাড়-টার নাম Rokko Mountain Range। আমরা ট্যাক্সি করে রোকো পর্বতের ওপর এসে উঠলাম। ওপর থেকে উপসাগরের ওপর জাহাজগুলো আর ওসাকার অগণিত বাড়ীঘর দেখা যায়। লোকের বসতি-গুলো দেখলে মনে হয় যেন এদিকে কোন খোলা জমি বা কোন পার্ক নেই। একটু দূরে ছোট্ট একটা জল-প্রপাত, নুনোবিকি (Nunobiki) শব্দ করতে করতে নীচের দিকে নামছে। এখান থেকে ট্যাক্সি করে গেলে সুন্দর Suma-Maiko-Akashi সমুদ্র তটভূমিটা দেখতে পাওয়া যায়। যেতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে আর এখানে পাইন গাছে ভরা রোকো পাহাড়ের পেছনে একটা সুন্দর উপত্যকায় Hot spring (Arima Spa) রয়েছে। অনেকে ওখানে যায়। রোকো পাহাড়ের ওপরে এত হাওয়া বইতে লাগল যে মনে হ'ল যেন বাতাস আমাদের ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিতে চায়। আমার স্ত্রীর কাপড়টা ছোট মেয়েদের মত কোমরে জড়ানো থাকলেও তা খুলে ফেলতে বাতাসের বেগ পেতে হচ্ছিল না। আমরা কিছুক্ষণ পরেই ওখান থেকে নেমে সহরের দিকে চলে গেলাম। গাইডটা জানালেন যে শহরের সমস্ত পানীয় জল Nunobiki জলপ্রপাতের জল থেকেই সরবরাহ করা হয়। আর রোকো পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে অনেক বিদেশীরা বাড়ী করে রয়েছেন। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া থেকে শুনে এসেছিলাম যে এখানে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর পদবী ভট্টাচার্য্য। সময়াভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সহরে এসে পড়লাম। এখানকার Motomachi আর Sannomiya রাস্তাগুলির দুধারে ভাল ভাল সুপার মার্কেট রয়েছে। এর মধ্যে জাপানী তৈরী নানারকমের ক্যামেরা বাইনাকুলার থরে থরে সাজানো রয়েছে আর রয়েছে ছোট বড় হাজার হাজার কালচার্ড পার্লস (cultured pearls)। মুক্তার দোকানই আশেপাশে অনেকগুলি দেখলাম। সোনার গহনা তৈরীর দোকান এখানে খুব নগণ্য বললেও চলে। এদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়, অনেকগুলি কলেজ, কোবে উইমেন্স কলেজ, Sannomiya Shinto Shrine (মন্দির), Daibutsu (বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি), ১৩৩৬ সালের ঐতিহাসিক Minatogawa যুদ্ধক্ষেত্র ও Nautical College রয়েছে। আমাদের দলটা আজ হোটেলে সন্ধ্যার দিকে ফিরবে তাই তাঁদের সঙ্গে আজ আমাদের মিশতেই হবে তা না হলে বিপদে পড়ব। তাই তাড়াতাড়ি ওঁদের পাওনা মিটিয়ে ট্রেনে করে ওসাকাতে ফিরে এলাম। হোটেল থেকে বেরুবার সময় অফিস থেকে সহরের কোনো ম্যাপ না নিয়েই কোবে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে ট্যাক্সিকে বললেই ট্যাক্সি হোটেলে নিয়ে যাবে। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! কোথায় ট্যাক্সি? ট্যাক্সি ধরতে গেলাম। লাইনে দাঁড়াতে পুলিশ আমাদের অনুরোধ করল। হাজার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইন দিয়ে। ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরতে কতঘণ্টা যে লাগবে তা বলতে পারব না। তাই বাসে যাবার জন্যে পা বাড়াই। বাসেও আসন খালি নেই। তখন আমরা হোটেলের নাম করতে করতে এগিয়ে চললাম। রাস্তার ধারে অনেকে মেসিনের মধ্যে zen দিয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। আমরাও দু'গেলাস খেলাম। দোকানদারকে হোটেলের কথা জানাতে আমাকে একটা কাগজে রাস্তার নক্সা করে জাপানী ভাষায় হোটেলের নাম লিখে দিলেন। সেই কাগজটা দেখিয়ে দেখিয়ে আমরা

হোটেলে এলাম। তখন আমাদের দলটী এসে গেছে। এখানকার টুরের গাইড আমাদের কোন খোঁজ না পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। দলের লোকরা আমাদের দেখে তাঁদের কি আনন্দ! সকলে এসে মালয়ী ভাষায় সব কথা জানতে চান। আমরাও আমাদের কষ্টের কথা তাঁদের জানালাম। যাই হোক যার শেষ ভাল তার সব ভাল মনে করেই আমাদের কষ্টের আর খরচের কথা আমরা ভুলে গেলাম। তাঁরা আমাদের খুব সহানুভূতি দেখালেন। ফরমোসাতে তাঁরা তিনদিন এত আনন্দ করেছিলেন যে সেখানে আরও কিছুদিন থাকলে হ'ত বলে আমায় জানালেন। আমাদের অনুপস্থিতির অভাবটা তাঁরা যে খুব অনুভব করেছিলেন তাও আমাদের তাঁরা জানালেন। মিঃ চেং ও তার ছোট বউএর মুখটা আনন্দে ভরপুর দেখলাম। আমার মিসেসের অন্যান্য বান্ধবীরা মিসেসকে পেয়ে খুব খুশী। তাঁরা মালয়ীভাষায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মত্ত। সকলের বেশ বয়স হয়েছে। অনেকে চল্লিশের ওপর, অনেকে পঞ্চাশ পার হয়ে গেছেন। কেউ বিধবা কেউ এখনও অনূঢ়া। অনেকে ব্যবসাবাণিজ্য করে খান। অনেকে তাঁদের ভাইয়ের বাড়ীতেই থেকে ভায়ের ছেলেমেয়ের যত্ন নেন। এই প্রথম মালয়দেশের বাইরে তাঁরা এসেছেন। বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন, তাঁদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারছেন বলে তাঁদের খুব উৎফুল্ল দেখলাম। অনেকে ছোটবেলায় চীন দেশ থেকে এসে এখানেই বড় হয়েছেন। সেখানে আর তাঁরা যেতে পারছেন না বলে খুব দুঃখ করলেন। আমার স্ত্রীও বললেন যে সত্যি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে থাকতে যা কষ্ট তা তিনি বোঝেন। সন্ধ্যা হয় হয় ডিনারের তাড়া পড়ে গেল। আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ডাইনিং হলে এসে বসলাম। মস্তবড় একটা টেবিলে আমাদের প্রায় বাইশজন বন্ধুবান্ধব বসে পড়লেন। আমাদের এক পাশে চীনা গাইডটীও আমাদের সঙ্গে বসল। ঐ ছেলেটী জাপানে পড়তে এসেছে। সে থাকে হংকংএ। ছুটীতে এখানে টুরিষ্ট বুরোতে গাইড হিসাবে চাকরী করে। ছুটী ফুরোলে সে কলেজে আবার পড়তে ঢুকবে। সে জাপানের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। জাপান সম্বন্ধে অনেককিছুই তার জানা আছে। আমাদের সঙ্গে আজ থেকে তাকে ঘুরতে হবে বলে সেও হোটেলের একটা ঘরে আজ রয়ে গেল। খাবার আয়োজন দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। মাছ, চিকেন, রুটী, জ্যাম, মাখন পুডিং আর আপেল। তার ওপর দুরকমের তরমুজ আমাদের টেবিলে দিয়ে গেল। প্রথমে কাঁচা কুমড়ো বলে আমরা খেতে চাইনি। পরে যখন গাইড ছেলেটী আমাদের জানালো যে এটি তরমুজ ও খেতে খুব সুস্বাদু তখন আমরা খেলাম। সত্যই তরমুজটি খেতে অপূর্ব্ব! সেদেশে অনেকবার ঐ রকমের তরমুজ খাবার জন্যে খুঁজেছিলাম কিন্তু পাইনি। আমরা সকলে সে রাত্রে আকণ্ঠভরে ডিনার খেয়েছিলাম।

খাবার পর কথায় কথায় বন্ধুদের বল্লাম যে আজ টেলিভিসানে একটা ভাল ছবি দেখাবে তাঁরা যেন দেখেন। তাঁরা ত অবাক। কারণ তাঁদের ঘরে কোন টেলিভিসান সেট নেই। পরে তাঁরা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে টেলিভিসানের সেট তাঁদের ঘরে নেই কেন জানতে চান। কয়েকটি ঘরে টেলিভিসান সেট রয়েছে তার জন্যে বেশী ভাড়া দিতে হয়। আমি ডাক্তার বলে টুরিষ্ট কোম্পানী আমার জন্যেই ঐ ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। আমি ওঁদের কথা শুনে দুঃখ পেলাম বলে তাঁরা আমাকে মালয়ী ভাষায় বললেন— "Tidapa নেভার মাইণ্ড।" পরে আমরা যে যার ঘরে চলে এলাম। সেদিন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমি টেলিভিসানে সিনেমা দেখেছিলাম। আমার স্ত্রীও খুব ক্লান্ত। নিদ্রাজড়িত চোখে ছবি দেখতে দেখতে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা তিনি জানতে পারেন নি। পরদিন প্রভাতে আমরা টেলিভিসানের সামনে বসে দাঁড়িয়ে ষ্টিল আর মুভিতে অনেকগুলি ছবি নিয়েছিলাম।

সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে টুরিষ্ট বাসে এসে আমরা বসলাম। আমাদের itinaryতে রয়েছে যে আমরা ওসাকা সহরটির দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে Kyotoতে গিয়ে Kyoto station হোটেলে একরাত্রি থাকব। ওসাকাতে আর এখন ফিরব না। তাই New Osaka হোটেল-টিকে বিদায় জানিয়ে আমাদের বাসটী ছেড়ে দিল। ওসাকা সহরটী গতকাল আমরা দুজনে মিলে ট্যাক্সি চেপে খুব ঘুরেছিলাম। কিন্তু মনে শান্তি ছিলনা বলে তখন মন খুলে সহরের সৌন্দর্য্যটা দেখতে পাইনি। আজ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে টুরিষ্ট বাসে চেপে ওসাকা সহরের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে চলেছি। মিঃ চেং তাঁর ছোট বৌকে জড়িয়ে ওসাকার সৌন্দর্য্য বোঝাতে বোঝাতে চলেছেন। ভদ্রলোকের এই নিয়ে তিনবার জাপান ভ্রমণ হ'ল। তিনি এখানে একা একা এসে ফূর্ত্তি করে গেছেন আমাদের পূর্ব্বেই তা জানিয়েছেন। স্ত্রীকে নিয়ে এসে এখানে ভালভাবে ফুর্ত্তি করা যায় না তাও তিনি জানিয়েছিলেন। গত কয়েকমাস পুর্ব্বে তিনি ছোটটীকে বিবাহ করেছেন। ছোট বউ জাপান দেখতে চান। তাঁকে তিনি একলা সঙ্গে আনতে তাঁর বিবেকে বাধছিল। তাই তাঁর সবাইকে নিয়ে এখানে আসার একমাত্র কারণ।

গাইড ছাত্রটী মাইকে শহরের ইতিহাস আর অন্যান্য রাস্তাঘাট ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর ইতিহাস একে একে বলে চলেছে। আমরা মন দিয়ে শুনছি আর নোট বইয়ে টুকে রাখছি। ওসাকা সহরটি মধ্য হনসুর প্রদেশের পশ্চিম দিকে ওসাকা উপসাগরের ধারে অবস্থিত। পাশেই রয়েছে Yo do নদীর মোহানা আর রয়েছে প্যাসিফিক মহাসাগরের জলরাশি। টোকিও থেকে এর দূরত্ব ২৫০ মাইল আর এটি হচ্ছে জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। ওসাকা সমতল ভূমির ওপরই স্থাপিত হয়েছে আর এর মধ্যে রয়েছে মাথা উঁচু করে বিরাট বিরাট পর্ব্বত মালা। এর মধ্যে রয়েছে অনেক মাইল জুড়ে সাবওয়ে ট্রেনলাইন আর রয়েছে আধুনিক সহরের সৌন্দর্য্য। এর মধ্যে দিয়ে গেছে অসংখ্য খাল তাই একে বলা হয় 'ভেনিস অফ জাপান'। উপ-সাগরের পাশে তৈরী হয়েছে বিরাট পোতাশ্রয় তারপর রয়েছে প্রধান প্রধান রেলপথ। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তৈরী হবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ইলেকট্রনিক ট্রেন হিকারী যা ঘন্টায় ১২৫ মাইল বেগে ওসাকা আর টোকিওর মধ্যে যাতায়াত করবে। (এ ট্রেনটি এখন টোকিও-ওসাকা লাইনে যাতায়াত করছে)।

আমরা ওসাকা বিশ্ববিত্তালয়ের পাশদিয়ে চলে এলাম। প্রকাণ্ড-বড় বিশ্ববিত্তালয়টি। এখানে নানা দেশের ছেলেরা পড়াশোনা করতে আসে। গাইডের মুখে শুনলাম যে জাপানে পড়াশোনা করতে হলে প্রথমে জাপানী ভাষা শিখতেই হবে। এঁরা মাতৃভাষায় লেখাপড়া করে থাকেন। তারপর পাপেট থিয়েটারের পাশদিয়ে আমাদের বাসটি ওসাকা দুর্গের কাছে এসে থেমে গেল। ছেলেটি জানালো যে আমরা কিয়োটোতে (Kyoto) পাপেট থিয়েটার দেখব সেখানের পুতুল-নাচ নাকি বিশ্ববিখ্যাত।

ওসাকা দুর্গে ঢুকতে গেলে প্রবেশপত্র কিনতে হয়। আমাদের টুরের টাকার মধ্যে তা ধরা ছিল। ছেলেটি প্রবেশপত্র কিনে এনে আমাদের দুর্গের মধ্যে নিয়ে ঢুকল। দুর্গটির চতুর্দ্দিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখার ওপর একটা কাঠের সেতু। ছেলেটি বললে যে এখানে পূর্ব্বে একটি ড্রব্রিজ ছিল। তারপর প্রকাণ্ড ফটকটি পার হয়ে একটি প্রকাণ্ড উন্মুক্ত উত্থান। উত্থানে কতরকমের ফুল ফুটে রয়েছে। আর তার মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তা দিয়ে অসংখ্য জাপানী জনসাধারণ তাঁদের স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে দুর্গ দেখতে এসেছেন। এত ভীড় যে রাস্তা চলাই দায় হয়ে পড়ছিল। আমার স্ত্রী ও আমাদের দলটি আগে আগে চলেছে আর আমি পেছনে থেকে আমার মুভি ও ষ্টিল ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলতে তুলতে চলেছি। মুভিতে ফটো তুলতে তুলতে হঠাৎ ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম যে আমার স্ত্রীকে একজন জাপানী ভিক্ষুক কি চাইছে। আমার স্ত্রীও যত

এগোন সেও তত তাঁকে অনুসরণ করছে। তারপর দেখলাম আমার স্ত্রীর শাড়ী দেখে জাপানী মহিলারা তাঁকে একেবারে ঘিরে ফেলেছেন ও তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। আমার স্ত্রী খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি কিন্তু এই দৃশ্যটা আমি আমার মুভিতে ধরে রেখেছিলাম। তাই আজও মধ্যে মধ্যে এই দৃশ্যটি আমরা দেখতে পাই। আমার স্ত্রী আমায় একটু পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "ওঁরা কি কখনও কোন ভারতীয় মহিলা জীবনে দেখেননি?" উত্তরে হাসতে হাসতে আমি বললাম "আজ ত দেখলো"।

গাইড আমাদের দুর্গটির বর্ণনা দিতে আরম্ভ করল। অনেক অনেক বছর আগে যখন নারা (Nara) আর কিয়োটোতে (Kyoto) কোন রাজাদের রাজধানী আরম্ভ হয়নি তখন থেকেই জাপানের কয়েকজন সম্রাট ওসাকাতেই তাঁদের বাসস্থান তৈরী করেছিলেন আর তাঁরা ওসাকাকে একটি মনোরম সুন্দর নগরীতে পরিণত করেছিলেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সামরিক শাসক Toyotomi Hideyoshi ওসাকার মধ্যে এই সুন্দর ও দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেছিলেন। আর এই দুর্গে বসেই সমস্ত জাপানকে তিনি শাসন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন ইডো (Edo) সামন্ত সরকার। এখন যে সরকার জাপানে অবস্থান করছেন। তাঁরাই ওসাকাকে প্রথম থেকে এর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এক অদ্ভুত আলোড়ন এনেছিলেন যার জন্যে ওসাকা আজ জাপানের মধ্যে দ্বিতীয় নগরী বলে গণ্য হয়েছে।

ওসাকা দুর্গের উচ্চতা ৫০ মিটার। এর ওপরে আমরা উঠে সমস্ত ওসাকা শহরটিকে খুব ভালভাবেই দেখলাম। এর হাজার হাজার সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আর এর অসংখ্য প্রশস্ত রাজপথ আমাদের মুগ্ধ করেছিল। দুর্গটিকে দেখে তখনকার দিনের সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গেল। এর মধ্যে অসংখ্য চিত্র ও তখনকার-দিনের অনেক জিনিষপত্তর ঐ দুর্গের মধ্যে রাখা আছে। সামরিক শাসকদের অনেক চিত্র দেখলাম। জাপানীরা এখনও শোগুন Toyotomi কে দেবতার আসনে স্থান দেন। তাঁর ছবির সামনে এসে তাঁদের প্রণাম করতে দেখলাম। তাঁর ছবির আশে পাশে অনেক বীর সামুরাই-এর ছবি রয়েছে। কারও মুণ্ডিত মস্তক রয়েছে, কারও মাথায় রয়েছে লম্বিত বেনী, আর পরণে নানারকমের রংচঙের আলখেল্লারমত জামাকাপড়। হাতে রয়েছে দুটো তরোয়াল, একটা বড় ও একটা ছোট। গাইডের মুখে শুনলাম এঁরা প্রভুর রক্ষার জন্যে নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিত। Toyotomi ছিলেন একজন শোগুন (Shogunate)—অর্থাৎ সামরিক শাসক, সম্রাট নয়। সামুরাই হচ্ছে যোদ্ধার জাত। এই-রকম শাসকদের অনেক সামুরাই থাকত। তারাই এই সব শাসকদের দেহরক্ষীর কাজ করত। তবে এই শাসকদের অধীনে অনেক ছোট ছোট জমিদার শাসক থাকতেন তাঁরাও সামুরাই রাখতেন। এই সামুরাইদের যে কোন শাসক বা জমিদারেরা তাঁদের জমিদারী থেকে বেছে বেছে বহাল করতেন। আর সামুরাইরা তাঁদের সেবা করতে গর্ব্বে তাঁদের বুক ভরে উঠত। এটি তাঁদের একটি রাজসম্মান ছিল। গত যুদ্ধে এই রকম সামুরাই-এর একটি তরবারি আমার হস্তগত হয়েছে। সেটি সামরিক গভর্ণমেণ্ট আমায় উপহার দিয়েছিলেন। এই সব সামুরাইদের খুব আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। প্রভুদের বাঁচাতে না পারলে বা তাদের প্রভুরা যদি তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিতেন তাহলে তারা হারাকিরি করত। হারাকিরির অর্থ নিজের তলপেটে বড় ছোরা দিয়ে চিরে ফেলে আত্মহত্যা করা। গত যুদ্ধে আমরা যখন জাপানকে হারিয়ে দিলাম—সম্রাটের মন্ত্রী তোজো হারাকিরি করেন। কিন্তু তাঁকে তখনি হাস-পাতালে নিয়ে গিয়ে আমেরিকানরা তাঁকে বাঁচিয়ে পরে তাঁর প্রাণদণ্ড দেন। গত যুদ্ধে আমরা অনেক জাপানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হারাকিরি করতে শুনেছি। কিন্তু জাপানে গিয়ে এইসব সামুরাইদের আর চোখে পড়ে নি। জাপানীরাও আজ পাশ্চাত্যদেশের সব নকল করতে ব্যস্ত দেখলাম। তাঁদের চলন, বলন, পরণের পরিধান

বস্ত্র পর্য্যন্ত তাঁরা নকল করে চলেছেন। তাঁদের আর দেখলে মনে হয়না যে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রাখছেন। রাস্তাঘাটে তাঁদের মেয়েরা পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের ছেলেরা প্রৌঢ়রা পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদেশকে নকল করে রাস্তাদিয়ে চলেছেন। গল্পে পড়া আর ইতিহাসে পড়ার জাপানীদের আজ আর আমার চোখে পড়ল না। যুদ্ধের এই ক'বছরে সব পাল্টে গেছে। জাপানের পূর্ব্বেকার চিত্র আজ আর নেই, সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেছে সামুরাইরা। তাঁদের আত্মারা হয়ত ওপর থেকে এই সব দেখে মাথা নীচু করে রয়েছে। পুরাতন জাপানের সভ্যতার জায়গায় পাশ্চাত্যের সভ্যতা নকল করে আজ তাঁরা খুশী বলে আমার মনে হ'ল। পূর্ব্বেকার জাপানী মেয়েরা পুরুষদের সেবার জন্যেই জন্মাত। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চিন্তাও করত না। পুরুষকে দেবতার আসনে বসাত। কিন্তু আজকের মেয়েরা আর পুরুষদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, তারা আজ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা আজ তাদের দেবতার আসনে স্থান দেয়না। তারাও মানুষ পুরুষরাও মানুষ বলে তারা মনে করে। তারা চলার পথে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলেছে দেখতে পেলাম। এদের দেখে অনেক বৃদ্ধেরা বলে ওঠেন "কালে কালে হ'ল কি? আমাদের সময় মেয়েরা ত এমন ছিল না। এদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।" ওরা এদের কথাগুলো শুনতে পেয়ে হেসে চলে যায়। এই যান্ত্রিক যুগে জাপান পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে ছাড়িয়ে ক্রমাগত ওপরে উঠছে। ওদের অতীতের সমাজ আর বাধা দিতে পারবে না। তারা কারও বাধা মানবে না আর।

এর পর আমরা Sumiyoshi মন্দির দেখলাম। এটিতে এদের সমুদ্রদেবতা থাকেন। এই মন্দিরকে বলা হয় National Treasures। তারপর গেলাম ৫৯৩ খৃষ্টাব্দের তৈরী Shitennoji (সিটেনোজী) মন্দিরে। এই মন্দিরটি জাপানের মধ্যে সবচেয়ে পুরাণো মন্দির। গত মহাযুদ্ধের পর এর পাঁচতলা প্যাগোডা ও এর সংলগ্ন বাড়ীটির নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। তারপর ওসাকার প্রশস্ত বৃক্ষশোভিত রাজপথ মিডোসুজির (Midosuji) ওপর দিয়ে আমাদের বাসটি চলতে আরম্ভ করল। এর দুপাশেই রয়েছে অনেক পুরাণো ও নতুন বাড়ী। Shin Kabuki-Za থিয়েটার এর পাশেই রয়েছে দেখলাম। আমরা এখানকার কাবুকী থিয়েটার না দেখে টোকিও সহরের কাবুকী থিয়েটার দেখব। তাই আমরা সহরটিকে একটি প্রদক্ষিণ দিয়ে সোজা কিয়োটো (Kyoto) অভিমুখে যাত্রা করলাম।

কিয়োটো সহরটি ওসাকার উত্তরদিকে ৫০ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। ট্যাক্সিতে করে গেলে ৯০ মিনিটে সেখানে পৌঁছানো যায়। ভাড়া পড়ে তিন হাজার ইয়েন। রেলে করে যাওয়া যায়—প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ২৪০ ইয়েন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১২০ ইয়েন। কিন্তু এ ভাড়াটা ১৯৬৩ সালের সময়ের। এখন অনেক ভাড়া বেড়েছে। আমাদের বাসটি শহর ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে। সুন্দর প্রশস্ত রাস্তার দুধারে ক্ষেত আর মাঝে মাঝে তাদের ছোট ছোট গ্রাম। দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে। আমরা এবার ছোট্ট একটা গ্রামের রেষ্টুরেণ্টে থেমে আহার সমাধা ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে কিয়োটা শহরের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে স্টেশন-হোটেলে গিয়ে উঠব। ক্ষেতের ওপর ছোট ছোট মানুষদের রৌদ্রের মধ্যে টোকা মাথায় দিয়ে কাজ করতে দেখলাম। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথা নীচু করে ধানের গাছ পুঁতছে। মাঠে মাঠে প্রচুর জল রয়েছে। দুধারে চলেছে খাল। সেই খাল থেকেই ওরা জল তুলে মাঠে ঢালছে। তাদের সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। গ্রামের মধ্যে মধ্যে গরু চরছে। গরুগুলি বেশ মোটা-সোটা ও স্তনগুলো খুব ভারী। শুনেছি এখানকার গরুগুলি দিনে আধমণ করে দুধ দেয়। মাঠে মাঠে প্রচুর ঘাস, তারা আনন্দে খাচ্ছে। ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে অতীতের জাপান দেখছি বলে মনে হল। এখানে

জাপানী পুরুষেরা ও মেয়েরা জাপানী পোষাকেই ক্ষেতে কাজ করছে। বাড়ীর একটী গৃহিণী তার ছেলেকে ধরে নিয়ে বাড়ীতে ঢোকাচ্ছে আর ছেলেটি চীৎকার করে হাত-পা ছুঁড়ছে। ওদের দেখে মনে হল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়া এখনও এদিকে আসে নি। ওদের সঙ্গে কথা কয়েও দেখেছি ওরা সরলতার সঙ্গে কথা বলে। ওরা খুব সাদাসিধা ভালমানুষ। ছোটবেলার আমরা গ্রামে গিয়ে আমাদের কৃষকদের সঙ্গে কথা কয়েছি, একসঙ্গে বসে খেয়েছি, গল্প করেছি। তারা কত সরল সাধাসিধা ভালমানুষ ছিল। কিন্তু এখানকার গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে তাদের অনেক অনেক তফাৎ।

আমরা কিছুক্ষণ পরে ওদের গ্রামের রেষ্টুরেন্টে সকলে ঢুকে পড়লাম। আগে থেকেই এখানে আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করা ছিল। তাই অনেক পূর্ব্ব থেকেই আমাদের জন্যে খাবারের আয়োজন ওরা করে রেখেছিল। কথায় আছে জাপানী আর চীনারা সূর্য্যের নীচের যা কিছু খাবার জিনিস থাকে তা তারা কোনটাই বাদ দেয় না। তাই তারা কোন্‌টা খাবে আর কোন্‌টা খাবে না তার বালাই নেই। কিন্তু আমাদের হয়েছে ঠিক উল্টো। আমরা মাছ খাই, কিন্তু সবরকমের মাছ খাই না। আমরা ডিম খাই, কিন্তু হাঁস-মুরগী ছাড়া অন্য কোন পাখীর ডিম খাই না। আমরা মাংস খাই কিন্তু মুরগী, ভেড়া আর ছাগলের মাংস খাই, অন্য প্রাণীর মাংস খাই না। কিন্তু বিদেশে মুরগী ছাড়া খাচ্ছি না। কেন না গরুর মাংসটা ভেড়া আর ছাগল বলে চালিয়ে দিলেও বুঝতে পারব না। তাই ভেড়া আর ছাগলের মাংস খাচ্ছি না। আমাদের নিয়ে ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর মহা বিপদ্‌ হয়েছে। তারা আমাদের জন্যে এখানে অনেক পূর্বেই আমরা মুরগী খাব বলে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওরা ভুল করে মুরগী রান্না করে নি। গো-মাংসেরই নানারকমের খাদ্য তৈরী করেছে। কেন না এখানকার গোমাংস হচ্ছে খুব নামজাদা। ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে ট্যুরিষ্টরা এখানে বিফের অর্ডার দেন। এখানে গোমাংস দিয়ে Sukiyaki আর ষ্টেক্‌ পৃথিবীর কোন দেশে নাকি পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না বলা ভুল হবে। ওরকমটি তারা তৈরী করতে পারে না। জাপানীরা অন্যান্য দেশে গিয়ে রেষ্টুরেন্টে এই দুটো জিনিস তৈরী করে থাকে কিন্তু কান্‌সাই জেলার গরুর মাংস না হলে খেতে খুব সুস্বাদু হয় না।

টেবিলে বসে আবার আমাদের উঠে পড়তে হল। আমাদের উঠতে হ'ল বলে অন্যান্য বন্ধুরা গাইডকে বলতেই গাইড ওদের খোদ মালিকা মহিলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করল। ওদের ভুল হয়ে গেছে, দশমিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে বলে ওকে তিনি জানালেন। আমাদের খাবার নীচের ঘরে দেওয়া হল। ওদের ভাত খেতে ভাল নয় তাই চাওমিন খেলাম আর তার সঙ্গে অন্যান্য জাপানী রান্নার তরকারি। আমাদের ভাল লাগল না। শুধু মুরগী ভাজা আর চাওমিন খেয়ে সেদিন আমাদের দুপুর বেলাকার আহার সমাধা করলাম। ওপর থেকে খুব হৈ-হল্লা শুনতে পেলাম। ওরা খাচ্ছে আর মালয়ী ভাষায় বলছে 'বাগুস্‌' অর্থাৎ খুব ভাল হয়েছে। আমরা ওপরে উঠে আসতেই তাঁরা আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন যে আমাদের পেতে কি এখনও দেরী আছে। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে বলে তাঁদের জানিয়ে দিতে তাঁরা বিস্ময়ে অবাক্‌ হয়ে যান। ওখানে গিয়ে দেখি মালয়ী ভাষায় 'আরো দাও, আরো দাও, বলে তাঁরা ডাক পাড়ছেন। আমরা এসে লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। জাপানী ভদ্রমহিলা আমাদের খাওয়া দেখে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা বসে বসে দুজনে শস্যের ক্ষেত আর কৃষকদের কাজ দেখতে লাগলাম। সূর্য্যের প্রখর তেজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দুজনেই খুব গরম অনুভব করছিলাম। মাথার ওপর আর সূর্য্য নেই, একটু পশ্চিমে হেলে গেছে। বেলা এখন প্রায় দেড়টা। বন্ধুদের আধঘন্টা পরেই খাওয়া হয়ে গেল। আমাদের পাশে এসে একটু তাঁরা বিশ্রাম করতে চান। মিঃ চেং তাঁর অষ্টাদশীকে নিয়ে পড়েছেন। মালয়ী ভাষায় এটা-ওটা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁর ফ্রকে খাবারের দাগ লেগে গেছে মাথাটী জল এনে সেটাকে তুলতে চেষ্টা করছেন।

অষ্টাদশী স্বামীর সেবা প্রাণ ভরে নিচ্ছেন আর গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। অন্যেরা তাঁকে এখন বেশ একটু ঈর্ষার চোখে দেখছেন। তাঁদের স্বামীরাও ত দেখছেন কিন্তু স্ত্রীদের ত তাঁরা মিঃ চেং এর মত এমন ভাবে সেবা করা দূরে থাক একটুও ভালবাসেন না। মিঃ চেং এর প্রথম পক্ষের প্রৌঢ়া স্ত্রী ওঁদের ব্যবহার দেখে তিনি অন্য জায়গায় গিয়ে বসেছেন। ছেলে মেয়ে দুটি সবই বোঝে। বসন্তকাল ওদের মধ্যেও এসেছে কিন্তু বাপের এই নির্লজ্জতার জন্যে তাদের ফর্সা মুখগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধারা পাশে বসে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। ছোট বৌ স্বামীর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিলেন। অন্যান্যরা ধূমপান করছিলেন তাঁরা তাঁকে তাঁদের দেশলাইটা এগিয়ে দেন। সিগারেট ধরিয়ে সেখানেই তিনি বসে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে আরামের ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন। আমরা দু'জনে ওঁদের সকলের মুখের দিকে তাকাই, ওঁরা আমাদের দেখে মৃদু-মৃদু হাসেন। স্ত্রীর বটুয়াতে মৌরীভাজা ছিল তাই দু'জনে মুখে ফেলে চিবোতে লাগলাম। কিয়োটো এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র। সেখানে আড়াইটার মধ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে তা না হলে আমাদের Nijo দুর্গটীকে ভালভাবে দেখা হবে না। তাই আমাদের সকলকে উঠতে হল। যেতে যেতে গাইড Kyoto-র ইতিহাসের কয়েকটি কথা আমাদের জানিয়ে দিল।

একহাজার বছর ধরে কিয়োটো ছিল জাপানের রাজধানী। নারাতেই (Nara) প্রথমে রাজধানী ছিল। পরে ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নারা থেকে রাজধানীটি সরিয়ে কিয়োটোতে আনা হল। সম্রাট Kwammuই উদা বা উটা গ্রামেই কিয়োটো সহরটি তৈরী করে রাজধানীতে পরিণত করেন। ১৮৬৭ সালের পূর্ব্ব পর্যন্ত এখানে রাজধানীটি ছিল। কিন্তু পরে এটি এখান থেকে টোকিওতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সহরটি পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে যুদ্ধের সময়ে ধ্বংস যায়। পরে এটি আবার নতুন ভাবে নতুন রূপ নিয়ে তৈরী হয়েছে। কিয়োটোতেই প্রথম জাপানের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ দেখা যায় তাই কিয়োটোকে পূর্ব্বে বলা হতো "Cradle of Japanese culture"। এখানে সব মিলিয়ে প্রায় এখন দু'হাজার মন্দির ও পবিত্র স্থান রয়েছে। আর রয়েছে পুরাকালের কিয়োটোর অনেক কীর্ত্তিসমন্বিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি।

কিয়োটো দক্ষিণ হনসুর মধ্যে একটি প্রদেশ (Prefecture) আর কিয়োটো সহরটি তারই রাজধানী। এই সহরের মধ্যে দিয়ে কামো (Kamo) নদীটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কামো-নদীটি ইয়োডো (Yodo) নদীরই একটি শাখা। এই সহরটি টোকিও থেকে ২২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এর চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর জাল দিয়ে ঘেরা। এই সহরের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধদেবের ৫৮ ফুট উঁচু কাঠের মূর্ত্তি আর Byodoin মন্দিরের দালান। এই দালানটি ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। এটি পৌরানিক চীনা পাখী Phoenix-এর মত অনেকটা দেখতে। কিন কা কুজী মন্দির. রায়োয়ানজী মন্দির—Sanjusangen, do Hall, পুরাতন রাজার প্রাসাদ, কাটসুরা রাজার প্রাসাদ, সুগাকিন রাজার প্রাসাদ রয়েছে।

আমাদের বাসটি Nijo দুর্গের কাছে এসে পৌঁছেগেল। এ জায়গাটা গরীব পল্লী বলেই আমার মনে হ'ল। এখানটা খুবই অপরিষ্কার ছিল। এখন কেমন হয়েছে জানিনা। দুর্গটির পাশদিয়ে একটা বড় খাল চলে গেছে তার ওপর একটা পুল রয়েছে। আমরা পুলটা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে Nijo দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এর মধ্যে ঢুকতে দর্শনী লাগে। এই নিজো দুর্গটি যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তৈরী হয়নি। এটিকে দুর্গ বলে অভিহিত করলেও এটি দুর্গ নয়। এটি একটি রাজ প্রসাদ। রাজা তোকুগাওয়া ইয়াসু Tokugawa Ieyasu (১৫৪২-১৬১৬) ১৬০৩ সালে নিজে থাকবার জন্যে এটি প্রথম

গেছেন। এঁর মৃতদেহটি Nikkoতে Toshogu-র মধ্যে কবরিত রয়েছে। ১৮৮৩ সালেও এটি রাজার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে এটি সাধারণের দেখবার জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। এই দুর্গের বাড়ীটি আর আশে পাশের উদ্যানটি ১০ একর জমির ওপর অবস্থিত রয়েছে। বাড়ীর মধ্যেকার কারুকার্য্য ও সজ্জা দেখলে পুরাণো Momoyama যুগের অনেক সৌন্দর্য্যের ছবি চোখে এসে পড়ে। প্রাসাদটির মধ্যে ঢুকতে গেলে প্রথমেই একটি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত দারুনির্ম্মিত ফটকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই ফটকটির নাম কারামন ফটক (Karamon Gate)। ফটকটি পার হয়েই রাজপ্রাসাদে ঢুকতে পারা যায়। এই প্রাসাদটির নাম নীনামারু প্রাসাদ (Ninamaru Palace)। এর মধ্যে অনেকগুলি বারান্দা ও ঘর রয়েছে যেমন Kuruma-yose (বারান্দা), Tozamurai (বসবার ঘর), Shi-kidai, Ohiroma (হলঘর) Sotetsu-no-ma, Kuro-shoin ও O-Kiyodokoro ও Daidokoro (রান্না ঘর)। Momoyama যুগের আদর্শ অনুযায়ী এই প্রাসাদটী তৈরী হয়েছিল।

এর বারান্দায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে এর দারুনির্ম্মিত জানালার ওপর হাতের সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ-গুলো। ফুলের বাগানের মধ্যে একটি বড় গাছের ডালে পাঁচটি ময়ূর বসে আছে আর তারা নিজেরা নিজেদের অবাক্ হয়ে দেখছে। আমাকে 'এইটি দেখে বলতে হ'ল, এটি অপূর্ব্ব এর তুলনা হয়না।' তারপর Shikidai-এর বারান্দাটি সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে। দেয়ালের ওপরে হাতে আঁকা ফুল, গাছ, পাখী আর জন্তুর ছবি রয়েছে। এই বারান্দাটি বেশ চওড়া। এর ওপর দিয়ে অন্য ঘরে যেতে হয়। তারপর আমরা Ohiroma হলঘরে ঢুকলাম। এর মধ্যে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেলাম। রাজা বসে রয়েছেন একটু দূরে এক কোণে আর তাঁর উপদেশ পর পর বসে শুনছেন একদল লোক। এঁরা কেউ মন্ত্রী, কেউ সেনাপতি, কেউ সমাজের শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি। এই মূর্ত্তিগুলি সবই মনে হয় কাষ্ঠনির্ম্মিত। Edo যুগের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আর দেওয়ালে দেওয়ালে ছবিগুলো দেখে আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম। এ ছবিগুলি আর মূর্ত্তিগুলি শিল্পী Tanyu Kano-র সুনিপুণ হাতের তৈরী। Kano শিল্পবিদ্যালয়ের ইনি একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তখনকার দিনে সকলেই মাটিতে কার্পেট বা কাঠের পাটাতনের ওপর বসতেন। তাঁদের গায়ে নানা রংয়ের লম্বা লম্বা আল-খেল্লার মতন জামা ছিল। আর জামার ওপর ছিল অনেকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের ছবি। হয়ত সেগুলি পদমর্য্যাদার এক একটি প্রতীক চিহ্ন। এদের Sliding (গড়ানো) দরজাগুলোর ওপর হাতে আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখলাম। এই সব ছবিগুলো তখনকার দিনের প্রথমশ্রেনী শিল্পীর দ্বারা আঁকা হয়েছিল। দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যে দরজার সামনে গাছের ওপর অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে। কাছে গেলেই ধরা পড়ে যায় যে এগুলি সবই দরজার ওপর আঁকা আছে। দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরটির নাম Shiroshoin। এটি শোগুনের (Shogun) নিজস্ব ঘর। এই ঘরের কাঠের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো আরও মনোমুগ্ধকর। সমস্ত ঘরটি ছবিতে ছবিতে ভরা। এই ঘরে শোগুন একটি ছোট্ট কুশনের ওপর বসে তার ডান হাতটি একটি ছোট্ট বাহারে টেবিলের ওপর রেখেছেন। তাঁর ঘরে দুটি সজ্জিতা রমণী রয়েছেন। একজন মেঝেতে বসে আছেন আর অপর-জন হাতে একটি পানপাত্র নিয়ে দণ্ডায়মানা। সব মূর্ত্তিগুলিই মনে হয় কাঠের তৈরী। তখনকার দিনের একটি সুন্দর চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সকলেই পরে আছেন তাঁদের সেই যুগের পরিধান বস্ত্র। অপূর্ব্ব সুন্দর। এই সব চিত্রই Momo-yama যুগের।

আমরা তারপর নিনোমারু উদ্যানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই আমরা একটি পুকুরের কাছে গেলাম। পুকুরের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ

রয়েছে। এই দ্বীপগুলিকে এরা স্বর্গ ও প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে থাকে। এই উদ্যানটির নির্মাতা স্থপতিবিদ্ Enshu Kobari ও তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা। এই উদ্যানে নানারকমের অনেক গাছপালা চতুর্দ্দিকে রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে অগণিত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। বসবার জন্যে কয়েকটি জায়গা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাবা মা'র হাত ধরে সেখানে বসে এটা ওটা খাচ্ছে দেখলাম।

এই দুর্গাভ্যন্তর দেখতেই আমাদের প্রায় দিন গড়িয়ে এ'ল। আমরা খুবই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত অনুভব করতে লাগলাম। এরপর আমরা সোজা Station Hotel-এ চলে এলাম। এই হোটেলটি বেশ বড়ই তবে এর মধ্যে একশটি ঘর রয়েছে সবই প্রায় ভর্ত্তি। New Osaka হোটেলে ছিল ২১১টি ঘর যা সব সময়েই ভর্ত্তি থাকে। হোটেলের ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমরা জুতোটা খুলেই বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। আঃ কি শান্তি! প্রায় পনের মিনিট পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ল। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম অনেকগুলি পরিচিত মুখ। জিজ্ঞাসা করি, "কি ব্যাপার?"

মালয় ভাষাতেই আমায় তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "পুতুল নাচ দেখতে যাবেন না?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই যাব।"

"তা'হলে ৬টি আমেরিকান ডলার আমাদের দিন। আমাদের গাইড ছেলেটি এখনি টিকিট কাটিয়ে নিয়ে আসবে। তা না হলে বসবার আসন পাবেন না। এখানে পুতুল নাচ খুব বিখ্যাত আর সেই সঙ্গে ওদের গেসাদের (Geisa) টবে ফুল সাজানো আর জাপানীদের উৎসবে কেমন করে চা করে অতিথিদের দেয় তারও অভিনয় করে দেখাবে।"

আমি পকেট থেকে দুটি ডলার ওঁদের হাতে এনে দিলাম। ওঁরা খুশী মনে চলে যান। রাত ৮ টায় শো আরম্ভ হবে। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। এখনও ডিনারের সময় হয়নি তাই জানালার ধারে আমরা দুজন বসে রাস্তার গাড়ী আর লোকজন চলাফেরা দেখতে লাগলাম। কিয়োটো রাজপথে অসংখ্য যান বাহন আর পথচারীর যাতায়াত চলেছে। আশে পাশে রাস্তার ধারে ধারে বেশ কয়েকটি বড় বড় দোকানে বেচাকেনা হচ্ছে। দূরে চেয়ে দেখলাম কিয়োটো সহরটিকে আলোর মালায় যেন কে সাজিয়ে দিয়েছে। পাশেই একটা সরু গলি চলে গেছে। সরু গলির ধারে একজন দোকানীকে কয়েক ডজন ছোট বড় তরমুজ বিক্রি করতে দেখা গেল। সবগুলিই কালো কালো তরমুজ। ওর মধ্যে একটাও সাদা কুমড়োর মত তরমুজ দেখতে পেলাম না। কুমড়োর মত তরমুজের একটা ফালি New Osaka হোটেলে খেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করেছিলাম। এখনও যেন তা আমার মুখে লেগে রয়েছে। এখন ডিনার খেতে যাব তাই আর তরমুজ কেনার দিকে ঝোঁক দিলাম না। রাত্রে ফিরে যদি দোকানটা খোলা থাকে তখন কিনে এনে ঘরে খেলেই হবে। একটু পরে ডিনারের সময় হওয়াতে আমরা নীচে গিয়ে ডিনার টেবিলে এসে বসলাম। আমাদের দলটি আগেভাগে ওখানে এসে আসন দখল করে রয়েছেন দেখতে পেলাম।

ক্রমশঃ

২৮৮ পাতার পর

মনেই বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সরকারী কাজ কারবার কখনও ঠিক ভাবে চলিতে পারে না, সেই ধারণাটি পূর্ণরূপে অসত্য প্রমাণ করা একান্ত প্রয়োজন। কঠিন হস্তে সকলকে নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য করিলে তবেই এই ক্ষেত্রে সফলতা আসিতে পারে। গভর্ণমেন্ট কি ইহা করিতে পারিবেন ?

পার্লামেন্টের সভ্যদিগের পাওনা

এম্ পি, অথবা পার্লামেন্টের সভ্যগণ দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে দেশশাসন কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য যাহা পাইয়া থাকেন তাহার তালিকা একটি ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। পার্লামেন্টের সকল সভ্যগণই মাসিক ৫০০ শত টাকা বেতন হিসাবে পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা পার্লামেন্টে যতদিন উপস্থিত থাকেন ততদিন প্রত্যেক দিবসের উপস্থিতির জন্য ৫১ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন। উপস্থিতির জন্য প্রতি ১৪ দিনে একবার করিয়া সহি করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ একবার সহি করিলেই তাঁহারা ১৪×৫১ বা ৭১৪ টাকা খরচ হিসাবে পাইয়া থাকেন। পার্লামেন্টের সভ্যগণ ভারতীয় রেলওয়েতে সর্ব্বত্র বিনা ভাড়ায় প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারেন। তাঁহার বাৎসরিক ১১ বার বিনা ভাড়ায় বিমানে গমনাগমন করিতে পারেন। ইহার উপরে যদি বিমান যাত্রা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে রেলভাড়া (১ম শ্রেণী) ও বিমান ভাড়ার তফাৎ পরিমাণ টাকা দিয়া তাঁহারা যথেচ্ছ বিমানে যাতায়াত করিতে পারেন। দিল্লীতে পার্লামেন্টের সভ্যগণ আসবাব-সজ্জিত গৃহ অল্প ভাড়ায় পাইয়া থাকেন। টেলিফোন ও বৎসরে ৫০০০ বার টেলিফোন ব্যবহার করা বিনা খরচে পাওয়া আর একটা অধিকার। ডাক খরচ মাসিক ১০০ শত টাকা, বিনা খরচে চিকিৎসা, বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিদেশী অর্থ পাইবার ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের সস্তায় উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহের ভোজনাগার এবং যুদ্ধপূর্ব যুগের মূল্যে ঘৃতাদি পাইবার একটি সস্তার দোকান ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য সুবিধা। পার্লামেন্টের সভ্যগণ যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজধানীতে গমন করেন তখন তাঁহারা ভারত সরকারের যে সকল বাসগৃহ ঐ রাজধানীগুলিতে আছে সেই সকল গৃহে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থাতে থাকিবার ঘর পাইতে পারেন।

পুনর্যাত্রা—স্মৃতিপথে

পরিমল গোস্বামী

আমার মোট পাঁচখানা স্মৃতিগ্রন্থ, শেষ গ্রন্থ—'যখন সম্পাদক ছিলাম' (১৯৭০)। এই পুস্তকের দুটি অধ্যায় প্রবাসীতে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। (প্রথম দিকের নয়টি অধ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়)।

এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে—তাই আর একবার বলা গেল কলম নিয়ে। এর নাম দিলাম পুনর্যাত্রা—স্মৃতিপথে। এবারে যা বলব তা আমার সম্পাদনায় জীবনের আর একটি লঘুগুরু দিক। এবং তা প্রধানত যুগান্তর দৈনিকের আমার ইতস্ততঃ নামক ধারাবাহিক রচনা বিষয়ে। এর সামান্য কিছু পঞ্চম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ নতুন।

ইতস্ততঃ নাম কেন হল তা পূর্বের বইতে বলেছি। এটিও আমার একজাতীয় সম্পাদকীয়, কিন্তু তবু একটু অন্যজাতের। এতে প্রায় সবই সমকালের সংবাদ নিয়ে লঘু আলোচনা—গুরু আলোচনা। এই ইতস্ততঃ আমি আরম্ভ করেছিলাম ১৯৬০ সন থেকে, এখনো চলছে, যদিও আমি যুগান্তর ম্যাগাজিন সেক্শনের সম্পাদক পদ থেকে ১৯৬৪ সনে অবসর গ্রহণ করেছি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত ইতস্ততঃর কিছু কিছু বাছাই-করা অংশ একত্র করে "ইতস্ততঃ" নামক একখানা বই ছাপা হয়, প্রকাশ করেছিলেন শ্রীযুক্ত ডি ডি মেহরা (রূপা অ্যাণ্ড কোং)।

তারপরের এক বছরের ইতস্ততঃ হারিয়ে গেছে আমার সংগ্রহ থেকে। তাই ১৯৫৭ সন থেকে ইতস্ততঃর স্মৃতি লিখতে যাচ্ছি এখন। অবশ্য তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই থাকবে। ইতস্ততঃর বাছাই করা অংশ মাত্র এ রচনায় দেওয়া সম্ভব হবে। আগেই বলেছি, এ সবই প্রায় সমকালের সংবাদের উপর ভিত্তি করে লেখা, তাই এতে আমার মন্তব্যের মূল্য যাই হোক না কেন, সংবাদ-মূল্য একটা থেকেই যাবে। সেদিক থেকে এগুলি একসঙ্গে সংকলনের একটা মূল্য থাকবে বলেই বিশ্বাস করি। অবশ্য তা কেবলমাত্র সংবাদ-ভিত্তিক লেখাগুলিতেই থাকবে। সব সময় শুধু সংবাদ নির্ভর আলোচনা হয়নি, তার বাইরেও অনেক আছে। পাঠকপাঠিকার কিছু কিছু জিজ্ঞাসার উত্তরও দিয়েছি অনেক সময়। বিশুদ্ধ কৌতুকও আছে।

প্রথমেই যে ইতস্ততঃটির অংশ এখানে উদ্ধৃত করেছি, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সনের প্রথম রবিবার, ৬ই জানুয়ারীতে। বিষয় 'নতুন বছর':

নববর্ষ

এটি শুধু নতুন বছর নয়, এটি ১৯৫৭! এ শুধু ১৯৫৬কে বিদায় দিয়ে ১৯৫৭কে বরণ করা নয়। ব্যাপারটা অন্যান্য বছরের মতো হলে ভাবনা ছিলনা, কিন্তু এ বছরটি স্বতন্ত্র। এটি মুক্ত বছর নয়। পুরানো যা কিছু, সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিয়ে গায়ে সাবান ঘষে সিল্কের পোশাক পরে নববর্ষ এসে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁকে বরণ করে নিলাম, তা নয়। এ একটি সম্পূর্ণ বদ্ধ বছর। পিঠে গত ৯৯ বছরের বোঝা নিয়ে শম্বুক গতিতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর চেহারা দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে খবরের কাগজের অফিস পর্যন্ত তটস্থ।

কিংবা হয়তো তটস্থ বলাটা ঠিক হল না। সবাই এখন সমুদ্রস্থ—তটস্থ হবেন বছরটা পার করে দিয়ে। ১০০ বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১০০ বছর আগে ঘটেছিল সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু এ দুটি বৃহৎ ঘটনা শুধু স্মরণ করলেই হবে না, এই ১০০ বছরে দেশের কতটুকু অগ্রগতি ঘটল, তার ইতিহাস যিনি যত তথ্যপূর্ণ করে তুলতে পারবেন,

তাঁর পরিশ্রম তত সার্থক হবে। ১০০ বছর আগে ১৮৫৭-তে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার দুটি দিক। এক দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ বিদ্যা ও সংস্কৃতির দিক। অন্যটি সিপাহী বিদ্রোহ, অর্থাৎ লড়াই-য়ের দিক। (এখন অবশ্য দুই এক হয়েছে এ রচনা যখন লিখছি)।

এই শেষের দিকটির একটি স্পষ্ট ও স্পর্শযোগ্য পরিণতি, ঘটেছে এবং আদর্শ ও স্পিরিটে (যা আমরা অনুমান করি), তা যদি সত্য হয় তা হলে তা সকল দিক দিয়ে সফল হয়েছে। বিদ্রোহ শুধু পরাধিকারের বিরুদ্ধে নয়, পরশাসনের বিরুদ্ধে নয়, নিজ দেশের বহু অর্থহীন সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধেই নানা বিদ্রোহ ঘটেছে, এবং মোটের উপর সমাজের দিক দিয়ে আমরা অনেকখানি বিশ্বজনীন হয়েছি আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকটা? সেদিকে কি বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ হয়েছে এই ১০০ বছরে?

বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদ্রোহজাত বিপ্লবের এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম মাইল-স্টোন। প্রথম মাইলস্টোন প্রথম মাইলের শেষেই থাকে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে থাকতেই বিপ্লবের শুরু হয়েছে। এ বিপ্লব জন্মেছে বিদ্রোহ থেকে এবং তা সিপাহী বিদ্রোহ নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমরা যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম, তা ১৮৫৭ সনের পর ৪৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এবং উনিশ শতকে জন্মে ইউরোপীয় আঙুরের মদ এবং ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের মদ পান করে যাঁরা বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাঁরা বর্তমান শতকের প্রায় আধাআধি পর্যন্ত তার জের টেনে এনেছিলেন। তারপর থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লব শুরু হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্ভবত আরো বেশি।...

পশুশালায়

আমার এক ভাগিনা দুবছর লণ্ডন বাস করে ১১ বছর বয়সে যখন ফিরে আসে তখন তার অনেকগুলো ফোটো-গ্রাফের মধ্যে একটি ফোটোগ্রাফ ছিল—ভালুকের ছদ্ম-বেশে তোলা তার একখানি ছবি। কোনো উপলক্ষে সেখানে ব্যবসাদার ফোটোগ্রাফার ছেটে ছেলেমেয়েদের নানা ছদ্মবেশ পরিয়ে ছবি তুলে বেশ কিছু উপার্জন করে। ছবিটি খুব মজার মনে হয়েছিল। ১৯৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে ভাগিনাকে নিয়ে একদিন আলিপুরের পশুশালায় গিয়েছিলাম। খুব সকালে গিয়েছিলাম তাই ভালুকের ভোজন দেখার সুযোগ হয়েছিল। ভাগ্নেকে বলেছিলাম, এরা সবাই মানুষ, ভালুক সেজে আছে। ঠিক তুমি যেমন লণ্ডনে ছিলে। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, এবং সেও খুব হেসেছিল সেকথায়।

কিন্তু হঠাৎ দেখি খাঁচার ভালুকেরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং খাঁচার মধ্যে ছটফট করে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল, এবং দুতিনটি ভালুক মাঝে মাঝে মানুষের মতো একটি দণ্ড জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে এমন জোর গলায় চেঁচাতে লাগল, যা শুনে সত্যই মনে হয়েছিল কোনো মানুষ গান গাইছে। পরে এই কাণ্ড দেখে যে ইতস্ততঃটি লিখেছিলাম ৩রা ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) তারিখে সেটি ছাপা হয়েছিল। তার অংশ বিশেষ এই:

আমরা পশুশালায় গিয়ে যেসব প্রাণী দেখতে পাই তার বাইরে তাদের কি হল না হল তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? এবং পশুশালায় কি আমরা আসল পশুদের দেখতে পাই? আলিপুরের কথাই ধরা যাক। কত লোক সেখানে গিয়ে জন্তুজানোয়ার দেখে ফিরে আসে, অথচ তারা জানে না কি দেখল।

আমিও একদিন প্রতারিত হয়েছিলাম। আলিপুর পশুশালায় যাওয়া এ-যাবৎকাল আমার একটি বিলাসিতা ছিল, সুযোগ পেলেই যেতাম, কিন্তু কিছুকাল হল যাওয়া বন্ধ করেছি। এখানকার বিষয়ে বর্তমানে আমি মোহমুক্ত। কেন, বলি।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। এই ঘটনাই আমার মনে প্রথম সন্দেহ জাগায়। সেদিন সকালে ভালুকের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছি. হঠাৎ দেখি ভালুকেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে খাঁচার ভিতর ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করে দিল। ভালুকের এমন উদ্দাম উল্লাস

আগে কখনো দেখিনি, এবং শুধু তাই নয়, দেখি এক-একটা ভলুক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে জোর গলায় হো-হো হা-হা করে গান গাইতে লাগল। ইউরোপীয় সুর। একটু গেয়েই খাঁচার মধ্যে এক পাক ঘুরে আসছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে গান গাইছে। প্রত্যেকটি ভালুক এই রকম করছে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে বোধ করি একমিনিট সময়ও লাগেনি। পর-ক্ষণেই আবিষ্কার করলাম—যে লোকটা ওদের খাবার বয়ে আনছে তাকে ওরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে। বাহক এসে এক বালতি খিচুড়ি ঢেলে দিল খাঁচার মধ্যে তবে ওরা শান্ত হল।

কিন্তু ঐ ইউরোপীয় গান। অনেকক্ষণ বসে চিন্তা করলাম তেঁতুল গাছের তলায় বসে। ঘন্টাখানেক পরে সুপারিনটেনডেন্টকে গিয়ে বললাম, ব্যাপার কি? সব খুলে বলুন তো? আমার জিজ্ঞাসার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, আর লুকিয়ে লাভ নেই। তিনি আমাকে একটি নির্জন ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং সব বলতে লাগলেন। পুরো এক ঘন্টা শুনলাম।

যা শুনলাম তা এই: ভালুক তিনটি আসলে ভালুক নয়, তিনজন জারমান, ভালুক সেজে আছে। যুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে অন্যান্য কয়েকটি জীবজন্তুর সঙ্গে ভালুকদেরও এখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, সে সময় ভালুকেরা হঠাৎ রক্ষকদের হাত থেকে পালিয়ে যায়। রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যে তারা পালিয়ে গেল তা কেউ জানে না। ঠিক এই সময়েই তিনজন জারমান ভদ্রলোক (তাঁরা কলকাতায় ইংরেজ পরিচয়ে কোনো রকমে বাস করছিলেন) তাঁদের আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়াতে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এসে প্রায় পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমাদের বাঁচান; আমরা ভারতের বন্ধু, কিন্তু ইংরেজরা দেখলেই আমাদের বন্দী করবে।' এটি ১৯৪২ সনের ঘটনা। সুপারিনটেনডেন্ট সব শুনে বললেন, 'ভালুক সেজে থাকতে রাজি আছেন? যে তিনটি ভালুক পালিয়েছে তা নিয়ে আর হৈ চৈ হবে না তা' হলে।' অবশেষে তাই ঠিক হল। ভালুকের সাজ যোগাড় করতে অসুবিধা হল না। সেই থেকে তিনজন পলাতক জারমান তিনটি পলাতক ভালুকের স্থানে বহাল হলেন। এবং তাঁরা কেমন সুন্দর অভিনয় করে চলেছেন, তা তো চোখেই দেখলেন।

তারপর যুদ্ধ থেমে গেল। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'এবারে তোমরা যাও।' ওঁরা বললেন, 'তা কেন? আমরা এই ভালুকের জীবনে এমন অভ্যস্ত হয়েছি যে এটি ছাড়লে এখন মারা পড়ব। বেশ তো আছি। তোমাদেরও হাঙ্গামা কম। শুধু খিচুড়ি দিলেই খুশি থাকব, আর বিশেষ কিছু চাইব না। তাছাড়া এখন নতুন ভালুক আনতে গেলে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ বেশ আছি। কেবল মনে স্ফূর্তি জাগলে, বিশেষ করে খিচুড়ি দেখলে, একটু গান গাইব, আর কিছু না।'

কিন্তু শুধু এরাই নয়, শুনলাম পশুদের এখানে খাদ্য-বরাদ্দ এমন লোভনীয় যে, এখানে অন্তত পনেরো জন বেকার ব্যক্তি পশু সেজে আছে শুধু দুবেলা খেতে পাবে বলে। এদের মধ্যে দুজন গ্র্যাজুয়েট, তিনজন ডি, ফিল, বাকি সবাই প্রায় প্রবেশিকা পাস। জন-প্রিয় চিম্পাঞ্জিটি একজন নামকরা নৃতাত্ত্বিক। অ্যান্‌থ্রপয়েড জীবন যাপন করে বিবর্তন-ধারাটি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত শতবার্ষিকীর বিশেষ কনভোকেশনের দিন চিম্পাঞ্জির খাঁচাটি বন্ধ ছিল, কারণ সেদিন তাঁর চিম্পাঞ্জির ছাল ফেলে কনভোকেশনের চাল পরে উপাধি বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকার দরকার ছিল। অন্যান্য কয়েকটি পশুর মধ্যে দুজন সিনেমা অভিনেতা আছে। তাদের বিশেষ বিশেষ দিন সন্ধ্যায় ছুটি দেওয়া হয়। এখানে পশু সেজে থাকলে খাওয়াটা ফ্রী পাওয়া যায়। সিনেমায় তাদের উপার্জন বেশী নয়। মাঝে মাঝে ডাক পড়ে। আরেকজন অভিনেত্রীও আছে, কিন্তু কোনটি তা বলা চলবে না।

আমি এসব শুনে স্তম্ভিত। আর যাইনি সেখানে। বুঝেছি, নকলের সাহায্যেই অনেক সমস্যার সমাধান সহজে হয়। ঘি, তেল প্রভৃতিও তাই সমাজে এত চলে।

এভাবে মাঝে মাঝে শুধুই কৌতুকের জন্য কৌতুক করা হয়েছে। এই সময় একটি অভিনব খাদ্যবস্তুর খবর বেরিয়েছিল যুগান্তরে। এর শিরোনাম ছিল—

পরমাশ্চর্য মেওয়া

আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম—(১০।২।৫৭) কুরুক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ সম্মেলনের সভাপতি বৈদ্যরত্ন কবিরাজ প্রতাপ সিং গ্রিগ্রিকা নামক এক ভারতীয় ফলের দুর্লভ নমুনা প্রদর্শন করেন। এই ফল খেলে প্রায় দু'মাস আর কোনো খাদ্য গ্রহণের দরকার হয় না। স্বাদ আলুর মতো। অতীতে মুনিঋষিরা দীর্ঘকাল তপস্যা করার সুবিধার জন্য এই ফল খেতেন। এই ফলের গাছ স্বভাবজ—অর্থাৎ যেখানে সেখানে জন্মে। আলমোড়া জেলায় প্রচুর জন্মে চাষও করা যায়। একটি গাছ থেকে প্রায় পাঁচ মোন ফল পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি ভবনে এ গাছের চারা লাগানো হয়েছে।

খবরটা এই পর্যন্তই উদ্ধৃত করার পর আমি মন্তব্য করলাম— এ ফল বিষয়ে আমি এতদিন কিছু বলি নি, কারণ আমার নিজের এই রকম একটি ফলের দরকার ছিল। কিন্তু ফল পাব কি করে তা আমার জানা নেই। এত বড় একটি খবর, পি-টি-আই কর্তৃক যত্ন করে সংগ্রহ করা, অথচ এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে কোনো সাড়া নেই কেন, এইখানেই আমার মনে সন্দেহ জাগে। তা'ছাড়া পি-টি-আই-এর নিজস্ব ভাষার অর্থ এই যে, এ ফলের নমুনা দুর্লভ—a rare specimen, অথচ পি-টি-আই বলছে একটি জেলায় এ গাছ প্রচুর জন্মে, অর্থাৎ জংলী গাছ, বিনা চাষে হয় এবং একটি গাছে পাঁচ মোন ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই ফল একই সঙ্গে সুলভ এবং দুর্লভ, তার অর্থ কি?

এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলমোড়ায় যেতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু বিরত হয়েছি। মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দর কথা। তিনি আলমোড়ায় এসেছিলেন (১৮৯০) কিন্তু কখনো গ্রিগ্রিকার কথা বলেন নি, সম্ভবত খানও নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলমোড়ায় এসে (১৯০৩) কিছুকাল বাস করে গেছেন, এবং সেখানে বসে কিছু কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু গ্রিগ্রিকার কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর এখানে বসে লেখা কবিতায় তিনি গ্রিগ্রিকার কথা বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি। এই সব ভেবে আমার আর সেখানে যাওয়া হল না। কেবল ঐ নামের কোনো অর্থ আছে কি না ভাবতে লাগলাম। গিরির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি? গৃহস্থ থেকেও নামকরণ হতে পারে। গৃহস্থিকা, গ্রিগ্রিকা। কিন্তু মুনিঋষি যা খেতেন তার সঙ্গে বিশেষ করে গৃহস্থ নাম যোগ করা হল কেন—যদি হয়েই থাকে। তবে মুনিঋষিরা গৃহস্থ ছিলেন প্রায় সবাই—কিন্তু আর ভাবব না।

সংবাদ ছাপা হয় কিন্তু তার পরে কি হল সে বিষয়ে সবাই নীরব। এ রকম আরো একটি ঘটনা আমার নোট করা আছে। এ খবরটি বেরিয়েছিল ১৯৫৩ সনের ২রা ফেব্রুয়ারির যুগান্তরে। সবটাই তুলে দিচ্ছি এখানে:

কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুতে ভারতের সাফল্য

(সামান্য ব্যয়ে দধি ও দুগ্ধ উৎপাদন।)

লখনৌ, ৩১শে জানুয়ারি। আজ জানা গিয়াছে যে ভারতের খাদ্যাভাব মোচনকল্পে কৃত্রিম খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার যে কৃত্রিম দধি প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার ফলে দধি উৎপাদনে সের পিছু মাত্র তিন আনা ব্যয় হইবে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে কৃত্রিম দুগ্ধ উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে দুগ্ধে যে পরিমাণ ভিটামিন থাকে তাহা সংরক্ষিত হইবে এবং সের পিছু তিন আনা হইতে চারি আনা ব্যয় পড়িবে। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর ডঃ সুব্রহ্মনিয়ম যুক্তরাজ্যে দুই তিন লক্ষ টাকা মূল্যে ব্যাপক-ভাবে উৎপাদন ব্যাবস্থা প্রবর্তনকল্পে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে গিয়াছেন।

—পি টি আই

এমন একটা খবর অথচ এর পরে কি হল তা নিয়ে পি-টি-আই নীরব কেন? উক্ত ডাইরেক্টর সাহেবের কি হল? তিনি কি কেবল বিদেশ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বিলেথ

গিয়েছিলেন? তিনি কি ফিরেছেন আদৌ? সংবাদে উল্লেখিত দু'তিন লাখ টাকারই বা কি হল? অদ্যাবধি সবাই নীরব। কারণ একমাত্র ফৌজদারী মকদ্দমায় খবর আরম্ভ হলে পরে কি হয় তাও জানা যায়, খাদ্যে যুগান্তর ঘটানোর প্রতিশ্রুতির খবর একবারের বেশি ছাপা হয় না।

নতুন ওজন ও দশমিক হিসাবে মুদ্রার প্রচলনে কিছু-কাল আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়েছিল। তা ছাড়াও পঞ্জিকায় বাংলা সাল ও তারিখের বদলে শক আসাতেও কম শক পাইনি কারণ বাংলা সাল ও বৎসর আরম্ভ আমরা অদ্যাবধি ছাড়ি নি। শুধু পয়সার হিসাব ও ওজনের ধারণা আমাদের সহজে হয়নি। সেন্টিগ্রেড কিছু কিছু অভ্যাস ছিল আগে থেকেই। এ বিষয়ে তখন যা লিখেছিলাম—ছাপা হয়েছিল ২৪শে মার্চ ১৯৫৭ তারিখে।

নতুন পয়সা, ওজন তারিখ, তাপমাত্রা

মাপে মেট্রিক, মুদ্রায় দশমিক, উত্তাপে সেন্টিগ্রেড ও পঞ্জিকায় চৈত্রীয় বার্ষিক রীতির চলন হওয়ায় অনেকে আপত্তি করছেন এই ভেবে যে, তাঁরা সহজে এই রীতিতে অভ্যস্ত হতে পারবেন না। এবং যতদিন না পারবেন, ততদিন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দিন কাটাবেন।

এটাই যদি একমাত্র আপত্তি হয়, তা হলে তার কোনো দাম নেই, কেননা আমরা দৈনন্দিন জীবনে মোটামুটিভাবে প্রায় সবাই উদ্‌ভ্রান্ত। আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধি, উদ্‌ভ্রান্ত বিবেচনা, উদ্‌ভ্রান্ত চালচলন, এবং উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। কাজেই নতুন যা কিছু হোক তাতেই যে আবার নতুন করে উদ্‌ভ্রান্ত হব, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

নব্য রীতিটি ভাল কি না, সে কথা কেউ বলছেন না। তবে ভাল হোক মন্দ হোক, কিছুদিন ঠকতে হবেই প্রতারকদের হাতে। নতুন হিসাবে জনসাধারণকে ঠকাতে হলে ঠগদের আগে হিসাবে পাকা হওয়া দরকার। সে জন্য তারা একটা কলেজ খুলে তাদের ছাত্রদের শেখাচ্ছে কি করে অল্প সময়ে নতুন ও পুরানো পয়সার ভাঙানিতে লোক ঠকানো যায়।...একটি গুজব থেকে জানা গেল, এই নতুন পয়সা, নতুন মাপ ও নতুন পঞ্জিকার কথা ভাবতে গিয়ে অনেক লোক পাগল হয়ে গেছে। এবং তারা হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাদের জন্য পৃথক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ তারা কেউ দশমিক উন্মাদ, না হয় মেট্রিক উন্মাদ, কেউ বা লিটার ও মিটার উন্মাদ। সেন্টিগ্রেড উন্মাদের সংখ্যা কম এবং শক উন্মাদরা সালের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে ক্রমাগত চেঁচিয়ে বলছে শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

এই সময় ইতস্ততঃতে এই নতুন পয়সার বিনিময় হার নিয়ে একটি ছড়া লিখেছিলাম—

ভাঙানিতে পেলে কত নয়ে পয়সে
পুরাতন পয়সার সম হয় সে—
খদ্দের জানে না তা,
জানে না দোকানদার,
কেউ খুলে বলছি না
হিসেবের দায় কার।
যুৎসই উত্তর
নেই কোথা, ছত্তোর,
সমস্যা বেড়ে যায়
উত্তরোত্তর।
হিসাব মেলাতে চাও?
—সোজা ডাকঘরে যাও,
যারে জিজ্ঞাসা করি
ঐ কথা কয় সে।
কিন্তু পিছিয়ে আসি
লাইনের ভয়ে সে।

—ক্রমশঃ

অন্ধ্র ভূমির সন্ত কবি

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম যৌবনের সে কি অবিবেকী প্রমত্ত সম্ভোগ। কে তখন কল্পনা করবে সন্ত কবি বেমানাকে? সেই রাজকীয় ঐশ্বর্যের সুখ বিলাস, লাস্যময়ী সৌন্দর্যময়ী নটীর রূপ যৌবন। সুরের অপরূপ মাদকতা, নৃত্যের ছন্দিত হিল্লোল, তাহার প্রতপ্ত উন্মাদনা। ভূলোকের ইন্দ্রলোকে নিত্য বিলসিত তখন বেমানার তরুণ জীবন। মোহনাঙ্গীর অমৃত ভরা যৌবন সম্ভার আর মোহমুগ্ধ পতঙ্গ যেন!

সেদিন মোহনাঙ্গীর প্রেম যদি অমলিন হয়ে থাকত? যদি সুবর্ণ সার্থক হত কনকাভিষেকম্? তাহলে কি অন্ধ্র-বাসীরা তাদের প্রিয় সন্ত কবিকে এমন করে লাভ করত?

এ প্রশ্নও আজ অবান্তর। কারণ অন্ধ্র রাজ্যের দিকে দিকে এখনো সঞ্জীবিত হয়ে আছে বেমানার নাম। শতাব্দের পর শতাব্দ উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আজও তেলেগু ভাষায় সর্বজনপরিচিত রয়েছেন কবি বেমানা। এমন লোকপ্রিয় কাব্য রচনাকার অন্ধ্রদেশে দ্বিতীয় দেখা যায়নি। আদি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এত অজস্র কবিতার রচয়িতা তেলেগু ভাষায় আর কেউ নেই। যদিও তা বেশির ভাগই চার-ছয় পঙ্‌ক্তির কাব্য-কণিকা, তথাপি সংগৃহীত হয়েছে প্রায় পঞ্চ সহস্র, আরো কিছু অবশ্যই লুপ্ত হয়ে গেছে বিস্মৃতি লোকে। কারণ বেমানার জীবিতকালে তাঁর রচনাবলী রক্ষা করবার প্রয়াস কেউ করেননি। তাঁর অগণিত ভক্তজনের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সেই বিপুল সৃষ্টি গ্রন্থ-বদ্ধ হয়েছে নিতান্ত আধুনিক কালে।

অন্ধ্রভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত কবি বেমানা। তেলেগু ভাষায় আরো শক্তিশালী অবশ্যই আছেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধু চরিত্রও রয়েছেন অন্ধ্রবাসীদের সামনে ধর্মজীবনের দৃষ্টান্ত হয়ে। কিন্তু একাধারে এমন কবি ও এমন সন্ত দুর্লভ দক্ষিণ ভারতের তেলেগু-ভাষীদের মধ্যে।

শুধু অন্ধ্র রাজ্যে নয়। প্রতিবেশী নানা অঞ্চলেও সাধারণের মনোলোকে তিনি তাঁর কাব্য সৃষ্টি নিয়ে আজও অমর। ভাষার ব্যবধান উত্তীর্ণ করে তাঁর নানা কবিতা তামিল ও কানাড়ায় অনুবাদ হয়েছে। তামিল-ভাষী আপন করে নিয়েছে তেলেগু কবিকে।

এমন কি দার্শনিক ক্ষেত্রেও বেমানার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যোগী বেমানা দার্শনিক বেমানা, সন্ত কবি বেমানার যশ এ রাজ্যের চতুঃসীমার বাইরেও সমুজ্জ্বল। কিন্তু কোথায় গেল মোহনাঙ্গী তাঁর রূপ যৌবনের দীপ্ত দাহ নিয়ে? বিস্মৃতির কোন্ অতলে? সন্ত কবির নামের সঙ্গেও স্মরণে মননে সে নটীর আর কোন সম্পর্কই নেই।

সাধক কাব্যকার বেমানার সমাদর অন্ধ্রভূমির সর্বত্র। যেমন বিশাল তেমনি প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এই অন্ধ্র দেশ। মধ্যপ্রদেশ ও কলিঙ্গের দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমে, তামিল রাজ্যের উত্তরে এবং মহীশূরের পূর্বে ব্যাপ্ত এই রাজ্যের চতুঃসীমা। নগ-শ্রেণী নদনদী উপকূল সমতল উপত্যকা অধিত্যকা গহন অরণ্যানীর বিচিত্র নিসর্গদৃশ্য তার দিকে দিগন্তরে। পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে বিস্তৃত পূর্বঘাট পর্বতমালা। কৃষ্ণা গোদাবরীর সুদূর বাহিনীর ধারা সিঞ্চন উর্বরা উপত্যকাভূমি। গুন্টুর নেল্লুর অঞ্চলের নয়নাভিরাম সমুদ্র-উপকূল। রাজ্যের অংশে অংশে অবারিত প্রকৃতির পট-বৈচিত্র্য। প্রধানা স্রোতস্বিনী কৃষ্ণা গোদাবরীর অগণিত শাখা-প্রশাখায় বিধৌত বিভিন্ন অঞ্চল।

গুণে ও পরিমাণে বিশাল অন্ধ্রে শিল্পসংস্কৃতির কি ঐতিহ্যপূর্ণ ঐশ্বর্যসম্ভার। অমরাবতীর বহু প্রসিদ্ধ মহা চৈত্য। নাগার্জুনীকোণ্ডার কালজয়ী মনোহর ভাস্কর্য। সিংহাচলম্ গিরির দর্শনীয় নরসিংহ মন্দির। হনমকোণ্ডার সহস্র স্তম্ভে শোভমান বিরাট স্থাপত্যকারু। অতীতের সৃজনশীল অন্ধ্রবাসীদের কত অপরূপ ঐতিহাসিক কীর্তিরাশি এখনো বিগুমান। আরো কত বিলুপ্ত হয়ে গেছে মহাকালের করাল গ্রাসে।

শিল্পী-মনের আর এক প্রকাশ তাদের কাব্য-সাহিত্যে। সেই ধারায় বন্দিত আছে বেমানার নাম। আর জন-মানসে তাঁর বিভিন্ন কবিতা-কলির অনুরণন। দার্শনিক কিংবা যোগী সন্ন্যাসী বলে শিক্ষিত মনের কাছে তাঁর পরিচিতি। কিন্তু সাধারণ থেকে গুণীজন সর্বলোক তাঁকে অধিক জানে সন্ত কবি বলে।

অসংখ্য রচনা ছিল বেমানার। অজস্র কবিতা-কণা। বিভিন্ন, বিচিত্র বিষয়ের সব কাব্য-কলিকা কিন্তু মধ্যযুগে লিপিবদ্ধ কিংবা রক্ষিত হবার সুযোগ ছিল না। উদাসীন কবির ভ্রাম্যমান জীবন। তাঁর রচনা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও আগ্রহের অভাব আরো হয়েছে সে-সব অবলুপ্তির কারণ। নানা স্থানের সাময়িক বাসে মুখে মুখে কবি রচনা করেছেন। হেলায় হারিয়ে গেছে তাঁর কত সৃষ্টি। তবু কালের কবল থেকে যা রক্ষা পেয়েছে তার পরিমাণও সুবৃহৎ।

বেমানার রচনার সেই সব নিদর্শন থেকেই বোঝা যায়, তাদের বিষয় বৈচিত্র্য। কত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সাধারণের বুদ্ধিগোচর নানা প্রসঙ্গ। ঈশ্বর, জীবনমৃত্যু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারণাও যেমন, তেমনি অতি পরিচিত লৌকিক কিংবা সাংসারিক কথা নিয়েও তাঁর কবিতা আছে। তাই সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যেই বেমানার সমাদর।

তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কত তা প্রদর্শনের জন্য তাঁর রচনা থেকে এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

মানুষ ও ঈশ্বর :

যিনি স্বয়ং হয়েছেন বিশ্বচরাচর,
নিজ সত্তাকে করেছেন অভেদ আত্মপর ;
জেনেছেন—সেই অখণ্ড মহান্,
আপনারই মাঝে তাঁর অবস্থান।
পেয়েছেন শিক্ষা যিনি মিলনের
অন্তরতমের সঙ্গে বহিরঙ্গের।
যদ্যপি তিনি কোন মর্তবাসী জন
তবু তাঁর সম্পূর্ণতা হয়েছে অর্জন।......

মৃত্যু :

ধনশালীর মৃত্যু হয়, পিছে থাকে সঞ্চয়।
প্রত্যাবর্তনের পর, পুনরায়
উপার্জন করতে হয়, যদিও মৃত্যুতে
হারায় যথাসর্বস্ব সম্পদে।
কোথায় তাহলে তার ধন আর কোথায় আত্মা ?
লৌহ যদি টুটে যায়, প্রয়োজন নির্মাণের।
যথারীতি যুক্ত করে দেয় কর্মকার।
কিন্তু যদি ভগ্ন, ব্যর্থ হয় কোন আত্মা—
কে তাহলে করে সুস্থ, কে করে উদ্ধার ?
চটি যদি ভাঙ্গে কভু, আনে অন্য এক।
মানুষের প্রাণ গেলে আত্মা পাবে তার
আরেক নতুন দেহ—আশ্চর্য কি তায় ?
যত দিনই থাকে প্রাণ, শিক্ষা করি যত,
অর্জিত সম্মান যশ যত বৃদ্ধি হোক,
সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কাল—হবেই নিঃশেষ।
আমাদের কর্ম কীর্তি হবে যে মৃত্তিকা।
কেবা পত্নী, কেবা পুত্র, কে সে বন্ধু জন,
প্রেমের সম্পর্ক কোথা—এ প্রাণের
অন্তিম লগনে ? কোথায় নির্ভর ?—
মৃত্যুকালে সহায়তা সাধ্য নয় কারো।

সতী পত্নী :

কি নির্মল গৃহাঙ্গন সাধ্বী সে কান্তার,
সে যেন আঁধার কোণে আলোর ঝলক।
শর্করা বা মধু হতে আরো মিষ্ট তার
প্রিয়ার অধর-বাণী, আঁখির পলক॥

দুষ্টা স্ত্রী :

উত্তাল সমুদ্র বক্ষে অর্ণবের গতি,
বায়ু ভরে উড্ডীন পাখীর উদ্দেশ—
অজানা যেমন, তেমনি ধরণীতলে
ভ্রষ্টার জীবন। মতিগতি অজানিত।
স্বামী হলে বিত্তবান্—হবে সে প্রেমিকা।
অর্থ যদি হয় লোপ—প্রেম পলাতকা;
তখন স্বামীর সত্তা নাম মাত্র সার,
প্রাণহীন দেহ যেন—গণনায় তার।

জাতি :

দৃষ্টি যদি বিশ্বময় করি প্রসারণ,
দেখি এ মানব জাতি একই জন্ম ভোগী।
অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব ডোরে অদৃশ্য বন্ধন,
সকলি সন্তান সম ঈশ্বর-নয়নে।
কি জাতি যে তাঁর, সে কি জানে কোন জন,
সর্ব্বজীব-প্রাণে যাঁর বাস অনুক্ষণ?

এমনি সব কাব্য-কণিকা বেমানার। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থেকে নানা লৌকিক বিষয়। ভূয়োদর্শন আর উদার মানবতার জনপ্রিয় বাণী।

এই ধরণের রচনার জন্যে কবিকে অন্ধ্রের ঘরে ঘরে আপন করে নিয়েছে।

কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে সমাদর করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে তাঁর ব্যক্তি-জীবনকে। কালের ব্যবধানে, অপরিচয়ের অন্তরালে অনেকাংশে কবিজীবন অদৃশ্য হয়ে গেছে। লুপ্ত হয়েছে তাঁর সর্ব্বস্বীকৃত কোন জীবন-কাহিনী। তাঁর নামের স্মৃতিকে ঘিরে কত কিংবদন্তীই গড়ে উঠেছে।

কবে জন্ম হয় বেমানার, কি ছিল তাঁর কুলশীল, কোন্ অঞ্চলের সন্তান তিনি—এসমস্ত বিষয়েই নানা জনের নানা ধারণা। শুধু তাঁর একটি বিষয়ে সকলে একমত যে তিনি ছিলেন সন্ত কবি। সংসারবিরাগী সাধুপুরুষ উদাসীন পরিব্রাজক। রমৃতা যোগী।

অন্ধ্রভূমির অঞ্চলে অঞ্চলে পল্লী জনপদে তিনি নিরন্ত পরিভ্রমণ করে ফিরতেন। পরিক্রমাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বহিরঙ্গ কাজ। উদয়াস্ত তাঁর পরিব্রাজক জীবন। বিজন প্রান্তরে, সমুদ্রতীরে, নদী মেখলা ক্ষেত্রে, অরণ্য গুহায়, নগর পল্লীর পথে পথে।

বেমানা কবিতা রচনা করতেন স্বভাবের প্রেরণায়। কখনো আপন ইচ্ছায়, কখনো অনুরোধে যখন জনসমাজে স্বরচিত কাব্য কলি আবৃত্তি করতেন, তখনই শুধু তাদের প্রচার হত। লিপিবদ্ধ তাঁর সমকালে কিছুই থাকেনি। লোকস্মৃতিই যেটুকু রক্ষা করেছে তাঁর কবিতাবলী। জনসমাজই পরম্পরায় যুগে যুগে তাঁর কাব্যসৃষ্টির ধারক বাহক হয়েছে।

এদিকে তাঁর জীবনকথা তাঁর বহু মুগ্ধ পাঠকেরই অজানা। আর সেই শূণ্যস্থান পূরণ করেছে নানা কথা ও কাহিনী। কোথা থেকে তাঁকে ঘিরে কত প্রসঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। শতাব্দের পর শতাব্দ। কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন বেমানা। তাঁর কত প্রকার জীবন-বৃত্তান্ত জনমনে রচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কোন্‌টি সঠিক তাও কেউ জানে না।

কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন বেমানা? এবিষয়েও নানা মত। তিন শ, চার'শ, পাঁচ'শ, এমন কি ছ শতাধিক বছর আগে ছিল তাঁর জীবনকাল—এমন সব মত প্রচলিত আছে। সে সমস্ত অনেক কাহিনীই সামঞ্জস্য-হীন নির্ভরযোগ্য নয়।

বেমানাকে নিয়ে যত কাহিনীর প্রচলন হয়েছে, তার মধ্যে একটি বিবৃত করা হবে এখানে। এটিও অবশ্য জনশ্রুতি। তবে অন্য অনেক বৃত্তান্তের মধ্যে বিশ্বাস-যোগ্য। তাঁর জীবনী নিয়ে অধুনাতন কালে যাঁরা সর্বাধিক গবেষণা করেছেন তাঁদের মতে এই বিবরণ গ্রহণীয়।

বেমানার জীবনকথা এই সূত্রে অনেকখানি জানা যায়। বিশেষ তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের বৃত্তান্ত। অর্থাৎ তাঁর সংসার ত্যাগের আগেকার ঘটনাবলী। সন্ন্যাস গ্রহণের সেই বর্ণাঢ্য পটভূমিকা উদ্দাম যৌবনের রূপমোহ, বিলাস সম্ভোগের দুর্দমনীয় আকর্ষণ, স্বপ্নভঙ্গ, নটীহৃদয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আশাহতের মানসিক বিপর্যয়, মৃত্যুর অমোঘ

বিধানের দৃষ্টান্ত, ভাগ্যের অচিন্ত্যনীয় গতি ইত্যাদি অতি নাটকীয় হলেও সুসমঞ্জস। অসাধারণ, কিন্তু অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বা অসংলগ্ন বোধ হয় না।

সন্ত কবির এই কাহিনীর যোগসূত্র আছে অন্ধ্র ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পৃষ্ঠপটে। এরাজ্যের মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক একটি পর্ব। তারই নির্দিষ্ট পর্যায়ে বেমানার জীবনকথা সংযুক্ত।

প্রথমে সেই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। আজ থেকে আট'শ বছর আগে, একাদশ শতাব্দের কথা। বরঙ্গল ও হনমকোণ্ডার কাকতীয় রাজারা তখন অন্ধ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেছেন। পরে তাই কাকতীয় সাম্রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ হয়ে প্রায় তিন'শ বছর অধিষ্ঠিত থাকে সগৌরবে। সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় বরঙ্গল। নানাভাবে সুসমৃদ্ধ নবীন সাম্রাজ্য কাকতীয় রাজবংশের পোষকতায় বিদ্যাচর্চার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। রাজসভায় সমাদৃত হন বিদ্বজ্জন—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কবিসমাজ। তেলেগু সাহিত্য সম্পন্ন হতে থাকে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতিরও। সে এক সুদীর্ঘকালের উত্থান ও বর্ধনের যুগ।

তারপর কালের গতিতে কাকতীয় রাজবংশের পতন ঘনিয়ে আসে। অবশেষে সাম্রাজ্যের সঙ্গে বরঙ্গলের চূড়ান্ত পতন হল ১৩২৩ সালে। এই সমগ্র অঞ্চল দিল্লীর তোঘলক সুলতানদের দখলে চলে গেল।

পুনরায়, কয়েক বছরের মধ্যেই, সুলতানদের অধঃপতনে নতুন সুযোগ পেলেন অন্ধ্রের সামন্ত রাজারা। তখন কাকতীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে পঞ্চ নতুন রাজ্যের জন্ম হল। অন্ধ্র প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সে এক সুবিহিত অধ্যায়।

সেই পাঁচটি রাজত্বের নাম উল্লেখনীয়। কোণ্ডাবিডু ও রাজমহেন্দ্রীর রেড্ডি রাজ্য, বেলামা রাজ্য, উত্তর তেলেঙ্গানা রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য। তারপর এই পাঁচটির মধ্যে থেকে আবার বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন। কিন্তু সে পরের কথা। বেমানার সময়ের পরবর্তীকালে প্রকাশমান হয় সেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভারত-বিখ্যাত গৌরবপর্ব।

বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম যুগের সমকালীন ছিলেন সন্ত কবি বেমানা। তিনি ছিলেন রেড্ডি রাজপরিবারের এক উত্তর পুরুষ। তবে সে তাঁদের পতন কালের কথায় কবির এই বংশপরিচয় পাওয়া যায়।

কাকতীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের কয়েক বছরের মধ্যে রেড্ডি রাজ্যের উদ্ভব। তার আয়ু বা অস্তিত্ব ছিল ১৪২৪ সাল পর্যন্ত।

এই এক'শ বছরের রেড্ডি রাজত্বের শেষ দিকে জীবন ও বেমানার কাব্যরচনার কাল।

কাকতীয় সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রদেবের এক সামন্ত ছিলেন প্রলয় বেমা রেড্ডি। তিনিই এই রাজ্যের পত্তন করেন।

কাকতীয় নৃপতিদের তুল্য রেড্ডিরাও ছিলেন জ্ঞানবিদ্যার সেবক। বরং রেড্ডি রাজসভায় আরো কবি ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে। রেড্ডি রাজারা স্বয়ং ছিলেন বিদ্বান্। বিশেষ তিনজন।

কোণ্ডাবিডুর ভূপতি কুমারগিরি রেড্ডি (১৩৮৬-১৪০২) নৃত্য ও সঙ্গীতের শুধু বোদ্ধা ছিলেন না, নৃত্য বিষয়ে একটি গ্রন্থ-লেখকও তিনি। কুমারগিরির শ্যালক কাটয় বেমাও ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। কালিদাসের নাটকাবলীর ভাষ্য রচনা করে কাটয় বেমা তার নাম দেন কুমারগিরি রাজিয়া। অর্থাৎ রাজা কুমারগিরির সম্মানে এই নামকরণ।

কুমারগিরির পরের রেড্ডি রাজা পেডা কোমাডি বেমা (১৪০২-১৪২০)। তাঁরও ছিল সাহিত্যপ্রতিভা ও নানা রচনা।

পেডা কোমাডি বেমার সময়েই (১৪২০-১৪২৪) কোণ্ডাবিডুর এই রেড্ডি রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় উদীয়মান বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ছত্রতলে।

অন্ধ্রপ্রদেশের সাংস্কৃতিক যাত্রাপথে রেড্ডি রাজত্বের শতাব্দটি মূল্যবান্ দানের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। তেমনি কোণ্ডাবিডু নগর, দুর্গের রাজা বেমা রেড্ডি (১৩৫৩-১৩৬৪) এবং তাঁর বংশধরদের রাজধানী রূপে প্রসিদ্ধ।

বক্ষ্যমাণ কাহিনীর নায়ক বেমানা ছিলেন শেষ

রেড্ডি রাজা রাচ বেমানার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাচ বেমানা অবশ্য তখন একজন সামন্ত রাজা মাত্র।

প্রথম যৌবনেও কিন্তু কবি বেমানার কাব্য রচনার কোন খ্যাতিই ছিল না। শুধু কবিত্বের অভাব নয়। যে আধ্যাত্মিকতার জন্যে তিনি বরেণ্য হয়ে আছেন তারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায়নি তাঁর জীবনে। সেই মদির উচ্ছল বিলাস-জীবনের এমন পরিণতি কেউ কল্পনাও করতে পারত না। বেমানার নিজের কাছেও তা হয়ত ছিল অভাবনীয়।

রেড্ডি রাজবংশের তখন অন্তিম অবস্থা। আগেকার সে গৌরব ও বৈভব অন্তর্ধান করেছে। সম্পদ্ সামান্যই অবশিষ্ট। পূর্ব-পুরুষদের তুল্য সম্মান বা রাজত্বের মান বা রাজ্যের আয়তন সবই নিতান্ত সঙ্কুচিত। দুতিন পুরুষ আগে যে রেড্ডি নৃপতিরা ছিলেন একচ্ছত্র স্বাধীন, তাঁদের বংশধর রাচ বেমানা এখন সামান্য সামন্ত রাজা মাত্র। পার্শ্বেই নবোত্থিত বিজয়নগর সাম্রাজ্য। তার সবল সম্প্রসারণের সামনে সঙ্গীত,সমৃদ্ধিহীন ক্ষীণ রেড্ডি রাজ্য।

তবু রাজ্যপাটের কিছু অবশেষ ঠাট তখনো ছিল। পূর্ব ঐশ্বর্যের মুক্তাভস্ম। আর সব ত্রুটির অন্তরালে মার্জিত সংস্কারের এক অলক্ষ্য ভিত্তি।

সেই পতনোন্মুখ রেড্ডি রাজবংশের এক প্রতিনিধি তখন বেমানা। কবর রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অন্ধ যৌবনের সম্ভোগ-দাস, সে-সময় এই তাঁর পরিচয়। রাজকার্যে কোন দায়-দায়িত্ব নেই, বরং সেই অধিকারে ইচ্ছা মাত্র লাভ করা যায় সর্ব স্বার্থের সুবিধা। বেমানার তখন এই মাত্র পরিচিতি সেই রেড্ডি প্রভাবিত অঞ্চলটিতে।

সুখের উপবন তরুণ বেমানার জীবন। অপূর্ণ কামনার কোন আগাছা সেখানে অসম্ভব। শুধু পুষ্পিত সৌন্দর্যের রসসম্ভার। মধু সৌরভ, বরণ মাধুরী, রূপ লাবনী। এইসব উপকরণেই প্রমত্ত তখন বেমানা।

বেমানার প্রধান কর্ম—মন্দিরে মন্দিরে নিত্য উপস্থিত। কিন্তু পূজার জন্যে তত নয়। দেবভক্তিও গৌণ।

রাজকুমারের চক্ষুতে তখন রূপের মায়া-অঞ্জন। চিত্তে নৃত্য পরাদের তনু-সৌষ্ঠবে পরিতৃপ্তির সন্ধানী। দেবতা-উপাসনার স্থান নিয়েছে ললিতা নৃত্যপটীয়সী দেবদাসী।

বেমানা অতিমাত্রায় ও সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। এই দুই কলাবিদ্যার তিনি মরমী অনুরাগী পূর্ব থেকেই। সেই হতে দেবদাসীদের প্রতি আসক্তি। নৃত্যগীতের মূর্তিধারিণী তারা। নৃত্যোচ্ছলা নটীদের ছন্দিত দেহলতা দুর্বার আকর্ষণ করে তাঁকে। তিনি সম্মোহিত হন; সুস্বরা তাদের সুরলহর তাঁর অন্তরে জাগায় বিধুর গুঞ্জরণ। আবেগ প্রকাশের প্রেরণায় তাঁর কবিত্বের স্ফুরণ ঘটে। এই প্রথম উদ্বোধিত হয় বেমানার কবি-চিত্ত কিন্তু তাঁর প্রকৃত কাবজীবনের বিকাশ হয় আরো পরে।

জীবনের এই পর্ব থেকেই বেমানা নটীদের আসঙ্গ-লিপ্সু হয়ে ওঠেন। মধুকণ্ঠী নৃত্যলীলায়িতা তারা। কেউ কেউ অতি রূপবতীও। কবির নয়ননন্দন মনোলোভা। তাঁর দিনরাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল সেই সব নারী সঙ্গে সোনালী স্বপ্নের আবেশে।

ক্রমে দেবদাসীদের মধ্যে একজন বেমানার সমগ্র চিত্ত অধিকার করলে। নানা কলাবিদ্যায়, তনুলাবণ্যে, হৃদয় রঞ্জনে। যেমন কলাবতী তেমনি রূপবতীও।......

দেবদাসীরা প্রায়শ রাজ-অনুগ্রহ লাভ করত। কিন্তু বেমানা দিলেন অনুগ্রহের অনেক বেশি। বিশেষ সেই একজন তাঁর অন্তরের অধীশ্বরী হল। নাম তার মোহনাঙ্গী। কোণ্ডবিড়ুর সর্ব শ্রেষ্ঠা দেবদাসী। বেঙ্কটেশ মন্দিরে নৃত্য অনুষ্ঠানের জন্যে নিযুক্তা দেবদাসী সে। কবির রূপদৃষ্টি, প্রথম প্রেমের প্রতপ্ত আবেগ এই লাবণ্যময়ীকে নিয়ে উত্তরোল হল।

বেমানার যৌবনের কণ্ঠমালা হয়ে উঠল মোহনাঙ্গী। পরমা নারীরত্ন রূপে তাঁর সামনে যেন নটীর উদয় হয়েছিল। অন্ধ যৌবনের মাদকতাময় জালে আবদ্ধ হলেন তিনি। রূপে অরূপে রাজকুমারের সত্তা মোহনাঙ্গী পূর্ণ করে রইল।

দেবদাসী বংশধারায় জন্ম তার। সহজাত বিত্তা-

ধরী। নৃত্য গীত কলাবিদ্যা তার জীবনের অবলম্বন। আবাল্য যোগ্য গুরুর শিক্ষায় এই দুই বিদ্যার চর্চা করেছে। সুসংস্কৃতা কলাবতী উপরন্তু বাক্ চাতুর্যে চিত্ত হরা। একাধারে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে মোহনাঙ্গী পারদর্শিনী। সুকণ্ঠী গায়িকা। তেমনি কুশলী বীণাবাদিকাও। দেবদাসী দুর্লভ সঙ্গীতগুণ বেমানার বিস্ময়।

আর মোহনাঙ্গীর রূপ। তার কমনীয় শ্রী ও স্নিগ্ধ মাধুর্যও দুর্লভ বোধ হয় তাঁর।

দেবদাসীর আকর্ষণে বেমানা প্রত্যহ মন্দিরে যেতে লাগলেন। শুধু নৃত্য উপভোগ নয়। সাগ্রহে আলাপ করতেন, পরিচয় নিতেন। তার সঙ্গে কথোপকথনেও পেতেন অপার আনন্দ।

তারপর তার আবাসে অতিথি হতে লাগলেন। নিয়মিত। মন্দির থেকে গৃহে ফিরে মোহনাঙ্গী তাঁর প্রতীক্ষায় থাকত। বেমানা উপস্থিত হলেই অভ্যর্থনা করত সাদরে। মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়নে রাজকুমার পরিতৃপ্ত হতেন। তাঁর বাসনা অনুসারে কোন দিন গীত, কোন দিন নৃত্যের অনুষ্ঠান করত দেবদাসী। মুগ্ধ বেমানা মূল্যবান্ উপহার দিতেন।

বেঙ্কটেশ মন্দিরেও উপস্থিত থাকতে হত মোহনাঙ্গীকে। নৃত্য আরতির সময়ে, কিংবা অন্য অনুষ্ঠানে বেমানার জন্যে তারই মধ্যে থেকে সে অবসর করে নিত। কখনো সন্ধ্যায়, কখনো অপরাহ্নে, কখনো নিভৃত রাতে।

উতলা রজনীতে বেমানা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। দয়িতাকে আদরে সোহাগে উন্মথিত করে শোনাতেন তার রূপের প্রশস্তি। হয়ে প্রশ্নচ্ছলে বলতেন, কে তোমার নামকরণ করছিল মোহনাঙ্গী? বিহ্বল অঙ্গে অঙ্গে কি মোহন তুমি। কি সুন্দর!'

আবেশে নটীর আয়ত আঁখি নিমীলিত হয়। বিম্বাধর ঈষৎ স্ফুরিত হয়ে উচ্চারণ করে, 'অন্তর আপনার প্রীতিপূর্ণ। সেজন্যেই আমি আপনার চক্ষুতে সুন্দর!'

আত্মহারা নায়ক দুই করতলে তার সুচারু ফুল্ল আনন তুলে ধরতেন। স্ফীদত্ত অক্ষিপটে, কপোলে, গ্রীবায় অঙ্কন করে দিতেন প্রগাঢ় প্রেমের আলিম্পন।

নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে বলতেন 'না। তুমিই আমায় পূর্ণ করেছ—অমৃতরসে।'......

মোহনাঙ্গীকে কেন্দ্রে ধারণ করে বেমানায় দিবারাত্রির অস্তিত্ব, তাঁর জীবন আবর্তিত হতে লাগল।

প্রাসাদে অল্পক্ষণই থাকেন কোণ্ডাবিড়ুর রাজভ্রাতা। সেই স্বল্প উপস্থিতিতেও তাঁকে আত্মমগ্ন দেখা যায়। অন্যমনস্ক। সর্ব বিষয়ে লক্ষ্যহীন, উদাসীন। কোন কার্যের দায়িত্বও আর তিনি নিতে চান না। কারো সঙ্গে বাক্যালাপেও আগ্রহ নেই তাঁর। বান্ধব যাঁরা ছিলেন সকলকেই ক্রমে ত্যাগ করেছেন। শুধু আছেন অভিরামায়া। রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার তিনি। অভিরামায়ার অন্তরের গভীর প্রীতির জন্যেই হয়ত কুমারের সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট আছে। অভিরামায়ার আন্তরিকতা না থাকলে এ ভালবাসার বন্ধনও হয়ত ছিন্ন করতেন বেমানা। কারণ তাঁর হৃদয় এখন দ্বিতীয় রহিত।

প্রাসাদ পুরে তাঁর কত প্রিয়পাত্রী ছিল জ্যোতি। স্নেহের পুত্তলি। রাচ বেমানার একমাত্র বালিকা কন্যা। জ্যোতির সঙ্গে কত সময় আগে যাপন করতেন তিনি। সে যেন তাঁরই আদরিণী কন্যা ছিল। তাঁর সঙ্গে সে কলরব করে সঞ্চরন করত প্রাসাদের সর্বত্র। শয়নকক্ষে, অলিন্দে, উপবেশন-প্রকোষ্ঠে, পুষ্পোদ্যানে। অকারণ কত কথোপকথন হত দুজনে। চার বছরের শিশু-মুকুল।

কিন্তু জ্যোতি তার দীঘল চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখে, তাত আর এখন তার কাছে আসেন না। আর তাঁর আদরের আহ্বান শুনতে পায় না সে। অভিমানে জ্যোতিও আর তাঁর কক্ষে যায় না।

প্রাসাদে সবার আগে বেমানার এইসব পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন—নরসাম্বা। রাচ বেমানার মহিষী, জ্যোতির জননী। রাণী নরসাম্বা। ব্যক্তিত্বে, চরিত্রমাধুর্যে সকলের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী তিনি। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে দেবর মান্য করেন মাতৃতুল্য। আবার বন্ধুভাবে অকপটে সকল কথাই আলোচনা

করেন। জ্যেষ্ঠের কাছে তাঁর সব প্রার্থনা আবেদন পৌঁছায় ভ্রাতৃজায়ার মাধ্যমেই।

নরসাম্বা বেমানার সমবয়সী। কিন্তু নারীর সহজাত বাস্তব বুদ্ধিতে,সাংসারিক উপদেশ দানের অধিকারিণী। দেবর তাঁকে নানা বিষয়েই সেই মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

বেমানার ভাবান্তর দেখে. কৌতূহলী হলেন রাণী। একদিন তাঁকে আপনার পুরে আহ্বান করে আনলেন।

অন্য দুএক কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইদানীং রাজকুমারের দর্শন দুর্ল'ভ হয়েছে।'

বেমানা সচকিত হলেন। বললেন, 'একথা কেন বলছেন? বরং আপনার সাক্ষাৎ বেশি পাই না। আমার ত কোন পরিবর্তন হয়নি?'

মৃদু হাস্য করলেন নরসাম্বা।

'আমি তোমার পরিবর্তনের কথা কিছু বলিনি। শুধু তোমার অদর্শনের কথা উল্লেখ করেছি। তোমাকে যে প্রাসাদে বিশেষ দেখা যায় না, সেকথা শুধু আমি নয়, সকলেই লক্ষ্য করেছে। এমন কি জ্যোতি পর্যন্ত।'

'জ্যোতি?' লজ্জিত হলেন বেমানা। আনন্দের পুত্তলি, পরম স্নেহের পাত্রীকে অনেকদিন পরে তাঁর মনে পড়ল। বলে উঠলেন, 'কোথায় সে? আজ কয়দিন তাকে দেখতে পাইনি। আপনার কোন দাসীকে আজ্ঞা করুন। জ্যোতিকে নিয়ে আসে যেন অবিলম্বে।'

'জ্যোতি এখন প্রাসাদে নেই। অন্যত্র গেছে। সে পরে হবে। এখন বল আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি। পরিবর্তন কি তোমার কিছুই হয়নি?'

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বেমানা বললেন, 'কিসের পরিবর্তন?'

নরসাম্বা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'রাজার সঙ্গে কি তুমি নিয়মিত সাক্ষাৎ. করে থাকো? তোমার রাজকীয় কর্তব্য কর্ম কি সম্পাদন করছ?'

বেমানা এবার আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'ক্রটি যদি কিছু হয়ে থাকে, মার্জ'না করবেন। রাজাকে জানাবেন, তাঁর যে কোন আজ্ঞা আমি পালন করতে প্রস্তুত আছি।'

'সে সব রাজকীয় ব্যবহার রাজা আর রাজভ্রাতার মধ্যেই হোক। আমি সে কথায় কেন?' ভ্রাতৃজায়া সহাস্যে বললেন। 'আমি তোমার অদর্শনের কথা বলেছি মাত্র।'

সেদিন আর বেশি কথাবার্তা হল না দুজনের মধ্যে। নরসাম্বাও আর বিশেষ কিছু জানতে আগ্রহ দেখালেন না।

তারপর আরো কিছুদিন লক্ষ্য করলেন দেবরকে। কিন্তু পুনরায় তাঁর সেই একই প্রকার। তেমনি অনুপস্থিতি প্রাসাদে। জ্যোতির সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ নয়। সেই ধরণের অন্যমনস্কতা কুমারের।

রাণী ভাবিত হলেন।

তারপর তৎপর হলেন দেবরের গতিবিধির সন্ধান করতে লাগলেন—অবশ্যই গোপনে। রাজগৃহে দাসদাসী অনুচরের অভাব নেই।

গুপ্ত অনুচর রাজকুমারকে অনুসরণে উপস্থিত হল দেবদাসীর গৃহে। কোণ্ডাবিড়ুর সর্ব্বপরিচিতা রূপবতী দেবদাসী মোহনাঙ্গী। সেই চর অনেক সংবাদই সংগ্রহ করে আনলে।

সেখানেই রাজভ্রাতার প্রায় প্রতিদিনের গতায়াত; এবং দেবদাসী সন্নিধানে তাঁর ভিন্ন রূপ। তাঁর সম্মানে এখানে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। তিনিই একমাত্র অতিথি বাঙ্‌মুখর প্রাণোচ্ছল, প্রেমিক রূপ তাঁর। নিত্য নব উপহারের ডালি নিয়ে আসেন।......

বিবরণ শুনে নরসাম্বা বিচলিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। এখন করণীয় কি? রূপসী নৃত্যপটীয়সী দেবদাসী। তার প্রভাব থেকে কেমন করে মুক্ত করবেন দেবরকে?

রাণীর দুর্ভাবনার সীমা রইল না। কারণ, বেমানার স্বভাব তাঁর ভালভাবেই জানা। স্পষ্টবক্তা, সরল কিন্তু উদ্দাম স্বভাব, আপন প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুর বশ নয়। কারো বিধিনিষেধ মানবার পাত্র নয়। ছলকলাময়ী নটীর কুহকে এমন তরুণ। ভ্রাতৃজায়াকে ভক্তি করে বটে। কিন্তু এ ব্যাপারে মান্য করবার ভরসা কোথায়? রাজার কাছে কি প্রকাশ করবে দেবরের এই প্রণয়-

লীলা? তার ফল শুভ না হবারই সম্ভাবনা। ভ্রাতাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। অনেক চিন্তার পর নরসাম্বা আপনিই দেবরের সঙ্গে কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। একবার সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য। তারপর যদি চৈতন্য না হয়—ভাগ্যের লিখন।

সেদিন সন্ধ্যায় বেমানার সঙ্গে রাণী সাক্ষাৎ করলেন।

রাজভ্রাতা তখন সজ্জিত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন প্রফুল্ল মুখে। ভ্রাতৃজায়াকে দেখে অভিবাদন জানালেন।

নরসাম্বা জিজ্ঞাসা করলেন 'এখন কোথায় চলেছ কুমার?'

বেমানা ইতস্তত করলেন, উত্তর দিতে। মিথ্যা বলতে বাধল স্বভাবে। সত্য উচ্চারণ করতেও শ্রদ্ধেয়ার সামনে সঙ্কুচিত হলেন।

উত্তর এড়াবার জন্যে তাই নিজেই বরং প্রশ্ন করলেন, 'আমার প্রতি এখন কোন আদেশ আছে কি?'

স্নিগ্ধ কণ্ঠে রাণী বললেন, 'আদেশ কিছুই নেই, কুমার। তবে তোমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার ইচ্ছা ছিল।

'আজ্ঞা করুন, দেবী।'

দেবরের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করে নরসাম্বা বললেন, 'একান্ত অনিচ্ছায় আজ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তোমার সঙ্গে যে এমন বিষয়ে আলোচনা করতে হবে তা অকল্পনীয় ছিল আমার পক্ষে। নিতান্তই তোমার মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তা করে বলছি। বলা আমার কর্তব্য। তবে আমার কথার মূল্য দেওয়া বা অগ্রাহ্য করা তোমার অভিরুচি।'

ভ্রাতৃজায়ার ধীর গম্ভীর ভাষণের ভূমিকায় রীতিমত অস্বস্তি বোধ করলেন বেমানা। মনে মনে প্রমাদ গণলেন। রাণীর ব্যক্তিত্বের জন্যে যে সম্ভ্রম করতেন তাইতেই অজানা আশঙ্কার উদয় হল মনে।

তবু মুখে বললেন, 'আপনি আমার মঙ্গলের জন্যে বললেন, সেজন্যে সঙ্কোচ কিসের? আমি কি আপনার কোন কথার কখনো অমর্যাদা করেছি?'

'এমন কথা তোমায় কোনদিন বলবার প্রয়োজন হয়নি, কুমার। যাই হোক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি এখন কোথায় যাবে? দেবদাসী মোহনাঙ্গীর আবাসে কি?'

প্রশ্ন শুনে নতমস্তক হলেন বেমানা। সহসা স্থির করতে পারলেন না কি উত্তর দেওয়া উচিত।

তবে অল্পক্ষণেই আত্মসংবরণ করে সত্য উত্তর দিলেন, 'সেইরূপই ইচ্ছা।'

'কুমার, এই দেবদাসীর সঙ্গে তুমি নিত্য যাপন করতে যাও। মোহনাঙ্গীর সঙ্গে তোমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতার কথা নগরের অনেকেই জেনেছে। এ সংবাদ আমার গোচরে এসেচে অনেক পরে। আমার জিজ্ঞাস্য,—এআচরণ কি তোমার যোগ্য?'

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বেমানা বললেন, 'আমি কি এমন অভিনব আচরণ করেছি যা আমার অর্থাৎ রাজকুলের পক্ষে অযোগ্য? শুনেছি অতীতেও সকল নৃপতিরা দেবদাসীদের পোষকতা করেছেন। রাজাদের দাক্ষিণ্যেই মন্দির থেকে তাদের পালন করা হয়েছে চিরদিন। রাজপুরুষরাই তাদের নৃত্যগীতের চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন, আনুকূল্য করেছেন।'

রাণী তেমনি অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'নৃপতিরা দেবস্থানের দেবদাসীদের যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা ভিন্ন প্রকারের। সেটি তাঁদের শুধু রাজকীয় নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য, মন্দিরের সেবক, ব্যবস্থাপক রূপেও করণীয়। তাঁদের সহায়তা ও বদান্যতা দেবদাসীদের অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজন। নৃত্য ও সঙ্গীতকলায় চর্চা তাদের যে জীবন সাধন তাও অনেকংশে সার্থক হয় রাজাদের দাক্ষিণ্যে। কিন্তু তোমার সঙ্গে কি মোহনাঙ্গীর সেই সম্পর্ক? তুমি কি শুধু তার নৃত্য সঙ্গীতের অনুরাগী রূপেই তার গৃহে উপস্থিত হও? তাহলে ত বেঙ্কটেশ মন্দিরেই শুধু উপস্থিত হতে পারতে। সকল দেবদাসীই চরিত্রবতী নয়। দেবস্থানের সেবাই অনেকের একমাত্র উপজীবিকা নয়, একথা কি তোমার অজানা?

মোহনাঙ্গী তেমনি চরিত্রের এক রমণী, দেবদাসী হলেও।'

নতমুখে বেমানা বললেন, 'মোহনাঙ্গী নারীকুলে এক রত্না।'

'নারীকুলে ?' ভ্রূ-ভঙ্গিমায় হাসলেন নরসাম্বা, 'এই সম্প্রদায়ের কিংবা তার বাইরেও কত নারীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তুমি ?'

'আর কারো কথা আমি বিশেষ জানি না। আর কোন দেবদাসীর সঙ্গেই আমার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি।'

'ভাল। কিন্তু তাহলে তুমি অনভিজ্ঞ। এখন আমার পরামর্শ শোন। এই নটীর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ো না। ও গৃহে যাতায়াত বন্ধ করে দাও। এরা ছলনাময়ী। প্রেমিকা নয়। নিতান্ত প্রেম-হীনা। এদের শিল্পীরূপ দূর থেকে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ব্যক্তিজীবনে এরা স্থূল স্বার্থসিদ্ধিই শুধু বোঝে আর সেই উদ্দেশ্যে মোহ জাগায়। মোহনাঙ্গীর যা প্রেম বলে ভুলেছ, তা ছলনা মাত্র। তার মোহে আত্মবিস্মৃত হয়ো না—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আর বেশি বলতে চাই না। তুমি বিচার বিবেচনা করে দেখো।'

নরসাম্বা বিদায় নিলেন।

কিন্তু তাঁর কথাগুলিতে, বিশ্বাস না করলেও, বিপর্যস্ত বোধ করলেন বেমানা।

রাণীর তিক্ত ভাষণে মনের মধ্যে তাঁর তীব্র গ্লানি আর ক্ষোভের সঞ্চার হল। আর সেই সঙ্গে বিশ্রী এক অবসন্ন ভাব। ভ্রাতৃজায়া কোন্ মুখে এমন জঘন্য কটু কথা উচ্চারণ করলেন ? মোহনাঙ্গীকে কোনদিন তিনি সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি ত ? অপরের মুখে তার নিন্দা শুনেছেন মাত্র। যে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই সে বিষয়ে তাঁর মতামত কিংবা সমালোচনার মূল্য কি ?

এমনি চিন্তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই বেমানার চিত্তের অবসাদ দূর হয়ে গেল। তিনি যাত্রা করলেন মোহনাঙ্গী সন্দর্শনে।

দেবদাসী তখন তাঁরই জন্যে প্রতীক্ষমানা ছিল। পরিপাটি প্রসাধন সম্পন্না। কজ্জলরেখার পটে দুটি স্বচ্ছ নয়নপদ্ম। স্বল্প ললাটে রক্তচন্দনের সূক্ষ্ম তিলক। চিকণ সুঘন কুন্তল। তার সর্পিল বেণীরচনার অন্তে শুভ্র পুষ্পস্তবক। বেমানা সবই লক্ষ্য করলেন। মধুর হাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে মোহনাঙ্গী।

আজ তার ভিন্ন প্রকার সজ্জা।* পরিধানে বসনের পরিবর্তে গাঢ় সবুজ বর্ণের মসৃণ 'লাঙ্গা'। তার নিম্নে সোনালী সীমান্ত রূপবতীর চরণপল্লবে ঝল্‌মল্ করছে। উত্তমাঙ্গে আকাশী নীল-রঙা আবরণী।

বেমানার রূপদৃষ্টির সামনে মোহনাঙ্গীর আঁখি-ভাব কি প্রেমপূর্ণই বোধ হল। প্রীতির রসে ঢলঢল সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল।

দেখে, আবার তাঁর মনে পড়ল, নরসাম্বার সেই বিষম রূঢ় কথাগুলি। কি দুর্বাক্যই রাণী উচ্চারণ করেছিলেন! সেসব কথা শুধু অপ্রিয় নয়—অসত্যও। হ্যাঁ, একথাই তাঁর মনে হয়। এই ত সে দেবদাসী। এর সম্পর্কে যে সব কুৎসিত কথা তিনি তখন প্রয়োগ করেছিলেন সবই মিথ্যা। আদৌ সত্য হতে পারে না।

কিন্তু কেন মোহনাঙ্গীকে এমন হীনভাবে বর্ণনা করলেন রাণী ? বেমানার মনে সন্দেহ জাগে—এ কি নারীদের সহজাত নারীবিদ্বেষ ? এক রমণী অন্য রমণীর প্রতি সচরাচর ঈর্ষাপরবশই হয়, বিশেষ অপরে রূপবতী বা গুণবতী হলে।

তখনই বেমানার মনে হল, কিন্তু মোহনাঙ্গী ত কোনদিন নরসাম্বার নিন্দা করেনি।

তার কারণ—দেবদাসীর মহত্ত্ব। তার অন্তর উচ্চ ভাবে পূর্ণ। নারীসুলভ ঈর্ষা-বিদ্বেষের অনেক উর্ধ্বে সে। শিল্প-সেবায় নিবেদিতপ্রাণা।

'কিসের এত চিন্তা ?' বেমানার ঘনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর কর-স্পর্শ করে মোহনাঙ্গী জিজ্ঞাসা করলে। কণ্ঠে তার অন্তরঙ্গতার সুর। তাঁকে সুখাসনের সামনে এনে বললে, 'বিশ্রাম করুন। চিন্তা দূর হবে।'

অন্যমনা ছিলেন বেমানা। অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন, 'না, চিন্তা কিছু করিনি ত ?'

মোহনাঙ্গীর পাণিপল্লব ধারণ করেই তিনি উপবেশন করলেন। সঙ্গিনীও বসল তাঁর সঙ্গে, ঈষৎ ঘূর্ণমানা হয়ে। সে যেন নৃত্যছন্দেরই কোন রূপাংশ। তার নৃত্যভঙ্গিম আসন গ্রহণে কুঞ্চিত লাস্যার তরঙ্গ-ভঙ্গ আবার সুস্থির হল তার পদ স্পর্শে। দেবদাসীর সুরভিত অঙ্গের আঘ্রাণে বেমানা পুলকিত উদ্দীপিত বোধ করলেন।

দীর্ঘ আঁখিপক্ষ্ম মেলে মোহনাঙ্গী সোহাগভরে উত্তর দিলে, 'বিলক্ষণ। কুমারের চিন্তাকুল মন অন্যত্র আছে। তাঁর শরীর মাত্র অধীনার পাশে।'

তার কোমল কপোলে আদর করেন বেমানা। তার সুষম মুখশ্রী মধ্যে সরস ওষ্ঠাধর বিযুক্ত হয়। হাসির রেখায় উন্মোচিত দেখা যায় মুক্তামালার দন্ত-শোভা।

বরাঙ্গিনীর সুডৌল বাহুলতা সাদরে গ্রহণ করে বেমানা বলেন, 'তোমার ভাষণও অতি মনোরম। যেন সঙ্গীতধ্বনি। বাচনেও কি পটীয়সী তুমি।'

একটি নিবিড় কটাক্ষ হেনে নটী জিজ্ঞাসা করে, 'এখন আদেশ করুন, কি আপনার বাসনা। কি ভাবে আপনাকে পরিতৃপ্ত করব? বীণালাপ শুনবেন, অথবা সঙ্গীত? আপনার তুল্য নৃত্যপ্রিয় আমি দ্বিতীয় দেখিনি। আজ আমি নৃত্যের জন্যেও প্রস্তুত আছি।'

আপন অধমাঙ্গের পরিধানের দিকে ইঙ্গিত করলে মোহনাঙ্গী।

আরো সন্নিহিত হয়ে বেমানা বললেন, 'আজ আমার অন্য কোন উপভোগের প্রয়োজন নেই। তুমি সত্যই বলেছ, আমি চিন্তাকুল এখন। আমি নানা ভাবনায় অতিশয় কাতর, অতি ক্লিষ্ট হয়েছে আমার মন। আমায় তুমি শুধু এখন এমনি সঙ্গদাও। তোমার পরশে আমার সর্ব গ্লান দূর হয়ে যাক। আমাকে সঞ্জীবিত কর তোমার হৃদয়ের উত্তাপে।'

বেমানা আতপ্ত আবেগে দু বাহু প্রসারিত করলেন। বক্ষলগ্না হল কুসুমিত রূপ তনু।......

ভ্রাতৃজায়ার সাবধান বাণী বেমানা নস্যাৎ করে দিলেন। বরং তারপর থেকে আরো অবাধ হয়ে উঠলেন যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তিতে। ধন মন ধন মোহনাঙ্গীকে অঞ্জলি ভরে দিতে লাগলেন।

তাকে মূল্যবান্ এক-একটি অলঙ্কার দিয়েও আর তৃপ্ত হন না তিনি। আরো নব নব উপচারে তার মোহন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জিত করতে তাঁর কামনা জাগে। ঘন ঘন উপহারের ফলে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে গেল তাঁর নিজস্ব সম্পদ্। কিন্তু মানসী সৌন্দর্যপ্রতিমাকে রতনে ভূষণে অলঙ্কৃত করবার সাধ তাঁর তখনো অশেষ।

সেই অতৃপ্তি পূরণের আশায় এবার তিনি রাজ ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। বিসর্জিত হল তাঁর বিবেক বোধ।

রাজকোষের সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করতে বেমানার মনে পড়ল—নাগহারম্। তাঁদের অলঙ্কার-শ্রেষ্ঠ, কুলরত্ন। হীরক খচিত কণ্ঠহার—অপরূপ দ্যুতিময়, অতি সূক্ষ্ম কারু কৃতি শোভন। নাগহারম শুধু বহুমূল্য সুদুর্লভ আভরণ নয়। রেড্ডি রাজবংশের অতীতাগত সৌভাগ্যসূচক অভিজ্ঞানও। প্রাচীন সংস্কারের স্মৃতি বিজড়িত পূত জ্ঞানে দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। হীরক-ময় নাগহারম্ দেবতার সম্পদ্ রূপেই রাজ কোষাগারে রক্ষিত থাকে। কোন রাজমহিষীও কখনো কণ্ঠে ধারণ করেন নি সেই হীরক-মালিকা। কোন মানবীর ভোগ্য বস্তু নয় নাগহারম্।

রূপোন্মত্ত ভোগোন্মাদ বেমানা এমন দুষ্কর্মেও প্রবৃত্ত হলেন। উৎকোচে বশীভূত করলেন রাজভাণ্ডার-রক্ষককে।

তার পরদিন থেকে নৃত্যপরা নটীর কণ্ঠে সেই নাগ-হারম্ অতুল প্রভা বিকীর্ণ করতে লাগল। দেখে কৃতার্থ হলেন বেমানা।—

ওদিকে প্রাসাদ আলোড়িত হয়ে উঠল এই নিদারুণ অপহরণ সংবাদে। রাজা রাচ বেমানা যেমন বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ হলেন। রক্ষীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে অপরাধীর সন্ধান করতে লাগলেন। উদ্ধার করতেই হবে নাগহারম্। নচেৎ ঘোর অমঙ্গল ঘটবে রেড্ডি কুলের।

নরসাম্বা বুঝেছিলেন, প্রকৃত অপরাধ কার। পাপী কে। বেমানার মতি পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা করবেন, মনস্থ করলেন।

বেমানাকে বার্তা পাঠালেন সাক্ষাতের জন্যে।

কিন্তু রাণীকে হতাশ হতে হল। দেবর উপস্থিত হলেন না তাঁর সামনে।

তখন তিনি রাজাকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সম্ভাব্য অপরাধীর কথা বলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন রাজাকে। অপরাধী সন্ধান থেকে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। রাজভ্রাতা অভিযুক্ত হলে কি রাজকুলের গৌরব বৃদ্ধি হবে? পারিবারিক কলঙ্ক প্রচার কখনোই কাম্য নয়। নাগহারম্ পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

রাচ বেমানা দৃঢ়চেতা পুরুষ নন। মহিষীর ইচ্ছায় বিরুদ্ধে আর তৎপর হলেন না তস্কর দমনে।......

এক প্রাসাদে বাস করেও নরসাম্বা দেবরের সাক্ষাৎ আর পেলেন না। জ্যোতির জন্যেও বেমানা আর উপস্থিত হতেন না এ অংশে।

তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—সুধা জ্ঞানে মোহনাঙ্গীর সঙ্গ লাভ ও তার তুষ্টি বিধান। তা চরিতার্থ করতে তিনি ক্রমে অধিকতর পাপে নিমজ্জিত হলেন।

প্রণয়িনীর শুধু কণ্ঠ অলঙ্কৃত করেই তিনি তৃপ্ত হয়ে থাকলেন না বেশিদিন। মাত্র গ্রীবার শোভায় কি সে বরণীয়া? অনেক সাধের শেষে স্থির করলেন, এই অতুলনীয়ার জন্যে যোগ্য করণীয় হবে—কনকাভিষেকম্।

ইচ্ছা মাত্র তাকে এই মনোবাসনার কথা জানিয়ে দিলেন।

মোহনাঙ্গীর সঠিক বা সবিস্তারে জানা ছিল না একথার অর্থ। স্বপ্নতুল্য এই শব্দটির আভাস মাত্র তার শোনা ছিল। এখন সকৌতূহলে প্রশ্ন করলে, কনকাভিষেকম্ কি?'

সানুরাগে তাকে স্পর্শ করে করে বেমানা বললেন, 'তোমার শির থেকে পদ পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ স্বর্ণ আভরণে ভূষিত করব। সেই অনুষ্ঠানের নাম কনকাভিষেকম্।'

চমৎকৃতা রোমাঞ্চিতা হল মোহনাঙ্গী।

কিন্তু সেদিন থেকেই বেমানা ভাবনায় আকুল হলেন। কনকাভিষেকমের জন্যে প্রচুর সুবর্ণ প্রয়োজন; কোথা হতে সংগ্রহ করবেন? নিজের যথাসর্বস্ব দিয়েছেন এ যাবৎ। নাগহারম্ উপহার দেবার সময় যে পাপের পথে নেমেছিলেন, এবার নামলেন তার আরো তলদেশে। পুনরায় কোষাগার-রক্ষীদের প্ররোচিত করলেন। এবার উৎকোচ দিয়ে অপহরণ করলেন রাজকোষের প্রায় সর্ব সঞ্চয়।

তার ফল অতি শোচনীয় হল। নাগহারম্ অপহরণের তুলনায় বহুগুণ বিপর্যয়কর। রাচ বেমানার চূড়ান্ত বিপদ্ ঘনিয়ে এল।

সামন্ত রাজার দেয় কর স্বরূপ ছিল কোষাগারে সেই অপহৃত সঞ্চয়। সম্রাটের নির্দিষ্ট বার্ষিক প্রাপ্য।

সেই অর্থ অদৃশ্য হতে রাজা চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। অর্থপ্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নেই তাঁর। কর প্রেরণের নির্ধারিত কাল আগেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। অনেক প্রার্থনায় কিছু সময় পেয়ে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করেন অতি কষ্টে। অচিরেই তা বিজয়নগরে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল।

সুতরাং চরম লাঞ্ছনা ঘটল রাচ বেমানার। কর দানে অসামর্থ্যের জন্যে তিনি কারারুদ্ধ হলেন।

বেমানা তখন মোহনাঙ্গীর গৃহে কনকাভিষেকম্ সুসম্পন্ন করে আনন্দে আত্মহারা। তার অঙ্গে অঙ্গে সুবর্ণ অলঙ্কার মণ্ডিত করে নয়ন মন সার্থক করেছেন।

সেই বিহ্বল নিশি যাপনের শেষে প্রভাতে বিদায় নিলেন বেমানা। যেন স্বপ্নের আশ্লেষের মধ্যেই তিনি প্রাসাদের দিকে চলেছিলেন। কিন্তু সে মধু যামিনীর স্বপন-স্মরণ পথেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

যে দুঃসংবাদ প্রাসাদে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেছিল তা শুনলেন পথিমধ্যে। জ্যেষ্ঠ কারারুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর কারণও জানলেন। স্তম্ভিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন বেমানা।

আর তাঁর পদ অগ্রসর হল না প্রাসাদের দিকে।

এখন কোন্ মুখে ভ্রাতৃজায়ার সামনে উপস্থিত হবেন? দুর্দৈবের মূল ত তিনি স্বয়ং। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকেই করতে হবে। এই আঘাতেই জাগরিত হল তাঁর সুপ্ত বিবেক বোধ! এখন প্রথম কর্ত্তব্য মনে হল—জ্যেষ্ঠকে বন্দীদশা থেকে সসম্মানে মুক্ত করা। সেজন্যে রাজকোষের অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন। সম্রাটের দেয় কর প্রেরণ না করলে কোনক্রমেই রাজার কারবাস রোধ করা যাবে না।

কিন্তু কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন এই বিপুল অর্থ? কে তাঁকে ঋণ দেবে? ভ্রাতা নিজেই যখন অসমর্থ হয়েছেন, বেমানার পক্ষে ত অর্থ সংগ্রহ আরো অসম্ভব। কে তাঁর এই পারিবারিক বিপদ্‌কে আপনার জ্ঞান করে সাহায্য করবে? অর্থ এবং হৃদয় কার আছে একাধারে?

অভিরামায়ার কথা মনে পড়ল। রাজস্বর্ণকার এবং তাঁর পরম সুহৃদ্। । তিনি যেমন অর্থশালী, তেমনি বমানার প্রতি প্রীতিবদ্ধ। তাঁর পক্ষেই এই অর্থ ঋণ দেওয়া সম্ভব। হৃদয়বান্‌ও অভিরামায়া এবং রাজ পরিবারের, বিপদ্ বিশেষ বেমানার তার অন্তর স্পর্শ করবে।

কিন্তু—বেমানার মনে হল—অভিরামায়া এত অর্থ দিতে কিছুতেই সম্মত হবেন না। তিনি অত্যধিক অর্থপ্রিয়, অর্থই তাঁর প্রাণ যেন, জীবনের প্রধান অবলম্বন। অন্য কোন প্রকার সাহায্যহলে অভিরামায়াকে বলা যায় এবং তিনি অবশ্যই তা করবেন। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থঋণের জন্যে তাঁকে বলা বৃথা। রাজকোষাগার যথেষ্ট সম্পন্ন হলেও হয়ত অনুরোধ করা যেত। কিন্তু এই দুরবস্থায় অভিরামায়ার সাহায্য পাবার আশা করতে পারলেন না বেমানা।

অর্থ এবং হৃদয় আর কার আছে একই সঙ্গে? কে উদ্ধার করবে তাঁদের এই পারিবারিক বিপর্যয় থেকে?

দুশ্চিন্তায় বেমানা বিদীর্ণ হতে লাগলেন। সেই আলোকময় প্রভাতেই যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল তাঁর চতুর্দিকে।

অকস্মাৎ তিনি যেন এই অন্ধ চক্র থেকে উত্তরণের সন্ধান পেলেন।

মোহনাঙ্গী।

ঘন তমিস্রার মধ্যে স্বর্ণবর্ণ আলোকলতার রূপে তাঁর মনে উদয় হল মানসী। সেই ত এখন প্রেয়সী মূর্তিতে তাঁকে বিপদমুক্ত করতে পারে। তার ইচ্ছা মাত্রে পূরণ হতে পারে রাজকোষের অর্থ। কোষাগার শূন্য করে তাকেই ত সর্ব্বস্ব ডালি দিয়েছেন। কি আশ্চর্য! এতক্ষণ মোহনাঙ্গীর কথা কি করে বিস্মৃত হয়ে ছিলেন তিনি? পৃথিবীতে, সংসারে সে-ই ত তাঁর এখন সকলের চেয়ে আপন জন। কত গভীর মোহিনী অংসরে, কত নিশীথিনীর একান্ত সঙ্গোপনে তার হৃদয়-গুঞ্জরণ তিনি শুনেছেন, 'কুমার, আমরা অভিন্ন। আমাদের দেহ শুধু পৃথক্। কিন্তু মনে আর আত্মায় আমরা এক—জন্ম, জন্মান্তরেও।'

বেমানা আর কালবিলম্ব করলেন না। দ্রুতপদে উপস্থিত হলেন দেবদাসীর আবাসে।

এখানে তাঁর অবারিত দ্বার। মোহনাঙ্গীকে অন্যত্র না পেয়ে তার শয়নকক্ষে এলেন।

নায়িকা তখনো সুখ-শয্যায় শয়ান। কুঞ্জ ভঙ্গ হয়েছে বটে, কিন্তু রজনী জাগরণ বিধুরা। মদালসা। অবন্ধন-বাস। শিথিল চিকুরের রাশি। আয়ত আঁখির প্রান্ত ছায়া যেন চন্দ্র-কলঙ্কের রেখা।

এমন অপ্রসাধিতা অপরিশীলিতা তাকে বেমানা কোনদিন দেখেননি। কিন্তু এ রূপ দেখেও ক্ষুণ্ণ হলেন না তিনি। বরং এই প্রাকৃত সৌন্দর্যও কি চিত্তাকর্ষক বোধ হল হল তাঁর।

পার্শ্বে উপবেশন করতেই মোহনাঙ্গী চোখ মেললে। এমন আকস্মিক আগমনে বিস্মিতা হলেও প্রকাশ করলে-না বিস্ময়ের ভাব। সদা সপ্রতিভ স্বভাব তার। হস্ত ধারণ করে সাদর সম্ভাষণ জানালে, 'সুস্বাগতম।

কি সৌভাগ্য দাসীর। এত অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরহের অবসান হল।'

কিছু পূর্ব্বেই পরিচারিকা তার নিদ্রা-ভঙ্গ করিয়ে যায়। স্নানের কথোনও জানায় তাকে। কিন্তু সে আলস্য ভরে গাত্রত্থান করেনি। এমন অসময়ে নায়কের আবির্ভাব। এত শীঘ্র? এই প্রভাতেই ত বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর বর্তমান মুখভাব কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। এমন বিপর্যস্ত দৃষ্টিতে, এমন অভাবিত সময়ে কোনদিন ত উপস্থিত হননি রাজভ্রাতা? মনে মনে সন্দিগ্ধা হয়েও মোহনাঙ্গী তাঁর যথারীতি অভ্যর্থনা করলে।

'মোহন, একটি গুরুতর কথা বলতে এসেছি তোমার সঙ্গে। তাই এমন অসময়ে।'

মধুর প্রতিবাদ করলে মোহনাঙ্গী, 'কুমার, ভাষণে ত্রুটি হয়েছে আপনার। এ গৃহ, এই অধীনা সম্পূর্ণ আপনারই। এখানে আপনার পদার্পণ সর্ব্বদাই সুসময়। আপনি স্বচ্ছন্দ হোন। আর যদি অনুমতি করেন আমি স্নান সমাপন করে আসি। তারপর নিশ্চিন্তে আপনার কথা শুনব।'

বেমানা সম্মত হলেন। সেই ভাল। এই বৃত্তান্ত-কথন সময়সাপেক্ষ হবে। ধীর সুস্থির হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ তাঁর নিজের পক্ষে।

বেশিক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হল না। ক্ষিপ্রকারিণী মোহনাঙ্গী। অচিরেই যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে এল।

সদ্যোস্নাতা, স্নিগ্ধ লবণ্যময়ী। প্রফুল্লকর তার অঙ্গের সুবাস। চিক্কণ সুনীল বসনে সুঠাম তনুর আভাস।

নায়কের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে নিবেদনের ভঙ্গিমায় বললে, 'এখন বলুন রাজকুমার, কি আপনার আদেশ?'

বেমানা যেন অপ্রতিভ বোধ করলেন। লজ্জিত হলেন অর্থের কথা উত্থাপন করতে। কিন্তু নিরুপায় হয়ে বিনা ভূমিকায় বললেন, 'সামন্ত রাজার বার্ষিক কর দানে অপারগ হয়ে আমার জ্যেষ্ঠ এখন কারাগারে। অথচ রাজকোষ একেবারে শূন্য। তাই অতি বিপন্ন হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। রাজার মুক্তির জন্যে এখনি অর্থের প্রয়োজন।......সেজন্যেই তোমার নিকটে উপস্থিত হয়েছি, মোহন।'

'আমার কাছে?' সত্যই এবার নটী পরামাশ্চর্য। 'এ জন্যে আমার নিকটে?'

বেমানা অনুভব করলেন মোহনাঙ্গীর কণ্ঠে এ যাবৎ পরিচিত মাধুর্যের নিতান্ত অভাব। প্রিয়তমার মুখে এ এক ভিন্ন প্রকার সুর। এমন স্বরের আস্বাদ তিনি দয়িতার কাছে পূর্বে কোনদিন পাননি।

অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করলেও তাঁকে বলতে হল, 'এই দারুণ বিপদের দিনে তুমি আমায় অর্থসাহায্য কর। নচেৎ রাজাকে মুক্ত করতে পারব না। অবশ্যই তোমার অর্থ আমি ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করব এবং যতশীঘ্র সম্ভব পরিশোধ করে দেব। তোমাকে আমার দেওয়া অলঙ্কারগুলি থেকেই এখন প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মোহনাঙ্গীর মুখভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। বেমানার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিলে আপনাকে। আর সে বিস্ময়ের ঘোর গোপন করতে পরলেনা।

বিস্ফারিত লোচনে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার সঙ্গে রহস্য করছেন না ত? সত্যই কি আপনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন? কাল সারা নিশি এমন কোন কথা ত উচ্চারণ করেন নি।'

'আজ প্রভাত পর্যন্ত এমন কথা আমার কল্পনাতীত ছিল। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এ দুঃসংবাদ পেয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, মোহন। রহস্য করবার মতন মানসিক অবস্থা আমার আদৌ নয়।' কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন বেমানা, 'আমার কথা বিশ্বাস কর। আমায় তোমার আভরণগুলি ঋণ দিয়ে সাহায্য কর।'

তাঁর কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেই এবার মোহনাঙ্গী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল।

মর্মাহত বেমানা বললেন, 'এ কি হাসির সময় না হাসির বিষয় মোহন?'

'আমি হাসছি এই ভেবে যে, আপনি কত বুদ্ধিহীন।'

'বুদ্ধিহীন? আমি?

'নয় কি।' বলে নটী এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি উত্তোলন করে বললে, 'ও কিসের শাদা আস্তরণ?'

'কেন? 'সুন্নম্। (অর্থাৎ চুণ)।'

'দেওয়াল থেকে এই সুন্নম্ কি ফিরিয়ে নিতে পারেন?'

'না।' হতবুদ্ধি হয়ে বেমানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু একথা কেন?'

'তেমনি আমাদের দেওয়া অর্থ আপনি বুদ্ধিমান্ হলে বুঝতেন, দেওয়ালের সুন্নম্ এবং বারাঙ্গনার অর্থ কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।'

স্তম্ভিত হলেন বেমানা। এবার সত্যই নির্বোধের তুল্য উচ্চারণ করলেন, 'তুমি...তুমি বারাঙ্গনা?...দেবদাসী নও?'

এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মানসীর কণ্ঠে। আর তিনি অন্তরে কশাঘাতের সঙ্গে শুনতে লাগলেন,— 'ছিলেম দেবদাসী—কিন্তু সে বহুকাল পূর্ব্বে। সে কুমারী জীবনের কথা বিস্মৃত হয়েছি কবে।' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলতে লাগল মোহনাঙ্গী, 'আমায় দেবদাসী গণ্য করেই কি রাত্রি যাপন করতেন এখানে? আমি যথার্থ দেবদাসী হলে আমার সঙ্গ উপভোগ করতে পারতেন? নিত্য নূতন অলঙ্কার, উপহার, অর্থ দিয়ে আমার পাপাসক্ত করতে সক্ষম হতেন কখনো? আমায় বারাঙ্গনা বলতে আপনার রুচিতে বাধে। কিন্তু দেবদাসীকে বারাঙ্গণায় পরিণত করা বড়ই রুচিকর।'

'মোহন, মোহন, তোমার বিষাক্ত রসনা সংবরণ কর। এতদিন তুমি যত প্রেমের আচরণ করেছ, যত প্রেমের পরিচয় দিয়েছ সে-সব তাহলে কি? নিতান্তই ছলনা?'

'প্রেম কিংবা ছলনা তা আপনার যেমন ইচ্ছা ভাবতে পারেন। তবে এরূপ ব্যবহারেই আমরা অভ্যস্ত। এই আচরণ আমাদের উপজীবিকা। আমাদের বৃত্তির প্রচলিত রীতি।'

অপমানে হতাশ্বাসে বিবর্ণ হয়ে গেলেন বেমানা। নিদারুণ গ্লানিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। গৃহত্যাগের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই মনে পড়ল জ্যেষ্ঠের কথা। অর্থাৎ কারাগারের তাঁর নিগ্রহের কথা।

শেষবার মিনতি করে বললেম, 'সে-কথা যাক। আমাদের এত দিনের সম্পর্কের কথা মনে করেও কি এই ঋণ ভিক্ষা দেবে না মোহন?'

'সে উত্তর আপনাকে স্পষ্টই জানিয়েছি।'

'সেই কি তোমার শেষ কথা?'

'এ বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না।'

বেমানা ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন দেবদাসীর গৃহ থেকে। নতমস্তকে পথে এসে দাঁড়ালেন।

কোন্ দিকে যাবেন স্থির করতে পারলেন না যেন। শূন্য হৃদয়ে শুধু বারবার আঘাত করতে লাগল—'মূঢ়, মূঢ়, কৃতকর্মের যোগ্য প্রতিফল।'

তাঁর চোখে জগতের সব দৃশ্য যেন হারিয়ে ফেললে তার বর্ণসমারোহ। পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাঁর অন্তস্থল মথিত করে ধ্বনিত হয়ে উঠল একটি হাহাকার—মোহনাঙ্গী, তোমার মনে এই ছিল!

এমন বৃহৎ প্রেমের অপমৃত্যু ঘটল এত সঙ্কীর্ণ ভাবে। অদৃষ্টের কি পরিহাস!......

অন্তরে বাইরে সর্ব্বস্বান্ত বেমানা। লক্ষ্যহীনভাবে পথ চলতে লাগলেন। ইচ্ছা হয়না এখন প্রাসাদে উপস্থিত হতে। অন্য কোথাও যাবারও স্পৃহা নেই। অপরিসীম হতাশ্বায় ভারাক্রান্ত মন। রাজাকে কারামুক্ত করবার কোন উপায় হল না। নরসাম্বার কাছে উপস্থিত হবেন কোন্ মুখে?

পুনরায় অভিরামায়ার কথা তাঁর মনে পড়ল। একবার সেখানেও চেষ্টা করা কর্তব্য। না-হয় প্রত্যাখ্যাত

হবেন। কিন্তু মোহনাজীর তুলনীয় অপমানের আশঙ্কা নেই সেখানে। অভিরামায়া তাঁর বহুদিনের সুহৃদ্। সহায়তা না পেলেও গ্লানিকর কিছু সেখানে ঘটবে না।

এমনি নানা চিন্তার পর বেমানা উপস্থিত হলেন অভিরামায়ার গৃহে। রাজার কারারুদ্ধ হওয়ার কথা তাঁকে বললেন। বিশেষ রাজকোষের অবস্থার কথা।

রাজার বন্দী হওয়ার সংবাদ অভিরামায়া আগেই শুনেছিলেন। কিন্তু রাজার কোষাগারের এমন দুরবস্থা তাঁর ধারণা ছিলনা। বেমানার ঋণের আবেদন শুনে তিনি চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ।

কিন্তু আশ্চর্য! বেমানা এখানে আশাতীত ফল পেলেন। যথার্থ সুহৃদের আচরণ করলেন অভিরামায়া। নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বন্ধুর হাতে তখনি এনে দিলেন।

বেমানার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হল কৃতজ্ঞতার আবেগে। শুধু এই ঋণ গ্রহণের জন্যে আজই জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, শোচনীয় স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে সে-কথা মনে করেই অভিরামায়ার সাহায্য তাঁর এত মর্মস্পর্শী হল। এমন কি অভিরামায়া এত অর্থ দিতে সম্মতই হবেন না এই আশঙ্কাই ছিল তাঁর মনে।

তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু বলতে উদ্যত হতেই অভিরামায়া বললেন, 'এ বিষয়ে এখন আর কোন কথা নয়। তুমি রাজাকে আগে মুক্ত কর। এ ঋণের জন্যে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। তোমার জ্যেষ্ঠ অবশ্যই সে ব্যবস্থা করবেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

বেমানা আর কালক্ষেপ করলেন না বন্ধুগৃহে। অভিরামায়ার সুবর্ণ নিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে ধাবমান হলেন। ভ্রাতৃজায়াকে এই সুসংবাদ দিয়েই যাত্রা করবেন রাজার মুক্তির উদ্দেশ্যে।

কিন্তু প্রাসাদের প্রবেশ করেই সেখানে এক অস্বাভাবিক আবহ লক্ষ্য করলেন। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ পুরী। দাসদাসী প্রহরী কারো সাড়াশব্দ নেই। অথচ সকলেই উপস্থিত। যেন কি এক অশুভ ছায়া রাজ আবাস আচ্ছন্ন করেছে। প্রথমে ভাবলেন, রাজার কারাবাসের জন্যেই প্রাসাদে এই বিষাদময় পরিবেশ। যাকে দেখেন, তারই নত শির। তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইবারও যেন কারো ইচ্ছা নেই। তাঁর মনে হল, এ কি তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার জন্যে? তাও সম্ভব এবং সেজন্যে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তাঁর পাপের ত সীমা নেই? আর তা সকলের কাছে গোপন না থাকতে পারে।

এখন নরসাম্বার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি অধীর হলেন।

এক পরিচারিকাকে দেখে আদেশ করলেন, 'রাণীকে সংবাদ দাও। আমি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

দাসী গমনোদ্যতা হয়ে পুনরায় ফিরে এল। বেমানাকে যেন কি বলবার উপক্রম করেও নতমুখী হয়ে রইল। তারপর বললে, 'কুমার, আরো এক মহা দুঃসংবাদ আছে। আপনি কি জানেন—'

রুদ্ধ-শ্বাস বেমানা। আরো দুর্দৈব? তাঁর অধৈর্য প্রশ্নের উত্তরে পরিচারিকা যা জানালে, শুনেও তা ধারণা করতে পারলেন না। মনে হল, ভুল শুনেছেন।

দ্বিতীয়বারের আকুল জিজ্ঞাসাতেও দাসীর একই উত্তর, 'জ্যোতি আর নেই।'

পুনরায় প্রশ্নের পরে সেই অবিশ্বাস্য সংবাদের এই বিবরণ পেলেন—রাজাকে বন্দী করে নিয়ে যাবার পর কাল প্রাসাদে সকলেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাণী তাঁর শয়নকক্ষে জ্ঞানহারাবৎ থাকেন। দাসীরাও ছিল তাঁরই কাছে। জ্যোতির কথা আর সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কারো স্মরণে ছিল না। সে একাকিনী ছিল দ্বিতলের এক নিভৃত অলিন্দে। তারপর কখন অসাবধানে সে সেখান থেকে অঙ্গন তলে পড়ে যায় কেউ লক্ষ্য করেনি। সন্ধ্যার পর তার সন্ধান আরম্ভ হলে যখন তাকে পাওয়া যায়, তখন আর শরীরে প্রাণ নেই। পতনের সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে সম্ভবত। কিছুক্ষণ পূর্বে তার অন্ত্যেষ্টিও সম্পন্ন হয়েছে। সমস্তই শেষ।

নরসাম্বার নয়নের মণি, বেমানার অতি আদরের

নিধি, রাজা রাচ বেমানার একমাত্র স্নেহের অবলম্বন, সদাচঞ্চল হাস্যময়ী জ্যোতি। অম্লান নিষ্পাপ একটি বিকচ কুসুম যেন। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রজাপতির মতন সে নৃত্য করে বেড়াত। অনুক্ষণ শোনা যেত তার সুমিষ্ট কলকাকলি। কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কাল প্রভাতেও বেমানা একবার তাকে দেখেছিলেন। আজ সে নেই। আর কখনো দেখা যাবে না তাকে। আর কোনদিন শোনা যাবেনা তার কণ্ঠস্বর।

চার বছরের সেই শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একদিনে।

আত্মসংবরণ করতে বেমানার বেশ কিছু সময় লাগল। তারপরের সুকঠিন কর্তব্য—ভ্রাতৃজায়ার সম্মুখীন হওয়া। কি করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হবেন এই ভাবনায় আরো খানিকক্ষণ অতিবাহিত হল। অবশেষে রোরুদ্যমানা নরসাম্বার কাছে এলেন আনত মস্তকে।

তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বেমানা উচ্চারণ করলেন, 'দেবী, আমার অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য। সমস্তই আমার পাপের ফল। রাজার বন্দীদশা, জ্যোতিকে হারানো—সবের মূলে আমি। আমি অধিকতর পাপী এই জন্যে যে, আপনি আমায় পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করে ছিলেন, সদুপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারিনি। এখন আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি তুষানলে প্রাণ ত্যাগ করব। যে অসহ্য মর্মজ্বালা এখন অনুভব করছি, জীবন দানেই তাতে শান্তি পাব। আর আমার অগ্নিসংস্কারে এ রাজপুরীও পরিশুদ্ধ হবে।'

নরসাম্বা আত্মসংবিৎ রক্ষা করেছেন অসীম ধৈর্যে। তাঁর চরিত্রে একদিকে যেমন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে তেমনি স্নেহ-কোমলতা। দেবরের কাতরোক্তি তাঁর অন্তর স্পর্শ করলে।

তিনি বললেন, 'মনে যদি তোমার সত্যই অনুতাপ জেগে থাকে তাহলেই মঙ্গল। অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি? তুষানলে প্রাণ দেবে? তোমার প্রাণের পরিবর্তে কি ফিরে পাওয়া যাবে জ্যোতিকে? ভাগ্যে যা ছিল, ঘটেছে। যে জীবন চলে গেছে, আর তা ফিরবে না। তুমি প্রাণ বিসর্জন দিলেও না। শোক সংবরণ কর। জ্যোতি যে তোমার কত স্নেহের ছিল তা আমি জানি। তবু বলি, এমন উতলা হয়ো না। বরং চেষ্টা কর তোমার জ্যেষ্ঠ যাতে মুক্তি-পান অবিলম্বে।'

'সে উপায় হয়েছে, দেবি। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যে আমি অভিরামায়ার সাহায্য পেয়েছি। তাতেই সামন্ত কর দেওয়া হবে। সে সংবাদ আপনাকে জানাবার জন্যেই এসেছিলেন। জ্যোতির কথা তার আগে পর্যন্ত জানতে পারিনি।'

নরসাম্বা শুধু বললেন, 'এখন তোমার প্রথম কর্তব্য রাজাকে কারামুক্ত করে আনা।'

বেমানা নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে গেলেন। এসব ব্যবস্থাই কঠিন হল না। কারণ, পর্যাপ্ত স্বর্ণ দিয়েছিলেন অভিরামায়া। রাচ বেমানাও মুক্তিলাভ করে প্রাসাদে এলেন।

কিন্তু তারপর থেকেই বেমানার জীবনে এল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

কোথায় অন্তর্ধান করলে সেই সঙ্গীত-নৃত্য-আমোদী রসপিপাসু তরুণ। নারী-রূপমুগ্ধ ভোগ-বিলাসী, অন্ধ যৌবনের দাস বেমানাকে আর দেখা গেল না। তাঁর সাক্ষাৎই পাওয়া যেতে লাগল কদাচিৎ। নৃত্য গীত নর্তকী গায়িকা বন্ধু-সংসর্গ কোন-কিছুতেই আর তাঁর অন্তরের যোগ রইল না। সমাজ সংসার সমস্ত এড়িয়ে তিনি থাকতে লাগলেন নির্জনে।

সেই অবস্থায় নরসাম্বা একদিন তাঁর বিবাহের অনুরোধ করলেন।

বেমানা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমার বিবাহের যদি উদ্‌যোগ করেন তাহলে আমি গৃহত্যাগী হব।'

তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে একথা বিশ্বাস হল নরসাম্বার। তিনি ভাবলেন, এখন একথায় আর কাজ নেই। বিবাহে বেমানাকে বাধ্য করলে হয়ত নতুন কোন বিপত্তি দেখা দেবে। এ অবস্থার পরিবর্তন হলে তখন বরং বিবাহের প্রস্তাব করা যাবে।

একা একা থাকতে লাগলেন বেমানা। এখন আর্দৌ অন্য চিন্তার উদ্বেলিত তাঁর মন। গভীর জিজ্ঞাসায় তিনি আলোড়িত হতে লাগলেন। এমন ধরণের ভাবনা কথনো তাঁর চিত্তে উদয় হয়নি। পর পর এই কয়টি দুর্ঘটনা ভারচ্যুত করে দিলে তাঁর মানস ভিত্তিকে।

রাজার কারাবাস, মোহনাঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতা, জ্যোতির মৃত্যু। এই ঘটনাপরম্পরায় এক অদৃশ্য যোগসূত্র তিনি দেখতে পেলেন। তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যে, চক্ষু উন্মীলনের জন্যে কোন অদৃষ্ট শক্তির ইঙ্গিতে সৃষ্ট হল যেন এই ঘটনামালা। এগুলি না ঘটলে তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্‌বোধন হত না। আবিষ্কার করতে পারতেন না জীবনের পরম লক্ষ্যস্থল।

জ্যেষ্ঠের বন্দীদশা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে—রাজ-সম্মানও একদিন ধূলায় লুণ্ঠিত হতে পারে। এত সংসারিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও অতিশয় দুর্ভাগ্য-জনক হওয়া সম্ভব।

রূপযৌবনের সম্ভোগ—জীবনে যা সব চেয়ে আনন্দ-কর বোধ হয়—কি তার পরিণতি? তাও ত ক্ষণিকের। শ্রীময়ী যৌবনময়ী রূপতনুর অন্তরালে কি কুৎসিত স্বার্থের গরল। সুতরাং কেন এই মায়া-মরীচিকার জন্যে আকিঞ্চন? মোহনাঙ্গী ছলনাময়ী না হত তা হলে আরো কতকাল এই অন্ধ আবর্তে বদ্ধ থাকতেন। তার মগ্ন স্বার্থবোধ শাপে বর হল তাঁর পক্ষে।

তারপর এই প্রিয় শিশুর আকস্মিক মৃত্যু। তাঁর নয়নের মায়া অঞ্জন মুছে দিয়ে গেল। জীবন এত ভঙ্গুর। মানুষ মাত্রেরই মৃত্যু যে অবধারিত—এ পুরাণো সত্য। সকলের মতন তাঁরও তা অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর কোন বাছবিচার সময়-অসময় পরিণত অপরিণত কাল কিছুই নেই, এসত্য এত নিকটে চাক্ষুষ না করলে ধারণা করা কঠিন হত তাঁর। কোথায় হারাল সেই সদানন্দময়ী মানব-কোরক? কেউ তাকে এ অকাল বিনষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারলে না।

বেমানা চিন্তা করতে লাগলেন, কি এক অদৃশ্য মহাশক্তির ক্রিয়া চলেছে বিশ্বজগৎকে ঘিরে, কিংবা তার অন্তস্থলে। সেই অদৃষ্টের কাছে কত অসহায় মানুষ আর তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্‌যোগ কর্ম-প্রয়াস।

সেই অলক্ষ্য শক্তিধরেরই এক নাম কি ঈশ্বর? কি তাঁর স্বরূপ? কেমন করে তাঁকে ধারণা করা যায়? তাঁকে অন্তরে লাভ করা যায় কি? যুগে যুগে তাঁরই জন্যে কত ত্যাগী, কত সাধক, কত ঋষি, কত যোগী সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছেন। কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন তাঁকে লাভ করবার আশায়? তাঁদের কি ব্যর্থ জীবন? তাঁরা ভুল করেছেন? দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের-মায়ায়-বদ্ধ আছেন যাঁরা, তাঁরাই কি সঠিক?

ইহাজগতে প্রকৃত সুখ কি? শান্তি কোথায়? যথার্থ সুখ শান্তি আছে কি পৃথিবীতে? সংসারে বা অন্যত্র, কোথায় কেমন করে তা লাভ করা যায়? কি তার পথ? কে দেবে সেই পথের সন্ধান?

এমনি শত চিন্তায় জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন বেমানা। অধ্যাত্ম বিষয়ে অন্তরে গভীর আকুতি জাগে। তৃপ্তি পান না আর কিছুতেই। কারো সঙ্গ আর কামনা করেন না।

একমাত্র সুহৃদ্ অভিরামায়া। শুধু তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন কথনো কথনো। গৃহী এবং বণিক্ হলেও অভিরামায়া ভগবৎবিশ্বাসী। অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনায় তাঁর বড় আনন্দ।

বেমানার এমনি সময়ে অভিরামায়া একদিন তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার এখন উপযুক্ত গুরুর প্রয়োজন। তিনি যদি তোমায় পথের দিশা দেখিয়ে দেন জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করেন, তুমি শান্তি পেতে পারো।'

'এমন কোন মহাপুরুষ কি তোমার জানিত আছেন?'

এমন একজন সিদ্ধ যোগীকে সত্যই অভিরামায়া জানতেন। তাঁর নাম লাধিকা যোগী। তাঁর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন মহাভাগ্য ক্রমে। কিন্তু তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে। অভিরামায়া আর তাঁর নিকট পূর্বের মতন ঘন ঘন যাতায়াত করেন না ইদানীং।

তাঁর কথা বলে বেমানাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবে তাঁর কাছে?'

অধীর হয়ে বেমানা বললেন, 'এ প্রশ্ন কি করবার? এতদিন কেন তাঁর কথা আমায় তুমি বলনি?'

অভিরামায়া মনে মনে বললেন, সে উপযুক্ত সময় এতদিন তোমার জীবনে আসেনি। প্রকাশ্যে বললেন, 'তাহলে কালই চল লম্বিকা যোগীর কাছে।'

বেমানাও তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন।

পরদিন দুজনে যাত্রা করলেন সাধুর উদ্দেশে।

কোণ্ডারিডু থেকে বেশ কিছু দূরে তখন তাঁর অবস্থান। দুই বন্ধু নগর পার হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এলেন। তারপর এক নাতিক্ষুদ্র বনের প্রান্তে দণ্ডায়মান কয়েকটি পর্বতের শ্রেণী।

সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অভিরামায়া বললেন, 'ওই পাহাড়ে একটি গুহায় এখন লম্বিকা যোগী রয়েছেন।'

আরো কিছুক্ষণ চলবার পর তাঁরা উপস্থিত হলেন গুহার মধ্যে।

বাইরের তুলনায় আলো অল্প হলেও গুহায় সবই পরিষ্কার দেখা গেল। একটি কোণে ব্যাঘ্রচর্মের আসনে উপবেশন করে ছিলেন যোগী। অভিরামায়া ও বেমানা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

অভিরামায়া কোন কথা বলবার আগেই লম্বিকা বললেন, 'তুমি উপযুক্ত সময়েই এসেছ। তোমার কথা আজ ক'দিন যাবৎ আমার মনে হচ্ছিল। দেখ, আমার দেহ বড়ই অপটু হয়ে পড়ছে। নিয়তই সাধনে বাধা পাচ্ছি। তাই স্থির করেছি, এ শরীর আর রাখব না। আগামী পরশু প্রাতে আমি দেহ ত্যাগ করব। যাবার আগে একজনকে দীক্ষা দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। তাই ক'দিন তোমার কথা মনে পড়ছিল। তুমি কাল এখানে এস। তোমাকেই দীক্ষা দেব।'

অভিরামায়া বললেন, 'প্রভু, আমার এই সুহৃদকে সেই আশাতেই এখানে এনেছি। ইনি গুরুর সন্ধানে দিন গুণছিলেন। আধ্যাত্মিক আকুলতায় ইনি সংসারে একান্ত উদাসীন হয়ে আছেন। আমার সঙ্গে এঁকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুণ।'

যোগী বললেন, 'দুজনকে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। একজনকে দীক্ষিত করাই মনস্থ করেছি। তোমার বন্ধুকে দীক্ষা দিতে হলে তোমাকে আর পারব না। আমার এই রূপই সংকল্প।'

বেমানা ব্যাকুল হয়ে অভিরামায়ার দিকে চেয়ে রইলেন। কোন কথা উচ্চারণ না করলেও অভিরামায়া শুনলেন তাঁর অন্তরের প্রার্থনা। বেমানা লম্বিকার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হলেন।

অভিরামায়া যোগীকে বললেন, 'প্রভু, তাহলে আমার সুহৃদকেই দীক্ষা দেবেন। আমার এখন ভাগ্যে নেই জেনে সন্তুষ্ট থাকব।'

লম্বিকা বেমানার মস্তক স্পর্শ করে বললেন, 'বেশ, তুমিই কাল শুচি দেহে এসো।'

সে রাত্রি বেমানা বিনিদ্র যাপন করলেন। প্রভাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন অধীর আগ্রহে।

তারপর যথাসময়ে যোগীর কথা মতন বেমানা প্রস্তুত হয়ে এলেন গুহার মধ্যে। তাঁকে দীক্ষা দানে লম্বিকা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর কিছু করলেন না। অতি সহজ সরল একটি ক্রিয়া। কিন্তু বেমানার জীবনে তার ফল সুগভীর, সুদূর প্রসারী হল। নিগূঢ় তার তাৎপর্য।

বেমানার জিহ্বার ওপর যোগী আপন অঙ্গুলী দিয়ে কেবল বীজাক্ষরটি লিখে দিলেন।

কিন্তু সেই লিখন স্পর্শের প্রভাব বেমানার জিহ্বাগ্র থেকে বিদ্যুৎ রেখার তুল্য তার সমগ্র চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

সে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনের অনুভব। যেন কি এক অজ্ঞাত আলোকের স্ফুলিঙ্গে যেন তাঁর অন্তর সত্তা আলোময় হয়ে উঠল।

দীক্ষান্তে অন্য মানুষে পরিণত হলেন বেমানা। গুরুর সঙ্গে সেদিন কিছু আলোচনাও তাঁর হয়েছিল। তাঁর কোন কোন জিজ্ঞাসার উত্তরও যোগী দিয়েছিলেন।

পরদিন লম্বিকা যোগী দেহত্যাগ করলেন। সেই গুহার মধ্যে তাঁর আদেশে তখন তাঁর দুপাশে উপস্থিত ছিলেন বেমানা ও অভিরামায়া। দুই শিষ্যের শরীরে ভর দিয়ে যোগী উপবেশন করেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর দেহান্তর ঘটল। তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর তাঁরা ধীরে ধীরে শয়ন করিয়ে দিলেন।

দেহসংকারের বিষয়েও লম্বিকা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন শিষ্যদের। তাঁর ইচ্ছা মতন সমাধির ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন।

তারপর থেকেই আরম্ভ হল বেমানার পরিব্রাজক জীবন।

একবার মাত্র কোণ্ডারিড্ডুর প্রাসাদে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রণাম করতে গিয়েছিলেন রাচ বেমানা ও নরসাম্বাকে।

কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার বহু অনুরোধেও বেমানা আর পুরবাসী হননি। তাঁর সমস্ত প্রশ্ন আর সমস্যার নিরাকরণ করে পথের সন্ধান যেন পেয়েছিলেন।

অন্য কোন জীবন তাঁর কাছে এখন নিষ্প্রয়োজন। প্রাসাদ-বাস এখন অবান্তর।

বেমানার জীবন একেবারেই রূপান্তরিত হয়েছিল। চিত্ত-লোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল সর্বসংশয়হরা প্রজ্ঞার দীপ্তি।

তিনি তখন থেকে যেন আলোকে অবস্থান করতেন। আলোয় বিচরণ করতেন। প্রচার করতেন আলোর বার্তা।

সব লৌকিক সম্পর্কের উর্ধ্বে তিনি চলে যান। শুধু বিস্মৃত হননি অভিরামায়ার ঋণ। অভিরামায়াই তাঁর প্রাণের যথার্থ সুহৃদ্। ত্রাণের কারণ। আপনি দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি বেমানার মুক্তিপথযাত্রায় সহায়তা করেছিলেন।

যেদিন লম্বিকা যোগীর দীক্ষা নেন সেদিনই তিনি সাক্ষাৎ করেন অভিরামায়ার সঙ্গে।

করজোড়ে বলেন, 'প্রিয় বন্ধু, আমার জন্তে তুমি এত বড় যোগীর কাছে অদীক্ষিত রয়ে গেলে, এমন সুযোগ লাভ করেও। তুমি আমায় ক্ষমা করেছ ত?'

'সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা। সব সঙ্কোচ মন থেকে দূর করে দাও।'

অভিরামায়ার এই ত্যাগের জন্তে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না বেমানার। তাই স্ব-রচিত নানা কবিতা তিনি অভিরামায়ার নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

বেমানার দীক্ষিত জীবনের তাবৎ বাণী প্রচারিত হয় কবিতার আকারে। সেই কবিতাবলীর সঙ্গে অভিরামায়ার নামও অমর হয়ে আছে।......

তখন থেকেই বেমানা সন্ত, বেমানা কবি, বেমানা প্রচারক। অন্ধ্রভূমির নিকট দূর সর্ব অঞ্চলে তাঁর পরিক্রমণ।

মানবের মধ্যেই যে দেবত্ব বিদ্যমান, ত্যাগের পথে ধ্যানযোগে যে সেই দৈবীভাব লাভ করা সম্ভব—এই ছিল তাঁর প্রচারিত একটি প্রধান বাণী, এক মূল মন্ত্র।

অপরের দুঃখ কষ্ট যে আপন অন্তরে ধারণ করে সেই যথার্থ মানুষ—এও তাঁর একটি প্রিয় বাণী।

বেমানা অতি দীর্ঘজীবী হয়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। লোকের মধ্যেই যে লোকোত্তরের অবস্থান তাঁর আপন ধর্ম জীবনই ছিল তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

অন্তিম পর্বে অন্ধ্রভূমির কাদিরি তালুকে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। সেখানেই তিনি চির সমাধি লাভ করেন—কাটাইরা পল্লীতে কোন বিস্মৃত অতীতে।......

আজো সেই সমাধিস্থলে ভক্তজনের নিত্য উপাসনা হয়ে থাকে। আর তিনি পূজিত হন অসংখ্য অন্ধ্রবাসীদের মনের মন্দিরে।

যাঁরা সন্ধানী, কালের পারাবার উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদের কাছে ভেসে আসে বেমানার অমর বাণী—তাঁর মুক্ত প্রাণের বিশ্বাসের কথা। অন্ধ কুসংস্কার আর অর্থহীন নিগড়কে তিনি কশাঘাত করে ঘোষণা করে গেছেন—'সত্য চিরন্তন। সত্য গুণাতীত।'

'ঈশ্বর-কৃপা ভিন্ন কোন মঙ্গল অসম্ভব।'

'ঈশ্বরে বিশ্বাসই মানুষের সঙ্করণের একমাত্র সৎপথ।'

স্বাধীনতা আন্দোলন ও আনন্দমোহন

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায়—ডাঃ রমা চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন......আত্মজয়ের, আত্মবিকাশের আত্মপ্রকাশের আন্দোলন। সে জন্য এই অশেষশুভ স্বাধীনতা-আন্দোলন কোনোদিনই সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়নি, চিরদিনই হয়েছে একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক আন্দোলন রূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও অভিনন্দিত। আমরা যে কোনো রাজনৈতিক নেতার পুণ্যজীবনী সম্বন্ধে এস্থলে চিন্তা করে দেখতে পারি এবং সেস্থলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব যে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দার্শনিক, ধার্মিক, নীতিবাদী এবং দর্শন-ধর্ম-নীতির মহিমময়, মধুময়, মঙ্গলময় ভিত্তিতেই তাঁদের রাজনীতির সুদৃঢ় সৌধ রচিত হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীইতো এর প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। তিনি যে ভাবে তথাকথিত কুটিল কঠিন রাজনীতিকেও ধর্মের অমল, অভয়, অশোক, অরুণ তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন, তা সত্যই অতি বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর।

মহামনীষী শ্রেষ্ঠ দেশসেবক গরিষ্ঠজনগণবন্ধু আনন্দ মোহন বসুও ছিলেন ঠিক এই ভাবেই একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। ময়মনসিংহ জেলার সুমিষ্টনামধারী জয়সিদ্ধি গ্রামে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৪৭ সালে। সেই সময়ে তাঁর ন্যায় মেধাবী ছাত্র ছিল অতি বিরল, কারণ তিনি জীবনে দ্বিতীয় হননি স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এনট্রান্স থেকে এম-এ পর্যন্ত সমস্ত পারিক পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পি-আর-এস্ বা প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়েও তিনি দশ সহস্র টাকা বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। তার পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সর্বজনকাম্য, সর্বজনসমাদৃত, সুকঠিন, দুষ্প্রাপ্য "র‍্যাংলার" উপাধি লাভ করে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করেন; তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় "র‍্যাংলার"। ইংলণ্ড থেকে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ব্যারিষ্টাররূপে প্র্যাক্‌টিস করে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জন করেন। আইনের পথ অনেক স্থলেই সত্যের ঋজু নির্মল, নির্ভীক পথ হয় না, অনেক স্থলেই আইনব্যবসায়িগণ অনিবার্য ভাবেই খলিত হয়ে পড়েন সত্য-ন্যায়-নীতির পুণ্যাদর্শ থেকে। কিন্তু আনন্দমোহন আজীবন সত্য-ন্যায়-নীতি-ধর্মের জাগ্রত জলন্ত প্রতীক। জীবনে তিনি একটিমাত্রও অসত্য কথা বলেন নি, একবারমাত্রও অসত্য আচরণ করেন নি, একবারমাত্রও অসত্য চিন্তা করেন নি।' এই কারণে তিনি "সেন্ট বো'" "সাধু বসু" এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হন।

আনন্দমোহন এই সঙ্গে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্, ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতা। শিক্ষার দিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহায়তায় "সিটি স্কুল" স্থাপন যা পরে সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ "সিটি কলেজ"এ উন্নীত হয়। তিনি নানাভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও উন্নতি সাধন করেন। ধর্মীয় দিক থেকেও তাঁর নাম "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। সমাজসংস্কারকরূপে তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অনুসৃত সকল শুভ সংস্কার আন্দোলনেরই পুরোভাগে ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকেও, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি দেশ ও দশের বহুবিধ

মঙ্গল সাধন করেন। জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণ চিরস্মরণীয়। আপার সার্কুলার রোডস্থ সুবিখ্যাত "ফেডারেশন হল"এর ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপনোৎসবে তিনিই শ্রেষ্ঠ, সর্বজনপ্রিয় দেশসেবকরূপে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের একটি মূর্ত প্রতীকরূপে এই ফেডারেশন হল অথবা মিলন-মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়, এবং সেই সঙ্গে রাখী-বন্ধন উৎসবও সর্বপ্রথম প্রবর্তিত করা হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর এই দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য গুরুতর পীড়িত আনন্দমোহনকে তাঁর স্নেহভাজন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিকটস্থ বাসভবন থেকে স্ট্রেচারে করে আনা হয় সভাস্থলে। সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে তাঁর লিখিত ইংরেজি ভাষণটি পাঠ করেন সুবিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আনন্দমোহনের এই শেষ ভাষণ ভাবের ঐশ্বর্যে, ভাষার মাধুর্যে, [illegible] দেশের একটি স্থায়ী সম্পদরূপেই পরিগণিত হবে।

এই অঞ্চলের তরুণ সম্প্রদায় এই স্বনামধন্য দেশনায়কের মূর্তি স্থাপনের শুভ ব্রত গ্রহণ করে সংগতভাবেই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অবশ্য বাহ্যিক মূর্তি-স্থাপন করলেই যে তাঁদের সব কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে, তা নিশ্চয়ই নয়। তার চেয়েও বড় কথা তাঁর প্রীতি ও ত্যাগের-সেবার মহাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আমাদের পরমারাধ্য যুবসমাজ অনির্বাণ আলোকস্বরূপ এই সব পূজ্যপাদ পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের প্রোজ্জ্বল প্রভায় নিজেদের জীবনকে উদ্ভাসিত করে নিয়ে সেই স্বর্ণালোকে বিশ্বজগতের অন্ধকার দূর করবেন চিরতরে।

বন্দীও মানুষ

যুগবাণী সাপ্তাহিকে প্রকাশ :—

৩০ হাজারের বেশী (রাজ) বন্দী আজ ভারতে কারান্তরালে অসহনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই মাসের পর মাস বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন বিচারালয়ে এই অহেতুক বিলম্ব বা পুলিশী হয়রানি আজ বিচার ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। কয়েক হাজার বিনা বিচারে আটক, বন্দীও বিভিন্ন প্রদেশের কারাগারে রয়েছেন। অনেকেই পুলিশী জুলুম বা প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। অনেকে রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের (কু) নজরে পড়ে কারাগারে পচছেন। এ ছাড়াও সাধারণ আইনানুগ ব্যবস্থার শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীও রয়েছে সহস্র সহস্র। সকল বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ একান্ত কাম্য। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকার বন্দীদের থাকবার, পরবার, খাবার, বেড়াবার, স্নান শৌচাদি প্রভৃতির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সমস্ত উন্নত করবেন এ আশা কি অন্যায়? ইংরেজ আমলে, এমন কি পুরানো কংগ্রেসী আমলেও জেলের অবস্থা [illegible] হলেও অসহনীয় ছিল। আজ [illegible]। বিনা বিচারে আটক রাখা গণতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নহে। চীন রাশিয়া, [illegible] কথা তুলে লাভ নেই। আমাদের সৃষ্টি করতে হবে নতুন সমাজ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কংগ্রেসের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে [illegible] বিনা বিচারে আটক রাখা অসঙ্গত। [illegible] ভারতের প্রশাসনিক বা পুলিশী ব্যবস্থা বিনা বিচারে বন্দীদের আটক রেখে কংগ্রেস ও সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছেন। আটক বন্দীদের সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অথবা প্রয়োজন হলে নতুন আইন করে বিচার করাই গণতন্ত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাঞ্ছনীয়। হিংসা বা অহিংসার নামে বন্দীদের প্রতি বিচারের পার্থক্য করা চলে না, হিংসাশ্রয়ী বন্দীদের অহেতুক জুলুম করে মনুষ্যত্বের অবমাননা আজ ভারতে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করতে চলেছে। সেজন্য ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। অচিরে ইহা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কারাগারে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবর্গের সাক্ষাতের অব্যবস্থা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে তারও আশু প্রতিকার এখনই প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে বাধা

আসামে তীব্র কাগজ সংকটের ফলে ১৯৭৪ সালের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কলকাতা থেকেও আসামে কাগজ পাঠানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কাগজের মূল্যবৃদ্ধিতে পাঠ্য-পুস্তকগুলোর মূল্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বাড়বে। রাজ্যের সরকারী অফিসগুলিতে কাগজের অভাবে এক-পিঠে লেখা একবার ব্যবহৃত কাগজগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্কুল-কলেজগুলোতেও কাগজের অভাবে দারুণ অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

"ব্যায়ামচর্চা" মাসিক লিখিতেছেন :—

প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা রবীন ভট্ট অধুনা লুপ্ত মুকুল সংঘে তাঁর ক্রীড়া জীবন শুরু করেন। এর পর "স্কুল অব ফিজিকাল কালচারে" বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জে, কে শীলের তত্ত্বাবধানে তিনি একজন ভারত বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধায় পারদর্শী হন।

ক্রীড়া জীবনের প্রারম্ভেই তিনি বর্মার মিচেল, গেল্ডেন-গ্লাভসের কিং, সেনাদলের ভাগোয়ান দাস ও ইন্টার-কলেজিয়েট-বক্সিংএ এস-চৌধুরীকে পরাজিত করে মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। এর পর তিনি রয়াল-সিগন্যালসের বৃটিশ বক্সার কর্পোরাল পিজিয়ন ও আমেরিক্যান সেনাদলের ষ্টোকার জন্সনকে বিরাট পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে মুষ্টিযুদ্ধের আসরে স্বীয় আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ১৯৪৮ সালে ইন্টার-কলেজ বক্সিং প্রতিযোগিতায় ফ্লাই ও ব্যান্টাম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি দ্বি-মুকুট অর্জনে সমর্থ হন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক মুষ্টিক দলের একজন প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। এই নির্বাচনের জন্য ভারতে দুবার মুষ্টিযুদ্ধ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। অপূর্ব চাতুর্যপূর্ণ মুষ্টিযুদ্ধের দ্বারা দুটি ট্রায়ালেই তিনি স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। এই অনুষ্ঠানেও তিনি কোঠারী আর হরীগ্যান ও বেসিল বোজারিও প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাগণকে পরাজিত করতে সমর্থ হন।

মুষ্টিযুদ্ধ ব্যতীত এই ক্রীড়াবিদ অতীতে এ্যাথলেটিক্স, রোড রেস এবং সাঁতারেও যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন।

বর্তমানে তিনি, তথ্য-বহুল বহু ক্রীড়া বিষয়ক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছেন।

কালোবাজারে চিনি সরবরাহ

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে লেখা হইয়াছে :—

প্রতি সপ্তাহেই সোম, মঙ্গল এবং বুধবার জনৈক ব্যক্তিকে সিভিল সাপ্লাই অফিস হইতে পনর বিশটা চিনির পারমিট সংশ্লিষ্ট কেরাণী বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এখান হইতে কেবল মাত্র রেশনসপগুলিকেই চিনির পারমিট ইস্যু করা হয়। অথচ উপরোক্ত ব্যক্তিটি রেশনসপ ডিলার নন; বৈধ ক্ষমতা প্রাপ্তও নহে। অফিসে সকলেই এই ব্যক্তিটিকে ভাল-ভাবে চিনে এবং জানে। বাবুদের সঙ্গে বসিয়া খোস গল্প করে, চা মিষ্টি খায় এবং আড্ডাও মারে। মাঝে মাঝে এ ব্যক্তিটিকে খাদ্য অধিকর্তার কামরায়ও আলাপ সালাপ করিতে দেখা যায়। চিনির পরিমাণও নেহাৎ কম নহে। প্রত্যহ প্রায় পঞ্চাশ বস্তা চিনি ঐ ব্যক্তিটি গুদাম হইতে ডেলিভারী নেয়। তারপর আর কিছু জানা যায় না।

অবশ্য বাজে লোকে বলে মফঃস্বলের রেশন সপ ডিলারদের নামেই চিনির পারমিট কাটা হয়। সেই চিনি, যাদের নামে পারমিট কাটা হয় তাহাদের মতানুসারেই ঐ ব্যক্তিটি উহা গ্রহণ এবং চিনি ডেলিভারী নেন কিনা, সর্বশেষে চিনির বস্তাগুলি যথাস্থানে পৌছে কিনা সে সম্পর্কে অনেকের মনে গভীর সন্দেহ। সন্দেহটা হল দপ্তর বাবুরা ভুতুরে রেশন কার্ডের ন্যায় চিনি পাচারেরও গ্যাড়াকল পাতিয়াছে।

সাময়িকী

কলিকাতা কর্পোরেশনের কথা

"যুগবানী" সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ :

কলকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অবশ্য বেশ কয়েক বছর ধরেই এর পরিচালন ব্যবস্থা খারাপ যাচ্ছিল। তাকে বাঁচাবার জন্য রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। কিন্তু সরকারে নিয়ন্ত্রাধীনেও এর উন্নতি ত দূরের কথা দিন দিন অবনতির দিকেই চলেছে। চুরি জোচ্চুরি; গাফিলতি কোনটাই সরকার বন্ধ করতে পারছেন না। একের পর এক মন্ত্রী বদল করা হচ্ছে, অফিসার বদল হচ্ছে কিন্তু কর্পোরেশনের রোগ সারানো যাচ্ছে না। কর্পোরেশনে এমন সব বাস্তু-ঘুঘুর বাস যে তাকে যিনি ঘাটাতে যান তিনিই কুপোকাৎ হয়ে যাচ্ছেন।

রাজ্য সরকার বাঘা বাঘা অফিসার বসিয়েও এর কোন বিহিত করতে পারেন নি। মন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে বিদায় দিয়ে তরুণ ডাকসাঁইটে মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জিকে বসানো হলে—তিনি অনেক কড়া কড়া কথা শোনালেন, সাত দিনের মধ্যেই সব জঞ্জাল সাফাইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—কিন্তু হাঁক ডাক ছাড়া বাস্তবে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এখন জঞ্জাল জমতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে কর্মীরা গো-স্লো ট্যাকটিস্ শুরু করেছে। কর্মীদের বক্তব্য তারা তাদের ইনসেনটিভ-বিল ঠিক মত পাচ্ছেন না। কর্পোরেশনের ভাঁড়ার শূন্য। কোটি কোটি টাকার কর অনাদায়ী পড়ে আছে। এই যে কর অনাদায় পড়ে আছে তার জন্য নিশ্চয়ই কর আদায়ী বিভাগের কর্মচারীরাই দায়ী। এ বিভাগের কর্মীদের গাফিলতির জন্য অন্য বিভাগের কর্মীদের হয়রানি। তার ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ছে। কর্পোরেশনে কর্মচারীদের বেতনই নাকি ৮৯ লক্ষ টাকা, ঠিকদার, লরী ভাড়া ইত্যাদির পাওনা ৪৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু কর্পোরেশনের তহবিলে আছে মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। কাজেই রাজ্য সরকারের কাছে হাত পাততে হয়েছে। রাজ্য সরকার এত টাকা দেবেন কোথেকে? তা ছাড়া সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনের নিকটে যে সব ট্যাক্স পাওনা আছে, তাও কর্পোরেশন দিতে পারছে না।

কর্পোরেশন যদি কর আদায় করায় অপারগ হন—তবে তার দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপালে হবে কেন? কর আদায় ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠু রূপে পালন করা যায় সেরূপ আইন-কানুন তৈরী করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই অনাদায়ী কর দাতারা বেশ র ভাগই রাঘব-বোয়াল শ্রেণীর লোক। এদের গায় হাত না দিতে পারলে কর আদায় করা যাবেনা কর্পোরেশনের অর্থ সঙ্কটও দূর হবেনা। পৌরমন্ত্রী এ দিকে নজর দিন। ছাত্র-যুবকরা ধান সংগ্রহ অভিযানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন। তাঁদের একাংশকে, বিশেষ করে যাঁরা কলকাতার অধিবাসী তাঁদের পৌর কর সংগ্রহণ অভিযানে লাগানো যায় কিনা মন্ত্রী মহানায়ককে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই। পাড়ায় পাড়ায় ছাত্র-যুবকদের দিয়ে পৌর কর ফাঁকি দাতাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। কর্পোরেশনের দেওয়া সুযোগ বন্ধ করাও চলে। এরূপ কড়া ব্যবস্থা না নিলে কর্পোরেশনের ভিক্ষার ঝুলি পূরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস

রাজা রামমোহনের সম্বন্ধে "তত্ত্ব-কৌমুদী" হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

কলিকাতা : বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ১৪০তম তিরোধান-দিবস উপলক্ষে এক সভার

আয়োজন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী আলো দত্তের সঙ্গীত ও সভাপতি মহাশয়ের প্রার্থনার পরে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস ও অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণপূর্বক সভায় ভাষণ দেন। শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস বলেন, রামমোহন সর্ববিধ অসত্য, কুসংস্কার ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষে নবযুগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সংগ্রামে তাঁহার প্রধানতঃ অস্ত্র ছিল জ্ঞান ও যুক্তি। দুর্বল বিচারবর্জিত ভক্তি বা অন্ধ বিশ্বাসকে রামমোহন কদাপি সহ্য করেন নাই। বর্ত্তমানে আমাদিগের জাতীয় জীবনে পুনরায় জ্ঞানবিচারের সংস্রববর্জিত অন্ধ বিশ্বাস ও আচারপরায়ণতার আধিক্য ঘটিতেছে এবং বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক সংকটে যুগনায়ক রামমোহনের আদর্শ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে জাতি ক্রমশঃ আরও অধঃপতিত হইবে। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেন—প্রত্যেক যুগেরই মহামানবগণকে বিচার করিবার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। বর্ত্তমান কালে রামমোহনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী প্রতিভা ও নির্ভুল ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ক্রমশঃ বিশ্বে আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে ও পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীগণ তাঁহার জীবন ও কীর্তির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রাচীন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এখন পর্যন্ত যাঁহারা রামমোহনের প্রতিভাকে খর্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা কালের গতিকে রোধ করিবার হাস্যকর ও ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রক্ষিত রামমোহনজীবনীর সুপ্রচুর অনাবিষ্কৃত উপাদানের প্রতি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও বলেন এই সকল উপাদান গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইলে রামমোহন-প্রতিভার নব নব দিগন্ত আমাদিগের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইবে। তিনি তাঁহার গবেষণা-লব্ধ রামমোহন-সম্পর্কিত কিছু নূতন তথ্যাদি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন। সভাপতি তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে রামমোহনের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার অপূর্ব মূল্যায়ন করেন এই উপলক্ষে তিনি রামমোহনের নিন্দা-কুৎসা- প্রচারে রত কতিপয় গবেষকের প্রচেষ্টায় তীব্র নিন্দা করেন ও তাঁহাদের রচনা হইতে নানা নিদর্শন উদ্ধার করিয়া সেসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি আরও বলেন রামমোহন সম্পর্কে নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা যে-সকল গবেষক করিতেছেন—তাঁহাদিগের সময়োপযোগী উদ্যমের ক্ষেত্র যাহাতে সম্প্রসারিত হয় তন্নিমিত্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া কর্তব্য।

দেশ-বিদেশের কথা

বুধ ও শুক্রগ্রহের সন্ধানে

ইউ-এস-আই-এস প্রকাশিত "মার্কিন বার্তা"তে প্রকাশ :-

রাতের আকাশে মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহাদি সম্পর্কে নানা গবেষণার কাজে এই নক্ষত্র ও তারকারাজি এখন বিজ্ঞানীদের প্রভূত সাহায্য করছে। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও পৃথিবীর বিবর্তন, পৃথিবীর সম্পদ ও সমস্যা, ভূমিকম্প, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য সমুদ্রবিজ্ঞানী, আবহবিদ ও ভূতাত্ত্বিকদের সরাসরি পৃথিবীর ওপরই নির্ভর করতে হত।

কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণা এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখন পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণার কাজে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে তুলনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এমনিভাবে জন্ম নিয়েছে এক নতুন বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সহায়তার জন্য এদের সঙ্গে সম্প্রতি আরও দুটি গ্রহ যুক্ত হচ্ছে। এ দুটি হল শুক্রগ্রহ ও বুধগ্রহ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ৩রা নভেম্বর এই দুটি গ্রহ অভি-মুখে একটি মেরিনার মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেছেন।

এই মেরিনার-১০ মহাকাশযানটি এই সর্বপ্রথম একটি গ্রহের অভিকর্ষ শক্তির সাহায্য নিয়ে অপর একটি গ্রহা-ভিমুখে চালিত হওয়ার পথ প্রস্তুত করে নেবে। শুক্র-গ্রহের অভিকর্ষ মহাকাশযানটির গতিবেগ হ্রাস করবে এবং এর গতিপথ বুধের দিকে ঘুরিয়ে দেবে। মেরিনার ১০ ১৯৭৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ৫,০০০ কিলোমিটার (৩,০০০ মাইল) উঁচু দিয়ে শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করবে এবং সব দিক অনুকূল থাকলে ২৯শে মার্চ বুধকে ১০০০ কিলোমিটার (৬০০ মাইল) দূরত্বের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে যাবে।

মেরিনার-১০ মহাকাশযানের মধ্যে থাকছে দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা সমেত ৭টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। এরা গ্রহ দুটির ৮ হাজার বা তারও বেশি আলোকচিত্র গ্রহণ করবে। টেলিভিশন ক্যামেরাগুলি দূরবীক্ষণ সমন্বিত। এর ফলে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা বুধের পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য দেখতে পারবেন। এইভাবে বুধের পৃষ্ঠদেশের মানচিত্রও প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য যে সকল যন্ত্রপাতি মেরিনারে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রহাদির নিকটবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র ও প্লাজমা ক্ষেত্র পরিমাপক যন্ত্রগুলি। একটি ইনফ্রারেড রেডিওমিটার তাপমাত্রা পরিমাপ করবে এবং দুটি অলট্রা ভায়োলেট যন্ত্র গ্রহ দুটির আবহমণ্ডলের খোঁজ-খবর নেবে। গ্রহদুটির ভর (mass), অভিকর্ষ, অভ্য-ন্তরীন উপাদান এবং ঘনত্ব নির্ধারণের জন্য রেডার ব্যবহার করা হবে।

শুক্র হল পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। এর আয়তনও পৃথিবীর প্রায় সমান। শুক্র সম্পর্কে গ্রহবিজ্ঞানীদের তাই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে;

শুক্র মেঘের ঘন আবরণে ঢাকা। ফলে এর পৃষ্ঠদেশ অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এই মেঘের স্তরগুলি শুক্র পৃষ্ঠের ৬০ কিলোমিটার বা ৩৬ মাইল উর্ধ্বে বিস্তৃত রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মেঘস্তরগুলি কিন্তু মাত্র ১০ কিলো-মিটার বা ৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। শুক্রের মেঘের উপাদান ও গতিবেগ রহস্যাবৃত। মেরিনার-১০-এর যন্ত্র-পাতিগুলি এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে। ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত যন্ত্রপাতি সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, শুক্রের মেঘের উপরের স্তরটি সর্বদাই এক কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে ও নীচে চলাচল করে। শুক্রের মেঘের সর্বোচ্চ স্তর পৃথিবীর মেঘের সর্বোচ্চ স্তরের মতই ঠাণ্ডা। প্রায় শূন্য ডিগ্রীর নীচে ৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর তাপমাত্রা। কিন্তু শুক্রগ্রহে মেঘস্তর থেকে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে গেছে। শুক্র-

পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হবে ৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই প্রচণ্ড তাপে অধিকাংশ খনিজপদার্থই গলে যায়। শুক্রপৃষ্ঠের আবহাওমণ্ডলের চাপ পৃথিবী অপেক্ষা শতাধিক গুণ বেশি।

শুক্র তার মেরুরেখার ওপর প্রতি ২৪৩ দিনে একবার আবর্তিত হয় এবং প্রতি২২৫ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবী যে দিকে ঘোরে শুক্রের গতি তার বিপরীত দিকে। তাই শুক্রের একটি দিন পৃথিবীর ১৫ দিনের সমান।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সঙ্গে শুক্রের আবহমণ্ডলের কোনও অমিল নেই। শুক্রের আবহমণ্ডল শতকরা ৯০ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে গঠিত। এতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ভাগ খুবই কম কিন্তু এই শেষোক্ত দুটিই পৃথিবীর আবহমণ্ডলের প্রধান উপাদান। শুক্র-গ্রহে কিছু জলীয় বাষ্প আছে। জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশসংস্থা আর আই রসুল হিসাব করে দেখেছেন যে শুক্রের আবহমণ্ডলে যত জলীয় বাষ্প আছে তা একত্রিত করে জলে পরিণত করা হলে এবং সেই জল সমস্ত শুক্রপৃষ্ঠব্যাপী সমানভাবে প্রসারিত হলে যে সমুদ্র সৃষ্টি হবে তার গভীরতা হবে মাত্র ১০ সেন্টিমিটার। কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্রগুলির জল যদি পৃথিবীপৃষ্ঠব্যাপী সমানভাবে প্রসারিত করা হয় তাহলে তার গভীরতা হবে তিন কিলোমিটার।

শুক্রের ঘন আবহমণ্ডল উত্তাপকে ধরে রাখে। ফলে শুক্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা শুক্রের মেঘের মধ্যে ছিদ্র পাবেন বলে আশা করছেন, যাতে এই সকল ছিদ্রপথের মধ্যে দিয়ে তাঁরা মেরিনার-১০-এর ক্যামেরার সাহায্যে শুক্র-পৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এর সম্ভাবনা যে খুব বেশি তা নয়। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টি-টিউট অব টেকনোলজির ডঃ ব্রুস মারে বলেন: "শুক্রপৃষ্ঠ দেখতে পাওয়া গেলে তা একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।"

পৃথিবী ও শুক্র এই দুটি গ্রহের আয়তন ও ওজন প্রায় সমান। আদি সৌর নীহারিকায় প্রায় একই সময়ে অনুরূপ উপাদান থেকেই উভয়ের জন্ম। সূর্য থেকে দুয়েরই দূরত্ব প্রায় সমান। তবুও এ দুটি কেমন করে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক গ্রহে পরিণত হল? এসম্পর্কে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, মেরিনার-১০ অভিযানের ফলে হয় সেগুলি সমর্থিত হবে, নতুবা সেগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

সূর্যগ্রহ

বুধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অল্প। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট জি ষ্ট্রম বলেন, "সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটোর কথা বাদ দিলে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম

তথ্য জানা গেছে বুধ সম্পর্কে। মেরিনার-১০ হল প্রথম মহাকাশযান যা বুধে যাচ্ছে। আর এক কথা, ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য ও সূর্যের অতি নিকটে অবস্থানের জন্য বুধ সম্পর্কে পৃথিবী থেকে পর্যালোচনা চালানো কঠিন। বুধ হল সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। আটলান্টিক মহাসাগর যেখানে সবচেয়ে প্রশস্ত তাহার দৈর্ঘ্য যতখানি, বুধের ব্যাস তার চেয়ে বেশি নয়। ঘড়িতে একটা বাজলে তার কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণটি যত ডিগ্রীর হয়, বুধ ও সূর্যের মধ্যে অনুরূপ রেখাদ্বয় কল্পনা করে নিলে যে কোণ সৃষ্টি হবে তা তার চেয়েও ছোট হবে। তীব্র সূর্যালোক সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বুধগ্রহকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা খুব বেশি সফল হন নি। বুধের পৃষ্ঠদেশে মোটা, কালো দাগমাত্র দেখা গেছে।

তবুও বুধকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলে সৌরজগতের অনেক রহস্যের কিনারা করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। বুধ ক্ষুদ্রতম গ্রহ হলেও এর ঘনত্ব সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি।

বুধ সম্পর্কে খুব কমই জানা আছে, যেটুকু জানা গেছে তাও অতি সম্প্রতি। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল সূর্যের কক্ষপথে বুধ যে বেগে ঘোরে নিজের অক্ষরেখায় চারদিকে সে সেই একই গতিবেগে ঘোরে, অর্থাৎ প্রতি ৮৮ দিনে একবার। এ থেকে মনে হয় চাঁদের মুখ পৃথিবীর দিকে যেভাবে রয়েছে বুধের একটি দিকও সর্বদাই সূর্যের দিকে রয়েছে সেইভাবেই। অবশেষে ১৯৬৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা রেডারের সাহায্যে এই তথ্য নির্ধারণে সক্ষম হলেন যে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বুধ প্রতি ৫৮ দিনে একবার আবর্তিত হয়। অর্থাৎ, সূর্যকে দুবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার মধ্যে বুধ নিজের অক্ষরেখায় তিনবার আবর্তিত হয়।

এই ঘূর্ণাবর্তের জন্য বুধে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ৬২৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে এবং রাত্রে তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২৫০ ফারেনহাইটে।

বুধগ্রহের আবহমণ্ডল বা চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। এ ছাড়া সূর্যের সন্নিকটবর্তী এই বিস্ময়কর গ্রহটি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা নেই। আশা করা যাচ্ছে মেরিনার-১০ অভিযানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটবে। মঙ্গল যেমন পৃথিবীর অনেক পরিচিত ও আপন হয়ে উঠেছে, মেরিনার অভিযানের দৌলতে বুধও অচিরেই সেইরকম পরিচিত হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৮০

৪র্থ সংখ্যা

অতি আবশ্যকীয় কার্য্য কে করিবে

সমাজে বহুলোকের বাস। এই সকল লোকেরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বহুদ্রব্য ও সেবা-সাহায্য সর্ব্বদাই আহরণ করিতে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই সচেষ্ট থাকেন। খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি, বাসস্থান ও তৎসহিত আসবাব, শয্যা, পরদা, বাসন, ভোজন পাত্রাদি; শিক্ষার জন্য পুস্তক ও অপরাপর সরঞ্জাম, রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি; যাতায়াতের জন্য যান-বাহন, উপার্জ্জনের সহায়তার জন্য যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি সকল কিছুই বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মশক্তি ও কার্য্যকৌশল ব্যবহারে মানুষের নানান্ অভাব দূরীকরণের সাহায্য করেন সেই সকল ব্যক্তির জ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশললব্ধ বস্তু উৎপাদন শক্তি বা অপর অভাবমোচনকারী সুবিধা সৃজন ক্ষমতা ব্যবহার করাও সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের নিকট একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এখন বিচার্য্য কথা এই যে, যাহা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সকল বস্তু বা সেবা-সাহায্য সমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে সরবরাহ করিবে কে? আজকালকার চলিত রীতি পদ্ধতি যাহারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নির্ণয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে জনসাধারণের যাহা কিছু পাওয়া নিতান্তই আবশ্যক সেই সকল অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বা সেবা-সাহায্য ব্যক্তিগত ব্যবসার ভাণ্ডার হইতে পাইবার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে; কেননা ব্যক্তিগতভাবে নিজলাভের জন্য যাহারা ব্যবসা করেন তাঁহারা ক্রেতাকে ঠকাইয়া শোষণ নীতি অনুসরণে নিজেরা ফাঁপিয়া উঠিতেই সচেষ্ট থাকেন। "সর্ব্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্ব্বাধিক লাভ" কি ভাবে হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামান তাঁহারা দরকার মনে করেন না। সুতরাং ব্যক্তিগত ব্যবসার হাত হইতে সমাজের সাধারণকে বাঁচাইবার জন্য উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতির ভার যদি সমষ্টিগতভাবে লইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে শোষণ আর থাকিবে না, ক্রেতা প্রবঞ্চনার আক্রমণে আর্থিক লোকসানের আঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইবেন না ও সকলেরই পক্ষে সর্ব্বাধিক লাভজনক ভাবে জীবন

যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হইবে। সমাজের জনগণের সুখ সুবিধাই যদি অর্থনীতির লক্ষ্য হয়, ব্যক্তিগত লাভের জন্য যদি সেই সুখ সুবিধা হ্রাস হয় তাহা হইলে বিচার করিতে হইবে সুখ-সুবিধা যাহাতে বৃদ্ধিলাভ করে তাহাই অর্থনৈতিক আদর্শ অথবা ব্যক্তিগত লাভ উড়াইয়া দেওয়াই আসল কথা। অর্থাৎ যদি ব্যক্তিগত লাভ বজায় রাখিয়াই সামাজিক সুখ-সুবিধা অধিকতম হইতে পারে এবং ব্যক্তিগত লাভ নাকচ করিতে গিয়া যদি জনসাধারণের সুখ-সুবিধা আহত হয় তাহা হইলে সমষ্টিবাদের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনসাধারণের ক্ষতি করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসার উচ্ছেদ বুদ্ধির কার্য্য বিবেচিত হইতে পারে কি না?

আর একটা কথা হইল যে অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যাহাতে যথাযথভাবে সরবরাহ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাই অর্থনীতির বিশেষ উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায় যে সমষ্টিগতভাবে সরবরাহকার্য্য প্রকৃষ্টতরভাবে সুসাধিত হইতেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাহা হইতেছিলনা, তাহা হইলে সমষ্টিবাদের সপক্ষেই জনমত যাইবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সমষ্টিগত ব্যবসা জনসাধারণের দ্রব্যাদি প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন ও বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং সরবরাহ হইলে পরেও তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যেই হইতেছে; তাহা হইলে জনসাধারণ সমষ্টিবাদের সমর্থন করিবেন কি না? ব্যক্তিকে জরিমানা করা যায় ও তাহাকে মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য করা যায়; কিন্তু সমষ্টি, সমাজ বা জাতি যেখানে "সরকারী" ব্যবস্থায় সকল কিছু সরবরাহের ভার লইয়া কোনও কিছুই ঠিক করিয়া করিতে সক্ষম হয় না সেক্ষেত্রে কে কাহাকে কিভাবে উপযুক্তরূপে কার্য্য চালাইতে বাধ্য করিতে পারে? তখন জনসাধারণের একমাত্র স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় থাকে "সরকারী" আমলাগোষ্ঠীর বিতাড়ণ চেষ্টাতে এবং প্রতিনিধি নির্বাচনকালে সরকারী কাঠামোরও আমূল পরিবর্ত্তনে। একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে "সরকার" বা নির্বাচিত প্রতিনিধি পণ্ডিত পাণ্ডাগণ ও তাঁহাদের অনুচর আমলার দল যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন যাহাতে তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণ হইতে না পারে। তাঁহারা যে জাতীয় আদর্শ ও জনমঙ্গল রক্ষার জন্য সবিশেষভাবে সচেষ্ট এবং তাঁহাদের সমালোচকগণ যে জন স্বার্থবিরোধী দুর্নীতি প্রতিষ্ঠাকারী বিপ্লব পথযাত্রী সমাজশত্রু ইহাই জোরগলায় প্রচার করিয়া তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়া থাকেন। যেখানেই সম্ভব তাঁহারা ঐ সমালোচকদিগকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বা অপরভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের বিরুদ্ধপক্ষকে শক্তিহীন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে অবশ্য তাঁহাদের একটা বড় বাধা হইল তাঁহাদের নিজেদের অক্ষমতা। যদি দেখা যায় যে তাঁহারা, অর্থাৎ সমষ্টিবাদের সমর্থক রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্ম্মীগণ যাহাই স্পর্শ করেন তাহাই অচল হইয়া উঠে, সকল কিছুর সরবরাহ কমিয়া যায় এবং মূল্য অকারণে বাড়িয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে অকর্মাদিগের আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অটল রাখিবার একমাত্র উপায় হয় অদূর ভবিষ্যতকালে কি কি মহা লাভের কার্য্য তাঁহারা করিবেন তাহার বর্ণনা ক্রমাগত আবৃত্তি করাতে। এখন যদিও ঠিকভাবে আলো না জ্বলে তাহার কারণ হইল শীঘ্রই সব কিছু যাহাতে আলোয় আলোকময় হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে সকলেই অতিমাত্রায় কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। খাদ্যাভাব হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র; শীঘ্রই সে অভাব কাটিয়া গিয়া খাদ্যভাণ্ডার অফুরন্ত রূপ ধারণ করিবে। বিদেশী মুদ্রা নাই বলিয়াই অনেক দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইতেছে না; কিন্তু যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাতে অতি শীঘ্রই আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া বিদেশী মুদ্রা প্রবল বন্যায় আমাদের তহবিল ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। প্রতিশ্রুতি, আশা প্রদর্শন ও ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন হইবে অক্ষম বক্তৃতাবাজদিগের শেষ সম্বল। ইহা ব্যতীত কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থা ফল প্রসূও হইতে দেখা যায় এবং সমষ্টিগত পরিচালনা এখানে ওখানে লাভ দেখাইতেও পারে। সেই সকল

ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ব্যবসায়ের গুণের কথা সকল কৃপণতা ভুলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া আমরা সমষ্টিবাদের প্রতিষ্ঠা আরও জোরাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবে জাতীয় ব্যবসার হিসাবপত্র পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে লাভ বহুস্থলেই হয় না। লোকসান কোথায় কেন হইতেছে তাহার সম্যক আলোচনা করা কঠিন কেননা "সরকারী" কর্মচারীগণ সর্বদাই পরস্পরকে বাঁচাইয়া চলেন এবং "সরকারী" কার্য্য পরিচালনা করিতে যে সকল তাঁবেদার নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের মুরুব্বির জোর সর্বদাই বিশেষ ভাবে থাকিতে দেখা যায়। এই সকল তথাকথিত "বিশেষজ্ঞ"দিগের অজ্ঞতা যখন প্রবল শক্তিতে সক্রিয় হইয়া উঠে ও তাঁহাদিগের আত্মম্ভরিতা যখন মুরুব্বিদিগের সহায়তায় তাঁহাদের যথেচ্ছাচারে নির্ব্বিরোধ সাহায্য পাওয়াইয়া দিতে থাকে; তখন "সরকারী" তাঁবেদার পরিচালিত ব্যবসায় ভবিষ্যৎ ক্রমে ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

আমরা সর্বদাই শুনি যে "মনোপলি" অথবা একাধিপত্য বড়ই দোষাবহ ব্যবস্থা এবং যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একাধিকারী ব্যবসাদারদিগের কবলে পড়িয়া রহিয়াছে সেই সকল ব্যবসা দ্বারা জনস্বার্থ কদাপি রক্ষিত হইতে পারেনা। একাধিকারী ব্যবসাদারগণ প্রথমতঃ সরবরাহ কমবেশী করিয়া বাজার ইচ্ছামত ওঠান-নামান করিয়া ক্রেতাদিগকে নিজেদের ক্রীড়নকে পরিণত করেন এবং ইহার উপরে দ্রব্যের বা সেবা-সাহায্যের সরেস নিরেস গুণাগুণ যথেচ্ছা পরিবর্তন করিয়া সমাজকে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজেদের লাভের আয়োজন করেন। মূল্যবৃদ্ধিও তাঁহারা যথাসাধ্য করিতে দ্বিধা করেন না। একাধিপত্য তখনই উত্তম হইতে পারে যখন তাহা জনহিতার্থে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা শুধু হইতে পারে যদি সমাজ ব্যবসায় নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর মঙ্গল সাধন চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমষ্টিবাদের নামে বৃহৎ বৃহৎ একাধিপত্য সৃষ্ট হইলেও জনমঙ্গল সাধন চেষ্টা তাহার মধ্যে অনেক সময়েই লোপ পাইয়া সাধারণকে যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে নিকৃষ্ট সেবা-সাহায্য বা বস্তু ক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। রেল জাহাজ পরিবহন; ডাক তার বেতার; শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সরকারীভাবে পরিচালিত কারখানা প্রভৃতির বিলিব্যবস্থা উত্তম করিয়া পরীক্ষা করিলেই এই কথা সাক্ষাৎভাবে দেখা যাইবে যে সরকারী অতিবৃহৎ একাধিপত্য সৃষ্টি করিলেই জনসাধারণের স্বার্থ যথাযথ সংরক্ষণ সাধিত হয় না।

রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের ও তাঁহাদের পোষ্য তাঁবেদারদিগের পোষণ ও জনসাধারণকে শোষণ সকল সময়েই তাল রক্ষা করিয়া একত্র অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহা যে শুধু ভারতবর্ষেই হয় তাহা না নহে; যে সকল দেশেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা উপযুক্ত হস্তে কেহ স্থাপন করে নাই এবং জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় দলের কারসাজি বুঝিয়া চলিতে অক্ষম, সেই সকল দেশেই এই সকল অন্যায় ঘটিতে পারে ও সহজেই ঘটিয়া থাকে।

আরব-ইহুদী যুদ্ধ

এবারে যখন আরব-ইহুদী সংঘাত আরম্ভ হয় তখন তাহার সূত্রপাত হয় মিসর ও সিরিয়ার তরফ হইতে। মিসর রুশিয়ার নিকট হইতে নূতন নূতন নানা প্রকার রকেট জাতীয় অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ইসরায়েল পরাজয়ের পক্ষে স্থির নিশ্চয়ভাবে যথেষ্ট মনে করিতে আরম্ভ করে ও ইসরায়েলকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইতে থাকে। মিসরকে রুশিয়া যে সকল অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিল সেগুলি ট্যাঙ্ক ও বিমান ধ্বংস করিবার কার্য্যে অব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং মিসর যখন হঠাৎ ইসরায়েলের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে তখন প্রথমে তাহারা অনেকগুলি ইসরায়েলের ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধ বিমান নষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে কিন্তু ইসরায়েলের পরাজয় ঘটে নাই। ইহুদী সৈন্যবাহিনী বহুস্থলেই আরবদিগকে হটাইয়া দিয়া তাহাদের দখলের সীমানা অতিক্রম করিয়া তাহাদের দেশে

অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। সিরিয়া ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কোনও বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। তাহারা রুশিয়ার নিকট নূতন রকেট অস্ত্র জোগাড় করা এবং তাহার ব্যবহার শিক্ষা কোন কিছুই মিসরের তুলনায় ব্যাপকভাবে করিতে সক্ষম হয় নাই। এই কারণে ইসরায়েলের ট্যাঙ্ক ও বিমানগুলি সিরিয়াকে আক্রমণ করিতে গিয়া সেই রূপ বাধা পায় নাই যাহা মিসরের যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের ক্রমাগতই অগ্রগমনে প্রতিবন্ধক হিসাবে লক্ষ্য করিতে হইয়াছিল। রুশিয়া সিরিয়াকে ততটা সাহায্য কেন করে নাই কিম্বা সিরিয়া সাহায্য গ্রহণে সক্ষম কেন হয় নাই প্রভৃতি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া এখন আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। সিরিয়াতে ইসরায়েল সহজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল এবং মিসরের সহিত যুদ্ধে তাহাদের সামরিক শ্রেষ্ঠতা সেরূপ সহজে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই কথাই হইল যুদ্ধের সকল বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করিবার পরে অনুসন্ধান লব্ধ সিদ্ধান্ত। ইসরায়েলের প্রধান সেনাপতি মোশে দায়ান যুদ্ধ নিবৃত্তির পরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও মনে হয় যে তাঁহার এই যুদ্ধের পরে আর পূর্বের ন্যায় মিসরের সংগ্রামশক্তি সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাব ছিল না। কিন্তু সিরিয়াকে তিনি পূর্বেরই মত হেয় জ্ঞান করিতে থাকেন।

শিক্ষা ও চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে এইবারে একটা বিষয় উত্তম-রূপে প্রমাণ হইয়াছে। সে বিষয়টি হইল শিক্ষা ও চেষ্টার মাহাত্ম্য। যে আরবগণ পূর্বে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও আজকালকার যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ত করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই অপারগ ছিল ও যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা ইহুদী-দিগের সহিত সংগ্রামে কোনও ভাবেই সমকক্ষ ছিল না, আজ তাহারা শিক্ষা ও চেষ্টার ফলে যুদ্ধ কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ সক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে। এইবার যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মিসরের সৈন্যগণ পূর্বের তুলনায় মহাকৌশলে আধুনিক রকেট চালিত অস্ত্রের সাহায্যে ইসরায়েলের ট্যাঙ্কবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করে এবং প্রথম কয়েক দিবসের যুদ্ধেই ইসরায়েল বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক হারাইয়া একাধারে হৃত-গৌরব ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। ইসরায়েল বাধ্য হইয়া নিজের বিমানবাহিনীকে প্রাণপণ ও অশেষ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ দিয়া মিসরের রুশিয় রকেট আক্রমণ কোনও মতে কিছুটা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে সক্ষম হ'ন। শুনা যায় যে ঐ প্রকার প্রাণান্তপরিচ্ছেদ করিয়াও ইসরায়েলের বহু ট্যাঙ্ক সুয়েজখালের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিনষ্ট হইয়াছে। মিসরের সেনাগণ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত অক্লান্তভাবে রুশিয়ার অস্ত্র চালনা শিক্ষক-দিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিত যাহাতে কোনও সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা আশু শীঘ্র রকেট নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর ট্যাঙ্ক অথবা আকাশে অনুচ্চভাবে ধাবমান বিমান ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। বংশগত বৎসরের আড়ষ্টভাব ও জড়তা সহজে দূর হয় না। বহু চেষ্টা ও একটানাভাবে অভ্যাস করিয়া চলিলে তবেই হয়ত সে জড়তা ধীরে ধীরে কাটিয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা, চেষ্টা ও অভ্যাস সমানে চালিত রাখিয়া অগ্রসর হইলে, তবেই সফলকাম হওয়া সম্ভব হয়। মনে, প্রাণে বা কার্য্যে কোনও শৈথিল্য যদি শিকড় গজাইতে পারে তাহা হইলে আর সফলতা লাভ সম্ভব হয় না। মিসরের মানুষ যাহা করিয়া দেখাইয়াছে তাহা উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমর বা অপর সকল কার্য্য ক্ষেত্রেই সকল জাতির মানুষ উন্নতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা

কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থলেও প্রত্যহ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চার হইতে আট ঘন্টা অবধি বিদ্যুৎ সরবরাহ কাটিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কেন হইতেছে সে সম্বন্ধে খুচরা খুচরা মন্তব্য মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে, প্রকাশিত হয় বটে কিন্তু তাহা বিষয়টার সম্বন্ধে কোন ব্যাপক অনুসন্ধানলব্ধ

যথার্থ তথ্যের বিজ্ঞপ্তি নহে বলিয়া জনসাধারণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, যে আলো, পাখা ঠাণ্ডা আলমারি ও সকল প্রকার বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রাদি বন্ধ হইয়া যাওয়াটা থামান যাইলেও থামান হইতেছে না। সকলেরই মনে এই বিশ্বাসটাই দৃঢ়মূল ভাবে স্থায়ীরূপ ধারণ করিতেছে যে যাহারা বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাযথ পরিমাণে সঞ্চালিত রাখিতে পারেন তাঁহারা তাহা যে সকল কারণে রাখিতেছেন না তাহা পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণকে জানান হইতেছে না। ইহার কারণ এই বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতির কারণের তালিকাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য নানান্ সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিলি ব্যবস্থার ত্রুটি প্রকট-ভাবে লিখিত থাকার সম্ভাবনা থাকাতে কোন ব্যাপক অনুসন্ধান করা হইতেছে না। জনসাধারণের ধারণা এই যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কিছু একটা কঠিন কার্য্য নহে। কয়লা জ্বালাইয়া জলবাষ্প সৃজন ও ঐ বাষ্পশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বসান অতি সহজ কার্য্য। ইহার প্রায় সকল যান্ত্রিক অবয়বই ভারতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং তেল নাই, যন্ত্র নাই, যন্ত্রাংশ নাই প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া কেহ নিজের দায়িত্বভার অপসারণে সক্ষম হইতে পারেন না। ভারতবর্ষে অসংখ্য বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই সকল কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা আছে লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীর ও যন্ত্রবিদের। ইহা নাই উহা নাই বলিয়া আসল কথাটাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া এ ক্ষেত্রে ততটা সহজ হইবে না; যদি না সরকারীভাবে বিষয়টাকে জাতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয়তার তালিকায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য। ভারতবর্ষে তাহা যতটা আছে তাহাও যদি সমাজ পরিচালকদিগের গাফিলি ও অক্ষমতার জন্য কার্য্যকরী না থাকে তাহা হইলে ঐ সমাজ নিয়ন্ত্রণকারকদিগের উপর দেশবাসী আর কোন ভরসায় আস্থা রাখিয়া নিষ্ক্রিয়-ভাবে সকল অভাব সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

হাঁড়ি চড়ানোর প্রতিবন্ধক

কঠিন হইলেও কোনও মতে দুই মুঠা চাল সংগ্রহ করা যায় এখনও। কিন্তু চাল, ডাল জুটিলেই ত আর খাওয়া হয় না। মধ্যের আর একটা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য না করা পর্য্যন্ত ভোজন কখন সম্ভব হয় না। ইহা হইল রন্ধন অথবা চলিত ভাষায় হাঁড়ি চড়ানো! আগুন জ্বালাইয়া তাহার উপর রন্ধন পাত্র স্থাপন করিয়া রন্ধন বস্তু জলে সিদ্ধ অথবা তৈলে ভর্জ্জন ইত্যাদি করা হইয়া থাকে। আধুনিক প্রথায় অনেকে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারেও রন্ধন করিয়া থাকেন। কাষ্ঠ অথবা কয়লার আগুন সচরাচর সবত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সহরে কয়লার, গ্যাস ব্যবহারও হয়। এবং কেরোসিন তৈল ব্যবহারও সহরে ও গ্রামে বহুল প্রচারিত আছে। এখন দেখা যাউক চাল, ডাল সংগ্রহের পরে রন্ধন কি করিয়া করা যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৈদ্যুতিক শক্তি আজকাল সহজলব্ধ নহে এবং তাহা ঘণ্টায় কুড়ি মিনিট সচরাচর বন্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অতি আধুনিক প্রথায় বিদ্যুৎ ব্যবহার রন্ধন কার্য্যে এখন প্রায় অসম্ভব। ইহার পরে যদি গ্যাসের ব্যবহার চেষ্টা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে সপ্তাহে পাঁচদিন গ্যাস পাওয়া যায় না। যাহারা সিলিণ্ডারে গ্যাস ক্রয় করেন তাঁহারাও আজ গ্যাস চাহিলে তাহা দশ দিন পরে পাইয়া থাকেন। গ্যাসে হাঁড়ি চড়ানো তাহা হইলে চলিবে না। কেরোসিন ক্রয় করিতে হইলে আজকাল দীর্ঘ "কিউ" শ্রেণীতে ধরণা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। তৎপরে হয়ত অধিক মূল্যদিয়া কালোবাজারে জল মিশ্রিত কেরোসিন ক্রয় করিয়া আনিয়া রন্ধন চেষ্টা করিতে হয়। জল থাকায় অনেক সময় মধ্যপথে "ষ্টোভ" নিভিয়া যায় ও রন্ধন পুরাপুরি হয় না। অতঃপর বাকি থাকে কাষ্ঠ ও কয়লা। কাষ্ঠের কথা ভুলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য কারণ, কাষ্ঠ পাওয়াও যায় না এবং তাহার মূল্যও

বন্ধ হচ্চে। কয়লা এক প্রকার ভালই ছিল কিন্তু কয়লার খাদগুলিকে "জাতীয়" করিয়া লইবার পর কয়লার সরবরাহ ও মূল্য উভয়ই ক্রেতাদিগের পক্ষে সহজ আহরণের সীমা ছাড়াইয়া প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতার চরমে পৌঁছাইয়াছে।

গণতন্ত্র জনহিতের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার কি না

কিছুকাল হইতেই দেশবাসীর মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন-চিন্তা করিতে সক্ষম তাঁহাদের মধ্যে গণতন্ত্রের কার্যকরী ক্ষমতা লইয়া সপক্ষে বিপক্ষে নানা কথা বলার একটা নূতন ধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা গণতন্ত্র বিরোধী এই নূতন ঢং এর আলোচনার সৃষ্টি তাঁহারাই প্রধানত করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা গণতন্ত্র সমর্থকতাঁহারা ঐ রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির সপক্ষে যাহা বলা প্রয়োজন মনে করেন তাহা বলিয়া আলোচনার শাখা প্রশাখা বিস্তারে সাহায্য করেন। এই আলেচনার দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল আদর্শগত বিচারের দিক : অর্থাৎ শাসন-ক্ষেত্রে যাঁহারা শাসিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সমর্থনে শাসন পরিচালনা শ্রেয় অথবা শাসিত ব্যক্তিদিগকে পূর্ণরূপে সকল কথা না বলিয়া একদল শক্তিমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞান ও বিচার অনুসারে শাসন কার্য পরিচালনাই অধিক ন্যায়সাপেক্ষ, ইহা স্থির করাই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই দিক হইতে দেখিলে ব্যক্তির স্বায়ত্ব শাসন অধিকারে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই বলিবেন গণতন্ত্র শ্রেয়। ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিয়া শাসকদিগের দলের বিরোধের অধিকার না দিয়া যদি একনায়কত্ব বা একমাত্র দলের শাসন অধিকার মানিয়াই রাষ্ট্র পরিচালনা সাধিত হয় আদর্শের দিক হইতে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে আসিলে শুনিতে হয় যে কার্যত গণতন্ত্র ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় পূর্ণরূপে সমর্থ নহে, কারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহারা ভোট দিয়া গণতন্ত্র চালনা করে তাহারা রাষ্ট্রীয় দল বিশেষের শাসন অধিকার উত্তমরূপে বিচার না করিয়াই মানিয়া লইয়া থাকে ও সকল ব্যক্তির সাক্ষাৎ-ভাবে বুঝিয়া শাসন কার্যে সহায়তার কথাটা একটা কাল্পনিক অবস্থার কথা মাত্র। বস্তুতঃ গণতন্ত্রে ব্যক্তির জাগ্রত সমর্থন স্বপ্ন বলিয়াই ধার্য হইতে পারে। ইঁহারা এই সূত্রে একথাও বলিয়া থাকেন যে একনায়কত্ব বা এক ক্ষুদ্র গণ্ডির শাসন অধিকার সমাজ ও ব্যক্তিকে অনেক অধিক সাহায্য করিয়া উন্নতির পথে চলিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিত্বের প্রসার ব্যবস্থা করে যদি কোথাও তাহা না হয় তাহা হইলে তজ্জন্য ঐ প্রকার শাসন নীতি ও পদ্ধতি দায়ী নহে, দায়ী সমাজ বিরোধী কোন কোন মানুষ। এবং সেরূপ অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উত্তরে বলা যায় যে গণতন্ত্র যখন ব্যক্তিত্বের অধিকার খর্ব করিয়া চালিত হয় তখনও সেইরূপ অবস্থার জন্য গণতন্ত্র দায়ী নহে, দায়ী কোনও অপরাধপ্রবণ রাষ্ট্রীয় দলের নেতা ও তাঁহাদের অনুচরগণ। বহু দেশে যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও সুচালিত আছে সেখানেব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা আমরা যাহা বর্তমান থাকিতে দেখি, তাহার তুলনায় একনায়কত্ববাদী দেশগুলিতে সমান স্বাধীনতা বা সুখ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে উন্নততর দেশগুলিতে যেরূপ ভাবে ব্যক্তিকে দুর্ঘটনা, রোগাক্রমণ, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, বৈধব্য, অনাথ অবস্থা, বেকারত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া অভাবগ্রস্তদিগকে রক্ষা করা হয়; তাহার সহিত সাম্য আমরা একনায়কত্ব চালিত দেশগুলির প্রায় কোনটিতেই দেখিতে পাই না। অনগ্রসর বহু গণতান্ত্রিক দেশে ঐ ব্যবস্থা নাই কিন্তু তাহা অর্থাভাবজনিত—আদর্শের পার্থক্যহেতু নহে।

আর একটা কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। তাহা হইল গণতান্ত্রিক দেশের কোন কোন নেতা ও তাঁহাদের সমর্থকগণের একনায়কত্ববাদের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বেচ্ছাচারের আগ্রহ। কোন কোন নেতা কোন কোন দেশে "ফ্যাশিজম" ঘেঁষিয়া চলিতে চাহিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে গণতন্ত্রের কোন দোষ প্রমাণ হয় না। নেতা-বিশেষের শক্তি-ক্ষুধাই প্রমাণ হয়। একনায়কত্ব ভাঙিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যেমন হইতে পারে, গণতন্ত্র ভাঙিয়া কম্যুনিজম, ফ্যাশিজম প্রভৃতিও তেমনি হইতে

পারে। হইবে কি না তাহা দেশ বিশেষের অবস্থার উপর নির্ভর করে। দারিদ্র্য যেখানে প্রবল এবং জনশিক্ষা সুপ্রসারিত নহে, সেখানে কখন কি ঘটিয়া যাইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। ইহা ব্যতীত বহিঃশত্রুর গুপ্ত কার্য্যকলাপও অনেক সময় বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে। এই সকল কথাই বিচার করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের ভবিষ্যৎবক্তাদিগের চলা কর্ত্তব্য।

বেতন বৃদ্ধি ও মুদ্রার ক্রয়শক্তি হ্রাস

বেতন বৃদ্ধির জন্য যত আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন তাহার মূলে রহিয়াছে ভারতের মুদ্রা রূপিয়া বা টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস। এই ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং আমরা নিজেরাই যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার মধ্যে দুই চারিটি উদাহরণ দিলে অনেকের পুরাণ কথা মনে পড়িবে এবং অল্প বয়স্কদিগের বিষয়টা বুঝিতে সুবিধা হইবে। যথা আমাদেরই মনে পড়ে যে ১৯০৪/৫ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে টাকায় ১৬ সের দুধ পাওয়া যাইত। সে সময় মোটা কোরা কাপড় পাঁচ পয়সা গজ বিক্রয় হইত এবং ১৷৷০ টাকায় এক জোড়া দশ হাত ধুতি পাওয়া যাইত। চাকর বাকরের বেতন তখন মাসে দুই তিন টাকার বেশী হইত না। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরেও চাকর বাকরের বেতন ৮৷০ টাকা হইত। দেড় হাজার টাকায় মোটর গাড়ি বিক্রয় হইত। বাড়ি ভাড়া ছিল মধ্যবিত্তদিগের জন্য ১৫৷২০ টাকা। কলিকাতায় দুধের দাম ছিল টাকায় পাঁচ৷ছয় সের; চাউলের দাম ৩৷৷০/২ টাকা মণ ও ভাতের হোটেলে ৮৷১০ পয়সায় পুরা খাওয়া চলিত। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আরম্ভের পূর্ব্বেও কেরাণীদিগের বেতন হইত মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশেষ করিয়া ১৯৫২৷৫৩ খৃঃ অব্দের পরে মুদ্রাস্ফিতি প্রবলভাবে বাড়িতে আরম্ভ করে এবং দ্রব্য মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় বহু গুণ হইয়া যাইতে থাকে। চাউলের মূল্য, ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বাদ দিয়া দেখিলেও, অনেক গুণ বাড়িয়া যায়; বাড়ি ভাড়া, বস্ত্র মূল্য, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, শাক-সব্জি প্রভৃতিও আকাশে উঠিয়া যায়। কিন্তু শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতির বেতন ৫০ টাকা হইতে ১৫০ টাকাই থাকিয়া যায়। যাহারা পেনশন ভোগী তাঁহাদের আগেকার হিসাবের কম বেশী ১০০ শত টাকা পেনশনে আর এক দুই ব্যক্তির খাওয়ার খরচই চলিত না। যে সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা পূর্ব্বের চাকুরী ১৫৷২০ বৎসর হইয়া গিয়াছিল তাঁহাদের সঞ্চিত "প্রভিডেন্ট" ফাণ্ডের আর কোনও মূল্যই থাকিল না। সঞ্চিত ফাণ্ডের টাকায় সুদে কাহারও ভরণ পোষণ হইবার আশা রহিল না। বর্ত্তমানেও মুদ্রাস্ফিতির গতিবেগ হ্রাস হইলেও থামে নাই। বেতন বাড়ানর সহিত ঐ বিষয়টার একটা ন্যায্য মীমাংসা করা উচিত। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়া যদি স্বর্ণ, রৌপ্য ক্রয় করিয়া রাখা হয় অথবা জমি জায়গা ক্রয় বা গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং দিবার সময় লাভ কি হইয়াছে বিচার করিয়া ফাণ্ড দেওয়া হয় তাহা হইলে হয়ত মানুষের সঞ্চয় হাওয়ায় মিলাইয়া যাওয়া বন্ধ করা যাইতে পারে। বিষয়টি অর্থনীতিজ্ঞদিগের বিশেষ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার বিষয়।

বেতন বৃদ্ধি মুদ্রার ক্রয়শক্তি হ্রাসের কারণে বেতনদাতাদিগকে করিতেই হইতেছে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি সাক্ষাৎভাবে বিশেষ কিছু হইতেছে না। কেন না যাহারা ঠিক যে কাজ করিতেছিলেন বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইয়া তাঁহারা কিছু অধিক কাজ করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না। পরোক্ষভাবে অধিক বেতন পাইয়া তাঁহারা হয়ত অধিক দ্রব্য বা সেবা-সাহায্য ক্রয় করিবেন এবং তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিতেও পারে। কিন্তু সে সকল উৎপাদন বৃদ্ধি যাহা হইবে তাহার তুলনায় বেতন বৃদ্ধি অধিক হইবে এবং তাহাতে মুদ্রাস্ফিতি বাড়িয়া চলিবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং মুদ্রাস্ফিতির চিকিৎসা করিবার ফলে রোগ আরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে তাহা হইলে চিকিৎসা কিভাবে করিলে রোগ প্রশমিত হইবে এবং কোন কুফল ফলিবে না? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সকল দ্রব্য ও ক্রয় যোগ্য সেবা সাহায্য যদি

ক্রমশঃ অল্প মূল্যে বিক্রয়ের দিকে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়, সরকারী লোকসানের খাতায় কর্জ্জা করিয়া যদি সেই ঋণের টাকা রিসার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নূতন মুদ্রা তৈয়ার করিয়া না লওয়া হয়, দেশবাসী যদি অধিক করিয়া সঞ্চয়ের দিকে নজর দেন এবং সকল প্রকার দ্রব্য ক্রয় যথাসম্ভব কম করেন তাহা হইলে মুদ্রাস্ফিতি হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার কথা বলা যত সহজ কার্য্যত করা ততটা অনায়াসসাধ্য নহে। মূল্য বৃদ্ধিও মুদ্রাস্ফিতি পরস্পর সমর্থক এবং মুদ্রাস্ফিতি শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থনৈতিক পন্থা অনুসরণ করিবার ফল। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধিও শাসকদিগের আর্থিক নীতি অবলম্বনের কারণে হইতেছে বলিলে ভুল করা হয় না। মূল্য বৃদ্ধি মানুষের অভাব বৃদ্ধিকর এবং তজ্জন্যই দারিদ্র্য দূর না করিয়া তাহার বিস্তারের কারণ। শাসকদিগের কার্য্য পদ্ধতি তাহার জন্যই দারিদ্র্য নিবারণে অসমর্থ। ভারতবর্ষের শাসকদিগের প্রচারিত আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রের কার্য্য পদ্ধতি তাহা হইলে পরস্পরবিরোধী এবং এই কারণেই যে রীতিনীতি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শাসন কার্য্য চালিত হয় সেই সকলই বর্জ্জন না করিলে আদর্শ রক্ষা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু মনে হয় না যে শাসক গোষ্ঠী নিজেদের ধরন ধারন্ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন অথবা পারিবেন।

শ্রেণী বিপর্য্যয়

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কোন দোকানের সম্মুখে দীর্ঘকায় সরীসৃপের মত একটা শ্রেণীবদ্ধ ক্রেতারদল দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে যে সকল নরনারী উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের দেখিলে অভাবগ্রস্ত মনে হয় না; এবং যে সকল এলাকায় এই সকল শ্রেণী লক্ষিত হয় সে সকল এলাকাও দরিদ্রদিগের নিবাসের এলাকা নহে। একবার অনুসন্ধান করিয়া শুনা যাইল যে ঐ সকল ব্যক্তি পাউরুটি ক্রয় করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। অন্য অন্য স্থলে এইরূপ শ্রেণী গঠিত হয় কেরোসিন অথবা সর্ষপতৈল ক্রয়ের জন্য। কথা হইতেছে যে এইরূপ অভাব হইতেছে কেমন করিয়া? ভারত-সরকার বহুদেশ হইতে নানাভাবে গম ক্রয় করিয়া আনিতেছেন এবং এই দেশেও গম ক্রয়কার্য্য শুনা যায় সবলহস্তে প্রবলভাবেই আয়োজিত হইতেছে। তাহা হইলে কি পশ্চিমবঙ্গে ভারত-সরকার গম পাঠাইতে কার্পণ্য করিতেছেন? শুনা যায় যে গমও সরকারী হস্তে মজুত আছে এবং তাহা এই প্রদেশে আনাও হইতেছে। কিন্তু তৎপরে তাহা না-কি আবার কালো-বাজারের বিক্রয় সামগ্রীরূপে বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইল ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? এই প্রদেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং রেলপথের ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুলিশ পাহারার ধুমধাড়াক্কা এবং বহু বৃদ্ধা ও অল্পবয়স্কা নারীদিগকে প্রত্যহ সম্বল এক পুটুলি চাউল লইয়া যাইবার অপরাধে গ্রেফতার করা হইতেছে; অর্থাৎ এখানে কেহ কোনও কিছুই কোথাও লইয়া যাইলে তাহা সেই মুহূর্ত্তেই পুলিশের নজরে আসিয়া যায়। তাহা হইল বস্তা বস্তা গম কি করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে? যাইতেছে নিশ্চয়ই কেননা গম আসিতেছে অথচ একটা পাউরুটি ক্রয় করিতে হইলে একজনকে দুইঘণ্টা শ্রেণীবদ্ধভাবে ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে। সর্ষপ তৈল ও কেরোসিনই বা পাওয়া যায় না কেন? সর্ষপ তৈল কি এখান হইতে নৌকাযোগে অথবা রেল-গাড়িতে বাংলাদেশে চলিয়া যাইতেছে? লোকমুখে শুনা যায় যে বাংলাদেশে সর্ষপ তৈল খুবই উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষ হইতে না-কি ঐ তৈল অনেকে বেআইনীভাবে পাঠাইয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন। ইহাও ত বন্ধ করা যায়। বিশেষ করিয়া যেখানে শক্তিমান আইন রক্ষকদিগের কোনও অভাব নাই। কেরোসিন সম্ভবতঃ বাংলাদেশে যায় না কারণ, কেরোসিন বাহির হইতে আসে এবং বাংলাদেশ তাহা বাহির হইতে আমদানি করিয়া লইতে পারে। কেরোসিনের অভাবটা তাহা হইলে যথার্থ এবং তাহার প্রতিকার করিতে হইলে তাহার আমদানি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই জন্য বিদেশী মুদ্রা লাগে। ইহার বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করিতে হইলে অর্থনীতিক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যবস্থাপকদিগের আবশ্যক। তাঁহারা কোথায়?

ঐতিহাসিক-কবি কল্‌হন ও 'রাজতরঙ্গিনী'

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক-কবি কল্‌হন এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। বহুখ্যাত 'রাজ-তরঙ্গিণী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁর কবি-প্রতিভা এবং ঐতিহাসিক চেতনা একদা তাঁকে তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতার মহামর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমকালীন যুগে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল যেমন অনন্য, তেমনি কবি হিসেবেও তাঁর বিকাশ ছিল প্রায় একক। এই দু'য়ের পূর্ণতা নিয়েই সাহিত্য-ইতিহাসে কল্‌হনের সর্ব্বাধিক প্রতিষ্ঠা।

প্রাকৃত ভাষায় 'কল্‌হন' শব্দের অর্থ সৌভাগ্যশালী। বলা বাহুল্য কবির এই নাম সর্ব্বার্থ-সার্থক। কারণ জীবদ্দশায় একদা তাঁর ব্যক্তিত্বের ইতিহাস-দুর্লভ মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শীদের অনুভবকে শ্রদ্ধাবনত করেছিল। তাঁর চরিত্রের অতুল্য বৈভব এবং সৃজনশীল প্রতিভা সমকালীন কবি ও ঐতিহাসিকদের প্রেরণাকে করেছিল দীপ্ত-সচল। জীবদ্দশায় এই জাতীয় গুণ-গৌরব সৌ-ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এদিক থেকে কল্‌হন সঞ্জীবনী শুভাদৃষ্টের অধিকারী।

কল্‌হনের আবির্ভাবকাল বা আয়ুষ্কাল সম্পর্কে নানা বৈষম্য ও ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি আনুমানিক তথ্য ভিন্ন এমন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নেই যার সাহায্যে যথার্থ কাল পরিমাণ স্থিরীকৃত হতে পারে। 'রাজ-তরঙ্গিনী' গ্রন্থের শেষার্দ্ধে গ্রন্থকার সম্পর্কে যতটুকু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তার ভিত্তিতে মোটামুটি একটা কালের আভাস পাওয়া গেলেও সেখানে সন তারিখের কোন উল্লেখ নেই। উপরন্তু পরিচয়-লিপিতে গ্রন্থ-কারের বংশপঞ্জী স্বরূপ ঘটনা বিবরণ বা বংশেতিহাস সম্পর্কে এমন কোন বিবৃতি নেই যার সাহায্যে কাল নির্ণয় করার মত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। অতএব কল্‌হনের প্রকৃত আবির্ভাব কাল ও তিরোভাব কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য আজও বিচার-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিদগ্ধ সমালোচক Winternitz-এর মতে, কল্‌হনের জন্মকাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন এক সময়ে১। তাঁর জন্মস্থান এবং পৈতৃক নিবাস ছিল কাশ্মীর দেশে। আবার কোন কোন সমালোচকদের মতে, কল্‌হনের জন্ম-কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। এই মতবাদের সূত্র ধরে প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত অমিত রায় তাঁর 'Kalhana and his Rajatarangini' নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন,—'Kalhana's possible period of birth has been assumed as the beginning of the 12th century' [Amrita Bazar Patrika, Puja Annual, 1970.] অনুরূপ ভাবে 'রাজতরঙ্গিণী' কাব্যের বঙ্গানুবাদক শ্রদ্ধেয় আচার্য্য হরিলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় একটি অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন —'কল্‌হন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন'২। অবশ্য কোন অভিমতই এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য নয়; এর প্রামাণি-কতা ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানা দ্বিধা আছে। তবে 'রাজ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কল্‌হন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী' দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। এর প্রকাশ কাল সম্পর্কে সকল পণ্ডিতেরাই মোটামুটি ঐক্যমত পোষণ করেন৩। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে কল্‌হনের আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কল্‌হনের জন্ম।

সম্ভবতঃ পরিহাসপুর (কাশ্মীর) গ্রামে তাঁর বাসস্থান ছিল। তাঁর পিতার নাম, চম্পক। 'রাজতরঙ্গিণী'র প্রত্যেক তরঙ্গের সমাপ্তিতে তিনি 'অমাত্য চম্পকের পুত্র' বলে নিজের পরিচয় প্রদান করেছেন। চম্পক কাশ্মীর-রাজ হর্ষদেবের (খ্রীঃ ১০৮৯-১১০১) রাজত্বকালে রাজ-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, অনেকের মতে, তিনি হর্ষদেবের মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন৪। কিন্তু Winternitz একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। 'History of Indian Literature' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, চম্পক হর্ষদেবের একজন বিশ্বাসী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন৫। 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক হরিলাল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, হর্ষদেবের শাসনকালের শেষভাগে চম্পক দ্বারপতি রূপে নিযুক্ত ছিলেন। যাই হোক, এ বিষয়ে অল্পবিস্তর মতানৈক্য থাকলেও গ্রন্থকার 'রাজতরঙ্গিণী'র প্রত্যেক তরঙ্গের শেষে নিজেকে অমাত্য-পুত্র বলে পরিচয় দান করেছেন। অমাত্য কখনো দ্বাররক্ষী বা সামান্য রাজ-কর্মচারী হতে পারেন না। অতএব কল্‌হনের পিতা যে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের সময়ে রাষ্ট্র-শাসন বিভাগের অন্যতম মন্ত্রণাদাতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না।

'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের শ্লোকে কল্‌হন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে Winternitz বলেছেন—'He was a devout follower of Saivism'। বিদগ্ধ সমালোচকের এই উক্তিটি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ; কারণ কাশ্মীর একদা শৈব ধর্মের তীর্থস্থান ছিল। আজও সেখানে শৈব ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। সহরতলীর প্রাচীন দেবালয়গুলি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে একদা সেখানে শৈব ধর্ম ও তান্ত্রিক দেহবাদের যথেষ্ট প্রসার ছিল। তান্ত্রিক ধ্যান ধারণা এবং সাধনপদ্ধতির প্রতি তৎকালীন মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে যুগে মানুষ হয়েও তন্ত্রতত্ত্ব বা তান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্রতি কল্‌হনের কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, বিশেষ করে বুদ্ধের অহিংসানীতি তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও কল্‌হন অপর কোন সম্প্রদায়ের ওপর দ্বেষ বা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না; অর্থাৎ তাঁর ধর্ম্মমত সাম্প্রদায়িকত্ব দোষে দুষ্ট ছিল না।

ঐতিহাসিক কবি রূপে আখ্যায়িত হলেও কল্‌হন একজন যশস্বী ঐতিহাসিক। ইতিহাস রচনার মধ্যে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশংসনীয় কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়েও কবি হিসেবে তিনি আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। Winternitz-এর ভাষ্য,—We do not find in him the poetic subtleties of Bharavi and Magha. The amplitude of his task forbade him to undertake any such thing. [History of Indian Literature] Winternitz-এর এই অভিমত সর্ব্বাংশে সত্য নয়। কালিদাসোত্তর যুগের কবি ভারবি এবং মাঘ-এর মত প্রথিতযশা কবি না হলেও কল্‌হন যে অনবদ্য কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কবিকর্মে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ সুলভ। কবি হিসেবে তাঁর মূল্যায়নও স্পষ্ট। তাঁর লেখন-শৈলী যেমন সুন্দর, তেমনি প্রাঞ্জল। 'রাজ-তরঙ্গিণী' স্থিত পদগুলির কাব্যসমুৎকর্ষ ও ছন্দকুশলতা প্রশংসনীয়। ছন্দ, অলঙ্কার, উপমা এবং শব্দ বিন্যাসের বাগ্ বৈদগ্ধ্যে 'রাজতরঙ্গিণী' কাব্যখানি অতুলনীয়। একথা স্মরণ করেই 'A History of Sanskrit Literature-classical' period-এর গ্রন্থকারদ্বয় মন্তব্য করেছেন, The poetic charm of the book is indeed very great! কবির শব্দ ও অলঙ্কার-বিন্যাসের কৌশল অদ্বিতীয়। তাঁর ভাব প্রতীতি যেমন অশেষ, উপমা ও অলঙ্কার-বিন্যাসও তেমনি বৈচিত্র্যময়। বিশেষ করে, অলঙ্কারের প্রয়োগ ও বিন্যাসের কুশলতা যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির সমতুল্য। কবির এই অসাধারণ অলঙ্কার যোজনার ক্ষমতা লক্ষ্য করলে মনে হয়, তিনি বহুখ্যাত 'রাজতরঙ্গিণী' রচনার পূর্ব্বে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া এই দুষ্টিক্ষম

ঐতিহাসিক কাব্য রচনার পূর্ব্বে তিনি তাঁর পূর্ব্বসূরীদের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট রচনা উত্তমরূপে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁদের সাহিত্যগত আদর্শ এবং মৌলিক চিন্তার পোষকতা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'মেঘদূত'; বিলহনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' এবং বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যগুলি তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কলহনের সাহিত্য সাধনার স্বরূপ প্রসঙ্গে Stein বলেছেন,—'His literary training indeed had been of the strictly traditional type and the manner in which he employed it shows no conscious departure from the conventional norm'। এক্ষেত্রে আরও একটি কথা স্মরণীয় যে, কেবল তথ্যসমাকুল ঐতিহাসিক উপাদানই 'রাজতরঙ্গিণী'র একমাত্র সম্পদ নয়, কলহনের কবি দৃষ্টি ও ভাবপ্রতীতি তাঁর রচনাকে শ্রেষ্ঠতার মর্য্যাদা দিয়েছে—তাকে, সুমিত ও হৃদ্য করে তুলেছে। বস্তুত 'রাজতরঙ্গিণী' একটি শান্তরস প্রধান কাব্য। প্রথম শ্রেনীর কাব্য প্রতিভার অধিকারী না হলে 'রাজতরঙ্গিনী'র মত কালজয়ী কাব্য রচনা কলহনের পক্ষে সম্ভব হতনা। এই গ্রন্থের কাব্যগত শিল্প যথার্থ রূপ পেয়েছে বলেই গ্রন্থটি আজও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কলহনের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য আজ সকলের অজ্ঞাত। ডঃ বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে লিখেছেন,—'কলহন কাশ্মীররাজ হর্ষের মন্ত্রী ছিলেন। কলহনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অলক দত্ত এবং অলক দত্তের উৎসাহেই কলহন কাশ্মীরের ইতিহাস প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হন। জয়সিংহ (১১২৭-১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করলে কলহন তাঁহারও সভাকবি হন।' কিন্তু এই অভিমতের স্বপক্ষে কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। এর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। কবি তাঁর গ্রন্থে নিজের ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে সমকালীন যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কলহন কোন সময় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন না। তাঁর পিতৃদেব চম্পক কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রাজত্বকালে কিছুকাল অবশ্য মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। হর্ষদেব ছিলেন একজন নির্ব্বোধ এবং দুষ্টাচারী রাজা। তাঁর পাপাচারের সীমা ছিল না। নিরীহ প্রজাদের ওপর শোষণ এবং নিপীড়ন করে তিনি পরম সুখ অনুভব করতেন। অবশেষে রাজার অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজাগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাঁকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। মন্ত্রীপুত্র কলহন তখন বয়সে তরুণ। দেশের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজপুরুষদের দুর্ব্বল আত্মশক্তি এবং আক্ষেপ-পীড়িত সমাজ জীবনের বাস্তব করুণ চিত্র তাঁর মনে গভীরভাবে ছায়াপাত করেছিল। দেশের সর্ব্বত্র এই চরম দুরবস্থা লক্ষ্য করে তিনি রাজসভাসদরূপে নিযুক্ত হবার বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন, এমনকি রাজসভার পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। অতএব কাশ্মীর রাজসভার সভাসদ বা সভাকবি রূপে তিনি জীবনে কোন সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর পিতৃদেবও রাজা হর্ষদেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন।

কলহনের রাজকর্ম্মে নিযুক্ত না হওয়ার অপর একটি কারণ ছিল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি 'রাজতরঙ্গিণী' রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। রাজার পৃষ্ঠপোষক বা রাজ-সভাকবি হয়ে তিনি কোন সময় নিছক রাজকাহিনী লিখতে চান-নি। তা লিখলে ইতিহাস না হয়ে 'রাজতরঙ্গিণী' রাজপ্রশস্তি গাথা বা রাজাদের কীর্ত্তিকলাপের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াত। কলহনের পূর্ব্বসূরীরা অবশ্য এরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইতিহাস না হয়ে সেগুলি রাজপ্রশস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাশ্মীর দেশের ইতিহাস—'রাজতরঙ্গিণী' একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথমা রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা মহাকবি কলহন জয়সিংহের রাজত্বকালে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয়া গ্রন্থের রচয়িতা কবিবর জোনরাজ। তিনি রচনা সমাপ্তির পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন।

জোনরাজের শিষ্য কবি শ্রীবর তৃতীয়া রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। রাজতরঙ্গিনীর এই অংশ চার অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর মধ্যে ১৪৫৯ হতে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থী রাজ-তরঙ্গিণীর রচয়িতা কবি প্রাজ্যভট্ট। তিনি রচনা আরম্ভ করে শেষ করতে পারেন নি। সেই অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন তাঁরই এক প্রিয় শিষ্য—কবিবর শুকনামা। সমগ্র রাজতরঙ্গিণীতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীর নৃপতিবৃন্দের ধারাবাহিক বিবরণ নিবদ্ধ হয়েছে।

কল্হন কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'তে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীররাজগণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই মূল্যবান্ গ্রন্থটি সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন ষ্টাইন (Stein) সাহেব। অনুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশকাল, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। বিশুদ্ধ অনুবাদ কর্ম্ম হিসেবে গ্রন্থটি বিদ্বজ্জন সমাজে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। ইংরেজী ভাষায় 'রাজতরঙ্গিণী' কাব্যের দ্বিতীয় অনুবাদক,—রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত ['Rajtarangini—The saga of the kings of Kalhmir'. Translated from the original sanskrit of Kalhana--by Ranjtt Sitaram Pandit] বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি প্রথম অনুবাদ করেন, লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা বাহাদুরের সভা-পণ্ডিত স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, কিন্তু এই অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ মূল গ্রন্থের অনেকগুলি শ্লোক এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় মূল গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন, আচার্য্য হরিলাল চট্টোপাধ্যায় [রাজ-তরঙ্গিনী—কবি কল্হন প্রণীত (সংস্কৃত কাশ্মীর-রাজ-তরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক: হরিলাল চট্টো-পাধ্যায়। সন ১৩১৯ সাল।) ঐ একই সাথে উত্তরপাড়া, কলিকাতা সেনট্রাল, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ ও নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ সমূহের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন ও দুর্গানাথ শাস্ত্রী কাব্য-রত্ন মূল রাজতরঙ্গিণী কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থটি খণ্ডাকারে প্রকাশিত। [রাজতরঙ্গিণী (কল্হন কৃত): রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন ও দুর্গানাথ শাস্ত্রী কাব্যরত্ন এম এ, অনুবাদক মূল ও বঙ্গানুবাদ। কলিকাতা ১৩১৯ সাল।] অতঃপর শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হতে রাজতরঙ্গিণীর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন [প্রথম প্রকাশ: ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ] অন্যান্য ভাষার মধ্যে ফারসী ভাষায় 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ করেন কবি বহর-উল-অসমার। তবে এই অনুবাদ আংশিক মাত্র। কাশ্মীরের মুসলমান নৃপতি জইনুল আবেদিনের আদেশে (১৪২১-১৪৭২ খ্রীঃ) কবি অসমার মূল গ্রন্থটির আংশিক অনুবাদ-কর্ম্ম সম্পাদন করেছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রাজতরঙ্গিণীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এযাবৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি।

কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী' অষ্টম তরঙ্গে বিভক্ত। প্রত্যেক তরঙ্গে কাশ্মীরনৃপতিগণের নাম, ব্যক্তি পরিচয়, শাসন-কাল এবং উল্লেখ্য ঘটনাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। রচনাটিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও আদর্শের ছাপ সুস্পষ্ট। এ থেকে প্রমাণিত হয়, কল্হন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী'তে অন্ধকারময় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যাদি নিরূপণের যাবতীয় সামগ্রী এবং উপকরণ নিবদ্ধ আছে বলেই গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-দের কাছে পরম আদরের বস্তু। গ্রন্থকার ইতিহাসোচিত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত সকল তথ্য অবশ্য অনুসন্ধানমূলক নয়, কতকক্ষেত্রে অনুমানমূলক। এই অনুমানমূলক তথ্যগুলি প্রাচীন লোকগাথা, কিম্বদন্তী ও নানা ঐতিহাসিক উপাদান হতে সংগৃহীত। গ্রন্থকার একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন৬। কিন্তু তাহলেও, ঐ তথ্যগুলির পৌর্বাপর্য সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ছিল বলেই তিনি এই দুরূহ কর্ম্মে আশাতীত সাফল্য-লাভ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর কবিমন কখনো কল্পনাকে আশ্রয় করেনি। সেখানে কল্পনাকে তিনি নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়ে অনুসন্ধান ও বিচারের আসরে টেনে নিয়ে গেছেন। স্বদেশ ও জাতির একটি মানবিক আদর্শকে তিনি কবির অনুভব দিয়ে

একান্তে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া কল্হনের প্রতিভার মধ্যে ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ সচেতনতা ছিল গভীর। তৎপরি নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি, তথ্য-বিন্যাসের ক্ষমতা এবং সুগভীর নিষ্ঠা তাঁকে সিদ্ধকাম ঐতিহাসিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

বানভট্টের 'হর্ষচরিত' কল্হণকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল। এই কাব্যখানি পাঠ করে তিনি 'রাজতরঙ্গিনী' রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নিজ গ্রন্থে কবি কয়েকজন প্রথিতযশা কবির নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি দামোদর গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রাজতরঙ্গিনী' পাঠে জানা যায়, দামোদর গুপ্ত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সময়ে মন্ত্রীত্ব বা কোন রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি জয়া-পীড় বিনয়াদিত্যের (খ্রী ৭৭৯-৮১৩) সময় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কবি রচিত 'কুউনীমত' সংস্কৃত সাহিত্যে একটি উল্লেখ্য কাব্য গ্রন্থ। কাব্য রচনা ছাড়াও দামোদর গুপ্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন।

'রাজতরঙ্গিনী' কাব্যে কাশ্মীরভূপতিগণের ধারাবাহিক বিবরণ ছাড়াও প্রাচীন ও সমকালীন সমাজের বহু চিত্র ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তথ্যগুলি সমাজ-বিদ ও ঐতিহাসিকদের কাছে মহামূল্যবান্ সামগ্রী। এই ঐতিহাসিক কাব্যে শুধু ভোগকামী, ঐশ্বর্য্যদাম্ভিক রাজপুরুষদের কথাই বিবৃত হয়নি, সেখানের ছোট বড় সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থকারের বর্ণন রীতি অতি প্রাঞ্জল। অন্যান্য ঐতিহাসিক কাব্যে এ ধরণের সামাজিক চিত্র বিরল। কবি তাঁর গ্রন্থে দুই কালের চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে, অতীত ও সমকালীন যুগের একটা তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য সাধারণের চোখে ধরা পড়ে। রাজপুরুষদিগের মধ্যে চন্দ্রপীড় এবং তাঁর ভ্রাতা ললিতাদিত্য ছাড়া অধিকাংশই কামাচারী ও দুর্জন ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সমাজে নানা কদাচার, অনাচার ও নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিয়েছিলেন। রাজকর্ম পরিত্যাগ করে তাঁরা অধিকাংশ সময় কামচর্চা ও কামসম্ভোগে অতিবাহিত করতেন। নিরীহ প্রজাগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাঁরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করতেন। এঁদের মধ্যে বজ্রাদিত্য, ললিতাপীড়, শঙ্করবর্ম্মা, চন্দ্রবর্মা, যশস্কর, কলশদেব, মল্লার্জ্জুন প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজপুরুষগণের রাজত্বকালে যৌন অনাচার, নীতিহীনতা এবং নানা প্রকার দুর্নীতি সমাজ জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছিল। চরিত্রহীনতা, বিলাস-লালসাময় জীবন এবং সভানন্দিনীদের নিয়ে নিরঙ্কুশ ভোগবিলাসের আতিশয্য এমন চরম পর্য্যায়ে উঠেছিল যে, তা চিন্তা করলে শঙ্কিত হতে হয়। শুধু রাজপুরুষরাই নয়, রাজমহিষী এবং রাজদুহিতারাও প্রকাশ্যভাবে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন। রাজ-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে তাঁরা নানা পাপাচারের জন্ম দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের অমঙ্গল ডেকে এনেছিলেন। নৃপতি যশস্করের পত্নীগণ এক চণ্ডাল রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন; ঐ রাজকর্ম্মচারীটি নৃপতির অনুগ্রহে রাজ-মণ্ডলেশ্বরের পদে অভিষিক্ত হয়েছিল। কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের কন্যা অনঙ্গলেখা স্বামীর অজ্ঞাতে পিতার এক মন্ত্রীর সাথে গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন। পরে তাঁদের হীন কার্যকলাপ সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সে যুগে কাশ্মীর দেশের রমণী-সমাজে পর্দার প্রচলন ছিল। অন্তঃপুরবাসিনীদের সচরাচর রাস্তাঘাটে দেখা যেত না। কাশ্মীরে তখন ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যুগ। সে যুগে রমণীরা উচ্চ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশ্মীররাজ কলশদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সাতজন বিবাহিতা পত্নী ও একজন উপপত্নী স্বামীর অনুগমন করেছিলেন। দেশে তখন বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। রাজ-পুরুষেরা নিম্নবর্ণের যেকোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারতেন। এরূপ কাজে তাঁদের কোন

সম্মানহানি হত না। কাশ্মীরনৃপতি চক্রবর্ম্মা হংসী নামে এক চণ্ডালিকাকে বিবাহ করেছিলেন। সমাজে নৃত্য-গীত-পটীয়সী গণিকাদের অবাধ গতিবিধি ছিল। রাজপুরুষেরাও তাদের সম্মান করতেন। রাজসভায় এবং রাজ অন্তঃপুরে গণিকাদের উপস্থিতি প্রায় লক্ষ্য করা যেত। অধিকাংশ নৃপতিরা গণিকাসক্ত ছিলেন। পূজাপার্ব্বণ ও উৎসবাদিতে গণিকাদের ডাক পড়ত। নৃত্য-গীতে অংশ গ্রহণ করে তারা সাধারণের মনোরঞ্জন করত। অতিমাত্রায় অসদাচারে আসক্ত হয়ে কয়েকজন নৃপতি অকালে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বজ্রাদিত্য, যশস্কর ও কলশদেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। লোকায়ত সমাজের নানা ক্রিয়াকর্ম্ম, আচার অনুষ্ঠান, আনন্দ উৎসব ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিণীতে। অন্যান্য আমোদ প্রমোদের মধ্যে নৃত্য-গীতাদির কথা গ্রন্থের কয়েক যায়গায় উল্লেখ আছে। সেই সময় কাশ্মীরী সমাজের নিম্নস্তরে এমন এক ধরণের লোক ছিল যারা নাচ-গানে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করত। কাশ্মীরে সেই সময় সর্পপূজার প্রচলন ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে এই ধর্ম্মমতের আচার আচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। কল্হন তাঁর অমূল্য গ্রন্থে লৌকিক জীবনের যে চিত্রগুলি তুলে ধরেছেন, তা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং সজীব।

ডঃ বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে কল্হন সম্বন্ধে আলোচনা কালে মন্তব্য করেছেন,—'সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও কবিকে যদি ঐতিহাসিকের মর্য্যাদা দিতে হয়, তবে তিনি কল্হন'; মন্তব্যটি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ। এর যৌক্তিকতা আমাদের স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যের তিনি প্রথম সফল পথিকৃৎ—মহাভগীরথ। রাজ-রাজাদের লীলাভূমি কাশ্মীরের অবস্থান এবং সেখানকার সামাজিক ও নৈতিক আচার অনুষ্ঠানের শিল্পসম্মত বিবরণ তিনি তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। এদিক থেকে কাশ্মীর বর্ণন বিশেষ মূল্যবান্। কল্হনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর ঐতিহাসিক নিষ্ঠাও ছিল অকৃত্রিম। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসা বিচারে তিনি অদ্যাপি অদ্বিতীয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাইরের উৎসাহ যত ছিল, তার চেয়ে অধিক ছিল তাঁর অন্তরের প্রেরণা। সিদ্ধকাম ঐতিহাসিক হবার বাসনা নিয়েই কবি ইতিহাস রচনায় বৃত্ত হয়েছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে তাঁর ইতিহাস-কীর্ত্তির সফলতা পূর্ণ রূপে প্রতিভাত।

---

(১) 'Kalhana was born in Kashmir (aboout A.D. 1100)—History of Indian Literature—Winternitz,

(২) 'রাজতরঙ্গিণী'—অনুবাদক : শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়, (ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক চট্টগ্রাম কলেজ) প্রকাশ কাল—১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

(৩) 'ক' কল্হন ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজতরঙ্গিণী' রচনা আরম্ভ করিয়া পরবৎসর অর্থাৎ ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজ জয়সিংহদেবের শাসনকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে ইহা সমাপ্ত করেন'। ['রাজতরঙ্গিণী', অনুবাদক : শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়]

'খ' 'কল্হন ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজতরঙ্গিণী' আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ করেন'।—[সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা : ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(গ) 'We have the Rajtarangini by Kalhana of the 12lh century'—'A History of Sanskrit Literature—classical period, Vol I, by S.N. Dasgupta & S. K. Dey.

(ঘ) 'Kalhana's Rajtarangini (A.D. 1149-50) History of Indian Literature by Winternitz.

(৪) 'ক' 'Champaka was a minister of the wicked and hopeless Harsa of Kashmir'—[A History of sanskrit literature—classical period Vol I by S.N. Dasgupta & S.K. Dey]

(খ) 'Kalhana was the son of the great Kashmiri Minister' ['Kalhana and his Rajtarangini' by Amit Roy—Amrita Bazar Patrika—Puja Annual' 1970]

(৫) 'Kalhana was the son of Champaka, a faithful adherent of king Harsa of Kashmir' [History of Indian litarature by Winternitz]

(৬) Kalhana frankly admits that he took some of the Kings from the predecessors' account while others are patched up apparently from hearsay and tradition for the sake of a continuous narrative'—[A History of sanskrit literature—classical period Vol [by S.K. Dey and S.N. Dasgupta]

অর্থ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত

সুশীতল দত্ত*

অর্থ হচ্ছে বিশ্বশক্তির দৃশ্যমান নিদর্শন, বিকাশ কালে এই শক্তি পৃথিবীতে জৈব ও বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে চলে আর বহিঃজীবনের পূর্ণতার জন্য তা অপরিহার্য্য। মূলত সত্যকার কাজের ক্ষেত্রে এই শক্তি দিব্য মহিমার অধীন। কিন্তু দিব্য মহিমার অন্তর্গত অন্যান্য শক্তির মতো এখানে তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আর নিম্ন প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু তা অহং-এর সেবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বা আসুরিক প্রভাবে বেষ্টিত হয়ে থাকতে পারে ও বিকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হতে পারে। এটা অবশ্য তিনটি শক্তির অন্যতম শক্তি, ধন ও যৌনতা। মানুষের অহং আর অসুর সম্পর্কে এঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে প্রবল—আর যাঁরা এগুলো পোষণ করেন তাঁরা সাধারণতঃ সেগুলোর অপব্যবহার করে থাকেন অথবা যথার্থ উদ্দেশ্যে এগুলো কাজে লাগাতে পারেন না। যাঁরা ধন কামনা করেন বা যাঁরা ধনবান্ তাঁরা ধনের অধিকারী হওয়ার চেয়ে বরং ধনেরই বশীভূত হয়ে পড়েন—দীর্ঘকাল ধন আঁকড়ে থাকায় রত এবং তার অপব্যবহারের ফলে ধনের উপর আসুরিক প্রভাবের যে দুষ্ট ছাপ পড়ে খুব কম লোকেই তা এড়িয়ে যেতে পারেন। এই কারণে অধিকাংশ আধ্যাত্মিক অনুশাসনই সম্পূর্ণ আত্মসংযম, বৈরাগ্য এবং ধন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির ও ধনলাভ করার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত এবং অহংমূলক বাসনা ত্যাগের উপর জোর দিয়েছেন।

কোন কোন অনুশাসনে অর্থ এবং সম্পদ অর্জনের উপরও বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে দারিদ্র কৃচ্ছ্র সাধনাই আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সোপান। ইহা একটি ভ্রান্তিমাত্র, কারণ এর ফলে বিরুদ্ধ শক্তির হাতেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। দিব্য মহিমার অন্তর্ভুক্ত এই ক্ষমতা পুনরায় জয় করা আর দিব্য জীবনের জন্য তার মহৎ ব্যবহারই সাধকের পক্ষে অতিমানসাশ্রয়ী পথ।

অর্থ ক্ষমতা যে সুযোগ সুবিধা এনে দেয়—সন্ন্যাসীর অনাসক্তি নিয়ে আপনি তাকে দূরে ঠেলে দেবেন না অথবা এর প্রতি কোন রাজসিক আসক্তি পোষণ করবেন না অথবা ভোগের চরিতার্থতায় গা ভাসিয়ে দেবেন না। মা এবং তাঁর সেবার জন্য অবশ্যই ধন সম্পদ জয় করতে হবে, একে শুধু সে ভাবেই দেখবেন।

সব সম্পদই দিব্য মহিমার অধীন এবং যাঁদের কাছে তা আছে তাঁরা ঐ সম্পদের অধিকারী নহেন—ন্যাসরক্ষক মাত্র। আজ বা আগামী কাল তা অন্যত্র থাকতে পারে। ধনসম্পদ তাঁদের কাছে থাকাকালীন তাঁরা কি ভাবে সে ন্যাস সম্পর্কিত কর্ত্তব্য পালন করেন, কি মনোভাব নিয়ে কোন্ চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁরা এর ব্যবহার করেন তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

ধন আছে বলেই কোন লোকের কাছে যাবেন না—এঁর বাহ্যিক চমক ক্ষমতা বা প্রভাবের দ্বারা বশীভূত হবেন না।

আপনি যদি সন্ন্যাসীর অনীহামুক্ত হয়ে অর্থ কালিমা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন তবে ঈশ্বরের কাজের জন্য অর্থের উপর আপনার অধিকতর ক্ষমতা জন্মাবে। মনের সাম্য, অভাববোধ না থাকা, আপনার যা আছে এবং আপনি যা গ্রহণ করেন বা আপনার অধিকার করার সমস্ত ক্ষমনা দিব্যশক্তি এবং তাঁর কর্ম্মে পূর্ণভাবে

* **Sri Aurobindo on Money** শীর্ষক মূল পুস্তিকার অনুবাদ—

সমর্পণ করাই হচ্ছে এই মুক্তির নিদর্শন। অর্থ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে মনের কোন বিকৃতি, কোন দাবী, কোন অসূয়া হচ্ছে কোন না কোন অসম্পূর্ণতা এবং বন্ধনের নিশ্চিত লক্ষণ।

এই ধরণের আদর্শ সাধক হচ্ছেন তিনি—প্রয়োজন হলে যিনি দরিদ্রের জীবন যাপন করতে পারেন আর কোন অভাববোধই যাঁকে বিচলিত করে না—বা দিব্য চেতনার অন্তর্গূঢ় বিকাশে বাধাস্বরূপ হয় না, প্রয়োজন হলে যিনি ঐ ভাবে ধনীর জীবন যাপন করতে পারেন এবং মুহূর্তের জন্য তাঁর মনের বাসনা বা আসক্তি কিংবা যে সব জিনিষ তিনি ব্যবহার করেন বা আত্মরতির দাসত্ব অথবা ধন সম্পদের অধিকারের ফলে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তার বন্ধনের হীনমন্যতার জালে জড়িয়ে পড়বেন না। তারজন্য রয়েছে পরিপূর্ণ দিব্য মহিমা আর আনন্দই হচ্ছে দিব্য মহিমা।

অতিমানস সৃষ্টির জগতে অর্থের ক্ষমতাকে দি শক্তির কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং মা যেভা তাঁর সৃষ্টিমূলক কল্পনায় সমর্পণ করেছেন ঠিক তেমি ভাবে এক সত্যিকার সুন্দর সু-সমঞ্জস, সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত এক নূতন দিব্য মহিমাযুক্ত জৈব এবং পার্থি অস্তিত্বের জন্য এই অর্থ ব্যবহার করতে হবে। কি প্রথমে যার জন্য তা অবশ্য জয় করতে হবে—আর যাঁদে অন্তর দৃঢ়, মহৎ, যাঁরা সকল প্রকার অহং থেকে মুা আর কোন কিছু দাবী না করে বা কাছে রেখে ব কোন দ্বিধা না করে আত্মসমর্পণ করেন, যাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ আর যারা ঐশী ক্ষমতা চালনার শক্তিশালী বাহন তাঁরাই হচ্ছেন এই বিষয়ের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিমান।

রবীন্দ্রনাথ ঃ শারদোৎসব

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য

'শারদোৎসব' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক নাটক। ইহা রূপক অথবা সাংকেতিক অভিধেয় কোন নির্দিষ্ট টেকনিক অবলম্বনে রচিত না হইলেও যায়গায় যায়গায় ইহাতে রূপকের অন্তরাল এবং সংকেতের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে 'শারদোৎসব'ই প্রথম পরিণত বয়সের রচনা—তাই যেটুকু রূপক বা সঙ্কেত আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছে। পরে এই ধারাটিই আরও ঘনীভূত হইয়া একটা নির্দিষ্ট টেকনিকের রূপ লইতে পারিয়াছে যাহার চূড়ান্ত নিদর্শন হইল 'রাজা' ও 'রক্তকরবী'। 'রাজা' নাটকটির সাঙ্কেতিকতা লইয়া বৎসর পূর্বে এই 'প্রবাসী'-তেই বিশদ আলোচনা করিয়াছিলাম। 'রক্তকরবী' লইয়া ভবিষ্যতে আর একটি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির আস্বাদনের পশ্চাতে যে রাবীন্দ্রিক সত্যগুলি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে উহাকে বিশদভাবে প্রণিধান করিবার জন্য অন্তরনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ: সাধারণ্যে নাটকের আবেদন যেখানে স্বীকৃত উহা জীবনের 'ঘটনা'। রবীন্দ্র-নাটকের ক্ষেত্রে উহার আবেদন যত না 'ঘটনা' তার বেশী 'উদ্ঘাটন'। তাই, রবীন্দ্র-নাটকের আস্বাদন নিবিড় হইয়া উঠে 'মনে'— মঞ্চে নহে।

পূজাবকাশে অভিনয়ের জন্য বালকদের একটি নাটক লিখিয়া দিতে হইবে—এই কথাটি মনে রাখিয়াই কবি নাটকটিতে শরৎকালীন ঋতুরস ও বালকোচিত একরূপ ক্রীড়াকৌতুকময় অবকাশরঞ্জনের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু নাটকটির আসল কেন্দ্রবিন্দু হইয়েছে তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে মনের মধ্যে গাঁথিয়া না লইয়া নাটকটিতে প্রবেশ করিতে গেলে একরূপ দুর্বোধ্যতার দোষ আসিয়া যাইবেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সম্বন্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সকলের মুখে মুখে প্রচারিত তাহার আসল কারণ, নাটকগুলির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্র-চিন্তাধারার তত্ত্ব-সত্যগুলির সহিত সম্যক পরিচিত না হওয়া।

'শারদোৎসব' নাটকটির আঙ্গিকে ও পরিবেশনে মঞ্চোপযোগী গতিবেগ অথবা নাটকোচিত ঘাত-সংঘাত নাই। ইহাতে সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অভ্যস্ত রীতি অনুসৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি মৌলিক ব্যাপার। নাট্যশাস্ত্রের পরিচিত রীতি অনুসারে ইহার ব্যাখ্যান সম্ভব নয়। নয় বলিয়াই যাহারা শারদোৎসবকে অভ্যস্ত নাট্যরীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে যাইবেন তাঁহারাই ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের মত 'বিজয়াদিত্য'কে 'হারুণ-অল-রসিদে'র ছোট ভাই অথবা সন্ন্যাসী উপনন্দ দাদাঠাকুরের মিলন চক্রটিকে mutual admi.ation society বলিয়া মনে করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন।

এই ধরণের বিচিত্র নাটকের রসাস্বাদন কোন দেশী বা বিদেশী নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া করা যাইবে না। করিতে হইলে একরূপ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ মনের সৃষ্টি করিতে হইবে। বোধহয় এই কারণেই ১৩২৯ সালে কলিকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথকে নাটিকাকারে একটি ভূমিকা লিখিতে হইয়াছিল। তাহাতে এই বিষয়ের প্রতিই তিনি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে দর্শকেরা নাটকটিতে কোন বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী গল্প, যুদ্ধ, রক্তপাত, আত্মহত্যা অথবা পতন ও মূর্চ্ছা কিছু আশা না করেন। "ইহা গানেতে, গন্ধেতে, রঙেতে, রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের

জিনিস।” জগতে আনন্দের কারবার যেখানে সেখানে এইরূপই ‘একটা কিছুই-না গোছের’ জিনিস থাকে যাহাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহার জন্য দরকার গৃহকার্যের অতি-প্রয়োজন-সীমার বাহিরে একটু অন্যমনস্কতা ও অনেকখানি ‘ছুটি’র আয়োজন। বোধকরি এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ কোন সময়ে ‘শারদোৎসব’কে “ছুটির নাটক” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

এই নাটকটির মূলতত্ত্ব হইতেছে ‘ঋণশোধ’। পরিপূরক রূপে অপর যে তত্ত্বগুলি আসিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে মিলনের সত্য, অপরটি রাজধর্মের আদর্শ। এই তত্ত্বগুলি যে কেবল শারদোৎসব নাটকেরই মূল কথা তাই নয়—এই যুগের রবীন্দ্ররচনার সকল বিভাগেই—কি কাব্যে, কি প্রবন্ধে, কি কি সঙ্গীতে এই তত্ত্বগুলি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ‘শারদোৎসব’ যেন এই যুগের ঐ idea-গুলির নির্বিরোধ প্রতিনিধি।

ঋণশোধ ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের নিকট নিছক ‘তত্ত্ব’ না হইয়া নিরেট সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ঋণশোধ তাহাই প্রকাশ, আর এই প্রকাশেই মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ।

বিশ্বসৃষ্টিতে জীবলোক ও প্রকৃতিলোক আপতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও উহারা ঠিক বিচ্ছিন্ন নয়। একই সত্তার আনন্দাংশে উভয়ের সৃষ্টি বলিয়া উভয়ের মধ্যে এক অন্বয় একাত্মতার যোগ রহিয়াছে। এই যোগটুকুকে অন্তরে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার মধ্যেই ‘রস’। উহাতেই আত্মায় আত্মায় ‘মিলন’ পরমাত্মীয় হইয়া উঠে। শরৎঋতুর আগমনের সাথে সাথে মনুষ্যপ্রকৃতিতে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায় এই যোগযুক্ত মিলনবোধের মাধুর্যের জন্যই। এই মিলনকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার মধ্যেই ছুটির আনন্দ। নচেৎ কর্ম্মকে পরিহার করিয়া ফাঁকি দিবার আলস্যকে কখনই ছুটি বলা যায় না।

রাজধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি প্রভুত্ব-বিরোধী। প্রভুত্ব করিবার মধ্যে আছে একরূপ স্বার্থ, লোভ ও শক্তির অহঙ্কার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তথা প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজধর্ম্ম নৃপতিকে স্বার্থ, লোভ ও অহঙ্কারকে পরিহার করিয়া শিক্ষা দিয়াছে পরার্থ, আত্মত্যাগ ও প্রেমকে বরণ করিয়া লইতে। ‘নৈবেদ্য’র অনেকগুলি কবিতা, ‘কথা ও কাহিনী’র ‘প্রতিরোধ’ ও ‘প্রতিশোধ’ এবং ‘রাজর্ষি’ নাটক ও উপন্যাস প্রধানতঃ এই সত্যটিকেই বড় করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ‘শারদোৎসব’এর রাজ-সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য হইতেছে এই নির্মুক্ত রাজধর্মের একটা ‘টাইপ্’। একই রাজার দুই আদর্শ। যে অর্থে সে বিজয়াদিত্য সে অর্থে সে শাসক ও রক্ষক; যে অর্থে সে সন্ন্যাসী সে অর্থে সে পালক ও প্রেমিক।

কিন্তু লক্ষ্যেশ্বর? আর সোমপাল?

যেখানে মানবধর্ম্ম পীড়িত সেখানেই লক্ষ্যেশ্বর; যেখানে রাজধর্ম অবমানিত সেখানে সোমপাল। বর্ত্তমান সভ্যতায় এই লক্ষ্যেশ্বর আর সোমপালের দল বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে বলিয়াই মানবধর্ম ও রাজধর্ম পীড়িত ও অবমানিত হইতেছে। তাই এত সঞ্চয়প্রীতি, এত স্বার্থপরতা, এত লোভ, এত ভয়, এত আত্ম-প্রবঞ্চনা। ‘গজমোতিহার’ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াও লক্ষ্যেশ্বরের শান্তি নাই, গজমোতিহার জগৎসেভায় বিক্রয় করিতেও তাহার ভরসা নাই—পাছে ঠকে। ওদিকে, রাজা সোমপাল ঈর্ষাপীড়িত। সে বিজয়াদিত্যের প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠিতে চাহে, কিন্তু মনুষ্যত্বের সে শক্তি তাহার নাই। তাই আশ্রয় লয় পাশবিকতার, ক্রূরতার, খলতার এবং গোপনীয়তার। মানব সভ্যতার ক্রমোন্নেষের পথে এইরূপেই অসুন্দর, কুশ্রীতা ও আত্ম-অবমাননাকর নিরানন্দ ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে। বিষয়াসক্ত মানুষ কেবল মুক্তার পরিসীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, মুক্তির অসীমে মুক্ত হইয়া উঠিতে পারে না। নাটকটির মধ্যে এই দুইটি চরিত্র, বিশেষ করিয়া লক্ষ্যেশ্বর রীতিমত নাটকোচিত গুণে সচল হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাহাকে লইয়া ও তাহার গজমোতিহার লইয়া ‘রূপক’ ও ‘কৌতুক’ যুগপৎ জমিয়া উঠিয়াছে।

সংকেতের স্পর্শ যে নাটকটির ভিতর একেবারেই অমিল একথা বলা ঠিক নয়। নাটকটির উপসংহারের দিকে অসীমের আনন্দ আভাসে ইঙ্গিতে ধরা দিয়াছে শরৎ প্রকৃতির রঙে রেখায়। বালকগণ যখন বলে, "কই, ঠাকুর, দেখিয়ে দাও না?" অতীন্দ্রিয়লোকচারী সন্ন্যাসী তখন ভাববিমুগ্ধতায় উদ্দীপ্ত হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, "ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে ....ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।" অর্বাচীনের দল আকাশ ভরিয়া উঠিবার সংকেত বুঝিতে পারে না। বলে, "কী সে?" সন্ন্যাসী বলে, "কি সে। এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোকে, আনন্দে, বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?"—ইহাই 'সংকেত'।

সাংকেতিকতার রহস্য হইতেছে—অসীমের অনিকেত আনাগোনা। কিছু আভাসে, কিছু ইঙ্গিতে আর অনেকখানি প্রস্তুত মনের তীব্রতম অনুভূতির স্ফুরণে, বিচ্ছুরণে। অরূপকে রূপের আধারে, অসীমকে সীমার মাঝারে, অধরাকে ধরার বাঁধনে চাক্ষুষ করিবার মধ্যে যে প্রতীতিগম্য আনন্দ তাবৎ স্থূল সাহিত্যে পাওয়া যায় উহার মধ্যে একরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার একরূপ প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতার অনৌচিত্য দোষ রহিয়াছে। যিনি 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠং', যিনি "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্'—তিনি প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহেন। তিনি শুধু তাঁরই কৃপাধন্য ভক্তের অনুভূতিলভ্য—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যং',—কেবল উপলব্ধির মধ্যেই তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিলে সংকেতের রহস্যময়তা ক্ষুন্ন হইয়া যায়;—তাই তাঁহার স্পর্শ পাইতে হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উন্মেষ দিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে হয় 'আরক্তচক্ষু'র উন্মীলন দ্বারা আর তাঁহার আবির্ভাবকে কান পাতিয়া শুনিতে হয় সঙ্গীতের ধ্বনিমূর্ছনার বিভোর দিয়া।—"আমার নয়ন ভুলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

নাটকটিতে অসীমের ব্যঞ্জনা প্রধান না হইয়া ঋণশোধের তত্ত্বটি যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা কবি নিজেও জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই ১৯২১ সালে ইহার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের নামকরণ করিয়াছিলেন 'ঋণশোধ'।

এই 'ঋণশোধ'—ব্যাপারটি কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন, "........একটি ছেলে ছিল উপনন্দ। খেলাধুলা ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্য নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হইতে এই কয়টি তথ্য পাওয়া গেল যে, আর সবাই যখন বাহির হইয়াছে শরৎ-প্রকৃতির আনন্দে যোগ দিবার জন্য উৎসব করিতে, উপনন্দ তখন একমনে কাজ করিতেছিল; আবার, এই কাজ করা ছেলেটির সহিতই শরৎ-প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ; সে দুঃখের সাধনা দ্বারা আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে।

এই তথ্যগুলির একত্রিত সত্যের মাঝেই ঋণশোধের তত্ত্বটি নিহিত আছে।

এই সমগ্র বিশ্বই তাহার প্রভু বিশ্বদেবতার ঋণশোধের নিমিত্ত দুঃখতপস্যায় রত। এই ঋণটি সে লইয়া আসিয়াছে সৃষ্টি মুহূর্তেই। "আনন্দরূপং যদ্বিভাতি"—স্রষ্টার এই আনন্দরূপকে সে ঋণরূপে লইয়া আসিয়াছে আপনার অপূর্ণ জড়পিণ্ডের সাথে সাথে। নিদারুণ বহ্নিতপস্যার ভিতর দিয়া ক্রমোদ্ভিন্ন হইতে হইতে সেই জড় পিণ্ডটিকে রূপে, রসে, শোভায় সরস শ্যামল ও প্রকাশময় করিয়া তুলিবার মধ্যেই সে দেবতার ঋণশোধ করিয়া চলিয়াছে। মনুষ্য-প্রকৃতিতেও চলিতেছে সেই ঋণশোধের পালা।

"আমি না চাহিতে তুমি যা করেছো দান
আকাশ আলোক তনুমন প্রাণ......"—না চাহিতেই তিনি সবকিছুই দিয়া আমাদের পাঠাইয়াছেন তাঁহার অচিন্ত্য দ্বৈতলীলা আস্বাদনের আনন্দের জন্য। সেই দানই মানুষের ঋণ। ঋণের এই কঠোর কৃপাকে মানুষ

সার্থক করিয়া তুলিতে পারে কখন? না, যখন সে নিরলস কর্মের সাধনা দ্বারা, ঐকান্তিক আত্মোৎসর্জনের মধ্য দিয়া আপনাকে 'প্রেয়' হইতে 'শ্রেয়ে'র অভিমুখে প্রকাশ করিতে থাকে সেই প্রকাশই আনন্দ, সেই আনন্দই তাঁহার রূপ—আনন্দরূপং যদ্‌বিভাতি। মানুষের মাঝেই আপনার আনন্দ খুঁজিয়া পাইয়া মানুষকে ঋণের দায় হইতে তিনি মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে চরমোৎকর্ষ লাভের মধ্য দিয়াই দেবতার ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া চলিয়াছে। শরৎ-প্রকৃতির বাহিরে রূপে রহিয়াছে প্রশান্তি ও সুন্দর; কিন্তু এই প্রশান্তি ও সুন্দরকে প্রকাশ করিতে ভিতরে ভিতরে তাহার অণুতে পরমাণুতে চলিয়াছে নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর দুঃখ ভোগ ও কঠিন ত্যাগ। তাই শরৎ প্রকৃতির সঙ্গেই সত্যকার আনন্দের যোগ রহিয়াছে ঐ উপনন্দের। সে অনন্যমনা হইয়া ঐকান্তিকী প্রচেষ্টায় সুন্দরকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে পুঁথির পাতায় চিত্র আঁকিয়া আঁকিয়া। জ্ঞানের ভাণ্ডারও ঐ পুঁথিটিকে বিচিত্রিত করিয়া তুলিতেছিল সুন্দরের আলিম্পনে। ইহাই তাহার ঋণশোধ। মানুষের সাধ্য কি দেবতার ঋণশোধ করে যদি স্বয়ং দেবতা কৃপা করিয়া না তাহা গ্রহণ করেন? তাই, ঋণ শোধ করিবার অহঙ্কার নয়, ঋণশোধের নিমিত্ত নিষ্ঠাপূর্বক আনন্দে দুঃখ স্বীকার—ইহাই তত্ত্বটির মীমাংসা। তাই উপনন্দের তিন কার্ষাপণ নিষ্ঠার দান লইয়াই রাজসন্ন্যাসী লক্ষেশ্বরের সহস্র কার্ষাপণ ঋণ শোধ করিয়া দিলেন। এখানে 'দুঃখ' সম্পর্কে ধারণাটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'দুঃখ' বলেন—উহা জীবনের কষ্ট বা, দারিদ্র্য নয়, উহা না পাওয়ার ব্যাকুলতা, না দেখার অসম্পূর্ণতা, মিলিত না হওয়ার বিচ্ছেদ বা বিরহ। 'হয়ে-না-ওঠা'ই দুঃখ; 'হ'য়ে ওঠা'র প্রচেষ্টাই তপস্যা; 'হয়ে ওঠা'ই আনন্দম্।

নাটকটির আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। প্রাচীন ভারতের তপোবন শিক্ষার ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য সুকৌশলে নাটকটির স্থান, কাল, পাত্রের নামকরণ করা হইয়াছে। উপনন্দ, লক্ষেশ্বর, সুভূতি, সোমপাল, বিজয়াদিত্য, বেত্রাসিনী, গজমোতিহার, কার্ষাপণ ইত্যাদি।

'ঠাকুরদাদা' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সৃষ্টি যাহার অনেকগুলি রূপায়ন হইয়াছে পরবর্তী রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে, যেমন, দাদাঠাকুর, ধনঞ্জয় বৈরাগী বিশু পাগল ইত্যাদি। ইঁহারা কেহই কাজের জগতের লোক নন্ অথচ সকল কাজেই ইঁহারা থাকেন। ইঁহারা সদাপ্রফুল্ল সদানন্দময় সরলচিত্ত একপ্রকার বৃদ্ধশিশু। ইঁহাদের একটি মন সদা যোগযুক্ত থাকে বলিয়াই সংসারের কোন কিছুতে ইঁহাদের আসক্তিও নাই, আপত্তিও নাই। ইহাদের কথাবার্তা, হাবভাব, চালচলন সবই ব্যতিরেক সম্পন্ন ভক্তিরসাপ্লুত। নিরভিমান আনন্দের সহজ প্রতিমূর্তি যেন। নাটকে ইঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন এই জন্যেই যে ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় 'বিবেক'। ইঁহারা সবাই এক-একজন 'শিশু ভোলানাথ'। যেন ঈশ্বরের অবারণ লীলাখেলার আপন-ভোলা মর্ত্যদূতী।

গান্ধীতীর্থ সেবাগ্রাম

কানাইলাল দত্ত

উপলক্ষ্য ছিল অখিল ভারত গঠনকর্মী ও সংস্থা সম্মেলন। স্বাধীনতার পর ছাব্বিশটা বছর কেটে গেছে, বিস্তর পরিকল্পনা ও বহু সহস্রকোটি টাকা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো পেট ভরে খেতে পায় না, কোটি কোটি মানুষ কর্মহীনতার অভিশাপে জর্জরিত। চারিত্রিক শিথিলতার কলঙ্ক আমাদের সবাঙ্গে। জাতি হিসাবে গৌরব ও গর্ব করার মত বড় বেশি কিছু আজ আর অবশিষ্ট নেই বল্লেই চলে। গান্ধী-বিস্মৃতি ও বিকৃতি এর জন্য দায়ী বলে যাঁরা মনে করেন আমি সেই দলের একজন।

জওহরলাল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্ণধার হবার অধিকার পেয়েছেন তাঁরা সকলেই, চলতি ধারণায়, গান্ধী পথের পথিক। অথচ দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ও লোককল্যাণ কর্মযজ্ঞে গান্ধীজি প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন নি। গান্ধীজী পথ নির্দেশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রত্যেকটি বিচার, অনুভব ও সিদ্ধান্তকে তিনি কর্মের মধ্যে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন অন্য কোন প্রবক্তা নিজ তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োগ করার অবকাশ বড় একটা পান নি। সেবাগ্রাম ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে গান্ধীজি গ্রাম গঠনের যাবতীয় পরিকল্পনার হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, আজ নেতাদের কলমের খোঁচায় শত শত কোটি টাকা মঞ্জুর হয়। এ রকম কোন সুযোগ গান্ধীজির ছিল না। দু-চার-জন বিত্তশালী স্বদেশবাসী যে তাঁকে কখন কখন অর্থসাহায্য করেন নি তা নয়। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ঐ সাহায্য যে একান্তই আকিঞ্চিৎকর ছিল তাতে সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই। এই জন্যই বাধ্য হয়ে গান্ধীজিকে, একমাত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার নতুন ক্ষেত্রগুলি ভিন্ন অন্য সব পরিকল্পনা যাতে স্বয়ংনির্ভর হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হতো। এ বড় কম কথা নয়। গান্ধীতীর্থের এই সব পরিকল্পনা-কেন্দ্রের বহু কর্মীকে শ্রমার্জিত অর্থে জীবন ধারণ করতে হতো। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে গান্ধীজি সেবাগ্রামে বিস্তর কাজ করেছেন।

সেবাগ্রাম একদা ভারতবর্ষের বে-সরকারী রাজধানী বলে বর্ণিত হতো। স্বাধীনতা আন্দোলনের কন্ট্রোল রুম বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। এই গ্রামের কুটীরে কত যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নয়, ভারত ব্যাপারে সারা বিশ্বের দৃষ্টি একদা নিবদ্ধ ছিল সেবাগ্রামের দিকে। দুনিয়ার শান্তিকামী অহিংসা-সাধকগণও সেবাগ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আলোর সন্ধানে। এই সব কারণে বহুজনের নিকট সেবাগ্রাম তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে। যে অর্থে বারাণসী বা বদ্রীনাথকে আমরা তীর্থ বলি সেবাগ্রাম অবশ্য ঠিক সেই অর্থে তীর্থ নয়। কিন্তু রাজগীর, বুদ্ধগয়া, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, কালাডি ইত্যাদিকে যে কারণে আমরা তীর্থের মর্যাদা দিয়েছি, সেবাগ্রামের মর্য্যাদা তার চেয়ে ন্যূন নয়।

সেবাগ্রাম বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ওয়ার্ধা জেলায় অবস্থিত। কলকাতা থেকে রেলপথে প্রায় হাজার কিলোমিটার এবং বোম্বাই মেল বা এক্সপ্রেস একমাত্র গাড়ি। হাওড়া থেকে প্রায় ঘণ্টা চব্বিশেক সময় লাগে। আমাদের যাত্রায় বিঘ্ন ঘটেছিল। উনিশে সেপ্টেম্বর আমরা রওয়ানা হই। গাড়ি রাত্র ন'টায়, কলকাতা থেকে হাওড়া ষ্টেশনে আসায় সবগুলি পথে এদিন গাড়ি ঘোড়ার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। সে জ্যামের দুর্ভোগ বর্ণনাতীত। মোটঘাট মাথায় নিয়ে আলুপোস্তা থেকে

হেঁটে হেঁটে যেতে হয়েছিল। এত ছুটোছুটি না করলেও পারতাম। ইয়ার্ডের গোলমালের জন্য গাড়ি এ দিন প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্বে ছেড়েছিল।

দীর্ঘ সময় হাওড়া ষ্টেশনে বসে থাকা একেবারে নিষ্ফল হয় নি। ষ্টেশনের একটা নতুন রূপ দেখতে পেয়েছিলাম এদিন। আমরা যখন গিয়েছি তখন কোলাহল কলরবে উত্তাল উন্মত্ত জনস্রোত বয়ে চলেছে। ক্রমে ক্রমে ষ্টেশন জনাবিরল হয়ে এলো। হোটেল রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে যায় ঠিক সাড়ে দশটায়। চলমান জনস্রোতে ভাটার টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ষ্টেশন জুড়ে শত শত মানুষ শুয়ে পড়ল। এখনই আহারাদি সেরে নিতে হবে, সাড়ে দশটার পর কিছুই পাওয়া যাবে না। একটি উলঙ্গ ভিক্ষুক শিশু নীরবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ভোজ্যের ভাগ চায়। ওর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে খাওয়া অস্বস্তিকর। ভদ্রলোক দুটি পয়সা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। ছেলেটি পয়সা দুটো ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল। চমকে উঠেছিলাম। ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যকণায় তার আগ্রহ, পয়সায় নয়। অনাগত ভবিষ্যতের হাঙ্গামাবহ ঘটনা এটি।

রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে আমাদের গাড়ি ছাড়ল। পরের দিন ভোরে চোখ মেলতেই দেখতে পাওয়া গেল অনুচ্চ পাহাড়ের হাতছানি। সমতলের মানুষের নিকট পাহাড় একটা পরম বিস্ময়ের আধার; আকর্ষকও বটে। রুক্ষ নিষ্প্রাণ পাথরের বুক চিরে বেরিয়ে আসা লক্ষ কোটি তরুগুল্মের পত্র পুষ্প পল্লবের মধ্য দিয়ে প্রাণের অনন্তরহস্য ঘোষিত হচ্ছে। দূর পাহাড়ের এই জঙ্গল চলন্ত গাড়ির যাত্রীদের চোখে সবুজ ঘাসের একটি সুন্দর আস্তরণ বলেই মনে হচ্ছিল। রামগড়ের জঙ্গলের একটি স্বকীয় মহিমা ও ঐশ্বর্য আছে। না দেখলে তা অনুমান করা যায় না। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঘন অরণ্য। প্রবাদ আছে রামগড় থেকে বহুদূর পর্যন্ত যেতে বানরদের ভূমি স্পর্শ করতে হতো না। কাছাকাছি কোথায়ও চিত্রকূটও রয়েছে। আছে বিস্তর সুখ্যাত পাহাড় পর্বত এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্থান। অভ্রভেদী হিমালয়ের শান্ত বিস্ময় বা দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের উদার মহিমা নেই মধ্যভারতের। কিন্তু অপরূপ ও বহু বিচিত্র নৈসর্গিক শোভার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের প্রসাদে হিমালয় বা সমুদ্রের অভাব কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারে নি।

শুধুমাত্র নৈসর্গিক শোভায় পেট ভরে না; ক্ষুধার সময় খাদ্যটাই একমাত্র কাম্যবস্তু। কিন্তু সদাশয় রেলদপ্তরের ব্যবস্থা এবং কর্মচারীদের চরিত্রগুণে গাড়ির ভোজনকক্ষে দু ঘণ্টা অপেক্ষা করে একটা বসবার আসন পাওয়া গেল; আর সেখানে আধঘণ্টা বসে থাকার পর জানা গেল ভাত নেই। ভাত পেতে দু' ঘণ্টা সময় লাগবে। এমন বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত অবস্থা সচরাচর চোখে পড়ে না। সর্বত্রই সব ব্যাপারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর প্রতি রেল কর্মচারীরা কিছু উন্নাসিকতা-মিশ্রিত অবহেলা করে থাকেন। এটা খুব স্বাভাবিক। কেননা গান্ধীজি তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করলে কি হবে, স্বাধীনতার পর নেতা ও কর্মচারীরা প্লেনে বা প্রথম শ্রেণী বা বিশেষ শ্রেণীতে ছাড়া চলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজে হোটেল রেস্তরাঁ মালিকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বলেছিলেন —"আমাদেরই পয়সায় আমাদেরই খারাপ খাদ্য সরবরাহ করে আমাদের রেলপথ।" (আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদ।)

চার টুকরো বাসি পাঁউরুটি, সামান্য একটু ডালের জল, লাউজাতীয় কোন সব্জীর এক চামচে তরকারী, একটা পাঁপরের সিকিখণ্ড এবং একটু ঘন ঘোল খেয়ে দু' টাকা দিয়ে এলাম। এই দুর্মূল্যের বাজারেও ঐ খাদ্যবস্তুর দাম কোনক্রমেই ১০/৮০ পয়সার বেশি হতেই পারে না। কাকে দোষ দেব। যে যেখানে পারছে কিছু গুছিয়ে নেবার ধান্দায় ফিরছে বলেই তো এমনি অবস্থা। এটাই এখন দস্তুর। যে নামই আমরা দেই না কেন, বর্তমান ব্যবস্থা চলতে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন আশা করাই বাতুলতা।

রাত্র চারটায় আমরা ওয়ার্ধা ষ্টেশনে পৌঁছাই।

তখনও দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ওয়ার্ধা জেলা শহর। এখান থেকে সেবাগ্রাম ৫ মাইল। ভাল পীচের রাস্তা। যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করে। রিক্শা ও টাঙ্গাও মেলে। ওয়ার্ধা রেল ষ্টেশনের গায়েই রাজ্য সরকারের বাস ষ্টেশন। সারাদিন খুব দুর্যোগ থাকায় বাস চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে। আধঘন্টার মধ্যে সেবাগ্রাম যাওয়ার একখানা বাস পাওয়া যাবে এই আশ্বাসে আমরা বাস ষ্টেশনেই বসে রইলাম। এত রাত্রে সেবাগ্রাম গিয়ে খেতে পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কা করে অনেকেই বাস ষ্টুমটির রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে নিলেন। এই রকম রেস্তরাঁকে স্থানীয় ভাষায় "উপাহার গৃহ" বলে। মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। সে তুলনায় জিনিসপত্রের দাম বেশি বলা যায় না।

রাত দশটা নাগাদ আমরা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সেবাগ্রাম আশ্রমে এলাম। আমরা আশ্রমের প্রধান ফটকে নামি। থাকবার যায়গা মাইলখানেক দূরে খাদি বিদ্যালয় ভবনে। অন্ধকারের মধ্যে ভিজতে ভিজতে মোটঘাট মাথায় করে পদব্রজে খাদি বিদ্যালয়ে গিয়ে উঠলাম। খাবার চিন্তা তখন আর নেই। জামা কাপড় ছেড়ে একটু গুছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া গেল। উষাদির ঝোলা থেকে কলা ও চিড়েভাজা কে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জানি না তবে আমিও তার ভাগ পেয়ে অনাহারে থাকবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।

পরের দিন প্রসন্ন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত বর্ষণধৌত সেবাগ্রামে আমাদের ঘুম ভাঙ্ল। গত রাত্রের দুর্যোগের চিহ্নমাত্র কোথায়ও নেই। চারুদার সেবক ও সচিব নিখিল ভাই এসেছেন আমাদের তত্ত্বতল্লাস করতে। তাঁরা ক'দিন আগেই এসেছেন। গান্ধীজীর স্নেহধন্য চারুদার পরিচিতি ও প্রভাব এখানে খুব। কার্যকর্তা নিবাসে একখানি পৃথক ঘর তিনি পেয়েছেন। এই বাড়ির ঘরগুলিতে রান্নার ও স্নানের জায়গা সহ পৃথক পায়খানা আছে। চারুদার পাশেই ছিলেন বিহারের খ্যাতিমান্ নেতা বৈদ্যনাথ বাবু। এই বাড়িগুলি মাটির। খোলার চাল। বসবাসের পক্ষে বেশ ভালই তো মনে হলো।

গান্ধীজি একাধিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে সবরমতী ও সেবাগ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ। সেবাগ্রামের তাৎপর্য বোধ করি সবচেয়ে বেশি। সেবাগ্রাম নামটি খুবই অর্থবহ। কিন্তু কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভেবেচিন্তে এই নাম দেওয়া হয় নি। ব্যাপারটা ঘটেছিল বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে, ডাণ্ডি যাত্রার সুরুতে। গান্ধীজি সঙ্কল্প করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জিত না হলে আর সবরমতী ফিরবেন না। সুতরাং এই পর্বের কারাবাস শেষ হলে শেঠ যমুনালাল বাজাজের আহ্বানে গান্ধীজি ওয়ার্ধা আসেন। তখন গান্ধীজির ইংরেজ শিষ্যা কুমারী স্লেড (মীরা বেন নামেই তিনি সমধিক পরিচিতা) ওয়ার্ধা শহরের পাঁচ মাইল দূরে বর্তমান সেবাগ্রামে একটি কর্মকুটীর তৈরি করে গ্রাম সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন (১৯৩৫)। গ্রামটির নাম ছিল সেঁ-গাঁও। ১৯৩৬ সনে গান্ধীজি এখানে বসবাস করতে আসেন। তখন পথঘাট ছিল না। সভ্য জীবন যাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছুই মিলত না। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে একখানা কুটীরে এসে উঠলেন গান্ধীজি। বন্ধুজনের নিষেধ তিনি মানেন নি।

পূর্বেই বলেছি গ্রামটির নাম ছিল সেঁ-গাঁও। এ একই নামে কাছাকাছি আর একটা বড় ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ফলে গান্ধীজির ডাকের চিঠিপত্র নিয়ে দারুণ বিভ্রাট সৃষ্টি হলো। "মহাত্মা গান্ধী, ইণ্ডিয়া" এইটুকু মাত্র লেখা চিঠিও গান্ধীজির নিকট এক সময় ঠিক মত বিলি করা হয়েছে। অথচ এইখানে কেবল মাত্র গ্রামের নামের জন্য গোলমাল দেখা দিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গ্রামটির নাম বদলে 'সেবাগ্রাম' করা হয়। এর অর্থ এখন যাই হোক ঐ সময় পুরণো নামের ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিসঙ্গতির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করলে ভুল হবেনা। আর কালক্রমে জনসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রেষ্ঠ সব ভারত সন্তানের বাসভূমি হয়ে ওঠে এই পল্লী। সেবাগ্রাম নামটি তাই সার্থক হয়েছে।

গান্ধীজির কর্মপ্রয়াসে স্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজ নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সেবাগ্রামের যাবতীয়

জমিজমা তাঁরই দান। স্বদেশভক্ত মানুষের দানে আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হতো। শেষের দিকে এ ব্যয় বড় কম ছিল না। মাসিক ব্যয় ছিল বেশ কয়েক হাজার টাকা। গান্ধীজি প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব লিখে রাখতেন। এ সব হিসাব নিকাশ কোথায় আছে এখন, তা জানা যায় নি। গান্ধী-জীবনচর্চার ক্ষেত্রে এটিও একটি মূল্যবান্ দলিল। বহু সময় গান্ধীজি নিজের হাতে দৈনিক খরচের হিসাব রেখেছেন। সে হিসাব তিনি দাতাদের পাঠাতেনও। হিসাবপত্র ঠিকমত রাখতেন বলেই গান্ধীজির কোন কাজে বা আন্দোলনে কখনও অর্থাভাব ঘটে নি। এ বড় কম কথা নয়। অপর্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্তি ঘটলে খরচ-খরচার ব্যাপারে অনেক সময় সহজেই আমরা শিথিল হয়ে পড়ি। গান্ধীজি ছিলেন চূড়ান্ত ব্যতিক্রম। পরের পয়সায় নবাবী করার যে মানসিকতা আজ সর্বদিকে প্রকটিত, মহাত্মা ছিলেন তার মূর্তিমান্ প্রতিবাদ। লবণের মত সস্তা ও সহজলভ্য জিনিসের একটি কণাও যাতে অপচিত না হয় সে জন্যও তিনি তৎপর থাকতেন। এমন কি দাঁতমাজার পর দাঁতন কাঠিগুলি ফেলে না দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে জ্বালানি-রূপে ব্যবহারের নির্দেশ ছিল।

অপর দিকে ছোট বড় সকলেরই শরীর শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনের প্রয়োজনীয়তা এই আশ্রমে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। সৌখীন চরকা কাটা নয়। সেবাগ্রাম ও আশপাশে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা কৃষি, গো-সেবা ও কুটীরশিল্প কেন্দ্রে কাজ করে যাঁরা কোন না কোন জীবিকার ব্যয় উপার্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে খ্যাত অখ্যাত বিস্তর আশ্রমবাসী আছেন। পূজ্য বিনোবাজির মত মানুষও একদা খাদি কেন্দ্রে যা মজুরি পেতেন তাতেই জীবন নির্বাহ করেছেন।

সেবাগ্রামের অনেক কুটীরেই গান্ধীজি নানা সময়ে বসবাস ও কাজকর্ম করেছেন। অধিকাংশ সময় যে গৃহটিতে ছিলেন তার নাম এখন বাপু কুঠি। খোলার চাল, মাটির মেঝে, মাটিলেপা এবং কাঠের ফ্রেমে বসানো চাটাই দিয়ে দরজা জানালা তৈরি করা হয়েছে। আশ্রমের অধিকাংশ বাড়িই এই রকম। বিশেষ প্রয়োজনে দুই-একখানা বাড়ির দেওয়াল ইটের, রুক্ষ পাথরের মেঝে এবং চাল অবশ্য খোলা দিয়েই তৈরী। বাপু কুঠির আয়তন ক্ষুদ্র। তবু তাকে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। গান্ধীজির জীবদ্দশায় ঘরখানির ভিতর বাহির যেমনটি ছিল এখনও তেমনি রাখা হয়েছে।

বসবার ঘরটুকুর মেঝেতে খেজুরপাতার পাটি বিছানো। গান্ধী-দর্শনার্থীরা এই পাটিতেই বসতেন। বিশ্বের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পাটিতে বসে গেছেন। একান্ত যাঁরা পা মুড়ে বসতে পারতেন না তাঁদের জন্য ছোট ছোট চৌকির ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজি নিজেও ঐ পাটিতেই বসতেন। ততে একটা তুলার ছোট তোষক ছিল। সেই আসনের সামনে একখানা চৌকির উপর একটি হারিকেন লণ্ঠন রয়েছে। পাশে খুব ছোট্ট একটি বুক কেসে কয়েকখানা বই এখনো আছে। শুনলাম ওগুলি সবই ধর্মগ্রন্থ।

আশ্রমে জাতিধর্ম বা বর্ণের কোন ভেদ ছিল না। বিত্ত, বিদ্যা বা পদমর্যাদার কোন তারতম্য ঘটাবারও অবকাশ ছিল না। গ্রামের নিরক্ষর চাষীর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সমস্যাও সহৃদয়তার সঙ্গে গান্ধীজি শুনতেন। তাদের অসুখ বিসুখে ঔষধপত্র দিতেন। তারাও এসে গান্ধীজির সামনে এই পাটিতেই বসতেন। দেশী হোক বিদেশী হোক অতিথিকে আশ্রমে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। গান্ধীজির নির্দেশ ছিল: Any who comes to see the Ashram or any guest must be made to feel at home।

গান্ধীজির কোন পার্থিব ধন সম্পত্তি ছিল না। সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—Civilisation in the real sense of the term consists not in multiplication but in deliberate and voluntary reduction of wants। জীবনভোর এই সাধনাই তিনি করে গেছেন। আর এতে যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা গান্ধীজির পার্থিব সম্পদের তালিকা দেখলে সহজেই বুঝা যায়। এই তালিকাটি

মহাত্মার মৃত্যুর পর রচিত এবং জিনিসপত্রগুলি বাপু-কুঠিতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। তালিকাটি এই :

(১) একজোড়া খড়ম, চটি,
(২) লাঠি একখানা,
(৩) চশমা,
(৪) তিনটি কাগজ চাপা,
(৫) জাপানী রুমাল একখানা,
(৬) বাঁধানো দাঁত রাখার একটি এনামেল কৌটা,
(৭) দোয়াত-দানী (কাঠের),
(৮) কলম ও পেন্‌সিল্ দানী, (কাঠের)
(৯) থুকদান,
(১০) পানীয় জলের বোতল,
(১১) পিন ও ট্যাগ রাখার পাত্র,
(১২) জপমালা,
(১৩) কাঠের একটি ছোট্ট পাত্র,
(১৪) প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স,
(১৫) একটুকরো পা-ঘসা ঝামা,
(১৬) বানর-পুতুল তিনটি,
(১৭) চরকা একটি,
(১৮) চট দিয়ে মোড়া একটি পুরাণো ছোট টিনের পাত্র, (ছেঁড়া কাগজ ফেলার জন্ত)।

এত সামান্ত জিনিষে একজন মানুষের জীবন কাটে, ভাবলেই আশ্চর্য হতে হয়। এগুলি খুবই সাধারণ এবং সস্তা। প্রয়োজন বাড়ানোকে গান্ধীজি পাপ মনে করতেন। তবু তাঁর প্রয়োজন যে এত সীমাবদ্ধ ছিল তা ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারি নি। অবশ্য উল্টো কথাও বিস্তর শ্রুত হয়। অনুপরে কা কথা, স্বয়ং সরোজিনী নাইডুও কৌতুক করে যা বলেছেন তার অর্থ হলো— গান্ধীজির দরিদ্র মানুষের জীবন যাপনের ব্যবস্থায় বিস্তর ব্যয় হয়।

পূর্বেই বলেছি গান্ধীজির বসবার ঘরখানির বেড়ায় মাটির প্রলেপ দেওয়া। তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসতেন। পূর্ব ও পশ্চিমের দেওয়ালে মাটির রেখা তুলে দুটো তালগাছের মধ্যে ওঁ শব্দটি হিন্দীতে লেখা আছে। এক দেয়ালে রয়েছে চরকার রিলিফ। সামনের ও পিছনের দেওয়ালে (বেড়ায়) যিশুখ্রীষ্টের একটি ছবি ও বাইবেল, রাস্কিন এবং টলস্টয় প্রভৃতি থেকে কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে।

গান্ধীজি সাধারণ মানুষ। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার দ্বারা তিনি দেবত্ব অর্জন করেন। এই উত্তরণের পথে সত্য ও অহিংসা হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মূলাধার। তাই রাস্কিনের উদ্ধৃতিটি খুবই অর্থবহ। সেটি এই :—

The essence of lying is in deception and not in words ; a lie may be told by silence, by equivocation, by accent on a syllable, by the glance of the eye, attaching the particular significance to a sentence and all these kinds of lies are worse and baser by many degrees than a lie plainly worded.

বসবার আসনের পেছনে ঝোলানো আছে—জি. সি. জারমারের—When you are in the right you can afford to keep your temper and when you are in the wrong you can not afford to lose it.

মিথ্যার বহুরূপী প্রকাশ সম্পর্কিত বাক্যটি ছিল গান্ধীজির চোখের সামনে আর সর্বাবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাটি ছিল তাঁর মাথার উপরে, আগন্তুকদের চোখের সামনে। মহাত্মা কি ভেবে এই স্থাপনার পরিকল্পনা করেন তা আজ অনুমান-সাপেক্ষ। মিথ্যার ছলনা সম্পর্কে একটা সদাজাগ্রত সতর্কতা তাঁকে ঘিরে রাখুক এবং কেউ কখনো যেন মেজাজ খারাপ না করে—এই রকম একটা বোধ সম্ভবত তাঁর মনে ছিল।

এই ঘরের পেছনে অর্থাৎ উত্তর দিকের খোলা বারান্দায় ছোট্ট একখানা তক্তপোশের উপর গান্ধীজি ঘুমোতেন। তিনি সকলকেই খোলামেলা স্থানে ঘুমোবার পরামর্শ দিতেন। তাঁর অনুরোধে লর্ড লোথিয়ান একবার এইখানে খোলাবারান্দায় ঘুমোন। মহাত্মার বসবার ঘরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণে ছিল স্নানের কামরা ও স্যানিটারি পায়খানা। একটা বসবার ঘরের চেয়ে বড়। পায়খানাটি গান্ধীজি নিজ হাতে প্রত্যহ পরিষ্কার করতেন। প্যান ধোবার ব্রাশটি আপনি এখনো দেখতে পাবেন। গান্ধীজি একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না।

তাই পায়খানায় বসেই তিনি কিছু পড়াশুনা করতেন। বইপত্রাদি রাখার জন্ত একটা ছোট্ট র‍্যাক দেওয়ালে ঝোলানো আছে। পায়খানার পূর্ব দিকে আর একটি ছোট ঘর আছে। স্নানের পূর্বে এই ঘরে একটি টেবিলে শুয়ে গান্ধীজি তেল মাখতেন। টেবিলখানা এখনো আছে। প্রয়োজন মত ঘরখানা রোগীর আশ্রয়স্থল হতো। সাধারণতঃ সেই সব রোগী এখানে থাকতে পেতেন যাঁদের গান্ধীজি নিজে শুশ্রূষা করতেন। গান্ধীজি নিজের হাতে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পারচুরি শাস্ত্রীর ক্ষত পরিষ্কার করছেন এ ছবি আমরা সকলেই দেখেছি।

বাপুকুঠির প্রাঙ্গণ কাঠা-দুই জায়গা বাঁশের সুদৃশ্য বেড়া দিয়ে ঘেরা। দুটি নিমগাছ মাত্র আছে এই ঘেরার মধ্যে। পাথরের গোলনুড়ি বিছানো সবত্র। পূব-উত্তর কোণে আর একখানা ক্ষুদ্রতর কুটীর আছে। পূর্বে সেখানে ছিল বাপুর দপ্তরখানা ও ব্যক্তিগত সেবকের বাসস্থান। এখন আশ্রম কার্যালয় হয়েছে এই বাড়িতে।

বাপুকুঠির প্রবেশ পথে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় লেখা কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি আছে। জুতো পরে ঢোকা নিষেধ। দর্শনার্থীর নাম ঠিকানা পেশা ও মন্তব্য লিখবার খাতা আছে। পৃথিবীর সবদেশের মানুষই এই গান্ধী-তীর্থে পদার্পণ করে থাকেন। তাই এই খাতাগুলি নানা দিক থেকে একদিন খুব মূল্যবান্ দলিল বলে বিবেচিত হবে। আমরা আমাদের নাম ঠিকানা পেশা লিখলাম, কিন্তু কোন মন্তব্য করিনি।

আর একটি অপেক্ষাকৃত বড বিজ্ঞপ্তির প্রতি আপনার দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হবে। সেটি হলো গান্ধী-কথিত সপ্ত সামাজিক পাপ। বাংলায় এগুলি হলো :

(১) নীতি-বর্জিত রাজনীতি,
(২) শ্রম বর্জিত সম্পদ,
(৩) নৈতিকতা-বর্জিত বাণিজ্য,
(৪) চরিত্র-বর্জিত শিক্ষা,
(৫) বিবেক-বর্জিত আনন্দ,
(৬) মনুষ্যত্ব-বর্জিত বিজ্ঞান, ও
(৭) ত্যাগ-বর্জিত পূজা।

কি গভীর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তবে এত অল্প কথায় এমন সামগ্রিক জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেওয়া যায় তা অনুমান-সাপেক্ষ। গান্ধীজিকে মানি আর নাই মানি এই পাপ মুক্ত না হলে কোন দেশে কেউ মানুষের মত বাঁচতে পারবে না এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

গান্ধীজি থাকতে স্বভাবতই আশ্রম ব্যাপারে তাঁর কথাই শেষ কথা বলে গৃহীত হতো। তিনি অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত কখনো কারো উপর চাপিয়ে দিতেন না। নানা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দেবার জন্ত একখানা খাতা ছিল। তাতেই গান্ধীজি একবার লিখেছিলেন—It is (আশ্রম ব্যাপারে গান্ধীজি-প্রদত্ত নির্দেশ) not to be regarded as a command. Everything is to be considered on its merits and only what the mind accepts is to be followed. আশ্রম-বাসীদের এতটা স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজির প্রাধান্য শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নিজের কর্ম ও সুবিবেচনার দ্বারা গান্ধীজি এই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

বাপুকুঠির সামনে একটি পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ প্রার্থনাভূমি ছিল। এই স্থানটিতে এখনো প্রার্থনা করা হয়। সেবাগ্রামে বসবাসের সময় গান্ধীজি ঐখানে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন। এই প্রার্থনা সভায় সুস্থ ও সক্ষম সকলের উপস্থিতি আবশ্যিক বিবেচিত হতো। গীতা, তুলসী রামায়ণ, কোরাণ, জেন্দ আবেস্তা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও ভজন ছিল প্রার্থনার অন্ততম প্রধান অঙ্গ। সেবাগ্রামের স্থানীয় ভাষা মারাঠী। তাই মারাঠী গীতার থেকে আবৃত্তি করা হতো। গীতাই বিনোবাজি কৃত মারাঠী ভাষায় পদ্য গীতা। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে বইখানি পঠিত হয়।

স্থানীয় ভাষা মারাঠী হলে কি হবে, আশ্রমের ব্যবহৃত ভাষা ছিল হিন্দুস্থানী। ভারতবর্ষের সব ভাষাভাষী নরনারী এই স্থানে সমবেত হতেন। সুতরাং ভাষা ব্যাপারে একটি নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে হিন্দীর উপযুক্ততা গান্ধীজি স্বীকার করতেন। সেই ভাষাকে তিনি

আশ্রমের ভাষা করে তোলেন। কিন্তু যাঁরা হিন্দী জানেন না তাঁদের সঙ্গে কাজকারবার ইংরেজীতেই করা হয়। হিন্দী প্রচার ও প্রচলন গান্ধী জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। তিনি এ জন্য হিন্দুস্থানী প্রচার সভাও স্থাপন করেন।

মহাত্মার পরলোক গমনের পর আশ্রম পরিচালনা নিয়ে নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। এখন 'সেবাগ্রাম আশ্রম ট্রাষ্ট' নামে একটি স্বতন্ত্র কমিটির হাতে এ ভার ন্যস্ত হয়েছে। যমুনালাল বাজাজের জামাতা প্রসিদ্ধ গান্ধীবাদী নেতা শ্রীশ্রীমননারায়ণজি ইহার সভাপতি পদে বৃত হয়েছেন।

সেবাগ্রামের কুটীরগুলি ঐতিহাসিক গৃহের মর্যাদা দাবি করতে পারে। প্রতিটি গৃহের পরিচয় হিন্দী এবং ইংরেজীতে সুন্দর করে সংক্ষেপে বিজ্ঞাপিত আছে। 'বাপুকুঠির' ঠিক সামনেই 'বা কুঠি', কস্তুর বা এখানে থাকতেন। 'বা' শব্দের অর্থ 'মা'। দীর্ঘকাল যাবৎ কস্তুরবাঈ গান্ধী সেবা ও সহনশীলতা দ্বারা গান্ধীজি সমেত সকলের নিকটই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বা' হয়ে ওঠেন। এই ঘর থেকে ১৯৪২ সনের ২ আগষ্ট কস্তুর বা গান্ধীজির সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করেন। আর ফিরে আসেন নি। বোম্বাইতে তিনি ধৃত হন এবং আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় ১৯৪৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। বাপুকুঠির পেছনে গান্ধী-সচিব মহাদেব দেশাইয়ের বাসভবন।

গান্ধীজি যখন সেবাগ্রামে আসেন (মে, ১৯৩৬) তখন এখানে একখানা মাত্র কুটির ছিল। আর ভি গাওয়ের 'সেবাগ্রাম' পুস্তিকার ভূমিকায় শ্রীমননারায়ণজি লিখেছেন :—There was not a single cottage there for his residence and Sevagram was unconnceted with Wardha by road। মে মাসের দারুণ গরম ও রোদের মধ্যে গান্ধীজি ওয়ার্ধা থেকে পদব্রজে এখানে আসেন। তাঁর এই যাত্রায় শ্রীমন-নারায়ণজি সঙ্গী ছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, গ্রামসেবা কাজের জন্য মীরা বেন একখানা কুটীর তৈরি করেছিলেন—সেখানেই মহাত্মা বসবাস করতে থাকেন। এই ঘরখানির নাম এখন 'আদি নিবাস'।

শারীরিক চিকিৎসার প্রয়োজনে গান্ধীজি মাটির ঘর ছেড়ে পাথরের মেঝেওয়ালা একটা কুটীরে উঠে যান। যমুনালাল বাজাজ এখানি নিজের থাকবার জন্য তৈরী করান। অতিথি ভবন রূপেও এটি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে এখানে হরিজন সেবা দপ্তর আছে। এই ঘর থেকে ১৯৪৬ সনের ২৫শে আগষ্ট গান্ধীজি দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লী থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়া-খালির গ্রামে চলে যান। তারপর কলকাতা ও বিহার হয়ে দিল্লীতেই ফেরেন এবং সেখানেই ইহলীলা সম্বরণ করেন (৩০ জানুয়ারী, '৪৮)। সেবাগ্রামে আর ফেরা হয় নি। এই বাড়িটির নাম হয়েছে 'আখিরি নিবাস' অর্থাৎ শেষ বাসস্থান।

এ ছাড়া রয়েছে 'কিশোরীলাল নিবাস' (কিশোরী লাল মশরুওয়ালার বাসভবন), 'পারচুরি কুঠি' (পণ্ডিত পারচুরি শাস্ত্রী), রুমারাপ্পা কুঠি, রুস্তম কুঠি, আশাদেবী নিবাস ইত্যাদি। পারচুরি শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। যারবেদা জেলে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কারামুক্তির পর তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। আত্মীয় স্বজনেরা ভয়ে তাঁকে বর্জন করলে আশ্রয়ের জন্য তিনি গান্ধীজির নিকট আসেন। গান্ধীজি নিজহাতে পারচুরি শাস্ত্রীর কুষ্ঠক্ষত ধুইয়ে ঔষধ লাগিয়ে দিতেন। এর ফলে কুষ্ঠ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরি-বর্তন হয়ে যায়। কুষ্ঠসেবা গঠন কর্মের মধ্যে স্থান পায়। আজ সেবাগ্রামের অনতিদূরে দত্তপুরে যে বিশাল কুষ্ঠাশ্রম গড়ে উঠেছে তার শুরু হয়েছিল, বলা যায়, মহাত্মার দ্বারা এই সেবাগ্রামে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৫১ সনে গান্ধী কর্মের অনুরাগী জনেরা গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন স্থাপিত করেন। এই সংস্থা ইতিমধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এঁদের তত্ত্বাবধানে একটি হাসপাতাল চলছে। কুষ্ঠ সেবা কর্মকে সুগঠিত আকার দান করার জন্য ১৯৩৬ সনে মহারোগী সেবামণ্ডল গঠিত

হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন সর্বসেবা সংঘের সঙ্গে মিশে গেছে।

এখন যে বাড়িতে নঈ তালিমের আপিস, ওখানে বসেই গান্ধীজি বিখ্যাত "কুইট ইণ্ডিয়া" বা ভারত ছাড়ো প্রস্তাব রচনা করেন। ১৯৪৯ সনে যে গৃহে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন হয়েছিল তার নাম হয়েছে "শান্তিভবন"। এর প্রায় নয় বছর আগে ১৯৪০ সনে মহাত্মা গান্ধী এই বাড়িতেই বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণের উদ্বোধন করেন। শান্তিভবনের সামনে হলো ঘণ্টা-ঘর। যে ঘণ্টাধ্বনি করে মহাত্মা ভিলেজ ইনডাসট্রিজ কোর্ট উদ্বোধন করেছিলেন সেই ঘণ্টাটিই এখানে রাখা হয়েছে বলে শুনলাম।

পাশেই কয়েকটি ছোট বড় গাছের সুদৃশ্য জটলা। তারই মধ্যে আশ্রমে পানীয় জলের কূপ। বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে জলবাহী নলের মধ্য দিয়ে সারা আশ্রমে এই জল সরবরাহ করা হয়। পাশে একটি স্তম্ভের উৎকীর্ণ বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, যার দৃষ্টিশক্তি নেই সে-ই কেবল অন্ধ নয়। যিনি নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখেন তিনিও অন্ধ; অন্যায়কারী বা পাপী নন, অন্ধ— এইখানেই গান্ধীজির বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতার পর (গান্ধীজির তিরোধানের পর বলাই যুক্তি সঙ্গত) আশ্রমের কাজকর্মে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বহিরঙ্গেও অদল বদল ঘটেছে। তবে অভিজ্ঞজনেরা বলেছেন মূল চেহারাটা মোটামুটি অবিকৃতই আছে। কলের জল, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এসেছে। কিছু কিছু নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে। পূর্বেই বলেছি গান্ধীজি যে দিন প্রথম আসেন তখন ওয়ার্ধা থেকে পায়ে হাঁটা পথও ছিল না। এখন সুন্দর পীচ-ঢালা রাস্তা। ডাক ও তার ঘরও হয়েছে।

কস্তুরবা স্মৃতি তহবিল থেকে গ্রাম সেবার কাজ শুরু হয়। ঐ কাজের একটি শাখাকে কেন্দ্র করে এখানেই ভারতবর্ষের প্রথম গ্রামীণ মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে। তেমনি কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে গান্ধী প্রবর্তিত ও পোষিত গ্রাম সেবার নানা উদ্যোগ।

অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হলো হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ (বর্তমানে সর্বসেবা সংঘের অন্তর্ভুক্ত), যাঁরা ভারতবর্ষে বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্য চলছে তার হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে জাতীয় দুর্যোগ কাটবে না এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। গত তিন-চার দশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তথা প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যে-সব নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ও বিদ্যাদির প্রবর্তনা ঘটেছে সেই মূলধারা থেকে সরে এলে লেখাপড়া অর্থহীন হয়ে পড়বে। ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নিজেদের ভাষায় ভাষান্তরিত করবার মত সহায় সম্বল বা সময়ের খুব অভাব। একটা অনুবাদ শেষ করতে দুটো নতুন জিনিস বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর আছে ইংরেজি শিক্ষার মোহ। ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে ইংরেজীর কৌলীন্য স্বীকৃত। এই কারণে আমরা নিজেরা কোন পথ করতে পারছি না। এমন কি গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষাও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। দেশ ভাগ হওয়ার জন্য অভিমানসঞ্জাত ক্রোধে যেমন আমরা কেউ কেউ অন্ধ হয়েছি এবং গান্ধী প্রবর্তিত বিধি ব্যবস্থা ও কল্যাণকর জেনেও তার বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করছি। সরকারী ভ্রান্ত নীতিও এ জন্য কম দায়ী নয়।

এই তালিমের সিদ্ধান্তানুসারে একটি ছাত্রকে ১১ বছর বিনা খরচায় ছাত্রাবাসে রেখে পড়াতে হবে। কেতাবী লেখাপড়ার সঙ্গে ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায় ছাত্রদের হাতে হাতিয়ারে কাজ করতে হবে। বলতে পারেন এত কলকারখানাই বা কোথায় অর্থ-ই বা দেবে কে? কলকারখানার অভাব বলেই তো গান্ধীজি চরকার কথা বলেছিলেন। আর ক্ষেত খামারের তো অভাব নেই। কৃষি কাজ, শস্য সংরক্ষণ, খাদি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি, গণতান্ত্রিক বিধিবিধান, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ ও শরীর চর্চায় অংশ গ্রহণ আবশ্যিক করতে হবে। এতে নেহাৎ কম আয় হবে না। সেই

আয়ের দ্বারা বারো আনা খরচ নির্বাহ হতে পারে। এখন এক-একটা ছাত্রের জন্য সরকার বিস্তর ব্যয় করেন। কারো কারো হিসাবে একটা ছেলেকে ডাক্তার বানাতে সরকারের ৮০/৯০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই রকম ব্যয় সব ব্যাপারেই। তবে এর "সিংহ" ভাগ জোটে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের ভাগ্যে। গ্রাম ভারতের দরিদ্র মানুষেরা কদাচিৎ এ সুযোগ পান। সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করে কাজ করলে গ্রামের মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেই এ কাজ করা যায়। লোক মুখে শুনি, চীন সামান্য পরিবর্তিত আকারে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের সহকারী সভানেত্রী শ্রীমতী তারা আলি বেগ সম্প্রতি চীন সফর করে এসে সেঞ্চুরী পত্রিকায় পরিবেশিত (জুলাই ১৪, ৭৩) একটি রচনায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশিত করেছেন।

কোটি কোটি মানুষ আজ বেকার। কর্মহীনতা শাঁখের করাত। এই বেকারেরা যে কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ উৎপাদন করতে পারতেন দেশ তা থেকে বঞ্চিত হয়, অপর দিকে কর্মরত মানুষের উৎপন্ন সামগ্রী ভোগ করে বেকারগণ জীবনধারণ করতে বাধ্য হয় বলে উৎপাদকেরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন। ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর অথচ জনবহুল দেশে এই দুর্বিষহ অবস্থার প্রতিকারকল্পে আধুনিক জটিল যন্ত্র-বিজ্ঞান অপেক্ষা খাদি ও গ্রামোদ্যোগের মামুলি কাজ-কর্মই প্রশস্ত এই কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও সরকার এ দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দেন নি। যত দিন যাচ্ছে ততই অবস্থা অসহনীয় ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিকৃত বা ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রভাবে গান্ধীজি চরকা ও কুটীর শিল্প নিয়ে গোঁড়ামি করেন নি। গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশে নামমাত্র মূলধন নিয়োগ করে তথাকথিত শিক্ষা ও শিক্ষণহীন মানুষকে কাজ দেবার সুসাধ্য উপায় চরকা ও কুটীর শিল্প। এটাই ভারতবর্ষের জরুরীতম সমস্যার ভারতীয় সমাধান। এটাই গান্ধী পথ। এটাই মুক্তির পথ।

চরকা ও কুটীর শিল্পে ক্ষেত্রে উন্নতির কোন অবকাশ নেই এ কথা গান্ধীজি মানতেন না। উন্নত ধরনের চরকা উদ্ভাবনের জন্য তিনি একবার একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেবাগ্রামের খাদি বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। বিদ্যুৎ চালিত অম্বর চরকা প্রচলন চেষ্টা চলছে। তুলা চাষ থেকে শুরু করে কাপড় তৈরী অবধি যাবতীয় কাজও এখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শেখানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা কার্যও চলে। আচার্য বিনোবা ভাবে এবং কৃপালানীজির মত খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিগণ একদা এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। এটি এখন খাদি রিসার্চ ইনস্টিটিউট রূপে খাদি কমিশনের তত্ত্বাবধানে চলে বলে শুনলাম।

গান্ধীজি প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত সেবাগ্রামের কৃষি ও গো-উন্নয়ন এবং শিল্প শিক্ষার বিবিধ কার্যক্রম এখন নঈ তালিম সমাজের অধীনে আনা হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পকে একটি সুসংগঠিত সংস্থার অধীনে আনবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজির নির্দেশে ১৯৩৪ সনে ভিলেজ ইনডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এ সম্পর্কে তিনি হরিজন পত্রিকায় লেখেন: গ্রাম-বাসীর জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে যে দুর্গতি ঘটেছে তার প্রতিকারের জন্য এই সংঘ পরিকল্পিত হয়েছে।

গান্ধীজির দৃষ্টিতে পরাধীনতা মোচনের কাজকর্মের গুরুত্ব যে খুবই বেশি ছিল তা বলাই বাহুল্য। তৎসত্ত্বেও তিনি একদিকে খাদি, কুটীর শিল্প, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাকার গঠন কাজ এবং অন্যদিকে ভিটামিন, স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, আহার ও রন্ধন প্রণালী নিয়ে তিনি নিরন্তর আলোচনা এবং এই সেবাগ্রামে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এই সব দেখে প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ল্যুই ফিশার লিখেছেন: His greatness lay in doing what everybody could do but doesn't। আমরা যে যতটা করতে সমর্থ সেই-টুকু মাত্র ঠিক মত করলে বোধ করি দেশের এই দুর্দশা হতো না। শিল্পোন্নত জার্মানী একদা (হিটলারের

আমলে) দেশ থেকে কর্মহীনতা ঘোচাতে বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের উচ্ছেদ করে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন করেন।

কস্তুরবা হেলথ সোসাইটি হাল আমলের অন্যতম সুবৃহৎ সংগঠন।

সেবাগ্রামে ১৯৩৬ সনে খুবই ক্ষুদ্রাকারে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়। কস্তুরবার পরলোক গমনের পর (১৯৪৪) তাঁর স্মৃতিরক্ষার অঙ্গরূপে সেবাগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে কেন্দ্র করে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এখানেই প্রথম স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা চালু করা হয়। কস্তুরবা ট্রাস্ট থেকে মহিলাদের ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুমঙ্গল কর্মের শিক্ষা দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়। কস্তুরবা ট্রাস্টের মহিলা কর্মীগণ সারা ভারতের বহু জনসেবার কাজে নিযুক্ত আছেন। এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের প্রথম গ্রামীণ মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ মেডিকেল কলেজ; কিন্তু পড়ুয়াদের দেখে মনে হলো তারা সকলেই শহরের ছেলেমেয়ে। অর্জুন লেখাপড়ার ধারা ও এখানকার জীবনধারণের ধরণধারণ তাদের শহুরে করে তুলেছে। এরা ফিরে গিয়ে গ্রাম সমাজে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা বোধ করবে। তাদের দু-এক-জনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে এঁরা গ্রামের মানুষের সেবা করতে নারাজ নয়। অর্থাৎ কোন কোন ডাক্তারদের মত এঁরা গ্রামে যেতে অস্বীকার করেন না। কিন্তু শহরের সুখ সুবিধা ও সচ্ছলতা তাঁরা গ্রামে প্রত্যাশা করেন।

কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়িয়ে প্রধান সড়ক ধরে সামান্য এগোলেই বাঁ হাতে গান্ধী সেবা সংঘ। এটি একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান, যমুনালাল বাজাজ এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী জোগানোর উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়। গান্ধী অনুরাগীদের অন্যতম প্রাচীনতর সংস্থা এটি। অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইনডাসট্রিজ এসোসিয়েশন, তালিমী সংঘ, কাটুনী সংঘ ইত্যাদি অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এর অনেক পরে গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনের মহাত্মাজির দেহাবসানের পর এবং বর্তমান সময়ের চাপে সেবাগ্রামের বহু অখিল ভারতীয় সংস্থার আকার আকৃতি ও কর্মধারার নবরূপায়ণ ঘটেছে। গান্ধী সেবা সংঘের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে।

ঢাকার মালিকান্দাতে গান্ধী সেবা সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী তখন বাংলা ভ্রমণ করছেন। তিনি অধিবেশনে যোগদান করেন। বর্তমানে আন্না সাহেব সহস্রবুদ্ধে এর সভাপতি।

সেবাগ্রামের হাতার বাইরে কয়েকটি গান্ধী প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে প্রথমেই মনে আসেওয়ার্ধা সেবাগ্রামের পথে গড়ে ওঠা মহিলাশ্রমটির কথা। এ অঞ্চলে গান্ধী কর্মযজ্ঞ শুরু হবার অনেক আগে ১৯২৪ সনে যমুনালাল বাজাজ যে হিন্দু মহিলা মণ্ডল স্থাপন করেন তাই ক্রমে মহাত্মাজির আগ্রহে ও বিনোবাজীর প্রত্যক্ষ সেবায় মহিলাশ্রমের রূপ পেয়েছে। আচার্য বিনোবা ভাবে এখানে দীর্ঘ বারো বছর বাস করেছেন। এ তাঁর তপস্যা ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে সরকারের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে এটি এখন কন্যা শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে। পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য সঞ্জাত প্রভূত সচ্ছলতার চিহ্ন আশ্রমের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে; তবুও গান্ধীজির আদর্শ রক্ষা করে চলার একটা সচেতন প্রয়াস এখানকার কাজে কর্মে বেশ অনুভব করা যায়।

গ্রাম সেবা মণ্ডলের কথাও একটু বলা দরকার। খাদি উৎপাদনের সরঞ্জাম প্রস্তুত, গোশালা এবং স্বরাজ্য ভাণ্ডার ইত্যাদি স্বয়ম্ভরতার আদর্শে মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। গান্ধীজির পরিকল্পনাকে অপূর্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তব রূপ দেন বিনোবাজি। যৌবন থেকেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসন্ধানী এই ঋষিকল্প মানুষটির নিকট প্রত্যেকটি কাজ ছিল তাঁর ব্রহ্মসাধনার অঙ্গ। তাই সামান্য সামান্য কাজ তাঁর হাতে পড়ে অসামান্য হয়ে উঠত।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে গ্রাম সেবা মণ্ডলের চর্মশিল্প বিভাগে কেবলমাত্র মৃত পশুর চামড়া ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা হতো, কসাইখানায় বা অন্যত্র জবাই করা গরু-বাছুরের চামড়া হাড়-গোড় প্রভৃতি এখানে ব্যবহৃত হতো না। গো-হত্যা পাপ বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন?

গরু প্রসঙ্গে গো-সেবা সংঘের কথাটা বলে নিই। ১৯৪১ সনে আদর্শ গো-শালা রূপে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গো-সম্পদের উন্নয়ন-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতে গরুর সংখ্যা বিপুল। কিন্তু সেগুলি সুস্থ ও সবল নয় বলে সম্পদ না হয়ে ভার হয়ে আছে। গ্রামীণ অর্থ-নীতিতে যেমন তেমনি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নত গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গান্ধীজির পূর্বে এদিকে কারো কার্যকর দৃষ্টি পড়ে নি। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের নজর ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে আঞ্চলিক ভাষায় দুধকে বলা হয় গোরস।

সেবাগ্রামে কিছু কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার পরে গড়ে উঠেছে। গান্ধী ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়ান্স তার অন্যতম। এর ছাত্রাবাসটির নাম হয়েছে জওহরলাল নেহরু হোস্টেল। মহাদেব দেশাইয়ের স্মৃতি-মন্দির "মহাদেব ভাই ভবন"। গান্ধী জীবনের নানা ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হল এটি।

মগন সংগ্রহশালাটি ওয়ার্ধায় অবস্থিত। নানা কারণে মগনলাল বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। সত্যাগ্রহ শব্দটির সন্ধান গান্ধীজি তাঁর নিকট পান। চরখার তিনি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকেই গান্ধী-কর্ম-পথের শ্রদ্ধাশীল অনুরাগী এই মগনলালের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সনে গান্ধীজি মগন সংগ্রহশালা উদ্বোধন করেন। চরখা ও কুটীর শিল্পের একটি প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনী আছে এখানে। দেশ বিদেশ থেকে গান্ধীজি যে সব উপহার পেয়েছেন তা এখানে প্রদর্শীত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যে খাদি উৎপাদিত হয় তার নমুনাও এখানে রয়েছে।

সেবাগ্রাম আশ্রমের দক্ষিণ প্রান্তে খাদিও গ্রামীণ শিল্প এবং গান্ধী সাহিত্য বিক্রয়ের একটি দোকান আছে। নিকটেই গান্ধীজির এক পুত্রবধূ (রামদাস গান্ধীর স্ত্রী) বাস করেন। আশ্রমের খুব কাছাকাছি কোন জনপদ নেই। তবে নিকটবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে গান্ধীজি থাকতে খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গ্রাম জীবনের প্রধান ধারার (main stream) সঙ্গে আশ্রমের কাজকর্ম মিলিয়ে দেবার জন্য গান্ধীজি সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। আশ্রমের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে গ্রাম থেকে পৃথক হয়ে তিনি থাকতে চান নি। তা সত্ত্বেও আশ্রম কিন্তু গ্রামের অংশ হয়ে ওঠে নি। গান্ধীজি ছিলেন গ্রামবাসীদের যোগসূত্র। তাঁর অবর্তমানে আশ্রমের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

সেবাগ্রামে প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য সহজেই চোখে পড়ে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, মনোরম কৃষিক্ষেত্র। বাপুর স্নেহধন্য সাহচর্য লাভে গর্বিত কিছু মানুষ এখনো আশ্রমে আছেন। উৎসাহী শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা পেলে অনেকেই স্মৃতিচারণ করতে দ্বিধা করেন না। তাঁদের টুকিটাকি কথা থেকে ইতিহাস রচিত হতে পারে। এঁদের কথা থেকে জানা যায় গান্ধীজী ঘুরে ঘুরে প্রায় প্রত্যহই ছোটবড় সকল আশ্রমবাসীর খোঁজ খবর নিতেন; ছোট বড় ভেদ ছিল না। গাঁয়ের মানুষের অসুখ বিসুখে গান্ধীজি ঔষধ দিতেন। তা ছিল সস্তা ও সহজলভ্য দেশজ ঔষধ। পারিবারিক গোলমাল ও গ্রামসমাজের ঝগড়াঝাঁটি কেমন কেমন নিপুণভাবে গান্ধীজি মেটাতেন তাও আপনি চেষ্টা করলেন জানতে পারবেন।

গান্ধীজির অবর্তমানে আশ্রমটিকে যাঁরা কিছুটা প্রাণবন্ত করে রাখতে পারতেন তাঁরা প্রায় সকলেই হয় পরপারে না হয় অন্যত্র চলে গেছেন। গান্ধী প্রতি-ষ্ঠানগুলি পরিচালনার মূল প্রতিষ্ঠান সর্বসেবা সংঘের সদর দপ্তর সেবাগ্রামে নয়, গোপুরীতে। গান্ধীজির সার্থকতম উত্তর সাধক পুজ্যপদে বিনোবাজি পাওনারে ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির স্থাপন করেছেন। ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে তিনি এখন সেখানেই বসবাস করছেন। মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবাজির কর্ম ঠিক এক পর্যায়ে পড়ে না। উভয়ের কর্মধারার মধ্যে মিল যেমন আছে, গরমিলও রয়েছে তেমনি। সুতরাং বিনোবাজি পৃথক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ঠিক কাজই করেছেন বলতে হবে। এটি সেবাগ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়—হাঁটা পথে ৪/৫ মাইল। বাসেও

যাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ওয়ার্ধা থেকেও মাইল ছয়েক হবে। তবে সুন্দর পীচঢালা পথ। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস চলে। এই পথই পাওনার হয়ে নাগপুর গেছে। পাওনারে বিনোবাজির ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের কথায় আসবার আগে সেবাগ্রাম প্রসঙ্গটি শেষ করে নিই।

সমসাময়িক ভারতবর্ষের বহু উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহাপ্রাণ মানুষ সেবাগ্রামের মাটিতে এসে মহামানব মহাত্মার চারিপাশে ভিড় করেছিলেন। যাঁরা তেমন খ্যাতি লাভ করেন নি, নেপথ্যে রয়ে গেছেন তাঁরাও ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করলে সরকারী ক্ষমতার সাহায্যে বড় চাকরি অথবা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। কেউ কেউ এই সহজিয়া পথের ভজনা যে করেন নি তা নয়। তাঁদের কেউ এখন সেবাগ্রামে নেই। এখানে প্রধানত দুই শ্রেণীর মানুষ এখন আছেন। (১) যাঁরা গান্ধী অনুরাগে আকৃষ্ট অথবা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বা উভয় কারণেই সেবাগ্রামকে তীর্থ বলে মনে করেন এবং ছেড়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেন নি। এবং (২) সেবাগ্রামের বাইরে যাদের জীবন ও জীবিকার কোন নিশ্চয়তা নেই। এদের বহুজনে একদা প্রাচুর্যের শিখর থেকে নেমে এসে গান্ধী আশ্রমের দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। দেশের কল্যাণ হবে, নিজের ভাল হবে এই বিশ্বাসেই তাঁরা তা করেছেন। ভারতের বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসে গান্ধী পরিবারে যুক্ত হয়েছেন। বহু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা সেবাগ্রামে গান্ধীজির নিকট আসতেন, কিন্তু উঠতেন এসে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস হোষ্টেলে। সেবাগ্রামে খুব কম থেকেছেন। গান্ধীজির ভক্তের সংখ্যা এই সব নেতাদের মধ্যে অনেক। তাঁরা স্বাধীন ভারতের কর্ণধার হয়েছিলেন। জনসাধারণের সীমাহীন আনুগত্য ও অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও গান্ধীজীকে তারা না পেরেছেন আদর্শ মার্গে বাঁচিয়ে রাখতে, না পেরেছিলেন আততায়ীর হাত থেকে বাঁচাতে।

গান্ধীজির নামে কিছু সংস্থা তাঁরা অবশ্য গড়ে দিয়েছেন। যেমন তৈরী করেছেন দেশ জুড়ে বহুসংখ্যক গান্ধী মন্দির। ঐ সব সংস্থায় অর্থের প্রাচুর্য। গোড়ায় নিষ্ঠাবান্ কিছু গান্ধীভক্ত ও গান্ধী দর্শনে অনুরাগী মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধীরে ধীরে, বোধ হয় আর্থিক প্রাচুর্যের ফলেই এর অনেকগুলি বিবিধ ভ্রষ্টাচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। অনেকে তো আবার মার্কস লেনিন মাওয়ের বিচারে গান্ধীজিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবার হাস্যকর প্রয়াসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরা বিভিন্ন ইংরেজী বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন, মোটরে চড়ে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করেন, সংস্থার খরচে হাওয়াই জাহাজে চড়ে দেশের অভ্যন্তরেও দেশান্তরে পাড়ি জমান এবং নানাবিধ ফাউণ্ডেশনের টাকায় ইউরোপ আমেরিকা হিল্লীদিল্লী করে বেড়ান। এরা কেউ গান্ধীজিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। নিষ্ঠাবান্ অনুরাগীজনেরা, যাঁরা এখনও সেবাগ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তাঁদের মধ্যেই গান্ধীজি বেঁচে থাকবেন। তাঁদের সাধনার দ্বারা গান্ধী ভাব ও ভাবনা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেই। আজ ভূদান গ্রামদানের মত মহা বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী গান্ধী চিন্তনের ফল। বাঙালীর জয়, মারাঠীর জয়, বহু পূর্বেই ভারত মাতা কি জয়-এ রূপান্তরিত হয়েছে। আজ তা ভারতের সীমা অতিক্রম করে জয় জগৎ ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে। গান্ধী চিন্তার অনুক্রম ও অগ্রগতির ঘটনা এগুলি।

পৃথিবীর সব দেশেই ধীরে ধীরে গান্ধী চিন্তা কোন না কোন আকারে প্রসার লাভ করছে। আইন করে জবরদস্তির দ্বারা অথবা বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বদল করা যেতে পারে আর তার দ্বারা সাময়িক কিছু সুফলও মিলতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সুফল পেতে হলে মানুষের চিন্তা ও চরিত্রের রূপান্তর ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে গান্ধী পথ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। জনজীবনে গান্ধীজির প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের বিচারবোধ তথা বিচারধারাটাই যে ত্রুটিপূর্ণ তা সেবাগ্রাম দেখার পর, এখানকার আশ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবার পর আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

ক্রমশঃ

অনুসন্ধান

অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

রোজ রাতে খাওয়ার পর খানিক সময় পায়চারি করা আমার অনেকদিনের অভ্যেস। খেয়ে উঠে আমাদের বাড়ির সামনের গলিটায় সাধারণতঃ পায়চারি করি। কারণ দক্ষিণ কলকাতার যে অঞ্চলটায় আমাদের আস্তানা সেখানে আলো বাতাস প্রায় ঢোকে না বললেই হয়। ছোট্ট বাড়িটার ভেতরে বাইরে রকের নামগন্ধও নেই। সেটুকুন জায়গা, পরিবারের মানুষ হিসেব করে প্রয়োজনমাফিক ঘর উঠেছে। ঘরের মধ্যেও পায়চারি করা দুঃসাধ্য। তাই বাধ্য হ'য়ে গলিটায় নেমে আসতে হয়। পায়চারি ক'রে যখন শুতে যাই প্রায় রোজই তখন গ্রীনউইচ সময়ে নতুন দিন শুরু হয়।

আজও পায়চারি করছি রুটিন মত। আজকের গরমটাও বেশ কষ্টদায়ক। তাই পায়চারি শেষ ক'রে ঘরে যাই যাই ক'রেও এমাথা ওমাথা ঘুরে চলেছি। রাত বারোটা বেজে গেছে। যে যে জায়গা থেকে বেল বাজে বা ভোঁ পড়ে, সবগুলোই আমার কানে এসেছে।

টুংটুং শব্দে একটা রিক্শা এসে দাঁড়াল পাশের বাড়ির সামনে। টলতে টলতে একটি লোক নামল রিক্শা থেকে। আমার চোখে নতুন কিছু নয়। গভীর রাতে, এমনকি আজকাল দিনের বেলায়ও এমনি দৃশ্য মহানগরীর পথে-ঘাটে হরহামেশাই চোখে পড়ে। রিক্শাটা দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। ইচ্ছে না থাকলেও এমনি ঘটনায় মানুষের চোখ প্রায়ই চলে যায়। আমারও তাই হ'ল। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় আমিও চেয়ে থাকি নীরবে।

ওই বাড়ির দরজাটা খুলেই লোকটির মুখের ওপর আবার দড়াম ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল। দরজা কে খুলল, লোকটির সঙ্গে তার কি কথা হ'লো এত দূর থেকে আমি শুনতে পাই না। লোকটি ওই বাড়ির দরজা থেকে রাস্তায় রিক্শাওয়ালার সামনে নেমে এল।

বেশ উত্তেজিত এবং জড়ানো গলায় রিক্শাওয়ালাকে বললে, তুই ভুল ক'রে আমাকে এ কোথায় নিয়ে এসেছিস?

রিক্শাওয়ালাও বেশ ঝাঁঝ মিশিয়ে বললে, আমি আনলাম কই বাবু? আপনিই তো আমাকে বোললেন এখানে আনতে।

—ঝুট্ মাত বোলো।

—হামলোক ঝুট বলতা নেহি। আপ ঝুট বল্তা হায়।

লোকটি রিক্শাওয়ালাকে বেশ চোস্ত রকমের একটি গালাগাল দিয়ে বলল, দেখো, গল্তি মাফ্ করো। আমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতেই হবে। এত রাতে আমি তো আর এখান থেকে হেঁটে যেতে পারব না। হেঁটে গেলে পথ ভুল হ'তে পারে।

রিক্শাওয়ালা হাত আর মাথা নেড়ে বললে, হাম যাবেনা বাবু। আপনি হামার ভাড়া দিয়ে দিন।

এগিয়ে যাই ওদের বচসা দেখে। আমাকে দেখে ওরা কেমন যেন থেমে যায়। বিশেষতঃ রিক্শার সওয়ারীটি। [illegible] থেকে [illegible] দেখতে থাকে। রিক্শাওয়ালার [illegible]। দর-দর ক'রে ঘাম ঝরছে ওর শরীর থেকে।

ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই রিক্শাওয়ালা বললে, ভবানীপুর থেকে এ বাবুকে নিয়ে আসছি। বাবুলোগ এক দফা বল্তা হায় ইধার যাওগা, ফির বল্তা হায়, [illegible] জায়গামে। বাবু [illegible] আদমী আছে। হামি আর বাবুর সাথে যাবেনা।

আমি এবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি, আসছেন কোত্থেকে ? যাবেন কোথায় ?

ভদ্রলোক যে জায়গার নাম করলেন এখান থেকে তার দূরত্ব হাঁটা পথে প্রায় আধ ঘণ্টা। আমি রিক্শা-ওয়ালাকে আরেকবার জিজ্ঞেস ক'রলাম সে যাবে কি না। রিক্শাওয়ালা মাথা নেড়ে অস্বীকার ক'রল। এমনকি সে আরও বলল, ভবানীপুর থেকে এখানে আসার ভাড়া না দিলেও সে যাবে না।

ভদ্রলোক বললেন, ও আমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারছে না। ভাবছে আমি ঠগ, ওকে নিয়ে যেয়ে ভাড়া দেব না। ওর ভাবটা ইতিহাসের সেই সময়টার মতন। সেই যে......আচ্ছা, সেই যে কোন্ সেঞ্চুরিতে হ'য়েছিল যেন ?

আমি কোন কথা বলি না। ইতিহাসে আমার মেধা এতই প্রখর যে পরীক্ষা-বৈতরণীতে এই বিষয়ে ডুবতে ডুবতেও কোনরকমে উৎরে গেছি।

রিক্শাওয়ালাকে বললাম, এই পর্যন্ত কত ভাড়া হ'য়েছে ?

—দু'টাকা বাবু।

এবার আমি ভদ্রলোককে বললাম, আপনি ওর ভাড়াটা দিয়ে দিন।

—সার্টেন্‌লি। দু'টাকা কেন, ওকে আমি চারটাকা দেব। কিন্তু আমাকে ওর পৌঁছে দিতে হবে। হেঁটে গেলে পথ খুঁজে নাও পেতে পারি।

—সে পথে ভ'রেখন। গম্ভীর স্বরে বললাম আমি।

আমার গলার আওয়াজে ভদ্রলোক কেমন কুঁচকে গেলেন। আর খাঁড়ুমাসি না ক'রে চারটে টাকা রিক্শা-ওয়ালাকে দিয়ে দিলেন। টুনটুন আওয়াজ ক'রতে ক'রতে রিক্শাওয়ালা গলির বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

আমি বললাম, চলুন আমার সঙ্গে। আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

নেশার ঘোরেও ভদ্রলোক একটু চমকালেন মনে হ'ল। নেশাগ্রস্ত চোখে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে থাকেন আমার দিকে। মনে হয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন চলছে ওঁর মনে।

—কি হ'ল ? দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি ? আসুন।

—সার্টেন্‌লি। যাবই তো। কিন্তু......আপনি...... আই মিন্ এই রাত্তে আমার সঙ্গে গেলে আপনাকেও লোকে মাতাল ভাববে না ?

—ভাবুক। কে কি ভাবল তাতে আমার কিছু যায় আসেনা।

আমার অবিচল কঠোরতায় ভদ্রলোক আমার দিকে ক্যাল্‌ক্যালিয়ে চেয়ে থাকেন। তারপর সামান্য একটু কুণ্ঠামাখানো হাসি বের ক'রে বললেন, নিয়মমতই একটু পান ক'রেছি কিনা, তাই একটু ইন্‌টক্সিকেটেড্ আছি, এই আর কি......। ব্যাপারটা কি জানেন ? একটু না খেলে মাথার মধ্যেকার চিন্তার জটটা ঠিক খুলতে চায় না।

আমি চিন্তাশীল নই। কিসে জট খোলে, কিসে খোলে না আমার জানা নেই। ও নিয়ে মাথাও ঘামাই না। এ ব্যাপারে আমি আদর্শ ভালো মানুষ নই, আবার নিয়মতান্ত্রিক পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আদিত্য রাখতে চাইনা।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, হাঁটতে পারবেন তো ?

—পারব না মানে ? মাত্র তো তিন বোতলের এ্যাক্‌শন্। বোতলকে বোতল টেনে এই প্রাণেশ চাটুজ্জে বৌকে পেছনে বসিয়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে মোটর-বাইক চালিয়ে গেছে। কই, হাত কাঁপেনি তো ! পা টলেনি তো! বয়েস বাড়লেও হাতযশ তো আর নষ্ট হয়নি।

আমরা হাঁটতে থাকি। যা ভেবেছিলাম তা নয়। ভদ্রলোক মোটামুটি টাল রেখেই হাঁটছেন আমার সঙ্গে।

মধ্যরাত্রের কলকাতা। শুনেছি, যাঁরা লেখক, যাঁরা কবি, তাঁরা নাকি গভীর রাতের নিদ্রাচ্ছন্ন মহানগরীর ভেতরের রূপ দেখতে হরহামেশাই বেরিয়ে থাকেন এমনি ক'রে। মহানগরীর সদাব্যস্ত প্রাণচঞ্চল ঝলমলে রূপের আড়ালে যে আরেকটি ক্ষত-দুষ্ট ক্লেদাক্ত সত্তা

রয়েছে, এই গভীর রাতে বাইরে না এলে তার নাকি দেখা মেলে না। কবি সাহিত্যিকরা ওই রূপ দেখেন, রসদ পান, ওই রসদ ছড়িয়ে দেন তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে। আমি লেখক নই। লেখকের অনুভূতিও আমার নেই। আমি বই পড়ি না। ওই জীবন সম্পর্কে পুঁথিগত জ্ঞানও আমার নেই। খেটে খাওয়া মানুষের ভোঁতা মন নিয়ে এই ব্যাপারে কোনদিন কোন কৌতূহলও বোধ করিনি। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমারও মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে গভীর রাত হয়। কোনদিন মহানগরীর নৈশ-রূপ চেয়েও দেখিনি। তবু কেন জানি না আজ এই মুহূর্তে ওই লোকটির পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটা হতাশাব্যঞ্জক প্রশ্ন বারবার আমাকে চাবুক মারতে থাকে, আমি যদি লেখক হতাম ?

এই যে রিক্শাওয়ালা আমাকে বিশ্বাস ক'রলোনা, এর জন্যে ওর কিন্তু কোন দোষ নেই।

প্রাণেশবাবুর কথায় আমি আবার বাস্তবে ফিরে আসি। মুখ দিয়ে শুধু সম্মতিসূচক একটা 'হুঁ' শব্দ করা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।

ব্যাপারটা, কি জানেন, আজকের দিনে আমরা পরস্পর একে অপরকে বিশ্বাস ক'রতে বোধহয় ভুলে গেছি। সত্যি, আমি ভেবে পাই না এমনি ক'রে আমরা কোথায় এগিয়ে চলেছি ? কেন মানুষ একদিন সমাজবদ্ধ হ'য়েছিল ? আপনার কি মনে হয় না মানুষের সমাজবদ্ধতার মূলে যে জিনিসটা সবচাইতে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিল তা হ'ল, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ?

প্রাণেশবাবু দাঁড়িয়ে প'ড়েছেন। আমাকেও দাঁড়াতে হয়। প্রাণেশবাবু আমার মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রয়েছেন। আমি বুঝতে পারিনা এ মাতালের প্রলাপ, না কি কোন চিন্তাবিদের ভাবনার ফসল। কলেজ-জীবনে পাঠ্য থাকায় বঙ্কিম চাটুজ্জের একটা বই প'ড়েছিলাম। সেই বইয়ের নায়ক এক আফিংখোর। আফিংয়ের মাত্রা চড়ালে নেশাটা যখন বেশ জমে উঠত, নেশার ঘোরে চিন্তার জট খুলে তার মাথা থেকে অদ্ভুত সব বাস্তব তত্ত্ব আর তথ্য বেরিয়ে আসতো। গোটা ব্যাপারটা ভাবতে যেয়ে আমি কেমন তালগোল হারিয়ে ফেলি।

আমাকে নীরব দেখে একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেললেন প্রাণেশবাবু।

তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন, মনে হয় আমার কথায় আপনি ঠিক সায় দিতে পারছেন না ? এতে আপনার অবশ্য দোষ নেই। প্রত্যেকেরই তো স্বতন্ত্র চিন্তাধারা থাকবে। তবে আমার কি মনে হয় জানেন ? এ অবস্থা খুব বেশিদিন চলতে পারে না। ইট্ মাষ্ট চেঞ্জ। এই যে ইউনিভার্স, এতো স্ট্যাটিক নয়, এ হ'ল ডাইনামিক। সেই যে আমাদের উপনিষদ বলেছে তমসার পর আলো……'

আবার হাঁটতে থাকি আমরা। রাস্তার বাঁকটা ঘুরতেই সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে একটা নেড়ি-কুকুর দু'চারবার আওয়াজ ক'রল। প্রতিবাদ করি না আমরা। কি মনে ক'রে ও আবার নিজেই থেমে গেল। কুকুরটার আওয়াজ থামতেই একটা নিস্তব্ধতা আবার আমাদের ঘিরে ধরে। নিঃশ্বাস ফেললেও শব্দটা যেন জোর মনে হয়। যে মহানগরী বিচিত্র কলতানে মুখর থাকে, সে যে এমনি নিস্তব্ধ হ'তে পারে, এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এই নিস্তব্ধ গলিপথে আমাদের চলার পথের সাক্ষী শুধু ওই নেড়ি-কুকুরটা, নিঃসঙ্গ স্ট্রীট্-লাইট্, আকাশের আবছা লেপা মেঘ আর ওই মেঘের আস্তরণের ভেতরে মায়া-জড়ানো একফালি চাঁদ।

খানিকদূর এসে প্রাণেশবাবু আবার বললেন, রিক্শাওয়ালা দু'টাকা বেশি নিয়ে গেল ঠিক। কিন্তু ওকেও তো খেয়ে-প'রে বাঁচতে হবে। যা দুর্মূল্যের বাজার। আমরাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, ওতো একটা রিক্শাওয়ালা।

আমার ইচ্ছে হয় ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলি, খুব তো জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। তা ওজন ছাপিয়ে না খেলেও তো বেশ ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু আমি কিছুই বলি না। শুধু ওর দিকে চেয়ে আবার হাঁটতে থাকি।

—আমার ধারণা, পৃথিবীর টোটাল প্রোডক্‌টিভিটি দিনের পর দিন কমে আসছে। তাই চাহিদার তুলনায় এই অভাব। বিজ্ঞান কিন্তু এ ব্যাপারে চুপ ক'রে বসে নেই। ওঃ—ভাবতে পারবেন না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা দিনরাত এই নিয়ে কি পরিশ্রমসাধ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

কথাগুলো বলার সময় প্রাণেশ চাটুজ্জের চোখে-মুখে একটা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাসে ডগমগ মনে হয় ওঁকে।

এরপর প্রাণেশবাবু বললেন, শুনলে হয়তো অবাক্ হবেন, এই সমস্যার সমাধান ক'রতে পারে একমাত্র এ্যাটম্। ওঃ—এ্যাটম্ যে কি জিনিস, এর যে কি অসীম ক্ষমতা, এ্যাটম্ যে কি ক'রতে পারে আর কি পারেনা, ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়।

এরপর ওর কথায় কেমন যেন একটা হতাশার সুর শুনতে পাই।

—আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় মুশ্‌কিল হ'ল এ্যাটমের কল্পনাতীত প্রচণ্ড গতি। এ কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। এর এই অনবরত গতি কিছুতেই কন্‌ট্রোল করা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীদের রক্ত জল-করা পরিশ্রম এইজন্যে মাটি হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ্যাটম্‌কে একদিন বাগ মানানো যাবেই। কতকগুলো এ্যাটম্‌কে জুড়ে দিয়ে একদিন একটা নির্দিষ্ট শেপ্‌-এর মধ্যে আনা যাবেই। সেদিন কিন্তু পৃথিবীতে আর কোনকিছুরই অভাব থাকবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী এ্যাটম্‌গুলোকে শুধু ছাঁচে ফেলে শেপ্‌ দেওয়া। ভাবতেই অবাক্ লাগে সেদিন আমাদের এই পৃথিবীটার কি রূপ হবে। খাদ্য আর পোশাকের জন্যে সেদিন থাকবেনা কোন জাল-জুয়াচুরি, এক্‌সপ্লয়টেশন্।

আমি বিজ্ঞান বুঝি না। বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের ওইসব জটিল এ্যাটম্-তত্ত্ব। তবু আমি জিজ্ঞেস করি, তবে তো সেদিন আরও সমস্যার সৃষ্টি হবে। এ্যাটমই যদি সবকিছু দেয়, তাহলে কলকারখানা বন্ধ হ'য়ে যাবে, চাষবাসও আর থাকবে না। সব কাজ-কর্ম থেমে যাবে। সে এক কেমন অবস্থা হবে বলুনতো?

—নো নো নো; ঠিক তা হবে না। সব কিছু বন্ধ হ'য়ে যাবে কেন? সবই থাকবে, তবে এ্যাটম্‌কে ভিত্তি ক'রেই সব কিছু চলবে।

আমি আর কিছু বলতে ভরসা পাই না। ভরসা পাইনা এই ভয়ে যে হয়তো বা আরও বড় বড় সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে আমাকে অথৈ জলে ফেলবেন ভদ্রলোক।

এবার দুম্ ক'রে প্রাণেশবাবু জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন, এতক্ষণ আপনার সঙ্গে হেঁটে আসছি, কিন্তু মিষ্টার, আপনার নামটাই জানা হয়নি।

—নিত্যানন্দ রায়।

বাঃ চমৎকার নাম। নিত্যই যার আনন্দ তিনিই নিত্যানন্দ। নামের সঙ্গে স্বভাবেরও মিল রয়েছে আপনার। নইলে কি এই রাতে একটা মাতালকে এগিয়ে দিতে যেতেন।

ওঁর গলার স্বরটা কেমন অন্যমনস্ক শোনায়। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন প্রাণেশ চাটুজ্জে। আমি জানি না এ মাতালের প্রলাপ কি না। আমি চেয়ে থাকি ওর দিকে। মদ খেয়ে যে নিজেকে মাতাল বলে সন্দেহ করে পারিভাষিক অর্থে তাকে কি বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি তাকে মাতাল বলব কি-না ভেবে পাই না। যতদূর জানি, সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক, কোন মদ্যপই নিজের প্রতি মাতাল অপবাদ সহ্য করে না। নিজেকে নিজে মাতাল বলা তো আরও দূরের ব্যাপার।

—কেন আমি এসব খাই জানেন?

প্রাণেশ চাটুজ্জের প্রশ্নটা দৃঢ় অথচ খানিকটা হতাশা মেশানো।

—ভুলে থাকতে। জানেন, আমার এই শিক্ষা ডিগ্রী রিসার্চ্ সব কেমন ভেতো হ'য়ে গেছে। অথচ আমি কি এমন একটা লাইফ্ চেয়েছিলাম······? আমি বুঝতে পারছি ওরা আমাকে এক্‌সপ্লয়েট ক'রছে, আমার

থিওরিটা চুরি ক'রে······মানে ব্ল্যাক্-মেইল······আই মিন্ ওই মিস্ কাপাদিয়া······আমি সব বুঝতে পারছি ······কিন্তু—কিন্তু······'

আমি ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে থাকি প্রাণেশ চাটুজ্জের মুখের দিকে। ওঁর কথাগুলো আমার বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা ক'রতে পারি না। আমার যেন মনে হয় এতক্ষণ পরে ওর মধ্যে নেশার ঘোরটা মাথা চাড়া দিয়েছে। আর ওই প্রলাপোক্তিগুলো যেন তারই ফল।

কথাগুলো বলতে বলতে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলেন ভদ্রলোক। মনে মনে কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এবার বাস্তবে ফিরে এলেন।

একটু সচকিত হ'য়ে বললেন, ও মাই গড্, আমরা এসে গেছি নিত্যানন্দবাবু। সামনের লাল বাড়িটা আমাদের। আপনি দাঁড়ান একটু। দরজাটা খুলতে বলি।

দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে প্রাণেশবাবু ডাকলেন, বিজয়া, দরজা খোল। আমি এসেছি।

আমি বললাম, অনেক রাত হ'য়েছে। এবার আমি চলি। আমাকে আবার এতটা পথ যেতে হবে তো।

—সে তো বটেই। অনেকটা পথ আপনাকে হাঁটতে হবে। এই গভীর রাতে আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এরপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, একটা ব্যাপার আমার ভাবতে অবাক্ লাগে। আমরা সাধারণ মানুষ দিন-রাত সকাল-বিকেল ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে সময়কে নিজেদের খেয়ালখুশি মতন টুকরো টুকরো ক'রতে চাইছি। কিন্তু কোন গণ্ডি দিয়ে কি সময়কে এমনি ভাগ করা যায়? সময় আবহমানকাল-প্রবাহিত একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতন। বলতে বলতে ভদ্রলোক কেমন আত্মস্থ হ'য়ে পড়লেন। দরজাটা খুলে যেতেই আবার বাস্তবে ফিরে এলেন। আমাকে প্রায় জোর ক'রে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে এনে হাজির করলেন।

—কাইণ্ডলি একটু বসুন। আমি আসছি।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই প্রাণেশবাবু বেরিয়ে গেলেন। দোতলার শেষ সিঁড়িতে ওঁর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলি আমি। অস্বস্তিও বোধ করছি খানিকটা। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। কড়া নাড়তে নাড়তে প্রাণেশবাবু যে নামে ডেকেছিলেন জানি না সে কে। তবে ওদের সম্পর্কটা অনুমান ক'রে নিয়েছি। কেননা এই গভীর রাতে অপ্রকৃতিস্থ কোন পুরুষকে দরজা খুলে দিতে কে এগিয়ে আসতে পারে তা খানিকটা অনুমেয়। হয়তো প্রাণেশবাবুর ক্ষেত্রে এটা একটা নিয়মের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আজ কে দরজা খুলল আমি দেখিনি। মনে হ'য়েছিল দরজাটা যেন নিয়মমাফিক আপনা আপনিই খুলে গেল।

যে ঘরে বসেছি সেটা ড্রইং রুম। বেশ সাজানো গোছানো। দামী আসবাব। দেয়ালে গোটা কয়েক ভালো অয়েল-পেন্টিং। দু'খানা আলমারি বোঝাই বিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানান্ বই। টেবিলের ওপর অনেকগুলো দেশী-বিদেশী জার্নাল। প্রায় সবগুলোই বিজ্ঞান-বিষয়ক। সব কিছু মিলিয়ে বুঝতে পারি, অয়েল পেন্টিংগুলো নামী বৈজ্ঞানিকদের। আমি কাউকেই চিনি না। বসে বসে আপশোষ হয় এই ভেবে যে বিশ্বজগতের ওই অত্যাশ্চর্য দিকটা আমার আছে অন্ধকারে রয়ে গেল। কোনদিন ওই দরজা দিয়ে আলোক বিচ্ছুরিত হ'য়ে আমার এই ভোঁতা মাথায় প্রবেশ ক'রতে পারবে না। আমার নিজের জীবনের এ এক বিরাট ট্র্যাজেডি, যা ভেবে ওই অয়েল্-পেন্টিংগুলোর ওপর মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হয়।

নেহাৎই সময় কাটানোর জন্যে একটা দেশী জর্নাল তুলে নিলাম। পাতা ওল্টাতে হ'ল না। আমাকে চমকাতে হ'ল সোজাসুজি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে।

—বোতলের দোসরকে পৌঁছে দিতে আসতে লজ্জা করে না?

চমকে ভেতরের দরজাটার দিকে তাকাই জার্নালের মলাট-ধরা আমার আঙুলটা কেঁপে ওঠে যে কোন পরিস্থিতিতে ঠোঁটকাটার মতন কাউকে [illegible] কিছু বলার সুনাম-দুর্নাম যাই হোক বরাবরই আমা

ছিল। কিন্তু এখানে আমি কেমন কুঁকড়ে এলাম। মুখে একটা কথাও যোগাল না। আমি বলতে পারি না, ওসব ছক-জম্ম জীবনে ছুঁইনি। কিন্তু কে যেন বাজিকরের মতন আমার ঠোটদুটো আটকে দিয়েছে। মঞ্জিলার দিকে স্তম্ভিতের মতন চেয়ে থাকি আমি। প্রাণেশ চাটুজ্জের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অনুমান ক'রে নিই। আর মেয়েদের রূপ যে কত নিখুঁত, কত সুন্দর হ'তে পারে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মঞ্জিলার মধ্যে আমি তা নতুন ক'রে আবিষ্কার করি। অথচ ওর চেহারার ওপর অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার চিহ্ন লেগে রয়েছে। চোখের কোণে লাকানো ভাব, একটা বৈকালিন বিষণ্ণতা ওর চেহারায়।

—কি হ'ল, চুপ ক'রে রইলেন কেন? চুপ ক'রে থাকবেন না? আপনারা যে খুনী। তা আমাকে এমনি তিলে তিলে মেরে কি লাভ? এই তো গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, একবারে ছিন্ন শেষ ক'রে।

আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।

বললাম, আমাকে দেখে কি জল্লাদ মনে হয়?

এবার ওর গলার স্বরটা কেমন বদলে গেল।

একটা অভিযোগের সুর ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।—না, আমি আপনাকে ওসব বলি না। কারণ, পুরুষের চোখের দিকে চাইলেই মেয়েরা বুঝতে পারে কে খুনী আর কে খুনী না। কিন্তু ওঁর প্রতি এত দয়া হ'ল কেন আপনার? গলা ধাক্কা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারলেন না? ওকে খুঁজায় মরত, পুলিশে ধরত। আমিও মুক্ত পেতাম।

প্রচণ্ড একটা আবেগ আর বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করি ওর মধ্যে। আমি দোতলায় ওঠার সিঁড়িটার দিকে একবার তাকাই। আমার মনের ভাবটা বোধহয় ওর কাছে ধরা পড়ে।

—ও এখন আসবে না। এই তো বাথরুমে ঢুকল। মাথায় আর চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল ঢালবে। যা গিলেছে তার ধকল কাটিয়ে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তারপর বেরুবে। তাছাড়া বাইরে থেকে বাথরুমের দরজাটা আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

—কিন্তু বেরিয়ে এসে যদি—

—আমার ওপর অত্যাচার করে, তাই তো? সে তো রোজকার ব্যাপার। না হয় আজ একটু বেশিই করবে। ও আমার গা সওয়া হ'য়ে গেছে।

আর কিছুই বলার খুঁজে পাই না আমি। জানালটা আমার হাতেই ধরা থাকে। নীরবে আমি চেয়ে থাকি দেয়ালের অয়েল-পেন্টিংগুলোর দিকে। এই গভীর রাত, রিকশাওয়ালা, এ্যাটমিক থিওরি, সব আমার চোখের সামনে বৃত্তের মতন পাক খেতে থাকে। শহরের নৈশ জীবনের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ওর কথাগুলো আমার কানে একটা তরঙ্গ তুলতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রাণেশবাবু বুঝি রিসার্চ-টিসার্চ কিছু করেন?

ওর মধ্যেকার ক্ষোভ আর অবরুদ্ধ আবেগ অনেকটা থিতিয়ে এসেছে।

একরকম হতাশার স্বরে বললেন, ও ······ ফিজিক্স-এ ডক্টরেট ক'রে কিছুদিন প্রফেসারি ক'রেছিল। তারপর পুরোপুরি রিসার্চ-ওয়ার্ক নিয়েই রয়েছে। ওর গবেষণার বিষয় হ'ল এ্যাটম্ থেকে খাদ্যবস্তু তৈরী করা। ও বলত এটা না-কি সম্ভব। সম্ভব হ'লে পৃথিবীতে আর খাদ্যাভাব থাকবে না। এ ব্যাপারে ও নাকি অনেকদূর এগিয়েওছিল। কিন্তু······

একটু থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, —দুর্ঘটনাটা হ'য়েছে এখানেই। ও যখন থিওরি নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে, তখনই ল্যাবরেটারিতে ওর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র শুরু হ'লো। জানিনা তারা কে। তাদের উদ্দেশ্যই বা কি। ওরা কি ওর থিওরিটা হাইজ্যাক ক'রতে চায়, না কি বানচাল ক'রতে চায়। মিস্ ইন্দ্রাণী কাপাদিয়া নামে ল্যাবরেটরীরই একটি মেয়েকে ওর পেছনে লাগানো হ'ল। মেয়েটি নাকি খুবই সুন্দরী। আর যাই হোক······পুরুষের মন তো······!

ওর কথায় এতক্ষণে আমি যেন একটা থেই খুঁজে পাই। পথে আসার সময় প্রাণেশ চাটুজ্জের সেই কথাগুলো আমার কাছে আর মাতালের প্রলাপ বলে

হয়না; মিস্ ইন্দ্রাণী কাপাদিয়ার একটা কল্পিত মূর্তি আমি বিজয়া দেবীর পাশে দাঁড় করাই। একদিকে মানুষ আর মানুষের মন, আরেকদিকে বিজ্ঞান এ্যাটম্ ইত্যাদি ইত্যাদি! এর কোনটা সার, কোনটাই বা অসার কিছুই বুঝতে পারি না। শিক্ষাদীক্ষা অর্থনৈতিক আর সামাজিক তারতম্যে আমাদের মধ্যে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, যুগে যুগে আমরা পুরুষ আর নারী ওই একজায়গায় এসে সব কেমন একই ছাঁচের তৈরী হ'য়ে যাই। আমাদের শিক্ষা-অশিক্ষার বিভিন্নতা মুছে যেয়ে সব একাকার হ'য়ে যাই।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে প্রাণেশবাবুর তাহ'লে অপরাধটা কোথায়? সত্যিই যদি ওর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র—'

আমার কথা কেড়ে নিয়ে প্রতিবাদের সুরে বিজয়া দেবী বললেন, কেন অপরাধ হবে না? ও কি বাচ্চা ছেলে? যে না-কি নিজের ওপর অসম্ভব আস্থা রেখে এগোতে পেরেছে তার মতন লোক মিস্ কাপাদিয়ার মতন একটা মেয়ের জন্যে......তাও যদি তার বউ সুন্দরী না হ'ত............।

বিজয়া দেবী মাথা নিচু ক'রেছেন। চোখের কোণ থেকে দু'ফোঁটা উষ্ণ জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ওই দু'ফোঁটা জল যেন বিজয়া দেবীর ভেতরকার সমস্ত আবেগকে নিংড়ে বাইরে নিয়ে আসছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি চলি। আমাকে মার্জনা করবেন।

—মার্জনা···? কিসের মার্জনা?

—এই রাতে আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার—'

—ও......। ফ্যাকাসে হাসির চকিত ঝিলিক্ ওঁর ঠোঁটে। বললেন, আপনি না এলেও হয়তো আপনারই মতন আর কেউ দয়া ক'রে ওকে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। এ তো প্রায় রোজকার ব্যাপার।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পৃথিবীতে তাহ'লে এখনো কিছু ভালো লোক রয়েছে। কিন্তু······আপনি ওর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না? ও তো আপনাকে বসতে বলে গেছে।

—না, আর প্রয়োজন নেই।

কথাটা বলে বড় বেখাপ্পাভাবে খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় পথে নেমে এলাম। পেছন ফিরে আর তাকাই না। আমার গতি সামনের দিকে। পথের দু'পাশে নৈশ মহানগরী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। প্রাণের স্পন্দন যেন কোথাও নেই। আমি মাত্র একটি প্রাণী এগিয়ে চলেছি নৈশ নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে আবহমানকালের মনুষ্য-চরিত্রের সাক্ষী হ'য়ে। কিসের এক আবিষ্কারের নেশা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। এই মুহূর্তে আমি যেন কবি দার্শনিক ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু হ'য়ে পড়েছি। সময় অতন্দ্র প্রহরী। বিজ্ঞান এ্যাটম্ ইত্যাদি সেখানে নগণ্যমাত্র। সময়ের অতন্দ্র প্রহরার সামনে বিজয়া দেবী, প্রাণেশ চাটুজ্জে আর মিস্ ইন্দ্রাণী কাপাদিয়া যেন মানব-জীবনের এক সত্যমূর্তির প্রতীক।

কংগ্রেস-স্মৃতি

(বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কংগ্রেসের তৃতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময়।

পূর্ব পূর্ব দিনের মত সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা-সহকারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। একদল স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাগণ জাতীয় সঙ্গীত গাইলে।

তারপর সভাপতি মশায় স্বয়ং নিম্নলিখিত দুটি প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করলেন।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস ভারতীয় ও আফ্রিকানদের চুক্তি ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের পক্ষে ভারতীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতীক স্বরূপ মনে করছে কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতীয় বাসিন্দাদের পদমর্য্যাদা ভোটাধিকার-প্রাপ্ত অধিবাসীদের সমপর্য্যায়ে না আনা হবে ততক্ষণ ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হতে পারবে না।

কংগ্রেস সি এফ্ এণ্ড্রুজকে তাঁর সেবাকার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণ মর্য্যাদার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ভারতীয়দের প্রেরণা দিচ্ছে এবং একজনও ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ না করে গঠিত পূর্ব আফ্রিকা ফেডারেশনের প্রতিবাদ করছে এবং দেশের উচ্চভূমি একান্তভাবে ইউরোপিয়ানদের বসবাসের জন্য উন্মুক্ত রাখার দরুণ ট্যাঙ্গেনিয়া ম্যানডেট ভঙ্গের আসন্ন বিপদের প্রতি জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

প্রস্তাব দুটি গৃহীত হল।

তারপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন সংবিধানের পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধান সভা এবং কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যৌথ নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করা হবে। দুই মহান্ সম্প্রদায়কে আপাততঃ তাদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বাঞ্ছনীয় হলে প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে জন সংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। প্রকাশ থাকে যে অনুরূপ সুবিধা পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন পেতে পারে। এবং অন্য প্রদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে পাঞ্জাবের আসন সংরক্ষণ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বৃটিশ বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য মুসলমান নেতাদের দাবি এই কংগ্রেসের মতে ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত এবং তা কার্য্যে পরিণত করা কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শাসন সংক্রান্ত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিচার সংক্রান্ত সংস্কার উপরোক্ত প্রদেশগুলিতে চালু করা হয়।

সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশরূপে গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করছে যে, কংগ্রেস-সং-

বিধানে গৃহীত নীতি অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সময় উপস্থিত হয়েছে।

এই কংগ্রেসের মতে এই প্রকারে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক।

এই কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করছে যে, অন্ধ্র, উৎকল, সিন্ধু এবং কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশ গঠন করে এই কাজ আরম্ভ করা হোক।

ভবিষ্যতের সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন বিধান পরিষদ বিবেকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিবেকের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা, ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান ও মিলনের স্বাধীনতা এবং অন্যের ভাবাবেগের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রেখে এবং অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রচারের স্বাধীনতা।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোন বিল, প্রস্তাব বা সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বা কোন প্রাদেশিক বিধান সভায় উত্থাপন করা চলবে না যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায়ের চার ভাগের তিনভাগ সদস্য ঐরূপ বিল, মোশন বা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন, আলোচনা এবং পাশ করতে আপত্তি করে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক ব্যাপার হচ্ছে বিধান সভাগুলির প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে গঠিত হিন্দু মুসলমানের যৌথ কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত বিষয়।

এই সুদীর্ঘ প্রস্তাব উপস্থিত করে শ্রীমতী নাইডু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনবদ্য ভাষায় প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দিলেন। তিনি প্রস্তাবটি যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে বললেন যে তিনি নিজে বন্ধনমুক্তি ছাড়া অন্য কোন ধর্ম জানেন না।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উর্দুতে এই প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রস্তাবটি লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অপেক্ষা অনেক ভাল।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর মিশ্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করে হিন্দীতে বললেন যে এই প্রস্তাব শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ।

পাটনার জগৎনারায়ণ লাল হিন্দীতে বললেন যে প্রস্তাবটি অস্পষ্ট এবং অনেক ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক, বিশেষভাবে বাস্ত গোহত্যা ব্যাপারে মুসলমানদের যদৃচ্ছা গোহত্যার দাবি তিনি সমর্থন করতে পারেন না।

উপসংহারে তিনি সকলের নিকট গোরক্ষা এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সরদার শার্দূল সিংও প্রস্তাবের সপক্ষে ভাষণ দিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রস্তাবটি লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের উত্তর।

এস্ সত্যমূর্ত্তি তামিলে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সিন্ধুর ডঃ চৈতরাম প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে উঠে অভিমত প্রকাশ করলেন যে অর্থ-নৈতিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কেবলমাত্র ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব অসমীচীন।

সিন্ধুর আর কে সিদ্ধ সর্বান্তঃকরণে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যীয় জোরালো ভাষায় প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রস্তাবটি স্বরাজ অর্জনের একমাত্র পথ। মহাত্মাজী এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পালন করতে পারেন নি কিন্তু এই প্রস্তাব, যা মহাত্মারই রচিত, তা যদি গৃহীত হয় এবং কার্য্যকর করা হয় তা হলে ২৪ মাসের মধ্যে ভারত স্বরাজ অর্জন করবে। তাঁর কল্পিত স্বরাজে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহ সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ অংশ থাকবে।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে তাঁর এক বৎসরের সেবাকার্য্য এখন ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি গৌহাটীতে স্থির করেছিলেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবেন। বর্ত্তমান প্রস্তাব দ্বারা তার সমাধান হয়েছে।

মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও জগৎনারায়ণের বিরোধিতা

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়র ভাষণ স্তব্ধ করে দিয়েছে। মৌলানা সাহেব জানালেন যে তিনি মালব্যজীর ভাষণে অভিভূত হয়েছেন। তিনি ব্রিটেনকে বলতে প্রস্তুত যে ভারতের সংখ্যালঘুদের অছি হচ্ছেন পণ্ডিত মালবীয়। যখন ঈজিপ্টে মিলনার কমিশন গিয়েছিল তখন ঈজিপ্টবাসীগণ বলেছিলেন যে তাঁদের মুখপাত্র হচ্ছেন জগলুল পাশা। লর্ড উইনটারটন দাবি করেন যে তিনিই হচ্ছেন সংখ্যালঘুদের মুখপাত্র। মৌলানা সাহেব মন্তব্য করলেন যে লর্ড উইনটারটন মিথ্যার বাদী। তিনি সংখ্যালঘুদের মুখপাত্র নন্। সংখ্যা-লঘুদের মুখপাত্র হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

তারপর সভাপতি মশায় প্রস্তাব ভোটে দিয়ে প্রতি-নিধিদের নিকট আবেদন করলেন যেন তাঁরা ঐক্যমত হয়ে প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন।

"মহাত্মাজী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর অধিবেশন বৈকাল ৫টা সভাপতি মশায় পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখার ঘোষণা করলেন।

বৈকালের অধিবেশনে প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যমনাদাস মেহেতা।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটীর সাম্প্রতিক সার্কুলার অনুসারে প্রাপ্ত নানা প্রকার মুসাবেদা এবং পরামর্শ (সাজেসসন) বিবেচনা করে এই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কমিটীর পরামর্শ বিবেচনা করে অধিকার ঘোষণার ভিত্তিতে একটি স্বরাজের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার ক্ষমতা দিচ্ছে এবং তা বিবেচনা ও অনু-মোদনের জন্য মার্চ-মাসের মধ্যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতা ও প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত বিশেষ কমিটীর নিকট উপস্থিত করার নির্দেশ দিচ্ছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মেহেতা মশায় বললেন যে স্বরাজ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব সাইমন কমিশন বা পার্লামেন্টের সৃষ্ট অন্য কোন কমিশনের উপর দেওয়া যেতে পারে না। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সাইমন কমিশন লর্ড উইনটারটনের মতই অজ্ঞ। লর্ড সাহেব ভুল না করে ভারত সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে পারেন না। তাঁর অজ্ঞতার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে পার্লামেন্টের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে দাক্ষিণ ভারতে হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্য অতিশয় প্রবল। এই উক্তিতে সভায় হাস্যরোল উঠল।

নিম্বকর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে এই প্রস্তাব স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপন্থি।

ডাঃ বরদারাজালু প্রস্তাব সমর্থন করে যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিলেন।

হরি সর্বোত্তম রাও প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মন্তব্য করলেন যে প্রস্তাবটি বোকামির নিদর্শন।

বিতর্কের প্রত্যুত্তর দিতে উঠে যমনাদাস মেহেতা বললেন যে যদিও কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তথাপি একটি সর্বসম্মত সংবিধানের মুসাবেদা প্রস্তুত করায় কোন বাধা নেই।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর মণিলাল কোঠারী নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

এই কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত অভিমত প্রকাশ করছে যে, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকবর্গ এবং জনসাধারণ উভয়েরই স্বার্থে দেশীয় রাজ্যগুলিতে অবিলম্বে প্রতি-নিধিত্ব মূলক সংস্থা এবং দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হোক।

প্রস্তাব উপস্থিত করে কোঠারী মশায় হিন্দীতে প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

এবং সত্যমূর্তি প্রস্তাবটি জোরালো ভাষায় সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর রাজকুমার চক্রবর্তী নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন :—

এই কংগ্রেস ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্বন্ধে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েও প্রস্তাব করছে যে এই বর্জন কার্য্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী-গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হোক—যেন প্রত্যেক প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা করা যাহতে করা ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন সংগঠিত করে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে চক্রবর্তী মশায় সংক্ষেপে ইংরজীতে তাঁর বক্তব্য বললেন।

আবদুল হামিদ খাঁ এই প্রস্তাব উর্দ্দুতে সমর্থন করলেন।

অন্ধের শ্রীমতী তিলকম্ আম্মল এবং বাংলার পুরুষোত্তম রায় কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সদস্যদের ফি ১০ টাকা ধার্য্য করা হল।

তারপর সভাপতি মশায় স্বয়ং সাধারণ সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এবং বল্লভ-ভাই প্যাটেলকে ধন্যবাদ দিলেন।

পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা আগামী বৎসরের জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু এবং সোয়েব কুরেশীকে সাধারণ সম্পাদক এবং যমনালাল বাজাজ এবং রেবা সঙ্করকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল।

তারপর আগামী বৎসর কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য কলিকাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্তাব করা হল।

তারপর ডাঃ এম্-এ আনসারী মশায় তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দিলেন। তিনি বিশেষ করে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য, সাইমন কমিশন বয়কট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উল্লেখ করে কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তারপর তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথলিঙ্গ মুদালেয়ার মশায়কে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ দিলেন। বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপ্টেন রাজারাম পাণ্ডে এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

পরিশেষে তিনি জানালেন যে তিনি মাদ্রাজের আতিথেয়তা ও মহানুভবতা চিরকাল স্মরণে রাখবেন।

সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথলিঙ্গ মুদালেয়ার সভাপতি মশায়কে এবং সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ দিলেন।

তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল এবং "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়", "আনসারী কি জয়", "বন্দে মাতরম্", ধ্বনি দিতে লাগল।

প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে লালা শঙ্করনাথ প্রথানুসারে ধন্যবাদ দিতে মঞ্চে আরোহন করলেন কিন্তু গোলমালে তাঁর কোন কথা শোনা গেল না।

প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

(১৩)

কংগ্রেস অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা দল বেঁধে মাদ্রাজ শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি খুঁজে খুঁজে ঘুরে দেখলাম। মাদ্রাজ হাইকোর্ট সমুদ্রতট থেকে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। হাইকোর্ট তখন বড়দিনের ছুটীর জন্য বন্ধ। আমরা হাইকোর্ট ভবনটি চতুর্দ্দিক ঘুরে দেখলাম, হাইকোর্টের উপরিভাগে সমুদ্রগামী জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য সার্চলাইট স্তম্ভ সন্নিবেশিত ছিল। মাদ্রাজ বন্দর দেখলাম কলিকাতার বন্দরের তুলনায় ছোট। শহরের অভ্যন্তরে একটি গোপুরম্ শোভিত পার্থসারথির মন্দির প্রবেশ করে পার্থসারথির অতি সুন্দর মূর্তি পরিদর্শন করলাম। মাদ্রাজ প্রদেশের বহুস্থানে অর্জ্জুনের সারথি রূপে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির স্থাপিত হয়েছে। একদিন এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন দেখতে গেলাম। সেখানে অধিকাংশ কর্ম্মীই তামিল। বাঙ্গালীও কিছু ছিল। একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর মূর্তি আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে আছে, এমন সৌম্যদর্শন মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। তা ছাড়া তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় আভা দ্বারা উদ্ভাবিত ছিল। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরের সুপ্রসিদ্ধ ম্যারিন

ড্রাইভ নামক সুপ্রসিদ্ধ রাস্তাটি সমুদ্রে উপকূলের বাঁধের উপর নির্মিত এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় চার মাইল। এখানে নাগরিকগণ দলে দলে সান্ধ্য ভ্রমণে আসেন। ম্যারিন ড্রাইভের নীচে একস্থানে সামুদ্রিক মৎস্যের জন্য সুন্দর একটি অ্যাকোয়ারিয়াম নির্মিত হয়েছে। সেখানে নানা-বর্ণের এবং নানা আকারের মৎস্যকুলকে বিচরণ করতে দেখলাম।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত থিয়োসফিকাল সোসাইটীর উপনিবেশ অ্যাডেয়ারে বিশ্ব থিয়োসফি সম্মিলন আহূত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ ঐ সম্মিলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একদিন বৈকালে ঐ সম্মিলন দেখতে গেলাম। সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে দেখি আমার সতীর্থ বন্ধু জলপাইগুড়ির উকিল নলিনীরঞ্জন ঘোষ উক্ত সম্মিলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত আছে। আমরা যেতেই নলিনী আমাকে সম্বোধন করে বলল, গিরিজা, একটু আগে এলে রুক্মিণী দেবীর (আরেনডেল) বক্তৃতা শুনতে পেতে। তাঁর কণ্ঠস্বর বাশীর সুরের মত শোনাচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতা না শোনা অত্যন্ত আপসোসের বিষয়। যাই হোক, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের আবিষ্কৃত মেসায়া (ভগবানের অবতার) কৃষ্ণমূর্তির ভাষণ শুনলাম। তিনি ইংরেজীতে অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর চেহারাও অতি সুন্দর, বিশেষ করে তাঁর চোখ দুটি। এমন পদ্মপলাশ লোচন সবদা দেখা যায় না। এ রকম চোখ আর একজনের মাত্র দেখেছিলাম। সে চোখের অধিকারী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সি. পি. রামস্বামী আয়ার। সে সময়ে কৃষ্ণ মূর্তির নাম পৃথিবীর সবত্র পরিচিত ছিল। অনেকে তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করতেন। বাংলার মনীষী দার্শনিক হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মশায় তাঁর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। একবার কলিকাতায় ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে কৃষ্ণমূর্তি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সময় আমি ইনষ্টিটিউটের হলে উপস্থিত ছিলাম। ডায়াসের উপর কৃষ্ণমূর্তির জন্য একটি মাত্র চেয়ার রক্ষিত ছিল। তাঁর অনুরক্ত ভক্তগণ তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তও ছিলেন।

অ্যাডেয়ারে কৃষ্ণ মূর্তির বক্তৃতা শেষ হওয়ায় পর অ্যাডেয়ারের অন্যান্য অংশ দেখার জন্য আমরা সমুদ্রের দিকে গেলাম। ফেরবার সময় কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করলাম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়কে ত দেখা গেল না। তাঁর অনুপস্থিতি আশ্চর্যজনক। মন্তব্য করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দত্ত মশায়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি তখন সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে আমরা তাঁর কথাই বলছিলাম।

ফেরবার সময় দেখি একস্থানে প্রচুর লোকের ভীড়। ব্যাপার কি জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে অগ্রসর হতেই দেখি একটা চতুর্দিক খোলা নাটমন্দিরে কৃষ্ণমূর্তি বহু বালকের সহিত ক্রীড়া করছেন এবং তাদের বেষ্টন করে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সেই অপূব বাল্যলীলা দেখছেন। ভক্তদের মধ্যে পার্শী ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন, খৃষ্টান ছিলেন। এই দৃশ্য খানিকক্ষণ দেখে আমরা কংগ্রেস নগরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

(১৪)

কংগ্রেস অধিবেশনের অন্তে আমরা কয়জন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের দলে ছিলেন আমি ছাড়া বাঁশবেড়ের মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, রংপুরের জমিদার নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, রাজসাহীর উকিল ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, রাজসাহীর তিনকড়ি মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, রামগোপাল চৌধুরী এবং হিলির প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। জানুয়ারী মাসেও মাদ্রাজ অঞ্চলে শীত ছিল না সুতরাং আমাদের শীতবস্ত্রাদি বন্ধুবান্ধবদের মারফৎ কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে আমরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হলাম।

মাদ্রাজ থেকে ট্রেণে রওনা হয়ে প্রথমে আমরা

চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে পৌছলাম। সেখানে একটি চৌলট্রিতে (এক প্রকার ধর্মশালা) রাত কাটিয়ে পরদিন প্রাতঃকালে গোশকট যোগে কাঞ্চীপুরে রওনা হলাম। সেখানে পৌছে শিব কাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চীর বিশাল বিশাল গোপুরমের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মন্দিরগুলি দর্শন করলাম। মন্দিরের স্তম্ভগুলিতে এবং গাত্রে যে সকল পাথরের অপূর্ব কারুকার্য আছে তা দেখে মুগ্ধ হলাম।

কাঞ্চীপুরম থেকে চিঙ্গলপুটে ফিরে এসে পক্ষীপর্বতোপরি আরোহণ করে দুপ্রহরে নির্দিষ্ট সময়ে দুটি পক্ষীকে মন্দিরের পুরোহিতের হস্ত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করতে দেখলাম।

পক্ষীতীর্থ থেকে সমতল ভূমিতে অবতরণ করে একটি মন্দির দেখতে গেলাম। সেখানে সিংহলের ট্রিঙ্কোমালির জনৈক মুথুকুমারু নামক তামিল ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি সকন্যা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। আমাদের সিংহল ভ্রমণের অভিপ্রায় জেনে তিনি একটি পত্র লিখে আমাদের হাতে দিলেন এবং বললেন যে পত্রটি তালাইমানার বন্দরে পৌছে রেল ষ্টেশনের কর্মচারীদের হাতে দিলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। ধন্যবাদের সহিত পত্রটি গ্রহণ করলাম। তারপর তাঁদের সঙ্গে একত্রে বাসে চড়ে মহাবালিপুরম্ দেখতে রওনা হলাম।

মহাবালিপুরমের অপূর্ব কারুকার্য্য সমন্বিত ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড (বোলডার) কেটে আশ্চর্য্য কৌশলে অর্জ্জুনের রথ প্রভৃতি রথ প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি পাহাড়ের গাত্রে উৎকীর্ণ অর্জ্জুনের তপস্যার চিত্রটি অতি সুন্দর। সেখানে হাতী থেকে আরম্ভ করে বানর পর্য্যন্ত বহু জীবজন্তুর মূর্তি খোদিত করা হয়েছে। আরও কয়েকটি মন্দির দর্শন করে আমরা সমুদ্রতীরবর্তী একটি মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরটির অবস্থান একেবারে সমুদ্রের কিনারে। মন্দিরের সম্মুখস্থ অরুণ স্তম্ভের কিয়দংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। দৃশ্যটি অতি মনোহর।

তারপর আমরা শ্রীরঙ্গম্ ত্রিচিনপল্লী (তিরিচিরুপল্লী), তাঞ্জোর (তাঞ্জাভূর), মাদুরা (মাদুরাই) প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলির বিশাল বিশাল মন্দির দর্শন করলাম। মাদুরাইয়ের বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দিরের সম্মুখস্থ সুদৃশ্য নাটমণ্ডপে প্রস্তর নির্মিত বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার মধ্যে শিব পার্বতীর বিবাহের চিত্র সম্বলিত, মূর্তি দেখলাম। পার্বতীর সলজ্জ মুখমণ্ডলের ছবি আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে।

মাদুরাই থেকে আমরা রামেশ্বরমে গেলাম। রামেশ্বর গমনের পথে যখন আমাদের ট্রেনটি মবন ও মণ্ডপের সেতুর উপর দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করছিল তখন আমরা মুগ্ধচিত্তে এই নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করছিলাম।

রামেশ্বরমে পৌছে আমরা একটি ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তারপর আমরা সমুদ্রে স্নান করলাম। সেখানকার সমুদ্রকে সমুদ্র বলেই মনে হচ্ছিল না। বৈকালে পরিপূর্ণ নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে অবগাহন করে তৃপ্তি পাওয়া গেল না। স্নানান্তে আমরা রামেশ্বরমের বিশাল মন্দির এবং মূর্তি দর্শন করলাম, রামেশ্বরমে দুদিন থেকে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে আমরা সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে ট্রেণে ধনুস্কোটি রওনা হলাম। ধনুস্কোটি থেকে রাজকুমার কলিকাতায় ফিরে গেল। আমরা বাকী ৮ জন ধনুস্কোটিতে সিংহলগামী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করলাম।

(১৫)

যথা সময়ে জাহাজে চড়ে আমরা ধনুস্কোটি থেকে সিংহলের তালাইমানার বন্দরে সন্ধ্যার সময় পৌছুলাম।

তালাইমানার বন্দর থেকে রেল-স্টেশনে গিয়ে, মুথুকুমারু মশায়ের পত্রখানি জনৈক রেল কর্মচারীকে দিলাম। এই পত্রের ফল আশ্চর্য্যরকম ভাবে দেখা গেল। কর্মচারীটি আমাদের বিশেষ খাতির করে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে পরিণত করে তাতে আমাদের উঠিয়ে দিলেন।

ধনুষ্কোটি থেকে তালাইমানার পর্য্যন্ত কয়েক ঘণ্টার সমুদ্র পথ অতিক্রম করার সময় জাহাজ এমন ভাবে দুলতে লাগল যে আমাদের মধ্যে অনেকেই বমন রোধ করতে পারলেন না। আমার যদিও বমন হয়নি তথাপি উঠে জাহাজের ঝাঁকানিতে শরীর বিকল হয়ে পড়েছিল। ট্রেণে উঠে টোষ্ট সহ চা পান করে আমরা সকলে ধাতস্থ হলাম।

ট্রেণে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে প্রত্যুষে আমরা অনুরাধাপুরমে পৌঁছুলাম। অনুরাধাপুরমে আমরা একটি বৌদ্ধ ধর্মশালায় উঠলাম। অনুরাধাপুরম প্রাচীন সিংহলের রাজধানী ছিল। এখানে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আছে। কয়েকটি অক্ষত বৃহৎ বৌদ্ধ ডাগোবাও আছে। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে শহরের পুরাতন কীর্তি সকল পরিদর্শন করতে বেরুলাম। একদিনে সমস্ত পুরাকীর্তি দেখা সম্ভব হল না। আমরা দুদিন অনুরাধাপুরমে ছিলাম। প্রাচীন বোধিদ্রুম ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধ মন্দির প্রদর্শন করলাম। বুদ্ধগয়া থেকে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রা বোধিদ্রুমের একটি শাখা নিয়ে সিংহলে যান। সেই শাখাটি অনুরাধাপুরমে রোপণ করা হয় তা থেকে এই বোধিক্রমের উৎপত্তি বর্তমানে বুদ্ধগয়ার সেই প্রাচীন বোধিক্রম নেই। সম্প্রতি সিংহল থেকে বোধিক্রমের শাখা ভারতে এনে নানা স্থানে রোপিত করা হয়েছে। বোধিক্রমটি অতি প্রাচীন হয়েছে। তার জীর্ণ কাণ্ডসকল স্বস্থানে রাখার জন্য লোহার আংটা দ্বারা বেড়া দেওয়া হয়েছে। নিকটস্থ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম যে উপাসক উপাসিকা রন্দ প্রদীপ জ্বেলে পুষ্পাঞ্জলি বুদ্ধদেবের পদপ্রান্তে অর্পন করছে। এখানে এবং সিংহলের অন্যত্রও দেখলাম যে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত জীবন্ত।

অনুরাধাপুরম থেকে আমরা বাসে করে মিহিণ্ডালে গেলাম। এখানেই প্রথমে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা আগমন করেন। তাঁরা যে স্থলে প্রথমে উঠেছিলেন সেখানে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের ভিক্ষুগণ আমাদের যত্ন করে সকল দেখালেন।

আমরা ঐ বাসে চড়েই দাম্বুল্লা ও সিগ্রিয়া গেলাম। দাম্বুল্লার বৌদ্ধ মন্দিরেও পূজারত বৌদ্ধ নরনারীকে দেখা গেল।

সিগ্রিয়ার একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের (বোলডার) উপর একটি একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। জনৈক রাজা শত্রুর ভয়ে এইখানে দুর্গ নির্মাণ করে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আমরা পাহাড়ের এক ধার দিয়ে নির্মিত লোহার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। তারপর নেমে এসে পাহাড়ের তলদেশের গুহার সিলিং-এ অপূর্ব ফ্রেস্কো চিত্র দেখলাম।

সেখান থেকে বাসে চড়ে আমরা পথে আরও দুই-একটি স্থান দেখে প্রাচীন সিংহলের অন্যতম রাজধানী কাণ্ডীর অভিমুখে রওনা হলাম। পথটি অতি সুন্দর এবং চতুর্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। সমস্ত সিংহল দেশটাই যেন একটি সুসজ্জিত উদ্যান। পথে যেতে যেতে দু'ধারে নারিকেলগাছ আচ্ছাদিত টিলা দেখা গেল। কোথাও বা কোকো ও কফির উদ্যান। এখন জানুয়ারী মাস কিন্তু মনে হল যে আমাদের বাংলা দেশের বর্ষাকাল। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গাছে গাছে আম ঝুলে আছে। সিংহলের বাড়ীঘর ও লোক দেখে মনে হল সিংহল ভারতবর্ষেরই প্রসারিত অংশ।

কাণ্ডীতে পৌঁছে আমরা একটি হোটেলে উঠলাম।

কাণ্ডী শহরটি অতি সুন্দর। শহরের ভিতর একটি লেক শহরের শোভা বর্ধন করেছে। এখানকার প্রসিদ্ধ দন্তমন্দিরে (দালাদা মালিগাওয়া) ভগবান্ বুদ্ধের একটি দন্ত রক্ষিত আছে। বৎসরে একবার মাত্র মন্দির থেকে দন্ত বের করে শোভাযাত্রা করা হয়। অন্য সময়ে সে দন্ত দেখার কোন উপায় নেই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দন্তটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমরা মন্দির দর্শন করতে গিয়ে শুনলাম ভিক্ষু উত্তম ব্রহ্মদেশের কয়েকজন বৌদ্ধ সহ এখানে এসেছেন এবং তাঁদের বিশেষ অনুরোধে তাঁদের দন্ত দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই শুনে আমরাও মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে বললাম যে আমরা সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছি এবং প্রার্থনা করলাম যে ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে আমাদেরও

দন্ত দর্শনের সুযোগ দেওয়া হোক। আমাদের আবেদন মঞ্জুর হল এবং নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষু উত্তমের দলের সহিত মিলিত হয়ে আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে গেলাম। মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু মন্দিরের গোপন কক্ষ থেকে স্বর্ণরৌপ্য খচিত একটি পেটিকা নিয়ে এলেন এবং তা উন্মোচন করে আমাদের দন্তটি দেখালেন। দাঁতটি সাধারণ মানুষের দাঁতের অপেক্ষা বৃহত্তর। আকারও ঠিক মানুষের দাঁতের মত নয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে একটি অগ্নিকাণ্ডে দাঁতটি ধ্বংস হয়ে যায়, পরে তার বদলে একটি কৃত্রিম দাঁত রাখা হয়।

কাণ্ডীর পেরাডেনিয়া বোটানিকাল গার্ডেনটি বিশ্ববিখ্যাত। ভারতে দুষ্প্রাপ্য নানাপ্রকার গাছের এখানে দর্শন মেলে। প্রায় সর্বপ্রকার মসলার গাছ এখানে আছে, তা ছাড়া জয়িত্রি ও জায়ফলের গাছ দেখলাম। একটি গাছে কয়েকটি অদৃষ্ট-পূর্ব ফল দেখে গাছের নিকটে গিয়ে দেখি যে একটি ফলের খোসা ফেটে গেছে এবং ফাটলের ভিতর থেকে কালো ও হরিদ্রাভ আভা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি ফল সংগ্রহ করে দেশে এসেছিলাম, ফলটি জায়ফল। জায়ফল হচ্ছে ফলটির বিচি এবং জয়িত্রি হচ্ছে ঐ ফলের শাঁস। পেরাডেনিয়া বাগানের অভ্যন্তরে সুন্দর ঝিল আছে। সেখানে একটি হস্তিযূথের স্নানলীলা দেখলাম।

কাণ্ডীতে অনেক কারুকার্য্যের শিল্পী আছে। শিল্প কার্য্যের কিছু নমুনা সঙ্গে এনেছিলাম।

পেরাডেনিয়া উদ্যান ভ্রমণের পর আমরা সিংহলের গ্রীষ্মাবাস পোলানুরুয়া দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমাদের দলের কয়েকজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, তাঁরা আর দেরি করতে চান না, শীঘ্র দেশে ফিরতে চান। ফলে আমাদের দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল, দলের ৩ জন আর অপেক্ষা না করে কলম্বো হয়ে দেশে ফিরে গেলেন, আমরা বাকী ৫ জন কাণ্ডীতে আর এক দিন থেকে গেলাম।

আমাদের সঙ্গীদের বিদায় দেবার পর দিন আমরা বাকী কয়জন বাসে চড়ে পোলানুরুয়ার অভিমুখে রওনা হলাম। পথটি অতি সুন্দর। পাহাড়ের গা বেয়ে চক্রাকার পথ অতিক্রম করে আমাদের বাস ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে চাবাগানগুলি অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। যতই আমরা উপরে উঠি চাবাগানগুলি আমাদের সঙ্গ ছাড়ল না। তারপর এক সময় আর চাবাগান দৃষ্টিগোচর হল না। চাবাগান এলাকা অতিক্রম করে উঠার পর চতুর্দিকের নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই অপূর্ব সৌন্দর্য্যময় স্থানটির নাম শুনলাম সীত্রালা। সিংহলে রাম রাবণের যুদ্ধের কথা কেউ জানে না, রাবণ সম্বন্ধে কোন কিম্বদন্তীও প্রচলিত নেই। সীত্রালা নামের সঙ্গে সীতার নামের কোন যোগ আছে কি না জানি না কিন্তু যদি এখানেই সীতাকে বন্দী করে রাখা হয়ে থাকে তা হলে এই স্থানটি অশোকবনের উপযুক্ত বটে।

পোলানুরুয়ায় পৌছে আমরা শীত অনুভব করলাম। এ সময় সিংহলের সমতল ভূমিতে গ্রীষ্মকালের ন্যায় গরম। পোলানুরুয়া শহরের দৃশ্যটিও মনোহর। আমরা শহরটি ঘুরে ফিরে দেখে কাণ্ডী প্রত্যাবর্তন করলাম।

কাণ্ডী থেকে আমরা কলম্বো গেলাম। সেখানে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম এবং তামিল ব্রাহ্মণের হোটেলে আহারাদির ব্যবস্থা করলাম।

কলম্বোয় দু'দিন থেকে সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করলাম। কলম্বোর বন্দরটি অতি সুন্দর। এখানকার মিউজিয়ম বা যাদুঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি সংগৃহীত আছে।

কলম্বোর "গল ফেস" নামক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়দের হোটেলটি সমুদ্রতীরে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত আছে। হোটেলের সম্মুখস্থ চত্বর সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। শুনলাম যে পৃথিবীর কোথাও উপকূলে ঘাস জন্মায় না, কেবলমাত্র এখানেই ঘাস আছে। ঐ চত্বরের একটি বেঞ্চে বসে আমরা সমুদ্রের শোভা উপভোগ করলাম। সিংহলের বহু লোককে বাঙ্গালী বলে ভ্রম হয়। গল ফেসে একটি সিংহলী যুবকের সঙ্গে আলাপ হল ও কথা-

প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে অন্তত: তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাংলা দেশ থেকে সিংহলে এসেছিলেন।

আমরা দু'দিন কলম্বোতে থেকে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও দেখলাম।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে ফেরবার সময় আমরা কলম্বো থেকে জাহাজে টুটি-কোরিণ যাব। তার পর কন্যাকুমারী দর্শন করে মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি শহর প্রদর্শনের পর কলকাতায় ফিরব কিন্তু আমাদের দল দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা গেল না। আমরা ৫ জন কলম্বো থেকে ট্রেনযোগে তালাইমানারে এসে জাহাজে সমুদ্র অতিক্রম করে ধনুস্কোটিতে পৌছে ট্রেণ ধরলাম এবং অন্য কোথাও না নেমে কলকাতায় ফিরলাম।

কলকাতায় ফিরে একদিন প্রাতঃকালে স্যার যদুনাথ সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোট আদালতের উকিল অনাদিনাথ সরকারের বাসায় গেলাম। সেখানে আমার পূর্ব-পরিচিত একজন সি আই ডি সাব-ইন্স্পেক্টারের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন, গিরিজাবাবু, আপনারা ত বহু দেশ ঘুরে এলেন। আমি বললাম, আপনি জানলেন কি করে? তিনি জানালেন যে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বাংলার প্রতিনিধিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কলকাতা থেকে বহু টিকটিকি মাদ্রাজ গিয়েছিল। আমরা যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাই তখন বাংলার টিকটিকিরা তামিল নাড়ুর টিকটিকিদের আমাদের সকলের পরিচয় দিয়ে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে বলেছিল। অনুরূপ ভাবে সিংহলের টিকটিকিদের আমাদের উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অথচ আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারি নি বা আমাদের মনে কোন সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নি।

ক্রমশঃ

অশরীরী

ডাঃ অমল সরকার

অনেকদিন ধরে ভুগছিলাম। রোগটা ছিল ক্যানসার। কাজেই সারবার কোন আশা ছিল না। তবুও মরতে চায় কে? বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমারও ছিল। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে পয়সার অভাব ছিল। কেই বা সাহায্য করবে, আমার প্রাণের জন্যে কারই বা মায়া। ঐ দুচার জন কথায় সহানুভূতি দেখাত, তার চেয়ে বেশী করবেই বা কি? বন্ধুদের মধ্যে যে দু-একজন ঘনিষ্ঠ ছিল, তারা দেখা করত, মাঝে মাঝে ফল-টল আনত, সান্ত্বনার দুচারটে কথা বলত। এর চেয়ে বেশী কিছু তাদের কাছে আশাও করতাম না। ওদের নিজেদেরও তো সংসার আছে, সমস্যা আছে? আমার প্রাণের জন্যে আজ যার সবচেয়ে বেশী চিন্তা হবার কথা, মানে আমার স্ত্রী মিনতি, সে আমার বহু আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। মিনতি ছাড়া আমার দুটো মেয়ে ছিল। তাদেরও বে'থা হয়ে গিয়েছিল, বিদেশে থাকত। তাদেরও সংসার ছিল, আমার জন্যে চিন্তা করবার কতটুকু সুযোগ-সুবিধাই বা তারা পেত। তা ছাড়া তারা তাদের স্বামী-ছেলেমেয়েদের ফেলে তো আর

আমার দেখাশুনো করতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর কমলনাথের চেষ্টায় এই হাসপাতালে একটা 'বেড' আমার জুটেছিল। যেদিন 'বেড' পেয়েছিলাম সেদিন কমলনাথের হাত ধরে আমি বলেছিলাম, 'কমল, তুমি আমার জন্যে যা করলে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।' কমল ছলছল চোখে উত্তর দিয়েছিল, 'ওসব কথা থাক্, ভাই। তুমি ভগবানের ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।' কমল জানত আমি ভাল হব না, আমি নিজেও জানতাম আমি ভাল হব না, তবুও ঐ বাঁচবার আশা।

এইভাবে প্রায় একবছর ঘুরে গেল, বাঁচবার আশা ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। ক্যানসারের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই ইদানীং ভগবান্‌কে বলেই চলেছিলাম, এবার দয়া কর। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। বিকেলে রোজই কমলনাথ আসে। সেদিন বিকেল হতে অনেক দেরী। কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।......... হঠাৎ যন্ত্রণাটা, অস্বাভাবিক বেড়ে উঠল। সবিতা নামে নার্সটিকে ডাকলাম। সবিতাই আজকাল আমাকে দেখাশুনো করছিল। আমার অসহায় অবস্থা দেখে ওর আমার প্রতি-বোধহয় মায়া পড়ে গিয়েছিল। ও যখন আমার দেখাশুনো করত, মনেই হত না ও আমার পর। মনে হত ও আমার একান্ত আপনার, এক-এক সময় মনে হত, মিনতি বোধ হয় সবিতার হাত দিয়ে আমার সেবা করছে, শুশ্রূষা করছে। সবিতা কাছেই বসেছিল। উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, খুব কষ্ট হচ্ছে?' আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দম যেন কেমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।' সবিতা আমার কথা শুনে ও আমার ভাবগতিক দেখে কেমন যেন 'নার্ভাস' হয়ে পড়ল। একটু সামলিয়ে নিয়ে বলে, 'কিচ্ছু ভয় নেই, আমি ডাঃ সোমকে ডেকে নিয়ে আসছি।' উঠে 'করিডরে'র দিকে এগিয়ে গেল। আমার তখন কিন্তু কষ্ট আরও বেড়ে গেছে। মনে হল কারা যেন এসে আমার নাক-মুখ চেপে ধরেছে। সবিতা ডাঃ সোমকে নিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আমার বেডের কাছে এল। ডাঃ সোম আমাকে নেড়ে-চেড়ে ভাল করে পরীক্ষা করে ষ্টেথিসকোপের একটা দিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সবিতা ডাঃ সোমের কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করে, 'ডাঃ সোম, কেমন দেখলেন?' ডাঃ সোম সবিতার দিকে মুখটা ফিরিয়ে বললেন, 'না, কোন আশা নেই।' সবিতা কোন কথা বলতে পারল না। ডাঃ সোম আমার হাতদুটোয় নিজের একটা হাত একবার ছুঁইয়ে সবিতার পিঠের ওপর হাতটা একবার রেখে চলে গেলেন। সবিতা নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমি বুঝতে পারলাম যে, এখন শত আশা বা চেষ্টা করলেও আমি আর বাঁচতে পারব না বা আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে, আমি এই তো চাইছিলাম। ক্যানসারের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্যে মৃত্যুই তো আমার একমাত্র কাম্য ছিল। সবিতা বেডের পাশে টুলখানায় চুপ করে বসে আমার কপালে মাথায় হাত বুলোতে থাকে। ঘরের অন্যসব রোগী তখন প্রায় ঘুমিয়ে, দু'একজন যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অস্ফুট আর্তনাদ করছিল। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, আমার জীবনের 'রেকর্ডেড' সময়ের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। এতক্ষণ কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছিলাম; কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তবুও নিচ্ছিলাম, পৃথিবীর সঙ্গে তখনও আমার সম্পর্ক ছিল, তখনও পৃথিবীকে অনুভব করছিলাম। এবার মনে হল, শ্বাস নিতে আর পারব না, কারা যেন আমার মুখ ও নাক সজোরে চেপে ধরেছে, কিরকম একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করলাম এক মুহূর্ত, তারপরই সব শেষ হয়ে গেল। আমার প্রাণটা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল, পৃথিবী থেকে আমি যেন আলাদা হয়ে গেলাম। দেখলাম, সবিতা 'না, না' বলে উঠল একবার। আমার বেডের আমার দিকে 'লাইট'টা নিভে গেল। আমি, আমার পৃথিবীর দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার সময় প্রথমে একটা দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এবার দেখি, সেই হাওয়া সূক্ষ্ম দেহের রূপ ধারণ করেছে,

প্রায় আমার পৃথিবীর চেহার মত, তবে বেশ গোলগাল, মানে পনেরো কুড়ি বছর আগে যেমন ছিলাম, 'বেডে' 'ক্যানসারে' আক্রান্ত শরীরটার মত দুর্বল, রুগ্ন, শীর্ণ নয়। একটা পার্থক্য বেশ বুঝতে পারলাম ; পৃথিবীর শরীরকে যেমন নিজের হাতেই নিজেকে ছুঁতে পারতাম, এখন আর পারছি না, তবে খুব একটা খারাপ লাগছিল না, ক্যানসারের সেই অসহ্য যন্ত্রণা ছিল না, কোন পিপাসাও ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছিল যে, আমি পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, আমারই মত কয়েকজন অশরীরী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাঃ সোম কারিডরের কাছে বসেছিলেন, তাঁর ওপর দিয়ে, ঘরের অন্য বেডগুলোর মাঝখান দিয়ে, বেডে শোয়া আমার শরীরটার ওপর দিয়ে, টুলে বসা সবিতার গায়ের ওপর দিয়ে ওরা চলে এল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, সত্যি, এদের ভারী মজা তো, যেখান দিয়ে যেভাবে খুশি যেতে পারে, পৃথিবীর কেউ এতটুকু টেরও পায় না। আমার খুব কাছে এসে ঐ আকৃতিগুলো আমাকে একরকম ঘিরে দাঁড়াল।

আমি প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ইতিমধ্যে একটি আকৃতি আমার একেবারে পাশে এসে হাসতে হাসতে বলে, 'কি, কেমন লাগছে ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের কেমন ?'

'এই পৃথিবীর দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে !'

'কেমন যেন খুব হালকা লাগছে। আচ্ছা, এই যে অশরীরী আকৃতি, এগুলো কি ?'

'কিছুই না, ঠিক এইভাবেই আমরা প্রত্যেকে আমাদের পার্থিব দেহের মধ্যে থাকি, তবে জানই তো, পার্থিব দেহ রক্ত-মাংস-হাড়-মজ্জা দিয়ে গড়া, ওগুলো চিরকাল থাকতে পারে না, একটা সময় আসে যখন ওগুলো আর কাজ করতে পারে না।

আর একটি আকৃতি এগিয়ে এসে বলে, 'ও তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছে না। মানে, যখন পৃথিবীর দেহে তুমি পৃথিবীতে ঘুরছিলে ফিরছিলে তখন তোমার কি মনে হয় নি যে, তোমার ভেতর থেকে কে যেন তোমাকে কথা বলায়, কাজ করায়, চিন্তা করায়, সেই কেই হল আমাদের এই অশরীরী আকৃতি। একেই পৃথিবীর লোকেরা নানা নাম দিয়েছে, আত্মা, সূক্ষ্ম শরীর,—এর কখনও বিনাশ হয় না।'

ওদের কথা শুনে আর আমার নিজের অবস্থা দেখে বেশ আশ্চর্য্য লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, পৃথিবীতে যেমন অগুনতি পার্থিব দেহ আছে, সেইরকম অগুনতি অশরীরী আত্মাও আছে নাকি ?'

প্রথম আকৃতিটি বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে পৃথিবীর দেহধারী জীবের যেমন মৃত্যু হয়, আমাদেরও, মানে অশরীরী আত্মাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হয়, একদিন এক বিরাট আত্মার মধ্যে গিয়ে আমাদের মিশে যেতে হয়, এই বিরাট-এর সঙ্গে মিশে যাওয়াকেই পৃথিবীর লোকেরা নাম দিয়েছে মোক্ষ, নির্বাণ, বা মুক্তি লাভ করা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে এইভাবে সেই বিরাট আত্মাতে মিশে যেতে যেতে সব অশরীরী আত্মা একদিন শেষ হয়ে যাবে ?"

সে বলে, 'পাগল, সেই বিরাট আত্মা রূপহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। একদিকে রূপ রূপহীন হয়ে অরূপে মিশে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে অরূপ রূপ গ্রহণ করে নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে।'

আর একটি আকৃতি বলে, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। পৃথিবীর গণ্ডী পেরিয়ে যেখানে তোমার অবস্থান হবে, সেখানেই সব কিছু দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে।'

এবার আমার ছেড়ে আসা দেহটার কাছে সবিতা ছাড়াও আরও দুচারজনকে দেখলাম, চিনতে পারলাম না, তবে মনে হল একজন ডাঃ সোম। আমি যে বেডে মারা গিয়েছিলাম তার চার পাশে মশারির মত একটা কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। বোধ হয় আমার মারা যাওয়াতে আমার দেহকে অন্যদের, মানে যারা বেঁচে আছে তাদের, কাছ থেকে আলাদা করে রাখবার প্রথম প্রয়াস।

সবিতা হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো ভাল করে বন্ধ করে দিল। বোধ হয় মারা যাবার সময় চোখদুটো একটু খোলা ছিল। ঠোঁটদুটোকে আঙুল দিয়ে একটু চেপে দিল, ঠোঁটদুটোও বোধ হয় খোলা ছিল, হাত-দুটোকে ওর হাতের মধ্যে একবার নিয়ে আমার বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল। চোখদুটো একবার মুছে নিল। আমার এই ভেবে আনন্দ হল যে, যাক্, পৃথিবী থেকে বিদায়ের দিনে একজন অন্ততঃ দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল। অবশ্য এটা আমার ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ; মিনতি যদি বেঁচে থাকত আর এই সময় আমার দেহের কাছে থাকত তাহলে কেঁদে ও চোখ ফুলিয়ে ফেলত। পরক্ষণেই ভাবলাম, মানুষ কাঁদেই বা কেন। জন্ম নেবার সময় নিজে কাঁদে আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় অপরকে কাঁদায়। তাহলে হাসে কখন! সমস্ত জীবনটা তো কেঁদেই কেটে যায়। আশ্চর্য্য! সবিতা চলে গিয়ে ছিল, এরপর ওখানে আমার দেহ যতক্ষণ পড়ে ছিল, ওকে আর দেখতে পাই নি। হয়ত আসে নি আর, হয়ত কাজের ভারে আর আসতে পারে নি, বা পৃথিবী ছেড়ে এসে আমিই সে চেনা মুখকে আর চিনতে পারি নি।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন লোক আমার দেহটাকে একটা স্ট্রেচার করে নিয়ে অন্য একটা ঘরে রেখে গেল। আমার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল কিন্তু মৃত দেহটার সঙ্গে চুম্বকের আকর্ষণের মত লেগে থাকল। আমি আমার ছেড়ে আসা দেহটা থেকে কিছুতেই দূরে যেতে পারছিলাম না, অথচ অন্য অশরীরী আত্মাগুলো দেখি, দিব্যি এঘর ওঘর সেখানে খুশী ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি আকৃতি কাছে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আমার এরকম বন্ধন দশা কেন বল তো? তোমাদের মতো যেখানে ইচ্ছে যেতে পারছি না।'

আকৃতিটি একটু হেসে উত্তর দেয়, 'পারবে, পারবে, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, তোমার তো এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি হয় নি।'

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, এখনও মুক্তি হয় নি কেন?'

'তোমার দেহটাকে যে মুহূর্তে ওরা মানে পৃথিবীর লোকেরা, আগুনে পুড়িয়ে দেবে এবং তোমার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে তুমি একেবারে মুক্ত হবে।'

'তাহলে যাদের কবর দেওয়া হয়?'

'ঐ একই কথা, তাদের কবরের মধ্যে শুইয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলে অশরীরী আত্মার মুক্তি হয়, তবে একটু দেরী হয়, আগুনে পোড়ালে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়, কারণ পার্থিব দেহের কিছুই অবশেষ থাকে না, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে গিয়ে একেবারে মিশে যায়।'

'কিন্তু যাদের পোড়ানো হয় না, কবরও দেওয়া হয় না। যেমন পার্সীদের।'

'ওদের মুক্তি পেতে বেশ দেরী হয়, কারণ ওদের স্থূলদেহের চিহ্ন অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে, মোট কথা হল পৃথিবীর ওপর থেকে যতক্ষণ না স্থূলদেহের সবটুকু বিলুপ্ত হয় ততক্ষণ মুক্তি হয় না। মানে অশরীরী হয়ে যেথানে খুশী যাওয়া যায় না, এই আর কি।'

একটু থেমে আবার ঐ আকৃতিটি বলে, 'তবে কি জান, আমাদের এই যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ান সেই পরম আত্মার ইচ্ছে অনুসারে হয়, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণকর্তা তিনিই।'

'তিনি মানে আমরা যাকে ভগবান আখ্যা দিয়েছি?'

'হ্যাঁ, বলতে পার। সে বিরাট আত্মাকে শুধু উপলব্ধি করতে পার, তবে তাঁর কি প্রচণ্ড শক্তি তুমি কল্পনা করতে পারবে না। এই যে গ্রহ, তারা, সূর্য্য, চন্দ্র যে একটা নিয়মে ঘুরে বেড়ায় এ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। সেই নিয়ামক, নিয়ন্ত্রকের ধারণা পর্য্যন্ত আমরা করতে পারি না।'

আমি বললাম, 'এরকম কথা পৃথিবীতে যখন ছিলাম তখনও শুনতাম। তিনি, মানে সেই নিয়ন্ত্রকের কোন আকার নেই—তিনি জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাঁর সেই বিরাটত্বের কল্পনা করা যায় না

বলে আমরা তাঁকে এক-এক রূপে কল্পনা করবার চেষ্টা করি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ, সত্যিই তিনি সীমাহীন বিরাট।'

কিন্তু তিনি কিভাবে পৃথিবীর এত রকম জীবের চিন্তা করেন, আর তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি, তিনি কি চান। মানে আমাদের পরিণতি যখন মৃত্যুতে, বিনাশে, তাহলে আমাদের জন্ম নেবারই বা কি দরকার। এই যে তোমরা অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমাদেরই বা কি দরকার। আর এই যে কোটি কোটি তারা, গ্রহ, নক্ষত্র এদেরই বা কি দরকার।'

আকৃতিটি উত্তর দেয়, 'সত্যি, তোমার প্রশ্নের অর্থ আছে, কিন্তু জবাব আমি দিতে পারব না। সেই পরম শক্তির সান্নিধ্যে যখন আসবে তখন এর সমাধান করে নিও।'

'আচ্ছা, তুমি যাকে পরমশক্তি বলছ তাঁকে দেখতে কিরকম?'

'জানতে কৌতূহল হচ্ছে, না?'

'হচ্ছে বই কি!'

আকৃতিটি উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় চার-পাঁচ জন লোক, বোধহয় হাসপাতালেরই লোক, আমার দেহটাকে ঐ ঘর থেকে, মানে 'বেড' থেকে এনে আমার মৃতদেহটিকে যেঘরে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে বের করে আনল। আমার সূক্ষ্ম আকৃতিটিও সঙ্গে সঙ্গে চলল এবং কয়েকজন অশরীরীও আমার সঙ্গ নিল। সিঁড়ি বেয়ে আমার দেহটিকে নীচে, একেবারে বাইরে গেটের কাছে এনে রাখা হল। তখনও স্ট্রেচারের ওপর আমার দেহটা। দেখি, কমলনাথ তার জনাকয়েক বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। একজনকে কমলনাথ বলে, 'আর বেশীক্ষণ তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না। এবার ব্যবস্থা করা যাক্।' পাশের ছেলেটিকে বলে, 'মহিম, তুমি একটা খাটের বন্দোবস্ত কর।' ইতিমধ্যে আর একজনের মৃতদেহ, সেও ক্যান্সারে মারা গেছে, বয়স আমারই মত, এনে আমার স্ট্রেচারের বেশ খানিকটা দূরে রাখা হল। দেখি, ঐ দেহটার কাছে আমাদের মত কয়েকজন অশরীরী আকৃতি ঘোরাফেরা করছে। আমি আমার পাশের আকৃতিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ঐ মৃতদেহটার কাছে যে আকৃতিগুলো ঘোরাফেরা করছে, ওরা কি তোমাদের সঙ্গে এসেছে?'

'না, ওদের আমরা চিনি না। ওদের একটা নিজস্ব দল আছে।'

'মানে!'

'মানে আর কিছু না, তোমাদের পৃথিবীতে যেমন বংশ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থাকে, আমাদেরও ঠিক তাই আছে। তুমি যখন বেঁচেছিলে পার্থিব-দেহে, তখন তো রোজ কত মৃতদেহ দেখতে সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু তুমি কি যেতে তাদের সঙ্গে, বা তুমি কি সেই মৃতের জন্যে কিছু ভাবতে?'

'না, তা ঠিক ভাবতাম না, তবে......'

'আমাদের এখানেও ঠিক তাই। আমাদের এক-একটা গোষ্ঠী আছে আর গোষ্ঠীর যিনি অধিকর্তা তাঁর নির্দেশমত আমাদের কাজ করতে হয়।'

'তাহলে বল তোমাদের ভেতর মারামারি, কাটাকাটি হয়—'

'মোটেই না, কারণ কি নিয়ে মারামারি করবে, মারামারি করতে গেলে চাই রক্ত-মাংসে গড়া দেহ এবং মারামারি ঝগড়া করবার কারণ থাকা চাই।—আমাদের তো আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি, যাকে পৃথিবীর লোকেরা ষড়্‌রিপু আখ্যা দেয়, সেগুলো তো নেই—আমরা ষড়্‌রিপু-মুক্ত কাজেই আমাদের মধ্যে মারামারি হতে পারে না। আসল কথা কি জান, মানুষ বা পৃথিবীর জীবমাত্রই এই রিপুগুলোর দাস অর্থাৎ এগুলো ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। রক্ত-মাংসে গড়া দেহ হলেই এগুলোর অবস্থান এবং সেই দেহই যখন নেই, আমাদের তখন সে রিপুগুলোই বা থাকবে কি করে!'

কমলনাথের বন্ধুটি আমার জন্যে ততক্ষণ একটা খাট নিয়ে এসেছিল। সেই দড়ির খাট, যে খাটগুলোকে

হাসপাতালের কাছে বা কোন কোন বাজারে দেখতে পেতাম যখন পৃথিবীতে ঘুরতাম, বেড়াতাম। কমলনাথ ও আর কয়েকজন এবার 'ষ্ট্রেচার'টার কাছে এসে আমার দেহটাকে ধরাধরি করে ঐ খাটটার ওপর শোয়াল। কে যেন বলে উঠল, 'কাপড় দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিন।' আর একজন বলল, 'দড়ি দিয়ে বডিটাকে বাঁধতে হবে না?' কমলনাথ উত্তর দেয় 'কিচ্ছু করতে হবে না, এখান থেকে কেওড়াতলা এমন কিছু দূর নয়, কয়েক মিনিটের পথ। যেমন আছে ঐ ভাবে নিয়ে চল।' দেখলাম যে কোন অনুষ্ঠান কেউ করল না। মনে পড়ল যে, মা-বাবা যখন মারা যান, দু'জনার জন্যে, বিশেষ করে মায়ের জন্যে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। ভাবলাম হয়ত আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে নি বলে অনুষ্ঠান বাদ যাচ্ছে। অথবা হাসপাতালে মারা গেছি বলে। ইতিমধ্যে দেখি কমলনাথের এক বন্ধু একটা ছোটগোছের ফুলের তোড়া নিয়ে কমলনাথকে দিল। কমলনাথ তোড়াটা আমার দেহের বুকের কাছে রেখে আমার হাতদুটোকে জোড়া করে তোড়াটার কাছে রাখল। কমলনাথ হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, 'বারোটা বাজতে চলল, চল, আর দেরী করার দরকার নেই। প্রকাশের আপনার বলতে আর কেউ আসবে না, খবর দেওয়া হয়েছিল ওর এক ভাইকে, কিন্তু এখনও সে যখন এসে পৌঁছয় নি; নাও হে রেডি হও।'

আমার সূক্ষ্ম শরীরটা খাটের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়েছিল, অশরীরী আকৃতিগুলোও আমার চারপাশে।

কমলনাথ ও আর তিনজন খাটটার চারটে পায়ার দিকে এক-একজন দাঁড়িয়ে পড়ল, তাদের মধ্যে দু'জন কোমরে লালগামছা বেঁধে নিল। একজন বলে ওঠে, 'নিন্ কমল-দা, যতীন-দা, কাঁধ দিন' বলে নিজেই 'বল হরি, হরি বোল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে এবং সকলেই তখন তারস্বরে চিৎকার করে, 'বল হরি, হরি...বোল।'

এই হরিকে মনে করবার এই ডাক যখন বেঁচেছিলাম বহুবার বহুদিন শুনেছি। কখনও শুনেছি মড়া নিয়ে যাবার সময়, আবার কখনও শুনেছি বৈষ্ণব আখড়ায়; অবশ্য বৈষ্ণবদের আখড়ায় প্রথমটা মানে 'বল হরি-টা' তেমন শুনতে পাইনি, তবে নিজেকে ভুলে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে পাগল হয়ে ভক্তকে দু'হাত তুলে নাচতে অনেকবার দেখেছি। ভাবলাম, সত্যি কি পার্থক্য ছিল,—বৈষ্ণবের 'হরি' ডাকে কেমন একটা আনন্দের শিহরণ হত আর মড়া নিয়ে যাবার সময় 'হরি'র নামে কেমন একটা আতঙ্ক হত।

আমাকে কাঁধে চড়িয়ে কমলনাথরা গেটের বাইরে এল। ছ'জন অশরীরীও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। তখন ভর দুপুর। রাস্তায় খুব ভিড় না থাকলেও লোকজন মোটামুটি আসা-যাওয়া করছে, ট্রাম-বাসও মধ্যে চলছে।

কমলনাথ বলে, 'চল সোজা, রাসবিহারী মোড়ের থেকে ঘুরলেই হবে।' আবার সেই বিকট চিৎকার করে, ওরা এগিয়ে চলল, 'বল...হরি, হরি...বোল, বল...হরি, হরি...বোল'। রাত্রি হলে এ চিৎকার নিশ্চয় বিকট শোনাত কিন্তু দিনের বেলা পৃথিবীর জীবনের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো থাকবার দরুণ 'বল...হরি'র শব্দ খুব একটা প্রাধান্য পাচ্ছিল না। আমার খাটের একেবারে গা ঘেঁষে ঘেঁষে আমরা কজন অশরীরী চলছিলাম। ডানদিকে তাকাতেই আশুতোষ কলেজ চোখে পড়ল, হাজরা পার্ক ও দেখলাম, কিন্তু সবই কেমন যেন বিদেশী বিদেশী লাগছিল। অচেনা লাগছিল। অথচ ঐ কলেজের ভেতর কতবার গিয়েছি, কতবার পার্কের ঐ বেঞ্চগুলোতে বসে সময় কাটিয়েছি। পরিবেশ সব একরকম আছে, কিন্তু আমার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। এইরকম কত কি ভাবছিলাম, দেখছিলাম। ঐ তো ট্রাম যাচ্ছে, ঐ তো 'ইপেজ'। আমার 'মড়া' নিয়ে কমলনাথরা ওখানে আসতেই যারা ইপেজের কাছে দাঁড়িয়েছিল, সরে দাঁড়াল। কেউ ভয়ে আস্তে আড়চোখে আমার মৃতদেহের দিকে তাকাল, আবার কেউ ডানহাতটাকে ক্রুসের মত করে নিয়ে মাথায় হাত ঠেকাল যেমনটি আমি বেঁচে থাকবার সময় 'মড়া' দেখলেই করতাম। ট্রামের ড্রাইভার আস্তে আস্তে ঘন্টি বাজাল, ওর চোখদুটো আমার খাটের

দিকে ছিল, ট্রামের একটা সিটে একজন বৃদ্ধলোক পাশের লোকটিকে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলল ও চোখ বুজে থাকল কিছুক্ষণ...বোধহয় আমার উদ্দেশে কোন প্রার্থনা করল।

আমাকে নিয়ে ততক্ষণ কমলনাথরা বসুশ্রী, উজ্জ্বলা সিনেমা হলগুলো পেরিয়ে এসেছে। কালিঘাট পার্ক বাঁ হাতে রেখে 'বল হরি, হরি বোল' করতে করতে ওরা এগিয়ে চলেছে। ঐ ভরদুপুরেও আমাকে নিয়ে যেতে ওদের বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না, কারণ 'ক্যান্সারে' ভুগে ভুগে আমার হাড়কখানাই মাত্র সার ছিল। আমার নিজের আমার দেহের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হচ্ছিল। কত কষ্টই না পেয়েছে ঐ দেহটা! অবশ্য কষ্টটা কিছুটা নিজের দোষে, কিছুটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। অথচ বছর পনেরো আগেও আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল।

ওরা রাসবিহারীর মোড়ে এসে পশ্চিম দিকে ঘুরল কারণ ঐ রাস্তা দিয়েই পৌঁছতে হবে কেওড়াতলা শ্মশানে যেখানে আমার মরদেহের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অশরীরী আত্মারও পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থাকবার শেষ স্থান। ইতিমধ্যে একজন অশরীরী আমার কাছে এসে বলল,—

'এবার তো তোমার যাবার সময় হয়ে এল।'

আমি বললাম, 'কেন, আমি কি এখনও পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে যাই নি।'

'কেন, নিজেকে দেখে বুঝতে পারছ না, তোমার ঐ মরদেহের সঙ্গে চুম্বকের মত লেগে থাকতে হচ্ছে। তবে তোমার বরাত ভাল যে ওরা তোমরা দেহতে একটু পরেই আগুন দিয়ে দেবে—'

'কিন্তু......' আমি বললাম।

'কিন্তু কি?' আকৃতিটি জিজ্ঞেস করে।

'মানে, আমরা মারা গেলেই কি সত্যি মারা যাই?'

'ঠিক বুঝলাম না! একটু পরিষ্কার করে বল তো।'

'মানে, আমি বলতে চাইছি যে, আমাদের পার্থিব দেহের যখন মৃত্যু হয়, যখন পৃথিবীর লোকেরা অর্থাৎ ডাক্তার-বৈদ্যরা নাড়ী টিপে, চোখ, বুক দেখে বলে দেয় যে অমুক মারা গেছে, সত্যি সে কি মারা যায়? এমনও তো হতে পারে যে ঐ মৃত্যুটা ক্ষণিকের, কিছুক্ষণের জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের ভেতর এমন কোন একটা 'নার্ভ' বা ঐরকম একটা কিছু আছে যেটাকে মানুষ এখনও জানতে পারে নি বা চিনতে পারে নি, এবং যেটাকে চালু করে দিলেই হৃৎপিণ্ড আবার চলতে শুরু করে দেবে।—তা না হলে দেখ, অল্প বয়সে জীব মারা যাবে কেন, হ্যাঁ, বয়স হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সব শিথিল হয়ে গেলে মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু সেই পরিপক্কতা বা শিথিলতা না এলে মৃত্যু হবে কেন? তোমরা বোধ হয় শুনে থাকবে যে, আজকাল কৃত্রিম উপায়ে অপরের হৃৎপিণ্ড লাগিয়ে একজন মৃত্যুমুখীকে বাঁচিয়ে রাখছে মানুষ। আমার তো তাই দৃঢ়বিশ্বাস যে, অল্প বয়সে পৃথিবীর কারুর মৃত্যু হয় না, তাকে একরকম জোর করেই আগুনে চাপিয়ে দেওয়া হয় বা মাটির নীচে কবর দিয়ে দেওয়া হয়। হয়ত এমনও হয় যে, চিতায় আগুন দেবার পর বা ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীর ওপর শুইয়ে দিয়ে 'সুইচ অন' করবার পর বা কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দেবার পর যাকে মৃত বলে 'ডিক্লেয়ার' করা হয় তার সম্বিৎ ফিরে আসে কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকে না।'

সেই আকৃতিটি বলে, 'তুমি যে একেবারে বাজে কথা বলছ তা নয়, এরকম দু'একটা ঘটনা আমারও জানা আছে। একবার কি হয়েছিল জানো—'

আমার মৃতদেহটাকে নিয়ে কমলনাথেরা ততক্ষণ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল। শ্মশানঘাটে কমলনাথকে আমার মারা যাওয়ার 'প্রমাণপত্র' দেখাতে হল। প্রমাণপত্র পরীক্ষা করবার পর ওখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রেজিষ্টারে আমার নাম, বয়স, ঠিকানা ইত্যাদি লিখে নেওয়া হল। এই বোধ হয় পৃথিবীর রেজিষ্টারে আমার নাম লেখা শেষ, মানে আমাদের মরদেহের অস্তিত্ব থাকাকালীন। এর পর আমার সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু লেখে তখন আমার আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবীতে।

প্রায় একটা বাজছিল। কেওড়াতলার যেখানটায় ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীর ঘরটা তারই দক্ষিণ দিকে বারান্দায়

ওপর তখন আমার মরদেহ রাখা। কানে এল, কমলনাথ বলছে, 'কাঠের জোগাড় করে ফেল হেমেন, আর দেরী করো না।' হেমেন নামে ছেলেটি বলে, 'কেন, কমল-দা, ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীতে ব্যবস্থা করলে কত না সময় কম লাগত।'

কমলনাথ উত্তর দেয়, 'না, বদ্ধ ঘরে ইলেক্‌ট্রিক হিটারে চাপিয়ে দাহ করাটা কেমন যেন রোষ্ট করার মত লাগে, কেমন যেন বিদেশী বিদেশী ছাপ। আমাদের যে চিরাচরিত প্রথা, মানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া তাতেই বন্ধুর গতি হয়।' একটু চিন্তা করে কমলনাথ আবার বলে, 'খোলা আকাশের নীচে আগুন জ্বলবে, প্রকাশের আত্মা অগ্নি-বাহনে সোজা উর্ধ্বলোকে যেতে পারবে।' হেমেন কমলনাথের কথার আর কোন উত্তর দেয় না। কাঠের জোগাড় করতে আর একজনকে নিয়ে বাইরে চলে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পৃথিবীর সঙ্গে আমার দেহের অবস্থান হবে ভেবে ভাল লাগল। আমার দেহের দিকে তাকিয়ে আমারই কেমন যেন মায়া হল। নিস্পন্দ, নিঃসাড় ভাবে শুয়ে আছে আমার দেহ সেই ভোর রাত থেকে। অথচ একদিন এই দেহে প্রতি মুহূর্তে থাকত শিহরণ, আলোড়ন ও গতি। ঐ দেহটাকে আশ্রয় করে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভাবনাই না ছিল। কিন্তু আজ সব শেষ। সত্যি, মানুষ জন্মই বা কেন নেয়, যদি এই হয় তার শেষ পরিণতি। আমার জন্ম যদি না হত তাহলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হত? আমার জন্মে পৃথিবীর লাভই বা কি হয়েছে? এই-রকম কত কি ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার কাছের আকৃতিটি জিজ্ঞেস করল, 'কি, খুব যে ভাবনায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমার তো ভাবনা থাকার কথা নয়? ভাবনা, চিন্তা এসব হচ্ছে যারা বেঁচে থাকে ঐ পৃথিবীতে তাদের জন্যে। মরণোত্তর অবস্থায় এসব কিছুই থাকে না। এর কারণ কি জান? কারণ ভাবনা, চিন্তা করে কে? মন। মন দেহ ছাড়া নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সে কাজ করতে পারে না। কাজেই তোমার মরদেহ থেকে তোমার মনরূপী শক্তি যখন বেরিয়ে এসেছে তার কোন শক্তিই নেই যতক্ষণ না সে আবার একটা দেহ পায়। এখন সে একেবারে মুক্ত।'

কথাগুলো শুনে প্রথমটা একটু অবাক্ লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই সব বুঝতে পারলাম। আকৃতিটি বলে চলে, 'আর তাই দেখ মানুষ তার একটা বিশেষ জন্মের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই মৃত্যুর পর মনে রাখতে পারে না। মনের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ। কিন্তু এই স্মৃতি দেহাশ্রিত। ঐ দেহ যখন কাজ করতে পারে না অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হয়, দেহ-সম্বলিত স্মৃতিশক্তিরও মৃত্যু হয় কারণ এই স্মৃতিশক্তির অধিকর্তা মন দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে আর কাজ করতে পারে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে তুমি বলতে চাইছ মনেরও মৃত্যু হয়?'

'না, তা হয় না, তবে পুরনো দেহের অর্থাৎ ছেড়ে আসা দেহের কোন কথাই তার মনে থাকে না।'

'মানে আমরা যেমন বেঁচে থাকা কালে পুরানো পরিধান ছেড়ে দিলে তাকে একেবারে পরিত্যাগ করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'কিন্তু, আমি যখন বেঁচেছিলাম তখন যে শুনতাম যে কোন কোন লোক তার পূর্বজন্মের সমস্ত কথা মনে করতে পারে, তাদের যেন কি বলত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জাতিস্মর। আমার বেশ মনে আছে আমাদের পাড়ায় একটা ছোট্ট মেয়ে থাকত। সে তার পূর্বজন্মের সব কথা বলত, কোথায় ছিল, কে তার স্বামী ছিল, স্বামী কি করত, তার ছেলেপুলে ক'টি ছিল।

'হ্যাঁ, এরকম দু'একটা ঘটনা হয়। তার কারণ একটি বিশেষ মন যখন একটি বিশেষ দেহে থাকে, সেই দেহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে আর দেহের এমন কয়েকটা নাড়ী আছে যেগুলোর অবস্থান নতুন দেহে ঠিক পূর্বের দেহের মত হলে পূর্বজন্মের অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারলে না, না?'

'না।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বেঁচেছিলে তখন রেকর্ডে গান শুনতে! যার গান শুনতে সে তো রেকর্ডে থাকত না, তার স্বরগুলিকে ধরে রেখেছে ঐ রেকর্ড। একটা বিশেষ গান কোন বিশেষ গায়ক কোন বিশেষ দিনে কোন একটা বিশেষ সময়ে গেয়েছিল, কিন্তু যখনই তুমি ঐ রেকর্ড মেশিনে বসিয়ে দিচ্ছ ঐ গান হচ্ছে, ঠিক সেই কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, কিন্তু ঐ মেশিন না থাকলে শত চেষ্টা করলেও একটা শব্দও বেরুবে না ঐ রেকর্ড থেকে। আবার যে কোন মেশিনে রেকর্ডটা বসিয়ে দিলে কোন কাজই হবে না। ঠিক তেমনি, যে বিশেষ দেহে কোন বিশেষ মন কাজ করত, কথা মনে রাখত, সেই বিশেষ দেহের মত সে যদি পরবর্তী কালে কোন দেহ পেয়ে যায় তাহলে তার আগের দেহের অনেক কথাই নতুন দেহের স্মৃতিতন্ত্রীতে বেজে উঠবে। তবে কি জান, পৃথিবীতে বাইরের একটা চেহারার সঙ্গে, সে তুমি মানুষই বল, পশু-পক্ষীই বল, আর প্রাকৃতিক বস্তুই বল, কখনও একটার সঙ্গে আর একটার মিল পাবে না; দেহের ভেতরটাও ঠিক তাই, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রভেদ আছে। বাইরে যেমন দু'একটা হুবহু মিল পেয়ে যাই, ভেতরেও কখনও কখনও মিল হয়ে যায় আর তখনই মন আগের জীবনের অনেক কথা মনে করতে পারে। এবার তো বুঝলে?'

'বুঝলাম, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে জীবের, তা সে মানুষই হক্‌ আর পশুই হক্‌, পুনর্জন্ম হয় না —আর এই যারা পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে, সেই মুষ্টিমেয় ক'জনের পুনর্জন্ম হয়। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে জীবের মৃত্যু হলেই তার শেষ পরিণতি হয়ে যায়। আর এই যে অহরহ পৃথিবীতে জন্ম হচ্ছে, এটা নিছক এ্যাক্সিডেন্ট। এ্যাক্সিডেন্ট এইজন্যে বলছি কারণ জন্ম কিভাবে হয় দেখ। কামের দ্বারা পীড়িত হয়ে একটি পুরুষ একটি স্ত্রীকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার বাসনায় মেতে ওঠে বা একটি স্ত্রী একটি পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিতে চায়—যার আখ্যা আমরা প্রেম দিয়েছি। এই পারস্পরিক গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যের পরিণাম হয় আর একটি জীবের জন্ম। তাহলে বল এর সঙ্গে পুনর্জন্মের কি সম্বন্ধ।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও যে মৃত্যুই জীবের শেষ পরিণতি।'

আর একটি আকৃতি যে আমার আর এক পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে; 'না, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য একটু আলাদা। আমি এ সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তা হল এই। জীবের পার্থিব শরীরের মৃত্যু হলে পঞ্চভূতের শরীর আবার পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। আর এই যে আমাদের মত অশরীরী আত্মা এর বিনাশ হয় না, এবং পরম-আত্মার সঙ্গে এর এক না হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত, পৃথিবীর এবং ঐরকম অন্য জগতে সেই আত্মার স্থূল কোন বস্তুর সঙ্গে একীকরণ হয় যেমন আজ বা আহার্য্য কোন সম্পদ এমনকি কখনও কখনও পঞ্চভূত মানে ক্ষিতি অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌-এর মধ্যেও মিশে যায়। তারপর কোন সজীব দেহ আবার লুক্কায়িত অবস্থায় থাকা আত্মাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে এবং জীব-দেহের ভেতর সেই আত্মার রূপান্তর হয় পুরুষ-শুক্রে অথবা স্ত্রী-ডিম্বে। তারপর এই দু'-এর সঙ্গমে অর্থাৎ দুটি আত্মার সঙ্গমে আবার জন্ম নেয় একটি নতুন জীব বা আত্মা। এইদিক থেকে দেখতে গেলে জীবমাত্রেরই যে পুনর্জন্ম হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই আসা-যাওয়া চলতে থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ না একটি জীবাত্মা পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় পরমাত্মার মধ্যে।

প্রথম আকৃতিটি আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, 'কি, এবার বুঝতে পারলে তো?'

আমি নিঃশব্দে আপন অজ্ঞতার পরিমাপ করতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এই যে পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ আছে। ধর এবারে যে স্ত্রী সে আগামী জন্মেও কি স্ত্রী হয়ে জন্মাবে?'

'দেখ, ওটা নেহাৎ-ই এ্যাক্সিডেন্ট। জীবদ্দশায় পুরুষ ও স্ত্রীর ভেদ আছে। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন আমাদের মত অশরীরীতে রূপান্তরিত হয় জীবদেহের ভেতরে অবস্থিত প্রাণ বা আত্মা, তখন শরীরের কোন

ভেদ থাকে না। কারণ আত্মার তো আর স্থূল শরীর নেই। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্থূল দেহের প্রয়োজন হয়। এককথায় বলতে গেলে অশরীরী 'সেক্সলেস'। দেখছ না আমাদের সব একরকম চেহারা। গলার আওয়াজও একরকম। আমাদের আকৃতির কোন স্থানেই স্ত্রী বা পুরুষ দেহের, যা তুমি পৃথিবীতে দেখছ, এখনও তোমার মৃতদেহের চারপাশে দেখছ, কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। অশরীরীর রূপ একরকম, না আছে স্ত্রী-পুরুষ দেহের ভেদ, না আছে উচ্চতা-দৈর্ঘ্যে ভেদ, না আছে আচার-ব্যবহারে ভেদ, না আছে মানসিক গঠনে ভেদ। তোমার দেহের মধ্যে এখনও একটু পার্থক্য আছে। কিন্তু ওরা আগুন দিলেই ঠিক আমাদের মত হয়ে যাবে।'

কমলনাথেরা ততক্ষণ আমারও মরদেহকে চিতায় শুইয়ে দিয়েছে। কাঠগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে আমার দেহটাকে প্রায় ঢেকে ফেলল। কে একজন বলে উঠল, 'কমল-দা, তুমিই মুখাগ্নি কর। ওর কোন আত্মীয়ই তো এল না।'

কমল কি যেন ভেবে বলে, 'দে, তাই দে, আমার হাতেই প্রকাশের আত্মার সদ্গতি হক।' খানিকটা ঘি আমার সমস্ত দেহে কে যেন ছিটিয়ে দিল। কমল একটা প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে গেল। প্রদীপটা একজন জ্বালিয়ে দিল।

একটি আকৃতি আমার গায়ে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্রকাশ, নাও, এবার তৈরী হও।' অশরীরীর মুখে নিজের নামটা শুনে চমকে উঠলাম। আকৃতিটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি আমার নাম জানলে কি করে। তুমি আমাকে চেনো নাকি?'

'চিনি তো বটেই। আর সেইজন্যেই তোমাকে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে। তোমার কাছে যে ক'জন অশরীরীকে দেখছ, সবাই তোমার খুব আপন জন।'

'এ্যাঁ, বলছ কি! কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না!'

'পারবে, একটু পরেই পারবে। ওরা যেই তোমার মুখে আগুন দেবে, দেখবে, তোমার আকৃতি তখন ঠিক আমাদের মত হয়ে গেছে এবং আমাদের তখন চিনতে পারবে।'

কমলনাথ একটা প্যাকাটি প্রদীপটায় জ্বালিয়ে নিয়ে প্রথমে আমার মুখে আগুন দিয়ে জ্বলন্ত প্যাঁকাটিটাকে চিতার নীচে রেখে দিল। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমার কেমন যেন অসহ্য গরম বোধ হল, তারপরই এত ভাল লাগল যে ওরকম ভাল আগে কোন সময় বোধ করি নি।

কমলনাথ আগুন দিয়ে প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার জ্বলন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে ও যেন কি বলে ওঠে। অন্য সবাই কাঠগুলোকে ঠিক করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমার কাছে ক্রমেই সব যেন কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে যেতে লাগল।

আকৃতিগুলো আমার কাছে এসে বলে, 'দেখ, এবার নিজের দিকে তাকাও, বদলিয়ে গেছ না, আর আমাদের ভাল করে দেখ তো, চিনতে পার কি না?'

ওদের দিকে তাকাতেই আমার খুব চেনা চেনা লাগল, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছিলাম না। আমরা সাতজন অশরীরী ততক্ষণ অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আমার দেহের কথা, কমলদের কথা তখন আর খুব একটা মনে পড়ছে না। আকৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে কেবলই ভাবতে লাগলাম, এরা কারা, এত চেনা! একটি আকৃতি কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। ভাবলাম, সে বলবে সে কে! হঠাৎ একটা খুব চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমার কানের কাছে।...চোখ খুলে দেখি আমি হাসপাতালে আমার 'বেডে' শুয়ে আর কমলনাথ আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। কমল বলে, 'প্রকাশ, আজ কেমন আছ?'

আমি চম্‌কে উঠলাম। 'ভাল আছি!' বলে ভাবতে লাগলাম, এতক্ষণ যা দেখলাম তার সবটাই তাহলে স্বপ্ন!

কান্ত কথা

শান্তিলতা রায়

একদিন বৌদিদিকে ও আমাদের ডেকে বললেন, এস, তোমরা আমার পাশে এসে ব'স ; আমি তো আর বেশীদিন নেই। তোমরা ভালো হয়ে থেকো। আর আমি যখন যাত্রা করব, তোমরা তখন হরিবোল ব'লো। কেঁদ না ; তোমাদের চোখের জল দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। তোমাদের নিয়ে বড় সুখে ছিলাম। মাকে একদিন বললেন, আমরা রাজসাহী অনেক দিন যাইনি, না ? বল তো প্রায় এক বছর হয়ে গেল। আমাদের কত সুখের স্থান ছিল রাজসাহী। মাকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা আনন্দনিকেতন গড়ে তুলেছিলাম। কত রাত জেগেছি। রাত্রেই আমার কাব্য সঙ্গীত ভগবৎ-সাধনা আমার মনে এসে যেত। আর যেখানে যা কাগজ কলম পেয়েছি অনন্যমনা হয়ে লিখে গেছি। সে যে আমার ভগবৎচরণে প্রণাম। তুমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠতে বলতে আর কত রাত জাগবে, শরীর খারাপ হবে যে। এখন একটুখানি শোও। মনে পড়ে সব কথা ? তুমি বোধ হয় আর সে-সব ভাববার সময় পাও না, না ভাবনাটা এড়িয়ে যাও। আমি সময় সময় ভাবি, রাজসাহী ছেড়ে এসে যেন গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর সেদিন পাব না। আর রাজসাহী যাবনা। সেবার পাবনা কন্‌ফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিলেন সে সময়ের কথা তোমার মনে আছে ? সমস্ত কাজ ফেলে আমিও পাবনা গিয়েছিলাম। তুমি বারে বারে আমাকে অনুরোধ করেছিলে যেন বেশী গান আমি না গাই। সভার সকলের অনুরোধ 'আমরা উত্তর বঙ্গের বুলবুলের স্বদেশী গান, বাণী কল্যাণীর গান শুনব।' এই রকম সকলের অনুরোধে প'ড়ে সে ক'দিন আমাকে প্রচুর গান গাইতে হয়েছিল। এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আমাকে বার বার গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তোমার কথা রাখতে পারিনি অসুস্থ হয়ে এসেছিলাম। তোমার সেই মিনতি এখন আমাকে অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। কত কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। আমার দশা দেখে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার চরণে আমার আর বাণী কল্যাণী নূতন করে লিখে দেওয়া হল না। দয়াল আমাকে বড্ড তাড়াতাড়ি নিতে চাইছে। মা বাবার বিছানার পাশে লুটিয়ে পড়লেন। বাবা হাত ধরে টেনে নিয়ে উঠিয়ে বসালেন। মায়ের এই দুঃখ ব্যথা বাবাকে অহরহ ব্যথিত করে রাখত। নিজের ব্যথাও মার ব্যথার কত সময়ে ভুলে যেতেন। মা শান্ত সমাহিত নিঃশব্দ চরণে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুজনেই দুজনার ব্যথার ব্যথী। রাত্রে ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠে বসে বাবা লিখলেন—

'সঁপি সব আশা দুঃখ পিয়াসা
দেব পরম চরণে রে।
আজি সেই ভাবে মিলেছিনু সবে
বিধি যেন এমনি মিলায় রে।'

সকালের দিকে রাত্রের মত অত যন্ত্রণা থাকত না। সামান্য একটু কমে যেত। হয় তো যত সুধীজনেরা আসতেন, বসতেন, গল্পগুজব হাস্যপরিহাসও হ'ত। তখন মনে হত এইবার বাবা ভালো হয়ে উঠবেন। কখনো সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কখনো আমাদের পিসতুতো ভাই বাবার বন্ধু নলিনী রায়, কোনদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আবার কোনদিন দীনেশচন্দ্র সেনও এসে বাবার সঙ্গে গল্পগুজব আলোচনা করতেন আবার বাবার লেখা নতুন গান শুনতেন কবিতা শুনতেন। রাজসাহীতে

বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন অভয়কুমার মুন্সী (ইনি এখনকার বিখ্যাত চিকিৎসক নীহারকুমার মুন্সীর জেঠামশায় ছিলেন), তিনি আসতেন বাবার কাছে। এঁদের নিয়ে বাবার খুব খুশীতেই দিন কাটত। লিখে লিখে কত বিষয়ের আলোচনা করতেন। খাতা কলমে অনবরত লেখা চলছে আর তাঁদের গল্প চলছে সকাল থেকে সন্ধ্যা বা রাত্রি পর্যন্ত। গান লিখছেন, দেবেন চক্রবর্তী বা সুধীর বসুকে দিয়ে সুর তুলে তাঁদের দিয়ে গাইয়ে নিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন। এই ভাবেই সারা-দিন অন্যমনস্ক থাকতেন। রাত্রি এলে কষ্ট বাড়ত। ডাকতেন লিখেই,—হেমেন্দ্র ভাই রে আর তোর বৌ ঠাকরুণ কোথায়, ডাক রে ভাই তাকে। মা তো কাছেই থাকতেন, এসে বসলেই বাবা তাঁর হাত ধরে থাকতেন। মা তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। দাদারাও বাবার পাশে এসে বসে থাকতেন। আমরাও এসে বসে থাকতাম, করবার কিছুই ছিল না। সেই গভীর রাত্রে এই গানটি লিখলেন—

"যেখানে দয়াল আমার বসে আছে সিংহাসনে
সেখানে তো হয়না যাওয়া পাপ-কণিকা লয়ে মনে।

আছে ভালো মন্দ ছেলে,
কারুকে যে দেয় না ফেলে,
শুধু প্রেমের আগুন জেলে
পুড়িয়ে নেয় সে আপন জনে।

আগুন জেলে মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা মাটি করে খাঁটি,
স্থান দেয় অভয় শ্রীচরণে।
সেই আনন্দমন্দির মাঝে
আনন্দসঙ্গীত বাজে,
নাহি ব্যথা অশ্রু বিষাদ
সেই সদানন্দ নিকেতনে।

দেখ কেমন তার ভালবাসা
মিটান আনন্দপিপাসা,
আগুনে না পোড়ালে খাদ
সে আনন্দ পাবে কেমনে।

(শেষ দান
সুর—মিশ্র ঝিঁঝিট জলদ একতালা।)

হাসপাতাল
৩০শে জ্যৈষ্ঠ। '১৭

এই গানে সুরটি নিজেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এই গানটি আমরা শিখে নিতে পারি নি। এর দু'এক দিন পর আমাদের মামাতো ভাই ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এলেন বাবাকে দেখতে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা, ডাক্তার বার্ড সাহেব, ওকনেলি সাহেব, ডাঃ সুরাওয়ার্দি এঁদের কল দিয়ে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি অপারেশন করা—এসবই যতীন দাদার ব্যবস্থায় হয়েছিল—তখন তিনি মেডি-ক্যাল কলেজে পড়তেন। যতীন দাদাকে দেখেই আমরা সকলেই খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। মা বল্লেন, যতীন কেমন পরীক্ষা দিচ্ছ? কেমন আছ? কত দিন পরে এলে। যতীন দাদা বল্লেন, পরীক্ষার জন্য আমি আসতে পারছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমি সব সময়ই পিসামশায়ের খবর রাখতাম। যাই, এখন পিসামশাইকে দেখে আসি। বাবা বসে ছিলেন, যতীন দাদাকে দেখে লিখলেন, যতীন এস—তুমিই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছ। সেই সার্পেনটাইন লেনে সুরেশের বাড়ীতেই তো আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। ওরে বাপ রে, কি নিঃশ্বাসে কষ্ট কতদিন ধরে চলছিল, তোমার হাত দিয়েই ভগবান্ আরও ক'টা দিন আয়ু বাড়িয়ে দিল। বড় কষ্ট পেয়েছি রে যতীন। এই অপারেশনের পরেই শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিলাম, যতীন আমাকে বাঁচিয়ে দিলে; এইটুকু বলতেই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সেই আমার শেষ কথা—আমি কিছুই ভুলিনি রে। তোমার হাত দিয়েই বাঁচিয়ে দিল, তোমার হাত দিয়েই আমার কথা নিয়ে গেল। যতীন দাদা বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানারকম কথাবার্তা বলে মার সঙ্গে দেখা করে বাবার শরীরের অবস্থা দেখে চলে গেলেন। এর মধ্যে, এস কে লাহিড়ী এমনি তো রোজই আসতেন,—

একদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা ও স্ত্রী এসেছিলেন। তাঁর এক কন্যার নাম প্রিয়তমা, আর একজনের নাম মনোরমা। বাবার সঙ্গে আমার ঠাকুরমার সঙ্গে এঁদের খুব আলাপ-আলোচনা হ'ত। বাবা সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বসে বসে লিখলেন—

'আখ দেখি মন নয়ন মুদে ভালো করে
ঐ আলো করে বসে কে আছে রে তোর—
ভাঙা ঘরে ?'
(শেষ দান।)

কষ্ট চলেছে। দিন চলেছে। বাবার কষ্ট বাড়ছে কখনো কম থাকে। ডাক্তাররা আসেন, বসেন, কথাবার্ত্তা বলেন চলে যান। মায়ের বিষণ্ণ মুখ। সবই আছে শুধু মনে হয় রুগীর ঘর নিরানন্দ নির্জন সন্ত্রস্ত। সকলের শঙ্কাকুল চিত্ত। কিন্তু মনে হয় না রোগী নিজে ভীত সন্ত্রস্ত পরমুখাপেক্ষী। রোগী সদানন্দ মনে লিখে চলেছেন—কখনো সঙ্গীত, কখনো কবিতা, কখনো হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গকবিতা। শরীরের যন্ত্রণা তুচ্ছ। শরীর যেন তাঁর নয়, আর কারও। খাওয়া কমে যাচ্ছে —এখন জলীয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু খেতে পারছেন না। তবু যেন দেহ অন্তর সুধারসে পরিপূর্ণ। সংসারে স্নেহ-মমতা, দয়া, পার্থিব যার যা পাওনা দিয়ে যাচ্ছেন। আবার অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে—

ওগো মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা-চিদানন্দময়,
সদানন্দে থাকেন যেথা
সেথা সদানন্দালয়।
আনন্দ সমীর লুটি আনন্দ সুগন্ধরাশি
বহে মন্দ, কি আনন্দ, পায় আনন্দ পুরবাসী।
* * * * * *
ধরণীর ধুলো মাটি পাপ তাপ রোগ শোক
সেথানে জানে না কেহ সে যে স্থিরানন্দ লোক।
লইতে আনন্দ কোলে, মা ডাকে আয় বাছা বলে,
তাই আনন্দে চলেছি ভাই রে কিসের মরণ ভয়।
(শেষ দান।)

হাসপাতাল রাত্রি
আষাঢ়—১৩১৭ সাল।

এমনি করেই কষ্টের মধ্যে আনন্দ আহরণ করে চলেছেন। রাত্রির লেখায় সকালে গানের সুর দিয়ে চলেছেন। কখনো সুধীর বসু, কখনো দেবেন চক্রবর্ত্তী, কখনো বড়দাদা কি মেজদাদা সে গান শিখে নিচ্ছেন। সেই ফাঁকে আমরাও শিখে নিচ্ছি। বাক্যহারা কিন্তু কোন অসুবিধা প্রকাশ করা বা ক্রুদ্ধ হওয়া বাবার কিছুই নাই। হাতের ভঙ্গীই যেন সুর। মনের সঙ্গে হাতের সামঞ্জস্য হারমোনিয়ামের রীডের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কে রোগী, কে সারারাত্র রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে? শরীরের কষ্টে কোথাও আবিলতা ছিল না।

মা একদিন বাবার ঘরের সামনেই বসে ছিলেন। এর মধ্যে বাবা এসে বসলেন। কতক্ষণ চুপ করে দেখলেন। আমরাও ছোট ভাইটিকে নিয়ে মার কাছেই বসে ছিলাম। মা বললেন, বৌমা, তুমি তোমার এই ননদ তিনটিকে পড়াশুনা একটু নিয়ম মত করিও। না হলে এরা যা শিখেছে সব ভুলে যাবে। আর তুমিও পড়াশুনার চর্চ্চা ছেড়ে দিও না।

বাবা লিখলেন মাকে উদ্দেশ করে, আমার এই স্নেহের ধনগুলিকে নিয়ে আর আমার রাজসাহী যাওয়া হ'ল না। আমাকে লিখলেন, বাড়ীর সেই পেয়ারা গাছ তলাতে তোদের দোলনা, সেই বাগানের টগর ফুল গাছের নীচে বোঁঞ্চ পাতা, কতো রজনীগন্ধা উঠোন ভরা, সবাই যেন আমাকে টানে। তোরা আমাকে যেন ভুলে যাসনে। আমাকে মনে করে সেই সব জায়গায় গিয়ে বসিস্, একটা গাছও তুলিসনে। যেমন আছে তেমনি যেন থাকে। করবী গাছের নীচে তোদের পড়াশুনার জায়গা, ওখানেই তোরা পড়শুনা করিস। মাকে বললেন, ছেলেদের ঘর যার যেমন আছে তেমনিই রেখো। তোমাকে আমি সবই দিয়ে গেলাম সবই বলে গেলাম। ছেলেরা বড় হয়েছে, তুমি বান্ধবহীন হবে না। তুমি রাজসাহীতেই থেকো। কোথাও যেও না। বাড়ীর প্রতি ধূলিকণায় সঙ্গেই আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। সে যে আমার বড় প্রিয় স্থান, সেখানেই তুমি আমাকে পাবে। আমাদের পড়াশুনার কথা সব

ভুলে গেলাম। আমাদের পাঁচজনের চোখের জলে বাবার গায়ের জামা ভিজে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। বৌদির হাত ধরে বাবারও চোখের জল পড়তে লাগল। বাবা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল।

বাবার কাছে আবার কত লোক আসতে লাগলেন। আবার সেই জমজমাট বৈঠকখানা। কবি কালিদাস রায় বাবাকে দেখতে এলেন, তখনও তিনি কবিশেখর হন নাই। বাবার কাছে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। তখন বোধ হয় তাঁর কবিতা-গ্রন্থ পুস্তকাকারে বার হয় নাই। বহুদিন পরে তাঁর রচিত পর্ণপুট, ব্রজবেণু বই দুখানা আমরা পড়েছিলাম। এ রকম মিষ্টি কবিতা আমরা কমই পড়েছি। বাবার সঙ্গে দেখা করে তিনি চলে গেলেন। তিনি আজও বেঁচে আছেন, বাঙালীর সৌভাগ্য।

আবার ক'দিন পরে বাবা দুপুর বেলা এসে আমাদের কাছে বসলেন। বৌদি দৌড়ে গিয়ে বাবার খাতা পেন্সিল নিয়ে এলেন, বাবা লিখলেন, শোনো বৌমা, তোমার শাশুড়ী কি রকম ভীরু ছিলেন তার একটা গল্প বলি। তুমি তো কিছুই জানো না মা; যখন দু-একটা মনে পড়ে তোমাদের শুনিয়ে যাই। মা তো নববধূর সামনে লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন, কি জানি কি কথা বৌ মেয়েদের সামনে বলে বসেন। বাবা হাসিমুখে বললেন, তোমরা জান তো, প্রত্যেক বছর রাজসাহীতে বহুরূপী আসত। নানারকম পোশাক পরে নানা সাজে সেজে একদল লোক সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পয়সা আদায় করত। এমন মজা যে কোন লোকই তাদের প্রকৃত রূপ ধরতে পারত না, যদি না তারা নিজে ধরা দিত। এই রকম একদিন একটা লোক সমস্ত গায়ে রক্ত মাখা, কাঁধে ছোরা বসানো—হঠাৎ আমাদের বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একেবারে মার সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কাঁদছে আর বলছে, এই যে মা ঠাকরুণ, এই দেখেন, আপনাদের ভাদুড়ি আমার কি অবস্থা করেছে। ভাদুড়িকে তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। আমি যে এখন মরি, আপনার সামনেই মরি। সে তো উঠানের মধ্যে বসে পড়ে মহা কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল। মা তো ভয়ে ওরে বাবা রে, কি সর্বনাশ, বলে দৌড়ে গিয়ে বাবা যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে গিয়ে বললেন দেখে যাও, ভাদুড়ি একটা লোককে ছোরা মেরেছে, তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। রক্তারক্তি হয়ে এসে মহা গোলমাল করছে। বাবা তো ছুটে বেরিয়ে এলেন, এসে দেখেন কেউ নাই। মা তো কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভয়ে কাঠ। এ আবার কি ব্যাপার? বাবা ভাদুড়ি-দাদাকে ডাকলেন, বললেন, তোমরা যাকে তাকে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দাও কেন? মাকে বললেন, বুঝলে না? এরা বহুরূপী, ভয় পেও না। সেই দিন সন্ধ্যে বেলা বৈঠকখানা ঘরে লোকজন সব বসে আছে, হঠাৎ সাধারণ ভাবে সেই বহুরূপী এসে হাজির। বাবাকে বললে, বাবু, আমার বখশিস? বাবা বললেন, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে এই ভাবে বৌ মেয়েদের ভয় দেখাও, আবার বখশিস চাইতে এসেছ? আমাকে যদি ঠকাতে পার তবে দশ টাকা বখশিস দেব তোমাকে। লোকটা তো যে আজ্ঞা বলে চলে গেল। এর কয়েকদিন পরে সকাল বেলা বাবার বৈঠকখানা ঘরে কত লোক জন মক্কেল মুহুরি সব বসে, এর মধ্যে বাবাও কেবল এসে ঢুকলেন। হঠাৎ দেখা গেল, মাথায় পাগড়ি, আচকান চোস্ত পরা, নাগরা জুতা পায়ে দুজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। সবাই ত্রস্ত হয়ে উঠল কেউ কেউ উঠে বলল, বসুন। তারা বসল না বললে, আমরা আতরের ব্যবসা করি। প্রত্যেক বছর আমরা বাবুর কাছে আতর বিক্রি করে যাই। এবার খুব ভাল আতর এনেছি, বাবুকে দেব বলে। বাবা খুব আতর ভালবাসতেন। আতরওয়ালা তাদের কাঠের বাক্স খুলে নানা রকম আতর একটু একটু করে শোঁকাচ্ছে আর একটু আতর তুলো শুদ্ধ কানের মধ্যে রাখার জন্য দিচ্ছে। বাবার দুটো একটা শিশি থেকে নেওয়া আতরের মধ্যে একটা খুব পছন্দ হল। বললেন, এইটাই দাও ঠিক দাম বল। আতরওয়ালা বলল, বাবু, আপনার সঙ্গে দরাদরি কি। তবে একটা কথা আপনি

যে বলেছিলেন দশ টাকা বখশিস দিবেন তা এখন দেন। আপনাকে আমরা ঠকিয়েছি বাবু। আমরা আতরওয়ালা নই। আমরা বহুরূপী। দুজনেই সেলাম ঠুকে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরশুদ্ধ হাসির রোল পড়ে গেল। বাবা বোকা হয়ে দশটি টাকা তাদের দিয়ে দিলেন। তারা আবার সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। বাবা বললেন, ভারি জব্দ করে গেল দেখছি। জানো বৌমা এখন আর এরকম নির্দোষ হাস্য পরিহাস চলে না। একদিন এলেন আমাদের নলিনী দাদা বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাবা বললেন, নলিনী, যতই যাবার দিন এগিয়ে আসছে ততই বেশি করে পুরোনো কথা মনে পড়ছে। সাহিত্য পরিষদের কথা বড্ড মনে পড়ে। সেখানে কত জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হ'ত। সেখানেই আমার সঙ্গে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের আলাপ হয়। সে বোধ হয় তখন সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিয়ান। সাহিত্য সম্বন্ধে তার জ্ঞানও প্রচুর ছিল। তাকে আমার বড় ভাল লাগত সে এখন এখানেও আমার কাছে প্রায়ই আসে। দেখো নলিনী, সবাই বলছেন আমার জীবনী আমাকে লিখতে। কিন্তু মনে হচ্ছে আমার জীবনকথা লিখবার আমার আর সময় হবে না। শরীর বড় কাহিল হয়ে পড়েছে, কেমন যেন কলুষ হয়ে উঠছি। সে যেন আমাকে তাড়াতাড়ি তার কাছে নেবার জন্য বেশ তোড়জোড় লাগিয়েছে। তাই ভাবছি নলিনীরঞ্জনকেই আমার জীবনকথা লিখবার ভার দিয়ে যাব। সে-ই উপযুক্ত সে আমাকে ভাল ভাবেই জানে। বাবার সঙ্গে তো তাঁর প্রায়ই নানা কথাবার্তা হ'ত। কত রকম গল্পসল্প করতেন। তাঁর মেয়ে পরিমলের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। এখন কে কোথায় ছিটকে পড়েছে।

এই রকম ভাবে বাবাকে নিয়ে আমাদের দিন চলেছে। তার মধ্যেই শেষ দান বই-এর জন্য গান, কবিতা লেখা, সুর দেওয়া চলছে। বিশ্রামের জন্য লেখা চলছে। তবে সদ্ভাব কুসুমের লেখাগুলি, কটকে যখন বাবা চেঞ্জে গিয়েছিলেন, সঙ্গে তো আমরাও ছিলাম, সেই সময় বাবার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত, জ্বর এলেই বাবা মাকে কি দাদাদের বলতেন খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতে। বাবা জ্বরের ঘোরে বলে যেতেন, মা কি দাদারা লিখে নিতেন। সেই কবিতাগুলি যে কোথায় আছে বাবারও তা খেয়াল ছিল না। বাবার মৃত্যুর অনেক পরে সে কবিতাগুলি খোঁজখবর করে সংগ্রহ করে সদ্ভাব কুসুম নামে শিশুদের স্কুলের পাঠ্য বই রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্য বিকাশ কোথা দিয়ে কি করে প্রকাশ হয়েছিল এবং সে কাব্যপ্রতিভার কি সৌন্দর্য্য সে সম্বন্ধে তাঁর চেতনা খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর ভগবৎসাধনাই তাঁর সমস্ত সত্তাকে আবরণ করে রেখেছিল।

লিখলেন—দেখ সুরেন, তাঁর এ কি বিকাশ। প্রেমের এ কি মূর্ত্তি। সখা প্রাণবন্ধু প্রাণের বেদনা কি বোঝ? এই যে তোমার নামে আমার দুঃখিনী মা পড়ে আছে? ৮০ বছর বয়স হল, এই কি তোমার বিচার? তুমিই বল, তুমিই ভরসা, তুমিই দয়াময়, আমি যে সব দেখেছি। আমাকে যে ক্ষমা করে নেবে সেও তুমি। দয়াল হে, কোথায় তুমি, এস এস হরি, দেখে যাও দীনবন্ধু। 'আমি কি জগৎ ছাড়া হে, এই গভীর আঁধারে অকূল পাথারে একবার দেহ সাড়া হে। সাড়া কেন দেবে না? কাতরে যদি ডাকি তবে কেন সাড়া দেবে না?' —অতুয়া। আবার লিখলেন—

> 'তব আশীষ কুসুম ধরি নাই শিরে,
> পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
> তবু দয়া করে সকলি দিয়েছ প্রতিদান কিছু পাওনি
> অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে
> মোরে দাওনি।'

> 'যখন যে রূপে প্রাণ ভয়ে যায়—
> তাই দেখি প্রাণ ভরি হে। —বাণী

তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে দুঃখ দিয়ে ব্যথা দিয়ে অন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন। অমৃতের আস্বাদন করাচ্ছেন। তাই শান্ত সমাহিত চিত্তে ব্যথা দুঃখ জীবন দেবতার পদতলে অঞ্জলি দিচ্ছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কনকায়েন। এখন বললে

কি সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে? তবু কিছু বলি—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যখন নবনির্মিত গৃহে গৃহপ্রবেশ করে তখন খবরের কাগজ দ্বারা সর্বত্র জানানো হয়েছিল, বিশিষ্ট সুধীজনদের পত্র দ্বারাও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। খুব উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে অনেক জায়গা থেকে অনেকেই এসেছিলেন। রাজসাহী থেকে বাবাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বাবার বন্ধু ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রও এসেছিলেন।

তখন তিনি সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ীতে উঠেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা রামায়ণী কথা, বেহুলা তখন স্কুলের পাঠ্য হয়েছিল। সাহিত্য পরিষদের উৎসবের আগের দিন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দীনেশ সেনের বাড়ীতে গিয়েছিলেন—দীনেশ সেন বললেন নলিনী পণ্ডিতকে, ইনিই রাজসাহীর কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেন। বাবা বললেন রাজসাহীর সকলের নয়। একজনের বটে। সেই উৎসবে বড় সভার আয়োজন হয়েছিল। সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। তাতে এত জনসমাগম হয়েছিল যে ভিড়ের চাপে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সভায় যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নীচেই রয়ে গেলেন আবার এই নীচেই রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আর একটা সভা হল। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর পরিচয় করে দেন। এবং বাবাকে একটি গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বাবার রচিত গানই গাইতে বলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে—বাবা প্রথমেই গাইলেন—'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে' (বাণী)। আবার রবীন্দ্রনাথ আরও গান গাইতে বললেন, বাবা গাইলেন—সৃষ্টির বিশালতা—'লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ নীল গগন গর্ভে' অভয়া বইএর মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সৃষ্টির বিশালতা গাইলেন, কি সুন্দর হয়েছে। সৃষ্টির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে এবার একটি গান করুন। বাবা গাইলেন, 'স্তূপীকৃত গগন রচিত ধূলি সিন্ধুকূলে, কোটি কীট করিছে বাস এক সূক্ষ্ম ধূলা (অভয়া)। এই গান দুটি শুনে সভার সুধীজন চমৎকৃত হয়েছিলেন—এই গান দুইটি কোন্ বইতে প্রকাশিত হয়েছে জানবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আবার সকলের ফরমাস এলো আর একটা গান। বাবা গাইলেন—'সেথা আমি কি গাহিব গান, (বাণী) এই রকম করে যখন যে কথা মনে আসত তখনই সে কথা লিখে জানাতেন। এই ধরনের পুরণো কথা যখন বলতেন, মনে হ'ত যেন সেই জগতে চলে গেছেন। যেন নেচে গেয়ে পদ্মার স্রোতের মতন আনন্দ স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন। সেই প্রমত্তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্তর কোথায় ডুবে গেছে। তাকে আর জাগাতে চাইছেন না। পুরনো কথায় এমনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। আবার একদিন আমাদের ডাকলেন, আয় রে, তোরা আমার কাছে আয়। আমরা তো প্রায় সব সময়ই কাছে থাকতাম। বাবার ডাকে আমরা, বৌদি, দাদারা এসে বাবার কাছে বসলাম। বাবা অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বললেন—বেশীর ভাগই রাজসাহীর কথা। সেই ভয়ঙ্করী পদ্মা নদী বর্ষায় যার গর্জ্জন সমস্ত রাজসাহীময় শোনা যেত। তার ঢেউগুলি পাড়ে এসে ভেঙে পড়ত আর ছলাৎ ছলাৎ জলের আওয়াজ হত। আমাকে যেন বলত—আয়, ঢেউ দেখে স্রোত দেখে গর্জন শুনে ভয় পাসনে। আয়, আমার গভীরে ডুবে যা, শীতল হবি। আমি যেন এখনও পদ্মার আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। জ্যোৎস্নায় পদ্মার উচ্ছলিত অপরূপ রূপ, অন্ধকারে তার কালো নিথর স্নিগ্ধ রূপ আমাকে টানছে রে। সেই বলছে, ও রে গভীরে, ডুবে যা, আমি কোল পেতে বসে আছি। আমায় কোলে নেবে, আমার পিপাসা মেটাবে। তাই তোদের বলছি রে, শোন্। ঐ যেন ডাকছে। তোরা সেই রাজসাহীতেই ফিরে যাস। সেখানেই আমাকে পাবি। এই রকম বাহিরে ভেতরে কথা বলে চলতেন। আর ভগবৎ প্রেম সঙ্গীত, কত কবিতা কত ছোট ছোট রচনা চলছে। কোথায় সব হারিয়ে গেল? তখন কেউ গুছিয়ে রাখেনি। সেগুলি পাওয়া গেলে আরও কিছু আমরা পেতে পারতাম। বাবার জীবনের চেয়ে আমরা আর কিছুই তখন বড় করে দেখিনি। ঝরা পাতার মতন আমাদের সব হারিয়ে গেছে।

বাবা আবার একদিন আমাদের কাছে এসে বসলেন। সন্ধ্যাবেলায় এস কে লাহিড়ী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সুধীজন কটেজে প্রায় রোজই আসতেন আর গানের মজলিশ বসে যেত। সেইজন্য দুপুর বেলাটাই অপেক্ষাকৃত নির্জন থাকত। বাবার তো ঘুম হ'ত না, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ কারোই ঘুম হ'ত না। বাবা হেমেন্দ্র বক্সীকেও ডাকলেন। লিখে বললেন, দেখ সেবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন রাজসাহীতেই হয়েছিল। তোদের বলে যাই, আমার লেখা থেকেই জানতে পারবি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কথা। যদি আমার জীবনী নলিনী পণ্ডিত লেখে তবে এ কথাটাও তাঁর এবং তোদের জানা হয়ে থাক।

সেবার রাজসাহীতে সাহিত্য সম্মেলন হল। সবর-নয় খুব উৎসাহ উদ্দীপনা। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এসেছেন। আরও অনেক সুধীজন এসেছেন। রাজ-সাহীর পাবলিক লাইব্রেরিতে সভা হবে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় এসেছেন। লালগোলার মহারাজা এসেছেন। অক্ষয় কুমার মৈত্র তো আছেনই। অক্ষয় সরকার মহাশয় আছেন। সে এক বিরাট সম্মে-লন। তাতে আবার উদ্বোধন সঙ্গীত রচনার ভার আমার ওপর পড়ল। গাইতেও হবে আমাকে। কি করি, ঐ গানটা লিখলাম—'স্বস্তি স্বাগত সুধী অভ্যাগত জ্ঞানপরব্রত পুণ্যাবিলোকন। বিদ্যাদেবীপদযুগ সেবক লোকানরঞ্জন মোহাবমোচন। গানটির সুর ও দিলাম। গানটি অভয়া বইতে স্থান পেয়েছে। সম্মে-লনের উদ্বোধনেও এগান আমাকেই গাইতে হয়েছিল।

আমি তো মহানন্দে এঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ওঁর কাছে মিটিংএর কোন কথা নিয়ে যাচ্ছি, খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সভা আরম্ভ হতে দু'তিন ঘণ্টা আর বাকী আছে। এর মধ্যে অক্ষয় মৈত্রের বাড়ী গেছি। সেখানে জলধর সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জলধর সেন আমাকে দেখেই বললেন, রজনী ভায়া, একটা নূতন গান রচনা করে নিয়ে যাও না। এখন তো হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। এরমধ্যে একটা গান লিখে নিয়ে চল, আমাদের খুবই ভালো লাগবে। কত বিদ্বজ্জন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আর একটা সুন্দরের সমন্বয় হবে। আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম এইটুকু সময়ের মধ্যে গান লিখে সুর দিয়ে কি গেয়ে উঠতে পারব? অক্ষয় দা বললেন, হ্যাঁ রজনী, তুমি নিশ্চয় পারবে। ব'স তো দেখি ভাই এ চেয়ারটায়, আর এতো টেবিল, ঐ দেখ কাগজ-কলম। বসে যাও। আমি তো বসলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য গানটি যেন নিজে নিজেই আমার কলমে এসে ধরা দিল। এই সেই গানটি—"তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা। (বাণী) সুর ও বসেই দিয়ে ঠিক করলাম। দেখ আমার মাথা কি রকম পরিষ্কার ছিল। অধিবেশনের সব শেষে এই গানটি গাইলাম—তখন আমাকে দেখবার জন্য সমস্ত সভা উদ্বেল হয়ে উঠল। মুগ্ধ হয়ে সবাই শুনল। সামান্য জিনিষ দিয়ে কত ভালবাসা পেলাম। আরও কত পাচ্ছি। এ কে দিচ্ছে বল তো? সকলের মধ্য দিয়ে এ ভালবাসা সে-ই দিচ্ছে। তা-ই আমি পেয়ে যাচ্ছি। সেই কনফারেন্স তিন দিন ব্যাপী হয়েছিল। বাবা এই রকম বলে যেতেন যখন মনে আসত।

একদিন বললেন—'দেখ দেবেন, ভাগ্যিস তুই আমার কাছে ছিলি, না থাকলে আমার গানের কি হ'ত? আমার গান কি আমার ছেলেমেয়েরা তোর মতন করে শিখে নিতে পারত? না তা পারতো, না। তাদের যে আমাকে দেখলেই চোখে জল আসে আমি কি তা দেখতে পাইনে ভাবিস? আমি বেশ বুঝি রে। তুই-ই আমার সুর গলায় নিয়ে গানটাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিস। তোর গাইবার ক্ষমতাও খুব আর তোর গলাও ভারি মিষ্টি। তুই-ই আমার অর্দ্ধেক কষ্ট ভুলিয়ে রাখিস। আমি আর যে ক'টা দিন আছি তুই আমাকে ছেড়ে যাসনে। কটা তো চাকুরি করে, সে কি করে আর আমার কাছে এসে থাকবে। তার গানও ভারি সুন্দর। আমার গলার সুর আমার ছেলেমেয়ে আর তোর গলায় দিয়ে গেলাম। মনে রাখিস এ সেই দয়ালের দান। এর অমর্য্যাদা করিসনে।

একদিন কবি সুধাকৃষ্ণ বাগচি এলেন বাবাকে দেখতে। তাঁর সঙ্গে বাবা অনেকক্ষণ লিখে কথা বললেন। আর একদিন দেখলাম 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় চন্দ্র সরকার বাবার কাছে এলেন। তাঁর ছিল মাসিক পত্রিকা 'সুপ্রভাত'। আমরা সুপ্রভাত পেলেই বুঝি বা না বুঝি বেশ করে পড়ে নিতাম। বইটির প্রথম পাতাতেই বড় বড় করে লেখা থাকত—'লগতু লগতু কণ্ঠে মম, মন্দার মালা'। অক্ষয় সরকার প্রায়ই এসে বাবার কাছে বসে থাকতেন। একদিন কি কথায় অক্ষয় সরকারকে বাবা লিখলেন, কি বললেন? বাঙালি? বেঁচে মরে রয়েছি যে, না হলে বাঙালির কি চোখ ফোটিয়ে দিতাম। বাঙালির চোটি কি জানেন না? অক্ষয় সরকার আরও কিছুক্ষণ বকা-বক করে চলে গেলেন। বাবা ডাকলেন, হেমেন্দ্র ভাই রে, দেখ কি বলেন অক্ষয় সরকার। বাঙালি নাকি সব বিষয়ে পিছিয়ে আছে? কথাটা মোটেই সত্য নয়—তাই না? কে পিছিয়ে আছে,—শিক্ষা-দীক্ষায় স্বদেশ প্রেমে বাঙালীই এগিয়ে চলেছে। ভগবান্ যদি দিন দিতেন, বাঙালি কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।

আর একদিন বললেন, সুরেন, স্বদেশীর সেই প্রথম যুগের কথা মনে আছে? সে যে কি উৎসাহ উদ্দীপনা! লোকে যেন উচ্ছকিত হয়ে উঠল। লর্ড কার্জন এসে সমস্ত ভারতবর্ষকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলল। ভালই করেছিল আমরা যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আত্মবিস্মৃত হয়ে পশুর জীবন যাপন করছিলাম। সুপ্ত ভারত গর্জন করে উঠল। প্রথম গর্জন হলো, আর বিলাত চাইনে, আর বিদেশী চাইনে. (রজনীকান্তের অপ্রকাশিত গান)। বিলাত জিনিষ ব্যবহার করব না। তখনই লিখেছিলাম, 'আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোটো, তবু আছি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠো।' এই গানটার শেষ লাইন ছিল 'শুন বিদেশী আমরা বুঝেছি সব, খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো'।

এই লাইনটার জন্যই সরকার থেকে গানটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। তখন স্বদেশ প্রেমের জোয়ার এসেছিল—তাতে সকলেরই চোখ ফুটল, অন্তর সজাগ হ'ল। এমন কেউ ছিল না যে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলের অন্তরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—আর নয়, আর বিদেশী জিনিষ কিনব না। ঘরের জিনিষ বাইরে পাঠাব না। ঘরে যা জুটবে তাই খাব। ঘরে ঘরে চরখা কেটে সুতো তৈরী করব সেই সুতোয় কাপড় বুনব, সে যেমনই হোক। ঠিক সেই সময় বোম্বাইতে কাপড়ের মিল বসল, তাতে মোটা সুতোর কাপড় তৈরী হতে লাগল। আর দেশের সব লোক সেই কাপড় পরতে লাগল। সবই মোটা খসখসে। দেখ—সুরেন সে কাপড় তো মোটা বলে আর বিক্রি হয় না। বেশী বাহারে বারিক সুতোর কাপড় বিলেত থেকে তৈরী হয়ে এদেশে আসে, সেই মিহি সুতোর কাপড় ব্যবহার করেই আমরা বাবু হয়ে উঠেছিলাম, এ মোটা কাপড় বিকোবে কি। কেউ কিনতে চায় না তাতেই মনে ধাক্কা লাগল, তাই তো, কি করছি। এমন করে নিজেদের ভুলিয়ে রাখছে বিদেশীরা। আমরাও দেশ জাতি ভুলে আত্মবিস্মৃত হয়ে আছি। বিবেকের কাছে বড় অপরাধ বোধ করলাম। কেন দেশের তৈরী জিনিষের উপর অশ্রদ্ধা। তাই লিখলাম—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

এই গানটি লিখে রাজসাহীর অক্ষয় সরকারের আপিসে এসে উপস্থিত হলাম। সেই দিনই রাজসাহী থেকে কলকাতা এসেছি। অক্ষয় সরকারের মেসে উঠে তাঁর আপিসে দেখা করতে এলাম। মেসের ছেলেরা আমাকে পেয়ে খুবই খুশী হয়ে উঠল। বলল, একটা স্বদেশী গান চাই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই—এই গানই লিখে দিলাম। এর মধ্যে জলধর সেন এসে উপস্থিত। গানটির খানিকটা পড়েই তাঁর পছন্দ হল, যে খানিকটা লেখা হয়েছিল তাই টেনে নিয়ে তখনই তিনি ছাপতে পাঠালেন। সম্পূর্ণটা লিখে আমি আর অক্ষয় সুর দিলাম। (এই

অক্ষয়কুমার সরকার সার যদুনাথ সরকারের বোধহয় কাকা)। গানটিও ছাপা হয়ে এল। সমস্ত মেসের ছেলেরা স্কুল-কলেজের ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে এল স্কুল কলেজ থেকে। কি উন্মাদনা—কি বলব। বিকেল বেলা আমাকে সামনে নিয়ে প্রসেসন করে এই গানটি গাইতে গাইতে অনেক পথ পরিক্রমণ করল 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীনদুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।' সে দিন সকলেই খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েছিল, জুতো কারোই পায়ে ছিল না। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার এখনও চোখে জল আসে। ওরা আমাকে কত ভালবাসত। কেন ভালবাসত কেন আমার গান ওরা এত ভালবেসে নিয়েছে। ওদের প্রাণ কত বড়ো। আর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। ওরা চেয়েছিল ওদের কেউ পথ দেখাক। সুরেন দাশ বললেন—আপনার এই গানটি সর্বজনমনে এমন স্পর্শ করেছিল যে সেই মোটা কাপড় মাথায় নিয়ে নগরে গ্রামে হাটে বাজারে এই গানটি গাইতে গাইতে সর্বত্র ঘুরেছে—তাতে বিক্রিও হয়েছে খুব। এমন কি সার পি সি রায় পর্য্যন্ত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কলকাতার যেখানে এই গানটি হয়েছে, সার পি সি রায় সেখানেই গানটি শুনতে যেতেন। স্বদেশী সঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাংলার মাটি বাংলার জল, অতুল প্রসাদের উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' দ্বিজেন্দ্রলালের ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আর আপনার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, এই গান কয়টি দেশের লোকের যেন মন্ত্র জপমালা হয়ে গিয়েছিল। দেশের বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত সকলেই এইসব গান গেয়ে পথে ঘাটে বেড়িয়েছে। তার মধ্যে নৌকার মাঝি, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আর জনসাধারণ তো আছেই, এই গান কয়টি লুফে নিয়েছিল। তার মধ্যে আবার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় গানটিই বেশী শুনতে পেতাম। এমন সহজ ভাবে এমন অপূর্ব্ব কথা আমরা আর পাই নি। আমরা যে হাটেবাজারে গাঁয়ে এই গান গেয়ে বেড়িয়েছি মনে হলে এখনও রোমাঞ্চ হয়। যদিও কারও গলাতেই সুর ছিলনা, কিন্তু উৎসাহ ছিল। বাবা বললেন, তোরা সবাই মিলে আর একবার সেই রকম করে গা দেখি, আমি শুনি, আবার আমার আগের কথা মনে হয়ে চোখে জল ঝরুক।

এই রকম করেই সকলের সঙ্গে হেসে কেঁদে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাবার দিন কেটে যাচ্ছিল। আবার রাখী-বন্ধনের কথা বললেন। রাখীবন্ধনের দিন আমাদের বাড়ী রান্না হ'ত না। সেদিন অরন্ধন। বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করবনা এই প্রতিজ্ঞা। সন্ধ্যায় স্বদেশী গান। রাত্রে খাওয়া দাওয়া,—যেন কোন ব্রত পালিত হল। স্বদেশী আরও অনেক গান বাবার শেষ দান বইতেই আছে। বাণী বা কল্যাণীতেও স্বদেশী সঙ্গীত অনেকগুলি আছে। একদিন বাবা লিখলেন সুরেন শোন কটকে যখন শরীর সারাবার জন্য চেঞ্জে গিয়েছিলাম তখন কি করে যে প্রচার হয়ে গিয়েছিল, রাজসাহীর রজনীকান্ত সেন কটকে এসেছেন। কি বলব, সেখানকার যত বাঙালী ছিল রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগল। কত আলোচনা, কত সাহিত্য সম্বন্ধে কথা আর গানের আসর বসিয়ে দিল। আমার তখন শরীর অসুস্থ, আমি ছেলেমেয়েদের দিয়েই বেশী গান গাইয়ে শুনাই। সকলেরই ফরমাস মত গান গাইতে হ'ত। যেমন 'ভারত কাব্যনিকুঞ্জে জাগো সুমঙ্গলময়ী মা। মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি করুক প্রচারিত মহিমা।' আর সবই বাণী ও কল্যাণীর গান। ভদ্রজনের সমাবেশও কমত না, আমরাও গাইয়েরা ছুটি পেতাম না। আমাদের পড়াশুনার সময় পার হয়ে গেলে মনটা ভালো লাগত না। বাবাও মাঝে মাঝে দু-একটা গান গাইতেন। এর মধ্যে একদিন রাস্তায় পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের সঙ্গে বাবার হঠাৎ দেখা। দুই বন্ধুতে দেখা হয়ে দুজনেরই খুব আনন্দ হল। এঁরা দুজনেই সমান তার্কিক। এক তর্কে বহু সময় কেটে যেত। আমরাও গানের আসরের থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম সেই ফাঁকে। তার বহুদিন পরে বাবার

অসুখের সময় কটেজে এসে পূর্ণচন্দ্র দে বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। বাবা লিখলেন, আসুন, বহুদিন পরে দেখা। আর তর্ক করা চলবে না, বাক্য গেছে। সব গেছে—শুধু হরিনাম নিয়ে আছি। কটকের আনন্দপরিবেশের রজনী সেনকে ভুলে যাবেন না। আমি শ্রীহরির আহ্বানে চলেছি। এমনি কত মহাজন আসতেন বাবার কাছে। বাবাও কত খুশী হতেন। বলতেন, যাবার সময় কত প্রেম ভালবাসা পেয়ে যাচ্ছি। আমার কি এটা পরম সৌভাগ্য বলে মনে হয় না? হারে হেমেন্দ্র, আমি এঁদের কি দিতে পেরেছি যে সবাই আমাকে দেখতে আসেন। এঁদের দেখলে আমার আবার বাচতে ইচ্ছা হয়।

দিন কয়েক পরে শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। শুনে আমাদের কিরকম আনন্দ হল কি বলব। সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর নাম বললে আর কিছু বলবার দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথের সেই 'অলকে ঝলকে জল পা টিপে টিপে ... কলস ভরা আমরা চল চল', 'বাঁধ বারণ ... না' 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। 'বন্দীবীর' রিসাইটেশন এই। সব গান বিজিতেন বসুর কাছে আমরা দুচারদিন আগেই শিখেছি। সিরাজগঞ্জ গার্লস স্কুলে রিসাইটেশন করেছি। সেই রবীন্দ্রনাথ আসবেন আমাদের বাড়ী। এ যেন স্বপ্ন। গানগুলো গুন গুন করে গাই আর খুশিতে যেন নেচে বেড়াই। আমরা প্রাণ ভরে তাঁকে দেখতে পাব।

সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ এলেন। কটেজের সামনে গাড়ী থামল। যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ গাড়ী থেকে নেমে এলেন। বাবা রোগের কষ্ট ভুলে গিয়ে পরিপূর্ণ সুখ মনে নিজেই হেঁটে এগিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বাবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাবা ব্যথিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুজনেই দুজনের প্রতি নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি এ কি সেই প্রাণপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ রজনীকান্ত? যেন একটু আনমনা হয়ে গেলেন। কাকে দেখতে এসেছি কাকে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ বসলেন। বাবা প্রথমেই লিখলেন, আপনি দয়া করে এসেছেন, আমার যাবার বেলায় দেবদর্শন হ'ল। গিয়ে বলব। আগে আমার একটু পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে যান। আমি পবিত্র হই। আমি মরণপথের, যাত্রী আমি মহা আহ্বানে চলেছি। কাটা পথ দিয়ে টেনে নিয়ে চলছে। রেহাই দেয় না। দয়াল আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার আর কষ্ট নাই। সেই ধুলো ঝেড়ে কোলে নেবে। আমি আবার বলছি আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যান। আমার যাত্রা সফল হোক। রবীন্দ্রনাথ অশ্রুভারাতুর চক্ষে নীরব হয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'এখন শরীর কেমন আছে?' বাবা লিখলেন 'এই ট্রাকিওটমি করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি তো বলেছি আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। একটু পায়ের ধুলো দিন মহাপুরুষ। বাবা লিখেই চলেছেন—আমি যখন বুঝলাম এ উৎকট ব্যথা পেনাল কোড নয়, এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে কোলে নেবে বলে, তখন বুঝলাম, এ মার নয়, এ যে প্রেম, এ যে দয়া। তারপর থেকে সব সহ্য করছি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল। নইলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত। সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন 'শিবাস্তে পন্থান: সন্তু'। আপনি আমাদের সাহিত্যের নায়ক, দার্শনিক, চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে, বলে দেখতে চেয়েছিলাম। নিজের তো পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই—ভালোবাসেন জানি তাই এত কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না। ছেলেটিকে দয়াকরে বোলপুরে নিতে চেয়েছেন শুনে কত আনন্দ হল। আমি যে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে কথা দিয়ে আবদ্ধ হয়ে আছি। নইলে আপনার কাছে থেকে দেবতা হ'ত তাতে কি পিতার অনিচ্ছা হতে পারে?

—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থশক্তি? তার যা গৌরব তা আমি এই যাবার পথে বেশ বুঝতে পারছি। তারজন্য মানুষ কি মানুষ হয়? এই যে এই যে মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিন রাত্রি দেখাশোনা করছে—এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক। আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত তাহলে আপনার 'রাজা ও রানী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। আমি রাজার অভিনয় করেছি। এমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব। রাজার পার্ট আমার আজও অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল তেমনি আছে।

"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লৌহের শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

('রাজা ও রানী' দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।)

একবার [illegible] পারলাম না।

ইহা সব 'কথা' আমার ছেলেমেয়েরা রেসাই-টেশন করবে।

—আর কণিকার আদর্শে অনেক লিখেছি, লেখে ধন্য হয়েছি। এ আনন্দে লেখেই ধন্য হয়েছি। সেটা আমার গৌরব না অগৌরব?

—হাঁ, অনেক জানে, জ্যোতিষও জানি, সবই জানি, কেবল আমাকে জানি না।

—আমি কি পাণ্ডা চিনি না? আমি কি পাগলা দেখি নি? আমি কি [illegible] চোখে দেখলে কি বুঝতে পারি না? আমি কি দেবতা দেখলে বুঝি না? তবে সেদিন বেকামি করেছি কি করে?

—রাগে কে? নিন্দে করে কে? আমাকে আর উত্তেজিত করবেন না, দোহাই আপনার।

—আমাকে আর কিছু বলবেন না। একবার যদি দয়াল আমায় কথা কইবার শক্তি দিত তবে আরও কিছু বলে যেতে পারতাম। আমাকে দয়াল বড় দয়া করছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে আমার রচিত গান আমার গলায় শুনে আপনি কত খুশী হয়েছিলেন। আরও গান ফরমাস করে শুনেছিলেন, সে কথা আমি ভুলিনি। আমি আমার আপন ভগবৎসাধনার সঙ্গীতরসে ডুবে আছি। প্রেমসুধায় মত্ত হয়ে আছি। এখন আমার ছেলেমেয়ের মুখে একটি গান শুনুন।

এরপর বাবার ইচ্ছায় ও রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতে আমি আর আমার ছোটদাদা 'বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না হায়, অবোধ জীবনপথযাত্রী' এই গানটি গাইলাম, বাবাই অর্গান বাজালেন। আমাদের কিন্তু ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের সামনে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি' এই গানটি রবীন্দ্রনাথকে শুনাবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা হল না বাবার ও রবীন্দ্রনাথের কথাই শেষ হয় না, গান শোনার কখন। যাই হোক, আমাদের গান শুনে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় খুশীই হয়েছিলেন। আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। তখন ঘরে যাঁরা ছিলেন সকলেই যেন বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন কেননা বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কথা হয়েছিল কেউই তা লিখে রাখেন নাই। শুধু বাবার লেখা থেকেই পত্রের কথাগুলি অনুমান করা যায়।

—'আমি? আজ চার মাস হাসপাতালে।'

'আমার তো ডাক পড়েছে। আমি চলে গেলে, যেন নিতান্ত দীন হীন বলে স্মৃতি থাকে, এটা প্রার্থনার দাবী কি কিছু রাখি না? কিন্তু আমার নিজের দাবী কাকেও কিছু তা বুঝি না।'

—'বোধহয় আমার হিসেবে আমি একটু পাইয়ে গেলাম।'

'হাঁ খুব মারে, তবে এখন আর বেশী কষ্ট হয় না। সব সহ্য করে যাচ্ছি।'

—'দেব, আপনার পায়ের ধুলি আমার মাথায় দিয়ে যান। আবার বলছি, আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন দয়াল শীঘ্র আমাকে তার কোলে নিয়ে যায়।'

—কাজ কি শেষ হয়? সেটা দয়াল জানে কার

কখন কাজ শেষ হবে। আপনার সঙ্গে দেখা হল' আমি গিয়ে তাকে বলব।'

রবীন্দ্রনাথের ও বাবার যে কথোপকথন হয়েছিল... তখন যদি দুজনের কথা কালিকলমে ধরে রাখা যেত সে হ'ত বোধহয় অপূর্ব সাহিত্য। আমাদের দুর্ভাগ্য সে কথা সমস্ত পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ছলছল চোখে বাবার হাত ধরে বিদায় নিয়ে গেলে দুই যুগমানব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমাদের দুঃখ রয়ে গেল তাঁর গান আমরা তাঁকে আর শুনাতে পারলাম না। সেই দিন এস কে লাহিড়ী এলেন বাবার কাছে। অনেকক্ষণ বসে কথা বললেন দু'জনে। বাবা বললেন, রামতনু লাহিড়ী, যিনি ধর্মে কর্মে পুণ্যবান্ ছিলেন। আপনি তাঁর পুত্র, আপনাকে দেখলেও পুণ্য হয়। আপনি আমাকে দেখতে আসেন, আমি লজ্জা পাই, আমি ধন্য হই। কত কথা দু'জনের হ'ত। তার পরে আমাকে ডাকলেন গান শুনবার জন্য। বাবা বললেন, আজ আমার জীবন ধন্য। আজ রবীন্দ্রনাথ এসে আমাকে দেখে গেছেন। দেখুন, দীনের কি সৌভাগ্য। আমি যদি রাজসাহী বসে ওকালতি করতাম তা হলে কি এ সৌভাগ্য হ'ত? আমাকে দুঃখ দিয়ে ব্যথা দিয়ে কোথায় তুলে দিয়েছে। দেশের লোক, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমায় দেখে গেলেন। এ ব্যথা, সৌভাগ্যের কাছে তুচ্ছ হোক। রাত্রে মাকে বললেন, দেখ হিরণ্ময়ী, তুচ্ছ রজনীকান্তের জন্য রবীন্দ্রনাথের পদধূলি বাড়ীতে। শত কাজ ফেলে আমাকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছেন। এত ব্যথিত পীড়িত দুঃখীর প্রতি তাঁহার পরম করুণা। একদিক দিয়ে গ্রহণ করেন আর একদিক দিয়ে দান করেন। কোনমতে তাঁদের বিচার—কিছু বুঝতে পারছ হিরণ্ময়ী? এ কথার উত্তর না কি দিবেন? মা-তো দু'হাতে প্রার্থনা করছেন, যশ চাইনে মান চাইনে শুধু ভালো করে দাও ওঁকে। উনি ভালো হয়ে উঠুন। আমার এই কথাটি শুধু রাখো ভগবান। বাবা রাত্রেই বসে লিখলেন এই গানটি—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব করিছে চূর।
তাই যশঃ অর্থ মান স্বাস্থ্য সকলি করেছে দূর।

(দয়ার বিচার—শেষ দান।)

এ গানটি বিখ্যাত বলে সবটা আর লিখলাম না।

বাবা এই গানটি রচনা করেই বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সুর দিয়ে হারমোনিয়ামে বাজিয়েই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এস কে লাহিড়ী রোজ এসে আমাকে ডাকতেন এই গানটা শুনবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে চলে গিয়েছিলেন। গানটি পেয়ে তিনি বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন যদিও কান্তকবির জীবনীতে এ চিঠিখানি উদ্ধৃত আছে তবুও আমি চিঠিখানি তুলে ধরলাম।

ওঁ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

সেদিন আপনার রোগশয্যার পাশে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি মাংস স্নায়ু পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়াও কোনমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না। ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী'র নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লৌহের শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে
পারে না কি
বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইয়াছিল সুখ দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তি দ্বারা ছোট এক মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। শরীর হার মানিয়াছে কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে কিন্তু সঙ্গীতকে

নিরস্ত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরও তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি মাংস ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশীর ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেই রূপ আশ্চর্য। যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে সেই দিনই আমি বোলপুর চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতা যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। সমস্তই তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন। আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ, সমস্তই তো তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন তাহাকে কেমন গভীর ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন। আজ আপনার জীবনসঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে বাবা যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ যেন বড্ড বেশী বলেছেন। লজ্জা পাচ্ছেন, দুঃখ পাচ্ছেন, আবার তাঁকে যে রবীন্দ্রনাথ চিনতে পেরেছেন এ চেতনা তাঁকে মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে। রজনীকান্ত দয়ালের পায়ে আত্মসমর্পণে যেন বিশ্বাস না হারায়। প্রশংসা যেন আত্মসমর্পণকে আবৃত না করে। শোন্ হেমেন্দ্র, দয়াল যে কি দয়া করছে তা তোরা কি কিছু বুঝিস? তোরা যেন কিছুতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিসনে। আমি যে রোগজীর্ণ আর ভগবৎপ্রেমের কাঙাল—সেইটাই বুঝবার চেষ্টা করিস। তবু বলি, রবীন্দ্রনাথের বাণী আমার ঈশ্বরপ্রেমে চেতনা সঞ্চার হোক। হেমেন্দ্র, তোরা এই প্রার্থনাই কর্।

এর পরে বাবা আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। এখন মর্ফিয়াতেও কষ্ট কমে না। রাত হলেই কষ্টটা বেশী বাড়ে। আর যন্ত্রণার সঙ্গে গান রচনা ও বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লেখা বাড়তে থাকে। গান যেন যন্ত্রণা লাঘবের মহৌষধ। গানই সম্বল, গানের সুরই যেন তাঁর চরণে দেবার অঞ্জলি। মা পাশে বসে থাকতেন, কত সময় বাবা মায়ের হাত ধরে বসে থাকতেন। লিখছেন—সবাই ব্যস্ত হয়, কই, আমি তো হাঁচ্ছিনে। কেন বুঝতে পারছ না তোমাদের আর হাত নাই। সন্তোষ কুমার বসু (যিনি পরে কলকাতার মেয়র হয়েছিলেন) রাতে তিনিও বাবার পাশে বসে থাকতেন। ছেলেরা বলা, আমার দাদারা তো থাকতেনই। আবার লিখছেন—আমাকে প্রেম দিয়ে সুর দিয়ে কাব্যসাধনা দিয়ে শরীরের কষ্ট ভুলিয়ে তার প্রেমে ভুলিয়ে নিচ্ছে আমার আমিকেও যদি ভুলে যাই তবে আর কি হবে? বাংলা দেশ আমাকে ছেলের মত করে আদর শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করছে—ভাল রাখবার চেষ্টা করছে—দেখে আমি নিজেকে ধন্য মনে করে যাচ্ছি। রাত্রেই লিখলেন—

কত বন্ধু কত মিত্র হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ হরি মোর কুটিরে নিয়ত।
মোর দশা হেরে তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা,
(তারা) যত মোরে বড় করে আমি তত হই নত।
একান্ত তোমার পায়
এ জীবন ভিক্ষা চায়
(বলে) প্রভু ভাল করে দাও তীব্র গলক্ষত।
এই অধমের প্রাণ
কেন তারা চাহে দান
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মত?

তুমি জানো অন্তর্য্যামী
কত যে মলিন আমি,
রাখো ভালো মারো ভালো, চরণে শরণাগত।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ যে আমার জন্য করছে এ তাঁরই মানুষ, সুতরাং তাঁরই প্রেরণায় এ সেবা তিনিই করছেন। আমার এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি না হলে তাঁকে তো পেতাম না। মায়ের কোলে যে শান্তি তাও পেতাম না।

আজ রবিঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বললেন "আপনাকে পুজো করতে ইচ্ছে করে।" আমি তো শুনে লজ্জায় মরি।

বললাম, আমাকে খামখা উঁচু করবেন না। আমি বড় দীনহীন বড় কাঙাল। আমার যাত্রাপথে দেবদর্শন হল গিয়ে বলব। আমাকে দেখে যান, আশীর্ব্বাদ করে যান। আমার যাবার সময় অকারণ মান বাড়াবেন না। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন সে কথা আমরা কেউই লিখে রাখিনি। এখন তার আফশোষ হয়।

সুরেন দাদাকে বললেন—'দেখ, এমন নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র যশ বাংলা দেশের কোন কবি পেয়েছে—' এই ভাবেই কথা লিখে যেতেন।

এর দু'চার দিন পরে বাবা মাকে ডাকলেন, বললেন, শুন কিরণ, তুমি বেশীক্ষণ আমার কাছছাড়া হয়ে থেকো না, তোমাকে মিনতি করছি। কত পিপাসা, আমি বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারিনা। তারপর তোমার দর্শন। না দেখলে থাকতে পারি না। প্রাণটা খর করে। আর হল না হিরণ্ময়ী, গলার ব্যথায় আমাকে খেতে দিল না। একটু জল দাও তো দেখি, খেতে পারি কি না। যখন ব্যথা কম থাকত তখন স্বভাবেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু আমরা সব সময় কাছাকাছি থাকতাম।

যখন যে কথা মনে আসতো বলে যেতেন। বাবা তো সব জানিস যে যখন যা মনে পড়ে বলে যাই, পারিস তো লিখে রাখ্। এর মধ্যে একদিন আমার বৌদি ও আমাদের ডাকলেন, বললেন, শোনো, আমার একটা মজার কথা আছে। তখন আমি হিন্দু হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করছি, পড়াশুনাও করেছি, আড্ডাও দিয়েছি গান লিখেছি, সুর দিয়ে, গান গেয়ে বেড়িয়েছি। একদিন এক ভদ্রলোক সকালবেলা এসে আমাকে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে গেলেন দুপুরে খাবার জন্য, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। আমি তো হষ্টেলে বসে তারপর স্নান সেরে বেশ সেজেগুজে সেইভদ্রলোকের বাড়ী গেলাম। গিয়ে বাইরের ঘরে বসলাম ঘরে কেউ নেই। একটু পরে সেই ভদ্রলোক নন্, আর একজন এলেন, এসে আমাকে দেখে বললেন। এ কি রজনী যে —এমন সময়ে হঠাৎ? আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ ১লা এপ্রিল। তাই তো বোকা বনে গিয়ে বললাম, এই এদিকে এসেছিলাম তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। আচ্ছা এখন যাই. বলে আমি উঠে এলাম। হষ্টেলে এসে কাউকে কিছু বললাম না। সন্ধ্যা-বেলায় সেই ভদ্রলোক এক হাঁড়ি খাবার এনে বললেন, কই, রজনী ভায়া কই? তুমি তো সব সময় চালাকি করে বেড়াও, এবার তো হারলে এখন সবাই মিলে একটু মিষ্টিমুখ কর দেখি। দল বেঁধে হৈ হৈ করে খাওয়াদাওয়া হল, তারপরেই আমিই গান গেয়ে মিষ্টিমুখ করা হল। সেদিন আমাকে অনেক গান গাইতে হল। তা যেন হল, কিন্তু ঐ জব্দ হওয়ার ব্যাপারটা যেন ভুলতেই পারছি না। কয়েকদিন পরে পাড়ায় ভোরবেলা খঞ্জনী বাজিয়ে কে যেন তার সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে যায়। পাড়ায় যেন গান শুনবার বেশ সাড়া পাওয়া গেল এক-দিন হষ্টেলে সব ছেলেরা মিলে এক জায়গায় বসে মুড়ি বেগুন পেঁয়াজের বড়া খাওয়া হচ্ছে। আমি ছিলাম না।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক বিকেলবেলা

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৩৪৪।৪৫ সনের কিছু আগেকার কথা। শান্তি-নিকেতন হতে অসুস্থ হয়ে কবিবর কোলকাতার বাড়ীতে এসেছেন। সংবাদ জেনে দেখতে গেলাম তাঁকে। ফটকের দারোয়ানের কাছ থেকে শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে লিখলাম—"আপনি যদি রচনারত না থাকেন তবে দোতলায় নেমে এলে চরণদর্শন করতে পারি। সেবক যতীন্দ্রপ্রসাদ।" দারোয়ান এসে আমাকে দোতলায় কবির বসবার কামরায় নিয়ে বসালো। কবি নেমে এসে বসার পর তাঁর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞেস করতেই তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা বললেন এবং কালিম্পং যেয়ে কিছুকাল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য থাকার কথা জানালেন। বললেন—"যতীন, তোমার কাকাবাবুর কালিম্পংএ একটি সুন্দর বাড়ী খালি আছে খবর পেয়েছি। তুমি যদি তোমার কাকাবাবুকে বলে' আমাকে তাঁর ঐ বাড়ীতে একটু থাকার ব্যবস্থা করে' দিতে পার তবে আমার খুব উপকার হয়।" আমি তাঁকে বললাম, "আপনি নিজে লিখে জানালেই তিনি সানন্দে কিছুকাল থাকার জন্য ঐ বাড়ীটা ছেড়ে দেবেন।" তিনি বললেন, "আমার সঙ্কোচ হচ্ছে জানাতে। তুমিই আমার হয়ে তাঁকে আমার কথাটা জানাও।"

আমি ৫৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে ফিরে এসে কাকাবাবুকে কবির কথা জানাতেই তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন, "তুমি এখুনি যোড়াসাঁকোয় যেয়ে কবিকে বলে' এসো, তিনি খালি-বাড়ীটাতে যতদিন খুশী থাকুন। আমি ঐ বাড়ীর caretakerকে কবির থাকার কথা জানিয়ে ঘরগুলি পরিষ্কার করবার জন্য এক্ষুনি টেলিগ্রাম করে' দিচ্ছি।"

আমিও সন্তুষ্টচিত্তে কবির কাছে ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর সম্মতির কথা জানালাম। কবি বললেন, ব্রজেন্দ্র বাবুকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।" ঐ বাড়ীটি ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের। আসাম-গৌরীপুরের কোনো জমিদারের ঐ বাড়ী নয়। অনেকের গ্রন্থে এই ভুল তথ্য আছে। এর প্রতিবাদ না করাটা অন্যায়। এই সময়ে কালিম্পঙে ১৩৪৫ সনে গৌরীপুর ভবনে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে "জন্মদিন" নামক সুবিখ্যাত দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেছিলেন এবং তা "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটির জন্য আমিও আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। কারণ প্রতিভাশালী বিশ্বখ্যাত—কবির সাথে দেশপূজ্য দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোরের যোগাযোগ ঘটিয়ে "জন্মদিন" কবিতাটির সৃষ্টির মূলে আমার ন্যায় অতিক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন কার্য্যে সহায়তা না থাকলে এ কবিতাটির সৃষ্টি হোতো কি না বলা যায় না।

কবিবরের সাথে আরো একটি স্মরণীয় দুপুরবেলার সংবাদ জানাবার বাসনা রইলো। ঘটনাটি দুঃখজনকও বটে। তার সুযোগ পেলে জানাবো। ঘটনার স্থল ময়মনসিংহ জেলা।

দীনবন্ধু পরিক্রমা

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

দীনবন্ধু মিত্রের যে গ্রামে জন্ম, সেই গ্রামের নাম চৌবেড়িয়া। নদীয়া জেলার এই গ্রাম চৌবেড়িয়া। গ্রামটির পাশ দিয়ে যমুনা নদী বয়ে গেছে। দীনবন্ধু মিত্রের বাবার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কালাচাঁদ মিত্রের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এক অভাবের সংসারে দীনবন্ধুর জন্ম হয়েছিল।

দীনবন্ধু গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। তাঁর পাঠশালার পড়া শেষ হল। বাবা তাঁকে জমিদারী সেরেস্তায় এক চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। মাইনে মাসে আট টাকা। দীনবন্ধুর পড়াশোনা করার ইচ্ছে, কিন্তু বাবার ভয়ে তাঁকে চাকরী করতে হল।

দীনবন্ধু কিছুদিন পরে বাবাকে না জানিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে উঠলেন। দীনবন্ধু লঙ সাহেবের স্কুলে ভর্তি হলেন। স্কুলের মাইনে তখন মাসে দুটাকা। দীনবন্ধুকে অনেক কষ্ট করে এই দুটাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ করলেন। তিনি বৃত্তি পেলেন। তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন।

দীনবন্ধু হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ করে বৃত্তিলাভ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন সেরা ছাত্র ছিলেন। দীনবন্ধু চাকরী পেলেন। তিনি পোস্ট মাস্টারের পদে নিযুক্ত হন। তাঁকে চলে যেতে হয় পাটনায়। এরপর তিনি উড়িষ্যায় ইনসপেকটিং পোস্ট-মাস্টারের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই কাজ দীনবন্ধুর মঙ্গল কিছু করতে পারে না, তাঁর অমঙ্গলই করেছে। এই কাজের জন্যে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে, এই কাজের জন্যে তাঁকে নদীয়া বিভাগে, ঢাকা বিভাগে যেতে হয়েছে। দীনবন্ধু যদি ঢাকা বিভাগে, নদীয়া বিভাগে যাওয়ার সুযোগ না পেতেন, তিনি গরীব নীলচাষীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেতেন না, তিনি গরীব নীলচাষীদের আর বিদেশী নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার নিজের চোখে দেখতে পেতেন না আর এসব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে না পারলে তাঁর পক্ষে নীলদর্পণের মত কালজয়ী নাটক রচনা করা সম্ভব হত না।

দীনবন্ধু যে দরদী হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, অবিস্মরণীয় নাটক নীলদর্পণ তার প্রমাণ। গরীব, অসহায় চাষীদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা না থাকলে, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা না করলে নীলদর্পণের মত নাটক লেখা কারো পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয়।

দীনবন্ধু তখন ঢাকা বিভাগে চাকরীতে নিযুক্ত রয়েছেন। একদিন তিনি রাত্রে মেঘনা নদী পেরোচ্ছিলেন। তিনি নৌকায় বসে নীলদর্পণ নাটক লিখছিলেন। কিছুদূরে এগিয়ে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হল। মাঝিরা চীৎকার করে উঠল। দীনবন্ধু সাঁতার জানেন না। তিনি নীলদর্পণের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে চুপচাপ নৌকায় বসে রইলেন। ভাগ্য ভাল। কাছেই চর দেখা দিল। সকলে চরে গিয়ে উঠলেন। একটু পরে মেঘনায় জোয়ার আসতে শুরু করল। এবার চর ডুবে যাবে। সবাই যখন ভয়ে অস্থির, তখন আর একটি নৌকা এগিয়ে আসছিল। এই নৌকার মাঝিরা চর থেকে সকলকে তুলে নিল। দীনবন্ধু আকস্মিক-

ভাবে রক্ষা পেলেন। সেদিন যদি দীনবন্ধুর মৃত্যু হত, নীলদর্পণ নাটকের কথা কেউ জানতে পারতেন না।

দীনবন্ধু ছিলেন দক্ষ সরকারী কর্মচারী। তিনি নিপুণ হাতে শুধু নাটকই লেখেন নি, তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারী কাজ করে গেছেন। ১৮৭১ সালে তাঁকে লুসাই যুদ্ধে ডাকের কাজে কাছাড়ে যেতে হয়েছিল। তিনি সুষ্ঠুভাবে সে কাজ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম-চন্দ্র লিখেছেন: "দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি পোস্টমাস্টার জেনারেল হইতে পারিতেন।......... পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং ডাইরেক্টার জেনারেলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোস্ট-মাস্টার জেনারেলের সাহায্য করিতেন। এ জন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছুদিন তিনি রেইলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। তারপরে হাবড়া ডিবিসনে নিযুক্ত হন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।"

দীনবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত মিশুক। তিনি লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ভালবাসতেন। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন। এটা ছিল তাঁর পরম শখ। একদিন দীনবন্ধু পালকীতে চড়ে এক গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। এক বাড়ীর বৈঠকখানায় ক'জন ভদ্রলোক বসে গল্প করছিলেন। দীনবন্ধু পালকী থেকে নেমে ওই অপরিচিত ভদ্রলোককের মাঝে গিয়ে বসলেন। তিনি কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে একখানা খাতা খুলে পড়তে লাগলেন। অন্য ভদ্রলোকেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন, একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে খাওয়ার ডাক পড়ল। সকলের সঙ্গে দীনবন্ধু বাড়ীর ভেতরে ঢুকে খেতে বসলেন। সেটা ছিল বিয়ে-বাড়ী। দীনবন্ধু খাওয়ার পর বাড়ীর কর্ত্তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোক দীনবন্ধুর এই সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। পরে দীনবন্ধু যখনই ওই গ্রামে গেছেন, তিনি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে দেখা করেছেন।

দীনবন্ধুর অহংকার ছিল না। তিনি সব সময় হাসিখুশী থাকতেন। তিনি রাগ করতে জানতেন না। তাঁকে কেউ বিরক্ত হতে দেখে নি। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার রাগ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "মনুষ্যমাত্রেরই অহংকার আছে দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না। আমি কখনও তাঁহার রচনা দেখি নাই।"

নীলদর্পণ তখন প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধু এক গ্রামে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গেছেন। গ্রামের সেই ভদ্র-লোকের বাড়ীতে এক নীলকুঠির দেওয়ান এসেছেন। দেওয়ান ভদ্রলোক নীলদর্পণ পড়েছেন কিন্তু নীলদর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্রকে চেনেন না। তিনি দীনবন্ধুর সামনে আর এক ভদ্রলোককে বললেন, নীলদর্পণ বইটা যেন শা—দীনবন্ধু নীলকুঠিতে বসে লিখেছে। দীনবন্ধু এই কথা শুনে হেসে ফেললেন। বাড়ীর কর্ত্তা সেই দেওয়ান ভদ্রলোককে বললেন, ইনিই দীনবন্ধু মিত্র। ভদ্রলোক তখন লজ্জায় পড়ে গেছেন। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর দীনবন্ধু বললেন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আপনার গালাগালি বড় মিষ্টি লেগেছে।

১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধ উপলক্ষে দীনবন্ধুকে পোস্ট অফিসের কাজে কাছাড় যেতে হয়েছিল। লুসাই যুদ্ধ থেকে তিনি ফিরে এলেন। সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দিলেন। দীনবন্ধু কাছাড় থেকে পরম বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে এক সুন্দর কাপড়ের জুতো তৈরী করিয়ে আনেন। দীনবন্ধু এই কাপড়ের জুতো বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখেন, কেমন জুতো;

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর নবীন তপস্বিনী নাটকটি উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃণালিনী উপন্যাসটি দীনবন্ধুকে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধু যদি লুসাই যুদ্ধে না যেতেন, তাঁর কমলে কামিনী নাটক লেখা হত না।

তিনি মণিপুর, কাছাড় থেকে যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি কমলে কামিনী নাটক লেখার কাজে লাগিয়েছেন।

একসময় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ীর পাশেই দীনবন্ধু থাকতেন। একদিন দীনবন্ধু নিজের বাড়ীতে ক'জন বন্ধুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। বিদ্যাসাগর-মশাইও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। বন্ধুরা নির্দিষ্ট দিনে দীনবন্ধুর বাড়ীতে এসেছেন। রাত তখন আটটা। দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরমশাইকে জানালেন, রাত এগারোটার আগে রান্না শেষ হবেনা। এদিকে ক'জন বন্ধু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যাকুল।

দীনবন্ধু ও বিদ্যাসাগর ভদ্রলোকদের মাঝে এসে বসলেন। দুজনে এমন বৈঠকী গল্প শুরু করলেন, গল্পে গল্পে রাত এগারোটা বেজে গেল। ভেতরে থেকে খাওয়ার ডাক পড়ল। যারা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। বিদ্যাসাগরমশাই হাসতে হাসতে বললেন, আর গল্পের প্রয়োজন নেই, এবার খাবেন চলুন, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

দীনবন্ধু আর বিদ্যাসাগর দুজনেই বৈঠকী গল্পে পটু ছিলেন। এক ভদ্রলোকের বাড়ীর বৈঠকখানায় বিদ্যাসাগরমশাই গল্প করছেন। সেখানে দীনবন্ধু হঠাৎ গিয়ে হাজির হলেন। বিদ্যাসাগরমশাই দীনবন্ধুকে দেখে বলে উঠলেন, এই যে, আমার ভায়া এসে গেছেন, এবার আমি অবসর নেই।

দীনবন্ধু তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। তিনি তখন কবিতা লিখতেন। দীনবন্ধু সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে কবিতা পাঠালেন। তাঁর কবিতা সংবাদ প্রভাকরের পাতায় প্রকাশিত হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন দীনবন্ধু। দুজনের বয়সের ব্যবধান প্রায় দশ বছর। দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু দুজনে যেমন হাসি তামাশা করেছেন, মনে হয়েছে, দুজনে সমবয়সী।

নীলদর্পণ দীনবন্ধুর প্রথম নাটক। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। পরের নাটক নবীন তপস্বিনী। দীনবন্ধু এই নাটকটি নদীয়ায় বসে লিখেছেন। ১৮৬৩ সালে নবীন তপস্বিনী প্রকাশিত হয়েছে। এরপর দীনবন্ধু একখানি প্রহসন লেখেন, নাম বিয়ে পাগলা বুড়ো। ১৮৬৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পরের রচনা সধবার একাদশী। এক অনবদ্য বলিষ্ঠ কালজয়ী নাটক। এটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ সালে লীলাবতী নাটক প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৭৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরের নাটক লীলাবতী। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লীলাবতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্ষেত্রমোহনের অনবদ্য অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে দীনবন্ধু তাঁকে বলেন, তুমি আমার নাটকের নায়িকার জীবন দিবার জন্যই জন্মিয়াছ।

১৮৭২ সালে দীনবন্ধু লেখেন জামাই বারিক। তাঁর শেষ নাটক কমলে কামিনী। তাঁর গদ্য রচনা তিনটি। কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর।

দীনবন্ধু মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। হেয়ার সাহেব মারা গেলেন। দীনবন্ধু হেয়ার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন :

দেখ মাতা গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতস্মরণীয়,
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্মল নিদান
যার জন্যে করেছেন সর্বস্ব প্রদান।

হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি দীনবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তিনি হরিশ্চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন :

দেখ হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্র মনোহর,
স্বদেশের শুভদানে যুক্ত কলেবর,

....

নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট দেশের কল্যাণ,
হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যায় প্রভায়,
বকুলচূড়ামণি দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর
ভারত ভরিল যশে হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়,
প্যাট্রিয়ট দেশে দেশে হল বরণীয়,

....

মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে ?

দীনবন্ধু মারা গেলেন। বঙ্গদর্শন তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পরম-বন্ধু দীনবন্ধু সম্বন্ধে কিছু লিখলেন না। বঙ্গদর্শনের পাঠক-পাঠিকারা অবাক্ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অকৃত্রিম বন্ধু দীনবন্ধুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় কিছু লিখলেন না! বঙ্গদর্শনকে বিদায় দেবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন: "আমার আর একজন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী, তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই; কেন কেহ তাহা বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাঁহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইত? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু।"

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

সকাল সকাল ডিনার খেয়ে আমরা গাইড ছেলেটীকে সঙ্গে করে পুতুলনাচ দেখতে গেলাম। এখান থেকে ওদের থিয়েটারটীর দূরত্ব প্রায় এক ফার্লং। রাত আটটার সময় শো আরম্ভ হবে তাই ধীর পদক্ষেপে আমরা এ গলি সে গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। বাইরের রাজপথের দৃশ্য বা বড় বড় সহরের ডাউনটাউনের সব জায়গাগুলো দিনের বেলা বা রাতের আলোতে কি সুন্দর দেখায়। কিন্তু সরু সরু গলির মধ্যে দিয়ে যেতে হলে অনেক জাপানী মধ্যবিত্তদের থাকবার বাসস্থান, ওদের মেয়েদের কাজকর্ম্ম বা বাড়ীর চারপাশটা আমাদের চোখে পড়ে। সাধারণ মধ্যবিত্তদের গৃহস্থদের মেয়েদের আমাদের মেয়েদের মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজ করতে দেখলাম। বাইরে বেড়াবার সময় যে সাজপোষাক তাঁরা পরে থাকেন তার চিহ্নমাত্র এখানে দেখতে পেলাম না। বাড়ীর মধ্যে চেঁচামেচি ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চীৎকার কানে শোনা গেল। জাপানী ভাষা জানি না, তাই তাদের কথা বুঝতে আমরা পারলাম না। এই চেঁচামেচিটা সংসারের ঝামেলায় পড়ে আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদের মতন বলেই আমার মনে হ'ল। রাস্তাঘাট আমাদের এখানকার চেয়ে পরিষ্কার হলেও ততটা পরিষ্কার নয়।

আমি এখানে এক বন্ধুপুত্রের কাছে শুনেছিলাম যে ট্যুরিষ্টদের শুধু ভাল ভাল জায়গাগুলোই ঘুরিয়ে দেখান হয়। জাপানে অপরিষ্কার জায়গা অনেক আছে সেগুলো তাদের দেখান হয়না। আর এদের সঙ্গে না থাকলে এদের ব্যবহার ও অতিথিসৎকারের নমুনা ভালভাবে বুঝতে পারা যায় না। ছেলেটী এখানে একটী পরিবারে পেয়িং-গেষ্ট হয়ে রয়েছে। টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স নিয়ে পড়ছে। মালয়ে এর বাপ-ঠাকুর্দ্দা মিলিয়নিয়ার। ছোটবেলা থেকেই রূপোর চামচে মুখে দিয়ে মানুষ হয়েছে। মালয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন দেশ। আর তার ওপর রবার ও টিনের জন্যে অন্যান্য দেশ থেকে খুবই ধনবান্। তারপর দেশটীতে খুবই কম লোকসংখ্যা। সেই দেশ থেকে গিয়ে ছেলেটী জাপানে বেশ অসুবিধায় পড়েছিল। তাই সে আমায় অনেক দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছিল আর তার বাবাকে এই সব কথা জানাতে বারণ করে দিয়েছিল। কারণ আমার বন্ধুটী শুনলে মনে খুব ব্যথা পাবেন তা আমি জানতাম। এই ছেলেটীই তাঁর প্রথম পুত্র।

আমরা যথাসময়ে থিয়েটারে ঢুকে আমাদের আসনে বসে পড়লাম। খুব বেশী লোক এখানে ধরে না। সামনেই ষ্টেজ রয়েছে। ড্রপসিনের ওপর হাতে আঁকা সুন্দর একটী প্রাকৃতিক দৃশ্য রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বাঁশী বাজতেই ড্রপসিনটা উঠে গেল। প্রথমেই দেখা গেল সেখানে চায়ের আসর বসে গেছে। কয়েকজন অতিথি মেঝেতে বসে আছেন আর একটী মহিলা গেইসার বেশে চা তৈরী করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একজন ঘোষক ভেতর থেকে ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় চা তৈরী করবার ইতিহাস বলে গেলেন। তারপর মহিলাটী কেমন করে চা তৈরী করবেন ও চা তৈরী হয়ে গেলে অতিথিদের কিভাবে চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেবেন তার একটা বিশদ বিবরণ দিয়ে গেলেন। যে-টুকু আমি আমার মস্তিষ্কে ধরে রাখতে পেরেছিলাম সেটুকুই আমি হোটেলে গিয়ে টুকে রেখেছিলাম।

কারণ অন্ধকারে বসে আমি খাতা কলম নিয়ে লিখতে তখন অসমর্থ হয়েছিলাম।

এদের এই চা উৎসবটী অনেক অনেক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। প্রথম এই উৎসবটী আরম্ভ হয় জাপানের প্রথম রাজধানী নারাতে (Nara)। সেই সময়টী হল ৭১০ খৃষ্টাব্দ। তখন এই নারাতেই ৭১০ সাল থেকে ৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজধানী ছিল। তারপর নারা থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে কিয়োটোতে স্থাপন করা হয়। এই সময়েই নারাতে চা পান উৎসবটি সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে প্রচলন দেখা যেত। তারপর কামাকুরাতে সাধারণের মধ্যে প্রচলন হয়। কারণ কামাকুরা তখন ছিল পূর্ব্ব জাপানের রাজধানী। এর সামরিক শাসনকর্ত্তা বা শোগুন ছিলেন আশিকাগা। এই বংশটী ১৩৩৩ সাল থেকে ১৫৭৩ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করে যান। তারপর মন্দিরের মধ্যে চা পানের উৎসব দেখা যায়। এই সময় থেকেই পুরাপুরি উৎসবটী একটী বৃহৎ আকার ধারণ করে থাকে।

দেখলাম ষ্টেজে অতিথিরা হাঁটুমুড়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের দেখলে মনে হয় যে তাঁরা যেন মন্দিরের পুরোহিতের প্রসাদ পাবার জন্যে বসে আছেন। গেইসা মেয়েটী বড় একটা পাত্রে বাঁশের তৈরী একটা বড় চামচে (এটাকে হাতা বলা যায়) করে কিছু কাঁচা চায়ের পাতা ফেলে দিলে। তারপর তার মধ্যে খানিকটা ফুটন্তগরম জল ঢেলে দিল। তারপর কয়েকটা সরুকাটি দিয়ে চা'টাকে গোলাতে লাগল। মেয়েটীর এই চা তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষকও ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় চা তৈরীর বিবরণ বলে চলেছেন। তারপর গেইসা মেয়েটী কয়েকটী বাটীতে চা ঢেলে অতিথিদের পান করতে দিল। অতিথিরা দু'হাতে করে চা পান করতে লাগলেন আর ওপর থেকে ড্রপসিন্‌টী পড়ে গেল। ঘোষক বলে দিলেন এরপর সুরু হবে ফুল সাজানোর অভিনয়। এই বিষয়ে তিনি কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিলেন।

পুষ্পসজ্জা জাপানের একান্ত নিজস্ব শিল্প বললেও হয়। অনেকে এই পুষ্পসজ্জা শিখিয়ে রুজিরোজগার করে থাকেন। তাই এই শিল্প শিক্ষার অনেক চাহিদা। জাপানের এই শিক্ষা দেবার জন্যে কয়েকশত বিদ্যালয় রয়েছে। সেখান থেকে বছরে বছরে শত শত ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করে কর্মজীবনে নামছেন। পুষ্পসজ্জা অনেক প্রকারের আছে। তারমধ্যে দু'একটা আমাদের দেখাবেন বলে ঘোষণা করলেন।

ঘোষণার পর ড্রপসিন্‌টী উঠল। দেখা গেল একটী গেইসা (Geisa) মহিলা একটী ছোট ফুলের টবের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর একজন সহকর্ম্মীনি মেয়ে একটী ছোট্ট চুবড়ি নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। চুপড়িটী কাত করে দর্শকদের সে দেখিয়ে দিলে যে তার মধ্যে রয়েছে কতগুলি ছোট বড় ডাল, বাহারে পাতা, কাঁটার ডাল ও ফুলের ডাটা সমেত কতগুলি লাল-সাদা-বেগুনে ফুল। কি ফুল ছিল তা দূর থেকে দেখতে পেলাম না। সহকর্ম্মীনি মেয়েটীর হাত থেকে এক এক করে ডাল, পাতা, ফুল নিয়ে টবটীর ওপর নিমেষের মধ্যে গেইসা মহিলা সাজিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা কাছ থেকে দেখলুম। পুষ্পসজ্জাটী দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। তারপর দেখান হয়ে যাবার পর আবার সেটাকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি সহকর্ম্মীদের হাতে দিয়ে দিলেন। আবার পরমূহুর্ত্তে তিনি ধীরে ধীরে আর এক রকমের পুষ্পসজ্জা করে দেখালেন। পর পর তিনটী পুষ্পসজ্জা দেখাবার পর ড্রপসিন্‌ পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার ঘোষক ঘোষণা করলেন যে এবার পুতুলনাচ দেখান হবে। তাই সরঞ্জামের জন্যে কিছুটা দেরী হবে বলে ঘোষক সকলের কাছে মাপ চাইলেন। তারপর পুতুলনাচের একটা ছোট্ট ইতিহাস আমাদের শোনালেন।

পুতুলনাচ বা বুনরাকু কয়েকশত বছর থেকে এদেশে চলে আসছে। যদিও ওসকাতে এর জন্যে একটা বিশেষ পুতুলনাচের থিয়েটার রয়েছে তবুও কিয়োটোর পুতুলনাচ জাপানে বিখ্যাত হয়ে আছে। জাপানীরা নাচতে ও নাচ দেখতে অতীতকাল থেকেই ভালবাসতেন।

জনসাধারণকে তাঁরা নাচ দেখিয়ে দেখিয়ে সারা জাপানে ঘুরে বেড়াত। অনেক সময় নৃত্যশিল্পীরা অসুস্থ বা অন্যকোন কারণে অনুপস্থিত হলে প্রযোজকদের মাথায় বাজ পড়ে যেত। তাই তাঁরা মানুষের মতন আকারে ছোট ছোট পুতুল তৈরী করে দর্শকদের নাচ দেখাতে লাগলেন। এই পুতুলনাচ দেখতে ছোটদের খুব ভীড় হ'ত। ছোটরা তাদের বাবা-মাদের জোর করে পুতুলনাচ দেখাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত। তাই ছেলে-বুড়ো মিলে দর্শকদের সংখ্যাও হত প্রচুর। আর প্রযোজকেরা এ থেকে খুব অর্থ উপায় করতেন। তাই মানুষের নৃত্য ছেড়ে পুতুলনাচেরই প্রবর্ত্তন করতে তাঁরা বেশী আগ্রহী হলেন। আমরা যে পুতুলগুলি দেখলাম সেগুলি কোনটা তিন ফুটের কোনটা চার ফুটের মত লম্বা। ওপরে কালো কাপড়ে সমস্ত দেহটা আচ্ছাদিত করে কয়েকজন লোক বসে রয়েছেন। তাঁদের চোখ-দুটো শুধু কালো কাপড়ের মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সুতোর বাণ্ডিল। ধীরে ধীরে বাজনা বেজে উঠলো তার সঙ্গে সঙ্গে গান। আর তারপরে এক এক করে ষ্টেজের ওপর পুতুলগুলো আসতে লাগলো। পরে গান থেমে গেল, বাজনা ও থেমে গেল। জাপানী ভাষায় পুতুল নর ও পুতুল নারী কথা কইতে আরম্ভ করলো। পুতুলগুলির হাত নড়ছে, মাথা নড়ছে, চোখ নাচছে, মুখ নড়ছে এমনকি মাথার চুলগুলো মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে যাচ্ছে আবার এদিকে ঘুরছে ওদিকে ঘুরছে। নারী পুতুলটী নর পুতুলটীর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল, ঝাঁটা হাতে তাকে মারতে গেল। নর পুতুলটী প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। তারপর আর একটা নারী পুতুল এসে তার সঙ্গে বিবাদ সুরু করে দিল। চেঁচাতে চেঁচাতে দু'জনে হাতাহাতি সুরু হয়ে গেল। দু'জনেই আহত হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। ড্রপসিন্ পড়ল। ঘোষক ঘোষণা করে বললেন যে একটা স্বামীর দুটী বউ স্বামীকে নিয়ে এদের মধ্যে মারামারি হ'ল ও দুজনেই আহত হয়ে মূর্ছা গেল।

এরপর অনেকগুলি ছোট ছোট কাহিনী অবলম্বনে পুতুলগুলি অভিনয় করে গেল। এই প্রথম আমি পুতুল-নাচ দেখলাম। পূর্ব্বে কখনও পুতুলনাচ দেখার আমার সৌভাগ্য হয়নি। পুতুলনাচ আমাদের খুব ভাল লাগল। ঘোষক শেষে আবার পুতুলনাচের বিষয়ে কয়েকটী কথা বলেন। আমরা যে এইমাত্র পুতুলনাচ বা এর জাপানী নাম বুনরাকু (Bunraku) দেখলাম তা খুবই পরিশ্রমের কাজ। এক একটী পুতুলকে চালনা করতে তিনটী লোকের দুটী হাতের সব সময় প্রয়োজন হয়েছিল। এই সব লোকগুলিকে পুতুলনাচে খুবই দক্ষতা অর্জন করতে হয় তা না হলে তাঁদের ষ্টেজে খেলা দেখাতে নেওয়া হয় না। তঁরা বাল্যকাল থেকেই পুতুলনাচের স্কুলে হাতেকলমে শিক্ষা নিয়েছেন। কয়েক হাজার লোক এই পুতুলনাচ দেখিয়ে সংসার নির্ব্বাহ করে থাকেন। সুষ্ঠুভাবে খেলা দেখাবার জন্যে আমরা সকলে তাঁদের ধন্যবাদ দিলাম। তারপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমাদের জানালার ধার থেকে রাস্তার ধারের ছোট্ট দোকানটীকে আমি এখনও ভুলিনি। ওসাকার (Osaka) তরমুজ খেয়ে আমাদের লোভটা খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাই ফেরবার সময় তরমুজের বাজারটী দেখে আমাদের তরমুজ খাবার খুব লোভ হয়েছিল। তরমুজটীকে কাটবার জন্যে ছুরি আমাদের ব্যাগেই রয়েছে কিন্তু কেটে খেয়ে এর আবর্জনাগুলো ফেলবো কোথায় তারই ভাবনা হল। জানলা গলিয়ে রাস্তার ওপর আবর্জ্জনাগুলো কলকাতার হ্যারিসন রোডের ধারের বাড়ীর লোকের ঘাড়ে ওপরতলাগুলো থেকে ফেলা যায় তা দেখেছি কিন্তু কিয়োটোর হোটেল থেকে (যদিও রাস্তাটা হোটেলের পাশ দিয়ে গেছে) তরমুজের আবর্জ্জনা ফেলতে পারা যায় না। কারণ ধরা পড়লে বেশ কয়েক হাজার ইয়েন আমাদের ফাইন হয়ে যাবে তা পূর্ব্বে থেকেই গাইড আমাদের সাবধান করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা টিনের ডাষ্টবিন রয়েছে দেখতে পেলাম। একটা

কাগজ যোগাড় করে তার মধ্যে আবর্জ্জনাটা মুড়ে ঐ ছোট্ট ডাষ্টবিনে ফেলে দেব ঠিক করলাম। কিন্তু অতবড় আবর্জ্জনার বাণ্ডিল যে ওর মধ্যে স্থান হবে না তাও বুঝতে পারি। ওটার মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজ আর সিগারেটের টুক্‌রো ফেলবার জন্যে ওটা রাখা হয়েছে। কিন্তু তত্রাচ আমরা তরমুজ খাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। স্ত্রীকে ঘরে বসিয়ে আমি নীচে চলে গেলাম। তরমুজের দোকানীকে আকার ইংগিতে হলদে কুমড়োরমত তরমুজ কিনতে চাইলাম। সে জাপানী ভাষায় কয়েকটা কথা বলে ঐ কাল তরমুজগুলো দেখিয়ে দেয়। আমি তখন বুঝলাম যে আমার চাহিদা ওর কাছে নেই। তাই একটী ছোট তরমুজ কয়েক ইয়েন দিয়ে কিনে নিয়ে এলাম। এর দাম পড়ল প্রায় মালয়ী ২টী ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশের তিন টাকার ওপর। তার কাছ থেকে একটী খবরের কাগজও চেয়ে নিয়ে এলাম। কাগজটীতে মুড়ে তরমুজটী বগলদাবা করে ঘরে এসে ঢুকলাম। আমার স্ত্রী জানালা দিয়ে আমার কেনাকাটা দেখে হাসছিলেন তা ঘরে এসে বুঝতে পারলাম। তিনি ছুরিটী ধুয়ে রেখেছিলেন। আমি যেতেই কলের জলে তরমুজটি ধুয়ে সেটিকে দু'খানা করা হ'ল। তরমুজের ভেতরটা টকটকে লাল। খানিকটা কেটে মুখে পুরলাম, কি, মিষ্টি! দু'জনে মিলে আধখানার বেশী খাওয়া গেলনা। তাই আধখানা তরমুজ ও খোলাগুলো কাগজে মুড়ে ঐ ছোট্ট ডাষ্টবিনে গুঁজে গুঁজে রেখে দিয়ে বিছানা নিলাম।

পরদিন ভোর বেলায় আমাদের ব্রেকফাষ্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কিয়োটোর কয়েকটি স্থান দেখে আমরা নারা অভিমুখে যাত্রা করবো।

আমরা কিয়োটো হোটেল থেকে টুরিষ্ট-বাসে করে Sanjusangendo মন্দিরের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। এর মধ্যে ১০০১টি দেব-দেবীর মূর্ত্তি রয়েছে। আমরা এই মন্দিরের দেব-দেবী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে একটি দেবীমূর্ত্তির অনেকগুলি হাত রয়েছে দেখতে পেলাম। মন্দিরের পুরোহিত আমাদের জানালেন যে এই দেবী খুবই শক্তিশালিনী, এঁর এক-হাজার হাত আছে। আমাদের হাত গোনবার সময় ছিলনা তাই সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কয়েকটি ইয়েন প্রণামী দিয়ে আমরা অন্য দেব-দেবীদের দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড হলঘরটি সব জাপানী দেব-দেবীতে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে। এইটী কিয়োটো সহরের সবচেয়ে পুরানো মন্দির। মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। তারপর আমরা পুরানো রাজপ্রাসাদের দিকে চল্লাম। রাস্তায় বেশ ভীড়, দু'পাশে সার সার দোকান অফিস রয়েছে। রাস্তার বাঁপাশে কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকায় কয়েকটি ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর রয়েছে। সেখানে সবকিছুই কিনতে পাওয়া যায়। কতগুলি ছোট বড় মন্দির পার হয়ে জাপান এয়ারলাইন্সের অফিসটি বাঁদিকে রেখে আমরা পুরাতন রাজপ্রাসাদের কাছে এসে পৌছলাম।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে Oda Nobunaga ও Toyotomi Hideyoshi এই প্রাসাদটি তৈরী করেছিলেন। এই জায়গাতেই ১৩৮২ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত সম্রাটদের বাসস্থান ছিল। এরমধ্যে একটি বড় হলঘর রয়েছে সেখানে সম্রাটদের প্রথম অভিষেক উৎসব ও অন্যান্য উৎসবও সম্পন্ন হত। এই প্রাসাদটি বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী হয়েছিল। প্রথম যখন এটি তৈরী হয় তখন শ্রমিকরা ঐসব গাছের গুঁড়িগুলো শনের মোটা মোটা দাড় দিয়ে বেঁধে প্রাসাদটি তৈরী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সব সময় শনের দাড়গুলো ছিঁড়ে গুঁড়িগুলো নীচে পড়ে যেত। কয়েক-বার অকৃতকার্য্য হ'লে তারা কর্ম থেকে বিরত হয়। তখন জাপানী স্ত্রীলোকেরা তাঁদের মাথার বড় বড় চুলগুলো এই প্রাসাদ তৈরী করবার জন্যে দান করেন। সেই চুল দিয়ে দাড় তৈরী করা হয়, তারপর এই প্রাসাদটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। আমরা কোথায় চুলের দাড়িদিয়ে বাঁধা গাছেরগুঁড়ি দেখতে পেলামনা। এটা মনে হয় একটা কিম্বদন্তী। অনেক জাপানী জনসাধারণ এসে এটিকে প্রণাম করলো দেখলাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর কোন ক্ষতি হয়নি। ১৮৬৭ সালে সম্রাট Meiji এখান থেকে রাজধানী উঠিয়ে টোকিওতে নিয়ে যান।

এরপর আমরা একটি জায়গায় এলাম। সেখানে বেশ কয়েকটি বাগানঘেরা মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে কিন-কাকুজীর মন্দিরটা সবচেয়ে বড়। একে স্বর্ণ-মন্দিরও বলা হয়। এটি একজন শোগুনের থাকবার জন্যে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়। এখানকার মন্দিরটির প্রায় সব জায়গাটাই সোনারপাতে মোড়া রয়েছে দেখলাম। এখন যেটি রয়েছে সেটি পুরানোটার মতন তৈরী করা হয়েছে। পুরানো মন্দিরটি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অগ্নিতে ভস্মিভূত হয়ে যায়। এই বাগানের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট পুকুর রয়েছে আর রয়েছে নানারকমের বড় বড় বৃক্ষ, চেরীবৃক্ষ ও অন্যান্য পুষ্পবৃক্ষ। এই বাগানটি ঘুরতে আমাদের বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট সাঁকো রয়েছে। সেই সাঁকো দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটি সাধুর আশ্রম পেলাম; অনেকে তাঁদের হাত দেখাচ্ছেন দেখলাম। আমরা এত ক্লান্ত যে ওদিকে আর নজর দিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করলাম না। আমরা সটান বাসে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। এই জায়গাতে ঢুকতে দর্শনী দিতে হয়। আমাদের দলটা একটু পরে বাসে এসে ঢুকতেই বাসটি ছেড়ে দিল। এই বাগানের অনেক দৃশ্য আমি মুভি ক্যামেরায় ধরে রেখেছি। মিঃ চেং ও তাঁর দ্বিতীয় বধূটির ছবি আমাদের ক্যামেরায় বেশ ভালভাবেই ধরা পড়েছিল। আমরা এই কিনকাকুজি মন্দিরটি দেখে পাশের Ryoanji-র রূপালী মন্দিরটি আর দেখলাম না। দূর থেকে দেখেই আমরা হোটেলে চলে এলাম। এখানে আমরা দুপুরের খাওয়াটা সেরেই নারা দেখতে বেরিয়ে যাব। নারাতে অনেক জিনিষ দেখবার আছে।

আমরা লাঞ্চ খেয়েই নারা সহর দেখবার জন্যে বের হয়ে পড়লাম। Kyoto ওসাখার উত্তর-পূর্ব্বে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর নারা ওসাখার পূর্ব্ব-দিকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে। তাই কিয়োটো থেকে এর দূরত্ব একটু বেশী। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে করে নারা সহরে এসে উপস্থিত হলাম। সহরটি খুব সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। আমরা প্রথমেই টোডাইজী মন্দিরটি দেখতে গেলাম। এই মন্দিরটি নারা সহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এদিকে Nigatsudo ও Shoso-in মন্দির দুটো রয়েছে। এখান থেকে সুদূর উত্তরে Wakakusa পর্ব্বতটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পর্ব্বতের চূড়া থেকে নারা উপত্যকা একটি সুন্দর ছবির মত দেখায়।

আমরা টোডাইজী মন্দিরের ফটকটি পার হয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। শতশত তীর্থযাত্রী এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ দিয়ে মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ আকারের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখতে চলেছেন। আমরা প্রথমে মন্দিরটির ফটো নিলাম। গাইডটি আমাদের প্রত্যেককে অট্টালিকার ও বুদ্ধের মূর্ত্তির সমস্ত বিবরণের একটি ছোট প্যাম্পলেট আমাদের হাতে পড়তে দিল। এই প্যাম্প-লেটটি প্রত্যেক টিকিটের সঙ্গে একটিকরে দেওয়া হয়েছে।

অট্টালিকার পূর্ব থেকে পশ্চিমের সামনের দিকের মাপ ১৮৭·৩৪ ফুট দক্ষিণ থেকে উত্তরের গভীরতা ১৬৫·৮৩ ফুট আর এর উচ্চতা হচ্ছে ১৫৮·৮৫ ফুট।

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে প্রকাণ্ড বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটিকে দেখতে পাওয়া গেল। মূর্ত্তির সামনে পুরোহিত রয়েছেন। থালায় অনেক ইয়েন পড়ে আছে। মূর্ত্তিটির পায়ের কাছে অসংখ্য ধূপ জ্বালা রয়েছে। সেই সব ধূপগুলি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে সমস্ত ঘরটাকে গন্ধে আমোদিত করে রেখেছে। নীচে থেকে মাথা উঁচু করে হেলিয়ে তবে আমরা বুদ্ধদেবের শান্ত মুখটি দেখতে পেলাম মূর্ত্তিটির দেহের উচ্চতা ৫৩·২৮ ফুট, মুখটির দৈর্ঘ্যের মাপ ১৫·৯১ ফুট, আয়ত চক্ষুর দৈর্ঘ্যের মাপ ৩·৮৮ ফুট, নাসিকার মাপ ১·৫৯ ফুট, কর্ণের মাপ ৮·৪৬ ফুট ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাপ হচ্ছে ৫·৩৭ ফুট।

আমরা ভেতরে গিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

বুদ্ধদেব আসনে বসে সমস্ত জগতকে হাত তুলে অভয় দান করছেন। তাঁর মাথার চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট বুদ্ধের মূর্ত্তি রয়েছে। সামনে ছিল অনেক বাতি-দান আর অজস্র ফুলের মালা আর ফুল। এই মূর্ত্তিটি ও মন্দিরটি নারা যুগে তৈরী হয়েছিল (Nara Period)। কেউ বলেন এটি তৈরী হয়েছিল ৭৫২ খৃষ্টাব্দে আবার কেউ বলে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে। এটি জাপানের সমস্ত কেগন সম্প্রদায়ের (Kegon sect) প্রধান মন্দির। এই মন্দিরকে জাপানীরা Daibutsu-den বলে অভি-হিত করে থাকেন, আর মূর্ত্তিটিকে বলেন Daibutsu। এই ডাইবুটসুই হচ্ছেন বুদ্ধদেব। যিনি কেগন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়টী মনে করেন যে পৃথিবীতে যা কিছু জিনিষ রয়েছে এমনকি সূর্য্য দেবতা পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁদের দেবতা বুদ্ধদেব পৃথিবীতে আনয়ন করেছেন।

বুদ্ধদেবের স্বর্গ মর্ত্তে স্থাপন করবার জন্যে সম্রাট সোমু (Shomu) ১২০০ বছর পূর্ব্বে কয়েকজন সাধুর সাহায্যে এই মন্দির তৈরী করেছিলেন। এই বিখ্যাত সাধুগুলির নাম Ryobn, Gyogi ও Baramon। এ মন্দিরের পাশে তাঁদের ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে জাপানের জনসাধারণ ও জাপানের বাইরে অন্যদেশের জনসাধারণেরা এই মন্দির তৈরী করবার জন্যে সকলে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন।

এই অট্টালিকাটি তৈরী হবার পর দু' দু'বার অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রথমে যেটি ছিল সেটি অনেক অনেক বড় ছিল। এখন যেটি রয়েছে এটি পূর্ব্বেকার মন্দিরের অপেক্ষা চল্লিশ ভাগ ছোট। ভেতরের বুদ্ধ মূর্ত্তিটিকে মধ্যে মধ্যে সারানো হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি সবটাই দারুনির্ম্মিত। পৃথিবীর মধ্যে এই দারুনির্ম্মিত মন্দিরটি আর এর ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তিটী সবচেয়ে বড় বলে এখনও লোকে জানে। গরীব ও ধনী জাপানীদের কাছে এই মন্দিরটা খুবই প্রিয়।

এই মন্দিরটি দেখে আমরা যাত্রীদের সঙ্গে ফিরলাম। এই মন্দিরের মধ্যে এত সেদিন যাত্রী হয়েছিল যে ভিড় ঠেলে ফিরে আসতে আমাদের সেদিন বেশ কষ্ট হয়ে-ছিল। আমি দূর থেকে মুভিতে ফটো তুলছি আর আমার স্ত্রী একটী রঙিন শাড়ী পরে মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যেদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছেন দেখে অনেক জাপানী মহিলারা তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। তাঁকে জাপানীভাষায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছেন দেখতে পেলাম। আমি এই দৃশ্যটিকে মুভিতে ধরে নিলাম। পরে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

আমরা এবার হাঁটতে হাঁটতে নারা উদ্যানের দিকে চলতে লাগলাম। সঙ্গে চলেছে অনেক জাপানী তীর্থ-যাত্রীর দল। অনেকে এরমধ্যে কিছু কিছু ইংরাজী জানেন। একজন জাপানী ঐতিহাসিকের সঙ্গে ভাগ্য-ক্রমে আমাদের এই পথের মধ্যে দেখা হয়েগেল। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন "আপনারা স্বামী-স্ত্রী মহান্ ভারতবর্ষ বুদ্ধের জ্ঞানপীঠ থেকে আসছেন?" উত্তরে বললাম "ঠিক জ্ঞানপীঠ বলতে যা বোঝায় সেখান থেকে নয়। আমরা আসছি কলকাতা থেকে। বুদ্ধের জ্ঞানপীঠ বৌদ্ধগয়ায়। আমাদের কলকাতা থেকে বেশ অনেকটা দূরে।"

"আপনারা যেখান থেকেই আসুন না কেন আপনি সেই মহান্ ভারতথেকেই আসছেন। আপনি ভারতীয়।" "হ্যাঁ আমরা ভারতীয়। এতবড় বৌদ্ধমূর্ত্তি কি পৃথিবীর আর কোথাও নেই?" তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন "না কোথাও নেই। তবে ব্যাঙ্ককে দু' এক-জায়গায় বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে বইয়ে পড়েছি।"

আমি তাঁকে বল্লাম "আমি ব্যাঙ্ককে দুটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখেছি। একটির নাম নিদ্রিত বুদ্ধ আর অপরটির নাম দণ্ডায়মান বুদ্ধ। নিদ্রিত বুদ্ধমূর্ত্তিটি একটি মন্দিরের মধ্যে শায়িত রয়েছেন আর অপরটি খোলা মাঠের মধ্যে দণ্ডায়মান রয়েছে। তবে এতবড় বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানেও নেই"। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন "আপনি ব্যাঙ্ককেও গিয়েছেন?" উত্তরে বল্লাম "মালয়দেশে ডাক্তারী করি। কলকাতাতে প্লেনে করে গেলেই,

প্রত্যেকবারই আমাদের ২৪ ঘণ্টা করে ব্যাঙ্ককে থেমে যেতে হয়। কারণ কোয়ালা-লামপুর থেকে সোজা কলকাতা যাবার প্লেন নেই। বারকয়েক ব্যাঙ্ককে আমাদের থাকতে হয়েছিল, তাই ব্যাঙ্ককের সমস্ত মন্দির আমরা দেখেছি।"

তিনি আমার কথা শুনে বল্লেন "আপনার বড় ভাগ্যবান।" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি "এই মন্দিরটি কি জাপানের নিজস্ব কীর্ত্তি না অন্যদেশের কোন মন্দির দেখে এসে এখানে তৈরী করা হয়েছে?" "এর ইতিহাস কিছু আছে তা না শুনলে নারাকে জানা যায় না।" বলে তিনি এর কিছু ইতিহাস আমায় শোনালেন। আমার স্ত্রীটি তখন নারা পার্কের কাছাকাছি চলে গেছেন তাঁর সঙ্গে চলেছেন আমাদের দলটি। স্বামীটি যে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে পেছনে পেছনে গল্প করতে করতে আসছেন তা তিনি জানেন।

তিনি গল্প আরম্ভ করলেন "তেরশ বছর আগে বেশ একটি বড় জাপানী পণ্ডিতের দল চীনদেশে যান। সেখানে গিয়ে চীনদেশের Loyang সহরটি দেখে তাঁরা অবাক্ হয়ে গেলেন। সেই সময় চীনে Tang রাজত্ব চলছে। সেই সময়কার সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার এঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। চীনারা তখন রীতিমত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। আমাদের পণ্ডিতেরাও সেই ধর্মে দীক্ষিত হলেন। চীনাদের সবকিছু ভালভাল আদর্শ নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন। বেশ কয়েকবছর পরে তাঁরা নিজেদের দেশে ফিরে এসে জাপান সম্রাটকে সমস্ত কথা জানালেন। সম্রাট সমস্ত বিবরণ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন নারাকে Loyangএর মতন করে তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। এই সহরটা তৈরী করতে অনেক বছর তাঁর লেগেছিল। যখন তৈরী শেষ হল তখন চিনতেই পারা গেল না এটি জাপানের নতুন সহর না Tang রাজত্বের রাজধানী Loyang সহর। Loyang সহরটি বহুবছর পূর্ব্বে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কিন্তু নারার মন্দিরগুলো এখনও সেই সময়কার স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এখান থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে Horyuji মন্দিরটা খুবই পুরানো। এটা তৈরী হয়েছিল ৭০০ খৃষ্টাব্দে। এটিও একটি Tang স্থাপত্যের নিদর্শন।"

আমি পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "বুদ্ধের মূর্ত্তিটি সবই ব্রোঞ্জধাতু দিয়ে তৈরী হয়েছে শুনলাম। এত ব্রোঞ্জধাতু জাপানে তখন ছিল?"

"এই বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরী করতে প্রায় এক মিলিয়ান পাউণ্ড ব্রোঞ্জধাতু লেগেছিল; এই ধাতু চীনদেশ থেকেই বোধহয় আনা হয়েছিল, ইতিহাসে তা লেখা নেই।" বৃদ্ধটী আরও কিছু বলবার জন্যে ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু আমার স্ত্রী এসে ডাকতেই আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাতে হ'ল। আমরা ডিয়ার পার্কের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। উনি চলে যেতে স্ত্রীটীর বেশ মুখ ভার দেখলাম। তাঁকে দলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আমি এতক্ষণ যে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছিলাম তার জন্যেই তাঁর এত অভিমান। হরিণদের জন্যে অনেক বিস্কুটের দোকান এখানে রয়েছে দেখলাম। সেখান থেকে বেশ কয়েকটা বিস্কুট কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লাম "তুমি হরিণগুলোর মধ্যে ঢুকে ওদের খেতে দাও আর আমি তোমার কয়েকটা ছবি সেই সময় তুলে ফেলি।" পার্কে অনেকগুলি শিংওয়ালা হরিণ চরছিল। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ওদের খেতে দিচ্ছে, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দেখতে পেলাম। আমার স্ত্রীর একটু ভয় বেশী। তিনি ওদের মধ্যে ভয়ে যেতে চাইছিলেন না। প্রায় ওঁকে জোর করেই হরিণ-দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি দূরে সরে গিয়ে ফটো তুলতে আরম্ভ করলাম। জাপানী স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ের দলে সেখানটা ভীড়ে ভীড়। তাঁরাও আমার স্ত্রীর অনেকগুলো ছবি তুলে নিলেন। শাড়ীপরা স্ত্রী-লোক ওঁদের কাছে খুবই নতুন তাই অনেকগুলো ক্যামেরা ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ করে ওঁরা একসঙ্গে ওঁনার ছবি তুলে নিলো। আমার ছবি নেবার আগ্রহ ওঁদের দেখলাম না। মিঃ চেং ও তাঁর যুবতী স্ত্রী তাঁরাও একটী হরিণের কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ফটো নিতে বল্লেন।

ছেলেটী বাবার ও সৎমায়ের ছবি নিয়ে পরে মা ও বোনের ছবি নিল। আমি ছেলেটীর ছবি তুলে দিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য এই মিঃ চেং, ওঁর লজ্জাঘেন্নার কোন বালাই নেই। প্রথমপক্ষের স্ত্রীটী অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঘুরছেন। এই ডিয়ার পার্কে প্রায় শ'খানেকের বেশী হরিণ ছাড়া থাকে। এখানেই তাদের বাচ্চা হয়, এখানেই সেই বাচ্চারা বড় হতে থাকে। এই হরিণের কেউ কোন ক্ষতি করলে তাকে রীতিমত শাস্তি পেতে হবে সরকার থেকে এই আইনটী বলবৎ আছে।

এরপর আমরা অনেক বছরের পুরানো মন্দির নিশিওনোকিও (Nishionokyo) মন্দিরটী দেখতে গেলাম। আসুকাতে সম্রাট Temmu ৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটী তৈরী করেন। পরে যখন আসুকা থেকে ৭১০ সালে তিনি নারাতে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন তখন তিনি সেই মন্দিরটীও সঙ্গে করে আনেন। পূর্ব্বেকার মন্দিরটীর নাম ছিল Yakushiji মন্দির। এখন সেখানে একটী ত্রিতল প্যাগোডা শুধু রয়েছে। এটী দেখে আমরা Sarusawa পুষ্করিণীটীর দৃশ্য দেখলাম। এর অপর পাড়ে রয়েছে একটী পাঁচতলা সুন্দর প্যাগোডা। এটীর নাম Kofukuji মন্দির। এটী তৈরী হয়েছিল ৬১৪ থেকে ৬৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সেই সময় Fujiwara family এটীকে তৈরী করেছিলেন। এই ফ্যামিলিটী আর একটি মন্দির Kasuga পর্বতের তলায় তৈরী করেছিলেন সেটির নাম Kasuga মন্দির। সপ্তদশ শতাব্দীতে এঁরা দেশের রাজনৈতিক জীবনের অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের হাতে আর সময় নেই বলে গাইড আমাদের সকলকে জানিয়ে দিল। আমাদের এখান থেকে সটান ওসাখা বিমানবন্দরে গিয়ে বিমান ধরতে হবে। সেই বিমানে করে আমাদের টৌকিও যেতে হবে। নারা থেকে ওসাখা বিমানবন্দর প্রায় ৫০ কিলোমিটার হবে। তাই আমরা আমাদের বাসে উঠে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে আমরা খুব ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। বাসে এসে বসতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নারাকে বিদায় জানালাম। এর স্মৃতি আমার ক্যামেরায় ধরে নিয়ে চলেছি। বিদায় নারা বিদায়, আর বিদায় জানালাম Todaiji মন্দিরের বিরাট বুদ্ধকে।

রাত্রের প্লেনে ওসাখা থেকে আমরা টৌকিও বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলাম। এখানকার টুরিষ্ট অফিসের বাসে করে এখানকার কর্মচারী আমাদের টৌকিওর শিবা পার্ক (Shiba Park) হোটেলে নিয়ে তুললেন। এই হোটেলে ২২০টি ঘর আছে। বেশ বড় হোটেল। এরমধ্যে আবার চাইনীজ রেষ্টুয়ারেন্টও আছে। এটি Shiba Park এর নিকট অবস্থিত। এখান থেকে Downtown (সহর) পাঁচমিনিটের রাস্তা। আমরা দু'জন থাকবার মত একটি ঘরে এসে ঢুকলাম। মিঃ চেং তাঁর যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে সটান আর একটি ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রৌঢ়া স্ত্রীটী আর ছেলেমেয়ের কোন খোঁজ নেবারই তাঁর দরকার হ'ল না। যুবতী স্ত্রীটির প্রেমের টানে ভদ্রলোককে নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে দেখে আমার একটি গানের কলি মনে পড়ে গেল "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে কোথায় নে যায় কে জানে, ওঠা নামা প্রেমের তুফানে।" বাথরুম থেকে স্নান সেরে আমরা ডাইনিং রুমে গিয়ে খেতে বসলাম। দলের প্রায় সকলেই এসেছেন। মানিকজোড়টি ঘরের এককোণে বসে আহারে ব্যস্ত। খুব ভাল খাবার আমাদের পরিবেশন করে গেল। সবই ইংরাজী খানা। বিফের বদলে আমাদের দু'জনের পাতে পড়ল মুরগীর মাংস। সারাদিনের পর খুব খিদেও পেয়েছিল। পেটভরে খেয়ে রবারের কোমল বিছানায় শুয়ে পড়তেই আমরা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

ভোর হতেই মুখ হাত ধুয়ে আমাদের সকালের প্রাতঃভোজন সারার পর গাইড ছেলেটি আমাদেরUeno park-এর ধারে নিয়ে এসে তুলল। বাসটি বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমরা সকলে বাগানের মধ্যে ঢুকলাম। এদিকে বাতাসের বেগ এত বেশী প্রবল যে আমার স্ত্রীর পরণের কাপড় দেহে রাখাই দায় হয়ে উঠল। ভালকরে কোমরে জড়িয়ে তবে তিনি

বেঁচাই পেলেন। শাড়ীর একটা অংশ হাওয়ার ধাক্কায় ফেটে গেল। এরকম হাওয়ার মুখে আমরা কোনদিনই পড়িনি। পুলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটী জাপানী ভদ্রমহিলা তাঁর কন্যাকে আমার স্ত্রীর কাছে দাঁড় করিয়ে একটা ফটো নিলেন। আমিও মেয়েটীর একটি ফটো নিলাম। পরে হাসিমুখে দু'জন দু'জনকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। মনেহয় আমার স্ত্রীর ফটো অনেকের ঘরে ঘরে আজ টাঙ্গানো রয়েছে। শাড়ীপরা মহিলা এখানে দুর্লভ। Meiji Revolution এর একজন বিখ্যাত নেতা Saigo Takamori মর্ম্মরমূর্ত্তি এই উদ্যানে রয়েছে। এর মধ্যে চিড়িয়াখানা রয়েছে। চিড়িয়াখানাটি দেখে আমরা দু'জনে মনোরেলে উঠলাম। এই উদ্যানটি ঘুরতেই আমাদের অনেক সময় লেগে গেল। এই পার্কটির মধ্যে রয়েছে এদের জাতীয় মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারী পাশ্চাত্য-শিল্পের একটী যাদুঘর, জাপান একেডেমি আর বিজ্ঞানের একটি মস্তবড় যাদুঘর। এরমধ্যে রয়েছে চেরী-বৃক্ষের সার বসন্তকালের একটি মস্ত আকর্ষণ। তারপর লাঞ্চ খেয়েই আমরা টোকিও টাওয়ারের দিকে চললাম। তার ওপর উঠে আমরা সারা টোকিও শহরটিকে দেখবো। এই Towerটি শিবা পার্কের মধ্যেই অবস্থিত। এর উচ্চতা ১০৫৫ ফুট। এরমধ্যে টেলিভিসনের সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে। এই Tower থেকেই সারা জাপানে টেলিভিসনের ছবিগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ওপর লিফটে করে উঠতে হয়। ওরজন্যে প্রবেশপত্র কিনতে হয়। জন প্রতি বড়দের লাগে ১৫০ ইয়েন, ছোটদের লাগে ৬০ ইয়েন। এখানে এত লোকের ভীড়ে যে আমাদের সকলকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ওপরে উঠে গেলাম। অনেক গুলি লিফট এখানে রয়েছে। সেগুলি সবসময়েই ওঠানামা করছে। ওপরে উঠে মুভি ক্যামেরাতে পুরো একটা রিল ছবি তুললাম। দূর থেকে ওদের পার্লামেণ্টের বাড়ীটি (Diet) দেখলাম। এই বাড়ীটি Kasumigaseki পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এর মাথার চূড়া বহুদূর থেকে দেখা যায়। এটি তৈরী হয় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। তৈরী করতে ১৮ বছর লেগেছিল। এর ডানপাশের অর্দ্ধেক বাড়ীটা Upper House এর জন্যে আর বাঁ-পাশের অর্দ্ধেকটা Lower House এর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দর্শকেরা দর্শকদের গ্যালারী থেকে বসে পার্লামেণ্টের অধিবেশনের কাজকর্ম দেখতে পারেন। এর জন্যে প্রবেশপত্র লাগে। প্রবেশপত্রটি পার্লামেণ্টের মেম্বারদের কাছ থেকে, অন্যান্য এমব্যাসি থেকে কিংবা বিদেশী সংস্থা থেকে পাওয়া যায়। একটু দূরে রাজার প্রাসাদ রয়েছে কিন্তু ওপর থেকে গাছের আড়ালে তা দেখা যায় না। প্রাসাদটি এমনভাবেই তৈরী করা হয়েছে যে ওপর থেকে কেউ প্রাসাদের কোন অংশ দেখতে পাবে না। ঐ রাজপ্রাসাদে জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বংশপরম্পরায় ১৮৬৯ সাল থেকে বাসকরে আসছেন। ঐ সময়েতেই কিয়োটো থেকে রাজধানীটি টোকিওতে সরিয়ে আনা হয়। এখনকার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নতুন একটি প্রাসাদে বাস করছেন। এটি তৈরী হয় ১৯৬১ সালে, এটির নাম Fukiage প্রাসাদ। পুরানো প্রাসাদটি দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় অগ্নিবোমাতে ধ্বংস হয়ে যায়।

এই প্রাসাদটি দেখবার জন্যে বছরে দু'বার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক বছরের ২রা জানুয়ারী ও সম্রাটের জন্মদিনে (২৯শে এপ্রিল)। অন্যান্য দিন বিদেশী টুরিষ্টরা অনুমতি নিয়ে প্রাসাদের একটি অংশে ঢুকতে পারেন।

Towerটীর পাদদেশে রয়েছে একটি পাঁচতলা অট্টালিকা। সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি যাদুঘর রয়েছে। ওপর থেকে প্রশান্তমহাসাগরের নীল-জলরাশি আমাদের চোখে পড়ে। নীচের দিকে অসংখ্য যানবাহন চতুর্দ্দিকের বড় বড় রাজপথ দিয়ে চলতে দেখা গেল। আমরা টোকিও সহরটির অগণিত অট্টালিকা আর তারমধ্যে সুন্দর সুন্দর উদ্যানগুলি দেখে মুগ্ধ হলাম। মাইলের পর মাইল ধরে সহরটি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে কোথাও কোন একটা ফাঁক দেখতে পেলাম

না, এক প্রশান্তমহাসাগরের দিক্‌টা ছাড়া। ওপরেই অনেককিছু কিনে খাওয়া যায়। ওপরের চাতালটা সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছেড়েফেলা বাদামের খোলা, ভয়মুজাবিচির খোলা, কাগজের ঠোঙা আর আইসক্রীমের পাতলা কাঠগুলোতে সব ভরা। আমাদের চোখে বেশ নোংরা লাগল। ওখানে একটা কোণে ডাষ্টবিন্ থাকা সত্বেও ছেলেমেয়ের দল এদিক ওদিক নোংরা কাগজ-গুলো ছড়িয়েছে। প্রত্যেক তলাতে বাথরুম রয়েছে। বেশীর ভাগ স্কুল থেকে এইসব ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে। সঙ্গে আছে ওদের শিক্ষক বা শিক্ষিকার দল। এখানে এসে এরা প্রচুর আনন্দ পায়। টাওয়ারের ওপরটা সব কাঁচদিয়ে বন্ধকরে দেওয়া হয়েছে তবে মাঝে মাঝে কাচের মধ্যে কয়েকটা গর্ত রয়েছে। অনেকগুলি টেলিস্কোপ এর মধ্যে রয়েছে টৌকিও সহরটি দেখবার জন্যে। আমরা ঠিকমত ঘুরিয়ে দেখতে পারলাম না। খালি চোখেই ওপর থেকে আমরা সহরটার চারদিক দেখলাম। বেশকিছুক্ষণ এখানে থাকবার পর আমরা টাওয়ার থেকে নেমে এলাম। প্যারিসের টাওয়ারের নকল করে এরা এটা তৈরী করেছে শুনলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের ওঠা হ'লনা তাই এখানে উঠে দুধের স্বাদ আমরা ঘোলে মেটালাম। প্যারিসের টাওয়ারের চেয়ে এটার উচ্চতা বেশী।

আমরা বিকালের দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। ডিনার খেয়ে আমরা আজ কাবুকি থিয়েটার দেখতে যাব বলে মনস্থ করেছিলাম। এই থিয়েটার দেখবার খরচ আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। গাইড আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তার সমস্ত খরচ আমরা সকলে চাঁদা তুলে দেব ঠিক হ'ল। এই কাবুকী থিয়েটারটীতে (Kabukiza কাবুকিজা) জাপানের প্রাচীন সাহিত্য থেকে নাটক তৈরী করে দেখান হয়ে থাকে। এটা নূতন করে তৈরী হয় ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের তৈরী পুরানো কাবুকী থিয়েটার এখানেই ছিল। গত মহাযুদ্ধে সম্রাটের প্রাসাদের সঙ্গে এটাও আগুনে বোমায় ধ্বংস হয়ে যায় পরে নতুন বাড়ীটা তৈরী হয়েছে। তৈরীর খরচ প্রায় সবটাই জন-সাধারণের কাছ থেকে এসেছে। এটা তৈরী করতে খরচ পড়েছে ২৮১ মিলিয়ান ইয়েন। এটা Marunouchi Nihombashi-তে Showa Dori আর Harumi Doriর সংযোগস্থলে অবস্থিত। গাইডটী বল্লে যে জাপানে দু' রকম নাটক অভিনয় হয়ে থাকে। একটী নো (No) নাটক আর অপরটী কাবুকী (Kabuki) নাটক। জাপানের শতকরা ৮০টা রঙ্গমঞ্চে এই 'নো' (No) নাটক এখনও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। এই নাটকে পুরাতন জাপানী ভাষা ব্যবহৃত হয়। অভিনেতারা খুব ধীরে ধীরে তাদের কথাগুলি উচ্চারণ করে থাকে। কিমানো-পরিহিত অসুস্থ ব্যক্তি যদি তার একটী হাত ওপরদিকে তুলে ধরেন, তাহলে বোঝায় যে তিনি কাঁদছেন। জাপানের মধ্যযুগে এইরকম ভাবে নাটক অভিনীত হ'ত। আর কাবুকী অভিনয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু হয়েছে। এর অভিনয়ের ভাষা খুবই আধুনিক। পশ্চিমী দেশগুলোর দর্শকেরা 'নো' অভিনয়ের চেয়ে এটা বেশী বুঝতে সক্ষম হয়ে থাকেন। 'নো' অভিনয়টা ধীর ও স্থিরভাবে অভিনয় হয়। কিন্তু এখানের কাবুকীর অভিনয়ে গতি ধীর ও স্থির নয়। আজকালকার অভি-নয়ের মত এর গতি দ্রুত।

আমরা ডিনারের পর কাবুকিজা হলে প্রত্যেকে তিনশত ইয়েন খরচ করে টিকিট কিনে ঢুকলাম। এত বড় প্রকাণ্ড হল আমার চোখে আর কখনও পড়েনি। এই হলের প্রত্যেকটী আসন দর্শকে ভর্তি। একটীও আসন আমি খালি দেখলাম না। আমার মনে হল যেন আমরা জনারণ্যের মধ্যে এসে বসলাম। শুনলাম সবশুদ্ধ এর আসনসংখ্যা বাইশশোর কিছু বেশী। আর একটী মজার জিনিষ আমার চোখে পড়ল। একটী সরু প্ল্যাট-ফরম্ থিয়েটারের মঞ্চ থেকে সরাসরি দর্শকদের আসনের মধ্যে ঢুকে এসেছে। শুনলাম এটি লম্বায় ১৮০ ফুট। এর ওপর এসে অভিনেতারা অভিনয় করে থাকেন। আমার কাউলুনের Kai Tak বিমানবন্দরের কথা মনে পড়ে গেল। এর রাণওয়েটা এমনি সরু হয়ে সমুদ্রের

ওপর অনেকটা চলে গেছে। বিমান তার ওপর দিয়ে ওঠানামা করে থাকে। মঞ্চটী খুব প্রকাণ্ড। ঘূর্ণিয়মান প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চের ব্যাস শুনলাম ১১০ ফুট। এই মঞ্চের দু'দিকেই কয়েকটী করে তলা রয়েছে। তার মধ্যে থেকে আলোকশিল্পীরা অভিনয়ের সময় আলোকপাত করে থাকে। ভেতরে ঢোকবার পূর্বে এই বাড়ীটীর মধ্যে একটী সুপারমার্কেটের মত বাজার রয়েছে দেখে এলাম। সেখানে সবকিছু পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত হলটা অন্ধকারে ভরে গেল। ষ্টেজের ড্রপসিনটী উঠে গেল। পাশের দ্বিতল, ত্রিতল থেকে ষ্টেজটাকে আলোকময় করে তুলল। অভিনেতারা অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। লাল-নীল-সবুজ আলোর বরণাতে তাঁদের দেহগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। পূর্বেকার জাপানী পোষাকে ওঁদের দেখে আমাদের খুব ভাল-লাগছিল। নৃত্যের তালে-তালে নৃত্যপটীয়সীরা যখন নাচতে-নাচতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁদের দেখে মনে হতে লাগলো যে স্বর্গের অপ্সরীরা যেন মর্ত্যে নেমে এসেছেন। নৃত্যের তালে-তালে সুমধুর বাজনার সুরে-সুরে প্রেক্ষাগৃহটী এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। জাপানী গীত আমরা বুঝতে পারলাম না তবে তাদের মধুর কণ্ঠস্বর এখনও মাঝে-মাঝে আমার কানে এসে বাজে। পুরুষের গম্ভীর ভাষা আর নারীদের সুমধুর কণ্ঠস্বরে সেদিন প্রেক্ষা-গৃহটীতে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। অনেক-গুলি টুক্‌রো-টুক্‌রো ঘটনা ওঁরা অভিনয় করে গেলেন। ষ্টেজের ওপর সত্যকেনা মাঝারি ধরনের জাপানী মোটর গাড়ীতে চড়ে কতকগুলি নারী আর পুরুষ ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ীটী চালিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁরা সকলেই হনলুলুতে যাবার জন্যে প্লেনে উঠতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ষ্টেজের আকাশে একটী ছোট এরোপ্লেন উড়ে চলে গেল। পরে একদল অপরূপ সুন্দরী নারী ওদেশের অর্দ্ধনগ্ন পোষাক পরে 'হুলা-হুলা নৃত্য' নাচতে আরম্ভ করলেন। তারপর এলেন বিকিনি পোষাকে সজ্জিতা হয়ে একটী নারীরদল; তাঁরা পুরুষের সঙ্গে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করে দিলেন। ষ্টেজের আকাশে রাত্রির তারাগুলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। দূরে হ্রদের ধারে পাহাড়ের ওপর নীচের বাড়ীগুলির মধ্যে থেকে অসংখ্য আলো জলছে। সেগুলো আকাশের তারার মত দেখাচ্ছিল। হ্রদের ওপর ছোট্ট একটা নৌকা ভাসছিল। সুন্দর অভিনয় আর সুন্দর এই দৃশ্য এ না দেখলে জাপান দেখা বৃথা হয়ে যায়। আমি মুভিতে বেশ খানিকক্ষণ ধরে এই দৃশ্যগুলি তুলেনিলাম। অর্দ্ধনগ্না নৃত্যরতা সুন্দরী নারীদের ছবি তুলতে পারলাম না। আমার গিন্নীটী বসে বসে খুব রাগারাগি আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে মৃদুস্বরে বললেন "তোমার কি বাহাত্তুরে ধরেছে? এইসব ছবিগুলো যখন বাড়ীতে গিয়ে দেখাবে তখন আমি যে ছেলেমেয়ে জামাইদের কাছে লজ্জায় মরে যাব।" পাশ থেকে মিঃ চেং-এর গলা শোনা গেল "বাগুস্, (Bagus) বাগুস্, বাইয়া চান্তে।" মালয়ী ভাষায় তিনি চীৎকার করে বলছিলেন, "খুব ভাল, খুব ভাল, অপূর্ব্ব সুন্দরী-নারীরা।" স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে সকলের সামনে আদর করলেন। পাশের ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন "আপনার মেয়ে নাকি?" মিঃ চেং ইংরাজি খুব ভাল জানেন না। তবে কেউ কথা বললে তিনি বুঝতে পারেন। তাই মুখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন "ইনি আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।" ভদ্রলোকটী তাঁকে লোকটী আর কিছু না বলে অভিনয় দেখতে থাকেন।

—ক্রমশঃ

পুনর্যাত্রা—স্মৃতিপথে

পরিমল গোস্বামী

॥ দুই ॥

আমাকে অনেক সময়েই পাঠকদের সব অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। এক পাঠক এক প্রশ্ন পাঠালেন কাফি খাঁ যেসব রাক্ষসের ছবি আঁকেন, তাদের মুখের ভাষাতে হিন্দিতে বসান কেন। এপ্রশ্ন নিয়ে কিছু গবেষণা করতে হল। আমি এর আগে জানতাম বাঙালী রাক্ষসেরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে কেবল অনেকগুলি অক্ষরেব সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে থাকে মাত্র। যেমন হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। এ কল্পনার সময় হয়তো কাল্পনিক ভূতের উচ্চারণের কথা মনে পড়েছে। ভূতের মাথার খুলির কথা মনে এলেই দেখা যায় সে মাথায় নাকের অস্তিত্ব নেই, শুধু একটি গহ্বর আছে। ভূত কথা বলতে গেলেই তার নাকহীনতার জন্য নাকী সুরে বলে, এমন একটা ধারণা আছে। নাক না থাকলে নাকী সুর হয় কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক রাক্ষসের বাংলা উচ্চারণ অনুনাসিক হয় এটা বহুদিনের ধারণা, তাই মনে হয় ভূত থেকেই এ কল্পনা এসেছে।

কিন্তু রাক্ষস হঠাৎ এই আনুনাসিক বাংলা ছেড়ে হিন্দি ধরল কেন কারটুন চিত্রে, সে সমস্যার একটা সমাধান চিন্তা করতে হল। প্রশ্নটি করেছিলেন চাকুরিয়ার জনৈক বিষ্ণু ধর। তিনি লিখলেন, অন্যের আঁকা ছবিতেও তিনি ভূতপ্রেতের মুখে হিন্দি ব্যবহার দেখেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, রামায়ণ মহাভারতের যুগেও কি রাক্ষসেরা হিন্দি বলত? এ বিষয়ে আমি অনেকদিন চিন্তা করেছি; এবং আমার ধারণা তারা তখন একমাত্র হিন্দিতেই কথা বলত। কারণ অযোধ্যার সবাই সংস্কৃতভাষী ছিলেন, অতএব রাক্ষসদের মধ্যে বাস করতে হলে অযোধ্যাবাসীদের হিন্দি জানা কম্পালসরি ছিল। দোভাষীর সাহায্যে তো আর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো যায় না? মূল রামায়ণে আছে হনুমানও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। রাবণের সংস্কৃত জানা ছিল কি না তা আমার অজ্ঞাত। কাজেই সীতা উদ্ধার বিষয়ে রাবণের সঙ্গে আলাপের সময় হনুমানকে হিন্দিতেই কথা বলতে হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনকি বন্দী সীতার সঙ্গে যে সব রাক্ষসী আলাপ করেছিল, তারাও সীতার সঙ্গে আলাপ করতে পেরেছিল কারণ সীতা বিবাহের পরে হিন্দি শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অতএব রাক্ষসরা হিন্দি ভাষী ছিল, এটা ধরে নিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। আমি ২৪-৫-৫৭ তারিখে চিঠির উত্তরে লিখলাম প্রায় এই রকম—

রাক্ষসরা হিন্দি বলত বলেই তাদের খুব দম্ভ ছিল এবং আর্যরা তাদের হাতে এই কারণেই বার বার লাঞ্ছিত হয়েছেন। আর্যরা তখন শুধু সংস্কৃত জানতেন। আর্যদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা একবার এক সম্মিলনের আয়োজন করেন। অনেক দিন ধরে এই সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল। ইউরোপ থেকেও কয়েকজন আর্য যোগ দিয়েছিলেন এতে। তাঁদের

মধ্যে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। একজন ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পি এচ্ ডি। তাঁর নাম হের গুঠেন মরগেন। তিনি নানা দিক থেকে রাক্ষসদের ভাষা অনুশীলন করে এই মত প্রকাশ করলেন যে, তারা স্রেফ ভাষার জোরে আর্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে যাচ্ছে। গাল দেবার পক্ষে হিন্দির তুল্য ভাষা নেই। তাই রাক্ষসদের গাল শুনে আর্যরা যতক্ষণ সংস্কৃত ভাষায় তার উপযুক্ত জবাব কি হতে পারে ভাবতে থাকেন, ততক্ষণে রাক্ষসেরা তাঁদের আক্রমণ করে বসে।

তাই তিনি একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। আর্যদের মধ্যে যদি কেউ হিন্দি জানা লোক থাকেন তবে তাঁকে ডাকা হোক। দেখা গেল যিনি জানেন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং ক্ষীণকায়। হের গুটেন মরগেন আর একজন অতি শক্তিশালী হিন্দি-অনভিজ্ঞ আর্যকে আহ্বান করলেন। বললেন এঁদের মধ্যে কুস্তি হোক। শত শত দর্শকের সামনে কুস্তি হল এবং সবাইকে স্তম্ভিত করে হিন্দি জানা দুর্বল আর্যটিই জয়লাভ করলেন। তখন সমবেত আর্যগণ নিশ্চিত বুঝতে পারলেন একমাত্র সংস্কৃত ভাষা জানাই তাঁদের দুর্বলতার কারণ। পরাজিত পেশীপুষ্ট আর্য অভিযোগ করলেন, কুস্তি চলাকালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর কানে ক্রমাগত হিন্দিতে জঘন্য সব শব্দ বর্ষণ করেছেন, তাই তিনি জয়লাভ করতে পারেননি।

জারমান পণ্ডিতের পরীক্ষা সফল হল। উপস্থিত একজন অ্যাংলো-স্যাকসন আর্য বললেন, গ্রেনডেলের পূর্বপুরুষও হিন্দি জানত, কিন্তু গ্রেনডেলের সময় থেকে এই ভাষা লুপ্ত হয়। কিন্তু বেউলফ হিন্দি জানত তাই গ্রেনডেল পরাজিত হয়েছিল। অতঃপর গুটেন মরগেনের পরামর্শে আর্যরা গুষ্টিসুদ্ধ হিন্দি শিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বত্র স্কুল খুললেন এবং রেডিওর সাহায্য নিলেন। তাঁরা দ্রুত হিন্দি শিখে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আর্যরা জয়লাভ করে রাক্ষসদের হিন্দি শিক্ষা বন্ধ করে দিলেন। রামায়ণের যুগ পর্যন্ত রাক্ষসেরা হিন্দি বজায় রাখতে পেরেছিল, শিক্ষা বন্ধ হলেও। লংকার পতনের পর রাক্ষসেরা এবং ঐ সঙ্গে তাদের সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রেনডেলদের সঙ্গে এই ঘটনাটা তুলনীয়। অতএব রাক্ষসের মুখে হিন্দি দেওয়া অন্যায় হয় নি। এ সবই রামায়ণ যুগের আগের ঘটনা। সমসাময়িক হওয়াও বিচিত্র নয়।

এই মূল্যবান গবেষণা ছাপা হওয়ার পর অনেক চিঠি এসেছিল। রাক্ষসের ভাষা লেখকদের হাতে এক রকম হওয়া উচিত এ কথা বলেছিলেন অনেকে। তা কি করে সম্ভব? জেলায় জেলায় ভাষার বদল ঘটতে থাকে। চট্টপল্লী ও ভট্টপল্লী দুইয়েরই ভাষা বাংলা। অথচ কত তফাৎ। রাক্ষসদেরও ভাষায় তেমনি জেলাগত পার্থক্য আছে। এবং প্রত্যেক জেলার রাক্ষসেরই নিজস্ব ভ্যানিটি আছে। ভাষা বদল করলে প্রথমত তা বাস্তবধর্মী হয় না, দ্বিতীয়ত তাতে তাদের ভ্যানিটিতে আঘাত লাগে। এবং যদিও রাক্ষস এখন আর কেউ জীবিত নেই, তবু তাদের প্রেতদেহ আছে। তাদের বিষয়ে লেখার সময় তাদের কথা ভাবা দরকার। তাদের ভাষার প্রতি অবিচার করলে তারা লেখকদের ঘাড় মটকাতে পারে।

যাই হোক, আমার লেখাটি ছাপা হওয়ার পর যে সব চিঠি এসেছিল তা থেকে দুটির অংশমাত্র নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা যাক। জনৈক কালীশঙ্কর দাসের চিঠি ছাপা হল ৭-৪-১৯৫৭ তারিখে তিনি লিখলেন—

আপনার মতামত ঠিক বলে মনে হয় না। বাংলা শিশু সাহিত্যে রাক্ষসের ভাষার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। রাক্ষসের ভাষা শিশু সাহিত্যের লেখকেরা নিজেদের খুশিমত লিখছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রাক্ষসের মুখে যে ভাষা দিয়েছিলেন, সে ভাষা অনেকদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা ব্যবহার করে আসছেন, কিন্তু কাফি খাঁ হিন্দী মাফিক ভাষা দিয়ে নতুনত্ব করেছেন। তাঁর চেয়েও নতুনত্ব দেখিয়েছেন

শৈল চক্রবর্তী। মাসিক বসুমতীর (১৩৬৩) ১৫ সংখ্যায় ছোটদের আসরের গল্পে দৈত্যের এইরূপ ভাষা দিয়েছেন—জানিস কোনও কোনও দানব দৈত্য আমার সঙ্গে পারে না। বাংলা ভাষার সঙ্গে অনাবশ্যক র-ফলার সংযোগে দৈত্যের ভাষা হয় তা জানা ছিল না। —এর একটি মান থাকা দরকার। সব রাক্ষসই যে হিন্দি বলত এটা মানতে পারলাম না। বক রাক্ষসের ভাষার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভাষার মিল হতে পারে না। প্রাদেশিক ভাষার ছায়া পড়বেই। ঘটোৎকচের সময়ে আসামে মৈথিলী ভাষার প্রচলন ছিল। বাংলা দেশেও বোধ হয় মৈথিলী ভাষার প্রচলন ছিল। কিন্তু বক রাক্ষসের দেশে হিন্দি কি মৈথিলী চলত জানা দরকার।—

রাক্ষসের ভাষা হিন্দী হতে পারেনা, একমাত্র মৈথিলীই হতে পারে। শৈলবাবু এবং কাফি খাঁর ভাষা উপযুক্ত বলে মনে করিনা। শিশু-সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে এইসব দৈত্যদানার দল, এদের বাদ দিয়ে গল্প হয়না……হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া সাহিত্যের রাক্ষসের ভাষা কোন পর্য্যায়ে আছে তার বিশদভাবে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

বড় চিঠির কিছু অংশ এটি। আমি এই চিঠি উপলক্ষে আলোচনায় লিখলাম—

পত্রলেখক বলেছেন, রাক্ষসদের ভাষার একটা মান বেঁধে দেওয়া হোক। কিন্তু তা করতে হলে দেখতে হবে, রাক্ষসেরা সব একজাতি কিনা (কারণ, দৈত্য-দানব সবই আছে এদের মধ্যে), অথবা তাদের ভাষা এক গোষ্ঠীভুক্ত কিনা। তবে শৈল চক্রবর্তীর রাক্ষসেরা রফলা ব্যবহার করে কেন, তা বলছি।

আদি ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান শ্রেণীর ভাষার বহু উপজাতি আছে। তার মধ্যে আছে ভারতীয় সংস্কৃত এবং আধুনিক কয়েকটি প্রধান ভাষা এবং সিংহলী ভাষা। কিন্তু ভারতবর্ষে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বাইরেও অনেক ভাষা আছে। উত্তর ভারতে পৈশাচী নামক একটি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইটিই আসলে ছিল পিশাচদের ভাষা (এর সঙ্গে হিন্দির মিল আছে)। কাফি খাঁর রাক্ষসেরা এই ভাষায় কথা বলে। দক্ষিণ ভারতের পিশাচেরা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বাইরে। তাদের ভাষা আর্যও নয়, ইণ্ডো-জারম্যানিকও নয়। তেলুগু, তামিল, কান্নাড়, মলয়ালম, টুলু, গাঁও, কোটা, কুরুক্স, কুই ও রাজমহল—এই কয়েকটি ভাষার মিশ্রণে তাদের ভাষার উদ্ভব। কিন্তু তাদের উচ্চারণে র-এর প্রাধান্য এত বেশি যে, যে-কোনো অক্ষরের সঙ্গে সুবিধা পেলেই তারা র-ফলা ব্যবহার করে। শৈল চক্রবর্তীর রাক্ষসেরাও তাই করে এবং তা কেবল তাদের বৈশিষ্ট্য নয়। এটা তারা পেয়েছে পিক্টদের কাছথেকে। এরা স্কটল্যাণ্ডের আদিবাসী, এবং অনার্য। যেমন গ্রেট উচ্চারণ গ্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-এট্‌ হয় তাদের মুখে। তারা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ঐ রকম দীর্ঘ র-ফলা ব্যবহার করে। এরা ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে স্কটল্যাণ্ডের লোক হয়েও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে কিভাবে যোগ স্থাপন করেছিল তা অদ্যাবধি পণ্ডিতদের অজ্ঞাত। তবে পিশাচদের মধ্যে যখন পৈশাচী ভাষা প্রচলিত ছিল, তখনই তারা উত্তর ভারত থেকে বাংলা এবং উড়িষ্যার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে থাকবে। তাই কাফি খাঁর পিশাচেরা যে ভাষায় কথা বলে তা কখনো বাংলার মতো, কখনো ওড়িয়ার মতো, কখনো হিন্দির মতো শোনায়।

এ বিষয়ে এই সঙ্গে আর একখানি চিঠি প্রকাশ করি। লেখিকা তপতী রায়, দিল্লী ৭, তিনি লিখছেন:

কাফি খাঁ অন্যান্য জায়গায় রাক্ষসদের মুখে কোন্-ভাষা দিয়েছেন লক্ষ্য করিনি, কিন্তু যুগান্তরে তাঁর রাক্ষসদের ভাষা ওড়িয়া। হিন্দী ছাড়া ওড়িয়াভাষা কি তারা 'optional' হিসাবে শিখত?

রাক্ষসের ভাষা উপলক্ষে এ পর্যন্ত যা লেখা হল তা সমস্তই শুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তবু দু একজন পাঠক এ আলোচনা সত্য মনে করে চিঠি দিয়েছিলেন। আমি যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলাম। উপরের ঐ চিঠির সঙ্গে আমি মন্তব্য জুড়ে দিলাম এই—

পত্রলেখিকার কথা আংশিক সত্য। রাক্ষস বা

পিশাচেরা যে স্বেচ্ছায় এমন মিশ্রভাষা ব্যবহার করে তা নয়। এতে তাদের দোষ নেই, তারা ভাষা রীতির দাসমাত্র। যেমন হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ— এই পৈশাচী ভাষার অর্থ কি, এবং এতে কোন্ কোন ভাষার চিহ্ন পাওয়া যায়? হাঁউ মানে নিশ্চয়, মাঁউ মানে আমি, খাঁউ মানে খাব, পাঁউ মানে পাচ্ছি। কিন্তু পাঁউ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন পাঁউরুটি বলতে পাই রুটি বোঝায় না। ফরাসী pain (প্যাঁ) মানে ব্রেড। অথবা পোর্টুগীজ pao মানে রুটি। দাঁড়াচ্ছে, প্যাঁ-রুটি অথবা পাও-রুটি। রুটি যোগে দুটি ভাষার দ্বন্দ্ব। গন্ধ-পাঁউ মানেও ঐ রকম কিছু হওয়া বিচিত্র নয়। অর্থাৎ মানুষের গন্ধ পাঁউ-রুটির তুল্য লোভ্য। তিনি বলেছেন, মৈথিলীই রাক্ষুসে ভাষা, তিনি শুধু উ-কার ও চন্দ্রবিন্দু দেখে ভুলেছেন।

মৈথিলী ভাষায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতার অংশ তুলে দিচ্ছি তা থেকে উ-কার ও চন্দ্রবিন্দু মৈথিলীতে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয় তা বোঝা যাবে। এই মৈথিলী ভাষায় লেখা একটি কৌতুক কাহিনী—

নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধারই
চাহিলুঁ টুটইতে মান
নাসাপর মুখর ঘুঁষি চলাওল
দারুণ বজর সমান।
মুণ্ড ঘুরি হম পড়লুঁ চরণতলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার।
তবহুঁ সো কোপ কঠিন হিয় নাগরী
মোহেন করল পিয়ার।
চরণ ধরিতে যব কর পরসায়লুঁ
নিতম্বে মারল লাথি।
কুঞ্জ তেজি হম দ্রুতগতি ভাগলুঁ
আগভয়ে জনু হাতী॥

এটি যে কৃষ্ণ ও রাধিকার মধ্যকার একটি প্রাইভেট সম্পর্কের কথা, সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। আমি শুধু মৈথিলী ভাষায় উকার ও চন্দ্রবিন্দুর অবাধ ব্যবহারের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—হাঁউ মাঁউ খাঁউ-এর সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে এর।

এই প্রসঙ্গ পড়ার পর জনৈক প্রাজ্ঞ পাঠক আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি শনিবারের চিঠির প্রথম সম্পাদক যোগানন্দ দাস, (এবং তাঁর এ চিঠি ছাপা হচ্ছে শনিবারের চিঠির উদ্ভাবক ও মালিক অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসীতে।)

যোগানন্দ দাস লিখলেন—আপনার কলম দেখছি আজকাল মানুষের ভাষা ছাড়াও রাক্ষসের ভাষা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছে। মশায়, রাক্ষসেরা চিরদিন দূরেই ছিলেন, দূরেই থাকুন। তাঁদের মুখে হিন্দী বসিয়ে দিলে মন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় তাঁরা যেন দিল্লীতে বা পাটনায় গদী অধিকার করে আমাদের মত নিরীহ বাঙালীদের ঘাড় মটকাবার তালে আছেন। আমাদের মধ্যে এখন ভীমের বা অর্জুনের অভাব, বাঙালীর এই বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের সময়ে পদে পদে হিন্দীভাষী রাক্ষসদের হাত থেকে যে আমাদের বাঁচিয়ে চলবেন তার লোকাভাব। কাজী দাদা আর কি? তিনি মনের আনন্দে আমাদের ঘাড় মটকাবার ছবি এঁকেই খালাস। যাই হোক, আপনাদের গবেষণায় একটা বড় অভাব থেকে যাচ্ছে। আপনারা রাক্ষসের ভাষা নিয়ে এত গবেষণা করছেন বটে, কিন্তু রাক্ষসদের শাস্ত্রসম্মত দেশ লঙ্কার উপর কেউ জোর দিচ্ছেন না। রামধুনের রাজ্যে বাস করছেন বলে কি রাবণ-মেঘনাদকে একেবারে ভুলে যেতে হবে? —মেঘনাদবধ কাব্যের পরেও? সুতরাং রাক্ষসদের ভাষার যদি হদিস চান তবে লঙ্কায় ডেলিগেশন পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে একখণ্ড রামায়ণ থাকলে ভাল। তাহলে মহাবীরের আশীর্বাদে রাক্ষসরা ডেলিগেশনকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবেনা। "একটা কথা, সীতা খাস অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রের স্ত্রী। অশোকবনে সীতার কাছ থেকে রাবণ এবং রাবণের মারফৎ রাক্ষসেরা হিন্দী শিখেছিলেন কি-না বলতে পারিনা।

আর এক কথা। ই এপ্রিলের (১৯৫৭) কাগজে

দেখলাম পাঁউরুটির কথা। রাক্ষসের কথাটা যেমন ভীতিপ্রদ, পাঁউরুটির কথা তেমনি মুখরোচক। সুতরাং মুখরোচক কথা দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করি। ফরাসী pain (প্যাঁ) বা ফিরিঙ্গী (পর্তুগীজ) pao থেকে পাঁউরুটির জন্ম দেওয়ার একটা বিপদ আছে। pain মানে যদি রুটি হয়, তবে পাঁউরুটির মানে দাঁড়ায় রুটি-রুটি বা ডবল রুটি। তারচেয়ে মিশর আক্রমণকারী ফরাসী বা গোয়া দখলকারী পর্তুগীজদের বর্জন করে নিজের ঘরের দিকে তাকালে হয়তো পাঁউরুটি শব্দের সোজা হিসেব পাওয়া যাবে। পাউরুটি বস্তুটি ইউরোপ থেকে আমদানি। তার বহু আগে থেকেই আমাদের নিজস্ব একটি বনেদি রুটির চলন এদেশে ছিল, আজও আছে। তাকে আমরা বলি হাতরুটি, কারণ, উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে এই রুটির ময়দা ঠাসা হয়। পাউরুটি তৈরির মেশীন আমদানির আগে এদেশে পাঁউরুটি তৈরির সাবেক ধরন যদি দেখে থাকেন, তবে জানবেন যে, ঐ রুটির ময়দা ঠাসা হত (আজও অনেক জায়গায় হয়) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে। সুতরাং হাথ-রোটির পাল্টা হল পাওরোটি—পাঁউরোটি—পাঁউরুটি। মনে হয় এইটেই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা যাই হোক, বস্তুটি অতি উপাদেয়—বিশেষতঃ যদি মচমচে টোষ্ট হয়। রবিবার সকালে উঠেই চায়ের টেবিলে কাগজ খুলেই ঐটির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

এই চিঠির সঙ্গে যোগানন্দবাবুর নিজহাতে আঁকা দুটি কারটুন ছবি ছাপা হয়েছিল, তা এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

(গত মাসের কিস্তিতে একটি ভুল উল্লেখযোগ্য। শেষ ছড়াটিতে হবে "কেউ খুলে বলিছে না, হিসাবের দায় কার।" ছাপায় হয়েছে "বলছি না।" ইংল্যাণ্ডের ভালুক সাজার ফোটোগ্রাফ তোলার সময় একটি লোক ভালুক সেজে ছোটদের জড়িয়ে ধরে ছবি তোলে। ছোটদের ভালুক সাজায় না। লিখতে ভুল হয়েছিল। পরে ছবিটি দেখে মনে পড়ল।)

—ক্রমশঃ

মূল্যবৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ কারণ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের সারাংশ—

বাজারে যত টাকার সরবরাহ সে তুলনায় ক্রয় বিক্রয় সামগ্রীর সরবরাহ যদি যথাযথভাবে উৎপাদিত ও বাজারে আমদানি না হয়, তাহা হইলে যে সকল সামগ্রী পাওয়া যায় তাহার সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অধিক হওয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি হয়। সুতরাং যদি বাজারে অধিক করিয়া টাকা ছাড়া হয় অর্থাৎ যদি বেতন, বোনাস, ভাতা, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিভিন্ন হিসাবে জনসাধারণ অধিক টাকা পাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তৎসঙ্গে সকল প্রকার দ্রব্য, সেবা-সাহায্য প্রভৃতিরও পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক; নয়ত মূল্যবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিবেই। আমাদের দেশে বহু পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য বিভিন্ন হিসাবে বহু অর্থ ব্যয় করা হয় যাহার ফলে বাজারে সেই অর্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাজারে আসিয়া পড়ে। মানুষ নূতন নূতন চাকুরী পায় কিন্তু এমন কিছু কার্য্য করেনা যাহাতে বাজারে ক্রয় সামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ফলে তাহারা বেতনের টাকা ক্রয়ার্থে ব্যবহার করে কিন্তু নিজেদের কর্ম্মশক্তি লাগাইয়া কোন কিছু উৎপাদন করিয়া বাজারের মাল সরবরাহ বাড়াইতে সাহায্য করে না। আমাদের কলিকাতা সহর নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইতেছে ও তজ্জন্য সহস্র সহস্র লোক মাটি খুঁড়িতেছে, পাইপ বহন করিয়া আনিয়া নূতন করিয়া বসাইতেছে। রাস্তা চওড়া করিতেছে। নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে। বহু লোকে শত শত চিঠিপত্র লেখালিখি করিতেছে, হিসাবের খাতার পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া চলিতেছে, আফিস দফতর খুলিয়া বসিয়া আছে—কতকিছু। বহু টাকা সরকারী তহবিল হইতে বাহির হইয়া কত লোকের হস্তে গিয়া পড়িতেছে। তাঁহারা সেই অর্থ লইয়া বাজারে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করিতে যাইতেছেন এবং ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু ক্রয় করিতেছেন তাঁহার কোন অংশই তাঁহাদের দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে না। তাঁহাদের ক্রয় শক্তি এ ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কলিকাতার মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া রেললাইন বসাইয়া মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইবে। এই কার্য্যে ও সেই মাটিকাটা ও অন্য নানা প্রকার কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। বহুলোকে বেতন পাইতেছে, ঠিকাদারী করিয়া লাভ করিতেছে; কিন্তু কোন বাজারের মাল প্রস্তুত করিতেছে না। ঐ অর্থে যদি কলিকাতার আশেপাশে যেখানে রাস্তা নাই সেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দূরের জায়গাকে নিকটে আনার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে সেই সকল দূরের জায়গার লোকের শ্রমে উৎপন্ন নানা বস্তু বাজারে আসিত ও তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি তেমন করিয়া হইত না। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথে কবে গাড়ি চলিবে এবং তখন তাহার ফলে বাজারে মাল সরবরাহ কিভাবে উন্নতি লাভ করিবে, তাহা একান্তই অনুমান বা কষ্টকল্পনার কথা। বহু টাকা যে এইসূত্রে কোনও কিছু হইবার পূর্ব্বেই বাজারে আসিয়া পড়িবে তাহাতে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি তখনই হইতে আরম্ভ করিবে। বস্তু উৎপাদন, তাহা দূর হইতে বাজারে লইয়া আসা, তাহার শোধন বা তাহা ব্যবহার করিয়া অন্য কোন বস্তু প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য উৎপাদনের কার্য্য। যে সকল কার্য্য করিলে কোনও উৎপাদন হয় না, শুধু মানুষে বেতনাদি পাইয়া তাহা লইয়া বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যায়, সেই সকল কার্য্য মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধিকর। হাওড়া হইতে কলিকাতায় আসিবার যে আর একটি সেতু নির্ম্মাণ করা হইতেছে তাহাতে বহু স্থান কলিকাতার অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া যাইবে। ইহাতে বহু দ্রব্যাদি সহজে কলিকাতায় আনা যাইবে এবং কলিকাতা হইতেও নদীর ওপারে যাওয়া সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে। এই দ্বিতীয় সেতু নির্ম্মাণ তাহা হইলে হয়ত ততটা মূলবৃদ্ধির কারণ হইবে না যতটা হইবে ঐ সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী চালানর ব্যবস্থা। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি যদি যথাসম্ভব ক্রয় বিক্রয় বৃদ্ধির মালমশলা উৎপাদনে সহায়তা করিয়া বিক্রয় ও ক্রয়ের বস্তু উৎপাদনে সাহায্য করিত তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা এত কঠিন হইয়া উঠিত না।

সাময়িকী

দুনিয়ার জনগণের ঘৃণ্যতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

লালতারা পত্রিকায় ঋত্বিক রায় লিখিয়াছেন :—

কোরিয়ার জনগণের ওপর নির্লজ্জ আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এক নতুন আগ্রাসন ও আক্রমণের নীতি সূচনা করে। মহান কোরিয় জনগণ ও চীনা জনগণের স্বেচ্ছাবাহিনীর হাতে নিদারুণ মার খাওয়ার মধ্য দিয়ে সেদিন থেকেই বস্তুতঃ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও আক্রমণের নীতির পরাজয় শুরু হয়। কিন্তু নির্লজ্জ মার্কিনীরা কোরিয়ার যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের ঐতিহাসিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পাগলের মত এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ, আগ্রাসন ও লুণ্ঠনের নীতি চালিয়ে যেতে থাকে। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া—পরপর এশিয়ার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিপীড়িত জনগণের ওপর তারা হিংস্র নখদন্ত নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। তাদের প্রতিটি আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত, নির্যাতিত মেহনতী মানুষ দুর্জয় প্রতিরোধ তুলে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে —যেখানেই ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত পা রেখেছে সাম্রাজ্যবাদ, সেখানেই জনযুদ্ধের দাবানল তাকে পাল্টা আক্রমণ করেছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই এশিয়ার বনজঙ্গল নদীনালা ইয়াঙ্কী যুদ্ধবাজদের ফাঁসীর মঞ্চ হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনাম ও লাওস কম্বোডিয়ার দেশপ্রেমিক জনগণের অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দেশ-বিদেশে এক প্রচণ্ডতর সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ইন্দোচীনে মার্কিন আগ্রাসনে, আক্রমণ ও বীভৎস হত্যালীলার বিরুদ্ধে মহান ইন্দোচীনের জনগণের সার্থক প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতির চূড়ান্ত পরাজয় ও এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের পথেই দিক নির্দেশ করে। পশ্চিম এশিয়ায় তেলের অতুল ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠনের জন্য ও আরব জনগণের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্য ইস্রায়েলী যুদ্ধবাজদের শিখণ্ডী খাড়া করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর যে অপচেষ্টা চালাচ্ছিল তাও ক্রমাগতঃ নতুন নতুন প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে এবং মহান প্যালেষ্টাইনীয় জনগণের মুক্তি বাহিনী ও মুক্তি সংগ্রাম সমগ্র আরব জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। ইস্রায়েলী জায়োনবাদীদের সামনে রেখে আরব জনগণের বিরুদ্ধে ইয়াংকী চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সমগ্র পৃথিবীর জনগণ তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়ছেন এবং এই ঘটনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্দ্ধমান সংকট ও বিচ্ছিন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানকে সিয়াটো স্যাটো ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে সামিল করে এবং ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে জোট নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ভেক পরিয়ে ভারত পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ ও নিপীড়ণ কায়েম রাখার ঘৃণ্য চক্রান্তের স্বরূপও ক্রমশঃ উদঘাটিত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাম একটি ঘৃণ্য, মানবতাবিরোধীর নাম হিসাবেই বেশী পরিচিত ও উচ্চারিত। জাপানী সমরবাদের পুনরুত্থান ঘটিয়ে এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থের প্রহরী ও রক্ষক হিসাবে জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের খাড়া করার অপচেষ্টাও এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। জাপানের যুদ্ধবিরোধী গণতান্ত্রিক মানুষের বিরাট প্রতিরোধের সামনে যুদ্ধবাজরা আপাততঃ কিছুটা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে এবং এমন কি লোকদেখানো গোছের হলেও জাপান থেকে মার্কিন ঘাঁটি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীর সামনেও সাম্রাজ্যবাদীদের কিছুটা নতিস্বীকার করতে হয়েছে। মহান চীন প্রজাতন্ত্রের জন্ম থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মহান চীনা জনগণ ও চীন গণপ্রজাতন্ত্র এশিয়ায় (ও পৃথিবীর প্রতিটি দেশে) সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, এশিয়ার ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের প্রতিটি সংগ্রামের সংগে থেকেছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণের জন-

যুদ্ধ ও গণসংগ্রামগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান চীন জনগণ, রাষ্ট্র ও পার্টি নৈতিক, বৈষয়িক ও অন্যান্য সাহায্য-সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের নীতিনিষ্ঠ ভূমিকা এশিয়া মহাদেশেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কোনঠাসা ও পরাজিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চীন নীতি পরাজিত হয়েছে এবং সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গণচীনের সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ নিতে হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে যেমন, তেমনিই এশিয়াতেও যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই পা রাখতে উদ্যত হচ্ছে সেখানেই জনযুদ্ধ ও গণবিক্ষোভের আগুন তার পা পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক তখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সহযোগী হিসাবে সোভিয়েতের নয়া জারেরা আত্মপ্রকাশ করলো। মহান স্তালিনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত অনুচর ক্রুশ্চভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মহান সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। অর্থনৈতিক নিয়মের স্বাভাবিক কারণেই নয়া পুঁজিবাদী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতন ঘটলো। দুনিয়ার মেহনতী মানুষের ভাগ্য যেমন একই সূত্রে গাঁথা, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মূল স্বার্থও তেমনি একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সোভিয়েতে নয়া পুঁজিবাদের পথিক ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও তাই পূর্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিজেদের শোষণের থাবা প্রসারিত করেই ক্ষান্ত রইলো না বা তা থাকা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত, অর্ধোন্নত দেশগুলির ওপরও ক্রুর ব্রেজনেভ-কোসিগিন চক্র তাদের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নখদন্ত বিস্তার করেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে মহান লেনিন স্তালিনের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী সেজে জালিয়াত সংশোধনবাদীরা সেখানকার জনগণকে শোষণের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছিল। কিন্তু তার বাইরে হাত বাড়াতে গিয়ে তাকে অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতার লিপ্ত হতে হোলো। সোভিয়েতের নয়া জারের সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণকে আরো কিছুদিন দমন করতে পারা যাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা সাগ্রহে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে কোলে টেনে নিলো। 'যেহেতু সোভিয়েত সংশোধনবাদ সাম্রাজ্যবাদের পুরনো পথে পা বাড়িয়েছে, সেহেতু সে অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাম্রাজ্যবাদের সহজাত সমস্ত দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় জর্জরিত।' এইভাবে 'বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সারিতে সোভিয়েত সংশোধনবাদী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অংশ গ্রহণই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোকে তীব্রতর করে তুলেছে। নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা সম্প্রসারণের জন্যে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা।' সমগ্র এশিয়া মহাদেশ সাম্রাজ্যবাদ-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগপৎ দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের অন্যতম ক্রীড়াভূমি। শোষণের মূল স্বার্থ বজায় রাখার জন্য, বিপ্লব দমন করার জন্য, নয়া উপনিবেশিক শোষণ কায়েম রাখার জন্য ও বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের বন্ধু ও নেতা চীনকে ঘেরাও করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকা বাড়ানোর, বাজার দখলের ও নতুন নতুন এলাকায় শোষণ ও শাসন প্রসারিত করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে চলছে এক তীব্র ও ভয়ংকর সংঘাত।

ইন্দোচীন, পাক-ভারত উপমহাদেশ, পশ্চিম এশিয়া, ভারত মহাসাগর—এশিয়া মহাদেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়েই আজ তাই শোষণের মূল স্বার্থ বজায় রাখার জন্য, বিপ্লব দমন করার জন্য ও বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের নেতা ও বন্ধু চীনকে ঘেরাও করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ঐক্যবদ্ধ।

আবার পশ্চিম এশিয়ায় অমূল্য সম্পদ খনিজ তেলের একচেটিয়া অধিকার লাভ করার জন্য, নানা ধরণের

খনিজ সম্পদ ও যুদ্ধ সামগ্রীতে সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে দখল করার জন্য এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশাল বাজার দখলের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে চলছে এক তীব্র ও ভয়ংকর সংঘাত। এই সব এলাকায় বাজার ও জনগণকে নিজ নিজ দখলে রাখার প্রয়োজনে বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিয়েও তারা তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। সামরিক গুরুত্ব ছাড়াও ভারত মহাসাগরের জলে ও সমুদ্রের নীচে রয়েছে এখনো অনাবিষ্কৃত বিরাট বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদের অমূল্য সম্ভার। এই সম্ভারের ভাবিষ্যত দখলদারীর জন্য এখন থেকেই মার্কিন সপ্তম নৌবহর ও সোভিয়েত নৌবহরের মধ্যে এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে জনগণের বিপুল প্রতিরোধের সামনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আজ নিয়েছে নয়া উপনিবেশবাদের জঘন্য কৌশল। ঠিক তেমনি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম রাখার জন্য ও বাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তারা সমাধানের চেষ্টা করছে নিজ নিজ প্রভাবাধীন দেশগুলিকে লড়িয়ে দিয়ে। যে ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি দক্ষিণ ভিয়েতনাম-থাইল্যাণ্ড-লন নল চক্রকে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, ইস্রায়েল ও জর্ডানকে দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার জনগণের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দিয়ে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, সিকিম, ভুটান, আফগানিস্থান, সিংহল, এইসব দেশের জনগণের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা এইসব দেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করার বুলি আউড়ে মুক্তি সংগ্রামরত জনগণকে বিপথে চালাচ্ছে, সেই সব দেশে নিজের নয়া উপনিবেশবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন ধরণের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী গোষ্ঠী তৈরী করছে এবং কার্যতঃ এই সব দেশে মূল ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধজোটগুলির অনুকরণে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ার দেশগুলির ওপর নানা ধরণের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি চাপিয়ে দিচ্ছে, এশিয় নিরাপত্তা চুক্তি বা 'পারমানবিক ছাতা'র চুক্তির মতো জঘন্য ধরণের সামরিক জোট গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্যই তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী লুণ্ঠনের ও নিজেদের যাবতীয় অপকর্মের সাফাই তারা গাইছে 'মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের' নাম করেই। মার্কস্‌-লেনিনের চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত সংশোধন করে, স্তালিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ কুৎসা চালিয়ে ও শেষ পর্যন্ত তা বিসর্জন দিয়ে তবেই তারা নিজেদের অপকর্মগুলি চালিয়ে যেতে পারছে।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৮০

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ দেশ হিসাবে ঠিক কি প্রকার, তাহার ফল ফুল, পশু পক্ষী, জল স্থল, মানুষ, ক্ষেত্রজ, খনিজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ঠিক কি জাতীয়, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতিশয় কঠিন। ভারতবাসী জনগণের আর্থিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করিতে যাওয়া আরও দুরূহ। এই রূপ যে অবস্থা ইহার মূলে আছে ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রের বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব। ভারতবর্ষ এক দেশ এবং ভারতীয় সভ্যতা কৃষ্টি ও মানবীয় জীবনধারা নানা শাখা প্রশাখা অবলম্বনে প্রবাহিত হইলেও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে একই উৎস উদ্ভূত বলিয়াই দেখা যায়। যদি কখনও অপর কোনও প্রভাব ভারতের সামাজিক স্রোতধারার মিলিত হইয়া থাকে, তাহাও ক্রমশঃ এক সর্বভারতীয় রূপই গ্রহণ করিয়া ভারতীয়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া লক্ষিত হয়। ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারতে সহস্র সহস্র বর্গ মাইল স্থান পার্বত্য অঞ্চল এবং তৎসংলগ্নই রহিয়াছে অনন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি। পার্বত্য ও নদী স্রোতজাত উপত্যকা, মরুভূমি, মালভূমি, নদনদীর সমুদ্র সংগম সংলগ্ন জলবহুল স্থলভাগ ও নানা প্রকার খনিজ ও আরণ্য সম্পদশালী অঞ্চল। ভারতের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় যে তাহাতে কোথাও ধান্য কোথাও গোধূম কোথাও বা তুলার চাষ উত্তমরূপে হওয়া সম্ভব হয়। যে সকল অঞ্চলে ইক্ষু আম্র বা কমলা লেবুর উৎপাদন সহজ সেই সকল অঞ্চলে হয়ত অন্য অতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্বত্য এলাকাতেও কোন কোন

স্থানে আগ্নেয় প্রস্তর, মর্মর, বেলে পাথর, মুটিং ইত্যাদি বর্তমান আছে এবং অন্যান্য বহু স্থানের পর্বতে মৃত্তিকার ভাগই অধিক। ভৌগোলিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় উত্তর ভারতবর্ষ দক্ষিণ ভারতের তুলনায় বহু পরে সমুদ্রবক্ষ হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্য এই হিসাবে উত্তর ভারত অপেক্ষা বহু পুরাতন দেশ। বিন্ধ্যাচল হইতে এই দক্ষিণ ভাগের আরম্ভ। ভারতের মৃত্তিকা কোথাও নদীস্রোতলব্ধ পলি মাটি প্রধান। কোথাও বা মাটিতে লৌহ অধিক করিয়া বর্তমান। অথবা মাটি কঙ্কর বহুল কিংবা তাহাতে আগ্নেয় প্রস্তরের অংশ অপরাপর উপাদানের তুলনায় অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়।

ভারতের অনেকাংশ সমুদ্রবক্ষ হইতে বহু উচ্চে এবং আরও অনেক অনেক ভাগ সমুদ্র হইতে বিশেষ উচ্চে নহে। মাঝামাঝি উচ্চতাও নানা স্থানে দেখা যায়। শুষ্কতা, আর্দ্রতা, বারিপাতের অল্পতা অথবা আধিক্য, স্বাভাবিক উষ্ণতা ও শৈত্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক গুণাগুণের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য-ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার। কোথাও দেশ বৃক্ষবহুল, কোথাও বা ঝোপঝাড় ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। উর্বরতা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের সুবিধা থাকায় কোন কোন অঞ্চল জনসমাবেশে পোকার্কী আবার প্রকৃতির প্রতিকূলতাবশত: কোথাও দীর্ঘ পথ চলিলেও জনমনুষ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কোথাও শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্যানী কোথাও বা জীব জন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়াই যায় না। বহুস্থলে শত শত ক্রোশ ধরিয়া বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী প্রবাহিত ও তাহার কূলে অসংখ্য মানুষের বসবাস। কোথাও বহুদূর যাইলেও জল দেখিতে পাওয়া যায় না ও সেই সকল স্থানে অল্প লোকেরই বাস।

অতি পুরাতনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিদেশের সহিত সম্পর্কে প্রভাবিত হইয়াছে। ইহা অনেকটা স্থলপথে ভারতের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকটা জল পথেও আসিয়াছে। ভারতের উত্তর, উত্তরপূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দিকে হিমালয় ও অন্যান্য অত্যুচ্চ পর্বতমালা। ঐ সকল পর্বত অতিক্রম করিয়া অপরাপর দেশে যাইবার যে সকল দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আছে সে গুলির আশে পাশে ভারতীয় জনগণের নিবাস আবহমানকাল হইতেই বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্রতটে যেসকল স্থলে পোতাশ্রয় বা বন্দর গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে সেই সকল স্থলে লোক বসতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের বাস অবশ্য জলের প্রাচুর্য্য ও কৃষিকার্য্যের সুবিধার উপর নির্ভর করাতে সিন্ধুনদ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যে পথে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে সেই সকল অঞ্চলেই বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সুদীর্ঘ পলিমাটি বহুল নদনদী তীরবর্ত্তী অঞ্চল প্রায় দৈর্ঘ্যে ২৫০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৩০০ শত কিলোমিটার। পৃথিবীর মধ্যে এত সুবৃহৎ নদীতটস্থ জনবাসভূমি অতি অল্পই আছে। উত্তর ভারতের যমুনার নদীর কূল হইতে বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার সঙ্গমস্থল প্রায় ১৬০০ শত কিলোমিটার দূরে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ চলিয়া নদীবক্ষ মাত্র ২০০ শত মিটার নামিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। নদীতট সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলির মধ্যে আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল আছে। সেইগুলি হইল গোদাবরী, কৃষ্ণা ও মহানদীর সন্নিপস্থ জনপদ সকল। এই সকল নদনদীর দানপুষ্ট অঞ্চল ব্যতীত আরও কয়েকটি নদীতীরস্থ অঞ্চলের কথা বলা উচিত। সেগুলি হইল নর্মদা, কাবেরী প্রভৃতি কয়েকটি নদীর নিকটস্থ স্থলভাগ।।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সকল জীবজন্তু বাস করে তাহাদের কথা বলিলেও বুঝা যায় যে এই দেশকে যে ভাবেই দেখা যায় তাহাতেই এক অসাধারণ বৈচিত্র্য মানবমনকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দেয়। ইহার মূলে আছে নানান্ প্রদেশের আবহাওয়ার পার্থক্য। হিমালয়ের শীতলবক্ষে যে সকল ছাগ, মেষ, হরিণ ও গোজাতীয় জীব বিচরণ করে তাহাদের কোন কোনটির লোম হইতে বহুমূল্য শালের বয়নকার্য্য করা হইয়া থাকে। ঐ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বরফের মধ্যে

লোমশ তুষার-চিতা, লালভল্লুক ইত্যাদি বাস করে। আসামের জঙ্গলে ও নীলগিরির চিরহরিৎ অরণ্যে নানা প্রকার বানর দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটের গিরি জঙ্গলে সিংহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র আলমোরা অঞ্চলে, সুন্দরবনে, কাজিরাঙ্গায় ও আরও কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে। হাতি, গণ্ডার, বন্য মহিষ, বাইসন, চিতাবাঘ ভারতবর্ষের বহুস্থলেই পাওয়া যায়। সম্বর, স্বর্ণমৃগ কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা, বারশিঙ্গা প্রভৃতি হরিণের প্রাচুর্ভাব ভারতের অধিকাংশ অরণ্যেই লক্ষিত হয়। ভারতের সরীসৃপদিগের কথা বলিতে হইলে তিন প্রকার কুম্ভীরের নাম প্রথমেই করিতে হয়। মৎসভুককুম্ভীর বা ঘাড়িয়াল, লবণাক্ত জলের বাসিন্দা ও মিষ্ট জলবাসী কুম্ভীর এই তিন প্রকার কুম্ভীরই ভারতে পাওয়া যায়।* পক্ষীজগতের যে সকল খেচর সর্ব্বত্র পরিচিত তাহাদিগের মধ্যে ভারতে দেখা যায় বহু পক্ষীকেই। ময়ূর, ময়না, শকুন, চিল, কাক, চন্দনা ও অন্যান্য তোতা, তিতির, পারাবত, মাছরাঙ্গা, হংস ও আরও অসংখ্য জাতির পক্ষী ভারতে পাওয়া যায়।

পশু-পক্ষী ও জল-স্থল বৃক্ষাদির বিচার করিয়া ভারতের অপরূপ বৈচিত্র্যের যে চিত্র প্রতিভাত হয়, ভারতীয় মানবগোষ্ঠিসকলের বর্ণনা করিলে সে বৈচিত্র্যবোধ আরও বহু বিস্তৃতরূপ ধারণ করে। ভারতের জনগণ ১৬৫২টি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন ও তাহার মধ্যে ২৫ টি ভাষায় পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে বাক্যালাপ করিতে দেখা যায়। এই সকল ব্যক্তি নানা ধর্ম্মাবলম্বী। যে সকল বিরাট বিরাট ধর্মগোষ্ঠির মধ্যে অসংখ্য শাখা-ধর্ম গঠিত হইয়াছে সেই সকল মূল ধর্মগুলি হইল হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য। ভারতের জনগণের শতকরা ৮৩ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, ২.৪৪ জন খৃষ্টান; ১.৭৯ জন শিখ এবং ১.২ জন বৌদ্ধ ও জৈন। ভাষার মধ্যে যে সকল ভাষা বহুলোক ব্যবহৃত তাহার মধ্যে হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, উর্দু, গুজরাটি, কন্নাদ, মালায়ালাম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী ও কাশ্মিরীর নাম করা যাইতে পারে। শতকরা ৮০ জন ভারতীয় গ্রামে বাস করেন ও ২০ জন বাস করেন সহরে। জাতিগতভাবে ভারতের জনসাধারণ বহু জাতি হইতে উৎপন্ন। ভারতে আদিম বাসিন্দাগণ ছিলেন বর্ত্তমান ভারতীয়দিগের তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্য জাতীয়। ভাষায়, ধর্মে, কৃষ্টিতে, আচার ব্যবহারে, আকৃতিতে ইঁহারা দ্রাবিড়, মঙ্গলীয় বা আর্য্য হইতে অনেকাংশেই পৃথক ছিলেন। শক, হুন, সিথিয়, পারসিক তাতার প্রভৃতি জাতি, যাহারা পরে ভারতে আগমন করেন তাঁহারা আরই আদিমদিগের তুলনায় পৃথক ছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে যে ভারতীয় মানবসকল জাতির পূর্ণ সংমিশ্রণের ফলে এক নবরূপ ধারণ করিয়াছেন এমনকথা বলা যায় না।

সংমিশ্রণ কিছু কিছু হইয়াছে কিন্তু বহুজাতিই অধিকভাবে আর্য্য, দ্রাবিড় অথবা মঙ্গলীয় থাকিয়া গিয়াছেন। শুধু মনের ক্ষেত্রেই সকলে মূল সভ্যতা এক উৎসজাত হওয়াতে এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারা বহুমুখবাহী হইলেও ক্রমশঃ এক বিরাট ধারায় মিলিত হইয়া একটি সর্ব্ব ভারতীয় রূপ ধারণ করিয়া ভারতের নিজস্ব সভ্যতা সৃজন করাতে বহু জাতি ও বহু চিন্তাধারার একত্র মিলনে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের মানবের ঐক্য ও অর্থনীতি-রাজনীতি-কৃষ্টিও-আদর্শ-ক্ষেত্রে একপথগামী হওয়ার কারণ ঐ মানসিক মিলনের মধ্যেই পাওয়া যায়। যাহারা এই মিলনে বাধার সৃষ্টি করেন তাঁহারা ভারতীয়তা বিনাশকারী।

* ভারতে শত শত প্রকারের সর্প দেখা যায়। বৃহৎ অজগর হইতে আরম্ভ করিয়া অতিক্ষুদ্র লাউডগা পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত ও সাধারণ সর্প পর্ব্বতের শিখরদেশ ব্যতীত অপর সকল স্থানেই বাস করে। জলসর্পও অনেক আছে। মৎস্যদিগের মধ্যে ভারতে ও ভারতীয় সমুদ্র অঞ্চলে বহুজাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়। বৃহদাকার হাঙর হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র মৎস্য অবধি সকল জাতির জলচর মৎস্য জাতীয় জীব ভারতের বাসিন্দা।

জন মঙ্গল

শক্তি সামর্থ্য বুদ্ধি চরিত্রবল সামাজিক প্রতিষ্ঠা পরিবারের অর্থসম্পদ ইত্যাদি যে সকল গুণ বা অবস্থা থাকিলে মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান জোয়াল করিয়া লইতে সক্ষম হয় ভারতবর্ষের নরনারীর সেই সকল গুণ ও অবস্থা সকলের ব্যক্তিগতভাবে সমান থাকিতে দেখা যায় না। বহু নরনারী এদেশে এমন অবস্থাতে থাকেন যাহাতে তাঁহাদের লোকসমাজে অতি কষ্টেই বাস করিতে হয়; এবং জন মঙ্গলের কথা আলোচনা করিলেই এই সকল নরনারীর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়া দেখিলে বহু লোকের কথাই প্রকটভাবে লক্ষিত হয় যাহারা চিররুগ্ন, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, মূক বা অপর কোন ভাবে নিজ চেষ্টায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম। আরও অনেকে আছেন যাঁহারা দুঃস্থ পরিবারে জন্মলাভ করিয়া যথাযথভাবে শিক্ষালাভ না করিতে পারায় কর্মক্ষেত্রে অচল অবস্থাতে পড়িয়া আছেন। অনেকে ভিক্ষুকজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নারীদিগের মধ্যে অনেকে সৎপথে থাকিয়া দিন কাটাইতে না পারিয়া দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। যে সকল লোক অপর সকল দেশবাসীর তুলনায় নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে অক্ষম তাঁহাদের সংখ্যা কিছু কম হইবে না। অঙ্গহীন, মূক, বধির ও অন্ধের সংখ্যা কয়েক কোটি নিশ্চয়ই হইবে। চিররুগ্ন, ভিক্ষুক ও কুপথের পথিকদিগের সংখ্যাও উপরোক্তদিগের সহিত সমান সমান ত হইবেই; অধিকও হইতে পারে।

আইন করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না, কারণ যে সকল কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল কারণ যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবে ততদিন সমস্যাও থাকিবে। কারণ অপসারণ করিতে পারিলেই অসুবিধার দমন সম্ভব হইবে। ভিক্ষুকদিগের উপস্থিতি যদি দূর করিতে হয় তাহা হইলে সকল মানুষকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক হইবে। শুধু উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা থাকিলেই হইবে না, উপার্জ্জন করিবার সুযোগ সুবিধাও সর্ব্বক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন। তৎপরে আছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করার কথা। যতক্ষণ ভিক্ষা করাতে মানুষের আত্মসম্মান অনুভূতি আহত না হয় ততক্ষণ মানুষ পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অথবা অপরের নিকট হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করা সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিবে না। ভিক্ষা করা নিবারণার্থে আইন প্রণয়ন করিয়াও কোন লাভ হয় নাই। ভারতবর্ষে ভিক্ষুক সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। রেলগাড়ীতে পথেঘাটে কোথাওই ভিক্ষুকের অভাব নাই। অনেক ভিক্ষুক আছে যাহারা উপার্জ্জন করিতে পারে না। অনেকে আছে যাহারা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও সে চেষ্টা করেনা। যাহারা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করার কোন রীতি, নীতি, পদ্ধতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহারা সত্য সত্যই কর্মক্ষম নহে তাহাদের সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা নাই। ভিক্ষা একটা ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও ভিক্ষুক সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের ভিক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া অনেক ব্যবসায়ী লাভের কারবার চালাইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে বালক বালিকা অপহরণ, তাহাদিগকে হাত, পা ভাঙিয়া অঙ্গহীন করিয়া ভিক্ষুকের উপযুক্ত রূপ দান প্রভৃতি অতি গর্হিত কার্য্য নানা স্থানে করা হইয়া থাকে। ইহা নিবারণ চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও অদ্যাবধি এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে।

ভারতবর্ষে শুনা যায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক অন্ধ ব্যক্তি আছেন। ইহাদিগের জন্য প্রায় ১৫০টি অন্ধ বিদ্যালয় আছে। অর্থাৎ প্রায় ৩৩০০০ জন অন্ধ মানুষের জন্য একটি স্কুল আছে। এইরূপ অন্ধ বিদ্যালয়ের সংখ্যা যদি ১৫০ হইতে বাড়াইয়া ২০০০/৩০০০ হাজারও করা যায় তাহা হইলেও অন্ধ সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হইবে না। মূক বধিরদিগের সংখ্যা কেহ বলেন ৬০ লক্ষ কেহ বলেন ৮০ লক্ষ। সংখ্যা যাহাই হউক তাহাদের শিক্ষার আয়োজন এদেশে বিশেষ কিছু নাই। ইয়োরোপ

আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আজকাল বহু বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মূক বধিরদিগকে সমাজে একটা উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে শিখান হয়। আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যায় নানান্ স্থলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য জনমঙ্গলের ব্যবস্থা কোন না কোন সময়ে আরম্ভ করিতেই হয় ও ৬০ কোটি মানুষের মধ্যে যাহাদের বিশেষ প্রকারের সাহায্য প্রয়োজন তাহাদের সকলের ব্যবস্থা করিতে অনেক সময় লাগাই স্বাভাবিক। মূক বধির ব্যতীত আরও নানান্ প্রকার অক্ষমতা আক্রান্ত ব্যক্তি থাকে যাহাদের বিশেষ প্রকারের সাহায্য ও শিক্ষা আবশ্যক হয়। যাহারা মানসিকভাবে কিছুটা অস্বাভাবিক, উন্মাদ না হইলেও পূর্ণরূপে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন নহে, সেই সকল ব্যক্তির শিক্ষা ও জনসমাজে বাস করিবার ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করা আবশ্যক ও সেই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে করা হয় নাই। মানসিক অক্ষমতা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় এখন অবধি অল্পই আছে। অক্ষমতা প্রবল না হইলে শিক্ষাদ্বারা তাহা অনেকটা স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে।

ভারতবর্ষে মানব-অকল্যাণকর নানান্ পরিস্থিতি দেখা যায় যাহা দূর করিতে না পারিলে জনহিতকার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। জাতিভেদের অন্যায় সমাজ-বিরুদ্ধতা কতকটা দমন করা হইয়াছে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় নাই। অস্পৃশ্যতা এখনও কোথাও কোথাও জাগ্রতভাবে সমাজকে আলোড়িত করে। তাহার অপসরণ সম্পূর্ণ হয় নাই। আর এটা অতি লজ্জাকর সামাজিক প্রথা হইল বাল্যবিবাহ। ইহা আইন করিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু এখনও ইহার প্রচলন বর্ত্তমান আছে। ১০।১২ বৎসরের বালক বালিকার বিবাহ অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে পূর্ণরূপেই এখনও বর্ত্তমান আছে। বিশেষ করিয়া জনবিরল প্রদেশগুলিতে। যাহাদের পরিবারে এইরূপ বিবাহ হয় তাহাদের মধ্যে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু তাহাদের উপর সরকারী কোন আইনভঙ্গের জন্য চাপ পড়িবার কথা আমরা কখন শুনি নাই। যদি একটা উচ্চ স্তরের অনুসন্ধানকারী কর্মপরিষদ গঠন করিয়া সরকারী কর্মচারীদিগের আইনভঙ্গ করা সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য বহু ব্যক্তির শাস্তি হইবে নিঃসন্দেহ। ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহ এখন আইনভঙ্গ না করিয়া কেহ করিতে পারেনা। কিন্তু এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অপর পত্নী গ্রহণ এখনও চলিতেছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহাও অনুসন্ধানের বিষয়। অস্পৃশ্যতা উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের বিশ্বাসও যে যাথার্থ্য অবলম্বনে গঠিত এরূপ ধারণার কোন সম্যক কারণ নাই। ক্রয় বিক্রয় বেতন-দান খাজনা মাশুল রাজস্ব ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনকানুন কালোবাজার ও কালো অর্থের ধাক্কায় রসাতলে গিয়াছে। কালো বাজার যে সমাজ-বিরুদ্ধ তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু কালো বাজার সমর্থক ব্যক্তিদের সংখ্যা হইবে কয়েক কোটি। ইঁহাদিগের কার্য্যকলাপ কোনও ভাবে সহজে বন্ধ করা যায় না। সুনীতি ইঁহাদিগের নিকট লাঞ্ছিতা, রাজশক্তি অসহায়া, আইনগ্রাহ্য নীতি পদ্ধতি পদদলিত। শত সহস্র রাজপুরুষ এই সমাজশত্রুদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। আত্মবিক্রয় যদি না করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও এই দেশদ্রোহীদিগের নিকট তাঁহারা নির্বীর্য্য ও পরাভূত।

লণ্ডনের অর্থ নৈতিক মাহাত্ম্য

বৃটেন যে সময়ে এক বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন সে সময়ে লণ্ডন পৃথিবীর অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের মহান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তখন সকল ক্রয়-বিক্রয়, চালান, বীমা, টাকার লেন-দেন অধিক ক্ষেত্রেই লণ্ডনকে কেন্দ্র করিয়া চালিত হইত কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে

লণ্ডনের সে আর্থিক শক্তি ও আভিজাত্য আর থাকা সম্ভব হইল না। ইহা ব্যতীত পৃথিবীর অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিরাট শক্তির আধাররূপে গড়িয়া উঠিল মার্কিণ ধননীতি ও অর্থসম্পদ। এই আমেরিকান শক্তি বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতই মনে হইয়াছিল যে অতঃপর নিউইয়র্কই সকল ব্যবসা বাণিজ্য ও লেন-দেনের কেন্দ্ররূপে লণ্ডনকে ছায়ায় ঠেলিয়া দিয়া নিজে ঐশ্বর্য্যের প্রখর আলোকে জগতের চক্ষু ঝলসাইয়া বিরাজ করিবে। কিন্তু বস্তুত তাহা হইল না। নিউইয়র্ক তথা আমেরিকান অর্থনীতি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিয়া সে সম্ভাবনাকে অসম্ভব করিয়া দিল। মার্কিণ রাজনীতি অর্থনীতিকে নানা প্রকার নীতি-রীতি ও পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া অসাড় অবশ করিয়া তুলিল। মার্কিণ ধনিকগণ নিজ দেশে বিশ্ববিস্তৃত লেন-দেনের কারবার চালাইতে না পারিয়া অন্যত্র কার্য্যকেন্দ্র খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন ও স্বভাবতই তাঁহারা লণ্ডনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই পুরাতন ও বৃহৎ ব্যবসা-কেন্দ্রকেই নিজেদের কারবারের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিবার কথাই স্থির করিয়া লণ্ডনের আশ্রয়েই মার্কিণ মূলধন স্থাপন করিলেন। বহু সংখ্যক মার্কিণ ব্যাঙ্ক লণ্ডনে আসিয়া লেনদেন আরম্ভ করিলেন ও তাহার ফলে লণ্ডন আবার নিজের হারান গৌরব ফিরিয়া পাইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও বিরাটতম লেনদেনের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। লণ্ডনই হইল পৃথিবীর স্বর্ণের বাজার এবং লণ্ডন হইতেই বহু বাণিজ্য ও জাহাজী বীমার কার্য্য হইতে থাকিল। যাহার টাকার আবশ্যক ও যাহার টাকা খাটাইবার প্রয়োজন উভয়েই লণ্ডনে গিয়া নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিতে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিল। লণ্ডনের প্রতিষ্ঠা এই ভাবে অক্ষুন্ন রহিয়া গেল।

আমেদাবাদে সৈন্যবাহিনী

[illegible] দিবসের পর হইতে যে গণ-বিক্ষোভের সূত্রপাত হয় ও যাহাতে কয়েক ব্যক্তির প্রাণ যায় তাহার ফলে আইন বজায় রাখা কঠিন হওয়াতে ২৯শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নকাল হইতে সামরিক বাহিনীকে শান্তিরক্ষার কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ ইহার পূর্ব্বে গুলী চালাইতে বাধ্য হওয়াতে প্রথমতঃ তিন ব্যক্তি হত হয় ও আর একটি বালক ২৮শে জানুয়ারী যখন জনতা একটি খাদ্যবিক্রয় কেন্দ্র লুঠ করিবার জন্য তাহার দরজা ভাঙিয়া ফেলে সেই সময় পুলিশের গুলীতে মারা যায়। ১০ই জানুয়ারী হইতে যে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহার ফলে জানুয়ারীর ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ৩১ জন মানুষের প্রাণহানী হইয়াছে ও ৮৮ জন আহত হইয়াছেন। সামরিক বাহিনী ২৭শে রাত্রি হইতেই আমেদাবাদে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। একদল ব্যক্তি একটি সভাতে শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি দিবার পরে ফিরিবার পথে মন্ত্রী ডাঃ আমুল দেশাই-এর গৃহে প্রস্তর নিক্ষেপ করে কিন্তু ডাঃ দেশাই সেই সময় গৃহে ছিলেন না। জনতা আরও অনেক স্থলে দোকান লুঠ করিয়া খাদ্যবস্তু প্রভৃতি লইয়া চলিয়া যায় এবং বহু স্থলেই পুলিশ কাঁদুনে বাষ্পগোলা ছুঁড়িয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এক স্থলে জনতা ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি শাখাদফতর আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পুলিশ একবার গুলী ছুঁড়িয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। ক্যাম্বে ও বরোদাতেও হাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে এবং পুলিশ সর্ব্বত্রই কঠিন হস্তে জন-বিক্ষোভ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। শান্তিপ্রিয় গুজরাটবাসীদিগের এই হিংসাত্মক ব্যবহারে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা চমৎকৃত হইয়া ইহার সমাধান চেষ্টায় তৎপর হইতেছেন। খাদ্যসামগ্রী দ্রুতগতি গুজরাটে পাঠানো হইতেছে। ইহার মূলে রাজনৈতিক উস্কানি আছে সন্দেহ করা হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসেরকর্ম্মীসংখ্যা অত্যধিক

ভারতবর্ষে প্রায় সকল কার্য্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম্মী নিয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহার মূলে আছে সেই জাতিভেদজাত মনোভাব যাহা মানুষকে "ইহা আমার কাজ" বা "উহা আমার কাজ নহে" এইরূপ ধারণার বশ করিয়া তুলে। যে তথাকথিত

অপকৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত সে উৎকৃষ্টতর কার্য্য করিতে পারে না এবং যে রন্ধন অথবা পানীয় জল সরবরাহ করে সে জুতা পরিষ্কার, ঘর মোছা কিম্বা পাইখানা প্রভৃতি ধুইবার কার্য্য করিতে একান্তই নারাজ। মৃত পশুর চামড়া যে ছাড়াইবে সে হয়ত পশুর মৃত দেহ লইয়া যাইবেনা, যন্ত্রপাতি চালনা কার্য্য ও তাহার তৈলদান, পরিষ্কৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারীকে করিতে হইবে বলিয়া এ দেশে সকলে মানিয়া লইয়া থাকেন। অপরাপর দেশে কোন কার্য্য করিতেই কাহারও আত্মসম্মানে অথবা জাত্যাভিমানে আঘাত লাগেনা। যে ব্যক্তি টিকেট বিক্রয় করে বা খাতা লেখে সেই ব্যক্তিই নিজ দপ্তর কক্ষ ঝাড়পোঁছ করিয়া পরিষ্কার রাখে। ভৃত্যদিগের মধ্যে যিনি রন্ধন করেন তিনিই ঝাড়পোঁছ, পাইখানা ধোলাই বা বাগানের ফুলগাছ রোপন অথবা তাহাতে জল দান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই বহুলোকের অল্প-অল্প কাজ করিবার রীতি ছিল ও তাঁহারা সকলেই অল্প বেতন পাইতেন। বর্ত্তমানে যখন সকলের বেতনই বাড়িয়া চলিয়াছে তখন নিয়োগকর্ত্তাদিগকেও দেখিতে হইতেছে যাহাতে বেতনের উপযুক্ত কার্য্যও সকলে করে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কর্ম্মীদিগের বেতন অন্যান্য বিভিন্ন কার্য্য ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের তুলনায় উচ্চ বলিয়াই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এই সকল বিমান পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ যথেষ্ট কার্য্য করিতেছেন কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে যে সকল কর্ম্মীর যথেষ্ট কাজ নাই। একটা অনুসন্ধান শেষ হইলে পরে বলা হইয়াছে যে ১৫০০০ হাজার ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ৬০০০ ব্যক্তির কাজ কিছু নাই। তাঁহারা অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

নির্দ্দলীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের মিলিত থাকায় বাধাসৃষ্টি

শ্রীমতী গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি টিটোর যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এক সময় নির্দ্দলীয় রাষ্ট্রগুলির যাহাতে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায় তাহার যে চেষ্টা অনেক শক্তিমান রাষ্ট্র করিয়া থাকেন, সে কথার বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। বিষয়টা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঐ দুই রাষ্ট্রনেতা তাহা লইয়া বিশেষ কোন ব্যবহার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের মতে যে সকল রাষ্ট্র পৃথিবীর কোনও বিশেষ একটা সামরিক দলে সংযুক্ত নহেন অর্থাৎ যাঁহারা আমেরিকান দল, রুশীয় দল অথবা চৈনিক দলের সহিত সংযুক্ত নহেন তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃজন চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য শুধু জাগ্রতভাবে ঐ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার ব্যবস্থাই যথেষ্ট। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রীমহলে এই সকল চেষ্টা বিষয়ে সতর্কতা থাকিলেই নির্দ্দলীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব সবলভাবেই সংরক্ষিত থাকিবে। খোলাখুলি অথবা গোপনে কোন শক্তিমান কি চেষ্টা কখন করিয়াছেন তাহা না বলা হইলেও বিষয়টা অজানার অন্ধকারে পড়িয়া নাই। সকলেই জানেন যে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া অথবা ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় বিবাদের চেষ্টা কে, কখন ও কি ভাবে করিয়া থাকে। বিবাদ যাহাতে না হয় অথবা হইলে যাহাতে সহজে ও শীঘ্র তাহা মিটিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে ভারত ও অন্যান্য শান্তিপ্রিয় জাতি সতত্তই প্রস্তুত থাকেন। বৃহৎ বৃহৎ যে সকল সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রবল জাতি আছে তাহারা যুদ্ধ লাগাইতে চাহে প্রথমতঃ ব্যবসা বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইবার সুবিধার জন্য। অন্য কারণ তাহাদের বিপক্ষ সামরিক দলের অসুবিধার কারণ ঘটাইবার জন্য; অর্থাৎ যে সকল জাতি যুদ্ধে ফাঁসিয়া যাইলে কোন শক্তিমানের বিপক্ষের সামরিক দানবের ঘাড়ে তাহার বোঝা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাপিয়া যাইবার সম্ভাবনা; শক্তিমানগণ সেইরূপ বাছাই করিয়া নির্দ্দলীয় রাষ্ট্রের সহিত অপর নির্দ্দলীয় রাষ্ট্রের বিবাদ সৃষ্টি করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

কাগজ অতি দুষ্প্রাপ্য

খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজও অন্যান্য মূল্যবান কাগজের তুলনায় অধিক পরিমাণে কাঠে থেঁতলান মণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়। এই কারণে যে সকল দেশে

নরম কাঠের অরণ্য বিস্তৃতভাবে গজাইয়া থাকে সেই সকল দেশেই খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় ও ঐ সকল দেশ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঐ কাগজ চালান হইয়া থাকে। সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ক্যানাডা এইরূপ অরণ্যের জন্য খ্যাত এবং ঐ সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষেও সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আনান হইয়া থাকে। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষে এই প্রকার অল্পমূল্যের কাগজ সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে এবং সকল প্রকার কাগজেরই মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে সংবাদপত্রাদি মুদ্রণ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক টাকার কাগজের এখন বাজারের দাম হইয়াছে তিন চার টাকা এবং সেই দামেও কাগজ পাওয়া যায় না। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ অথবা নিউজ প্রিণ্ট যাহা পাওয়া যায় তাহা ঈষৎ লালচে রঙের ও সম্ভবতঃ তেমন টঁ্যাক্‌সই নহে। যাঁহাদের আমদানি করিবার হুকুমনামা আছে তাঁহাদের আমদানির খরচ কিছু কমে হয় কিন্তু অনেক সময় বিদেশী বিক্রেতাগণ টাকা পাঠাইলেও মাল পাঠাইতে পারিবে না বলিয়া টাকা ফেরত দিয়া দেয়। এই সকল কারণে সংবাদপত্র পরিচালনা অধিকাংশ পরিচালকদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি সুইডেন ভারতকে ১০০০০ টন কাগজ পাঠাইবেন বলিয়া কড়ার করিয়া প্রথম দফায় ৫০০০ টন মাল পাঠাইয়াছেন ও স্থির করেন যে পরে দুই ভাগে ৪০০০ টন করিয়া বাকি ৮০০০ টন মাল পাঠাইবেন। কিন্তু একটা নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া কাগজ আসা বন্ধ হইয়া গেল। কোনও জাহাজই ভারতবর্ষের জন্য ঐ রপ্তানি মাল বহন করিয়া কোনও ভারতীয় বন্দরে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত না হওয়ায় সুইডেনের মাল সুইডেনেই পড়িয়া রহিল। ৮০০০ হাজার টন কাগজ সকল আয়োজন যথাযথভাবে ঠিক করা সত্ত্বেও সুইডেন হইতে ভারতে আসিয়া আর পৌঁছাইতে পারিল না। এখন কাগজ কি মূল্যে কোথা হইতে কখন আসিতে পারিবে তাহা কোনও গণৎকার বলিতে সক্ষম নহেন।

সুসভ্য শাসন কার্য্য ও শাসাইয়া বিরুদ্ধবাদ দমন

সুসভ্য শাসন পদ্ধতি অনুসরণে যে দেশ শাসিত হয় সে দেশে কেহ কোনও আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে ও রীতি মানিয়া বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রকাশ্য ও যথারীতি বিচার করিয়া যদি প্রমাণ হয় যে বিচারাধীন ব্যক্তি নির্দ্দোষ তাহা হইলে তাহাকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয়। কোনও সুসভ্য দেশে বিচার না করিয়া কাহাকেও কারারুদ্ধ করা শাসন নীতি বলিয়া অধিককাল প্রাহ্য থাকিতে পারে না। যুদ্ধ, বিদ্রোহ বা কোনও অসাধারণ পরিস্থিতিতে শাসকদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে সন্দেহে গ্রেফতার করিয়া রাখিতে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে ব্যবস্থা সর্ব্বদাই অল্পকাল স্থায়ী হয়। অধিক দিন সে ব্যবস্থা চালিতে দিলে দেশ-শাসকদিগের ন্যায় জ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সন্দেহ হইতে আরম্ভ করে এবং দেশবাসী শাসনকার্য্যে স্বৈরাচারের আবির্ভাব দেখিয়া শাসকদিগকে অপসৃত করিয়া সুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। সুসভ্য রীতিতে যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দেশে এইরূপ জনমনের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই ঘটিতে পারে এবং স্বৈরাচারী শাসকদিগকে অপসারণ করিবার চেষ্টাকেও বিপ্লব বা বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কদাপি তদ্দেশের অবস্থার ন্যায্য বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

শাসকদিগের স্বৈরাচার যখন প্রাথমিক অবস্থায় থাকে তখন দেখা যায় যে শাসকগণ যাহাকে তাহাকে বিপ্লবী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কথায় কথায় কঠিন হস্তে অতি সাধারণ আন্দোলন দমন চেষ্টা করিতেছেন এবং বেআইনী আইন প্রণয়ন করিয়া সাধারণ সমালোচক ও বিপ্লববাদী নির্ব্বিচারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই কারারুদ্ধ করিতেছেন। এই সকল লক্ষণ দেখিলেই চিন্তাশীল সংবিধান সংরক্ষক ব্যক্তিদিগের মধ্যে শাসক গোষ্ঠির মতলব সম্বন্ধে আশঙ্কার উদয় হইতে আরম্ভ করে এবং

(এরপর ৫৬৯ পাতায়)

সরণ্যু ও বিবস্বান

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

জরা-মরণ-ভীতি ভ্রংশী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে নানাভাবে তাঁর স্তুতিবন্দনায় মুখর হয়েছেন আদি-যুগের ঋষি। সেই সঙ্গে সৃষ্টির আদিম প্রত্যূষকে স্মরণ করেছেন তাঁরা সেই পূর্ণতার কারণ-সলিল হ'তে সর্ব-পূর্ণকারী মহাপূর্ণতার কাছে আত্মনিবেদনের কালে। তখন যে পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা, তার বেদোজ্জ্বলা ধারণা থেকেই মহাজ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে সমস্বরে নিবেদন করেছেন পরমা প্রার্থনা :

—প্রথমা হ ব্যুবাস সা ধেনুরভবদ্ যমে।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম॥

—সৃষ্টির আদিতে ছিল না দিবা, ছিল না রাত্রি। সেই অন্তহীন কালের অনন্ত যাত্রাপথে এই প্রথমা উষসী—পিতৃলোকাধিপতি যমরাজের সে প্রিয়পাত্রী। একাকিনী দিবসের সে অক্ষয়ফল সাধনাপূত সুরভি ধেনু। সে আমাদের নিকট পয়স্বতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর অভিমত ফল প্রদান করুক।

জীবনে তেজোদৃপ্ত যৌবনশ্রী ফুটাবার জন্য আত ব্যগ্র সেই ঋষিকুলের আকুতি প্রতি মুহূর্তে শ্রবণ করে চলেছেন সরণ্যু। নবীন বর্ষের সূচনায় চিরনবীনা শক্তির এই প্রার্থনা প্রতি মুহূর্তে গ্রহণ ক'রে চলেছেন উষা।

উষা,—অন্ধকার বিনাশিনী, স্বর্গদ্বারোন্মোচন-কারিণী, দুঃস্বপ্ন ও অপদেবতাসমূহের হন্ত্রী। তিনি বিশ্বচরাচরকে নিদ্রা হ'তে জাগরিত করেন—সর্বত্র সঞ্চারিত করেন প্রাণরস। বারংবার বন্দনায় মুখরিত হয়েছে তাই স্তবমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠ :

—সর্ব জ্যোতির্ময়দের শ্রেষ্ঠারূপে আবির্ভূতা, বিচিত্র পরাজ্ঞানসহ ব্যাপ্ত চরাচরে সুখদাত্রী, হে জ্যোতি-র্ময়ী উষা, সূর্য হ'তে অজ্ঞানের উদ্ভবের মতো তোমার আদিপীঠে ধন্যা হয়েছে রজনীর কল্প-বিকল্পনা।

দেখেছেন তাঁরা—

এঁর ক্রমাধানে এসেছিল জ্যোতির্ময় বৎসা শুভ্রা জ্যোতি। বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পরস্পরে করে, অনুসরণ, অমরদ্যুলোকে রূপহীন হয়ে করে বিচরণ।

দেবাত্মায়, একই অন্তহীন পথে পরস্পরে এগিয়ে চলে এই দুই ভগিনী। পরস্পর এক মনে—সুরূপা উষা, ও বিভিন্নরূপিনী রজনী চলে অবিরাম—কখনও স্তব্ধ হয় না তাঁদের অভিরাম গতি।

সরণ্যু,—সর্বসত্যের জ্যোতির্ময়ী নেত্রী। জ্ঞান-প্রবুদ্ধ সৃষ্টির কাছে মুহূর্তে উন্মুক্ত করেন বিচিত্র জ্ঞান-দুয়ার। জগতের বিশিষ্ট রূপকে প্রকাশিত করেন তিনি—সর্বভুবনকে জ্ঞানে জাগ্রত করেন এবং দিব্যানন্দে পূর্ণ করেন সকলকে।

আপন প্রজ্ঞানে ঋষিকণ্ঠে অপরূপা হয়ে বর্ণিতা হয়ে উঠেছেন চিত্রময়ী সরণ্যু :

—কুটিল পথের যাত্রিককে ধনদাত্রী তুমি শুধু দিব্যানন্দের কারণে বিরত করো ভোগ হ'তে। সামান্য দিব্যদৃষ্টি সম্পন্নকে—প্রথিত উষা, দেন বিশিষ্ট দৃষ্টি—সর্বভুবনকে প্রবুদ্ধ করেন জ্ঞানে।

জ্যোতির্বসনা যুবতী এই দ্যুলোকদুহিতাকে দিব্য দৃষ্টিতে প্রকটিতা হ'তে দেখে উৎফুল্ল ঋষিহৃদয় তাঁকে আহ্বান জানায় আপনাপন মন্ত্রে :

—সর্বরূপ পার্থিব ধনের ঈশ্বরী, অয়ি সৌভাগ্য-শালিনী উষা, আজ এই যজ্ঞে প্রকট হও তুমি।

স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তাঁরা—

চিরন্তনীদের মাঝে ইনিই প্রথমা। আগমনী উষা অনুসরণ করেন পর যে গত আপনারই যাত্রাপথ। এঁরই প্রকাশে উর্ধ্বগতি হয় জীবের। —যোগপথে এই দেবীই প্রবুদ্ধ করেন মৃত্যুকেও।

আহ্বান করেন:

—যবে তুমি সুপ্রজ্বলিত করো অগ্নিকে, অয়ি উষা, তবে সত্যের দিব্যদৃষ্টির দুয়ার হয় উন্মুক্ত। যাজ্ঞিক মানবগণকে যবে প্রবুদ্ধ করো, তবে দেবগণমধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তোমার কল্যাণময় দিব্যকর্মরাশি।

সেই যজ্ঞাহ্বানের সাথেই বারংবার ধ্বনিত হয়ে ওঠে তাঁদের নমস্তুতি:

—সত্য পালিকা, সত্যসম্ভূতা, আনন্দময়ী, প্রিয়-সত্যমন্ত্রপ্রেরয়িত্রী, সুকল্যাণধাত্রী। সর্বশত্রু হ'তে পৃথক করে আমাদের। শ্রেষ্ঠতমা আজ এই যজ্ঞে প্রকাশিতা হও তুমি, সংগত করো দেবজন্ম।

সমস্বরে গীত হয় ঋষিকণ্ঠের মন্ত্রবাণী:

—বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী
চক্ষুরুর্বিয়া বিভাতি।
বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য
বাচমবিদন্মনায়োঃ॥

প্রশ্ন জাগে নবীনকালের মুনিবৃন্দের মনে:

—কে এই উষানাম্নী যাজ্ঞিকসত্যের দেবী? রশ্মি-সন্তারের সমুদ্‌গতা হয়ে কেমন ক'রে সম্ভবিতা হয়েছেন এই আলোকবিত্তা আলোকদুহিতা?

প্রশ্ন জাগে:

—কি এই প্রাচী-উদ্ভাসিনী উষা সৃষ্টির রহস্য? প্রতি রজনীর অন্তে নবীনারূপে সমুদিতা তমঃধ্বস্তী প্রসিদ্ধা এই জ্যোতির পরিচয়ই বা কি? উদয়-মহিমায় পূর্ব-দিগন্তে স্মিতহাস্যে দণ্ডায়মানা এই বিচিত্রদৃশ্যা আকাঙ্ক্ষতী উষার কাছে কি সত্যই পৌঁছায় তাঁদের স্তুতিগাথা?

প্রশ্নান্বিত হয়ে ওঠে নবীন ঋক্‌-দ্রষ্টার হৃদয়:

—সূর্য-প্রণয়িনী উষাকে সদা অনুসরণ করেন কেন স্বয়ং ধ্রুবজ্যোতি বিবস্বান? রবিপ্রিয়া উষা না এলে কি নিখিল বিশ্ব হ'তে চিরবিদায় নেবেন ভাস্কর? অরুণভোগ্যা উষার স্তবেই তুষ্টি কেন স্বয়ং সবিতৃর?

বুঝতে পারেন না তরুণ ঋষিবৃন্দ:

—ভগভগিনীরূপে সুখ্যাতা ও বরুণের আত্মীয়ারূপে পরিজ্ঞাতা এই উষাকেই ইন্দ্রকন্যা এবং ইন্দ্রকর্তৃক সংহৃতা বলে প্রচার করা হয়েছে কেন? কেন স্বর্গবৈদ্য অশ্বি-দ্বয়েরই শ্রীকে অনুসরণ ক'রে আগমন করেন সেই অভি-নবত্বসম্পন্না রমণীয়া সরণ্যু?

প্রত্যক্ষ করেছেন, চমৎকৃতা হয়েছেন, কিন্তু উন্মো-চিত করতে পারেন নি সেই রহস্যাবরণ—

কেমন ক'রে সেই দ্যোতনাত্মিকা উষা সকল ভুবনা-ভিমুখে প্রকাশিত হয়ে পশ্চাদ্‌গামীর প্রতি আপন অনুগ্রহদৃষ্টিকে সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ করেন—প্রতিভাসিত রাখেন? কিভাবে সেই উদ্বোধনকারিণী সংজ্ঞাপ্রদাত্রী দেবী সকল অনুসারী জনের প্রার্থনাকে পূরণ করেন?

বুঝতে পারেন না তাঁরা—

কোন্ মহিমায় সেই বৈচিত্র্যশালিনী, পরমধনাধি-কারিণী দেবী উষা পশুভাবরূপ সকল অজ্ঞানতাকে নিবারণ করেন, বিনাশ করেন? কোন্ মহিমায় জ্ঞান-জ্যোতিঃ সমূহ বিস্তারকারিণী মহতী সেই উষা, স্যন্দন-শীল জল প্রবাহ যেমন অচিরেই নিম্নদেশকে ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ সকল লোককেই ব্যেপে আছেন?

পূর্বকল্পে ত্বষ্টৃপুত্রী সংজ্ঞারূপে সূর্যকে লাভ করেও শেষ পর্যন্ত কল্পাবসানে ভৈরবলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে মহাপ্রকৃতির সত্তা, ভৈরবভাবের মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রসঙ্গে সূত কর্তৃক প্রথম বর্ণিত হয়েছিল সেই আদিম-তমা উষার সৃষ্টিবার্তা।

মহাপ্রলয়ের অবসানে তমোময় এই চরাচর জগতে সকলই যখন প্রসুপ্ত ও অতর্ক্যাবস্থায় পরিণত হলো, নাম-রূপাদির আভাস মাত্রও যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন অবিজ্ঞেয় ও অবিজ্ঞাত সেই জগতে নিখিল পুণ্য

কর্মের কারণ, অব্যক্ত মূর্তি স্বয়ম্ভূ এই অখিল জগৎ প্রকটিত করত প্রাদুর্ভূত হলেন তমোরাশির অপসারণে। যিনি সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অণীয়ান অথচ মহীয়ান দেবেশ্বর, তিনিই তখন নারায়ণ নামে বিখ্যাত হয়ে স্বয়ংই সমুৎপন্ন হলেন, এবং সম্যক চিন্তার দ্বারা বিবিধ বিশ্বসৃষ্টি কামনায় স্বীয় শরীর হ'তে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করলেন সকল প্রাণোৎসরূপী জলরাশি। পরে সেই জলে নিক্ষেপ করলেন বীজ। ঐ বীজ পরে এক হেম-রূপ্যময় মহান্ অণ্ডে পরিণত হলো। ঐ অণ্ড অযুত সূর্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করল। মহাতেজা আত্মভূ স্বয়ং তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সহস্রবৎসরকালব্যাপী নিবাসিত হলেন। পরে প্রভাব ও ব্যাপ্তিক্রমে বিমুক্ত প্রাপ্ত হলেন। অনন্তর প্রথমেই তন্মধ্যে প্রাদুর্ভূত হলেন ভগবান সূর্য। আদিভূত ব'লে আদিত্য নামে অভি-হিত হয়ে সৃষ্টি-ইচ্ছার সহায়ক হলেন সেই মহান্ তেজো-পিণ্ডাকৃতি স্বয়ং বিবেকের জ্যোতি।

এরই সঙ্গে সার্থক হলো পদ্মযোনি ভগবান পিতা-মহের লোকসৃষ্টি। সার্থক হলো তাঁর মন হ'তে জাত মানস প্রজাবৃন্দ ও দেহ হ'তে উৎপন্ন মাতৃহীন পুত্রবৃন্দের সৃষ্টি।

এইভাবে অতীন্দ্রিয়দেহা দীপ্ত তেজোময়ী ও দিব্য জ্ঞানসমুত্থা সেই মহীয়সীর সৃষ্টিকালেই প্রজাপতির কল্পনালোকে গুণত্রয়ের দ্বন্দ্ব প্রাদুর্ভূত হলো। মার্তণ্ড-জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করল সত্ত্বের প্রসারণ এবং সেই গুণকে খর্ব করতে বিরুদ্ধাচারী হলো তমের বিকার। উভয়ের মধ্যস্থায়ী রূপে বিরাজিত হলো রজের অহংকার।

ব্রহ্মাণ্ডে জাত বিপুলজ্যোতি মার্তণ্ডের চেয়েও কল্পনাতীত বিরাটত্বে রাজিত ছিল ব্রহ্মাণ্ডের তনু; এবং সেই বিশালত্বের যে অংশে যখন মার্তণ্ডজ্যোতির প্রকাশ সম্ভাবিত হলো, তখন সেখানেই সাত্ত্বিকত্বের অনুসারী হলো রাজসিকের বৃত্তি। আর যে অংশে যখন উত্তাসনাপারগ হলেন আদিত্য, সেখানে তখনই তামসিকতার অনুগামী হলো ঐ মধ্যম গুণ।

যুগপৎ রজঃসমীরণে ভূলোকের অর্ধ-অর্ধ অংশে আপনাপন অধিকার লাভ করল সত্ত্বঃ ও তমঃ।

সম্ভাবিত হলো ভূলোকের দিবা ও রাত্রির কল্পনা। দিবসাধিকারী হলেন সত্ত্বঃ, এবং রাত্রিকে প্রাপ্ত হলেন তমঃ। রজের অধিকারভুক্ত হলো উভয়াধিকারেরই কালবিভাগ। সৃষ্টি সহায়তায় এক কালেই সহসা ব্রহ্মাণ্ডার্ধে আপন অযুতরশ্মিসমন্বিতব্যাহারে যখন আবি-র্ভূত হতেন মার্তণ্ড, তখন পলকপতন মুহূর্তও অবসর পেত না তমসা অপসৃত হ'তে। আবার দিবা-বসানে সহসাই সংঘটিত হতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবির্ভাব।

দিবা বা রাত্রির স্বীকৃতিধন্য আবির্ভাব ও শাসনা-ধিকারের কালে দানবকুলে জন্মলাভ করেছিলেন ভিন্নাঞ্জন-পুঞ্জপ্রতিম অন্ধক। দুর্জয়, অদ্ভুতকর্মা, অজেয় এবং বজ্রাঘাতেও দুশ্ছেদ্য সেই দৈত্যবরের অত্যাচারে তপস্বীবর্গের তপোবন সহ সমগ্র স্বরলোকও বিধ্বংস হয়ে গেল। বিনষ্ট হলো ধনাধিপতি কুবেরের পদ্মরা-গাদি মহারত্নে মণ্ডিত বিটপাকার ধ্বজ, বিধ্বংস হলো যমের কাষ্ঠ ও লৌহময় বৃকচিহ্নিত মহাধ্বজ, হৈমসিংহ-ধ্বজে সুশোভিত সূর্যও হলেন অবরুদ্ধ। রত্নচিহ্নিত কুম্ভে উপলক্ষিত বিচিত্রযোধী অশ্বিনীযুগলের কেতুও বিভগ্ন হয়ে গেল। বিচূর্ণ হয়ে গেল শতক্রতুরও সিত চামরমণ্ডিত, হৈমপাতকাকাররচিত এবং চিত্রবিচিত্র রত্নরাজিখচিত সুরধ্বজ। ধ্বস্তধ্বজ হলেন অগ্নি ও বরুণ, অনিল ও বৃহস্পতি, এবং আরও অনেকানেক বসু-পতি ও সুরপুরুষ। সুরারি অন্ধকের ত্রাসে বিত্রাসিত সুরবৃন্দ স্বর্লোক পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করলেন প্রাণ-রক্ষার অভিলাষে।

পাকশাসনের পরাক্রমাবসানে শুধু স্বর্গেই নয়, ত্রিভুবনেই প্রতিষ্ঠিত হলো দৈত্যশাসন।

দেবপরিপন্থী অসুরের প্রীতি কামনায় ভূলোকে প্রজ্বলিত হ'তে শুরু হলো যজ্ঞাগ্নি। যজ্ঞভাগী অন্ধকের চিত্তপ্রসাদক উদারার্থ রচনাবলী বিন্যাসিত ক'রে দেবনিন্দক নববেদ বিরচিত হলো। দিকে দিকে গীত

হ'তে শুরু হ'লো সুরাসুর-মর্দী আসুরিক কীর্তিকথা। উদাসীন শচীপতির আসনাধিকার করলেন দৈত্যগুরু স্বয়ং শুক্রাচার্য।

গন্ধর্ববৃন্দের সুদিব্য তানলয়-সম্পন্ন মধুর গীতিকায় বিধিত হলো মহাসুর অন্ধকের সন্তোষ। সহস্র সহস্র নৃত্যগীতবিশারদা অপ্সরা সীমন্তিনীদের সেবায় লব্ধ হলো তাঁর পরিতোষ। বিদ্যাধর ও সিদ্ধসংঘের উপাসনায় সার্থক হলো সেই অপ্রতিমকর্মা দিতিতনয়ের ঐশ্বর্যাহরণ।

মূর্তিমন্ত ঋতুবর্গের উপাসনায় বিহিত হলো অসুরশ্রেষ্ঠের তর্পণ। বায়ু ও জলদজালের সম্মার্জনায় মার্জিত হলো অসুরাধিকারের সকল ভূভাগ। স্বয়ং বিবিধ-ভূষণে ভূষিতা হয়ে দৈত্যপুরে বিরাজমানা হলেন স্বয়ং শ্রীদেবী। আকুলভাবিত হয়ে সুরারিপুরে সর্বভাবেই বিদ্যমানা হলেন ঋদ্ধিও। সুলভ্য হলো চিন্তামণি প্রভৃতি রত্নরাজি; সুপ্রাপ্য হলো কল্পদ্রুম ও কামপাদ-পাদি তরুবর্গ; সকল গিরিশীর্ষ আনত হলো অসুরের পাদপীঠতলে। অসুরভোগ্যা হলেন মূর্তিমতী দিব্যৌষধি ও ওষধিরা। অসুরাধিপের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তাঁর বিত্তরকার্যে রত হলেন বিবিধ রস ও ধাতুবর্গ। অসুরের সম্বর্ধনায় আগ্রহান্বিত হলেন নদী ও সমুদ্র, স্থাবর ও জঙ্গম।

এইভাবে অপর্যোদার—বিস্ফারিতনেত্রে অসুরের পানে সদা লগ্নদৃষ্টি হয়ে রইলেন সর্বলোকের সকল সৌভাগ্যরাশি। পাবকযুক্ত অনিলসম তেজস্বী সেই অন্ধক; লোকস্রষ্টার মতো পরমেষ্ঠিপদে অধিষ্ঠিত হলেন। এমন কি দেবব্যাপারঘাতী অসুরের আয়ত্তাধীনে আপন সাধন ও দিনকার্য নির্বাহ করতে বাধ্য হলেন দীপ্তাংশু ভাস্কর।

কিন্তু চিরস্থায়িনী হতে পারলেন না অসুরের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। আসুরিক প্রকৃতির অনুসরণেই শরীরাশ্রয়-প্রবণেচ্ছু ব্যাধির মতো ধীরে ধীরে অসুর-রাজ্যে আপনাপন প্রভাব বিস্তৃত করলেন ভয়ঙ্করী অলক্ষ্মী ও অসূয়া, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, এবং কলহ।

অনিবার্য পরিণতিকে সফল করার জন্যই অহঙ্কারোন্মত্ত ত্রিলোকাধীশের মনে জাগল এক দুর্নিবার দুরাকাঙ্খা। ত্রিলোচন রুদ্রকে পরাজিত ক'রে স্বয়ং শক্তিকে লাভ করতে উন্মুখ হয়ে উঠল তার পরিণামানুযায়ী ও পরিণামানুসারী দুর্মতি।

বিনাশপথে অগ্রসর হয়েই যেন চিৎকার ক'রে উঠলেন অলক্ষ্মী-অধ্যাসিতান্তর অন্ধক:

—সেই রুদ্রের রুদ্রাণীকে লাভ করব আমি। ঐ রুদ্রের হাতেই হত হয়েছেন আমার অনেকানেক পিতৃদল। সুতরাং সেই প্রমথ-শৃগালগণে বেষ্টিত নন্দীশ্বরের রুধিরেই তর্পণ করব আমি আমার পিতৃপুরুষের।

যেমন চিন্তা, তেমনই উদ্যম। বহুযোজন দীর্ঘ কুন্দপুষ্পসদৃশ ধবলবর্ণ মনোহর শৃঙ্গশায়ী ভবাধিকারের মহলোকে একাকী অগ্রসর হলেন রুদ্রাণীলোভাতুর অন্ধকাসুর।

পুষ্পজালমণ্ডিত মন্দরাদ্রির উত্তুঙ্গ কুঞ্জসমূহে মারুতের প্রবাহনে দ্বিগুণ হয়ে উঠল আস্ফোটের গর্জন। কৈলাসের উত্তুঙ্গ কাঞ্চনশৃঙ্গে ও কাঞ্চনময় নিম্নভূমিভাগে প্রকম্পন সূচিত হলো, এবং হেমরেণুক্ষরণকারী ও উজ্জ্বলকান্তি গুহাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হলো অন্ধকের সদম্ভ পদক্ষেপণের ধ্বনি। গণেশ্বরনিবেসিত মন্দর-বিহারী খেচরবৃন্দ পলায়নপর হলো অন্ধকের আবির্ভাব-ত্রাসে; বিবর্ণ, বিশুষ্ক ও বিগন্ধ হয়ে গেল সেখানকার মন্দারকুসুম ও পদ্মাদিরাশি। পলায়নপর হলেন বীরবাহু, বীরভদ্র, বীরসেন, ভৃঙ্গিরীট আদি সকল শিবগণসমূহ।

অষ্টমূর্তির অঙ্গভূতা প্রধান-পুরুষাতীতা বেদমাতা গায়ত্রীরও পূর্বতনা, বিশ্বেশ্বর পাতিব্রত্যসম্পন্না বিশ্ব-সংহারকারিণী বিশ্বমায়া প্রবর্তিকা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী মহাশক্তিকে বিরুদ্ধবুদ্ধিতে লাভ করতে এসে কোন প্রাথমিক বিরোধের সম্মুখীন না হয়ে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল অন্ধকের হৃদয়বেগ।

শুধু প্রত্যাগ্রসর হলেন কুলনন্দী নন্দী। কিন্তু পাশ-

প্রহারে মূর্ছিত নন্দীর দেহকে পদদলিত ক'রেই হরনিকেতনে প্রবেশ করলেন দুরাচারী অন্ধক।

নিরাকুলা হরকান্তা আপন পাদপ্রসৃতির প্রক্ষালনে এগিয়ে এসে সহসা সবেগে ধাবমান মদান্ধ অন্ধককে দর্শন করলেন। শিবার রক্ষার শৈবপরাক্রমে বিশ্বাসিনী হলেন শিবানী। আপন শক্তির প্রকাশকে সংযত ক'রে পরমপবিত্র এক শ্বেতার্ককুসুমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মগুপ্তা হলেন অম্বিকা।

দেবীর অভাবিত অদর্শনে আরও ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠলেন কামাপ্লুতচিত্ত অন্ধক। শিলায় শিলায় বিশাল পরিঘের অকারণ আঘাত দিয়ে আরও অগ্রসর হলেন তিনি।

সহসা বৃষভত্যাগী ভবকে শূলহস্তে গিরিপ্রস্থে পাদচারে দণ্ডায়মান দেখে সহস্রগুণ বর্ধিত হলো তাঁর রোষানল। এই যোগীরূপী রুদ্রকে হত্যা ক'রে অসুরকুলের মৃত্যুরূপী প্রধানকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতেই শুধু ব্যগ্র হলেন না অন্ধক, রুদ্রহীন রুদ্রাণীকে লাভ করার জন্যও আতুর হয়ে উঠল তাঁর সকল লোভ।

—রে দুরাত্মন্! তবে চিহ্নহীন হোক তোর চিরন্তনীরতা! বরণ কর্ মৃত্যু।

মুহূর্তমধ্যে ত্রৈলোক্যের ভয়জনন, অতীব তুমুল ও দারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিকম্পিত হ'তে শুরু হলো মন্দারের শৃঙ্গদেশ।

সহসা সবেগে সমাগত অন্ধকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য ক'রে নিক্ষিপ্ত হলো হরশূল। কিন্তু মহাপ্রতাপ অন্ধকের কোনই ক্ষতি সাধিত হলো না তাতে। বরং সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করে। অন্ধকের দক্ষিণস্কন্ধে বিলগ্ন সেই শূলাগ্রমুখ হ'তে ক্ষরিত হয়ে যে কয়েকবিন্দু অসুরশোণিত নিপতিত হলো ভূতলে, তার প্রতি কণিকায় সৃষ্টি হলো মত্তস্তেজী এক একটি ভীষণ অন্ধক। আর, সেই সঙ্গে প্রায় শতাধিক ভীমপাণি অন্ধকের সম্মিলিত মুষ্ট্যাঘাতে বিপন্ন প্রায় হলেন দেবেশ গিরিশ।

দ্বিগুণ বিক্রমে দংষ্ট্রাকরাল, সূর্যকোটিসমিত, সিংহচর্মপরিবৃত, জটাজুটমণ্ডিত, ভুজগহারবিভূষিত, নলপঙ্কসমন্বিত, ব্যাঘ্রসদৃশবাহবিশিষ্ট ও অগ্নির ন্যায় লোচনধারী ভগবান ভূতভাবন ভবের শূলটিকে আপন বক্ষ হ'তে উৎপাটিত ক'রে তাঁরই হৃদয়ে সেটিকে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে উৎকট জয়লাভে অট্টাট্ট হাস্যে যেন ভেঙে পড়ল মূলান্ধকের চিত্তোল্লাস।

কথঞ্চিৎ আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংস্তম্ভিত ক'রে শূলপ্রহারে সত্বরে সেই সম্মিলিত শাখান্ধকবৃন্দকে সমুৎপাটিত করলেন শাশ্বত শিব। অচিন্ত্যের চিন্তায় সেই কালে শুধু শোণিতজ আসুরিক শক্তির বিধ্বংসোপায় সূচিত হওয়ার সুযোগে হস্তযুগসহায়ে শূলগ্রহণ ও সমুৎপতনপূর্বক, কঠোর সঙ্কল্পে আপন ওষ্ঠপুটচ্ছদ দংশিত ক'রে দেবাদিদেবের মস্তকে নিপাতিত করল তার কালদণ্ডপ্রতিম ঘোর মুদ্গর।

অবিচলিত রইলেন সত্ত্বগুণাধার স্থাণু। কিন্তু দীপ্ত ও দুর্ধর্ষ সেই গদাপাতজনিত ক্ষতমুখ হ'তে ভূরি পরিমাণে বহির্গত হলো রক্তরাশি।

বিস্ময়-বিমূঢ় অন্ধকের চোখের সম্মুখেই পূর্বদিকস্থায়ী রুদ্রশোণিতের ধারা হতে প্রাদুর্ভাব হলো অগ্নিসমপ্রভাবিশিষ্ট, পদ্মমালাবিভূষিত ও বিদ্যারাজনামে বিখ্যাত ভৈরবের; উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থিত রক্তধারা হ'তে জাত হলো চণ্ড ও কপালাদি ভৈরবচতুষ্টয়; পশ্চিমপার্শ্ববাহিত শোণিতধারা হ'তে সৃষ্ট হলো শূলভূষিত স্বতন্ত্র রুদ্রভৈরবের; ভূমিস্থিত রুধির থেকে উত্থিত হলেন সৌভাগ্যনসমপ্রভ শূলভূষিত ভৈরব; এবং ঊর্ধ্বধারা হ'তে অবতরণ করলেন বিঘ্নরাজ।

ভৈরবাষ্টকের মহাবলপ্রভাবেই নিঃশেষোর্বীর্য অন্ধককে শূলপ্রোত ক'রে ইন্দ্রায়ুধের মতো বিচিত্র শোভায় ছত্রবৎ ধারণ করলেন দেবাদিদেব।

পুনরায় ভূতলস্পর্শী হ'তে শুরু হলো শূলভেদী অসুর-শোণিত। পুনরায় সৃষ্টি হ'তে শুরু হলো শাখান্ধকবৃন্দ।

ভৈরবাষ্টকের পরিঘাঘাতে সৃষ্টিমাত্রই গতায়ু হ'তে শুরু হলো শাখান্ধকবৃন্দ। কিন্তু প্রগাঢ় দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলেন সর্বেশ্বর শর্ব।

যতদিন না তাঁর আপন নেত্রোত্থিত হুতাশন ও সূর্যধারা রসশোষণ ও শোণিত নিঃশেষিত না হবে অন্ধকের, যতদিন না ত্বক ও অস্থিমাত্রাবশেষ হবে তাঁর দেহ, ততদিন ঐ বিগলিত রুধিরধারাকে অবরোধের উপায়ের শরণে আশ্রিত হলেন শর্বশরেণ্য পিঙ্গলাঙ্গ। তাঁর ললাটফলক হ'তে রাশি রাশি বিনিঃসৃত হতে লাগল ঘর্মজল।

মুহূর্তমধ্যে সেই রুদ্রঘর্মে সঞ্জাতা হলেন অন্ধক-শোণিত-পরিপ্লুতাঙ্গা এক বিচিত্ররূপা কন্যা। রক্ত-তনুকা, রক্তাম্বরা ও রক্তনেত্রা সেই রুধির-চর্চিতা চর্চিকার সবেগ অসৃকলেহনে নিঃশেষিত হয়ে গেল অসুরশোণিত, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অনভিপ্রেত অগণিত রক্তবীজান্ধক-বৃন্দের নবকলেবরপরিগ্রহের বিক্রম। পুনরায় ত্রিদিবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন সুরসঙ্ঘ।

শম্ভুসমুদ্ভূত অগ্নির সংস্পর্শে সমুদয় পাপ-পরিহৃত হয়ে গেল অন্ধকের। আসুরিক রক্তের নিঃশেষণে দূরীকৃত হয়ে গেল তার শারীরিক ও মানসিক দুষ্কৃতি ও দুর্বি-চিন্তা। ব্যপনীত দানবভাবের স্থলাভিষিক্তা হলো ঈশান ও ঈশানীতে অচলা ভক্তিরাশি।

স্তবতুষ্ট শঙ্করের বরে ভৃঙ্গীরূপে তাঁর সেবাধিকার লাভ করল অন্ধকের পূত পরিণতি।

কিন্তু অনিয়মিতা হয়ে উঠলেন ঘোরাকারা সেই মহামাতৃকা। একই আত্মতনু বহুভাগে বিভক্ত ক'রে বহু মূর্তিমতীরূপে বেষ্টন করলেন তাঁরা স্বয়ং শঙ্কর ও শঙ্করীকে। লোলুপ রসনায় উচ্চারিত হলো ভীষণা প্রার্থনা :

—ভগবন্ ভক্ষয়িষ্যামঃ স দেবাসুরমানুষন্।
ত্বৎ প্রসাদাজ্জগৎ সর্ব্বং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি॥

চমকিত হলেন ভবানীপতি। যে মঙ্গলের মানসে নিহত করলেন তিনি অসুরকে, যে কল্যাণের অনুষ্ঠানে বিহিত হলো এই হত্যাযজ্ঞ, তাকেই নিঃশেষে ভক্ষণ করতে চায় এই মাতৃকা।

বহুরূপিণী সেই একৈকা মাতৃকার উদ্দেশে ধ্বনিত হলো শঙ্করের আদেশবাণী :

—সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্যকর্মরূপে নির্দেশিত করলাম আমি। অচিরে এই ভীষণ সঙ্কট হ'তে নিবর্তিত করো আপন মনকে।

অতিক্ষুধায় অর্দিতা সেই শোণিতপিপাসার্তা রুধির-দিগ্ধাঙ্গা মাতৃকাবৃন্দ; শিববাক্যে আশ্বাসিতা হ'তে পারলেন না তাঁরা কিছুতেই। অতি ভীষণা মূর্তি পরি-গ্রহ ক'রে চরাচর ত্রৈলোক্যভক্ষণে প্রবৃত্তা হলেন তাঁরা সমবেতভাবে। প্রমাদ গণলেন প্রমথাধিপ। আপন তেজঃসঞ্জাতা মাতৃকামূর্তির হননে অপারগ হলেন কৃশানু-রেতস্ ব্যোমকেশ।

সহসা অগ্রসরমান হয়ে এলেন হিরণ্যপাণি বিবস্বান। সুরবিৎ ত্রাসবিমুক্ত হয়েও মাতৃকাভীত সত্যবচস্‌সঙ্ঘের অনুষ্ঠেয় অধ্বরাহ্বানে হিরণ্ময় রথে ঊর্ধ্বমার্গে প্রবৃত্ত হ'য়ে এলেন দ্যুতিত-দৈবত মহাদ্যুতি। ত্রৈলোক্যের আসন্ন বিপত্তিকে অপসারিত করতে চাইলেন বিশ্ব-লোকের সকল দুঃখ-মালিন্যের মূর্তিমান বারংবাধা।

পরক্ষণেই তাঁর অপ্রমেয় আলোকরাশিতে প্রথমটা যেন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যায় মাতৃকার। তারপর সর্ব-ভুবনোদ্ভাসিনী জ্যোতিপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে তাঁর প্রণয়ান্বিত দৃষ্টিতে, মুগ্ধ হয়ে গেলেন রক্তলোভাতুরা অসংখ্যা মাতৃকা। চিন্তাতীত এক দুর্লভ্যের প্রাপ্তিতে অভিলাষবতী হয়ে এক মূর্তিতে রূপান্তরিতা হয়ে গেলেন তাঁরা।

পিশঙ্গ পরিচ্ছদ-পরিধায়ী ঐ অভিরাম সূর্যকে লাভ করতে, ঐ কোটিকন্দর্পজিৎ সূর্যের বক্ষে আশ্রয় পেতে, এবং অবলেশহীন স্বাতন্ত্র্যে সূর্যময়ী হয়ে উঠতে চেয়ে আপন তৃষ্ণা ও ক্ষুধাকে বিস্মৃতা হলেন মাতৃকা, বিস্মৃতা হলেন সর্বসংহারের ইচ্ছা।

ধ্বনিত হলো গগনবাণী :

হে অরুণবর্ণা উষপাভিকামা কামিনি, জগতে উষা-নামে খ্যাতা হয়ে সূর্যকে লাভ করবে তুমি। সূর্যের মতোই সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত হোক তোমার অধিষ্ঠান। সূর্যের মতোই সকল অসুন্দরতাকে শোভনীয় করার ব্রত উদ্‌যাপিত করার পুণ্যে সূর্যা হয়ে ওঠো, আশীর্বাদ করি।

রেণু রেণু হয়ে লোক-লোকান্তরে বিচ্ছুরিত হয়ে গেল প্রথমজাতা এই মাতৃকারূপিণী ভাবী-উষার তনু। জগতের অণু অণু অসুন্দরকে সুন্দর করার ব্রতে আপন কলেবরকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্যা হয়ে গেল সেই জায়মানা সূর্যপ্রেমিকা।

উদ্ভবান্তরে অর্য্যমন্ আদিত্যকে অধিগত করার অদম্য দোহদে সমাক্রান্তমনাঃ সেই মাতৃকার আত্মাকে সাধনবিশুদ্ধি দানের কারণে ভৃগুবংশে জন্মপরিগ্রহ করতে হলো।

ঋষিকুলজাতা হয়ে মনুজলোকে মানবীরূপে আবির্ভূতা সেই কল্যাণী পরিচিতা হলেন কুঞ্জিকা নামে।

ঋষি-পিতার প্রশান্ত আশ্রমপাদে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন কুঞ্জিকা, ততই যেন অপার্থিব জ্যোতিতে আপ্লুত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর দেহ। তাঁর সকাশে এসে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম হতেন না কোন ঋষি কিংবা দেবতা। সারাটি দিবসব্যাপী সূর্যের উর্ধ্বগ ও প্রবণমার্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সেই সৌরতপস্বিনী। সূর্যজ্যোতি যেন দ্বিগুণে ভাস্বর হয়ে উঠত সেখানে।

নিশাকালেও কন্যার অঙ্গবিচ্ছুরিত জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে থাকত ভার্গবের আশ্রম। মর্ত্যজবিধি অনুসারে উদ্‌বাহিতা হলেন কুঞ্জিকা। কিন্তু তাঁর হৈতিময় তনুসন্নিধানে এসে মৃত্যুময় পরিণতি লাভ করলেন মর্ত্যজ স্বামী।

এরপর বিন্ধ্যপাদস্থ মহাক্ষেত্রে রেবাকপিলাসঙ্গমে তপঃস্থান নির্ধারিত ক'রে মহাসিদ্ধিকর ব্রতে অবলম্বিনী হয়েছিলেন সূর্যপরায়ণা কুঞ্জিকা। নিত্য সদাচারশীলা হয়ে, নিত্য সঙ্গবিবর্জিতা হয়ে, নিত্য জিতেন্দ্রিয়া ও জিতক্রোধা হয়ে, আত্মশোধনতৎপরা হয়ে রইলেন কুঞ্জিকা।

নর্মদাতটে অবস্থিতা থেকে ক্রমে ক্রমে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, পারাক ও তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত সমাপন করে গেলেন ব্রতধারিণী সূর্যতপস্বিনী। হয়ে উঠলেন দেবদুর্লভ সুমহাসত্ত্বশালিনী, হয়ে উঠলেন অসীম ধৃতি-সন্তোষশালিনী।

এইভাবে একাগ্র সূর্যতপস্যায় ক্ষীণদেহা হয়ে গেলেন দেবী কুঞ্জিকা। এণস্নিগ্ধা মর্ত্যমানবীর আত্মিক আকর্ষণে অনিবার্যভাবে বিচলিত হলো লোকপ্রদীপ বিবস্বানের ভেদজ্ঞানহীনতার নীতি। একটি বিশেষ রমণীতে সঞ্জাত তাঁর সেই মমতাধিক্যে ব্যাহত হলো শস্তকর্মরাশি। বিশ্বলোকে কেবলমাত্র ভার্গবাশ্রমস্থায়ী অংশের পানে বেদনার্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জ্যোতিরাধার সবিতৃ। বিপুল ও বিরাট বিশ্বাংশে সম্ভবিত হলো না আর নিশান্তান্ধকারের দূরীভবন।

সদা এক কামনার স্পর্শে প্রলিপ্ত সৌরাধিপের অন্তরে কুঞ্জিকালাভের অভিলাষ ব্যতীত অপর কোন আদর্শের আস্তবমাত্রও তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টিহিতব্রত-বিস্মৃত লোকাধিপতি ব্রধ্নকে তাঁর কর্তব্যকর্মে প্রেরণা প্রদানে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হলেন সুরবৃন্দ।

বিরহের ব্যথাভারে কৃশপাণ্ডুর হয়ে এলেন সূর্য; মর্ত্যের এক জ্যোতিষ্মতীকে না পাওয়ার মানসিক-সন্তাপে সন্তপ্ত হ'তে লাগলেন স্বয়ং জ্যোতিরাধার। তাঁর অতুলনীয় জ্যোতিঃশোভা তাঁরই কিরণসংপৃক্ত মৃণালের মতোই ম্লানিমা প্রাপ্ত হয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

স্তোতৃগণকে বরপ্রদানে বিমুখ হলেন সূর্য, সুন্দর যজ্ঞাবশিষ্ট যজমানও বঞ্চিত হলো মঙ্গলভাগের অংশ-লাভে। প্রবাহনস্তব্ধ হলো পাবন জলরাশি, অন্তরীক্ষ-বিহারবিহীন হলো শুদ্ধবান বায়ু। বিরামরহিত ও ঋতুবিভাগকর্তা দ্যোতমান সূর্যের বিমনতায় বিনষ্ট প্রাপ্তপ্রায় হলো সৃষ্টিলোকের প্রাণ।

ক্ষয়হীন তমসায় আবৃত ব্রহ্মাণ্ডের সেই বৃহদংশে পুনরায় স্বক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলো সক্ষম দৈত্য ও দানব। পুনরায় আসুরিক ও রাক্ষসিক অত্যাচারে বিপর্যস্ত হ'তে শুরু হলো সূর্যালোকবঞ্চিত ব্রহ্মাণ্ডায়তন।

এমনই কালে প্রকম্পন সঞ্জাত হলো বায়ুতরঙ্গে, এবং সেইসঙ্গে প্রভাসিত হয়ে এলো অনাদিনিধনা আকাশবাণী :

—সৃষ্টিলোকের কল্যাণকামী জগৎপ্রাণ সূর্যের মানস-সঙ্গিনী, হে স্থিরপ্রেমা মাতৃকা, সূর্যকে লাভ করতে হলে নিখিল সৃষ্টির সহায়তায় আত্মোৎসর্গ কর। তোমার কল্যাণী বুদ্ধির অমোঘ উৎসর্জনে লাভ করো স্বয়ং প্রজাপতির মানসীতনু। আর, সরণ্যুরূপিণী সেই তনুর চিরন্তন মিলন সংঘটিত হোক বিবেকরূপী বিবস্বানের সাথে। ধন্য হোক সৃষ্টিলোক, ধন্য হোক প্রণয়ানুরাগে বিহ্বল তোমাদের দুটি সুন্দর প্রাণ।

এবারেও রেণু রেণু হয়ে লোক-লোকান্তরে বিচ্ছুরিত হয়ে গেল দ্বিতীয়জাতা সেই কুঞ্জিকারূপিণী ভাবী-উষার তনু। জগতের অণু অণু অসুন্দরকে সুন্দর করার ব্রতে আপন কলেবরকে বিশ্রাবিত ক'রে ধন্যা হয়ে গেলেন সেই স্থিরপ্রেমা সূর্যাকাঙ্ক্ষিণী।

সর্বপুণ্যের অবশেষে মাতৃকা ও কুঞ্জিকার ঐ একাধারগতা পার্থিব রূপরাশির সংগ্রহেই সম্ভাবিতা হয়েছিলেন অপ্সরোবরা তন্বী তিলোত্তমা। সেই জন্মে লাবণ্যচ্ছন্নরূপে প্রতিভাতা হয়ে নিপুণ-সৃষ্টিকর্তা বিধাতারও আশ্চর্যকারিণী হয়েছিলেন সুন্দোপসুন্দাবিঘাতিনী সেই ভামিনী। পুনঃ দেবকার্য সাধন ক'রে সেই জন্মেই বিধাতার কাছ হ'তে বরলাভ করেছিল সেই মন্মথমোহিনীর পার্থিব-ভাগ্য:

—স্থানং সূর্যরথে দত্তং তব চন্দ্রাননে ময়া।

যাবৎকাল অম্বরপথে অবস্থান করবেন আকাশাধিপ সূর্য, তাবৎকাল বহু উপভোগের আশিস লাভ ক'রে রবিলোকে চিরস্থায়িনী হবার পথ সুগম ক'রে নিয়েছিলেন তিলোত্তমা।

পরে, সমুদ্রমন্থনকালে বিষ্ণুকে মোহিনীবেশে সজ্জিত করার সহায়তায় প্রজাপতির মানসীকন্যারূপে জাতা হবার অধিকারলাভ করেছিল তার অপার্থিব সত্তা।

মানসজা হলেও সূর্যাবিচ্ছিন্না উষার সেইটিই শেষ অস্তিত্বের বিরাজন।

অলকনন্দার কূলে কূলে

অমিয়ময় বিশ্বাস

"এই সেই লছমনঝোলায় বিখ্যাত ঝোলা সেতু। বাঁয়ে দেখুন—দুই পাহাড়ের মধ্যে যে জলস্রোত প্রবাহিত—ইনিই পতিতপাবনী ভগবতী গঙ্গা। ডাইনে দেখুন—মন্দিরের বাঁধা ঘাটের নীচে মা গঙ্গা হৃষীকেশের সমতলভূমিতে প্রবহমাণা। গঙ্গার সমতলভূমিতে অবতরণ লছমনঝোলার প্রধান মাহাত্ম্য। আপনারা এই পবিত্র স্থানে মা গঙ্গাকে প্রণাম করুন।"

"ওঁ নমো-গঙ্গায়ৈ।
মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি-বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তী ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বুপিবতস্ত্বদ্বীচিষুৎপ্রেঙ্খত
স্ত্বন্নামস্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ" ॥ ইত্যাদি

বদরিকাশ্রম চলেছি। সঙ্গে রয়েছে পত্নী সুধারানী, কন্যা জয়ন্তী (খান্টু), সাথী শের সিং এবং কাণ্ডারী হরিদ্বারের পাণ্ডা শ্রীরামকুমার শর্ম্মাজী। পাণ্ডাজী ভক্তিভরে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত গঙ্গাস্তোত্র বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃত উচ্চারণে আবৃত্তি করলেন।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রথম লছমনঝোলায় এসেছিলাম। তখন বনাকীর্ণ পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ীদের পায়েচলা পথে ধীরে ধীরে নীচে নেমে বনের শেষে, নদীর ধারে আবিষ্কার করি এই বিখ্যাত সেতুটিকে। বাঁদিকে দু'পাড়ের সবুজ পাহাড়ের মাঝে গঙ্গার স্রোত। পুলের নীচে বড় বড় পাথরের স্তূপকে পাশ কাটিয়ে পাষাণপ্রাচীরমুক্ত জলস্রোত উল্লাসভরে ছুটে চলেছে। পুণ্যতোয়া গঙ্গা তাঁর তুষারাচ্ছন্ন জন্মভূমি, শৈলমালাশোভিত ক্রীড়াভূমি ত্যাগ করে নেমে এলেন পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের আলোকপ্লাবিত সমতলভূমির উদার উন্মুক্ত বক্ষে।

আমরা সেতু পার হয়ে ডানদিকে নদীর ধারে ধারে আম্রমুকুলের সুগন্ধে ভরা, বকুলে হাওয়া, ছায়াঘন পথে এসেছিলাম স্বর্গাশ্রমের বিখ্যাত কালীকম্বলীওয়ালার সদাব্রতের কেন্দ্রে। পাশেই গীতাভবন। গঙ্গাবক্ষে খেয়ানৌকা যাত্রীদের পারাপার করছে।

পুল পার হয়েই বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে যে পথ ক্রমশঃ ওপরে উঠে গেছে—সেই পথই বদরিকাশ্রম যাত্রীদের বিখ্যাত পায়ে চলার পথ। আমরা ঐ পথে কিছুদূর এগিয়ে যাই।

ঐ পথে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল, হয়ত এই পথেই অতীতের অন্ধকারযুগে রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়নের সঙ্কল্প নিয়ে বনাকীর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, ভীতিপ্রদ অতলস্পর্শী খাদ, অজস্র পার্ব্বত্য ঝরনা ও নদী এবং সদা সঙ্কট-সমাকুল দুর্গম দুরূহ পথের সমস্ত বাধা ও বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে এসেছিলেন হিমগিরির বুকে—গঙ্গার উৎসমুখে। এই পথে এসেছিলেন ঋষি ব্যাসদেব। তাঁর পুণ্যস্মৃতি আজও বহন করছে—পায়েচলা পথের ব্যাসচটি, সামরিক পথের বিয়াসী ঘাঁটি, আর এই পথের শেষ প্রান্তের ব্যাসগুহা। এই দুর্গম পথেই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ পাণ্ডুর পাণ্ডুকেশ্বরে ভ্রমণ। আর এই পথেই আছে কর্ণপ্রয়াগ—মহাবীর কর্ণের নদীবক্ষে তপস্যার প্রস্তরাসন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে নিহত আত্মীয়স্বজনগণের শোকে অভিভূত ও অনুতপ্ত পাণ্ডবগণের শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই পথেই অন্তিমযাত্রা। মহাপ্রস্থানের পথের শেষ কোথায় কেউ জানে না—কিন্তু এর আদি যে এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে পদব্রজে বিশাল ভারতকে

অতিক্রম করে এই পথেই মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের বদরিকাশ্রমে আগমন। আর এই পথেই নবম শিখগুরু গোবিন্দ সিং তপস্যার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন হেমকুণ্ডের নির্জ্জন হ্রদতীরে। অগণিত সাধু মহাত্মার পায়ের ধুলায় পবিত্র বদরীবিশালের এই সনাতন পথের তুল্য পুণ্যভূমি সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। ভারতের অগণিত ভক্ত জনগণের পুণ্যপ্রবাহ এই দুর্গম দুরূহপথে যুগে যুগে ধাবিত। এই পথের শেষেই আছে মর্ত্যধামে ভগবানের স্থূলমূর্ত্তি। তাঁর কৃপা কটাক্ষে ভবধামের সকল দুঃখ নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মোটরের পথ তৈরী হয়ে অবধি পায়েচলার সনাতন পথ পরিত্যক্ত হয়েছে। পুরাতন পথের আশ্রয়স্থল চটিগুলিও শূন্য ও ভগ্নোন্মুখ। কদাচিৎ দু' একজন সাধু—এই পুরাতন পার্ব্বত্য পথে আজও পাড়ি দেন। কঠোর সাধনা বিনা ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় না—অন্তরের এই মহান্ প্রেরণাতে তাঁরা এই কঠোর পথের পথিক।

হরিদ্বার থেকে বদরীবিশালের পথে রওনা হয়ে অনুমতির জন্য লছমনঝোলাতে আমাদের অপেক্ষা করতে হোল। ঐ অবকাশে পাণ্ডাজী লছমনঝোলার দ্রষ্টব্যগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিলেন। এই কয় বৎসরে কত পরিবর্তন হয়েছে। যে টিলার পাহাড়ী পথে সন্তর্পণে নীচে নেমেছিলাম সে আজ সুপ্রশস্ত রাজপথ। টিলার মাথা কেটে সমতল স্থান বের করা হয়েছে। মোটরগুলি সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রাকৃতিক বন্য সৌন্দর্য্যকে নির্মূল করে—লছমনঝোলাকে আধুনিক সভ্যতার উপযোগী করে সাজান হয়েছে।

শিবালিক পাহাড়ের গায়ে গায়ে গঙ্গার জলধারাকে ডাইনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। শেষে একটি উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে নেমে এলাম উত্তরাখণ্ডের শ্রেষ্ঠ সঙ্গম—দেবপ্রয়াগে, সমুদ্রতট থেকে ১৩০০ ফুট উঁচুতে।

আমাদের গাড়ী থামল সঙ্গমের বিপরীত দিকে—পাহাড়ের গায়ে পথের ওপর। সেখান থেকে সঙ্গমের স্নানঘাট বহুনীচে ও বহুদূরে। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে দেবপ্রয়াগ শহরটি ছবিরমত সুন্দর। পাহাড়ের পায়ে একটির পর একটি বাড়ী খেলাঘরের মতন সাজান। সুউচ্চ বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়ি নেমে এসেছে একেবারে ভাগীরথীর বুকে।

শর্ম্মাজী বলতে লাগলেন, "দেবভূমির শ্রেষ্ঠ প্রয়াগ এই দেবপ্রয়াগ। অতীতে দেবশর্ম্মা নামে এক সাধু এই অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে—সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। সেই পুণ্যাত্মা সাধুর স্মৃতিতে এস্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। একটু লক্ষ্য করে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে ভাগীরথীই মূল ও আদিগঙ্গা আর সম্মুখের পাহাড়ের নীচে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বতী ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে—তিনি হচ্ছেন বিষ্ণুপদী গঙ্গা অলকনন্দা—ভাগীরথীর একটি উপনদী মাত্র। এই দুই নদীর সম্মিলিত প্রবাহই 'মা গঙ্গা।'

এখানে সঙ্গমের স্থানটি অতি সুন্দর। পাহাড়ের পাথর ঢালু হয়ে ক্রমে নীচে সঙ্গমের জলের ভেতর নেমে এসেছে। সেই ঢালু পাথর কেটে তৈরী হয়েছে—সঙ্গমের নামবার সিঁড়ি ও সঙ্গমের প্লাটফরম্ বা চত্বর। গঙ্গার ওপারে পাহাড়ের গায়ে—জঙ্গলে ঢাকা বদরিকাশ্রমের জনহীন পায়েচলার পথ মাঝে মাঝে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অলকনন্দার ওপর একটি ঝোলাসেতু ঐ পায়েচলা পথের দূরাগত পরিশ্রান্ত যাত্রীদের সোজা পৌঁছে দিচ্ছে সঙ্গমের স্নানঘাটে।

আমরা ভাগীরথীর পুল পার হয়ে দেবপ্রয়াগ শহরের মাথার ওপর দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, অলকনন্দার কূলে কূলে—বদরীবিশাল দর্শনের আশায় এগিয়ে চললাম। শর্ম্মাজী বলতে লাগলেন, "যে ভাগীরথী আমরা পার হয়ে এলাম তিনিই মূল গঙ্গা—আর এঁর জন্মস্থানই 'গঙ্গোত্রী' ও উৎসমুখ 'গোমুখ' বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত। এই দেবপ্রয়াগ থেকে ১০০ মাইল উত্তরে বিশাল হিমালয়ের বুকে আছে চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী ভগীরথ পর্ব্বত। তার অঙ্গে তুষারের উত্তরীয়। সেই উত্তরীয়ের দক্ষিণ ভাগ রক্তবর্ণ উপলখচিত গৈরিক আর বাম ভাগ

তুষারধবল। উত্তরীয়ের দুই পার্শ্বদেশ ধারণ করে আছেন তুষারকিরীটী 'ভৃগুশিখর' ও 'সুদর্শন শিখর' পর্ব্বতদ্বয়। এই দুই পর্ব্বতের পাদদেশের উপত্যকা বেয়ে নেমে আসছে ভগীরথ পর্ব্বতের তুষার উত্তরীয়ের সম্মিলিত দুই প্রান্ত—ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর ধবল প্রস্তরী-ভূত গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের সুউচ্চ তুষার মালভূমিতে।"

"সুদূর অতীতকাল থেকে এই কঠিন শীতল জমাট তুষারের উষ্ণ আবেগ অলক্ষ্যে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ছে বিরাট হিমশিলার বক্ষের অন্ধকার গহন গহ্বরে। সেই বিগলিত তুষারের হিমশীতল পূতধারা গঙ্গোত্রী তুষার মালভূমির পশ্চিম প্রান্তের এক ভয়াল আঁধার গুহামুখ 'গোমুখ' থেকে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ছে আলোক-উদ্ভাসিত ভারতের স্নিগ্ধ সমতল প্রাঙ্গণে। এই হোল গঙ্গা বা ভাগীরথীর আরম্ভ।"

"তারপর গোমুখ থেকে ভাগীরথী গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের পাদদেশ স্পর্শ করে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিতা। গঙ্গোত্রীতে পৌঁছে তিনি দক্ষিণগামিনী। দুঃসহ শীতল বরফের রাজ্য ত্যাগ করে ভাগীরথী নেমে এলেন পাইন, ফার, দেওদার ঢাকা সবুজ পাহাড়ের কোমল কোলে। নদীবক্ষ এখানে পাথরে পাথরে সমাচ্ছন্ন। সহস্র স্রোত-ধারায় বিভক্ত হয়ে ভাগীরথী মহেশের জটাজাল ভেদ করে নেমে এসেছেন গৌরীকুণ্ডে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গা-মন্দিরের সামনে নদীবক্ষে এক বিরাট শিলা। এর নাম ভগীরথ শিলা। এই শিলাসনে উপবেশন করে সগর রাজার প্রপৌত্র রাজা ভগীরথ—তাঁর মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ বহুবর্ষ তপস্যা করে ভাগীরথীকে মর্ত্ত্যে নিয়ে আসবার বর বা অনুমতি লাভ করেন।"

"এই হচ্ছে বর্ত্তমান রূপ। তবে মনে হয়, যে কালে রাজা ভগীরথ ভাগীরথীর উৎসমুখ সন্ধানের উদ্দেশ্যে গঙ্গোত্রীতে উপনীত হয়েছিলেন তখন খুব সম্ভব গঙ্গার উৎসমুখ গঙ্গোত্রীর সন্নিকটে ছিল এবং উৎসমুখের আকৃতির সঙ্গে গোমুখের সাদৃশ্য থাকাও অসম্ভব নয়। ইদানীং গোমুখ বর্তমান গঙ্গামন্দির থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে এবং গোমুখ একটি বিরাট অন্ধকার গহ্বর।"

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে কঠোর ক্লেশকে বরণ করে রাজা ভগীরথের গঙ্গার উৎসমুখ আবিষ্কার একালের ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের ভীতিপ্রদ জঙ্গলের পথে আফ্রিকার জাম্বেসী-নদীর উৎসমুখ সন্ধানের চাইতেও মহান্ ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই সুমহান্ কীর্তিকে চির-স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ গঙ্গার প্রারম্ভের মুখ্য পর্ব্বতের নাম ভগীরথ পর্ব্বত এবং গঙ্গার আদি ও অন্ত ভাগকে ভাগীরথী বলে অভিহিত করেছেন।

গাঙ্গোত্রী মন্দিরের অনতিদূরেই কেদার পর্বত থেকে কেদার গঙ্গা এবং তিব্বতের হিমচত্বর থেকে নীলবর্ণা জাহ্নবী নেলাং গিরিবর্ত্মের পথে হিমালয়কে অতিক্রম করে ভাগীরথীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। তারপর এই দুই সখীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়-দুহিতা বরফের রাজ্য ত্যাগ করে উষ্ণতর বনজঙ্গলাকীর্ণ, নাতিউচ্চ পাহাড়ের পথে নেচে চলেছেন। দু-পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে অযুত ঝরনা ঝরে পড়ছে স্নেহময়ী মা ভাগীরথীর শীতল কোলে। উত্তর-কাশীতে ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী বরুণা ও অসিকে সাথী করে টিহরী, কোটেশ্বরের গভীর ঘন জঙ্গলের পথে ভাগীরথী নেমে এলেন দেবপ্রয়াগের পুণ্য সঙ্গমে।"

"এই হ'ল ভাগীরথীর স্থূল মূর্ত্তি। দুঃখের বিষয় যে, এযাত্রা আপনাদের এসব দেখা হবে না। তবে ভগবানে ভক্তি ও এই সব পুণ্যভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা রাখবেন। ভবিষ্যতে হয়ত গঙ্গোত্রীর পুণ্যতীর্থ দর্শন আপনাদের ভাগ্যে ঘটেও যেতে পারে।"

সূর্য্যদেব এখন মাথার ওপর। জুন মাসের প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপ এই উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ী এলাকাতেও আমাদের ঝলসে দিচ্ছে। পাহাড়ের গাছগুলির পাতাও রৌদ্রের তাপে বিবর্ণ। পাহাড়ের নীচে অলকনন্দার ঘোলাজল তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এই স্রোতধারা। লোকবসতিশূন্য নদীতীর ও তরীশূন্য নদীবক্ষ পূর্ববঙ্গ-বাসী আমাদের একটু অবাক্ করল। কিন্তু পাহাড়ী

নদীর বুকে অগণিত পাথরের স্তূপ, তার খরস্রোত ও আকস্মিক পরিবর্তনশীল জলের গভীরতা ও প্রবাহ সর্বদাই সংকটের সূচনা করে। সেজন্য এই সব পাহাড়ী নদীতে নৌকা ভাসালে পারে পৌঁছানর চাইতে পরপারে পৌঁছানর সম্ভাবনাই অধিক। দ্রুতগতি যানে বসে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখে যাচ্ছি নিঃশব্দ চলচ্চিত্রের ক্রমিক পট পরিবর্তন।

শর্মাজী বলতে লাগলেন, "এখন আমি আপনাদের ভাগীরথীর যমজ ভগিনী অলকনন্দার কথা বলব। বরাহ পুরাণের মতে নর ও নারায়ণ পর্বতের মধ্যস্থিত বদরীবিশাল উপত্যকায় প্রবাহিত অলকনন্দাই পতিতপাবনী গঙ্গা। শাস্ত্রে বহুস্থলে এই নদী আদিগঙ্গা বা বিষ্ণুগঙ্গা বলে পরিকীর্তিত। বদরীবিশালের মন্দিরের পশ্চাতের নারায়ণ পর্বতের উত্তরস্থ শতপথ হিমচত্বরে এর জন্ম। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে নামছে ৪০০ ফুট নীচে। অসংখ্য বিচূর্ণিত জলকণা কঠিন শীতে ঘনীভূত হয়ে ঘন কুয়াশার আবরণে এই জলপ্রপাতকে সর্বদা ঢেকে রাখে। এরই নাম বসুধারা জলপ্রপাত—বদরীনারায়ণের মন্দির থেকে ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে। অলকনন্দার প্রধান উপনদী হচ্ছে সরস্বতী। বিশাল হিমালয়ের উত্তরস্থ তিব্বতের একটি চিরতুষার ভূখণ্ডে এর জন্ম। নাতিউচ্চ মানা গিরিবর্ত্মের ভেতর দিয়ে সোজা নামছে দক্ষিণে। পথে খাসতোলী গ্রামের সন্নিকটে খরোয়াতাল থেকে খরোয়া নদী এর সঙ্গে মিশেছে। তারপর পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ ফাটলের পথে নামছে সোজা ২০০ ফুট নীচে। একটু পরেই মানা গ্রামের নীচে পুণ্যতোয়া অলকনন্দার সঙ্গে এর দর্শন ও মিলন।"

এই মানা গ্রামের ওপরের পাহাড়ে আছে ব্যাসগুহা। এই গুহাতে বসেই নাকি বেদব্যাস মহাভারত লিপিবদ্ধ করেন। তারও ওপরে পাহাড়ের বুকে আছে—চক্রতীর্থ, চন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড—প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি। এরা সবাই ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে। সূর্য্যকুণ্ডের দক্ষিণ কোণে যেখানে নর ও নারায়ণ পর্ব্বতের মিলন সেখানেই পাহাড়ের গায়ে ধাপ ধাপে প্রাকৃতিক সিঁড়ি। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হয়ে—এই সিঁড়ির পথে সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করেছিলেন।"

মানা পার হয়ে বদরীবিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধৌত করে অলকনন্দা চলেছে দক্ষিণে। বিষ্ণুপ্রয়াগে এর সঙ্গে মিশেছে ধৌলীনদী বা বিষ্ণুগঙ্গা। হিমালয়ের বরফের রাজ্যে জন্ম নিয়ে যোশীমঠের নিকটস্থ নিতি গিরিবর্ত্মের মধ্যদিয়ে এসেছে বিষ্ণুগঙ্গা। কর্ণপ্রয়াগে মিশেছে পিণ্ডার বা কর্ণগঙ্গা—এসেছে পূর্ব্ব ত্রিশূল ও নন্দাদেবী পর্ব্বতের মধ্যের তুষার উপত্যকা থেকে। আর নন্দপ্রয়াগে এর সঙ্গম হয়েছে ত্রিশূল পর্ব্বতের পশ্চিম ঢাল থেকে প্রবাহিত মন্দাকিনীর সঙ্গে। তারপর অলকনন্দা চৌখাম্বা পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত যোশীমঠ ও চামোলীর গভীর খদের ভিতর দিয়ে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগে। সেখানে এর সঙ্গম মন্দাকিনীর সঙ্গে।"

"কেদারেশ্বরের মন্দিরের ঠিক পেছনের দুই পর্ব্বতের বাহুবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে নিক্রান্তা হয়ে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করে ধূম্রবর্ণা মন্দাকিনী গৌরীকুণ্ডে প্রবাহিতা। হ্রদের পাশের বরফাবৃত দুই পাহাড়ের শীর্ষ থেকে নেমে এসেছে গলিত তুষারের দুগ্ধধবল ক্ষীর গঙ্গা, পাশে আছে নীলবর্ণা সরস্বতী ও মধুগঙ্গা। মন্দিরের অনতিদূরেই এরা মিশেছে মন্দাকিনীর বৃহত্তর স্রোতে। এই মিলিত স্রোতধারা মহাদেবের জটাজুটনিঃসৃত মন্দাকিনীর সঙ্গম অলকনন্দার সঙ্গে। আপনারা অতি সত্বরই রুদ্রপ্রয়াগে এই পুণ্যসঙ্গম দর্শনের পুণ্য অর্জ্জন করবেন।"

এতকাল বদরিকাশ্রমের পায়েচলার পথই এই পাহাড়ী অঞ্চলের সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন মেটাত। সামরিক প্রয়োজনে ইদানীং পাহাড়ের গায়ে চওড়া পথ তৈরী হয়েছে। বদরিকাশ্রমের সন্নিকটস্থ হিমালয়ের "মানা পাস", যোশীমঠের অনতিদূরের "নিতিপাস" ও গঙ্গোত্রীর নিকটস্থ "নেলাং পাস"এর পথে তিব্বতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ যুগাতীত কাল থেকে। এই সব পথেই মানস সরোবরের যাত্রীরা পুণ্যলাভের আশায়

কলাস যেতেন—ভুটিয়ারা আসত তাদের ক্ষুদ্র পণ্য বিনিময়ে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের আশায়। রাজনৈতিক কারণে আজকাল এই সব দুর্গম অরক্ষিত পার্বত্য পথগুলিতে ছোট ছোট সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দ্রুত সরবরাহের জন্য তৈরী হয়েছে আধুনিক যন্ত্র-যানের উপযোগী সদা-নির্ভরযোগ্য চওড়া পথ। বদরীবিশালের যাত্রীবাস-গুলি এই সামরিক পথেই যাওয়া-আসা করে।

দেবপ্রয়াগ ছেড়ে অল্পসময়ের মধ্যেই আমরা এলাম টিহরী রাজ্যের প্রধান শহর শ্রীনগরে। পর্বতদুহিতা অলকনন্দা পার্বত্য উচ্ছৃঙ্খল রূপ ত্যাগ করে আধুনিক শহর শ্রীনগরের বিস্তৃত উপত্যকায় ভবারূপে বিরাজ-মানা। শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী। উন-বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোরখাদল এই রাজ্য আক্রমণ করে শ্রীনগর অধিকার করে। গাড়োয়ালরাজ অপেক্ষা-কৃত দুর্গম শহর টিহরীতে পলায়ন করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে গাড়োয়ালরাজ তাঁর রাজ্য উদ্ধার করেন বটে কিন্তু এই সাহায্যের মূল্যস্বরূপ তাঁকে অর্দ্ধেক রাজ্য ব্রিটিশকে ছেড়ে দিতে হয়। বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতে টিহরীরাজের ব্রিটিশ শক্তির সম্মানিত ও অত-গৃহীত পৃথক সত্তা বিলুপ্ত। বৈকালের পড়ন্ত রোদে শ্রীনগর ত্যাগ করে আমরা পৌঁছে গেলাম পথের দ্বিতীয় প্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগে। তখন গোধূলি উত্তীর্ণ।

রুদ্রপ্রয়াগের আধুনিক বাজারের ভেতর দিয়ে, অলকনন্দার পুল পার হয়ে এলাম সঙ্গমের সন্নিকটস্থ কালীকম্বলিওয়ালার কাঠের তৈরী ধর্মশালায়। ওপরের লোহার শিকে ঘেরা বারান্দায় আশ্রয় পেলাম। নীচে অলকনন্দার রুদ্র রূপ। ভীষণ গর্জ্জন করে জলস্রোত উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে।

উত্তরাখণ্ডের প্রতিটি দুর্গম তীর্থে কালীকম্বলি-ওয়ালার ধর্মশালা যাত্রীদের এক প্রকাণ্ড অভাব মোচন করেছে। জনমানববসবাসশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ বা হিমাচ্ছা-দিত পার্বত্য তীর্থস্থানগুলিতে যে সব ভক্তজন অসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দেবদর্শনের আশায় ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন—তাঁদের আশ্রয়স্থানের অভাব ও অনভ্যস্ত জীবনের বহুবিধ ক্লেশে মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ গিরির হৃদয় কেঁদে ওঠে। তার ফল এই কালীকম্বলি-ওয়ালার ধর্মশালা। প্রতি তীর্থস্থানে ধর্মশালা, চিকিৎসা-লয় ও সদাব্রতের সুচারু ব্যবস্থা তাঁর সুমহান্ কীর্তি। তাঁর কল্যাণে এই দুর্গম দেবভূমির তীর্থস্থানগুলিতে দেব-দর্শন সহজ ও নিরাপদ্ হয়েছে। —ক্রমশঃ
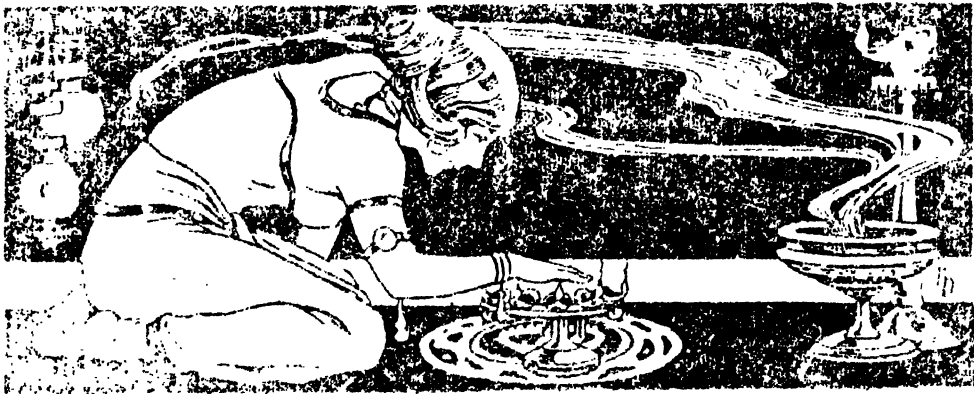
কবি সত্যেন দত্তের শব্দ শিকার

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কবি সত্যেন বাবু প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা অভ্যস্ত ভ্রমণে বের হতেন। আমিও সন্নিকটে হেদোর পুকুর ঘুরে, চক্র দিয়ে ফিরতাম। একদিন দেখি, সত্যেনবাবু বেথুন কলেজের সামনের ফুটপাথে, দুটি বাজে ওঁছা ছোক্রার সব কথা কাটাকাটি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শুনছেন। আমি তাঁর সামনে যেয়ে বললাম্ কি শুনছেন? তিনি আমাকে হেদোর ভেতরে দক্ষিণ দিকের এক টালির ছায়াশীতল ঘরে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলেন। প্রথমেই বললেন, "ওই ছোক্রাদের চলতি শব্দগুলো ও তাদের প্রয়োগ কেমন হচ্ছে, তাই শুনছিলাম। এভাবেইতো অনেক চলতি শব্দ সংগ্রহ করি আমি। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"আপনি ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসকে চেনেন?" আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি বলাতে তিনি বললেন, "ঐ বাঙাল্ কবির বহু কবিতায় খুব force আছে। ওঁর অনেক কবিতাই আমি পড়েছি। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক প্রচলিত শব্দ উনি কবিতায় ব্যবহার করে' বিশেষ ভালো কাজই করছেন। ফরাসদেশের প্রোভেন্সের কবি মিস্ত্রায়েলের মতন উনি ঐভাবে আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখলে বাংলাভাষা শব্দসম্পদে খুব সমৃদ্ধ হোতো। ভালো কথা, ওঁর 'ভাওয়াল পূজা' কবিতায় আছে—লগে-লগে রগে-রগে লাগে যেন টান্। এসব শব্দের অর্থ কি, বলতে পারেন।" আমি বললাম্ নিশ্চয়ই পারি। জন্মভূমি উত্তরবঙ্গ, শিক্ষাস্থল উত্তর প্রদেশও দক্ষিণ বঙ্গ, কর্ম্মস্থল পূর্ব্ববঙ্গে আমার।

লগে-লগে মানে সাথে সাথে। আর রাগ-রগে মানে শিরা উপশিরায়। সত্যেনবাবু শুনে বললেন—"বেশ তো চমৎকার শব্দ ও প্রয়োগবিধি। আপনি ঐ কবিকে আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখতে অনুরোধ করবেন। ওঁর "স্বদেশ" কবিতাটি অতি চমৎকার। এই একটি কবিতার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। কবি গোবিন্দ রায় "যমুনা লহরী" নামে একটি কবিতার জন্যই অমর হয়ে আছেন। সুকবি যতীন বাগচীর "কাজলা দিদি" কবিতাটিও একটি অবিস্মরণীয় কবিতা। ,সব কবির সব কবিতা সমভাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় না, এইটি ধ্রুবসত্য।

মেদিনীপুর নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যাবার আগে তাঁকে যেতে অনুরোধ করায় তিনি তদুত্তরে অনেক কথাই বলেছিলেন। সময়ান্তরে সুযোগ পেলে লিখবো আবার। এই ৮৪ বছর বয়সে এসব বলে না গেলে আর বলাই হবে না। সাহিত্যিক নন, কিন্তু ধনবান; এমন লোককে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি করাটা সত্যেনবাবুর আদৌ মনঃপুত হয়নি। মূল সভাপতির নামটা এখানে উল্লেখ করলাম না।

বিদ্যালয়ে সমবায় শিক্ষা

দীনেশ সেন

বহুদিন পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সমবায় সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমবায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার পর বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বা সমবায়বিভাগের উচ্চকর্মচারীরা স্কুলে সমবায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই। সমবায় বিভাগের কর্মচারীগণ মাঝে মাঝে ছাত্রদের সমবায় সম্পর্কে তর্কপ্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়গুলিকে ছয় ভাগে (groups) ভাগ করিয়া পড়ানো হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে আবার পুরাতন নয় ও দশক্লাসের প্রবর্তন হইতেছে। এই নূতন স্কুল ফাইন্যাল বা ম্যাট্রিক ক্লাসের পাঠ্যসূচী কি হইবে তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে; কিন্তু মনে হয় ঐচ্ছিক বিষয়ের পাঠনের ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা হইলে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সমবায় (cooperative) অন্যতম ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন।

বিদ্যালয়ে কিভাবে সমবায় শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা ধনীর দেশ; তবু সেখানে সমবায় সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হয় এবং বড় বড় সমবায়ও পরিচালিত হয়। জাতীয় শিক্ষা সমিতির জার্ণালে এক প্রবন্ধে মিঃ মরগ্যান লিখিয়াছিলেন, সমবায় হইল জনসাধারণের। জনসাধারণের স্বার্থে ইহা জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ইহা দ্বারাই সাধিত হয়। যেখানে স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় নাই, সেখানে ইহার অস্তিত্ব। সমবায় যুদ্ধের কারণ ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দূর করে। যেখানে বেকার সমস্যা প্রবল, সেখানে সমবায় উন্নততর সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে। সমবায় জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্ব-বোধের সঞ্চার করে। সমবায় নিজের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা আনয়ন করে। গণতন্ত্রের মূলে আছে সমবায়।

ডাঃ এফ্ ডবলিউ সির (F.W. Cyr) এবং জে এইচ্ টিপটন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮০টা বিদ্যালয়ে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান। তাঁরা ৩৭টা রাষ্ট্রের ১৩৩টি বিদ্যালয় হইতে উত্তর পান। দেখা গেল যে ৪টি স্কুলের ৩টি বিদ্যালয়ে সমবায় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ৯৭% জন উত্তর দেন যে পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমবায়ও অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত। স্কুলের পরিচালকদের মধ্যে ৯৮./. জন এই মত সমর্থন করেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা, বৃত্তিগত কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিচালকদের মন্তব্য এই যে, সমবায় শিক্ষা ছাত্রদিগকে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্দ্ধারণে সাহায্য করে।

১৯৪১ সালের উইটিং বিদ্যালয়ে ভোগ্যপণ্যের সমবায় শিক্ষা সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৪৫০টি স্কুলে শিক্ষক ও পরিচালকদের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন এবং ভোগ্যপণ্যের সমবায় শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় কি না জানিতে চাহেন। সমীক্ষার পর দেখা গেল ১৯৪১ সালে শতকরা ৫৪টি স্কুলে ভোগ্যপণ্যের সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। শতকরা ৩০টি স্কুলে সমাজবিদ্যা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইতিহাস ও কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় সকল শিক্ষকই পাঠ্যসূচীতে সমবায় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করেন।

শতকরা ১৬জন মনে করেন সমবায়ের শিক্ষা উইস্‌কন্‌সিন্‌ রাষ্ট্রের মত বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা সমিতির মতে লোকের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা একচেটিয়া কারবারের ফলে ঘটে। সমবায়ই সাধারণের বেকারত্ব কমাইতে পারে এবং তাদের ক্রয়শক্তি বাড়াইতে পারে।

১৯৪৯ সালে জে কে হারশ ও ই এ পোরিগান একটা সমীক্ষা গ্রহণ করেন। সমীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, কলেজগুলিতে ১৪৬০ জন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং ১৬১৫ জন গ্রাজুয়েট সমবায় সম্পর্কে পড়াশুনা করে। জেমস্‌ এন্‌সেল (Ansel) কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে একটি সমীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে দেখা গেল যে যে-সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিতে সমবায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। কলেজগুলি ছাড়াও তিনি ৬৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নগুলি পাঠান। তিনি দেখিলেন যে যে-সকল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের শতকরা ৮২ ভাগ সমবায় সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা দান করেন। এই কলেজগুলিতে অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ও বাণিজ্য ক্লাসেই সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। শতকরা ১০টি কলেজে সমবায় সম্বন্ধে পৃথক পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকাংশ কলেজে কৃষি ও অন্যান্য প্রকার সমবায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। সমবায়ের শিক্ষাদানে অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমাজবিদ্যা ও বাণিজ্যকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়।

নূতন নয় ও দশ ক্লাসের স্কুলে সমবায়ের শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। স্কুলে ছাত্রেরা সমবায় সমিতি গঠন করিলে তাতে কলমে সমবায়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

চৈত্রের গাজন ও চড়ক পূজার মেলা

ভাগবতদাস বরাট

চক্রাবর্তে ফাল্গুনের পরই চৈত্রের চরণক্ষেপ। সূর্যের প্রখর তাপে শীত পরাভূত হয়ে দূরে পলায়ন করল। কিন্তু চৈত্রের বৃষ্টি নয় আমাদের। কারণ, আমরা মোটেই পরিবর্তনশীল নই। কষ্টের ভেতর কত লোকই [illegible] দুঃখের মধ্যে, তথা অনুভূত হলেও দুঃখকে কেউ আমন্ত্রণ জানাই না। অথচ কায়ার ছায়ার মত সুখ-দুঃখ আষ্টেপৃষ্ঠে জীবনে আসে। আনন্দের দাক্ষিণ্য লাভ করতে হলে এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। যাক সে কথা। এখন কাজের কথাই বলে ফেলি।

বাঙালীর বারমাসে তের পার্বণ। এই প্রবাদ বাক্যটি যার মন থেকে প্রথম প্রকাশ পায় তিনি নিশ্চয়ই এ জগতে নেই। কিন্তু শুধু তাঁর কথার সমর্থনে জাহির করব। কারণ, তাঁর হিসাবে বেশ গোলমাল দেখা যাচ্ছে। বাঙালীর বারমাসে তের পার্বণ তো নয়ই বরং আরো বেশী। উল্লেখযোগ্য যে কয়টি উৎসব দেখা যায় তার সংখ্যা নগণ্য নয়। চৈত্র মাসের চড়ক পূজা সেগুলির একটি বিশিষ্ট উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে এই আনন্দজনক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন মাসে এর পর্ব অনুষ্ঠিত হলেও চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এই পার্বণ সাড়ম্বরে সূচিত। আবার শুরুও বলা চলে। কারণ, চৈত্র সংক্রান্তির পর নানাস্থানে বৈশাখের বিভিন্ন তারিখে চড়ক গাজন দেখা যায়। চত্বরে চত্বরে মেলা বসে। জনগণের মিলনতীর্থের ভোক্তা বিশ্বেশ্বর মহাদেব। সেই ভিখারী শিবের ভাণ্ডার শূন্য হলেও পার্থিব জনগণ তাঁর দরজায় ধর্না দেয়। হরের মন হরণের প্রভাব প্রমাণিত হয়। মহেশের মহান মাহাত্ম্যও সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হয়। যে মানুষ কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ সেও সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে [illegible] প্রতীক্ষা করে। মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র শিবমন্দির দিনকয়েক কোলাহলে মুখরিত হয়।

সন্ন্যাসীরা শিবভক্ত। উপাস্যদেব শ্মশানবাসী শঙ্কর। ভক্তদের পালন ও বিধান খুব কড়াকড়ি। এঁদের চলতি কথায় ভক্তা বলে। এঁদের ব্রত উদযাপনের পদ্ধতিও বিস্তর। যার যেমন মানত তাঁর তেমনি কষ্টকর ক্রিয়া কর্ম। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে কষ্টকর মনে হলেও এঁদের কাছে মোটেই ক্লেশকর নয়। সাধারণ ভক্তা ছাড়া পাটভক্তা ও আগুন সন্ন্যাসী নানাশ্রেণী যে সব ভক্তাদের দেখা যায় তাদের অনেক ক্ষেত্রের প্রক্রিয়া খুবই আয়াসসাধ্য।

অনেকে হয়ত বলবেন, শিব-ভক্তরা কেবল মাত্র নিজেদের উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করেন। মেনে নিলাম তাঁদের উক্তি ঠিক। অনেকে সখ করেও সঙ সাজে। সখের ঘোরে মনে ক্লেশ অনুভূত হয় না। কিন্তু সবাই তো তা নয়। কেউ হয়ত দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শিবের কাছে মানত করল,—বাবা আমাকে রোগমুক্ত করুন। সন্ন্যাসী হয়ে আপনার ঋণ শোধ করব। আশুতোষের প্রাণ কাঁদল। কাতর প্রার্থনায় তিনি সাড়া না দিলেও মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। তাই

প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁকে সন্ন্যাসী হতে হল। এবং যেমন ভাবে মানত শোধের কথা ছিল ঠিক সেই ভাবে তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। শিবের মহিমা শিবই প্রচার করলেন। শম্ভু নিজেই স্বয়ং-ভু। অর্থাৎ জাহির করলেন ভুবনে আমিই আছি।

আমি মানত করিনি। করেছিলেন আমার মা। সে বহু বছর আগের কথা। শৈশবে আমার যখন টাইফয়েড্ হয়েছিল সেই সময় মা মানত করেছিলেন,—আমার ছেলে সেরে উঠলে তোমার ভক্তা হবে এবং সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব প্রণাম সেবা খাটবে। আমি সেরে উঠেছি, কিন্তু ব্রত সাঙ্গ করিনি। বছরের পর বছর কেটে গেছে তবু ঋণ শোধ হয়ে উঠেনি। তারপর হঠাৎ কি মনে হল মানত শোধ করি। এবং বছর দুই আগে সেই মানত শোধে সচেষ্ট হয়ে আমি ভক্তা হলাম। এ বিষয়ে স্ত্রীর বান্ধবী পারুল দিদিরও উৎসাহ যেন বেশী বলে মনে হয়েছিল।

বাঁকুড়ায় একেশ্বরের শিব। শিবের মহিমা অপার। চৈত্র সংক্রান্তির চার-পাঁচ দিন আগে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হলাম। সারাদিন নিরম্বু উপবাস। অপরাহ্নে স্নানান্তে শিব-পূজা সেরে বাড়ী ফিরে একবার মাত্র ফল ও দুধ ভক্ষণ। সেই সময়েই জলপান। অন্য সময় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটলেও জলপান নিষেধ। বাবার অরূপণ মহিমা। তাঁর করুণা হলে তৃষ্ণা মোটেই পাবে না।

প্রবাদ আছে, "ডুবে জল খাওয়া"। অর্থাৎ অলক্ষ্যে কিছু করা। কেউ জানল না, শুনল না, অথচ আমি আলমনল সবং করলাম। বিড়ালতপস্বীর মত কাজ। ফাকর সেজে ফিকিরে পয়সা লুটছি। সন্ন্যাসী হয়ে স্নান করতে গিয়ে কোন সন্ন্যাসীর জল দেখে তৃষ্ণা বোধ হয়ে উঠেছিল। তখন সে জলে ডুব দিয়ে জলের নীচে জলপান করে। হয়ত এই কারণে ডুবে জলখাওয়া প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি। এবংবিধ ঘটনার নজিরও আছে; লোকমুখে শোনা কথা-কাহিনী কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে। এই ভাবে জলপান করে কোন সন্ন্যাসী স্নানান্তে শিবপূজা করতে এসে মন্দিরের সার-কটে সর্বসমক্ষে বমি করতে শুরু করেন এবং সেই সময় সেই বমির সঙ্গে ছোট ছোট জ্যান্ত চিংড়িমাছ বেরিয়ে আসে। চোর হাতেনাতে ধরা পড়ে। আবার একথাও শোনা যায় যে, নিয়ম পালনে ব্যতিক্রম ঘটায় কোন সন্ন্যাসী রক্তবমি করে মারা যান। কথায় বলে, শিবের ঘর আর ক্ষুরের ধার, দুই-ই সমান। সে অনেক কথা। বাবার মহিমা অপার। মহেশের মহান্ কীর্তি। মহিমা যে বিস্ময়কর, তা বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করবেন। যার উপর তাঁর করুণা, শুধু তিনিই তাঁর মহিমা বুঝবেন। অপরের সাধ্য নয়। মনে ভক্তিভাব আপনা-আপনি প্রকট হবে। তিনিই পুণ্যবান্ যাঁর অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভক্তি জাগে। ভক্তির উৎস বিকীর্ণ হয় আপনা-আপনি। ভক্তা হয়ে লক্ষ্য করেছি অনেক ভক্তার ভক্তির ভাব। মোটেই যে তা ইচ্ছাকৃত বা অভিনয় নয়, তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমার মনে তো ভক্তিভাব জাগে নি। মনে হয়েছে যদি সত্যিই ওঁরা ভক্তিরসে আপ্লুত, তা হলে আমি ওদের পদরেণুর যোগ্য নই। তৃণের চেয়েও তুচ্ছ আমি। বিষণ্ণমনে বাড়ী ফিরেছি। বুঝেছি আমার সাধনায় বিচ্যুতি আছে।

স্ত্রীর বান্ধবী পারুল দিদি কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কাছে আমার নূতন নামকরণ "মাষ্টার মশায়"। ওঁরই দেওয়া মনগড়া নাম। স্বভাব সিদ্ধ সাজবেশে পারিপাটি। সেদিনও ঠোঁটের হাসির ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকের সংমিশ্রণ। তিনি সেদিনও লাস্যময়ী। স্ত্রীকে দেখিয়ে বলেছেন,—দেখ দেখ, মাষ্টারকে আজ কেমন সুন্দর মানিয়েছে। তারপর আমার উদ্দেশে বলেছেন,—কিগো, মুখ ভার কেন? উত্তরে বলেছি,—মনে ভক্তির ভাব এল না অথচ ভক্তা হলাম। কথার শেষে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,—ভক্তির ভাব আসেনি বলে যখন দুঃখ পাচ্ছেন তখন জেনে রাখুন ভক্তির ভাব আসতেও দেরি নেই। চলুন, খাওয়াদাওয়া সারবেন। ওঁর কথায় আশ্বস্ত হলেও অস্বস্তি কাটেনি। কারণ, আমি যা নই তার চেয়েও বড় ওঁর কাছে।

স্ত্রী পা ধোয়ালেন। বাড়ীর আর সব মেয়েরাও পায়ে জল ঢাললেন। বসার আসন পেতে দিয়ে পাখা হাতে সামনে বসলেন পারুল দিদি। স্ত্রীকে বললেন, —"আজ আমি মাষ্টারের খাবার ছোঁব না। তুমি খেতে দাও।"

খাদ্যবস্তু বিভিন্ন। দুধ, সরবৎ, ছানা ও নানাবিধ ফলমূল, এত কি আর খাওয়া যায়? খাওয়ার ইচ্ছাও নেই। হঠাৎ মনে হয় বেলের কথা। বেলের অভাবে বেল খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু বেল তো কিনি নি। ভাবলাম আগামী কাল বেল কিনব। মনের কথা মনেই রাখলাম বেল খাওয়ার কথা প্রকাশ করলাম না। বাতাস করেন পারুল দিদি। আর বলেন, মাষ্টারের পরিচর্য্যার পুণ্য হবে। আজ যে উনি সন্ন্যাসী। ভাবলাম ঠাট্টা করলেন। কারণ, গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়না। মনটাও সেই সঙ্গে তৈরী হওয়া চাই। তবে এ কথা সত্য যে ভক্তির ভাব না জাগলেও গেরুয়া ধারণে কেমন যেন একটা পবিত্র ভাব আপনা আপনি অন্তরে এসে যায়। এ আমি লক্ষ্য করেছি। অবশ্য এ আমার আপন কথা। অপরের কথা বলতে পারি না।

ভক্তা হওয়ার আগের দিন নাপিতের কাছে ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন করার প্রয়োজন। প্রত্যহ বেলতলায় ঘোরাঘুরি করে বেলপাতা তুলতে হয়। কারণ বাবা বিশ্বনাথ বেলপাতায় সন্তুষ্ট। কিন্তু নেড়া হওয়ার প্রয়োজন নেই। নেড়া হয়ে বেলতলায় ঘোরাঘুরি করার বিধান নেই। ক্ষৌরকার্য্য সমাপনে সামান্য একটু চুল, দাড়ি ছাটা কাটা এবং সেই সঙ্গে হাত ও পায়ের নখ কাটা। ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। তারপর গেরুয়া, উপবীত ও উত্তরী ধারণে ভক্তা। হাতে থাকে ফুলের সাজি ও বেতের দণ্ডী। পালন ব্রহ্মচর্য্য। বিছানায় শয়ন নিষেধ। কম্বল কিম্বা বাঘ ও হরিণ চর্ম্মে শয়ন। দিনান্তে একবার মাত্র আহার ও জলপান। যদিও তৃষ্ণার উদ্রেকে রাত্রিকালে একাধিক বার জলপানের বিধান আছে। সন্ন্যাসী হলেই নব-জন্ম। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। বাড়ীর জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচে সেই সময় অশুচি হবে না। তখন ভক্তা মাত্রই যে শিব-গোত্র। এই অবস্থায় যদি কোন ভক্তার মৃত্যু ঘটে তা হলে কিন্তু সব ভক্তাই অশুচি। মৃতাশৌচ পালন পনের দিন। সবাই যে একসূত্রে গাঁথা। এক মন এক প্রাণ। জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ রহিত। মহামিলনের এমন সহজ পন্থা অন্য কোন ব্রত উদ্‌যাপনে দৃষ্ট হয় না।

বাড়ী হতে এক্তেশ্বর দু'মাইল। সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান সেরে ফুল ও বেলপাতা তুলে হাঁটা-পথে আমি এক্তেশ্বর চলে যেতাম। ঐখানেই সারাদিন কাটিয়ে অপরাহ্নে স্নানান্তে পূজা সেরে পাটভক্তার পাটে ফুল দিয়ে বাড়ী ফিরতাম। সকলের মুখে সমবেত কণ্ঠে সুর সহযোগে নাম কীর্ত্তন,—'এক্তেশ্বরের ভোলানাথ মণি মহাদেব" "হর হর দিগম্বর নাথ মণি, মহাদেব", "শিব শম্ভু, নাথ মণি মহাদেব" ইত্যাদি।

বেল খেতে ইচ্ছা হওয়ায় পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভাবলাম বাজারে গিয়ে বেল কিনব। তারপর বাবার পূজার সেই বেল নিবেদন করে সন্ধ্যায় প্রসাদ নেব। কিন্তু বেল কিনতে হল না। সকালেই দেখি পারুল দিদি আমার মনের কথা টের পেয়ে ওর মাসী-মার হাত দিয়ে বেল পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুধু এইক্ষেত্রে নয়, বহুক্ষেত্রে বারবার লক্ষ্য করেছি, উনি আমার মনের কথা জানতে পারেন। আমার কাছে কেমন যেন অলৌকিক মনে হয়। সেইজন্যই ওঁকে আমি বিশেষ নজরে দেখতাম। এবং সারাদিন ঈশ্বরকে ভুলে থেকেও বিকালে ওর সান্নিধ্যে ও নানা কথাবার্তায় ঈশ্বরকেই স্মরণ হত। সন্ধ্যায় ওঁকে আমাদের বাড়ী হতে ওদের বাড়ী এগিয়ে দিতে গিয়ে মনে হত আমি যেন ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না, উনি আমার অন্তর্লোকে বসে বিস্মৃত সত্য পথের হদিস দিচ্ছেন। যাক্ এখন যা বলছিলাম তাই বলি।

ভক্তাদের মধ্যে মুখ্য হল পাটভক্তা। তিনি চৈত্র সংক্রান্তির পনের দিন আগে হতে সন্ন্যাস হন। দিবসান্তে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ। ওর সাধন প্রণালীর প্রক্রিয়াও ভিন্নতর এবং কঠোরতম। প্রত্যহ

অপরাহ্ণে তিনি পাটপাথায় নিয়ে স্নান করতে যাবেন। যিনি পাটপাথায় তুললে অন্যান্য ভক্তাদের পাটে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার। এবং পাটের উপর পুষ্পাঞ্জলি না দেওয়া পর্য্যন্ত ভক্তাদের নিরম্বু উপবাস। সংক্রান্তির আগের দিন ঐ পাটভক্তা পাটে শয়ন করবেন। এবং সেই অবস্থায় চারজনে তাঁকে পাটসমেত কাঁধে তুলে মন্দিরের রাস্তা ধরে রাস্তায় রাস্তায় পরি-ভ্রমণ করবেন। সেই সময় মন আপনা-আপনি স্বীকার করবে ভূতনাথ পাগল হলেও ভণ্ড নন। সুপ্ত নন, জাগ্রত। নীলকণ্ঠের বিষ-ধারণের ক্ষমতা অসীম।

একজন মানুষ যাতে চিৎ হয়ে শুতে পারে এইরূপ একটি স্বল্পপরিসর কাষ্ঠনির্ম্মিত তক্তা হল পাট। এর উপরিভাগে ঘন ঘন সুচগ্র লৌহশলাকা প্রোথিত। ঐ পোতা লৌহশলাকার উপর পাটভক্তা শয়ন করবেন। এবং সেই অবস্থায় তাঁকে রাজপথে পরিভ্রমণ করান হবে। তখন দর্শক মাত্রই শিব-মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হবেন। পরিশেষে দেখা যাবে যে অগণিত সুচালো লৌহ-দণ্ডের উপর শয়ন করাতেও পাটভক্তার দেহের কোন-রূপ ক্ষতি সাধন হয়নি।

এক্তেশ্বরের শিব স্থানে পাটভক্তার মাধ্যমে গঙ্গাধরের মাহাত্ম্য প্রকট। কিন্তু অন্যত্র ভক্তাদের মানত শোধের প্রক্রিয়া আরো বেশী বিস্ময়কর। আগুন সন্ন্যাসী, চড়কে ঘোরা, এবং বানফোঁড়ার মাধ্যমে উমানাথের উদার মহত্ত্ব প্রচারিত।

একটি বিরাট লম্বা শালকাঠের খুঁটি মাটিতে শক্ত-ভাবে পোঁতা। সেই খুঁটির উপর থেকে দোদুল্যমান কয়েকগাছি মোটা দড়ি। দড়িগুচ্ছের প্রান্ত ভাগের প্রত্যেকটিতে একটি করে লৌহ-নির্ম্মিত হুক বাঁধা। সেই হুক ভক্তার পিঠের মাংসে শক্ত করে গেঁথে ভক্তাকে উপরে টেনে তুলে ঘুরানকে বলা হয় ভক্তার চড়কে চড়া। একসঙ্গে দু'তিনজন ভক্তাকে ঐভাবে গেঁথে তুলে ঘুরান হয়। আর সেই সময় ভক্তার কোন কষ্টবোধও হয় না। মনে প্রমাদ বোধের চেয়ে প্রমোদ বোধই হয়ে থাকে। মুখে বাবার নাম কীর্ত্তন করতে করতে ঘুরতে থাকেন। চোখে-মুখে স্ফূর্ত্তির আমেজ। মনে হবে ম্যাজিক দেখছি। যাদু খেলা। তা যাদু খেলাই বটে। যাদুকর পঞ্চানন ডমরু বাজিয়ে যেন খেলা দেখাচ্ছেন। সেইরূপ আগুন সন্ন্যাস ও বানফোঁড়া অনু-ষ্ঠানকেও ম্যাজিক বলে মনে হবে।

পাঁচ হাত লম্বা ও দু'হাত প্রস্থ বিশিষ্ট একটি কুণ্ডে কাঠ ও কয়লা বিছিয়ে কাঠ-কয়লায় অগ্নিসংযোগ করা হল। তারপর দিগম্বরের নাম স্মরণ করে ভক্তা ঐ আগুনের উপর হাটাহাটি করতে থাকবেন। অথচ তাঁর পায়ে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে আগুনের লেলিহান শিখায় কোন ক্ষতি হবে না। এ যেন মজার খেলা! যে মজা অন্য কেউ বুঝবেন না, বুঝবেন ঐ ভক্তাই।

বাণ ফোঁড়াও ঠিক এইরূপ আশ্চর্যজনক আর এক খেলা। ভক্তার জিবকে টেনে রেখে আড়াআড়ি ভাবে তাঁর জিবে লোহার সরু দণ্ড একদিকে ফুঁড়ে অপর-দিকে বের করা হয়। লৌহ দণ্ডের দু'প্রান্ত দু'জন লোকের ধরা অবস্থায় এবং ঐ দণ্ডের মধ্যস্থলে জিব গাঁথা অবস্থায় ভক্তা। ভক্তা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে থাকেন। আর সঙ্গে লোক দু'জন নাচের তালে এগিয়ে চলেন। নাচতে নাচতে ভক্তা রাজপথ ও মন্দির পরি-ভ্রমণ করেন। অথচ তাঁর জিবের কোনরূপ ক্ষতসাধন হয় না, এবং শরীরের কোনরূপ অসুস্থতাও পরিলক্ষিত হয়না। এমনই শিবের কৃপা।

এই সবই মানত অনুযায়ী অনুষ্ঠান। এক্তেশ্বরে এতসব অনুষ্ঠান দেখা যায় না। বাঁকুড়ার ওন্দাগ্রামে বৃদ্ধেশ্বর শিবের স্থানে এইসব অনুষ্ঠানই দেখা যায়। শুধু ওন্দায় নয়, বাঁকুড়া জেলায় আরও অনেক শিবমন্দিরে এবং বীরভূম, হুগলী জেলার অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের অনেকেই মহেশের মহিমা কথা স্বীকার করবেন না। বলবেন, এটা মনের দৃঢ় বিশ্বাস ও অটুট আত্মপ্রত্যয়। কিন্তু এও তাঁর করুণার দান।

চৈত্র সংক্রান্তিতে ভক্তাদের কেন্দ্র করেই মেলা বসে। মেলাই মুখ্য। ভক্তা গৌণ। ভক্তার কথা মনে

থাকে না অথচ ভক্তাদের দর্শনেচ্ছায় এবং সেই সঙ্গে শিব দর্শনের অভিলাষে জনসমাগম। আর জনসমাগমে বিবিধ জিনিষপত্রের আমদানী। দোকানপাটের পত্তন। মেলার সূত্রপাত। কিন্তু আমরা মেলায় যাই জিনিষ কিনতে। কেউ বা কিছু বেচতে। কেউ আসে আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে স্ফূর্তি করতে। কিন্তু এই মেলার উদ্দেশ্য তা নয়। মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে মিলিত জনগণ ভক্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমভাবে বিভোর হয়ে ভক্তিরসে আপ্লুত হবেন। কিন্তু আমরা অন্য মেলায় যে ঢুকে পড়ি। আসল কথা ভুলে যাই। কেনাবেচার হাটে হিসাবের পাই-পয়সা নিয়েই যে আমরা ব্যস্ত!

মনে ভক্তির ভাব না আসায় ভক্তা হয়ে অনুশোচনায় মুহ্যমান হয়েছিলাম। কিন্তু শিব মহিমায় এই সব দৃষ্টান্ত দেখে মাথা আপনা-আপনি তাঁর চরণে নুয়ে পড়ল। জল বুদ্বুদের মত ভক্তির স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক মেরে অন্তরেই মিলিয়ে গেল। ধরে রাখতে পারি নি। ক্ষণিকের আমেজ। মন যে আঁধারে ঢাকা। অন্ধকারে পথ খুঁজি বলেই পথের হদিস খুঁজে পাইনা। কিন্তু পারুল দিদি কি তা স্বীকার করবেন?

গান্ধীতীর্থ সেবাগ্রাম

কানাইলাল দত্ত

গান্ধীতীর্থ সেবগ্রামের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি পাওনারের ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের কথা কিছু না বলা হয়। কেননা গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে গান্ধীকর্মের স্বাভাবিক অনুক্রম অনুসরণ করলে এই ব্রহ্ম-বিদ্যা মন্দিরে উপনীত হতেই হয়। ছোট্ট পূর্ববাহী পাহাড়িয়া নদ ধাম। তারই উত্তর তীরে একটি টিলার উপর যমুনালাল বাজাজ একখানি বাংলো বাড়ি করেন অনেকদিন আগে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গান্ধীজি এক-বার অসুস্থ বিনোবাজিকে এখানে পাঠান। সেই ১৯৩৮ সন থেকেই এই ক্ষেত্রটি বিনোবা ক্ষেত্ররূপে পরিচিত। বাজাজের লাল বাংলোকে ঘিরে বিনোবাজির আজকের ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির গড়ে উঠেছে।

পাওনারের এই জায়গাটির প্রাচীনত্ব অবিতর্কিত। ভূগর্ভে বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। বিনোবা-জি যখন ঋষি ক্ষেত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীর শ্রম দ্বারা কার্য্য সুরু করেন তখন কোদাল চালাতে চালাতে তিনি নিজেই অনেক মূর্তি উদ্ধার করেন। বর্তমান "ভরত-রাম মিলন" বিগ্রহটি তিনিই পান। কেবল পাওয়া নয়, মন্দির নির্মাণ করে বিনোবাজি নিজেই বৈদিক মতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করেছেন।

কথিত আছে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এই স্থানে প্রবর সেন নামে এক ধার্মিক রামভক্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এতদঞ্চলে বহু দেব মন্দির গড়ে ওঠে। কালক্রমে, সম্ভবতঃ আগ্রাসী মুসলমানদের অত্যাচারে এই মন্দিরাদি ধ্বংস হয়। পূর্বোল্লিখিত ভরত-রাম মিলন মূর্তি ছাড়া অন্য মাটির তলায় গঙ্গাদেবী, বিষ্ণু, কংসবধ প্রভৃতি প্রতিমা পাওয়া গেছে। শ্রীবিষ্ণুর একটি সুন্দর মূর্তিটি রঙ করে কাচের আধারে খাবার ঘরে রাখা হয়েছে। অন্যান্য ভাঙা ও আস্ত মূর্তিগুলি

সবই আশ্রমের নানা স্থানে সুদৃশ্য করে স্থাপিত হয়েছে। রাজা প্রবর সেনের নামানুসারে জনপদের নাম হয়েছে পাওনার। কাছে-পিঠে আর কয়েকটি ছোট বড় মন্দির আছে। সবগুলিই অপেক্ষাকৃত নতুন, কিন্তু বিগ্রহ প্রাচীন। অতএব অনুমিত হয় পুরাতন যেসব বিগ্রহাদি বিনষ্ট হয়েছিল তারই কিছু পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বিনোবাজি সারা ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। এখন তিনি ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির ছেড়ে বেরোন না, ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছেন।

ক্ষেত্র সন্ন্যাসের অর্থ হলো নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে না যাওয়া। কেবল ক্ষেত্র সন্ন্যাসই নয় তিনি এখন সূক্ষ্মে প্রবেশ করেছেন বলে বলা হয়। ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে না পেরে চারুদার নিকট উত্থাপন করি। তিনি বল্লেন বিনোবাজি জাগতিক ক্রিয়া কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন, এমন কি চিঠিপত্রও লেখেন না। তবে তাঁকে চিঠিপত্র লিখলে তিনি লেখকের অভিমুখীন হয়ে যে চিন্তা করেন তার দ্বারাই লেখক উপকৃত হন। অদৃশ্য-ভাবে এই কল্যাণসাধনের সমগ্র বিষয়টিকে সূক্ষ্মে প্রবেশ বলে উল্লেখ করা হয়। ব্যাপারটা আরও গভীর। সহজ করে আমাকে বোঝাবার জন্য এইটুকু মাত্র বলেছিলেন।

সেবাগ্রামের সম্মেলনেও বিনোবাজি যান নি। কিন্তু গঠনকর্মের ক্ষেত্রে বিনোবাজির নির্দেশ আজ অপরিহার্য বিবেচিত হয়। তাই সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন সেবাগ্রামের মণ্ডপ ছেড়ে ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এই সব অধিবেশনে বিনোবাজি একমাত্র বক্তা। শ্রোতাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নআকারে লিখে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হয়, তিনি সেগুলির উত্তর দেন। তাঁর উত্তর শুনবার পর প্রায়ই দ্বিতীয় প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না, এতই প্রাঞ্জল সে উত্তর। নানা স্থানে এই রকম একাধিক অধিবেশনে আমার উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে। তথাপি আরও একটু নিকট থেকে পূজ্য বিনোবাকে দেখবার এবং তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবার পাওনারে আমিও প্রায় তিনদিন অবস্থান করি।

প্রথম দর্শনেই বিস্ময়। বিনোবাজি দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন। এমন সরল শিশুর মত জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল ইতিপূর্বে দেখবার অবকাশ হয়নি। গান্ধীজির মত হাঁটু অবধি কাপড়, নগ্ন দেহ কিন্তু মস্তকটি সবুজ টুপি দ্বারা আবৃত। গান্ধীটুপি নয়। ক্রিকেট খেলোয়াড়-দের মত সামনের দিকে চোখের উপর প্রসারিত সবুজ টুপি, পায়ে স্যান্ডেল।

শান্ত স্বরে কথা বলেন। বক্তব্য যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সর্ববিধ উত্তেজনা বর্জিত। শ্রোতারা সাধারণতঃ গ্রামের গঠনকর্মী, কিন্তু দেশ বিদেশের খ্যাতকীর্তি অ-সাধারণ মানুষও আসেন বিস্তর। কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য। বসেন শ্রোতার আসনে। আজকের সভায় আমার পাশেই খোলা আকাশের নিচে নুড়ি ছড়ানো উঠোনে বসেছেন একদা গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমন্নারায়ণ, তার পরেই রয়েছেন বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী বৈদ্যনাথ বাবু। তিন চারদিন আগে এখানে বসেছিলেন ডাঃ সুশীলা নায়ার, প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত নেতৃবর্গ। তারও কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী একান্তে কথা বলে গেছেন দীর্ঘ সময় ধরে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে বিনোবাজির ... ক্ষমতাধর দ্বিতীয় কোন পুরুষ আছেন বলে আমার জানা নেই।

পরেরদিন বিনোবাজি বাংলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করেন। চারুদা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাংলায় মুখপাত্ররূপে কথা বল্লেন ক্ষিতীশবাবু; ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। সাধারণ প্রতিটি কথায় তো বটেই, গভীর ও কঠিন বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রেও বিনোবাজির সহজ রহস্যপ্রিয়তা ও মধুর বুদ্ধি-দীপ্ত বাক্যের ছটায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়। সারা ভারতের সকলে প্রধান কর্মীকে, তা কয়েক হাজার হবে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। ক্ষিতীশদাকে দেখলেই তিনি বিষ্ণু সহস্রনাম মালার একটি বাক্য—দেবকী নন্দনঃ স্রষ্টা ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ বলে সম্বর্ধিত করেন।

লাল বাংলার মেজেতে আমরা বসেছিলাম। বিনোবাজি আমাদের মত ভূমি আসনেই বসলেন। বিনোবা-সচিব বালুভাই একটি কাগজে আমাদের সকলের নাম লিখে বাবাকে দেখতে দিলেন। আমরা ২৮ জন উপস্থিত ছিলাম। বাবা এখন একেবারেই কানে শোনেন না। সব কথা তাঁকে লিখে দিতে হয়। নামগুলি মনোযোগের সঙ্গে দেখে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বল্লেন—চার বেদ, ৬ দর্শন ও ১৮ পুরাণ এই মিলে ২৮ হয়। তোমরা ২৮ জন আজ সশরীরে উপস্থিত হয়েছ; অতএব ভাবনা কি? এই মন্তব্যে একটি অনুচ্চ শব্দের আনন্দময় হাসির ঢেউ খেলে গেল। ঐ বৈঠকে তিনি পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্তা বল্লেন। মুখ্যতঃ দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমেই বল্লেন—আমাদের সকল ভাবনা চিন্তা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করতে হবে। নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি বাংলা থেকে তিনজন প্রতিষ্ঠিত কর্মী চাইলেন। আর বল্লেন, ভারতবর্ষের ঐক্য রক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই—সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজি, মাতৃভাষা এবং দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা এই পাঁচটি করে ভাষা শেখা অপরিহার্য। দেবনাগরী লিপি প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রায় প্রত্যেকটি ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ আছে। লিপির বিভিন্নতার জন্য সেগুলি আমাদের বোধগম্য হয় না। তাই কোন উপায়ে একটি লিপির প্রচলন হলে বহুভাষার দেশ ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ হবে। ভাষার বর্ণমালা বদলে দেওয়ার কোন অভিপ্রায় তাঁর আছে বলে মনে হলো না।

কিশোর বয়সেই বিনোবাজি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করেন। আকস্মিকভাবে গান্ধীজির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। গান্ধীপথে মানব সেবার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব এই বিশ্বাসে তিনি গান্ধী আশ্রমে গান্ধী-কর্মে লিপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই ছিল এ কর্মসাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং বিনোবাজি তা লাভ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কর্মভিত্তিক ব্রহ্মসাধনার ফলে গীতার কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। কর্ম তো সহজ সাধ্য ব্যাপার। চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকীয় কাজকে তিনি বিকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। গীতা প্রবচনে এ সম্পর্কে সুন্দর ও মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। বিনোবাজির এই বইখানি প্রায় সকল ভারতীও ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিনোবাজির ব্রহ্মসাধনা কর্মভিত্তিক তা একটু আগেই বলেছি। কিন্তু কি সে কর্ম? তা হচ্ছে বিশ্বলোক কল্যাণকর্ম। ভূদান, গ্রামদান গ্রাম স্বরাজের পথ ধরে ছয়জগতের শিখরদেশ পর্যন্ত তিনি আরোহণ করেছেন। আরোহনের কাজটি খুবই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। তাই বিনোবাজির সাধনার পূর্ণ ফল এখনো আমরা সুস্পষ্টরূপে পাইনি। তবে একদিন যে বিশ্ববাসী তা পাবেন তাতে আমি সন্দেহ পোষণ করি না। বিনোবা-কর্মে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির শাশ্বত ভারতীয় আদর্শ মূর্ত হয়েছে।

বাংলার জনৈক গল্পলেখক তাঁর বনস্পতির বৈঠক শীর্ষক রচনায় বিনোবাজির গ্রামদান আন্দোলনকে অলীক ভাবোচ্ছ্বাস বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এ ভদ্রলোক ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করেন নি। গল্প উপন্যাস লেখকেরা তো লোকরঞ্জনের জন্য বানিয়ে বানিয়ে লিখতে অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়া বিনোবাজির কাজকর্ম যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।

কালক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষেত্রে বিনোবাজি ব্যক্তিগত সাধনার পন্থাকে নাকচ করে দিয়ে বর্তমান কালের জন্য সামূহিক সাধনা নির্ণয় করছেন। তিনি বলেছেন যুগধর্মের দাবী হচ্ছে সাধককে ভিক্ষার পরিবর্তে উৎপাদক শ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করতে হবে। তাঁর কথায়ঃ 'মজদুরিকে ক্ষেত্রমে ব্রহ্মবিদ্যা।' প্রত্যেক আশ্রমবাসীকে (নরনারী সকলকেই) দৈনিক ছ' ঘণ্টা শ্রম দিতে হয়। এর চার ঘণ্টা উৎপাদক শ্রম এবং দুই ঘণ্টা সাফাই, রান্না প্রভৃতি সেবার আবশ্যকীয় কাজ। তিনি হিসাব করে দেখেছেন এর দ্বারাই একজন লোকের অন্ন বস্ত্রের ব্যয় সংগৃহীত হয়। ১৯৫৯ থেকেই এই আশ্রম

তথা ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির শুধুমাত্র ব্রহ্মবাদিনী মহিলাদের সাধন ক্ষেত্র হয়েছে। স্ত্রী-শক্তির সম্যক ও সার্থক উদ্বোধন ভিন্ন এই যুগে লোককল্যাণ কর্ম সম্পূর্ণ হবে না। দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্ষুব্ধ বিশ্বে হিংসা-অত্যাচার জর্জরিত মানব সমাজের বাঁচবার এই একটিমাত্র উপায়ই অবশিষ্ট আছে। ব্যাপারটা সহজে বোধগম্য হয় না। আশ্রমিকগণ বিশ্বাস করেন মহিলারা বিচারনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবাদিনী হলে শঙ্করাচার্যের মত শাস্ত্রকারও তাঁদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হতে পারেন এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারতবর্ষের সমাজকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। পরাজিত দেবতাদের পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন মহামায়া। নারীকে আমরা আদ্যা-শক্তি বলেছি। হিন্দু ধর্মের বিপুল সংখ্যক দেব দেবীর মধ্যে দেবীর সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানাও বেশি বলে অনুমিত হয়। অতএব বুঝি চাই না বুঝি ব্যাপারটা চট করে উড়িয়ে দিতে পারি না।

ভারতের নানা ক্ষেত্রে নীরব সাধনা চলছে। স্ত্রী-শক্তি জাগরণের জন্য প্রসঙ্গতঃ গান্ধীজির প্রচেষ্টা স্মরণীয়। মহাত্মার নানা উক্তি থেকে অনুমান করা যায় সত্য অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য তিনি নারীশক্তির উপর অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুলে একটি কন্যাগুরুকুল স্থাপিত হয়েছে। বিনোবাজি এ বিষয়ে খুবই দৃঢ়মত পোষণ করেন। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন যে,………

"….যতদিন পর্যন্ত শঙ্করাচার্যের মত তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন নারীর আবির্ভাব হবে ততদিন পর্যন্ত কৃষ্ণ, মহাবীর এবং গান্ধীর মত পুরুষও নারীজাতির উদ্ধার করতে সমর্থ হবেন না।" তিনি শাস্ত্র আলোচনা করে বলেছেন—নারীরা নিজেরাই যাতে এগিয়ে যেতে পারেন এমন কোন নির্দেশ হিন্দু শাস্ত্রে নেই। সেই নির্দেশ অর্জন করার কাজ বাকি আছে। আর বিনোবাজির বিশ্বাস একাজ মায়েদেরই করতে হবে। আর তারই সূচনা তিনি করেছেন ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরে। সারা দেশে অনুরূপ আরো প্রতিষ্ঠান অচিরে গড়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কোন টাকা পয়সা বা জমিজমার মালিকানা এর নেই। হিসাব-পত্রও রাখতে হয় না। এই দায়িত্বটা রয়েছে গোপুরীর গ্রামসেবা মণ্ডলের হাতে। এইটি বিনোবা স্থাপিত প্রথম সংস্থা। ১৯৩৪ সনে তিনি এর স্থাপনা করেন। বলা হয়, সমাজজীবনে যেমন গার্হস্থ্য আশ্রমের পর সন্ন্যাস আশ্রম সেবা ক্ষেত্রেও তেমনি "উসি প্রকার গৃহস্থ সংস্থাকে আধার পর সন্ন্যাস সংস্থা চলে।' প্রাচীন মুনি ঋষিদের আশ্রমের ব্যয়ের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সে বিষয়ে নানা গল্পসল্প আজও আমরা শুনি। হাজার হাজার লোক লস্কর সৈন্য সামন্ত সমভি-ব্যাহারে আগত রাজা ও তাঁর লোকজন সকলেই আশ্রমের আতিথেয়তায় তৃপ্ত হতেন। অর্থাৎ বহু মানুষকে খাওয়াবার মত খাদ্য এবং আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা এবং কর্মী আশ্রমে পাওয়া যেত। বিনোবাজির আশ্রমে আগত প্রত্যেকটি অতিথিকে অন্নাদি সরবরাহ করা হয়। এ বিষয়ে একটু পরে আমরা কিছু আলোচনা করব।

অপরে ভার নিয়েছে বলে মিতব্যয়িতা সম্পর্কে বাবা অসতর্ক নন। মৈত্রীতে পড়েছিলাম, বাবার গরমজল রাখার ফ্লাস্কটি ভেঙ্গে গেলে নতুন একটি কেনার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি একমাস যাবৎ আধ লিটার দুধ পান কমিয়ে দেন। শুনেছি বিনোবাজি পিতৃদেবের নিকট থেকে ৮৭ হাজার টাকা পান। সবটাই তিনি গ্রামসেবা মণ্ডলকে দান করে দেন। এবার জন্মদিনে এক জনৈকা বাঙ্গালী তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে প্রণাম করেছেন। অথচ একটি ফ্লাস্কের জন্য একমাস নিজের আধ লিটার দুধ বর্জন! শুনলেই মাথাটা আপনা থেকেই লুটিয়ে পড়ে। এমন মানুষ এখনও ভারতবর্ষে আছেন বলেই এত সঙ্কট ও অনাচার ভ্রষ্টাচারের মধ্যে আমরা টিকে আছি।

ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য বই পড়া জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কর্ম ও অপ্রত্যক্ষ সাধনার যোগ-সাধন করতে হয়। পূর্বেই বলেছি, বিনোবাজির সাধন-

ক্ষেত্রে মাত্র নারীদেরই প্রবেশাধিকার আছে। যে এগারজন প্রার্থী মহিলা নিয়ে আশ্রমের সুরু হয় তাঁরা হলেন : কর্ণাটকের অক্কাদেবী, লক্ষ্মী চন্দ্রমা এবং মীরা দেবী; গুজরাটের উঁষা বেন, আমেদাবাদ ও নাসিক থেকে আগত সিন্ধি কন্যা যথাক্রমে পদ্মা ও শান্তি দেবী, উত্তর প্রদেশের শুশীলা দেবী, পশ্চিমবঙ্গের কমলা ও শ্যামা দিদি এবং কেরালার বকুলী বোন। ১৯৫৯ সনের ১৩ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে (সেপ্টেম্বর '৭৩) আশ্রমে ২৩ জন সাধিকা আছেন। ভারতের নানা রাজ্য থেকে তাঁরা এসেছেন। রাজ্যওয়ারী একটা হিসাব এখানে দিলাম। কর্ণাটক—৬, গুজরাট—৩, মহারাষ্ট্র—৫, রাজস্থান—২, নাসিক (সিন্ধি)—২, আমেদাবাদ (সিন্ধী)—১, বোম্বাই, তামিলনাড়ু, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা—১ জন করে। একটি জার্মান মহিলাও আছেন দেখলাম।

আশ্রমের সাধারণ কাজ সুরু হয় ভোর ৪টে থেকে। ঐ সময় ঘন্টাধ্বনি করে সকলকে শয্যাত্যাগ করতে আহ্বান জানান হয়। এরপর ঘন্টা মিনিটে বাঁধা সারাদিনের কর্মসূচি চলে নিঃশব্দে। সামান্য মাত্র শৈথিল্য ঘটলে বা অমনোযোগী হলে এই কর্মসূচির সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কর্মসূচিটি এই :

সকাল : ৪টা শয্যাত্যাগ। ৪॥টা বিনোবাজির ঘরে সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। লোক সংখ্যা বেশি হলে সামনের উঠোনেও অনেকে বসেন। ঈশাবাস্য উপনিষদ আবৃত্তি দ্বারা প্রার্থনা সুরু হয়। ক্রমে নামমালা (ওঁ তৎসৎ শ্রীনারায়ণ তু) এবং একাদশব্রত আবৃত্তি করে শেষ হয়। মোট মিনিট পনের সময় লাগে।

প্রার্থনার পূর্বেই হাতমুখ ধোওয়ার কথা। প্রার্থনার পর থেকে ৫-৪৫ মিঃ পর্যন্ত স্বাধ্যায় বা নিজ নিজ পড়াশুনা তারপর আধঘন্টা কৃষিকাজ। আশ্রমের মহিলারা বড় বড় কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে যে সব শাকসব্জী তরিতরকারী উৎপন্ন করেন তার দ্বারাই এখানকার প্রয়োজন মেটে। এই মহিলারা আরও অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করে দেন। আশ্রম প্রাঙ্গণ ও ভারত রাম মন্দির চত্বর সমতল করার মত কঠিন শ্রমসাধ্য কাজও তাঁরা নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। মহারাষ্ট্রের এই অঞ্চলের মাটি পাথরে মেশানো। অতএব সেখানে কোদাল চালিয়ে কৃষিকাজ করা যে খুবই শ্রমসাধ্য কাজ তা বলাই বাহুল্য।

এখানকার জল সরবরাহ গৃহটির (একটি ছোট দ্বিতল পাকা ঘর) অধিকাংশ এই মহিলারা শরীর শ্রমদ্বারা সম্পন্ন করেছেন। বহিরাগত অতিথি অভ্যাগতরাও এই সময় ক্ষেতিকাজে যোগ দেন। তাদের প্রায়ই ঘাস তোলার ন্যায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরনের কাজ দেওয়া হয়।

আধ ঘন্টা ক্ষেতে কাজ করার পর একটি ঘন্টা পড়ে। তখন সাফাইয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সকলেই ঝাড়ু ও চুপড়ি হাতে বেরিয়ে পড়েন। এক বিন্দু ময়লা কোথায়ও যেন না থাকে সেদিকে সকলেরই শ্যেন দৃষ্টি। আমিও দু'দিন একাজ করেছি। একটি নিমগাছ তলা থেকে ঝরা পাতা কুড়োই। তার মধ্যে স্বভাবতঃই কিছু পাথর কুচি উঠে আসে ঝুড়িতে। যে বালিকাটি নিজে কাজ করেও আমার কাজের তদারকী তথা সাহায্য করছিলেন তিনি শান্তস্বরে বল্লেন এই পাতাগুলি দিয়ে জৈব সার তৈরি হবে, পাথর থাকলে চলবে না। কাজ করতে করতে বারবার আমার মনে পড়ছিল আমাদের ঘরবাড়ি এই রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা যত্নশীল হই না কেন? দ্বিতীয় স্মরণে ভাসছিল গান্ধীজির একটি কথা : Dirt is a misplaced substance.

পুরোপুরি ক্লান্ত হবার আগেই কাজ শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়ে। ইতিমধ্যে লম্বা একটা লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে স্বয়ং বিনোবাজি পাদ পরিক্রমায় বেরিয়ে নীরবে কাজ দেখে যান। গত জন্মদিনে ১১ই সেপ্টেম্বর এই লাঠিটি তাঁকে উপহার দিয়েছেন জনৈক ভক্ত। কারো কারো কাছে একটু দাঁড়ান। মুখে কিছু বলেন না। আমার পাশে এসে মিনিট দুই তিন দাঁড়িয়েছিলেন। আমি

রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। কাজে যোগদান বহিরাগতদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়।

৭টায় প্রাতঃরাশ। উক্মা (অর্থাৎ আধভাঙ্গা গম ভেজে জল দিয়ে সিদ্ধ করা) ও দুধ। চা নেই, চিনি নেই। তরল গুড় পাওয়া যায়। আশ্রমের বাইরে বড় রাস্তায় চায়ের দোকান আছে। এক কাপ চা ত্রিশ পয়সা।

৭-৪৫ মিঃ পনের মিনিট ধ্যান। কয়েক মিনিট আগে বিনোবাজির ঘরে গিয়ে খালি মেজেতে সকলে বসেন। যে তক্তপোষখানায় বিনোবাজি, রাত্রে ঘুমোন তার উপরেই তিনি উত্তর দিকে মুখ করে বসেন। ঠিক ৭-৪৫ মিঃ একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে যান। পনের মিনিট ধ্যানের পর ভক্তিমূলক গান অর্থাৎ সমবেত কণ্ঠে ভজন গীত হয়। ভাগবৎ ও তুলসী দাসও মধ্যে মধ্যে পড়া হয় বলে শুনেছি। ৯-৪৫ মিঃ থেকে দর্শনার্থীদের সঙ্গে বাবা দেখা সাক্ষাৎ করেন। বিনোবাজিকে আশ্রমবাসী ও ভক্তজনেরা বাবা বলে সম্বোধন করে থাকেন। অন্যরা এই সময় নিজ নিজ কাজকর্ম করেন। এই দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনার সময় আশ্রমিকরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকেন। আলোচনার দ্বারা শিক্ষালাভ হয়। শিক্ষার এই পদ্ধতির উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কথোপকথনের প্রতিটি বাক্য লিখে নেওয়া হয়। আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকা মৈত্রীতে ইহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রকাশের ব্যবস্থা আছে।

মৈত্রী হিন্দী মাসিক পত্রিকা। আশ্রমিকা মহিলারাই এর সম্পাদনা করেন। বাইরের কিছু লেখা প্রকাশিত হলেও বিনোবা পরিবারের লোকজনেরাই বেশি লেখেন। পত্রিকাখানি নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। প্রায় হাজার তিনেক নিয়মিত গ্রাহক আছেন।

১০॥টায় সংস্কৃত বিষ্ণুসহস্রনাম আবৃত্তি করা হয়। পরমধাম প্রকাশন (আশ্রমেরই একটি সংস্থা) সমস্রনাম পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, উপনিষদ ইত্যাদির সঙ্গে ব্রহ্মসূত্র, জ্ঞান দেব প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধর্মগ্রন্থাদি এই সংস্থা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কোরাণ, বাইবেল সহ নানা ধর্মগ্রন্থের সার সঙ্কলন করে প্রকাশ করা হয়েছে। জৈন ধর্মের নাকি কোন প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নেই। বিনোবাজি জৈননন্দনজিকে দিয়ে জৈনধর্মসার নামে এই ধর্মের সহস্রটি সূত্র সঙ্কলন করিয়ে শত খণ্ড মুদ্রিত করে অধিকারী ব্যক্তিবর্গের মতামতের জন্য পাঠাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন, তাদের মতামতের ভিত্তিতে সুসংস্কৃত করে পুস্তকখানি সাধারণের জন্য প্রকাশিত হবে বলে শুনেছি।

এগারটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। ভূমি আসনে বসে কলাপাতায় খেতে হয়। ভাত এবং রুটি প্রধান খাদ্য। নিরামিষ আহার। এ খাদ্য বাঙালির রুচিকর নয়। বারটা থেকে দু'টা পর্যন্ত নীরবতা পালন করা হয়। ঘরে বসে লেখা-পড়া বা নিঃশব্দে করা যায় এমন কাজ করা চলে।

সওয়া দুইটায় আবার পনের মিনিট সমবেতন ধ্যান হয়। তখন থেকে পাঁচটা পর্যন্ত নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে কাজকর্ম। বিনোবাজির অধিকাংশ সভা সমিতি বৈঠক তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে হয়ে থাকে। অন্য সময় তিনি প্রায় মৌন থাকেন।

পাঁচটায় রাত্রের ভোজন। এটা আমাদের কাছে খুবই বিচিত্র বোধ হবে। এতে নাকি কাজের সুবিধা হয়, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। ঘণ্টা পড়লে যারা খেতে না যান তাদের অভুক্ত থাকতেই হয়। সাতটায় রান্না ও খাবার ঘরে তালা পড়ে যায়।

ছ'টায় সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা। লাল বাংলার পাশে পাথর বসানো প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভা বসে। বিনোবাজি কয়েক মিনিট আগেই আসেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন রসবোধ ও রহস্যপ্রিয়তার দ্বারা তিনি এই সময় সকলকে মাতিয়ে তোলেন। এই সময় তিনি ইতিহাস পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ থেকে লোকশিক্ষার ঘটনাগুলি মধ্যে মধ্যে বলে থাকেন। বিনোবা কথিত এই রকম গল্পের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন নতুন দিল্লীর সস্তা সাহিত্য মণ্ডল প্রকাশন।

প্রার্থনার মুহূর্ত উপস্থিত হলে সব হাসি ঠাট্টা বন্ধ হয়ে যায়। ভজন গান দিয়ে প্রার্থনার সুরু হয়। অতঃপর বিনোবাজির গীতা থেকে স্থিত প্রজ্ঞের শ্লোকগুলি, নামমালা এবং একাদশব্রত পরপর আবৃত্তি চলে। একাদশব্রতের প্রসিদ্ধ শ্লোকটির রচয়িতাও যে বিনোবাজি সে কথা বহুজনে জানেন বলে মনে হয় না। প্রার্থনা শেষ হতেই বিনোবাজি উঠে পড়েন। প্রার্থনান্তিক ভাষণ নেই। এর অল্প পরেই তিনি শুয়ে পড়েন।

একটা খোলামেলা ঘরে বিনোবাজি থাকেন। তাঁর শোয়া বসা সবই এই ঘরে। ঐ ঘরের চারদিকে কোন দেওয়াল নেই বল্লেই চলে। সবই জানালা। রং চং করা ঝাঁপের জানালা। তোষকহীন বালিশহীন বিছানা হচ্ছে ঋষি বিনোবার সুখ শয্যা। মাথার বিচিত্র টুপিটি এই শোবার সময় মাত্র খুলে রাখেন।

এখন থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত ফ্রি টাইম। যথেচ্ছা কাজ ও ঘোরাফেরা করা চলে। ৮টায় কথা বন্ধ। ৮॥ টায় বাতি বন্ধ। এখানে এখন বিজলি আলো। সকলেই গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সব নিয়ম কানুন মেনে চলেন। আমরা এই সময়টায় একদিন গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলাম। গ্রামের উপর আশ্রমের প্রভাব অনুভব গ্রাহ্য নয়। আর একদিন ধাম নদী তীরে গান্ধী ঘাটে বসে পাহাড়িয়া নদীর রুক্ষ সৌন্দর্যের তুলনা করেছিলাম পূর্ব বাংলার পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী, ধলেশ্বরীর সঙ্গে। উদ্ধত পাথরের মাথায় চঞ্চল পা রেখে বালকেরা নানা খেলায় মেতে ওঠে। নৌকো চলেনা এ নদীতে। অনুরাগ রঞ্জিত যুবক যুবতীকে মধ্য-নদীর পাথরের আসনে বসে নিভৃত গুঞ্জনে কাল কাটাতে দেখেছি। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসে তাদের লুব্ধ দৃষ্টির আড়াল করে দেয়।

ব্রহ্মবিদ্যার্থীদের শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র ও জ্ঞানদেব পড়ান বিনোবা ভ্রাতা বালকোবাজি। তিনি এখানে পুরাসময় থাকেন না। সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই ছ' মাস তাঁর অবস্থানকাল। অন্যান্য অধিতব্য বিষয় হলো উপনিষদ, গীতা, বিনোবাজির রচনা, সর্বোদয় তথা আধ্যাত্মিক সাহিত্যাদি। আশ্রমিকা প্রায় সকলেই এম, এ, বি, এ, পাশ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাও ছিলেন কেউ কেউ। এরা নিজেরাই পারদর্শিনী। তাই তথাকথিত শিক্ষকের এখানে তেমন প্রয়োজন ঘটে না। তবু শ্রীশিবাজী ভাবে, শ্রীদাদা সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতজনেরা মধ্যে মধ্যে সাহায্য করে থাকেন।

ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের আয়াতন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। আশ্রমের উপযোগী অপূর্ব সুন্দর নামে তার গৃহাদি ও পথ-ঘাটের নামকরণ করা হয়েছে। জ্ঞান পথ, ত্যাগ পথ ছাড়া রয়েছে কর্ম, কারণ, সাম্য ও অনুরূপ আরও কয়েকটি নাম। পাঠাগারের নাম জ্ঞানগৃহ।

আশ্রমের পাশেই নিজস্ব ছাপাখানা। তার তত্ত্বাবধান করেন পুরুষকর্মীরা। আশ্রমিকারা এখানে একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করে জীবিকার্জন করেন। আশ্রমের কিছু ক্ষেতখামার আছে। তা দেখাশুনো করেন ভাইয়েরা। এদের বলা হয় অবিরোধী পুরুষ। চমৎকার তুলো, আঁক, বজরায় এখন ক্ষেত ভরে আছে।

দুটি অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি শ্যামা দিদি ও বালু ভাই। এদের কথা না বলে আশ্রমের কথা কিছুতেই শেষ করতে পারি না। শ্যামা দিদি আমাদের বাংলার বোন, ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের প্রথম দিন থেকে আছেন। যে ক'দিন ছিলাম তিনি মাতৃ-স্নেহে আমাদের ঘিরে রেখেছিলেন। খাবার ঘন্টা পড়লে পাছে আমরা সময় মত যেতে ভুলে যাই, তিনি আমাদের ডাকতে এসেছেন। এমন কি রাত্রে মশারী টাঙাতে ভুল না হয় তার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। ছোট বড় প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি কেমন করে জানতে পারেন ভগবানই জানেন, এসে উপস্থিত হচ্ছেন বিনা আহ্বানেই। স্নেহপ্রীতির নির্মল ধারায় তিনি এমন করে আমাদের সিক্তি করেছিলেন যে তাঁর সাহায্য নিতে কোন সংকোচই হতো না।

আর বালু ভাই। ইনি বিনোবা-সচিব। সৌম্য

দর্শন, মিষ্টভাষী সদা হাস্যময় এই ভদ্রলোক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। আজ ঘড়ির কাঁটার মত নীরবে, একপ্রকার নেপথ্যে থেকেই, বিনোবাজির সঙ্গে অহোরাত্র অবস্থান করছেন। কাজটি দারুণ কষ্টকর। তিলমাত্র অবসাদ বা অসাবধানতা এলে সমগ্র কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়। বিনোবাজির চরণতলে নিজেকে তিনি নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে দেখে আমার যিশুর একটি উক্তি স্মরণ হয়েছিল—

No man having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom or God.

আসবার দিন চারুদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিনোবাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করতে পেরে কৃতকৃতার্থ হয়েছি। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। সে মুহূর্তে মনে হয়েছিল এর চেয়ে মহৎ আশ্রয় আর নেই, মহত্তর আপনজন আর হতে পারে না। 'জয় জগৎ' লিখে একখানা গীতাই দিয়ে বাবা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। এটি আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। হৃদয় মথিত করে কবির দু'টি ছত্র স্মরণে এলো :

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্ব মম তোমারি মহিমা।

গৌরদাস বসাক

শৈলেনকুমার দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গৌরদাস বসাক নাম দুটি যেন অঙ্গাঙ্গী। গৌরদাসের মত বন্ধু না থাকলে মধুসূদন জীবনে অনেক অসুবিধায় পড়তেন, বাংলা ভাষায় কাব্য-নাট্য রচনা করতেনও কিনা সন্দেহ। সেদিক থেকে আমরাও তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। মধুসূদনের ছাত্রজীবনে, সাংসারিক জীবনে এবং কাব্যের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে গৌরদাসই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। কীটসের জীবনে, যেমন সেভার্ণ এসেছিলেন, টেনিসন যেমন পেয়েছিলেন আর্থার হালামকে মধুসূদনের জীবনে তেমনি ছিলেন গৌরদাস।

মধুসূদনের অশান্ত জীবনের পানে যে একটি মাত্র হাওয়া অনুকূলে বয়েছিল, সে হাওয়াটি হল বন্ধু-প্রীতির। কবি এটি অনুভবও করতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের জীবনে যোগ্য বন্ধুর অভাব ছিল না। তবু গৌরদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধু মনে করতেন। তার কারণো ছিল—গৌরদাসই ছিলেন একমাত্র বন্ধু যিনি ছাত্রজীবন থেকে আমরণ নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রটি প্রীতি ও মমতা দিয়ে রক্ষা করেছিলেন।

গৌরদাসকে চিঠিপত্র লিখতে গিয়ে তাই মধুসূদনের আবেগের অন্ত ছিল না। সম্বোধন করতে গিয়ে কখনও লিখতেন Dearest' কখনও বা Belovedest। তাঁর চিঠিতে তাঁর যে অপরিসীম আনন্দ ও উল্লাস উপচে পড়ত, তা তাঁর জীবনচরিত পাঠকেরা সকলেই জানেন। গৌরদাসের বন্ধু ও প্রীতির কথা স্মরণ করে একবার তাই তিনি লেখেন—

My heart beats when the thought that you are my friend comes into my mind! You say you will honour my place—or "palace" (as you kindly designate my cottage) with your "Royal Presence", your presence Gour Dass, is something more than Royal. Oh! it is Angelic! Oh! no! it is something more exquisite still!

গৌরদাসের লেখা মধুসূদনের বিভিন্ন সময়ের চিঠি-পত্রে এ সবের অনেক নমুনা ছড়িয়ে আছে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সময় দু'তিন দিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর বন্ধু অদর্শনে ব্যাকুল মধুসূদন লেখেন—**Come, brightest Gour Dass on a hired Palkee and see thy anxious friend M. S. D.** মাদ্রাজ প্রবাসে দু'তিন মাস খবর না পেয়ে ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি স্মরণ করেছিলেন গৌরদাসকে—**Are you all dead! Or had I by some unintentional act or other offended you? I really do not remember having received a single line from you or Bhudeb for the last 3 months. Et tu Brute?**

গৌরদাস মধুসূদন জীবনের অনেকখানি জায়গাই জুড়ে আছেন। অথচ গৌরদাস আজ বিস্মৃত। আন্তরিকতা; সহানুভূতি, সাহায্য এসবকথা বাদ দিলেও মধুজীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল—তিনি প্রথম মধুসূদনকে বাংলা ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করেন। নাটক লেখার মূলেও ছিলেন তিনি। মধুসূদনের জীবনচরিত লেখবার জন্য সব আয়োজন করলেও তিনি জীবনী লিখতে পারেননি। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা না থাকলেও মধুসূদনের জীবনীরচনায়

পথ এত সুগম হত না। এসব ছাড়াও কলেজ জীবনে মধুসূদন টুকরো টুকরো কাগজে যে সব কবিতা লিখে ফেলে দিতেন, সেগুলিও সযত্নে রক্ষা করে জনসমক্ষে আনেন তিনিই।

গৌরদাস নিজেও কৃতী ছাত্র এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যের তুলনা হয় না তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক, সেকালের একটী অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রিচার্ড-সনকে, সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন—মধুসূদন, প্যারীচরণ সরকার, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখকে। বন্ধু হিসাবে সাহচর্য পেয়েছিলেন সেকালের প্রায় প্রতিটি কৃতী মনীষীর, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

কিন্তু প্রতিভার চমকে মধুসূদন তাঁকে যতটা কাছে টানতে পেরেছিলেন, ততটা আর কেউ পারেননি। কলেজ জীবনে উজ্জ্বল তারকা রাশির মধ্যে যাঁকে তিনি 'জুপিটার' মনে করতেন, তাঁর সুতীব্র আলোকেই তিনি আজীবন হারিয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্য দেশ হলে গৌরদাসও অনেক গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু এ দেশে তিনি তা পারেননি। মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে এমন গভীর ভাবে মিশে না থাকলে হয়তো আমরা এই দিগম্বর সন্ন্যাসীটির নামও শুনতে পেতাম না। কিন্তু মধুসূদন নিজেই তা হতে দেননি। তাঁর প্রতিটি রচনার আড়ালে আবডালেও যেন এই গৌরবর্ণ শান্ত সমাহিত পরহিতব্রতী পুরুষটি নিঃশব্দে পদচারণা করেছেন।

গৌরদাস ১৮২৩ সালে কলকাতার এক সুপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাজকৃষ্ণ বসাক। রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণের বন্ধু ছিলেন। সে সূত্রে গৌরদাসও মধুসূদনের মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব নয়, নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। গৌরদাসের মাতৃদেবীও মধুসূদনকে পুত্ররূপে স্নেহ করতেন। মধুসূদনও তাঁকে মা বলে ডাকতেন। গৌরদাসের বাড়ীতে এসে ভৃত্যকে তিনি চিৎকার করে বলতেন—মাকে গিয়ে বল তাঁর খৃষ্টান ছেলে এসেছে, রুটি আর ঘন্ট পাঠিয়ে দেন যেন। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ছাত্র হিসেবে গৌরদাসও কৃতী ছিলেন। তাঁর জীবনও ছিল সুদীর্ঘ এবং কর্ম্মবহুল। হিন্দু কলেজে থেকে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে তাঁর প্রথম জীবন শুরু হয় শিক্ষকতায়। তিনি বরাহনগরে তাঁর উদ্যান বাটিতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজেই সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে এই বিদ্যা-নিকেতন গভর্ণমেন্ট স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। গৌর-দাসের এই স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল।

এরপর গৌরদাস চিৎপুরে পুলিশ দারগা হন। কিন্তু একাজ তাঁর ভাল লাগেনি। তাই এ পদ পরিত্যাগ করে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন। এখানে থাকাকালীন তিনি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব প্রবন্ধ Englishman, Hindoo Patriot প্রভৃতি কুলীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি বহু পদস্থ ইংরাজের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদেরই সহায়তায় তিনি শেষ পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কিন্তু শুধু এক জন কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী হিসেবেই নন, চরিত্রগুণে তিনি অচিরেই প্রভূত সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তিনি কলকাতার জাষ্টিস অব দি পিস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের নানা পরিসরে তিনি সাহিত্য চর্চা ছাড়েননি। তাঁর বহু গবেষণা মূলক জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ আজও সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে আছে। বিশেষভাবে যে কটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল—

Bengal, its Castes and its Curses,
Kalighat and Calcutta,
On the Barisal Guns,
Gopalpore Meteorite,
Notes on some Buddhist Copper Coins প্রভৃতি।

১৮৯৯ সালে ৭০ বৎসর বয়সে এই কর্মযোগী বন্ধু-বৎসল পুরুষটির কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে।

গৌরদাসের কর্মবহুল জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হল মধুসূদনকে বাঙালি স্রষ্টায় পরিণত করা। ছাত্রাবস্থা থেকেই যিনি শ্বেতদ্বীপের তীরে বেড়াবার স্বপ্ন দেখতেন, মিল্টনের মত কবি হবার স্বপ্ন দেখতেন—তাঁর চোখের মোহাঞ্জন মুছে নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে উদ্যোগী করাটা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু গৌরদাস সে কঠিন কাজটি করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেন।

মধুসূদনের বাংলা নাটক রচনার পিছনেও একটি ছোট ইতিহাস আছে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে 'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সাল দেখতে এসেছিলেন মধুসূদন, সঙ্গে ছিলেন গৌরদাস। এই রিহার্সালে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ' দেখে মধুসূদন দুঃখ প্রকাশ করেন এবং গৌর দাসের অনুরোধে বাংলা নাটক রচনার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ফলশ্রুতি হল শর্মিষ্ঠা। এদিক থেকেও গৌরদাসই হলেন নাট্যকার মধুসূদনের গোপন সূত্রধার।

শুধু নাটক কেন, কাব্য রচনার মূলেও তাঁর প্রেরণা ছিল অপরিসীম। তিনি মধুসূদনকে বার বার বাংলা কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু মধুসূদন সেসব কথা কানেও তোলেননি। তারপর মধুসূদন তাঁর Captive Ladie ইংরাজী কাব্যের একটি কপি গৌরদাসকে পাঠালে, গৌরদাস একটি ঐতিহাসিক পত্রে লেখেন—We do not want another Byron or another Shelley in English. What we lack is a Byron or a Shelley in Bengali Literature! গৌরদাসের এ আক্ষেপ মধুসূদনের অন্তরে পৌঁছেছিল। তিনি বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন।

শুধু নাটক বা কাব্যই নয়, মধুসূদনকে অমর করে রাখতে গৌরদাসের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 'মধুসূদনের পূর্ণ জীবনী রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখের একটি পত্রে পরবর্তীকালে তিনি মধুসূদনকে লেখেন—In the meantime, let me tell you that I am anxious to begin your Biograply. Now I want some particulars of your childhood, birth day and a little family account, Will you please send me at an early opportuinty? Pray to do so at once.

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে গৌরদাস শেষ পর্যন্ত জীবনী লিখতে পারেননি। তবে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি না-থাকলে যে পরবর্তীকালে জীবনী লেখকদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হত, সেকথা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের একজন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ভূমিকায় লিখেছেন—"তিনি উপকরণ সংগ্রহ না করিলে মধুসূদনের কোন জীবন চরিতই রচিত হইত কিনা সন্দেহ।"

তবে গৌরদাস নিজে মধুসূদনের 'বসওয়েল' হতে না পারলেও মধুসূদনের প্রথম জীবনচরিত রচিত হয় প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে। ১৩০০ বঙ্গাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' প্রকাশিত হলে মধুসূদনের অন্যতম সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র গৌর দাসকে একটি পত্রে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন—"You have discharged the noble duty of a friend to a friend. The whole callous and Bengali World is on one side and you are doing justice to Madhu's memory on the other! The book may be the writing of another but its seeing the light must be mainly traced to your paternity. ...For the getting up of Madhu's

biography as a public act, I move for a vote of public thanks to you.

শুধু ছাত্র ও সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মধুসূদনের সুখ-দুঃখের একজন প্রকৃত অংশীদার ছিলেন। মধুসূদনের বিক্ষিপ্ত জীবনের যোগসূত্রটি বজায় রাখতে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। গৌরদাসের নিজের জীবনেও কর্মব্যস্ততার সীমা পরিসীমা ছিল না, কিন্তু মধুসূদনের যেকোনো উপলক্ষ্যে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাসী মধুসূদনকে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, উদাসী কবিকে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির অবৈধ দখল সম্পর্কেও সচেতন করে দিয়েছিলেন।

মধুসূদনের জীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই গৌরদাস বিচরণ করেছেন। জীবনে যিনি সব সময়ে মধুসূদনের কাছে কাছে ছিলেন, মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর কর্তব্যবোধ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। কবির শোকসভা, সমাধি ফলক নির্মাণ প্রভৃতি উত্তর মৃত্যু সমস্ত প্রচেষ্টাতে তিনিই ছিলেন পুরোভাগে। বাড়িতে সৌখিন রান্না হলে যিনি মধুসূদনকে না-খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন না, মধুসূদনের মৃত্যুর পর সেই গৌরদাসকে সত্য কোন আবেগ বা অন্য কোন অনুভূতি কর্তব্যবোধ থেকে কখনও বিচ্যুত করতে পারেনি। শুধু গৌরদাসেরই নয়, মধুসূদনেরও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি জীবনে এমন একজন বন্ধু পেয়েছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে ভাবতে অবাক লাগে পরবর্তীকালে মধুসূদন কোন গ্রন্থ গৌরদাসকে উৎসর্গ করেননি, কবিতায় কোন যশোগাথাও রচনা করেননি। হয়তো তাঁর অন্তর আরও গভীর কিছু করতে চেয়েছিল, যেটা তিনি হয়তো করতে পারেননি অথবা করতে চাননি। হয়তো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, গৌরদাসের স্মৃতিরক্ষা বা যশোগাথার প্রয়োজন নেই—তিনি নিজগুণেই অমর হয়ে থাকবেন।

সত্যিই তাই। যতদিন মধুসূদন জীবিত থাকবেন, ততদিন গৌরদাসও অমর। গৌরদাসকে নিবেদিত একটি কবিতায় মধুসূদন নিজেও সেকথা বলে গেছেন—

Yet, Friendship, and Love shall be ier ours my Gour !
Where'er may Fate lend me
Thou shan't be forgot !

গৌরদাসের জীবনে এর চেয়ে গৌরবের আর কি হতে পারে। মধুসূদনই বা বন্ধুপ্রীতির এর চেয়ে গভীরতম বা পবিত্রতম কি স্বীকৃতি দিতে পারেন।

কান্ত কথা

শান্তিলতা রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমাকে দেখে ওরা আমায় ডাকলে, আমিও ওদের সঙ্গে বসে গেলাম। নানা গল্পগুজবের পরে একজন বললে, আচ্ছা বলতো কে রোজ রোজ এত ভোরে খঞ্জনী বাজিয়ে ভারি মিষ্টি গান গেয়ে যায়? একজন বললে, হ্যাঁ আমিও শুনেছি, আর একজন বললে, একদিন খুব সকালে উঠে দেখতে হবে কে গান গেয়ে যায়। আমি বললাম, ভোরবেলায় কে গান গেয়ে যায় তাকে দেখলে কি হবে, একজন বললে, কি আর হবে এত সুন্দর গান গেয়ে যায় তাকে ধরতে পারলে দু-চার পয়সা দিতাম। আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত পেতে অঞ্জলি করে বললাম, পয়সা দাও গান আমিই গেয়ে যাই। ছেলেরা খাবার-দাবার ফেলে আমায় জড়িয়ে ধরলো। আমি বললাম, এটা বুঝলে না তোমরা, এই সেই ১লা এপ্রিলের প্রতিশোধ। ছেলেরা ব্রাভো ব্রাভো বলে আমাকে নিয়ে প্রায় নাচবার জোগাড়। এইভাবেই আমাদের হোষ্টেলের জীবন—পড়া নিয়ে, আনন্দ নিয়ে কাটিয়ে এসেছি। এখন তো সেদিন আর নাই, নিছক আনন্দ করার জন্ত আনন্দ আর নেই। আমি ছুটিতে যখন দেশে গিয়েছি তখন শুধু নেচে গেয়ে লিখে, গানের সুর দিয়ে আনন্দ করে বেড়িয়েছি। তখনও রাত্রে বসে লিখেছি—"নমো নমো নমঃ জননী বঙ্গ। তখনও লিখেছি "অব্যাহত তোমারি শক্তি গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া 'ধানী' যেমন তদ্বৎ প্রেমের আনন্দ মনে উপলব্ধি করি তেমনি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খেলাধুলাও করি, তাদের সঙ্গে সাঁতার কাটি, আবার বৈঠকখানায় বসে টানা পাখার হাওয়া খাই, আবার বাবা, জেঠা, গণ্যমান্ত সকলের অনুগত হয়েও থাকি, এমনি করেই পরমানন্দে দিন কাটিয়ে এসেছি, কি বোলো এ যে সবই তার কাজ, আমাকে দিয়ে করায়।

আমার কি রকম সাহস ছিল জানো ঐ পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একেবারে মাঝ নদীতে চলে গিছি যেখানে জলে ভীষণ ঘূর্ণি—কিন্তু তলিয়ে তো যাই নি। সেই আমাকে পাড়ে তুলে দিয়ে গেছে। নিঃশঙ্ক প্রাণে গেছি এসেছি। আমাকে সব সময় আগলিয়ে রাখে তার কাছে টেনে নেবে বলে সব দিক দিয়ে তৈরী করে নিচ্ছে। আর ক'টা দিন বা আছি সেই জানে।

আরও একটা বলি: পূজার সময় দেশ থেকে আসতে পোড়াদহ রেলে এসে দামুকদিয়া ঘাটে নামতে হত, আমি একবার দেশ থেকে আসছি পোড়াদহ এসে রেলগাড়ী করে দামুকদিয়া ঘাটে এসে নেমেছি এখান থেকে বেশ খানিকটা পথ পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে নৌকা করে পদ্মার ওপারে সাড়াঘাটে গিয়ে নামতে হত, এখানে পদ্মা বড় ভীষণ। যেমন ঢেউ তেমনি গর্জ্জন, এপার ওপার দেখা প্রায় যায় না। ওপারটা শুধু দেখা যায় আকাশ আর পদ্মা এক হয়েছে, নীল একটি সরু

সেখায় এই পদ্মা পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হবে? নৌকা তো আমাদের ছাড়লো, এত হাওয়া যে মাঝিরা পাল তুলে দিল নৌকা তো সোঁ-সোঁ করে ছুটে চলেছে। হাওয়া তো প্রবল ছিলই, হাওয়া যেন আরও বাড়তে লাগলো। মাঝ পদ্মায় গিয়ে এমন হল নৌকা কাত হয়ে পড়লো। কিন্তু মাঝিরা ঠিক বৈঠা বেয়ে চলেছে। নৌকার একটু হেলে পড়া দেখে মা তো ভয়ে আতঙ্কে প্রায় কান্নাকাটি করার জোগাড়। এই বুঝি নৌকা ডুবে যায়, বাবাকে বললেন মাঝিদের বল এখুনি পাল নামিয়ে দিক, বাবা বাইরে এসে মাঝিদের বলে গেলেন, কিন্তু মাঝিরা আর পাল নামায় না। মা তো শেষকালে নৌকার ছই-এর বাহিরে এসে মাঝিদের বললেন, কি করছ তোমরা পাল নামাও নাই কেন? নৌকায় তো জল উঠে পড়ার মত হয়েছে। মাঝিরা বললো আমরা কি করবো মা, কর্তাবাবু তো পাল নামাতে দিলই না বরং আরেকটা পাল তুলে দিতে বললেন। মা চেয়ে দেখেন দুখানা পাল তোলা, আর নৌকা তীরবেগে চলেছে। এই সময়ে হঠাৎ হাওয়ার জোর কমে এলো, মাঝিরাও পাল নামিয়ে নিল। মা নৌকার ভিতর এসে দেখেন যে আমি চুপচাপ হাসি-মুখে বসে আমি। মা তো রেগে গেলেন, আমি বললাম, ভয় পেয়েছো? ভয় কি? মা বললেন, হ্যাঁ ভয় কি মাঝ পদ্মায় সবটিকে নিয়ে ডুবে যাই আর তুমি আরও একটা পাল তুলে দিয়ে চুপ করে বসে আছ, নৌকায় তো জল ওঠে, ভাবি ভরসা দিচ্ছ, বাবা খুব হাসলেন। আমরা প্রায় সাডাঘাটের কাছে এসে পড়লাম।

বাবারও ছিল দুরন্ত সাহস—কোন বিপদেই ভয় পান নাই, বরঞ্চ বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল স্বভাব। আমরা বসে আছি আমাদের মধ্যে বাবা এসে বসলেন, বড়দাদা, মেজদাদা, ছোটদাদা মা বৌদি আমরা তিন বোন, হেমেন্দ্র বক্সী তো ছিলেনই আরো কে কে ছিলেন ঠিক মনে নেই, আমাদের মধ্যে আমাদের ছোট্ট ভাইটি খেলা করে বেড়াচ্ছে। বাবা লিখলেন যদি বেঁচে থাকতে পারতাম তবে তোমাকে, তিন মেয়েকে, ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পড়াশুনা শিখাতাম, গানও ওদের ভাল করে শেখাতে পারতাম, তা আর হোল কৈ, মার দিকে চেয়ে লিখলেন—"কত-কাল আগে" "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে—কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল তোমার করুণা চন্দনে"। গানটি লিখেছিলাম —গানটি লিখে টেবিলেই খাতা দিয়ে চাপা দিয়ে উঠে চলে এসেছিলাম, তুমি কোন সময় গিয়ে গানটি পড়ে এসেছিলে এবং খুব দুঃখ হয়েছিলো তখন, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, এ গান আমি আর নিজে গাইব না, দেখ তখন থেকে ওগান আর গাইনি, আর এখন? ভগবান আমার কথা বন্ধ করেছেন তোমার চোখের জলেরও মূল্য দিয়েছেন, আমার তো গাইবার আর কথাই নাই, আর সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কণ্ঠ আর ফিরে পাবনা কথাটা বলে ছিলাম—আর এমন ক্ষণেই তোমার চোখের জল পড়েছিল—সবই সে শুনে ছিল। এখন তবে একটা কথা, এখানেই বলে রাখি সবাই তো আছ, আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।" চোখের জলের সঙ্গে লিখলেন—"যখন আমি শেষ হয়ে যাব, যখন আমাকে সবাই সাজিয়ে নিয়ে যাবি তখন আমার কষ্ট আর থাকবে না —তাঁর মহা আহ্বানে যখন তোরা তাঁর পায়ে আমাকে সমর্পণ করতে নিয়ে যাবি। তখন এই গানটি গেয়ে আমাকে নিয়ে যাবি।" লিখলেন 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে। এ গানটি সম্পূর্ণ করেই গেয়ে নিয়ে যাবি, গানটা বড় ভালো যে, সবটাই আমি মনে মনে গাই, তোরা আর কি করে শুনবি, আমার বলা রইল তোরা ভুলে যাসনে।" চোখে জল সকলেরই, মা যেন কেমন হয়ে রইলেন, বোধহয় মনে মনে সেই আগের দিনে চলে গেছেন। এখন ভাবি এ পৃথিবীই বা কি দুঃখের জায়গা রসালনন্দন বর্ণিতই বা কি সুখের স্থান। আমাদের দিকে চেয়ে লিখলেন, শোন তোরা আমার যাবার বেলায় কেউ

কাঁদবিনে শুধু বলবি হরি বোল...আমার কানে কানে বলবি হরি বোল...আমাকে ঘিরে বলবি হরি বোল...। নিজেরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে, লিখলেন মায়া কাটানো কি সোজা কথা? এই যে স্নেহের ধনগুলি বসে আছে কি করে এদের ছেড়ে যাব, এরা যে আমায় ঘিরে রেখেছে, যেতে দিতে চায়না কিন্তু ডাক পড়েছে যেতে হবেনা? আমি যে দয়ালের ডাক শুনতে পাচ্ছি, আমি তো মৃত্যুর অপেক্ষা করছি আমার যে ব্যারাম হয়েছে তা শিবের অসাধ্য, তৈরী থাকা ভালো খুব বড় ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তরী ডুবে যাওয়াই বেশী সম্ভব, সেই জন্যই বলি তোরা তৈরী থাকিস, হেমেন্দ্র আমাকে আর আশা দিসনে, আশা থাকলেই তোদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, কিন্তু ভগবানের দিকে যায় না। বাঁচব না মনে করলেই এখন আমার উপকার, কারণ সুস্থ থাকলে কেউ বড় দয়ালের নাম করে না।

সুধীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, আগেই বলেছি, এসে বসে থাকতেন, বাবার সঙ্গে কি কথা হত তা আমরা কখনও শুনি নাই, তবে আসতেন বাবার মুখ দেখেই বোঝা যেতো যে বাবা মনের মানুষ পেয়েছেন। স্যার পি, সি, রায় একদিন এলেন, অনেকক্ষণ বসে কথা-বার্ত্তা বললেন, বললেন আপনি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" এই গানটিরই কবি, অন্য সব লেখা গান এসব ছেড়েই দিলাম—শুধু ঐ গান-টি'র জন্য আপনি আমাদের নমস্য, এ যে কি দান করে গেলেন আপনি জানেন না, আমাদের সকলের আয়ু দিয়ে যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করা যেতো তবে আমরা ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করতাম, তবুও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবান আপনাকে ভালো করে দিন" পি, সি, রায় বললেন—রাজসাহীর কথা ভুলিনি। সেদিন আপনার সঙ্গলাভে অমৃত লাভ করেছিলাম। কবির এমন আনন্দরূপ অন্তরজরূপ কখনও ভুলতে পারব না, চিকিৎসার কথা—জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা লিখে কথা বললেন—আপনি দেশের জন্য কর্ম্ম ও সাধনায় ব্যাপৃত আছেন, আপনার দীর্ঘ জীবনই কামনা করি, আমার জীবন দিয়ে দেশের কি উপকার হবে? আমার আয়ু প্রার্থনা করবেন না, আমাকে বলুন তাঁর সাধনাতেই যেন নিমগ্ন থাকতে পারি, আর যে কটা দিন আছি, মাঝে মাঝে দয়া করে এসে আমাকে দেখে যাবেন।"

বোধহয় পি, সি, রায় আরও একদিন এসেছিলেন, বাবার স্বদেশী সঙ্গীতের কথায় পি, সি, রায় যেন মেতে যেতেন, তাই সুরেশ দাশ একদিন বললেন বাবাকে, নব্য ভারতে আপনার স্বদেশী সঙ্গীতের কথা দ্বিজেন্দ্রলাল কি লিখেছেন জানেন? তিনি বলছেন, যদি দেশের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে কাহারও সঙ্গীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে তবে তাহা কবি রজনী কান্তের। বাবা বলেছিলেন—"হ্যাঁ তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে বেদনা দিল প্রচুর।

আমার কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গর্ব্ব করিতে চুর।

"আমার কি সত্যিই একটু গর্ব্ব হয়েছিল? নারে মনে প্রাণে কোথাও গর্ব্ব কোন কিছুর জন্যও বোধ করিনি, আমি ছোটবেলা থেকে চেয়েছি তাঁর প্রেম তাঁর ভালবাসার ঠিকানা। আমি যদি গর্ব্ব কিছু করেই থাকি তাও আর প্রেমের বিকাশ, সে আমার গর্ব্ব নয়। সুরেন তোরা আমাকে একটু হৃদয়ঙ্গম করে দেখিস, এবার যে ধূমকেতুটা উঠেছে—ওর নাম তোরা জানিস? আমাদের বললেন—ওটার নাম হেলির ধূমকেতু, সত্তর বছর পরে পর পর একবার করে দেখা যায়, সব জায়গা থেকেই দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মধ্যে যে এত সব পাহাড় আছে আর এক একটা প্রায় ছয় মাইল উঁচু—চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোটো কিন্তু ওর পাহাড়গুলো পৃথিবীর পাহাড়ের চেয়ে বড়। দূরবীণ দিয়ে চাঁদকে দেখা গেছে—প্রাণী নাই বাতাস নাই তেজ নাই, শুধু পাহাড় আর কিছু নাই, নদী নাই, ঝরণা নাই, সমুদ্র নাই গাছ নাই, পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু যেটা সেটা ছয় মাইল। তের লক্ষ একত্রিশ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যা হয় সূর্য্যটা তাই, প্রায় তিরানব্বই কোটি মাইল দূরে আছে, তাই যখন ভাবি

তখন আমাকে এতক্ষুদ্র মনে হয় যে নিজেকে হারাতে পাইনে, বেদনাও থাকে না। ভাখো আমি রজনী সেন এখানে বসে কত গর্ব্বই না করছি কত অভিমান করছি কত রাগ, কত কাণ্ডই করেছি মনে হলে লজ্জা হয় না? আমি একটা নগণ্য ব্যক্তি তবু কেন এত ভালবাসা পাচ্ছি? বরিশালের অশ্বিনী দত্ত মহাশয় পর্য্যন্ত আমার খবর নিচ্ছেন চিঠি লিখছেন—'আপনি প্রকৃতই অমৃতের অধিকারী, আপনার সঙ্গীত অমৃতময়, লক্ষ লক্ষ লোক ভগবৎ চরণে আপনার নিরাময় প্রার্থনা করিতেছে আমিও তাদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি"।

আমার বাবার পথে কেন এত ভালবাসা কুড়িয়ে যাচ্ছি? এত ভালবাসা পেলে যে আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছাতেই কি সব কিছু হয়, হয় তাঁরই ইচ্ছায় বাঁর অমোঘ বিধান। আবার বললেন—আমাকে বড়ো ব্যথা দিচ্ছে, বড় মারছে, কি যে বলে আর মারে, মারুক মারতে মারতে হাত ব্যথা হয়ে যাবে, আমিও কিছু বলবও না, যা হবে তাই হোক, দেখিনা কোথায় নিয়ে যায়, আমি তো ধুলোয় নামব না। ঘাড় ধরে নামিয়ে দিলেও নামব না, তখন কাঁদব, এ কান্না শুনতে তাকে হবেই, আমার এই কাকা শরীরে আর কিছু রাখল না, আমার মাথায় একটা পা, বুকে একটা পা দিয়ে চেপে রেখেছে, আমি কি বুঝতে পারি না? আমাকে দু'দিক থেকে দু'জনে টানছে মানুষের যা সাধ্য তাই দিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে—সেই পরম দয়াল তো আমাকে ছাড়বেনা। নিয়ে যাবার বড়ো চেষ্টা করছে। আরে দয়াল যাকে টেনেছে—ডাক্তার, বৈদ্যের আর হাত কি? ছেড়ে দাও না—যারে যেই রাখে সেই। ছেড়ে দাও, তোমাদের ডাক্তার, বৈদ্য যখন হার মেনেছে তার কোলেই চলে যাব সেই শান্তিময় কোলে।

বাবা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন, সকলেই যেন বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। আবার ওকেনাল সাহেব এলেন, বার্ড সাহেব তো রোজই আসছেন, সারওয়ার্দি এসেছেন কেউ কোন নূতন চিকিৎসাও বলতে পারেন না, আর আশাও কিছু দিতে পারবেন না। বাবার খাওয়া আরও কমে গেল, কিন্তু মুখের হাসি ঠিকই আছে। আর লেখনী ধীর গতি হয়েছে কিন্তু বন্ধ হয়নি—চলছে, প্রায় বসেই থাকেন, কষ্টও বাড়ছে একটু একটু করে আর লিখেও যাচ্ছেন। এই লেখনীই তাঁর প্রাণ শক্তির উৎস, শরীরের কষ্টে লেখনী আর চলতে চাচ্ছে না, আমরাও নীরব নিয়মের মত হয়ে আসছি। দূর থেকে একটা ভয়ঙ্কর কালো মেঘ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, দেশের আপামর জনসাধারণ কবি দার্শনিক বিদগ্ধ জন, আত্মীয় জন সকলেই আসেন ম্রিয়মান, ভাষাহীন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে নীরবে বসে থাকেন। কবি চেয়ে থাকেন আর ধীরে ধীরে লেখনী চলে, মনের প্রফুল্লতা আরও দীপ্ত আরও প্রসন্ন।

"ভাইরে মায়ের কাছে চলেছি, আর দেরী নাই, এইবার আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে, তোদেরও ছুটি হয়ে যাবে, কত ব্যাকুল হয়েছিস, কত রাত ঘুমুসনি কত চিন্তা করেছিস. বাবা আয়রে কাছে। আমার বড় পিপাসা, তোর মা কই রে"। এই রকম আস্তে আস্তে লিখে যেতেন।

আবার ডাক্তাররা পরামর্শ করলেন বিলেত থেকে রেডিয়াম এনে একমাত্র চিকিৎসা বাকী, কিন্তু তখন তো এরোপ্লেন হয়নি, কাজেই রেডিয়াম আনতে দেরী হবে, শরীরের যে অবস্থা রেডিয়াম এনে চিকিৎসা করতে দেরী হয়ে যাবে, সে ব্যবস্থার মধ্যে কেউ গেলেন না। মৃত্যুর কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, বাবা আরও কয়েকটি গান বা কবিতা যাই বলি লিখলেন—

দাও ভেসে যেতে দাও তারে—
ঐ প্রেমময় পরমেশ পাদোদক
তাঁহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুধারা
দিও নাকো বাধা, যেতে দাও,
আমার মরাল-মন ঐ চলে যায় কার গান গেয়ে
শোনো, ঐ স্রোতো বেগে মধুর তরল ছুদি, যেতে দাও।
মুক্তিওমা ওটিও চলে যাক

আসিয়াছে যেথা হতে—
সে চরণে ফিরে চলে যাক
দিয়ে যাক এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীর সুশীতল সুমধুর ধারা
অমর করিয়া যাক বাহি।
ঐ অশ্রুটুকু ঐ জীবনে মরালের পাথেয় মধুর
সেটুকু নিও না কেড়ে
দিতে চাই তারি পদতলে।
যে দিয়াছিল অশ্রু ভিক্ষা।
আমার দয়াল ঐ বসে আছে নিরজনে
আমারে দিও না বাধা ভেসে যাই একমনে।

বোধহয় এইটিই শেষ রচনা। আরও দু'একটা আছে, তার দু'চার লাইন তুলে দি, এইটি লিখবার আগে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। হেমেন্দ্র বক্সী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললে 'দাদা বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি? কি কষ্ট হচ্ছে? বাবা চোখের জলের সঙ্গে মুখ তুলে হেমেন্দ্র বক্সীর দিকে চাইলেন তারপরে চোখ নামিয়ে লিখলেন—

আমি কাঁদি যার তরে সে যে
মোর অন্তরের হিয়া
মরমের সবটুকু জীবনের সবটুকু দিয়া।
ভাই রে হেমেন্দ্র আমি ব্যাকুল হইয়া যদি কাঁদি,
পবিত্র আদেশ তারি (তুমি তো জানিছ মোর)
কি কঠিন ক্লেশকর ব্যাধি।
তুমি ভাবিতেছ বুঝি মিথ্যা বেদনার তরে কাঁদি
ছি ছি বন্ধু ছি ছি সখা—
আমারে কোরো না অপরাধী।

ক্রমেই বাবা স্তিমিত হয় পড়েছিলেন। লেখার শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তবুও লিখলেন—হে আমার মঙ্গল কর্তা আমার পরম বন্ধু তোমার জয় হোক, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছি, তোমার নাম সম্বল করেই চলেছি, আমাকে অভয় চরণে স্থান দাও, আর পারি—না।

মাকে ডেকে লিখলেন বললেন—'হিরণ্ময়ী বড় আবরণ করে রেখেছিলে এবার আবরণ খোলো আমাকে বিদায় দাও আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। আর বোধহয় লেখনী চলবেনা—তাই বলে যাচ্ছি। ওকি কাঁদছো? এই রোগদগ্ধ দেহটা যত্ন করে রেখে লাভ কি? বল একবার বল, আমার হাতধরে বল—শ্রীহরি শান্তি দাও, আর যে কটা দিন আছি হরির নাম শুনাও, কাঁদবার দিন তো রইলই, এখন কেঁদনা। আমার বৃদ্ধা মা, আমার মা কই ডাক না, তাকে দেখো, আমাদের বললেন দ্যাখ তোদের চোখে জল? কাঁদবিনে কিছু ভুলিসনে—তোদের মাকে দেখিস আমার মাকে দেখিস, আর আমার কাছে বসে হরিনাম শুনা, "কেন বঞ্চিত হব চরণে" কি ভুলে গেলি? আয় রে আমার কাছে, আর আমার কথা বলবার ক্ষমতা নাই, বড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, হেমেন্দ্র বক্সীকে বললেন—কত জন্মের পুণ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম, হেমেন্দ্র ভাইরে দয়ালের নাম কানে দিও, আর রাখতে পারলে না, মা মহামায়া ডাকছে—তার ডাক পেলেই চলে যাব, আমাকে ক্ষমা কোরো। অন্তরে দয়ালের আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন, বাইরে আমাদের কাতরতা দেখছেন।

দিন যায়, ফুরাইয়া হায়, কোন বিধাতার শাপে"। শরীরের যন্ত্রণায় অর্থের চিন্তায়—এক মুহূর্তের জন্যও বিধাতাকে দোষী করেন নাই, "খালি বলছেন" আমার বন্ধন, আমার মালিন্য, আমার কষ্ট আর কিছুই রইল না। আমি অমৃতের অধিকারী হতে চলেছি"।

হঠাৎ যেন বাবার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়লো। তাঁর মায়ের ব্যাকুল ক্রন্দন বলে ডাকে আর যে সাড়া দিতে পারছেন না। আমার দাদারা ছোট দুই বোন সৌদি সকলের ডাকে শুধু সকলের মুখের দিকে চেয়ে আছেন, যেন চোখের ভাষায় বুঝাচ্ছেন আর ডেকো না। আমাকে সেই 'যেখানে দয়াল আমার বসে আছে সিংহাসনে আমারে দিও না বাধা ভেসে যাই একমনে।

চিকিৎসকেরা বসে আছেন তবু যদি একটু কষ্ট লাঘব হয় বারে বারে ইনজেকশন দিচ্ছেন, তখন গ্লুকোজ

ওয়াটার ছিলনা, সেলাইনও ছিলনা। কাজেই আর শেষ চিকিৎসায় কি আরাম বোধ হবে।

মা বলেন কোথা যাও তোমাকে যেতে দেব না, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। বাবা কাঁপা হাতে লিখলেন—দয়াল নিতে এসেছে তাই যাচ্ছি, আমাদের দিকে চেয়ে লিখলেন ওরা রইল, এই শেষ লেখা।

দু'দিন এই ভাবেই রইলেন, তিন দিনের দিন সকাল থেকেই কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, আমরাও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম, কে আসে কে যায় কে চুপি চুপি কথা বলে চোখের সামনে দেখছি, কি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই চেতনায় আসছে না। কালো মেঘ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, কি সর্বনাশা প্রভঞ্জন নিয়ে আসছে—সবাই যেন দূর থেকে চেয়ে দেখছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।

ক্রমে রাত হয়ে এলো—সমস্ত যে অন্ধকার হয়ে গেল। মৃত্যু দূত প্রভঞ্জন রূপে এসে দাঁড়ালো, আমাদের বৌদি আমাদের তিন বোনের কানের কাছে এসে বললেন বাবা যে তোমাদের আর আমাকে বাবার যাত্রার সময় হরির নাম শুনাতে বলেছিলেন এখন সেই সময় এসেছে তোরা হরি নাম কর, আমরা হরি নাম করব কি—আমরা বাবার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লাম, কি করেছি আর এখন সেকথা স্মরণ নাই। বাবা চলে গেলেন, সমস্ত নিস্তব্ধ শুধু দাদাদের আর আমাদের কান্না, মাকে চেয়ে দেখলাম এখন তো আর বাবার গলায় ব্যথা নাই তাই বাবার গলায় হাত দিয়ে বাবার পাশে পড়ে আছেন, ঠাকুমা কি বুঝলেন জানিনা, ঠাকুমা শুধু রজন রজন বলে ডাকছেন খুব আস্তে আস্তে। বাবা শান্ত, প্রশান্ত মুখ, তাঁর দয়াল তাঁকে নিয়ে গেলেন। রোগ-জর্জ্জর দেহটা পড়ে আছে, সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান হয়ে গেল, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা থেমে গেল, আমাদের আকুল প্রার্থনা প্রাণ ভিক্ষা সব বিফল হয়ে গেল।

কোথা থেকে কত লোক এলো সকলের হাতে ফুলের মালা—সুরভিত ধূপচন্দনে কে যে বাবাকে সাজালো—দেখেছি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। কটেজে এত লোক হল যে ভিতরে দাঁড়াবার জায়গা নাই, বাইরে রাস্তায় সব ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেই এ জীবন নীরব নিঝুম হয়ে কিসের অপেক্ষা করছেন? বাবাকে যখন নিয়ে যায় তখন সকলেই ভয় পেয়েছিলেন যে মা ও পত্নীর পাশ থেকে রজনী কান্তকে নিয়ে আসা খুব মুস্কিল হবে, তা হয়নি। হেমেন্দ্র বক্সী মাকে ধরে বললেন—বৌঠান দাদাকে নিয়ে যাই? মা কিছু না বলে হাতখানি বাবার গলার থেকে সরিয়ে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমার মেজদাদা এসে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার ছোটবোন, সেজবোন জিজ্ঞাসা করলো—বড়দা ওরা বাবাকে এত সাজাচ্ছেন কেন? ওদের ইচ্ছে যে বাবার মাথার চুল ওরা আঁচড়িয়ে দেয়—যেমন রোজ দিত, বড়দাদা কিছুই বলতে পারলেন না, ঠাকুমা কিছু বুঝতে পারছিলেন না, ঠাকুমাকে বৌদি এসে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিয়ে এলেন। রজনীকান্ত মহাযাত্রা করলেন। দেবেন চক্রবর্তী, সুধীর বসু, সুস্থির বসু আরও কে কে জানিনা রাস্তায় বেরিয়ে সেই গানটি গেয়ে আস্তে আস্তে রজনীকান্তের মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে। কবে তাপিত চিত্ত করিব শীতল তোমারি করুণা চন্দনে"। যে গানটি নিজে আর গাইব না বলে মার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর শেষ যাত্রায় যেন এই গানটি গাওয়া হয় বলে গিয়েছিলেন।

আমরা বাড়ীর মধ্যে যার যার মত পড়ে আছি, ঘর খালি এইটাই শুধু চোখে পড়ছে, বাবা চলে গেলেন চোখের সামনে দিয়ে তা যেন এখনও মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিনা, অন্তরের দিকে চেয়ে দেখি কি কথা যেন ঠেলে উঠতে চায়, কি বলতে চায় বলছে কি?

হে জলন্ত অগ্নিশিখা—
তোমার পবিত্র বক্ষে
সজ্জিত চন্দনে মাল্যে

কবিরে তুলিয়া লহো
(চন্দনে কুসুমে মাল্যে
বরণ করিয়া লও) দিয়া রাজটিকা।
যত কিছু দুঃখ সুখ
প্রেম সুধাপূর্ণ বুক
দীর্ণ বেদনায় তারে—
সমর্পণ করিলাম, তোমার চরণে
শান্তি হোক শান্ত হোক কাঙ্ক্ষিত মরণে।

সব যেন উজাড় করে অগ্নি দেবতাকে আহুতি দিলাম, তাঁর শান্তি হোক, আমরা তো এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে শান্তি দিতে পারি নাই।

হে দেবতা মঙ্গলময় তোমার প্রিয় পুত্রে তুমি কোলে তুলে নাও, তোমার অমোঘ বিধানের জয় হোক।……

তারপর রাত কেটে গেল ভোর হল, ভোরের বেলা মা যখন স্নান করে এসে দাঁড়ালেন, ঠাকুমার তখনো আচ্ছন্ন অবস্থা, তিনি হঠাৎ মুখ তুলে মার দিকে চাইলেন যেন চম্‌কে উঠলেন বল্লেন—একি? একি বৌমা তুমি এবেশ করেছ কেন? কি হল তোমার হাত খালি কেন? আমার রজনের যে অমঙ্গল হবে। মা ঠাকুমার পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। বৌদি মাকে জড়িয়ে ধরলেন, ঠাকুমাও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের মত হয়ে গেলেন, তার অনেক পরে জ্ঞান এল বটে কিন্তু মাথার গোলমাল হয়ে গেল। কথাও বলেন না, কাঁদেনও না, খালি বাবাকে দেখতে আসবার জন্য বাবা যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে আসবার চেষ্টা করতেন।

আর তারপর দিনই অভয়া বইটি ছাপা হয়ে এলো। বাবা যেখানে শুয়ে থাকতেন সেইখানে বইগুলি রাখা হল। বাবা বইটি দেখতে পাবেন না বলে খুব দুঃখ করেছিলেন। সে দুঃখ আমাদের রয়ে গেল।

তার কয়েকদিন পরে আমরা কটেজ ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা বাড়ীতে চলে গেলাম।

ঠাকুমার যখন একটু বোধ আসতো তখন বলতেন—আমি তো আর রজন ছাড়া হয়ে রাজসাহী যাব না, আমি কাশী যাব, তোমরা আমার সেই ব্যবস্থাই করে দাও। 'বৌমা তুমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে রাজসাহী চলে যাও,—কই আমার লক্ষ্মীমূর্তি বৌমা কই রে' বলে আবার অজ্ঞানের মত হয়ে যেতেন।

ঠাকুমার কাশী যাওয়াই ঠিক হল। আমার বড়দাদা ও আরও কে কে যেন ঠাকুমাকে নিয়ে যাবেন। ঠাকুমার ছোটবোন আমাদের ছোটঠাকুমাও যাবেন। আমাদের মনে হল বাবা চলে গেলেন। ঠাকুমাও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—আমাদের আর কে রইল? মা ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আমার আর কেউ নেই। আমরাও ঠাকুমাকে ঘিরে রইলাম যেতে দেবনা। কিন্তু ঠাকুমার ঐ এক কথা রজন ছাড়া হয়ে আমি কি করে রাজসাহী যাব? বাবা বিশ্বনাথের পায়েই পড়ে থাকবো। বৌমা আমাকে আর ডেকোনা মা—তোমরা ভালো থেকো, আমাকে যেতে দাও, একটু বলেই আবার মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন।

ঠাকুমা কাশী চলে গেলেন।

আমাদেরও দেড় বছর পর রাজসাহী ফিরে যাবার দিন হয়ে এলো।

এই লেখাটি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলবার আছে।

রজনীকান্ত সেনের জন্ম-বার্ষিকী কিছুদিন আগে হয়ে গেল। তখনও এ লেখা সম্বন্ধে কারও কোন আগ্রহ আসে নাই। এতদিন বাদে—স্মৃতিতে যা আছে তা গুছিয়ে বলবার মত ক্ষমতা আছে কিনা এবং স্মৃতিকথার ধারাবাহিকতা রাখবার সুবিধা পাব কিনা এসব চিন্তা করে রজনীকান্তের স্মৃতি-চারণ ঘরোয়া কথায় বলবার সাহস হয় নাই। এখন এতদিন পরে যখন লিখবার আগ্রহ নিয়ে বসেছি—তাতে দেখতে পাচ্ছি—রজনীকান্তকে ঘিরে তাঁর পারিবারিক স্মৃতি মনের মধ্যে আজিও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাংসারিক বিপর্যয়ের পর্দাটা যেন সরে গেছে। যা যেখান থেকে পেয়েছি মনের মধ্যে সব এনে জড়ো করেছি। সেগুলি গুছিয়ে

বলতে পেরেছি কিনা সে বিশ্বাস খুব আসছে না, সে বিচার আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

তারপর এই স্মৃতিকথায় বাণী ও কল্যাণীর গান খুব বেশী ব্যবহার করিনি। তার কারণ বাণী বা কল্যাণীর প্রত্যেকটি গান দেশের সকলেই কম বা বেশী জানেন। যে সব গান এখনও সর্ব্বসাধারণে জানেন না আমি সেই গানগুলি প্রায় সর্ব্বত্রেই বলেছি। তাঁর শেষ জীবনের শেষ অবস্থায় এই গানগুলিই তাঁর মর্ম্ম-কথার অভিব্যক্তি।

তাঁর অপ্রকাশিত লেখা কয়েকটি কাব্য কথায় যুক্ত হল। এইগুলি বহু আগেকার লেখা। মনে হয় প্রথম বয়সের। কাব্য কথা পড়ে কেউ যদি তাঁকে সামান্যও বুঝতে পেরে থাকেন—তবেই আমার লেখা সার্থক।

সমাপ্ত

স্বামী রামতীর্থ

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর ভারত ভ্রমণোপলক্ষ্যে লাহোরে উপস্থিত। সেখানে ফরম্যান খ্রীশ্চিয়ান কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থরাম গোস্বামীর সহিত পরিচয় ঘটে। ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন স্বরূপ তীর্থরাম তখন স্বামীজীকে নিজের সোনার ঘড়িটি উপহার দেন। তিনিও উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তীর্থরামেরই জামার পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"বেশ তো বন্ধু, আমি এই পকেটেই ঘড়িটি পরিব।" *

সেই রামতীর্থের উত্তর প্রদেশে শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তিনি প্রায় অপরিচিত। তাই বাঙ্গালী পাঠকদিগকে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনকথা সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইল।

পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলায় মুরলিওয়ালাগ্রামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপূজার পরের দিন (মতান্তরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) তীর্থরামের জন্ম। হিন্দী রামায়ণ রামচরিত মানস রচয়িতা তুলসীদাস গোস্বামীও এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উক্ত নামে আর একজন মরমীয়া সাধু (Mystic saint) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে সুপরিচিত হন। তাঁহার অনেক শিষ্য হয়, এবং তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চিত্রলের নিকটবর্ত্তী স্বট্ (Swat) নামক গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তীর্থরামের পিতা হীরানন্দ গোস্বামী নির্লোভ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সরলপ্রাণের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিলনা। শিষ্য সেবকদিগের নিকট হইতে দক্ষিণা ও প্রণামী স্বরূপ যাহা পাইতেন তদ্দ্বারাই কোনরকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পেশোয়ার ও স্বট্‌গ্রামে তাঁহাকে প্রায়ই যাইতে হইত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সকল হিন্দু বাস করিতেন এই গোস্বামীরাই তাঁহাদের বংশগত গুরু।

ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েকদিন পরেই তীর্থরাম মাতৃহারা হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুদাস গোস্বামী এবং তাঁহাদের বৃদ্ধা জ্যেঠিমা তাঁহাকে মানুষ করেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ

হইলে তিনি আরও লেখাপড়া শিখিতে চান, কিন্তু গোস্বামী পরিবারের সে আর্থিক সামর্থ্য ছিল নাই। তৎসত্ত্বেও বিদ্যা অর্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তিনি ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হইয়া যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিতই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার মেধা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। কৈশোর হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি শুনিতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন। নিজেই মাঝে মাঝে পুরাণাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়া নিজেই আবার প্রশ্নগুলির সুযুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতেন। গ্রামের লোকেরা ইহাতে বিস্মিত হইত। একটু বড় হইলে তীর্থরামের ধ্যানপরায়ণতা ও নির্জনবাসের আগ্রহ দেখিয়া উঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা চলিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চেষ্টাতেই তিনি কলেজে ভর্তি হন এবং গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া বি, এ, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। গণিতশাস্ত্রেই এম, এ, পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়িবার সময় রাত্রে প্রদীপ জ্বালাইবার তেলের প্রয়োজন হইলে অনেক দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হইত। না খাইলে যে পয়সা কয়টি বাঁচিত তাহা দ্বারাই তিনি তৈল সংগ্রহ করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদও তাঁহার যৎসামান্য ছিল। দিনের পর দিন রাত্রে অনাহারে থাকিলেও তাঁহার সুন্দর সহাস্যমুখে কোনরূপ মালিন্য দেখা যাইত না। কেমন একটা অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য তাঁহার মুখ-মণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত হইত। অনাহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর কিন্তু শীর্ণ হইয়া পড়িল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও তাঁহার জ্ঞানার্জন স্পৃহা কিছু কমে নাই। বিজ্ঞান ও গণিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি হাফিজ, মৌলানারুমি, মাঘাব, ওমরখৈয়াম্ প্রভৃতি সুফি সাধক ও কবিদিগের গ্রন্থগুলি নিবিষ্ট মনে পড়িয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রও যত্নের সহিত আয়ত্ত করেন। গোর্কী, ইমার্সন এবং থোরোর তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, পার্শি ও পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত কাব্যগুলির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। তিনি নিজেও সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় রচিত তাঁহার অনেক কবিতা আছে। প্রায় সকলগুলিই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের আলেখ্য স্বরূপ। এম্, এ, পাশ করিবার পর তীর্থরাম লাহোর ফরম্যান কলেজে প্রায় দুই বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ওরিয়েন্টাল কলেজে যোগ দেন। সেই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াও কিছু অধিক পরিমাণে দুধ খাইয়া অচিরকালে তিনি বেশ সবল ও সুস্থ হইয়া উঠেন। ব্যায়ামের কিছু নূতন প্রণালীও তিনি আবিষ্কার করেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ব্যায়াম করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক হিসাবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন। সহকর্মীরা সকলেই তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। রাষ্ট্রবৃত্তি (State scholarship) গ্রহণ করিয়া বিলাতে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'র‍্যাংলার' (wrangler) পরীক্ষা দিবার তাঁহার তীব্র ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিধাতা উহা হইতে দেন নাই। সে বৎসর রাষ্ট্রবৃত্তি ন্যায়তঃ তাঁহার প্রাপ্য হইলেও উহা একজন মুসলমান ছাত্রকে দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। এই সময় কৌপীন ও কম্বল সম্বল করিয়া তিনি গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, বদরিনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি দুরারোহ তীর্থস্থানগুলি পদব্রজে দেখিয়া আসেন। তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে বনে জঙ্গলে বসে, গুহার মধ্যে বা বৃক্ষতলে একান্ত একাকী নিদ্রায় অভ্যস্ত হন। কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া হৃষীকেশের নিকট ব্রহ্মপুরীর

বনে তিনি ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া অদ্বৈতবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কোন্ সময় এবং কাহার নিকট হইতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহা সঠিক জানা যায় না।

বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কৈশোরেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া উঠেন। ক্রমে মুরলীধারী শ্রীমূর্তির দর্শনও লাভ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি সংসারে আবদ্ধ হন নাই। তাই বলিয়া তিনি নির্মমও ছিলেন না সহজ প্রেমিক ও প্রকৃতির পূজারী ছিলেন তিনি। ফুলের সুষমা, তৃণের কমনীয়তা এবং নদনদীর মৃদু মর্মরধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলিত। তাঁহার রচিত অনেক কবিতাই প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় দেয়।

দ্বৈতবাদী সাধকদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের দর্শনমানসে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার সে পরিশ্রম সার্থকও হয়; কিন্তু ইহাতে হৃদয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপরে অদ্বৈতবাদী সাধকদিগের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আবার কঠোর সাধনা আরম্ভ করেন এবং যথাকালে তাঁহার মনবাসনা পূর্ণ হয়। তখন তিনি অতুল আনন্দের অধিকারী হন।

বেশ কয়েক বৎসর হিমালয়ে বাস করিয়া তিনি সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। তাঁহার সুন্দর কোমল মুখমণ্ডল, গভীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়, তদুপরি ভ্রমর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ও তপোদীপ্ত মূর্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইল। প্রতিভায় উজ্জ্বল ললাটের নিম্নে সুগঠিত উন্নতনাসিকা ও রমণীয় ওষ্ঠাধর দর্শনে মানুষ আকৃষ্ট হইল।

নিজে যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা মানবসমাজে বিতরণের জন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা হইতে জাপান যাত্রা করেন। মাত্র একপক্ষকাল তিনি জাপানে ছিলেন, ইহার মধ্যেই সেখানে কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়া জাপানে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেন। জাপানে যে ইন্দো-জাপান সমিতি তিনি গড়িয়া আসিয়াছিলেন তাহা আজও তথায় বিদ্যমান।

টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় (Imperial University) এর প্রাচ্যদর্শন ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার টাকা কুৎসু (Dr. Taka Kuthsu) তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বলেন, —তিনি মূর্ত্ত বেদান্ত (Perfect embodiment of Vedanta)। টোকিওর বিশেষ বিদগ্ধ অধ্যাপক কিন্জা হিরাই (Kinja Hirai) সিকাগো ধর্মসভায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিও রামতীর্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামী রামতীর্থ জাপান হইতে আমেরিকার স্যানফ্র্যানসিস্‌কো-তে (San Franscisco) উপনীত হন। আমেরিকায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়া নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া এবং নানা প্রশ্নের সদুত্তর দানে সুনাম অর্জন করেন। বক্তৃতাগুলিতে প্রায়ই উচ্চ গণিত (Higher Mathematics) ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অদ্বৈত বেদান্তই প্রচার করিতেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রোতাদিগকে সম্বোধনের ভাষার মধ্যেও বেশ একটি বৈশিষ্ট্য থাকিত। অধিকাংশ সময় তিনি শ্রোতাদিগকে এইভাবে সম্বোধন করিতেন—("My own self in the form of ladies and gentlemen)." ইহাতে তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানই প্রকাশ পাইত।

ধনীবিলাসীদিগের মধ্যে থাকিয়াও তিনি আমেরিকায় খুব সাদাসিধাভাবেই দিন কাটাইতেন। নিজের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ, অনেক সময় নিজেই মাথায় বহিয়া আনিতেন। "প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা" বাক্যটির মর্মার্থ তাঁহার জীবনে সকল কার্য্যেই প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া এবং তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া যে সকল সংবাদপত্র সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল সেই পত্রগুলির সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ কাটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি সেইগুলি স্যাক্রামেণ্টো (Sacramenta) নদীতে ভাসাইয়া দেন।

আমেরিকার জনমানসের উপর তিনি একটি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া আসেন। আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিদায়ী সভায় কয়েকজন আমেরিক্যান

ভক্ত তাঁহাকে সাদর সম্বোধন করিয়া তদুপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা সমস্বরে পাঠ করেন। উহার প্রথম দুই চরণ :—

"Like Golden* ovide, neath the pines
Ramacharits to us his blessed lines".

শেষ দুই চরণ :—

"We know to thee all good must be
For thou art in God and God in thee".

ইহাতে আমেরিকাবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি কেবল বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াই বেড়ান নাই, ভারতের কিসে উন্নতি হয় সে বিষয়েও চিন্তা করিতেন। আমেরিকায় প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যে দেখা যায় ভারতবর্ষের অবনতির কথা ভাবিয়া তিনি কিরূপ ব্যথিত হইতেন। বার বার এ কথা তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে—'ভারতের ইহলৌকিক অনগ্রসরের প্রধান কারণ, ভারতে কার্য্যকরী বেদান্তের (Practical Vedanta) আলোচনার অভাব ঘটিয়াছে। আমেরিকা ও য়ুরোপ অজ্ঞাতসারে উহার অভ্যাস ও অনুশীলন করিয়া উন্নতির শিখরে উঠিতেছে।"

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার সাধারণ উপদেশই ছিল—"Live in God, all is right, make others live in God all shall be well"—"নিজে ঈশ্বরপরায়ণ হইলে সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইবে, অপরকে ঈশ্বরাভিমুখী করিলেও সকলের কল্যাণ হইবে।"

"The spirit of Yajna" (যজ্ঞের তাৎপর্য্য) শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে স্বামী রামতীর্থ বলিয়াছেন:—"Now instead of wasting precius ghee in the mouth of artificial fire. why not offer hard crusts of dry bread to the gastric fire (জঠরাগ্নি) which is eating up the flesh and bones of millions of starving but living Narayans". এই উক্তি বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দের অমর লেখনী প্রসূত পংক্তি কয়টি মনে করাইয়া দেয় :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আবার—"Criticism and Universal Love"—("সমালোচনা ও বিশ্বপ্রেম") শীর্ষক প্রবন্ধে সাধু রামতীর্থ একস্থানে বলিয়াছেন—"Sad indeed is the Kitchen religion which allows the Infinite, Immortal soul to be sullied by the foreigner's soup"—ইহা কি স্বামীজির "হাঁড়ির ভিতর ধর্ম্ম ঢুকেছে" বাক্যটি মনে করিয়ে দেয় না ?

স্বামী রামতীর্থের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মধ্যে অনেক কথাই বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি মনে হয়। একই আদর্শে এবং একই অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত দুইজন মহাপুরুষের চিন্তাধারা ও তাহা প্রকাশের ভঙ্গি একই-প্রকার হওয়া বিশেষ বিচিত্র নয়।

ভারতে ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি মিশর দেশ পরিদর্শন করেন এবং একটি বৃহত্তম মস্‌জিদে অসংখ্য মুসলমান শ্রোতাদিগের সম্মুখে পারস্য ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামতীর্থ নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। তাঁহার বক্তৃতাবলীর বিষয়বস্তু প্রধানতঃ তিনটি থাকিত—(১) জীবনে বেদান্ত প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস ; (২) সমাজের প্রতিস্তরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা এবং কর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া এবং (৩) ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা।

ভারতে উপনীত হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলে তাঁহার কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে একটি নূতন সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহাদিগকে বলেন—"ভারতে যতগুলি সমিতি আছে, সকলগুলিই তাঁহার নিজের, সেই সকল সমিতির মাধ্যমেই তিনি

প্রয়োজনমত কাজ করিয়া যাইবেন। স্বতন্ত্র সমিতির কোনও দরকার নাই।" তিনি যে মনেপ্রাণে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, সেই কারণেই এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের একদিন তিহেরী গাড়োয়ালের নিকটবর্তী বিশিং গঙ্গায় স্নান করিবার সময়ে দৈবক্রমে জলে ডুবিয়া যান। এইভাবেই রামতীর্থের তিরোভাব ঘটে।

এই ঘটনার কয়েক মিনিট পূর্বে তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় উর্দ্দুতে শেষ কয়টি কথা লিখিয়া যান—"ওহে মৃত্যু যদি ইচ্ছা হয় এই দেহটি লইয়া যাও। জীবনধারণ করিবার আমার আরও অনেক দেহ আছে। চন্দ্রমার শুভ্র কৌমুদী ও সূর্য্যের সোনালী কিরণ গায়ে মাখিয়া আমি বেশ আনন্দেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব। পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীদের শরীরে স্বাধীনভাবে গান গাহিয়া বেড়াইব। মৃদুমন্দ মারুতের সুন্দর গতিভঙ্গি আমি, আমিই প্রমত্ত প্রভঞ্জন। আমার এই সকল আকৃতি চির পরিবর্তনশীল, চির ভ্রাম্যমাণ। শীর্ষ দেশ হইতে আমি নামিয়া আসিয়াছিলাম, দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিয়া ঘুমন্তদিগকে জাগাইয়া তুলিলাম; কাহাকেও সান্ত্বনা দিলাম, কাহারও বা অশ্রু মুছাইলাম, কাহাকেও আবৃত করিলাম, কাহারও বা আবরণ উন্মোচন করিলাম। আমি এটা ওটা স্পর্শ করিয়া বিদায় লইয়া চলিলাম। আমার সঙ্গে কিছুই রাখি নাই। কেহই আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না। হরি ওঁ।"*

* সারনাথ বারানসীর রামতীর্থ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত স্বামী রামতীর্থের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী (ইংরাজী) হইতে প্রবন্ধটির সমুদয় উপাদান সংগৃহীত প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

সুন্দরী নারীর দলেরা সরু প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে দর্শকদের মধ্যে এসে অর্দ্ধনগ্ন বেশে নাচতে আরম্ভ করল। দর্শকেরা সমস্ত চুপ চাপ করে দেখতে লাগলেন। কোন গোলমাল এর মধ্যে ছিল না। তবু মাঝে মাঝে মিঃ চিং এর "আহা উহু" শব্দ শোনা যায়। ভদ্রলোক লজ্জার মাথা খেয়ে সুন্দরী নর্ত্তকীদলের তারিফ করতে লাগলেন।

পাশের জাপানী ভদ্রলোকটী হেসে তাঁকে ছোট ছোট ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সব নর্ত্তকীরা নারী নয় সকলে পুরুষ। কারণ কাবুকী থিয়েটারে একজন নারীকেও অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। সমস্ত পুরুষদের মধ্যে থেকে প্রযোজক মশায় বেছে বেছে নেন, যে সব পুরুষের গলার স্বর 'চং' চাল-চলন মেয়েলী ধরনের তাদের, এখানে মেয়েদের পার্ট অভিনয়ের জন্য সিলেক্ট্ করা হয়ে থাকে। আপনি একটু শান্ত হন।" মিঃ চেং হতাশ হয়ে পড়লেন তা বেশ বুঝতে পারলাম। আমার স্ত্রীটী এখন আমায় বললেন "ওগো সব দৃশ্যগুলো তোমার মুভিতে তুলে ফেল।"

আমি বল্লাম 'আর ঐ সিন গুলো দুবার আসবেনা যদি না আবার আমরা আরও একবার দেখতে আসি। কারণ অভিনয়ের এটা শেষ দৃশ্য।" আমার স্ত্রী বলে উঠলেন "কিছুটা ত তুলেছ তাতেই হবে। কিছু-ক্ষণ পরে শো ভেঙ্গে গেল। ধীরমন্থর পদে সকলে এক এক করে বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায় সকলে এসে জড়ো হলাম। এখন রাত প্রায় একটা। প্রায় ৫ ঘন্টা ধরে আমরা শো দেখলাম। কখন যে সময়টা কেটে গেল আমরা বুঝতে পারলাম না। এরপর গাইডটি হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দু-একজায়গায় ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এল, এইসব ঘরে রাত্রে নাচ দেখান হয়। অন্য একটা জায়গায় দেখলাম একটি বাড়ীর গায়ে একটা নগ্ন নৃত্যের ছবি। জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারা যায় যে এখানে নগ্ন নৃত্য দেখানো হয়। আমরা সকলে ট্যাক্সি ডাকতে গাইডকে বল্লাম। কিন্তু মিঃ চেং সপরিবারে দেখবার জন্য নগ্ন নৃত্যের টিকিট কিনতে যাবেন জানালেন। যুবতী কন্যা ও যুবক পুত্রকে এইসব নগ্ন চিত্র দেখান অন্যায় বলে সকলে ওকে বোঝালাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তিনি যাবার জন্য উদ্যত হলেন ও আমাদের দেখাবার জন্য টিকিট কাটতে বললেন। আমরা যে হোটেলে এখনি চলে যাবো তা গাইডকে বললাম। মিঃ চেংও তাঁর পরিবারের লোক ছাড়া সকলেই ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। মিঃ চেং দেখে শুনে বলে বসলেন "এই জন্যেই আমি কোন দলের সঙ্গে এখানে আসতে চাইনি।' বলে আর একটা ট্যাক্সিতে তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা চেপে বসলেন। রাতের টোকিও দেখতে দেখতে ট্যাক্সিটি ছুটে চললো। সারা শহরটিকে ফুলের মালাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সে রাত্রিতে টোকিও শহর দেখে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরা হোটেলে ফিরে এসে বিছানা নিলাম। পরদিন ট্যুরিষ্ট কোম্পানী হোটেলে রেখে একটা দিন আমাদের কেনা কাটার জন্য ছুটি দিয়েছিল। ঐ দিনটার মধ্যে আমরা যে যার কেনা-কাটা যেন শেষ করে

ফেলি। আসছে কাল সেই কেনার দিনটা ছিল। তাই আমরা সকলেই ভোরে আর উঠিনি। বেলা আটটায় উঠে বিছানা থেকে ধীরে সুস্থে বাথরুম থেকে এসে ব্রেকফাষ্ট-টেবিলে হাজির হলাম। আমাদের বন্ধুরাও গত রাত্রে রাত জেগে আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানায় কাটিয়েছেন বুঝতে পারলাম। মিঃ চেং কপোত-কপোতীও এসে হাজির হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের পুরানো টেবিলে বসে খানাপিনা করছেন। ভদ্রলোকের প্রৌঢ়াস্ত্রী ও ছেলে মেয়েটী আর একটি টেবিলে বসেছেন। মিঃ চেংএর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমাদের টেবিলটায় কয়েকজন এসে বসেছেন। সকলেই আজ তাঁদের বাড়ীর জন্য কিছু কেনা কাটা করবেন। আমরাও কিছু কিছু করে কিনবো। সুপার মারকেটে আমাদের একবার যেতে হবে। একটা ভাল মুক্তার মালা সেখান থেকে কিনবো। কিয়োটোর সুপার মার্কেট থেকে একটা মালা প্রায় চারশত পঞ্চাশ মালয়ের ডলার দিয়ে কিনেছি। গিন্নীর খুব পছন্দ, তিনি আর একটা কিনতে চান। কারণ মেয়েদের বিয়ে থা-ত আছে। তারা যদি সোনার হারের বদলে মুক্তোর মালা চায় তাহলে তাকে নিশ্চয় দিতে হবে। তিনি মেয়েদের মা ত? না দিলে কি হয়? "তোমার পাঁচটা মেয়ের জন্য পাঁচটা হারই কিনতে হয় তাহলে।" ঠাট্টা করে তাঁকে বলি। এখন তিনি রাগতে ভুলে গেছেন। আমার কথা তিনি শুনে বললেন "না অন্য মেয়েদের সব সোনার হার দেব।" আমি আর কথা না বলে ব্রেকফাষ্ট সেরে উঠে পড়ি।

জাপানে সাবওয়ে আছে শুনেছিলাম। প্রায় সব শহরেই রয়েছে। কিয়োটোতে আমি একবার সাবওয়ে ট্রেনে উঠতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সময় অভাবে আর অন্য কোন সঙ্গী না পেয়ে আমাদের যাওয়া হয় নি। কারণ আমাদের প্রায় সবদিনই টুরের প্রোগ্রাম ছিল। আর গাইড ছেলেটী আমাদের কোথাও যেতে একলা বারণ করেছিল। আজ সারাদিন আমাদের ছুটি। খাব দাব আর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সারাদিন কাটাব। প্রথমে আমরা অনেকের কাছে গিয়ে ইংরাজীতে বলায় আমরা সাবওয়ে ট্রেনে উঠে কিছুটা ঘুরে আসব আমাদের ষ্টেশনটী দেখিয়ে দিতে। তাঁরা কেউ ইংরাজী বোঝেন না আর সাবওয়ে কাকে বলে তাও জানেন না। বড়ই মুস্কিলে পড়লাম। আসবার সময় একটু আধটু জাপানী ভাষা শিখে আসা আমাদের উচিত ছিল। আমরা এই সাবওয়ের খোঁজ করতে প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। আমরা তখন সুপার মার্কেট এ এ্যাসক্যালেটার দিয়ে উপরে উঠে গেলাম মুক্তার মালা কিনতে। অনেক খোঁজা-খোঁজির পর আমরা মুক্তোর দোকানে গেলাম। ভদ্রলোক ইংরাজী জানেন। আমাদের মুক্তোসম্বন্ধে অনেক লেকচার দিলেন। আমাদের কাছে ট্যাক্স-ফ্রি কোন চিঠি আছে কিনা তাও জানতে চাইলেন। আমাদের কাছে আছে জেনে তিনি মালাটির দাম কমিয়ে দিলেন। ট্যাক্স ফ্রি কাগজের ওপর দাম ও মুক্তোর কোয়ালিটী লিখে সই করে দোকানের ছাপ দিয়ে দিলেন। পরে টাকা দিলে তিনি আমাদের মুক্তোর মালাটি একটা বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। কিয়োটো থেকে আরও একটা কিনেছি জেনে তিনি খুব খুশী হন। আমার স্ত্রী তাঁর ব্যাগের মধ্যে মুক্তোর বাক্সটি পুরে নিলেন। আমি সাবওয়ে যাবার কথা জানাতে তিনি একটা কাগজে জাপানী ভাষায় সমস্ত লিখে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "আমাদের অফিসের নিচেই সাবওয়ে। আপনি নীচে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুণ।" নীচে গিয়ে কোথাও কোন সাবওয়ে ট্রেন দেখা গেল না। হাঁটতে হাঁটতে আর কাগজটি দেখাতে দেখাতে একটু দূরে একটি ছোট গর্ত্ত দেখতে পেলাম। সেটার মধ্যে আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা রেলষ্টেশন। টিকিট ঘরে গিয়ে একটি টিকিট কিনলাম। এই ষ্টেশনের দুটো ষ্টেশনের পরেই সেই ষ্টেশনটী। ট্রেন আসতে আমরা ট্রেনে চড়ে পড়লাম। বসবার জায়গা নেই।

ভীড়ে ভীড় করে সকলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরাও দাঁড়িয়ে রইলাম। প্যাসেঞ্জারকে টিকিট দেখালাম। তিনি দেখে বললেন "এখনো দেরী আছে।" ট্রেন চলেছে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে ষ্টেশন এলে ট্রেন থেমে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে চলতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁকে টিকিটখানা দেখাই। আমায় 'সরি, বলে নেমে যেতে বললেন। আমরা যে বেশী কয়েকটি ষ্টেশন পার করে গেছি তা বুঝতে পারি। আমরা ট্রেন থেকে নেমে পূর্বেকার সুপার মার্কেটের ভদ্রলোকের চিঠিটা একজন কনডাকটারকে দেখিয়ে ইশারায় বলি যে ওখানে ফিরে যাব। তিনি আবার আমাদের অন্য একটি ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন। আমরা ফিরে এলাম। এইটাই ট্রেনের শেষ ষ্টেজ। এখানে নেমে উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখি একজন কনডাকটার টিকিট নিচ্ছেন। আমরা তাঁর হাতে টিকিট দিতেই তিনি টিকিটটা দেখে হেসে আমাদের যেতে বল্লেন যেখান কার থেকে টিকিট কেনা সেখানেই টিকিটটা ফিরিয়ে দিলাম বলে তিনি হেসেছিলেন তা বেশ বুঝতে পারলাম। আমরা একটু লজ্জিত হয়ে সাবওয়ে ষ্টেশনটি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে চল্লাম। সবসময় আমাদের সঙ্গে একটি করে সহরের ম্যাপ থাকে আর সেই ম্যাপের ওপর আমাদের হোটেলটির অবস্থান কোথায় তা চিহ্নিত করা আছে। এই চিহ্নটা হোটেলের ম্যানেজারই দিয়ে ছিলেন। আর জাপানী ভাষায় হোটেলের নাম ও ম্যাপ লিখে দিয়ে ছিলেন। সেই ম্যাপটা দেখাতে দেখাতে আমাদের হোটেলে আমরা ফিরে এলাম। এতে হারিয়ে যাবার ভয় নেই, তবে প্রথম দিন 'নিউ ওসাকা' হোটেল থেকে আমরা কোন ম্যাপ না নিয়েই কোবে সহরটি দেখতে গিয়েছিলাম তাই পথে আমাদের কষ্ট হয়েছিল।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে এসে উঠলাম। আমার স্ত্রীকে লিফ্‌টে করে ঘরে ছেড়ে দিয়ে আমি লাউঞ্জে এসে বসলাম। কারণ, দুপুরবেলায় নিদ্রা-দেবী আমার কাছে তখন আসতেন না, লাউঞ্জে যেতেই ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন "আপনার ঘোরা আর কেনাকাটা হয়ে গেল?" আমি হাসতে হাসতে আমার ঘটনা দুর্ঘটনা তাঁকে সব জানাতে তিনি আমায় বল্লেন "আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে গেলেন না কেন? আমি সব বুঝিয়ে দিতাম।" আমি বল্লাম "আপনি ব্যস্তমানুষ তাই আপনাকে বিরক্ত করি নি।"

"আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি এখানকার একটা স্কুলের শিক্ষক। আপনি ভারতীয় বলে আপনার কাছথেকে ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চান।" বলে পাশের এক বৃদ্ধ জাপানী ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। ওঁনার সঙ্গে লাউঞ্জে বসে বসে আমার সঙ্গে অনেক কথা হল। ভারতের অনেককিছু তিনি জানতে চাইলেন। বইয়ে সবই লেখা আছে কিন্তু অজন্তা, ইলোরা সম্বন্ধে আরও বেশী তিনি জানতে চান। আমি সন্ত ভারত থেকে অজন্তা, ইলোরা দেখে ফিরছি তাঁকে সব বুঝিয়ে বলি। তিনি শুনে খুবখুশী। "ভারতে যে আর এই বয়সে যাব সে আশা খুবই কম। আপনার কাছে থেকে যেটুকু জানতে পারলাম সেইটুকুতেই আমি খুশী।" তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন।

আমি বললাম "টোকিওতে এসে আমি সব গুলিয়ে ফেলছি। এই সহরটা যেন একটা গোলক ধাঁধা।"

ভদ্রলোক শুনে বল্লেন "টোকিওর ছোট্ট একটা ইতিহাস আপনার জানা দরকার। আর কোথায় কি কি দেখার জিনিষ আছে সেগুলোর ইতিহাস আর কাহিনী আপনার কাছে খুলে বল্লে আপনি অনেক অসুবিধা থেকে রক্ষা পাবেন। এখনকার টুরিষ্ট কোম্পানীরা শুধু পয়সা উপায় করতেই ব্যস্ত, যেখানে একটু চটক্ আছে, উলঙ্গমেয়ের নাচ আছে সেইখানেই তারা নিয়ে যায়। আরে মেয়েজাতটা ত পৃথিবীতে সব জায়গাতেই রয়েছে। আর দেহের সমস্ত অংশ সকলেরই সমান। কোন তফাৎ নেই। দেশটাকে দেখতে হলে তাদের সংস্কৃতি কৃষ্টি তাদের ইতিহাস

তাদের ভৌগোলিক তাদের উন্নতি অবনতির কাহিনী সবদেখা আর শোনা চাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে টুরিষ্টদের মেশা চাই তবেই তাঁরা সব জানতে পারবে।"

আমি বললাম "আপনি আমাকে কিছু কিছু সব জানান তাহলে জাপানকে আমি কিছুটা জানতে পারব।'

আমায় তিনি প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক ধরে জাপান সম্বন্ধে অনেক কিছু বক্তৃতা দিলেন আর আমি কি কি জায়গায় ঘুরে দেখেছি আর তার বিষয় আমি গাইডের মুখ থেকে কি শুনেছি তাও জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যা জানি ও শুনে আমায় নোট বইয়ে টুকেছি তাই বল্লাম। তিনি গাইড ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন "এর চেয়ে বেশী আমি জানি না।

ছেলেটী কি পড়ে?"

তাঁকে বললাম "সে একজন ইতিহাসের ছাত্র।"

"আমিও তাই মনে করেছিলাম।" বলে তিনি আমায় কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়েন।

তিনি অনেক কিছুই বলে গেলেন। সব কথা আমি পরে ঠিক ভাবে লিখে নিতে পারি নি, তবে তার সব দু'ঘণ্টার বক্তৃতার সারাংশ হচ্ছে যে জাপানী জনসাধারণ আজ পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে পদে পদে অনুকরণ করে চলেছে, নিজের দেশের সভ্যতা ভুলে যেতে বসেছে। ভবিষ্যতে এর পরিণাম খুব যে ভয়াবহ হয়ে উঠবে তা তিনি বিশ্বাস করেন। বৃদ্ধেরা যে যুগের তালে তালে পা দিয়ে চলতে চায় না তা ত আমরা জানি তাই আমি তাঁর কথা আমি সব শুনেই গেলাম কোন বাদানুবাদ করলাম না। তিনি আমার মত শ্রোতা পেয়ে খুব খুশীই হয়েছিলেন।

টোকিও জাপানের রাজধানী তা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। টোকিও বে র ধারেই এটা অবস্থিত। এই টোকিওই জাপানের প্রাণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। টোকিওর মধ্যে রয়েছে, প্রধান টোকিও; এর চোদ্দটী সহর, তিনটা কাউন্টি আর অনেকগুলি দ্বীপপুঞ্জ, প্রধান টোকিও সহরটী ২২০ বর্গমাইল। এটা আবার দুটীভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটী হচ্ছে পূর্ব্বদিকের (টোকিও বে র ধারে) নীচু পলিমাটীযুক্ত জমিগুলো, আর অন্যটী হচ্ছে পশ্চিমের শক্ত উঁচু জমিগুলো। এখানেই সহরের নাগরিকদের বসতি রয়েছে। এই টোকিও হচ্ছে আমদানী, রপ্তানীর প্রধান স্থান। জাপানের অন্যান্য সহরের মধ্যে কেন অন্যান্যদেশের প্রধান সহরের লোকসংখ্যা এই সহরের লোকসংখ্যার কাছে ম্লান হয়ে যায়? এত লোকসংখ্যা তবু তাদের নাগরিক জীবন সুষ্ঠুভাবেই চলে যাচ্ছে? তার কারণ এই সহরের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই ভাল। এখানে সবই রয়েছে যেমন ট্রেন, বাস, সাবওয়ে ট্রলি আর তারপর নতুন দ্রুতগামী ট্রেন হচ্ছে যা ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে ওসাকা আর টোকিওর মধ্যে চলাচল করবে। তাইই জন্যে জাপান আজ উঠে পড়ে লেগেছে। এর জন্যে নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। এই লাইনের জোড়ে কোন ফাক নেই। আগেকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজকালকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। টোকিও বের মধ্যে থেকে জমি বের করে Hanneda বিমানবন্দর তৈরী হয়েছে। জনসাধারণের ভালভাবে খাওয়া পরা আর থাকবার জন্যে প্রদেশের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। প্রায় লোকের ঘরে ঘরে আজ ট্র্যানজিষ্টার রেডিও ও টেলিভিসন রয়েছে। এখানে অনেকগুলি নতুন পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বড় বড় জাহাজ টোকিও বন্দরে আসে। তবে ইয়োকোহোমার মত এত বেশী আসেনা। সহরের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি পার্ক রয়েছে যাতে করে জনসাধারণ সারাদিন কাজের পর একটু বিশ্রাম নিতে পারে।

এখানে একটী ষ্টেডিয়াম রয়েছে প্রায় ৮৫০০০ দর্শক এখানে বসতে পারেন। অনেক বৌদ্ধমন্দির রয়েছে, অনেকগুলি আমরা দেখে এসেছি। সবগুলি দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

এই শহরে Ginzaই হচ্ছে টোকিওর ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে সব জিনিস কিনতে পারা যায়। এর পেছন দিকের রাস্তায় ক্যাবারে, অসংখ্য চা আর কফির দোকান, বড় বড় নাইট ক্লাব রয়েছে। তারপর রয়েছে Kodokan এটিকে জুডোর Judo মক্কা বলা হয়। এই অট্টালিকা ২৭০ মিলিয়ান দিয়ে তৈরী হয়েছে।

তারপর রয়েছে অনেক অনেক দেখবার জিনিষ যা আমাদের সময় আর অর্থের অভাবে দেখা হয় নি। শহরের বুকের উপর বড় বড় চওড়া রাস্তা এ ধার ওধার চলে গেছে। বড় বড় হাইওয়ে জাপানে অনেক রয়েছে আবার অনেকগুলি তৈরী হচ্ছে দেখে এলাম। ১৯৬৪ সালে জাপানে অলিম্পিক গেম প্রতিযোগিতা হবে তারই জন্য অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে তাও আমরা দেখে এলাম।

জাপানের সংবাদ সকল ঘরের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিবার জন্যে রয়েছে বড় বড় কটি সংবাদ পত্র। তারমধ্যে একটি আসাই সংবাদ পত্র যার দৈনিক বিক্রি চল্লিশ লক্ষের ওপর. আর ছোটদের শিক্ষার জন্যে রয়েছে দু'হাজারের বেশী কিনডার গার্টেন স্কুলে আর ৪৫০টির বেশী জুনিয়ার কলেজ। আর রয়েছে তিনটি পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়, টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৭৭) ওয়াসেডা (১৮৮২) ও কাইও (১৮৬৭) তারপর রয়েছে অনেক বড় বড় নতুন কলেজ। যেখান থেকে হাজার হাজার জাপানী ছাত্রেরা শিক্ষা পেয়ে বার হচ্ছে।

আসছে কাল ভোরেই আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নিয়ে হাকুনির পথে অগ্রসর হব। তাই আজ আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

পরের দিন ব্রেকফাষ্ট খেয়েই আমরা জাপান ছেড়ে Yokohomaবন্দরে উপস্থিত হলাম। টৌকিও থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১৭ মাইল। এটি টৌকিও বের উপর টৌকিও শহরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সব দেশের জাহাজ যাতায়াত করে থাকে। মস্তবড় বন্দর। জাপানের সহরগুলির মধ্যে এটা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। এই সহরের আয়তন ১৫৫ বর্গমাইল। এটা দশটী ওয়ার্ডে বিভক্ত। লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের মতন। এই সহরে বন্দর ও নীচু জমিগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে। এই অংশটার নাম Yamashita আর ওপরের জায়গাগুলোতে রয়েছে ওখানকার বাসিন্দাদের বাসস্থান সেই অংশের নাম রাখা হয়েছে Yamanote। এখানে অনেকগুলি জাহাজ নোঙর করা রয়েছে দেখলাম। এখানকার বেশ কয়েকটী ফটো আমরা তুলে নিলাম। যদিও আইনতঃ এখানে ফটো তোলা বারণ তবুও আমরা টুরিষ্ট বলে রেহাই পেলাম। পরে আমরা সহরের মধ্যেদিয়ে কামাকুরার দিকে এগিয়ে চল্লাম। ইয়োকোহামা সহরটীও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত নগরী।

এই সহর থেকে কামাকুরা সহরটীর দূরত্ব মাত্র বার মাইল। কামাকুরা সহর Miura উপদ্বীপে সাগামীর উপসাগরের ধারে অবস্থিত। এখানে অনেকে সমুদ্রধারে বাস করতে আসেন আর অনেক বড় বড় সরকারী অফিসারদের গ্রীষ্মবাসের জন্তে এখানে অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে। এখানে দেখবার মধ্যে রয়েছে কামাকুরা মন্দিরটী। মস্তবড় বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় একটী বুদ্ধের মূর্ত্তি। উদ্যানের মধ্যে এটাকে বসান রয়েছে। এটা ব্রোঞ্জধাতু দিয়ে তৈরী হয়েছে। আর এই মূর্ত্তিটীকে ১২৫২ সালে এইখানে এনে স্থাপনা করা হয়েছে। এটা পৃথিবীর সমস্ত ভাল ভাল স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে অন্যতম। এটী ১১০০ বছরের পুরাণো মূর্ত্তি বলে লোকে দাবী করে থাকে। এই কামাকুরা সহরটী ১৩৩৩ থেকে ১৫৭৩ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জাপানের রাজধানী ছিল। এ শোগুন Ashikago এখানে প্রথমে তাঁর রাজধানী স্থাপনা করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে কামাকুরার নাম এখনও নষ্ট হয়নি। আমরা এই বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটী ছবি অন্যের দ্বারা তোলালাম। বাগানটীর চতুর্দ্দিক ঘুরে ঘুরে আমরা বাসের কাছে ফিরে এলাম। জাপানের কোনো জায়গায় খুব বেশী ভিখারী আমাদের চোখে পড়েনি। এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটী ভিখারীকে ভিক্ষা নিতে দেখলাম। পাশদিয়ে ঝুড়ি করে বড় বড় পিচ ফল বিক্রি করতে চলেছে। আমি প্রায় দু'টাকার মত পিচ ফল বেছেবেছে কিনে ব্যাগে পুরলাম। আর দুটো দু'জনে খেতে খেতে চল্লাম। এমন সুন্দর পিচ ফল আমরা কখনও আস্বাদ করিনি। আমরা এরপর Atami অন্তরীপের

দিকে এগিয়ে চল্লাম। আজ সারাদিন সমুদ্রের ধারের হাইওয়ে দিয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে অপরাহ্নে Atami-র একটা জাপানী সরাইখানায় রাত কাটাবো। জাপানে এলে যদি এদের সরাইখানা একটা রাতও না কাটাই তাহলে এরা অতীতে ও এখন কেমন ভাবে জীবন কাটায় তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়ে উঠবে না। তাই টুরিষ্ট কোম্পানীর এই সুন্দর প্রচেষ্টা।

সমুদ্রতীর দিয়ে আসতে আসতে আমাদের মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়ে এল। আমরা একটা দ্বিতীয় জাপানী হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পূর্ব্বে থেকেই এঁরা সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। ছোট্ট একটা হোটেল লোকজন কোথায়ও চোখে পড়ল না। গৃহস্বামিনী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আপ্যায়ন করে আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবারের টেবিলে ডাক পড়ল। এক একটা প্লেটের ওপর মাংসের ঝোল আর ভাত একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সকলে মনের আনন্দে খেতে আরম্ভ করে দিলাম। আমি গৃহস্বামীনিকে মাংস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তিনি হেসে বল্লেন যে এটা ভাল জাতের টাট্‌কা গরুর মাংস। জাপানী প্রথায় রান্না হয়েছে। এরকম রান্না এদিকে প্রায় হয়না। গাইডের দিকে চাইতেই গাইড উঠে গিয়ে জাপানী ভাষায় তাঁকে কয়েকটা কথা বলে এ'ল। কিছুক্ষণ পরেই ভদ্রমহিলা এসে আমাদের দুটো ডিশ নিয়ে চলে গেলেন। মুখটা বেশ ভার ভার দেখলাম। আবার তাঁকে চিকেনকারি রাঁধতে হবে বলে তাই তাঁকে খুব বেজার দেখলাম। ওর বন্ধুরা খেয়েদেয়ে উঠে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমরা প্রায় ২৫ মিঃ পরে ভাত আর মুর্গিরঝোল খেলাম। বাড়ীর মুর্গীকে জবাই করে তার মাংসের ঝোল আবার নূতন করে ভাত তৈরী করে আমাদের খাওয়ান যে কত কষ্ট তা আমরা বুঝি। বুঝলেও আমাদের কোন উপায় ছিলনা। ভদ্রমহিলা ও তার ঝিটি গেঁশার পোষাক পরে আমাদের আপ্যায়িত করে ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর ফটো তুলবো বলে গৃহস্বামীনিকে অনুরোধ করলাম। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হ'ল। তবে তাঁর ঝিটার সঙ্গে ফটো তুলতে আপত্তি করলেন না। ঝিটি খুবই মিষ্টি। মিষ্টি মেয়ের ছবি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ভাল। তাই ওদের দাঁড় করিয়ে ওদের ফটো মুভিতে নিয়ে নিলাম।

প্রায় ৩টার সময় আমরা তাঁর বাড়ী ছেড়ে Atami-র দিকে অগ্রসর হলাম। গাইডের মুখে শুনলাম যে আতামী (Atami) জাপানের 'Riviera'। সমস্ত পূর্ব্ব এশিয়াতে এর মত আর দুটী জায়গা নেই। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবন রয়েছে আর তার পাশে পাশে রয়েছে শত শত সুন্দর সুন্দর বাসস্থান। ছুটীতে এখানে বেড়াবার জন্যে জাপানের প্রত্যেক জায়গা থেকে এমন কি অন্যান্য দেশ থেকেও অনেকে এখানে ছুটী কাটিয়ে যান। সেজন্যে এখানে শত শত ছোট বড় হোটেল ও সরাইখানা তৈরী হয়েছে। টোকিও থেকে অনেক ট্রেন আতামী-তে যাতায়াত করে থাকে। আতামীর কাছেই ইতো (Ito) সেখানেও অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবন রয়েছে। আর তার আশে পাশেও অনেক হোটেল„ আর সরাইখানা তৈরী হয়েছে।

গাইডের মুখে শুনলাম, যেখানে আমরা লাঞ্চ খেলাম সেটা বাজারে হোটেল নয়। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে টুরিষ্টদের খাইয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকেন। সাগরের ধার দিয়ে আমাদের বাসটী বেগে চলেছে। সাগরের ধারে ধারে জেলেরা মাছ ধরতে ব্যস্ত দেখলাম। এ সব মাছ তারা ধরে আমেরিকা আর অন্যান্য জায়গায় চালান দিয়ে ডলার রোজগার করে থাকে। আমরা পথে কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবন পার হয়ে Miharukan হোটেল নামক একটী জাপানী সরাইখানায় এসে উপস্থিত হলাম। তখন বেলা প্রায় ৬টা। সূর্য্যের আলো তখন বেশ রয়েছে। আমরা ঘরের ভেতর গিয়ে চেয়ারে বিশ্রাম নিতে লাগলাম।

—ক্রমশঃ

বাদুড়

অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"আরে! আপনি একলা ব'সে যে? এরি মধ্যে হাঁটাপর্ব্ব শেষ ক'রে ফেলেছেন? আমাদের দলের আর সকলে কোথায়?"

মৃদঙ্গবাবু আগের রাত্রে তাঁর পিসতুতো দিদির নাতনীর বিয়েতে একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন। তার ওপর জ্যৈষ্ঠমাসের গরম—রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। তাই আজ বেশী ভোরে এসে একা পড়ে গেছেন। প্রাতঃভ্রমণকারী নিত্য সহচর আরও চারজন রোজই এই বেঞ্চিতে বসে আড্ডা দেন।

৭০ বছর বয়স্ক মৃদঙ্গবাবু অবসরপ্রাপ্ত সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দুইবার হৃদ্‌রোগের ধাক্কা সামলিয়েছেন। ডাক্তারের পরামর্শে রোজ ভোরে রবীন্দ্র সরোবরে বেড়াতে আসেন। দলের সকলেই এই পৃথিবীতে কম ক'রে ৬৫ বছর পার করেছেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভুজঙ্গবাবুর বয়স ৭৬ আর সর্ব্বকনিষ্ঠ বিকাশবাবুর বয়স ৬৫ বছর। অবিনাশবাবু শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ শুরু ক'রে এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হবার পরে অবসরপ্রাপ্ত হন। বালিগঞ্জে তাঁর তিনখানা বাড়ী আছে বেনামিতে। তাঁর বয়স ৬৭—ডায়াবিটিসও হৃদ্‌রোগের খদ্দের। কার্ত্তিক বাবুর বয়স ৬৯। তিনি কোন এক প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করতেন। ধানজমি কিনে মাছের ভেড়িতে পরিণত করেছিলেন। নিজের নামে থাকলে বিপদ তাই নিঃসন্তান কার্ত্তিকবাবু ভাইপোর নামে রেখেছেন।

বর্ত্তমানে এদের কারও বাকী জীবনে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। জীবনকে তাঁরা ভাল-বাসেন, যেমন আর সকলে বাসে। যতদিন সম্ভব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে আর খাদ্য ধ্বংস ক'রে যমকে কলা দেখানো যায় সেই উদ্দেশ্যে রোজ ভোরে শুদ্ধ বাতাসে পদচালনা করেন আর একত্রে আড্ডা মারেন। খানিকটা ক্লাবের মতন—ক্যালকাটা ক্লাব না হ'য়ে অনেকটা যেন কেওড়াতলা ক্লাব।

মৃদঙ্গবাবুর বেশীক্ষণ একা ব'সে থাকতে হয়নি। বিকাশ বাবুর পরে কার্ত্তিক বাবু এলেন। বেঞ্চিতে বসেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"কি ভুলই না করেছি। কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছুই নেই মশায়, আজকালকার দুনিয়ায়? আমার ভাইপো হাবুল লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে ষোল বছর বয়স থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আর পানওয়ালার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বিনা পয়সায় এক আধটা বিড়ি পেয়ে ধন্য হত। তাকে ভেড়িতে বসিয়ে ভাবলাম একটা হিল্লে হ'লো—"

বাধা দিয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন "ভাইপো যখন ভেড়িতে রয়েছে তখন নিশ্চয়ই ভালো ভালো মাছ বিনা-মূল্যে আপনার দোরে পৌঁছে দিচ্ছে। খুব ভাগ্য আপনার।"

কার্ত্তিকবাবু বললেন, "তা হ'লে তো বাঁচতাম। তাই যদি দিত তাহ'লে তো বুঝতাম পৃথিবীতে ধর্ম্ম আজও আছে। 'কৃতজ্ঞতা' কথাটা অভিধানে ছাড়াও বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। কি আর বলবেন—গত বছরে একবার শুধু একটা ঝুড়িতে কিলো পাঁচেক জ্যান্ত গুলে মাছ পাঠিয়েছিলো। কিলবিলে মাছ গুলো দেখে গিন্নীর গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠল। তিনি ঝুড়িসহ মাছ ঝিকে দিয়ে—"

কার্ত্তিকবাবুর কথা শেষ না হতেই অবিনাশবাবু হন্তদন্ত হ'য়ে এসেই লাঠি ঠুকে বললেন, "দেখছেন তো? কি বলেছিলাম? ভুট্টোর কথাবার্তা আর কাণ্ড কারখানা ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছেন? আর এদিকে মৌলানা ভাসানী? ঠিক সময়মত পালিয়ে দিল্লীতে শরীর সারিয়ে দেশে

কিয়ে দম কষে কি হুঙ্কার আর বিষোদ্গার। আবহাওয়া কোন্ কোন্ দিকে ঘুরছে বুঝতে পারছেন? বুঝলেম মশাই। ভুট্টো আর ভাসানী কাঁকড়া বিছের দুটো দাঁড়া আর পিছনের হুল হয়েছেন আবার পারস্যের বাদশা। কেন বাপু? বাপ ঠাকুরদার কল্যাণে গদি পেয়েছিস, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বংশ বাঁচাবার ব্যবস্থা ক'রেছিস্—ইস্পাহানের গুলবাগিচায় ব'সে গোলাপের গন্ধ শোঁক্, আতর মাখ্, সিরাজী মদ খা, সাকীদের দিয়ে গান গাওয়া, ওমর খৈয়াম পড়্ আর মাঝে মাঝে ময়ূর সিংহাসনে ব'সে আলবোলায় টান দে আর চামরের হাওয়া খা—তা না—রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছেন। বাদশা তো নয় যেন মরুপ্রদেশের বিধানসভার সদস্য—হুঁঃ"—ব'লে লাঠিটা সজোরে আবার ঠুকলেন অবিনাশবাবু।

—"আপনি বড় উত্তেজিত হ'য়ে পড়ছেন, অবিনাশবাবু। আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ক্ষতিকর হ'তে পারে" অনুনয় করলেন বিকাশবাবু।

—"উত্তেজিত হব না? চুলোয় যাক্ আমার স্বাস্থ্য। দেশের ওপর যে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে তা বুঝতে পারছেন? আর আমরা কি করছি? বন্ধুত্বের খাতা খুলে সবাইকে সই করতে বলছি। হুঃ। মহিলাকে দিয়ে কখনও দেশ চালানো সম্ভব? রাইফেল, রিভলবারের জায়গায় কিনা আংটি আর চুড়ি। আমাদের উচিত এমন একজন প্রকৃত বীর্য্যবান্ পুরুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দেওয়া যিনি বাক্যব্যয় না ক'রে স্টেনগান দিয়ে ভুট্টো আর ভাসানীর দলকে সাবাড় ক'রে দেবেন।"

অবিনাশবাবুর ডান হাতের লাঠির ডগাটা মৃদঙ্গবাবুর নাক ঘেঁষে স্টেনগানের নলের মত ঘুরে গেল। মৃদঙ্গবাবু চমকিয়ে কেশে উঠলেন। মল্লযোদ্ধার মত প্রসারিত দুটি হাতের একটিতে অবিনাশবাবুর লাঠিটা কাঁপছে আর অপর হাত থেকে একটা স্বচ্ছ পলিথিন ব্যাগ দুলছে। ব্যাগটির মধ্যে নানারকমের ফুল—বেশ কয়েকটি গন্ধরাজ ফুলও দেখা যাচ্ছে।

—"ফুলগুলো কি ক'রে পেলেন? গন্ধরাজগুলো?" প্রশ্ন করলেন বিকাশবাবু।

লাঠিটা উঁচু ক'রে ধরে অবিনাশবাবু বললেন—"এর সাহায্যে। পথে আসতে আসতে সংগ্রহ করেছি। একটা বাড়ীর পাঁচিলের ভিতর দিকে দুটো গন্ধরাজ ফুলের গাছ আছে। গাছ দুটো পাঁচিলের থেকে উঁচু। হাতের নাগালের বাইরে তাই লাঠির সাহায্যে ফুল আহরণ করি।"

—"অর্থাৎ আপনি ফুল চুরি করেন।"

—"ফুল সব সময়ে পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েই জন্মায়। ঠাকুরের পায়ে পৌঁছাতে পারলে তার জন্ম সার্থক। কে আহরণ করল আর কিভাবে করল তাতে কি এসে যায়? একে চুরি বলে না।"

বিকাশবাবু মৃদঙ্গবাবুর কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন, "অবিনাশবাবু দেখছি কর্ম্মজীবনের অভ্যাস আজও বজায় রেখেছেন।" তেমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "উপায় কি? হীরে মুক্তো বসানো আংটি আর বারো জোড়া সোনার চুড়িধারিণী যে মহিলাটি ওঁর সংসাররূপ রাষ্ট্র চালাচ্ছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে চলতে যদি না পারতেন তাহ'লে এই লাঠিধারী একদা বীর্য্যবান্ অবিনাশবাবুকে কি আজ এই কেওড়াতলা ক্লাবের আসরে দেখতে পেতেন? বাক্যবাণের খোঁচায় কোন্‌কালে টেঁসে যেতেন, না হয় কান্নার বন্যায় ডুবে যেতেন।"

অবিনাশবাবুকে বসতে ব'লে বিকাশবাবু কার্ত্তিকবাবুকে বললেন—"আপনার বুদ্ধিমান্ ভাইপো কি শীঘ্রই কিছু মাছ—নিদেন পক্ষে গুলে কি ল্যাঠা পাঠাবে? যদি পাঠায় তাহলে সবটাই ঝিকে দিয়ে দেবেন না। কিছু ছিটেফোঁটাও যদি আমাকে দেন তো ভালো হয়। বাজারে মাছের দাম যা বেড়েছে তাতে আমার পেনশনের টাকা দিয়ে কেনা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বুঝতেই পারছেন, সারা জীবন কাজ ক'রে রেলের কারখানার চার্জ্জম্যান কতই বা পেনশন পেতে পারে।"

মৃদঙ্গবাবু বললেন "আপনি রেলকর্ম্মচারী ছিলেন। নিশ্চয় পাস নিয়ে বহু জায়গা ঘুরেছেন?"

—"হ্যাঁ, অবিনাশবাবু যেমন লাঠির সাহায্যে পূজার ব্যবস্থা ক'রে পুণ্যার্জ্জন করছেন আমিও তেমনি পাসের সাহায্যে বহু তীর্থে পূজা দিয়ে পুণ্যার্জ্জন করার চেষ্টা করেছিলাম। দাক্ষিণাত্যে বহু মন্দিরে খালি গায়ে ছাড়া ঢুকতেই দেয় না তাও—"

বাধা দিয়ে কাত্তিকবাবু বললেন—কি মশাই? যে মন্দিরে ঢুকবে তাকেই বিবস্ত্র হতে হয়? মেয়েরা নিশ্চয় যায় না?"

—"হ্যাঁ, দলে দলে যান। প্রথমে যখন জানলাম তখন আপনি যা ভাবছেন সেইরকম কৌতূহল নিয়ে তাড়াতাড়ি পেতে লাগিয়ে, কপালে ভস্মের প্রলেপ দিয়ে খালি গায়ে মন্দিরে ঢুকে দেখি নিয়মটা শুধু পুরুষদের ওপর খাটিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি পুজোটুজো আমার সেরকম আসে না। ভক্তির সঞ্চার তেমন হয়নি। তবে নিজে ভক্ত না হ'লেও অন্য ভক্তের দলের সান্নিধ্যেও তো হয়তো কিছু সুফল হয়েছে। তাছাড়া অনেক পুরাণো মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আমার খুব ভালো লেগেছিল।"

মৃদঙ্গবাবু বললেন, "তা তো লাগবেই। অল্প বয়সে গিয়েছিলেন। মন্দির ভাস্কর্য্যে অনেক সময় এমন কিছু পেতেন যাতে মনে শুড়শুড়ি লেগে আনন্দ পেতেন, তাই না।"

মাথা চুলকিয়ে বিকাশবাবু বললেন, "একেবারে অস্বীকার করি না। কিন্তু দর্শন মাহাত্ম্য তো আছে। এত দেবদেবী দর্শন ক'রে যা পুণ্যের ছোঁয়াচ লেগেছে তার প্রভাবে পরজন্মে আর কিছু না হই গণেশের বাহন হবার যোগ্যতা নিশ্চয় পেয়েছি। কিন্তু এখন বুঝছি যে তা হওয়া ঠিক হবে না। গণেশকে বহন করতে হ'লে ধড়টা পুষ্ট হ'তে হবে তাতে ভালো চাল ও গমের গোলায় থাকতে হবে। আজকাল গোলা বলতে শুধু ফুড কর্পোরেশনের বড় বড় গুদাম। সেখানে এমন চাল রাখা থাকে যা সরাসরি জমি থেকে ফলানো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরও সাধ্যের বাইরে—ফুড কর্পোরেশনের কৃতিত্ব আছে বলতে হবে। চামরমণি, রূপশাল চালের বদলে ঐ কাঁকরমনি পচামাল খেয়ে ভেদবমি উঠবে আর পিঠের গণেশ বেসামাল হ'য়ে উল্টে পড়বেন। গণেশের বাহন হবার ইচ্ছা তাই আর নেই। কি করলে বাদুড় হ'তে পারি বলতে পারেন? আমি বাদুড় হ'তে চাই।"

ভুরু কুঁচকিয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন—"বাদুড়? আর কিছু না হয়ে বাদুড় হবার সখ হ'ল যে? বয়েসকালে নিশাচরবৃত্তি অভ্যাস ছিলো বুঝি?"

বিকাশবাবু বললেন—"আজ্ঞে না। আমাদের রেলের কোয়ার্টারে লিচু, জামরুল, কালোজাম আর পেয়ারার গাছ। এসব ফল পয়সা দিয়ে কিনতে হ'ত না। অতিরিক্তভাবে পেতাম, খেতাম আর বিলিয়ে দিতাম। আর আজ? পাঁচ টাকা কিলো লিচু কিনতে হবে—তাও ডাল-পাতা সমেত ওজন ক'রে? অথচ জামরুল, গুটকে কালোজামেরও কি দাম—পেয়ারাও টাকায় মোটে তিন-চারটে। পেনশনের টাকায় ফল খাওয়া আর সম্ভব নয়। ফল খাওয়া বরকট করেছি বটে কিন্তু মনের মধ্যে ফল খাওয়ার আনন্দের অনুভূতি আর অভিলাষ রয়ে গেছে। এ জন্মে সেই আনন্দ আর পাবার উপায় নেই। পরজন্মে পেতে হ'লে বাদুড় হ'তে হবে—"

কাত্তিকবাবু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন—"ওঃ হো! সাড়ে সাতটা বেজে গেল। আজও ভুজঙ্গবাবুর দেখা নেই; তিনদিন হয়ে গেল পাত্তা নেই। কিছু অঘটন ঘটল না তো?"

মৃদঙ্গবাবু বললেন—"তাইতো! আমাদের উচিত একবার খোঁজ নেওয়া। চলুন, একজোটে যাওয়া যাক"

ভুজঙ্গবাবু জমিদার বাড়ীতে কেরানীর কাজ ক'রে কর্ম্মজীবন কাটিয়েছেন। অতি সৎ ও অমায়িক লোক। সরকারের হাতে জমি তুলে দেবার অনেক আগেই জমিদারবাবু খুশী হয়ে ভুজঙ্গবাবুকে আড়াই কাঠা জমি উপহার দিয়েছিলেন। টালির চালের মাটির ঘর আর ছোট্ট একটা কাঁচা উঠোন ছিল তাতে। এখন তার আশেপাশে অনেক পাকা বাড়ী, রাস্তাঘাট হয়েছে;

হোগলা বন আর নেই কিন্তু মশা আছে। বজবজ লাইনের দক্ষিণে এই এলাকার নাম এখন লেক গার্ডেন্স। যদিও কোন গার্ডেন নেই।

ভয়ে ভয়ে মৃদঙ্গ, অবিনাশ, কার্ত্তিক ও বিকাশবাবুরা ভুজঙ্গবাবুর বাড়ীর দিকে এগোতে থাকলেন। কই, বাড়ীর সামনে তো কোনও এ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তারের গাড়ী দেখা যাচ্ছে না, দড়ির খাটিয়া আর বাঁশও নেই, জানলার বাইরে কমলালেবুর খোসা বা ওষুধের খালি বাক্স তো পড়ে নেই। কান্নাকাটির শব্দও নেই। শুধু একপাল ছেলেমেয়ের হাসি আর কলরোল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। নির্ভয়ে মৃদঙ্গবাবু কড়া নাড়লেন। ময়লা আধছেঁড়া হাফপ্যান্টপরা নয়-দশ বছরের একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে। সকলে দেখলেন ছোট উঠানে একটা তেল চিট্‌চিটে লগ্‌বগে পুরাণো ঈজি-চেয়ারে ব'সে ভুজঙ্গবাবু হাঁটুর ওপরে একটা ন্যাংটা শিশুকে বসিয়ে নাচাচ্ছেন। আরও গোটাদশেক অর্দ্ধ-নগ্ন ছেলেমেয়ে ভুজঙ্গবাবুর সামনে ব'সে—বোধহয় তাঁর কাছ থেকে গল্প শুনছিল। চারজন অপরিচিত ভদ্র-লোককে দেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রুপ ফোটোর ভঙ্গীতে তারা ভুজঙ্গবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নবাগতদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। "আসুন! আসুন!" বলে ভুজঙ্গবাবু ফোগলা মুখে হাসলেন। ছেলেমেয়ের দলও দেখাদেখি হাসল।

মৃদঙ্গবাবু বললেন—"এরা কারা?"

ভুজঙ্গবাবু বললেন—"আমার ছোটমেয়ে আর তার ননদ তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হঠাৎ সন্তোষপুর থেকে এসে পড়েছে। বাসে ধাক্কা খেয়ে ননদে[illegible] দেওর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে। রো[illegible] সকালে আর বিকেলে এদের রেখে মায়েরা তা[illegible] দেখতে যায়। আমি তাই ক'দিন থেকে বেড়াতে যে[illegible] পারছি না। এদের সঙ্গে মেতে থাকি—ভালোই আছি

এই খেঁদী! যা, আমার চশমাটা নিয়ে আয়।

পচা! আমার বাঁধানো দাঁতজোড়া আন তো।

কালিন্দী! আমার কাচা গেঞ্জীটা এনে দে।

ভোম্বল! তুই এক কেটলী চায়ের জল উন্[illegible] চাপিয়ে দে।

ঘন্টা! তুই যা আমার বালিশের নীচ থেকে দু[illegible] টাকা বের ক'রে আটটা সন্দেশ এক দৌড়ে কিনে আ[illegible] —ঘুড়ি কিনে ফেলিস না যেন।

পুঁটি! তুই চারটে কাঁচের গেলাস ভালো ক'[illegible] ধুয়ে কুঁজো থেকে জল ঢেলে রাখ্‌।

লাবু, নটে, চাঁপা, ভোঁদা? তোরা দুটো টুল [illegible] দুটো মোড়া ভালো ক'রে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আয়।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে যে যার কাজে চলে গেল। কো[illegible] নগ্ন শিশুটিকে নিয়ে ভুজঙ্গবাবু একগাল হেসে বললে[illegible]

"আপনারা সকলে ভালো তো?"

মৃদঙ্গবাবু বিকাশবাবুকে কানে কানে বললে[illegible] "দেখলেন তো! এই ভুজঙ্গবাবু হ'লেন মহীরুহ [illegible] ওরা বাদুড়। কর্ম্মী বাদুড়গুলো ওঁকে ধরে ঝুলছি[illegible] কেমন এক ঝাঁকে ছিল আর এক ঝাঁকে উড়ে [illegible] বিভিন্ন কাজে লেগে গেল। আবার ফিরে মহীরুহে ঝুলবে।"

সুতপা

(উপন্যাস

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

সকাল বেলাটা বেশ ঝলমলে ছিল। ঝরঝরে আবহাওয়ায় মনটা বেশ খুসি খুসি ছিল অনুপম বাবুর। খুসি হওয়ার কারণ অবশ্য আবহাওয়া নয় কারণ অন্য, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের দিন ক্রমশঃ এগিয়ে এসে তার ব্যবধান রেখেছে মাত্র তিন দিনের। আশীর্ব্বাদের দিনে ভাবী আত্মীয়দের দেখে মনটা বাড়ীর সবারেরই খুসিতে ভরে উঠেছিল। এখন মেয়ে পার করতে পারলেই নিশ্চিন্দি। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে বাড়ীতেই বসে ছিল, এবার বিদায়ের পালা। সবই নির্বিঘ্নে কেটেছে এখন শেষ অঙ্কের পালাটা চুকলেই মঙ্গল।

অবশ্য হয়ে যাবে সবই যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে হাজারে হাজারে হচ্ছে, তবুও এই যে উদ্বেগ এই ব্যস্ততা অহেতুক বাগ বিতণ্ডার পরেই আপোষে এর একটা আনন্দও ত আছে। সুতপার বিয়ে এও কি কম আনন্দের কথা? ওর মা ত এখন থেকেই বিচ্ছেদের কান্না জুড়ে দিয়েছে। কান্নার কি আছে? আসবে যাবে, কলকাতাতেই ত, বাইরে ত আর নয়। ওদের ব্যাপারগুলো ওই রকমই। আনন্দ গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হলে সেটা যে নিছক আনন্দ নয় এটাই যেন ঘুলিয়ে দেখে নিতে যাওয়া। যাক গে।

দুপুরের পর থেকেই আকাশটা কেমন যেন মেঘলা করে এল আর সারা বিকেল ধরে বৃষ্টির ছাট সামলে ঘরের মধ্যে বসে বসে অনুপম বাবুর যেন মেজাজটা খিচড়ে গেল। অনেক কাজ ছিল বিকেলের দিকে, জিনিষ পত্তর কিছু কেনা কাটার ত ছিলই আর নেমন্তন্নও কয়েকটা বাকি ছিল। কিছুই হ'ল না। বাড়ীর ভেতর ত, জ্ঞাতি কুটুমদের কলরোলে বেশ জমাটই হয়ে আছে। ওদের ত, আর দায়িত্ব নিয়ে দোকান বাজার আর টাকার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না; আর তা ছাড়া-অনুপম বাবু নিজেও লোকটি সে রকম মিশুকে ও ফুর্ত্তিবাজ নন। ফলে ওরা ওদের আনন্দ নিয়েই আছে আর উনি ছুটোছুটি করছেন আর একে ওকে ধরে এটা ওটা করিয়ে নিচ্ছেন। চলছে সবই সুষ্ঠুভাবে, হয়েও যাচ্ছে সবই কিন্তু কি করা যায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল রাস্তায় আলোও জ্বলে উঠল বৃষ্টিও থেমেছে কিন্তু মন যেন তেমন চাঙ্গা হচ্ছে না।

বিকেলের এই বিশ্রী আবহাওয়াটা যেন কোথা থেকে টেনে আনল একটা সৃষ্টিছাড়া বিষণ্ণতা—যেন কোথায় লুকিয়ে বসেছিল আজ সন্ধ্যায় এসে ছেঁকে ধরবে বলে। বাইরের ঘরে বসে অনুপমবাবু যেন আপন চিন্তায় অনিচ্ছাসত্বেও ডুবে যেতে লাগলেন। সুতপার বিয়ের চেষ্টা তিনি বছরখানেক ধরেই করছিলেন মানে গত বছর ওর হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর থেকেই অনেককে বলে ছিলেন। সেই চিরাচরিত প্রথায় একে একে মেয়ে দেখার জন্যে আসতেও লাগলেন অনেকে। সুতরাং সেই চিরাচরিত প্রথায় সুতপার সেজেগুজে ইণ্টারভিউ দেওয়া আর তার সঙ্গে ডিস ডিস মিষ্টির শ্রাদ্ধ।

হাসি পায় অনুপমবাবুর। জলজ্যান্ত মেয়েকে যেন খদ্দেরের সামনে বসালে, কেউ বৃদ্ধ ছেলের বাপ, কেউ ছোকরা ছেলের বন্ধু, কেউ হলেন অভিজাত মহিলা ছেলের দূর সম্পর্কের মাসি, নানান পাত্রের নানান প্রতিনিধি। আর পাত্র স্বয়ং? হ্যাঁ সরকারি কেরানী তবে তার দাদার এক শালা রাশিয়ায় আছে কাগজে দিয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই। কেউ বা স্কুল মাষ্টার কিন্তু তার এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাই রায়বাহাদুর।

উকিল, কলকাতায় প্রায় সবাই তার নাম জানে। এই রকম সব ব্যাপার। অনুপমবাবু ভেবে পাননা যে ছেলেগুলোই বা কেমন? নিজেকে অভিজাত বলে প্রমাণ করার জন্যে দূর সম্পর্কের প্রতিভাবানদের নাম ভাঙাতে এরা এত ব্যস্ত? নিজের পরিচয়টাকে এরা বড় করে ভাবে না কেন? কেনই বা ভাবে না এদের পরিজনেরা? বিরক্তিতে মন ভরে যায় তার। তার ওপর আছে দেনা পাওনা আর মেয়ের চেহারা নিয়ে চুলচেরা বিচার। ছেলের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে তার বংশ পরিচয় নিতে হয় ঠিকই কিন্তু অনুপম বাবুর বংশ পরিচয়ের ওপর খুব একটা আস্থা নেই। শিক্ষা রুচি বংশ পরিচয় থেকে আসে ঠিকই কিন্তু বংশের মুখ পোড়ান ছেলেরও অভাব নেই। ছেলেটিকে দেখে নেওয়াই উপযুক্ত কাজ বলে তাঁর ধারণা। এ পাত্রটি মন্দ নয়, চাকরী করে, মাইনে ভাল তবে একটু খুঁৎ খুঁতে বলে মনে হয়। ওদের বাড়ীর সকলে মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে কথা পাকাপাকি হওয়ার পর একদিন বন্ধুদের নিয়ে দেখতে এল। কি দেখলে ভগবানই জানেন, কিছুই বোঝা গেল না। তারপর ওদের বাড়ীর লোকেরা এল আশীর্ব্বাদের দিন ঠিক হল দুপক্ষেরই। ওরা সুখী হোক এটাই কামনা সবায়ের।

এ দেশে এখনও ছেলে পক্ষের দৌরাত্মটা বেশ বজায় আছে বলে মনে হয়। অনুপম বাবুর মনে পড়ে ছেলের বাপের সঙ্গে কথা বলা যেন মুস্কিলের ব্যাপার। সে এক একজন এক এক মূর্ত্তি নিয়ে বসে আছে। পুত্র শাস্ত্রমতে পুৎ নামক নরক থেকে বাঁচায় কিনা জানা নেই তবে বিয়ের বাজারে যে প্রতিপত্তি বাড়ায় তাতে সন্দেহ নেই। এই যে একটি দীনতা সমাজের এর থেকে পরিত্রাণ কোথায়? মেয়েরা চাকরী করে স্বাধীনভাবে চলবে, এই পথই শেষ পথ, তা ছাড়া মেয়েবহুল সমাজে পিতা বা ভ্রাতা-নির্ভর মেয়ের বিয়ের লটারী ছাড়া গতি নেই। এর পরিণতি খারাপ কি ভাল সে বিচার অনুপম বাবুর পোষায় না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন উনি। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। রাস্তায় লোকজন গাড়ী চলাচল করছে কেবল মনে হচ্ছে যেন সারা শহরটায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে। যেন প্রকৃতি মানুষের মনে একটা বেদনায় অশ্রু ফুটে বেরিয়ে সমস্ত আকাশ বাতাসকে একটা নিঃশব্দ কান্নায় ভরিয়ে তুলবে। মনে কি পরের হাতে মেয়েকে তুলে দেবার কষ্টটা পেয়ে বসেছে? ভাবতে চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তা'ত নয়। বরঞ্চ মেয়ের বিয়ের আনন্দেই ত' কাটছিল ক দিন। তবে কি শরীরটা একটু বেশী পরিশ্রমে কাহিল হ'ল নাকি? হবেও বা। তবে তিনি এমনিতেই বেশ পরিশ্রমী লোক, যখন খাটেন ভূতের মত খাটতে পারেন। হয়ত বা শারীরিকই কিছু হবে।

ওঁর সখাক্ষি চৌধুরী মশাই একবার ঘরে এসেছিলেন। ওঁকে বিষণ্ণ দেখে একটু চিয়ার-আপ করতে—কি ভাবছ ভায়া? ছেলে ভালই মনে হয়—বুঝলে। বি,এস,সি পাস, মাইনেও মন্দ নয়, কলকাতায় বাড়ীও আছে, বাপ-মা রয়েছে, গুড্ লাক। সুতপার বরাত জোর আছে বোঝা সহজ। দেখতেও খারাপ নয় ছোকরা।

আরে সে সব, ত' হল' অনুপমবাবু বলেন, এখন জীবনটা সুখে কাটাক এই আর কি। যা দিনকাল দেখছি ওসব বিয়ে-টিয়ে সময় মত চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

সে'ত বটেই, চৌধুরী বলেন, পারলে চোকানই ভাল, তবে তোমার কেসে একটু তাড়াতাড়িই হচ্ছে বলে মনে হয়। আজকাল বিয়ে সবই দেখছি দেরীতে।

সেটা বলতে পার ছেলেদের রোজগার করা পর্য্যন্ত মেয়েদের অপেক্ষা করতেই হয়, কেননা স্বামীর রোজগারেই যখন স্ত্রীর ভরণ পোষণ তখন ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

'হ্যাঁ যা বলেছ, দু'জনেই রোজগার করলে বিয়েটা সহজ হয়ে যায়। আর তাই যেতে চলেছে। আমাদের পরের জেনারেশন কি আর ঠিকুজি, কুষ্ঠি আর পরম্পরের গুরুর মুখ চেয়ে বসে থাকবে?' বলেন অনুপমবাবু দু'জনেই হাসেন।

'হ্যাঁ তখন ব্যাপার হবে কিরকম সেটাই ভাববার কথা—' অনুপম বাবু যেন বেশ চিন্তিত ভাবেই বলেন এখনও হচ্ছে অনেক কিন্তু পারিবারিক বোঝাপাড়া বা সংস্কারটি এখনও আছে। যখন দু'পক্ষই স্বাধীন হবে তখন বোধহয় ভালই হবে।

হ্যাঁ সে ভালই হবে। নিজেরাই বোঝাপড়া করে নেবে। ভাব দেখি কি ব্যাপার, দলে দলে মেয়ে দেখতে আসা, পছন্দ না করে চলে যাওয়া, পরীক্ষা করা, বাজিয়ে নেওয়া তারপর যথা পূর্বম তথা পরম, সেই সুখ দুঃখের চিরকালের সংসার।

ওপাশের বারান্দায় মেয়ে পুরুষের একটা হাসির কলা উঠল, চৌধুরী মশাই কৌতূহলী হয়ে গুটি গুটি উঠে গেলেন। আর অনুপমবাবু ডুব দিলেন নিজের চিন্তায়। সমাজের ভেতর এসব জিনিস যে কেন থাকে বোঝা যায় না। অথচ এছাড়া আর কিইবা করার আছে? এত আর নতুন সৃষ্টি নয়, বহুদিনকার, আর এইভাবে তাঁরও বিয়ে হয়েছে। তিনিও একদিন দু'তিনটি মেয়ের পর সুনন্দাকে দেখে পছন্দ করেছিলেন বলেই সুনন্দা তাঁর গৃহিনী। তার বাবা ঠাকুরদারও সেই একই ইতিহাস। আর এই ভাবেই হাজার হাজার পরিবার এদেশে সুখেই জীবন কাটিয়েছে আর কাটাচ্ছেও। ওসব ভালবেসে বিয়ে ত এদেশে সবে আসতে সুরু করেছে মধ্যবিত্ত পরিবারে। তবে এটা ঠিক যে মেয়েরা যত স্বাধীন হবে নিজেরা রোজগারপাতি করবে তখন অন্ততঃ তাদের এভাবে মেয়ে দেখার পরীক্ষায় বসতে হবে না।

দরজার সামনে দিয়ে সাধন বলে যাচ্ছিল, বাড়ীর পুরোন ধোপা কিছু কাপড় বোধহয় বাকি ছিল দিয়ে গেল।

'ও রে'—কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে ডেকে ফেল্লেন তাকে। সাধন দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ঘরে এসে এক-গাল হেসে দু'হাত তুলে নমস্কার করলে।

'শুনেছিস্ ত' সব'।

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, কি আনন্দের কথা দিদিমণির বিয়ে।

'তোরা সব আসবি, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে, কিরে আসবি ত?'

'আজ্ঞে আমি একাই আসব।'

'কেন? একা কেন, সবাই আসবি।'

'না বাবু তা' হবে না। বৌ আমার কাছে থাকে না আর মেয়েও শ্বশুরবাড়ী।'

'বৌ তোর কাছে থাকে না কেন?'

'ও বাবু ঝগড়া করে চলে গিয়েছে, আর আমিও আনতে যাইনি।'

অনুপমবাবু মনে মনে বললেন—'যাচ্ছলে'।

'তা তোর মেয়ের কোথায় বিয়ে হয়েছে?' কেমন যেন একটা অহেতুক প্রশ্ন ভেতর থেকে ঠেলে উঠে পড়ে। বোধহয় বিষণ্ণতাটাকে কাটাবার একটা ইচ্ছে ভেতর থেকে উঁকি মারছে।

'সে বাবু আমাদের পাশের গাঁয়ে। ক্রোশ তিনেক হবে। তা' নয় ছয় করে পাঁচ বছর ত' কাটল, দুটি বাচ্চা। ওদের কিছু ধান জমিও আছে, আর আমাদের জাত-ব্যবসা, এই নিয়েই কাটাচ্ছে আর কি।'

'তা' তোর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পেলি কোত্থেকে?' একটা কেমন কৌতূহল জাগে।

'ও সব বাবু ভবিতব্য, মানুষের ইচ্ছেয় হয়না এসব। সম্বন্ধ এল, হয়ে গেল। নইলে বাবু কে আর আমার জামাই খুঁজতে সাতটা গাঁ ঘুরে বেড়াবে।'

'তা চেষ্টা ত' করিছিলি, না-কি ওম্নি ওম্নি তিন ক্রোস দূরের গাঁয়ের লোক জানতে পারল যে তোর মেয়ে আছে।' উনি একটু স্নেহমাখা সুরে খোঁচিয়ে ওঠেন।

সাধন পুরনো লোক, রসিকতা বোঝে। বললে, 'সে বাবু জ্ঞাতিকুটুম্, বন্ধু-বান্ধবকে লোকে যেমন বলে থাকে তেমনিই বলা, এতেই যা হয়। আমিই কি ভেবেছিলুম ওর অত তাড়াতাড়ি অমন নির্বিঘ্নে হবে? ও সবই বাবু ভাবিতব্য।'

কথাটা অনুপমবাবুর মনেও যেন লাগে। পিসিমার মুখের বুলিই হল' বিয়ের ব্যাপার সবই ভবিতব্য।

পিসিমার কথার সঙ্গে সাধনের কথার মিল। আমাদের সমাজে সবাই জ্ঞানী, কেবল আমার মত গোটাকতক কৌতূহলী ছাড়া।

সাধন বিদায় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকেন রোহিণীবাবু, পাড়ার পুরোন প্রতিবেশী। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলেন, যা'হোক তাহলে কাজ তো গুছোলে।'

'এখনও শেষ হয়নি দাদা, বাকি আছে।'

'ওই হ'ল' বলেন রোহিণীবাবু। মেয়ের বিয়ের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে গিয়ে যা পেয়েছি সেতুলনায় তোমার ত' কিছুই নয়। তিনটের বিয়ে দিলুম এই নিয়ে। তা' তোমার পাত্রটি যা শুনছি বেশ ভালই ত' মনে হয়। সম্বন্ধটা পেলে কোত্থেকে?

'এই সবাইকে বলা ছিল, এটা সেটা করতে করতে লেগে গেল আর কি। এটা এসেছে আমার শ্বশুর-বাড়ীর তরফ থেকে। আমার শালার অফিসের কার আত্মীয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রোহিণীবাবু বলেন, 'ওঃ কি ব্যাপার গেছে তাই ভাবি। বড় মেয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে অনেক কষ্টে ঠিকানা খুঁজে বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওপর থেকে এক হুঙ্কার—''কত দেবেন মশাই?' ঘাবড়ে গিয়ে ওপরে তাকাতেই দেখি পাকা গোঁফওলা এক ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নিজেই বললে, আমিই ছেলের বাবা, দূর থেকে দেখেই বুঝেছি কেন আসছেন। অনবরতই লোক আসছে। যাইহোক কত দেবেন নগদ।'

মেজাজটা অনেক কষ্টে সামলে বললুম—'বিশেষ কিছু নয়।'

'তবে আর হ'ল না', জবাব হ'ল।

'হয়ে আর কাজ নেই' বলেই হন্ হন্ করে পেছন ফিরে চলতে লাগলুম, আর সমানে শুনলুম—'ও মশাই শুনে যান, ও মশাই শুনে যান।'

অনুপমবাবু এতক্ষণ দমবন্ধ করে শুনছিলেন, নিঃশ্বাস ফেলে বললেন 'ওঃ এর নাম বিয়ে।'

হ্যাঃ, রোহিণীবাবু বলেন, 'তবে এসব থাকবে না। আজকাল যা দিন এসেছে তাতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগারপাতি করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানই ভাল। সেই যে পুরোন রীতি দেনাপাওনা আর মেয়ে-দেখা এসব উঠে যাওয়াই ভাল। কি বলেন?' জিজ্ঞেস করেন অনুপমবাবু।

রোহিণীবাবু যেন চিন্তিত হন—'কি জানি বাবা তবে আমাদের দেশে মনে হয় মেয়েদের বাপু বিয়েটা দরকার। একটা বয়স পেরিয়ে গেলে ত তা আর হয় না। আমাদের পাঁচুদার মেয়েদের দেখনা। ৩'টি মেয়ের একটিরও বিয়ে হল না, বা মনে কর করল না। দিব্যি চাকরী করছে, আনছে সংসার চালাচ্ছে। ওর ত' ছেলেপুলে নেই, ওরাই সব করে।

'সেত ভালই, তবে তাদের জীবনের কি হ'ল।'

'প্রশ্ন ত' সেইখানেই।'

রাঙ্গা জেঠাইমা ঘরে ঢোকেন। বৃদ্ধা, কিন্তু কইয়ে-বলিয়ে মিশুকে। নাতনির বিবাহ উপলক্ষ্যে আসা, ক'দিন আছেন এখানে। পর্দার বালাই রাখেন না, রাখবার কথাও নয়। ঘরে ঢুকেই বলেন—'শুনেছিস অনু, রাণুর মেয়ে লভ্ করে বে' করেছে। রাণু রাঙ্গা পিসিমার কি সম্পর্কের ভাইঝি না কি যেন।'

'তাই নাকি?' বলেন অনুপমবাবু। রোহিণীবাবু হাসেন—'ওই শোন' তা' মন্দ কি?' বলেন অনুপম-বাবু, 'দেখাশোনা করতে হল না, এমনিতেই হয়ে গেল।' বলেই অবশ্য তিনি একটু স্বস্তি পান নিজের মেয়ের কথা ভেবে। ওঁর মেয়ে নিজে দেখে বিয়ে করছে ভাবতেই যেন ওর প্রেসার উঠে যায়। কথা যে বললেন নেহাৎ কথার কথা হিসেবে।

'হ্যাঃ মন্দ নয় বই কি' জেঠাইমার অভিযোগ—'যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড, এরা বামুন আর ওরা কায়েত না শুঁড়ি কি একটা, ছি-ছি। এ কি যুগ পড়ল রে বাবা এঁ্যা? এই কি শিক্ষার ফল? ওরা দু'জনেই শিক্ষিত মানলুম, কিন্তু সমাজের মধ্যে বসে এইসব অসামাজিক কাজগুলো যে তোরা করিস, তোদের বিবেকে বাধে না? বিয়ে কি পালিয়ে যাচ্ছিল?

রোহিণীবাবু হাসেন—'বিয়ে হয়ত পালাত না, কিন্তু মনের মত সঙ্গী হয়ত হাতছাড়া হয়ে যেত।'

'হ্যাঁ তাইত, মুখপোড়ারা এটুকু বোঝেনা যে চোখে ভাল লাগলেই সারা-জীবন ভাল লাগেনা। এই যে আদিকাল থেকে বাপ-মা ঠিক করে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে তারা সংসার কচ্ছে কি করে?'

কথাটা সত্যি। ওঁরা দু'জনেই নীরব থাকেন।

লাভ ম্যারেজেও অনেকেরই কিন্তু সুখেই কেটেছে. কি বলেন? অনুপমবাবু রোহিণীবাবুর দিকে একটু সমালোচকের ভঙ্গীতে তাকান।

ডেকরেটরের দোকানের লোক ঘরে ঢুকল—'বাবু জিজ্ঞেস করলেন কাজ কি কাল থেকেই সুরু করব না পরশু থেকে?'

ওই পরশু সকাল থেকেই লেগে যেও, বিকেলের মধ্যেই শেষ করে ফেল, শুধু শুধু একদিন বাড়িয়ে লাভ নেই—অনুপমবাবু বলেন।

'বেশ তবে আমরা পরশু থেকেই শুরু করে দোব।'

'হাঁা পরশু ভোর থেকেই।' লোকটি চলে যায়।

'সানাই ঠিক করলে কোথায়?' রোহিণীবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'সে ওই ডেকরেটরই ঠিক করে দিয়েছে'। বলছে ত' ভালই, দেখাই যাক্।'

'বাপরে বাপ, রাঙ্গা জ্যেঠিমার সেই পুরাণ অনুযোগ, —'দেশটাকে একেবারে গোল্লায় দিলে গা। বিয়ে হ'ল সে ভবিতব্য, তোর বর, তোর বউ ঠিক জায়গায় গুটোবাঁধা আছে। বিয়ের যোগ বরাতে থাকলে যেখানেই থাকিস হয়ে যাবে। তার জন্যে ঝুলোঝুলি করে যাকেতাকে একটা করে ফেললেই হ'ল।'

'তা' ওটাও ত' ভবিতব্য, রোহিনী বলেন—যাকে তাকে বিয়ে করা বরাতে থাকলে সে আর কে আটকাবে? ওটাও বরাতের ওপর ছেড়ে দিন।'

'কেন ছাড়ব?' জ্যেঠাইমার গর্জ্জন, 'আগের দিনে কি বরাত ছিলনা তখন কটা অমন বিয়ে হত শুনি?'

অনুপমবাবু হো হো হো করে হেসে উঠলেন, এতক্ষণে বোধহয় বিষণ্ণতাটা কাটল। 'এ যুক্তিটা মানে বিচ্ছিরি রকমের অকাট্য, কি বলেন?'

রোহিণীবাবুও হাসেন—'ঠিক্ ঠিক্', এ একেবারে অখণ্ড যুক্তি, কোথাও ফাঁক নেই।

'তবে?' জ্যেঠাইমার বিজয়িনীর ভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। ওরা উপভোগ করে। রসুইকর বামুনের দল ঘরে ঢোকে। 'বাবু তা'হলে ওই কথাই পাকা রইল।' বলে একজন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই পরশু সকাল থেকেই লেগে যাবে। আর দেখ সন্দেশটা দোকানেই অর্ডার দিচ্ছি, ও বাড়ীতে সুবিধে হবে না। আগে ভেবেছিলুম বটে কিন্তু ও দরকার নেই। তোমরা লেডিকেনি আর দরবেশটাই নাও।'

'বেশ তাই হবে বাবু। আর বলছিলাম কি, লোকটা একটু ইতস্তত: করে, মানে যদি কিছু দেন...এই আগাম বকশিস্ আর কি, একটা আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে......।'

অনুপমবাবুর মনটা নাড়া দিয়ে ওঠে—বেচারী চাইছে নিক্।

'যা ছোটবাবুর কাছ থেকে আমার নাম করে চেয়ে-নিগে যা:। উনি শালার দিকে লেলিয়ে দেন। খরচের একটা অংশ উনি শালা সন্তর হাতে দিয়ে দিয়েছেন।

ওরা চলে যায়।

'এ আবার কি? আগাম বকশিস্? ওসব দাও কেন?' রোহিণীবাবু অনুযোগ করেন।

যাক গে, গরীব মানুষ চাইছে, একটা আনন্দের ব্যাপার চলছে যখন কি বলগো জ্যেঠাইমা??

জ্যেঠাইমার মন এখন অন্যদিকে। সে কথার জবাব না দিয়ে শান্তভাবে বলেন—

'কি? আমি ঠিক বলিনি? তোমরাই বল। ছিল আগে এ সব? এই খুসিমত বিয়ে? বল।'

রোহিণীবাবুও গম্ভীরভাবে বলেন—

'কি জানেন জ্যেঠাইমা, বিয়েটা যে সব সময় বিয়ের জন্যেই হয় তা' হয়ত নয়। অনেক সময় পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে হয়, তারা গুণকেই ভালবাসে। যেমন ধরুন আপনি যাদের কথা বলছেন তারা দু'জনেই শিক্ষিত।

'শিক্ষিত মানে? শিক্ষিত বলে শিক্ষিত, দু'জনেই স্কলারসিপ পাওয়া, মেডেল পাওয়া।'

'তা' হলেই দেখুন এরা হয়ত পরস্পরের জ্ঞান-পিপাসাকে ভালবেসেছে আর কিছুকে নয়। দু'জনের রুচির মিল কত সময়ে দু'টো জীবনকে এক করে দেয়, তারা সামাজিক সংস্কারের বা চেহারার, বা পয়সার ওপর নজর দিতে পারে না। এ রকম বহু ঘটনা হয়েছে।

'কিন্তু এটা কি ভাল? আগে কি করে চলত, বল তা' হলে? সেখানে কেউ কারোও মনের খবর ত' পেত না, অথচ কেমন দু'টি জীবন মিলে যেত, অথচ সমাজের মধ্যে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ডও হ'ত না।' 'ঠিক কথা', উৎসাহ পেয়ে রোহিণীবাবু একটু ঠিক হয়ে বসলেন—'কিন্তু তখন মেয়েদের এত লেখাপড়া বা বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েদের মনটা ছিল ঘরকুনো ভীরু প্রকৃতির। তাই যার সঙ্গেই বিয়ে হোক মানিয়ে চলার একটা বাধ্যতা তাদের মধ্যে থেকেই যেত। এখন কি করে তা হবে বলুন? মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, তাদের মধ্যে চিন্তার খোরাক জুটছে এখন মনের মত বর খুঁজতে গেলে বেশ কষ্ট হবে। তার উপর রুচিমত না হলেই বিপদ। কি বল হে অনু?'

'কিন্তু বিয়েটা কেন? গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।' কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বললেও কিন্তু সিরিয়াস্‌লিই বলেন অনুপবাবু। দেখা যাক না তর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওর নিজের কিছু বক্তব্য এই ফাঁকে প্রকাশ করে দিলে কেমন হয়? বন্ধু-মহলের মত এখানে ত' আর অপদস্থ হবার ভয় নেই।

'লোকে ঘর বাঁধে ঘরের জন্যেই সেখানে ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন না তোলাই ভাল।'

'এ আবার কি বলছ? আমার রুচি আমার সাধনার সে সঙ্গী বা সঙ্গীনি হ'তে না পারবে তাকে নিয়ে ঘর বেঁধে আমার কি সুখ?'

'ওসব গালভরা কথা' অনুপমবাবু নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেই এবার বলেন, 'রুচি সাধনা এসব মগজে নিয়ে বিয়ে করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার সাজান মানে নিজেকে, আর সাবাইকে সং সাজান।'

'বারে বাঃ, তা হলে সংসার আর সাধনা একসঙ্গে চলেনা?' জ্যেঠাইমা যেন একটু বিব্রতভাবেই কথাটা বলেন।

'আচ্ছা তোমরা যে কেন এসব বল; উনি একটু হাসেন।

'আরে আরে কি খবর কি খবর সব, কনে কোথায়?' হুড়মুড় করে একদল নবাগত মেয়ে, পুরুষ কুটুমের ঘরের মধ্যে আবির্ভাব। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়ে যায়। সবার মুখেই প্রশ্ন 'কনে কোথায়?' সেই এখনকার নায়িকা ত'।

চল্‌-চল্‌ সব ওপরে চল্‌ ওপরে চল্‌, জ্যেঠাইমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সবাইকে ওপরে নিয়ে যেতে তৎপর হলেন। ওদিকে রোহিণীবাবু একেবারে কোণ-ঠাসা হবার ভয়ে গুটি গুটি বিদায় নেন, তর্ক ওখানেই শেষ।

অপুপমবাবু ঘরে একা বসে কিছু একটা ভাববার আগেই আবির্ভাব হয় তাঁর গৃহিণী সুনন্দার—'আচ্ছা তুমি কিরকম লোক। বাঙ্গাদির মেয়ে জামাইকে বলনি; ওরা দু'দুটো কাজে আমাদের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেল. ছি-ছিঃ কি ভাববে বলত।'

'তোমাকে কে এই বানানো দুঃসংবাদটা দিলে?'

'কেন? কখন গেলে?'

আজ সকালে, আজ সকালে গিয়ে ওদের বলে এসেছি। খিদিরপুর গেলুম বলেই ত' ফিরতে অত দেরী হ'ল, দেখলে না জিনিষপত্তর সব ওদের দিয়ে আনাতে হ'ল।'

'বল নিত!'

'বলার সময় কোথা, আর জিজ্ঞেসই বা করলে কখন!'

'যাক্‌ তবু ভাল যে খেয়ালটা রেখেছ।'

'খেয়াল্‌ ত' আমিই করেছি, তোমার খেয়াল্‌ ত' এখন হ'ল।

'সে যাই হোক্‌, আমার এমন খারাপ লাগছিল। আর শোন, আমায় যে দু'-শো টাকা দিয়েছিলে, তার

আর পাঁচিশ টাকা পড়ে আছে, আবার ওপরে যাবে যখন কিছু দিয়ে রেখ।'

'ঠিক্ আছে, একটু দেখেশুনে খরচ ক'র, এখনও অনেক বাকী।' ঘরে ঢোকেন বড় শ্যালিকা ;—'মেয়ের চুকলে এবার শালির মেয়ের জন্যে তৈরী থেক। ও তোমাকেই দেখতে হবে, আগেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি।'

তিনজনেই হাসে। সুনন্দা সায় দেয়—হ্যাঁ দেখনা দিদি, কি করি, এটা চুকুক্ তারপর খুকুর ব্যবস্থা ওকে দিয়েই করাব। কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান বার করছি।

'ওইরকম পাত্র খুকুর জন্যেও এনে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখছি।'

'খুকুর ওর চেয়েও ভাল পাত্র হবে দেখ। দেখতে আরও ভাল, খরচও করবে, পড়েছেও বেশী, ও হয়ে যাবে।' অনুপমবাবুর গলায় সান্ত্বনার সুর।

'ওই ওই হলেই বাঁচি, আবার আরও। যাগগে ও তোমাদের ব্যাপার, তোমরাই দেখবে।'

ওপরে চলেছে কি হুল্লোড় তার আওয়াজ নিচের ঘরে মুহুর্মুহু ছুটে আসছে। চলছে কথার পিঠে কথা আর ঠাট্টা তামাসা। প্রতিবেশী একজনের হাসিও তেমনি পাড়া কাঁপিয়ে। বহুদিন পরে এবাড়ীতে কাজ, তাই বুঝি আর কোন বিধি নিষেধ মানা যাচ্ছে না।

ওঃ কি ব্যাপার—অনুপমবাবুর কথায় একটা আত্মপ্রসাদের সুর, এরা দেখছি তিন দিন আগেই সমস্ত এনার্জি খরচ করে ফেলবে। কিছু অবশিষ্ট রাখতে বল।

শ্যালিকা হেসে ওঠেন—তাই বটে, হয়েছে কি জান না বুঝি সন্তুর ত' যার সঙ্গে ভাব হয়েছিল তার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'ল আর সন্তুর হল মামার পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে, তাই নিয়ে সন্তুকে সবাই খেপাচ্ছে আর বলছে সেই আগেকার মেয়ে নাকি সন্তুকে হাতে রেখে ছিল। সন্তুও কম যায় না...ওপরে যা সব হচ্ছে, যাও না একবার।

হ্যাঁ অমি ওই করি। অনুপম কথাটা কাটিয়ে দেন। সন্তু ওঁর কিছুটা দূর সম্পর্কের সম্বন্ধি প্রায় সমবয়সী কিন্তু তরুনচিত উচ্ছলতাটা এখনও বজায় রেখেছে। যাক এখন আর ওঁর ওসব ভাল লাগছে না, কেবল কাজটা কি করে উদ্ধার করা যায় সেই চিন্তা।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেন শ্যালিকাকে, আচ্ছা দাদার বোম্বে বাস আর ক'দিন ? অনেক দিন ত' হল।

ওঁর কথা বাদ দাও ওই আসছে যাচ্ছে এই পর্য্যন্ত। বদলি হওয়ার ব্যাপার এক ওপরওলারা জানেন আর জানেন যিনি সকলের উপরে ওপরওয়ালা। জিজ্ঞেস করলে ত' কিছুই বলতে পারে না।

স্ত্রী ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে জিজ্ঞেস করেন' তুমি কি এখন বেরোবে কোন কাজ আছে ? নয়ত ওপরে এস, দানের বাসনগুলো একবার মিলিয়ে নি।

না এখন আর বেরোব না, কয়েকটা কাজ ছিল ও কাল দেখা যাবে। চল আমি যাচ্ছি ওপরে।

সুনন্দা চলে যায়, শ্যালিকা বলেন—ওঃ আমার যে কি মুস্কিল, উনি রইলেন বিদেশে আর আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে ক'দিক সামলাই বলত ? এদিকে বড় মেয়ের বয়স হচ্ছে, তার একটা ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার তোমাদেরই করতে হবে তোমরা না করলে হওয়া শক্ত। আর যা দিন কাল পড়েছে ভয় করে।

আরে ওসব হয়ে যাবে দেখ ও কিছুই আটকাবে না। চল দেখি একবার তোমার, বোনের আবার হুকুম শুনলে ত'।

হ্যাঁ চল চল হেসে ওঠে শ্যালিকা। দুজনেই সিঁড়ির পথে পা বাড়ায়।

এই শ্যালিকাটিকে অনুপম বাবু চিরকালই একটু কৌতূহলী চোখে দেখেন। স্বামী বিদেশে ইনি এখানে একাই সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে দিব্যি দিন যাপন করেন। ওঁর স্বামী অর্থাৎ বরদা বাবু সেই যে দশ বছর আগে গেছেন এখনও ফেরবার নাম নেই; তবে কাজ কর্মের ছুটিতে তাঁকে প্রায়ই কলকাতা আসতে হয় এই যা সান্ত্বনা অথচ ইনি স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে নারাজ। দিব্যি ছেলে মেয়ে চাকর বামুন ঝি সম-

ভিব্যহারে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন, তবে সুখে কি দুঃখে বোঝা শক্ত। স্বামীছাড়া সংসার নিয়ে মেয়েরা দিব্যি ভুলে থাকতে পারে অবশ্য যদি নেহাৎ না আটকায়। এর কথা মনে পড়লেই অনুপম বাবুর নিজের ওপর যেন মায়া হয়, অর্থাৎ স্বামীরা যে স্ত্রীর একমাত্র নির্ভর নয় এরই সাক্ষ্য বহন করে ইনি যেন বেড়াচ্ছেন। তবু অহঙ্কারী বা স্বার্থপর নন বেশ অমায়িক মহিলা। এক এক সময়ে এঁকে দেখে ওর মনে জিজ্ঞাসা জাগে—তবে মেয়েরা আসলে চায় কি স্বামী না স্বামীর সংসার চায়? নিশ্চয় দুটোই কিন্তু কোনটা বেশী করে বা কোনটা বেশী দরকার? জীবনের প্রয়োজনে দু'টোই চাই তবে সংসার অনিবার্য্য। একটা বিশেষ অবস্থায় কি পুরুষ কি মেয়ে একটা মনে আশ্রয় চাইবেই। এই যে চাওয়া এটাই স্বর্গীয়, এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। কিন্তু শিল্পীর কল্পনা যেমন পটভূমিতে চিত্ররূপে আশ্রয় নেয়, তেমনি পরস্পরের মানবিক আশ্রয়ের পরিণতি সৃষ্টি করে সংসারের যেখানে ফুটে ওঠে পরস্পরের আত্মবিশ্লেষণের পূর্ণ সুযোগ। এইখানেই সংসারের সার্থকতা।

ওরা নাই বলুক অনুপমবাবু সন্ধ্যার তর্কের কথা ভাবেন, ওরা এখা হয়ত বুঝবে না যে গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনের একটা নিজস্বতা আছে। এটা একটা রুচি বা তপস্যা নিরপেক্ষ স্বাধীন বিষয়। গার্হস্থ্য জীবন তার আপন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। হয়ত বা এটাই একটা সাধনা। বোধহয় একটু তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন উনি। কখন শ্যালিকার পিছু পিছু ওপরে চলে চলে এসেছেন খেয়াল ছিল না খেয়াল হ'ল সম্বর চিৎকারে—

কি হে কোথায় ছিলে এতক্ষন বাদে ঘর থেকে তাও নিঃশব্দে শালির পিছু পিছু......।

রাস্কেলটার গলাও তেমনি তিনখানা বাড়ী পেরিয়ে শোনা যায়। ওরও স্নেহমাখা তিরস্কার—

থাম! শালারা ত চেঁচিয়ে কথা বলে জানি, তোর ও কি তাই নাকি? আজকের দিনে একটু শালীর সঙ্গে ঘুরছি বলে তাই পাড়ার লোককে জানাবি।

সবাই হাসে। নিহাত আসে পাশে বাচ্চারা বা গুরুজনেরা কেউ ছিল না তাই রক্ষে নইলে কি বিচ্ছিরি হত এ্যাঃ। অনুপমবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজেকে সামাল দেন।

ক্রমশঃ
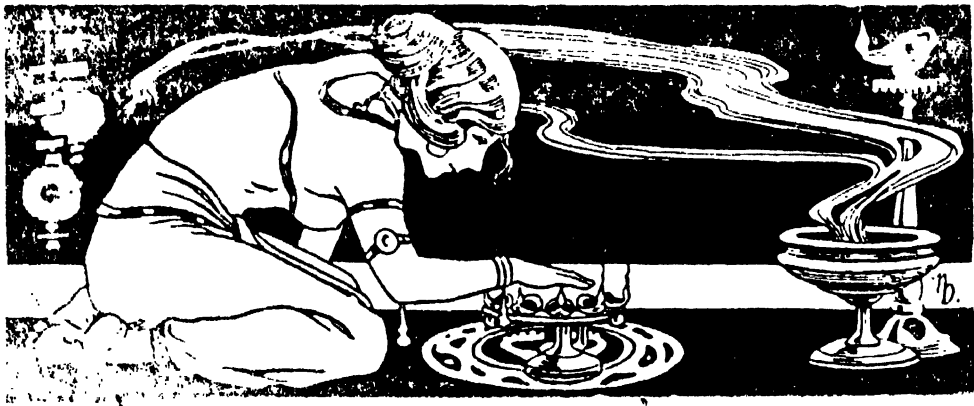
ক্রীড়া জগতে শারীরিক যোগ্যতার স্থান

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

খেলার মাঠে physical fitness বলে একটি কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের এ বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন।

কয়েক দশক আগেও শারীরিক যোগ্যতার (physical fitness) সাধারণ মানের অবনতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই সময় আমেরিকার বহুসংখ্যক মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সামরিক কাজে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। এই জন্যই পর পর কয়েকজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সমগ্র জাতির শারীরিক যোগ্যতার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে খুব কম জনই আছেন যাঁরা উপযুক্ত শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন।

যে কোন খেলাতেই শারীরিক যোগ্যতা (physical fitness) হল কৃতিত্বের মানদণ্ড। কোন মানুষই কখনও চ্যাম্পিয়ন রূপে স্বীকৃতি পেতে পারেন না যদি না তিনি উপযুক্ত শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হন। ক্রীড়া প্রতিযোগীতার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের কাম্য হলেও সকলের আগে প্রয়োজন উপযুক্ত শরীর বা fit body।

শারীরিক যোগ্যতা কি এবং এর পরিমাপকটাই বা কি? এই বিষয় নিয়ে আজ কিছু আলোচনা করব। বিনা ক্লান্তিতে অধিক সময় পর্য্যন্ত কাজ করার ক্ষমতাই শারীরিক যোগ্যতার মাপকাটি।

নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামের (controlleed exercise) আগে এবং পরে হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-স্পন্দন এবং নাড়ী-স্পন্দনের তুলনামূলক পরীক্ষার উপরই শারীরিক যোগ্যতার সামগ্রিক মান নির্ভর করে।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষক (National Coach) Al. Murray এবং ব্যায়াম শিক্ষাবিদ্ Michael Fallon যে মতামত পোষণ করেন সেই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব।

এঁদের মতে দুইটি অতি সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা শারীরিক যোগ্যতার মান নির্ণয় করা সম্ভব।

এই পরীক্ষায় প্রথমে ক্রীড়াবিদকে একটি চেয়ারে স্বাভাবিক ভাবে দশ মিনিট বসিয়ে রাখার পর হাতের কব্জির উপর নাড়ীর স্পন্দন গণনা করতে হয়।

আমরা জানি সাধারণ ব্যক্তির নাড়ীর গতির স্পন্দন মিনিটে ৭২ বার। শরীর সুস্থ সবল ও সমর্থ হলে নাড়ীর গতির স্পন্দন সাধারণের তুলনায় কম হয়। এই জন্যই ক্রীড়াবিদদের নাড়ী ধীরে চলে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এর নাম Brady Cardia এবং ক্রীড়া জগতে ইহা Athlete's Pulse নামে সুপরিচিত।

নাড়ীর সাধারণ গতি গণনার পর এবার পরীক্ষার্থীকে কোন স্থান পরিবর্তন করে পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত একই জায়গায় দৌড় করান হয়। এই ব্যায়ামের পর নাড়ীর স্পন্দন যদি ১১০ বারের বেশী হয় তা'হলে বুঝতে হবে ক্রীড়াবিদের শরীর বিশেষ উপযুক্ত নয়। এই পরীক্ষাটিতে উপযুক্ত বিশ্রামান্তে পর্য্যায়-ক্রমে পরপর তিন রকম ভাবে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করা হয়। প্রথম বার দাঁড় করিয়ে, দ্বিতীয়বার বসিয়ে এবং তৃতীয় বার শুইয়ে নিয়ে পরীক্ষার্থীর নাড়ী স্পন্দন গোনা হয়।

এই পরীক্ষায় এই তিনপ্রকার নাড়ী স্পন্দনের হারের (pulse rate) মধ্যে পার্থক্য যত কম হবে ক্রীড়া-

বিদ্‌কেও ততই শক্ত ও সমর্থ বলে ধরে নিতে হবে। ক্রীড়াবিদের হৃৎপিণ্ড যে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম এই পরীক্ষার দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীতে আর-একপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা শারীরিক যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর সুবিধামতন কোন এক নির্দিষ্ট মাপা পথে তাকে ১২ মিনিট ধরে পর্য্যায়ক্রমে হাঁটতে কিংবা দৌড়তে হয়। ক্রীড়াবিদ্‌কে তার এই প্রচেষ্টায় কোন রকম শারীরিক নিপীড়ন করতে দেওয়া হয় না।

এই পদ্ধতিতে ক্রীড়াবিদ্ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হাঁপিয়ে পড়েন ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৌড়বেন। এরপর তিনি হাঁটতে আরম্ভ করবেন। হাঁটার মধ্যে আবার যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন তখন তিনি পুনরায় দৌড়তে আরম্ভ করবেন। পরীক্ষার্থীকে ১২ মিনিট ধরে পর্য্যায়ক্রমে এই রকম হাঁটতে এবং দৌড়তে হবে।

এই ১২ মিনিটে পরীক্ষার্থী কতটা পথ অতিক্রম করলেন সেইটাই এই পরীক্ষার বিচার্য্য বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমানবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী ১২ মিনিটে ১ মাইল অথবা তার কম পথ অতিক্রম নিকৃষ্টতম শারীরিক যোগ্যতার পরিচায়ক। ১ থেকে ১। মাইল পথ অতিক্রম সাধারণ নিম্ন পর্য্যায়ের মান বলে ধরা হয়। ১। মাইল থেকে ১॥ মাইল পরিভ্রমণ সাধারণ পর্য্যায়ের মান বলে নির্ণীত হয়। ১॥০ মাইল থেকে ১৸০ মাইল উৎকৃষ্ট এবং ১৸০ মাইল এবং ততোধিক পথ অতিক্রম উৎকৃষ্টতম শারীরিক যোগ্যতা বলে ধরে নেওয়া হয়।

মানুষ এই শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে আরও কিছু লাভ করতে সমর্থ হয়। শারীরিক যোগ্যতা আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অপনোদনেও যথেষ্ট সহায়তা করে। শারীরিক যোগ্যতা কিছুটা রোগ প্রতিষেধক শক্তিও অর্জন করে। ইহা জীবনকে প্রফুল্লতর করে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানেরও পথ সহজতর করে দেয়।

প্রতিটি লোকের জীবনে শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন হলেও ক্রীড়াবিদের নিকট ইহা কিন্তু অত্যাবশ্যক।

এই জন্যই বিদেশী শিক্ষকেরা সর্বপ্রথম ক্রীড়াবিদের শারীরিক যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখেন। তারপর অন্যান্য গুণ যথা—শক্তি, সামর্থ্য, তৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে নজর দেন।

আমার মনে হয় আমাদের দেশেও এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। শরীরকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হবে, যথা—

(১) পরিকল্পিত ব্যায়াম (Planned Exercise)

শারীরিক যোগ্যতার উন্নতির জন্য ব্যায়াম পরিকল্পনা হবে ক্রমোন্নতির জন্য ক্রমপর্য্যায়ের ব্যায়াম। উন্নতির জন্য বেশী তাড়াহুড়া না করাই ভাল। কারণ এতে শারীরিক নিপীড়ন (strain) হয় এবং শারীরিক নিরসতা (staleness of the body) আসে। শারীরিক যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন পুনঃ পুনঃ হাল্কা ধরণের ব্যায়াম। বেশ কিছুদিন এইরূপ প্রশিক্ষণের পর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভের পর উপরোক্ত পদ্ধতিতে ভার নিয়ে ব্যায়াম করা উচিত।

প্রশিক্ষণের প্রথমদিকে সপ্তাহে কয়েকদিন করে ধীরে ধীরে দৌড় অভ্যাস করা উচিত। যদি শরীর উপযুক্ত সুস্থ না হয় তা হলে পর্য্যায়ক্রমে হাঁটা ও দৌড় অভ্যাস করতে হবে যতদিন পর্য্যন্ত না উক্ত দূরত্ব দৌড়ে শেষ করা যায়।

সপ্তাহে দু'তিনদিন করে একমাইল দৌড় অতি শীঘ্রই শারীরিক যোগ্যতা আনিতে সক্ষম। সপ্তাহে যদি আরও কয়েকদিন বেশী দৌড়ান যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

(২) বিশ্রাম এবং মানসিক শান্তি

শারীরিক উন্নতি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য ক্রীড়াবিদের প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ ঘুম এবং বিশ্রাম। ব্যায়ামকালে শারীরিক কোষসমূহ ভেঙে

যায়। বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রাক্কালে ঐ সকল কোষ পুনরায় তৈয়ারী হয়।

মানসিক চাঞ্চল্য দূর করার জন্যও বিশ্রাম ও ঘুমের কিছুটা প্রয়োজন আছে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ক্রীড়াবিদ্‌কে মানসিক প্রশান্তি অটুট রাখতে বলাটা কি রকম যেন আশ্চর্য্য শোনায়। কিন্তু আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মানসিক অশান্তি শারীরিক অস্বস্তির কারণ হয়ে আমাদের কৃতিত্বের পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। জয়লাভ সুনিশ্চিত এমন বহু ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও শুধুমাত্র মানসিক অশান্তির জন্যই প্রতিযোগীকে অনেক সময় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

(৩) সুস্থ জীবন ধারণ (Healthy Living)

ব্যায়াম এবং প্রশিক্ষণ আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় অপেশাদার প্রতিযোগীরাও ব্যায়াম প্রশিক্ষণকে একঘেয়ে অপরিবর্তনীয় একটি দৈনন্দিন কাজের মতন মনে করেন। এই রকম একঘেয়ে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মাঝে দেশ ভ্রমণ, হাসি-ঠাট্টা এবং ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে ক্রীড়াবিদ্‌কে তাঁর সময় অতিবাহিত করতে হবে শুধুমাত্র মনকে সতেজ, সবল ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য।

(৫০৪ পাতার পরবর্তী অংশ)

শাসকগণও আরই জোর গলায় নিজেদের দমন শক্তির অস্তিত্ব ও দমননীতি প্রয়োগে শাসন পরিচালনার অধিকার সম্বন্ধে প্রচার শুরু করিতে থাকেন। এই সকল পরিণতি রাষ্ট্রক্ষেত্রে কেহ শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না। শাসাইয়া শাসন পরিচালনা চেষ্টা যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক তাহা সংবিধান সংরক্ষক মনোভাব প্রদর্শক নহে। সুসভ্য শাসন পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যেও ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগের স্থান সর্ব্ব উচ্চে থাকিতে পারে না।

ছাপার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

কিছুদিন পূর্বে ছাপার কাগজের মূল্য যাহা ছিল এখন তাহার তুলনায় মূল্য হইয়াছে ৩।৪ গুণ। বিদেশ হইতে কাগজ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইলে বহুক্ষেত্রেই বিদেশী রপ্তানিকারক কাগজ পাঠাইতে অক্ষম জানাইয়া বায়না ফেরত দিয়া দেন। ফলে এদেশে প্রস্তুত কাগজ ব্যতীত অন্য কাগজ পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকার সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রকাশকদিগকে নেকনজরে দেখেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাঁহারা যে কাগজ সরবরাহ সম্বন্ধে খুব উৎকণ্ঠিত এমন মনে করার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না। সকল লক্ষণই প্রকাশকদিগের পক্ষে অশুভ মনে হয়। অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। যেগুলি কোনমতে চলিবে তাহাদেরও বহু লোকসান বরদাস্ত করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সংবাদ পত্রের কর্ম্মীদিগেরও অনেকের অপর পথে চলিতে বাধ্য হইতে হইবে। এক যদি সরকারী ঔদাসিন্য দূর করিয়া ন্যায্য মূল্যে কাগজ আমদানি ব্যবস্থা সম্ভব হয় তাহা হইলেই অবস্থান্তর হইতে পারিবে।

জীবন-রহস্য

নীহারকণা দাস দে

রাস্তার ধারের ন্যাড়া গাছটাকে দেখে
আমার পথের পাশের কঙ্কালসার
ভিখারীটাকে মনে পড়ে যায়।
এই সেদিনও দেখেছি ঐ রিক্ত-পত্র গাছের দেহে
প্রাণের স্পর্শ, সবুজের সমারোহ।
এলো-মেলো দখিন পবন এসে
ওর কচি নবীন পাতায় পাতায়
ক্ষণে ক্ষণে পরশ বুলায়।
ধাড়ী-শালিক থেকে আরম্ভ ক'রে
বাচ্চা চড়ুই-ছানাটা পর্য্যন্ত জানে, চেনে
তাদের এই সুখ-নীড়কে।
বাদলের অঝোর-ধারার মাঝে
সে আশ্রয় দিয়েছে সবারে।
ঝড়ের প্রাবল্যকে সহ্য করেছে মাথা পেতে
হঠাৎ সেদিন পৌষের হিমেল হাওয়া
এসে, ঝরিয়ে দিয়ে গেল
তার প্রবীণ হলুদ-পাতাদের।
আজ এই হাড়-কাঁপানো শীতের দিনে
সঙ্গীবিহীন পত্রহীন গাছটা
একা দাঁড়িয়ে শির-শির ক'রে কাঁপছে।
তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের পানে,
স্মরণ করছে রঙীন-বসন্তকে মনে মনে।
পাঁজরা বার-করা ভিখারীটার দেহ
চিরদিন এমন ছিল না।
দেহে অবয়বে জড়িয়ে ছিল
মেদ, মাংস, পাতলা মসৃণ ত্বক।
যৌবনের কর্ম-বহুল দিনে
ওদের সাহচর্যে সে গড়েছে
একখানি ছোট্ট মধুর বাসা
সেখানে এসেছে প্রিয়া
মুখে মধু নিয়া
এসেছে তনয়-তনয়া
আত্ম পরিজন।
জীবনের ঘাটে ঘাটে
হয়ত তারা নেমে গেছে
অচেনা অজানা বন্ধুর সাথে
তার ডাকে।
আজ জরা তাকে গ্রাস করেছে,
হয়ত একে অকাল-বার্দ্ধক্যও
বলা যেতে পারে।
কর্মক্ষমতাহীন শোভাহীন
রুগ্ন ভিখারীটা, ড্যাব-ড্যাবে চোখ নিয়ে
তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের পানে।
স্মরণ করছে সেই অদেখা অচেনা বন্ধুকে
যে তার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।
বসন্তের আগমনে ঐ শুষ্ক-বৃক্ষের কঙ্কাল বুকে
গজাবে কচি কচি নধর পাতা
আবার সে সাজবে নব সাজে।
কিন্তু ভিখারীটার দেহে মনে প্রাণে
রঙিন বসন্ত আর সাড়া জাগাবে না।
হয়ত জীবনের পরপারে
আবার সে সাজবে নব-সাজে।

———

অনন্য

দিলীপকুমার রায়

কবে শ্যামলকে চাইবি তুই প্রাণ করে পণ,
অমল উষার দিশায় দিয়ে সাড়া নিশায় ?
ছেড়ে ছোট সুখবিলাস তুই কবে রে মন,
শুধু গাঁথবি তাঁর নাম তোর আনন্দের মালায় ?

আমি বুঝি না তোর অবুঝ বাসনা রে মন,
তুই ফোটাবি দুদিনেই সুদূর স্বপন ?
যাকে যোগী তাপস মুনি যুগে যুগে
করে ধ্যান—মিলন চেয়ে তাঁর গহন হিয়ায় !

গেছে স'রে দেখ্ আজ পথের বাধা যত,
বল্ তুই : "আমি হবই তাঁর মনের মত।"
তাঁকে পায় কেবল সে-ই—যে একান্তী হ'য়ে
চায় তাঁর শরণ-দীক্ষা প্রেম-আরাধনায়।

সেই সাধনাই বরণ কর চোখের জলে,
ডাকে তাঁকে : "চরণ রাখো হৃৎকমলে,
আমি নিবেদন করব সব—প্রাণ তনু মন,
তুমি মিটাও সুরের ক্ষুধা বাঁশির সুধায়।

আশা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আশা ভঙ্গ ! আশা কয়া ?
আহা ! আশার কি মোহময় রূপ।
ভোলায় সবার মন। তোমার দুরাশী মন।
আমার হতাশ নিরাশ মন।

আর মন তাকে বলে 'চুপ-চুপ'।
'কাঁদিস তো আশা'! 'মিছে কথা'!
কিন্তু সে বেঁধেছে বাসা—

মানুষের অন্তরের সঙ্গোপন পুরে,
করেছে গভীর ক্ষত যক্ষ্মা ধরা বুকের মতন
—হেসে হেসে কুরে কুরে।
প্রতিদিন করে যায় বুকের পাঁজর।
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে ঝরঝর।
তবু পাশ থেকে উঁকি মারে তার কি মোহন রূপ।
চুপি-চুপি শোনে মন তার বাণী।
আর বলে 'চুপ-চুপ'।

নতুন প্রণয়ী মন

করুণাময় বসু

একদিন এসেছিল বুঝি
নতুন প্রণয়ী মন, সেদিন পেয়েছি খুঁজি
রোদ ধরা গাছে গাছে সোনালি ঝালর,
এক ঝাঁক পাখিদের গানে গানে ভোরের আলোর
ছিল ঢেউ তোলা নদী, ছিল বাঁকা চাঁদ,
ছিল মায়াময় বনরেখা, নব চেতনার স্বাদ।
ছিল দূরে, আরো দূরে ইন্দ্রধনু রেখা,
সেই রঙ চুরি করে মনে মনে ছিল কিছু লেখা।
তখন এসেছ তুমি,
ফুলে ফুলে ভরা ছিল দূর বনভূমি।

তারপর মন চলে গেল,
ঝরা পাতা এলোমেলো
উড়ে গেল কৃষ্ণচূড়া বনে ;
মন নেই, আমি একা গহন নির্জনে।
রোদে আর মায়া নেই, কেঁদে মরে চাঁদ,
তুমি আর তুমি নেই, ভুলেছি আস্বাদ।
অন্ধকারে দুইহাতে ভান করে খোঁজা,
তবু জানি তুমি শুধু বোঝা।
মুছে গেছে, ভুলে গেছি আগের চেহারা,
মনে আর রঙ নেই, নেই কোন সাড়া।
একদিন তাই বসে ভাবি
নতুন প্রণয়ী মন খুঁজে আনে
স্মরণের মায়াময় চাবি ;
যে চাবি হারায়ে গেলে
মুছে যায় রাঙা রাত,
বুজে আসে জীবনের মধুময় ঝাঁপি।

অনন্ত জীবন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রান্তে মোর বসুধার
সমাপ্তি হয় না যেন। স্বার্থপরতার
পাষাণ-কারার মাঝে আমার ভুবন
রেখোনা সীমিত। সে যে জঘন্য মরণ!
অনন্ত জীবন—সে তো সমস্ত সত্তার
অকুণ্ঠ আনন্দঘন অসীম বিস্তার
দিক্ হ'তে দিগন্তরে। মৃত্তিকার তলে
বীজের মহান্ মৃত্যু সোনার ফসলে
বিস্তীর্ণ প্রান্তর পূর্ণ করে অঘ্রাণের!
মরণের গর্ভে উৎস শাশ্বত প্রাণের।
প্রাণের ঐশ্বর্য্যে মোরে দাও অধিকার!
বিচূর্ণ করিয়া দাও 'আমি ও আমার'—
এ অহং-অন্তরেরে। এই পুরাতন
'আমি'রে তোমার কর জন্মের মতন।

কংগ্রেস-স্মৃতি

দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭।

গিরিজামোহন সান্যাল

(১)

কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের অব্যাহিত পরে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহিত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সমুদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছে তারা যেন তাদের অধীনস্থ জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে প্রত্যেক গ্রামে কাজ চালানোর জন্য কংগ্রেস সদস্যদের দেয় চাঁদা ছাড়াও অন্যূন পক্ষে গ্রাম প্রতি ১ টাকা হারে চাঁদা আদায় এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে অথবা গ্রাম সমষ্টিতে একটি করে কংগ্রেস স্থাপনের উদ্দেশে কংগ্রেস কর্মী নিযুক্তের নির্দেশ দেয় এবং তাদের প্রত্যেক গ্রামে কম পক্ষে ১০ জন করে কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের আহ্বান জানায়।

ওয়ার্কিং কমিটি আরও নির্দেশ দিচ্ছে যে অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার এক তৃতীয়াংশ গ্রাম্য কমিটির জন্য, এক তৃতীয়াংশ জেলা কংগ্রেস কমিটির জন্য এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

কমিটী আরও প্রস্তাব করছে যে সংগঠনমূলক কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা হবে এবং কাজ ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে ১৯২৭ সালের প্রারম্ভে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দিনের পর দিন জোরদার হতে লাগল। চার মাসের উপর যে সত্যাগ্রহ চলছিল তার গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। যুক্ত প্রদেশ' বিহার, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রদেশ থেকে বহু কর্মী পটুয়াখালি এসে সত্যাগ্রহের নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন ঢাকা শক্তি মঠের স্বামী জ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন। বারানসী থেকে স্বামী কমল পুরী, ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দ ও মধুসূদন শর্ম্মা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে বরিশালে জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে পৌঁছুলেন। কারামুক্ত সত্যাগ্রহী সারাফৎ আলী সত্যাগ্রহের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বিহারে রওনা হয়ে গেলেন।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে জনসভার অধিবেশণ হয়।

২৮শে জানুয়ারী পটুয়াখালী জেলের অভ্যন্তরে সাধারণ কয়েদীরা সত্যাগ্রহীদের উপর বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ চালায়। এতে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। স্পষ্টতই গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় এই ঘৃণিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই জানুয়ারী মাসেই মহাত্মা গান্ধী শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী, কুমারী মীরা বেন, কুমারী যমুনা বাই, দেবদাস গান্ধী, মহাদেব দেশাই এবং কৃষ্ণদাস সমভিব্যাহারে অভয় আশ্রম পরিদর্শন করতে কুমিল্লায় উপস্থিত হন।

কুমিল্লা যাওয়ার পথে মহাত্মাগান্ধী সদল বলে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ হতে রওনা হয়ে চাঁদপুর পৌছেন। সেখানে তথাকার জন সাধারণ তাঁকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করে।

কুমিল্লা রেল ষ্টেশনে যখন সদলে মহাত্মাজী পৌছান তখন তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য অসংখ্য জনসাধারণের সহিত হরদয়াল নাগ, কামিনী কুমার দত্ত, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র

ঘোষ প্রভৃতি নেতাগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশন থেকে অভয়াশ্রমের দূরত্ব ছিল তিন মাইল। মহাত্মাজী পদব্রজে আশ্রমে যাওয়া পছন্দ করেন।

মহাত্মাজী এই উপলক্ষে দুটি নমঃশূদ্রদের গ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে খদ্দর অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

জানুয়ারী মাসের মাঝা-মাঝি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের ভয়াবহ অবনতির সংবাদে দেশের সর্বত্র উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল।

দুষ্টক্ষতের ন্যায় এই সময় হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

৯ই জানুয়ারী শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের ২৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যখন শিখদের শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন এভিন্যু দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উক্ত শোভাযাত্রার উপর মুসলমানেরা আক্রমণ চালায়। ফলে কয়েকজন হিন্দু ছুরিকাহত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৪ টার সময় বরিশাল ধর্ম রক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে পঞ্চ সহস্রাধিক নাগরিক একটি সরস্বতী মূর্তি বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা করে সহর প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। রাস্তার মোড়ে ২ সহস্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল সহরের অন্যান্য অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শোভাযাত্রা চকবাজারে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি মসজিদ ছিল। এই মসজিদ অতিক্রম করে তার সম্মুখ দিয়ে শোভাযাত্রাকে যেতে হবে। মসজিদের নিকট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও তার সহকারী কর্মচারী এবং বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ অপেক্ষা করছিল।

শোভাযাত্রাকারীদের মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করতে বলা হল। তা পালন করতে অস্বীকার করায় শোভাযাত্রার নেতাদের গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হল এবং সকলকেই ব্যক্তিগত জামিনে খালাস দেওয়া হল। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সরল কুমার দত্ত এম, এল, সি (প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র)। বিখ্যাত নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন ও শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং ঢাকার স্বামী জ্ঞানানন্দ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাদের জন্য এই ব্যবস্থা সেই মুসলমান সম্প্রদায় অকুস্থলে অনুপস্থিত ছিল। সেই সময় যাঁরা মসজিদে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও কেউ কোন প্রকার বাধা দেন নি।

বরিশালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চরমে উঠল যখন ভোলায় ১৭ই মার্চ তারিখে রথ যাত্রা উপলক্ষে দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দুর দোকান লুণ্ঠিত হল।

বরিশালের সরস্বতী মূর্তির শোভাযাত্রা উপলক্ষে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে আনীত মোকর্দমায় সতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের ৬ মাসের বিনা পরিশ্রমে জেল হল।

বরিশাল জেলার পোনাবালিয়া গ্রামে শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল। বিক্ষুব্ধ জনতা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করার ফলে পুলিশের গুলীতে ২০ জন হত এবং প্রায় ৪০ জন আহত হল।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা চলতে লাগল। যে মাসের প্রথম দিকে সুরাটে শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে,—আয়োজিত শোভাযাত্রার উপর বহু সংখ্যক মুসলমান লোষ্ট্র ক্ষেপণ আরম্ভ করার ফলে বহু লোক জখম হয়।

লাহোরে মুসলমানদের দ্বারা একজন শিখ মহিলার অবমাননার ফলে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এই হাঙ্গামায় দুজন মুসলমান হত হয়। এর দরুণ বার জন শিখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

(৩)

এদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের পক্ষদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। ১১ই ও ১২ই মার্চ,—তারিখের অধিবেশনে কমিটীর সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর কার্য্যকরী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা সূচক প্রস্তাব পাশ করা হয়, সুতরাং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির আসনে আসীন হন।

সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতির জন্য

তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে আনয়ন করা হল এবং ১৬ই মে গভর্ণমেন্ট সুভাষচন্দ্রের মুক্তির আদেশ দিলেন।

এই মে মাসেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল প্রসিদ্ধ নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলার মাজুগ্রামে মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া আমতা লাইট রেল যোগে আমরা সম্মিলনে যোগ দিতে যাই। এবার প্রতিনিধি ও দর্শকদের সংখ্যা অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক কম ছিল।

(৪)

হিন্দু মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৫ই মে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে মুসলমানদের প্রস্তাব সম্বন্ধে সাব-কমিটীর রিপোর্ট আলোচনা করে ওয়ার্কিং কমিটী যৌথ ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিলে নির্বাচন ব্যাপারে মুসলমানদের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব পেশ করে।

বোম্বাই প্রদেশ থেকে সিন্ধুকে পৃথক করা প্রস্তাব সম্বন্ধে কমিটী এই অভিমত প্রকাশ করল যে কংগ্রেস সকল সময়ই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের স্বপক্ষে, সুতরাং বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক সিন্ধুপ্রদেশ গঠনে কোন আপত্তি নেই।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন শেষ হয়।

কিছু সময় বিরতির পর সেই দিনই এস্, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয়।

প্রথমেই সভাপতি মশায় মহাত্মা গান্ধী শীঘ্র ব্যাধিমুক্ত হয়ে যাতে ভারতের এবং জগতের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল। অনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে :—

(১) ভবিষ্যতের যে কোন সংবিধানের পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিধান সভাগুলির প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত করা হবে।

(২) দুটি মহান সম্প্রদায়কে বর্তমান বিধান সভাগুলিতে তাদের ন্যায্য স্বার্থ বজায় রাখার পূর্ব প্রতিশ্রুতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যদি কোন সম্প্রদায় চায় তা হলে প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে, যৌথ নির্বাচনের জন্য— সম্প্রদায়গত লোক সংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত করা হবে। প্রকাশ থাকে যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুকূলে এইরূপ সুবিধা দেওয়া হবে যাতে তারা প্রাদেশিক বিধান সভাগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে যে সংখ্যক আসনের অধিকারী তদপেক্ষা বেশী আসন পেতে পারে এবং এ সম্বন্ধে যে অনুপাত স্থির করা হবে তা কেন্দ্রীয় বিধান সভার নির্বাচন ক্ষেত্রেও রাখা হবে।

(৩-ক) অন্যান্য প্রদেশগুলির ন্যায় উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য মুসলমান নেতাদের প্রস্তাব এই কমিটীর মতে সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত।

(৩-খ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠনের প্রস্তাব ইতিপূর্বেই কংগ্রেস সংবিধানে ভাষার ভিত্তিতে, প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয়েছে এবং কমিটী এই মত প্রকাশ করছে যে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হোক।

(৪) ভবিষ্যৎ সংবিধানে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক বিধান সভাগুলির বিশ্বাসের স্বাধীনতায় উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। বিশ্বাসের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং মিলনের স্বাধীনতায় এবং অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ধর্ম-প্রচারে স্বাধীনতা,—

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দীতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

অন্ধ্রের বিশ্বনাথন্ একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে এই কমিটী মুসলমানদের দিল্লী প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে তা পুনরায়—স্বীকার করে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে ভারতের স্বরাজ পরিকল্পনায় উক্ত প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

নিম্বকর মশায় এই সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলে তাঁর পরিধানে খদ্দর না থাকায় তাঁর পক্ষে আলোচনায় যোগদানে আপত্তি উত্থাপন করা হল। নিম্বকর মশায় আপত্তিকারীদের জানালেন যে সভাপতি মশায় তাঁকে আলোচনায় যোগদিতে অনুমতি দিয়েছেন। নিম্বকর মশায় ইংরাজিতে সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এস্. সি. দাস আর একটি সংশোধক প্রস্তাব পেশ করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন সম্বন্ধে কংগ্রেস কোন মত প্রকাশ না করায় এই কমিটীর সে সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকা কর্তব্য।

সংশোধক প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হল।

এস্ সত্যমূর্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জোরালো ভাষায় মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এম, আর, জয়াকর মশায় আর একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তিনি তাঁর প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের কথার পর "অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ বিচার ও অন্যান্য বিষয়ের সংস্কারের প্রবর্তনের কথাগুলি যুক্ত করতে বললেন।

সিন্ধু সম্বন্ধে জয়াকর মশায় তাঁর সংশোধক প্রস্তাবে বললেন যে ভাষার ভিত্তিতে যখন সমগ্র দেশ পুনর্গঠিত হবে সেই সময় সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অংশরূপে সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশ রূপে গঠন করা হোক।

সংশোধন প্রস্তাবটি সমর্থিত হওয়ার পর সভার কার্য্য অপরাহ্ন পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

অপরাহ্নে কমিটীর অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে সভাপতি মশায় সদস্যদের হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন যে সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

বালুসু শাম্বমূর্ত্তি একটি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখতে বলেন।

ডাঃ পট্টভী সীতারামায়া এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সফী দাউদী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মৌলানা সাওকত আলী, মূল প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন।

জিন্না সাহেব একটি টেলিগ্রাম দ্বারা মুসলমানদের দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে অনুরোধ জানালেন।

অনুরূপ অনুরোধ জানিয়ে ডাঃ অ্যানি বেসান্ত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।

আলোচনার পর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর নাগপুর সত্যাগ্রহ, কাউন্সিলের কর্মসূচী প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কমিটীর কার্য্য শেষ হল।

(৫)

ইতিমধ্যে আগামী মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হল।

দেশের অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী আগষ্ট মাসের মধ্যে ডাঃ আনসারীর নাম সভাপতির পদের জন্য সুপারিশ করল কিন্তু ডাঃ আনসারী সভাপতির পদ গ্রহণের পূর্বে এ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশের উপর জোর দিলেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে তিনি কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে মনস্থ করেছেন এবং সভাপতির পদ গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি তা দেশের সামনে উপস্থিত করবেন। তাঁর এই অভিপ্রায় তিনি মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে জানালেন ও এ সম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন।

ডাঃ আনসারীর মত মোটামুটি এইরূপ। যাঁদের

তিনি অহিংস অসহযোগ নীতিতে আহ্বান এবং কাউন্সিল প্রবেশের নীতিতে আহ্বান নয় তথাপি তিনি মনে করেন যদি কংগ্রেস সদস্যগণ, কাউন্সিলে প্রবেশ করেন তা'হলে তাঁদের কাউন্সিলের, কর্মসূচী পুরোপুরি মেনে নিতে হবে এবং তাঁদের মন্ত্রীত্ব এবং অন্যান্য পদ গ্রহণের অনুমতি দিতে হবে অর্থাৎ কংগ্রেসকে কানপুর ও গৌহাটীতে গৃহীত নীতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। সভাপতির পদ গ্রহণ করলে তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এই নীতি গ্রহণের জন্য জোর দেবেন। সুতরাং তিনি মনে করেন যেন তাঁর নির্বাচক মণ্ডলী তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাকেন।

এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা শওকত আলী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শোয়েব কুরেশী, এবং এম্, এ- জিন্নার সহিত আলোচনার জন্য তিনি বোম্বাইতে গেলেন। জিন্না সাহেব ডাঃ আনসারীর মত শুনে অত্যন্ত খুসী হলেন এবং তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ডাঃ আনসারীর মতের সমালোচনা করে মন্তব্য করলেন যে এটা তাঁর নিকট বেদনাদায়ক বিস্ময়ের মত ঠেকছে।

লালা লাজপত রায়ও ডাঃ আনসারীর মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী নাইডু ও মৌলানা শওকত আলী কোন মতামত প্রকাশ করলেন না।

ডাঃ আনসারী কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন না, তিনি জানালেন যে তাঁর মত অনড়।

(৬)

এদিকে বঙ্গীয় বিধান সভায় স্বরাজ্যদল বাংলা—গভর্ণমেন্টকে পর্য্যুদস্ত করতে লাগল। ২৫শে সেপ্টেম্বর —মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ হওয়ায় ফলে মন্ত্রীদ্বয় আবদুল করিম গজনভী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী (গজ-চক্রবর্ত্তী মন্ত্রীত্ব) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এর অব্যবহিত পরেই কুমিল্লায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে গেল। একদল মুসলমান বিনা প্ররোচনায় অভয় আশ্রমে চড়াও হয়ে আশ্রমের কর্মীদের আক্রমণ করল কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে পুলিশ মুসলমানদের কিছু না বলে আশ্রমের কর্মীদের গ্রেপ্তার করল।

অন্যান্য স্থানেও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হতে লাগল।

এই সকল কারণে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে—সিমলায় মহম্মদ আলী জিন্নার সভাপতিত্বে ঐক্য সম্মিলন আহুত হল।

মূল কমিটীর অধিবেশন ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমানদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনার ফলে ১৮ই তারিখে একটি সাব-কমিটী গঠিত হল। তার সদস্য হলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, জয়রামদাস দৌলতরাম, দিল্লীর রায় কেদারনাথ, কানপুরের প্রিন্সিপাল দেওয়ান চাঁদ, সরদার সার্দুল সিং, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু।

১৮ই তারিখ সাব-কমিটির অধিবেশনে গোহত্যা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হল কিন্তু কোন মীমাংসা হল না।

মূল কমিটী মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো সম্বন্ধে আলোচনা করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সাব-কমিটীর উপর ভার দিয়েছিল কিন্তু সে সম্বন্ধেও কোন ঐক্যমত হল না। ফলে সভাপতি মশায় সভার কার্য্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখলেন এবং ঘোষণা করলেন যে যদি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারী, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডঃ কিচলু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, ডাঃ মুঞ্জে, রায় কেদারনাথ, জয়রামদাস দৌলত রাম এবং সরদার উজ্জল সিং ঐক্যমত হয়ে রিকুইজিসন দেন তা হলে তিনি রিকুইজিসন প্রাপ্তির তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐক্য সম্মিলনী আহ্বান করবেন।

সভা মুলতুবি হওয়ার পূর্বে মূল, কমিটী ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার নিন্দা করল।

এর পরেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ কমল না, বরং বেড়েই চলল। ১১ ই অক্টোবর লাহোরে একজন হিন্দু ছুরিকার দ্বারা আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। ঐ তারিখেই সিন্ধু প্রদেশে স্থানীয় জাতীয় আঞ্জুমান একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রচার করল যে জনৈক রাজপাল নামক রাজপুত্র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুৎসা করে একটি রচনা তৈরী করেছে এবং এই হেতু মুসলমানদের উত্তেজিত করতে লাগল। ফলে সিন্ধুতেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে গেল।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে বাংলা দেশের সর্বত্র ডেটিনিউদের মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন সুরু হল। সুভাষচন্দ্র বসু আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯শে অক্টোবর বি, জে, হর্নিম্যান ও আরও ৩০ জন সদস্যের রিকুইজিশন অনুসারে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধান সভায় দ্বৈতশাসন পরিচালনে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্বন্ধে মাদ্রাজ কাউন্সিলের কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্যের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি বিশেষ অধিবেশন কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায়। সদস্যদের মধ্যে যারা এই সভায় যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ আনসারী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, তুলসী চরণ গোস্বামী, টি প্রকাশম্, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সাওকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বি জে হর্নিম্যান ও মৌলানা আক্রাম খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

নিম্বকর মশায় রিকুইজিসনকারীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উপস্থিত করতে উঠলেন। রাজকুমার চক্রবর্তী মশায় বিষয়টি মুলতুবি রাখার জন্য নিম্বকর-মশায়কে অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না।

নিম্বকর মশায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব কমিটীতে উপস্থিত করলেন :—

মাদ্রাজ কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টির আচরণ সম্বন্ধে স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের মতামত অবগত হয়ে এই কমিটী বিশ্বাস করে যে উক্ত পার্টি কংগ্রেসের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য স্বরাজ অর্জন অথবা গৌহাটী কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপন্থী কিছু করে নি কারণ কমিটীর বিচারে সেই সময় ঐ প্রদেশে দ্বৈত শাসন অবসানের কোন সম্ভাবনা ছিল না বরং কংগ্রেস পার্টি অন্য একটি পার্টীর সহযোগিতায় আমলাতন্ত্রের বলবৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছে যে পার্টির উদ্দেশ্য আমলাতন্ত্রের নিকট অনুগ্রহ স্বরূপ চাকুরী, সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়তা দমন, যতটা এ কাজে তারা সাফল্য লাভ করছে তৎজন্য মাদ্রাজে কাউন্সিলের কংগ্রেস পার্টি কংগ্রেস এবং দেশের ধন্যবাদের যোগ্য। এই প্রসঙ্গে এই কমিটি সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করে যে কংগ্রেসী সদস্যগণ কোন মতেই গৌহাটী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এবং সর্বদা দ্বৈত-শাসন ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত সুযোগের অন্বেষণ করবে।

প্রস্তাবটি যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সভায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন এবং ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় তা সমর্থন করলেন।

হার্ণিমান সাহেব উঠে বৈধতার একটি প্রশ্ন তুলে জিজ্ঞাসা করলেন যে প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা না করে কি ভোটে দেওয়া সঙ্গত হবে।

সভাপতি মশায় বললেন যে আরও কিছু সময় আলোচনার জন্য অপেক্ষা করবেন। আর কেউ আলোচনায় যোগ না দেওয়ায় মূল প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন ডাঃ আনসারী

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কমিটি দেশে সম্প্রতি যে সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং খুন জখম হয়েছে তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিন্দা করছে এবং দেশে অহিংস, আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

মৌলানা মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাস গুপ্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন:—

প্রত্যেক ব্যক্তি বা দলের যুক্তি দেখিয়ে বা বুঝিয়ে সুজিয়ে অন্যকে ধর্মান্তরিত করা অথবা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু জোর জবরদস্তি প্রতারণা বা অন্যপ্রকার অন্যায় উপায় দ্বারা অথবা আর্থিক লোভ দেখিয়ে তা করা বা করতে বাধা দেওয়া চলবে না। পিতা মাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা চলবে না। যদি ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায় তা হলে তাকে তার নিজের ধর্ম সম্প্রদায়ের কারও নিকট পৌঁছে দিতে হবে; ধর্মান্তরিতকরণ বা ধর্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যক্তি, স্থান, কাল প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার গোপনীয়তা রাখা চলবে না অথবা ধর্মান্তর বা পুনর্গ্রহণ সাপক্ষে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ বা আন্দোলন করা চলবেনা।

যখনই ধর্মান্তরিত করন অথবা ধর্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যাবে যে এই ব্যাপার গোপনে জোর জবরদস্তি দ্বারা বা অন্যায় উপায়ে করা হয়েছে এবং যখন সংবাদ পাওয়া যাবে যে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তখনই তা তদন্ত করা হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত শালিশী বোর্ড দ্বারা বিবেচিত হবে।

মৌলানা সওকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এম্, আর, জয়াকর মশায় একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন যে কর্মসূচীতে না থাকায় এই রকম গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা অনুচিত।

টি প্রকাশম্ প্রস্তাবটী মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেন এবং জয়রামদাস দৌলতরাম তা সমর্থন করলেন।

তুলসী চরণ গোস্বামী প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে বললেন যে ওয়ার্কিং কমিটীর পূর্ণ দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আছে।

রাজকুমার চক্রবর্ত্তী তুলসী বাবুকে সমর্থন করেন মুলতুবি প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হওয়ার পর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

তার পর সেদিনের মত কমিটির অধিবেশনের সমাপ্তি হ'ল।

পর দিন অধিবেশন আরম্ভ হলে প্রথমেই যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে গোহত্যা এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রতিপক্ষদের ভিন্ন ২ দাবি এবং মতের সুষ্ঠু সমাধান মনে করেও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তদনুসারে কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাবার অধিকার দিচ্ছে এবং এই রূপ প্রচার কার্য্য চালাতে ওয়ার্কিং কমিটীকেও বলছে।

এবং আরও প্রস্তাব করছে যে মাদ্রাজে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভায় এবং কংগ্রেসের অধিবেশনকে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হোক।

যেহেতু ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়ের উপর তাদের ধর্মের দাবিত্ব ও ধর্মমত আরোপ করা বা আরোপ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে অতএব শৃঙ্খলা নীতি বজায় রেখে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ধর্ম মত প্রকাশ ও অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে এই কমিটী গ্যারাণ্টি দিচ্ছে।

যে কোন সময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে,

মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার অধিকার হিন্দুদের থাকবে কিন্তু মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা থামানো বা বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা চলবে না অথবা মসজিদের সম্মুখে গান ও বাজনা এমনভাবে করা চলবে না যাতে মসজিদের উপাসকদের বিরক্তিকর অসম্মান বা বাধা সৃষ্টি হয়।

খাদ্যের জন্য পশু বধ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিউনিসীপাল আইনের সাপক্ষে রাজপথ এবং কোন মন্দির বা উপাসনাগারের সান্নিধ্য ছাড়া এবং হিন্দুদের চোখের আড়ালে যে কোন সহরের এবং গ্রামের যে কোন স্থানে মুসলমানদের গোহত্যা করার অধিকার এই কমিটী দিচ্ছে।

হত্যার জন্য গরুকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া এবং সে সম্বন্ধে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা চলবে না।

গোহত্যা সম্বন্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃঢ়মূল ভাবপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যেন তাঁরা গোহত্যা এমন ভাবে করেন যাতে সংশ্লিষ্ট হিন্দুদের সহরে বা গ্রামে কোন প্রকার উত্তেজনার কারণ না হয়।

যখনই এই প্রস্তাবের যে কোন সর্ত ভঙ্গের অভিযোগ পাওয়া যাবে তা ওয়ার্কিং দ্বারা নিয়োজিত অথবা সাধারণ আইনানুসারে গঠিত শালিসী বোর্ড অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তাদের সে সিদ্ধান্তই হবে চুড়ান্ত।

মৌলানা মহম্মদ আলী মৌলানা আক্রম খাঁ সুভাষ-চন্দ্র বসু এবং রাজকুমার চক্রবর্তী দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পর কমিটির অধিবেশন শেষ হল।

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর এই ঐক্য প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে সভা আহূত হল।

মুসলমান সম্প্রদায়ও এক সভায় সমবেত হয়ে প্রস্তাবটি সমর্থন করল।

ক্রমশঃ

কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

যুগশক্তিতে প্রকাশ

নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর সংগে পাল্লা দিয়া কাগজের দামও বাড়িতেছে, বস্তুতঃ কাগজের মূল্য বৃদ্ধির হার অন্যসমস্ত বস্তুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে গত একমাসের মধ্যে নিউজ প্রিন্ট বা তজ্জাতীয় কাগজের মূল্য শতকরা আশীভাগ বাড়িয়াছে। অন্যান্য ধরণের কাগজের অবস্থাও তথৈবচ।

এই অবস্থায় প্রথমেই বেকায়দায় পড়িয়াছেন ছোট সংবাদপত্রের পরিচালকগণ, যাহারা নিউজপ্রিন্টের কোটা পান না। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাহাদের সংগ্রাম প্রায় এখন শেষ পর্য্যায় পৌঁছিয়াছে। এই সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য দেখিলে মনে হয় যে বোধহয় এই সমস্ত পত্রিকার অবলুপ্তিই সরকারের কাম্য। দ্বিতীয়তঃ বেকায়দায় পড়িবেন ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং পুস্তক প্রকাশক ও ছাপাখানার পরিচালকগণ। অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলেই কাগজের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি অচলাবস্থার সৃষ্টি করিবে। অচিরেই কার্য্যতঃ দেশব্যাপী শিক্ষা-বন্ধ কর্মসূচী চালু হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে।

সরকারী কর্ত্তারা কিন্তু নিশ্চুপ। এই ব্যাপারে তাহাদের কিছু করার আছে বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণ মাঝে মধ্যে উপরের মহলের কিছু কিছু বক্তৃতায় কাগজ সমস্যার উল্লেখ শুনিতে পান বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার তাহাদেরও কাম্য নয়। তাহা না হইলে এই অবস্থা এত অধিক দিন ধরিয়া নিশ্চয়ই চলিতে দেওয়া হইত না।

রামমোহন রায়ের একটি গান

তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ—

মন, এ কি ভ্রান্তি তোমার।

আবাহন, বিসর্জন বল কর কার?

এই গানটি একদা 'একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের' বড় প্রিয় ছিল। সে আজ ১৬০-১৭০ বৎসর পূর্বের কথা। তখনও ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় নাই, নতুবা বলা যাইত, গানটি ব্রাহ্মগণের বড় প্রিয় ছিল। খুব সম্ভবতঃ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের বহুবৎসর অবধিও রামমোহন রচিত ঐ গানটি জনপ্রিয়তা হারায় নাই, যদিও সমসাময়িক সাক্ষ্যের অভাবে সে-কথা জোর দিয়া বলা যাইতেছে না।

১৮১৯ সালের ৯ই মে রবিবার রাধাচরণ মজুমদারের গৃহে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার একটি বৈঠক হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরবর্তী সপ্তাহের সমাচার দর্পণে ও ২৮শে মে ইণ্ডিয়া গেজেটে বাহির হইয়াছিল। Calcutta Monthly Journal-এর ১৮১৯ মে সংখ্যায় ঐ সভার ও উক্ত গানটির বিস্তৃততর আলোচনা প্রচারিত হইয়াছিল।

(২)

জর্নালের সংবাদ-দাতা গানটির রচনা-কাল ও রচয়িতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ঐ গান নিশ্চয়ই ১৮১৯ ৯ই মে'র পূর্ব রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কতকাল পূর্বে? তিনি দেখাইয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীর কবি Sternhold ও Hopkins-এর একটি কবিতার সহিত এই গানের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। জার্নালে উদ্ধৃত কবিতাটি এইরূপ :—

What madness say hath seized your heart !
Whom did you thus 'approach, depart' !

The God who dwelleth throughout space,
To him you say, 'Here take the place
Reflect you not within your breast,
Who He is that you call a guest?
For God who doth the world sustain,
You set a chair : and say 'Remain'!
Amazing this! But more behold!
Such fully as can scarce be told!
Food of all sorts you now spread forth,
As alms to Him who owns the earth!
And loudly ask Him to partake,
Of that which He himself did make!

লেখক এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা বিবেচনা করিয়াছেন :

* ইংরেজী কবিতাটি বাংলা মূলের অনুসরণে রচিত।

** ইংরেজী কবিতা ও বাংলা গান পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে রচিত।

*** রামমোহনের নামে প্রচারিত গানটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা তাহার অনুসরণে লিখিত।

উপরে-বিবেচিত তিনটি ব্যাখ্যার স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিয়া জর্নালের লেখক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় ব্যাখ্যা বর্জনের কারণ হিসাবে তিনি লিখিয়াছেন, ঐ ইংরেজী কবিতা পুস্তকটি তৎকালে এদেশে আদৌ প্রচলিত ছিল না, কাজেই রামমোহন বা অপর কাহারও পক্ষে ইংরেজী মূল ব্যবহারের সম্ভবনা খুবই অল্প। এ যুক্তি দুর্বল। জর্নালের সংবাদদাতা স্বয়ং যখন ইংরেজী কবিতাটি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তখন রামমোহনও তাহা দেখিয়া থাকিতে পারেন। অবশ্য জর্নালের ইংরেজ সংবাদদাতার পক্ষে ইংরেজী পুস্তকটি দেখিবার সুযোগ রামোহনের তুলনায় বেশী ছিল। কিন্তু তৃতীয় ব্যাখ্যাটি বর্জনের পক্ষে আরও কয়েকটি অন্যাধিক গুরুতর যুক্তি বর্তমান।

প্রথমতঃ, রামমোহনের অপরাপর গানের ইঙ্গিত। 'মন, এ কি ভ্রান্তি তোমার' গানটির একমাত্র বক্তব্য,—যিনি সর্ব্বব্যাপী যিনি বিশ্বস্রষ্টা, তাঁহাকে তুমি বসিবার আসন ভোজ্য দ্রব্য ইত্যাদি দিতেছ, এ কেমন কথা। এই বক্তব্য রামমোহনের আরও বহু সংগীতে প্রধান স্থান পাইয়াছে, যথা :

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে
যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা, এ কেমন ?
চন্দ্রসূর্য গ্রহ যত,
যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত করহ যতন।
পশুপক্ষী জলচরে,
যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে করাতে ভোজন।

[৩নং সংগীত]

কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে
সমুখে নাচাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে কে দেখে কোথায়।

[৫নং সংগীত]

অখণ্ড মণ্ডলাকারে
ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তারে কর বিসর্জন।

[১৯ নং সংগীত]

আলোচ্য গানটি রামমোহন কোন ইংরেজী কবিতা দৃষ্টে লিখিয়াছেন, বলার অর্থ—উপরি উদ্ধৃত সব কয়টি গানই ঐ ভাবে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। "মন এ কি ভ্রান্তি তোমার" গানটির 'অসংস্কৃত' পাঠ ১৮১৯ সালের ৯ই মে বৈঠকে গাওয়া হইয়াছিল, তখনও তাহা শেষ রূপ পায় নাই।

দ্বিতীয় লক্ষণীয়, গানটির 'প্রকৃতিগত' সাক্ষ্য। খ্রীষ্টীয় সাধনার সকল অংশই সম্ভবত: ষোল আনা অপৌত্তলিক নয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পৌত্তলিকতার সহিত পরিচয়-বিহীন কেহ (১) For God who the world sustain, you set a chair and say

remain ; (২) Food of all sorts you now spread forth as alms to Him who owns the earth, ইত্যাদি লিখতেন তাবা যায় না।

তৃতীয় লক্ষণীয়, সাধারণতঃ অনুবাদে মূলের তুলনায় বেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'তুমি কেবা ডাক কাকে, না কর বিচার' বাংলা পাঠের এই ৭টি স্থলে ইংরেজীতে Reflect you not within your breast who is that you call a guest এই ১৪টি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি বাংলা 'এ কি চমৎকার' বুঝাইতে ইংরেজীতে পাই Amazing this ! But more behold, such fully as can scarce be told,—তিনটির স্থলে বারটি শব্দ।

জর্নালের সংবাদ-দাতা ভ্রমক্রমে Sternhold—Hopkins এর নাম করিয়াছেন কি না তাহাও বিবেচ্য। তাঁহার উক্তির ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর নহে : তিনি যে 'সংশোধন' ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, কোথাও এরূপ দৃষ্ট নহে। Sternhold—Hopkins-এর জীবনী হইতে জানা যায় তাঁহারা প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় Book of Psalms-এর ইংরেজী অনুবাদক রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অপর কোন কবিতা সংগ্রহ [জর্নালের ভাষায় fugitive pieces] তাঁহারা মিলিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন সাক্ষ্য মিলিতেছে না।

Sternhold—Hopkins-কে লেখক-তালিকা হইতে বাদ দিলে, প্রথম বিকল্পই অধিকতর সম্ভাবনাময় বলিয়া মনে হয়। 'এ কি ভ্রান্তি তোমার' গানটি এক দিকে যেমন বিশেষ ভাবে ভারতীয় পরিবেশের সাক্ষ্য বহন করে, তেমনই অপর দিকে ইহার মূল বক্তব্যের সহিত রামমোহনের চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠতা সুস্পষ্ট। তাঁহার কোন ইংরেজ বন্ধু গানটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া থাকিতে পারেন।

(৩)

গানটির 'জর্নালে'র পাঠ ও রামমোহন-গ্রন্থাবলীর পাঠ সর্বত্র একরূপ নয়। রামমোহন কৃত আদি পাঠ, পরবর্তী সংশোধন সবই আমাদের কাছে মূল্যবান,—এই বিবেচনা হইতে পাঠান্তর-নির্দেশ সহ গানটি দেওয়া যাইতেছে।

জর্নালের পাঠ

[রোমান অক্ষরে মুদ্রিত]

এ কি ভ্রান্তি তোমার ?
আবাহন ! বিসর্জন ! বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে
ইহাগচ্ছ ব'লে তাকে
তুমি কে বা ডাক কাকে
না কর বিচার ?
সে প্রভু জগত ধ'রে,
আসন প্রদান ক'রে,
ইহ তিষ্ঠ ! বল তারে,
এ কি চমৎকার !
এ কি দেখি অসম্ভব।
বিবিধ আহার সব
তারে দাও কোথ রব,
এ বিশ্ব যাহার।

গ্রন্থাবলীর পাঠ

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে
ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কে বা আন কাকে,
এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে
আসন প্রদান করে,
ইহা তিষ্ঠ বল তারে
এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব,
বিবিধ নৈবেদ্য সব
তারে দিয়া কর স্তব,
এ বিশ্ব যাহার। ॥ ৮নং সংগীত ॥

এই গানটির মধ্যে আমরা রামমোহনের একটি রচনা

আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতেছে এই ছবিটি যেন পাই। তাঁহার অপর কোন গানের কবিতার একাধিক পাঠ আমরা দেখি, নাই। (অশোকলাল ঘোষ লিখিত)

চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের একখানি চিঠি

শ্যামাদাস দে দ্বারা অনুবাদিত (প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

আর্য অফিস, পাণ্ডিচেরী

১৮ই নভেম্বর ১৯২২

স্নেহের চিত্ত,

"অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় দু'বছর মনে হয়, আমি কাউকে কোন চিঠি লিখিনি। (শ্রীমতিলালকে লিখিত শেষ চিঠির তারিখ ১১।১১।১৯২০, আর এ চিঠির তারিখ ১৮।১১।১৯২২, প্রায় দু'বছরই। এ থেকে স্বতই অনুমিত হয় যে, সেই চিঠির পর শ্রীঅরবিন্দ বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সাধনার গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। সে কথা লিখছেনও শ্রীদাশকে)।

"আমি আমার সাধনায় এমনই মগ্ন ছিলাম যে, বাহ্যজগতের সঙ্গে কিছুদিন আমার সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গেছিল। এখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছি বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমাকেই প্রথম চিঠি লিখতে ইঙ্গিত করছে আমার। বস্তুত পরিস্থিতির চাপেই দীর্ঘদিন বাদে বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে কলম ধরতে হচ্ছে।

"প্রয়োজনটা হল, এই দীর্ঘ অন্তঃসমাধির পর আমি যে বাইরের কাজটায় প্রথমে হাত লাগাতে যাচ্ছি, সেই প্রসঙ্গে। বারীন (বারীন ঘোষ) বাঙলায় যাচ্ছে, সে এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করবে। কিন্তু সম্ভবত কয়েকটি কথা তোমাকে আমার নিজেরও বলা আবশ্যক। তাই আবশ্যক বোধেই এই চিঠি পাঠাচ্ছি বারীনের মাধ্যমে। ওর সঙ্গে একটা লেটার অব অথরিটিও দিচ্ছি, তা থেকেই বুঝতে পারবে আমার প্রয়োজনের গুরুত্বটা, যে উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। ওর মুখ থেকেই জানতে পারবে সব কথা, তবু বিষয়টাকে বিশদ করতে কিছু লিখেও জানাচ্ছি।

"আমার বর্তমান চিন্তাধারা এবং জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গী তুমি জান বলেই আমার বিশ্বাস। এখানে আসবার পূর্বে আমার প্রত্যয়ের মধ্যে যে কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল (চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী পৌঁছেছিলেন তিনি ১৯২০-এর ৪ঠা এপ্রিল। তারপর একটা যুগ পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা একটা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে) তা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমার বিশ্বাসে আমি আজ দৃঢ়নিশ্চিত যে, মানুষের কর্ম ও জীবনের মূল ভিত্তিই হল আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগবলে একটি নবচেতনার উদ্বোধন। আমি ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে অনুভব করছি যে, মানুষ তার ব্যর্থ বিড়ম্বিত গতানুগতিক জীবন পরিক্রমা থেকে কোন বৃহত্তর জীবনচেতনায় উত্তীর্ণই হতে পারবে না যতক্ষণ না সে এই ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছে। আমি বিশ্বাস করি যে সমগ্র জগতের কল্যাণে এই মহিমময় অধ্যাত্ম বিজয়ই হবে ভারতবর্ষের মিশন। এই যোগের মূল শক্তিটা কোথায়? এর সত্যস্বরূপটা কি? কী করে সেই গুহানিহিত সত্যকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? করা যায় তাকে সুসংহত ও সুপরিচালিত? আমাদের বর্তমান সংস্কারাবৃত মনবুদ্ধি, জীবন ও দেহের সেই মহান রূপান্তর কী করে সম্ভব? এই সমস্যাটারই সমাধান খুঁজছিলাম আমি এতদিন আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে। এখন আমার জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটেছে, রহস্যটা আমার কাছে ধরা পড়েছে, এবং আমি ঠিকটা নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছতে পেরেছি। অবশ্য পূর্ণশক্তি এখনও আমার আয়ত্তে আসেনি, তাই আরও কিছুদিন আমাকে নিভৃত যোগসাধনা করতে হবে। কারণ এই নূতন কর্মশক্তি যতক্ষণ না আমার পূর্ণ আয়ত্তে আসছে ততক্ষণ আমি বাইরের কোন কাজে হাত দেব না। পারকেই ভিত তৈরী না

হওয়া পর্যন্ত আমি কিছু গড়ব না। এ আমার দৃঢ় সংকল্প। তবে প্রস্তুতি-পর্বের একটি কাজে ব্যাপকভাবে হাত লাগাবার জন্যে আমি আগের থেকে অনেক বেশি সামর্থ্য অর্জন করেছি,—সেটি হল অপরকে এই যোগ-সাধনায় দীক্ষা দান এবং তাদের নিজের হাতে গড়ে তোলা। এমনি কিছু তৈরী সহকর্মী না পেলে যে আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী শুরু করাই সম্ভব হবে না। অনেকেই আমার কাছে থেকে এই সাধনা গ্রহণ করতে চাইছে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের আমি কাছে রাখতেও পারব। আরও আছে অধিকতর সংখ্যক যাদের দূর থেকেও শিক্ষাদান করা চলবে। কিন্তু এই যোগশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এখানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাইরে অন্তত দু'একটি শাখা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে বর্তমানে আমার নাগালের মধ্যে যা কিছু সামর্থ্য সঙ্গতি আছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। আমার মনে হয় তোমার ব্যক্তিগত সুপারিশ ও প্রভাব দ্বারা এই অত্যাবশ্যক অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তুমি বারীনকে সাহায্য করতে পারবে। আমার জন্যে এ দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করবে বলে আশা করতে পারি না কি ?

সম্ভাবিত ভুল বোঝা এড়াবার জন্যে আর একটা কথা বলা দরকার। অনেকদিন আগে চন্দননগরের মতিলাল রায়কে আমি একটা নতুন অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার আদর্শ, চিন্তাধারা ও ...র্মনীতির পরিকল্পনা দিয়েছিলাম। আমার অধ্যাত্ম-শক্তির প্রেরণার সহিত তার কর্মশক্তি যুক্ত করে সে তার প্রবর্তক সঙ্ঘের মাধ্যমে সেটা কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করছে। আমার বর্তমান পরিকল্পনাটা সেটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা আমার নিজের কাজ, নিজেকেই করতে হবে। আর কেউ এটা করতে পারবে না আমার হয়ে।

তোমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনে তুমি যে নরমপন্থা—যথার্থ কার্যকর পন্থা—গ্রহণ করতে চাইছ সেটা আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করছি। তবে এত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে পড়ে তুমি শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে; তবু তোমার সাফল্য আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। অবশ্য 'স্বরাজ' সম্বন্ধে তোমার মতাদর্শেই আমি বেশী আগ্রহী, কারণ আমিও যথার্থ ভারতীয় স্বরাজাদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করছি এবং আমি দেখতে চাইছি আমার চিন্তাধারার সঙ্গে তোমার চিন্তাধারা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ইতি—তোমার অরবিন্দ

দেশ-বিদেশের কথা

"শ্রেণী সংগ্রাম" ও "বিপ্লবের ক্রমানুস্মৃতি"র নামে সন্ত্রাস-পূজা

Backgrounder পত্রিকাতে প্রকাশ—

কুখ্যাত "সাংস্কৃতিক বিপ্লব", অসংখ্য সদস্য বিতাড়ন ও মাওবাদী কর্মনীতির বিরোধী সন্দেহে সাধু ব্যক্তিদের নির্যাতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পিকিং-এর কুৎসা প্রচারসহ তাঁদের খামখেয়ালী ও হঠকারী কর্মনীতি সমর্থন করতে গিয়ে চীনা নেতারা যে সব প্রধান রাজনৈতিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল "শ্রমিকশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি", "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থায় বিপ্লব চলতে থাকা", "কমিউনিজমের জয় না হওয়া পর্যন্ত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক—এই দুই পথের মধ্যে সংগ্রাম"। এই যুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর না, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন্‌টা বেশী আছে তা' বলা কঠিন। কেউ মনে করতে পারে যে, মাও সে-তুং ও তাঁর অনুগামীরা কখনও গভীরভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন না করায় তিন গাছের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের অব্যবহিত পরের সময়কার দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ও কমিউনিজমে উত্তরণের যেমনটি সোভিয়েত ইউনিয়নে হচ্ছে—কালের পরিস্থিতির মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য, আর একটা জিনিসও বেশ স্পষ্ট—সমাজতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ ও পিকিং-এর নেতৃচক্রের মধ্যে ক্ষমতার জন্য গোষ্ঠীগত লড়াই এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের (মাও সে-তুং বলেন এ সব দেশে "পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে") বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ আক্রমণ সমর্থনের উদ্দেশ্যে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের কৃত্রিম ব্যবহার।

শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে চীনা নেতাদের সমস্ত যুক্তি তর্কশাস্ত্র ও তথ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা বলেন যে, চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং "সাংস্কৃতিক বিপ্লবে"র মধ্যে দিয়ে চীনে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব আরো শক্তিশালী হয়েছে। তাঁরা বলেন, "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-টাই "সমাজতন্ত্রের অবস্থায় অনুষ্ঠিত ধনিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লব।" আমাদের যদি চীনা নেতাদের বক্তব্য মেনে নিতে হয় তা হলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, হয় চীনে আদপেই কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় নি, কৃষিতে সমবায়, পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের রূপান্তর এবং শোষক শ্রেণীগুলির অবলুপ্তি ঘটে নি, অর্থাৎ চীনে কোন সমাজতন্ত্র নেই, অথবা সমাজতন্ত্রের নীতি বাতিল করে বৃহৎ শক্তিসুলভ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী জন-বিরোধী কর্মনীতি অনুসরণের এবং মাওবাদী কর্মনীতি প্রতিরোধ করছে এমন সব কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে দমনের জন্য সমাজতান্ত্রিক বুলিগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টার সম্মুখীন হ'তে হয়।

আমরা জানি, শোষক শ্রেণীগুলির অবশেষ এখনও চীনে বর্তমান। তবু মাওবাদীরা "পুঁজিবাদী পথ অনুসরণকারী ব্যক্তিদের", "পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সচেষ্ট ব্যক্তিদের" (যার অর্থ হল চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যগণ, প্রবীন বিপ্লবী ও শ্রমিকরা) বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ ঘোষণা করেও শোষকশ্রেণীগুলির অবশেষের গায় কোন মতেই হাত দেয় না। "ব্যক্তিদের" সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্পষ্ট রাখা এই সব কথা,

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর এক হাত নেওয়ার সুবিধাজনক উপায় মাত্র। এই কারণে শুধু দরকার তাদের "শ্রেণীশত্রু" বলে চিহ্নিত করা।

সমাজতন্ত্রের অবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে মাও-বাদীদের নিবিড়ভাবে কাজে লাগানো তাদের কর্মনীতি যে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ও দাবি মেটাতে পারে না, চীনে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর দাবি মেটাতে পারে না এবং তাদের কর্মনীতি সমাজে তীব্র সংঘাত সৃষ্টি করে, জনগণকে বিরোধী করে তোলে ; কেবলমাত্র মরিয়া ও অবিরাম সংগ্রাম, পীড়ন, স্থায়ী বিতাড়ন ব্যবস্থা, সন্ত্রাস ও ভীতিপ্রদর্শনের অবস্থায় এই কর্মনীতি অনুসৃত হতে পারে এই সত্যেরই স্বীকৃতি। "সাংস্কৃতিক বিপ্লবে"র মত আন্দোলন কয়েক বছর অন্তর অন্তর বার বার করা হবে এই মর্মে চৌ এন-লাই ও ওয়াং হুং ওয়েন যে সব বিবৃতি দিয়েছেন স্পষ্টতঃই সেগুলির অর্থ এই রকমই দাঁড়ায়। এটাও লক্ষ্য করার মত যে, মাওবাদীরা এই সব আন্দোলনকে "পার্টির মধ্যে দুই কর্মধারার লড়াই" (মাওবাদী মাওবাদ বিরোধীদের —লেখক)-এর সঙ্গে যুক্ত করে। চৌ এন-লাই'এর মতে এই সংগ্রামের "দশ, বিশ, ত্রিশ বার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।" এ ছাড়া আরও বেশী করে লোক সেখানোর উদ্দেশ্যে এবং এই তত্ত্বের "তাত্ত্বিক নিবিড়ীকরণে"র জন্য ওয়াং হুং ওয়েনের রিপোর্টে মাও সে-তুং কর্তৃক আবিষ্কৃত একটা "শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তব নিয়মে"র উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়েছে। এই নিয়ম নিম্নরূপ :

"স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলার ফলে দেখা দেয় সর্বব্যাপী শৃঙ্খলা। সাত বা আট বছর অন্তর অন্তর এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। সমস্ত আবর্জনা আপনা থেকেই উপরে উঠে আসে। এটা উঠে না এসে পারে না......"

সৈন্যবাহিনী ও পার্টি

চৌ এন-লাই-এর রিপোর্ট এবং নিয়মাবলী পরিবর্তন সংক্রান্ত রিপোর্ট—এই দুই রিপোর্টেই নিম্নলিখিত বিবৃতি আছে : সৈন্যবাহিনী ও হুংউই ও পিং সংগঠনগুলি সহ "সবকিছুকেই পার্টি'ই পরিচালনা করবে।" পার্টি'র ভূমিকাকে জোরদার করার আহ্বান "লিন পিয়াও-এর ব্যাপারে"র অপ্রত্যক্ষ ফল এবং সঙ্গে সঙ্গে "ক্ষমতা রাইফেল থেকে জন্মগ্রহণ করে" অনিবার্য-ভাবেই যার পরিণতি ঘটে "সর্বত্র রাইফেলই রাজত্ব করে" এই তত্ত্বে মাও-এর এই তত্ত্বের দেউলিয়া ও বিপজ্জনক প্রকৃতির স্বীকৃতিও ঘটে।

বর্তমানে মাওবাদীরা প্রথম তত্ত্বটিকে বজায় রাখার এবং দ্বিতীয়টিকে বাতিল করার চেষ্টা করছেন। কার্য-ক্ষেত্রে এটা করা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে। বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না বটে, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক জীবনে তার অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকছে। চীনেরা পার্টি'র নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের প্রায় ৪০ শতাংশ পেশাদার সৈন্য এই তথ্যই এটা প্রমাণ করছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল নিয়মিত অফিসার ও সামরিক পদগুলিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের। পলিট-ব্যুরোর ২৫ জন সদস্য ও বিকল্প সদস্যের মধ্যে ১৮ জন নিয়মিত অফিসার ও সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ; পলিট ব্যুরোর স্থায়ী কমিটির ৯ জনের মধ্যে ৬ জন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ জন সহকারী চেয়ার-ম্যানের মধ্যে ৩ জন। প্রদেশগুলিতেও সামরিক বাহিনীর লোকজনের ঘাঁটি বেশ শক্ত। ২৯টি স্থানীয় পার্টি ও বিপ্লবী কমিটির ২২টিতে সামরিক বাহিনীর লোকেরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসে আছে। পিকিং এদের হিসেবের মধ্যে না ধরে পারবে না।

মাওবাদ—কোথাও যাওয়ার পথ নয়

মোটের উপর, স্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনকার্যের কোন ইতিবাচক কর্ম-সূচী উপস্থাপন করতে পারে নি। দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও তার সম্ভাবনার কোন বাস্তব বিশ্লেষণ কংগ্রেসের দলিলপত্রে নেই। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উল্লেখ করা হয়েছে দৈবক্রমে। তবু, স্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেশের করণীয় কাজগুলি সম্পর্কে একেবারে

ভাসাভাসা ভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করে চৌ এন-লাই দেউলিয়া মাওবাদী মতবাদের সঙ্গে একই রকম ভাসাভাসাভাবে হলেও "পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনাকে জোরদার করার জন্য আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, পার্টি সংগঠনগুলি "অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রশ্নগুলির প্রতি যথাবিহিত মনোযোগ দিক, জনগণের জীবন সম্পর্কে যত্ন নিক এবং কিভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে রূপায়িত ও তার লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করুক।" কিন্তু চীনা নেতারা যদি মাওবাদী কর্মধারা অনুসরণ করতে থাকেন তা হলে এইসব আহ্বান শূন্যে বাধাপথেই ঝুলে থাকবে, কারণ, মাওবাদ জনগণের স্বার্থের কোন ধার ধারে না। মেহনতি জনগণের জীবনযাত্রার নীচু মান বজায় রাখা, যুদ্ধ শিল্প এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও পরমাণু অস্ত্রের বিকাশ ঘটানোর জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার দিকে লক্ষ্য রেখেই মাও সে-তুং এর প্রকৃত কর্মনীতি পরিচালিত হয়।

সাময়িকী

ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন

যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকে প্রকাশ—

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁহার খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের সফরকালে একটি জনসভায় বলিয়াছেন যে সরকার প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব স্বীকার করে এবং তাঁহাদের ধান সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ হইলেই তাহা করা যাইবে। সংগ্রহের ঘোষিত লক্ষ্য তো মাত্র পাঁচ লক্ষ টন। ইহা কি গল্পের "মধুসূদন দাদার ভাণ্ড"এর মতই অক্ষয় যে ইহা দিয়া তিনি বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় মাথা পিছু চাল বাড়াইবেন, কয়েকটি নূতন এলাকা বিধিবদ্ধ রেশনের আওতায় আনিবেন, ঘাটতি এলাকায় সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু রাখিবেন তাহার উপর সমগ্র রাজ্যের জনগণের সারা বৎসর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন? পুরা পাঁচ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করিতে পারিলেও তাহা শুধুমাত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে অর্থাৎ বিধিবদ্ধ রেশনে মাথা পিছু সপ্তাহে সাড়ে সাত শত গ্রাম চাল দিলে ও বর্তমানের সংশোধিত রেশন এলাকায় যে সামান্য পরিমাণ চাল দেওয়া হইতেছে তাহা বজায় রাখিতেই খরচ হইয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত দশহাজার টন চাল কাকুতি মিনতি করিয়া সংগ্রহ করিয়া তিনি বিধিবদ্ধ রেশনে মাথা পিছু আড়াই শ গ্রাম চাল বাড়াইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি—এক তাঁহার প্রতিশ্রুতির স্বপক্ষে জোরদার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সংগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা এবং দুই—রেশনে চালের মূল্য আগামী মাস হইতে বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈয়ার করা। কিন্তু ইহা যে নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকার আগামী বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের চালের কোটা বৃদ্ধি না করিলে (তাহার সম্ভাবনাও খুবই সামান্য) ইহা বজায় রাখা যাইবে না তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা নয়।

তবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়া শুনিয়া এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন কেন? তিনি কি মনে করেন যে মিথ্যা প্রচার চালাইবার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হইবে এবং নিজের গোলার সমগ্র ধান সরকারের হাতে তুলিয়া দিবে? তাহা তো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না কারণ

তাঁহার প্রতিশ্রুতির উপর জনগণের যে কতটুকু আস্থা আছে তাহা এত দিনেও তিনি উপলব্ধি করেন নাই ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। কিছুকাল পূর্বে তিনি পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসিবার পরই সেখানে তাঁহার চিত্র সম্বলিত পোষ্টার পড়িয়াছিল—

"নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি
দিবার কিছুই নাই,
আছে শুধু ফাঁকা বুলি
দিয়ে গেলাম তাই।"

আসলে ব্যারিষ্টার মুখ্যমন্ত্রী এখানেও ব্যারিষ্টারি চালই চালিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সংগ্রহের লক্ষ্য পূর্ণ হইলে......।" এখন সংগ্রহের লক্ষ্য পূর্ণ না হইলে তো তাঁহার কোনই দায় দায়িত্ব থাকিবে না। সংগ্রহের লক্ষ্য যে পূর্ণ হইবে না মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা ভাল করিয়াই জানেন এবং এই ব্যর্থতার জন্য প্রকৃতিকে কতখানি, বামপন্থী বন্ধ ও আন্দোলনকে কতখানি ও মজুতদার ফড়িয়া/মিল মালিকদের কতখানি দোষী সাব্যস্ত করা হইবে তাহার খসড়া তৈয়ার করিতে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অঘ্রাণ মাসের শেষে কিছু বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং পৌষেও হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারী মহল এখন হইতেই খনার বচন আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—'যদি বর্ষে আগনে—রাজা যায় মাগনে।' এরপর হয়তো আওড়াইবে—'যদি বর্ষে পৌষে—কড়ি হয় তুষে।" এম, এল, এরা ইতিমধ্যেই মহাকরণে টেলিগ্রাম ও রেডিওগ্রাম পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ধান বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অতএব সংগ্রহ দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইবে। মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতায় উপস্থিত নাই। মহাকরণে তাঁহার প্রিয় সহচর মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন সাংবাদিকদের বলিয়াছেন—"এই বৃষ্টির ফলে বুকে কাঁপন ধরছে—ধান সব নষ্ট হয়ে গেল' সংগ্রহ হবে না।" কৃষি দপ্তরের জনৈক বিশেষজ্ঞ "অগ্রহায়ণ মাসের শেষে এই সর্বনাশা বৃষ্টি আলু চাষের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে কিন্তু পাকা ধানের ক্ষেত্রে এই বৃষ্টিতে সামান্য ক্ষতি হলেও সেই ক্ষতি ততটা মারাত্মক হইবে না" বলিয়া বিবৃতি দিলেও মন্ত্রীমণ্ডলী এই ব্যাপারে "খনা"কেই সর্বোচ্চ "অথরিটি" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। জয়নাল আবেদিন সাহেবদের বুকে "কাঁপন" ধরিয়াছে ঠিকই তবে তাহা আশঙ্কায় না আশায় কে জানে? বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিলেও কয়েক দিন স্থায়ী হইলে তাঁহারা সংগ্রহের সকল দায় দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া রেশন বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দরজায় লম্বা হইয়া পড়িতে পারেন।

অপরদিকে বিভিন্ন জেলায় পুলিশের সূত্র হইতে অভিযোগ উঠিয়াছে যে এম্, এল্, এরা বিভিন্ন ক্যাকড়া তুলিয়া সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির রূপায়ণে কোন সহযোগিতাই করিতেছে না। বিভিন্ন জেলায় পুলিশ বড় জোতদারদের খামারে গিয়া এখনই ধান আটকাইতে চায়, কিন্তু কংগ্রেসী এম, এল, এরা ধান ধরিবার ব্যাপারটি এড়াইবার জন্য নানারূপ বাহানা করিতেছেন। বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সংবাদে দেখা যায় যে সেখানে এম, এল, এরা পুলিশকে বলিয়াছেন যে আগে লেভির ধান আদায়ের পালা শেষ হউক তাহার পর মজুত উদ্ধার চালান হইবে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কিন্তু ধারণা যে জোতদারদের এত সময় দিলে তাহারা খামার হইতে ধান ঝাড়া মাড়া করিয়া অন্যত্র সরাইয়া দিবে, কারণ লেভির ব্যাপারটির ফয়শালা হইতে এখনও দুই মাস দেরী আছে। অপরদিকে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিযোগ উঠিয়াছে যে কর্ডনের পুলিশদের সহিত ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের গোপন আঁতাত রহিয়াছে। দিনের বেলা যাহারা কর্ডন পাহারা দেয়, রাত্রে তাহারাই বেপারী ও ফড়িয়াদের ধান সমেত সাইকেল গরুর গাড়ী ও লরী পার করিয়া দিতেছে। যুব কংগ্রেস তো ইতিমধ্যেই খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবকংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বলিয়াছেন যে সরকার তাঁহাদের সহিত ধান সংগ্রহের ব্যাপারে কোনরূপ আলোচনাই করিতেছে

না এবং তাঁহাদের নিকট কিরূপ সাহায্য চায় বা কি তাঁহাদের করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই জানাইতেছে না। অবশ্য সরকারের পক্ষেও তাঁহাদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা মুস্কিল, কারণ উদ্বৃত্ত জেলাগুলির অধিকাংশ এম, এল এ-ই প্রিয় সুব্রত গোষ্ঠী বিরোধী। এই অবস্থায় সেখানে যুবকংগ্রেসের কর্মীদের আমদানী করিলে গোষ্ঠী সংঘর্ষেরও এক গোষ্ঠীর দ্বারা অপর গোষ্ঠীর গলদ প্রকাশ করিয়া দিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। পুলিশের সহিত কংগ্রেস কর্মী ও এম, এল, এ-দের সম্পর্কেও এই ব্যাপারে যেরূপ তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে "রস মরিয়া গেলে" অর্থাৎ জোতদারদের একটা হিল্লা এবং মজুতদার ও মিল মালিকদের সংগ্রহ মোটামুটি সম্পূর্ণ হইলেই তাঁহারাও সংগ্রহের ব্যাপার হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন বলিয়া মনে হইতেছে।

গত বৎসর এই সময় অর্থাৎ নতুন ধান চাল বাজারে আসিবার সময় পল্লীঅঞ্চলের চালের দাম ছিল কেজি পিছু ১ টাকা ৬২ পঃ হইতে ১ টাকা ৪৪ পয়সার মধ্যে। এবার তাহা দাঁড়াইয়াছে ২টাকা ৬১ পয়সা হইতে ২ টাকা ৩৮ পয়সা। অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য পণ্যের মূল্যও গত বছরের তুলনায় এই বছর বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে জোর জুলুম ও জবরদস্তি ব্যতীত ৭৩ টাকা কুইণ্টাল দরে ধান কেনা সম্ভব নয়। এই জোর চালাইতে হইলে সকল শ্রেণীর সরকারী সংগ্রাহকদের মধ্যে ঐক্য ও তাঁহাদের চরিত্রে সাধুতা ও আন্তরিকতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহার একটিরও বর্তমানে অস্তিত্ব নাই। ধান কিনিতেছে সরকার ৭৩ টাকা কুইণ্টাল দরে, মিল মালিকেরা ও মজুতদাররা না হয় এক টাকা পর্য্যন্ত দাম দিতেছে। দেড় কুইণ্টাল ধানে এক কুইণ্টাল চাল হয় এবং তৈয়ারির খরচ পড়ে কুইণ্টাল পিছু সাড়ে পনের টাকা। সেই হিসাবে চালের বর্তমান বাজার দর যথেষ্ট মুনাফা সমেত এক টাকা আশী পয়সার কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিল। অথচ উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ব্যক্তিদের এখনই ২ টাকা ৬১—২টাকা ৩৮ পয়সা দরে ঐ চাল কিনিতে হইতেছে। সরকার এব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়, কারণ পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করিলে অথবা চালের সর্বোচ্চবিক্রয় মূল্য ধার্য্য করিলে সমস্ত চালই মাটির তলায় চলিয়া গিয়া সঙ্কটকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে। এখনই যখন এই অবস্থা, তখন দুই তিন মাস পরে যখন চাষীর ঘরের ধান ফুরাইয়া আসিবে তখন অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বা তাঁহার পারিষদবর্গের ইহা জানা নাই, তাঁহাদের এত নির্বোধ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। তথাপি তাঁহারা "একটি মানুষকেও অন্নাভাবে মরিতে দেওয়া হইবে না। সমগ্র রাজ্যের জনগণকে বিধিবদ্ধ রেশনের আওতায় আনা হইবে" প্রভৃতি লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়াছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলে জনগণ যতই বিক্ষুব্ধ হোক না কেন তাহারা সরকারকে শুধুমাত্র গালি দিতেই পারে, তাঁহাকে অপসারিত করিবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠিলে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে লাঠি ও গুলীর সাহায্যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে হইলেও জনমতের কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। শাসন ক্ষমতায় আসীন দলের পরিবর্তন শুধু ঘটিতে পারে নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু সেখানেও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কোন বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলগত নির্বাচনে যে অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে নির্বাচনে প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং আগামী নির্বাচনেও যে তাঁহারা ঐ কৌশল প্রয়োগ করিয়া অনায়াসে জয়ী হইতে পারিবেন, কংগ্রেস নেতাদের মনে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি নিতান্ত অঘটনই ঘটে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? গণতন্ত্র এমনই মজার জিনিস যে দেশের যতদূর সর্বনাশই কেহ নিজের দুর্বুদ্ধির জন্যই হোক বা স্বার্থসিদ্ধি জন্যই হোক করুন না কেন, ব্যক্তিগতভাবে কেহই তাহার জন্য দায়ী হইবে না। দেশকে শ্মশানে পরিণত করিলেও

পদত্যাগ করিয়াই তাঁহারা সম্পূর্ণ রেহাই পাইয়া যাইবেন।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আশঙ্কার কারণ দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দলের মধ্যে গোষ্ঠী লড়াই বহুদিন হইতেই ছিল। কিন্তু এতদিন তাহা সংগঠনের নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এখন ছাত্রফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট প্রভৃতি সর্বত্রই তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রবীণ পরিপক্কবুদ্ধি অভিজ্ঞ নেতারা দক্ষতার লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও সঙ্কট আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিলে নিজেদের সংযত করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভাবাবেগে যারা পরিচালিত তরুণ সম্প্রদায় বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তাই তাহাদের মধ্যে গোষ্ঠী কলহের ফলে যে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তীব্রভাবেই আক্রমণ করিবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও কাহারও রেহাই পাইবার উপায় থাকিবে না। এই আতঙ্কেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর বর্তমানে আতঙ্কিত হইয়াছেন। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে এই গোষ্ঠী কলহ তীব্রতর করিয়া তুলিবার জন্য তিনি নিজের গরজে একদিন ইহাকে মদৎ দিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধার্থ শঙ্করের কোন সাংগঠনিক ক্ষমতা নাই, তাই তাঁহার নিজস্ব কোন দল নাই, রাজনীতি বা রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই, স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি কোন দিনই কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহা ছাড়াও সমাজ উন্নয়নে বা শিক্ষা ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন জনকল্যাণের ক্ষেত্রেও তাঁহার কোনই অবদান নাই। তাই একমাত্র মাতামোহের নাতি' ব্যতীত জনসমাজে তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে কোনই প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদাই নাই। শুধুমাত্র অভিজ্ঞ প্রবীণ নেতাদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার সুযোগেই দৈবক্রমে তিনি উচ্চ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সুকৌশলে ঐ বিরোধের আগুনে হাওয়া দিয়া ইহাকে তীব্রতর করিয়া নিজ নেতৃত্ব বজায় রাখিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম দিকেই দৈবগতিকে তিনি কম্যুনিষ্ট দলের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন। ঐ সময় কম্যুনিষ্টদের দলীয় বাহিনীর শক্তি ও কার্য্যকারীতা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই কারণেই দলীয় নেতৃত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য দলীয় বাহিনী গঠনের কার্য্যে সবিশেষ মনযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টরা তরুণদের লইয়া দলীয় বাহিনী গঠন করিলেও তাহাদের কোন পৃথক সংগঠন গঠন করিতে বা তাহাদের নিজস্ব কোণ নেতা সৃষ্টি করিতে দেয় নাই। সিদ্ধার্থ রায়ের নিজের সাংগঠনি কোন ক্ষমতা না থাকায় তিনি এই বাহিনী গঠন ও পরিচালনার জন্য নেতা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবের জন্য তিনি প্রবীণ নেতাদের "জব্দ" রাখিবার উদ্দেশ্যে তরুণদের মধ্য হইতেই নতুন নতুন নেতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি না থাকিলে ও কুবুদ্ধি থাকিতে আপত্তি নাই। একজন তরুণকে সর্বোচ্চ নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করাকে তিনি নিরাপদ বলিয়া মনে করেন নাই। কয়েকজনকে নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাঁহাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্জীবিত করিয়া তিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্বপদে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বর্লিনে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন তাঁহার "ফেইলিওর অফ এ মিশন" গ্রন্থে হিটলার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন —"বিভেদ ঘটাইয়া শাসন ক্ষমতার অবিচলিত থাকাই ছিল তাঁহার নীতি। হিটলার সর্বদাই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ও তাহার অনুগামীদের আত্মকলহের একমাত্র মীমাংসাকারক হইয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে কোন সময় এক ব্যক্তিকে অপরের অথবা এক গোষ্ঠীতে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়া দিতে পারিতেন এবং এইভাবে সকলের উপরই প্রভুত্ব করিতেন।"

সুকুমার মতি তরুণদের সরল মনে তিনি লোভের আগুন প্রজ্জলিত করিয়াছেন। তাহাদের ক্ষমতার স্বাদ দিয়া তাহাদের নররক্তের স্বাদ প্রাপ্ত শার্দুলের মত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের অন্তরের আদর্শ-বাদকে চূর্ণ করিয়া সেখানে ক্ষমতাবাদের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। বামপন্থীদের গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও হিংসার রাজনীতির অবসান ঘটাইবার জন্য যে আদর্শবাদী তরুণরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের অন্তরে ক্ষমতার লড়াইয়ের বীজ বপন করিয়া ঐ বাম-পন্থীদের অপেক্ষাও অধিকতর নির্মম ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে তিনি তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাই ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইনের মতই তিনি মানব সৃষ্টি করিতে গিয়া দানব সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ দানব পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বামপন্থীদের উচ্ছেদ করিবার জন্য পরের পর অমানুষিক হিংসাত্মক কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহারা জিঘাংসায় এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে আজ তাহার নিজের সৃষ্টি কর্তাকেও ধ্বংস করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিপন্ন সিদ্ধার্থ শঙ্কর তাই আজ আত্মরক্ষার জন্য প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহাদের শিবিরে আসিয়া এই দানবকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। কিন্তু তিনি সত সত্যই রক্ষা পাইবেন কিনা একমাত্র ভবিষ্যতই তাহা বলিতে পারে।
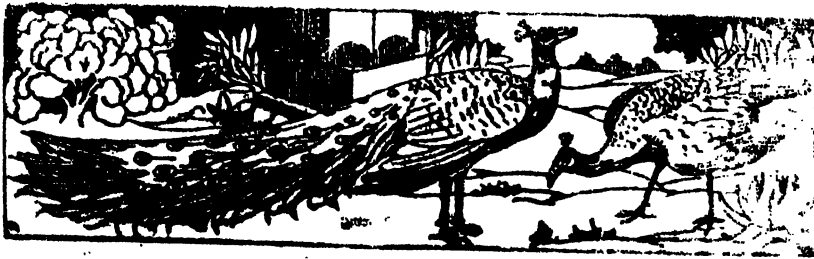
ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তমভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৮০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা

যাহাদের অনেক টাকা আছে বলিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের দুই এক জন রাজার নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইত কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় কোনও ভারতবাসীর টাকা আছে বলিয়া শুনা যায় না। তথাকথিত একাধিপত্যালব্ধ ঐশ্বর্য্যের কথাই বলা যায় কিন্তু তাহা যে কাহার আছে, কতটা আছে, তাহা কেহই পরিষ্কার বলিতে পারেনা। ইহার কারণ, ভারতবর্ষের মানুষ অতি দরিদ্র বলিয়া যাহার নিকট এক লক্ষ টাকা আছে তাহাকেই সকলে অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৫০০০ ডলার অথবা ৫৫০০ পাউণ্ডকে পশ্চিমদেশীয় জনসাধারণ (ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী) অতি সাধারণ সম্পদ বলিয়াই মনে করে। আমেরিকাতে শুনা যায় ১০০০০০ ব্যক্তির ১০০০০০০ ডলার অথবা ৭৫ লক্ষ টাকার অধিক অর্থসম্পদ আছে। অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই কোটিপতি; আমাদের দেশে কোটিপতি কয়জন আছে তাহা হয়ত হাতে গোনা যায়। শতকোটি টাকা অর্থাৎ সাড়েপাঁচ কোটি পাউণ্ড বা ১২ কোটি ডলার ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। রাজা মহারাজাদিগের আমলে শুনা যায় ইন্দোরের হোলকার যশবন্ত রাও-এর বার্ষিক আয় ছিল সাত কোটি ডলার অথবা পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক। সাউদি আরবের রাজার বার্ষিক আয় ঐ

প্রকাবই হইবে। হায়দ্রাবাদের নিজামের বৈভব মাপা সহজ ছিলনা, তবে তাহা ২৫০ শত কোটি ডলার অথবা প্রায় ২০০০ কোটি টাকা প্রমাণ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। নিজামের বার্ষিক আয় সাউদি আরব অথবা হোলকারের তুলনায় অধিক ছিল বলিয়া ধার্য্য হয়। কুবায়েটের আমীর বৎসরে ৬৮ কোটি ডলার অথবা ২৮৫ কোটি টাকা পাইয়া থাকেন কথিত হয়। আমেরিকায় বর্ত্তমানে পাঁচজন ধনী আছেন যাহাদের সম্পদ ১৩০।১৫০ বা ততোধিক শত কোটি ডলার। কাছাকাছি ১০০০ কোটি টাকা বলিলেই চলে। আমেরিকায় চলচ্চিত্র অভিনয় কার্য্যে বহু উপার্জ্জন হইয়া থাকে এবং সেই উপার্জ্জনের তুলনায় ভারতবর্ষের অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের উপার্জ্জন তেমন কিছু হয় না। আমেরিকান বালিকা অভিনেত্রী শার্লী টেম্‌পল্ দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আমেরিকার কোন কোন পরিবারের সম্পদ এত অধিক যে তাহার সহিত তুলনায় ভারতের মহাধনী পরিবারগুলির ঐশ্বর্য্য অল্প মনে হইবে। মেলন নামক পরিবারের তিন ব্যক্তির মধ্যে দুই জনের ৫০ কোটি ডলার (৩৭৫ কোটি টাকা) ও একজনের ১০০ কোটি ডলার (৭৫০ কোটি টাকা) থাকা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিলনা। অনেকের মতে ঐ পরিবারের অর্থ সম্পদ মোটেমাটে ৩০০ শত কোটির অধিক (ডলার) অর্থাৎ ২২৫০ কোটি টাকা।

শুধু আমেরিকার কথা বলিলেই হয়না। জাপানে একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তাহার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষকে বাৎসরিক দেড় কোটি ডলার বা দশ কোটির অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম করিয়াছিল। আমেরিকায় জেনারেল মোটরস ও জেনারেল ইলেকট্রিক-এর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ জাপানের ঐ ব্যক্তির সমান সমান বা অধিক উপায় করিয়াছেন। অন্যায়ভাবে যাহারা অর্থোপার্জ্জন করে তাহাদের মধ্যে আমেরিকার আল কাপোনে ১৯২৭ খৃঃ অব্দে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বা ৭৫ কোটির অধিক টাকা ব্যক্তিগতভাবে উপার্জ্জন করে। হেনরি ফোর্ড যে সময় যথেষ্ট উপায় করিতেন তখন তাঁহার আয় ছিল বাৎসরিক ৭ কোটি ডলার বা ৫০ কোটির অধিক টাকা।

দানের কথা আলোচনা করিলে সর্ব্বাগ্রে বলা উচিত জন ডি রকেফেলারের কথা—এই মহানুভব ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় ৭৫ কোটি ডলার বা ৫৬২ কোটি টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যাঁহারা দানের জন্য প্রসিদ্ধ তাঁহারা রকেফেলারের মত দান করিতে সক্ষম হন নাই প্রধানতঃ ঐরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিতেন না বলিয়া। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১৯৫৫ খৃঃ অব্দে ৪১৫৭টি শিক্ষা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চাশ কোটি ডলার দান করেন।

এই সকল ঐশ্বর্য্যশালী দেশগুলিতে কোন কোন ধনী পরিবারের মহিলাগণ বৎসরে পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ টাকা বসনভূষনে ব্যয় করিয়া থাকেন। একজনের ২৫০ জোড়া জুতা ছিল বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার দস্তানা ছিল ২২৫ জোড়া। কানের দুল ৪৫ জোড়া ছিল এবং বল-নাচের গাউন ২৮টি। এ সব অবশ্য ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন করা হইত।

যদি কেহ চেষ্টা করিয়া হিসাব করেন যে ইয়োরোপ আমেরিকার ধনী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক বাসগৃহ, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি রাখার অভ্যাস কি প্রকার আছে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অনেকেরই বহুস্থলে বাসগৃহ আছে ও অনেকেই নিজের সুবিধার জন্য জাহাজ, বিমান প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত ঘোড়া কুকুর, নানা প্রকার পশুপক্ষী প্রভৃতি রাখিয়াও বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়া থাকে। পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলাজাত বস্তু প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়া অনেকে বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই সকল দেশে যাঁহাদিগের অবস্থা সেইরূপ সচ্ছল নহে বা যাঁহারা কোন কারণে অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন তাঁহাদিগকে সামাজিকভাবে সাহায্য দান ব্যবস্থা অতি উত্তমরূপেই করা হইয়া থাকে। যথা কোন কর্ম্মী বেকার হইয়া পড়িলে, অথবা উপার্জ্জকের মৃত্যু ঘটিলে, কিম্বা কাহারও ছোট জখমের

ফলে কর্মক্ষমতার হানী হইলে সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে অভাবের হাত হইতে রক্ষা করিবার আয়োজন পূর্ণরূপেই করা আছে। বার্দ্ধক্যে, বৈধব্যে, অনাথ, অসহায়, আতুর ও অন্যপ্রকার দুরবস্থায় সমাজ সর্বদাই আগাইয়া আসিয়া ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং কাহার অনেক ঐশ্বর্য্য আছে, কে অধিক উপার্জ্জন করে বা বিলাসে অর্থব্যয় করে তাহা লইয়া জনসাধারণ মাথা ঘামাইতে কোনও ব্যস্ততা দেখায় না। কর্মীদিগের রোজগার ইয়োরোপ আমেরিকায় যথেষ্ট হয় এবং সমাজ সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ দিবার জন্য বহু ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহাকে বিলাসিতা অথবা লোক-দেখান অপব্যয়বহুল ধরনধারণ বলা হয়, অন্য দেশে তাহা সাধারণ জীবনযাত্রা পদ্ধতির অঙ্গ বলিয়াই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এদেশে গ্রাম্য লোকে পায়ে জুতা পরা অথবা গায়ে জামা দেওয়া অনাবশ্যক বিলাসিতা বলিয়া মনে করিত। এখনও বহুস্থলে একটি ক্ষুদ্রকক্ষে পরিবারের সকল লোকের বাস, সরল ও সহজ জীবনযাত্রার পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হয়। দুইটি ঘর পাইলে অন্য কাহাকেও একটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শুধু জলে ভাত বা ডাল রুটি খাইয়া থাকা বহু অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব অথবা ছানা অনেকেই খায়না। চিনি খাওয়া, সাবান ব্যবহার, গৃহে বসিবার আসবাব থাকা প্রভৃতি অনেক কিছুরই গরীব দেশে প্রচলন নাই। জীবন ধারণ করার জন্য কোন জিনিস অত্যাবশ্যকীয় এবং কোনটি অকারণ বিলাসিতা ইহার বিচার স্থিরভাবে এখনও কেহ করিতে পারে না।

যখন মরণের পথ প্রশস্ত ছিল

ইয়োরোপ যখন শিক্ষা, দ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক জীবন নির্ব্বাহ রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল তখন "কালো মড়ক" বা ব্ল্যাক ডেথের ফলে ইয়োরোপে কয়েক বৎসরে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। ইহা ঘটিয়াছিল ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে। ইহার পরে ইয়োরোপে ঐরূপভাবে কোন রোগ হইয়া অতলোক আর মারা যায় নাই। কিন্তু ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া দুই তিন কোটি লোক মারা যায়। যুদ্ধে ইয়োরোপে বহু লক্ষ মানুষের মৃত্যু হইয়াছে এবং রুশিয়াতে বিপ্লবের পরে কয়েক কোটি মানুষ অন্নাভাবে ও গোলাগুলীতে মারা গিয়াছে বলিয়া সকলে মনে করেন। দরিদ্র দেশের মধ্যে ভারতবর্ষে প্লেগ ও ম্যালেরিয়াতে কত লোক মারা গিয়াছে তাহার কোনও হিসাব করা সম্ভব নহে। তবে প্রতি বৎসরই বহুলক্ষ মানুষ ঐ দুই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে নিঃসন্দেহ। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে উত্তর চীনে এক কোটির অধিক মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। ভারতবর্ষে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষে কয়েক কোটি নরনারীর অনাহারে মৃত্যু হয়। ১৯৩১ খৃঃ অব্দে হয়াঙ্গ হো নদীর বন্যায় চীন দেশে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে শেনসি প্রদেশ চীনে দশ লক্ষ মানুষের ভূমিকম্পে প্রাণ যায়। হিরোসিমাতে অ্যাটম বোমা ফেলিয়া আমেরিকানরা লক্ষাধিক জাপানী নরনারী, বালক-বালিকা ও শিশুকে হত্যা করে। আমেরিকানরা অবশ্য রাজপথে মোটরগাড়ী চালাইয়াই ১৯৬৯ খৃঃ অব্দে ৫৬০০০ ব্যক্তি মৃত্যুর কারণ ঘটায়। ১৯৬৮ খৃঃ অব্দে আমেরিকায় চুয়াল্লিশ লক্ষ লোক রাজপথে চলিবার সময় মোটরগাড়ী সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় আহত হ'ন। সুতরাং দারিদ্র্যে যেমন রোগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মৃত্যু ডাকিয়া আনে, ঐশ্বর্য্যের পরিবেশেও তেমনি মরণের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

সুড়ঙ্গ রেলপথ

সর্ব্বদীর্ঘ ও সর্ব্বপুরাতন সুড়ঙ্গ রেলপথ হইল লণ্ডনের। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত ঐ রেলপথ এখন ২৫৭ মাইল দীর্ঘ এবং উহাতে ২৭৮টি ওঠা নামার ষ্টেশন আছে। এই রেলপথে ২০০০০ মানুষ কাজ করে। লণ্ডনের সুড়ঙ্গ রেলপথ কোথাও কোথাও মাটির উপর দিয়াও চলে। ইহার প্রায় একশত মাইল পথ একেবারেই গভীরভাবে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের ভিতরে স্থাপিত।

কিছু কিছু পথ মাটি কাটিয়া খাদ বানাইয়া তাহার মধ্যে রেল বসাইয়া উপরে ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া সুড়ঙ্গেরই মত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। লণ্ডনের এই ২৫৭ মাইল সুড়ঙ্গ রেলপথে ১৯১১ খৃঃ অব্দে ৬৫ কোটির অধিক যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিলেন। একদিনে কুড়ি লক্ষের উপর যাত্রী এই রেলপথ ব্যবহার করিয়াছেন দেখা গিয়াছে। হ্যামষ্টেডের নিকটে এই সুড়ঙ্গ রেলপথ ১৯২ ফুট নীচু দিয়া গিয়াছে।

প্যারীসের মেট্রো রেলপথ অনেক স্থলে সুড়ঙ্গের ভিতরে বসান আছে এবং অনেক স্থলে মাটির উপরেও আছে। মেট্রোর ষ্টেশন সংখ্যা ২৭০। নিউ ইয়র্কের মাটির নীচের রেলপথ ২৩৭ মাইল দীর্ঘ ও তাহার ষ্টেশন সংখ্যা ৪৭৫। ১৯৭১ খৃঃ অব্দে এই রেলপথে যাত্রী পারাপার হইয়াছিল ২০৮১,৮১০,৪৬৪ জন।

কলিকাতায় যে সুড়ঙ্গ রেলপথ বসান হইতেছে তাহার দৈর্ঘ্য এখন অবধি ২০ মাইলের অধিক হইবে বলিয়া মনে হইতেছেনা। যে পথ ধরিয়া ঐ রেলপথ আসিবে সেই দিকটা বিশেষ জনবহুল নহে। সুতরাং ঐ পথে অনেক যাত্রী যাতায়াতের সম্ভাবনা থাকিবে এরূপ আশা করা যায়না। এই রেলপথ যদি চন্দননগর হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অনুসরণ করিয়া হাওড়া বড়-বাজার, চীনা বাজার হইয়া চৌরঙ্গীতে আসিত, তাহা হইলে ইহার দৈর্ঘ্য হইত ২৫-৩০ মাইল ও ইহার যাত্রী সংখ্যাও হইত দ্বিগুণ চতুর্গুণ। কিন্তু পরিকল্পনা যাঁহাদের তাঁহারা বিষয়টা যথাযথভাবে বিচার করেন নাই। সুড়ঙ্গ রেলপথ হইলেই হইল, যাত্রী কম-বেশী হওয়া না হওয়া অপর প্রসঙ্গ। আর একটা কথা এই যে সুড়ঙ্গ রেলপথ না হইলেও কোন ক্ষতি হইতনা, কারণ রাস্তায় গাড়ী চলিবার স্থানাভাব এখনও কলিকাতায় হয় নাই। বাস যদি পাঁচগুণও হয় তাহা হইলেও তাহার স্থানের অকুলান হইবে না।

আণবিক ও পরমাণবিক বোমার কথা

আণবিক বোমা বা "অ্যাটম্ বম্" প্রথমে ব্যবহার করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপান আক্রমণ কালে ১৯৪৫ খৃঃ অব্দে। এই সময় দুইটি আণবিক বোমা ফেলা হয় জাপানের দুইটি সহরের উপরে। হিরোশিমা সহরের উপর যে বোমাটি ফেলা হইয়াছিল তাহা দৈর্ঘ্যে দশ ফুট ছিল ও ওজন ছিল তার ৯০০০ হাজার পাউণ্ড। এই বোমার বিস্ফোরণ-এর শক্তি ২০০০০ টন টি, এন, টি, বিস্ফোরক ফাটাইবার সমান ছিল (কুড়ি কিলোটন)। ঐ বোমা ফেলাতে হিরোশিমায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় এবং সহর ধ্বংস কার্য্যও হয় প্রচণ্ড ও সর্ব্বনাশা। এই আণবিক অস্ত্র পরে ক্রমে ক্রমে আরও অসম্ভব শক্তিশালী হইয়া ওঠে এবং সোভিয়েট সামরিক পরীক্ষাতে ১৯৬১ খৃঃ অব্দে নোভায়া জেমলিয়াতে যে পারমাণবিক বোমা ফাটাইয়া দেখা হয় তাহার বিস্ফোরকশক্তি ছিল ৫৭ মেগাটন অথবা ৫৭০০০০০০ টন টি, এন, টি, বিস্ফোরণের সমান। এই বিস্ফোরণের ধাক্কা ৩৬ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছিল ও সেই ধাক্কা তৎপরে আরো দুই বার পৃথিবী ঘুরিয়া অনুভূত হয়। পূর্ব্ব বার্লিনে ঐ জাতীয় একটি বোমা রক্ষিত আছে যাহা ১০০ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন ও যাহা ফাটাইলে ১৯ মাইল ব্যাসের একটা বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হইবে। ঐ বোমার তেজে ৪০ মাইল দূরেও সর্ব্বত্র আগুন লাগিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে রুশিয়ার ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ১৫০০।২০০০টি আণবিক বোমা আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞনে অনুমান করেন। এই সকল বোমা নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থাও আছে উভয় রাষ্ট্রের এবং নিক্ষিপ্ত বোমাকে মধ্যপথে ফাটাইয়া দিবার আয়োজনও বিশেষভাবে করা আছে। পারমাণবিক বোমার চূড়ান্ত পরিকল্পনা যাহা আছে তাহা হইল একটি ৫০০০০ মেগা-টনের কোয়াল্ট সণ্ট বোমা যাহা ফাটাইলে সমগ্র মনুষ্য-জাতি জ্বলিয়া, পুড়িয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শুধু তাহারাই বাঁচিবে যাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীর গহ্বরে পাঁচ বৎসর কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতে পারিবে। এই সকল কথা হইতে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ভীষণতা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষজ্ঞদিগের মতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বিগত পঞ্চাশ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে এবং আগামী ৩৫ বৎসরে তাহা পুনরায় দ্বিগুণ হইবে। অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ২০০০ খৃঃ-অব্দে ঐ জন সংখ্যা ৬০০।৭০০ কোটির মাঝামাঝি কোথাও দাঁড়াইবে ও অনেকে মনে করেন যে আর ১৫০০ বৎসরে পৃথিবীর মানুষের ওজন পৃথিবীর নিজের ওজন অপেক্ষা অধিক হইয়া যাইবে অর্থাৎ তখন পৃথিবী প্রতি বর্গ ফুটে হয়ত একজন করিয়া মানুষ বাস করিবে। অবশ্য ইহার পূর্বেই হয়ত মানুষ অন্যান্য গ্রহে গমন করিতে সক্ষম হইবে এবং সেইরূপ যাতায়াত হওয়া আরম্ভ হইলে পৃথিবীর লোক অন্য গ্রহে চলিয়া যাইবে।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে অনুমান করা হয় পৃথিবীতে মাত্র ৮।১০ কোটি মানুষ বাস করিত এবং খৃষ্টের জন্ম-কালে সেই জনসংখ্যা ২০।৩০ কোটি হইয়াছিল। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে এই জনসংখ্যা ৫০ কোটির অধিক হয় এবং তৎপরে হয় ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ৭৫ কোটি ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ১২৫ কোটি ও ১৯২০ খৃঃ অব্দে ২৫০ কোটি। তখন হইতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি যেভাবে হয় তাহার অনুমান করা হয় নীয়রূপ :—

১৯৬০—৩০০ কোটি
১৯৭০—৩৬৩ কোটি
১৯৭৩—৩৮৬ কোটি

তৎপরে যাহা হইবে তাহার বিচারে বিশেষজ্ঞ-দিগের মনে হয় যে ভবিষ্যতে মানুষের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২০০০ খৃঃ অব্দে ৬৫০ কোটিতে। ২০৭০ খৃঃ অব্দে ২৫০০ কোটিতে এবং ২১০০ খৃঃ অব্দে ৪৮০০ কোটিতে। অর্থাৎ এখন যেখানে একজন মানুষ আছে একশত বৎসর পরে সেই খানে ১০ জন মানুষ বিচরণ করিবে। খাদ্য উৎপাদন করিতে হইবে দশগুণ এবং বাসস্থান নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইবে ঐ অনুপাতে একটির জায়গায় দশটির। এই ভয়াবহ সম্ভাবনা জানিয়াও মানুষ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ চেষ্টা বিশেষ করিয়া করি-তেছে না। এখন লোক সংখ্যা হ্রাসের যে সকল উপায় হইতে পারে তাহার মধ্যে হইতে পারে পারমানবিক যুদ্ধে শত শত কোটি নরনারীর মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। প্রথম উপায়গুলি নিদারুণ ভাবেই ভীষণ এবং সেই রূপ অবস্থা যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ সকল দেশে আইন করিয়া না করিলে কদাপি যথাযথভাবে হইবে না। আইন করিয়া যে সকল রীতি পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করা হইবে তাহা না মানিয়া চলিলে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলেই নিয়ম অনুসরণ মানুষে করিবে, নয়ত করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ; আমরা পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, যে মানুষ অভ্যাসের দাস, তাহাকে দণ্ডের ভয় অথবা পুরস্কারের আশা না দেখাইলে সে সহজ বুদ্ধির কথা শুনিতে চাহে না।

ভারতবর্ষে এখনও বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন অনেকে মানিয়া চলে না। তিনের অধিক সন্তান হইলে অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হইবে নিয়ম করিলে তাহা লইয়াও বহু গোলযোগ হইবে। পরিবার বৃদ্ধি বিষয়ক কোন ব্যবস্থাই যে উত্তমরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা মনে হয় না।

চিত্রকলার মর্য্যাদা

ইয়োরোপ আমেরিকায় ধনি ব্যক্তি ও কৃষ্টি প্রতিষ্ঠান-গুলি চিত্র সংগ্রহ বহু মূল্য দিয়া একত্র করিয়া থাকেন। ইহা যে শুধু বর্তমানকালে লক্ষকোটীর হিসাবের যুগেই হইয়া থাকে তাহা নহে। বহুকাল হইতেই ইয়োরোপ আমেরিকার বিত্তবান নরনারী ও প্রতিষ্ঠান সকল ঐ ভাবে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে স্যাকসনির দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ অগষ্টাস "করেজোর মাদলেন রীডিং চিত্রটি প্রায় ২৫০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করেন। তৎকালীন টাকায় ক্রয় শক্তি বিচার করিলে এই মূল্যের যথার্থ ওজন বুঝা যাইবে। ফ্রেডরিখ অগষ্টাস ১৭৫৯খৃঃ অব্দে র‍্যাফায়েলের "দি সিষ্টিন মাডোনা

চিত্রটি প্রায় ৩২০০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জে, পিয়েরপণ্ট মরগ্যান রাফায়েলের দি কলোনা অল্টারপিস ৩৭৫০০০০ টাকাতে ক্রয় করেন। ইহার পরে পিটার ওয়াইডেনার ১৯০৬, ১৯১১ ও ১৯০০ খৃঃ অব্দে ভ্যান ডাইক্, রেমব্রান্ট ও রাফায়েলের তিনটি চিত্রের এক একটি ৪০।৪৫ লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের দ্বিতীয় জার নিকোলাস ১৯১৪ খৃঃ আব্দে লিয়োনার্ডো ডা ভিনচির একটী চিত্র কমবেশী এক কোটী দশলক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। আমেরিকার কয়েকটী সংগ্রহশালা ১৯৬১,৬৭ ও ৭০ খৃঃ অব্দে রেমব্রান্ট, লিওনার্ডো ও ভেলাস্‌কেজের চিত্রের জন্য এককোটী পঁচাত্তর লক্ষ, তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ও চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

চিত্রের এই প্রকার উচ্চ মূল্য দেখিলেই মানুষের স্বভাবতই মনে হয় যে মনি মুক্তার মূল্যও হয়ত এত অধিক হয় না। কথাটা কিছু ভুল নহে, কারণ তিন কোটি কিম্বা চার কোটি টাকা দিয়া কেহ কোন মনি মুক্তা ক্রয় করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। ১৯৬৯ খৃঃ অব্দে অভিনেতা রিচার্ড বার্টন তাঁহার পত্নী এলিজাবেথ টেলারের জন্য একটি ৬৯.৪২ রতি হিরক প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। উচ্চ মূল্যে হিরক ক্রয় করার ইহাই বোধ হয় চূড়ান্ত নিদর্শন। একটি মুক্তার কথাও শুনা যায় যাহার দৈর্ঘ সাড়ে নয় ইঞ্চি, ব্যাস সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি, ওজন চৌদ্দ পাউণ্ড এক আউন্স ও নাম "আল্লার মুক্তা" ১৯৩৬ খৃঃ অব্দ হইতে এই মুক্তাটি উইলবার্ণ ড'াওয়েল কবের সম্পত্তি এবং ইহার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে ২৬২৫০০০০ টাকা। এই মূল্যে অবশ্য মুক্তাটি ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মূল্য ধার্য্য করার কথা যদি শুধু ওঠে তাহা হইলে লিয়োনার্ডো দা ভিঞ্চির "মোনালীসা" বা "লা জোকন্দা" চিত্রটির বীমা করিবার জন্য ৭৫ কোটি টাকা মূল্য স্থির করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান হিরক সম্ভবতঃ "কোহিনূর"। ইহা ইংলণ্ডের রাজমুকুটে বসান আছে। টাকা দিয়া ইহা ক্রয় করা হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহা কোনও মূল্য না দিয়া ইহা আহরণ করিয়া নিজ দেশের রাজদরবারকে অর্পণ করে। কোহিনুরের মূল্যও ৭৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বের মতই আছে

হয়ত'বা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অপকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ণনাটা আমাদের দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোনের ব্যবসা, নানা স্থানে যাতায়াতের সুখ সুবিধা ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হইয়া থাকে। ইহার উপর আছে দ্রব্যের অভাব, ভেজাল ও নকল ঔষধাদির কথা। ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ সরকারী চেষ্টায় ক্রমাগতই বিস্তার লাভ করিতেছে। প্রায়ই শুনা যায় আরও ৫০০ শত অথবা ৫০০০ হাজার গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুর্ম্মুখ লোকে বলে যে পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রামের লোকে অন্ধকারে অল্প আলোতে সাবধানে চলাফেরা করিত ও ফলে হঠাৎ পতনের সম্ভাবনা ছিল কিছু কিছু কিন্তু ততটা নহে। এখন বৈদ্যুতিক আলো থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ নিভিয়া যায় এবং মানুষ ক্ষণপ্রভার চকিত অন্তর্দ্ধানজাত দৃষ্টিবিভ্রমে সহজেই পথের প্রস্তরে হোঁচোট খাইয়া অথবা অদৃশ্য কর্দ্দমে পা পিছলাইয়া পতিত হয়। গৃহেও অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গিয়া নানাপ্রকার অঘটন ঘটিয়া থাকে। আর একটা কথাও আছে। তাহা হইল বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিয়া জীবনযাত্রা পদ্ধতি নতুনভাবে গঠিত হয় ও সেই বিদ্যুৎ যদি কোনও কারণে হঠাৎ চলিয়া যায় তাহা হইলে মানুষের জীবনধারণ নানাভাবে কষ্টকর হইয়া উঠে। যথা মোটরও চলিতে চলিতে থামিয়া যায়, বৈদ্যুৎতিক চুল্লি হঠাৎ নিভিয়া গিয়া রন্ধনকার্য্য ব্যাঘাতে নষ্ট হইয়া যায়, ঠাণ্ডা আলমারির খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হয়, পাখা না চলার ফলে মানুষ ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া নিদ্রাহীন ভাবে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। রোগীর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার বা যন্ত্রাদি ব্যবহার স্থগিত রাখিতে হয়—আরোও কতকিছু ওলটপালট হয়। আজকাল মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কলকব্জা চালাইয়া উৎপাদন ও উপার্জ্জন করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ না

থাকিলে বহু কাজই বন্ধ হইয়া যায় ও সহস্র যন্ত্র, কল-কব্জা বন্ধ রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে ভারতে ক্রমাগতই এইভাবে শতশত কোটী টাকার উৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিতেছেনা। যত টাকা এইভাবে লোকসান হইতেছে তাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দশ গুণ অধিক করা হইতে পারিত।

টেলিফোন এখন একটা অতিবড় হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনার দ্যূতক্রীড়া এবং একটা টেলিফোন সংযোগ পাইতে হইলে ছয় সাতবার চেষ্টা করিয়া বারে বারে ভুল সংযোগ পাইবার পরে হয়ত যাহাকে চাই তাহাকে পাওয়া যায়। অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা, এমন কি দিনের পর দিন টেলিফোন বেকার থাকিয়া যায়, অভিযোগ করিলে দুই তিন দিন পরে হয়ত কেহ আসিয়া যন্ত্রটি নাড়াচাড়া করিয়া বলিয়া যায় যে "পার্ট" প্রয়োজন কিন্তু "পার্ট" নাই, এখন কোন রকমে গোঁজামিল দিয়া চালাইয়া দেওয়া হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। টেলিফোন ঠিকমত না চলার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক কার্য্যকলাপ, রোগ চিকিৎসা, আগ্ন নিভানোর গাড়ী অথবা পুলিশ ডাকা ও নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্রব্য উৎপাদনের বাধা, কালো-বাজার ও মাল লুকাইয়া রাখিয়া অধিক লাভে অল্প অল্প করিয়া মালবিক্রয় প্রভৃতি রীতি প্রচলিত হওয়ার ফলে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায়। ইহার মধ্যে তৈল, দুগ্ধেরগুঁড়া, শিশুদিগের খাদ্য প্রসাধনের বস্তু, নানাপ্রকার ঔষধ প্রভৃতির কথা প্রায়ই শুনা যায়। কালোবাজার যে আছে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কালো টাকা ও কালোবাজার যেসকল ব্যক্তির কার্য্যকলাপে চলিয়া থাকে তাহারা সকলেই একাধিপত্য-দানব অতিবৃহৎ ধনী নহে। সুদখোর, অত্যাধিক ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া বস্তির ঘরের মালিক, ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনাকারী মুদীর দোকানের দোকান-দার প্রভৃতি বহু সমাজবিরোধী ব্যক্তিই যাহাকে ধনীক বলা যায় তাহা নহে। এইরূপ ক্ষুদ্র ধনীক, প্রবঞ্চক ভারতবর্ষে খুঁজিলে প্রায় এক কোটি পাওয়া যাইবে। যাহারা ভেজাল দিয়া মাল বিক্রয় করে, দুগ্ধে জল মিশায় ও নকল ঔষধাদি চালায় তাহারাও অসংখ্য। ইহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করা সহজ নহে। সমাজবাদ প্রবর্ত্তক যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহাতে ইহাদিগের কোনও অসুবিধাই হয় নাই। ইহারা ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে। কি করিলে দুগ্ধে জল, খাদ্যে ভেজাল, নকল ঔষধ বিক্রয় ইত্যাদি বন্ধ হইবে তাহা কে নির্ণয় করিবে? সুদখোরদিগকে কে দমন করিবে? যাহারা দশটাকা কাঠা জমি ভাড়া করিয়া তাহাতে ৫০০ শত টাকা ব্যয়ে এক-একটি কক্ষ নির্ম্মাণ (খোলার চালের ও কাঁচা ইটের) করিয়া তাহা মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় গরীব লোকেদের থাকিতে দেয়, তাহাদেরই বা শতকরা ৪০।৫০ টাকা লাভে বাড়ীভাড়া দেওয়া হইতে কে সৎপথে চালাইবার ব্যবস্থা করিবে? যাঁহারা বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ ও টেলিফোন পরিচালনা কার্য্য যথাযথভাবে করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কি এই সকল কঠিন কার্য্য করিতে পারিবেন?

জাতীয়ভাবে দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা

শ্রীমধু লিমাই-এর নাম আজকাল সকল সংবাদপত্র পাঠকগণই জানেন; কারণ বামপন্থী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর সমালোচনার জন্য তিনি বর্ত্তমানকালে একটা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ও কংগ্রেসী নেতাগণ মধু লিমাই-এর সমালোচনা মন দিয়া শুনিয়া থাকেন বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি সর্ব্বত্রই শাসনক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসার লইয়া আলোচনা হইতেছে এবং সেই সম্পর্কে শ্রীমধু লিমাই ইংরেজী "জনতা" পত্রিকায় জাতীয় ভাবে দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা লইয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে নিম্নলিখিতরূপ:—

"দুর্নীতি সকল সময়েই নীতি বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধের কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে দুর্নীতি ভারতবর্ষে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর ধর্ম্মের ক্ষেত্রের কথা থাকিতেছে না। তাহা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে জাতির অস্তিত্বের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"দুর্নীতিই একমাত্র মহা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক যাহা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে জাতিকে সবল হইয়া উঠিতে বাধা দিতেছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি দুর্নীতির জন্যই নিরোধ করা যাইতেছে না।

"একথা বলা যাইতে পারে যে, শাসনক্ষেত্রে প্রবলতম রাষ্ট্রীয় দলের নির্ব্বাচন তহবিল বৃদ্ধি দুর্নীতির একটা প্রধান কারণ। ১৯৭১, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ খৃঃ অব্দে ঐ দলের জন্য যে অগাধ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার তুলনায় পূর্ব্বে যে সকল ধনী ও ব্যবসায়ীগণ চাঁদা দিতো তাহা কিছুই ছিলনা বলা যাইতে পারে। দালদা, তৈল, চিনি, কাপড় প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

"সামরিক বিভাগ হইতে যে ৫০০ শত জীপ ১৯৭১ খৃঃ অব্দে পরিত্যক্ত হয় তাহা একটা উদাহরণ।

"অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহু অর্থ ঢালিয়া শাসকদলকে সাহায্য করে; যদিও তাহা ১৯৬৯ খৃঃ অব্দের কোম্পানী আইন সংশোধনের বিরুদ্ধকার্য্য ছিল। রসিদ না দিয়া টাকা লওয়া ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি না ছাপিয়া তাহার জন্য অর্থ গ্রহণ প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে হইয়াছিল; হিসাব পরীক্ষক ও কোম্পানী আইন প্রয়োগকর্ত্তাগণ এইরূপ ব্যাপার কি করিয়া হইতে দিলেন তাহাও আশ্চর্য্যকর।

বহুকিছু হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও তাহার বিলিব্যবস্থা লইয়া অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে। সকল ক্ষেত্রে যে কেহ কাহাকেও টাকা দিয়া থাকে তাহাও নহে; কিন্তু ইহাতে নাম জাহির করার সুবিধা হয় ও এই কারণে ইহা দুর্নীতি।

"অনেক মন্ত্রীর নামে নানা প্রকার অপযশের কথা শুনা যায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাহা লইয়া কিছুই করেন না।

"এই সকল কারণে দুর্নীতি দমনের জন্য একটা জাতীয় আসর গঠন করা আবশ্যক যাহাতে জাতীয় জীবনকে নিষ্কলঙ্ক রূপদান করা সম্ভব হয়।

"নির্ব্বাচনে সাফল্যই একমাত্র দুর্নীতির কারণ নহে। আর একটা সমান সমান কারণ হইল রাষ্ট্রীয় দলের ব্যক্তিদিগের আত্মজাহির প্রবৃত্তি। আমলাগণ নির্ব্বাচনে নামে না কিন্তু তাহারা দুর্নীতি পরায়ণ। মন্ত্রীগণও শুধু নির্ব্বাচন বা রাষ্ট্রীয় কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা করেন না। দুর্নীতির শাখা অনেক ও নানা জাতীয়।

"আমার শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নিকট অনুরোধ যেন তিনি তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাকালে এই সমস্যার সমাধান চেষ্টা করেন। তিনি যদি নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে অনেক গুণীজনই তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইবেন।

"আসর গঠন করিয়া দুর্নীতি সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইবে ও সেই সকল খবর বিশ্লেষণ করিয়া ব্যবহারার্থে বিভাগানুযায়ী ভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। ইহার পরে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তদন্ত ও প্রমান অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং যদি দেখা যায় যে কোনওটির মধ্যে যথেষ্ট বস্তু আছে তাহা হইলে আন্দোলন করিয়া সরকারকে সেই বিষয়ে আইনগ্রাহ্য পন্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

"আসর সাধারণ ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাইবে।

"এইভাবে দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্র আইন সভার বাহিরে চাপের সৃষ্টি করা হইবে।

"এইজাতীয় আসর দুর্নীতি নিবারণের জন্য ক্রমশঃ নানান্ অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিবে।"

শ্রীমধু লিমাই যাহা বলিয়াছেন তাহা করিলে বিষয়টার একটা উচ্চস্তরের আলোচনা হইবে নিঃসন্দেহ কিন্তু তাহাতে দুর্নীতি দমন কার্য্য ব্যাপকভাবে সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ দুর্নীতি যে স্বাধীনতা লাভের পরেই শুধু প্রসার লাভ করিয়াছে এরূপ কথা সত্য-ইতিহাসের কথা নহে। বৃটিশ আমলে ও তৎপূর্ব্বে বাদসাহী ও নাবাবী শাসনকালে ঘুষ, স্বজাতির পকেট পুরণ, অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় প্রভৃতি বহু দুর্নীতিকর কার্য্যই চালিত ছিল। এদেশ স্বাধীন হইবার পরে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে স্বাধীনতার আলোকে

এরপর ৬১৯ পাতায়

নচিকেতার উপাখ্যান

(অনুবাদ)

ডাঃ অমল সরকার

[সদল মিশ্রের 'নাসিকেতোপাখ্যান' হিন্দী সাহিত্য জগতের অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ 'খড়ী বোলী'তে রচিত। 'খড়ী বোলী' (খড়ী=দাঁড়ালে, বোলী= ভাষা) র অর্থ হল চল্‌তি বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা, অর্থাৎ যে ভাষায় আধুনিক কালের হিন্দী সাহিত্য লেখা হয়ে থাকে। 'খড়ী বোলী'র পূর্বযুগে হিন্দী সাহিত্য রচিত হত অবধী ব্রজ আদি ভাষায়। 'খড়ী বোলীর অন্যতম প্রবর্ত্তক সদল মিশ্র ১৮৬০ সম্বৎ (১৮০৩ খৃঃ) এ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'চন্দ্রাবতী' বা 'নাসিকেতোপাখ্যানে'র 'খড়ী বোলী'তে অনুবাদ করেছিলেন এবং এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের একটি এখনও কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

(নিম্নোক্ত রচনা সদলজী বিরচিত 'নাসিকেতোপাখ্যানে'র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রাচীন, হয়তো তা একটু বঙ্কিমী ছাপ আছে, কিন্তু 'খড়ী বোলী'তে লিখিত পুস্তকের ভাব ও ভাষার রূপান্তরে এই বৈশিষ্ট্য আপনা হতেই এসে পড়েছে।

['নাসিকেতোপাখ্যান' মুনি নচিকেতার কাহিনী। মহারাজা রঘুর কন্যা চন্দ্রাবতীর নাসিকা থেকে নচিকেতার জন্ম হয়। চন্দ্রাবতীর অস্বাভাবিক উপায়ে অন্তঃস্বত্বা হওয়া, কুমারী-কন্যাকে গর্ভবতী দেখে রঘু রাজার ক্রোধ ও তাকে নির্বাসন দণ্ড দান, নির্বাসিত অবস্থায় ঋষি-আশ্রমে নচিকেতার জন্ম, ক্রোধান্বিত চন্দ্রাবতীর নচিকেতাকে গৃহ হইতে বিতাড়ণ ও পশ্চাত্তাপ। দৈবক্রমে নচিকেতার আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ, পিতার অভিশাপে নচিকেতার যমলোকে গমন, যমরাজার কৃপায় নচিকেতার নরক দর্শন ও জীবিত অবস্থায় মর্ত্তলোকে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা এই উপাখ্যানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এই উপাখ্যানের বিশেষ মহত্ব নিহিত আছে রচয়িতার নরক-বর্ণনায়। এই পুস্তকের নরক-বর্ণনা কখনও ২ দান্তের 'ইন্‌ফারনো' অথবা পারস্য দেশীয় 'হাতেম তাই' এর নরকের দৃশ্যাবলী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।]

দেবতাগণের প্রধান সকল সিদ্ধির দাতা সেই গণপতিকে আমি প্রণাম জানাই যাঁহার চরণ কমল স্মরণ করিবা মাত্র সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর হইয়া যায় এবং প্রতিদিন হৃদয়ে সুবুদ্ধি জাগিয়া উঠে এবং সংসারের জনগণ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত্‌ করিবার পর সেই পরম পদ লাভ করে যাহার প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণও লালায়িত।

দোহা

গণেশের দুটি চরণ-কমল, সকল সিদ্ধির বাস।
বন্দনা করি পূরণ হয়, মনের সকল আশ॥

চিত্র-বিচিত্র সুন্দর বৃহদাকার অট্টালিকা খচিত ইন্দ্রপুরী সমান শোভিত কলিকাতা নগরী মহাপ্রতাপী বীর নৃপতি কম্পানী মহারাজকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই মহান নগরীতে কত মহৎ লোকের নিবাস এবং নানা দেশ হইতে কত গুণীজন এইখানে আসিয়া আপনাপন গুণ প্রদর্শনে সবাইকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। এই অত্যাশ্চর্য্য নগরীর নাম শুনিয়া সদল মিশ্র পণ্ডিতও এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্ববিদ্যা বিশারদ মহাজ্ঞানী যাঁহার নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং যিনি বিদ্যালয়ের আচার্য্য ছিলেন সেই মহান গুণী শ্রী মহারাজ জন গিলক্রাইষ্ট

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহারই আদেশে সদল পণ্ডিত সংস্কৃতে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের দেশী ভাষায় এবং দেশী ভাষায় লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার কার্য্যে উদ্যোগী হইলেন।

এইভাবে ১৮৬০ বিক্রম সম্বতে চন্দ্রাবতীর কথা সম্বলিত নাসিকেতোপাখ্যান গ্রন্থটিকে, যাহা সংস্কৃতে লিখিত হইবার কারণে সহজবোধ্য ছিল না, 'খড়ী বোলী' (কথ্য ভাষা) তে রূপান্তরিত করিলেন। সদলজী যেভাবে এই গ্রন্থটির কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন তাহা হুবহু নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—

কোন এক সময় রাজা জন্মেজয় গঙ্গার তীরে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। একদিন স্নান-পূজাদি সমাপনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য দান করিয়া দেবতা ও পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট করিয়া, ঋষি ও পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে বৈশম্পায়ন মুনির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডবৎ হইয়া আপনার প্রণাম জানাইয়া করজোড়ে মুনির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি বেদ-পুরাণ সকল শাস্ত্রের সারমর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, এতদোপরি আপনি ব্যাস মুনির শিষ্য কাজেই আপনি সকল যোগীদের ভিতর ইন্দ্রের সমতুল্য। অতএব আপনি এমন কোন কাহিনীর উক্তি করুন যাহা শুনিলে সমস্ত পাপ ক্ষালন হইয়া যায় এবং আমরা রোগমুক্ত হইয়া সমস্ত জীবন সংসারকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিতে পারি।

সন্তুষ্ট হইয়া মুনি উত্তর দিলেন, হে রাজন। তুমি সত্যই জ্ঞানী। তোমার অভিলাষ মত আমি পুরাণের সেই কাহিনী আজ বলিব যাহা শুনিলে সমস্ত পাপ স্খালিত করিয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। তুমি ঋষি ও সেবকদিগের সহিত ইহা মনযোগ দিয়া অনুধাবন কর।

পুরাকালে উদ্দালক নামে ব্রহ্মার এক পুত্র ছিল—তিনি মহাজ্ঞানী মুনি ছিলেন যাঁহার দর্শন মাত্র লোক পবিত্র হইয়া যাইত। বেদ ব্রাহ্মণ্ শ্রুতি স্মৃতি আদিগ্রন্থে এমন নিপুণ, দয়াময় দাতা আর কেহ ছিলেন না এবং এই অসীম শক্তিমান মুনিগণ শ্রেষ্ঠের তপস্যাই একমাত্র ধন ছিল, এই মহান যোগীর সুন্দর আশ্রমে প্রতিদিন কত মহান মুনির সমাগম হইত এবং ইঁহারই আশ্রমের যে স্থান নানা প্রকার বৃক্ষে আচ্ছাদিত ছিল সেই স্থানে একদিন পিপ্পলাদ মুনি আসিয়া পৌঁছিলেন।

তাঁহাকে দেখিবা মাত্র উদ্দালক ঋষি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নতমস্তকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসনে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। অনন্তর প্রেম-পূর্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া তাঁহার কুশলাদি ও আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিপ্পলাদ মুনি বলিলেন—,আমি তোমার গভীর তপস্যার কথা শুনিয়া এই বনে আসিয়াছি এবং তোমাকে দেখিয়া অতীব প্রসন্ন লাভ করিয়াছি। কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ বিবাহ ব্যতিরেকে এইরূপ তপস্যা নিষ্ফল হইয়া যায়, কারণ সস্ত্রীক তপস্যা করিয়া ঋষিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বেদের আদেশানুসার সন্তান প্রাপ্তির জন্য স্ত্রী সম্ভোগ করা আবশ্যক নচেৎ কোন ক্রিয়াই কোনমতে সফল হয় না এবং নিঃসন্তানের প্রতি দেবতা ও পিতৃকুল কেহই সন্তুষ্ট হন না। পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির প্রতি দেবতা ও পিতৃগণ অতিশয় প্রসন্ন হন যাহার সৃজনশক্তি সম্পন্ন পুত্র বিদ্যমান। পুত্রহীন কিরূপে আনন্দ লাভ করিতে পারে কারণ পুত্র বিনা যে সবই অন্ধকার।

এইজন্য আমি আদেশ করিতেছি যে ঋষিগণের সম্মতি লইয়া কাহারও কন্যা লইয়া আইস এবং আপন বংশ উৎপন্ন কর, নচেৎ তোমার তপস্যার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

উদ্দালক উত্তর দিলেন, 'মহাপ্রভু, তপস্যা করিতে আমার ষট্ চতুর্দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে একটি স্ত্রীর জন্য যদি উহা আমাকে ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে মহা নরক ভোগ করিতে হইবে। আপনি জ্ঞানে আমা অপেক্ষা অনেক বড়, আপনি আজ্ঞা করুন আমার এখানে কি করা উচিত।

ঋষি পিপ্পলাদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ উক্তি করা উচিত নহে, কারণ সন্তান বিনা যোগ তপস্যা কিছুই সফল হয় না এবং সন্তানের জন্য স্ত্রীর কাছে যাইতে পূর্বাকার মুনিগণ আজ্ঞা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হয় যে ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভোগ করে। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে তপস্যা ভাঙ্গিয়া যায় না, ধর্মশাস্ত্রেও ইহা কথিত আছে।

এইরূপ সত্যবচন উদ্ধরণ করিয়া মনে মনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পিপ্পলাদ মুনি পুনরায় উদ্দালকের অতি নিকটে যাইয়া কহিলেন—স্বায়ংভুব মুনিও বলিয়াছেন যে সন্তানের জন্য ভার্যা গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই। এই বৃত্তান্ত বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন।

এই বলিয়া পিপ্পলাদ ঐ স্থান হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন উদ্দালক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'দেখ দেখি! আমার কঠিন তপস্যায় একি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার বৃদ্ধ অবস্থা, একটি কেশও কৃষ্ণবর্ণ নাই, এমতাবস্থায় সন্তানের জন্য কাহার নিকট কন্যা যাচ্ঞা করিব। কে আমাকে কন্যা দিবার জন্য সম্মত হইবে!'

ব্যাকুল হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে এক্ষণে একমাত্র ব্রহ্মার নিকটে যাওয়াই সমীচীন—তিনিই আমার সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

অনন্তর নিকটস্থ সকল ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া করজোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

উদ্দালকের বচন শুনিয়া পিতামহ, যিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, চক্ষু উন্মীলীত করিয়া বলিলেন, 'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, সকল কুশল তো? তোমার আশ্রমে সকল মঙ্গল তো? এস্থলে কি প্রয়োজনে আসিয়াছ, বৎস?,

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া উদ্দালক উত্তর করিলেন, 'পিতামহ, আপনার অনুগ্রহে সমস্তই কুশল। কিন্তু মুনিগণ আমাকে পুত্রের জন্য বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এইজন্য আমি আপনার শরণে আসিয়াছি, সমস্যার সমাধান করিয়া দিন।

এই কথা শুনিবামাত্র বিধাতা বলিলেন, প্রথমে মহাতপস্বী কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার পুত্র হইবে। পরে রাজা ইক্ষাকুর বংশোদ্ভবা অপূর্ব সুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না পতিব্রতা কন্যা তোমার ভার্যা হইবে। তুমি বৃথা চিন্তা করিও না। আমার কথা কখনও মিথ্যা হইবে না। আপন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া শিবের পূজা কর।

প্রজাপতির কথা শুনিয়া উদ্দালক যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মহারাজ! আপনি একজন এত বিরাট পুরুষ হইয়াও এইরূপ বাক্য কেন বলিতেছেন যাহা কেহ কখনও কোথাও শোনে নাই। বুঝিতে পারিতেছি না ভার্যা বিনা কি করিয়া পুত্র হওয়া সম্ভব?'

উদ্দালকের এই কথা শুনিবামাত্র ব্রহ্মা ঐ স্থান হইতে চকিতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন উদ্দালক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে বিধির বচনের অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া সে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে ২ আপন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে স্থানে চতুর্দিকে কেবল ঋষিদিগকে জপমন্ত্র উচ্চারিত করিতে দেখা গেল।

বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন, 'হে রাজন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা অতীব আশ্চর্য। মনসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

ঐ স্থান হইতে উদ্দালক পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্বেকার ন্যায় তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তপস্যারত অবস্থায় থাকিয়াও রাত্রিদিন স্ত্রী-চিন্তা তাহার মনে বার বার উদিত হইল এবং ফলস্বরূপ কামের দ্বারা তিনি পীড়িত হইতে লাগিলেন।

অবশেষে একদিন যখন তিনি এইরূপ ধ্যানে মগ্ন তাঁহার হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা তিনি হস্তে ধারণ করিয়া পদ্মের উপর স্থাপন করিলেন এবং সেই পদ্মকে কুশের সহিত বাঁধিয়া গঙ্গার জলে

ভাসাইয়া দিলেন। দৈবক্রমে সেই পদ্ম ভাসিতে ২ মহারাজা রঘুর রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল।

এই রাজার চন্দ্রাবতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; চন্দ্রাবতীর সুলক্ষণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে, গন্ধর্ব, নাগ ও দেবকন্যার ভিতর কেহ ঐরূপ সুন্দরী কন্যা দেখে নাই বা ঐরূপ সুন্দরীর কথা শোনে নাই; চন্দ্রাবতীর এমনি এক মনমোহিনী রূপ ছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র পৃথিবীজয়ী কামদেব পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন এবং ত্রিলোকে এমন কেহ ছিল না যে চন্দ্রাবতীকে দেখিয়া আপনাকে হারাইয়া না ফেলিত। রাত্রিদিন দশ সহস্র রাজকন্যা ঐ সুন্দরী কন্যার সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকিত এবং ইচ্ছানুসারে চন্দ্রাবতী আপন পিতার ভবনে জীবনের নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে বিভোর থাকিত। ঊর্মিমালা অধ্যুষিত সাগরে যেমন লক্ষ্মী এবং তারকারাশি সজ্জিত নভমণ্ডলে যেমন চন্দ্রমা শোভা পাইয়া থাকে তেমনি হর্ম্যরাজিমণ্ডিত রাজপ্রাসাদে চন্দ্রাবতী শোভা পাইত, মধুযামিনীর কোন কামিনীর ভিতরই এই রমণীয় রূপের একটি কণাও দেখিতে পাওয়া যাইত না আর তাই বোধ হয় সকলে এই বলিয়া আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিত যে চন্দ্রাবতীকে বিধাতা আপন হস্তে রচনা করিয়াছেন। কেহ বলিত এই কন্যা ইন্দ্রের অপ্সরা। কোন দেবতার অভিশাপে মর্তে আবির্ভূত হইয়াছে। রাজা রঘু ছিলেন ইক্ষাকু বংশসম্ভূত, বেদ-শাস্ত্রে পারদর্শী, মহান ধর্মাত্মা, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর, কাম ও লোভাদি রিপুকে জয় করিয়াছেন, প্রজা-পালনে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত, ব্রাহ্মণদিগের ভক্ত, সত্য একমাত্র ব্রত এবং ইঁহার রাজ্যে কেহ কোন রোগ বা শোকগ্রস্ত নহে, সকলেই স্বাস্থ্যবান এবং পরাক্রমী, অগ্রজের পূর্বে কনিষ্ঠের মৃত্যু নাই এবং প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে মঙ্গলানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিলেন, 'হে মহারাজ, এই রাজার কন্যা চন্দ্রাবতী অল্পবয়সে সখীগণ সমভি-ব্যাহারে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া ষট্‌রস ভোজন ও ষোড়শোপচারে শৃঙ্গার করিত।

একদিন সখীগণ শৃঙ্গার সমাপন করিয়া মুক্তাহার গলায় পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রমোদ-ভ্রমণে বাহির হইল। কেহ হাতে ধ্বজা লইল, কেহ ছত্র ধরিয়া চলিল। আবার কাহারও হাতে চামর শোভা পাইতে লাগিল। কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া চলিল এবং নানারূপ রঙ্গরস করিতে করিতে তাহারা আগাইয়া চলিল।

ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মঙ্গল-বেদ উচ্চারিত করিল এবং ভিক্ষুকগণ রঘু রাজবংশের উপাখ্যান গাহিয়া শুনাইতে লাগিল। সখীগণ কিয়ৎক্ষণের ভিতর গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর যখন রাজকন্যা চন্দ্রাবতী স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন তখন দেখিলেন যে স্বর্ণসদৃশ অতি সুবাসিত কুশ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি কমল ফুল সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ঐ ফুল দেখিয়া কন্যা উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল। 'সখীগণ, তোমরা দেখ কেমন এক সুন্দর ফুল বহিয়া যাহিতেছে, তোমাদের ভিতর কেহ উহাকে আমার নিকট শীঘ্র লইয়া আইস। আমার মনে হইতেছে যে ইহা স্বর্গের কোন দেবতার ফুল যাহার চিত্ররূপ গঙ্গার দুই তীরের শোভা বাড়াইয়া দিয়াছে।

রাজকন্যার এই কথা শুনিবামাত্র এক সখী ফুলটি সত্বর আনিয়া তাহার হাতে দিল। কন্যা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উহা তুলিয়া যেমনি ঘ্রাণ লইতে লাগিল তেমনি উহাতে উদ্দালক মুনি যাহা রাখিয়াছিলেন তাহা কন্যার নাসিকারন্ধ্রের ভিতর দিয়া গর্ভে প্রবেশ করিল। কিন্তু চন্দ্রাবতী বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না যে তাহার গর্ভে কি প্রবেশ করিয়া গেল এবং স্নান-পূজা সমাপন করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে সকলের সহিত আপন মন্দিরে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর প্রথম মাসে কন্যার দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পাইল, এবং দ্বিতীয় মাসেই গর্ভলক্ষণ বুঝিতে পারা গেল। তৃতীয় মাসে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। চতুর্থ মাসে অঙ্গের লোমগুলি পৃথক হইল। পঞ্চম মাসে স্তন ও নিতম্ব ভারী হইয়া উঠিল। ইহাদের

ভাবে কন্যা আরাম করিয়া বসিয়া কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিত না। ষষ্ঠ মাসে মাতা যখন কন্যার উদর-স্ফীতি দেখিলেন তখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, পরে জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, না তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছে; যাহা কখনও সম্ভব নহে তাহা কি করিয়া সম্ভব হইল।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে? দশসহস্র রাজকন্যা সদাসর্বদা কন্যাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তত্রাচ এমত অবস্থা কেমনে সম্ভব হইল? হায় রে! বংশে কলঙ্কের কালিমা মাখিয়া গেল। যে কেহ শুনিবে সেই তো ছিঃ ছিঃ করিবে।

এইরূপ পরিতাপ করিতে ২ মাতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে তোর এমন দশা হল কেন? আমাকে সত্য কথা বল্।'

তখন কন্যা বলিল, 'মাতা, আমি কিছুই জানি না কেমনে ইহা সম্ভব হইল! আমি সত্যই অভাগিনী। এক্ষণে প্রাণত্যাগ করা ব্যতিরেকে আমার আর কোন উপায় নাই, কারণ আমি যাহাই বলি না কেন, আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। কোথায় সূর্য-বংশের গৌরব রহিল, যে বংশের উত্তমোত্তম কীর্তিকলাপ ত্রিলোক বিখ্যাত আজ সেই বংশের কন্যার এই অবস্থা যাহাতে সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে আজ পরিহাসের বস্তু। পিতার নিকটে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব! জানি না বিগত জন্মে এমন কি কাজ করিয়াছি যাহার জন্য এমন মহাদুঃখপূর্ণ ফল ভোগ করিতে হইল। আমার ন্যায় শোকসন্তপ্তা কন্যা তুমি এখন ত্রিভুবন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও পাইবে না। তুমি দেখিবে না যে কোন দেবকন্যা বা কোন গন্ধর্ব, অসুর, নাগ, কিন্নর বা মানব কন্যা এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে।

ইচ্ছা হইতেছে আপন উদর কাটিয়া ফেলি ও মৃত্যুকে বরণ করি। কিন্তু আপনাকে হত্যা করিলে আর একটি জীবনকেও হত্যা করা হইবে যে আমার গর্ভে আছে এবং ইহাতে দুটি প্রাণ নষ্ট হইবে। এইজন্য আত্মহত্যা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইতেছি। মাতা, তুমিই এক্ষণে বলিয়া দাও আমি কি করিব।'

ইহা শুনিয়া রাণী হা হতোস্মি বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, 'মা, কে তোমাকে ছলে ভুলাইয়া তোমার এমন সর্বনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি কি করি, কাহার নিকট যাই এবং কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি।'

এইভাবে নানারূপ বিলাপ করিতে ২ রাণী অবশেষে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ সখীগণ উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে এই ঘটনার কথা সারা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িল। দিবারাত্র সংস্থানে ইহারই চর্চা হইতে লাগিল। সবাই বলিল, 'দেখ, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিও না। রঘুরাজা চন্দ্রাবতীকে বাল্যকাল হইতে কত শিক্ষা না দিতেছিলেন এবং চন্দ্রাবতীও সেই শিক্ষা অনুসারে বড় হইয়া উঠিতেছিল। ব্রত-নিয়ম পূজা-আচারে কন্যার নিষ্ঠা দেখিয়া রাজা প্রসন্ন ছিলেন এবং বলিতেন যে কোন এক দেবী আমার তপস্যার ফলে মানবী-রূপে আমার ঘরে জন্ম লইয়াছেন। এই কারণে দশ সহস্র কন্যার পরিচর্যায় তাহাকে রাখিয়াছিলেন এবং পুত্রগণ অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি জানিতেন যে কন্যা অতি সরল, প্রতিদিন সু-আচার করিয়া গঙ্গা-স্নান করে ও দেবতার পূজা করে, পুরাণাদি শ্রবণ করে এবং যে কন্যা বিবাহের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হয় নাই, সেই কন্যা এমন দুষ্কর্ম কি করিয়া করিল যাহাতে রঘুবংশের মুখে কলঙ্ক লাগিয়া গেল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'হে ভগবান, অন্য সমস্ত কিছু দাও কিন্তু কন্যা দিবার আশীর্বাদ করিও না যাহাতে লোক উপহাস করে।'

রাজার নিকট রাণী দুএকদিন এই ঘটনা প্রকাশ

করিলেন না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে চন্দ্রাবতীর কথা লইয়া সকলের ভিতর আলাপ-আলোচনা হইতেছে তখন তিনি কাঁপিতে থাকিলেন এবং ক্রমাগত চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন, মনে হইতে লাগিল যেন স্বর্ণলতা হইতে মুক্তাফল ঝরিয়া পড়িতেছে। তিনি রাজার নিকট বিলাপ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এ কি অনর্থ হইল, ইহার প্রতিকার কিরূপে হইবে। আমি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতেছি, এখন কি উপায় হইবে, আপনি কোন ব্যবস্থা করুন।'

ইহা শুনিয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত ভগবানকে স্মরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, 'মহারাণী। শীঘ্র শান্ত করো। কি এমন অনর্থ হইল যাহার জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখাইতেছে? ইহার কি কারণ অবগত কর। আমার জীবদ্দশায় তোমার এরূপ অবস্থা আমার সহ্যাতীত। রাণী উত্তর দিলেন, 'প্রভু! বড়ই অদ্ভুত ঘটনা। পুরুষের সংস্পর্শ বিনাই আপনার কন্যা অন্তঃস্বত্বা হইয়াছে। এবং এই কারণে সকলে এই বংশকে দোষ দিতেছে এবং সকল কীর্তির অপযশ গাহিতেছে। ইহা শুনিয়া রাজা ক্ষণিককাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, 'ওরে পাপিয়সী কন্যা, তুই এ কি করিলি?' এবং কন্যাকে বনে নির্বাসিত করিবার আদেশ দিলেন।

এই আদেশ পাইয়া সেবক ক্রন্দনরতা চন্দ্রাবতীকে রথে করিয়া লইয়া এক বনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ঐ বনে ব্যাঘ্র ও সিংহের ভয়ে পদ্মলোচনা চন্দ্রাবতী ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে বিধাতা, তুমি ইহা কি করিলে? এবং পরিত্যক্তা হরিণীর ন্যায় চতুর্দিক দেখিতে লাগিল। ঐ সময় সত্য-ধর্ম ব্রতী এক ঋষি ঐ স্থানে ইন্ধন আহরণ উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে এক নারীর ক্রন্দনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহা তো কোন অসহায় স্ত্রীলোকের ক্রন্দন কণ্ঠস্বর, এই ভীষণ বনে স্ত্রীলোক কেমন করিয়া আসিল? নিশ্চয় কোন বিপদে পড়িয়াছে।

মুনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং চন্দ্রাবতীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন, চন্দ্রাবতীকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন এ রমণী নিশ্চয় অহল্যা অথবা দ্রৌপদী অথবা ইন্দ্রের অপ্সরা তিলোত্তমা পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার হস্তপদাদি কমল অপেক্ষাও রমণীয় এবং ইহাকে বারবার দেখিলেও নয়নের তৃষ্ণা মিটে না। চন্দ্রমা-সমান মুখমণ্ডল, ক্ষীণ কটিদেশ, মৃগী-সদৃশ চঞ্চল নয়ন, বড় বড় দুটি স্তন যেন দুটি স্বর্ণকলস, রক্তিম অধর, তিতির পক্ষীর ন্যায় নাসিকা যাহার নিম্নে একটি তিল তাহার রূপকে বাড়াইয়া দিয়াছে। এই অসামান্য রূপবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ঋষি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং এত আকুল হইয়া কাঁদিতেছই বা কেন?'

কন্যা উত্তর দিল, 'মহাপ্রভু! আমি রঘু রাজার কন্যা। চন্দ্রাবতী আমার নাম। আমার ন্যায় হত-ভাগিনী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। দশ সহস্র রাজকন্যা পরিবেষ্টিত থাকিয়া আমি কখনও কোন পুরুষের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করি নাই এবং সমস্ত ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া দেবতার সেবা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু জানিনা কেমন করিয়া আমার গর্ভসঞ্চার হইল। এই জন্য পিতা আমাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যদি আপনিও আমার কথা বিশ্বাস না করেন।

পদ্মাবতীর মধুর বচন শুনিয়া ঋষির হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইল এবং তিনি বলিলেন যে আজ হইতে তুমি আমার ধর্মকন্যা। আইস, আমার আশ্রমে চলো, আরও অনেক মুনিগণ ঐ স্থানে বাস করেন। উঁহাদের সহিত কালাতিপাত কর এবং যতদিন না সুদিন আইসে আপন বিপত্তির সহিত বোঝাপড়া কর।

মুনির কথা শুনিয়া চন্দ্রাবতী বলিল, 'হে প্রভু, তাহাই হইবে। আপনি যে কৃপাপূর্বক এই দাসীকে দর্শন দিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল

ক্লেশ ও ক্লান্তি দূর হইয়া গিয়াছে। একণে আপনার সেবা-ব্রত করিয়া ভবসাগর পার হইয়া যাই ইহাই আমার একমাত্র কামনা ও বাসনা।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া চন্দ্রাবতী উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকন্যা ঋষির সহিত যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিল সে স্থানে শত শত মুনিজন আপনাপন যোগ তপস্যা পূজায় রত ছিল। সম্মুখের কুণ্ডে স্বচ্ছ শীতল জল দৃষ্টিগোচর হইল এবং চারিপার্শ্বে কমলদলগুলির ওপর ভ্রমরবৃন্দ তখন গুঞ্জন করিতেছিল, কুণ্ডের চারি তীরে হংস সারস চক্রবাক আদি পক্ষী কূজন করিতেছিল, বৃক্ষরাজির উপর হইতে পরভৃতের কুহু কুহু ধ্বনি শোনা যাইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বসন্ত ঋতুর সমাগম হইয়াছে।

রাজকন্যা ঐ পবিত্র আশ্রম দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টি লাভ করিল এবং মনে মনে বলিল ঈশ্বর তুমি আমাকে গর্ভ দিয়া ভালই করিয়াছিলে। নচেৎ রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া, পিতা-মাতার স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এই মহাপুরুষদের দর্শন হইত না। ভালই হইয়াছে যে আমি সকলের উপহাসের বস্তু হইয়াছি। এখন একাগ্রচিত্তে মুনিদিগের সেবা করিব এবং যোগ-তপস্যা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব না।

যখন নবম মাস কাটিয়া গেল তখন ক্রীড়ানত মস্তকে একদিন চন্দ্রাবতী ঋষিদিগকে বলিল, 'মহারাজ, একণে কাল পূর্ণ হইতেছে, এইজন্য আমি অন্য এক স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি যেখানে সহজে বালক ভূমিষ্ঠ হয় এবং এই যজ্ঞশালা অশুদ্ধ না হয়।

মুনিগণ তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ লতাগুল্মবেষ্টিত এক বনে একটি কুটিরের কথা বলিলেন।

চন্দ্রাবতী সন্তুষ্ট মনে ঐ স্থানে চলিয়া গেল। একদিন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে কন্যা কুটিরের দ্বারপ্রান্তে যাইয়া সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, 'হে ত্রিলোকস্বামী। তোমার অজ্ঞাত কিছু নাই। এবং এই বনের দেব-দেবীগণ। তোমরা আমার প্রার্থনা সাগ্রহে শ্রবণ কর। আমি কোনওদিন কোন পুরুষের মুখদর্শন পর্যন্ত করি নাই, অতএব যেরূপে এই গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল ঐরূপে এই গর্ভ যেন বাহির হইয়া আইসে।

এইরূপ মিনতি করিয়া সে ভিতরে যাইয়া বসিল এবং চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গর্ভ নাভিদেশ হইতে হৃদ্দেশে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ স্থান হইতে কণ্ঠদেশে যাইয়া নাসিকারন্ধ্র হইতে সূর্যসমান মহাতেজস্বী এক পুত্র বাহির হইয়া আসিল।

উঁহাকে দেখিবামাত্র চন্দ্রাবতীর আনন্দের সীমা রহিল না এবং উঁহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া যে তপস্বী তাহাকে ঐ স্থানে লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, 'হে পিতা। নাসিকা হইতে আমার এক অতি সুন্দর বালক উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি বলুন উহার কি নাম রাখিব এবং সময়ের লগ্নও আপনি নিরূপণ করিয়া দিন। মুনি উত্তর করিলেন—'নাসিকা হইতে ইহার যখন উৎপত্তি হইয়াছে ইহার নাম নাসিকেত রাখিয়া দাও, লগ্ন বিচার করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে এই বালক ভবিষ্যতে এক মহাপুরুষ যোগী হইবে যাহার সম্মুখে দেবতাগণও মাথা নত করিয়া লইবে।

এই বলিয়া মুনিগণকে ডাকিয়া তিনি ঐস্থানে মঙ্গলগীত করাইলেন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, 'হে রাজা। এইভাবে দশদিন অতিবাহিত হইলে পর চন্দ্রাবতী পুত্রকে স্নান করাইয়া ও দুগ্ধ পান করাইয়া ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়া ঋষিদিগের সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন এইরূপ সেবা করিতে যাইয়া চন্দ্রাবতীর ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেলে বালক জাগিয়া উঠিল, এবং ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রাবতী ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিল, 'ওরে দুষ্ট। তোর জন্য পিতামাতা আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আর তুই আমাকে এইভাবে বিরক্ত করিতেছিস। তুই আমার নয়, নিশ্চয় আমার কোন শত্রু। এখন আমার জীবনের একমাত্র কাজ মুনিদিগের সেবা করা, আর তুই উহাতেও

বাধা দিতেছিস। তোর এখান হইতে দূর হইয়া যাওয়াই সমীচিন।

এই বলিয়া চন্দ্রাবতী ঐ পুত্রকে তৃণের এক বোঝার উপর চাপাইয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল এবং সমস্ত মন প্রাণ দিয়া মুনিদের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিল এবং কিছুদিনের ভিতর সে জ্ঞানপ্রাপ্তির স্তরে গিয়া পৌঁছিল। এদিকে বালক গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে স্নানরত উদ্দালক মুনির নিকটে পৌঁছিল।

উহাকে দেখিয়া ঋষি আশ্চর্য্য হইয়া চতুর্দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন 'দেখ দেখি, কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি এমনি করিয়া তৃণের বোঝার উপর চাপাইয়া একটি নির্দোষ বালককে ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহার হৃদয় দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছু নাই। হঠাৎ ঋষির মনে ব্রহ্মার কথা উদয় হইল যে প্রথমে সে পুত্র পাইবে এবং তাহার পর স্ত্রী পাইবে।

তৎক্ষণাৎ ঋষির মন দ্বিগুণ আনন্দে ভরিয়া গেল এবং বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, অনন্তর বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। মুনি বারবার বিধাতার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 'পিতামহ, তোমার কথা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে। পুত্রের চিন্তা হইতে আমি এক্ষণে নিষ্কৃতি পাইলাম। এখন এমন তপস্যা করিতে পারিব যাহাতে স্বর্গের বিনিময়েও আমি অটল থাকিতে পারি।

এইরূপ চিন্তা করিতে২ মুনি আশ্রমে পৌঁছিয়া পুত্রকে বলিলেন, 'পুত্র শোন। এই পবিত্রস্থানে নানা-প্রকার আচারের দ্বারা মহর্ষিদিগকে প্রসন্ন কর, পিতার সেবা কর, কন্দ-মূল আহার করিয়া কালাতিপাত কর, তাহা হইলে এইস্থানের সকল বিদ্যা তুমি অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইবে।

যোগ্যপুত্র প্রাপ্ত হইয়া ও পুত্রকে এইভাবে আদেশ করিয়া মুনি আপন কার্য্য নিবিষ্ট চিত্তে সমাধা করিতে মনস্থ করিলেন।

বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন, 'মহারাজ, কিছুদিন পর যখন রঘুরাজার কন্যার ক্রোধ প্রশমিত হইল, তখন পুত্রের জন্য এমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

চৌপাই

সব তপ ভুলে গিয়ে নয়ন নীর বয়ে যায়।
ধৈর্য্য হারায়ে দিয়ে কি ভুল সে করে হায়॥

চন্দ্রাবতী দিনরাত কেবলি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল এবং নিরপরাধ বালককে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল যে আমি যে অধর্ম করিয়াছি তাহাতে কি আমার তপস্যা সফল হইবে, কোন পশুও বোধহয় আমার ন্যায় এমন জঘন্য কার্য্য করে না। আমি এ কি করিলাম! পুত্র, তুমি কোথায়? এক মুহূর্তের জন্যও যে তোমাকে আমি ভুলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তোমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুই খাইব না, কিছুই পান করিব না।

মনে২ এই বিচার করিয়া রাজকন্যা আকুল হইয়া আপন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং যে বনবাসীকে দেখিতে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ওগো, তুমি কি এই পথে কোন বালককে যাইতে দেখিয়াছ'?

যখন কেহ কিছু বলিতে পারিল না তখন শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে চন্দ্রাবতী জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল, অবশেষে পুত্রকে খুঁজিতে২ গঙ্গার তীরে আসিয়া পৌঁছিল। সম্মুখের দিকে আরও কিছু দূর চলিবার পর মুনিগণের এক অতি মনোরম আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ স্থানে বালকও গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য আসিয়াছিল।

তাহাকে দেখিতেই রাজকন্যা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বারবার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিল, 'পুত্র, কে সেই মুনি যিনি তোমাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন? এ মুনির কি নাম এবং তাঁহার আশ্রমই বা কোনটি? আমি তোমার মাতা, আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?

বালক বলিল, 'মাতা। আমি উদ্দালক ঋষির আশ্রমে থাকি, ঐ সেই আশ্রম এবং তিনিই আমার পিতা মাতা দেবতা ও গুরু। এক্ষণে ফল মূল আনিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন।'

এই বলিয়া সে চন্দ্রাবতীকে আপন আশ্রমে লইয়া গেল এবং আসন দিয়া বসাইল। জল আনিয়া পদ প্রক্ষালন করিল এবং বলিল, 'মাতা তুমি এই স্থানে আরাম কর, আমি ততক্ষণ এই অগ্নিশালা লেপন করিয়া দিতেছি।'

পুত্রের এই মধুর বচন শুনিয়া মাতা বলিল, 'তুমি বস, আমি ঘর লেপন করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া গোবিষ্ঠা ও মৃত্তিকা দিয়া অতি সযত্নে বাহিরে ও ভিতরে লেপন করিয়া চন্দ্রাবতী গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে উদ্দালক মুনি বন হইতে ফল-মূল আহরণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আশ্রমের দিকে দেখিবামাত্র তাঁহার আশ্চর্য্য লাগিল, ভাবিলেন, 'আজ কে এমন সুনিপুণভাবে ঘরে বাহিরে লেপন করিয়াছে।'

উদ্দালক হাসিয়া পুত্রকে ডাকিলেন, 'আমি তোমার ভক্তি-ভাব দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট তুমি কি বর প্রার্থনা কর?' নাসিকেত উত্তর দিল, 'মহারাজ! আমি এই কার্য্য করি নাই, আমার মাতা আসিয়াছেন। তিনিই আশ্রমের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।'

উদ্দালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মাতা কোথায়? তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস, আমি দেখিতে বড়ই ইচ্ছুক।'

ইহা শুনিতেই বালক গঙ্গাতীরের দিকে দৌড়াইয়া গেল এবং মাতাকে বলিল, 'মাতা, আমার পিতা গৃহে আসিয়াছেন, তোমাকে ডাকিতেছেন। চল, তাঁহার নিকট গিয়া থাকিবে।'

চন্দ্রাবতী বলিল, 'পুত্র, ইহা কি বলিতেছ, ইহাতে লোকনিন্দা হইবে এবং অবশেষে নরক-বাস হইবে। পিতা মাতা ভ্রাতা ইঁহারাই কন্যাদান করিতে পারেন, কিন্তু কখনও শুনি নাই যে পুত্র তাহার মাতাকে কাহারও নিকট সম্প্রদান করিয়াছে।'

আমার ন্যায় উচ্চবংশের কন্যা এবং এক তপস্বিনীকে কিরূপে তোমার পিতা গ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি তোমার পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত কর, তিনি যাহা উচিত মনে করিবেন তাহাই করিবেন।

তখন বালক উঠিয়া পিতার নিকট গেল। বালককে দেখিতেই মুনি বলিয়া উঠিলেন—পুত্র! তুমি একাকী চলিয়া আসিলে, তোমার মাতাকে সঙ্গে করিয়া কেন লইয়া আসিলে না?

নাসিকেত উত্তর দিল, 'পিতা, আমি তো বলিয়াছিলাম কিন্তু আপনার নিকট আসিতে মাতা সম্মত নন, তিনি আমাকে বলিলেন, 'পুত্র শোন, আমার এই যৌবনাবস্থা দেখিয়া ভাবিও না যে কোন পুরুষের কাছে যাইব। আমি যুবতী হইতে পারি কিন্তু আমি একজন পতিব্রতা রাজকন্যা, বিবাহ ব্যতিরেকে আমি তোমার পিতার নিকট যাইতে পারি না। তিনিও নিশ্চয় অবগত আছেন যে বেদ-পুরাণাদি সকল শাস্ত্রে এইরূপ কার্য্যের নিষেধ আছে।

উদ্দালক বলিলেন, 'পুত্র, এক্ষণে জানিতে পারিলাম যে বিবাহ বিনা তিনি আমার নিকট আসিতে অনিচ্ছুক। পুনরায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস যে তোমার মাতা কোন রাজার কন্যা এবং অল্প বয়সে যে বনবাস হইয়াছিল তাহার হেতু কি? এবং তোমার জন্মই বা কি করিয়া হইল, এই প্রশ্নগুলির উত্তর লইয়া আইস।'

বালক পিতার সকল কথা মাতার নিকট যাইয়া শুনাইল। তখন মাতা বলিল, 'পুত্র! তোমার পিতা আমার সকল কথা স্বয়ং জানেন কারণ তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। তথাচ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অধুনা সমস্ত পৃথিবীর রাজা রঘুরাজাকে ঈশ্বর সব-কিছু দিয়াছেন, ইঁহার যশ ও খ্যাতি দেবতারা পর্য্যন্ত গাহিয়া থাকেন এবং সকল ধর্মাত্মার ভিতর তাঁহারই প্রথম স্থান। আমি এই রঘুরাজার কন্যা। চন্দ্রাবতী আমার নাম। দশ সহস্র সুন্দরী রাজকন্যা আমাকে

পরিবেষ্টিত করিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিত। স্নেহ ভালবাসায় পিতা আমাকে সব উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাকে পুত্র অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করিতেন।

একদিন আমি নিজেই নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিলাম। সখীদের সঙ্গে করিয়া একদিন গঙ্গা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে কুশাচ্ছাদিত একটি পদ্মফুল আমার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। পদ্মফুলটি অতি সুন্দর থাকায় সখীগণ উহা তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিল। পাপড়ীগুলি খুলিয়া যখন আমি ঐ ফুল হইতে ঘ্রাণ লইতেছিলাম তখন সূক্ষ্মের ন্যায় কোন বস্তু আমার নাসিকা দিয়া উদরে প্রবেশ করিয়া গেল। এবং ঐ বস্তু হইতেই আমার গর্ভের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পর এই কথা চতুর্দিকে রটিয়া গেল এবং অবশেষে আমার পিতার কানে গিয়া পৌঁছিল। শুনিবামাত্র তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। পরে মন্ত্রীদের অনুরোধে তিনি আমাকে এক ভীষণ বনে নির্বাসন দিয়া আসিবার আজ্ঞা দিলেন। দৈবাৎ ঐ স্থানে এক মুনির দর্শন পাইলাম। আমাকে ক্রন্দনরত দেখিয়া তিনি আমাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং এই আশ্রমে আমার নাসিকা হইতে তোমার জন্ম হইল, নাসিকা হইতে তোমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মুনি তোমার নাম রাখিলেন নাসিকেত।

একদিন মুনিদিগের সেবাকার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় তুমি ঘরে অনবরত কাঁদিতেছিলে। আমার ভীষণ ক্রোধ হইল। আমি দৌড়াইয়া গিয়া তোমাকে একটি তৃণের বোঝার উপর চাপাইয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলাম। কয়েকদিন পর আমি তোমাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলাম এবং গঙ্গার তীর অনুসন্ধান করিয়া আগাইয়া চলিলাম এবং অবশেষে এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

নাসিকেত মাতার সব কথা পিতার নিকট বলিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উদ্দালক বলিলেন, 'মহান জনের কথা কখনও মিথ্যা যায় না। ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য হইয়া প্রকাশ পাইল। পুত্র! ফল-মূল আহার করাইয়া মাতাকে আপন সঙ্গে রাখ। আমি রঘু রাজার নিকট তাঁহার কন্যাকে চাহিতে যাইতেছি।

এই বলিয়া উদ্দালক ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মুহূর্তের ভিতর রঘুর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে নগরীর শোভা এবং নগরবাসীদের অতিশয় সুখ দেখিয়া উদ্দালক অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ক্রমে রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বাররক্ষক রঘুরাজার নিকট যাইয়া বলিল, 'মহারাজ, এক মহাতেজস্বী ঋষি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

শুনিবামাত্র রঘু রাজা মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়াই মুনির চরণ স্পর্শ করিয়া হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং আপন সিংহাসনে বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জল দিয়া পা ধোয়াইয়া দিলেন। এবং উচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ,' আপনার অশেষ অনুগ্রহ যে আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। এক্ষণে আমার সমস্ত কার্য্য সফল হইল ও জন্ম সার্থক হইল। আজ হইতে আমার রাজ্যে সুদিন আসিল কারণ যে স্থানে আপনার ন্যায় ঋষিদিগের পদধূলি পড়িয়া থাকে সেই স্থান আনন্দে ভরিয়া উঠে। বলুন কি কারণে আমার রাজ্যে আপনার আগমন হইয়াছে?'

নৃপতির এইরূপ মধুর বচন শুনিয়া উদ্দালক তাহাকে অজস্র আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'ধন্য তোমার পিতা-মাতা যাহারা তোমার ন্যায় এইরূপ ধর্মাত্মা পুত্রের জন্ম দিয়াছেন। এবং স্বর্গলোকে দেবতাদিগের প্রতিটি কন্যা তোমার গৌরব-গাথা গাহিয়া গাহিয়া ফিরে। তোমার নিকট আমি তোমার সুলক্ষণা কন্যা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। ধর্মাবতার! বেদের বিধানানুসারে ঐ

কন্যা আমাকে দান করুন, আপনি একলক্ষ গোদানের ফল পাইবেন।

'এই কথা শুনিয়া রাজা উত্তর করিলেন, 'প্রভু, অন্ন-বস্ত্র হস্তী-অশ্ব যেকোন বস্তু যত ইচ্ছা আপনি যাঞ্চা করুন, কিন্তু আমার গৃহে তো কন্যা নাই যে আমি তাহাকে দান করিব।'

মুনি বলিলেন, 'তোমার পতিব্রতা কন্যা বিনা বিবাহে তোমার গৃহে নাই সত্য, কিন্তু কোথাও তো নিশ্চয় অবস্থান করিতেছে। বংশবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন, কোটি অশ্বমেধের যজ্ঞ-ফল পাইবেন।'

ঋষির কথায় রাজা হতবাক্ হইয়া শোকে বিহ্বল হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর লজ্জাবনতভাবে কহিলেন, 'মহারাজ, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আমার ঐ একটি কন্যা ছিল, কিন্তু কোন দোষে তাহাকে আমি ক্রোধবশে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। অতএব সে আপনার যোগ্য নহে। এখন ঈশ্বরই জানেন সে জীবিত আছে না পরপারে চলিয়া গিয়াছে।'

তখন উদ্দালক মুনি রাজাকে সমস্ত কাহিনী শুনাইলেন। কি করিয়া তিনি ব্রহ্মার বর পাইলেন এবং আপন রেত পদ্মফুলে রাখিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলেন, সেই রেতকে ঘ্রাণ করিয়া চন্দ্রাবতী গর্ভবতী হইল। এই দেখিয়া রাজা কন্যাকে বনবাস দিলেন, ঐ বনে এক মুনির আশ্রমে তাহার নাসিকা হইতে একটি পুত্রের জন্ম হইল। তারপর নাসিকেত ও চন্দ্রাবতীর তাহার আপনার কাছে আসা এবং আপন ইচ্ছা সবকিছু রাজাকে শোনাইলেন।

ইহা শুনিয়া রাজা পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায় রে, আমার কন্যা যে নিষ্পাপ চরিত্রের সে কথা আমি কিছুই জানিতাম না। আমার ন্যায় অধর্মী আর কে আছে যে বিনা অপরাধে কন্যাকে বনবাস দিতে পারে।'

এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মুনি যাহা বলিয়াছিলেন রাণীকে তাহা শোনাইলেন। রাণী ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পতির চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, ইহা যদি সত্য হয় তবে অবিলম্বে লোক পাঠাইয়া পুত্রসহিত কন্যাকে লইয়া আইস, কারণ কন্যার শোকে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কবে আমি সুন্দর পুত্র ক্রোড়ে চন্দ্রাবতীকে দেখিতে পাইব, না জানি বনে থাকিয়া আমার চন্দ্রাবতী ভোরের চন্দ্রমার ন্যায় কত মলিন হইয়া গিয়াছে। দেখ, এসবই আমাদের কর্মফল, এখানে কত প্রকার আরাম-বিলাসের মধ্যে ফুলের কোমল শয্যায় শুইয়া যে দিন কাটাইত, সে আজ বনে ফল-মূল খাইয়া কণ্টক শয্যায় শুইয়া সারা প্রহর কত ভয়ানক পশুদের গর্জনের মাঝে দিন কাটাইতেছে।'

রাজা উত্তর করিলেন, 'মাতাপিতা হইতে একটি প্রাণীর একবারই মাত্র জন্ম হয়। এবং সুখ-দুঃখ যাহার যা ভাগ্যে থাকে তাহাই আসেই, সে রাজাই হ'ক বা প্রজাই হ'ক, বড় বা ছোট সবাইকে এইভাবে বিধির লিখনানুসারে দুঃখভোগ করিতে হয়।

ইতিমধ্যে সখীগণ এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দৌড়াইয়া আসিল, চন্দ্রাবতীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল এবং আনন্দে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিল এবং অঙ্গ হইতে আভূষণ খুলিয়া সেবকদের দান করিতে লাগিল, রাজা ও রাণী অগণিত অর্থ ও অন্নবস্ত্র ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া দিতে লাগিলেন। আনন্দ-গানে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হর্ষিত চিত্তে রাজা সভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে বলিলেন, 'মহাপ্রভু, আপনি আমাকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমার আনন্দ আজ সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্তে আমার সামনে অবস্থান করুন, আমি কন্যাকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনাকে সমর্পণ করিতেছি।'

এই বলিয়া অমৃতসমান খাদ্যবস্তু ভোজন করাইয়া রাজা অতি সযত্নে মুনিকে আপন ঘরে ধরিয়া রাখিলেন এবং সেবককে দিয়া পাল্কী করিয়া পৌত্রসহিত কন্যাকে লইয়া আসিলেন। সবাই আসিয়া তাহাদের আদর করিল। বালককে কোলে লইয়া রাণী-মাতা কন্যাকে

কাছে বসাইয়া কাঁদিয়া ২ বনের সমস্ত কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। রাজপ্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে লোকের ভীড়ে চলিবার এতটুকু পথও রহিল না। রাজা পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া অন্যান্য রাজা ও ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার দিন স্থির ক ন।

লগ্ন আসিলে সকলকে সঙ্গে য়া ঐ মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে স্বর্ণস্তম্ভের উপর মনি দীপ জ্বলিতেছিল। মুক্তাখচিত কাষ্ঠাসনে বরকে এবং রত্নখচিত আসনে বধূকে বসাইয়া দুজনাকে পীতাম্বর বস্ত্র পরিধান করাইয়া ও গলায় মালা পড়াইয়া বৈদিক নিয়মে বিবাহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়িতে লাগিলেন। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের বাজনা, কথক গান এবং বারবণিতার নৃত্য চলিতে লাগিল। রাজা এক সহস্র হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব এবং গোধন, অসংখ্য বাসন, ভূষণ, বস্ত্র ও অর্থ জামাতাকে যৌতুকরূপে দান করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তারপর হাতজোড় করিয়া বিনীতভাবে উদ্দালক মুনিকে বলিলেন, 'ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা এক মহান আশ্রয় পাইলাম। আমার গৃহে এমন কোন বস্তু নাই যাহার দ্বারা আপনার পূজা করিতে পারি। জল দ্বারা সাগরের এবং প্রদীপ দ্বারা সূর্য্যের কি পূজা হইতে পারে। সাগরের বা সূর্য্যের এরূপ পূজায় আনন্দ হইবে কিরূপে। যাহারা মহাত্মা তাঁহারা মান ও সম্মানের দ্বারাই সন্তুষ্ট হন।

এই বলিয়া রাজা ঋষির চরণ স্পর্শ করিলেন। অতিশয় প্রসন্ন হইয়া মুনি রাজাকে উঠাইয়া পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'রঘুরাজা! কেন হইবে না। কেমনে আপনার প্রশংসা করিব জানি না। ভগবান আপনাকে অনেক বুদ্ধি দিয়াছেন। ভগবান করুন আপনার সদাসর্বদা উন্নতি হউক এবং অশ্ব-হস্তী ও অন্যান্য বস্তু যাহা আমাকে আপনি যৌতুক দিয়াছেন তাহা আপনার গৃহেই থাকুক, কারণ আমি বনবাসী তপস্বীদের এই সবের কোন প্রয়োজন হয় না

তখন রাজা জন্মেজয় বৈশম্পায়ন ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! শুনিয়াছি ঐ স্থানে নাসিকেত আসিয়া কিছুদিন পর পিতার শাপে জীবিতাবস্থায় যমরাজার নিকটে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে ঐ কাহিনী শ্রবণ করান যাহাতে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়।

ঋষি বলিলেন, 'রাজা তোমাকে অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া আমি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অনুমান ঠিক, তুমি যাহা শুনিতে চাও আমি বলিতেছি, মন দিয়া অনুধাবন কর।

এইভাবে রঘুরাজার কন্যা চন্দ্রাবতীকে উদ্দালক বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন এবং তপস্যা করিতে লাগিলেন। নাসিকেতেরও যোগ-তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং সেও যোগাভ্যাস করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ'

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং নাটকের যতটা সমাদর, ঐতিহাসিক কাব্যের সমাদর ততটা নয়। অবশ্য ঐতিহাসিক কাব্যও বাংলা সাহিত্যে সীমিত-সংখ্যক। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) এবং নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫) বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে সমাদর পায়নি এমন নয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) রচিত পৃথ্বীরাজ (১৩২২) এবং শিবাজী (১৩২৫) ঐতিহাসিক কাব্যদুটি প্রকাশকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা যে অর্জন করতে পারেনি তার মূলে হয়তো বাংলা দেশের কাব্যামোদী পাঠকের—ঐতিহাসিক কাব্যের প্রতি অনীহা! তাই সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য রচনায় পরবর্তী কালে বিশেষ কোন প্রয়াস দেখা যায়নি।

যোগীন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার হিসেবেই অমর হয়ে আছেন। অথচ তিনি নিজেও একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁর শিবাজী কাব্য পড়ে 'নব্যভারত' মন্তব্য করেছিলেন 'যোগীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।' সর্বশ্রেষ্ঠ কবি না হলেও শ্রেষ্ঠ কবির অনেক গুণ যে তাঁর ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী কাব্য দুটির ছত্রে ছত্রে তার অজস্র প্রমাণ আছে।

উনিশটি সর্গে বিভক্ত পৃথ্বীরাজ কাব্য ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে যে কাব্যটি খুবই জনপ্রিয় হয় সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৩৩০ সালের মধ্যে কাব্যটির চারটি সংস্করণ হয় এবং যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'বছর পরে ১৩৩৫ সালে পঞ্চম সংস্করণও প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের ধর্ম-আন্দোলনের একজন যোদ্ধা হিসেবে যোগীন্দ্রনাথ খুবই গোঁড়া ছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের ওপ তাঁর অন্ধ আসক্তি-ই তাঁকে পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী কাব রচনায় আগ্রহী করে থাকবে। হয়তো এই ধর্মান্ধতা দোষেই সব গুন থাকতেও কাব্যদুটি ঐতিহাসিক থেকে গেছে" স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়নি।

শুধুমাত্র কাব্য রচনা করার উদ্দেশ্যে যোগীন্দ্রনাথ পৃথ্বীরাজ রচনা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও মহৎ। হিন্দুজাতির—অতীত গৌরব এবং পতনের কারণগুলি দেখানোই ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি পৃথ্বীরাজ কাব্যের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—"পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কবিতা-রস বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতিপথ দেখিলে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পতনের পর উত্থান অবশ্যই হইবে।"

গ্রন্থাভাষেও তাঁর প্রকৃত মনোভাবের কথা আছে—

> না পারি দেখিতে আর; ইচ্ছা হয় মনে
> অবতারি মর্ত্যলোকে, প্রচারি আবার
> ভারতে সে মহাধর্ম, আদর্শ যাহার,
> পুত্র, পতি, ভ্রাতা, সখা, রাজা, প্রভুরূপে
> পরিস্ফুট রামচন্দ্রে। যে ধর্মের গুণে
> ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যক্ষ, রাক্ষস, বানর
> বদ্ধ হল সমভাবে।

কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রার্থনা জানিয়ে কবি তাঁর উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন—

দয়া, তবে কর, দয়ার্ময়ি !
শুনাও, অতীত স্মৃতি করি' সঞ্জীবিত,
ভারতের ভূতকথা। হক জালাময়ী
সে কাহিনী, তবু দেবি ! করিয়া শ্রবণ,
বুঝি নিজে, বুঝাইব স্বদেশীয় জনে
কোন্ দোষে, কোন্ পাপে পতিত আমরা ;
কারণ বিহনে কার্য্য না ঘটে সংসারে।
(২য় সর্গ)

এই উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় নিয়ে রচিত পৃথ্বীরাজ কাব্যটির উনিশটি সর্গে কবি 'বিষয়—নিরূপণ' করেছেন এই ভাবে—

প্রথম সর্গ :—পৃথ্বীরাজের দিল্লীলাভ
দ্বিতীয় সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা
তৃতীয় সর্গ—সংযুক্তার উপবন বিহার
চতুর্থ সর্গ—রাজসূয় ও স্বয়ংবরোদ্যোগ
পঞ্চম সর্গ—পৃথ্বীরাজের সংকল্প
ষষ্ঠ সর্গ—সংযুক্তার স্বয়ংবর
সপ্তম সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় মন্ত্রণা
অষ্টম সর্গ—হর্ষে বিষাদ
নবম সর্গ—দিল্লীতে প্রেতাবির্ভাব
দশম সর্গ—দৌত্য
একাদশ সর্গ—গৌরীপূজা
দ্বাদশ সর্গ—যুদ্ধোদ্যোগ
ত্রয়োদশ সর্গ—তরায়ণের প্রথম যুদ্ধ
চতুর্দশ সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণা
পঞ্চদশ সর্গ—তুঙ্গাচার্যের রাজনীতি চর্চা
ষোড়শ সর্গ—জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা
সপ্তদশ সর্গ—তুঙ্গাচার্যের অগস্ত্য দর্শন
অষ্টাদশ সর্গ—তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ
ঊনবিংশ সর্গ—সংযুক্তার চিতারোহন।

ওপরের চিত্রটি থেকে যোগীন্দ্রনাথের ইতিহাসের যথাযথতা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পৃথ্বীরাজ কাব্যে চারটি চরিত্রের মধ্যে পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, সেনাপতি গোবিন্দ এবং মহম্মদ ঘোরী সকলেই ঐতিহাসিক, তবে কাল্পনিক চরিত্রও আছে। সে দুটি হল মাতৃস্নেহ এবং প্রতিহিংসার প্রতিমূর্তি মেধা এবং 'সাধুচেতা, দূরদর্শী, স্বদেশপ্রেমিক ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ' তুঙ্গাচার্য। তুঙ্গাচার্য চরিত্রের অন্তরালে কবি নিজেই যেন বিচরণ করেছেন। ইতিহাস-নির্ভর কাব্যে কাল্পনিক চরিত্র চিত্রণের কৈফিয়ৎ হিসেবে কবি ভূমিকায় বলেছেন—"বর্ণনীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কল্পিত ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু কুত্রাপি ইতিহাসোক্ত ঘটনার বিকৃতি করি নাই।" অবশ্য সেই সঙ্গে কবি পাঠককেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি, তাহা আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই আমি যে কাব্য লিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই আশা করি, আমার পাঠকবর্গও, তেমনি সেকথা বিস্মৃত হইবেন না।"

পৃথ্বীরাজ কাব্যের প্রথম থেকেই কবি পাঠককে সদ্গুণ সম্পর্কে সচেতন রাখতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম সর্গে অপুত্রক দিল্লীপতি শ্রীঅনঙ্গপাল দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে সিংহাসনে বসাতে গিয়ে বলেছেন—

দুষ্টে কোরো দণ্ডদান, রাখিও শিষ্টের মান
গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা কোরো বীর।
স্বদেশ স্বধর্ম তরে দিও প্রাণ অকাতরে
সম্পদে বিপদে থেকো স্থির।

এই নির্দেশ মাথায় নিয়ে পৃথ্বীরাজ সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর চরিত্রেও এই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে। পৃথ্বীরাজের এই প্রজাবৎসল এবং বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্রটি কবি সর্বত্রই নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। পৃথ্বীরাজের বীরত্বব্যঞ্জক দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

শাল সমুন্নত দেহ,
পরিঘ—সদৃশ বাহু,
মাংসল, বিশাল বক্ষঃস্থল ;
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ,
ললাট ভ্রূকুটি ভীম
নেত্র হতে নিঃসরে অনল।
(ত্রয়োদশ সর্গ)

পৃথ্বীরাজ যেমন বীর, পৃথ্বীরাজ-পত্নী সংযুক্তা তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না রূপসী,, 'দয়া মূর্ত্তিমতী ধর্মিষ্ঠা, প্রবীণা জ্ঞানে।' পৃথ্বীরাজের কাঠিন্য বর্ণনায় কবি যেমন পটু সংযুক্তার রূপবর্ণনাতেও কবি তেমনি নিপুণতার পরিচয় রেখেছেন—

সে রূপ-মাধুরী
কেমনে বর্ণিবে কবি। পূর্ণ চন্দ্র সম
শোভিছে বদন কান্তি, স্নিগ্ধ আভাময়ী;
বিশাল সুনীল নেত্র; প্রবাল নিন্দিত
শোভে চারু ওষ্ঠাধর; বক্ষ পীনোন্নত;
ক্ষীণ কটিদেশ; তনু ললিত সুঠাম।
কাঞ্চনে, রতনে, পুষ্পে সে বর মুরতি
দ্বিগুণ শোভিছে এবে।

(ষষ্ঠ সর্গ)

পৃথ্বীরাজ কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দু-জাতির অতীত গৌরব এবং পতনের কারণ দর্শানো হলেও কবি কাব্যটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হননি। সংযুক্তার রূপমাধুর্যে বিহ্বল পৃথ্বীরাজের আকুলতা, সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজের উপস্থিতি এবং সংযুক্তাকে নিয়ে পলায়ন ইত্যাদি কোন ঘটনাই কবির মনোযোগ থেকে দূরে সরে যায়নি। সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত রাজাদের—যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তা যেমন নিখুঁত, তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবির সূক্ষ্ম রসবোধের পরিমিতিবোধেও পাঠক মুগ্ধ হবেন, সন্দেহ নেই। চিত্রটি তুলে ধরার মত—

কেহ বা তরুন যুবা, সুরূপ, সুন্দর;
পঞ্চাশোর্দ্ধ, সুপ্রবীণ কোন কোন (ও) জন;
কেহ বা সপ্ততিপর, শিরে শুক্র কেশ
দন্ত বিগলিত; কিন্তু ঘোচেনি লালসা,
এসেছেন বর বেশে। কষিত কাঞ্চন
বর্ণ কার (ও); কেহ কৃষ্ণ, পিঙ্গল কেহ বা;
স্থূল সূক্ষ্ম হ্রস্ব, দীর্ঘ, নানা দেহধারী।

(ষষ্ঠ সর্গ)

সংযুক্তাকে নিয়ে পলায়নের পর—নৌকায় তাঁদের মিলন-দৃশ্যটি আরও সুন্দর—

ত্যজি' ছদ্মবেশ, সাজি' রাজ-পরিচ্ছদে,
বসিলেন পৃথ্বীরাজ তরণী মাঝারে
ধরি সংযুক্তার কর, নির্নিমেষ আঁখি
দুই জনে; বাক্য নাহি স্ফুরিতে বদনে
কি কাহিনী নয়ন যে কহিল নয়নে
উভয়ের, কেবা বল পারে বর্ণিবারে?
বুঝ কে তাবুক! কবি অক্ষম বর্ণনে।

(ষষ্ঠ সর্গ)

যোগীন্দ্রনাথের চিত্র-ধর্মিতা, শব্দচয়ন এবং অনায়াস ছন্দ এক একটি পঙ্‌ক্তিকে উজ্জ্বল রঙের দীপ্তি দিয়েছে। মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় এবং মৃত্যুর (?) পর সংযুক্তার শ্মশানে উন্মাদিনীর মত স্বামীকে খোঁজার দৃশ্যটি যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি ভয়ঙ্কর সুন্দর। শ্মশানের বর্ণনা কবির ভাষায় জীবন্ত হয়ে আছে—

পড়ি' নানাস্থানে
ভগ্নকুম্ভ, ঘট্টা, কন্থা, দগ্ধ কাষ্ঠরাশ।
কোথা প্রকটিত দন্ত নরমুণ্ড পড়ি'
হাসে ব্যঙ্গচ্ছলে যেন। অঙ্গারের মাঝে
শুভ্র অস্থিখণ্ড কোথা' দীপিছে আঁধারে।

(উনবিংশ সর্গ)

এহেন শ্মশানে সংযুক্তা পিশাচীর কাছে স্বামীর মৃতদেহ দেখে ভীষণা ভয়ঙ্করা হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু সংযুক্তা মূর্তিমতী দয়া হলেও সে বীর-জায়া; বিপদে সে কঠোরা। সংযুক্তার এই পরিবর্তন কবি কি দক্ষতাতেই না অঙ্কন করেছেন!

স্তম্ভিত সংযুক্তা; ক্ষণ, মন্ত্রমুগ্ধা প্রায়,
রহিলা দাঁড়ায়ে; অশ্রুহীন আঁখি হতে
ঝরিল স্ফুলিঙ্গ; তনু কুসুম-কোমল
হইল, সহসা, যেন পাষাণ-কঠোর;
দুর্জ্জয় কি মহাতেজ, প্রবেশি অন্তরে,
অঙ্গে অঙ্গে বরাঙ্গীর সঞ্চারিল বল।

(ঐ)

পৃথ্বীরাজ কাব্যের—অনায়াস গতি, বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরা যেভাবে দ্রুত এগিয়ে গেছে তাতে পাঠক মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নেই। হিন্দু কুলতিলক পৃথ্বীরাজের বীরত্ব, তাঁর উদারতা এবং পতনের বর্ণনা পর্যন্ত যোগীন্দ্রনাথের—দেশপ্রেমও ফুটে উঠেছে। সে-দেশপ্রেম সমস্ত রকম নীচতা হীনতার উর্ধ্বে। কবির ভাষায়

স্বদেশ বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায় ;
সীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ দু'এর মাঝে ;
ভারত সন্তান বলি' নাহি বুঝে কেহ

এই দোষেই পৃথ্বীরাজের পরাজয়, হিন্দুজাতির—পতন। তাই কবির সাবধানবানী উচ্চারিত হয়েছে—

আসমুদ্র হিমাচল স্বদেশ সবার
আচণ্ডাল—দ্বিজ সবে স্বধর্মী স্বজাতি
একের বিধ্বংসে হ'বে ধ্বংস সকলের।
(পঞ্চদশ সর্গ)

পৃথ্বীরাজ কাব্যের বিভিন্ন সর্গে অনেক খুঁটিনাটি চিত্র আছে সেগুলি যেমন মনোহর, তেমনি সুচিত্রিত। পৃথ্বীরাজের শেষবার যুদ্ধযাত্রায় প্রাক্কালে সংযুক্তার মনোভাব, বিভিন্ন ঘটনা অবশ্যম্ভাবী মহীরুহ পতনের ইঙ্গিত বহন করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি গোবিন্দের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের—কথোপকথনের অবকাশে কবি প্রকৃত বীর এবং যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ সেনাপতির দূরদর্শিতার পার্থক্যটুকুও দেখিয়েছেন। এ ছাড়া বহু ক্ষুদ্র ঘটনাও আছে। তবে বীরত্বই কবিকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছে। সেজন্যে 'বীরসুতা, বীরজায়া, বীর প্রসবিনী' রাজপুত রমণীদের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন—

অঙ্গের বরণ তপ্ত কাঞ্চন নিন্দিত,
পুষ্ট পরিপূর্ণ দেহ, কিবা সুললিত।
পীন, সমুন্নত বক্ষ নেত্রতৃপ্তিকর,
বিপুল নিতম্ব, উরু সুগোল সুন্দর।
গ্রীবা, বাহু মরি কিবা বর্তুল গঠন,
রক্ত ওষ্ঠাধর, স্ফুট সুনীল নয়ন।
কি আনন্দ, কিবা স্ফূর্তি ব্যক্ত মুখে করে,
পদক্ষেপে সজীবতা,—লাবণ্য নিঃসরে।

বীর-প্রসবিনীদের দেখে কবি পুলকিত হলেও, বঙ্গললনাদের কথা ভেবে নীরবে দু'ফোটা অশ্রুমোচনও করেছেন—

হেরি সে রমণীদলে মানস নয়নে
বঙ্গ-নারী মূর্তি পড়ে কবির স্মরণে।
রোগে শীর্ণা, গণ্ড, ওষ্ঠ লৌহিত্য-বিহীন ;
নয়ন কোটরগত, করপদ ক্ষীণ।
নাহি স্ফূর্তি, নাহি তেজ, দেহে নাহি বল,
কি অব্যক্ত মনস্তাপে নয়ন সজল।

কবির এই ক্রন্দন শেষ সর্গে আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ভুদাচার্যের অন্তরালে তিনি নিজেই যেন পৃথ্বীরাজের পতন পর্যবেক্ষণ করে শেষ অবধি জানিয়েছেন—

আমার এ বাঞ্ছা তবে পূর্ণ কোরো, দেব !
পতিতপাবন তুমি করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধারিও কৃপাগুণে। হিন্দু নর নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে
হিন্দুর দুর্গতি মূলে দুর্মতি হিন্দুর
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।

নিষ্ঠা এবং যথোচিত যোগ্যতার সঙ্গে ইতিহাসের যথার্থ চিত্রণে কবি যে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তা যে কোন কাব্যেরই শ্লাঘার বস্তু। ঘটনা উপস্থাপনা রসসঞ্চার এবং শব্দ ঝংকারেও কবি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।' তাঁর উপমাগুলিও অনবদ্য। দু একটি উপমা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত—

(ক) যার প্রিয়া পঙ্কজিনী পঙ্ক মাত্র চায় (ষোড়শ সর্গ

(খ) শিক্ষক যেমতি
শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে। (২য় সর্গ)

(গ) শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে (ঐ)

(ঘ) শিলাখণ্ড, বাঁধা পরস্পর
রোধ করে স্রোত বেগ, তরঙ্গ উত্তাল ;
কিন্তু অনাবদ্ধ হলে, 'উলটি' 'পালটি'
হয় ক্রমে, রেণু শেষ। (ঐ)

(ঙ) থাকুন দাম্ভিনী সতী

শশিব্রতা, ইন্দ্রাবতী

যোগ্যা পত্নী সংযুক্তা তোমার ;

রাধা বিনা ঘনশ্যাম

কেনা জানে শূন্যধাম.

থাকুন সহস্র গোপী তাঁর ? (৫ম সর্গ)

পৃথ্বীরাজ কাব্য পড়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"পদলালিত্যে ও অর্থ গৌরবে, ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্যে ও ভাবের বিশদতা পূর্ণ গাম্ভীর্যে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে ও আখ্যায়িকার রচনা পারিপাট্যে এবং প্রকৃতির শোভাবর্ণনে ও চিত্রিত চরিত্র প্রস্ফুটনে—এই সমস্ত সদগুণে পৃথ্বীরাজ প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে।" 'বেঙ্গলী' পত্রের মন্তব্যটুকুও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

In melody of diction, grandeur of description, loftiness, of sentiments and its faithful representation of men and manners, the book deserves to be ranked with the masterpieces of our literature.

পৃথ্বীরাজ কাব্য অধুনা বিস্মৃত হলেও কবি এ কাব্যের যথোচিত সমাদর এবং জনপ্রিয়তা দেখে গিয়েছিলেন। তাই পরে শিবাজী কাব্য রচনার অনুপ্রেরণাও লাভ করেন। পৃথ্বীরাজ কাব্য পাঠকের কাছে শিবাজী কাব্যেরও একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। শিবাজী কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি এ সংগতির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন —"পৃথ্বীরাজে আমি হিন্দুজাতির পতন বর্ণনা করিয়াছিলাম। পতনের পর উত্থান প্রকৃতির নিয়ম। শিবাজীতে আমি এই উত্থান বর্ণনা করিয়াছি।......... সাদৃশ্যের উল্লেখে যদি কেহ অনুচিত স্পর্দ্ধার আরোপ না করেন তবে উপসংহারে বলি—Paradise Lost এর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয়, পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান পাঠ করাও সেইরূপ আবশ্যক।"

পদলালিত্য, শব্দঝংকার, গতির সাবলীলতা ইত্যাদি সমস্ত গুণ থাকা সত্বেও পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী কাব্য দু'খানি কালজয়ী সৃষ্টির সম্মান লাভ করতে পারেনি। তাতে অবশ্য আক্ষেপ করার কিছু নেই। যোগীন্দ্রনাথ যে মহাকবির জীবনীরচনা করে অমর হয়ে আছেন—সেই অবিস্মরণীয় রচনার ভিত্তিমূলে এই কাব্য দু'খানিই দুটি স্তম্ভ হয়ে স্মরণীয় থাক।

অলকানন্দার কূলে কূলে

অমিয়ময় বিশ্বাস

রুদ্র প্রয়াগ সমুদ্রতট থেকে ২০০০ ফুট উঁচুতে। এখানে বদরীনাথ আগত অলকানন্দার সঙ্গে কেদারাগত মন্দাকিনীর সঙ্গম। পাহাড়ের পথ থেকে সঙ্গমের ঘাট প্রায় ১০০ ফুট নীচে। উঁচু উঁচু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে হয় সঙ্গমের বাঁধানি চত্বরে। অলকনন্দার আবর্ত্তিত ও আলোড়িত জলরাশি ঢেউ তুলে সগর্জ্জনে ছুটে যাচ্ছে। কার সাধ্য জলে নামে, দেখলেও মাথা ঘুরে ওঠে। অতি সাহসী ও নিষ্ঠাবান ভক্ত যাত্রীগণ মাটি দিয়ে সঙ্গমের জল সন্তর্পণে তুলে স্নান পর্ব্ব কোনও প্রকারে সমাধা করেন। দুই পাশেই বয়ে আসছে মন্দাকিনা—মন্দাক্রান্তা তালে দুই বিপরীতধর্ম্মী স্রোতস্বতীর অপূর্ব্ব মিলনে রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গম সকল তীর্থযাত্রীর প্রণম্য।

পরদিন ভোরে ধর্ম্মশালা থেকে বের হয়ে দেখি পথের ওপর যাত্রীবাহী বাসগুলি সামনের পাহাড়ের টানেল পর্য্যন্ত সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। শর্ম্মাজী বল্লেন, এই বাসগুলি কেদারের যাত্রী নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। কেদারের পথ—বদরী বিশালের পথের চেয়েও কঠোর। মহাদুর্গম, দুরারোহ, তুষারমণ্ডিত পথে রুদ্র মহেশ্বরের মন্দির। এই কঠিন পথে অশক্ত দুর্বল বা যারা রুগ্ন তাদের পক্ষে পায়ে হাঁটা পথে কেদার দর্শন করে পুনরায় বদরীনাথ যাত্রা অসম্ভব। তাদের ভাগ্যে শুধু-বদরী। চার লোক—কেদার বদরী গাঙ্গোত্রী যুমুনোত্রী দর্শনের পুণ্য তাদের ভাগ্যে লেখা নেই। অধুনা বাস হয়ে অবধি কেদারের যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। তবুও এখনও সবটা পথে বাস চালু হয়নি। কেদারের পথে গুপ্তকাশী থেকে সুরু হবে বুক ভাঙ্গা চড়াই। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। পায়ে খিল ধরে। লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলে চলে হাতে ফোস্কা পড়ে। শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরকে পাশে রেখে কেদার যাত্রীদের উঠে আসতে হয় ৬০০০ ফুট উঁচু ত্রিযুগী. নারায়ণে। মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে দু-পাশে নিয়ে রত্ন সিংহাসনে সমাসীন। তার পর বনময় পার্ব্বত্যপথে নেমে আসতে হয় গৌরীকুণ্ডে। সেখান থেকে আবার চড়াই। বৃক্ষলতা শূন্য, জনহীন, নিস্তব্ধ পথে রামওয়ারা চটি—তার পর তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের গায়ে অসংখ্য ঝরণা ডিঙ্গিয়ে তুষার ঝটিকা বিক্ষুব্ধ বরফে ঢাকা পথের শেষে খর স্রোতা মন্দাকিনীর ওপারে দেবাদিদেব মহাদেবের কঠিন প্রস্তরের হিম দেউল। এই মন্দিরের অবস্থান পাহাড়ের এমন একটি অংশে যে সেখানে সূর্য্যালোক কচিৎ প্রবেশ করে। সর্ব্বদা মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টি, তুষারপাত আর হিমশীতল মত্ত বায়ুর মহাগর্জ্জন।

"কেদারের মহেশ্বর কোনও মূর্ত্তি নন। একটা অসমান কালো পাথরের স্তূপ মাত্র। শিব পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ভগবান বেদব্যাসের উপদেশ অনুযায়ী পাণ্ডবগণ জ্ঞাতিহত্যার পাপস্খলনের নিমিত্ত এই কেদারনাথ শিবের শরণাপন্ন হন। শিব পাণ্ডবগণের এই গুরু পাপে কুপিত হয়ে তাদের এড়াবার উদ্দেশ্যে যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে আত্মগোপন করতে সচেষ্ট তখন মহাবলী ভীম শিবের পার্শ্বদেশ আকর্ষণ করে মহেশের মৃত্তিকায় প্রবেশে বাধা দেন। ভীমের অদ্ভুত ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব পাণ্ডবদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সেই প্রাচীন কাল হতে অদ্যাপি মহেশের মহিষরূপী পার্শ্বদেশ এই কেদারনাথে শিলাস্তূপরূপে বিরাজমান।"

"কোনও কোনও পুরাণের মতে পাণ্ডবগণ মহাদেবের মার্জনা লাভ করে তুষারাবৃত স্বর্গারোহিনী গঙ্গাকে

অনুগমন করে কেদার মন্দিরের পশ্চাতের ভীষণ দুর্গম পার্বত্য পথে বদরিকাশ্রমে শ্রীবিষ্ণুর ক্ষমালাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একমাত্র যুধিষ্ঠির এই দুরূহ পথ অতিক্রম করে বদরিকাশ্রমে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য পাণ্ডবগণ ও দৌপদী এই তুষার পথে চির সমাধি প্রাপ্ত হ'ন।

শর্মাজী বলতে লাগলেন যে "বাস হয়ে অবধি সর্বসাধারণের পক্ষে দেবদর্শন সহজ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপার্জ্জনের বহুবিধ পন্থাও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই আধুনিক সভ্যতার সম্প্রসারণে-ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেবতার দেবত্ব আর মানুষের মনুষ্যত্ব। জটাজুটধারী, প্রায় অর্দ্ধনগ্ন, অস্নাত, অভুক্ত, মলিন বসন পরিহিত তীর্থযাত্রীগণের যে ভগবদ্‌ভক্তি, নিষ্ঠা-সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যেত আজ তা অদৃশ্য। পথের আশ্রয় চটিতে, জীবন ধারণের খুদ কুঁড়া বিক্রেতার ও এই অঞ্চলের জনসাধারণ প্রায় নিঃস্ব এই তীর্থ যাত্রীদের দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগের পথে দেবদর্শনের পুণ্য আকাঙ্ক্ষাকে বিনীত মহারাজ সম্বোধনে যে বিপুল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তা আজ লুপ্ত। আজকার তীর্থযাত্রীরা কেউ আর মহারাজ নন্‌। তাঁরা শেঠ—মানে ধনী' অথবা বাবু, মানে স্বচ্ছল, শিক্ষিত ভদ্রলোক। তীর্থযাত্রাতেও তাঁরা আরামদায়ক অভ্যাসগুলি বজায় রেখে নিজেদের সুবিধামত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে-মিউ-জিয়ামে রক্ষিত মূর্ত্তিদর্শনের ন্যায় দেবদেউলে দেবদর্শনে ভ্রাম্যমান। চটির পথে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি হত—বিপদে, দুঃখে পরস্পরকে সাহায্য করবার যে মহান আকাঙ্ক্ষা মনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেত তা ঐ জনশূন্য বদরীবিশালের পথের বিলীয়মান রেখায় বিলুপ্ত। এযুগের অধিকাংশ দেবদর্শনেচ্ছু যাত্রীগণ আর ভক্ত তীর্থযাত্রী নন্‌। তাঁরা কৌতূহলী টুরিষ্ট মাত্র। অতীত মুছে যাচ্ছে—এসেছে নূতন রূপ,—নূতন মান-আধুনিক নবীন দৃষ্টিভঙ্গী।"

আমরা চলেছি নন্দ প্রয়াগ—কর্ণপ্রয়াগের পথে। অলকনন্দা পাশে পাশে ধীর গতিতে প্রবাহমানা। প্রভাতের সূর্য্যালোকে অলকনন্দাকে কি শান্ত দেখাচ্ছে গত রাত্রের ঘন আঁধারে রুদ্র প্রয়াগের অলকনন্দার রুদ্র রূপ মনে হচ্ছে যেন দেখার ভুল। এত মিষ্টি ও স্নিগ্ধ তার রূপ। নন্দ প্রয়াগের মন্দাকিনীকে নদী মনে করলে ভুল হবে। নন্দাকিনী ছোট পার্ব্বত্য ঝরণাবয়ে যাবার মত সঙ্কীর্ণ একটি রেখা মাত্র। ছোট পুলের ওপর দিয়ে সেই নদী নাম্নী মন্দাকিনী পার হলাম। এর পর এলাম কর্ণগঙ্গার সঙ্গম অকলনন্দার সঙ্গে; অলকনন্দা এখানে কনিষ্ঠা ভগিনী। জ্যেষ্ঠা কর্ণ-গঙ্গার যেমন বিস্তার তেমনি তার স্রোত। সঙ্গমে জলের ভেতর একটি স্তম্ভ সদৃশ উচ্চ শিলা—মহাবীর কর্ণের তপস্যার আসন। প্রখর সূর্য্যালোকে অলকনন্দা ও কর্ণগঙ্গার আলোড়িত জলরাশি আলোকের কণা বিচ্ছুরিত করে—প্রবল ঢেউ তুলে মহাবীর কর্ণের শিলাসনের নিয়ে ভীমবেগে প্রবাহিত। চামোলীর বিস্তৃত উপত্যকায় দেখলাম ধীরগামিনী অলকনন্দাকে। পিপলকুঠির বিখ্যাত চটি-গুলি আজ শূন্য। আমরা বেলাকুচি পার হয়ে এলাম হিমালয়ের বিখ্যাত কেন্দ্র যোশীমঠে ৬০০০ ফুট উঁচুতে। চারিদিকে পাহাড়ের মাথায় বরফের উষ্ণীষ।

এখানে আমরা মহামানব শঙ্করাচার্য্যের তপস্যার স্থান দেখলাম। যে বৃক্ষের নীচে বসে তিনি তপস্যা করেছিলেন সেই সেঁতুত .(MULBERRY) বৃক্ষটি আরও কয়েকটি বৃক্ষের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আজও বিদ্যমান। নিকটেই ফল ও ফুলের বাগানের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠ।

শঙ্করাচার্য্য কেরল প্রদেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতা সুভদ্রা। ইনি নর্ম্মদাতীরবাসী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর উপদেশে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কাশীধামে গমন করেন। তাঁর আবির্ভাবের কালে সমস্ত উত্তর ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে প্লাবিত। বৈদিক হিন্দুধর্ম নিষ্প্রভ। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত ভাষ্যের প্রচার দ্বারা নাস্তিকতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হতে হিন্দু-

ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। তাঁর বিপুল জ্ঞান, অখণ্ডনীয় যুক্তি, সারগর্ভ উপদেশ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হিন্দু জনগণের উৎসাহ যাতে মন্দীভূত না হয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মুখ্যস্থানে হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎস্য চার বেদের চর্চ্চা ও প্রচারের নিমিত্ত মঠ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে—আরব সাগরের কূলে দ্বারকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বারকামঠ ও মন্দির বিদ্যমান। সন্ন্যাসীদের অঙ্কিত নাম "তীর্থ"। মন্দিরের দেবমূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বর ও দেবীমূর্ত্তি ভদ্রকালী। আচার্য্যের উপাধি হস্তামলক বেদ সামবেদ, ও মহাবাক্য—"তত্ত্ব 'মসি"। সুদূর দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরীমঠের সন্ন্যাসীদের অঙ্কিত নাম সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। মন্দিরের দেবতা আদি ভৈরব ও দেবী কামাক্ষী। মন্দিরের আচার্য্য সুরেশ্বরাচার্য্য—বেদ-যজুর্ব্বেদ এবং মহাবাক্য অহম ব্রহ্মোস্মি। পূর্ব্বে—বঙ্গোপসাগরের কূলে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠের সন্যাসীদের অঙ্কিতনাম—অরণ্য, বন। মন্দিরের দেবতা জগন্নাথ ও দেবী বিমলা। মন্দিরের আচার্য্য পদ্মপাদ বেদ ঋগ্বেদ এবং মহাবাক্য প্রজ্ঞানাম ব্রহ্ম। আর ভারতের উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের কোলে এই যোশীমঠ। জ্যোতির্ম্মঠের সাধুদের অঙ্কিত নাম গিরি পর্ব্বত, সাগর। দেবমন্দির বদরীধামে, দেবতা-নারায়ণ দেবী "পূর্ণাগিরি। আচায্য ও মঠাধীশ তোটকাচার্য্য বেদ অথর্ব্ববেদ এবং মহাবাক্য অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

শর্ম্মাজী বলতে লাগলেন যে বদরিকাশ্রমে বিষ্ণু পূজার বর্ত্তমান রূপের সঙ্গে মহামনা শঙ্করাচার্য্যের সম্পর্ক সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে এর আদিকথা জানা প্রয়োজন। পুরাণে এবং মহাভারতে বদরীকাশ্রমের বহুল উল্লেখ আছে। পুণ্যভূমি বদরীবিশালপুরীর প্রথম উল্লেখ পাই বরাহপুরাণে। নর ও নারায়ণ পর্ব্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকায় সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশাল তাঁর হৃত রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত কঠোর তপ করেন সেই আদিকাল হতে এই উপত্যকার সহিত রাজাবিশালের নাম সংযুক্ত হয়ে আছে। পুরাণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে তৎকালে বদরীনাথে কোনও দেবতার মূর্ত্তি বা তার পূজার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ঋষি নারদ বদরিকাশ্রমে সর্ব্বপ্রথম নারায়ণ পূজার প্রবর্ত্তক।

সেজন্য এই উপত্যকার অন্য নাম নারদীয় ক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণু যখন দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন দেবগণ ও মুনি ঋষিগণ বিষ্ণুর অভাবে বিষ্ণু পূজা কিরূপে সম্ভব হবে জানবার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং ভক্তজনের প্রার্থনায় প্রীত হয়ে ভগবান বদরিকাশ্রমে প্রবাহিত অলকনন্দার এক কুণ্ডে আপনার প্রবাহিত প্রতিমূর্ত্তির সন্ধান দেন এবং ঐ মূর্ত্তি উদ্ধার করে মর্ত্তে বিষ্ণুপূজা প্রচারিত করতে আদেশ করেন।

মহর্ষি নারদ অলকনন্দার দক্ষিণ তীরের এক কুণ্ড হতে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ শালগ্রাম শিলা উদ্ধার করে তপ্ত কুণ্ডের উত্তরে বরাহশিলাসনে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে বিষ্ণুপূজা মর্ত্ত্য ধামে প্রচলিত করেন। আচার্য্য নারদই বদরীনাথের প্রথম ও প্রবীণ অর্চক এবং তাঁরই ব্যবস্থামত এই পূণ্যপীঠে দেবগন বৎসরের ৬ মাস পূজাকরেন এবং অবশিষ্ট ৬ মাস মনুষ্যদের পূজার জন্য উন্মুক্ত রাখেন।

"বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবকালে ভগবানের এই মূর্ত্তি পুনরায় কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বদরীধামে বিষ্ণুপূজা প্রায় ৫০০ বৎসর বন্ধ থাকে। ভবিষ্যপুরাণে এই মূর্ত্তির উল্লেখ ও তার আনুসঙ্গিক বিবরণ পাঠ করে শঙ্করাচার্য্য এই বিষ্ণুমূর্ত্তি পুনরায় নারদকুণ্ড হতে উদ্ধার করে গরুড়শিলায় স্থাপিত করেন এবং বদরিকাশ্রমে তুষারাবৃত অঞ্চলে স্থায়ী মঠ স্থাপন অসম্ভব বিবেচনা করে নিকটস্থ যোশী মঠে নিজের তপস্যার স্থান নির্ব্বাচন করে বাস করতে থাকেন এবং শেষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কেদারখণ্ডে দেহরক্ষা করেন। এই হচ্ছে বদরিকাশ্রমের সহিত মহামানব শঙ্করাচার্য্যের সম্পর্কের কাহিনী।

দ্বিতীয় বার নারদকুণ্ডে নিক্ষেপকালে এই মূর্ত্তির কিছু অঙ্গ হানি ঘটে। কালে এই মন্দির ও উপত্যকাভূমি গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গাড়োয়াল রাজ এই দেব-বিগ্রহের ও কেদারের মহেশ্বরের পূজায় ভবিষ্যতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে—সেজন্ত ১৫০টি গ্রাম দেবোত্তর দান করেন। এছাড়া বদরীনাথের নিজস্ব জমিদারীও কিছু আছে। এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ যে 'ফুলপুর' নির্ব্বাচনকেন্দ্র থেকে ৺পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রতিবার লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন সেই ফুলপুর অঞ্চলও বদরীনাথের জমিদারীভুক্ত।

বদরীনাথের বর্তমান মন্দির ১৬শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালরাজ মন্দিরের অধ্যক্ষ-স্বামী বরদারাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুকরণে নির্মাণ করেন। ইন্দোরের পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাঈ এই মন্দিরের চূড়ার স্বর্ণছত্র দান করেন। অলকনন্দার সন্নিকটস্থ তপ্তকুণ্ডের সম্মুখে প্রায় ৫০।৬০টি উঁচু সিঁড়ি মন্দিরের সিংহদরজা পর্য্যন্ত উঠে গেছে তারপর প্রাঙ্গণের মাঝে বদরীবিশালের মুখ্য মন্দির।

যোশীমঠ থেকে আমাদের সঙ্গের বাসগুলি পাহাড় থেকে প্রায় গড়িয়ে নামল—অলকনন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমে—বিষ্ণুপ্রয়াগে। এরপর আমরা অলকনন্দার তীরে তীরে এলাম গোবিন্দঘাট চটিতে। নবম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ পূর্ব্বজন্মে মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত মেধস্ ঋষিরূপে নিকটবর্তী তুষারাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক হ্রদ হেমকুণ্ডের তীরে সাধনা করেছিলেন। তাঁর লিখিত জীবনচরিতে এ কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই হ্রদ ও পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে আছে হিমালয়ের বিখ্যাত পুষ্প উপত্যকা।

১০ মাইল পর পাণ্ডুকেশ্বর। পাণ্ডুকেশ্বরের রামানুজ সম্প্রদায়ের ফুলের বাগান থেকে বদরীবিশালের দৈনিক পূজার ফুল সরবরাহ করা হয়। পথ এখন কঠোর চড়াই। দু'পাশের পাহাড় একেবারে খাড়া ওপরে উঠে গেছে। বৃক্ষলতাশূন্য কঠিন পাথরের গাঢ় ধূসর দেয়াল—কোথাও বা হলদে সেওলার সামান্য প্রলেপ—কোথাও বা এক আধটা ঘনসবুজ পাইন-গাছের চারা ঐ খাড়া পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

পথেরসাথী অলকনন্দা হারিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাহস করে খাদের ধারে শুয়ে নীচে তাকালে হয়ত তার রূপালী জলরেখা দেখা যেত—কিন্তু সময় যে নাই। দুই পারের পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ ব্যবধান—গভীর অতলে প্রবাহিতা—অলকনন্দাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছে। অলকনন্দা শুধু যে অদৃশ্য তাই নয়—তার নূপুর নিক্কণও আর শোনা যায় না। রৌদ্রালোক বঞ্চিত, হিমশীতল পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ ফাটলের পথে ক্ষীণকায়া অলকনন্দা সবার অগোচরে—অনাদরে বয়ে চলেছেন।

গাড়ীর ইঞ্জিন ভীষণ শব্দ করে 'রেডিয়েটর থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে চড়াই পথে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগল। গাড়ীগুলি প্রতিটি ঝরণার নীচে থামে আর বরফগলা ঠাণ্ডা জল ভরে নিলে পুনরায় সতেজে চলতে আরম্ভ করে। এমনি করে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা উঠে এলাম ৮০০০ ফুট উঁচু-হনুমানচটিতে।

হনুমানচটির ৪ দিকে ৪টি বিশাল পর্ব্বত। পূর্ব্বে ঋগ্বেদ পর্ব্বত, পশ্চিমে সাম বেদ, দক্ষিণের নাম চতুর্ব্বেদ আর উত্তরে অথর্ব্ববেদ। ৪ বেদ রক্ষিত, অলকনন্দার পুণ্যবারি বিধৌত সঙ্কীর্ণ পথের শেষে বদরীবিশালের বৈকুণ্ঠপুরী। হনুমানচটি হতে বদরীনাথ মাত্র সাড়েচার মাইল কিন্তু আরও ২৫০০ ফুট উঁচুতে। আমরা বরফে-ঢাকা চড়াই পথে ওপরে উঠতে লাগলাম। এপাহাড় কঠিন পাথরের নয়—পাথর ও বালির স্তূপ মাত্র। মাঝে মাঝে ধ্বস্ নেমে পথকে আরও সঙ্কীর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল করে রেখেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য শুভ্র বরফের চাদর। তার নীচে থেকে তুষার শীতল জলস্রোত পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে। আমরা অতি সাবধানে এই বিঘ্নসঙ্কুল পথটুকু পার হলাম। ভয়ে, আনন্দে আমাদের বুক দুরু দুরু।

এসে থামলাম "দেবদর্শনীতে"। এখানে আমরা সবাই নেমে বদরীবিশালের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম; সামনেই ঘন নীল আকাশতলে তীক্ষ্ণশীর্ষ, উন্নত, রজত-শুভ্র নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের নীচে বরফাচ্ছাদিত নারায়ণ পর্ব্বতের কোলে দেখলাম বৈকুণ্ঠপুরী বদরীকাশ্রম।

তার মধ্যভাগে স্বর্ণছত্রের আলোকছটায় উদ্ভাসিত—বদরীবিশালের বিষ্ণুমন্দির। শেষ মধ্যাহ্নের তপনের রক্তাভ রশ্মি—দুগ্ধ-ফেন-নিভ তুষাররাশি ও মন্দিরের স্বর্ণ চূড়ায় প্রতিফলিত হয়ে অলৌকিক শোভার সৃষ্টি করল। মনে হ'ল আজ আমরা পৃথিবীর কল কোলাহল, বিরামহীন কর্মব্যস্ততা ও সব দুঃখ দৈন্যের অন্তে সর্বশান্তির আধার স্বর্গপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। মেঘনির্মুক্ত আকাশতলে, পাহাড়ের আবেষ্টনের মাঝে-সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ও স্নিগ্ধ শীতলতা এই দেবভূমির শান্তি ও পবিত্রতাকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। আমরা মোহাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে—সুউচ্চ বিষ্ণুমন্দির, অলকনন্দার পারে ব্রহ্মকপালের ঘাট, আচ্ছাদিত তপ্ত কুণ্ড ও অলকনন্দার সেতু।

হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা অলকনন্দার পারে অতিথিশালায় এসে পৌঁছলাম। ১০,৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ী এলাকার তরল আবহাওয়ায় আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জিনিষপত্র সহ বিশ্রামের জন্য রেখে সবাই পাণ্ডাজীর সঙ্গে দেব দর্শনাকাঙ্খায় বের হয়ে পড়লেন। আমার জন্য ডাণ্ডি আসছে—পাণ্ডাজী আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

কিন্তু বসে থাকতে পারলাম না। মনের ভেতরে দেবদর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। আমি ধীরে ধীরে অলকানন্দার সেতু অতিক্রম করে—তপ্তকুণ্ডের সামনে এসে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভগবান নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের অলিন্দ জনহীন।

আজ জীবনের শেষে ডাক্ দিলে প্রভু। আমি যে সমস্ত জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। 'তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যে জন্ম-জন্মান্তরের। তুমি আমি যে অভিন্ন, অবিভাজ্য। কোন পাপে তোমা হতে আমি এত দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম সে পাপের মলিনতা কি ধুয়ে গেছে যে আজ তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নিলে—তোমার আমার মিলনই যে আমার শতলক্ষ জন্মের সাধনা।

প্রভো আমরা যেন আর কখনও পরস্পরকে ভুলে না থাকি। চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।' বদরী বিশালের চক্ষুও যেন সজল হয়ে উঠল।

অসীম আকাশ হতে ভগবানের আশীর্বাদ মাথার ওপর বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়তে লাগল।

মাদ্রাজে মধুসূদন

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

১৮৪৮ সালের প্রথমে মধুসূদন মাদ্রাজে চলে যান। আগের বছর রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। মধুসূদন মাদ্রাজে আট বছর ছিলেন। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত মধুসূদনের শিক্ষকতা করে কেটেছে। ১৮৪৮ সালে মধুসূদন মাদ্রাজে মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে ইংরাজী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। এই বছরেই মধুসূদনের বিয়ে হয়।

রেবেকা ম্যাকটাভিস এক ধনী নীলকরের মেয়ে। অপরূপ লাবণ্যময়ী রেবেকা। রেবেকা মাদ্রাজে মেল অরফ্যান অ্যাসাইলমের বালিকা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। মধুসূদন রেবেকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রেবেকার আত্মীয়-স্বজন এই বিয়েতে আপত্তি করেন। সেসময় মিঃ নর্টন ছিলেন মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল। মিঃ নর্টন মধুসূদনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

১৮৪৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন এক চিঠিতে প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন গভীর ক্ষোভ, হতাশায়, দুশ্চিন্তা নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেম। এই চিঠিতে মধুসূদন তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিয়েতে যে প্রবল বাধা এসেছিল সে কথাও উল্লেখ করেছেন। মধুসূদন লিখেছেন, **Miss Din of English parsentage. Her father was an indigo planter of this presidency: I had great trouble in getting her.**

১৮৪৯ সালে মাদ্রাজ সার্কুলেটার পত্রিকায় মধুসূদনের ক্যাকটিভ লেডি প্রকাশিত হল। মধুসূদন ছদ্মনামে এই কাব্যটি লেখেন তাঁর ছদ্মনাম ছিল টিমাথি পেনপোয়েম। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি কাব্যটি রচনা করেন।

মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে রামায়ণ মহাভারতের কথা ভুলে যান নি। তিনি ইংরাজীতে কাব্য রচনা করলেও মহাকাব্যদ্বয়ের কথা বিস্মৃত হন নি। ১৮৪৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখেছেন, শ্রীরামপুর সংস্করণের রামায়ণ ও মহাভারতের এককপি করে বই তাঁর কাছে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মধুসূদন মাদ্রাজে 'স্পেকটেটর', মাদ্রাজ সার্কুলেটর অ্যাণ্ড জেনারেল ক্রনিকল, এথিনিয়ম পত্রিকায় লিখতেন। তিনি এথিনিয়ম সংবাদ পত্রের প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু ক্রনিকল নামে একখানি ইংরেজ সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েছিলেন। হিন্দু ক্রনিকল ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

মধুসূদন অ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ নর্টনকে ক্যাপটিভ লেডি উৎসর্গ করার কথা ভাবেন। ১২শে মে মার্চ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখেছেন, ক্যাপটিভ লেখা হয়ে গেছে, আমি অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ নর্টকে এই কাব্য উৎসর্গ করব বলে ঠিক করেছি। তাঁর কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছি। সাহিত্যানুরাগী মিঃ নর্টনের কাছে কাব্যের প্রথম সর্গ, দ্বিতীয় সর্গের কিছুটা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি তাঁর কাছে আন্তরিক সহানুভূতি পাব বলে আশা করি।

মধুসূদন এই চিঠিতে লিখেছেন, আমি মাদ্রাজে মেল আরফ্যান অ্যাসাইলমের শিক্ষক, আমার ছাত্ররা ইউরোপীয় ও ভারতীয়। আমার সাজপোষাক তাদের মত। মধুসূদনের সঙ্গে যদি রেবেকার পরিচয় না হত, যদি রেবেকার সংগে তাঁর বিয়ে না হত, হয়ত তাঁর

পক্ষ্যে ক্যাপটিভ লেডি কাব্যটি লেখা সম্ভব হত না। অপরূপ রূপলাবন্যময়ী রেবেকা মধুসূদনকে ক্যাপটিভ লেডি লেখার প্রেরণা যুগিয়েছেন। প্রেমিককবি মধুসূদন ১৮৪৯ সালের ১৯মে মার্চ তারিখের চিঠিতে স্বীকার করেছেন, **Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the caption addressed to her.**

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine;
Woo'd by melodious worship ! welcome then,
Tho' ours the home of want—I ne'er repine :

..

Thou love—thou gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality !

মধুসূদন গৌরদাসকে ক্যাপটিভ লেডির কপি পাঠিয়ে দেন। গৌরদাস ক্যাপটিভ লেডি পড়ে মুগ্ধ হয়ে মধুসূদনকে চিঠিতে লিখেছেন : **I have read your poem with the deepest interest. It gives me exceeding pleasure to be able to add that I rose from its perusal with a higher opinion of your talents...**

গৌরদাস ক্যাপটিভ লেডির প্রশংসা করলেও তাঁর ধারণা ছিল : মধুসূদন যদি বাংলায় কাব্য রচনা করেন, তিনি খ্যাতিমান হতে পারতেন। তাই তিনি মধুসূদনকে লিখেছেন : I wish Modu, I do sincerely wish, nay I would entreat you to the very end of the world, to turn to your old mother Bengalee with all possible attention.

গৌরদাস বসাক ছিলেন মধুসূদনের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তিনি মধুসূদনকে বারবার বাংলায় কাব্য রচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। গৌরদাস মধুসূদনকে লিখেছেন, তিনি যেন ক্যাপটিভ লেডির এক কপি বই ড্রিংকওয়টার বেথুনকে পাঠিয়ে দেন। বেথুন ছিলেন তখন এডুকেশান কাউন্সিলের সেক্রেটারী। বেথুন সাহেব ক্যাপটিভ লেডী পড়ে মুগ্ধ হন। কিন্তু তিনি গৌরদাসকে লেখেন, মধুসূদন যদি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন, তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করবেন, তিনি অমরত্ব লাভ করতে পারবেন। গৌরদাস বেথুনের এই চিঠি উল্লেখ করে মধুসূদনকে লিখেছেন, বেথুন সাহেব ঠিকই লিখেছেন, তাঁর উপদেশ ঠিক, এ কথা আমিও বার বার বলেছি, আবার বলছি. ইংরেজী সাহিত্যে আর একজন বায়রণ, আর একজন শেলীর প্রয়োজন নেই, আমাদের বাংলা সাহিত্যে বায়রন অথবা শেলীর বড় অভাব।

মধুসূদন ক্যাপটিভ লেডী লিখে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন কিন্তু কলকাতায় পত্র পত্রিকায় তাঁর কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে হিন্দু ইনটেলিজেনসার বেঙ্গল হরকরার নাম উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল হরকরা মন্তব্য করে : These verses of M. N. S. Dutta are very fair amateur poetry. মধুসূদন এই সমালোচনা পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গৌরদাসকে লিখেছিলেন : curse that rascal, his article......... like a shaft......ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদনের কাব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। মধুসূদন গৌর দাসকে লিখেছেন, Do look out for the Review.

মধুসূদন বিয়ে করে সুখেই ছিলেন। তাঁর চিঠি পড়ে বোঝা যায় যে তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। ১৮৪৯ সালের ৬ই জুলাই তারিখের চিঠিতে মধুসূদন লিখেছেন : আমি খুব শীগগীর পিতৃত্বের অধিকার পেতে চলেছি, আমার ভাগ্য এখন সুপ্রসন্ন।

মধুসূদন ছিলেন অধ্যয়নপ্রিয়। তিনি মাদ্রাজে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। ১৮৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখের চিঠিতে মধুসূদন গৌর দাসকে লিখেছেন, একজন স্কুলের ছাত্রের চেয়েও আমি পড়াশোনায় বেশী ব্যস্ত। এসময় মধুসূদন হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজী ভাষা শিখেছিলেন। মধুসূদন প্রতিদিন স্কুলে চারঘন্টা শিক্ষকতা করেছেন আর বারো ঘন্টা বিভিন্ন ভাষা শেখার জন্তে পড়াশোনা করেছেন।

গৌরদাস বসাক চান নি, মধুসূদন মাদ্রাজে পড়ে থাকুন। তিনি মধুসূদনকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্যে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন। ১৮৫৫ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে মধুসূদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত মারা যান। মধুসূদন বাবার মৃত্যুসংবাদ পাননি। তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্পত্তি গ্রাস করার চেষ্টা চালান। পরমবন্ধু গৌরদাস বসাক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানান, তিনি যেন মধুসূদনকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গৌরদাস মধুসূদনকে লেখেন: তোমার বাবা, মা দুজনেই মারা গেছেন। তোমার খুড়তুতো ভায়েরা পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তোমার দুই বিমাতা এখনও বেঁচে। তাঁদেরও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। তুমি যদি কলকাতায় ফিরে আসো তোমার সম্পত্তি তুমি ফিরে পাবে।

১৮৫৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে চিঠির উত্তরে লিখেছেন, মিঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি জানতাম, আমার মা বেঁচে নেই। কিন্তু আমি কখনও ভাবতে পারিনি, আমি ভাগ্যহীন হয়েছি। এখন আমি কি করব! মধুসূদন দুঃখ করে লিখেছেন, আমার বাবা মারা গেলেন, আমি জানতে পারলাম না। একটা বছর প্রায় কেটে গেল, আর আমি জানলাম না, আমার বাবা নেই। কবে, কোথায় মারা গেলেন তা জানতে পারলাম না। মধুসূদন এই চিঠিতে জানতে চেয়েছেন বাবা কি পরিমাণ সম্পত্তি রেখে গেছেন।

এসময় মধুসূদন নানা অশান্তিতে ভুগেছিলেন। তাঁর বড় অর্থকষ্ট চলছিল। তিনি এই চিঠিতে খোলাখুলি লিখেছেন, I am a very poor man just now তিনি চিঠির সব শেষে জানিয়েছেন, তিনি শহরের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'স্পেকটেটার'এর সহ-সম্পাদক।

১৮৫৬ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে গৌরদাস মধুসূদনকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে এক সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন। গৌরদাস লিখেছেন, তুমি ওখানে শিক্ষকতা করছ, এই শহরে আরো ভাল সুযোগ পাবে। তুমি যদি এখানে চলে আসো, আমি নিজের টাকায় একখানা কাগজ প্রকাশ করব, সেই কাগজের সম্পাদক হবে তুমি, যদি ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আমার, যদি লাভ হয়; তার সবটা তোমার।

মধুসূদন যদি গৌরদাস বসাকের মত পরমশুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু না পেতেন, হয়ত তাঁর জীবনটা অন্যরকম হত। তিনি যদি কলকাতায় ফিরে না আসতেন, তাঁর কাব্য নাটক কিছুই রচনা করা হত না। গৌরদাস বসাকের উৎসাহে ১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলন ও প্রথম সর্ব্বভারতীয় শিল্প ট্রাইবুনাল

সমর দত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির অনতিবিলম্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সুরু থেকেই ভারতে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলনের লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণ তাদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অর্থ-নৈতিক দাবীদাওয়া পেশ করতে আরম্ভ করে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটেরও হুমকি দেয়। তদানীন্তন বম্বে প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ এবং বাঙলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ চরমাকার ধারণ করে। প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বম্বেতে বিচারপতি এইচ' ভি দিভেতিয়া ব্যাঙ্ক শ্রমিক ও ব্যাঙ্ক মালিকের বিরোধ মীমাংসা ক'রে যথা সময়ে তাঁর রায় দেন। সেই রোয়েদাদটি ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট বম্বে গেজেটে প্রকাশিত হয়। তারপর মূল বম্বে শহরের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ৩০টি ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি দিভেতিয়া আর একটি রায় দেন। এই রোয়েদাদটি ১৯৪৭ সালের ৯ই এপ্রিল বম্বে গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায়, প্রকাশিত হয়। এই রোয়েদাদটি দিভেতিয়া রোয়েদাদ নামে পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে আমেদাবাদের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণও এই রোয়েদাদের সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হয়।

বিচারপতি বি, বি, সিংহের উপর তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের ৪০টি ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১১ই মার্চ বিচারপতি সিংহের রায় প্রকাশিত হয়। যুক্ত প্রদেশ সরকার ১৫ই মার্চ একটি আদেশ জারী ক'রে এই রোয়েদাদটি বলবৎ করে। এই রোয়েদাদটি 'বি, বি, সিংহ রোয়েদাদ' নামে পরিচিত। উপরি উক্ত দিভেতিয়া রোয়েদাদের দরুণ বম্বের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ খুসী হ'তে পারেনি। তারা বম্বে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এ্যাক্ট অনুসারে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি দিভেতিয়া রোয়েদাদের আয়ুষ্কাল শেষ করে দেবার জন্য নোটিশ দেয়। অপরদিকে যুক্ত প্রদেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণও বি, বি, সিংহ রোয়েদাদের দরুণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে। কারণ রোয়েদাদটি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মালিক এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সংস্থার নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ নানাভাবে বি, বি, সিংহ রোয়েদাদের ব্যাখ্যা করে। কোন্ ব্যাখ্যা এবং কার ব্যাখ্যা ঠিক সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। এই রকম অবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। যুক্ত প্রদেশ সরকার একটি কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠন করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিন্দ বাসিনী প্রসাদ এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। এই বোর্ডের উপর বি, বি, সিংহ রোয়েদাদের সঠিক ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বি, বি, সিংহ রোয়েদাদটিকে পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতাও এই কনসিলিয়েশন বোর্ডটিকে দেওয়া হয়। যথা সময় এই বোর্ড বি, বি, সিংহ রোয়েদাদের ব্যাখ্যা ক'রে মতামত দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের অভিযোগ থেকে যায়। যাইহোক ১৯৪৯ সালের ১৮ই এপ্রিল যুক্ত প্রদেশ সরকার একটি আদেশজারী ক'রে আলোচ্য কনসিলিয়েশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত (অধিকাংশ) বলবৎ ক'রে দেয়।

ইতিমধ্যে তৎকালীন অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক সরকার ঐ প্রদেশের কয়েকটি ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ আইন-সম্মত সালিসির সহায়তায় মিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রায় সাত হাজার শ্রমিক কর্মচারী ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট থেকে দীর্ঘ ৪৬ দিন ধর্মঘট করে। একটি শিল্প ট্রাইবুনালের মাধ্যমে এই বিরোধের মীমাংসা হয়। এই ট্রাইবুনালটি আর, গুপ্ত ট্রাইবুনাল নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতা গেজেটে এই ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বেঙ্গল সার্কেলের (যে সার্কেলটি তখন আসাম থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল) সকল শ্রমিক-কর্মচারী গুপ্ত রোয়েদাদের সুযোগ-সুবিধায় উপকৃত হয়। এই ব্যাঙ্কের মাদ্রাজ সার্কেলের শ্রমিক-কর্মচারীগণও গুপ্ত রোয়েদাদের আওতার মধ্যে এসে পড়ে। তবে সেক্ষেত্রে রোয়েদাদটিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। গুপ্ত রোয়েদাদ প্রকাশিত হ'বার কিছুদিন পরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বেঙ্গল সার্কেলের কর্মচারীগণ তাদের ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বর্দ্ধিত হারে মহার্ঘভাতা এবং আরও কতকগুলি ভাতা সম্পর্কিত দাবী মালিক পক্ষের নিকট পেশ করে। সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে এই দাবীগুলি আর একটি ট্রাইবুনাল কর্তৃক বিবেচিত হয়। এই ট্রাইবুনালটির নাম এস, সি, চক্রবর্তী ট্রাইবুনাল। ১৯৪৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর চক্রবর্তী ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। এই ট্রাইবুনাল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের অধিকাংশ দাবীই নাকচ করে দেয়।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেন্ট্রাল্ ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করে। এই ট্রাববুনালটির নাম এস, কে সেন ট্রাইবুনাল। এই ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ দু'টি ট্রাইবুনালের মাধ্যমে মীমাংসিত হ'বার ব্যবস্থা হয়। দু'টি ট্রাইবুনালেরই বিচারক ছিলেন এস, কে, সেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ কলিকাতা গেজেটে এস কে সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। দিভেতিয়া ট্রাইবুনালের রোয়েদাদের সঙ্গে এস কে সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত হুগলী ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এবং হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ আইনানুগ পদ্ধতিতে মীমাংসিত হ'বার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

উল্লিখিত শিল্প ট্রাইবুনালের রোয়েদাদগুলি সত্বেও ব্যাঙ্ক শিল্পে দীর্ঘকালীন শান্তির লক্ষণ দেখা যায়নি। এর কারণ এদেশের শ্রমজীবী মানুষের আশা ছিল যে ভারত স্বাধীন হ'লে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। তাদের জীবন ও জীবিকার পথ সুগম হ'বে। বিধ্বস্ত ও দেউলে জীবনের গ্লানি থেকে তারা মুক্তি পাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'বার পরেও তাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটল না। সমাজের যে চিত্রটি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার মধ্যে একদিকে ছিল দারিদ্র্য ও দুর্দশা, বেকারী ও আধা-বেকারী এবং অর্থ-নৈতিক অসাম্য। অপরদিকে মুনাফা ও সঞ্চয়, প্রাচুর্য্য ও ভোগ-বিলাস এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। সেইজন্য জনসাধারণ বিশেষ ক'রে শ্রমজীবী এবং মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দিল হতাশা ও তিক্ততা এবং পরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও সংশয়। এই অবস্থায় অন্যান্য শিল্প শ্রমিকগণের মত ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের মত তাদেরও একথা বুঝে নিতে দেরী হয়নি যে বিনা সংগ্রামে তারা কিছুই পাবেনা।

১৯৪৯ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার একটি অর্ডিনান্স জারী ক'রে ঘোষণা করে যে, যে সমস্ত ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর একাধিক প্রদেশে শাখা কার্য্যালয় অথবা ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধীয় অন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে সেই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির শ্রমিক-মালিক বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা কিছু করণীয় তা প্রাদেশিক সরকারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সম্পন্ন করা হ'বে। এই অর্ডিনান্সের নির্দ্দেশগুলি শীঘ্রই কার্য্যকর

করবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এইভাবে ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত এলাকার মধ্যে এসে পড়ে। ১৯৪৯ সালের ১৩ই জুন ভারতবর্ষের প্রায় ৫৫টি ব্যাঙ্কের শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রণালয় একটি তিনজন সদস্য বিশিষ্ট শিল্প ট্রাইবুনাল গঠন করে। এই ট্রাইবুনালটি প্রথম সর্বভারতীয় শিল্প-ট্রাইবুনাল। এটির উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কশিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর ক'রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যে বিশিষ্ট বিচারপতিগণকে নিয়ে এই ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল তাঁরা হলেন—

(ক) কে, সি, সেন—(সভাপতি)

(খ) জে, এন, মজুমদার—(সদস্য)

(গ) এন, চন্দ্রশেখর আয়ার—(সদস্য)

কে, সি, সেন ছিলেন বম্বে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্টের সভাপতি এবং বম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। জে, এন, মজুমদার ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এন, চন্দ্রশেখর আয়ার ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এই ট্রাইবুনালটি সেন-ট্রাইবুনাল নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বম্বের কাউন্সিল হলে আলোচ্য ট্রাইবুনালের উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ হয়। এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ ট্রাইবুনালের নিকট অন্তর্বর্তী সাহায্যের দাবী পেশ করে। এবিষয়ে কানপুরে ইউ, পি, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন অত্যন্ত তৎপর হ'য়ে ওঠে। এই সংস্থাটি ঘোষণা করে যে তাদের অন্তর্বর্তী সাহায্যের দাবী পূর্ণ না হ'লে তারা ১৯৪৯ সালের ২১শে জুন থেকে ধর্মঘট ক'রবে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের চীফ্ লেবার কমিশনারের নির্দেশে পাটনাতে ১৯৪৯ সালের ১৭ই ও ১৮ই জুন একটি মন্ত্রনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এবং ইউ, পি, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই সভার রিপোর্ট সেন ট্রাইবুনালের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং কর্মচারীগণকে অন্তর্বর্তী সাহায্য দানের যৌক্তিকতা আছে কি-না সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা ক'রে রায়-দেবার নির্দেশ দেন। তদনুসারে ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ও ৫ই আগষ্ট থেকে লক্ষ্ণৌতে এই সর্বভারতীয় ট্রাইবুনালে উত্তর প্রদেশ ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের অন্তর্বর্তী সাহায্য দানের দাবী সম্বন্ধে শুনানী চলে। ১৯৪৯ সালের ২৫শে আগষ্ট এই ট্রাইবুনাল উত্তর প্রদেশের ২৪টি ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণকে অন্তর্বর্তী সাহায্য মঞ্জুর করে। ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ঐ প্রদেশের আরও ১২টি ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণও সেন-ট্রাইবুনালের রায় অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সাহায্য লাভ করে। এরপর পশ্চিমবঙ্গের ২০টি ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়ন, মাদ্রাজের ৩টি ইউনিয়ন, বম্বের ২টি ইউনিয়ন, বিহারের ১টি ইউনিয়ন এবং দিল্লী ও পাঞ্জাবের প্রায় সব ক'টি ইউনিয়ন সেন-ট্রাইবুনালের নিকট অন্তর্বর্তী সাহায্যের দাবী পেশ করে। ট্রাইবুনাল ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর তিনটি পৃথক পৃথক রোয়েদাদের মাধ্যমে বম্বে, বিহার দিল্লী এবং পাঞ্জাবের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণকে অন্তর্বর্তী সাহায্য মঞ্জুর করে, এতদ্ব্যতীত এই ট্রাইবুনাল ১৯৪৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর আরও দু'টি রোয়েদাদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণকে অন্তর্বর্তী সাহায্য দানের নির্দেশ দেয়।

এমনিভাবে অন্তর্বর্তী সাহায্যদানের ব্যাপার শেষ হবার পর সেন-ট্রাইবুনালে বেশ কতকগুলি ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মালিকগণ কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত মামলা ওঠে। ১৯৪৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ট্রাইবুনালের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে বম্বে, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দেরাদুন, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, গৌহাটি, বারাণসী এবং মুসৌরিতে এই মামলা সংক্রান্ত বিচার সম্পন্ন করে। ট্রাইবুনালের বিচারে অধিকাংশ শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মচারী নির্দোষ ব'লে মুক্তি পায়।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মৌলিক দাবীগুলির বিচার বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালের ১৬ই জানুয়ারী বম্বেতে এই সবভারতীয় ট্রাইবুনালের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনের প্রারম্ভে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণের (যারা নিজ নিজ ইউনিয়নের মামলা পরিচালনার জন্য ট্রাইবুনালে প্রেরিত হয়েছিল) রাহা খরচের প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়। শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ট্রাইবুনাল আদেশ দেয় যে ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণকে বম্বে যাওয়া আসার খরচ এবং ঐ স্থানে সাময়িক অবস্থানের খরচ ব্যাঙ্ক মালিকগণকে দিতে হবে। টাকার অঙ্কে কি পরিমাণ খরচ মালিকগণকে বহন করতে হবে সে সম্বন্ধেও ট্রাইবুনাল নির্দেশ দেয়। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট (সেণ্ট্রাল) রুল-এ ২১-ক ধারা যুক্ত করে। এই নতুন ধারার বলে আলোচ্য ট্রাইবুনাল ব্যাঙ্ক মালিকগণকে উপরি উক্ত আদেশ দানে সমর্থ হয়।

১৯৫০ সালের ৩রা এপ্রিল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মূল দাবীগুলির উপর সেন-ট্রাইবুনালের শুনানী শেষ হয়। মূল দাবীগুলির উপর শুনানী ৪২ দিন স্থায়ী হয়। অন্তর্বর্তী সাহায্য দানসম্বন্ধীয় দাবীর উপর শুনানী চলে মোট ১৫ দিন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত মামলার শুনানী চলে ১০২ দিন। কালকাতা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, নাগপুর, ও পাটনা উচ্চ আদালতের কর্তৃপক্ষ এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকটী সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই ট্রাইবুনালকে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্থান দিয়া সাহায্য করে। বম্বের বৃটিশ ইনফর্মেসন সার্ভিস, বম্বের টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিজের ইকনমিক্‌স্‌ ও ষ্টাটিসটিক্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্ট, বম্বের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোর্ট, সিমলার লেবার ব্যুরো, বম্বের লেবার ইনফর্মেশন সেক্রেটারিয়েট, ক্রফোর্ড বেলি এ্যাণ্ড কোং (সলিসিটর) এবং বম্বের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নানারূপ পুস্তক, দলিল, কাগজপত্র এবং পরিসংখ্যান দিয়া ট্রাইবুনালকে সহায়তা করে। এই ট্রাইবুনালের প্রধান কার্য্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন ডি, এম, ভাদে। এই সর্বভারতীয় শিল্প ট্রাইবুনালে যে সকল আইনবিদ্‌ মালিকপক্ষের মামলা পরিচালনা করে তাদের মধ্যে এ ই রেয়ার, বি, কে, দফতরী, খান্ডুভাই দেশাই, জামসেদজি রাঙ্গা, এফ, বি, গ্যাডগিল, এস, সি, বেইনন, বি, কে, আগামে, এম, খাখাটা, এন, সি, আচার্য্য এবং ডি, সি, বৈষ্ণব নাম উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত আইনবিদ্‌ কর্মচারীগণের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে তাদের মধ্যে নীরেন দে, ভি, জি, এম রাও, এন, ডি, ফাডকে, মৃগেন সেন, ডব্লু, ডি, সোয়ান্স, সি, আর, মানকড়, শান্তি লাল শাহ, এস, আর, থোমার, এস, বি, ডি-সিলভা, এস, এস, দিঘি এবং আর খোসারের নাম উল্লেখনীয়।

এইবার দেখা যাক্‌ সেন-ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ কি পেয়েছিল এবং এই রোয়েদাদ তাদের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ট্রাইবুনাল সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যথা—

ক শ্রেণী—সমস্ত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং যে সব তফসিলী ব্যাঙ্কের আমানত ৫০ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যাঙ্ক যেগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ২৫ কোটি টাকা অথবা তদূর্দ্ধ।

খ শ্রেণী—যে সমস্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ২৫ কোটি টাকা। (ন্যূনপক্ষে ৭॥০ কোটি টাকা)।

গ শ্রেণী—যে সমস্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ৭॥০ কোটি টাকার কম। যুগপৎ এই ট্রাইবুনাল ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারণ ব্যয়ের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে তিনটি এলাকায় বিন্যস্ত করে। এই তিনটি এলাকা হ'ল প্রথম শ্রেণীর এলাকা; দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর এলাকা। বম্বে, দিল্লী এবং কালকাতা প্রথম শ্রেণীর এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়। আমেদাবাদ, হাওড়া, আলিপুর, কাশীপুর, গার্ডেনরীচ, বরাহনগর, টালিগঞ্জ এবং দমদমও প্রথম শ্রেণীর এলাকাভুক্ত হয়। যে সমস্ত

অঞ্চলের লোক সংখ্যা এক লক্ষ অথবা তদূর্দ্ধ সেই অঞ্চলগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তৎকালীন পাঞ্জাবের যে সমস্ত অঞ্চলের জন সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অথবা তদূর্দ্ধ ছিল সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরি উক্ত আদেশ অনুসারে যে সমস্ত অঞ্চল প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবে না সেগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর এলাকা হিসাবে গণ্য করবার জন্য ট্রাইবুনাল নির্দেশ দেয়।

মূল মাসিক বেতন সম্বন্ধে ট্রাইবুনাল যে রায় দেয় তা এইরূপ—

ক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৯৬ টাকা থেকে ২৯০ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৮২ টাকা থেকে ২৪৮ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৭০ টাকা থেকে ২১৩টাকা (ঐ)

খ শ্রেণী ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৯১ টাকা থেকে ২৮৫ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৭৮ টাকা থেকে ২৪০ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৬৬ টাকা থেকে ২০৭ টাকা (ঐ)

গ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৮৬ টাকা থেকে ২৬২ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৭৩ টাকা থেকে ২২৫ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৬২ টাকা থেকে ১৯১ টাকা (ঐ)

অধঃস্তন কর্ম্মচারীগণের মাসিক মূল বেতন

ক শ্রেণী ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৬০ টাকা থেকে ৮৯ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৪৯ টাকা থেকে ৭৮ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৪০ টাকা থেকে ৬৯ টাকা (ঐ)

খ শ্রেণী ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৫৬ টাকা থেকে ৮৫ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৪৬ টাকা থেকে ৭৫ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৩৮ টাকা থেকে ৬৭ টাকা (ঐ)

গ শ্রেণী ব্যাঙ্ক

প্রথম শ্রেণী এলাকা—৫২ টাকা থেকে ৬৯ টাকা (২৪ বৎসরে)

দ্বিতীয় শ্রেণী এলাকা—৪৩ টাকা থেকে ৬০ টাকা (ঐ)

তৃতীয় শ্রেণী এলাকা—৩৫ টাকা থেকে ৫২ টাকা (ঐ)

আলোচ্য ট্রাইবুনাল কর্মচারীগণের মাসিক মূল বেতনের উপর মহার্ঘ ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, পার্বত্য অঞ্চল ভাতা, জ্বালানী দ্রব্য ভাতা, দেশান্তরে বদলিকালীন বিশ্রামগ্রহণ ভাতা এবং অধঃস্তন কর্মচারীগণের পোষাক পরিচ্ছদ ধৌতকরণ ভাতা মঞ্জুর করে। ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী ও ব্যাঙ্কিং ডিপ্লোমাধারী কর্ম্মচারীগণও একটি বিশেষ ভাতার অধিকারী হয়। এতদ্ব্যতীত হেডক্লার্ক, ক্যাশিয়ার ইনচার্জ এবং সুপারভাইজারগণও বিশেষ ভাতার অধিকারী হয়। অধঃস্তন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে দফতরী, হেড ক্যাশম্যান, ওয়াচম্যান, চৌকিদার এবং ক্যাশ দারোয়ানকেও এই বিশেষ ভাতা দেয় বলে ট্রাইবুনাল নির্দেশ দেয়।

মূল বেতন এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা ব্যতীত ট্রাইবুনাল কর্ম্মচারীগণের কাজের ঘণ্টা; ওভার টাইম, ছুটী, চিকিৎসা খরচ, বোনাস, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফণ্ড এবং পেনসন পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় দাবীগুলির উপর সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ রায় দেয়। কর্ম্মচারীগণের বার্দ্ধক্য বীমা, কর্ম্মী নিয়োগ পদ্ধতি; শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি, চাকুরী থেকে বরখাস্তকরণ পদ্ধতি, বদলীর নিয়মাবলী, চাকুরী জীবনে পদোন্নতি, চাকুরীতে নিযুক্ত হবার বয়ঃসীমা এবং বাস্তুহারা কর্ম্মচারীগণকে ক্ষতিপূরণ দান ইত্যাদি বিষয়ে এই ট্রাইবুনাল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধান দেয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সুপারিশ করে। সর্বদিক থেকে বিবেচনা করে একথা বলা যেতে পারে যে এই সর্বভারতীয় শিল্প ট্রাইবুনাল প্রদত্ত রোয়েদাদটি চিত্তাকর্ষক। স্বাধীন ভারতে শ্রমিক মালিক বিরোধ

নিষ্পত্তির ব্যাপারে সর্বপ্রথম একটি নতুন প্রণালী প্রবর্তন করে। তথাপি বহু শ্রমিক নেতা এবং বহু সমালোচক এই ট্রাইবুনালের রোয়েদাদটির ত্রুটি বিচ্যুতি শ্রমিকগণ এবং জন সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা স্বর্গীয় টি, এস, রামানুজম যে সমালোচনা করেন তা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সেই সমালোচনা সেন-ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ সম্বন্ধে তাঁর মিশ্র মনোভাবের পরিচায়ক। তিনি বলেন—

"...........The pay scale of the Subordinate staff of a class '6' Bank of a third class area (1944 as base area) is fixed as Rs. 35-½-42-1-52 while the corresponding scale for a clerk of 'A' class Bank of the first class area is Rs. 96-6-132-7, 174-8-190-205-9-250-10-290. Thus at the start the ratio of salaries of these two types of employees is 1 : 2 : 7 and in a service span of 24 years that ratio becomes 1 :5 :6. Thus a middle class employee who is supposed to enjoy some thing like a 'living wage' under the Award is assured of a standard of living which is at least 170% more than that of a Subordinate Staff. But all the statistical data relied upon by the Tribunal seemed to show that the mtddle class standard of living was just 80% more than that of the Subordinate Staff. Hence the award has widened the gap between the standards of living of the Subordinate Staff and the Clerks so enormously that the employees of these two categories must in due course of time develop a social antagonism against each other and may not find it either desirable or expedient to combine together in futute for any common purpose. Nor has any direction been given by the Tribunal to narrow down the gap between the standards of living of the workmen at the bottom and the non-workmen at the top except the making of a general observation on the unsound policy of certain Banks in the matter of investment, bank-expansion and deposit and the expression of a pious hope that the Reserve Bank of India would decide under Section 10 of the Banking Companies' Act of 1949 whether the salaries and allowances given to the Managing Directors and Managers are on a scale disproportionate to the resources of the companies concerned."

"........Employees all over India demanded a national standard of pay structure subject to any local differences being adjusted by the device of compensatory allowances. But the employers wanted all kinds of divisions seeking to distinguish between one Bank and the other and between one unit of establishment and another. The Tribunal conceded in practice what the employers wanted."

"...........The rates of increments are gradual and much less than what they were in the senior grade clerical scale of many leading Banks and above all a new inequality has been introduced by creating notable differences in the scales of pay between one area and another. To add insult to injury transfer of an employee of a Bank from one area to another will reduce his earnings after 45 days. Furthermore, an Employee may be subjected to any amount of subtle veiled forms of victimisation if some boss of the Bank does not like him. Thus the solidarity of the working class has literally ben cut into pieces and cut permanently by a Tribunal whose sole object was to secure social peace on the basis of social Justice."

"...........Every dark cloud has a silver lining and it is possible to find here and there even in this bleak award some points of satisfaction. For instance, the linking of bonus to dividend is proper. The rate of one month's pay as bonus for every 3% devidend declared is fair. But the exemption of first 4% dividend from bonus liability is an unfortunate provision. Although the Tribunal has not directed the stopping of the per-

nicious system of a Pension Scheme existing in Imperial Bank of India under which employees alone have to make 5%contribution to their Pension Fund, Yet 8. 1/3 contribution to their Provident Fund as directed by the Tribunal will enable them to get 3. 1/3% more contribution from the Bank which may be a set off in a way against the employees' contributions of 5% to the Pension Fund and to such of those employees who get increased pay under the Award the setting off may cancel 5% Pension Fund contribution altogether as Provident Fund contributions have to be made on the new increased pay scales. The winding up of the Fidelity Guaranty fund system under which an employee has to pay for the possible or contingent dishonesty of somebody other than himself is a just direction.

অপরদিকে কতকগুলি বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিকপক্ষ সেন-ট্রাইবুনালের এই রোয়েদাদের দরুন খুশী হতে পারেন নি। এর কারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের অবস্থা একটা নির্দ্দিষ্ট মান-এ উপনীত হোক এটা তারা চায়নি! সেইজন্য তারা সুপ্রীম কোর্টে এই রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল করে। তারা এই মর্ম্মে সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করে যে (ক) সেন-ট্রাইবুনাল ১৯৫০ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট (এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল) এ্যাক্ট অনুসারে গঠিত হয়নি। (খ) এই ট্রাইবুনালের রায় এক শ্রেণীর কর্মচারীগণের (যারা মালিক পক্ষের মতে অফিসার) প্রতি প্রযোজ্য নয়। (গ) বোনাস এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে এই ট্রাইবুনালের রায় আইনসম্মত হয়নি। যথাসময়ে এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা ওঠে। যে সাত জন স্বনামখ্যাত বিচারপতি এই মামলাটি বিচার করেছিলেন তাঁরা—

১। সি, জে, কেনিয়া (প্রধান বিচারপতি)

২। এস, সি, মহাজন

৩। বিজন মুখোপাধ্যায়

৪। পতঞ্জলি শাস্ত্রী

৫। ফজল আলি

৬। এস, আর, দাস

৭। এস, কে, দাস

সুপ্রীম কোর্টের বিচার অনুসারে সেন-ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ বে-আইনী ও বাতিল ব'লে ঘোষিত হয়। এর প্রধান কারণ যে তিন জন বিচারপতি রোয়েদাদে সই করেন তাঁদের মধ্যে একজন শুনানীর কোন কোন সময় অনুপস্থিত ছিলেন। এমনিভাবে বহু অর্থ, বহুশ্রম এবং বহু সময় ব্যয় করে যে সবভারতীয় শিল্প ট্রাইবুনালের রায়টি ১৯৫০ সালের ১২ই আগষ্ট আত্মপ্রকাশ করে সেটি ১৯৫১ সালের ৯ই এপ্রিল অকার্য্যকর হয়ে যায়।

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

চেয়ারে বসে বসে ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিলাম। ভেতরটা দেখে দুজনেরই খুব অবাক লাগল। বড় বড় হোটেলে থেকে এসেছি সবই পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব কায়দায় গড়া। কিন্তু এ যে তার একেবারে বিপরীত!

মেঝের ওপর গদি পেতে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। বালিশ দুটো পাথরের মত শক্ত। ওয়াড়গুলো সব বালিশের মাথায় ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। নিজেদেরই ওয়াড়গুলো বালিশে পরিয়ে নিতে হবে! একটাই বিছানা দুজনের জন্যে তৈরী করা হয়েছে! বিছানার পাশেই ছোট্ট একটা কাঠের তৈরী টুল। বুঝলাম না ওটা আবার ওখানে কেন রাখা হয়েছে। চেয়ারগুলো সবই ছোট ছোট। ওয়ারড্রোব দেয়ালের মধ্যে রয়েছে। Sliding দরজাটা সরাতেই জাপানীদের দুটো কিমানো বেরিয়ে পড়ল। ওগুলো রাত্রে পরে আমাদের শুতে হবে। ঘরের মধ্যেই বাথরুম রয়েছে। দুটো কল ওতে লাগানো আছে। একটি গরম জলের ও আর একটি ঠাণ্ডা জলের কল। আমি বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে বেরিয়ে এলাম। কমোড ওর মধ্যেই রয়েছে। আমার পরেই আমার স্ত্রী বাথরুমে ঢুকলেন। আমি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগলাম। ঘরের দেওয়ালটা কাঠের তৈরী তার ওপরে রঙিন বাহারে ফুলের ব্লক দিয়ে ছাপানো কাগজ মারা। পাশেই একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মেসিন ও তার পাশেই একটি টেবিল ফ্যান! অন্যদিকে একটি টেলিভিসন সেট আর তার পাশেই একটা ছোট রেডিও সেট। বুঝলাম দুটোই রাখা হয়েছে। গৃহস্বামীর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন একটি চালাতে পারেন। বৈদ্যুতিক আলো দেওয়ালে দেওয়ালে রয়েছে। আমাদের জুতোটি বাহিরে খুলে রেখে দিতে হ'ল আর তাদের চটি জুতো আমাদের পায়ে দিতে হল। যখন প্রথমে আমার ঘরে প্রবেশ করি আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে একটি সুন্দরী যুবতী পরিচারিকা। সেই আমাদের কিমানো আর জুতো পরাটা ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছিল। পরিচারিকাটি দেখতে বেশ সুন্দরী ও বেশ ভদ্র। আমাদের কাছে এসে কথা কইলেই সে পা দুটো জোড়া করে মাথা নীচু করে অভিবাদনের কায়দাটা আমার কয়েক বছর আগেই রপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জাপান যখন আত্মসমর্পণ করলো তখন আমি মাকয়ে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন। আমার অধীনে প্রায় ৫০ জন জাপানী সৈনিক কাজ করতো। কয়েকটি ক্যাপটেন ও কয়েকটি লেফট্যান্যান্টও তাদের মধ্যে ছিল। যখনই তারা আমার অফিসে আসত তখনই তারা তাদের পাদুটো জোড়া করে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাত। রাস্তায় বের হলে আমাকে দেখে ওদের কর্ণেল, অন্যান্য অফিসারেরা বা সৈনিকেরা ঐ ভাবে অভিবাদন করতেন। আমরাও তাঁদের মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করতাম। এটা আমাদের মিলিটারী আইনে ঘোষণা করা ছিল। বাইরের করিডরে একটা বড় ফ্রিজ রয়েছে দেখলাম। ফ্রিজটা খুলে দেখলাম। ফ্রিজটি অনেক রকমের মদ ও অন্যান্য পানীয়ে ভর্ত্তি রয়েছে আর রয়েছে সেখানে নানা রকমের কেক ও চকোলেট। আমরা ইচ্ছা করলে যত ইচ্ছা খেতে পারি এমন কি সমস্ত ফ্রিজের মালগুলো পেটে ঢোকাতে পারি। ফুরিয়ে গেলেই আবার ফ্রিজটি ভর্ত্তি করে দিয়ে

যাবে। কিন্তু খাওয়া ত দূরের কথা ছোঁয়া যায় না। ঠাণ্ডা বরফের মত হলেও হাত দিলে গরম লাগবে। এক একটা বোতলের দাম বাজারের দামের চেয়ে চার গুণ। আমাদের হোটেল থেকে বিদায় নেবার সময় কড়ায় গণ্ডায় সব চুকিয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে। তাই আমরা আর ফ্রিজের দরজা খুলতে সাহস করিনি।

পরিচারিকা মেয়েটি দরজায় ধাক্কা মারতেই আমি বলে উঠি "come in।" সে ভেতরে এসে ঢোকে। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম দেখে আমার গিন্নীর মুখে হাসি ফুটল। সকালে শুধু একবার মাত্র একটি কাপ চা খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছেন তারপর সারাদিন আর কোথাও চা খাওয়া হয় নি। আমাদের মাথার কাছের চৌকিটার ওপর দুটি ছোট ছোট কাপ আর চায়ের কেটলিটা বসিয়ে চলে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি বিছানায় বসে কাপে চা ঢাললাম। মুখে দিতেই আর মুখ দিতে পারলাম না; এর মধ্যে চিনিও নেই দুধও নেই আর লেবুর ও কোন কথাই নেই। জলের মত শুধু চাটা আর মুখে দিতে পারলাম না। এই রকম চা আমরা মালয়ে অভ্যাগতদের অনেক ডিনারের পূর্ব্বে দিতে দেখেছি। এ গুলি শুধু পানীয়ের জন্তে দেওয়া হয়।

আমরা এবার কিমানোটা খুলে নিজেদের জামা কাপড় পরে হোটেলের পেছন দিকে হেঁটে বেড়াবার জন্তে নীচে নামলাম। এখান থেকে কয়েক গজ দূরেই প্যাসিফিক মহাসাগরের জলরাশি রয়েছে। এই জায়গাটি একটি অন্তরীপ। এটি একটি পাহাড়ী জায়গা। এই পাহাড়ের ওপর কয়েক শত বাড়ি তৈরী হয়েছে। প্রায় সবগুলোই হোটেল আর না হয় আমাদের মত সরাই-খানায় ভর্তি। তবে এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বাড়ী রয়েছে সেগুলি জাপানের অন্যান্য জায়গার ধনীদের নিজস্ব বিলাস গৃহ। আমাদের সরাইখানার পেছন দিকে একটা ছোট্ট ফুলে ভরা বাগান তারপর ফাঁকা ঘাসে ভরা মাঠ আর তার পাশেই রয়েছে একটি বড় সুইমিং পুল, বাইরে নামতেই প্রচণ্ড বাতাস এসে আমাদের অস্থির করে তুলল। তবুও জোর করে আমরা সুইমিংপুলের কাছে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

আমার স্ত্রীর শাড়ীটা গায়ে আর রাখা যাচ্ছে না। মহা মুস্কিলেই তিনি পড়ে গেলেন। শাড়ীর আঁচলটা তিনি ঝগড়াটে কুমারী মেয়েদের মত কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলেন। আমার গায়ে সার্ট আর পরনে প্যান্ট ছিল, আমাকে কায়দা করতে পারল না। এই প্রচণ্ড বাতাসটা হবার কারণ আছে। জাপানের ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটী নামকরা ঝঞ্ঝা চলে গেছে, তাতে সেবার জাপানের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। সংবাদপত্রে জাপানের এই সংবাদ পড়ে মালয় থেকে ছেলে শ্যামল আর মেজমেয়ে মিনা আমাদের জন্তে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তারা আমাদের নিরাপত্তার কথা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠি আমরা যথা সময়ে পেয়েছিলাম। আমরা নানা জায়গা থেকে দুদিন অন্তর তাদের রঙিন কার্ড পাঠাতাম। তাতে অনেক সংবাদ তাদের জানিয়ে দিতাম। আমরা মনে করেছিলাম যে প্যাসিফিক সমুদ্রের একেবারে কাছে এসে পৌছেছি ওর জল একটু মাথায় দিয়ে আসবো। কিন্তু ঝড়ের প্রবলতা থাকায় তা আর আমাদের হয়ে ওঠে নি। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ হ'ত। সেই শব্দটা-তেই আমাদের ভয় হত। আমরা মুভি ক্যামেরাতে ঘরের ভেতর ও বাইরের অনেকগুলি দৃশ্য ধরে রেখেছি। এখন মধ্যে মধ্যে সেগুলি দেখি আর পুরোনো স্মৃতিগুলো আমাদের মনে পড়ে যায়। তখন আমরা ভাবি যে কত কত দূরে আমরা ছিলাম। আজ সেই পরিচারিকা, আর সেই হোটেলগুলোর ম্যানেজার, বয়, বাবুর্চি, মন্দিরের পুরোহিত, জাপানী, চীনা, বন্ধুরা কোথায় যেন তারা হারিয়ে গেছে।

(১) আতামী (A tami) অন্তরীপের ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। হাজার হাজার বাড়ীর মধ্যে থেকে জ্বলে উঠল নিয়ন বাতির সাদা সাদা আলোগুলো। দূর হতে ওদের দেখতে আমাদের খুব ভাল লাগল। বাইরের বারান্দায় কিমানো পরে আমরা দুজনে পায়চারি করতে লাগলাম। আকাশে অসংখ্য তারা জল জল করছে। দূরের আর আশে পাশের বাড়ীর আলোগুলো

ঠিক আকাশের তারার মত দেখতে হয়েছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঐ উজ্জ্বল বাড়ীগুলো সেদিন আমাদের মনকে খুব মুগ্ধ করে ফেলেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের সরু একফালি জল এসে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেখান থেকে বেরুবার আর পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। ছোট ছেলে যেমন মায়ের কোলে মুখে গুঁজে রাগ করে মাঝে মাঝে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারে, তেমনি করেই মহাসাগরের জলটা পাহাড়ের কোলে গিয়ে আছাড়ি পিছাড়ি লাগাচ্ছে। সেই সরু জলের ফালির ওপরের পাহাড়ের ওপর ছোট বড় নানান জাতের গাছের জঙ্গল। ওদিকটা রাত্রিবেলা বেশ গাঢ় অন্ধকার। ওদিকে কোন বাড়ী নেই। জলের এ ধার থেকেই এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ পাশের প্রায় গোটা পাহাড়টা বাড়ীতে বাড়ীতে ভর্তি হয়ে আছে। এ দৃশ্যটা চিরদিন আমাদের মনে থেকে যাবে।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ডিনার এল। জাপানী এথায় জাপানী খাবার পরিবেশন করা হবে। আমাদের শুধু মাছ আর না হয় দুপেয়ে মাংস আসবে তা প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছে। দুটি থালা, আমাদের সামনে পেতে দেওয়া হল! আমরা জিজ্ঞাসা করে করে খাবারগুলো সব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। মেয়েটি কিছু কিছু ইংরাজী বোঝে বা দু একটা ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। মেয়েটি মাছ ভাজা, চিকেন কারি আর জাপানী ভাত (যা আমরা ওসাকা Indian Restaurent এ চেয়েছিলাম) পাতে এক এক করে ঢেলে দিতে উদ্যত হয়। আমরা হাত নেড়ে জানালাম যে আমরাই এক এক করে নিজে নিয়ে খাবো। তারপর একটা প্লেটে কয়েকটি ছোট ছোট শুয়রের মাংসের মত রয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলে ওঠে, কাঁচামাছ (Raw fish) জাপানীরা খেতে খুব ভালবাসে। এই মাছটি জাপানীদের খুব প্রিয়, very costly। "কাঁচা মাছ আমাদের খেতে দিয়েছে?" গিন্নী জোরে বলে ওঠেন। হাত নেড়ে তাকে বলে, ওটা সরিয়ে নিতে। সে ত গিন্নীর কথায় অবাক হয়ে যায়। অত দামী খাবার সরিয়ে নিতে বলছে। মেয়েটির সত্যিই ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। ওখানেই একটা ডিস ঢাকা দিয়ে সরিয়ে রেখে বলে যে, সে ওটি পরে নিয়ে যাবে। গিন্নী ওকে ওখান থেকে চলে যেতে বলতেই ও চলে যায়। ওদের নিয়ম হচ্ছে যে পরিচারিকাটি আমাদের সামনে বসে থেকে আমাদের এক এক করে জাপানি খাদ্য খাওয়াবে। আমরা কয়েকটি ভাত নিলাম বটে কিন্তু খেতে পারলাম না। মাছ ভাজা আর চিকেন কারি (জাপানী রান্না)খেয়ে ওকে ডাকলাম। মেয়েটির কাঁচামাছের টুকরোর ওপর খুব লোভ ছিল। সে সেখানেই খেতে উদ্যত হল। কিন্তু আমার স্ত্রী ওকে বললেন যে বাইরে নিয়ে গিয়ে যেন সব খেয়ে নেয়। মেয়েটী থালা বাটি গেলাস নিয়ে ভেতরে চলে গেল। মাছটা খেয়েছে কিনা বলতে পারলাম না। কারণ ওরা ওখানে বিনা খাওয়ায় পরিচারিকার কাজ করে থাকে। ও আবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা এর পর কোথায় যাবো।

আমি বললাম "বোধহয় ফুজি হোটেলে।"

মেয়েটির মুখ আনন্দে ভরে গেল। আমায় জানাল যে তার স্বামী ওখানে বাঁশি বাজায়। তাকে যেন সব বলি যে সে আর তার ছোট ছেলেটি ভাল আছে। স্বামীটির নাম আমাদের সে জানিয়ে ছিল। সে অনেক দিন তার স্বামীকে দেখতে পায়নি তাই আমার মারফৎ তাকে জানিয়ে দিতে বললে। আমরা তাকে জানাব বলতে সে চলে গেল। চিঠিতে হয়ত সব কথাই সে তার স্বামীকে জানায়। তবুও আমি যে তার স্ত্রীর কাছে থেকে আসছি তা জানলে তার স্বামী নিশ্চয়ই খুশী হবে তাই মেয়েটী আমাদের অনুরোধ করেছিল।

রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল। পরদিন প্রাতেই আমরা হোটেল ছাড়লাম। ব্রেকফাষ্ট আর এখানে আমাদের খেতে হয় নি। আর মেয়েটীকেও আর সকালে আমরা দেখিনি। আমাদের বাসটীও ওখানে সারারাত্রি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের তুলে নিয়ে বাসটী হাকুনির পথে পাড়ি দিল। হাকুনির পথে যেতে যেতে সুন্দর

বনভূমি, তার বনফুল আর দূরে পাহাড়ের চুড়াগুলো দেখে আমার মনটা ভাল লাগলেও তবুও মনটা যেন আমার বেশ বিষাদে ভরা ছিল। গত রাতের ঘটনায় আমার মনটাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। পরিচারিকা মেয়েটী আমাদের সেই পরিত্যক্ত মাছের টুকরাগুলো মুখে তোলবার সময় আমাদের তাকে বাধা দেবার কোন দরকার ছিলনা। না হয় আমাদের সামনেই সে খেত, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? কাঁচা মাছ একদিন আমাদের সামনে খাবে আমাদের তা ভাল না লাগলেও চুপ করে থাকা উচিত ছিল। জাপানের বাইরের খুব জাঁকজমক পূর্ণ সহর দেখলাম। জাপানের উঁচুতলার বাসিন্দাদের চোখে দেখলাম। আর দেখলাম এই পরিচারিকার মত নীচু তলার লোকদের। এরা সত্যিই বহুকষ্টে সংসার চালাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কয়েকমাস পর একবার হয়ত দেখা হয়। সংসারের খরচ যোগাবে না স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আনন্দ করবে! ওর শশুর শাশুড়ী জীবিত রয়েছে তাঁরা অকর্মণ্য অবস্থায় বাড়ীতেই থাকেন তাদের খরচ ছেলেকে চালাতে হয়। কারণ তারা সকলেই এক পরিবারের মানুষ হয়ে বাস করছে। আজকালকার ছেলেরা পয়সা উপায় করে বাবা মাকে ত্যাগ করে ছেলে বৌ নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ফুর্তি আনন্দে মত্ত থাকে। বাবা মা থেকে থাকল কি মরলো তা দেখার তাদের দরকার হয় না। পৃথিবীর কত পরিবর্তন !!

বাস চলেছে আমরাও চলেছি। ভাগ্যের ওপর সব দোষটা ছেড়ে দিয়ে মনটাকে শান্ত করি। মিঃ চেং আর যুবতী মিসেস্ চেং দুজনে পাশাপাশি বসে রীতিমত গল্প জুড়ে দিয়েছে তাদের হাসি ঠাট্টার শব্দ সকলের কানে ভেসে আসছে। তাঁর প্রথম বৌটী পেছনের সিটে মেয়েকে নিয়ে ওদের হাসিঠাট্টাগুলো ম্লানমুখে শুনছে। তার মুখের ভাষা নেই তবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। আমাদের বাসটী পাহাড়ের ওপর ধীরে ধীরে উঠছে। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকাতে বেশ ভয় পায়। মটরের চাকাটা একটু এদিক ওদিক হলেই একবারে তিনহাজার ফুট নীচে খাদে গিয়ে পড়তে হবে। গাড়ীর চালকটী খুব সাবধানী। গতকাল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। বাসের সামনে গাইডটী বসে বসে মাইক দিয়ে আমাদের ভালো ভাবে তার বক্তৃতা শোনাচ্ছে মাঝে মাঝে পেছন দিকে তাকাতে থাকে। কাকে সে দেখতে চাচ্ছে তা আমরা সকলেই জানি। সকলেই তার তাকানি দেখে মুখটিপে টিপে হাসতে থাকতে। মেয়েটীও ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, হাসতে পারে না। পাশে মা বসে রয়েছেন। মা তাঁর স্বামীর ব্যবহারে মর্মাহত। মেয়েটীর দিকে তাঁর নজর নেই। মেয়েটী বেশ সুন্দরী ওর বাবা মিঃচেং সবসময়েই সকলকে বলেন। গাইড ছেলেটী এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, হংকংএ বাবা মা থাকে যদিও ধনীর ছেলে নয়, তবুও সংসার তাদের অসচ্ছল নয়। একবার সে বেরিয়ে আসতে পারলে হংকং এ সে একটা ভাল চাকরী পাবেই। তাতে ভালভাবে তার সংসার চলে যাবে। মেয়েটীও বাবার ব্যবহারে আর লজ্জাহীনতার জন্য বাবার সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে। ওর এক মাসীর কাছে মেয়েটী একবার বলেছিল। মা অন্য বান্ধবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেদিন বলছিলেন। ছেলে মেয়ে দুজনেই এখন পড়া করে। কয়েক বছর বাদে বাবার থেকে দুজনেই বেরিয়ে এসে চাকরী করে মাকে নিয়ে গিয়ে রাখবে। ভদ্রমহিলাটী এই সব কথা সকলকে বলে বেড়ান, নিজের অপমানকে চাপা দেবার জন্য বোধহয়। সত্যিই আমরা ত বুঝতে পারি যে মিঃ চেং একজন নির্লজ্জ বেহায়া বুদ্ধিহীন পুরুষ। মানুষ থেকে সে পশুর স্তরে একবারে নেমে গেছে। হলেই বা বিবাহিতা স্ত্রী তা বলে কি নিজের প্রৌঢ়া স্ত্রী ছেলেমেয়ের কাছে ছোট বৌকে নিয়ে এত মাতামাতি তাঁর ভাল? ওঁকে কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখা দূরের কথা, ওঁকে এখন সকলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন। কেউ ওঁর সঙ্গে এখন আর কথা পর্য্যন্ত কইতে চান না। মিঃ চেং যেন একেবারে একঘরে হয়ে রয়েছেন মিঃ চেংও কাকেও

প্রাণের মধ্যে আনতে চান না। তিনি যেন একলাই একশ।

বাসটী চলেছে বেশ দ্রুত বেগে। সামনে ফুজিয়ামা পাহাড়টী ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ওর পাশেই আমরা চলেছি। ওর পাশেই পাঁচটা হ্রদ রয়েছে। সেই হ্রদের কাছেই আমরা চলেছি। ফুজি পাহাড়টীকে আরও কাছে দেখা যাচ্ছে। খুব ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে! ওর মাথার উপর গর্তটী সব মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা এখন একটী সমতল ভূমির কাছে এসে বাস থেকে নেমে বিশ্রাম করতে লাগলাম। সামনে শুষ্ক ময়দান মাইলের পর মাইল চলে গেছে, তার পরেই ফুজিয়ামা মাথা উঁচু করে। ডান দিকের একটি বড় উঁচু পাহাড়ে ট্রলি ট্রাম ওঠানামা করছে। কয়েকটী ফটো নিয়ে আমরা আবার অগ্রসর হলাম। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাকুনি হ্রদের ধারে এসে পড়লাম। বাসটী আমাদের নামিয়ে একটু দূরে গিয়ে থেমে গেল। হাকুনী হ্রদের ধারে ধারে বসার আসন রয়েছে আর আসনের মাথায় রং বেরং এর বড় বড় খোলা ছাতা রয়েছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড রোদের তাপ থেকে আসনটাকে ছায়াপ্রদান করাই ছাতাগুলির উদ্দেশ্য। বৃষ্টি এখন পড়ছে না। আকাশে এক টুকরো করে মেঘ পর্য্যন্ত নেই। ঘামে জামা কাপড় ভিজে গেছে। হ্রদের পাশে অনেকগুলি দোকান ও হোটেল রয়েছে। এর মধ্যে একটীতে আমাদের লাঞ্চের বন্দোবস্ত হয়েছে। তাই এখানে বিশ্রাম নেওয়া। খিদেও খুব পেয়েছে। ভোরেই বেরিয়েছিলাম পথে, কিছুই আজ আর খাওয়া হয় নি। বেলা ১২ টা এখনো বাজে নি তাই খাবার জন্য সকলের তাড়া পড়ে গেছে। আমরা কলের জলে মুখ হাত পা ধুয়ে হাকুনি হোটেলে ঢুকলাম। সেখানেই আমরা আমাদের আহার সমাধা করব। অন্যেরা সব কিছুই খেলেন আমরা শুধু মুরগীর রোষ্ট মটরশুটি সেদ্ধ, ফ্রেঞ্চ আলু সেদ্ধ, ব্রেড, বাটার, জাম আর শেষপাতে একপিস পুডিং দিয়ে আহার শেষ করলাম। বীফটা সব জায়গায় বেশী চল দেখলাম। হ্যাম এখানে খুব কম দেখলাম। মাঠে মাঠে গরু ছাগলকে চরান দেখে এলাম। তাদের কি স্বাস্থ্য, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাদের দুধের বাঁটগুলো এত ভারি আর মোটা মোটা তার থেকে যেন প্রচুর দুধ পাওয়া যায় তা বোঝা গেল। জাপানীদের নিম্নস্তরের লোকদের কষ্টের সংসার হতে পারে তবে তারা সকলেই চাকরী করেছে। খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই তারা ভালভাবে করে, তা না হলে তাদের দেখলেই মনে হয় তারা বেশ স্বাস্থ্যবান। খেতে না পেয়ে তারা রক্তাল্পতার রোগে ভুগছে তা আমার চোখে পড়ল না। বাংলাদেশে কত শত ছেলে মেয়েরা যে খেতে না পেয়ে রক্ত শূন্য রোগে ভুগছে তা গননা করা যায়না। ভারত আর জাপানের জনসাধারণের মধ্যে অনেক তফাৎ। আর আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় আমরা না খেতে পেয়ে মরি, আর তারা বেশী খেয়ে মরে এই তফাৎ।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমরা মোটর লঞ্চে উঠবো গাইডকে জানালাম। মোটর লঞ্চটী চারজন লোক আরোহীকে নিয়ে লেকটার চতুর্দিকে একবার লম্ফ ঝম্প করে ঘুরিয়ে দেবে। প্রত্যেককে এরজন্যে দুটি ডলার করে খরচ দিতে হবে। আমার স্ত্রীটি সাঁতার জানেন না তাই আমার ভয় হচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রীটী আমায় বললেন যে আমি একজন সন্তরণবিদ তাই তাঁর আমার সঙ্গে যেতে কোন ভয় নেই। লঞ্চ ওল্টালে আমি যে ওঁনাকে পাঁজাইকলা করে তীরে আনতে পারবো তা তিনি এখনোও বিশ্বাস করেন।

ক্রমশ

আচার্য যদুনাথ সরকার ও জয়পুরের ইতিহাস

মণি বাগচি

মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের গবেষকমাত্রই জানেন, আচার্য যদুনাথ সরকার যখন মুঘল মহাভারত রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন মূল দলিল দস্তাবেজ এবং খাঁটি উপাদানের সন্ধানে তাঁর সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসারিত ছিল। এইভাবেই তো তিনি বহু অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমের ফলে তাঁর অক্ষয় সাহিত্যকীর্তি 'হিস্ট্রি অব আওরংজীব' (৫খণ্ড) গ্রন্থের যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর এই একটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, ভারতবর্ষের কোন্ রাজা-মহারাজা বা নবাবের প্রাসাদে মুঘল যুগের কী দুর্লভ উপাদানরাজি সংরক্ষিত আছে তা তিনি অভ্রান্তরূপেই জানতেন ও সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পেতেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি যে সফল হতেন তা নয়। না হওয়ার কারণও ছিল। অধ্যাপক যদুনাথ যখনি অবকাশ পেতেন তিনি তখন কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি ঘুরে বেড়াতেন একজন সাধারণ পর্যটক হিসাবে নয়, তথ্য-সন্ধানী একজন উৎসাহী গবেষক হিসাবে। এইভাবে তিনি তাঁর গবেষণার জন্য বহু দুর্লভ ও মূল্যবান উপকরণ প্রাপ্ত হন এবং তাই দিয়ে তিনি মুঘলভারতের ইতিহাস রচনায় একটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথের কথাই ছিল: 'No document, no history' এবং সেইজন্য তিনি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারগুলি থেকেই সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় উপাদান।

কথিত আছে, শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদুনাথ সরকারকে দেখলেই মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধীকারী হিন্দু ও মুসলমান দেশীয় রাজ্যে 'সামাল' 'সামাল' রব উঠত, পিছনে গুণ্ডারা লেগে থাকত। তিনি জানতেন এই দেশের হিন্দু-মুসলমান যক্ষের ধনের মতো পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ লুকিয়ে রাখে। কিন্তু কোনো সরকারী উচ্চপদস্থ সাহেব চাইলে নবাব ও রাজা-মহারাজারা হন্তদন্ত হয়ে ঐসব পুঁথির নকল সুন্দর মরোক্ক চামড়ায় বাঁধিয়ে তাঁকে নজরানা দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতেন। রামপুর নবাব প্রাসাদে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান ফার্সী উপাদান তিনি নিজে সংগ্রহ করতে ব্যর্থকাম হয়ে উইলিয়ম আর্ভিনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতার বহু কাহিনী এই নিবন্ধের লেখক আচার্যের মুখে শুনেছিলেন। তাঁর আজীবনের বন্ধু, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সখারাম গোবিন্দ সরদেশাইকে বিভিন্ন সময়ে লেখা একাধিক পত্রে এই বিষয়ের চিত্তাকর্ষক উল্লেখ আছে।

যদুনাথের মনে বরাবর এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, জয়পুর দরবারে রাজপুত ও মুঘল ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান সংরক্ষিত আছে, যেমন আছে রাজপুতানায় প্রাক্তন রাণাবংশীয়দের ঘরে মুঘল ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনুরূপ উপাদান। বহুল পরিমাণেই সেসব উপাদান কীটদষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ফলে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হতে পারেনি। জয়পুর রেকর্ডস্ দেখবার জন্য যদুনাথ উঠে-পড়ে লেগেছিলেন এবং কথিত আছে যে, তাঁকে জয়পুর দরবার থেকে একটি বিশেষ শর্তে ঐগুলি দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়। শর্তটি ছিল এই যে, উক্ত উপাদানের ভিত্তিতে তিনি জয়পুরের একটি ইতিহাস রচনা করবেন। যদুনাথ তাতেই সম্মত হন। বহু পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক সেই ইতিহাস—'History of Jaipur' রচনা করেন এবং অনেকের বিবেচনায় এটিকে তাঁর

একটি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক রচনা বলা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি জয়পুর রেকর্ডস্ দেখবার ও পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু জয়পুর দরবার তাঁর 'হিষ্ট্রি অব জয়পুর' প্রকাশ করেন নি। বলা বাহুল্য, দরবারের অনুরোধেই তিনি এই ইতিহাস লিখেছিলেন কিন্তু যা লিখেছিলেন তা উপাদানের ভিত্তিতেই এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। কিন্তু তথাপি জয়পুর দরবার এই বইটি প্রকাশ করেন নি। এই ইতিহাসে তাঁকে যেসব বিষয়ে পরিবর্তন করতে বলা হয়েছিল, যদুনাথ তাতে সম্মত হননি। তাই যেসব গবেষকের পক্ষে প্রয়োজন হতো তাদের সেখানে গিয়ে প্যালেস লাইব্রেরিতে বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে আসতে হতো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, আমরা আশা করেছিলাম যে যদুনাথের এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি যদুনাথ-জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাই এবং সীতামাউতে যদুনাথের প্রিয়তম শিষ্য মহারাজকুমার ডক্টর রঘুবীর সিংকে একটি পত্র লিখি। আমার চিঠির উত্তরে মহারাজকুমার ১২-১১-৭০ তারিখের একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

I am fully in the know of the fact that Her Highness the Rajmata, Srimati Gayatri Devi, is now willing to get Sir Jadunath Sarkar's *History of Jaipur* Published. But my-fears are that persons who possibly be editing it for the press are not at all competent. I found that some local pressures have persuaded her to entrust it finally to a committee consisting of some local persons whose only qualifications are that they have dabbled in History, and are local persons who can pose to be the best guardians of the prestige and dignity of the ancient House of Amber—Jaipur. I can only wish that H. H. the Rajmata is rightly advised by some eminent disconnected person lik: Dr. R. C. Majumder not to let fools tinker with the work of Sir Jadunath Sakar, as it may be to the disadvantage to the work itself.'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু এই মূল্যবান তথ্যটি যদুনাথের অনুরাগী সকল বিদগ্ধজনকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। মনে হয় এই বিষয়ে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার হস্তক্ষেপ করলে এই মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থটি যথোচিতভাবে প্রকাশিত হতে পারবে। এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন অথবা কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ প্রভৃতি সংস্থাগুলিরও এর কিছু দায়িত্ব আছে মনে হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার ছাব্বিশ বছরের মধ্যেও আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি প্রকাশিত হলোনা—এ কী কম লজ্জার কথা। বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ার জন্য যদুনাথ কিরূপ ক্ষুব্ধ ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। জাতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্পর্কে তাঁর স্বজাতির কি কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই ?

ভুলের মাশুল

মীরা ঘোষাল

মানুষ মাত্রেই ভুল করে। চৌধুরীমশাইও ভুল করেছেন। তবে ভুলের মাশুল যে এতটা হবে তা ভাবতে পারেন নি। ভদ্রলোকের বিয়ে করাটা একটা দারুণ ভুল হ'য়ে গেছে। পুরুষ পাঠকমাত্রই ভাববেন আরে ও ভুল তো সকলেই করে। করে পস্তায়। এ আর তাঁর কপালে নতুন কি হ'ল?

না ওর মধ্যে একটু কথা আছে। চৌধুরী মশাই গরীবের ঘরের ছেলে। মেধার জোরে চিরকাল স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং খুব ভালো রেজাল্ট থাকায় পাস করেই ইউনিভার্সিটিতে লেকচারশিপ পেয়ে যান। সে দিন তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর মত সুখী এবং ভাগ্যবান খুব কমই আছে পৃথিবীতে, বছর তিনচার চাকরী করার পর প্রাক্তন মাষ্টার মশাই এবং বর্ত্তমান সহকর্মী সুধাময়বাবু একদিন কথায় কথায় বলেন, "এবার তুমি বিয়ে থা কর।" বিয়ের কথা চৌধুরী মশাইও দুয়েক বার ভেবেছেন। তবে উদ্যোগী হ'য়ে বিয়ে দেবার মত অভিভাবক কেউ তাঁর ছিল না। কাজেই সে চিন্তা কাজে পরিণত হ'তে পারে নি। সুধাময়বাবু তাঁকে ছাত্র অবস্থা থেকেই যথেষ্ট স্নেহ করেন। তার ওপর তিনি আবার তাঁর বাবার সহপাঠী। তিনি চুপ করে রইলেন।

সুধাময়বাবু এর দিন পনের পরেই হঠাৎ চৌধুরী মশাইকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর ভাইঝির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। প্রথমটা চৌধুরীমশাই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, সুধাময়বাবুর ভাইঝিকে চেনে না জানে না এমন যুবক সমস্ত এলাহাবাদ শহরে কেউ ছিল কি না সন্দেহ। নাচে গানে যাকে বলে চৌকস মেয়ে মিটুনী মিত্র। দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু হাস্যে লাস্যে অপরূপা। সর্বদা একদল স্তাবক পরিবৃত মক্ষিরাণীর মত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় সুধাময়বাবুর ভাইঝি মিটুনীকে। তার স্তাবক দলের মধ্যে সহরের নামকরা পরিবারের বহুকৃতি যুবক আছে। তার মত এক অর্ব্বাচীন গরীব যুবককে বিয়ে করতে বলছেন সেই মিটুনীকে—একি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম। না স্বপ্নও নয়' মতিভ্রমও নয়; সত্যি সুধাময়বাবু নিজে উদ্যোগী হ'য়ে বিয়ের যোগাড় করতে শুরু করলেন। এমন সৌভাগ্যের কথা বেশিদিন চাপা রইল না! সহকর্মীরা সকলেই জানল। দুজন শুভানুধ্যায়ী তাঁকে উপদেশ দেবারও চেষ্টা করল:—"এমন কাজ ভুলেও কোর না। আরে মিটুনীকে বিয়ে করবে পাগল হয়েছ নাকি? ও মেয়ের কি আর জাত ধর্ম আছে? সেবার ওই মাস ছয়েক আগে কোলকাতায় কাটিয়ে এল তিন মাস।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চৌধুরী মশাই এর তখন অল্প বয়স, তার ওপর মিটুনীর মত মেয়ে। তার জন্যে সহরের সমস্ত যুবকবৃন্দ উদগ্রীব। তাকে ঘরণী ক'রে পাওয়া—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা। চৌধুরী মশাই কারো কথায় কান দিলেন না। পরে কতবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। হায়রে অনভিজ্ঞ যুবক। পাদপ্রদীপের নায়িকাকে পুষ্পার্ঘ দিতে কসুর করে নি অনেকেই, কিন্তু তাকে ঘরণী করার কথায় সকলেই পিছিয়ে গেছে দশহাত। অন্তত অভিভাবকেরা দশহাত দিয়ে রক্ষা করেছেন তাদের। নৃত্যপটিয়সী মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছেন তার কাকা জ্যাঠারা। বাবা বহুদিন গত। বিধবা মায়ের শিথিল শাসনে বেপরোয়া মেয়ের স্তাবক জুটেছিল বহু। কিন্তু বর জোটাতে না পেরে বিধবা মা কেঁদে পড়লেন ভাসুর দেওরদের কাছে। তখন মিটুনীর খ্যাতি বা অখ্যাতি সহরে এত ছড়িয়ে পড়েছে যে ভালো ভালো ঘরের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙ্গে যায়। যতটা টাকার জোরে সব কিছু দোষ ত্রুটি ঢাকা পড়ে ততটা খরচ করার সামর্থ্য ছিল না তারজ্যাঠা কাকাদের।

তাঁদেরও নিজের সংসার আছে। অতএব সুধাময়বাবু বুদ্ধি ক'রে চৌধুরী মশাই এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন খুব তাড়াতাড়ি।

বিয়ের পরেই চৌধুরী মশাই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন হাতের তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। মিষ্টুনী চৌধুরী নামই বদলাল। কিন্তু তার স্বভাব বদলালো না এত টুকু। বিয়ের পরও সে তার স্তাবকদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল আগের মতই। দুদিন চৌধুরী মশাই এর কাছে থাকে তো মাসের বাকি দিনগুলো কাটে তার বাপের বাড়িতে। কতদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চৌধুরী মশাই একা ঘরে শুকনো মুখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছেন। পাশের ঘরে নিজের স্ত্রী হৈ হল্লা ফষ্টি নষ্টি করেছে নিজের স্তাবক দলের সঙ্গে তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে। তিনি রাগে দুঃখে কি করবেন ভেবে পান নি। শেষ কালে অনেক ভেবে চিন্তে এলাহাবাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

উত্তর বঙ্গের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নিয়ে চ'লে গেলেন। লাভের মধ্যে এখানেই তাঁর পৈতৃক বাড়ি। ছোট একতলা বাড়ি, এতকাল ভাড়া ছিল, এখন সারিয়ে নিয়ে নিজে বসবাস শুরু করলেন।

এলাহাবাদ থেকেএসে ছোটসহরে তাঁর খুব অসুবিধে হতে লাগল। কিন্তু মনে তিনি বড় শান্তি পেলেন। নতুন জায়গায় এসে স্ত্রী কেমন যেন ডাঙায় তোলা মাছের মত নির্জীব হয়ে পড়লেন। ক'দিন বাদে চৌধুরীমশাই জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। ন মাসের মাথায় স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। আবার নতুন ক'রে অশান্তি শুরু হ'ল তাঁর। চিন্তায় ভাবনায় তিনি শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। একবার ভাবলেন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তখনই আবার মনে হ'ল তাহ'লে তো গিন্নীটির পোয়াবারো। সেখানে আবার বৃন্দাবন লীলা শুরু করবেন। মনে হ'তেই ঠিক করলেন নিজের কাছেই তাকে রাখবেন। স্ত্রীকে জব্দ করার জন্য ঝি চাকর সব ছাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখলেন তাতে বিন্দু মাত্র দমল না। মিষ্টুনী, দিব্যি গুছিয়ে সংসার করতে লাগল। ছেলে সামান্য বড় হ'তেই পাড়াশুদ্ধ লোক বলতে লাগল ছেলে যে একেবারে ছোট চৌধুরীমশাই!” স্ত্রীর পরিবর্তন দেখেও তিনি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। প্রথম বাচ্চাটা হওয়ার পরই তাঁর সুঠামদেহী স্ত্রী কি অসম্ভব মোটা হয়ে গেল। না দেখলে কেউ বিশ্বাসই ক'রত না এই মেয়েই একদিন নৃত্যে লাস্যে পুরুষের বক্ষমাঝে কত তরঙ্গই তুলেছে। চৌধুরী মশাই এতে দুঃখিত তো হলেনই না বরং স্বস্তি বোধ করলেন। এখন তার স্ত্রী চাইলেও লীলাখেলার জন্য কোন সঙ্গী পাবেন না।

তিন বছরে তিনটি সন্তান জন্মানোয় চৌধুরীমশাই বড় আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী নিপুণ গৃহিণী। ঘর দুয়ার ছবির মত রাখেন। নিজের হাতে ছেলে মেয়েদের জামা তৈরী করেন এমন সুন্দর যে কোথায় লাগে নামকরা দর্জি। কিন্তু একটাই মুশকিল। তিনি আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। যে কোন নতুন ডিজাইনের জামা কাপড় দেখলে তক্ষুনি ছিট কিনে ছেলে মেয়েদের পরানো চাই। কোন ভদ্র মহিলার নতুন ধরণের গয়না দেখলে তাঁরও সেটা গড়ানো চাই। কোথাও কোন নতুন রান্না খেয়ে এলে সেটা তারও করা চাই। এভাবে যে কি অজস্র খরচ হয়। চৌধুরী মশাই-এর এক পয়সা জমে না, উল্টে বাজারে দেনা। চাকরীতে ঢুকে নিজেকে বেশ বড় লোক মনে হ'ত। তখন বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। সে সব তো গেছেই এখন এমন অবস্থা হয়েছে ইনসিওরেনস এর প্রিমিয়াম দিতে পারেন না। অল্প বয়সে ভালো চাকরী পাওয়ায় এক বন্ধু তাকে দিয়ে বেশ মোটা টাকার ইনসিওরেনস করিয়ে ছিলেন। এখন সময় মত প্রিমিয়াম দিতে না পারায় পলিসি ল্যাপ্স হয়ে যাবার জোগাড়। খবর পেয়ে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা সে বছরের পুরো প্রিমিয়ামের টাকা দিয়ে দিলেন এবং তাঁকে উপদেশ দিলেন বুঝেশুনে চলতে। চৌধুরী মশাই কি আর বুঝে শুনে চলেন না? তাঁর দুটি ছাড়া তিনটি প্যান্ট

নেই। সাটিও তথৈবচ। অথচ গিন্নী বিয়ে বাড়িতে যাবেন তাঁর নতুন কোন গয়না নেই। বেনারসীও যা আছে সবার দেখা। অতএব ইনসিওরেনস প্রিমিয়ামের টাকা ও আরও কিছু ধার ক'রে কানের একজোড়া হালফ্যাসানের ঝোলা জড়োয়া দুল হ'ল এবং একটা বেনারসী শাড়ি। তার ঐ তিনমনী চেহারায় ঐ ঝোলা দুল যে একেবারে মানায় না সে কথা তাকে বোঝায় কে? কার বাড়িতে নতুন ধরনের সোফা সেট এসেছে। পরীক্ষার খাতা দেখার দরুণ কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনেই গিন্নী সে সোফা সেট ধারেই কিনে আনলেন। পাওনা টাকা দিয়ে সে ধার শোধ ক'রতে হ'ল।

এ সবই তাঁর মনে এসেছিল কিন্তু কিছু দিন যাবৎ এক নতুন সমস্যা তাঁর রাতের ঘুম দিনের শান্তি নষ্ট করেছে। রাতদিন চিন্তা ক'রে ক'রে চেহারা আরও পাকিয়েছে। কপালে কয়েকটা বলিরেখা বেড়েছে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের উপায় কিছু উদ্ভাবন করা যায় নি। বছরখানেক হ'ল তাঁদের ঠিক পাশের বাড়িতে একটি অল্প বয়সী দম্পতি এসেছে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত, দুজনকেই দেখতে সুন্দর। তাঁদের একটি মাত্র ছেলে সেও ফুটফুটে সুন্দর। তাঁদের চাল চলন, থাকার ধরণ ধারণ দেখে চৌধুরীগিন্নীর মাথা খারাপ হবার জোগাড়। ফ্রিজ, এয়ার কণ্ডিশনার, টেপরেকর্ডার, রেডিওগ্রাম, ক্যামেরা এক কথায় তাদের স্বচ্ছল অবস্থা। তাঁদের থাকার সাহেবী ধরণ দেখে চৌধুরী গিন্নী মনে মনে মুগ্ধ হ'লেন। কিন্তু বাইরে চুটিয়ে তাদের নিন্দে শুরু করেই যদি ক্ষান্ত হতেন তাহলে চৌধুরী মশাই-এর কিছু বলার ছিল না। তাঁর স্ত্রীর নিন্দে করা স্বভাবের কথা সহর শুদ্ধ লোক জানে। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই একটা ডিনার সেট কিনে বসলেন।

পাশের বাড়ি নাকি রোজ কাঁচের বাসনে খায়। তাদের সুন্দর ডিনার সেট আছে। তিনি রোজ না হয় কাচের বাসনে নাই খেলেন, তা বলে বাড়িতে একটাও ডিনার সেটা না থাকলে সম্মান থাকে না প্রতিবেশীর কাছে। পাশের বাড়ির ঘরে ঘরে কার্পেট। তাঁর অন্ততঃ বাইরের ঘরে একটা চাই। অতএব দুশ টাকা দিয়ে একটা কার্পেট কিনে ফেলেন। বিদেশ থেকে আনা প্রতিবেশীর গ্যাস ওভেন আছে। তার দাম এদেশে ছাব্বিশ শ টাকা। আহা তা না হয় না কিনলেন, একটা সাধারণ গ্যাসের উনুন কিনতে আর কত বা লাগে। অতএব তিনশ টাকা দিয়ে গ্যাস এল। চিন্তায় ভাবনায় চৌধুরী মশাই আধখানা হ'য়ে গেলেন। যা খান হজম হয় না, মাথা ঘোরে। ডাক্তার বলেন, "কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসুন।" ঘুরে আসবেন তার টাকা কোথায়? গিন্নীর কাছে চেঞ্জে যাবার কথা ব'লতে গিয়ে বকুনি খেলেন: "কত মুরোদ, উনি আবার যাবেন চেঞ্জে।" চৌধুরী মশাই চুপ ক'রে গেলেন। ক'দিন বাদে চৌধুরী গিন্নী নিজেই বললেন, ডাক্তার তো তোমাকে চেঞ্জে যেতে বলেছেন, চল না উটকামণ্ড থেকে ঘুরে আসি।" চৌধুরী মশাই সবই বুঝলেন। পাশের বাড়ির লোকেরা পুজোর ছুটিতে কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছেন। অতএব তাঁকেও উটকামণ্ড যেতে হ'বে। তিনি বললেন, "উটকামণ্ড গিয়ে আমার শরীরের উন্নতি হবে এই তোমার ধারণা! টাকা পয়সার চিন্তায় আমার শরীর খারাপ, আমার ভালো যদি চাও তবে লোকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছাড়।" কর্তার কথায় গিন্নী বড়ই দ'মে গেলেন। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী তিনি নন। আচ্ছা নাই বা হ'ল উটকামণ্ড। কোন এক দূর সম্পর্কের মামাকে লিখে একমাস মধুপুর ঘুরে আসার ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন চৌধুরী গিন্নী। পাড়ায় ব'লে বেড়াতে লাগলেন। মধুপুরের জলহাওয়া নাকি হজমের পক্ষে দারুন ভালো। নইলে তো তাঁদের উটকামণ্ড যাবারই ইচ্ছে ছিল" ইত্যাদি, ইত্যাদি। চৌধুরি গিন্নীকে পাড়ার সকলেই চেনে। কথা শুনে কেউ বা মুখ টিপে হাসল, কেউ বা প্রকাশ্যে টিপ্পনি কাটল।

মধুপুর থেকে ফিরে আসার দিন দশেক বাদ থেকেই চৌধুরী মশাই শুনতে পেলেন গিন্নী কাজকর্মের ফাঁকে বেশ কয়েক বারই বললেন ফ্রীজ থাকলে দারুন সুবিধে। তাহ'লে বেশ একদিন বেঁধে নিলে তিন দিন নিশ্চিন্ত।

পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা বাইরে চাকরী করেন রবিবার বেশী ক'রে রেঁধে রাখেন।" চৌধুরী মশাই এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল পাশের বাড়ির গিন্নী তো একদিন বেশী ক'রে রাঁধেন কারণ তাঁকে বাইরে চাকরী করতে হয়। তুমি কি একদিন বেশী ক'রে রেঁধে তিন দিন পাড়া বেড়াবে? কিন্তু তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইলেন। কিন্তু তিনি চুপ করলে কি হয় ভবী ভুলবার নয়। প্রায়ই তিনি বলতে লাগলেন ফ্রিজ হ'লে নাকি কত সুবিধে সেটা না থাকায় তাঁর কত কষ্ট হয়, ফ্রীজ থাকলে নাকি খরচও অনেক বাঁচে ইত্যাদি নানা মন্তব্য। চৌধুরী মশাই শুনেও না শোনার ভান করেন।

হঠাৎ সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির সামনে একটা ঠেলা। ঠেলা থেকে একটা ফ্রীজ চারজন লোক তার বাড়ির ভেতর নিয়ে যাচ্ছে এবং চৌধুরী গিন্নী দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। চৌধুরী মশাই নিজের চোখকে বিশ্বাস ক'রতে পারছিলেন না। তিনি গেটের কাছে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চৌধুরী গিন্নীর হঠাৎ চোখ পড়ল কর্তার ওপর। একগাল হেসে বললেন,"ফ্রীজ এসে গেল।" চৌধুরী মশাইএর মুখ দিয়ে কথা সরল না। গিন্নী এমন করে বললেন কথাটা যেন তাঁদের ফ্রীজ কেনার সমস্ত ঠিক ছিল—টাকা জমা দেওয়া হ'য়ে গেছে—খালি ডেলিভারী দেওয়া বাকী ছিল। সেটাও হ'য়ে গেল। রাগে দুঃখে মনে হ'ল যেদিকে দু চোখ যায় বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তা না ক'রে ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। গিন্নী আহ্লাদী আহ্লাদী গলায় তাঁকে বলতে লাগলেন,"চল না গো, দেখিয়ে দাও কোথায় ফ্রীজটা রাখা হবে।" চৌধুরী মশাইকে তাঁর সহকর্মীরা সদাসহাস ব'লে থাকেন। কিন্তু আজ তিনি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ রুক্ষ গলায় খুব রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন,"আমাকে ছাড়াই যখন ফ্রীজ কিনতে পেরেছ তখন আমাকে ছাড়া সেটা রাখার ব্যবস্থাও করতে পারবে। ন্যাকামী কর'তে এস না আমার কাছে।" গিন্নী তাঁর নিরীহ স্বামীর এ হেন বাক্য শুনে সেখান থেকে স'রে পড়লেন।

ক্রমে ক্রমে জানতে পারলেন, গিন্নী তার বড়লোক মাসির কাছে দু হাজার টাকা ধার নিয়ে এই ফ্রীজ কিনেছেন। যতদিনে হোক টাকা শোধ দিলে চলবে। চৌধুরী মশাই আকাশ পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না কি ভাবে স্ত্রীর এই অপরিণামদর্শীতার প্রতিকার করেন। দিন দিন তিনি কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের মত ক্ষীণকায় হ'তে লাগলেন।

আজকাল গিন্নী বেশ খুশি থাকেন। প্রায়ই পাশের বাড়ি বেড়াতে যান। সেখানে থেকে ফিরে এসে তাদের বাড়ির কোথায় কি আছে সব খবর গড় গড় ক'রে ব'লে যান। তিনি অর্ধেক কানে তোলেন অর্ধেক তোলেন না। কখনো গিন্নী বলেন আমার যদি অত জিনিস থাকত তাহ'লে যে কত ভালো গুছিয়ে রাখতাম" কখনো বলেন, "ওরা ভীষণ কিপ্‌টে, এত পয়সা তবু খরচ করতে গেলেই হিসেব করেন।" চৌধুরী মশাই ভাবেন, "হায় ভগবান আমার গিন্নী যদি একটু হিসেবী হ'তেন।" তাঁর আজকাল রীতিমত ভয় হয়। তাঁর যা শরীরের অবস্থা কোন দিন কি হ'য়ে যায়। একটি পয়সা জমানো নেই; ইনসিওরেনস এর টাকা কটা ভরসা। কিন্তু গিন্নীর এ নিয়ে কোন চিন্তা নেই। তিনি নিশ্চিন্তে আজ এ পর্দা, কাল সে শাড়ি কিনে বেড়াচ্ছেন। কিছু বলতে গেলেই বলেন, "হিসেব ক'রে কি হবে—যা হবার তা হবে। অত হিসেব করতে পারি না—আহা কি সুখেই রেখেছেন, এর ওপর আবার হিসেব।"

সেদিন কথায় কথায় গিন্নী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা আমাদের এ বাড়িটা বিক্রী করলে কত টাকা পাওয়া যাবে?" চৌধুরী মশাই চমকে উঠলেন, বললেন, "হঠাৎ বাড়ি বিক্রীর কথা ওঠে কেন?" গিন্নী বললেন "না এমনিই বললাম, জানা থাকা ভালো বাড়ির দামটা। চৌধুরীমশাই কিন্তু ভাবনায় পড়লেন। কথাটা চৌধুরী মশাইর এর মাথাটা একটা কাঁঠালে মাছির মত ভন ভন করতে করতে তাকে চিন্তিত ও বিরক্ত করে তুলল। হঠাৎ বাড়ি বিক্রীর কথা কেন? নিশ্চয় এর পেছনে নিগূঢ় কোন কারণ আছে? কি সেটা? তাঁকে বেশীদিন চিন্তা করতে হ'ল না হঠাৎ একদিন তাঁর চার

ছেলে মেয়ে মহা উত্তেজিত হ'য়ে এসে খবর দিল পাশের বাড়ির গ্যারাজ তৈরী হচ্ছে, ওদের গাড়ি আজ কালের মধ্যেই এসে যাবে।

প্রতিবেশীর গাড়ি এসে গেল। চৌধুরী গিন্নীর মুখে অমাবস্যার অন্ধকার। সব কাজে বিরক্তি! দু চারবার বললেন, "এ রকম বিশ্রিছিরি একটা পুরোণ বাড়িতে থাকার চেয়ে এ বাড়ি বেচে দিয়ে কলেজের সুন্দর আধুনিক ধরনের কোয়ার্টারে থাকা অনেক ভালো। কি যে রুচি সব বুঝি না।" চৌধুরী মশাই এসব শোনেন। তাঁর আর রাত্রে ঘুম হয় না। দিনের বেলা শান্তি পান না। কিসের অশান্তি। প্রতিবেশী গাড়ি কিনেছেন তাতে কি হয়েছে? তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন? তিনি চেষ্টা করেন যাতে পাশের বাড়ির গাড়ির শব্দ কানে না আসে। কিন্তু উপায় নেই, তাঁর পড়ার ঘরের পাশেই প্রতিবেশীর নতুন গ্যারাজ। নতুন গাড়ি, তাও যে কেন এত আওয়াজ করে গাড়িটা। পাশের বাড়ির গ্যারাজ থেকে যখনই গাড়ি বেরহয় তার আওয়াজ চৌধুরী মশাই এর বুক রোলারের মত গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। গাড়ির শব্দ কানে এলেই তাঁর মনে হয় যেন ভূমিকম্প হ'চ্ছে। তাঁর জীর্ণ বাড়িটা যেন এখনই তাঁর মাথার ওপর ধ্বসে পড়বে।

সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢেকে চৌধুরী মশাই পাশের বাড়ি উপস্থিত হ'লেন। প্রতিবেশীর স্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। ভদ্রলোক চৌধুরী মশাইকে দেখে যৎপর-নাস্তি অবাক হলেন। চৌধুরী মশাই পাড়ার কারো বাড়ি যাওয়া তো দূরে থাক, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না। তাঁকে হঠাৎ তাঁর কাছে আসতে দেখে তিনি যে কি বলবেন চৌধুরী মশাইকে কিছুই বুঝতে পারলেন না। চৌধুরী মশাই বিনা ভূমিকায় শুরু করলেন, শুনলাম আপনি নিজের বাড়ি তৈরী করছেন এবং সেখানেই বসবাস ক'রতে চান, কিন্তু সামান্য কাজ বাকি থাকায় যেতে পারছেন না? প্রতিবেশী ভদ্রলোক এ হেন ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুনে মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হ'লেও মুখে বললেন, "হ্যাঁ সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্যে বাড়িটা সম্পূর্ণ হ'তে পারছে না—নইলে কবেই চলে যেতাম। চৌধুরী মশাই ধীরে ধীরে বললেন, "আমি আপনাকে এ টাকা যদি দিই।" ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, "না না সেকি? আপনি কেন টাকা দেবেন। নেহাৎ গাড়িটা কিনে ফেললাম, তাই টাকাটা কমে গেল! দু এক বছরেই টাকার জোগাড় হয়ে যাবে।

চৌধুরী মশাই ব্যাকুল হ'য়ে ভদ্রলোকের দুহাত জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "এ টাকা আপনাকে নিতেই হবে। আমার বাড়ি বন্ধক দিয়ে এ টাকা আমি জোগাড় করেছি। কাজেই বুঝছেন আমার গরজ কতটা। আমাকে দয়া করার জন্যই এ টাকা আপনি নিন। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আপনার বাড়ি শেষ না হ'লে আমার বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবে।" ভদ্রলোক চৌধুরী মশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলেন কে জানে— ধীরে ধীরে বললেন, "বেশ নেব আপনার টাকা।"

কংগ্রেস-স্মৃতি

দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭।

গিরিজামোহন সান্যাল

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি কমিশান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই বিষয় আলোচনার জন্য ভাইসরয় বিভিন্ন দলের নেতাদের আহ্বান করলেন। তদনুসারে মহাত্মা গান্ধী, বিঠলভাই প্যাটেল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, দেওয়ান বাহাদুর টি রঙ্গচারিয়ার, স্যার আবদুর রহিম, মহম্মদ ইয়াকুব প্রভৃতি নেতারা বড়লাটের সহিত মিলিত হলেন।

আলোচনার ফলে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে কমিশন সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের সদস্য দ্বারা গঠিত হবে। তবে কমিশানের কাজের সুবিধার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় এবং শেষ পর্য্যায়ে ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া হবে মাত্র।

বাংলার গভর্ণর মহোদয়ও এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তকে আহ্বান করেন। কমিশনের সমর্থনের জন্য গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে নানা প্রকার চেষ্টা চলতে লাগল।

অবশেষে রয়েল কমিশান গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে কেবল মাত্র পার্লামেন্টের ইংরাজ সদস্যদের নিয়ে কমিশন গঠিত হল।

কমিশনে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত না করায় দেশের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল।

স্যার হরিসিং গৌড় মন্তব্য করলেন যে এক মাত্র ভারতীয় সদস্য লর্ড সিংহকেও কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

শ্রীমতী বেশান্ত মহোদয়া কমিশনকে একটি সাদা আখ্যা দিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিলেন।

ভারতের সকল রাজনৈতিক দল ঐ কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ অ্যানী বেশান্ত, এম এ জিন্না সাহেব এবং অন্যান্য প্রধান নেতারা সকলেই বয়কটের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

লালা লাজপত রায় নিজেদের একটি সংবিধান প্রস্তুত করতে ভারতের নেতাদের পরামর্শ দিলেন।

এই রকম পটভূমিকায় মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধি-বেশন হয়।

নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আনসারী ২ই ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে অন্যান্য কথার পর তিনি জানালেন যে রয়েল কমিশন গঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সম্মুখে একটি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কমিশন বয়কট সম্বন্ধে আশাপ্রদ ঐক্যমত হওয়াতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তাঁরা যদি তার সদ্ব্যবহার করে স্বরাজ অর্জনের জন্য জনমত গঠন

করতে পারেন তা হলে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে এমন একটা শক্তি অর্জন করা হবে যা হবে অপ্রতিরোধ্য।

যাঁদের নির্বাচিত সভাপতি মশায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, স্যার নরোত্তম মোরারজী, বিপিনচন্দ্র পাল, সি, ওয়াই চিন্তামনি, মহম্মদাবাদের মহারাজা সাহেব রাজা রামপাল সিং, স্যার মহম্মদ ইকবল, স্যর মহম্মদ সফী, এম, এ, জিন্না, যমুনা দাস দ্বারকা দাস, স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, স্যর জুলফিকার আলী খাঁ, স্যার হরিসিং গৌড়, স্যর আলী ইমাম, স্যর আবদুর রহিম, এ, কে, ফজলুল হক্, এ, কে, গজনভী যোসেফ ব্যাপ্টিষ্ট, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, জগৎ নারায়ণ, নবাব মহম্মদ ইসমাইল, আর, বি, সীতারাম, ডাঃ জিয়াউদ্দিন, স্যার মোরোপন্থ যোশী, স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, রাজা নরেন্দ্রনাথ, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাং, সি, এফ, এনড্রুস প্রভৃতি নেতাগণ, এঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন স্থির হয় ২৫শে ডিসেম্বর।

২২শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গীগণ সহ মাদ্রাজে পৌঁছুলেন।

ঐ তারিখে মাদ্রাজ মেলে হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাংলা ও বিহারের প্রতিনিধিদের একটি দল মাদ্রাজ এল। এই দলে বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নব নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্র মিত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, ললিতমোহন দাস, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাস গুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সস্ত্রীক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, লাল মোহন ঘোষ এবং সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী।

পর দিন ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় একটি স্পেসাল ট্রেনে আরও বহু প্রতিনিধি মাদ্রাজে রওনা হয়ে ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৯ টা নাগাদ মাদ্রাজ পৌঁছয়। ঐ দলের সঙ্গে ছিলেন অধিকাংশ মফঃস্বলের প্রতিনিধি। রংপুরের নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, রাজসাহীর সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজসাহীর উকিল ক্ষিতীশ সরকার। তিনকড়ি মজুমদার, হিলির প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চৌধুরী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, বংশবাটীর মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে আমিও এই দলে ছিলাম।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং অন্যান্য নো-চেঞ্জারগণ পৃথক ভাবে রওনা হয়েছিলেন।

আমরা মাদ্রাজে পৌঁছুলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের অভ্যর্থনা করে কংগ্রেস নগরে বাংলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে গেল।

প্রতিনিধি ও দর্শকদের বাসস্থানের জন্য সহর থেকে কিছু দূরে একটি বৃহৎ জলাসয়ের ধারে মনোরম পরিবেশ, তিন মাইল বৃত্তাকার একটি কংগ্রেস নগর নির্মাণ করা হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতি খাদি দ্বারা গৃহ নির্মাণ না করে এবং কোন তাঁবু না খাটিয়ে প্রতিনিধি ও দর্শকদের বাসভবনগুলি কেবল মাত্র বাঁশ ও সুপারী বৃক্ষের সাহায্যে নির্মাণ করেছিল, এ ধরণের শহর নির্মানের উদ্দেশ্য ছিল এই সময়ে মাদ্রাজের অনিশ্চিত আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থেকে গৃহগুলিতে সুরক্ষিত করা। বোধ-হয় গত গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে খাদি নির্মিত গৃহে প্রতিনিধিদের দুর্দশার অভিজ্ঞতাও এই পরিকল্পনার মূলে ছিল। তা ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতি চেয়েছিল প্রতিনিধিদের সম্মুখে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় নগরের দৃশ্য তুলে ধরতে। গৃহগুলিতে কুড়ি হাজার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। এই নগরে অভ্য-র্থনা সমিতির জন্য অফিস গৃহ, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস এবং বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য একটি মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছিল। নগরের-

মধ্যস্থলে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ প্যাণ্ডেল শোভা পাচ্ছিল। প্যাণ্ডেলের চতুর্দিকে চারটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি মাদ্রাজ সহরের মিউনিসিপাল রাস্তার সহিত এবং চতুর্থটি কংগ্রেসের জন্য নবনির্মিত অস্থায়ী রেল ষ্টেশনের সহিত যুক্ত করা হয়েছিল।

কংগ্রেস নগরে প্রায় ৫০০ গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। বৈদ্যুতিক আলো, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতি সম্বন্ধে সুচারু ব্যবস্থা মিউনিসিপালিটী করেছিল। নগরে হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল এবং এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়াও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রতিনিধিদের আহারের জন্য একত্রে আহারের বা বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন রুচি অনুসারে আহারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। মোটের ওপর সর্ব বিষয়েই অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ এম এ আনসারী মশায় বোম্বে মেলে ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মাদ্রাজে, পৌঁছেন।

সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে অত্যন্ত ভীড় হবে মনে করে রেল কর্তৃপক্ষ বোম্বে মেলকে বেসিন বিজ ষ্টেশনে থামিয়ে সভাপতি মহাশয়ের কামরাটিকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে সেই কামরাকে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে আনয়ন করে।

সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ষ্টেশনের বহির্ভাগে বিশাল জনতা সমবেত হয়েছিল। সেই জনসমুদ্রকে সংযত রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ষ্টেশনের বাইরে একটি বেষ্টনী রচনা করে জনসাধারণকে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য তার গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গণ্য মান্য নেতাদেরকেও ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করতে হিমসিম খেতে হয়েছিল এবং তাঁরা অতি কষ্টে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। ডঃ অ্যানি বেসান্ত মহোদয়াকেও অতিকষ্টে প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবিকাগণ ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করার সময় জনতার চাপে পড়ে যায়। প্রাতঃকাল ৭টা থেকে ৭॥টা পর্য্যন্ত জনতার চাপের চোটে পরস্পরের ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। ট্রেণ পৌঁছার ১০ মিনিট পূর্বে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (ইনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পূর্ব্বেই মাদ্রাজে আসেন) এসে গেট দিয়ে ষ্টেশনে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়ায় রেলিং টপকিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

যখন ৭॥টার সময় ট্রেণ দেখা দিল তখন সমবেত জনতার "আল্লা হো আকবর" এবং ডাঃ আনসারীজি কি জয় ধ্বনিতে সমস্ত স্থান মুখরিত হয়ে উঠল।

কামরা থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সহিত ডাঃ আনসারী প্ল্যাটফরমে অবতরণ করেন, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারী মশায়কে পুষ্পমাল্যে শোভিত করে অভ্যর্থনা জানালেন। অভ্যর্থনা সমিতির সকল কর্মকর্তাই প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যেই যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডঃ অ্যানি বেশান্ত, মৌলানা শাওকত আলি, ইয়াকুব হোসেন, এ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ডঃ রামা রাও, স্বামী ভেঙ্কটাচলম চেট্টি এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

সভাপতি মশায়ের ফটো তোলার পর তাঁকে নিয়ে সকলে ষ্টেশনের বাইরে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। এই সময় সভাপতি মশায়ের মস্তকের উপর গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ এবং জাতীয় পতাকা আন্দোলন করা হচ্ছিল। সেই সময় বাইরে সমবেত জনতা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করল।

সভাপতি মশায়কে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গেটের দরজা খোলা সহজসাধ্য হল না। অতি কষ্টে গেট খুলে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী শ্রীমতী নাইডু ও সভাপতি মশায়কে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে আনা মাত্র সব দিক থেকে জনতা তাঁকে চেপে ধরল এবং সভাপতির নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। ভীড়ের মধ্য থেকে রক্ষা

করার জন্য কয়েকজন ব্যক্তি সভাপতি মশায়কে ঘিরে চললেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সম্মুখে পথ দেখিয়ে চললেন, সভাপতির দেহরক্ষী তাঁর পশ্চাতে চললেন এবং উভয় পার্শ্বে থাকলেন ভেঙ্কটরমন এবং একজন বলিষ্ঠ মুসলমান কর্মী। চাপবদ্ধ জনতা উচ্চধ্বনি করতে করতে সম্মুখে ও পশ্চাতে ঠেলতে পুলতে লাগল এবং সর্বদাই সভাপতি মশায়ের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ভীড়ের চাপে বহু লোকের চশমা ভেঙ্গে গেল এবং অনেকের জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল কিন্তু তাতে কারোও উৎসাহ কমল না বা নিবারিত হল না। ডাঃ আনসারী মশায় বিনা প্রতিবাদে সহাস্য বদনে নিজেকে জনতার হাতে ছেড়ে দিলেন।

ষ্টেশনের পোর্টিকোতে পৌঁছার পর মোটর গাড়ীতে ওঠার সময় পুনরায় সভাপতি মশায় মুস্কিলে পড়লেন। প্রথমে শ্রীমতী নাইডু গাড়ীতে উঠলেন এবং সভাপতি মশায় তাঁকে অনুসরণ করলেন কিন্তু জনতা গাড়ীর হুড না সরানো পর্য্যন্ত এবং সকলে যাতে দেখতে পায় এমন ভাবে সরোজিনী নাইডু মহোদয়া উঁচুতে আসন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত গাড়ী চালাতে দিল না। সভাপতি মশায়ের প্রতি তারা আরও নির্দয় হল। জনতার নির্দেশে তাঁকে পুনঃ পুনঃ দাঁড়াতে হল এবং কেউ২ তাঁকে অভিভাষণ দিতে বলল। ডাঃ আনসারী দুই তিন বার দাঁড়ালেন এবং জনতার অভ্যর্থনা হাতজোড় করে নমস্কার দ্বারা স্বীকার করলেন।

সভাপতি মশায়ের গাড়ীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার ছিলেন।

প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায়কে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে শহরের প্রধান২ রাজপথ দিয়ে দুই মাইল দূরে কংগ্রেস নগরে নিয়ে যাওয়া হল। শোভাযাত্রার সঙ্গে দেশী ও ইংরাজি ব্যাণ্ড পার্টি ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে চলল, যে সকল পথ দিয়ে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল সেখানকার নাগরিকগণ জয়ধ্বনি দ্বারা— সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানাল।

কংগ্রেস নগরের তিলকমণ্ডপের নিকট শোভাযাত্রাকে খানিকক্ষণের জন্য থামান হল। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যর্থনা মূলক সঙ্গীত দ্বারা সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানাল।

তারপর শোভাযাত্রা সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট মার্বেল হলের নিকট এসে থামল। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, রামা রাও এবং হামিদ খাঁ সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা করে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

(১০)

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয়। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং ডাঃ আনসারী সভাস্থলে প্রবেশ করতেই উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন।

উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—মৌলানা মহম্মদ আলী, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মি, বিজয় রাঘবাচারিয়ার, মৌলানা সাওকত আলী, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ডাঃ সত্য পাল, স্বামী ভেঙ্কটরমন চেট্টি, ডাঃ মুঞ্জে, বরদা রাজন নাইডু, তুলসী চরণ গোস্বামী, সি রাজা গোপালাচারী, এবং বল্লভভাই প্যাটেল।

চাটাইয়ের উপর খদ্দরের চাদর বিছিয়ে সদস্যদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চাদরটি পরীক্ষা করে মৌলানা মহম্মদ আলী জানতে চাইলেন যে এটা খদ্দরের চাদর কি না। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার পরীক্ষা করে বললেন যে এটা খদ্দরের চাদর। মহম্মদ আলী সাহেব আয়েঙ্গার মশায়ের মত মানলেন না, তিনি চাদর গুটিয়ে খালি চাটায়ের উপর আসন গ্রহণ করলেন।

বর্তমান সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় কমিটিতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে তাঁর আসন ত্যাগ করে নব-নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারী সাহেবকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন যে মহাত্মা গান্ধীর ফোরকাষ্ট অনুসারে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের

হত্যা থেকে শুরু করে বর্ত্তমান বৎসরে খুব খারাপ সময় পড়েছিল। সম্প্রতি ষ্ট্যাটুটারী (সাইমন) কমিশনের কল্যাণে সর্বদলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন খুবই আশাপ্রদ। তিনি বিশ্বাস করেন ডাঃ আনসারী তাঁর মধুর স্বভাব এবং দেশ সেবার অর্ঘ দ্বারা জাতীয় কাজ সার্থক করে তুলবেন। তিনি আশা করেন যে বর্ষশেষে ডাঃ আনসারী মশায় স্বাধীন ভারতের মুকুটহীন সম্রাট হবেন।

ডাঃ আনসারী সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর হর্ষধ্বনির মধ্যে পুষ্পমালা দ্বারা শোভিত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন যে ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যবসা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন দলের নেতারা যেন কাজ করে যান। বিদায়ী সভাপতিকে ধন্যবাদের প্রসঙ্গে ডাঃ আনসারী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করেছেন তজ্জন্য তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

এর পর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে রূপান্তরিত হল।

সাইমন কমিশন বয়কট সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে কমিশন ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পরিপন্থি সুতরাং ভারতের পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পন্থা হচ্ছে প্রত্যেক প্রদেশে প্রতিপদে উক্ত কমিশন বয়কট করা সুতরাং কংগ্রেস জনসাধারণকে কমিশনের বিভিন্ন সহর পরিদর্শনের সময় গণবিক্ষোভ, সংগঠন করতে আহ্বান করছে।

ভারতের বিধান সভার বেসরকারী সদস্যদের এবং রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নেতাদের কমিশনের নিকট সাক্ষ্য না দিতে এবং কোন প্রকার প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বা কমিশনের সহিত সহযোগিতা না করতে এবং বিশেষ করে বিধান সভার বেসরকারী সদস্যদের সিলেক্ট কমিটির জন্য ভোট না দিতে বা কমিটিতে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করতে এবং কমিশনের কার্য্য সম্বন্ধে যে কোনও প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে কংগ্রেস বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছে এবং যতদিন সাইমন কমিশন ভারতে অবস্থান করবে তত দিন মন্ত্রীদের পতন ঘটানো বা কমিশন সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য ছাড়া বিধান সভার অধিবেশনে কংগ্রেস সদস্যদের বিধান সভায় উপস্থিত না হতে নির্দেশ দিচ্ছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে বয়কট সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য অন্যান্য দলের সহযোগিতা প্রার্থনা করার ক্ষমতা দিচ্ছে।

জমশেদ এন, আর, মেহেতা প্রস্তাব সমর্থন করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাব সমর্থন করে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন।

টি, প্রকাশম একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা কেবল মাত্র আসনগুলি শূন্য বলে ঘোষণায় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আসনগুলি খালি রেখে বিধান সভার সদস্যদের গঠনমূলক কার্য্যে এবং সাইমন কমিশন বয়কট সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে বললেন।

সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করে প্রকাশম মশায় বললেন যে এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন কংগ্রেস সংবিধান থেকে সর্ব প্রকার বাধা দূরীভূত করা প্রয়োজন যাতে সকল দল কংগ্রেসে একতাবদ্ধ হয়ে একযোগে বয়কট চালাতে পারে। যদি কংগ্রেস প্রাণবন্ত করে গৌরব বজায় রাখার আগ্রহ থাকে তা হলে কংগ্রেসের প্রস্তাব বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা না করে কংগ্রেসের স্পিরিট অনুসারে যেন কাজ করেন।

আর, কে, সিদ্ধ আর একটি সংশোধক প্রস্তাব স্পষ্ট করে নির্দেশ দিতে বলেন যাতে বিধান সভার বেসরকারী সদস্যরা অথবা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নেতারা সাইমন কমিশনকে কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে না পারেন।

বুলুস্ সাম্বমূর্তি প্রস্তাবটি আরও জোরদার করার জন্য আর একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা বিধান সভার

কংগ্রেস সদস্যদের উক্ত সভা থেকে বেরিয়ে আসার জন্ম এবং কোন কারণেই পুনরায় প্রবেশ না করার জন্ম নির্দেশ দিতে বললেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশায় একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস সদস্যগণকে বিধান সভাগুলি থেকে একদম বেরিয়ে আসতে বললেন যাতে গঠনমূলক কর্মসূচী বিনাবাধায় সফল করা যায়।

প্রস্তাব উত্থাপিত করে শ্যাম বাবু বললেন যে গত পাঁচ বৎসর ধরে প্রকৃত পক্ষে গঠনমূলক কার্য্য অবহেলিত হয়েছে। এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া চক্রবর্তী মহাশয়কে সমর্থন করলেন।

শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত মহোদয়া মূল প্রস্তাব সমর্থন করে সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

আনে ও যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত আলোচনায় যোগ দেন।

আলোচনান্তে ভোটে সমুদয় সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

শ্যাম বাবু নোটিশ দিলেন যে তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাবটি উপস্থিত করবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী লীগকে অভ্যর্থনা করে চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর একটি প্রস্তাব দ্বারা চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সেখান হতে ভারতীয় সৈন্যদের অপসারণের দাবি জানালেন এবং বললেন "ভারত থেকে সৈন্য প্রেরণ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাজনক।"

ডাঃ মুঞ্জে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শাস্বমূর্তি একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাবে অত্যন্ত হীনতাজনক" শব্দগুলি বাদ দিতে বললেন।

আরও কয়েকটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়েছিল কিন্তু সকল সংশোধক প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয়ে ভোটে মূল প্রস্তাব পাশ হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর একটি প্রস্তাব দ্বারা ভারতবর্ষে এবং পূর্ব সমুদ্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করছে তৎসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে তা বন্ধ করার জন্য দাবি জানালেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ মুঞ্জে একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা ভারতীয় যুবকদের যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বললেন। বৈধতার প্রশ্নে এই সংশোধক প্রস্তাব খারিজ হল। তার পর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর একটি প্রস্তাব দ্বারা পাশপোর্টের বিরক্তিকর ব্যবস্থার সমালোচনা করলেন।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় পুনরায় বিষয় নির্বাচনী কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রস্তাব করলেন যে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে ভারতের জনগণের লক্ষ্য সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা।

বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

সত্যমূর্তি মশায় সমর্থন করে উঠে বললেন এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের মূল নীতি পরিবর্তনের কোন কল্পনা নেই।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ডাঃ অ্যানি বেশান্ত এই প্রস্তাব উচ্ছ্বসিত ভাষায় সমর্থন করলেন। তার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বন্দীয় অন্তরীণদের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

অন্যান্য প্রস্তাব দ্বারা ভারত থেকে বর্মাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাকে এবং বর্মায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনাকে ধিক্কার দেওয়া হল।

আর একটি প্রস্তাব দ্বারা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বয়কটের জন্য আবেদন করা হল।

তার পর মোশনের মত কামটীর কার্য্য শেষ হল।

২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে কংগ্রেস নগরে প্যাণ্ডেলের সম্মুখে জাতীয় পতাকা সমবেত বৃহৎ জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে উত্তোলন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় পতাকা উত্তোলনের জন্য সেন গুপ্ত মশায়কে যথোচিত ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ক্রমশঃ

তৈল সংকটের পরিণতি কোথায় ?

সন্তোষকুমার দে

ছেলে বেলায় একটা হেঁয়ালি শুনতাম: পৃথিবীটা কার বশ? এর উত্তর ছিল টাকার বশ। এখনও মোটামুটি তাবে তাই; তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা চলে, পৃথিবীটা এখন তেলের বশ। সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার যে আরব-ইজরাইল যুদ্ধ স্বল্প কালের জন্যে হয়ে গেল, সেই যুদ্ধটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল, মধ্য প্রাচ্যের ছোট ছোট আরব রাজ্যগুলো ক্ষমতায়, লোকবলে, অস্ত্রে, শৌর্যে, বীর্যে নগণ্য হলেও, তারা মহাশক্তিধর দেশগুলোর জীবন যাত্রা এক দিনেই স্তব্ধ করে দিতে পারে। ওদের শক্তির প্রধান উৎস হল খনিজ তেল! এই তেল সরবরাহ বন্ধ হলেই উন্নত দেশগুলোর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে; কারণ আজকের দিনের সভ্যতার চাকা ঘুরছে এই তেলের বলে। কাজেই সেই মহাশক্তিধর তেল সরবরাহ যদি কিছু কালের জন্যে ব্যাহত বা বিঘ্নিত হয় তাহলে সভ্যতার অগ্রগতিও থমকি থেমে যাবে পথ-মাঝে, আর সেই সঙ্গে নেমে আসবে প্রায় মধ্যযুগের আবহাওয়া।

তেল ত সবদেশে মেলে না। মেলে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে, আমেরিকায়, রাশিয়া, ক্যান্স, চীন, উত্তর আফ্রিকায়। আর অতি অল্প পরিমাণে মেলে ভারতে ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে। কিন্তু অফুরান্ত তেলের ভাণ্ডার হল মধ্যপ্রাচ্যে—আবুধবি, এলজিরিয়া, মিশর, ইরাক, ইরাণ, কুয়েত, লিবিয়া, সৌদি আরব, সিরিয়া আর কয়েকটা শেখ রাজ্যে। এই গলিত স্বর্ণের একছত্র সম্রাট হলেন এঁরাই। সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপ ও জাপান একান্ত ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল। এরা কি পরিমাণ তেল মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানি করেন, তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে :—

দেশ	আমদানির উৎস	আমদানির পরিমাণ
জাপান	মধ্যপ্রাচ্য	৯০% শতাংশ
গ্রেট ব্রীটেন	”	৭০% ”
ফ্রান্স	”	৮০% ”
পশ্চিম জার্মানী	”	৯০% ”

ইটালি	"	৯৫%	"
ভারতবর্ষ	"	১০	"

সমগ্র পৃথিবী আজ যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করছে সেটা যত দিন যাবে ততই বাড়তে থাকবে বই কমবে না। বিশেষজ্ঞেরা তাই বলছেন, ১৯৮০ সালের মধ্যেই এই তেলের ব্যবহার বেড়ে দ্বিগুণ হবে। তেল ব্যবহার করছে সবাই কিন্তু উৎপাদন করে মাত্র কয়েকটি দেশ। আবার যারা উৎপাদন করে (যেমন আমেরিকা) তারাও যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করছে, তাহল তাদের উৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী। ইউনাইটেড নেশনের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ১৯৮০ সালের মধ্যেই উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলো নিম্ন-লিখিত হারে তেল ব্যবহার করবে :—

দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ		ব্যবহারের পরিমাণ	
উত্তর আমেরিকা	৮৫০	মিলিয়ণ টন	১১৬৪	মিলিয়ন টন
পশ্চিম য়ুরোপ	•	"	" ১২০০	" "
সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্বয়ুরোপ	৬৪০	"	" ৬৯২	" "
ল্যাটিন আমেরিকা	৪২৫	"	" •	" "
আফ্রিকা	৫৫০	"	" •	" "
মধ্যপ্রাচ্য	১১৭০	"	" •	" "
জাপান	•	"	" ৫৯২	" "
এশিয়া ও অন্যান্য সকলে	•	"	" ৫৫৯	" "

এই তালিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে মধ্য প্রাচ্যে সব চেয়ে বেশি তেল উৎপন্ন হয় অথচ সে দেশে তেলের ব্যবহার মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। যে দেশ তেলে ভাসছে, তাকে তেলের রাজা বলা চলে। আর এই রাজাকেই এখন সকলে তৈলমর্দন করছে। মধ্যপ্রাচ্যে অবশ্য সব অংশে সমান পরিমাণ তেল পাওয়া যায় না। সেখানে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তেল পাওয়া যায় তার হদিশ মেলে ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদন থেকে। এই সব বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক তেলের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :

সৌদি-আরব—১·১১ বিলিয়ন পিপে, আবুধাবি—২·১৫ মিলিয়ন পিপে, বাহারিন—২৮ মিলিয়ন পিপে; টিউনিসিয়া—২৯ মিলিয়ন পিপে, ইরাক—৫৫২ মিলিয়ন পিপে, কাতার—১০০ মিলিয়ন পিপে, ওমান—১৩১ মিলিয়ন পিপে, মিশর—৮৯ মিলিয়ন পিপে, ইরাণ—১·২৩ মিলিয়ন পিপে, লিবিয়া –১·১০ মিলিয়ন পিপে।

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে মধ্য প্রাচ্যের ইরাণ সব চেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করছে ; তারপরেই স্থান হল সৌদি আরবের।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, সেটি হল আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া কোন শিল্পোন্নত দেশই যথেষ্ট পরিমাণ তৈল সম্পদের অধিকারী নয়। সঞ্চিত তৈল সম্পদ কোন দেশে কত আছে তারও একটা অনুমানিক হিসেব বিশেষজ্ঞেরা তৈরি করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে এখনও আছে ৬০০ বিলিয়ন পিপে, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০০ বিলিয়ন পিপে, আফ্রিকায় ২৫০ বিলিয়ন পিপে, ল্যাটিন আমেরিকায় ২২৫ বিলিয়ন পিপে, দূর প্রাচ্যে ২০০ বিলিয়ন পিপে, আমেরিকায় ২০০ বিলিয়ন পিপে, কেনেডায় ৯৫ বিলিয়ন পিপে, য়ুরোপে ৫০ বিলিয়ণ পিপে (এক বিলিয়ণ হল ১০০ কোটি, আর এক মেট্রিক টন হল ৭·৩ পিপে)

Oil, the Middle East and the World—Charle Issawi, Centre for Stratagic and International Studies দ্রষ্টব্য।

এই হিসেব মত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় মিলিত ভাবে সঞ্চিত তেলের পরিমাণ মাত্র ৪২৫ বিলিয়ন পিপে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও ৫০০ বিলিয়ন পিপে তেল সঞ্চিত আছে।

আমেরিকা এখন ২৫ শতাংশ তেল বাইরে থেকে আমদানি করে এবং এর বেশির ভাগ আসে কেনেডা ও ভেনিজুলা থেকে। মাত্র ৪%—৫% শতাংশ তেল সে আমদানি করে মধ্য প্রাচ্য থেকে। অন্য দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখনও পর্যন্ত তেল সম্বন্ধে সে স্ব-নির্ভর। তাকে

বাইরে থেকে তেল আমদানি করতে হয় না আর এর জন্যে সে কারও দয়ার ওপর নির্ভর করে না। উপরন্তু সে তার নিজের ভাণ্ডার থেকে কিছু পরিমাণে তেল ভারতকে দিয়ে দুর্দিনে বন্ধুকৃত্য করতে রাজি হয়েছে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েট তেলমন্ত্রী Sashin বলেছিলেন, ২০ বছরের মধ্যে রাশিয়া আরও তৈলসম্পদের অধিকারী হবে। এই রকম বলার কারণ হল, সাইবেরিয়ায় প্রত্যন্ত প্রদেশে অফুরান্ত তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পেট্রোলিয়মের বিষয় আমেরিকার একটা বড় অসুবিধে হল, বাইরে থেকে তেল আমদানি করতে তার যে খরচ পড়ে, নিজের দেশের অপরিশোধিত তেল শোধিত করতে খরচ পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি (শ্রমিকের মজুরি অত্যন্ত বেশি হওয়ায়)। এই অসুবিধের জন্যই আমেরিকা বাইরে থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে পারে নি। নিজের দেশের তেল শোধন করতে খরচা বেশি পড়লেও, শোধন তাকে করতেই হয়—তেলের বিরাট চাহিদা মেটানোর জন্যে। তাই আমেরিকা হয়ে পড়েছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় তেল শোধনকারী ও ব্যবহারকারী দেশ।

আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলি আমেরিকার বাইরে থেকে তেল আমদানির জন্যে ৫০০০ বিলিয়ন পর্যন্ত লাভ করেছে; অর্থাৎ আমেরিকা অন্যান্য দেশে ব্যবসায় সূত্রে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে এটা তার ১।০ অংশ। দফাদারি আলোচনা করে জানা যায় সৌদি আরবে ১০০% শতাংশ তেল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে, লিবিয়ার ৭৫%, কুয়েতে ৫১%, ইরাণে ৪০% আর ইরাকে করেছে ২৫% শতাংশ। কিন্তু করলে কি হবে? মধ্য প্রাচ্য এখন নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে। তৈল সমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলোকে এখন আর আগের মত যথেচ্ছ শোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই মনে হয়। তারা ক্রমশই আত্মসচেতন হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে তারা রাশিয়ার কাছে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে ১৯৬৭ সালে ইরাক পশ্চিমাদেশ কর্তৃক পরিচালিত Rumaila তেল কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেয়। এই কোম্পানিটি রাষ্ট্রায়ত্ব করে ১৯৬৯ সালে তার পরিচালনার ভার দেয় রাশিয়াকে। এই যৌথ ইরাকী এগ্রিমেন্ট অনুসারে ১৯৭২ সাল থেকে সেখানে দৈনিক এক লক্ষ পিপে তেল শোধিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে সোভিয়েট তৈল মন্ত্রী বলেছিলেন,—"The Soviet Iraki agreement makes Russia's first foot hold in an important Middle EastOil Producing Country." —(Middle East Oil, Vanderbilt University Press)

ইরাকের দেখাদেখি এলজিরিয়া ১৯৭১ সালে বিদেশী তেল কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেয়। আর ১৯৭২ সালে লিবিয়া রাষ্ট্রায়ত্ব করল ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ম কোম্পানি। কেউ কেউ বলেছেন আগামী দশ বছরের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যে আর উত্তর আফ্রিকায় সব রাষ্ট্রই তাদের নিজ নিজ তৈল সম্পদ বিদেশীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেবে। আমেরিকা খনিজ তেলের সাহায্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, রাশিয়া করে তার চেয়ে অনেক কম। রাশিয়ায় বিদ্যুৎ বেশির ভাগ উৎপন্ন হয় কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি থেকে। ১৯৬৯ সালে রাশিয়ায় এ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন থেকে ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। এই তেল ও গ্যাস থেকে রাশিয়া আশা রাখে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করতে পারবে। তেল ব্যবহারে রাশিয়া এখনও আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপের পেছনে। এর কারণ মনে হয়, সোভিয়েট রাশিয়া এখনও আমেরিকার মতো শিল্পসমৃদ্ধ নয় আর সাংসারিক সব কাজে বিদ্যুতের দাসও হয়ে পড়ে নি। তাই তার যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় তা তার নিজস্ব তেলের ভাণ্ডার থেকে পূরণ হয়: কিন্তু রাশিয়া যদি আরও শিল্প সমৃদ্ধ হতে চায়—আর সেটাই স্বাভাবিক—তা হলে তারও তেলের ভাণ্ডারে টান পড়বে বলে মনে হয়। এই জন্যে মনে হয় সোভিয়েট রাশিয়া এখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করছে। মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদের ওপর সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপ ও

জাপান একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন চতুর্থাংশ অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলি মধ্য প্রাচ্যের ওপর নির্ভর করছে। তেলের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন ১৯৮০ সালের মধ্যেই পৃথিবীর তেলের চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় রাশিয়া যদি সেখানে তেলে ভাগ বসাতে যায় তাহলে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উঠবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও অসন্তোষের এক বিরাট কেন্দ্র।

আমেরিকা

পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারকারী দেশ হল আমেরিকা সে দেশে রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো, দোকানে কেনা বেচা সবই চলে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে। মানুষ গা-গতর খাটিয়ে কোন কাজই করতে চায় না। চাকরবাকরের মাহিনা সেখানে এত বেশি যে কোটিপতি ছাড়া কেউ মাস মাহিনায় ঝি-চাকর রাখতে পারে না। সপ্তায় একদিন ধোয়া পোছা করার জন্যে ঠিকে ঝি রাখেন এমন পরিবারও সেখানে নেই বললেই চলে, কারণ এই রকম ঠিকে ঝি বা চাকরের মাইনে হল দৈনিক ১৫-২০ ডলার বা ১১২ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। কাজেই গৃহিনীদের বোতাম টেপা জগতে (Push button) বাস করতে হয়। প্রশ্ন হতে পারে, গৃহিণীরা কোন শ্রমসাধ্য কাজ করেন না, বোতাম টিপে নিমেষে সব কাজ সেরে নেন, ফলে যে অখণ্ড অবকাশ পান, তা কাটান কি করে। সময় কাটান তাঁরা টেলিভিসনের দিকে সারাদিন তাকিয়ে থেকে, গল্পগুজব করে, বেড়িয়ে আর মজলিসে যোগ দিয়ে। তাঁরা বলেন, জীবনটা ত হল স্বপ্ন, স্বপ্নগুল হয়ে থাকাই ভাল। তাঁদের অবস্থা কবি Xangston Hughes বর্ণনা করেছেন এই বলে :—

> "Holdfast to dreams/For when dreams go/ Life is a barren field/Frozen with snow."

জীবন সেখানে যন্ত্রচালিত। তাই আমেরিকাকে বলা হয় a land of three g's—gadget,gear and games. কথাটা মিথ্যা নয়। সেখানে মোটর গাড়ির সংখ্যা হল এক কোটি ষোল লক্ষ, সব চেয়ে বেশি উড়োজাহাজ সেখানে প্রত্যহ আকাশে ওড়ে। তাছাড়া শিল্পোন্নত দেশ বলে পরিমাপহীন বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে কলকারখানা চালু রাখার জন্যে।

পৃথিবীর লোক সংখ্যায় অনুপাতে আমেরিকার লোক সংখ্যা ছিল ৬ শতাংশ ; অথচ এই অল্প সংখ্যক লোক পৃথিবীর ৩০./০ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। বাকি ৭০ শতাংশ ব্যবহার করছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ। প্রতি ১০-১৫ বছর অন্তর আমেরিকার মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচ দ্বিগুণ হয়ে চলেছে। ১৯৪৬-১৯৬৬ সালের মধ্যে আমেরিকার লোক সংখ্যা বেড়েছে ৪০ শতাংশ কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বেড়েছে দ্বিগুণের ওপর। এখনই গড় পড়তা এক এক জন আমেরিকান ৫৫ জন এশিয়া ও আফ্রিকা বাসীদের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন আর এই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যে বছরে মাথা পিছু প্রায় ৯০০ গ্যালন তেল লাগছে। তেল ছাড়াও প্রতিজন আমেরিকানের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্যে বছরে ২৪,০০০ পাউণ্ডের বেশি কয়লা পোড়াতে হচ্ছে। এ ভাবে আর কত দিন চলবে ? এ বিষয়ে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, —প্রতিটি কেনেডিয়ানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বাৎসরিক কয়লার প্রয়োজন ২০০০০ পাউণ্ড, প্রতি সুইড ও চেকের জন্যে— ১৪০০০ পাউণ্ড, প্রতি বেলজিয়ান, ডেন ও পূর্ব জার্মানের জন্য—১৩০০০ পাউণ্ড, প্রতি অষ্ট্রেলিয়ান, ব্রিটন, নেদারল্যাণ্ডার ও পশ্চিম জার্মাণের জন্যে—১২০০০ পাউণ্ড কয়লা।

আমেরিকায় ৮০% শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তেল, গ্যাস ও কয়লা থেকে ১৬% শতাংশ জলশক্তি থেকে, আর মাত্র ২% শতাংশ উৎপন্ন হয় পরমাণবিক শক্তি থেকে। এখন আমেরিকার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হল ১·৫ ট্রিলিয়ন।

(এক ট্রিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০,০০০)

২০০০ সালে আমেরিকার লোকসংখ্যা ২৭ কোটি হতে পারে (অর্থাৎ ১৯৭০ সালের তুলনায় ৩০% শতাংশ

মাত্র) কিন্তু ঐ সময়ে সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে হবে ৪ থেকে ৫ গুণ। এ বিদ্যুৎ কোথা থেকে পাওয়া যাবে আর কি ভাবেই বা পাওয়া যাবে?

বিদ্যুৎ শক্তি সভ্য মানুষের দাস স্বরূপ। আগে যেমন বড়লোকেরা অসংখ্য দাসদাসী রাখতেন এবং তাদের সুখ দুঃখের দিকে একবারও না তাকিয়ে নির্মমভাবে খাটিয়ে নিতেন, তেমনি সভ্য-জগৎ আজ বিদ্যুৎশক্তিকে খাটিয়ে নিচ্ছে। তাই এখন বিদ্যুৎশক্তিকে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক দাসী (মেকানিক্যাল্ মেড)। য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র, এবং বিশেষ করে আমেরিকায় শিল্পোৎপাদনে, গৃহস্থালী ও চাষবাসের কাজ এবং পরিবহন প্রভৃতি সমস্ত কাজই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে হয়ে থাকে। আর এই সব কাজে অবিশ্বাস্য পরিমাণ অশ্বশক্তির (হর্স পাওয়ার) প্রয়োজন। আমেরিকায় প্রতি বছর ৮ ট্রিলিয়নের বেশি অশ্বশক্তির দরকার হয়। এগুলো জীবন্ত-অশ্ব হলে তাদের আস্তাবলে জায়গা হত না।) প্রতি আমেরিকান হাতের কাছে বোতাম (সুইচ্) টিপে ঘর-কন্নার যেসব কাজ সেরে নেন, যেসব কাজ বিনা আয়াসে হয়ে যায়, সেই সব কাজ যদি দাসদাসী দিয়ে করাতে হত, তা হলে লাগত ৫০০ জন দাসদাসী। তবে দেখুন প্রতিটি আমেরিকানের আরামের জন্যে দরকার হচ্ছে পাঁচ শ' দাসদাসী। মুসলমান যুগে নবাব, বাদশাহদেরও এত দাসদাসীর প্রয়োজন হত না। আমেরিকার তুলনায় পশ্চিম য়ুরোপবাসীদের প্রতিজনের প্রয়োজন হয় দেড় শ' থেকে আড়াই শ' দাসদাসী (মেকানিক্যাল মেড)। আর অষ্ট্রেলিয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকানদের লাগে যথাক্রমে ২৫০ জন ও ১২৫ জন। এই ভাবে হিসেব করে বিজ্ঞানী Irving Benglesdorf বলেছেন, আমেরিকার লোকসংখ্যা প্রায় কুড়ি কোটি, এর সঙ্গে যদি যোগ করা হয় ১০০ বিলিয়ন শক্তি-দাস (এনার্জি স্লেভ), তা'হলে আমেরিকার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১০০,২০০,০০০,০০০। এটা অবশ্য পরিহাসের বিকাশিতৎ। তা হলেও বেশখানিকটা চিন্তার খোরাক যোগায়।

আর একজন পরিহাস রসিক বিজ্ঞানী, কোলারেডর ন্যাশনাল সেন্টার ফর এটমস্ফিয়ার রিসার্চের অধিকর্তা ডাঃ জেমস্ লজ, জুনিয়ার এই রকম একটা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"We must limit our Own population it is true, but it is even more necessary to impose a program of rigorous birth control on our energy slaves. To say that the programme is an enormous program of Rethinking Priorities, is to state the obvious, but is nonetheless true." এই ত গেল আমেরিকার অপরিমিত বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের কথা।

জাপান

বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারে জাপানও বড় কম যায় না। তার স্থান আমেরিকার পরেই। অথচ এই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে তার দেশে এক ফোঁটাও তেল মেলে না। কয়লার উৎপাদন অবশ্য জাপানে নিতান্ত মন্দ নয়; তবু শিল্প সমৃদ্ধ হবার জন্যে তাকে বাইরে থেকে ৫৮% শতাংশ কোকিং কয়লা আমদানি করতে হয়। জাপানের অবস্থা দেখে বলতে ইচ্ছে হয় সে যেন তেল বন্দী। তেলের কাছে সে যেন বাঁধা পড়েছে, এ বন্ধন থেকে তার মুক্তি নেই। যেসব রাষ্ট্র শিল্পোৎপাদনের জন্যে তেলের ওপর একান্ত নির্ভরশীল এবং তেল খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তেল ব্যবহারে জাপানের স্থান সপ্তম। এটা অবশ্য ১৯৫৮ সালের কথা। তখন থেকে আজ পর্যন্ত জাপান সমানে তার তেলের চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে, কাজেই এখন তার স্থান আর সপ্তম নয়—বোধহয় আমেরিকার পরেই।

উপযুক্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান এখনও পর্যন্ত জাপানে পাওয়া যায় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও তার সম্ভাবনা কম। য়ুরোপের কোন কোন অংশে কিন্তু এ বিষয়ে কিছু আশা এখনও আছে বহু রকমের কাঁচা মাল জাপানে অমিল, তা সত্বেও জাপান হয়ে উঠেছে এক বৃহৎ-শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। G. N. P. (Gross National Production) কেবল মাত্র সোভিয়েট রাশিয়া

আর আমেরিকা তাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে। জাপানের G. N. P. বর্তমানে ১৫% শতাংশ। তার এই গড় জাতীয় উৎপাদন বজায় রাখতে হলে, তার মধ্য-প্রাচ্যের তেলের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সে যদি শিল্পোৎপাদনে Dai-ichi (প্রথম শ্রেণী) হতে চায় এবং উদ্দেশ্যও তাই; তা'হলে তাকে মধ্য-প্রাচ্যের তেলের কাছে ত্বং হি মম হৃদয়েশঃ বলে শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। জাপান এখনই প্রতিদিন ৩·৪ মিলিয়ন পিপে তেল ব্যবহার করছে। ১৯৮০ সালে তার তেলের চাহিদা বেড়ে গিয়ে হবে প্রতিদিন এক কোটি পিপে। আর তারপর? সে কথায় উপস্থিত আর কাজ নেই। তার কলকারখানা চালু রাখার জন্যে বিপুল পরিমাণে তেল মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করতে হচ্ছে; বর্তমানে এর পরিমাণ হল ৮৫%—৯০%। এই তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জাপানের কলকারখানা, যানবাহন চলাচল সব এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে—ধ্বংস হবে তার অর্থনীতি। তার বিপুল পরিমাণ G. N. P. নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে পশ্চিম য়ুরোপের কোন দেশের সঙ্গেই শিল্পোৎপাদনে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। তার রপ্তানি বাণিজ্য মার খাবে। কিন্তু জাপানের মত আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য মার খাবেনা। তার যে-তেল আছে এবং যে পরিমাণে তেল সে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি করতে পারবে তাতেই তার শিল্পোৎপাদন কর্ম কোন রকমে বজায় রাখতে পারবে। জাপানকে হারিয়ে দিয়ে সেই তখন বৃহৎ শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠবে।

তেল সরবরাহ বন্ধ না করে শুধু মাত্র তেলের দাম বাড়ালেও জাপানের নিতান্ত কম ক্ষতি হবেনা; কারণ, তার ফলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়তে বাধ্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য শুধুমাত্র তেলের দাম বাড়িয়েই জাপানকে কাহিল করে দিতে পারে। সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত তৈল-বাণে পৃথিবীর সব দেশই অল্পবিস্তর আহত হলেও, আঘাতে সবচেয়ে বেশি জর্জরিত জাপান। তার এই বাণাঘাত আরাম করবার জন্যে বিশল্যকরণী কোথাও পাওয়া যাবে না। কাজেই এই একমাত্র তৈলাস্ত্র দিয়েই মধ্যপ্রাচ্য সহজেই জাপানকে জব্দ করতে পারবে। আর হয়েছেও তাই। আরব-ইজরাইল যুদ্ধে জাপান আরব রাষ্ট্রগুলিকে নৈতিক সমর্থন জানায় নি, কারণ সে আমেরিকার সবচেয়ে বড় বন্ধু। জাপানের ১/৩ অংশ শিল্পজাত দ্রব্যের (বাৎসরিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার) ক্রেতা হল আমেরিকা আর য়ুরোপ হল মাত্র ১৫% শতাংশের। কিন্তু যেই মধ্যপ্রাচ্য জাপানকে আর তেল দেবে না বলে হুমকি দিল, অমনি এতদিন পরে জাপানকে আরব রাষ্ট্রগুলিকে নৈতিক সমর্থন জানাতে হল। তাকে স্পষ্ট করে বলতে হল, ১৯৬৭ সালের ইজরাইল অধিকৃত আরব রাষ্ট্র এলাকা ছেড়ে না দিলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে না—আরবদের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন আছে। এতে আমেরিকা জাপানের ওপর খুব চটে গিয়েছে; কিন্তু তাতে কি? পেটে খেলে পিঠে সয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানকে ধূলিশয্যা নিতে হয়েছিল। সম্মিলিত শক্তি জাপানের সমস্ত কল-কারখানা তুলে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণপূর্ব দেশগুলোতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য জাপানকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া। জাপান হয়ে পড়েছিল একেবারে নিঃস্ব। এ হেন জাপান কয়েক বছরের মধ্যেই সততা ও কর্ম-দক্ষতার ফলে তার পরাজয়কে শিল্পবিজয়ে পরিণত করল। তাই দেখতে পাই আজ জাপান শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্যেই নয় জাহাজ নির্মাণে, পিয়ানো কেমেরা, ট্রান্‌জিস্টার টেলিভিসন সেট প্রভৃতি নির্মাণে পৃথিবীর এক নম্বর দেশ হয়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধে হেরে গিয়েছে বটে কিন্তু শিল্পযুদ্ধে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিজয়ী হয়েছে।

এই সব দেখে অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন একুশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই, অর্থাৎ এখন থেকে ২৭ বছর পরেই জাপান হবে Ichi ben অর্থাৎ পয়লা নম্বর শিল্পোন্নত দেশ। তার জাতীয় গড়-উৎপাদন আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এশিয়ায় এখন সবচেয়ে ধনী-দেশ হল জাপান।

সামরিক শক্তিতেও জাপান একেবারে ফেল্‌না নয়। এশিয়ায় মহাচীনের পরই সমর সজ্জায় জাপানের স্থান। এ বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীতে এখনই তার স্থান হল ষষ্ঠ এবং এখানেই সে থেমে থাকে নি, ক্রমাগত নিজের সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে চলেছে। এখন সে মাঝারি ধরনের ট্যাংক তৈরী করছে, নৌশক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে। আগামী পাঁচ বছরে পনের বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করবে বলে ঠিক করেছে। ধনী দেশ না হলে কি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়?

ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (E. E. C.) আরব ইজরাইল যুদ্ধে মৌনাবলম্বন করেছিল, বিশেষ কিছু বলে নি। যদিও মনে মনে পূর্ণ সমর্থনটা ছিল আমেরিকার প্রতি। যেই আরবদেশগুলো ২৫% শতাংশ তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেবে বললে, অমনি তাদের প্রত্যক্ষভাবে আরবদেশগুলোকে সমর্থন জানাতে হল—ইজরাইলকে নিন্দা করতে—হল। এ ছাড়া তাদের উপায় ছিলনা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম কথায় বলে। তেলের যে এত শক্তি বোধহয় আগে তারা জানত না।

ভারতবর্ষ জাপান বা য়ুরোপের মত শিল্পসমৃদ্ধ দেশ না হলেও, তার তেলের একান্ত অভাব। মাত্র ৩০% শতাংশ তেল এদেশে মেলে। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। যদিও তেলের ব্যবহার এদেশে পশ্চিমা যেকোন দেশের তুলনায় অনেক কম। তেলের সাহায্যে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় খুব কমই; তবে সার উৎপাদনে বেশ খানিকটা তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের তেল দরকার হয় প্রধানতঃ যানবাহন চালনায়। আর এই তেল আমদানি করতে হয় ইরাণ, সৌদি আরব আর ইরাক থেকে। এই অপরিশোধিত তেলের মোট আমদানির পরিমাণ এক কোটি ষাট লক্ষ টন। এর এক কোটি টনই পাঠায় ইরাণ। এখন ন্যাশনাল ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানি পৃথিবী জুড়ে টেণ্ডার আহ্বান করেছেন। যেদেশ বেশি দাম দেবে, তারাই তেল কিনতে পারবে। এতে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রচুর ক্ষতি হইবে। তেলের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাবে। বর্তমানে ভারত তেলের জন্যে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করছে। সেটা এক লাফে ১২০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। অথচ ভাগ্যের পরিহাস ভারত আজ বলে নয়, বহু কাল থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশকেই, বিশেষ করে আরব দেশগুলোকে সমর্থন করে আসছে এবং এই সব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ চিরদিন সুহৃদভাবাপন্ন। শুধু নরম মাটিতে আঁচড়ান সহজ এই মনে করেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেলের দাম হঠাৎ বাড়িয়ে দিল। ফলে ভারতের বেশ অসুবিধে হয়েছে। যানবাহন চালানর খরচা অনেক বেড়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ ঘাটতিও বেশ খানিকটা দেখা দিতে পারে।

তেল সরবরাহ বন্ধ হলে

এতদিন মধ্যপ্রাচ্য নির্বিবাদে আমেরিকাকে তেল সরবরাহ করে আসছিল; কিন্তু এ বছরে আরব-ইজরাইল যুদ্ধে অবস্থার যেন পরিবর্তন হতে চলেছে। আরব রাষ্ট্রগুলি ও উত্তর-আফ্রিকা আমেরিকাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, ১৯৬৭ সালে হৃত আরবভূমি ইজরাইল ফিরিয়ে না দিলে তারা আমেরিকাকে একেবারে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেবে কিংবা রপ্তানির পরিমাণ খুব কমিয়ে দেবে। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে আমেরিকার খুব ক্ষতি হবে না (আমেরিকার মতে), কারণ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য-থেকে সামান্য পরিমাণ তেল আমদানি করে। আরবরা তেল না দিলে, ইরাণ হয়ত সেটা পূরণ করে দিতে পারে। না দিলেও আমেরিকা হয়ত কেনেডা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বাড়তি তেল এনে সেই ঘাটতি মিটিয়ে নিতে পারবে (এটাও অনুমান সাপেক্ষ)। ঘাটতি মেটাবার জন্যে আমেরিকা ইতিমধ্যেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। (১) ডিসেম্বর থেকে পেটরোল রেশনিং চালু করেছে, (২) শিল্পে শতকরা দশভাগ তেল কম সরবরাহ করবে, (৩) মোটরের সর্বোচ্চ গতি বেঁধে দিয়েছে। এইসব

ব্যবস্থার ফলে এখন রোজ যে এক কোটি সত্তর লক্ষ পিপে তেল ব্যবহার হচ্ছে, তা আর হবে না। পরিমান কমে যাবে। প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন ১৯৮০'র মধ্যে আমেরিকা তেলের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হবে। তবে মুস্কিল হচ্ছে আমেরিকায় বিদ্যুতের চাহিদা যে পরিমাণে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, তাতে এখন না হোক অদূর ভবিষ্যতে তাকে হয় বিদ্যুৎ ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে হবে, নয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

তেলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আরব রাষ্ট্রগুলি কতটা সফল হবে সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। তাদের নিজেদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য নেই, পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে; তাছাড়া তাদের তৈলক্ষেত্রগুলি এখনও বেশির ভাগ বিদেশী কর্তৃক পরিচালিত। অবশ্য ১৯৮০ সালের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের সব রাষ্ট্রই পাশ্চমা তৈল কোম্পানীদের হটিয়ে নিজেরাই পরিচালনা ভার গ্রহণ করবে, তবে কতটা সফল হবে সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। অপর দিকে আমেরিকারও অসুবিধে। সে এক দিকে মধ্য প্রাচ্য থেকে তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে চায় অন্য দিকে ইজরাইলকে টাকা, অস্ত্র, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে যাবে' এই দু-মুখো নীতি আরবরা কি করে বরদাস্ত করবে? এ নীতি সফল হওয়া ও সম্ভব নয়। তাই একটা সংঘর্ষের ক্ষেত্র যে তৈরি হচ্ছে সেটা কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

তেল সরবরাহ বন্ধ হলে তার অন্য ফল হবে সারা পৃথিবীতে নতুন করে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান চলতে থাকবে। কিছু কিছু নতুন তেলের উৎসের সন্ধানও মিলবে, যেমন মিলছে ভারতবর্ষে নাগাল্যাণ্ডে। বোম্বায়ের উঁচু এলাকায় কিছু পরিমাণে তেল পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকায় গ্যাস চালান দেওয়ার ব্যবস্থা এরই মধ্যে করে ফেলা হয়েছে। আর বাকু থেকে জাপানকে তেল সরবরাহ করার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাপানী সহযোগিতায় পাইপ লাইন বসানোর কথাবার্তা সুরু হয়েছে। য়ুরোপ আমেরিকায় গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ সীমিত করা হবে—যা ইতিমধ্যেই অল্প পরিমাণে করা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা যদি পূর্ণ ভাবে কার্যকরী না হয় এবং আমেরিকার শিল্পোৎপাদন যদি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়; তাহলে কি হবে? সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেবার জন্যে কি আমেরিকা যুদ্ধে নেমে পড়বে? আমেরিকা অবশ্য ইতিমধ্যেই হুমকি দিয়ে রেখেছে তেল সরবরাহ বন্ধ করলে, সেও শিল্পজাত কোন দ্রব্যই মধ্যপ্রাচ্যে পাঠাবে না' এ হুমকিতে কোন কাজ হবে না। শিল্পজাত দ্রব্য পাঠাবার জন্যে অনেকে উদগ্রীব হয়ে আছে। রাশিয়া আবার এদিকে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সেও অস্ত্র দিচ্ছে, বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে। এর ফলে ইজরাইল ও আরবদের মধ্যে আবার নতুন করে সংঘর্ষ হতে পারে। তবে সেটা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে না বলেই বিশ্বাস; কারণ আমেরিকা যুদ্ধে নামলেও রাশিয়া প্রত্যক্ষ্যভাবে যুদ্ধে নামতে সাহসী হবে না; তার প্রধান ভয় মহাচীনকে। যদি রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধে তাহলে চীন পেছন থেকে রাশিয়ার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে, একথা রাশিয়া ভাল ভাবেই জানে, আর এই জন্যে রাশিয়া ভারত সাগরে তার নৌ বহর পাঠাবে না বলে আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছে, যদিও আমেরিকা নতুন করে আবার নৌবহর পাঠাচ্ছে। তবে আমেরিকা ভারত মহাসাগরে ক্রমাগত নৌবহর পাঠাতে থাকলে রাশিয়ার কতদিন চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হবে সেটাও ভাববার বিষয়। আমেরিকার এইভাবে ক্রমাগত নৌবহর পাঠানোর উদ্দেশ্য আরবদেশ-গুলোকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য বলেই মনে হয়, ঠিক যুদ্ধ করার জন্যে নয়, যেমন সে ভারতকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য পাকিস্তান—বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় নৌবহর পাঠিয়েছিল। রাশিয়া ভাল ভাবেই জানে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধলে, কোন দেশই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে না। কাজেই মনে হয় যুদ্ধ বাধলে সেটা হবে সীমিত ধরণের, যেমন হয়েছিল ভিয়েৎনামে ক'বছর ধরে। আর সে যুদ্ধে রাশিয়া ও আমেরিকা দুজনেই পরের হাতেই তামাক খাবে।

যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে অন্য উপায়ে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা

মেটানো যায় কিনা সে কথাও আমেরিকা সক্রিয়ভাবে ভাবছে। সেই উপায়টা হল পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন। এ প্রচেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। এ ভাবে কিছু কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন সব শিল্পোন্নত দেশেই ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা সফল হওয়া ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। ইউরেনিয়ম পরমাণুকে বিভাজন করলে যে অমিত শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিকে সংহত করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা। ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে য়ুরোপের প্রায় সব দেশেই এটমিক রি-একটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে পূর্বাঞ্চলে তাপ বিদ্যুতের সম্ভাব্য পরিবর্তন ব্যবস্থা হিসাবে পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্যে একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এটমিক রি-একটার থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন বিষয়ে আমেরিকা সব চেয়ে অগ্রণী। ইতিমধ্যেই ২৮টি নিউক্লেয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করছে। এ ছাড়া আরও ৫০টি নতুন প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে; আর নতুন করে তৈরি হবে আরও ৭০টি প্ল্যান্ট। এই সব নতুন প্ল্যান্টগুলো কাজ আরম্ভ করলে, বর্তমানে আমেরিকায় যে ৩৭০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপন্ন হচ্ছে তাতে আরও ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি যুক্ত হবে। এতে আমেরিকার বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটা পূরণ হবে। কম দামের ইউরেনিয়ম, যা থেকে এই শক্তি বর্তমানে আহৃত হচ্ছে তার ভাণ্ডার পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। যে ভাবে বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে তাতে এই শতাব্দীর শেষের দিকে এই শ্রেণীর ইউরেনিয়ম নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন ইউরেণীয়ম ২৩৫ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হবে। এই শ্রেণীর ইউরেণীয়ম মাত্র কয়েকটি দেশে পাওয়া যায় এবং তারও পরিমাণ অফুরন্ত নয়, কাজেই দামও অনেক বেশি। এই শ্রেণীর ইউরেনিয়মের জ্বালানি শক্তি অনেক বেশি। গলফ্ খেলার বলের আকারের এক পাউণ্ড ওজনের এই শ্রেণীর ইউরেনিয়মের মধ্যে যে জ্বালানি শক্তি আছে তা পনের গাড়ি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পোড়ালে পাওয়া যেতে পারে। নিউক্লেয়ার রি-একটার থেকে শক্তি আহরণের খরচ বেশি, বিপদের আশংকা ততোধিক। এর জেনারেটিং প্ল্যান্টে যদি ফাটল ধরে, তার নলে যদি যদি ছিদ্র দেখা দেয় তাহলে তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণের ফলে অপরিসীম ক্ষতি হবে। এ ছাড়াও পারমাণবিক রিএকটার থেকে বিষাক্ত পরিত্যক্তাংশ (রেডিও একটিভ ওয়েস্ট) যা বার হবে, তা যেখানেই ফেলা হোক সেখানেই মানুষের মৃত্যু ডেকে আনবে। সমুদ্র গর্ভে ফেললে বা মাটির নিচে পুঁতে দিলেও বিপদের হাত থেকে নিস্তার নেই। তা ছাড়া এর ফলে বায়ুমণ্ডলও দূষিত হয়ে পড়বে।

কৃত্রিম অতি যান্ত্রিক জীবন পরিণামে সুখকর হয় না। কৃত্রিম সভ্যতার উদ্দেশ্যে বোধ হয় কবি বলেছিলেন :—

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র নমো নমো
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত
তব বস্তু বিশ্ব বক্ষোদংশ ধ্বংস বিকট দন্ত
তব খনি খনিত্র—নখ—বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ—অন্ত
তব পঞ্চভূত—বন্ধন কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

শুধু রবীন্দ্রনাথই নয় অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও এই যন্ত্র নির্ভর কৃত্রিম জীবনযাত্রা কে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা এই তেলাভাব পরিস্থিতিকে বরং একটা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ বলে মনে করেছেন। যখন তেলের সংকট দেখা দেয় নি, তখনও অনেক বিজ্ঞানী এই অতি যান্ত্রিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। নোবেল-বিজয়ী ওলন্দাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক টিন বারজেন বলেছেন—"পাশ্চাত্য সমাজ আর একটু কৃচ্ছ্র সাধন করুক তাতে তার ক্ষতি হবে না।" আর একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক লোরেঞ্জ বলছেন,—জীবন এবারে আর একটু সরল হোক মানুষের তাতে মঙ্গলই হবে।"

আজকের এই সাময়িক অসুবিধা, তৈল সংকট যদি কেটেই যায়, তাহলেও ত ভবিষ্যৎ সংকট দূর হয়ে

যাবে না একেবারে। কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল এ সব ত চিরদিন পাওয়া যাবে না। একদিন এ ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। সে দিন জ্বালানির ব্যবস্থা কি করে হবে? মানুষ কি সেদিন শীতে কুঁকড়ে মরে যাবে—রান্না করে আর খেতে পাবে না? সে এক নতুন সমস্যা। সে সমস্যাও বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যা সমাধান করবার চেষ্টা এখন থেকেই করছেন। সে সমাধানের প্রসঙ্গ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বিরত হলাম।

একটা নির্মম সত্য যা নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটা এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হবে। সেই সত্যটা হল—এতগুলো ধনী, শিল্পসমৃদ্ধ, সামরিক শক্তিতে অজেয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অদ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্রকে মুষ্টিমেয় অনগ্রসর, নিজেদের মধ্যে সতত বিবাদমান সংহতিহীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দয়ার ওপর এমনভাবে, একান্ত নির্ভরশীল হতে এর আগে মানুষের ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি। এ অপমান তারা কতদিন নীরবে সহ্য করে সেটাই দেখবার বিষয়।

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রণজিৎ কুমার সেন

এযুগের এক অনন্য আদর্শবাদী ব্যক্তি মাত্র ন'ন, কবি বিজয়লাল ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, একনিষ্ঠ দেশসেবক, এবং সবার উপরে জীবনশিল্পী। তাঁর আশৈশব শিল্প-চেতনা তাঁকে শুধু কবি হিসেবেই গ'ড়ে তোলেনি, গ'ড়ে তুলেছিল উচুদরের প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক ও বিভিন্ন পর্যায়ের আর্টের নিখুঁত ব্যাখ্যাতা হিসেবেও। তাঁর স্বদেশানুরাগ যেমন নিখাদ ও গভীর ছিল, তেমনি ছিল মানব প্রেম। অথবা বলা যায়—মানবপ্রেমই তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বদেশ-আত্মার সঙ্গে যেমন তিনি একাত্ম ছিলেন, তেমনি ছিলেন দেশ বিদেশের মনীষীদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান। গান্ধী-আদর্শ তাঁকে যতখানি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছে, ততোধিক তাঁর চিত্তকে উদ্বোধিত করেছে রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ। ব্যক্তিমানসের দিক থেকে তিনি তাই এই উভয় মনীষীর ভাবরাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন অত্যন্ত সহজেই। তাঁর ব্যক্তিত্ব এত প্রবল ছিল যে, তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারা ও রুচি থেকে কেউ তাঁকে নড়াতে পারতো না। আদর্শবাদী চরিত্রমাত্রেরই লক্ষণ এটা। তার ফলে বহুক্ষেত্রের নানাক্ষেত্রে তাঁকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, ঠকতে হয়েছে, কিন্তু মননক্ষেত্রে তিনি যে আত্মিকশক্তি লাভ করেছেন, তাকে কোনো কিছু দিয়েই পরিমাপ করা যেতোনা। দেশ ছিল তাঁর কাছে গরিয়সী মাতা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন পণ ক'রে তাই গ'ড়ে তুলেছিলেন তিনি চারণদল—যার আদর্শ ছিল গান্ধী-অনুসৃত সর্বোদয় ও সত্যাগ্রহ। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি তাই সমধিক পরিচিত ছিলেন চারণ কবি বলে। এ ক্ষেত্রে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুলের পরোক্ষ প্রভাব তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাইলেও হয়তো পুরোপুরি পরিহার করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রাণচেতনায় যাঁরা সবক্ষণের জন্যে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন—বুদ্ধ, যীশু, কনফুসিয়াস, শ্রীচৈতন্য, সক্রেটিস, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, হুইটম্যান, রোলাঁ, গর্কি, রাসেল, হাক্সলি, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও লেনিন। ফলে তাঁর চরিত্রে এমন এক শান্ত সমাহিত অথচ দীপ্ত মাধুর্য প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছিল—যা এ যুগে অনেকের ক্ষেত্রেই বিরল। আত্মীয়জ্ঞানে বিশ্বকে তিনি কেবলই নিজের দিকে আকর্ষণ করেছেন, সোদরপ্রতিম ভিন্ন কাউকে তিনি কখনও সম্বোধন করেননি। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধই তাঁকে এ যুগের এক দুর্লভ মানুষ হিসেবে গ'ড়ে তুলেছিল।

১৮৯৮ সালে কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পিতা কিশোরীলাল, মাতা কিরণময়ী। খুব অল্প বয়স থেকেই বিজয়লাল দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম কারাবরণ করেন ১৯২২ সালে। কারা-জীবনেই তাঁর প্রথম সংযোগ ঘটে কাজী নজরুলের সঙ্গে। দুই কবির গানে গানে তখন কারাগার মুখর হয়ে থাকতো। এরপর ১৯৩০,' ৩২ এবং ৪২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্যে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কিছুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এ সময়ে বিজয়লাল রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন। দেশবন্ধুর 'বাংলার কথায়' তাঁর প্রথম সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত পরে যথাক্রমে 'বঙ্গবাণী', 'ঊষা', 'দৈনিক কৃষক' ও 'লোক' সেবক' পত্রিকার তিনি সম্পাদক হন। মাঝখানে বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত থাকেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিজয়লাল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ইতিপূর্বেই তিনি নদীয়ার বড়-আন্দুলিয়ায় গান্ধী আদর্শে স্ব-পরিকল্পিত 'লোকসেবা

শিবির' ও 'নবজীবন সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৭৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি সেখানেই গ্রামীন সংস্কার, সংগঠন ও শিক্ষাকার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তিনি বিয়ে করেন বরিশালের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রিয়নাথ দাশগুপ্তের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী ইলাকে। জ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যেদিকে-না শ্রীমতী ইলার অনন্যসাধারণ প্রবণতা ছিল। ১৯৬১ সালের ১৩ই মে তিনি লোকান্তরিতা হ'লে তাঁর সম্পর্কে 'সেই মঞ্জুভাষিনী নম্রনীরব নারী' নামে বিজয়লাল যে স্মৃতি-পুস্তিকা রচনা করেন, তাতে জীবনসঙ্গিনী সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখেছেন:'...গণতন্ত্রের মূর্তিমতী প্রতিমা ছিলেন ইলা। অন্যের জন্য ভাবতে পারতেন, নম্র ছিলেন ব্যবহারে চিন্তায় উদারতার পরিচয় থাকতো, আর ছিল একটা তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। নিজেকে যেমন সম্মান দিতে পারতেন, অন্যকেও তেমনি।'—সর্বস্ব-ত্যাগিনী নিরাভরণা এই মহিয়সী নারী ছিলেন লোক সেবা শিবিরের-মাতা। তাঁদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

বিজয়লাল-রচিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ত্রিশ। যথা—সর্বহারাদের গান, সাম্যবাদের গোড়ার কথা, রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ, মনের খেলা, মনের গভীরে, মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রদূত, বিদ্রোহীর স্বপ্ন, কমিউনিজম, রবিতীর্থে, রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র, স্বর্গের ঠিকানা, সাম্যবাদের মর্মকথা, মরুজয়ের সেনা, ঘরের মায়া, সেনাপতি গান্ধী, মানুষের অধিকার, রাশিয়ার কথা, ত্রয়ী, বঙ্কিমের স্বপ্ন, অভিশাপ না আশীর্বাদ, দ্রষ্টার চোখে, ঝটিকার ঊর্ধ্বে, হ্যাভেলক এলিস ও যৌনবিজ্ঞান, আমরা যাহা বিশ্বাস করি, হে রুদ্র সন্ন্যাসী, 'The Champion of the Proletariat' প্রভৃতি।

এই গ্রন্থরাজি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ ক'রেও বিজয়লাল ছিলেন একান্ত প্রগতিপন্থী। যা কিছু অন্যায়, অসত্য ও নীতিবর্হিত, তার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। তাঁর লেখনী ছিল নিত্যকালের বিদ্রোহী, বিপ্লবী ও সংগ্রামীর বজ্রকঠোর লেখনী। বাংলার প্রগতিসাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পুরোধাস্বরূপ। বিশ্বসাহিত্যের প্রগতিশীল চিন্তা-ধারাকে তিনি অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মাধ্যমে এদেশের জনচিত্তে প্রবাহিত ক'রে দিয়েছিলেন। 'প্রগতিসাহিত্যের রূপ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: প্রগতিসাহিত্য সকলের আগে চায় জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দিতে। রলাঁর কণ্ঠে সে বলে—Thought has no higher role than that of making itself the great soldier of the action that renews the world! যে কর্মকে আশ্রয় ক'রে বুর্জোয়া সমাজ শ্রেণীহীন সমাজের (classless society) মধ্যে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে, জ্ঞানকে হতে হবে সেই কর্মের মহাসৈনিক। কর্মের সাহায্য করাই হ'চ্ছে আজকের দিনে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কাজ। প্রগতি প্রগতিসাহিত্যের ব্রত হবে নূতন জগৎ সৃষ্টির কাজে কর্মের সহায় হওয়া।'

বিদ্রোহীর দলকে তিনি দু'টি ভাগে দেখেছেন। একদল হলো ভাবুক—নূতন ভাবকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো যাদের জীবনের প্রধান ব্রত। আর একদল হলো কর্মী—নূতন ভাবকে কর্মের মধ্যে রূপ দেওয়াই হলো যাদের জীবনব্যাপী সাধনা। ভাবুক যে—তার হাতে থাকে লেখনী। সেই লেখনীকে অস্ত্র ক'রে সে শুরু করে পুরাতনের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলন্ত আর ভয়ঙ্কর চিন্তার প্রবাহ বেরিয়ে আসে তার কলমের মুখ থেকে। অনেকদিনের জীর্ণ সংস্কারের ভিত্তি যায় তখন টলে; নূতন নূতন ধারণা এসে মানুষের মনে পাতে আসন। কবির পশ্চাতে দেখা দেয় কর্মী। একজনের স্বপ্নকে আর এক-জন রূপ দেয়, একজনের অশরীরী ভাবকে আর এক-জন দেয় বাস্তবের মধ্যে দেহ।

কিন্তু বিজয়লালের জীবনে দেখা যায়—সেই কবি ও কর্মী একসঙ্গে এসে মিলেছেন। যে মনে তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের জন্ম, সেই মন নিয়েই তিনি নেমেছেন জাতীয় সংগঠনের কাজে। 'রক্ত ঊষার যাত্রীদল'কে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

'ওরে আমার বাধনহারা রক্ত উষার যাত্রীদল,
চল্ ফুটিয়ে মরুর বুকে নব আশার লাল কমল ;
অন্ধকারের দুর্গ-শিরে রাঙা রবির জয়-নিশান
উড়িয়ে দিয়ে, কণ্ঠে নিয়ে পাগলা ঝোরার বিজয় গান
চল্ আগিয়ে নতুন দিনে তরুণ যত বন্ধুগণ,
অরুণ-রাঙা মেঘের রথে এল পথের নিমন্ত্রণ।'

আবার 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে বলেছেন :—

'কাল বোশেখীর মেঘের পাতায় বিজলীর অক্ষরে
চরৈবেতির অগ্নিমন্ত্র। কর্ণবিদারী স্বরে
বজ্র হাঁকিছে চল, চল, চল, নব যৌবনদল,
জীবনের ধ্বজা উড়াইয়া চল আনন্দে চঞ্চল।'

নজরুলের 'বিদ্রোহী'র পর বিজয়লালের 'সর্বহারাদের গান' বিপ্লবী বাংলার তরুণ সমাজকে একদা যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। এর বাইরেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বহু সনেট রচনা করেছেন—যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি। বিদ্রোহ ও বৈরাগ্যের সমন্বয়ে এই সনেটগুলো উদ্দীপ্ত ও মধুর। জীবনকে তিনি কখনও শান্তির শান্ত ক্ষেত্রে কল্পনা করেননি, জীবনকে দেখেছেন তিনি অবিরাম তিতিক্ষায় আর সংগ্রামে। রোলাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন—'জীবন সেখানেই, যেখানে মানুষের বেদনা আর সংগ্রাম—যেখানে সূর্যালোক আর ঝড়বাদল ('Life is where the suffering of men and their combat are, in the sun and the rain storm')।

আমার সঙ্গে বিজয়লালের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে ১৯৩৮ সালে—যখন তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক। আমার মানসিক প্রবণতা অনেকাংশে তাঁর অনুসারী হবার ফলে এই সম্পর্ক অল্প দিনেই নিবিড় হ'য়ে ওঠে। আমার তৎকালীন রচিত অনেক কবিতা ও গান তিনি সাগ্রহে দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। লোকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিতেন 'a budding poet of Bengal' ব'লে। এমন মানসিক ঔদার্য সেদিন অন্য কোনো সম্পাদকের মধ্যে খুব কমই দেখেছি। একদিন সন্ধ্যায় বাগবাজারের ৫নং অন্নদা নিয়োগী লেনে তাঁর মাতৃসান্নিধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন : 'মা, দেখ, তোমার এই ছেলেটিকে চিনতে পারো কিনা! আমার আর মিহিরের মতই রণজিৎ তোমার আর-এক ছেলে।'—আমি কবি-জননীকে প্রণাম ক'রে সেদিন ধন্য হলাম। যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'খেয়াল' পত্রিকায় আমি তখন তাঁর 'সর্বহারাদের গান' দিয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখলে তিনি আমাকে সারা বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেন : 'তুমিই প্রথম ব্যক্তি—যার কলমে আমার বইয়ের এমন বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ পেলো।'

সেদিন থেকে জীবনের সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের ফাঁকে ফাঁকে নানা সভাসমিতিতে আমরা একত্রে মিলিত হয়েছি, তাঁর ভাবগম্ভীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, গল্প ক'রে সারা মনে খুসী হ'য়ে উঠেছি। পরবর্তীকালে আমি যখন মাসিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা সম্পাদনা করি, তখন তাঁর রচনা চেয়ে বড় আন্দুলিয়াতে চিঠি পাঠালে তিনি নিজেই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে এসে একদিন বঙ্গশ্রীর দপ্তরে উপস্থিত। বললাম : 'এতদূর কষ্ট ক'রে না এসে লেখা তো ডাকে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন দাদা!' জবাবে বিমুগ্ধ হাসি হেসে বিজয়লাল বললেন : তোমাকে এসে নিজের হাতে লেখা না দিতে পারলে আমি কি তৃপ্তি পেতাম!'—তারপর থেকে অবশ্য ডাকেই তিনি লেখা পাঠাতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন আচরণ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র ক'রে আমার সাহিত্যপরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ নিয়ে যখন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা গভীর হ'য়ে উঠছে, বিজয়লাল তখন দৈনিক 'লোকসেবক' পত্রিকার সম্পাদক। বললেন : 'বিষয়টা তুমি যত বড় ইচ্ছে লিখে আমাকে দাও, লোকসেবকে প্রকাশ করি, অন্যায়ের মুখোস খুলে যাক!'—এমনি দুর্দ্ধর্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে গান্ধীজী সম্পর্কে বাঙালী কবিদের কবিতা সম্বলিত একটি গ্রন্থ সম্পাদনার ভার প'ড়েছিল আমার উপর। প্রস্তাবক ছিলেন হুমায়ুন কবীর। বিজয়লালকে চিঠি লিখলাম তাঁর কবিতা চেয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ডাকে একটি সুললিত চিঠি সহ কবিতা পাঠিয়ে দিলেন 'গান্ধী মহারাজ'—যার প্রথম দু'টি চরণ হলো—

'পুঞ্জীভূত অন্ধকার। মেঘাচ্ছন্ন দিকচক্রবাল!

আলো নাই, আশা নাই! ওরা কারা চলন্ত কঙ্কাল?'...

দীর্ঘ পঞ্চাশ লাইনের কবিতা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে গ্রন্থটির প্রকাশে বাধা ঘটে। বেতার-জগৎ-সম্পাদকের আগ্রহে আমি তখন এই কবিতাটি সহ আমার সম্পূর্ণ সংগ্রহ গান্ধী-সংখ্যা বেতার জগতে প্রকাশের জন্য দিই। বেতার জগতের ব্যাপক প্রচারের ফলে আমার উদ্দেশ্য বরং সার্থক হলো।

পরে বিজয়লাল চোখে অস্ত্রোপচার করাতে বাধ্য হন। সেই থেকে তাঁর শরীর ক্রমে ভেঙে পড়ে। একদা দেহসৌষ্ঠবে তিনি ছিলেন দেবকান্তি পুরুষ। আর্য-সদৃশ সুঠাম দেহ, উন্নত নাসা, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল বর্ণ। বাংলা সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথের পর এরকম দেবকান্তি দেহ লক্ষ্য ক'রেছি প্রবোধ কুমার সান্যাল ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। স্বদেশ-কর্মের তীব্রতা ও পুলিশের অত্যাচারেও সেই দেহ অটুট ছিল। মাঝে মাঝে মুগ্ধতার সঙ্গে ঈর্ষা প্রকাশ ক'রে বলেছি: 'আপনি সাক্ষাৎ দেব-কুমার কার্তিকেয়।' জবাবে আমাদের মতো মুগ্ধতার হাসি হেসে স্বভাবগত বিনয়ে তিনি চোখ নামিয়ে নিয়েছেন।

সেই দেহ একদিন মৃত্যুর হিমস্পর্শে নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। সেদিন ১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪। তাঁর শেষকথা ছিল: 'বড় অন্ধকার, আমাকে রোদে নিয়ে চলো।'

আলোর সন্ধান, আলোকতীর্থে তিনি চ'লে গেলেন॥

সুতপা

উপন্যাস

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

'তোকে নাকি কে হাতে রেখেছিল শুনলুম, তাকেও নিয়ে এলি না কেন? এমন আনন্দের দিনে……বলতে বলতে উনি দানের বাসন যে ঘরে ছিল ঢুকলেন।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল।

'ভয়েতে ভয়েতে, ওর গলার পর্দা চড়ানই থাকে, আমাকে হাতে রেখেছিল বলে নিজেকে বাঁচিয়ে ত' আর তোমাকে তার হাতে রাখতে পারিনা, তাতে ত' আমাদেরই লোকসান। আমি বেহাৎ হলে তোমার ত' আর কিছু যায় আসে না, কিন্তু তুমি বেহাৎ হলে যে আমাদের বিপদ'—আরও কিছু বলত হয়ত' বিশেষ করে ও অনেকের সায়ও পেয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে পিসিমা ছুটে এসে ঝামেলা পাকাল—'ওরে সন্তু ছাদে একবার আয় বাবা বাচ্চাগুলো আমার কথা শুনছে না। ওদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতে চাইছি…।'

'তবেরে' সন্তুর কান ফাটান চিৎকার, 'চলত দেখি তোমার কথা কে না শোনে। তুমি হলে কিনা-গিয়ে ম্যা-ম্যা—ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে, যাকে কিনা যতসব চোর-জোচ্চোর পকেটমারেরা যমের মত ভয় করত আর……ওর গলা ক্রমশঃ ছাদের কলরোলের মধ্যে মিশে যায়।

দানের বাসনের স্তূপের মধ্যে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে ডুবে যায়। মেয়ের বিয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে আপনাপন মনোমত জিনিষ কিনেছে। এই ত প্রথম বড় কাজ। মেয়ের অন্ন-প্রাশনের সময় যা হয়েছিল সে আর এমন কি। তাই বোধহয় একটু বেশীই হচ্ছে। তা' হোক্ গে। মেয়ে সুখী হোক, শান্তির সংসার পাতুক, এ ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়। আর সারা-জীবন বলবে বাপ-মা নিজের সাধ্যমত আশ-মিটিয়েই দিয়েছিল।

বাসন মেলান হলে আবার জামা কাপড়ের ফর্দ মেলান। এবার স্তূপাকার হতে থাকে শাড়ি ব্লাউজ আর ধুতী। জামাই বাবাজির আবার টেরিলিন টেরিকটের বাতিক। শ্বশুর মশায়ের তাই প্রাণখুলে জামায়ের শখ মেটাবার চেষ্টা।

তারপর গহনার হিসেব। একটির পর একটি ভেল্-ভেটের শেটে ছোটতে বড়তে সারবন্দী হতে থাকে।

'সুতপা কোথায় মাসিমা?' সুতপার বান্ধবী অনিমা হঠাৎ ঘরে ঢোকে।

'বোধহয় পাশের ঘরে, দেখত' বলে সুনন্দা আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করে। অনিমা পাশের ঘরে গিয়ে দেখে সুতপাকে ঘিরে বান্ধবী আর সম-বয়সী আত্মীয়েরা কলধ্বনিতে ঘরখানা মুখর করে রেখেছে। অনিমাকে ঢুকতে দেখে অনেকে তাকে স্বাগত জানায়। সুতপা খুসী হয়ে ওঠে। অনিমা ঘরে ঢুকেই বলে—

'কিরে তুই যে আজই বৌভাতের ক'নে হয়ে উঠলি, সবাই তোকে ঘিরে বসেছে।

'কেনই বা হবেনা?' একজনের গলা শোনা যায়, 'ওর কনের ত' সুরু হয়েছে সেই আশীর্ব্বাদের দিন থেকেই।'

'.........আর সেটা চলবে সেই বৌভাতের রাত পর্য্যন্ত '

'না গো না, এবার এক বয়স্কার গলা শোনা যায়, কনের চলবে সেই মা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত।'

সবাই লজ্জা পেয়ে ক্ষণিকের জন্যে থম্‌কে যায়, কারোও মুখে আড়-চোখে হাসি খেলে যায়। আর সুতপার মুখ হয়ে যায় লাল। ওকে বাঁচাবার জন্যে অনিমা কথা ঘোরায়—

'যাই বলিস সুতপা তোর চেহারাটা বেশ কনে কনে হয়ে উঠেছে, এই শাড়িটায় তোকে বেশ মানিয়েছে, বলছিলি বটে পছন্দ নয়।'

কথার মোড় ফিরতে—সুতপা খুসী হয়, বলে ওঠে—'আরে আমি ত' এটার কথা বলিনি, আমি যেটা বল্‌ছিলুম সেটা ত' পরেনি, সেটা তুলে রেখেছি। ও আর বার করবনা, যতই বলিস।'

খাবার ডাক আসে পিসিমার: 'হ্যাঁরে তোরা কি সারারাত গল্প করবি? খাওয়া-দাওয়া করতে হবেনা? মেয়েটাকে অভিমন্যুর মত ঘিরে রেখেছিস্ ওকে একটু নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দে।'

শ্যামলী একটু ফাজিল গোছের, বলে বসে, 'ওকে ত' আর তিন দিন বাদে বধ করাই হবে, তাই একটু ঘিরে রাখা, এই আর কি।'

হাসির হুল্লোড়ের মাঝে পিসিমা বলেন, 'বধ নয়, বরং বল জীবন পাবে। তোরা এখন বধ হয়ে আছিস্ সময় মত জীবন পাবি।

'আমাদের কে বধ করলে পিসিমা?' ভিড়ের মধ্যে এক অবিবাহিতার প্রশ্ন। আর পিসিমাও এখন জেনারেল পিসিমা। তাঁর নাটকীয় ভঙ্গী 'মেয়ে হয়ে জন্মে যেই ডাগর হলি ওমনি বধ হলি, এখন জীবনদাতা না আসা পর্য্যন্ত ডাগর হয়ে বসে থাক।'

এবার হেড়েগলা এক বয়স্কার, তিনি পিসিমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করেন 'সেদিন গেছে গো সেদিন গেছে, তুমি আমি পাওনি। ভাবছ কি এরা, এনারা সব সেই আশায় বসে বসে দিন গুনছে? তবে শুনবে সব একে একে...।'

'ওরে বাবা শুনতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে'—তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

একে একে বান্ধবীরা বিদায় নেয়, আত্মীয়ারা পিসিমার পেছু নেয়, আর একথা সে কথা কইতে কইতে বাকি সকলে এঘরে ওঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমা আর সুতপা গুটি গুটি পড়ার ঘরে চলে যায়। সুতপার এখন তেমন খিদে হয়নি বলে পিসিমার অনুরোধ সহজেই কাটিয়ে নিয়েছে। কি জানি বাবা অখিদের ওপর খেলে মেয়ের যদি আবার কিছু হয়।

'হ্যাঁরে অনিতাকে বলেছিস্?'

অনিমার প্রশ্নের জবাব সুতপা চট্ করে দিয়ে উঠতে পারেনা। অনিতার বিয়ে হয়েছে এই কিছুদিন আগে। নিজেই বিয়ে করেছে বাড়ীর লোকের অমতে। ওদের বাড়ীতে সুতপার আদর ছিল; কিন্তু বিয়ের পর অনিতার ওপর ওর বাড়ীর লোকেরাই বিরূপ, তার ওপর সুতপার বাড়ীর লোকও খুব খুসী নয়। অথচ অনিতা সুতপার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অন্যতমা। এ অবস্থায় সুতপার কি করা উচিত সে পরামর্শ দেওয়ার...বা সে পরামর্শকে কাজে রূপান্তরিত করার মত কাউকেই সে কাছে পাচ্ছে না। অনিমার কথার জবাবে তাই সে চট্ করে কিছু বলতে পারলনা। অনিমাও আভাসে ব্যাপারটা অনুমান করে বলে—

'সত্যিই, কি করবি বলত?'

'কি করি বলত, অথচ দেখ এ সময়ে অনিতাকে না বললে বেচারী মনে ভীষণ কষ্ট পাবে, ভাববে বুঝি এইভাবে সবাই ওকে একে একে বাদ দিচ্ছে।'

'মাসিমাকে একবার জিজ্ঞেস করনা।' অনিমা পরামর্শ দেয়।

'সে'ত করেছি, মা কোন কথা বলেনি, বলেছিল বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। তা' বোধহয় কাজে-কর্মে ভুলে গেছে।'

'আবার করনা, দেখনা কি বলে।'

'কি জানি, বাবা শুনলে যদি রাগ করে ত' কি হবে?'

'কেন রাগ করবে কেন? হয় হ্যাঁ বলবেন নয়ত না বলবে, এই ত। আর যদি রাগ করে ত' মাসিমা বুঝবে, তুই ত' আর সামনে আসছিস না।'

ঘরের মধ্যে একরাশ রজনীগন্ধার গোছা একপাশে ছিল। কেউ এনেছে। তারই গন্ধে ঘরের ভেতরটা ভরে উঠেছে। দু'টি প্রথম যৌবনা নবীনা তরুণীর মুখে ফুটে উঠেছে মিলিত জীবনের স্বপ্ন-সুষমা। পরস্পরের মন জানাজানির মধ্যে জাগছে সলজ্জ লালিমা। এক-জনের প্রস্তুতির অন্যজনের আকাঙ্ক্ষার আনন্দ। যত সমস্যার জটিলতা ঐ ঘরে এসে স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চির-পুরাতন জীবন মঞ্জরীর সেই প্রথম স্ফুরণে। ওদের জন্য এখন হয়ে উঠেছে অফুরন্ত স্বপ্নের উৎসধারা, নবতর আশা-আকাঙ্ক্ষার অতলসমুদ্র।

'বলিস ত' আমিই গিয়ে বলি মাসিমাকে।' অনিমা ভরসা দেয় সুতপা মনস্থির করতে পারেনা। বাবা-মার মনে এমন একটা কিছু ও-দিতে চায়না যা তাদের পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। মা হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাকে জিজ্ঞেস করবে: আর বাবা যদি বিরক্ত হয়ে মা'কে দু'টো কড়া কথা বলে ত' মা দুঃখ পাবে আর তার প্রতিক্রিয়া আসবে সুতপার ওপর। আনন্দের মধ্যে এসব আনতে আর তার মন চাইছিল না। আবার অনিতার মুখখানা মনে পড়ে। ও আশা করে যে ও ওর স্বামীকে নিয়ে সুতপার বিয়েতে আসবে। কত মনের কথা বলবে ওরা দু'জনে, কত ভরসা দেবে। সেদিন অনিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন কাপড়ের দোকান থেকে ও ওর 'স্বামীর সঙ্গে' বেরোতেই সুতপার সঙ্গে দেখা, ও তখন স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেসের কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। সুতপাকে দেখে অনিতার সে কি আনন্দ। ওর স্বামীও বেশ চমৎকার ভদ্রলোক। কত কথা যেন বলতে চায় অনিতা। সুতপার বিয়ের খবর ও জানতে পেরেছিল, তাইতে যেন আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না। নিজেই নেমন্তন্ন নিয়ে ছিল—

'এখানে ত' কিছু বলা যাবেনা বিয়ের দিন আমরা গিয়ে তোকে সাহস দিয়ে আসব দেখিস।' ওর স্বামীও হেসে ওর কথায় সায় দিয়েছিল।

সেই অনিতাকে ও বলেনি। বেচারী মন-গুমরে হয়ত কত কি ভাবছে কে জানে। হয়ত তার সুতপার ওপরই একটু বিরূপ মনোভাব জেগে উঠছে। অনিতা জানেনা সে সত্যিই অনিতাকে আজকের দিনে কত কাছে চায়। তার মনের দরজায়ে ঘা দেওয়ার যোগ্য লোক অনিতা ছাড়া কেইবা আছে? কিন্তু কি সে করতে পারে। তার ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে অনিতা জড়িত, আর আজকের দিনে জীবনের এই মহা-মাহেন্দ্র-ক্ষণে তাকে কাছে পেতে কত সঙ্কোচ।

অনিমা নিজেই উঠে দাঁড়ায়—'দাঁড়া মাসীমাকে জিজ্ঞেস করে আসি, তুই বোস।'

'এই দাঁড়া দাঁড়া শোন' সুতপা উদ্বিগ্ন হয়।

'কেন কি হল?'

'একটু বাদে যাস, এখন মা-বাবা দু'জনেই ও ঘরে ব্যস্ত। একটু বাদেই বাবা চলে যাবে তখন যাস।'

অনিমা বসে পড়ল। একটু বাদেই বলে—

'দেখ ওদের যখন বিয়ে হয়েই গেল, তখন আর অযথা কোনঠাসা ক'রে রেখে লাভ কি বলত? নিজে-দের জীবনে সুখে ঘর-সংসার পাততে পারলে কার কি বলার আছে বল? আর সেটাই ত' সবায়ের কামনা।'

'একশো বার। ওর কি দোষ বলত? ওরা অত-গুলো বোন, আর দেখ ওদের বিয়ের চেষ্টাও ওদের বাড়ীতে কেউ কোনদিন করেনি, ওর মনের অবস্থাটা দেখ।'

'অবস্থা ত' ভাল নয়'—অনিমা অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়।

'আচ্ছা দেখ পয়সা না থাকলে কি বিয়েটা সত্যিই আটকে যায়? বল? এখন কি করে হল? ওরা

দেখতে এমন কিছু ভাল নয়, তবু পছন্দ করার কি লোকের অভাব হ'ল ?'

পয়সার অভাবে বিয়ে আটকায় রে, তুই বুঝবি না। তোদের বাড়ীতে খরচা করছে তুই তাই এ ব্যাপারের কিছু জানিস না। ছেলেপক্ষের এক এক জনের যা দাবী-দাওয়া তা' শুনলে আঁৎকে উঠবি।'

'তা'হলে দেখ ছেলে নিজে যখন দেখে বিয়ে করে তখন পয়সার কথা ভাবে না, পয়সা চায় তার বাড়ীর লোক। কি বল ঠিক না ?'

'ওরে বাবা এক একটি পাত্তর আছেন তারা বাড়ীর লোককে লেলিয়ে দেন, তবে নিজেরা ভালবেসে বিয়ে করলে আর পয়সার কথা আসবে কোত্থেকে ?'

'তুই কাউকে ?' সুতপা একটা যেন মিষ্টি খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করে।

'কেন ? আজ দেখ একবার' সুতপার দিকে চেয়েই অনিমা উত্তর দেয়, 'হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলি কেন ?'

'ভালবাসার কথা উঠল তাই হঠাৎ মনে স্ট্রাইক করল, তবে আপত্তি থাকলে চেপে যা'...

'এরকম ব্যাপার কিছু ঘটে থাকলে তোর কাছেও চেপে রাখলে মন যে হাঁপিয়ে উঠবে। তবে জেনে রাখ আমাদেরও যা অবস্থা আমার ওছাড়া গতি আছে বলে ত' মনে হয় না।'

'দু'জনেই বেশ মজা পেয়ে হাসতে থাকে।

'কি দেখে ভালবাসবি ?' জিজ্ঞেস করে সুতপা, 'রূপ না গুণ ? নাকি রূপে গুণে সমান হলে তবে ?'

'ওসব খাটিয়ে দেখতে গেলেই আর ভালবাসা হয়েছে। ভালবাসার লোক সব সময়েই সুন্দর আর সব গুণেই গুণী।'

'বাঃ কোন গুণ না থাকলেও ?'

'হ্যাঁ সে নিগুর্ণের গুণী।'

দু'জনের চাপা-হাসি সমস্ত ঘরটা ভরে স্তিমিত সবুজ আলোয় একটা মাধুর্য্যের গুঞ্জন তোলে।

'যাই বলিস বাপু ভালবাসার বিয়েতে অনেক ঝুঁকি, খোঁজ খবর আর কতটুকুই বা পাওয়া যায়, সব কিছুই ত' নিজেদের মধ্যে জানাজানি আর বোঝাপড়া। সুতপার মনের ধারণাটা ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

অনিমা হেসে উঠে বলে—'দেখ সুতপা তুই আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি। তোর ত' হয়েই যাচ্ছে, তার ওপর আবার তুই এসব ব্যাপারে ছেলেমানুষ......

'হোক তা' তুই আমায় বুঝিয়ে দে, আমি ঠিক বলিনি ?'

'পরে, দু'জনের মধ্যে আলাপ হলে তারা দু'জনের সম্বন্ধে জানতে পারবে না ? ভালবাসা যদি সত্যিই জন্মে যায় ত' কেউ কাউকে ঠকাবে না। আর নিছক যদি লোভে পড়ে বিয়ে করে ত' ঠকতে ও ঠকাতেও পারে।'

দু'জনেই যেন বেশ ভাবুক হয়ে ওঠে। অনিমা বিজ্ঞের মত বোঝায়, সুতপা জিজ্ঞাসুর মত তাকায়।

'দু'জনে দু'জনকে দেখে ভালবেসে ফেলে। তারপর আলাপ হয়, নাকি আলাপ হওয়ার পর ভালবাসে ?' হেসে জিজ্ঞেস করে সুতপা।

'কি জানি। ভালবাসা মানে তার রুচিকে তার প্রকৃতিকে, বা তার চেহারাকে ভাল লেগে যায়। আর এমন লোক হলে ত' কথাই নেই। এক এক জনের এক এক রকম রুচি। তবে দেখ মেয়েদের চাই ঘর। ঘর বাঁধার জন্যেই ত' বিয়ে বেশীর ভাগেরই।

'সবাই কি নির্ভর করার জন্যে বিয়ে করে ? অন্য কিছু নেই ?' সুতপা জিজ্ঞেস করে।

'তা' কেন ? যেখানে সংসার চালানর কথা থাকে সেখানে এই। নইলে যেখানে পয়সার অভাব নেই, সেখানে অন্য কিছু থাকতে পারে। তবে কি জানিস আমার মনে হয় দু'জনেই দু'জনের ওপর নির্ভর করে, আর মেয়েরা চায় আশ্রয়।'

'আর ছেলেরা ?' সুতপা কৌতূহলী হয়, 'ছেলেরা বুঝি কিছুই চায় না ?

'কি ?'

'তুই বুঝবি না, ভাববি আমি বড় বড় কথা বলছি।'

'না ভাবব না, তুই বল।'

'ছেলেরা চায় সান্ত্বনা, সেও একটা আশ্রয় বইকি।'

উঃ অনিমা, তুই কি জ্ঞানী, ওরে বাবা, কত জেনে গেছিস এখন থেকে।'

'এ সবাই জানে, তুই কেবল মায়ের আঁচল ধরা বলে জানিস না। কোনদিন ভাল করে এসব ভেবে দেখেছিস?'

'দরকার নেই বাবা আমার ওসব ভেবে, তাতে যে যা ভাবে ভাবুক।'

দু'জনেই হেসে ওঠে।

অনিমা উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়া একবার মাসীমার সঙ্গে কথা বলে আসি, অনিতার জন্যে, এ্যাঁ?'

'যা' তবে বেশী কিছু বলিস নি যেন, সাবধানে যা বলার বলবি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে ভাবতে হবেনা।' অনিমা বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যায়।

সুতপা খাটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে একটা বালিস টেনে নেয়। স্তিমিত আলোয় রজনীগন্ধার গন্ধটা যেন নতুন করে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গভীর আমেজ এনে দেয়। সারা ঘরটার চারপাশে যাজ্ঞর জিনিষ-পত্তর ছড়ান, ঘরের বাইরে হৈ-হল্লোড়, এসবের উপলব্ধি ওকে যেন এক নতুন কল্প-লোকের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ, অজানা অচেনা লোকের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ। গায়ে রোমাঞ্চ লাগে, চোখে ভেসে উঠে কল্পনার স্বর্ণ-মিনার।

অনিতার কথা ভাবতে গিয়ে ও যেন অনেক কিছু দেখতে পায়। অনিতার স্বামী প্রমথবাবু একজন বড় গাইয়ে আর অনিতাটাও গান-পাগলা যদিও নিজে এমন কিছু ভাল গায় না, কিন্তু গানের প্রতি আসক্তি ওর দারুণ। নানান্ গানের আসরে ও সুযোগ পেলেই যেত আর সেই সূত্রে গাইয়েদের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল প্রচুর। প্রমথবাবুর সঙ্গে সেই সূত্রেই আলাপ! উনি ওদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন, আর বাড়ীর লোকেরাও ওর গানে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বিয়েতে ওদের আপত্তি ছিল। এটা নাকি ওদের পারিবারিক নীতির বিরুদ্ধে ছিল। ঠিকুজি কুষ্টির বালাই ত' নেই'ই তার ওপর জাত-বর্ণেরও মিল নেই। কিন্তু অনিতা ভালবেসেছিল ওকে। ওকে না ওর গানকে কে জানে; হয়ত বা দু'টোকেই। কিন্তু সুতপা কাকে ভালবাসবে? মুখে ওর একটা লজ্জার রাঙামাটা ফুটে উঠে। তার কোন গুণের পরিচয় পাওয়া ত' দূরের কথা চোখের দেখাও দেখেনি। সামনে বসে মুখ নিচু করে ছিল। ঘরে ক'জন ছিল, তারা কেমন, ও ভাল করে মনে করতে পারেনা। একটা আড়ষ্টতা পেয়ে বসেছিল। শুনেছে সে নাকি ভাল। নিশ্চয়ই ভাল, নইলে তার বাকী জীবনটা তার বাবা-মা তার হাতে তুলে দিচ্ছে কি করে? সুতপাকে সে ভালবাসবে, নিশ্চয়ই বাসবে। কিন্তু কি দেখে বাসবে? সে ত' এমন কিছু অপরূপা নয়, মনে মনে হাসে ও, পছন্দ ত' করেছে তাকে। ভালবাসার খুধায় তাকে বাসতে হবে। গুণের পরিচয় সে ত' কিছুই পায়নি, তবু ও বিশ্বাস করে ভালবাসা আদায় করার মত গুণ তার আছে। বিয়ের মন্ত্রে নাকি যাদু আছে তাতেই দু'জনকে দু'জনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অপূর্ব সেই মন্ত্র। ও বিহ্বল হয়ে পড়ে।

ভাবতে চেষ্টা করে, ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে কি আশা করে, কি পেলে খুসী হয়? ও কখনই ছেলে-দের কাছে কখন ঘেঁসেছে, না এ নিয়ে কোনদিন কিছু ভেবেছে। অনিমাকে এসব জিজ্ঞেস করলে একটা আভাষ হয়ত দিতে পারে। ও এসব নিয়ে বেশ বলতে পারে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করতেও কেমন সংকোচ হয়, যা: কি ভেবে বসবে। হয়তো আড়ালে অন্য মেয়ে-দের কাছে বলে ফেলবে। ও নিজের থেকে যদি কিছু বলে ত বেশ শোনা যায়। তাছাড়া ওর সম্পর্কেয় বৌদিরাও সব বয়সে বড় বড়, সম্পর্কও এরকম নয় যে নিজেরা বসিয়ে বসিয়ে কিছু বলবে।

আচ্ছা অনিমাকে আভাসে একটু জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? যেমন, অনিতার কথা তুলে হাসতে হাসতে যদি জিজ্ঞেস করে আচ্ছা প্রমথবাবু অনিতাকে যে

ভাল বাসল সেকি তার গান শুনে? না কি অনিতা সত্যিই সুন্দরী বা এইরকম একটা কিছু—কিন্তু অনিমা এতক্ষণ কি করছে?

মাকে জিজ্ঞেস করায় কিছু হ'ল নাকি? এতক্ষণ লাগার ত' কথা নয়। মা ওকে রাগ করে কিছু বলেনি-ত? না ওকে না পাঠালেই হ'ত। যা তড়বড়ে মেয়ে নিজেই সব ঠিক করে চলে গেল। সুতপার যেন একটু বিরক্তি এল অনিমার ওপর। কি দরকার ছিল বাবা যাবার? ওর নিজের ওপর রাগ হতে লাগল ওকে যেতে দেওয়ার জন্য। ওরও মনে মনে ইচ্ছে ছিল বলেইত অনিমাকে বাধা দেয় নি। এখন শুধু শুধু এই নিয়ে কয়েকটা শক্ত কথা শুনতে ওর মন চাইছিল না। কিন্তু এখন ত আর উপায় নেই। অনিমা হয়ত সুতপার নাম নিয়েই জিজ্ঞেস করছে তাতে মার বিরক্তি হয়ত সুতপার ওপরই পড়েছে, ঘরে যদি আর কেউ থেকে থাকে সেও হয়ত মন্তব্য করেছে। ওর একটা অশান্তি এল মনে। এতক্ষণের বিহ্বল মদির ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গেছে কেমন একটা যেন আশঙ্কার ছায়া ওর মনের মধ্যে পড়তে লাগল।

এই আশঙ্কার ছায়াটা ওর মধ্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। সারা বাড়ীটা জুড়ে যে একটা হৈ হুল্লোড়ের আভাসে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আসছিল সেটাও থেমে গেছে, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে বাড়ী-টার ওপর। ও একটু অবাকও হল যখন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল কারা যেন ও ঘরের দরজা পেরিয়ে চলে গেল। বাড়ীরই লোক বেশ বোঝা যায় কিন্তু কেমন নিরবে, যেটা ওর কাছে বেশ অস্বাভাবিক ঠেকল।

ব্যাপার কি? ও শুয়েই রইল; কিন্তু কান পেতে রইল কিছু শোনা যায় কিনা। ঘর থেকে বেরোতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। বাড়ী ভর্ত্তি আত্মীয় কটুম্বদের ভীড়ের মাঝখানে কৌতূহলী হয়ে ব্যাপার জানতে গিয়ে যদি অপ্রস্তুত হতে হয়। অপেক্ষা করতে লাগল ঘরে কেউ ঢুকলে ব্যাপারটা জানতে পারবে।

কান পেতে বুঝল কথাবার্তা চলছে, কিন্তু সবই চাপা গলায়। একটা অবাঞ্ছিত যে কিছু ঘটেছে সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত হ'ল। কিন্তু কিছুতেই আন্দাজ করতে পারল না। অথচ ব্যাপারটা যে জটিল, তা' যে সমস্ত বাড়ী-, টার আনন্দকে যেন টুঁটি টিপে ধরেছে সেটা বেশ বোঝা যায়। কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ আসেনি ত? কিংবা কোন দুর্ঘটনার?

আস্তে আস্তে দরজার একটা পাল্লা খুলে, ও খাটের ওপর উঠে বসল উদ্বিগ্ন মন নিয়ে। ঘরে কে ঢুকল? আবছা আলোয় ও দেখল অনিমা। হ্যাঁ অনিমা ত'। কিন্তু ওরকম কেন? একটু আগে যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন ছিল আনন্দে ভরপুর আর এখন—মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখদুটো জলে ভরা, একটু বিষণ্ণ নৈরাশ্যের সুস্পষ্ট ছাপ, ওর দিকে যেন গভীর সান্ত্বনার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কোন কথা যেন বলার নেই।

ও ছুটে গেল অনিমার দিকে। কিছুই ও মনে আনতে পারল না। শুধু উদ্বেগ রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল—

কি হয়েছে রে? তুই এরকম কাঁদছিস কেন?

ওকে হাত ধরে খাটের কাছে টেনে আনতে আনতে খোলা দরজা দিয়ে দেখল বারান্দার ওপাশে অনে-কেই এঘর ওঘর করছে কিন্তু সবই যেন কেমন নিঃশব্দে।

অনিমা চোখ মুছল। সুতপা ওর দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অনিমা ভারি গলায় বললে—

'দেখ, বিয়ের, ব্যাপারেও কি নীচতা, এতে ওদের কি ভাল হবে?

সুতপার বুকটা ধড়াস করে উঠল, চোখ কেটে জল গড়িয়ে আসতে চাইল কিন্তু জোর করে তা সংযত করে জিজ্ঞেস করল—

'কেন? কেন? কি হয়েছে?'

'এ বিয়ে হবে না' বলতে বলতে ও কেঁদে ফেলল— একটু আগে ছেলের কাকা এসে বলে গেছে ছেলে এখন মনস্থির করতে পারেনি, আপনারা যা এখন পর্য্যন্ত খরচ করেছেন আমরা সব মিটিয়ে দেব, এ বিয়ে ভেঙ্গে গেল।

সুতপা কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত ঠেকল ওর কাছে যেন জিজ্ঞেস করে ফেলতে যাচ্ছিল—কোন বিয়ে? কার বিয়ে? কথাটা তার শুকনো গলা দিয়ে বেরোতে দেরী হওয়ার জন্যেই জিজ্ঞাসার আগে নিজের থেকেই তার জবাব পেয়ে গেল। একটু একটু করে বুঝল যে তার বিয়ের যে আয়োজন এখন পর্য্যন্ত হয়েছে তা, নিরর্থক। সুতপার বিয়ে ভেঙ্গে গেল। অর্থাৎ যে স্বপ্ন, যে প্রস্তুতি নিয়ে এতদিন সে প্রতীক্ষা করেছে তা মিথ্যে হয়ে গেল। অনিমা ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে খাটের ওপর বসে ছিল। সুতপা বুঝতে চেষ্টা করছিল যে এটা ভাল হল না মন্দ হল, তার আপন অনুভূতির রাজ্যে যেন এখনও ব্যাপারটা ঢুকতে পারেনি, এটা এখনও পর্য্যন্ত তার জানার মধ্যেই রয়েছে। ও যেন তলিয়ে বুঝতে চাইছে সত্যি ব্যাপার কি? এও হয় নাকি? কথাটা এত খাপছাড়া যে এক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে।

'তা ওরা কি বললে?' সুতপা কথার কথা হিসেবেই নিজের বাড়ীর লোকের মতামত জিজ্ঞেস করলে।

'তোর বাবার অপমানে মুখ লাল হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। কাকারা, মামারা সব ছেলের বাড়ীতে গেছে।'

সুতপার অনুভূতি এবার নাড়া পেল। বাবা যেমন অপরকে সম্মান দিতে জানে তেমনি নিজের সম্মান সম্বন্ধে খুব সচেতন। বাবা যদি অপমানিত হয়ে থাকেন ত' সুতপা জানে কতখানি আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে। এবার ওর বুকের ভেতরে—একটা ব্যথা যেন টনটনিয়ে উঠল, অনুভূতিতে ধরা দিল ব্যাপারটা। ওর নিরপরাধ, শান্তি-প্রিয় মানুষের ব্যথার কারণ আজ সে নিজে। কিন্তু কি ওর করার আছে।

'হ্যাঁ রে মা কোথায় রে?' জিজ্ঞেস করে অনিমাকে।

অনিমা ধরা গলায় বললে—'জানিস মাসীমা অজ্ঞান হয়ে গেছে সবাই তার······'

সুতপা চমকে উঠল—'এ্যাঁ?'

ও ছুটে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, অনিমা ওর হাত চেপে ধরল, "ওরা সবাই মিলে মুখে চোখে জল দিচ্ছে, বাতাস করছে, তুই গেলে ওরা আরও বিব্রত হবে, পরে যাস।'

সুতপা ওর হাত ছাড়াতে না পেরে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে মনটা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। কে যেন অলক্ষ্যে ওকে এক যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে ও দৃষ্টিকে, ওর চিরপরিচিত পরিবেশের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললে। ওর চোখের সামনে থেকে একটা বহুদিনের ছেঁড়া পুরোন পর্দা আস্তে আস্তে কে টেনে সরিয়ে দিলে। বিবাহেচ্ছু সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠে ওকে তাদের প্রতিবাদী করে তুলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ও যেন একটা গভীর মোহনিদ্রা ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে নিজের সম্বিৎ ফিরে পেতে লাগল। অনিমা অবাক্ হয়ে দেখল কিছুক্ষণ আগের সুতপা যেন ক্রমশঃ আর এক সুতপায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হাতে একটা আলতো ঝাঁকানি দিয়ে বললে—

'কিরে, মন খারাপ করিস নি যেন। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। জানিস······

'হুঁঃ।' একটা ব্যঙ্গ মেশান বিরক্তির আওয়াজ বেরোয় সুতপার মুখ থেকে। অনিমার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। এ সুতপা সে সুতপা নয়, এ আরেকজন। কি বলবে কিছুই ভেবে পেল না, স্পষ্ট বুঝতে পারল এ মানুষ সান্ত্বনার ভিখারী নয় এখন একেবারেই। ওর মুখ দেখে ভেবে পেল না কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন

'কিন্তু ওকে কিছুই বলতে হ'ল না। সুতপাই ওর ধরা হাতশুদ্ধ ওকে টেনে চললে 'আয়।'

এ ডাকের সঙ্গে, এমন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, এমন যাদু মেশান যে অনিমা বিহ্বল হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'কোথায়?'

অনিমার মনে হ'ল এ এক অমোঘ নির্দেশ। মন্ত্র-মুগ্ধের মত ওর পেছু পেছু চলতে লাগল

সুতপা ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়, সেখানে সেখানে ছোট কাকিমা আর রাঙ্গা পিসিমা চাপা-গলায় কি বলাবলি করছিলেন। সুতপার দিকে তাকিয়েই তাদের কথা যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। বারান্দা পেরিয়ে ওরা দু'জনে সিঁড়ির কাছে এল, সেখানে দিদিমা আর কালুদা কি বলাবলি করছিলেন, সুতপাকে দেখে যেন কেমন সম্ভ্রম ভরে পথ ছেড়ে দিয়েএকটু বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন। ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

বড় ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। অনিমার বুকটা ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল সুতপার হাবভাবে। ঘরের মধ্যে জ্যেঠাইমারা, কাকিমারা, রাঙ্গাদাদু, সেজ-দাদু, ছোটমামার মেয়েরা, রাঙ্গা দিদিমা, সেজঠাকুরমা, আর পাড়ার কয়েকজন মহিলায় ঘর প্রায় ভর্ত্তি। কয়েক জন সুনন্দাকে বাতাস করছে, মাঝে মাঝে মুখে চোখ কপালে জলহাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেউবা ডাক্তার আনার কথা বলছে, কেউবা তাতে বারণ করছে ও এমন কিছু নয় শুধু শুধু ডাক্তার এনে উদ্বেগ বাড়ান।

সুতপা সোজা ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। অনিমা ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়াল। সুতপা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললে—

'আচ্ছা তোমরা সবাই যাও, আমি বরঞ্চ মার কাছে একটু থাকি, এতে মনে হয় ভাল হবে......

ওর কণ্ঠস্বর যেন সবায়ের মর্ম্মভেদ করে তাদের বিস্মিত করে দিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। কেবল রাঙ্গাদাদু সবশেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে উন্মনা ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ এখন জ্ঞানত ফিরছে, ওকে কাছে দেখলে ওর মার পক্ষে ভালই হবে।

মার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুতপা দেখল ওর মা ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। মার বুকে হাত রেখে ও বললে—

'কি হয়েছে মা? যে তুমি অমন করছ। যা হচ্ছে' হোক গে।'

. সুনন্দা মুখে হাসি টেনে বললে—মেয়ের মা হলে বুঝতিস কেন এমন হ'ল আমার। কি পাপ করেছিলুম ঠাকুর...সুনন্দা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। সুতপা এখন অন্য মানুষ। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা যেন অনেক বেড়ে গেছে। বেশ বুঝল মাকে এইভাবে কিছুক্ষণ কাঁদতে না দিলে আঘাতটা হাল্কা হবেনা। তাই সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললে না, কিন্তু তার মা লক্ষ্য করতে পারল না যে তার মেয়ের চোখে জলের বদলে ফুটে উঠছে প্রবল আত্মবিশ্বাসের প্রখর দৃষ্টি যার ভাষা পড়তে পারে শুধু নিয়তি। সে শুধু সুনন্দার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর নিরবতার অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু বাদে সুনন্দা শান্ত হয়ে মেয়ের দিকে তাকা-তেই যেন দেখল নতুন সুতপাকে এতক্ষণ পরে। তার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়ে মনের নৈরাশ্যকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। শরীরটা সোজা হয়ে উঠল যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই; মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, তুই মন খারাপ করিস নিত?

সুতপা হাসল। শুকনো হাসি, কিন্তু তাতে যেন রসিকতা মেশান। 'তা' মন খারাপ হবে না? বললে ও 'এমন করে অপমানিত হলে কার না মন খারাপ হয়?' আবার হাসল এবারেয় হাসি স্বাভাবিক। সুনন্দা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মনের সমস্ত বেদনা যেন কোথায় ভেসে চলে যেতে চায়। আবেগ-বিধুর কণ্ঠে শুধু বেরোয়—

'দেখ না তোর আবার ভাল সম্বন্ধ আসবে...

এমন সময় নিচে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল বেশ আনন্দ উচ্ছ্বাসের। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। ওরা মা মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারলে না, তবে মনে হল পাত্রপক্ষের মত বোধ হয় ফেরান গেছে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে সাহস করে কেউই কিছু প্রকাশ করতে পারল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু অপেক্ষা করতে লাগল শেষ পরিণতির আশায়।

এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সুতপার ছোট মামার বড় মেয়ে রীনা। বয়স বছর ষোল সতের হবে। একেবারে আনন্দে ভরপুর। এক নিঃশ্বাসে বললে—

পিসিমা, পিসিমা, বাবা ফিরেছে, ওরা রাজী হয়েছে। ওঃ বাবা নিচে সব বলছে, কত করে ছেলেকে ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে তবে মত করেছে। তুমি শিগগির এস তোমায় পিসেমশাই ডাকছেন।

গম্ভীর মুখে রিনার কাছে এগিয়ে এল সুতপা। বললে—আচ্ছা তুই যা, মা এক্ষুণি যাচ্ছে। বলতে বলতে রিনাকে দরজা পার করে দিয়ে ও দরজায় খিল এঁটে দিল। তার পর মায়ের খুশিভরা মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওর দৃষ্টিতে যেন ঝরছিল আগুন, তাই মায়ের মুখের খুশি ভাব পালটে গেল কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না সুনন্দা।

'তুমি গিয়ে বল মা আমি বিয়ে করব না।' সুনন্দা চমকে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে—সেকি? সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবি?

'সে পরে দেখা যাবে, এখন ত নয় তুমি গিয়ে বল।' আমাকে যদি জোর কর আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। ভয়ানক কেলেঙ্কারীতে পড়ে যাবে। ধরে বেঁধে রাখতে চাও চেষ্টা করতে পার কিন্তু বলছি তাতে কোন সুখ পাবে না।'

মা নির্বাক। মেয়েকে কি বোঝাবে; নিচে গিয়েই বা কি বলবে? আর বললে বাড়ীশুদ্ধ লোকই বা কি ভাববে? মেয়ের বাবা কি করবে? কিছুই ঠিক করতে না পেরে নিরব হয়ে বসে রইল। অথচ মেয়ের এ ধরনের অভিমান অন্ততঃ বিয়ের ব্যাপারে চলে কিনা তাও ভাববার কথা। আবার কোথায় সম্বন্ধ দেখে বেড়ান, এত আয়োজনের পর ভেস্তে গেলে পরের সম্বন্ধগুলোও খুব সুবিধের হবে না। কারণ এটাকে একটা খুঁৎ বলে সবাই ধরে নেবে। নিয়ে হয়ত নানা কথা ভেবে বসবে। কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সুনন্দার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শুধু মুখ নিচু করে অস্পষ্ট স্বরে বললে—'অমন করিস নি।'

সুতপার চোখের জল আর বাধা মানলনা। সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। বললে কি বলছ মা আমরা কি মানুষ নই? এত আয়োজনের পর বলে কি না বিয়ে ভেঙ্গে গেল। তারপর আবার গিয়ে হাতে পায়ে ধরা ধরি করে মত করান। ও ঘরে গেলে আমার কি হবে বুঝতে পারছ না। আমি ত' দয়ার পাত্র হয়ে কোথাও যেতে চাইনি। কেন আমায় তোমরা তাড়াতে চাইছ? আমি মাষ্টারী করব, চাকরি করব, কোন দিন তোমাদের গলগ্রহ হব না এই আমি কথা দিচ্ছি। আমার বিয়ে যদি কোন দিন না হয়ত তোমাদের দোষী করব না। তোমাদের উপর এই অপমান সয়ে আমাকে সেখানে পাঠিও না। আমার দায়িত্ব আমিই নোব। তুমি বাবাকে গিয়ে বল।'

সুতপা খাটের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। সুনন্দা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মূর্চ্ছাজনিত দুর্বলতাটা কেটে গেছে বটে কিন্তু, কেমন যেন একটা জড়তা পেয়ে বসেছে। ওদের গিয়ে কিই বা বলবে, কিই বা বোঝাবে, কোন পক্ষের হয়ে কথা বলবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। ওদিকে দরজায় একজনের পর একজনের টোকা পড়ছে, এক এক জন একবার ডেকে যাচ্ছে, কোন রকমে এতক্ষণ যাচ্ছে যাচ্ছি করে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, কিন্তু শেষে সবার চিৎকার আর দরজায় ধাক্কা ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে সুনন্দা সাড়া দিয়ে দরজাটা আস্তে খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

'কি এখন শরীর কেমন ? সব ঠিক্ হয়ে গেছে ত ? এ্যাঁ কি বলিস্ বিয়ে হচ্ছে বটে একখানা।' ওর হাসির চোটে তিনতলা শুদ্ধ কেঁপে উঠল।

'ওদিকে চল চল, শুনছি সব তোর'—কথা ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাইকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় সুনন্দা, যাবার সময় ঘরের দরজাটি টেনে ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

তারপর অনিমা বাড়ী ফেরার আগে একবার দেখা করতে এসেছিল কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নি, ওর মেঘ-গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল শুধু।

... ...

জীবনে এমন এক একটা সময়, বা ক্ষণ বললেই ভাল হয় আসে যা অল্প সময়ের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের কৃত্রি-মতার মুখোশটা একটানে সরিয়ে দিতে চায়। আর সেই ফাঁকে চকিতের জন্যও কেউ কেউ আপন সত্তার চিরাচরিত আবরণের অন্তরালে নিয়তির এক অমোঘ নির্দেশ দেখতে পায়। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ মেশানো স্বাভাবিক জীবনটা তখন নিজের দৈন্য নিয়ে এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বসে যে তার অনিবার্য্য পরিণতিকে উন্নত রূপ দেওয়ার তাগিদ প্রচণ্ড ভাবে অনুভূত হয়। এই অবস্থা যার জীবনে যত আগে আসে সে তত ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলা এই জন্যে যে এই তাগিদটাই তার পরবর্ত্তী জীবনের প্রধান সহায় বলে পরবর্ত্তী জীবনটাকে মনের মত করে গড়ে তোলার অবসর পায়। নিজের মনের মত করে নিজের জীবন-গঠন কথাটা হাস্যকর শোনালেও প্রচ্ছন্নভাবে একটা সত্য বোধহয় এর মধ্যে নিহিত হয়েই রয়েছে। একভাবে দেখতে গেলে প্রতিটি জীবনেই মানুষের অপনাপন ইচ্ছায় তৈরী আর তা' চলেছে নিজের নিজের প্রকৃতিগত ইচ্ছাতেই। যে পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে আসে তা যদি প্রাক্তন জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারাতেও বইতে থাকে, তবুও তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করে নিশ্চিন্তে মানুষ জীবন যাপন করে কি করে ? হয়ত বা তার প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে নিজেই নিজের অজ্ঞাতসারে আপন জীবনের সমূল পরিবর্ত্তনকে আহ্বান করে আনে।

ব্যাপারগুলো ভাবিয়ে তাবতে গিয়ে কেমন ধুয়ে যায় সুতপা। কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে এক এক সময় মনটা ভাসতে ভাসতে চলে যায় দূরে বহুদূরে সহরে গ্রাম মাঠ জঙ্গল নদী নালা পার হয়ে নীল আকাশের নিচে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে।

ওর ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। অফিস ঘরে এসে নিজের দু'একটা টুকিটাকি কাজ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

'কি চললেন ?'

পেছন ফিরে দেখে আনন্দ বাবুও নামছেন। ওঁরও ডিউটি শেষ।

'হ্যাঁ আর কি ?' বলে সুতপা।

'ওঃ আজ যা গেছে,' আনন্দ বাবু বললেন 'একবারে যমে মানুষে টানাটানি যাকে বলে।'

'ও আপনার সেই দু'শ চোদ্দ নম্বরের বেড ?'

'হ্যাঁ আর বলবেন না।'

'এখন কেমন আছে ?'

'অনেকটা ভাল, মানে আউট্ অফ্ ডেঞ্জার ভয়ের আর কিছু নেই।'

'খুব রেয়ার কেস কিন্তু, আমি ত' আজ পর্য্যন্ত একটাও পাইনি' বলে সুতপা।

'কোত্থেকে পাবেন ? আমারও ত' এই হাতে খড়ি। হঠাৎ এভাবে বেয়াড়া রকমের টান নেওয়া কি বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন ত ? তিন দিন স্রেফ্ অক্সিজেনের ওপর নির্ভর, মাথা আমার একেবারে গুলিয়ে দিয়েছিল। মাঝে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। শুধু আমি কেন ? স্যারেরও সেই অবস্থা। দেখেন নি ?'

'খুব দেখেছি। আজ দু'তিন দিন ধরে যে ভাবে চললেন তাতেই আঁচ পেয়েছি, তবে আপনার কন্ফিডে-ন্সটা খুব দেখেছি। বলছেন বটে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু আপনার মুখ দেখে তা' বোঝা যায় নি।'

হেসে ফেলেন আনন্দ বাবু।

'মানে মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ পায়নি, এই বলতে চান।'

'ঠিক তাই।'

'কথা বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি পেরিয়ে কম্পাউণ্ডে এসে গেল।

'কোনদিকে যাবেন?' জিজ্ঞেস করেন আনন্দ বাবু।

'একবার একটু বাজারের দিকে যাব, কয়েকটা জিনিষ কেনার আছে। আপনি?'

'চলুন আমিও তাই। একটু রিল্যাক্সেসন চাই, হোটেলে যেতে ভাল লাগছে না। ভেবে ছিলাম ইভনিং শোতে সিনেমায় যাব, তা' আর হয়ে উঠল না। বরং চলুন আপনার সঙ্গে দোকানেই যাই।'

ওরা বড় রাস্তা ধরে চলতে লাগল।

'আপনার সেই আত্মীয়াটি কেমন আছেন? আপনার বৌদি না কি যেন, হ'ল?'

'হ্যাঁ ভালই আছে এখন' বলে সুতপা, 'কোয়াইট্ নরম্যাল ডেলিভারি, কেবল ষ্টিচ্‌গুলোর জন্যেই আটকে রাখা আর ত' ক'টা দিন বাদেই রিলিজড হয়ে যাবে।

'যাক্ আপনার মুখ রক্ষে হ'ল।'

'সাধারণ ব্যাপার, ওতে আর মুখরক্ষার প্রশ্ন কিংবা আছে। এ্যাবনরম্যাল কিছু থাকলে বলতে পারতেন।'

'আপনার কি সম্পর্কের বৌদি? খুব কাছের বলে ত মনে হয় না'

'সে রকম কাছের কিছু নয় তবে পরিচয়টা অনেক দিনের।'

'তবু ত' দেখছি আপনাদের সম্পর্কটা বেশ ভালই।

হাসে সুতপা 'উনিত আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন, প্রায়ই খবরাখবর নিতেন বলে।'

'আমার প্রশংসা' খবরাখবর নিলে আর প্রসংসার কি থাকতে পারে বলুন।'

'তাছাড়া আমাদের মধ্যের জানাশোনা কেউ এলে ভদ্রতার খাতিরে একটু একটু নজর না রেখে পারি না।'

'ওইখানেই ত' জিৎ আপনার। যাই হোক সুনাম পাওয়া ত' ভালই, এতে আপনার বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।'

'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু যদি মনে না করেন, মানে যদি অভয় দেন।' জোরে হেসে ওঠেন আনন্দবাবু। সন্দেহ জাগে সুতপার; একটু যেন থাবড়ে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়, প্রশ্নটা কোন দিক থেকে আসবে সাবধান হয়ে যায়। বলে, 'বলুন না কি জিজ্ঞেস করতে চান।'

'মানে একটা কথা এক জনের কাছ থেকে শুনলাম মানে আমার শোনা কথা অবিশ্যি, আচ্ছা আপনি নাকি বিয়ের রাত্রে হঠাৎ বিয়ে করব না বলে এমন বেঁকে বসেছিলেন যে সব পণ্ড হয়ে যায়। শেষে পাত্র পক্ষ অনেক অনুনয় করেও আপনার মত করাতে পারেনি।'

সুতপা নিরবে শোনে। বোঝে কাসিই বোধহয় কথায় কথায় সব বলে ফেলেছে। সুতপার মজা পায়। হাসি মেয়েটা বেজায় ঠোঁট আলগা, কথা বলতে পারে না। যাই হোক বলেছে তাতে কি আসে যায়, এত চাপা ঢাকা কিছু নয়। সুতপাকে নিরব দেখে আনন্দবাবু নিজের খেয়ালেই বলে চলেন—

'ও: তা' যদি হয় ত আপনার মনের জোরের প্রশংসা না করে পারা যায় না, মানে আপনি ভয়ঙ্কর মহিলা' হো হো করে হাসতে থাকেন উনি।

এই সহজ সরল উচ্চহাসিটি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হোটেলে তিনি এখন আছেন কিনা চাকরেরা হোটেলের দরজা থেকেই তা' বলে দিতে পারে। তিনি এখন তাঁর ওয়ার্ডে আছেন কিনা ওয়ার্ডে ঢোকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা' বোঝা যায় কাউকে জিজ্ঞেস না করেও।

'যা শুনেছেন তা পুরোপুরি সত্যি না হলেও কিছুটা সত্যি বলে সুতপা, বিয়ে আমার ভেঙ্গে গিয়েছিল তবে বিয়ের রাত্তিরে নয় তার তিনদিন আগে।'

'কেন আপনার কি পাত্তর পছন্দ হয় নি?' কৌতুক করেন আনন্দবাবু।

'আমার পছন্দের কথা ত' আসেই না। আসলে

দু'পক্ষের মতান্তর হওয়ায় আমি মাঝখান থেকে বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাতেই আর এগোয়নি।'

'আপনার বেঁকে দাঁড়ানোর কারণটা কি? একটু জিজ্ঞাসু হন আনন্দবাবু। সুতপা ভাবে কি বললে ঠিক হবে। তারপর বললে—

'দেখুন যে কারণটা একটা মানুষের মনের বাঁধন গুলোকে ভেঙে দিয়ে মনের আত্মাভিমানটাকে জাগ করে জাগিয়ে তোলে, সেই কারণটাই ছিল আসল কারণ, সেটা অবশ্য আপনার কাছে দুর্বোধ্য লাগবে কিন্তু এর বেশী আর কিই বা বলতে পারি।'

একটা মনোহারী দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুতপা। আনন্দবাবু বললেন—

'কি এখানেই কিনবেন?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন।'

ক্রমশঃ

বিশ্বজয়ী বীরবাহু হেনরী আর্মষ্ট্রং

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী কোনও এক কর্মমুখর সহরের একটি অলস দিনের অপরাহ্ন। দিবাশেষে কর্ম-চঞ্চল সহরের ক্লান্ত অধিবাসীরা শ্রান্ত পদক্ষেপে আপন আপন আলয় অভিমুখে গমনে উদ্যত হয়েছেন। পড়ন্ত বেলার এই সময়টিতে ফেরিওয়ালারা পসরা-পসরা সাজিয়ে খরিদ্দার আবাহনে নিমগ্ন রয়েছে। এদের মধ্যেই কিছু কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর জুতো পালিশের সরঞ্জাম সহ পথিকগণের জুতো পালিশে মনোযোগ প্রদান করেছে। কেউ বা আবার উদ্‌গ্রীবচিত্তে সন্ধানী দৃষ্টিতে ধূলিমাখা পাদুকার সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি হেনে চলেছে। প্রতিদিনই এই সময় পথপার্শ্বে একজন সুগঠিত বলশালী কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে ছন্দোময় মধুর কণ্ঠে, একটি গান গেয়ে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়—

"একটি পয়সা দাও গো বাবু
একটি পয়সা দাও।
ময়লা জুতো ময়লা পায়,
একটু থেমে যাও॥
একটি পয়সা তোমার কাছে,
সে কিছু নয়, কি দাম আছে?
আমার সে তো রাজার মাণিক,
পালিশ করে নাও"॥
কাল কালি বুরুশ ভাল,—
ঠিকরে যাবে জুতোর আলো।
এক কালিতে যায় বারো মাস,
(বাবু) পালিশ করে নাও॥
একটি পয়সা দাও গো বাবু,
একটি পয়সা দাও।"

এমনি করেই দারিদ্র্য-নিপীড়িত ছেলেটি জুতো পালিশ করে আপন দুঃখের অন্নসংস্থান করে। এই রকম করেই স্বীয় নিরন্ন পরিবারের দুঃখ মোচন করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু এর মধ্যেও বাধা অনেক। মাঝে মাঝে পুলিশের তাড়া খেয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। সময় সময় অন্য জুতো পালিশ করা সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খরিদ্দারের দখল নিয়ে কর্মসূত্রেই হয়ত মারামারি

বেঁধে যায়। এই অবস্থায় অনেক সময় একাই তাকে কয়েক জনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়। কখনও কখনও হয়ত চার পাঁচটি ছেলেকে মুষ্ঠাঘাতে ধরাশায়ী করে আপনাকে রক্ষা করতে হয় তাকে। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ছেলেটি কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নিজস্ব আত্ম-বিশ্বাস অথবা ঈশ্বর-বিশ্বাস হারায় নি কোনদিন। এই রকম করেই জীবনযুদ্ধের নিদারুণ জটিলতার মধ্যে প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার স্ফুরণ হয় তৎ-কালীন কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর হেনরী আর্মষ্ট্রংএর মধ্যে। এই রকম গৃহহীন, নিরন্ন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মধ্যেই হেনরীর মুষ্টিযুদ্ধ জীবনের শুরু হয়।

১৯১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর আমেরিকার মিসৌরী রাজ্যের সেন্টলুই সহরের কোন এক অখ্যাত নিগ্রো পল্লীতে অতি দারিদ্র পরিবেশের মধ্যে হেনরী আর্মষ্ট্রং-এর জন্ম হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সেই অর্থের সন্ধানে হেনরীকে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। দারিদ্র্য-জর্জরিত হতভাগ্য এই কৃষ্ণাঙ্গ বালককে জীবিকার সন্ধানে বহুপ্রকার উপজীবিকার মধ্যে স্বীয় ভাগ্যানু-সন্ধানে নিবিষ্ট থাকতে হয়। জুতো পালিশ ব্যবসায়ে শারীরিক, মানসিক এবং অর্থ-নৈতিক প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতার জন্যই হেনরি এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করে ভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জনের জন্য লস্ এঞ্জেলিস সহরে আগমন করেন।

লস্ এঞ্জেলিস সহরেই হেনরী অকস্মাৎ তার ভবিষ্যত জীবনের সন্ধান পান। এই সময়েই হেনরীর ভবিষ্যত উন্নতির সূত্রপাত হয়।

লস্ এঞ্জেলিসে এসে ভবঘুরের জীবন যাপন করতে থাকেন হেনরী আর্মষ্ট্রং। এই সময় একদিন রাস্তায় আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে একটি মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হতে দেখে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে দেখতে প্রবল উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পরেন আর্মষ্ট্রং। দর্শকদের প্রবল চীৎ-কার ধ্বনি তখন তার প্রাণে এনে দেয় রোমাঞ্চকর এক আনন্দের শিহরণ। হৃদয়ে অনুভব করতে থাকেন তিনি চিরন্তন মানব প্রকৃতির সেই আদিম রণোন্মাদনা "আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ।" এই ক্ষণটিতে আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় অতীত জীবনের মুষ্টিযুদ্ধের স্মৃতিগুলিও একে একে তার মানসপটে উদিত হতে থাকে। অতঃপর মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থার নির্দেশ পান। তিনি স্থির করেন মুষ্টিযুদ্ধের দ্বারাই তিনি তাঁর জীবিকা অর্জন করবেন।

এরপর উনিশ বছর বয়সে হেনরী জীবনের প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে মোট ১৪টি পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যে ১১টিতে জয়লাভ ও মাত্র তিনটিতে তিনি পরাজয় বরণ করেন। এরপর থেকেই হেনরী জীবনের জয়যাত্রা পথে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালে সবসমেত ২৬টি প্রতিযোগিতার সকল-গুলিতেই প্রতিপক্ষদের নক আউটে পরাজিত করতে সক্ষম হন। সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ দর্শকগণ এই সময় তাকে "হামারিং হাক" আখ্যায় ভূষিত করেন।

ফেদার ওয়েট বিভাগের বিশ্ব-বিজয়ী খেতাবের জন্য হেনরী অতঃপর পিটার স্যারণের বিরুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করেন। ১৯৩৭ সালের ২৯শে অক্টোবর তিনি স্যারণের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে প্রহারে জর্জরিত করে দেন। এই প্রতিযোগিতায় স্যারণ মাত্র ছয় রাউণ্ড পর্যন্ত হেনরীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর তিনি অচৈতন্য হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণে বাধ্য হলে, হেনরীকে ফেদার ওয়েট বিভাগের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

এই বিজয়ের পর মাত্র কয়েক মাস সন্থই থেকে অজিত পরাক্রমশালী বীরবাহু দুরন্ত আর্মষ্ট্রং ১৯৩৮ সালের ২১শে মে ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাবের জন্য বার্নিরসের বিরুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। এই প্রতিযোগিতায় সুদীর্ঘ ১৫ রাউণ্ড ব্যাপী লড়াই করে তিনি বার্নি-রসের থেকে "বিশ্ব ওয়েল্টার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন" খেতাবটিও ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হন।

বিশ্ব রণাঙ্গনের ত্রি-মুকুট-জয়ী হেনরী আর্মষ্ট্রং অতঃপর ১৯০৮ সালের ১৭ই আগষ্ট লো এ্যাম্বাসে'র বিরুদ্ধে লড়াই করে "বিশ্ব লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন" খেতাবটিও অর্জন করতে সমর্থ হন। এই প্রতিযোগিতাতেও ১৫ রাউণ্ড ব্যাপী তীব্র লড়াইয়ের পর হেনরী এ্যাম্বারসকে পরাজিত করে সব প্রথম বিশ্বের "ত্রি-মুকুট-জয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা" নামে ভূষিত হন।

এর কিছুদিন পরেই হেনরীর পূর্বের সেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আরও ঘনীভূত হতে থাকে। অতঃপর করুণাময়ের প্রতি হেনরীর কৈশোরের সেই আত্ম-নির্ভরতা আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠে। এই সময় মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক হেনরী ক্রমাগতই চিন্তা করে চলেন খৃষ্টের সেই অমর বাণী—"I am the resurrection and the Life and he who believeth in me yet shall he live and shall never die."

অতঃপর জাগতিক সকল মান সম্মান ও ধন সম্পদ পরিহার করে অপরিমেয় ধন সম্পদ ও অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী জগদ্বিখ্যাত হেনরী আর্মষ্ট্রং ধর্ম-যাজকের বৃত্তিকেই জীবনের শেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই পরম নির্ভরতা ও চিরশান্তির সন্ধান পান অতীতের সেই দীন দরিদ্র কঙ্কাল কিশোর হেনরী আর্মষ্ট্রং।

৬০০ পাতার পর

দুর্নীতির অন্ধকার অনেকটা অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল নির্বাচনে ভোট সংগ্রহের খাতিরে বহু অন্যায় দেখিয়াও না দেখা, চোর ছেঁচড় ঘুষখোর পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি সমাজ বিরুদ্ধতা দোষ দুষ্ট দুরাত্মা প্রভৃতির নিকট রাষ্ট্রক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত দুগ্ধে জল মিশান, খাদ্যে ভেজাল, সুদখুরী, গরীব ও অজ্ঞ লোকেদের ওজনে, মূল্যে ও হিসাবে ঠকান, অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় প্রভৃতি কেহ থামাইবার চেষ্টাও করে নাই। ইহার উপরে আসিয়াছে পার্টিবাজী সংক্রান্ত দুস্কর্মের নিত্য নূতন খুন খারাপি দাঙ্গাহাঙ্গামা, মিথ্যাপ্রচার ও অন্যায়ের প্রশ্রয়ের বন্যা। মোটের উপর খাদ্যায় ও দুর্নীতি সম্ভবতঃ লোকচক্ষে অধিক প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্নীতি সম্বন্ধে অপপ্রচারের মূলে আছে রাষ্ট্রীয় দলগুলির পারস্পরিক বিরুদ্ধতা। সত্য হউক, মিথ্যা হউক অথবা সত্যমিথ্যা মিশ্রিত সাজান অপবাদ কার্য্য হউক, এই রাষ্ট্রীয় দলের দ্বন্দ্বে কথায় ও কার্য্যে যাহা করা হয় তাহার ভিতর সুনীতির সারবস্তুর একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। কথাবার্ত্তা যেভাবে চালিত হয় তাহাতে মনে হয় যেন দুর্নীতি শুধু কোনও একটা বিশেষ রাষ্ট্রীয় দলগত উৎস হইতেই উত্থিত হইতেছে। অপর সকল কেহই যেন নির্দ্দোষ নিষ্পাপ ও নিরপরাধ। বস্তুত যদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সকল রাষ্ট্রীয় দলে অথবা অপরাপর গণ্ডি ও গোষ্ঠীতেই দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ আছে এবং কিছু কিছু সাধুব্যক্তিও আছে। দক্ষিণপন্থীরাই বর্ত্তমানে শাসন ক্ষেত্রে শক্তিশালী। সুতরাং তাহারাই শাসনক্ষেত্রের কার্য্যসূত্রে নানাপ্রকার দেওয়ানেয়ার ভারপ্রাপ্তব্যক্তি। দুর্নীতির কার্য্য হইলে তাহার সহিত শাসক গোষ্ঠীর সংযোগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে প্রমান হয় না যে দক্ষিণপন্থী না হইয়া রাজকর্মচারী বামপন্থী হইলে দুর্নীতি থাকিত না। কন্ট্রোল, পারমিট, লাইসেন্স, কালোবাজার, অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা ও আয়োজন লইয়া বিলিব্যবস্থা সকল মতাবলম্বি মানুষই করিয়া থাকে এবং পার্টি বদল হইলে মানুষের স্বভাব বদল হয় না। চুরি-ডাকাতি ওয়াগন ভাঙা অন্যায়ভাবে বিদেশীমাল আমদানী, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা ইত্যাদি যাহারা করিয়া থাকে তাহাদের মতবাদ কি তাহার আলোচনায় কোন অর্থ থাকেনা। চোর হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান বা নাস্তিক যাহাই হউক, তাহার চুরীর সহিত তাহার ধর্মের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে একথা কেহ মনে করিতে পারেনা। দুধে যে জল মিশায় কিম্বা তেলে ভেজাল দিয়া থাকে তাহার অহিংসাতে বিশ্বাস আছে কিনা অথবা সে কার্লমার্ক্সকে মহামানব মনে করে কিনা তাহা বিচার করিয়া কি লাভ হইতে পারে?

মোট কথা হইল যে, দুর্নীতির সহিত আদর্শবাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারেনা ও থাকেনা। সকল দলের, গোষ্ঠীর, গণ্ডির বা মতবাদ অনুসরণকারীর মধ্যেই দুর্নীতি প্রবল ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে এবং উঠিয়া থাকে। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই বঙ্গক্ষেত্রে দুর্নীতি জীবন্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং জনসমাজে তাহার দমন চেষ্টা সবল ও দুর্দ্দম আগ্রহে কেহ করিবার ব্যবস্থা করে নাই। দেশ ব্যাপী একটা নৈতিক সংস্কারের আবশ্যতা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু পরস্পরকে নিন্দাবাদ করিয়া আক্রমণ ব্যতীত কোনও কার্য্যকর প্রচেষ্টা হইতেছে না। এখন দুর্নীতি সমাজের উচ্চতম স্তরে পৌছিয়াছে এবং যদি তাহা মূল হইতে উৎপাটন করা না হয়; তাহা কদাপি দূর হইবে না।

হায় পৃথ্বীশ, কি হন্তারক প্রেমিক

তারক পাল

হায় পৃথ্বীশ!
ভাবছ এমন করেই কি সাজবে
পৃথিবীর রাজা?
চাট্টিখানি মাথা আর হাত,
আর চাট্টিখানি হিংসা!
আর কিছু নয়?
হয়ত পণ্যেরও পসার?
আগাছার কথা ত' নয়;
তার কোনও বদখৎ প্রশাখা।
তোমার ঐ পথ-চলতির
মুহুর্মুহু করতালে
তোমার ঐ মহাপথের
অধর-তলে।
থাকবে রাবণের মত
হা-হুতাশন
আর শবরীর মত
মর্মান্তিক প্রতীক্ষা।
অথবা দেখ'ব
কোনো শাক-চুন্নির সুগ্রীব-বধ।
—অকারণেই।
হায় পৃথ্বীশ!
তোমার কশ্চিৎ পথিকের
আকিঞ্চন বাচ্ঞা
হয়ত বয়েই যেত।
কি জানি।

(২)

হায় পৃথ্বীশ!
তুমি কি দূরের পথিক?
কোনও দিন কি নও?
শুধুমাত্র পথের বিচ্ছেদে
মাঙ্গলীয় উচাটন
আজ হিমাদ্রির পাড়ে প্রক্ষিপ্ত
পথ আর পাথেয়
ত' এক নয়।
যেমন নাকি রূপ-রস-গন্ধ?
কিছু নয়?
কেন না—
উধাও আকাশে
একফালি চাঁদ
আর বন-জুমায় কাক-জ্যোৎস্না
বুঝি এক!
কেন না—
সার্থক মুখ
কি ভুলায়
স্বর্গীয় ঈর্ষাকে
তার মানায়।
হায় পৃথ্বীশ!
তখন ঐ একফালি বাঁকা চাঁদ
শুধু, কি
হন্তারক ছন্দের রূপক মাত্র?
কি জানি॥

ফুল

অনিলকুমার আচার্য

পৃথিবীর রূপে রসে আপনার দেহ গড়ি' শুভ্র ফুলদল
ঘোর অমানিশা শেষে প্রভাত-আলোকে
হেসে করে ঝলমল।
আনন্দ-রসে তার ভরে উঠে দেহখানি কানায় কানায়—
জীবন সার্থক তার, নিবেদিবে আপনারে
দেবতার পায়।
উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তুলে ধরে আপনার দেহ-অর্ঘ্যখানি,
বিনম্র হৃদয়া সে যে, লজ্জা আর শ্রান্তিময়ী,
সদা জোড়পাণি।
সেইক্ষণে প্রকৃতির নিয়মের বশে আসে লুব্ধ মধুকর,
আকণ্ঠ ভরিয়া পান করে মধু, তারপর যায় নিজঘর।
তাহাতে কি কুসুমের শুচিতার শুভ্রতার হয় কোন হানি ?
তাহাতে কি কুসুমের মনের কোণেতে
দেখা দেয় কোন গ্লানি ?
তাহাতে কি দেবতার নৈবেদ্যের থালে
তার হয় নাকো স্থান ?
সেই ফুল হাতে নিয়ে পূজারী কি করে নাকো
দেবতার গান ?
রচেনা কি স্তবগাথা, দেয় নাকি
দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ?
সে যে সেই একই সে গো, পূতশুভ্র সে কুসুম-কলি।
পৃথিবীর ধূলিজাল ছোঁয় না, ছোঁয় না তারে,
সে যে শুভ্রশুচি
নিষ্পাপ উদার ছন্দে গড়া তার দেহমন, আশা-অভিরুচি।
দেবতার পায়ে নতা, ভক্তিমতী স্তবরতা,
সদা জোড়-পাণি,
আপনার শুভ্র-শুদ্ধ মহিমায় সকলেরে কাছে নেয় টানি।
জানি জানি জানি তার ভক্তি-শুদ্ধ নম্রতায়
দেবতার পায়ে হবে ঠাঁই,
ধরার কালিমা-ধূলি ছোঁয় না ছোঁয় না তারে,
বার বার এ কথা জানাই।

আশ্রয়ার্থী

দিলীপকুমার রায়

দিন চ'লে যায় ছায়া আসে ঘনিয়ে চারিদিকে।
তোমার কৃপার কথা কি নাথ, চলব শুধুই লিখে ?
রাজার হালে রাখলে মানি, কিন্তু রাজার রাজা
ঠাঁই না দিলে পায় - রাজভোগ হয় দুর্ভোগ সাজা।
তোমার কথা ঢের বলেছি—"তুমি দয়াময়,
জীবনে তোমার দানবর করেছি সঞ্চয়
দিনে দিনে পলে পলে"—শুধু যতই পাই
ততই তোমার শ্রীচরণে শেষের শরণ চাই।
এবার এসো, ঘুরিয়ো না আর, মজিয়ো না দয়াল
মায়ার খেলায়—এসো তোমার রূপ ধ'রে রসাল।
তোমার আসার আশায় আছি তুমি জানো নাকি ?
রাজার হালে রেখে আমায় দিও না নাথ ফাঁকি।

রাজা রামমোহন ও সতীদাহ

"তত্ত্ব কৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত এক প্রবন্ধের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণে সর্ব্বাগ্রে আন্দোলন আরম্ভ করেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তচন্দ্রিকা গ্রন্থে অসারত্ব প্রদর্শনের জন্য রামমোহন ১৮১৭ সালে বাঙ্গলায় "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" ও ইংরাজীতে *Second Defence of Monotheistical system of Hindoos* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গত তিনি লিখিয়াছিলেন :

Ungeera and Vishnu and also modern Raghunandana authorise a widow to burn herself voluntarily with the corpse of the husband but the modern Brahmins, in direct opposition to their authority allow her relatives to bind the mournful and infatuated widow to the funeral pile with ropes, and bamboos as soon as she expressed a wish to perform the dreadful funeral sacrifice, to which the Brahmins lend ready assistance."

সতীদাহ সম্পর্কে ব্রাহ্মণগণের অশাস্ত্রীয় আচরণের কথা রামমোহন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি, অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের পণ্ডিত হিসাবে প্রদত্ত অভিমতের পূর্ব্বেই। এমন তীব্র ভাষায় নিন্দা কি ইহার পূর্বে আর কেহ করিয়াছিলেন?

রামমোহন কোন অন্যায় সম্পর্কে শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত থাকার লোক ছিলেন না। ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াই ছিল তাঁহার স্বভাবধর্ম। সেজন্য দেখিতে পাই, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তাঁহার শাস্ত্রীয় মতামত শ্রবণে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট এক নির্দেশনামা জারী করিয়া শাস্ত্রীয়-বিধি-লঙ্ঘন-করা সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এশিয়াটিক জার্ণালের ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত পত্রিকার পূর্বমাসে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত শ্রীরামপুরের মিশনরী ওয়ার্ড সাহেবের এক লেখার প্রতিবাদে জনৈক লেখক যাহা লেখেন তাহাতে প্রসঙ্গত প্রকাশ :

"Mr. Ward cannot be ignorant that only four years ago it was pointed out to the magistrate of Calcutta that to bind a widow was contrary to the law, and that in consequence of this information the practice was prohibited in the suttee taking place near Calcutta. This is a fact so honourable both to the learned native Rammohan Roy who pointed out the breach of law, and the magistrate who enacted a strict obedience to its letters, that it ought not to be overlooked by Mr. Ward. (*Vide Asiatic Journal, 1821, p 145*)

কলিকাতার পুলিস এই তথ্য অবগত ছিলেন বলিয়া কালীঘাটের নীলু ডাক্তারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সহধর্মিনী সহমৃতা হইতে চাহিলে পুলিশ এ সম্পর্কে রামমোহনের শরণাপন্ন হন। এই সংবাদ কণিকাটুকুও পাওয়া যায় ১৮১৮ সালের মার্চের এশিয়াটিক জার্ণালে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক জার্ণালের জানুয়ারী সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার টাইটলারের এক প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গত সতী দাহ সম্পর্কে এক ফুট-নোট হইতে এই সংবাদ জানা যায় যে ১৮১৭ সালের যশোহরের জজ সতীদাহ প্রথার ন্যায় জঘন্য প্রথা

করিয়া মনুসংহিতা এবং ঐ বিষয়ে সম্পৃক্ত কয়েকটি পুস্তক ডাক্তার টাইটলারকে প্রদান করেন এবং তাঁহার মতামত জানিতে চান। ডাক্তার টাইটলার রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহিবা মাত্র রামমোহন—

"perfectly agreed in my opinion regarding the illegality of suttee......I notice this circumstance on two accounts; first becouse it is in the highest degree creditable to the truly expanded mind of Rammohan Roy, who although a Brahmin, was in this instance seen soaring like the eagle in the region of light, far superior to the darkened conception of his caste, and not fouud averse to listen to a fact regarding to the suprs·ition in India which was communicated to him by an European, and second, because I esteem it not more than an act of justice to the gentleman holding the highest official situation at Jessore."

শ্রীমতী কাইথ্ মার্টিন 'হরকরা' পত্রে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লেখেন যে, সতীদাহ নিবারণ সম্ভব হয় রামমোহন রায়ের অষ্টাদশ বৎসর অক্লান্ত সাধনার ফলে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঐ সাধনা শুরু হইলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হয়। ঐ বৎসরেই (১৮১২) জগমোহনের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সহমৃতা হওয়া বন্ধ করিতে না পারায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, এই নৃশংস প্রথা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইবেন।

পরিবহণ মন্ত্রী

"যুগজ্যোতি" পত্রিকায় প্রকাশ :

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে অন্য সকল রাজ্যে পরিবহন সংস্থাগুলির মোটা টাকা লাভ হয় অথচ পশ্চিমবঙ্গ তিনটি সরকারী পরিবহন সংস্থারই প্রচুর লোকসান হয়।

উত্তর প্রদেশের সরকারী পরিবহন সংস্থার লা বছরে ৩ কোটি টাকা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৮৬ লা টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা রাজ্য পরিবহন সংস্থা লোকশান ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, উত্তর বঙ্গ রাজ্যপরি বহন সংস্থায় ১২ লক্ষ টাকা ও দুর্গাপুর রাজ্য পরিবহ সংস্থার ৩০ লক্ষ টাকা—মোট ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

তিনি বলেন উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থায় এখন মো বাসের সংখ্যা ৩০০টি, কিন্তু তাহার মধ্যে ৯০টি চলেনা ৭০টি বাসের টায়ার নাই এবং অন্য ২০টি অন্যান্য কার অচল। কিন্তু তামাসা এই যে বাস চলিতেছেনা অথচ কর্মী নিয়োগ অব্যাহত রহিয়াছে। তিনি বলে যে ঐ সংস্থার কর্মীর সংখ্যা আগে ছিল ২৬০০, এখ দাঁড়াইয়াছে ৪৮০০; কারণ একজন মন্ত্রী গত এপ্রিল মে ও জুন এই তিন মাসে ২০০০ লোককে নিয়ো করিয়াছেন। আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদে লোক নিয়োগ করিবার চেষ্টাও চলিতেছে কিন্তু টাকা সংগ্রহ করিয়া বাসগুলি চালাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে না।

দুর্গাপুর রাজ্য পরিবহন সংস্থার প্রসঙ্গে ঐ মুখপাত্র বলেন সেখানেও ঐ একই ব্যাপার চলিতেছে। ঐ সংস্থার ১৫০টি বাসের মধ্যে ৯০টিই অচল হইয়া পড়িয়া আছে, অথচ কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২০০ দাঁড়াইয়াছে। একদিকে বেশী সংখ্যায় বাস অচল অপর দিকে কর্মী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাই লোকসানও বৃদ্ধি পাইতেছে।

কলিকাতা রাজ্য পরিবহন সংস্থা সম্পর্কে ঐ মুখপাত্র মন্তব্য করেন যে উহার অবস্থা সকলেই জানেন কাজেই বিস্তারিত বলিয়া লাভ নাই।

সাময়িকী

পরলোকে সুখময় দত্ত

করিমগঞ্জ বারের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবি শ্রীসুখময় দত্ত মৃদু স্ট্রোক্ এর আক্রমণে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত দুটোয় ৮৬ বৎসর বয়সে, তাঁর করিমগঞ্জস্থ বাসভবনে মানবলীলা সম্বরণ করেছেন। তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি কাছাড় জেলায় অন্যতম বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলায় বালাগঞ্জ থানার খুজাবগাও গ্রামে। সুনামগঞ্জ থেকে তিনি মেট্রিক্ পরীক্ষায় আসামে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করে কলিকাতা থেকে এম, এ, পাশ করেন এবং ১৯১৮ করিমগঞ্জে এসে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৈষ্ণবধর্ম মতের সাহিত্যে আকৃষ্ট হন। তাঁর এক পুত্র শ্রীশংকর দত্ত একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের এক হাসপাতালে চাকুরীতে আছেন। শ্রীদত্তের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করিমগঞ্জের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আদালতই বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁহারা একটি সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। স্থানীয় নাগরিক পরিষদও এক সভায় তাঁর আত্মার শান্তি কামনা সহ আত্মীয়-স্বজনদের শোকে সহানুভূতি জানান।

বরাক সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ০৬শে জানুয়ারী বদরপুরে বরাক নদীর উপর নবনির্মিত সেতুটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণ ২-০০ টায় পূর্তমন্ত্রী ডাঃ লুৎফুর রহমান ফিতা কেটে সেতুটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিধায়ক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এবং প্রধান অতিথি ছিলেন আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য শ্রীরণেন্দ্র মোহন দাস। ঐ অনুষ্ঠানের সময় কাটিগড়ার একদল ছাত্র-ছাত্রী বুকে কালোব্যাজ লাগিয়ে কালোপতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা ভাষার দাবীতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ৩টায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সেতুর উদ্বোধনের ফলে ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঙ্গে কাছাড়ের যোগাযোগ সহজতর হল।

সুয়েজ অঞ্চল : আজ ও আগামীকাল

আজ যখন মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে সৈন্যরা যুদ্ধ বন্ধ করে সরে যাচ্ছে তখন কায়রোয় রচিত হচ্ছে সুয়েজ খাল ও তার উভয় তীরবর্তী শহরগুলির পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। বিশেষজ্ঞদের মতে খাল পরিষ্কার করতে—আটক জাহাজগুলি সরাতে, বোমা ও মাইন এবং ডোবা জাহাজ ও উপকূলবর্তী সাজ-সরঞ্জামের ধ্বংসাবশেষ তুলে বালি ও পলি পরিষ্কার করতে প্রায় ছয় মাস লাগবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, খালে জাহাজ চলাচল শুরু হলে মিশরের বছরে ১৭ কোটি ডলার আয় হবে। মিশরীয়রা এখানেই থামতে রাজী নন, তাঁরা আয় বাড়িয়ে ২৫ কোটি ডলার করতে চান। এর জন্য বড় বড় জাহাজ বিশেষ করে, অতিকায় তৈলবাহী জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য খালকে আরও গভীর করার এবং নৌ-চলাচল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দরকার হবে।

উপকূলভাগের পুনর্নির্মাণের জন্য আরো বড় পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে। সুয়েজ নগরী এখনই একটি বৃহৎ পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই নগরীকে দশ লক্ষ লোকের একটি শিল্প-কেন্দ্রে পরিণত করা হবে; খালের অপর পারের সঙ্গে এই নগরীর যোগস্থাপন করা হবে একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। পোর্টসৈয়াদ ও ইসমাইলিয়ার জন্যও অনেক কিছু করা হবে।

কায়রোর "অল-গুমহুরিয়া" পত্রিকা লিখেছেন,

নতুন পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট

চর্হবিল, আরব পুঁজি, ঋণ, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে এবং ইতিমধ্যেই এইসব পরিকল্পনায় আগ্রহ দেখাচ্ছে এমন বিদেশী পুঁজি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে বিরাট লগ্নীর প্রয়োজন হবে। উক্ত পত্রিকা আরও লিখেছেন যে, এই পরিকল্পনাগুলি এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলির রূপায়ন ৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে স্থাপিত মিশরের সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেও মিশর আজকের দিনের পরস্পরবিরোধী বাস্তবতাগুলিকে উপেক্ষা করছে না। খাল অঞ্চলের পুনর্গঠনের কর্মসূচীর মধ্য প্রাচ্যের বিরোধীদের ন্যায্য মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত—এ কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে কায়রোর সংবাদপত্রগুলিতে। আর এই ন্যায্য মীমাংসা নির্ভর করছে অধিকৃত সমস্ত ভূখণ্ড থেকে ইজরায়েলের সরে যাওয়ার উপর। এই কথা গোপন নেই যে, শুধু তেল আভিভে নয়, অন্যত্রও কোন কোন অতি প্রভাবশালী মহল এই রকম মীমাংসার বিরোধী। ইজরায়েলী বাহিনী সরিয়ে নেওয়া সম্পর্কে ইয়োরোপে ন্যাটোর সদরদপ্তর থেকে প্রকাশিত বিশেষ বিবৃতিতে সুয়েজ খাল আবার খুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, এর ফলে নাকি সোভিয়েত নৌবাহিনীকে সাহায্য করা হবে। অনুরূপ আর একটি যুক্তি হল সুয়েজ খাল আবার খোলা হলে সোভিয়েত জাহাজগুলির চোরাকারবার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। এই যুক্তি দেখিয়েছেন পেন্টাগন। টাইম বলেন যে, পেন্টাগন সুয়েজ খাল আবার চালু করার প্রকল্পে উৎসাহী নন।

অন্যদিকে পশ্চিমী সামরিক বড় কর্তারা এমন উৎসাহের সঙ্গে খাল আবার খোলার পরিকল্পনার অজুহাতে প্রগতিশীল আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে লক্ষ্য রেখে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেছেন যে উৎসাহ কোন ভাল কাজে দেখালে ভাল হত। এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্রিটেনের দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপ—যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটি নির্মাণ করেছে তা আরব দুনিয়ার কয়েকটি অংশ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের অপেক্ষা সামান্য বেশী দূরে অবস্থিত।

তবু মিশরীরা বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের শান্তিপূর্ণ নির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়নের অনুকূল অবস্থা দেখা দেবে। এর প্রমাণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ তান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা দৃঢ়তর হয়ে ওঠার মধ্যে। এই সব দেশ সর্বদা আরবদের পক্ষ সমর্থন করছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তির জন্য আরবদের সংগ্রামে সাহায্য করেছে।

দেশ-বিদেশের কথা

দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের মার্কিন পরিকল্পনা সম্পর্কে 'প্রাভদা'

ভারত মহাসাগরে সামরিক উপস্থিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক মহলগুলি এই অঞ্চলের দেশসমূহের স্বাধীনতা দারুণভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। তারা এখন এক কর্মধারা অনুসরণ করছে যা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এবং সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য সংগ্রামরত মানুষের আশাআকাংক্ষার পরিপন্থী। দিয়েগো গার্সিয়ায় একটি বিরাট ও স্থায়ী নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণের যে সিদ্ধান্তের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে তাতে এশীয়ার মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে সেম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাভদা একথা বলেছে।

এটা খুবই পরিষ্কার যে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি সুদৃঢ় করার সঙ্গে সোভিয়েতের দিক থেকে "বিপদের" কোন সম্পর্ক নেই। আসলে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের ইচ্ছা পেন্টাগনের হয়েছে। এসব তারই ফল। এবং রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর এই অংশে ঘাঁটি স্থাপনের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য আছে।

প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে যে, এব্যাপারে পিকিং-এর নেতাদের অবস্থানও মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করবার যে প্রস্তাব করা হচ্ছে তার প্রতি শুধু মৌখিক সমর্থন জানিয়ে মাওবাদী প্রচারকেরা সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে যে মিথ্যা কাহিনী রটাচ্ছে মাওবাদীরাও সেই অলীক কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করছে এবং এই ভাবে পেন্টাগন কর্তৃক দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে বিরাট সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনাকে সমর্থন করছে। তার চেয়েও বড় কথা হল, সম্প্রতি এরকম কথাও শোনা যাচ্ছে যে, ভারত মহাসাগরে সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছা পিকিং-এরও আছে।

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন বিমান ও নৌবহর কেন রাখা হয়েছে তার কারণ বিশ্ববাসী ভাল করেই জানেন। এপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, যখন বাংলাদেশের ঘটনাবলী এমন দিকে যাচ্ছিল যেটা ওয়াশিংটনের একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না তখন মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উপকূলে পাঠানো হয়েছিল। অথবা বলা যায় মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সময় আরব দেশগুলির উপকূলভাগে গিয়ে এই নৌবহরই বলপ্রদর্শন করেছিল।

সুয়েজ খাল ও আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচল

সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে ইজরায়েলী অগ্রসরের অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল।

খাল বন্ধ হওয়ার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বহু দেশের অর্থনীতিতে, কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে উত্তরে যায় তেল, আকরিক ধাতু, তুলা, রবার, পাট, টিন ও চা এবং দক্ষিণে যায় ধাতু, সিমেন্ট, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য। ব্রিটেন থেকে আফ্রিকা ঘুরে দূর প্রাচ্য যেতে যত সময় লাগে, সুয়েজ খাল দিয়ে গেলে তার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম সময় লাগে। এই পথে ভারতে যেতে ৪০ শতাংশ কম সময় লাগে। ইতালী, গ্রীস ও তুরস্ক থেকে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির দূরত্ব সুয়েজ খাল দিয়ে গেলে ৩ থেকে ৫ গুণ বা তারও বেশী কমে যায়। ১৯৬৬ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে ২৪ কোটি ২০ লক্ষ টন মাল

অথবা সারা দুনিয়ায় জাহাজবাহিত মালের ১৫ শতাংশ নানা দেশে পৌঁছোছিল।

ইজরায়েলী অগ্রসর তৈলবাহী জাহাজ বহরের মালিক অন্তর্জাতিক একচেটিয়া তৈল পুঁজিপতিদের কাছে দেখা দিল ঈশ্বর প্রেরিত ব্যাপাররূপে। তাঁরা দ্রুত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে নিউজার্সির স্টাণ্ডার্ড অয়েলের ৫২ লক্ষ টনের তৈলবাহী জাহাজ বহর এবং রয়াল ডাচ শেল-এর ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টনের তৈলবাহী জাহাজ-বহর ছিল। দুনিয়ার অন্যতম বৃহত্তম নৌশক্তি ফ্রান্সের সমগ্র তৈল-বাহী জাহাজবহরের চাইতে ঐ দুই কোম্পানির জাহাজ-বহর আরও বড়।

সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ার ফলে যে সব পরিবর্তন ঘটে সেগুলি সহজেই চোখে পড়ে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া তৈল পুঁজিবাদের মুনাফার মধ্যে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া তৈল পুঁজিবাদের মুনাফা
(দশ লক্ষ ডলারে)

	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল অব নিউজার্সি—	১,০৯১	১,১৫৫	১২,৭৫
টেক্সাকো—	৬৯২	৭৫৪	৮৩৬
গাল্ফ অয়েল—	৫০৫	৫৬৮	৬৫৬
মোবিল অয়েল—	৩৫৬	৩৮৫	৪২৮
রয়াল ডাচ শেল (দশ ষ্টার্লিং পাউণ্ডে)	২০৬	২১০	—

সুয়েজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উন্নতিকামী দেশগুলির বড় রকমের ক্ষতি হয়। এদের বাণিজ্যপোতসহর না থাকায় এরা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির জাহাজ ভাড়া করতে বাধ্য হয় এবং সামান্য বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল থেকে এদের ভাড়া মেটাতে হয়।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতি যে সব দেশের তাদের মধ্যে আছে ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূলবর্তী দেশগুলি। এই সব দেশ প্রধানতঃ কারবার করে ইয়োরোপীয় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির সঙ্গে। যেমন, পশ্চিম ইয়োরোপে ভারতের আকরিক লোহা প্রেরণ বাবদ ভাড়া টন প্রতি ৫ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৯ ডলার, অথচ ভারতের আকরিক লোহার দাম পড়ে টন প্রতি ৭ ডলার।

খাল বন্ধ হওয়ার ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিশর। যেমন, ১৯৬৬ সালে খালে জাহাজ চলাচল বাবদ তার আয় হয়েছিল ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এতে তার মোট আমদানির এক-চতুর্থাংশের দাম মেটানো সম্ভব হয়।

ব্রিটেনের মত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিরও ক্ষতি হচ্ছে। ব্রিটেনের ক্ষতির পরিমাণ দিনে ১৫ থেকে ১০ লক্ষ ডলার।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :

(ফরম নং ৪)

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— প্রতি মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ১১।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৩

৪। প্রকাশকের নাম — ঐ

জাতি — ঐ

ঠিকানা — ঐ

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

এবং

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর না[ম]

ঠিকানা

এবং

(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারী-দের নাম ঠিকানা—

১। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়
১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

২। শ্রীমতী ঈশিতা দত্ত
১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

৩। শ্রীমতী সুনন্দা দাস
১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

৪। শ্রীমতী নন্দিতা সেন
১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

৫। শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়
৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

৬। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

৭। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়
৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

৮। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র
৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

৯। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ— প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার

REGISTERED No. WB/CC—213 : THE PRABASI MARCH 19
India & Pakistan Price : Single Copy Re. 1.25 an Annual Subscription Rs. 14
Phone : 24-5520